

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রকাশনায়
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৬৫ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১

মুদ্রণে
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২এ কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদশিল্পী
কাইয়ুম চৌধুরী

জীবনের অন্তিম লগ্ন আসন্ন আশঙ্কায় এ বইয়ের বুকে
অঙ্কিত রাখলাম এক সারি প্রিয়জনের নাম :

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়,
যিনি বাঙলার, বাঙালীর ও বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসের
অনেক জটিল গ্রন্থি মোচন করেছেন।

পৌত্র নাফিস করিম কান্ত,
যাঁর মধ্যে অসামান্য কিছু প্রত্যাশা করছি।

জীবনসঙ্গিনী সালেহা,
যিনি সংসার-তরীর কর্ণ নিপুণ হাতে নিয়ন্ত্রণ করে
আমাকে চিরনিশ্চিন্ত রেখেছেন।

আত্মীয় আবু রশীদ মাহমুদ,
যিনি আমার পক্ষে সব দায়িত্ব বহন করে
আমাকে স্বস্তিতে রেখেছেন।

কন্যাকল্প মা শাহীন আখতার,
যিনি কিছুকাল আমার বৈকালিক ভ্রমণে সঙ্গী হয়ে নানা তত্ত্বালোচনায়
আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপিত রেখেছিলেন।

এবং ছোটভাই ডাক্তার আহমদ জহীর,
যাঁর প্রতি আমার সব দায়িত্ব পালন করা গেল না।

আ. শ.

বিন্যাসক্রম

প্রথম অধ্যায়

ভাব বিপ্লব : চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য পৃ : ১-১১৯

১. চৈতন্যবাদ ও বাঙলার রেনেসাঁস ২. ভক্তিবাদের প্রাবল্যের কারণ ৩. ভক্তিতত্ত্বের শাস্ত্রীয় উৎস ৪. বাঙলা ভক্তিবাদের ভিত্তি ৫. ভক্তিবাদ ও ইসলাম : মতসমন্বয় ৬. ভক্তিবাদ, সাধনসঙ্গীত ও ইসলাম ৭. সুফীর স্রষ্টাসৃষ্টি সম্পর্কতত্ত্ব ৮. সুফীতত্ত্বের স্থানীয় বিকাশ ৯. বৈষ্ণবমতের স্বরূপ ও প্রভাব ১০. অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব : চৈতন্যদর্শন ১১. বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্ব ১২. পদাবলীর রসতত্ত্ব ১৩. চৈতন্যজন্ম কালের বাঙলাদেশ ১৪. চৈতন্যদেবের জীবনকথা ১৫. চৈতন্যবাণী ১৬. চৈতন্যদেবের অবদান ১৭. ষড়্‌গোস্বামী ও চৈতন্যপার্ষদ-পরিকর পরিচিতি, চরিতকথার স্বরূপ-চৈতন্যচরিতগ্রন্থ সংস্কৃত ও বাঙলা, সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রক্ষিপ্ত রচনা ও জালগ্রন্থ, সহজিয়াদের গ্রন্থ, পদাবলী সংকলনগ্রন্থ, ব্রজবুলি, পদকারগণ, চট্টগ্রামের মুসলিম পদকার, চট্টগ্রামের হিন্দু কবির পদসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্যে ষোলশতকের বাঙলা ও বাঙালী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাবগত ও কৃষ্ণমঙ্গল পৃ : ১২০-১২৫।

১. কৃষ্ণভক্তি প্রচারমূলক পাঁচালী, কবিগণ. সতেরো-আঠারো শতকের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থাবলী।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্য পৃ : ১২৬-১৩৫

রামায়ণ [অনুবাদ-১] অনুবাদকের যোগ্যতা ২. রামকথা ও ভারতকথা ৩. রামকথার উৎস ও কাল ৪. অদ্ভুত-বাশিষ্ঠ-অধ্যাত্ম রামায়ণ ৫. রামকথার বিশ্বরূপ ৬. রামাযণ ও অনুবাদকগণ।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাভারত পৃ : ১৩৬-১৬১

মহাভারত [অনুবাদ-২]। ১. জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত পরিচিতি ২. মহাভারত উত্তরাপথের সম্পদ ৩. বাঙালীর চোখে মহাভারত ৪. মহাভারতের বাঙলায় অনুবাদ-প্রেরণা ৫. কবিপরিচিতি : কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, পরাগল খান ও ছুটি খান, রামচন্দ্র খান, সঞ্জয়, কাশীরাম দাস।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রণয়োপাখ্যান পৃ : ১৬২-২৭২

প্রণয়োপাখ্যান [অনুবাদ–৩] ১. উপাখ্যানতত্ত্ব ২. মধ্যযুগের মুসলিমরচিত বাঙলাসাহিত্য ও চট্টগ্রাম ৩. ষোলশতকের প্রণয়োপাখ্যান : মধুমালতীর সমকালীন, বিদ্যাসুন্দর, লায়লী-মজনু, মুহম্মদ কবীর, দ্বিজ শ্রীধর, শাহ বারিদ খান, দৌলতউজির বাহরাম খান।

সতেরোশতকে রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য : পৃ : ১৯৪-২৩৪। ক. রোসাঙ্গরাজ্য পরিচিতি খ. রোসাঙ নামের উৎপত্তি. গ. রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য সৃষ্টির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ ঘ. 'রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য' নামের যাথার্থ্য ঙ. 'মঘ' নামের উৎপত্তি, চ. রোসাঙ্গ শহরের কবি ও কাব্য পরিচিতি : কাজী দৌলত, মাগনঠাকুর, আলাউল, মরদন, শমসের।

সতেরোশতকের অন্যান্য উপাখ্যানপ্রণেতা : পৃ : ২৩৪-২৫০। ১. ফারসী-উর্দু-হিন্দি উপাখ্যানে জীবনচিত্র, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান, কবিগণ : দোনাগাজী, আবদুল হাকিম, শরীফশাহ, গেয়াস খান, মুহম্মদ আকবর, মঙ্গলচাঁদ, নওয়াজিস খান।

আঠারো-উনিশশতক : পৃ : ২৫০-২৭২। মুহম্মদ আলী রাজা, পরাগল, মুহম্মদ আলী, মুহম্মদ আকবর, মুহম্মদ রফিউদ্দিন প্রভৃতি। আঠারো শতকের প্রণযোপাখ্যানের হিন্দু রচয়িতাগণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য পৃ : ২৭৩-২৯৯

১. জিগীষা ২. মাগাজী ৩. মসিয়া সাহিত্য ৪. পূর্বকথা ৫. শিয়াপরিচিতি ৬. জয়কুমরাজার লড়াই, জাযেনউদ্দীন সম্বন্ধে নতুন তথ্য ৭. জয়গুণের কিস্সা ৮. সিকান্দরনামা ৯. আবদুল নবী ১০. কবি গেয়াস খান ১১. নসরুল্লাহ খোন্দকার ১২. শেখ ফয়জুল্লাহ ১৩. দৌলতউজির বাহরাম খান ১৫. মুহম্মদ খান, হায়াত মাহমুদ, হামিদ প্রভৃতি। রূপক যুদ্ধকাব্য সত্যকলিবিবাদসম্বাদ।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিম ধর্মসাহিত্য পৃ : ৩০০-৩৩৯

মুসলিম ধর্মসাহিত্য : [অনুবাদ–৫] ১. গোড়ার দিকের দেশজ মুসলিমসমাজ ২. অনুবাদে বাধা ৩. অনুবাদে আগ্রহ ৪. মুসলিম ধর্মসাহিত্যের ধারা : বাঙলায় ইস্লামের রূপ ৫. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কয়েকজন কবির জীবৎকাল নিরূপণ প্রসঙ্গ, কবিগণ : শেখপরাণ, নেয়াজ, মুত্তালিম, আশরাফ, আলাউল, মুজাম্মিল, আবদুল হাকিম, সৈয়দ নুরউদ্দীন, নসরুল্লাহ খোন্দকার, মুহম্মদ ফসীহ প্রভৃতি।

অষ্টম অধ্যায়

সাওয়াল সাহিত্য পৃ : ৩৪০-৩৫২

সওয়ালসাহিত্য : [অনুবাদ–৬] কবিগণ : আকিল, সার্দী, এতিম আলম, আলি রজা, সেরবাজচৌধুরী, সৈয়দ নুরউদ্দীন, নসরুল্লাহ খোন্দকার, আবদুলকরিম খোন্দকার।

নবম অধ্যায়

চরিতকথা পৃ : ৩৫৩-৩৮৫

নবীবংশ, রসুল চরিত, বাঙলা কাসাসুল আম্বিয়া, রসুল চরিত ও রসুল বিজয়, সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, জনাব আলি, মুহম্মদ খাতের, শমশের গাজীনামা : শেখ মনোহর, নসলে উসমান : মুহম্মদ উজির আলি, দুল্লামজলিস : আবদুলকরিম খোন্দকার, সিফৎনামা : নুরুল্লাহ, সূফী সানাউল্লাহচরিত : আজমতুল্লাহ।

দশম অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল পৃ : ৩৮৬-৪০০

১. চণ্ডী পরিচিতি ২. চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যান দুটোর সারাংশ ৩. কবিগণ : মানিকদত্ত, দ্বিজমাধব, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামদেব, রামানন্দ যতি, কৃষ্ণরামদাস প্রভৃতি।

একাদশ অধ্যায়

মনসামঙ্গল পৃ : ৪০১-৪০৯

নারায়ণদেব, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজবংশী দাস, কালিদাস, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, সীতারাম দাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, তন্ত্রবিভূতি, দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রভৃতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

কালিকামঙ্গল পৃ : ৪১০-৪২৫

ভূমিকা, কঙ্ক, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম চক্রবর্তী, বলরামচক্রবর্তী, রামপ্রসাদ সেন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক কবি।

বিবিধ অপ্রধান দেবদেবীর পাঁচালী পৃ : ৪২১-৪২৫

শীতলামঙ্গল : নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, বল্লব, কৃষ্ণরাম দাস, মানিক রাম গাঙ্গুলী, ষষ্ঠীমঙ্গল : কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী, শঙ্কর। সারদামঙ্গল : দয়ারাম দাস, বীরেশ্বর, রাজা রাজসিংহ। সূর্যমঙ্গল, জাহ্নবীমঙ্গল প্রভৃতি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিবমঙ্গল পৃ : ৪২৬-৪৩৩

১. সর্বভারতীয় দেবতা শিব ১. বাঙলার শিব ৩. কবিগণ : রামকৃষ্ণরায়, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রামরাজা, দ্বিজ রতিদেব প্রভৃতি।

চতুর্দশ অধ্যায়

আপোসমুখী সাহিত্য : পীরপাঁচালী পৃ : ৪৩৪-৪৫৩

ক. পীর-নারায়ণ সত্য

১. শাস্ত্রের ও সমাজের বিবর্তন ধারা ২. শাস্ত্র ও সমাজ বিপ্লব ৩. শ্রেণীদ্বন্দ্ব ৪. ষোলশতক থেকে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় ধারা ৫. জীবন ও ঐহিকতা পীর-নারায়ণ সত্য-এর উদ্ভবতত্ত্ব ৭. সত্যপীরের জন্ম বৃত্তান্ত ৮. কবিগণ : কঙ্ক, রূপরাম, কৃষ্ণরাম দাস, শেখ ফয়জুল্লাহ, ভৈরব ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, তাহির মাহমুদ, ফকির গরীবউল্লাহ, আরিফ প্রভৃতি অনেক।

খ. কাল্পনিক, ঐতিহাসিক এবং দরবেশ পীর : পৃ : ৪৫৩-৪৭৩। ১. পূর্বকথা ২. পীরবাদের উৎস ৩. পাঁচপীরতত্ত্ব ৪. কাল্পনিক পীর : কালুগাজী চম্পাবতী, বড়খাঁগাজী, বনবিবি, মছলন্দী পীর, মানিক পীর ৫. সেনানী পীর : ইসমাইল গাজী, জাফরখাঁ গাজী, সফীউদ্দীন সুলতান ৬. দরবেশ পীর : বদর, বদীউদ্দীন মাদার, শাহ সুলতান বলখী, পীর গোরাচাঁদ, পেয়ার শাহ, মোবারক গাজী, একদীল শাহ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবক্ষয়যুগ : যুগসন্ধিরকাল : পৃ : ৪৭৪-৫২২

ক. দোভাষী সাহিত্য

১. দোভাষীপুথির ভাষা ২. দোভাষীপুথির ইতিকথা ৩. দোভাষী সাহিত্যের পাঁচটি ধারা ৪. শায়ের পরিচিতি : গরীব উল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ আটচল্লিশজন কবি।

খ. কবিওয়ালা ও কবিগণ পৃ : ৫২২-৫২৯।

১. ভূমিকা ২. আঠারো-উনিশ শতকের বন্দর-নগরের কবিওয়ালা। কবি পরিচিতি : গোঁজলাগুই, লালুনন্দলাল, হরুঠাকুর, কেষ্টামুচি, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী, নীলমণি, নীলঠাকুর, ভোলাময়রা, এ্যান্টনীফিরিঙ্গী, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রূপচাঁদপক্ষী, দাশরথি রায়, রামবসু প্রমুখ অনেক।

ষোড়শ অধ্যায়

বিবিধ রচনা পৃ : ৫৩০-৫৮৩

১. ইতিহাসের উপকরণ : বাস্তব ঘটনা নির্ভর রচনা ২. মহারাষ্ট্রপুরাণ ৩. পাঠান প্রশংসা, জোরওয়ারসিংহ প্রশস্তি ৪. আওরা দ্য বারোজ ৫. খওলে কুকির হামলার ইতিকথা প্রভৃতি এবং ছড়া, গান ও কবিতাংশ ৬. গোপীদাস রচিত চৈতন্যমঙ্গল ৭. ব্রজমোহন দাস রচিত চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ ৮. রহিমুননিসা রচিত বিলাপ ৯. তামাকুপুরাণ ১০. মুহম্মদ দানিশ রচিত জ্ঞানবসন্তবাণী ১১. নিকাহমঙ্গল ১২. একটি বৈষ্ণবপদরহস্য ১৩. সঙ্গীতশাস্ত্র ১৪. ফালনামা ১৫. লোকসাহিত্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাহিত্য বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির রূপরেখা পৃ : ৫৮৪-৬১৭।

১. ভূমিকা, বাঙালীর বৃত্তিগতশ্রেণীবিন্যাস, শিক্ষা, লেখাপড়ার উপকরণ, চিকিৎসাবিদ্যা, খাদ্য, পোশাক, অলঙ্কার, নারী, বিবাহ, আদবকায়দা, লোকচরিত্র, নেশা, গানবাজনা, খেলাধূলা, দাসপ্রথা, ঘরবাড়ি, মুদ্রা-বিনিময়, কৃষিশিল্পদ্রব্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র, লোকাচার ও কুসংস্কার, জনগণের আর্থিক অবস্থা, গ্রাম্যসমাজ, উপসংহার।

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

[দ্বিতীয় খণ্ড]

প্রথম অধ্যায়

ভাববিপ্লব : চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবসাহিত্য

১. চৈতন্যমতবাদ ও বাঙলার রেনেসাঁস

বাঙলাসাহিত্যের যুগবিভাগ প্রসঙ্গে একবার বলেছি যে, সেকালে রাজ্যজয়, ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্যসূত্রে বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মীর সঙ্গে কোন দেশের মানুষের পরিচয় ঘটতো। কেননা সেকালের বাহুল্যবর্জিত প্রত্যাশারহিত নিরক্ষর মানুষের অনাড়ম্বর জীবন-জীবিকা গাঁয়ের পরিসরে থাকতো নিবদ্ধ। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মাত্রই ছিল অসম্ভবের পর্যায়ে। জীবনবিকাশের উপায় ছিল সাধারণের অজ্ঞাত। বর্ণে ও কর্মে বিন্যস্ত সমাজে স্বভাগ্য গড়ার সুযোগও ছিল সীমিত। তা' ছাড়া চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছ অশন-বসন কেন্দ্রী বলে এবং তার প্রাপ্তি গাঁয়ের পণ্য ও শ্রম বিনিময়েই নিবদ্ধ বলে এবং শতকরা নিরানব্বই জনের পক্ষে ভাগ্যান্বেষণে দূরযাত্রা নিরর্থক বলে দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না তেমন। পথ ছিল প্রায়ই দুর্গম, দুরতিক্রম্য ও দস্যুসঙ্কুল। ফলে গাঁ-গঞ্জ ছিল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। নগর-বন্দরের ও রাজধানীর সমীর ও সংবাদ গাঁয়ের বুকে পৌঁছতে সময় লাগত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব ব্রিটিশ আমলেও দেখা গেছে গাঁয়ের ইংরেজি-অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষের ঘরে-মনে বিলাতী হাওয়া ছিল প্রায়ই অনুপস্থিত।

আজকের যন্ত্রযুগে রুদ্ধ ঘরে চোখ বন্ধ করে থাকলেও বিশ্বের বহু কিছু জানা হয়ে যায়। তারে-বেতারে-শব্দে-চিত্রে-পত্রে-পত্রিকায় এবং দূর-দূরান্তরে যাওয়া-আসার সহজতায় পৃথিবীর পরিসর নিতান্ত সংকীর্ণ হয়ে একটা বিশাল শহরের মানসরূপ নিয়েছে। কাজেই আজকের মানুষের পক্ষে রূপকথার যুগের অসীম অজ্ঞাত জগতের স্বরূপ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তবু সেকালেও আত্মপ্রত্যয়ী ও উচ্চাভিলাষী রাজকুমারেরা ছিল, ছিল অভিযাত্রী বণিকনন্দন, ছিল উদ্যোগী পুণ্যার্থী শাস্ত্রপ্রচারক ও তীর্থযাত্রী। আরো ছিল দুঃসাহসী নিরুদ্দেশ পর্যটক। তাদের মাধ্যমেই দূরদেশের মানুষে মানুষে হতো পরিচয়। অবশ্য নগর-বন্দরেই হতো সাধারণত সে পরিচয়ের ও প্রভাবের শুরু। তারপর ক্রমে মন্থরভাবে ও অলক্ষ্যে গাঁয়েও সংক্রমিত হতো সেভাবে। এমনি দেশজয়, বাণিজ্যসম্পর্ক ও ধর্মপ্রচার সূত্রে কোন দেশে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী এলে স্থানীয় মানুষের উপর ঐ নতুন মানুষের মন-মত, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের প্রভাব পড়ে। তখন গ্রহণে-বরণে-অনুকরণে-অনুসরণে-নির্মাণে-মেরামতে স্থানীয় মানুষের ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে সে প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠত। তিন প্রকারে বিদেশী প্রভাব দেখা দেয়—বস্তুগত. ভাবগত ও পদ্ধতিগত। বস্তুগত প্রভাবের মধ্যে পড়ে আসবাব ও তৈজস, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র, ফল-মূল, ভাষা-কৃৎকৌশল, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, অলঙ্কার ও প্রসাধনসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। ভাবগত প্রভাবে মেলে ধর্মতত্ত্ব, মূল্যবোধ, নাচ-গান-বাজনা, আদব-কায়দা, আচার, আচরণ, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি। আর পদ্ধতিগত প্রভাব বলতে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও জীবিকাপদ্ধতি বোঝায়। নবধর্মের ও বিজেতার প্রভাব নগরে-বন্দরে সনাতন সমাজে চাঞ্চল্য ও দ্রোহ সৃষ্টি করে—একদল হয় রক্ষণশীল, অন্যদল হয় পুরোনোদ্রোহী ও গ্রহণশীল। ফলে সমাজে ঘটে উপদ্রব ও বিপ্লব। উনিশ শতকী কোলকাতায়-মাদ্রাজে-বোম্বাইতে ইংরেজি শিক্ষিত ব্রিটিশ প্রভাবিত সমাজে ব্যবহারিক ও মানসিক যেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বকালেও পার্সী-গ্রীক-শক-হুন-ইউচি-কুষাণ প্রভাবে তেমনিও তাই ঘটেছে। ব্রিটিশ প্রভাবে যেমন পর্তুগীজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় প্রভাব আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তেমনি মধ্যএশিয়ার তুর্কী-মুঘল-ইরানী প্রভাব পূর্বতন শক-হূন-কুষাণ অবদান আবৃত করে রেখেছে। আমরা জানি সভ্য জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি মাত্রই মিশ্র, বহু যুগের বহু ও বিচিত্র মানুষের অবদানে তা পুষ্ট।

উনিশ শতকে কোলকাতায় ব্রিটিশ প্রভাবিত সমাজে মনে-মতে তজ্জাত আচারে-আচরণে যে পরিবর্তন এল, তাকে কেউ কেউ রেনেসাঁস বলে অভিহিত করেন, যদিও তাতে মৌলিক চিন্তা-চেতনা ছিল দুর্লক্ষ্য, জীবনের ও মননের সর্বক্ষেত্রে মেরামত প্রয়াসই ছিল প্রকট। বস্তুত অনুকরণে ও অনুসরণে মৌলিকতা থাকা প্রায় অসম্ভব, ফলে তা অবশ্যই ছিল অপ্রত্যাশিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অনুকৃতির আগ্রহে কিছু সংস্কার, পরিহার, পরিবর্জন ও গ্রহণ-বরণের কাজ চলতে থাকে।

আমরা আর্যবিজয়ের পরে বিজেতা-বিজিতের দ্বন্দ্বমিলনে এক সমন্বিত ধর্ম-সংস্কৃতি পেয়েছিলাম। আবার দেব-দ্বিজ-বেদের নামে ব্রাহ্মণ্যপীড়ন যখন প্রবল হল, তখন গৌতম-মহাবীরের নেতৃত্বে উৎপীড়িত অনার্যের বিদ্রোহ নব শাস্ত্রের প্রচ্ছায় স্বস্তি সন্ধান করেছে। এমনি করেই সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে। একেশ্বরবাদী আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে স্থানীয় লোকের সঙ্গে বিদেশীর ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয়জাত আত্মজিজ্ঞাসাই শঙ্করকে স্বশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করেছিল, যেমন করেছিল ইংরেজ আমলে রামমোহন প্রভৃতিকে। শঙ্করের সংস্কার-প্রয়াস একাধারে সুদূরপ্রসাবী ও আশ্চর্য ফলপ্রসূ হয়েছিল। এতে একদিকে বৌদ্ধ-জৈন সমাজ যেমন বিলুপ্ত হয়েছিল, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সমাজও নতুন করে সমন্বিত ও সংহত হওয়ার দিশা পেয়েছিল। তাঁর মায়াবাদ-জ্ঞানবাদ-অদ্বৈততত্ত্বের অনুসরণে দাক্ষিণাত্যে ভক্তিবাদের উদ্ভব—যার ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, ভাস্কর, বল্লভ প্রভৃতির মতবাদে ও চর্যায়। আবার উত্তরভারতে তুর্কী আফগান বিজয়ের ফলে ইসলামী সাম্য ও একেশ্বরবাদ বর্ণাশ্রিত সমাজে যে চাঞ্চল্য ও দ্রোহ সৃষ্টি করে তার ফলে বিশেষ করে অস্পৃশ্য সমাজে ব্রাহ্মণ্যপীড়ন মুক্তিলিপ্সু মানুষ কবীর, নানক, রামানন্দ, দাদু, রামদাস, মীরাবাই প্রমুখ সন্তের নেতৃত্বে ভক্তিবাদী সম্প্রদায়সমূহ গড়ে তোলে। তারা মন্দির ছাড়ল বটে কিন্তু প্রবেশ করল না মসজিদে। ইতিপূর্বে মদীনা থেকে মুলতান অবধি সবাই ইসলাম বরণ করেছিল। এখানে সন্ত-আন্দোলনের প্রচ্ছায় ভারতীয় সমাজ আত্মরক্ষা করল। তুর্কীবিজয়ে ভারতের সর্বত্র উনিশ শতকী বাঙলাদেশের মতো প্রথমে শিক্ষিত শহুরে সমাজে আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্পণমূলক আন্দোলন চলে এবং পরেও সুস্থ ও স্বস্থ হওয়ার জন্যে শাস্ত্রসংস্কার, আচার-আচরণ সমন্বয় ও নতুন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মত গ্রহণ ও সমন্বিত করার জন্যে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক-দার্শনিক প্রয়াস চলেছিল। সে যুগের অযান্ত্রিকতার ও দুর্গমতার পরিবেশ [উনিশ শতকী কোলকাতায়ও একশ' বছর (১৭৬০–১৮০৬ খ্রীঃ)] প্রায় দুশ' বছরের মতো লেগেছিল। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রভৃতির রচনায় এ স্বস্থ হওয়ার সূচনা এবং উনিশ শতকের মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতোই রঘুনন্দন প্রমুখের ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মের, দর্শনের, এবং আচারের ও সমাজের ক্ষেত্রে এ-সব বিপ্লব-বিদ্রোহ ছাড়াও ইংরেজ আমলের মতোই আসবাবে-তৈজসে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়, আচারে ও আচরণে, জীবিকায়, সাহিত্য-শিল্পে, স্থাপত্যে- ভাস্কর্যে—এক কথায় ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে রূপান্তর ঘটে। উনিশ শতকী মানস-পরিবর্তন যদি রেনেসাঁস হয়, ব্যবহারিক পরিবর্তন যদি যুগান্তর বলে চিহ্নিত হয়, তাহলে আরব-তুর্কী-আফগান বিজয়েও দক্ষিণাপথে ও উত্তরাপথে তেমনি রেনেসাঁস ও যুগান্তর ঘটেছিল, বরং তার গভীরতা ও ব্যাপকতা বেশি ছিল বলেই মনে হয়। কারণ তা বাহ্য আচার-আচরণে নিবদ্ধ ছিল না, চিত্তলোকে আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়েছিল, যার ফলে যে-ধর্মবোধের অপর নাম জীবন-চেতনা তার প্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, ভারতব্যাপী প্রায় অধিকাংশ মানুষ এভাবে নবজীবন লাভ করেছিল।

বাঙলাদেশেও তুর্কীবিজয়ের ফলে ভাববিপ্লব ও সামাজিক উপপ্লব দেখা দিয়েছিল, শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল এখানেও। এটি ছিল যথার্থই জীবনের জাগরণ।

২. ভক্তিবাদের প্রাবল্যের কারণ

অষ্টম শতকের অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সঙ্গে জ্ঞানবাদ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর মায়াবাদ-বিরোধী উত্তর সাধক ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রমুখ তাত্ত্বিক-দার্শনিকেরা ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এঁরা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়। আগেও নারদ, শুক, প্রহ্লাদ, ব্যাস

প্রভৃতি কেউ অবিমিশ্র আর্য ছিলেন না। এবং অদ্বৈতবাদ এবং তাঁদের ভক্তিবাদও ছিল ব্যক্তিক মানসপ্রবণতাপ্রসূত মত। দাক্ষিণাত্যের প্রচারকেরা একে দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এরা সবাই ভারতে মুসলিম আগমনের পরে আবির্ভূত, এজন্যে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ ইসলাম ও সূফী প্রভাবিত বলে মনে করার কারণ আছে। বিদ্বানেরা আজকাল তা' স্বীকারও করছেন।

ক. এ ব্যাপারে বিনয় ঘোষ বলেন ঃ

"বুদ্ধ আর যীশুর মর্মবাণী আত্মসাৎ করে 'মহম্মদ' ইসলামের বাণী নতুন করে শোনালেন মানুষকে। তাই বিশ্বমানব আবার নতুন করে ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল। নীতিভ্রষ্ট আদর্শভ্রষ্ট ভারতের নিস্তেজ মানুষও যে সাড়া দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? দক্ষিণ ভারত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ইসলামের বাণী ইসলামের আদর্শ সমুদ্রপথে প্রথমে পৌঁছল দক্ষিণ ভারতে। তাই বোধ হয়, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। দক্ষিণ ভারত নতুন যুগের ভারতসংস্কৃতির পথ প্রদর্শক হয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। .....অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধর্ম-সমন্বয় ও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্য। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণ ভারতের। একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড় দেশে; নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণ ভারতে এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারত পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।.......দক্ষিণ ভারতের দু একজন রাজা পর্যন্ত যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা' থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম তখন হিন্দু সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। ....ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে শঙ্কর আপোসহীন 'অদ্বৈতবাদ' প্রচার করেছেন।......শঙ্করাচার্যের আপোসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন আরবি ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সে উৎস-সন্ধানের প্রেরণা এসেছে তা' স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্যের পরে রামানুজ বিষ্ণুস্বামী মাধবাচার্য ও নিম্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যায়।.........ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ থেকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।......ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজ ভাষার সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির স্তরে নেমে এলেন।"[১]

খ. তারাচাঁদ বলেন ঃ

"The establishment of this monothesistical tendency received a powerful impetus from the appearance of so uncompromisingly monotheistic a religion as Islam. Sankara was born at time when Muslims were begining their activities in India, and if tradition is correct, when they had gained a notable success in the extension of their faith by converting the king of the land, He was born and brought up at a place where many ships from Arabia and the Persian Gulf touched, If his extreme monoism, his stripping of the one of all semblances of duality, his attempt to establish his monosim of the authority of revealed scriptures, his desire to purge the Cult of many abuses, had even a faint echo of the new noises, that were abroad. it would not be a matter of great surprise or utter incredulity ....His successors Ramanuja, Visnuswami, Madhava and Nimbarka and the hymn-makers in their speculation and religious

১. *বাঙলার নবজাগৃতি, পৃঃ ১২১-২৪*

tone, show closer parallelism. In the give and take of Culture between Muslims and Indians it is difficult to assess accurately the share of the each....... But the fact remains that a number of elements were absorbed into Hinduism through its direct contact with Islam and these elements where presented to India impressed with the Islamic mould".[১]

...Ramanuja's parpatti and Guru-Bhakti—'It is more likely however, that they came from Islam. Both were very prominent features of that religion (Islam). The word Islam means surrender and the Muslim is verily a prapanna .....Historically also there is on insuperable difficulty in supposing that Ramanuja adopted it from Islam"[২]...... This sufi conception of diefied teacher was incorporated in medieval Hinduism."[৩]

গ. লিঙ্গায়েতবাদ সম্বন্ধে তারাচাঁদ বলেন ঃ

It is difficult to resist the infernce that lingayatism was a result of the influence which these Muslims exerted in these parts of India. No other hypothesis appears sufficient to explain the revolutionary character of its doctrines and customs. The abandonment of such a deeprooted Hindu idea as that of metempsychosis and of such customs as cremation and purificatory death ceremonial, the abolition of inequalities of caste and sex and the reform of marriage, the Conceptions of the Community of brave warriors led by their sanctified preceptor, and of god (allama) whose very name is probably of Muslim origin, point unmistakably to the source of inspiration that is Islam." pp 119-20 or ১.

The reform movement of Ramananda, Chaitanya Kabir, Nanak show the stimulus of Islam. [The Hindu View of Life by Dr. Sarbapalli Radhakrishna p. 18]

ঘ. ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ও বলেন ঃ

As a living people the Hindus have always imbibed new objects and ideas from other peoples, Our contact with the Muslims, that is to say, the Turks and the Persians [who, over and above their won national mental make-up and ways of life, had imbibed certain ideologies from the Arabs in the shape of Islam] has not been without any effect upon us, say from 1000 A.D. onwards. We have taken over from the Persians and the Turks hundreds of new things in the material domain, and profited considerably by them. In the domain of thought and ideas also we have been profoundly affected. From the fourteenth century onwards North-Indian Hindu music has been largely a mixture of ancient Hindu music with elements contributed by the music of Arabia, music of Persia and of Central Asia. In the sphere of religion, too, there has been a very strong influence of Islam : the muslim insistence upon a Saguna-Brahma, without any form (Nirakara), forms the fundamental Muslim conception of the

---

১ *Influence of Islam on Indian Culture, pp. 111-12*

২ *Influence of Islam on Indian. Culture pp 114*

৩ *Do pp. 110.*

Divinity, and this kind of conception we find in all the Sant-Margisaints and poets including Kabir and Nanak. Certain ideologies and practices from the Sufi form of Islam also have become accepted into the mediaeval Vaishnav schools of India, including our Gaudiya (Bengali) Vaishnavism. So in this way Hindu civilisation have been moving on, taking whatever it could absorb from the thought of the world of Islam. Consequently I cannot think of excluding Islam from a consideration of our dyamic Hindu or Indian thought in its history during the last 800 years. The scriptural theology of orthology of orthodox Quranic Islam is a different matter, and I do not know to what extent that has been extended and developed by Indian Muslims. But Suffism in India certainly has had its own history and that I look upon it as an integral part of our Indian cultural development. Bengali and other Indian Muslims I cannot consider to be foreigners at all, because they are the blood and flesh of our flesh although they might express their formal adherence to a creed which developed outside India; but that I consider perfectly immaterial."[১]

"Through Sufism the character of Indian civilisation—Hindu civilisation, was very deeply modified, particularly in North India. In my article published long ago, 'Islamic Mysticism, Iran and India,' I mentioned that even in our Gaudiya Vaisnavism certain Sufi influences actually strengthened it. "[২]

ঙ. এ প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন—"আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইসলামের একেশ্বরবাদের সহিত কমবেশী পরিচিত হইতেছিল। ....একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল বাহির হইতেও আসিয়াছিল, উভয়ে মিলিয়া দশম-একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়। ঋণ স্বীকার করা ভাল।[৩] যেমন করিয়াই হউক শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে বেদান্ত দর্শনের সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।[৪] তাহাদের [মুসলমানদের] একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেশ্বরবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।"[৫] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেন 'সুফীমত হইতে মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও সন্তবিচার কিছু জিনিস আত্মসাৎ করিয়াছে।.......গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গঠনে, বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সূফী প্রভাব আছে।[৬]

বিদেশী বিধর্মী পদানত উত্তর ভারতের লোকের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল, তাই এদের উপর মুসলিম মানসসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল মন্থর গতিতে। মুক্ত দ্রাবিড় অঞ্চলে এই প্রভাব দ্রুত ও সর্বগ্রাসী হয়। আর প্রাচীন আলোয়ার সম্প্রদায়ের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রেমগান ভক্তিবাদ প্রসারে পরোক্ষ সহায়তা দিয়েছে। তবু দ্রাবিড় দার্শনিকদের তত্ত্বে লক্ষ্মী বা শ্রীর স্থান নগণ্য।

---

১. *সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র—সুনীতিকুমার স্মারক সংখ্যা, পরিচয়, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ পৃঃ ৫৭-৫৮।*

২. *ঐ ঐ পৃঃ ৬৪।*

৩. *ভারতদর্শনসার— পৃঃ ৬৪-৬৭।*

৪. *ঐ পৃঃ ২৬৭।*

৫. *ঐ পৃঃ ২৯২।*

৬. *প্রাগুক্ত— সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র, তারিখ ১১/৭/৫ এবং ১/৫/৫২।*

শাসকদের প্রতি বিরূপতা যখন মন্দা হয়ে এল, তখন উত্তর ভারতেও ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করল। তাও এল দক্ষিণ ভারত থেকে; নইলে রাম-সীতাই রাধা-কৃষ্ণের স্থান গ্রহণ করতেন।

'ভক্তি দ্রাবিড় উপজি লায়ে রামানন্দ।
প্রকট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড।'

এই উক্তিই আমাদের সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য। রামানন্দ, কবীর, দাদু প্রভৃতি উত্তর ভারতে ভক্তিবাদ প্রচাবক। এই অবধি বৈষ্ণবমতে রাধা-কৃষ্ণলীলা এবং প্রেম অনুপস্থিত। ভক্তির সঙ্গে কৃপা ও করুণাই যুক্ত থাকে—প্রেম নয়। ভক্তিরই উপজাত [by product] হচ্ছে প্রেম—এ কারো মতে ভক্তির পরিণতি আর কারো কাছে ভক্তির বিকৃতি।

৩. ভক্তিতত্ত্বের শাস্ত্রীয় উৎস

দেবী, শ্রী, রাত্রি প্রভৃতি সূক্ত ছাড়াও ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ প্রভৃতির উক্তি ভিত্তি করে বরুণ, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতির সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক, শতপথ-ব্রাহ্মণ, কঠ, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি এবং পঞ্চরাত্র, শৈবসংহিতা, নারদের 'ভক্তিসূত্র' শাণ্ডিল্যের শাণ্ডিল্যসূত্র' প্রভৃতির আলোকে ভক্তিমতের আভিজাত্যে ও প্রাচীনতার আস্থা দৃঢ় করবার প্রয়াস থাকলেও কার্যত মতবাদ হিসেবে নয়-দশ শতকের পূর্বে এর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তেমনি মুসলমান বিজয়ের পূর্বে 'ভক্তি' প্রেমবাদে পরিণত হয়নি। আর ষোল শতকে চৈতন্যের মত প্রচারের আগে রাধা-কৃষ্ণলীলা জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার রূপ ধরেনি। তখনো পুরুষ ও প্রকৃতি তথা মৈথুন তত্ত্বের রূপক হিসেবেই রাধা-কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত ও আস্বাদিত হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে আলোয়ার সম্প্রদায়ের গানে ও গাথায়। এদের কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা নয়—নাপ্পিন্নাই। আমরা দেখেছি শক্তি ও শক্তিমান রূপে এক 'আদিম যুগলে' বিশ্বাস অনার্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই যুগলতত্ত্বই নানা বিবর্তনের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণলীলার রূপ নিয়েছে।

বিষ্ণু-শ্রীতে মৈথুনতত্ত্ব আরোপিত হলেও এপর্যন্ত আমরা রসলীলা বা রাসলীলা দেখিনি। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—"বিশেষ কোন দার্শনিক তত্ত্বমতের অবলম্বনে রাধাবাদের উৎপত্তি হয় নাই; রাধাবাদ মুখ্যত পুরাণমূলকও নহে।"[১]

ক. কেউ কেউ বলেন—'রাধা-কৃষ্ণ' উপাখ্যান আসলে আকাশের সূর্য ও নক্ষত্রের মনোময় রূপক কাহিনী। বিষ্ণু সূর্যের এবং রাধা তারার নাম। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন—"রাধা নাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদে বিশাখা, অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা, অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথর্ববেদে 'রাধো বিশাখে' স্পষ্ট উক্তি আছে।......রাধা অর্থে সিদ্ধি। ....কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্র হইয়া গিয়াছে। মহাভারতের কর্ণের ধাত্রীর নাম রাধা। ....গো-রশ্মি, গোপ-কৃষ্ণ, গোপী-তারা। কবি কৃষ্ণ-রাধাকে রাসমধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন।"[২] এই ব্যাখ্যা তথ্যভিত্তিক বলে মনে হয়। কেননা আদি কৃষ্ণলীলায় সোমাভা, অনুরাধা, চিত্রা, কৃত্তিকা, ভদ্রা, রোহিণী, রেবতী, বৃষভানু, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রাশি ও নক্ষত্র সূচক নাম পাচ্ছি। মনে হয় এই রূপকেই পরে মানবীয় ভাব আরোপিত হয়ে পল্লবিত বৃন্দাবনলীলায় পরিণত হয়েছে। রূপ-গোস্বামীর 'ললিতমাধব' নাটকে তারা, আকাশ ও পৌর্ণমাসীর রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

খ. ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা এবং প্রধানা গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতার কথা আছে। এই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট সূত্র ধরে বৈষ্ণবেরা প্রধান গোপীকেই 'রাধা' বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা' মেনে নেয়া যায় না। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে রাধার নাম নেই। মৎস্য, বায়ু, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে ক্বচিৎ রাধার নাম উল্লেখিত আছে। পুরাণেই প্রথম রাধার উল্লেখ পাই। কিন্তু

---

১. *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ: ৯৫।*

২. *ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪০ সন—যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির প্রবন্ধ।*

৩ *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ; পৃ: ৯৬-০৭।*

এখানেও রাধা কৃষ্ণের বিশিষ্টা লীলাসঙ্গিনী নন। তবে রাধিকা কৃষ্ণেরই প্রকৃতি, শক্তি ও বল্লভা রূপে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বর্ণিত হয়েছেন এবং এখানে সখীপরিবৃত রাধাকৃষ্ণকে একাসনে আসীন দেখা যায় । এক্ষেত্রে রাধা লক্ষ্মীর অবতার ও বিষ্ণুর শক্তি। অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রের পূর্ণ আভাস এখানেই সূচিত হয়েছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত পদ্মপুরাণ ও পঞ্চরাত্রের রাধাকাহিনীর প্রামাণিকতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এই সব অংশ পরবর্তী যোজনা হওয়া সম্ভব।[১] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাবাদের বৈষ্ণবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এজন্যে পণ্ডিতেরা এর প্রাচীনতায় সন্দিহান। মোটামুটি বলা যায়, নবম শতকের দিকে রাধা নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। আর কৃষ্ণের রাসলীলার উদ্ভবও বিষ্ণুপুরাণের কালে অথবা কিছু পরে। এর মূল ছিল আভীর জাতির 'রাখালিয়া গানে'। এবং দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার কল্পিত কৃষ্ণলীলা ভিত্তি করেই ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলার প্রকাশ। আলোয়ারদের কৃষ্ণসঙ্গিনী রাধা নন—নাপ্পিন্নাই। আর সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি সাতবাহনরাজ হালের 'গাহা সত্তসঈ' নামের পদসংগ্রহের একটি পদে। হালকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের লোক মনে করা হয়। কিন্তু এ গ্রন্থের কতগুলো পদ তত প্রাচীন নয় বলেই কোন কোন বিদ্বানের মত। অতএব রাধাবিষয়ক পদটিও অর্বাচীন অর্থাৎ নবম শতকের দিকের হওয়া বিচিত্র নয়। আনুমানিক সাত-আট শতকের কবি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের নান্দী শ্লোকে এবং আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে। ইনিও নয় শতকে বর্তমান ছিলেন বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। তারপর কুন্তকের [১০-১১শতক] "বক্রোক্তি-জীবিতে' ত্রিবিক্রমের [১০ শতক] 'নলচম্পুতে' বল্লভদেবের [১০ শতক] 'মাঘের শিশুপাল বধের টীকা'য় সোমদেব সূরির [১০ শতক] 'যশস্তিলকে' এবং তারপর 'সুভাষিতরত্নকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থে রাধা ও রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ আছে। এর পরে বারো শতকের জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ই রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

অনার্যপ্রভাবে বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন অনুসরণই আমাদের লক্ষ্য। এই অনার্যপ্রভাব এত বেশি এবং সুদূরপ্রসারী যে, তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব। এখানে আমাদের আলোচনার ফলশ্রুতি দেয়া হল ঃ আর্যগণ শুধু ঋগ্বেদ সম্বল করে ভারতে এসেছিলেন, এবং সংখ্যায়ও খুব বেশি এসেছিলেন বলে মনে করবার কোন কারণ নেই, সুতরাং বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের যে ক্রমপরিণতি ও প্রসার ঘটেছে তাতে অনার্য অবদান তুচ্ছ নয়। অথর্ববেদ ও সামবেদের কোন কোন সূক্ত এদেশেই রচিত হয়। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকও রচিত হয় এখানে। আরণ্যক বিধিতে যে ভাববাদী দ্রাবিড় প্রভাব পড়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা ক্রিয়াসর্বস্ব বৈদিকধর্মের সহসা কল্পনাশ্রয়ী হবার অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য ঃ ১. বৈদিক সাধন-ভজন যজ্ঞের মারফতেই চলত ২. কোন বিশেষ দেবতার প্রতি আনুগত্য বা ভক্তি প্রদর্শন অপরিহার্য নয়, কারণ দেবতারা যজ্ঞমারফৎ ভোগ পেলেই মূল্যস্বরূপ অভীষ্ট বরদানে বাধ্য। ৩. ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ তখনো প্রচলিত হয়নি। শুধু কর্মমার্গই ছিল। ৪. সৃষ্টি বা স্রষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা তখনো প্রবল হয়নি। ৫. তখনো পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায়নি। এর পরের স্তরের বৈদিক আর্যধর্মের মিশ্র বিকাশ হয় সাংখ্য ও যোগ দর্শনে। পরবর্তী যোগশাস্ত্র জটিল ও বিভিন্নমুখী হয়েছে। কপিল সাংখ্যসূত্র বোধ হয় খ্রিস্টীয়পূর্ব ৩য়-৪র্থ শতকে রচিত হয় আর খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে পতঞ্জলি যোগসূত্র রচনা করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের চরক ও আড়াঢ় ঋষি সাংখ্যমত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক সাংখ্যমতের ভিত্তি হচ্ছে খ্রিস্টীয় ৩য় শতকে রচিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। সুতরাং সাংখ্য ও যোগ যে বৌদ্ধ-জৈন প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্বভিত্তিক। যোগ ঈশ্বরবাদী, সাংখ্য নিরীশ্বর।

---

১. *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ১০৩-০৭।*

বেদান্তদর্শনের শঙ্কর বা ভাস্কর সিন্ধুদেশে আরববিজয়ের পরে আবির্ভূত হন। জ্ঞানমার্গ শঙ্করেরই সৃষ্টি। প্রজ্ঞা দ্বারাই মুক্তি বা মোক্ষ লাভ ঘটে। "তজ্জন্য কোন প্রকার যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম; গ্রহণ প্রভৃতিতে স্নান ; দান প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক কর্ম ; কিংবা নানা পূজা-অর্চনাদি কার্যকর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা বেদবিধি নিষেধাদি মানিয়া চলিবেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নন।"[১] শঙ্করের মায়াবাদ ভাববাদী বৈরাগ্যপ্রবণ দ্রাবিড় মানসপ্রসূত। আনুষ্ঠানিক ধর্মের অস্বীকৃতি বৈদিক প্রভাবমুক্তির পরিচায়ক। জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক সত্য মাত্র—পূর্ণজ্ঞানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে এর বিলুপ্তি। এই মায়াবাদ বৈরাগ্যবাদের জন্ম দেয়। শঙ্করের মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলে—তাঁর মতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই, সব মিথ্যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার দরুন জীবন বা জগৎ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। কাজেই ব্রহ্ম ছাড়া আর সব মিথ্যে—'একম এবং অদ্বিতীয়ম'। শঙ্কর জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভের সাধনা ছাড়া অন্য আরাধনা স্বীকার করেন নি। শঙ্করের এই অদ্বৈতবাদ বা জ্ঞানমার্গের প্রবর্তনে ইসলামের প্রভাব আছে।

তারপর তুর্কী-আফগান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার আগেও ইরানি সূফীতত্ত্বের প্রভাবে ভারতে 'ভক্তিবাদে'র উদ্ভব হয়। ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতাবাদ ইসলামের প্রভাবেই উদ্ভূত হয়। এই ভক্তিবাদের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বৈরাগ্যবাদই জয়ী হল। মূলত শঙ্করের মায়াবাদে ব্যবহারিক জীবনের অর্থাৎ পার্থিব জীবনের যে অসারত্ব ঘোষিত হয়েছে, তাই ভক্তিবাদের আবরণে স্বীকৃত হল। জগৎ সত্য হলেও নিত্য নয়, সুখময় নয়। কাজেই যা নিত্য, যা চরম, যা পরম, যা হলে নিশ্চিত হওয়া চলে, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া সম্ভব হয়—তাকে পাওয়ার সাধনাই জীবনের চরম ও পরম হওয়া উচিত। কাজেই অনিত্য সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাবানের লক্ষণ।

গীতায় কর্মের কথা আছে, শঙ্করে জ্ঞানের কথা রয়েছে। এই কর্মবাদের সঙ্গে আর্যদের মানসসম্পর্ক গভীরতর, জ্ঞানমার্গের সঙ্গেও যোগ সুদৃঢ়। তাই বর্ণ-হিন্দুগণ গীতা ও অদ্বৈতবাদ সহজে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিবাদের প্রসার অনার্যদের মধ্যেই বেশি। প্রজ্ঞালব্ধ মুক্তিও সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কর্মলব্ধ মুক্তিও কি সহজ? তাই ভক্তিবাদ আভিজাত্যহীন জনসমাজে সাদরে গৃহীত হল। বৈরাগ্য-সম্পৃক্ত এই ভক্তিবাদ। নবম শতক থেকেই রাধাবাদের তথা রাধা-কৃষ্ণলীলার উদ্ভব। রাসও 'কৃষ্ণ-নাপ্পিন্নাই' লীলার প্রভাবেই পরিকল্পিত। আর চৈতন্য সমকালে ভক্তিবাদ প্রেমবাদে পরিণত হয়।

এদিকে যোগের ও সাংখ্যের প্রভাবে তান্ত্রিক ও যোগ সাধনার বহুল প্রচলন হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ আর জনসাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর ফলে বৌদ্ধ বজ্রযানে নাথ-সহজিয়া মতের উদ্ভব হয়। তার জের রয়েছে বাউল মতে ও বৈষ্ণব সহজিয়ায়। "এই তন্ত্রসাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজ রূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে"[২] এবং "সহজিয়া ধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সূফীবাদের সামঞ্জস্যবিধান হইয়া বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।"[৩]

৪. বাঙলার ভক্তিবাদের ভিত্তি

এবার বাঙলার কথায় আসা যাক। বাংলাদেশে ভক্তিধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—"মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর

---

১. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ১৭।

২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬২, পৃঃ ১৯৪

৩. উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণ ঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃঃ ৬।

রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। এবং উত্তরাপথে বাসুদেব কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন ভক্তিপরায়ণ ভাগবত মত উদ্ভূত হয়েছিল, বাংলাদেশেও তেমনি লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্‌গত হয়েছিল। – –বাংলাদেশে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই কাহিনীকে অবলম্বন করে অত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয়নি, যত হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে। বৌদ্ধমতের ভক্তিভাবের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের কথাশ্রিত ভক্তিভাবের একটু তফাৎ আছে। বৈষ্ণবমতে ভক্তি জ্ঞানশূন্য এবং লীলাস্মরণ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু বৌদ্ধমতে ভক্তি জ্ঞানেরই অঙ্গ।"[১] এখানে নাথ ও সহজপন্থ স্মরণীয়। সদগুরু থেকে 'জ্ঞান' (মহাজ্ঞান) না পেলে সাধনার সিদ্ধি নেই। বৌদ্ধভক্তিবাদ চৈতন্য ও তাঁর আগের যুগে জয়দেব মিশ্র, চণ্ডীদাস, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে [প্রত্যক্ষ প্রভাব এসেছিল সূফীমত এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে]।

সুতরাং বাঙলায় বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল, নাথপন্থ ও বৌদ্ধ সহজিয়া প্রভৃতি মত অনার্য মনোভঙ্গিরই প্রকাশ। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, "বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল-সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে তেমনি পূর্বযুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা আরও পর থেকে বাংলাদেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্মমত চলিত ছিল—শৈবনাথ মত এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মত [নাথপন্থ ও চর্যাপদের সহজিয়া] এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ সন্ন্যাসীরা নিজেদের 'যোগী' বা 'কাপালিক' বলত, এরা কানে নরাস্থি কুণ্ডল, নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার-বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাইরে ছিল এদের কুঁড়েঘর। যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত 'নাথ', বর্তমান সময়ে যুগীজাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। শৈব ও বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতন্ত্রের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাপদে।–চর্যাপদগুলো বাংলা পদাবলীর রূপ।"[২]

৫. ভক্তিবাদ ও ইসলাম ঃ মতসমন্বয়

তুর্কী-আফগানদের ভারত অধিকার ভারতবর্ষের সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে শক-হুনদল এসেছিল ; ভারতবাসীরা অনায়াসে তাদের গ্রহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু বহিরাগত তুর্কী-আফগান মুসলিমকে এদেশীয় সমাজ আত্মস্থ করতে পারেনি। তার কারণ, মুসলমানেরা শুধু বিশেষ আকৃতি, প্রকৃতি ও বাহুবল সম্বল করে আসেনি, এসেছিল যুক্তিনির্ভর এবং প্রত্যয়দৃঢ় ধর্ম, সমাজ, আচার আর রাষ্ট্রাদর্শ নিয়ে, যার সামাজিক ও পারমার্থিক প্রভাব ছিল অসাধারণ। এত অসাধারণ যে, তা' আজকের দিনের সাম্য ও সমাজবাদের চেয়েও সর্বগ্রাসী এবং আণবিক বোমার চেয়েও বিস্ময়কর। ফলে, মুসলমানদের এক দেহে লীন করা কোন মতেই সম্ভব হয়নি। কিন্তু আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যধর্মও পর্যুদস্ত হবার নয়। এর অন্তর্নিহিত শক্তিও এই নব শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্য ছিল। ফলত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম না হল ইসলামে বিলীন, আর না পারল মুসলমানদের বিলীন করতে। বিজেতা ও বিজিতের তথা শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার এ স্নায়বিক দ্বন্দ্ব বড় তীব্র হয়ে দেখা দিল। কেউ কাউকে না পারে গ্রহণ করতে, না পারে গ্রহণ করাতে। অবস্থাটা যেন, 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। উভয় পক্ষই বুঝল এ অবস্থা অসহ্য। এর আশু সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এসব অভিজাত হিন্দুর কথা।

এদিকে বর্ণাশ্রম কন্টকিত অনুদার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে নিপীড়িত শূদ্রগণ ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের চুম্বকার্ষণে এতই বিচলিত হয়েছিল যে, স্বধর্মে সুস্থির থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। আগ্রহ প্রবল হলেও মন যা চায়, তা পাওয়া অধিকাংশের পক্ষে সহজ ছিল না। নবধর্ম গ্রহণে বাধা ছিল ত্রিবিধ ঃ প্রথমত, প্রাচীন সংস্কারের মোহ ও ভয়, দ্বিতীয়ত,

---

১. *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।*

২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী পৃঃ ৪২।

হিন্দু-সমাজপতির কোপ-দৃষ্টি, তৃতীয়ত, ইসলাম সম্বন্ধে অনিশ্চিত জ্ঞান। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অধিকারবঞ্চিত নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ইসলামের উদার সমাজ-ব্যবস্থা ও সাম্য দর্শনেই প্রলুব্ধ হয়েছিল এবং আজন্ম পোষিত মায়াবাদের সঙ্গে বহু-শ্রুত সূফীতত্ত্বের অপূর্ব সামঞ্জস্য দর্শনে কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছিল। এভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের বাঁধন আলগা হয়ে গেল, তারা পথে নামলো, কিন্তু ইসলামের আশ্রয় নিতে পূর্বোক্ত কারণে ছিল প্রচুর শঙ্কা। দাদুর ভাষায়–'হিংদু তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাজ'। কাজেই 'নির্ভে নির্পথ হোই।' তাই ঘরে থাকাও নয়, গন্তব্যে যাওয়াও নয়, পথ চলে পথের দিশা পাওয়ার প্রয়াস দেখা দিল। হিন্দুর মায়াবাদ ও মুসলমানের সূফীতত্ত্বের সমন্বয়ে নবদর্শন আবিষ্কৃত হল, অর্থাৎ নতুন ধর্ম সৃষ্টি হল। সক্রেটিসের 'knoweth thyself', উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি' ইসলামের 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।' বা উপনিষদের 'তং বেদ্যং পুরুষৎ বেদ মা বো মৃত্যু পরি ব্যথাঃ। এই হল নবধর্মের মূল দর্শন বা মন্ত্র। ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য যখন 'মনের মানুষকে পাওয়া, তখন হিন্দুয়ানির মুসলমানির বেড়াজালে আটকে পড়ার দরকার কি ? শঙ্করাচার্যের দর্শন তখনো আলোচিত তত্ত্ব এবং পারস্য-সাহিত্যের মারফত হাফেয-জামী-রুমী-আত্তার-খৈয়ামের বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত সত্য। কাজেই এ আন্দোলনের ইন্ধন ছিল হাতের কাছেই।

এরূপে ভারতের দিকে দিকে ধর্মসমন্বয়ের ও ঐক্যের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক, কবির, চৈতন্যদেব, রামদাস, বল্লভাচার্য প্রমুখ সাধক-প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটলো। শাস্ত্রের অধিকার লাভের, সামাজিক সত্তায় মর্যাদা আরোপের ও জীবনে নিরাপত্তাবোধের অবচেতন প্রেরণা থেকেই হয়তো এসব ধর্মান্দোলন শুরু হয়। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দণ্ডধর মুসলিমশক্তিকে বাধা দেবার বা বিতাড়িত করার সচেতন প্রয়াস হিসেবে প্রকট হয়ে ওঠে। শিখ বা বৈষ্ণব আন্দোলনে যে এ-উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে বাদশাহ্ আকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্তও সমন্বয়সাধন অব্যাহত ছিল। এপথে গান্ধীর 'রামধূন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। সূফী কবির দিওয়ান, গজল ও রুবাই প্রভৃতির অনুকরণে অধ্যাত্ম সংগীত রচিত হয়েছে। চর্যাগীতির ও দোঁহার কাল থেকেই গণভাষায় রচিত পদ ও দোহা ধর্মমত ও তত্ত্ব প্রচারের বাহন রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এদের উদ্দেশ্য ও সাধনা সার্থক হয়েছিল। ইসলাম সত্য সত্যই বড় বাধা পেল। এর গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলাম আর বিশেষ প্রচার বা প্রসার লাভ করল না। এর আগে মদিনা থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি ইসলামে দীক্ষা অপ্রতিহত ছিল। শুধু তাই নয়, কিছু মুসলমান তাঁদের মতে দীক্ষাও নিল বিশেষত শিখ ও বৈষ্ণব ধর্মে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের আওতায়ও তারা রইল না। এগুলো হিন্দু-মুসলিম ধর্মদর্শনের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। কিন্তু প্রচারকগণ নামে হিন্দু হওয়ায় ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি নামসার হিন্দুয়ানির রেশ থাকাতে এরা জাতি অর্থে হিন্দুই রয়ে গেল। তাতে উত্তরকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা হয়। সুতরাং এরা নামগত জাতিতে হিন্দু ও ধর্মগত জাতিতে আলাদা। যেমন—রাজা রামমোহন রায়ের নামমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাখানুসারী বলে মনে করে। ফলত, এরা জাতিতে হিন্দুই বয়ে গেল। বস্তুত রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মও সচেতনভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রসার বোধ কল্পে প্রবর্তিত হয়েছিল আর উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছিল।[১]

---

১. "এই সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হইয়া সংশয়বাদী চিত্তের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল এবং যাঁহারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের শরণ লইয়াছিলেন। এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম সমাজের ভাঙ্গনকে রোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। .....ব্রাহ্মধর্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু সমাজের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিত। বস্তুত হিন্দু ধর্মাদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই এই রূপ সংখ্যাই ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল।"–উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নব জাগরণ : সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ. ২৩৭-৩৮।

উক্ত ভাবসাধকদের মধ্যে জোলা শ্রেণীর কবীর এবং ধূনকর সম্প্রদায়ের দাদূ ও রজ্জব মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হয়েও তাঁরা ধর্মান্দোলন করেছিলেন—তার কারণ তাঁরা নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত হিন্দুসমাজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূফীদের হাতে। শরিয়তী ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব, পূর্ব সংস্কারগত মায়াবাদের প্রভাব এবং সূফীতত্ত্বের উদার আবহাওয়া তাঁদেরকে ভাবরসে বা প্রেমসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যেও যে আত্মার স্বরূপ এক ও অবিকৃত এই সমন্বয়পন্থীগণ তা-ই প্রচার করেছেন। এসব ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদপ্রথা ও শাস্ত্রে অনধিকার রহিতকরণ আর মনুষ্য-সত্তায় মর্যাদা দান। তা' পুরোপুরি সফল হল। তাই ইসলাম আর প্রসার লাভ করেনি। তবে তার প্রভাবই সমাজ সংস্কারে প্রয়োজনীয় ফল দান করল। যেমন—য়ুরোপে ইসলামের অনুকরণে প্রোটেস্ট্যান্ট মত প্রচারই নবযুগ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ভাগবতে ভক্তিবাদের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তা মুসলিম বিজয়ের পূর্বে প্রসার লাভ করেনি। 'গীতগোবিন্দে' আধ্যাত্মিকতা নেই। বিদ্যাপতিতেও নেই। গীতগোবিন্দ-বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণধামালী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শিব-শিবানীর ছড়া বা গাথা প্রভৃতি আদি রসাত্মক রচনা সামাজিক জীবনের বিকৃতির এবং রাজনৈতিক নিবীর্যতার যুগে নৈতিকতা-শিথিল গণ-মনের রসপিপাসা মিটাবার জন্যেই রচিত হয়েছিল।

বিপরীতধর্মী দুই সংস্কৃতির মোকাবিলায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুর সমাজ মনে, তার ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনদর্শনে যে সাড়া জাগল, তারই ফলে বাঙলায় বৈষ্ণব-বাউল মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি। অবশ্য দাক্ষিণ ভারতেই এর প্রথম বিকাশ। এখানে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ তাতে দ্রাবিড়সুলভ ভাবাবেগের প্রাচুর্য ছিল। আর ছিল তীব্র প্রাণময়তা। দ্রাবিড় রক্তের উত্তরাধিকারী বাঙলায়ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ একই রূপ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। এমনিতেই বাঙালী চিরকাল ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। সামান্য কারণেই উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত, উন্মত্ত বা অভিভূত হয়ে পড়ে। এজন্যেই এরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করে, তখন তা গীতিকবিতা হয়ে ওঠে, সামাজিক আন্দোলনে সাময়িক ঝড় তোলে, রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর ক্ষণবিপ্লব ঘটায়। এজন্যেই এরা তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়ানুভূতি গোচর না হলে আচরণ করে না।

৬. ভক্তিবাদ ঃ সাধনসঙ্গীত ও ইসলাম

ভাবপ্রবণ আস্তিক মানুষের মনে মাঝে মাঝে পরমের বিরহবোধ জাগে। তখন তার পক্ষে 'হরি বিনে দিন ও রাতিয়া' যাপন অসহ্য হয়ে ওঠে, সে অভিসারে যাত্রার উপায়ও খুঁজে পায় না, কারণ 'হরি রহে (অনতিক্রম্য] মানস সুরধুনী পার।' তাই চিরকাল আস্তিক মানুষের ঘটে ঘটে বিচ্ছেদকাতর রাধা আজো কাঁদছে। এ কান্না ও বিলাপ কেবল গানেই ধ্বনিত করা সম্ভব। তাই মরমীদের সাধনভজন গানেই চলে। জালালউদ্দীন রুমীর, খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির, নিজামউদ্দীন আউলিয়ার নাচগানবাজনার মাধ্যমে সাধনাপদ্ধতি স্মর্তব্য।

বাঙালী মুসলমানেরাও যে সঙ্গীতকে অপার্থিব উৎকণ্ঠার তথা আধ্যাত্মজিজ্ঞাসার নিবৃত্তির ও সাধনার বাহন করেছিল, তা' চিশতিয়া, কাদিরিয়া, কলন্দরিয়া প্রভাবের প্রমাণ ছাড়াও, আঠারো শতকের কবি আলি রজার জবানীতে পাচ্ছি :

আলি হস্তে সে সকল সন্ন্যাসী ফকিরে
শিখিল সকল যন্ত্র রহিল সংসারে।
ভাবের বিরহ সব শান্ত হৈতে মন
রাগতাল কৈল প্রভু সংসারে সৃজন।
সর্বদুঃখ দূর হয় গীতযন্ত্র রাএ
গীতযন্ত্র শুনি মহামুনি ভ্রম যাএ।
গীতযন্ত্র মহামন্ত্র বৈরাগীর কাম

রাগযন্ত্র মহামন্ত্র প্রভুর নিজ নাম।
জীববন্ত যত আছে ভুবন ভিতর
সর্বঘটে যন্ত্রে বাজে গীতের সুস্বর।
ঘটে গুপ্ত যন্ত্র গীত যোগিগণে বুঝে
তে কারণে সর্বজীবে সে সবারে পূজে।
গীতযন্ত্র সুস্বর বাজায় যে সকলে
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তার মেলে।
শুদ্ধভাবে ডুবি নৃত্য করে যেই জনে
গীতরসে মজি প্রভু থাকে তার সনে।

অপর একজন কবিও বলেন ঃ

কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার
রাগযন্ত্র নাদ সব ঘটে আপনার।
অষ্টাঙ্গ তন মধ্যে আছএ যে মিলি
তনান্তরে মন-বেশী করে নানা কেলি।
মোকামে মোকামে তার আছএ যে স্থিতি
ছয় ঋতু তার সঙ্গে চলে প্রতিনিতি।.........
রাগঋত অন্ত যদি পারে চিনিবার
জীবন মরণ ভেদ পারে কহিবার।
কিবা রঙ্গ কিবা রাগ কিবা তার রূপ
ধ্যানেত বসিয়া দেখ ঘটে সর্বরূপ।

বাঙালী মুসলিম সমাজে সংগীতচর্চা যে সূফীপ্রভাবেরই ফল, আমাদের সে অনুমান উক্ত চরণ কয়টির দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হল। আগেই বলেছি, বাঙালী মুসলিম মরমীরা যে সাধনপন্থ গ্রহণ করেছেন, তা মূলত ইসলামী নয়। ভারতিক সূফী মতবাদও একান্তভাবে আরব-ইরানি নয়। এর অবয়বে যেমন ভারতিক প্রভাব পড়েছে, বাঙালী মরমীদের দর্শনে, ধর্মে ও আচারেও তেমনি প্রচুর দেশজ তথা ভারতিক উপাদান রয়েছে। কাজেই এদেশে হিন্দু-মুসলমান চিরকাল হাতে হাত মিলিয়ে ও মনে মন মিশিয়ে অধ্যাত্মসাধনা করেছে। এভাবেই বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় মরমীদের উপমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

বলেছি, মুসলিম অধিকারের পূর্বে ও পরে ভারতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন—বাহ্যানুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অথচ সাধারণেব পক্ষে ধর্ম আচাবিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে ধর্মাচরণ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে মুসলমানেরা তাদের চার পাশেই অবলম্বন খুঁজেছে। এভাবেই তাদের তত্ত্বদর্শনে পীরপূজা ও দেহচর্যা মুখ্য হয়ে উঠেছে, তাদের তত্ত্বপ্রকাশের মাধ্যম হয়েছে ভারতিক রূপকল্প। আরাধ্যের প্রতীক হলেন রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণ, এমনকি কালীও।[১]

অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর। উক্ত সব ধর্ম, দর্শন ও সংস্কার তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাতে আবার শরীয়তের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক রাখাও সম্ভব হয়নি অশিক্ষা ও সূফীমতের প্রাবল্যের দরুন। কাজেই সূফীতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই মুসলমানেরা অংশ গ্রহণ করেছে। এভাবে বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়ার তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ততন্ত্র, যোগ, ইউনানী দর্শন প্রভৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছে। এবং এরূপে তারা মিশ্র-দর্শন খাড়া করেছে। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতির প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যত ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের

---

১. *মুসলিম কবির পদসাহিত্য ঃ অলি রজা হোসেন আলি, ক্রমিক সংখ্যা ৩৭২, ৩৯৩, পৃ, ১৯১।*

বাঙালী, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ....বাংলাদেশে ইসলামের সূফীমত বেশি প্রসার লাভ করে। সূফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"[১] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও বলেন, "আধ্যাত্মিক বা মারফতী সাহিত্যে ইরানের সূফী প্রভাবও রয়েছে এবং বাউল-মুর্শিদা সাহিত্য ছাড়াও নিছক দার্শনিকতত্ত্ব এখানে কম মেলে না। এসব বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের কারণ বোধ হয় এই যে মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে ও মননে এমন একটি স্তর আছে যেখানে সব ভেদাভেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাধকগণ অতিমাত্রায় আচারবর্জিত ও মর্মনিষ্ঠ। তাই এমন নির্বিচার সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। হরগৌরী সম্বাদ, জ্ঞান-প্রদীপ, যোগ-কলন্দর, আগম-জ্ঞানসাগর, আবদুল্লাহর সওয়াল, মুসার সওয়াল, মল্লিকার সওয়াল, ইউনান দেশের পুঁথি, গোরক্ষবিজয়, সিরাজ সবিল, নূরজামাল প্রভৃতি গ্রন্থ এ শ্রেণীর।"[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঙালী মুসলমান মরমীরা যে, সাধনপন্থ আবিষ্কার করেছে তা একান্তভাবে ইসলামী নয়। বস্তুত ভারতিক সূফীমতবাদেও ভারতিক দর্শনের যেমন প্রচুর প্রভাব পড়েছে, তেমনি বাঙালী মরমীয়াদের দর্শনে ও ধর্মে প্রচুর দেশজ তথা ভারতিক উপাদান রয়েছে। অবশ্য নিরক্ষর জনগণের ধর্ম ও দর্শন বলে এগুলো আশানুরূপ পুষ্ট হয়নি। একথাও অনস্বীকার্য যে, বৈষ্ণবমতই প্রথম হিন্দু-মুসলমানকে একই সাধন ক্ষেত্রে কিছুটা আকৃষ্ট করে। অতএব এগুলো কোন বিশেষ ধর্ম, বিশ্বাস বা সংস্কারের পরিচয় বহন করে না। জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চির কৌতূহল থেকেই এর জন্ম। এ প্রয়াস তাই ধর্মনিরপেক্ষ। এ স্তরের অনুভূতিতে মানবমনে দেশ-কাল পাত্রের ও বিশ্বাসের ভেদাভেদ ঘুচে যায়, এগুলো সে স্তরের অনুভূতি ও উপলব্ধির অভিব্যক্তি। তাই সৈয়দ সুলতান, শেখ চাঁদ প্রভৃতি ইসলাম ও নবী কাহিনী যেমন শুনিয়েছেন, তেমনি আবার এসব মরমীবাদও প্রচার করেছেন।

পীর দরবেশ আউলিয়া প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভারতের প্রথম যুগের মুসলমানেরা মুসলিম সংস্কৃতি গ্রহণ করবার সুযোগ পায়নি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা প্রচলিত হয় এভাবেই। তাতে কোন হিন্দুপ্রভাব নেই। তবে এই পীরবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ-হিন্দুর গুরুবাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

৭. সূফীর স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্কে তত্ত্ব

সূফীদের মূল বক্তব হচ্ছে সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দজাত। তিনি চাইলেন–'কুনফায়াকুন' [Be it so, and it is so] অর্থাৎ সৃষ্টি কারো অনুরোধে বা গরজে হয়নি। স্রষ্টা তাঁর খেয়াল খুশীর খাতিরে আনন্দসহচর হিসেবেই তা' করেছেন। এ তাঁর লীলা। অসমানে প্রণয় হয় না। নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন ও অকৃত্রিম আনন্দ পেতে হলে বন্ধুসাহচর্যই কাম্য। কারণ হৃদয়ের অসংকোচ প্রকাশ একমাত্র প্রণয়ের সম্পর্কেই সম্ভব। সুতরাং স্রষ্টা যেখানে আমোদ উপভোগের জন্যেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সৃষ্টির সেরা মানুষের সঙ্গে তাঁর বান্দা-মনিব সম্পর্ক হতে পারে না। তা হলে সে সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না। স্রষ্টার উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়! যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে গতিবিধি অবাধ হওয়াই স্বাভাবিক। কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধা সেখানে অবাঞ্ছিত নয় শুধু, অসম্ভবও। কাজেই আল্লাহর সঙ্গে যেখানে মানুষের প্রণয়ের সম্পর্ক, সেখানে বান্দা-মনিবের, পিতা-পুত্রের, ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক কল্পনা করাও বাতুলতা। অতএব নামাজ-রোজার বা এই প্রকার আনুগত্যের প্রশ্ন অবান্তর। ফলে শরীয়ত সেখানে নিরর্থক। অনুরাগে প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহবোধে উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে–প্রেমিক প্রেমাস্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে,

---

১. *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পৃঃ ২৫-২৬।*

২. *ক. পুথি সাহিত্যের বিষয়বস্তু এলান-১৯৫২ খ্রিঃ।*
খ. সওয়াল সাহিত্য, মৎসম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী, ১৯৭৬ সন।

পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপ কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার খণ্ডিতাংশ। বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সমুদ্র। কিন্তু বিন্দুর একক শক্তি কতটুকু। তাই তার অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই সমুদ্রের জন্যে তার আকুলতা। নইলে যে তার অপমৃত্যু সুনিশ্চিত! বিন্দুস্বরূপ জীবাত্মার তাই পরমাত্মার জন্যে এমনি আকুলতা। গরজ জীবাত্মার ; তাই সে প্রেমিক–তাই সে রাধা। পরমাত্মারও গরজ আছে, যেমন—সমুদ্রও বারি বিন্দুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোন বিশেষ বিন্দুর জন্যে তার কোন বিশেষ আকুলতা নেই। এজন্যেই জীবাত্মা সদা-উদ্বিগ্ন পাছে সে বাদ পড়ে। তাই রাধা বলে,—'এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে, না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়, যখন বলা চলে 'আনল হক বা সোহম'। এ অবস্থাটা সূফীর ভাষায়রফানাবিল্লাহ্ কিংবা বাকাবিল্লাহ্, বৈষ্ণবের কথায় যুগ রূপ বা অভেদরূপ। [তুঃ চৈতন্যদেব মুই সেই, মুই সেই] ......এই দুটো কথায় সূক্ষ্ম দার্শনিক অর্থের মারপ্যাঁচ আছে। তবে অবস্থা ও অভিপ্রায়টা মূলত একই। একেই 'সামরস্য' অবস্থা বলা হয় সহজিয়া তান্ত্রিকদের ভাষায়।

'কুনফায়াকুন' দ্বৈতবাদের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে 'একোহম বহুস্যাম' অদ্বৈতবাদ নির্দেশক। সূফীরা মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈতসত্তার অভিলাষী। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায় গড়া, তবু তাদের সাধনা চলে দ্বৈতবোধে এবং পরিণামে অদ্বৈতসত্তার প্রয়াসে। সূফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী-বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। কেননা রুমীর কথায় ঃ

দানা চুঁ অন্দর জমিন পেন্‌হা শওয়াদ।
বাদ আজোঁ সারে সবজি বস্তা শওয়াদ॥

জীবাত্মা তখন বাঁশির মতো বলে—'বশোনো আজনায়ে চুঁ হেকায়েত মি কুনন্দ।...... এজন্যে রবীন্দ্রনাথও বলেন,

বিরহানলে জ্বালে রে তারে জ্বালো
রয়েছে দীপ না আছে শিখা, এইকি ভালে ছিলরে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।

তাই সূফীগানে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলন-পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পাই। সূফীর গজল ও বৈষ্ণবপদসাহিত্য মানবাত্মার চিরন্তন Tragedy-র সুর ও বাণী বহণ করছে। না-পাওযার বেদনা আর পেয়ে হারানোর শঙ্কা—কোন্‌টার চেয়ে কোনটা কম! তাই চিরকাল 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া' যেমন 'কাঁদে' এবং লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখঁলু, তবু হিয়া জুড়ন না গেলি', তেমনি 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' এর শেষ নেই, সমাধান নেই। সূফীর গজল-দিওয়ান-রুবাই আর বৈষ্ণবপদাবলী ঐ চির বিরহবোধকে ধ্বনিত করারই প্রয়াস-প্রসূন। এ সাধনাও বড় কঠিন সাধনা। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়—এ তিন থাকতে কিছু হয় না। ধন-জন-মানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে, তবে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঘুচে যায়। এজন্যেই এতে সবার অধিকার নেই। সূফী-বৈষ্ণবেরা তাই পণ্ডিত ও ধর্মধ্বজীদের উপহাস করেন। হাফেজ বলেন,

ঢাল সুরা সখি, সাজাও পেয়ালা, শরম আছে কি তায়,
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো–ধরম যাহারা চায়।

চণ্ডীদাস বলেন ঃ

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছএ যারা
কাজ নাই সখি, তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।

স্মার্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়ে বৈষ্ণববিপ্লবের যে প্লাবন এলো, তাতে পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু সবাই চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হয়নি, রাধা-কৃষ্ণের রূপকে ভক্তি বা বৈরাগ্যসাধনা করেনি।

৮. সূফীতত্ত্বের স্থানীয় বিকাশ

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক কবি 'রাধাকৃষ্ণ' রূপকে পদসাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কেউ করেছেন নেশার ঝোঁকে আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে। নেশার ঝোঁকে করার কারণ দুটো। ১. সূফীমতবাদের সাথে বৈষ্ণবাদর্শের আত্যন্তিক সাদৃশ্য ও আচারিক মিল এবং ২. জগৎ ও জীবনের চিরাবৃত রহস্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌতূহল প্রভৃতি মানুষের মনে যে-জিজ্ঞাসা জাগায়, তার সদুত্তর সন্ধানের প্রয়াসজাত যে অভিব্যক্তি তাতে দেশে বহুল প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ রূপকের ব্যবহার। বৈষ্ণবদের নামকীর্তন, জীবে দয়া, বর্ণভেদ-প্রথার বিলোপ সাধন, বিনয়, নামে রুচি, দশা, সখীভাব, ঐশ্বর্য প্রদর্শন, রাগানুগাভক্তি, তালাকপ্রথা, পুনর্বিবাহ প্রভৃতি সূফীদের যিকর, খিদমত সামা, হাল, সদাসোহাগ, কেরামতি, তরিকত, হরিকত, মারফত প্রভৃতির অনুকরণ মাত্র। ফানাফিল্লাহ বা বাকাফিল্লাহ রাধা-কৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব বা যুগলরূপ পরিকল্পনার উৎসস্বরূপ। এমনকি অদ্বৈতবাদী হিন্দুর দ্বৈতাদ্বৈতবাদও সূফীর দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত। অবশ্য বেদান্ত প্রভাবে পরে সূফীদের কেউ কেউ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হয়েছিলেন। সুতরাং সূফীমতাসক্ত বাঙালী মুসলমানদেরকে বৈষ্ণবসাধনা অনুপ্রাণিত করবে তাতে আশ্চর্য কি? এজন্যেই সাধক নুর কুতবে আলম এবং সৈয়দ মুর্তজা ফারসি গজল যেমন লিখেছেন, তেমনি রচনা করেছেন বাঙলা রাধা-কৃষ্ণ পদও। তাঁরা দুই তত্ত্ব অভিন্নরূপে দেখেছেন। রাধা-কৃষ্ণ যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার, দেহ ও প্রাণের এবং ভক্ত ও ভগবানের পরিভাষা রূপে ভারতবর্ষে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, এঁদের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার মুসলিমরচিত পদ ও দোহাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞাসু। সেই অনাদিকাল থেকে মানুষ নানাভাবে এ প্রশ্নের সদুত্তর সন্ধান করছে। এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার রূপ মানুষ অবিশেষে একই। কাজেই চিন্তাধারাও কমবেশি একই রূপ। কেননা সবারই 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশী লাগিছে অন্তরে।' ইরানি ভাষায় ও সাহিত্যে অপটু বাঙালী মুসলমান তাই রাধা-কৃষ্ণের দেশীয় রূপককে জগৎ ও জীবনের এবং আত্মা-পরমাত্মার রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছে। শুধু বাঙালী মুসলমানই বা বলি কেন, দাদু, কবীর, রজব, তাজ প্রভৃতি অবাঙালী মুসলমানও রাম ও রাধা-কৃষ্ণকে বাদ দিতে পারেননি। রাধা-কৃষ্ণ রূপক তাদের মনন প্রকাশের বাহনরূপে কাজ করেছে। সতেরো শতকের দরিয়া সাহেব বলেন ঃ

আদি অংত্ত মেরা হৈ রাম।
উন বিন ঔর সকল বেকাম॥
কহা কঁরূ যে মান বড়াঈ।
রাম বিনা সব হী দুখদাই॥
সোচ ধাম ধন কৌ।
সোক লেস নেকহু
কলেসকৌ ন লেস রহ্যো।
সুমরি শ্রীগোক লেস
গো কলেস মনকৌ।

মইজদ্দিন বলেন ঃ

বৃংদাবনকী কুংজ লগিন সেঁ
ঢুংঢত ঢুংঢত হারী
দৈহৌ দরস মোহি আপনি
মৌজ মে এহো কৃষ্ণ মুরারি
পিয়া মোহি আস তিহারী।

আফসোস বলেন ঃ

নিশিদিন কৃষ্ণ মিলন কো সঁখিয়া

কবি শেখ বলেন ঃ

চরণ কমল হী কী
লোচন মে লোচ ধরী
রোচন হ্বৈ রাচ্যো

সাধক এয়ারী বলেন ঃ

হৌ তো খেঁলৌ পিয়া সংগ হোরী
জবতে দৃষ্টি পরৌ অবিনাসী

লাগী রূপ-ঠগৌরী
কহ য়ারী য়াদ করা হরিকী
কোই কহৈ কো কহৌরী।

দরিয়া সাহেবও বলেন ঃ

মুরলী কৌন বাজাবৈ হো
গগন মংডল বীচ?
যা মুরলীকে ধূন সে

সহজ রচা বৈরাট।

আস লগায়ে ঠাড়ি রহত হৈঁ
আফসোস পিয়াকী নেহ-সুরতিয়া
নিরখত নর ঔ নারী রতে হৈঁ।
কবি কাইম বলেন ঃ
হরি হেরত মৈঁ ফিরতী বাবরী
নৈননি মেঁ কব আবৈ
হরি কো লখি কাইম সঁখিয়া সোঁ
কাহেন ধূম মচাবৈ।

যা মুরলীকী টেরহিঁ সুন সুন
বহী গোপিকা মোহী
সব্দ ধুন মিরদংগ বজত হৈ
বারহ মাস বসংত।
অমহদ ধ্যান অখংড আতুরবে
ধ্যাবত সবহী সংত।
কান্হ গোপী করত নৃত্যহিঁ।
চরণ বপু হি বিনা
নৈন বিন দরিয়াব দেখে
আনংদরূপ ঘনা।

একেত সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর, তাদের রক্তসংস্কারে ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা-সূফীমতবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং মুসলমানদের মনের, ইন্দ্রিয়ের, আত্মার ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তাই বাঙালী কবি শাহ নুরের কথায় মুসলমানদের রাধা-কৃষ্ণ রূপক গ্রহণের সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই ঃ

সৈয়দ শাহনুরে কয় রাধাকানু চিন হয়
রাধাকানু আপনার তনে রে।

আরো স্পষ্ট হয় যখন শুনি ঃ 'তন রাধা মন কানু শাহনুরে বলে।'
অথবা ঃ

সৈয়দ শাহনুরে কয়, ভব কূলে আসি
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী।

অথবা ওসমানের কথায় ঃ

রাধা-কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্রিদিন।
কানুরাধা একঘরে সদায় করে বাস
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

সৈয়দ মুর্তাজাও বলেন ঃ

আনন্দমোহন মওলা খেলাএ ধামালী
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি
সৈয়দ মুর্তাজা কহে, সখি, মওলা গোপতের চিন।
পুরান পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন।

এর সঙ্গে তুলনীয় ঃ

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি। [চৈতন্যচরিতামৃত]

বিকৃত বৈষ্ণবসাধক—বাঙলার বাউল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেকগুলোই রাধাকৃষ্ণের রূপকে দেহতত্ত্ব জানার তথা জীবাত্মার ও পরমাত্মার রহস্যভেদে প্রয়াসী। শুধু তাই নয়, আধুনিক উর্দু কবি হাফিজ জালন্ধরী থেকে বাঙালী কবি নজরুল, জসীমউদ্‌দীন প্রভৃতি অনেককেই এ 'রাধা-কৃষ্ণ' কাব্য প্রেরণা দান করেছেন।

আমরা দেখেছি, তারাচাঁদ 'Influence of Islam on Indian Culture' গ্রন্থে, বিনয় ঘোষ 'বাঙলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে এবং 'ভারতদর্শনসার' গ্রন্থে উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের বিকাশ মুসলিম প্রভাবপ্রসূত বলে অনুমান করেছেন। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'[১] চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম মুসলিম প্রভাবজ বলে এক রকম স্বীকার করেছেন। আর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে বাউল মত বাঙালী মুসলিম মানস উদ্ভূত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বৈষ্ণবমতে ও পদসাহিত্যে সূফী প্রভাব স্বীকার করেছেন।[২]

তবু এসত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্রভাবটি পারস্পরিক হয়েছিল। কবীর, দাদূ, রজ্জব, আউল, লালন ফকির প্রভৃতি দেশীয় মুসলমান আর শাহ বুআলি কলন্দর, গাউস গোয়ালিয়র, বুলেহ শাহ, শাহ আবদুল লতিফ থেকে বাঙলার সৈয়দ আইনুদ্দীন প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলিম বংশধরগণ অবধি সবাই নানাভাবে অল্প বিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন ভারতীয় তত্ত্বচিন্তার দ্বারা।

সূফীমতবাদী হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধা-কৃষ্ণের রাস, মৈথুন প্রভৃতির কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তাঁরা রূপ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক সূচক ও ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করতে পারলেও বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের অধ্যাত্মতত্ত্বের মিল খুঁজে পাননি, তাই মুসলমানের লেখায় ও-সব শ্রেণীর পদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাদের রচনায় অনুরাগ ও বিরহবোধ এবং জীবন জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট। সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে–এটিই রূপ ; এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কবোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ; এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে—এটিই বংশী ; আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়—এটিই অভিসার। এ ভাবে সাধনায় এগিয়ে গেলে অধ্যাত্মস্বস্তি আসে—তাই মিলন। এবও পরে চরমাকাঙ্ক্ষা—একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা যার নাম বাকাবিল্লাহ—এ-ই বিরহ। মৃত্যুর আগে সাধারণের চরম মিলন নেই—তাই বাকাবিল্লাহ সূচক পদ নেই। কেউ কেউ সে দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন—তাঁরাই এ বাকাবিল্লাহ হন—আর বলেন 'আনল হক'–যেমন মনসুব, বায়েযীদ প্রমুখ সাধক বলেছেন। সৈয়দ মুর্তজার ফারসি গজলে রাধাকৃষ্ণ নেই এবং নুর কুতুব-ই-আলমের বাংলা পদে রাধাকৃষ্ণ আছেন। এ আলোকে যাচাই করলে রাধা-কৃষ্ণ লীলা যে সূফীতত্ত্ব প্রকটের দেশী রূপক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এজন্যই মুসলিমরচিত পদ রাগানুগ নয়। এ ব্যাপারে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য ঃ "একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে।.....বৈষ্ণবের মতে রাধাকৃষ্ণের যত লীলা তাহার ভিতর মানুষের কোন স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (স্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাহার হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে ; জীব সেখানে লীলা পরিকর-ভূত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলাদর্শন ও আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলাকীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনাও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।..... কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে, কারণ তাঁহারা চৈতন্য প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিলেন ; একটা সাহিত্যিক বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকার সূত্রেই পাইলেন,

১. *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং পূর্বার্ধ) ঃ "রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোস কিছু হয়েছিল। ইহার পিছনে দরবেশ ফকীরদেরও প্রভাব ছিল এবং এই সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সূফী প্রভাবের কিছু ছাপ পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়।" পৃ ২৪৫।*

২. *পরিচয় সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা ঃ সুরজিৎ দাসগুপ্তকে লেখা চিঠি। পৃঃ ৪৬, ৫১।*

কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কোন স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্তি করিয়া লইলেন।

"বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সুফীপন্থী। সুফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের বহুরূপে লীলা—ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'একে'র সৃষ্টি লীলার প্রধান শরিক—লীলা দোসর।.. সুফীপ্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেম-ধর্মের আদর্শের সহিত অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণের পূর্বরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব।"[১]

৯. বৈষ্ণবমতের স্বরূপ ও প্রভাব

ষোল শতকে বৈষ্ণবমতের উদ্ভবে যে ভাববিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাব গণমনের সংকীর্ণতা ও ক্রুর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করেছিল। উদার মানবিক বোধে বাঙালীর চিত্তের প্রসার, এবং রুচির বিকাশ ঘটেছিল, চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে অসূয়ামুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা তাই সম্ভব হয়েছিল। এ সময়ে নিশ্চিতই রাধা-কৃষ্ণ লীলামহিমা বাঙালীর চিত্তহরণ করেছিল। নরে নারায়ণ দর্শন কিংবা জীবে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব করা যুগের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজে ধর্মে ও রাষ্ট্রশাসনে আকবরের উদার নীতি এই বোধ আরো উজ্জীবিত করেছিল। তাই ষোল শতক বাঙালী জীবনে ছোটখাট রেনেসাঁসের যুগ।

এই শতক অনিবার্য কারণে বাঙলা সাহিত্যেরও সোনার যুগ। পনেরো শতকের বাঙালীর রচনা বিচ্ছিন্ন ও বিরল প্রয়াসে সীমিত। কিন্তু ষোল শতকের নব বৈষ্ণবীয় উচ্ছল ভাববন্যায় বাঙালী হৃদয় প্লাবিত হয়ে ভাষা-সাহিত্যেব আঙিনায়ও উপচে পড়েছিল। কবির সাংখ্যাধিক্যে, সৃজন পটুতায়, রচনার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে এই শতক গোটা মধ্যযুগের মধ্যমণি। ভাবের, ভাষার এবং রূপের ও চিত্রকল্পের স্বতোৎসারে এই শতকের সাহিত্য অনন্য।

কিন্তু এ রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণপ্রাচুর্য চৈতন্যদেবেরই দান। তাই অবৈষ্ণবেরা এই বিপ্লব-বন্যায় বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষোল শতকে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল। এই বন্যার প্রথম তোড় মন্দা হবার মুখে ষোল শতকের শেষ পাদে অবৈষ্ণবেরা সম্বিৎ ফিরে পেতে থাকে। কিন্তু তখন তাদেরও অজ্ঞাতে তাদের চিত্ত চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে সমর্পিত। যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধদের যারা ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রচ্ছায় নিজেদের ধর্মমত প্রচ্ছন্ন রেখেছিল, তাঁরাও চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্রের দোহাই দিয়ে রাধা-কৃষ্ণের লীলাবাদকে সম্বল করে নিল। এরাই নতুন বৈষ্ণবসহজিয়া। শাক্তসমাজে শক্তির বাৎসল্য ও করুণাময়ী রূপের প্রাধান্য, শৈবসম্প্রদায়ে ভোলানাথ শিবের জনপ্রিয়তা এবং তান্ত্রিক কাঠিন্যে প্রীতিরসের প্রবণতা বৈষ্ণবপ্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

---

১. *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৩২১-৩০

ষোল শতকে চৈতন্যোত্তর কালে তথা ষোল শতকের শেষ পাদে আমরা নিশ্চিত রূপে দুইজন হিন্দু কবির সাক্ষাৎ পাই। দুইজনই রচনা করেছেন চণ্ডীমঙ্গল। এবং উভয়েই চৈতন্যচরণে আত্মনিবেদন করেছেন। দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য তাঁর গঙ্গামঙ্গলের এক ভণিতায় বলেছেন ঃ

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।

পনেরো শতকের হিন্দুকবি ঃ বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্দ্রমিশ্র আর ষোল শতকের প্রথম পাদের কবি হচ্ছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী ও দ্বিজ শ্রীধর। এঁদের মধ্যে পাঁচজন সুলতান বা সামন্ত প্রতিপোষণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অতএব এঁদের সাহিত্যিক প্রয়াস নতুন গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক-পরিমণ্ডলের প্রথম দান।

নতুন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় দান বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও সমাজের সংস্কার প্রয়াস এবং হিন্দুর মনে নতুন জীবন-স্বপ্নের উদ্ভাস [গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হৈব হেন আছে]।

এর তৃতীয় দান উত্তর ভারতিক সন্ত ধর্মের অনুসরণে সূফীপ্রভাব দক্ষিণ ভারতিক অদ্বৈততত্ত্বের ও ভক্তিবাদের ভিত্তিতে নব অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ববাদ ও প্রেমবাদের উদ্ভব। চৈতন্যের ব্যক্তিক মনীষার ফসল এই নব অধ্যাত্মবাদ প্রচারিত হলেও এ কোন আকস্মিক অকারণ ঘটনা নয়।

জন্মসূত্রে বিন্যস্ত সমাজে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের জীবন নিয়তির অমোঘ বিধানের মতো পৈতৃক পেশার নিগড়ের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে পুরুষানুক্রমিক পীড়ন, তাচ্ছিল্য ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় ছিল না তাদের। এতে দেহ, মন ও আত্মার উপর যে জুলম হত, নতুন কোন আশার বা আদর্শের আলোর অনুপস্থিতির দরুণ তা সহ্য করতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের ফলে তারা চোখের সামনে দেখল, আজ যে ক্রীতদাস বুদ্ধি, সামর্থ্য ও নৈপুণ্য বলে কাল সে বাদশাহী তখত অলঙ্কৃত করছে। দিল্লীতে ও গৌড়ে এই আজব কাণ্ড হামেশাই ঘটছে। দেখতে পাচ্ছে সামান্যের মধ্যে রূপকথার নায়ককে। মানুষের আত্মপ্রসারের এই অনিঃশেষ ক্ষেত্রে সন্ধান পেয়ে তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাঁধন ছিঁড়বার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। মানুষ অবিশেষের জীবনের বিরাট সম্ভাবনার সন্ধান যখন একবার পেল, তখন তাদের ধরে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্যসমাজ বাঁধন যত শক্ত করতে চাইল, ছিঁড়বার আশঙ্কা ততই বাড়ল। কারণ পাখি যখন নব দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে, সে উড়বার চেষ্টা করবেই।

ব্রাহ্মণ্যবাদীর এ প্রয়াস যখন ব্যর্থ হল তখনই শুরু হল চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে স্মৃতি ও শাস্ত্র দ্রোহী সমাজ গঠনের আন্দোলন। এবং এ উদ্দেশ্য মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে। কেননা, অন্যথায় যারা ইসলাম গ্রহণ করত, মুখ্যত তারাই বৈষ্ণব হলো, যেমন সমাজে পতিত হবার পর খ্রিস্টধর্ম বরণ করা ছাড়া যাদের অন্য উপায় রইল না, তারাই ব্রাহ্মমত সৃষ্টি করে নতুনে-পুরাতনে সন্ধি ঘটিয়ে স্বধর্মের প্রচ্ছায় আত্মরক্ষা করলো।

আগেই বলেছি বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতিতে ও সামাজিক আচার-আচরণে ইসলামী রীতিনীতির হুবহু অনুকৃতি রয়েছে অনেক। তবু মানুষের চারিত্রিক স্খলনপতনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা আর পতিতাত্মার জন্যে করুণাবোধ করা বৈষ্ণবীয় উদারতার সুন্দরতম প্রকাশ।

অতএব, মুসলিম সংস্কৃতির মোকাবেলায় দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে যা ঘটেছে, ষোল শতকের বাঙলায়ও একই ঐতিহাসিক প্রাতিবেশিক কারণে তাই ঘটেছে। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের সূচনা আগেই হয়েছিল, তা এই উপায়ে সিদ্ধ হলো। বাঙালীর সবাই অবশ্য বৈষ্ণব হয়নি। কিন্তু এসত্য অবশ্যস্বীকার্য যে, কেউই আর স্বধর্মে ও স্বমতে সুস্থির থাকতে পারেনি, অবচেতনভাবে বৈষ্ণবীয় উদার মানবিকতার প্রভাবে পড়েছিল। তারা স্বস্থ থাকতে পারল না বটে, তবে সুস্থ মানস-আবহাওয়া পেল। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ সে উদারতা অবৈষ্ণবের মতো কাজে লাগাতে পারেনি, যেমন শিখেরা পারেনি নানকের মতসমন্বয়ী উদার আদর্শকে ধরে রাখেত। তারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎকণ্ঠ ও উগ্র হয়ে ওঠে। এবং এ উদ্দেশ্যে তারা সংকীর্ণতাকেই সম্বল করে। আত্মরতি সর্বাবস্থায় পরপ্রীতির

পরিপন্থী। এ কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও সত্য। শিখদের মতো বৈষ্ণবেরাও উদার দৃষ্টি সংকুচিত করে নবগঠিত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়নে ও তাদের ধর্মতত্ত্বে আভিজাত্য আরোপপ্রচেষ্টায় সময়ের, শক্তির ও মনীষার অপচয় করতে থাকে। দৃষ্টি এমনি সংকীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ হওয়ায় তারা নতুনভবে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যেও গড়ে তুলল বিভিন্ন মতের উপসম্প্রদায় চৈতন্যের ও তাঁর পার্ষদের নামে।

জীবনী গ্রন্থগুলো তাদের সংকীর্ণতার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন বৃন্দাবন দাস অবৈষ্ণব হিন্দুকে পাষণ্ডী বলেই জানতেন। বৈষ্ণব সুলভ বিনয় কিংবা সহিষ্ণুতাও তাঁর ছিল না। মনের মধ্যে তিনি সবসময়ই পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষপ্রসূত উত্তেজনা বহন করতেন। তাঁর একটি গালি তিনি ধূয়ার মতো আবৃত্তি করেছেন, 'এতো পরিহাবেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।' ফলে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যেব আর একটি প্রাচীর উঠল। মিলন ময়দানের পরিসর আর একটু সংকীর্ণ হল মাত্র। বৈষ্ণবেরা এভাবে যখন বাস্তব জীবন ও প্রয়োজনকে আড়াল করে পারলৌকিক জীবনস্বপ্নে অভিভূত এবং দৃষ্টি মাটি থেকে সরিয়ে নিয়ে আকাশে নিবদ্ধ করেছে, মুঘলবিজয়ে তখন নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

কাজেই দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদ, উত্তর ভারতের সন্তধর্ম ও বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম একই পরিবেশ ও সমস্যাপ্রসূত মতবাদ। তবু কেবল বৈষ্ণবধর্মেই ভক্তির প্রেমরূপে মহিমান্বিত প্রকাশ ঘটেছে।

বৈষ্ণব মতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা অভিন্নও বটে—আর ভিন্নও বটে। যেমন পানি বিহীন ঢেউ হয় না, কিন্তু পানি ছাড়া ঢেউয়ের একটা রূপ কল্পনা করা যায়। তেমনি রোদ ও সূর্যকে একাধারে অভেদ ও পৃথক করে কল্পনা করা সম্ভব। তাত্ত্বিক কবি হাজী মুহম্মদরে ভাষায় ঃ

বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল, বৃক্ষ, বীজ—এই তিন নাম হয়
একে হয় তিন জান তিনে এক হয়।
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহ ভিন্ন নয়
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যায়
কিন্তু তেন মত জানিও যে আল্লা আর বান্দা
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।
গাছ আর ফল যেন হয় এক কায়।
তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নয়
তেন রূপে জানিও বান্দা আর খোদায়।
বান্দার আজাবে কভু খোদা না পীড়য়
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরয়।
আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ
জন্মমৃত্যু নাহি তান আওনাগমন।

[ইত্যাদি পূর্বে সূফীসাহিত্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেন ঃ

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

এমন সূক্ষ্ম ভেদ-অভেদ তত্ত্বভিত্তিক বলেই বৈষ্ণবমতবাদের নাম অচিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ইসলামের দ্বৈতবাদের প্রভাবেই ভারতের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বিচলন ঘটে ফলে দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির উদ্ভব।

১০. অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ঃ চৈতন্য-দর্শন

বৈষ্ণবমতানুসারে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্কটা সংক্ষেপে এই[১], আদিতে পরমপুরুষ স্বরূপ বিধাতা এক ছিলেন। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করলেন, তাই নিজ অংশ থেকে নারী স্বরূপাকে সৃষ্টি করে 'যুগল' হলেন। এখানেই পুরুষ-প্রকৃতি মায়াব্রহ্ম ও বিষ্ণুশ্রী তত্ত্বের উদ্ভব। নারীই শক্তি স্বরূপা, নারীসম্পর্কেই পুরুষ হয় শক্তিমান। মৈথুন তত্ত্বেরও উদ্ভব হয় এভাবেই। পুরুষ-প্রকৃতির তথা নারীপুরুষের মিলনেই সৃষ্টির উদ্ভব। তাঁদের সম্পর্কও প্রেমের। কাজেই সৃষ্টি প্রেমজ। তিনি চাইলেন—একোহম বহুস্যাম। কেননা আমি নিজেকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করতে চাই। আর তাই সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দসহচর। যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আনন্দের তথা প্রণয়ের সম্পর্ক সেখানে নিয়মরীতির ব্যবধান থাকতে পারে না। কাজেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের সেখানে ঠাঁই নেই। অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ, বিরহবোধে এর উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। বৈষ্ণবের কথায় এ মিলন মানে যুগলরূপ ও অভেদরূপ। এর অন্য নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। এ সাধনার বৈষ্ণবীয় নাম 'রাধাভাব'। সাধারণের জন্যে এ সাধনা নয়। সাধারণ মানুষ ভগবানের কৃপাকামীমাত্র তাই তার কেবল গোপীভাবে সাধনা করা। গোপী গুরু, জীব শিষ্য। রাধাকৃষ্ণের লীলায় গোপীর ভূমিকা লীলাসহচরীর ঃ

দুই মুখ নিরখিব দুই অঙ্গ পরশিব
সেবা করিব দোঁহাকার।
ললিত বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।

এজন্যেই রাধার সাধনা রাগাত্মিকা আর গোপীর তথা বৈষ্ণবের সাধনা রাগানুগা।

এক প্রাচীন গোপজাতির লোককথার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে অভিন্ন হয়ে ওঠেন। গোপীপ্রধানা রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ই জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে ধর্ম-দর্শনের ও সাধন-ভজনের অবলম্বন হয়েছে।

বৈষ্ণবের মতে ঃ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

বৈষ্ণবেরা এই কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির উন্মেষ-পদ্ধতির কথা এভাবে বলেন ঃ

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয়
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।

বৈষ্ণবের মতে ভগবান রস স্বরূপ ঃ রসো বৈ সঃ। আবার তিনি সবার প্রিয়, বন্ধু ও আত্মাস্বরূপ ঃ প্রেষ্ঠো ভবান তনুভৃত্যাং কিল বন্ধুরাত্মা। তিনি এক ছিলেন, জীবনলীলা আস্বাদনের জন্যে বহু হলেন ঃ 'একোহম বহুস্যাম'। সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি লীলারস আস্বাদন করেছেন ঃ পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা, ভগ্নী, জায়া, সখা প্রভৃতি রূপে তিনি প্রেম দিচ্ছেন এবং নিচ্ছেন। 'শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর নাম'/'কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পর্যন্ত প্রধান।' 'হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ভয়/ পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়।' রবীন্দ্রনাথও বলেন ঃ

---

১ *এ সঙ্গে এ গ্রন্থের ১৫৯-৬২ পৃষ্ঠার পাঠ স্মর্তব্য।*

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।

আবার তিনি রূপময়ও। তিনি যেমন মধুর, তেমনি সুন্দর। সৃষ্টি তাঁর সৌন্দর্যেই প্রথম আকৃষ্ট হয়। তাই সৃষ্টির প্রধান উপাস্য-রূপ।

চোখের দাবী মিটলে পরে তখন খোঁজে মন
তাই তো প্রভু সবার আগে রূপের আকিঞ্চন। (সত্যেন দত্ত)

রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা,
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
এমন ফুল্লশ্যামল ধরা।

ভগবান রূপের আকর এবং গুণের ভাণ্ডার। এমনকি 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার/ আস্বাদিতে স্বাদ উঠে মনে।' এমনি অবস্থায় ঃ 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া' থাকে, যৌবনের বনে মন হারাইয়া' যায়, 'ঘরে যাইতে পথ অফুরান' হয়। তখন ঃ 'রূপ লাগি আঁখি ঘুরে গুণে মন ভোর' হয় এবং 'প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কাদেঁ। রূপময় এবং রসময় ভগবানের প্রতি এই হচ্ছে পূর্বরাগ ও অনুরোধ। তখন ঃ 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া কান্দে' এবং 'পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।'

রবীন্দ্রনাথও বলেন ঃ

এই পেয়েছি সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
ধন্য হল অঙ্গ মম পুণ্য হল অন্তর।

অথবা,

আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক না হারা
জীবন ব্যেপে লাগুক পরশ
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখি তারা।

অথবা,

গায়ে আমার পুলক জাগে
চোখে লাগে ঘোব
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখির ডোর।
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন জলে
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর।

অথবা,

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে তোমার আমার খেলা।

তখন কানের কাছে,—'মনের মাঝে বাঁশী বাঁজে—সে বাঁশী ডাকে'। তখন 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশী (সবারই) অন্তরে লাগে '; তখন বাঁশী 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' প্রাণ আকুল করে।

রবীন্দ্রনাথও বলেন ঃ

আমি যে আর সইতে পারি নে
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।

তখন বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকবো তোমার নাম
সে ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।

এমনি অবস্থায় ঘরে থাকা দায়। কেননা তখন 'বেদনার ঢেউ উঠে জাগি সুদূরের লাগি'। এরই নাম বিরহ। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী-বৈষ্ণবের সাধ্য। তাই সূফী গজলে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলন পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ-কান্নার ধ্বনি শুনতে পাই। কেননা 'জনম অবধি রূপ নেহারলে'-ও নয়ন তৃপ্ত হয় না, আর 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া' রাখলেও হিয়া জুড়ায় না। শুধু কি তাই! ক্ষণে ক্ষণে 'বেদনার ঢেউ উঠে জাগি' আর তাই 'আজিও কাঁদিছে রাধাহৃদয়কুটিরে'। না-পাওয়ার বেদনা আর পেয়ে-হারানোর শঙ্কা মানবাত্মায় যে চিরন্তন দুঃখ জাগিয়ে রেখেছে, তার সীমা-শেষ নেই। এজন্যেই যখন সাক্ষাৎও হয়, তখনো 'দুহুঁকোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। খণ্ড মানবাত্মা অখণ্ড ব্রহ্মে লীন হতে চায়। তাই বিচ্ছেদের -বিরহের এ বেদনা ও আকুলতা। সে আকুলতার আতিশয্যেই 'পর্বত আকাশের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায় এবং 'তরুশ্রেণী পাখা মেলি মাটির বন্ধন ফেলি' ছুটে।

বৈষ্ণবেরা চিরসুন্দর, চিরমধুর চিরনবীন ও চিরকরুণাময় ভগবানের মধুররূপেরই উপাসক। এই জন্যেই বৈষ্ণবমত প্রধানত রূপধর্ম।

কৃষ্ণের মধুররূপ শুন সনাতন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।

এমন কি 'রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণ হয় চমৎকার, আস্বাদিতে স্বাদ জাগে মনে।'
–এর জন্যেই রূপের পাথারে আঁখি ডুবে থাকে।

১১. বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্ব

১, যুগলরূপ ঃ রসস্বরূপ কৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপিনী রাধা তত্ত্বত এক এবং অভিন্ন ঃ

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ।

এই যুগল রূপই বৈষ্ণবের উপাস্য।

আবার রাধা হ্লাদিনী' শক্তি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ঃ

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি
সেই মহাভাবরূপ রাধা ঠাকুরাণী।
হেন মহাভাব যার মনে উপজয়
বেদধর্ম তেজি সে যে কৃষ্ণকে ভজয়।

২, প্রকাশ ও বিলাসঃ ভগবান নিজে বিলাস-ইচ্ছায় বিচিত্র-সৃষ্টিরূপে প্রকটত হয়েছেন। রসিক এবং করুণাময় রূপেই তাঁর এই বিলাসলীলা চলে। তিনি একাধারে বস্তু ও ভোক্তা।

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছায় উদ্‌গম।

৩. রসাস্বাদন ঃ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি।

ভগবান এক ছিলেন, লীলা-রস উপভোগের জন্যেই নিজ অংশ থেকে রাধাকে সৃষ্টি করলেন সঙ্গিনীরূপে। আব একই কারণে তিনি সৃষ্টিরূপে বহু হলেন। তাই কৃষ্ণ বলেন ঃ

বাই তুমি সে আমার গতি
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।

৪. পরস্পর ভজনা ঃ স্রষ্টার জন্যে সৃষ্টির যেমন আকুলতা, সৃষ্টির জন্যেও স্রষ্টার তেমনি আকর্ষণ। রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

তাই কৃষ্ণ বলেন ঃ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল।

অথবা, সুন্দরি আমারে কহিছ কি
তোমারি লাগিয়া ভাবিয়া বিভোর হইয়াছি।

রাধাও বলেন ঃ [কৃষ্ণ] পাখিক পাখ মীনক পানি
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।

পরস্পরের সম্বন্ধটা এরূপ ঃ

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি
দুহুঁ কোঁড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।

৫. ভগবান ও মানুষ ঃ মানুষ ভগবানের অংশ। মানুষ ভগবানের পরাপ্রকৃতি ঃ

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।

তাই, কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহারি স্বরূপ।

৬. মানবের সাধ্যবস্তু ঃ মানুষের সাধ্যবস্তু প্রেম। এই প্রেমের আলোকেই স্রষ্টাকে বোঝা যায়, তার প্রসন্ন প্রসাদ লাভ ঘটে।

৭. মানবের সাধন ঃ কেবল গোপীভাবের দ্বারাই স্রষ্টার কৃপালাভ করা সম্ভব। নিষ্কামভাবে তথা ফলাকাঙ্ক্ষা না করে রাধাকৃষ্ণকে ভালবাসার নামই

গোপীভাব ঃ সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়
বেদধর্ম তেজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়।

এবং রাগানুগামার্গে ভজনাই গোপীভাবের সাধনা ঃ

রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

বৈষ্ণবেরা সূফীদের মতে স্রষ্টাব সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনা করে না, রাধাকৃষ্ণের লীলাসহচর রূপেই তাদেব সিদ্ধি। গোপীরা যেমন রাধাকৃষ্ণের লীলা সহচরী, অর্থাৎ এঁদের লীলা দেখা, শোনা, জানা ও সহায়তা করাই গোপীদের লক্ষ্য,

এতেই তাদের তৃপ্তি ঃ বাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ প্রেমলতা
সখীগণ হয় এই লীলার পুষ্টি পুষ্পপাতা।
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়
সখী লীলা বিস্তারিত সখী আস্বাদয়।
সখী স্বভাব এক অকথ্য কথন
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাই সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার সে লীলা কবায়
নিজ কেলি হোতে তাহে কোটি সুখ পায়।

তেমনি গোপীভাবের সাধক বৈষ্ণবদেরও তাই কামনা। এজন্যই বৈষ্ণবেরা ঃ

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার
রাত্রি দিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার।
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ।

হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে রাধারূপ জীবাত্মার সঙ্গে কৃষ্ণরূপ পরমাত্মার প্রণয়লীলার অনুধ্যানই বৈষ্ণবব্রত।

৮. পূর্বরাগ-অনুরাগ ঃ প্রেমের উন্মেষে রূপানুরাগই প্রথম স্তর—এটিই পূর্বরাগ, রূপ ও গুণমুগ্ধতাই অনুরাগ—এটি দ্বিতীয় স্তর।

৯. অভিসার ঃ মিলনসাধনার শুরুই অভিসার।

১০. বাসকসজ্জা ঃ হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের প্রতীক্ষাই বাসকসজ্জা।

১১. মিলন ঃ ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধিই মিলন।

১২. গৌরাঙ্গ ঃ রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার গৌরাঙ্গ-চৈতন্যদেব। তাঁকে শরণ করেই রাধাকৃষ্ণের সাধনা করতে হবে ঃ

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজ রূপ আস্বাদিতে হইলা অবতার।

তাই গৌরাঙ্গ-গৌরচন্দ্র চৈতন্য-লীলা দিয়েই আরম্ভ হয় কীর্তনগান—যার নাম গৌরচন্দ্রিকা।

কৃষ্ণের নারী-লীলা নতুন নয়। দাক্ষিণাত্যে নাপ্পিন্নাই ও মায়বন যথাক্রমে রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরূপ। তামিল সাহিত্যে এ লীলার বহুপদ রয়েছে। তাছাড়া গাথা সপ্তশতী, অমরুশতক, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিত রত্নকোষ, আর্যাসপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি সব সংকলন গ্রন্থেই শিব-উমার বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলার শ্লোক ও পদ মেলে। পদ্ম, ভবিষ্য, স্কন্ধ, মৎস্য পুরাণেও রাধাকৃষ্ণ লীলার কথা বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চণ্ডীদাসরচিত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতিতো আছেই। নববৈষ্ণবেরা তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাতে জীবাত্মা-পরমাত্মা লীলার রূপক আরোপ করেছে মাত্র। বস্তুত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা কাব্যের সর্বভারতীয় বিষয়বস্তু। তামিলে, সংস্কৃতে, প্রাকৃতে ও অবহটঠে বহু কবি এ লীলা বর্ণনা করে পদ রচনা করেছেন।

১২. পদাবলীর রসতত্ত্ব

বৈষ্ণবপদাবলীতে পাঁচটি রস আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত ও দাস্যরসের পদ নিতান্ত কম। সখ্য ও বাৎসল্যের পদও বেশি নয়। মধুর বা উজ্জ্বল রসের পদই বেশি। আদিরসেরই বৈষ্ণবীয় নাম মধুর রস। মুখ্যত এই মধুর রস আস্বাদনের মাধ্যমেই বৈষ্ণব সাধনা চলে। এর নামই 'কান্তাপ্রেম' এবং এইটি সর্বসাধ্যসার। আর রাধা-প্রেম সাধ্য শিরোমণি। 'পহিলহিঁ রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল, অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।' পূর্বরাগ ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়, অনুরাগের প্রেরণায় অভিসারের প্রয়াস জাগে, অভিসারে মিলন ঘটে। মিলনের পর মাথুর [বিরহ], তারপর আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা।

পদের আবার লীলানুগ উপবিভাগও আছে। রাধাকৃষ্ণ লীলাকে একটি গীতিনাট্য কল্পনা করলে এই উপবিভাগগুলোর সার্থকতা বোঝা যায়। এই উপবিভাগগুলি ঃ জন্ম, বাল্য, গোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ, দান, নৌকা, অভিসার, মিলন, বংশীশিক্ষা, বসন্ত ও হোলী, ঝুলন, রাস, মান, বিরহ ভাবসম্মিলন, নিবেদন ও প্রার্থনা। আর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকে রাধাকৃষ্ণ গীতিনাট্যের নান্দী বা সূচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয় বলে এগুলোকে বলে গৌরচন্দ্রিকা।

অবস্থানুসারে মধুর রস দু' প্রকার—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ আবার চার প্রকার ঃ পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য [মিলনেও বিরহবোধ], মান ও প্রবাস [বিরহ]। এ চারটির প্রত্যেকটির আটটি করে

উপবিভাগ আছে। বিপ্রলম্ভ বিরহবোধেরই নামান্তর, কেননা, এর পূর্বরাগে, প্রেমবৈচিত্ত্যে, মানে ও প্রবাসে বিরহই মুখ্য। সম্ভোগেরও চারটি প্রধান রূপ এবং প্রত্যেকটির আটটি করে উপশাখা আছে। এভাবে চৌষট্টি অবস্থান্তরের আলেখ্য পাওয়া যায়। আবার নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা, আচরণ ও মনোভাবের পরিচায়ক চৌষট্টি রসাশ্রিত কীর্তনের ব্যবস্থা আছে। নায়িকার অষ্টাবস্থা এবং প্রত্যেকটির আটটি করে উপবিভাগ আছে ঃ ১ অভিসারিকা–জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তমসাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তাভিসারিকা (বংশী শুনে), অসমঞ্জসাভিসারিকা (অসংবৃত বেশে)। ২. বাসকসজ্জা—মোহিনী (সুবেশা), জাগ্রতিকা (প্রতীক্ষায়) রোদিতা (বিলম্ব হেতু), মধ্যোক্তিকা (স্বগত-উক্তিযুক্তা), সুপ্তিকা [কপট নিদ্রিতা] কৃষ্ণভ্রমে ত্রস্তা, চকিতা [নিজ অঙ্গচ্ছায়া দর্শনে], সুরসা [গানে আগমন], উদ্দেশা [দূত প্রেরণেচ্ছুক]। ৩. উৎকণ্ঠিতা—দুর্মতি, বিকলা, স্তব্ধা, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখ্যোৎকণ্ঠিতা, মুখরা, নির্বন্ধা। ৪. বিপ্রলব্ধা—বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরা, ভীতা। ৫. খণ্ডিতা—নিন্দা, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগল্‌ভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কম্পিতা, সন্তপ্তা। ৬. কলহান্তরিতা—আগ্রহ, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মৃদুলা, বিধুরা। ৭. প্রোষিতভর্তৃকা—ভাবি, ভবন, ভূত, দশদশা, দূতসংবাদ, বিলাপা, সুখ্যুক্তিকা, ভাবোল্লাসা। ৮. স্বাধীনভর্তৃকা—কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, সমুক্তিকা, সোল্লাসা, অনুকূলা, অভিষিক্তা। দশদশা এরূপ ঃ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম তত প্রসার লাভ করেনি, কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্য এক সময়ে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মনে রসের তরঙ্গ তুলেছিল। সুলতান সুবাদারের প্রতিপোষকতায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বুনিয়াদ তৈরি হয়, আর বৈষ্ণব রচনার দ্বারা ভাষাসাহিত্যের দ্রুত প্রসার ও বিকাশ ঘটে। কেবল সাহিত্যসৃষ্টির ও ভাষার পুষ্টির ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিকভাবে বাঙলার ধর্মে সমাজে সংস্কৃতিতে এবং মননেও এর প্রভাব ও দান অপরিমেয়। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যপ্রভাবের বিপুলতার ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে কেবল এর তুলনা চলতে পারে। বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের ফলে এদেশের বহুলোক বৈষ্ণবমতবাদ গ্রহণ করে। এ মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৈষ্ণবসহজিয়া ও বাউলমতবাদ সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। বৈষ্ণবমতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শাক্তসম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে এবং প্রধানত বাৎসল্য রসাশ্রিত শাক্তপদাবলী রচিত হয়। মুসলমানেরাও রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার, দেহ-মনের, এবং ভক্ত-ভগবানের রূপক হিসেবে গ্রহণ করে পদ রচনা ও আস্বাদন করেছে। লৌকিক প্রণয়গীতিতেও নায়িকা অর্থে 'রাই' এবং নায়ক অর্থে 'কালা' সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সেই সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নতুন ছন্দে কত প্রাচুর্য এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল [সাহিত্য সৃষ্টি–সাহিত্য পৃঃ ৯৬]। 'ব্রজবুলি' নামে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কীর্তনের পাঁচ প্রকার সুর-তাল-পদ্ধতিও গড়ে ওঠে—ক. গড়েরহাটী খ. মনোহর শাহী, গ. রেণেটী, ঘ. মন্দারিণী, ঙ. ঝাড়খণ্ডী। কীর্তন গানে কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর—এ ছয়টি অঙ্গ রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খোল করতালই প্রধান। ভাগবতাদির কথা বাদ দিলে চোখে দেখা রক্তমাংসের মানুষের চরিতাখ্যান রচনাও শুরু হয় এ সময় থেকেই। বাঙলায় গীতিকবিতা রচনার এবং অলঙ্কার ও দর্শন শাস্ত্রে আলোচনার সূত্রপাতও করেন বৈষ্ণবরাই।

১৩. চৈতন্যের জন্মকালের বাঙলাদেশ

বাঙলাদেশে যখন তুর্কীবিজয় ঘটে, তখন [১২০১-৪ খ্রীস্টাব্দে] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নতুন চিন্তা-চেতনার অভিঘাতে এখানেও বিশেষ করে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষের মনে জাগে প্রশ্ন, ফলে তাদেরও জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার দিগন্ত হয় প্রসারিত। মুক্তিতৃষ্ণা তাদেরও

করে আকুল। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজের সুবিধাভোগীরা হয় সনাতনী ও রক্ষণশীল, আর বঞ্চিতরা হয় বিদ্রোহী। এমনি অবস্থায় রক্ষণশীলেরা হয় কূর্মস্বভাবাশ্রিত। আত্মগোপন করেই তারা আত্মরক্ষায় হয় প্রয়াসী, দ্বার রুদ্ধ করেই বাইরের হাওয়া ঠেকানোর চেষ্টায় থাকে নিরত। বাঙলাদেশেও তুর্কীপ্রভাব ঠেকিয়ে রাখার ও এড়িয়ে চলার জন্যে স্মৃতি-সংহিতার ব্যাখ্যা-ভাষ্য তৈরি করে সমাজবন্ধন দৃঢ় করবার চেষ্টায় নামলেন শাস্ত্রবিদ ও সমাজপতিরা। রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, রামনাথ প্রমুখ অনেকেই ভাঙনের পথ বন্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু বঞ্চিত মানুষ মুক্তির আশ্বাস এবং সামাজিক সাম্যের প্রসাদ ও বৃত্তি পরিবর্তনের ভাগ্যগড়ার পথের সন্ধান যখন একবার পেয়েছে, তখন দেব-দ্বিজের দোহাই সে মানবে কেন? তারা চোখের সামনে দেখতে পেল, শুনতেও পেল আজকের বাজারে কেনা মানুষ—মামলুক [ক্রীতদাস] কাল জামাতা এবং পরশু সুলতান. এ যে শুধু দিল্লীতেই ঘটছিল তা নয় নবাগত প্রায় যে-কোন তুর্কীর জীবনে তারা এ বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষ করল। ক্রীতদাস মানস ও কায়িক যোগ্যতা বলে সর্দার-সওদাগর-রাজপুরুষ হচ্ছে, গুণে-মানে মাহাত্ম্যে সে কারো চাইতে খাটো থাকছে না। সেদিনকার বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত অস্পৃশ্য ও দরিদ্র সমাজে স্বভাগ্য গড়াব এমনি সুযোগ ছিল হাতে চাঁদ পাওয়ারই নামান্তর। কারণ কামার-কুমার তাঁতী-মুচি-নাপিত ধোপা-জেলের ধনী হবার কোন উপায় ছিল না সমাজে। তারা বুঝল উচ্চবিত্তের অভিজাতরা দেব-দ্বিজ বেদের নামে তাদের ঠকিয়েছে চিরকাল। এবার জন্মসূত্রে নয়, কর্মসূত্রেই জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত।

ফলে রঘুনন্দনদের স্মৃতি—শাসন পাশে বাঁধা গেল না নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষকে। এমনি অবস্থায় উত্তরভারতীয় আদলে হিন্দুর সমাজরক্ষায় এগিয়ে এলেন চৈতন্যদেব। সেদিনকার হিন্দু সমাজে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা উনিশ শতকের রামমোহনের মতো। রামমোহনও চেয়েছিলেন নতুন পরিবেশে হিন্দুর শাস্ত্রকে ও সমাজকে মেরামতের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে খ্রীস্টধর্মের প্রসার ঠেকাতে এবং প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সনাতন সমাজবঞ্চিত মানুষদের সমাজেই ঠাঁই করে দিতে। রামমোহন তাঁর প্রয়াসে সফল হয়েছিলেন, তাই কোলকাতা খ্রীস্টানবহুল মাদ্রাজ কিংবা সিংহল হলো না। চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনও সার্থক হয়েছিল, ইসলামের প্রসার বাঙলাদেশে রুদ্ধ হয়েছিল, যেমনটি হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরভারতে। ব্রাহ্মণ্যসমাজের এসব ধর্মান্দোলনে স্বরূপত গীতা-স্মৃতি সংহিতাশাসিত ধর্ম অস্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু যেহেতু সন্তরা সব হিন্দু সমাজেরই ছিলেন, তাই বাহ্যত এক প্রকারের জ্ঞাতিত্ব রয়ে গেল, যার ফলে তারা হিন্দু জাতি—এ সাধারণ সত্তায় ও সংজ্ঞায় তাদের ধর্মীয় ও রাজনীতিক সংহতি রক্ষিত হল। রাজনীতি ক্ষেত্রে এ অভিন্ন সত্তাবোধ তাদের পক্ষে একালে সুফলপ্রসূ হয়েছে।

১৪. চৈতন্যদেবের জীবনকথা

আমরা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই চৈতন্যদেবকে একজন চিন্তানায়ক, সমাজনেতা, শাস্ত্র-সংস্কারক ও যুগপুরুষ রূপে দেখব। অর্থাৎ আমরা বৈষ্ণবসুলভ বিশ্বাসবশে তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে বিচার করবো না, তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও যুগদুর্লভ চিন্তা-চেতনার মূল্যায়নই আমাদের লক্ষ্য। অবশ্য বৈষ্ণবেরা জানে ও মানে যে চৈতন্য স্বদেহে রাধার ভাবকান্তি এবং আত্মায় কৃষ্ণের অংশ ধারণ করে রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে মানবজন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ—তিনি ছিলেন নররূপে নারায়ণ। একাধারে জীবাত্মা-পরমাত্মা। তাই বৈষ্ণব জীবনীকারেরা নন্দদুলাল কৃষ্ণের আদলে তাঁর অবতারসুলভ অলৌকিক জীবনকথা রচনা করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে মানুষ চৈতন্যদেব অবশ্যই একাধারে যুগন্ধর ও যুগস্রষ্টা।

সেদিন বিদেশী বিধর্মীর ধর্ম ও সংস্কৃতির মোকাবেলায় হিন্দুসমাজে বিচলন ও দ্রোহ দেখা দিয়েছিল, যার প্রতিরোধ নানা উপায় গ্রহণেও সম্ভব হয়নি। জৈন-বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের এই অনার্য-অধ্যুষিত দেশে চৈতন্যদেব ইসলামী সাম্য ও সূফী প্রেমবাদভিত্তিক যে প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, তাতেই তিনি বলতে গেলে স্বকালেই আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করলেন। অসামান্য আত্মপ্রত্যয়, উদারতা, মননশীলতা এবং যুগসমস্যার মূল কারণোপলব্ধির মতো প্রজ্ঞা, সংস্কারমুক্তি আর গণশ্রদ্ধা

আকৃষ্ট করবার মতো চরিত্রগুণ ও ব্যক্তিত্ব না থাকলে এ কখনো সম্ভব হত না। আমরা ঐ সব চরিত্রগ্রন্থ থেকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণে ও পরোক্ষ-অনুমানে রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ চৈতন্যদেবের জীবনের ও কৃতির রূপরেখা আবিষ্কারের চেষ্টা করবো। এর বেশি কিছুতে আমাদের এক্ষেত্রে প্রয়োজনও নেই।

জীবনে সমাজে ধর্মে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সাধারণ মানুষ দুনিয়ার সর্বত্র একইভাবে চিন্তা করে। দেশে রাজনৈতিক, আর্থিক কিংবা নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে নির্জিত দরিদ্র ও নীতিশিথিল জাতি মনে করে, ধর্মভাবহীনতাই বুঝি দুর্দিন-দুর্ভোগের পরাভব-পরাধীনতার মূল কারণ। তাই দেশপ্রাণ ও সমাজহিতৈষী সাধারণ নেতারা জনমনে ধর্মভাব ও শাস্ত্রানুগত্য জাগানোর চেষ্টা করেন। সেন্ট অগাস্টিন, মার্টিন লুথার থেকে উনিশ শতকের বাঙলার ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী, ওহাবী, ফরায়েজী আন্দোলনে, কিংবা হালীতে ইকবালে তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। চৈতন্যের জন্মের পূর্বে ও চৈতন্যের বাল্যকালে বাঙলাদেশেও হিন্দুর শাস্ত্র সংস্কার করে হিন্দুর মনে শাস্ত্রানুরাগ জাগিয়ে মানুষকে শাস্ত্রানুগত করে তাদের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও শাস্ত্রিক দুর্গতি ঘুচানোর চেষ্টা হয়েছিল রঘুনন্দন প্রমুখ শাস্ত্রবিদের ও সমাজ-সর্দারের নেতৃত্বে। তখন হিন্দুর মনোবল বৃদ্ধির জন্যে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণ্যশক্তি তুর্কীদের তাড়িয়ে স্বাধীন গৌড়রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা হবে হেন আছে।'—এ কথা জ্যোতিষ গণনায় প্রাপ্ত তথ্য হিসেবে প্রচারিত হল হিন্দুসমাজে। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) এ রটনাকে গুরুত্ব দিয়ে হিন্দুর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে সতর্ক থাকতেন। 'পিরল্যাগ্রামেতে বৈসে যতেক যবন'—তারা সুলতানকে জানাল, 'গৌড়ে বিপ্ররাজা হবে হেন আছে'। কাজেই নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হৈব পাছে।' যখন 'নিকটে [এই] যবন রাজা বড়ই দুর্বার' তখন নদীয়ায় চৈতন্য আন্দোলনের শুরু। 'নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিলা।' 'আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়'। 'প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী'। তবে দ্বন্দ্বটা নিবন্ধ ছিল শাসক যবনে ও সমাজ সর্দার ব্রাহ্মণে, 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে'।

মিথিলায় তুর্কী সুলতানদের প্রভাবের দরুন ঐনবার বংশীয় রাজাদের পতনের ফলে হিন্দুর সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র বাঙলার উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মধ্যস্থলে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। চৈতন্যের আবির্ভাবের কালে নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদ্যা ও শাস্ত্র চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাই নানা অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণেরা এখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে। বৃন্দাবন দাসের মতে নদীয়ায় তখন প্রায় ঘরে ঘরে টোল এবং সেখানে পড়ুয়ার অন্ত নেই। নবদ্বীপে এলে লোকে যথার্থ বিদ্যারস পায়। অতএব তখন নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতির, সংস্কৃতভাষার ও সাহিত্যের চর্চার এবং রক্ষার কেন্দ্র আর ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রবিদের ও সমাজপতির নিবাস। এ কারণে শ্রীহট্ট থেকেও নীলাম্বর চক্রবর্তী, জগন্নাথ মিশ্র, চন্দ্রশেখর, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি এসে নবদ্বীপে বাস করছিলেন।

বাঙলাদেশে দুইবার একদেহে অসামান্য রূপগুণের সমাবেশ হয়েছিল। একবার চৈতন্যদেহে, অন্যবার রবীন্দ্র-শরীরে। 'এক অঙ্গে অত রূপ [এবং গুণও] নয়নে না হেরি'। বিমুগ্ধ দীনেশচন্দ্র সেন চৈতন্যকে প্রমূর্ত প্রেমরূপে বর্ণনা করেছিলেন–'প্রেম একবার মাত্র এই পৃথিবীতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বুঝেছিলেন 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরিছে কায়া'। একথাগুলো নিতান্ত আবেগসর্বস্ব নয়।

মিশ্র বাচির একঘর ব্রাহ্মণ উড়িষ্যার জাজপুরে বাস করত। 'চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল জাজপুরে। শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল রাজা ভ্রমরের ডরে'। আবার শ্রীহট্টের জয়পুর গাঁ থেকে জগন্নাথ মিশ্র সম্ভবত প্রতিবেশী নীলাম্বর চক্রবর্তীর প্রবর্তনায় তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করতে আসেন। নদীয়ায় জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিয়ে করেন।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন তারিখে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণের সময়ে [১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে] চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। ব্রজমোহন দাস তাঁর চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ

গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মক্ষণ এভাবে দিয়েছেন ঃ 'শাকে চৌদ্দশত আর সপ্তবৎসব। বিষ্ণু বিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর। ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা বিষুতজান। ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান'। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। নামকরণ হয় ১৪০৭ শকের ১২ই চৈত্র [১৪৮৬ সনেব ৯ই মার্চ] বিশ্বম্ভর নাম হইল বিংশতি দিবসে' [জয়ানন্দ]। উপনয়ন হয় ১৪১৬ শকে [১৪৯৪ খ্রীঃ]।

সপ্ত বৎসরে তার কর্ণভেদ কৈল

নবম বৎসরে তার যজ্ঞ উপবীত দিল [চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ ও লোচন দাস]।

প্রথম সন্তান বিশ্বরূপের জন্মের পরে পর পর ছয়টি নব জাতকের মৃত্যুর পরে হওয়ায় কুসংস্কার বশে চৈতন্যের নাম রাখা হয় নিমাই। ছয়পুত্র 'ছলিয়াছে নড়ছ্যাদে দেখিয়া। পিতামাতা থুইল নাম নিমাই বলিয়া' [ব্রজমোহন দাস]।—যাতে নিম তিতো বলে অথবা মাতৃহীন বলে যমের অরুচি অথবা করুণা হয়। হিন্দুদের এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি নামও সন্তান বাঁচানোর জন্যে জন্ম মুহূর্তে কড়ি নিয়ে বিক্রয় করা জ্ঞাপক। নিমাই-র পোষাকী নাম রাখা হয়েছিল বিশ্বম্ভর। গৌরবর্ণ ছিলেন বলে প্রতিবেশীরা শৈশবে-বাল্যে তাঁকে গোরা, গোরাচাঁদ বা গৌবাঙ্গ বলেও ডাকতো।

শ্রীহট্টের লাউড অঞ্চলেই ছিল অদ্বৈত আচার্যের পূর্বনিবাস। তিনি ছিলেন শচীদেবীর গুরু ও প্রতিবেশী। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর সঙ্গে মিশ্র পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। অদ্বৈতাচার্যের কাছে বাল্যে ও কৈশোরে শিক্ষালাভ করে বিশ্বরূপ যৌবনের প্রারম্ভে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাই পিতামাতা অতি স্নেহবশে নিমাইকে প্রশ্রয় দিতেন। হয়তো তাই বাল্যে-কৈশোবে নিমাই প্রাণবন্ত ও দুরন্ত ছিলেন। নইলে পাঁচশ' বছর আগের কিশোর 'ভাব' করে [হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা গেলা ঘর] সুন্দরী মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করার জন্যে মা-বাপের কাছে নিঃসংকোচে আবদার করতে পারতেন না। বিয়ের সময়ে [১৫০১-০২ খ্রীঃ] নিমাইয়ের বয়স পনেরো ষোলর বেশি ছিল না। ষোড়শ বৎসর প্রভুর যৌবন' [বৃন্দাবনদাস]। তবু লেখা-পড়ায় তাঁর অবহেলা ছিল না, যথাসময়ে এই মেধাবী বুদ্ধিমান কিশোর ব্যাকরণে ও অলঙ্কার বিষয়ে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত হলেন। বায়ুরোগ বশে তিনি কিছুদিন অপ্রকৃতস্থ বা পাগলপ্রায়ও ছিলেন। পিতৃবিয়োগের ফলে হয়তো আর্থিক অসাচ্ছল্য দেখা দেয়। তাই তিনি রওয়ানা [আঃ ১৫০৬ খ্রীঃ] হলেন শ্রীহট্টে পিতৃ পুরুষের সম্পত্তির সন্ধানে। নদীয়া থেকে শ্রীহট্টে যাতায়াতে তাঁর দু'বছর লেগেছিল। তরুণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত পথে পথে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হয়তো আপন বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিচ্ছিলেন আর সে সঙ্গে উপার্জন করছিলেন। সে যুগে সাধারণের জন্যে ডাক ব্যবস্থা ছিল না; কাজেই বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন তাঁর প্রেমের ও প্রাণের লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটেছে। যে নারী ছিল তাঁর জীবনচেতনার উৎস, যাকে ঘিরে তিনি রচনা করেছিলেন জীবন-স্বপ্ন, যে ছিল তাঁর সকল উদ্যমের ও কর্মপ্রেরণার আকর, তার বিয়োগে সংসারযাত্রা নিরর্থক হয়ে গেল।[১] মিথ্যে হয়ে গেল জীবন-যৌবন, ধন-মান-যশ। স্বপ্ন ভঙ্গে মন হল তাঁর বিবাগী। প্রেমপ্রতিমার বিকল্প হয় না। তাই আত্মীয়-স্বজন জোর করে তাঁকে পুনর্বিয়েতে প্রবর্তনা দিলেও [আঃ ১৫০৮ খ্রীঃ] দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া তার ভাঙামন জোড়া দিতে পারলেন না, ধরে রাখতে পারলেন না তাঁকে সংসারজীবনে। যে তরুণ পণ্ডিত ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধি প্রসূত আত্মপ্রত্যয় বশে বয়োধর্মের প্রভাবে উদ্ধত, আত্মম্ভর, যশলিপ্সু, দাম্ভিক, বিদ্যাগর্বী, পবিহাসরসিক প্রেয়সী স্ত্রীর বিয়োগে তাঁর মনে, মেজাজে ও আচরণে এল অভাবিত পরিবর্তন। বুকের জ্বালা ও মনের অশান্তি দূর করার জন্যে তিনি ধর্মভাবে আত্মনিমগ্ন হবার বাসনায় দীক্ষা নিলেন [১৫০৮ খ্রীঃ], তীর্থ পর্যটনে গেলেন। তাঁর প্রথম দীক্ষাগুরু হলেন পুরী-শাখার কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী। তখনো জীবিকা অর্জনের জন্যে মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে টোল চালান বটে [১৫০৯ খ্রীঃ অবধি], কিন্তু মন তাঁর তখন রাধাকৃষ্ণের অনুধ্যানে আচ্ছন্ন। শ্রীরাম পণ্ডিতের বাড়িতে মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে অবসর সময়ে কৃষ্ণভক্তি উদ্দীপক গানের আসর করেন। ক্রমে তাঁর সঙ্গীসহচরের সংখ্যা বাড়ল। হরিদাস, নিত্যানন্দ, স্বরূপ রামানন্দ এমনকি মাতামহের বয়সী অদ্বৈতাচার্যও জুটলেন তাঁর সঙ্গে।

---

১. *লক্ষ্মীর অপঘাত মৃত্যুই চৈতন্যদেবের সংসারে বৈবাগ্যের অন্যতম কারণ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং পৃঃ ১৭২ পাদটীকা।*

এসময়েই তিনি কৃষ্ণভক্তি উদ্দীপক সঙ্গীত শুনতেন। ১. চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়েব নাটক গীতি / ২. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ / এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ [চৈতন্যচরিতামৃত]। ৩. বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ / ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ (চৈ-চরিতামৃত)। ক্রমে দল বিপুল হল। এবার শুরু হল পথে পথে কীর্তন-নর্তন। রুখে দাঁড়াল সনাতনীরা, তাঁদের বিরুদ্ধে রটানো হল নানা কুৎসা।

এগুলো সকলে মধুমতি সিদ্ধি জানে
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
খাইয়া তা' সবা সনে বিবিধ রমণ।

সনাতনীদের পক্ষ হয়ে জগাই-মাধাই দুই উচ্ছৃঙ্খল যুবক ভাই পথে কীর্তন কালে নিত্যানন্দকে প্রহার করে। এসময়ে সনাতনীরা প্রতিবেশীর শান্তি-স্বস্তি বিনষ্টকারী এবং নিত্যধর্মদ্রোহী ভ্রষ্টচরিত্র মাতাল বলে চৈতন্যদলের বিরুদ্ধে নবদ্বীপস্থ আম্বরামুলুকের কাজীর কাছে নালিশ করে। কাজী একদিন পথ-কীর্তন কালে সিপাহি পাঠিয়ে ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং নগরকীর্তন নিষিদ্ধ হল। চৈতন্যদেব শুনে রাত্রির প্রথম প্রহরে দলবল নিয়ে নগরকীর্তনে বের হলেন এবং ঘেরাও করলেন কাজীর বাড়ি। এর মধ্যে অনন্যতা আছে। মধ্যযুগের বিক্ষুব্ধ নিরস্ত্র নাগরিকের রাজশক্তির বিরুদ্ধে সম্ভবত এটিই প্রথম প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ও প্রকাশ্য প্রতিশোধ প্রয়াস। অসহায় কাজী স্তোকবাক্যে চৈতন্যকে শান্ত করে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু এই অশুভ শক্তির প্রবলতা ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে গৌড়ে খবর পাঠালেন। এতকাল সুলতান সনাতনী হিন্দুর দ্রোহের আশঙ্কায় ছিলেন, এখন তাদের মধ্যে শাস্ত্রীয় মতভেদ দেখা দিয়েছে দেখে ঐ বিরোধ গাঢ় ও বিভেদ ত্বরান্বিত করার জন্যেই শাস্তির বদলে চৈতন্যদলের প্রতি আনুকূল্য করবার নির্দেশ দিলেন কাজীর প্রতি। কাজীও কাবু হয়েছে দেখে চৈতন্যদলে আরো লোক জুটে গেল। অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নদীয়ার গৃহাঙ্গন ও নগরপথ হরিসংকীর্তনে আর নর্তনে মুখরিত ও কম্পিত হয়ে উঠল। হোসেন শাহ দেখলেন এখন এই নতুন দল অধিকতর প্রবল, এবং অধিকতর সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ। বিপদ যদি আসে তবে এবার চৈতন্যদল থেকেই আসবে, তাই তিনিও সতর্ক হয়ে রইলেন। এ খবর নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের কাছে পৌঁছেছিল। বিশেষ করে কেশব ছত্রী, রূপ, সনাতন, অনুপম তখন দরবারে প্রবল। এমনি সময়ে একদিন নিমাই তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা নিলেন, সে দিন ছিল ২৯শে মাঘ ১৪০১ শক বা ১৫১০ সনের ২৬শে জানুয়ারি ঃ

ততঃশুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রযাতি মকবাম্মনীষী [মুরারি গুপ্ত]

মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে সেই বেলে।

সন্ন্যাসে দীক্ষা নেয়ার পর তাঁর ভাবোন্মাদনা বেড়ে গেল। বৈষ্ণব কবির মানসচক্ষে তখন তাঁর অবস্থা ঃ

বিমল হেম জিনি　　　　তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম
কদম্বকেশর জিনি　　　　একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম,
চলিতে না পারে　　　　গোরাচাঁদ গোঁসাই রে
বলিতে না পারে আধ বোল
ভাবে অবশ হইয়া　　　　হরি হর বোলা ইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল।

পদকারদের মধ্যে বসু রামানন্দ, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, বংশী বদন, পরমানন্দ গুপ্ত, গৌরী দাস, রামচন্দ্র, নয়নানন্দ, নরহরি সরকার, অনন্ত আচার্য, কানুদাস, চন্দ্রশেখর, পরমেশ্বর দাস, কৃষ্ণদাস ও চৈতন্য দাস, শঙ্কর ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব

দত্ত, রামদাস, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, দেবকী নন্দন, অনন্ত দাস প্রভৃতি গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষ দর্শী ছিলেন এঁদের কেউ সহচর কেউবা পরিকর। এর কিছুকাল পরেই [১৫১০-৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঃ ১৪৩১ শকের ৯ই ফাল্গুন] হয়তো রূপ-সনাতন বা অন্য কারুর ইঙ্গিতে গৌড়রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যাব হিন্দুরাজ্যে আশ্রিত হয়ে সম্ভাব্য রাজরোষ এড়ালেন চৈতন্যদেব। অল্পদিনেব মধ্যেই উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র, পুরীপ্রবাসী নদীয়ার পণ্ডিত সার্বভোম ভট্টাচার্য ও রাজগুরু কাশীমিশ্র তাঁর ভক্ত হওয়ায় তাঁর গুণ-মান-মাহাত্ম্য বাঙলায় উড়িষ্যায় দ্রুত প্রচারিত হল। বাঙলাদেশ থেকে গিয়ে জুটলেন ভক্ত গদাধর, হরিদাস ও স্বরূপ দামোদর।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে [১৪৩২ শকে] এপ্রিল থেকে ১৫১২ সনের মে অবধি বছরাধিক কালের জন্যে দক্ষিণভারত পর্যটনে বের হয়ে চৈতন্যদেব সুরাট অবধি পরিভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণকালেই রামানন্দ রায়, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি তাঁর ভক্ত হয়ে পুরী নীলাচলে তাঁর সহচর হয়ে থাকলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কৃষ্ণভক্ত আলোয়ার বা আড়বার সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং বিল্বমঙ্গলরচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

১৪৩৬ শকে [১৫১৪ খ্রীঃ] চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন গমনের পথে নদীয়া শান্তিপুরে এসে মাতা ও অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রূপ সনাতনও এসময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। কোন কারণে বাঙলাদেশ হয়ে তাঁর বৃন্দাবন যাওয়া হল না। পুরীতে ফিরে গিয়ে কয়েকমাস পরে ১৪৩৬ শকে [১৫১৪ খ্রীঃ] তিনি উড়িষ্যার ও ছোটনাগপুরের অরণ্যপথে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করলেন এবং ফেরার পথে ১৫১৬ সনে [১৪৩৭ শকে, ফাল্গুনে] ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় নদীয়ায় আসেন। ঐ সনেই নীলাচলে ফিরে এক বছরকাল একটানা সেখানে বাস করেন। কাশীতে-প্রয়াগে তপন মিশ্র, বৈদ্য চন্দ্রশেখর, কীর্তনীয়া পরমানন্দ, রূপ ও সনাতন এবং তাঁদের ভাই বল্লভ [অনুপম-জীব গোস্বামীর পিতা] প্রমুখ তাঁর নাম ও প্রভাব বিস্তারে সহায়ক ছিলেন। বাঙলাদেশে তাঁর হয়ে তাঁর প্রেমধর্ম প্রচার করেন অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি। এঁরা বছরে একবার পুরী-নীলাচলে গিয়ে তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসতেন। পুরীর জগন্নাথের রথের দিনে কীর্তন-নর্তন সময়ে তাঁর বাম পায়ে ইটের কণা বিদ্ধ হয়, পরে তা বিষাক্ত ক্ষতে পরিণত হয় এবং ১৫৩৩ সনের ২৯শে জুন, [৩১শে আষাঢ়] বেলা তৃতীয় প্রহরে এক রবিবারে তাঁর তিরোধান ঘটে। এ সময়ে তাঁর মাতা শচী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিতা ছিলেন। তখন তাঁর বয়স কিঞ্চিন্ন্যুন ৪৮ বছর। ক. 'আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিন' [লোচন দাস], 'আষাঢ় সপ্তমী শুক্লা অঙ্গীকার করি' [জয়ানন্দ] গ. চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্ন হৈল অন্তর্ধান [কৃষ্ণদাস কবিরাজ]। চৈতন্যদেব জীবনের শেষ বারো বছর প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকতেন।

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ। (চৈ. চ)

প্রথম জীবনেও তাঁর একবার কিছুকালের জন্যে এরূপ অবস্থা হয়েছিল। বৈষ্ণবেরা একে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলে।

১৫. চৈতন্যবাণী

চৈতন্যদেব কোন গ্রন্থ রচনা করেননি কিংবা ভক্তদের জন্যে কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রও তৈরি করেননি। বৈষ্ণব শাস্ত্র, আচার ও চর্যা গড়ে উঠেছে ষড়গোস্বামীর হাতে, [রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট]। 'শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।' [চৈতন্যচরিতামৃত]। চৈতন্য মুখনিঃসৃত উক্তি ও বাণী হিসেবে নিম্নলিখিত বাঙলা ও সংস্কৃত কথাগুলো বহুল প্রচলিত ঃ

১. কৃষ্ণবিহীন কেবল 'রাধা' নাম উচ্চারণের বিরুদ্ধে তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত রূপক ছড়া—

করিনু পিপ্‌পলী খণ্ড কফ নিবারিতে
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।

২. আটটি শ্লোকে তিনি শিষ্যদের তত্ত্ব, ধ্যান, স্তুতি ও চর্যা জানিয়ে দিতেন। শ্লোকগুলো 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত ঃ

১. সংকীর্তন মাহাত্ম্য ঃ

চেতোর্দর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণমৃতাস্বাদনং
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনং।।

২. নামে রুচি ঃ

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত ঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি-
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।

৩. বিনয়, সহিষ্ণুতা ঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোবির সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

৪. ভক্তি ঃ

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

৫. কৃষ্ণ-শবণ ঃ

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত–ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।।

৬. নামকীর্তন ঃ

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।

৭. কৃষ্ণবিরহবোধ ঃ

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে।।

৮. প্রেমৈক নিষ্ঠা ঃ

অশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনার্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।

১৬. চৈতন্যদেবের অবদান

চৈতন্যদেবের বড় অবদান হচ্ছে সূফীমতের প্রভাবে ভক্তিধর্মকে প্রেমধর্মে উন্নীত করা। চৈতন্যের প্রেমচর্যার সাধন-ভজনের বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না, অনন্যচিত্তে রাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ ও রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ সাধন-ভজন 'কলিযুগই ধর্ম হয় হরি সংকীর্তন'। তাই গানেই চলত সাধন-ভজন—'নামলীলাগুণাদীনামুচৈর্চভাষা তু কীর্তনম' [রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু]। কিঞ্চিন্ন্যুন পাঁচশ বছর আগে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্য সর্বসংস্কার ও গীতা-স্মৃতির সর্বপ্রকার শাসনমুক্ত হতে পেরেছিলেন। আজো আমরা যা পারিনে সেই সংস্কারান্ধ তামসযুগেই তিনি শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা বিধবা নারায়ণীর অবৈধ সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার এবং নারায়ণীর সম্মানিত সামাজিক স্থিতির অধিকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। আবার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবলে গণমনে ব্যক্তির গুণ-মান-মাহাত্ম্য কত প্রবল ও গভীর হলে এমন দেশ-কাল শাস্ত্রবিরোধী পাঁতি জনগণ

প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে তাও এসূত্রে স্মর্তব্য। নারায়ণী হলেন বৈষ্ণবের মাতা, তাঁর সন্তান বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণবদের ব্যাস। জৈন-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশে সুপ্ত সাম্যচেতনা ও মানব মর্যাদাবোধ ইসলামের স্পর্শে চৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে নবরূপে পুনর্জাগ্রত হলো। বাঙালী নতুন করে উপলব্ধি করল 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। চৈতন্য প্রভাবে বর্ণাশ্রিত হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের মানুষ—যারা শূদ্রাদি অস্পৃশ্য মানুষকে গৃহপোষ্য পশুর বেশি মর্যাদা দিত না,—কুলগৌরব, আভিজাত্যবোধ, বর্ণগর্ব, বিদ্যাভিমান, সংস্কৃতিচেতনা ও কুলবাচি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিহার করে ভক্ত মানুষের ভিড়ে মিশে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হলো ধন্য ও কৃতার্থ। বাঙলাদেশে চর্যা হিসেবে বৈষ্ণব মত তেমন গৃহীত হয়নি, কিন্তু চৈতন্যের 'নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্মদর্শন' ধর্মভেদ নির্বিশেষে সবাইকে প্রভাবিত করেছিল। তাই গোটা ষোল শতক ধরে বাঙালী চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের প্রভাবে বিনয়াচরণে, অহিংসায় ও রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীতে অভিভূত ছিল। প্রায় আড়াইশ' তিনশ' বছর ধরে অবৈষ্ণব সমাজেও সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও সংবেদন ক্ষেত্রে 'কানু ছাড়া গীত' এবং 'রাধা ছাড়া সাধা' ছিল না। হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে জীবাত্মা-পরমাত্মারূপী রাধাকৃষ্ণ লীলা না হোক কাম-প্রেমের অনুভব ও প্রকাশ কালা-কানু-রাধা-রাই ব্যতীত সম্ভব হয়নি। অবৈষ্ণব হিন্দু ও মুসলিম রচিত পদসাহিত্য তার সাক্ষ্য। ঈর্ষা-অসূয়া-ক্রুরতা-সংকীর্ণতাদুষ্ট বাঙালী চৈতন্য প্রভাবে মানবতার সুউচ্চ স্তরে উন্নীত হল। কিছুকালের জন্যে সুমধুর হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বার্থবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখল। স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা-সন্তানে, প্রতিবেশী-পরিচিত জনের সর্বত্রই পারস্পরিক বন্ধন হচ্ছে কেবল প্রীতির। এই প্রীতিই ঈশ্বর। এক কথায় বাঙালী পরোক্ষ নব জীবনচেতনা ও উদার জগৎ ভাবনা লাভ করল চৈতন্যপ্রসাদে। তাই ষোলশতক সর্বার্থেই অবিশেষ বাঙালী জীবনে রেনেসাঁসের যুগ। বস্তুত বাঙালীর মনে-মননে, সমাজে, ধর্মমতে উদার মানবিকবোধজাত প্রীতিসুন্দর বিনয়মধুর বাসন্তী হাওয়ার স্পর্শ লাগল, যার ফলে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সোনার ফসল ফলেছিল। চৈতন্য ধর্মান্দোলন সেদিন বাঙালীর মনুষ্যত্ব বিকাশের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, যদিও বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জীবনে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবীয় বৈরাগ্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাংসারিক দায়িত্বে কর্তব্যে-কর্মে অনীহা, তজ্জাত ভিক্ষাবৃত্তির মহিমান্বিত প্রসার, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার নামে বল-বীর্যে ঘৃণা, ব্যবহারিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও ধনসম্পদের গুরুত্বহ্রাস প্রভৃতি এ প্রেমবাদের মুখ্য কুফল। অবশ্য দেশকালের পরিবেষ্টনী ও সমস্যার কথা অনুধাবন করলে বলতেই হবে সেদিন হিন্দুসমাজের বিপন্ন অস্তিত্ব চৈতন্যদেবের অসামান্য দূরদৃষ্টির ফলে ও ব্যক্তিত্বগুণে নিরাপদ হয়েছিল। তাঁর মতবাদে হিন্দুর শাস্ত্র জখম হল বটে, কিন্তু হিন্দুর জাতীয় সত্তা রক্ষা পেল।

১৭. ষড় গোস্বামী ও চৈতন্য পার্ষদ-পরিকর পরিচিতি

ক. ষড় গোস্বামী ঃ বলেছি চৈতন্যদেব কোন বিধিবদ্ধ শাস্ত্র রেখে যাননি শিষ্যদের জন্যে। তাঁর উচ্চারিত বাণীর মধ্যে কেবল শিক্ষাষ্টকই পাই। চরিতকারগণ যেসব তত্ত্ব ও তথ্য তার মুখে উচ্চারিত বলে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো প্রমাণসিদ্ধ নয়। গল্প নাটকের মতো লেখকের উদ্দিস্ট লক্ষ্যে রচিত মাত্র। কিন্তু চৈতন্য তিরোধানের পর এই গৌড়ীয় নববৈষ্ণবদের চর্যার ও আচার-আচরণ বিধির প্রয়োজন হল। বিধি নিষেধের শাস্ত্র যেমন আবশ্যিক, তেমনি বিশ্বাস ও মতকে অবিকৃত রাখার জন্যে উপলব্ধ তত্ত্বের ও গৃহীত তথ্যের একটা দার্শনিক যৌক্তিক ভিত্তিরও ছিল প্রয়োজন। খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো একাজ যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করলেন তাঁরাই বৈষ্ণবসমাজে 'ষড় গোস্বামী' নামে স্মরণীয় ও পূজনীয়। এই ছয়জন শাস্ত্রকার ও দার্শনিকদের তিনজনই একপরিবারের—রূপ ও সনাতন দু ভাই ও তাঁদের অপর ভ্রাতা অনুপমের [বল্লভ] পুত্র জীব। অন্য তিনজন হলেন গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁর নির্দেশে রূপ ও সনাতন চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় নববৈষ্ণবমতবাদ প্রচারের জন্যে এবং বৈষ্ণবতীর্থরূপে বৃন্দাবনকে গড়ে তুলতে বৃন্দাবনে বাস করতে থাকেন।

চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গজন অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, রামানন্দ, তপনমিশ্র প্রভৃতি চৈতন্যদেবের জীবৎকালে চৈতন্যের হয়ে নবমত প্রচার ও ব্যাখ্যা করেছেন, সেসব সূত্র ধরে ষড় গোস্বামী চৈতন্যপ্রচারিত প্রেমবাদকে একটি শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ভিত্তি দান করেন। 'ছয় গোসাঞি' কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' সূত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।

এর পূর্ববর্তী চৈতন্যচরিত গ্রন্থে একত্রে ছয় জনের নামও মেলে না। ষড় গোস্বামী বৃন্দাবনেই বাস করতেন।

খ. সনাতন গোস্বামী ঃ সনাতন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর আত্ম পরিচিতি সূত্রে জানা যায়, তাঁরা কর্ণাটী ব্রাহ্মণ এবং জমিদারবংশীয় ছিলেন। তাঁদের বংশপীঠিকা নিম্নরূপ ঃ

জগদ্‌গুরু— অনিরুদ্ধ—রূপেশ্বর—পদ্মনাভ—মুকুন্দ—কুমারদেব

জ্যেষ্ঠ | মেঝো | সনাতন | রূপ | অনুপম | [জীব গোস্বামী]

এঁরা প্রথমে নৈহাটিতে (নবহট্টে) পরে চন্দ্রদ্বীপে (বাকলায়-বরিশালে) এবং চৈতন্য অনুচর হবার প্রাক্কালে যশোহরে নিবাস স্থাপন করেন। সনাতন, রূপ, অনুপম এবং তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা [নাম অজ্ঞাত] হোসেন শাহ্‌র উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। রূপ ছিলেন দবিরখাস [একান্ত সচিব-খাসমুন্সী]। সনাতন ছিলেন সাকর মল্লিক, অনুপম বা বল্লভ ছিলেন টাঁকশালের অধ্যক্ষ। এঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক ছিলেন, প্রজাপীড়ন ও অর্থআত্মসাতের দায়ে হোসেন শাহ তাঁকে পদচ্যুত করেন। সম্ভবত সেখানে তিনি বিদ্রোহী হিসেবে বাস করেন ঃ

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-১৯)

সনাতন চৈতন্যভক্ত হওয়ার পর রাজকার্যে অবহেলা দেখান, উড়িষ্যা অভিযানে সুলতানের সঙ্গী হতেও অস্বীকার করেন, দরবারেও অনুপস্থিত থাকেন চৈতন্যদেবকে দেশত্যাগ করে উড়িষায় যাবার পরামর্শ কেশব ছত্রীর মতো বোধ হয় সনাতনও দিয়েছিলেন। বিশেষত রামকেলীতে রূপ ও সনাতন গোপনে ছদ্মবেশে রাত্রে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে চৈতন্যচরিতে উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা চাকরী ছাড়ার পূর্বেই অর্থ-সম্পত্তিরও বিলি ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই আত্মরক্ষার্থে কিংবা চৈতন্যধর্মের নিরাপত্তার জন্যে তাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন। যে কারণেই হোক, বিরক্ত হয়ে ও সনাতনের উপর আস্থা হারিয়ে হোসেন শাহ্ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে বশ করে তিনি পালিয়ে গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। ইতিপূর্বে রূপ ও অনুপম যশোরে পরিবার-পরিজনদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখলেন। সনাতন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁদের নিবাস ছিল গৌড়ের রামকেলী গ্রামে। ব্রজমোহন দাস তাঁর চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে বলেছেন যে,

১. দবির খাসেরে প্রভু পরিচয় দিলা...
রূপ সনাতন নাম থুইল দোহার।
ভক্তি গ্রন্থ দোহে বহু করিল প্রচার।

২. দবীরখাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে
দবীরখাসে ঘুচাইলা সংসার বন্ধন।
দুই ভাইর নাম হইল রূপ-সনাতন। [জয়ানন্দ, পৃঃ ২৩২]

জীব গোস্বামীর তালিকানুসারে সনাতন রচিত গ্রন্থ চারটি ঃ

ক. বৃহৎ ভাগবতামৃত–নববৈষ্ণবধর্মের পটভূমিকারূপে এ কাব্য রচিত। গ্রন্থে পুরাণের রীতি ও আদর্শ অনুসৃত হয়েছে।

খ. বৈষ্ণবতোষিণী [বা দশম টিপ্পনী]—ভাগবতেব দশম স্কন্ধের টীকা। ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত। চৈতন্যদেব এই গ্রন্থে অবতার রূপে বন্দিত—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবং।

প্রেম ভক্তি বিতানার্থং গৌড়দেশেষ্ববতার যঃ।

গ. হরিভক্তি বিলাস–[গোপাল ভট্টের নামে চলে] 'হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত। 'দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত। এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি।' সনাতন' [চৈ. চ] 'লীলাস্তব দশমচরিত যারে কয়' (ভক্তিরত্নাকর)।

ঘ. লীলাস্তব বা দশমচরিত (অপ্রাপ্ত)। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে সনাতনের জন্ম। এবং ১৫৬২ সনের শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন গমনের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গ. রূপ গোস্বামী—সনাতন, রূপ ও অনুপম সম্পত্তি সুরক্ষিত বা হস্তান্তর করেন এবং অর্থ নিয়ে রূপ-অনুপম প্রয়াগে পালিয়ে গেলেন। কারারক্ষীকে ঘুষে বশ করে সনাতনকে মুক্ত করার জন্য রেখে গেলেন দশ হাজার টাকা। রূপও বিদ্বান এবং কবি-নাট্যকার ছিলেন। তিনি বহুগ্রন্থ প্রণেতা ঃ

১. কাব্য ঃ হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, স্তবমালা, উৎকলিকাবল্লী, ছন্দোহষ্টাদশকম, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর প্রভৃতি এবং ৪১টি গীতাবলীও রয়েছে যা কেউ কেউ এগুলো সনাতন রচিত বলেও মনে করেন যথা—

ক. শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী [গোপীকান্ত দাস, পদকর্তা]

খ. গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলী। [গৌরসুন্দর দাস]

২. নাটক ঃ বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, দানকেলীকৌমুদী।

৩. রসতত্ত্ব, দর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্র—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি।

৪. কাব্য সংকলন ঃ পদ্যাবলী, মথুরামহিমা।

৫. নাট্যতত্ত্ব ঃ নাটকচন্দ্রিকা।

৬. ধর্মতত্ত্ব ঃ সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত।

৭. লঘুবৈষ্ণবতোষিণী।

এগুলো ছাড়াও রাধা-কৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা, অষ্টকালিকা, শ্লোকাবলী, গোবিন্দ বিরুদাবলী প্রভৃতি আরো কয়েকখানি পুস্তক তাঁর রচিত বলে কথিত। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৫৬২ সনের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর গ্রন্থাবলী বৈষ্ণবসমাজে গুরুত্বসহকারে আজো পঠিত হয়। বিশেষ করে তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদায় ও গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত রূপ ও জীব গোস্বামীই বৈষ্ণবদের মূল ধারার শাস্ত্রকার, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক।

ঘ. জীব গোস্বামী—সনাতনের ভাই অনুপম গৌড় সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। পালিয়ে প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র জীব অল্পবয়সেই বিয়ের আয়োজন হচ্ছে দেখেই নাকি গৃহত্যাগ করে চৈতন্যভক্ত হন। জীব গোস্বামী তাঁর পিতৃব্যদের চাইতেও প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁর রচনাই বলতে গেলে বৈষ্ণবদের শাস্ত্রীয় দর্শন দৃঢ়ভিত্তিক করে এবং পরিবারের এই তিনজনের গ্রন্থাবলীই বৈষ্ণবদের মূলশাখার বন্ধন অটুট রাখে। নইলে মতবৈষম্য বৈষ্ণব সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করে দিত। এতেও ভাঙন পুরো রোধ করা যায়নি। চৈতন্যতিরোভাবের অল্পকাল পরেই খড়দহে, শ্রীখণ্ডে ও নবদ্বীপে তিনটে গুরুসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কাশীতে জীব তাঁর শিক্ষাগুরু মধুসূদন বাচস্পতির কাছে ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদান্ত পাঠ করে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনিও বৃন্দাবনেই বাস

করতেন। তবে বাঙলাদেশে তাঁদের গ্রন্থ প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন তিনি। সে সূত্রে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক ঃ

১. কাব্য ঃ গোপালচম্পু [১৫৯২ খ্রীঃ] সঙ্কল্পকল্পদ্রুম মাধবমহোৎসব [সপ্ত সপ্তমণোশাকে–১৪৫৫ খ্রীঃ রচিত], গোপাল বিরুদাবলী [অপ্রাপ্ত]।

২. ব্যাকরণ, রসতত্ত্ব ও অলঙ্কার ঃ হরিণামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা [অপ্রাপ্ত], রসামৃতশেষ, দুর্গমসঙ্গমণি, লোচনরোচনী, ধাতুসংগ্রহ, ভাবার্থসূচক চম্পু।

৩. স্মৃতি, তত্ত্ব ও দর্শন ঃ কৃষ্ণার্চাদীপিকা, [অপ্রাপ্ত], গোপালতাপনী, ব্রহ্মসংহিতা, ক্রমসন্দর্ভ, লঘুতোষিণী, ভাগবতসন্দর্ভ, ষটসন্দর্ভ, সর্বসংবাদিনী।

৪. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর, উজ্জ্বলনীলমণির, যোগসারস্তবের, অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীর ভাষ্য, এবং পদ্মপুরাণের রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির টীকাও তিনি রচনা করেন।

ঙ. রঘুনাথ ভট্ট—ইনি চৈতন্যদেবের প্রথম শিষ্য। পূর্ববঙ্গীয় তপন মিশ্রের পুত্র। তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীবাসী হয়েছিলেন। রঘুনাথ বাল্যকালে চৈতন্যদেবকে তাঁদের বাড়িতেই দেখেছিলেন। কথিত আছে যে তিনি মুঘল সেনাপতি-সুবাদার অম্বররাজ মানসিংহের গুরু ছিলেন। যৌবনে তিনি নীলাচলে আটমাস করে দুইবার চৈতন্য সান্নিধ্যে ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের খাদ্য রান্না করতেন [রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ–চৈ. চ]। ভাগবত আবৃত্তিতে ও কীর্তনগানে তিনি পটু ছিলেন।

চ. রঘুনাথ দাস—ইনি সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র। গৌতম বুদ্ধের মতোই ঐশ্বর্য আর রূপসী স্ত্রীর আকর্ষণও তাঁকে গৃহবন্দী করতে পারেনি। কিশোর বয়সেই তিনি চৈতন্যদেবকে দেখবার জন্যে [১৫৪১ সনের দিকে] শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে গিয়েছিলেন। তখনই সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে চৈতন্যদেব তাঁকে নিরস্ত করেন ঃ

"স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল।"

তবু তিনি ছিলেন গৃহী-বৈরাগী। নিত্যানন্দের নির্দেশে তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে বৈষ্ণবদের দই-চিড়ে ভোজন করাতেন। নিত্যানন্দের পরিহাসের ভাষায় এ ছিল ভক্ত 'রঘুনাথের অর্থদণ্ড'। এই 'লঙ্গরখানা' 'ভাতারা' নামে ছিল পরিচিত এবং এ ভোজন-উৎসবের নাম হল 'দণ্ডোৎসব'। অবশেষে পালিয়ে গিয়ে তিনি নীলাচলে চৈতন্য সান্নিধ্যে রইলেন এবং স্বরূপ দামোদরের কাছে বৈষ্ণবতত্ত্ব অধ্যয়ন করলেন। চৈতন্যতিরোধানের পরে তিনি বৃন্দাবনেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ভোগবিমুখ নিষ্ঠ সাধক ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন তাঁর ভক্ত সেবক। তিনি অনেক স্তব [প্রায় ২৮/২৯টি] রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

১. স্তবমালা ঃ বিলাপকুসুমাঞ্জলি, প্রেম পরাবিধ স্তোত্র প্রভৃতি।

২. কাব্য ঃ মুক্তাচরিত্র, দানকেলিচিন্তামণি।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়।।
শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর।। [ভক্তিরত্নাকর]

ছ. গোপাল ভট্ট—গোপাল ভট্টের মুখ্য কাজ ছিল দীক্ষাকামীদের দীক্ষা দান ও বৈষ্ণবাচারে উপদেশ দান। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষাগুরু। তিনি গোস্বামীদের মধ্যে স্বল্প পরিচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে মনোহর দাসের অনুবাগবল্লীতে ও প্রেমবিলাসে তাঁর সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবাচার ব্রতাদির স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস বা ভগবদ্‌ভক্তিবিলাস [মতান্তরে সনাতন রচিত] তাঁব রচিত গ্রন্থ বলেই সাধাবণভাবে স্বীকৃত।

মঙ্গলাচরণ শ্লোক ঃ ভক্তে বিলাসাশ্চিন্ধতে প্রবোধা /নন্দস্যশিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাসং সন্তোষয়নরূপ–সনাতনোচ [চৈ. চ. উপাদানের পৃঃ ১৬৭]। গোপালভট্ট দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গমবাসী ত্রিমল্লভট্টের পুত্র। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে চৈতন্যদেব বর্ষাকালে চার মাস যাবৎ ত্রিমল্লভট্টের গৃহে নাকি অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন।

ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস
তাহাঞি রহিল প্রভু বর্ষা চারিমাস [চৈ-চরিতামৃত]

যত মন তত মত। কাজেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই বৈষ্ণবসমাজে মত ও পথভেদ দেখা দেয়—এ মতপার্থক্য পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিচিত ঃ ১. চৈতন্যপন্থ, ২. নিত্যানন্দপন্থ, ৩. অদ্বৈতপন্থ, ৪. শ্রীবাসপন্থ, ও ৫. গদাধরপন্থ। এঁদের মত পার্থক্য তেমন প্রকট ছিল না। পরে গৌড়সম্প্রদায় [নবদ্বীপকেন্দ্রী] ও বৃন্দাবনসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাত তত্ত্বেও সাধনপন্থায় পার্থক্য প্রকট হতে থাকে। তার পরে আবার নদীয়া [শান্তিপুরে] খড়দহ ও শ্রীখণ্ড—এ তিন কেন্দ্রানুগত বৈষ্ণবদের মধ্যেও মতান্তর দেখা দেয়। নদীয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য ও তাঁর পত্নী সীতাদেবী, খড়দহে নিত্যানন্দ ও তাঁর পত্নী জাহ্নবা দেবী, পুত্র বীরভদ্র, এবং শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ও মুকুন্দ দাস নেতৃত্বদান করেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ কেউ চৈতন্যদেবকে বিষ্ণু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মূর্তিপূজারও আগ্রহ জেগেছিল। যাঁরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে প্রমূর্ত প্রেম-ভক্তিরূপ চৈতন্যদেবের ভজনাই কর্তব্য বলে মনে করেন, তাঁরাই গৌরপারম্যবাদী, [চৈতন্যদেবেই প্রমূর্ত Ultimate Reality-এ তত্ত্বেও ও সত্যে বিশ্বাসী নামে খ্যাত]। কাঁচড়াপাড়ার পদকার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার এ মতের প্রবক্তা ও প্রবর্তক। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রণেতা প্রবোধানন্দ সরস্বতীও এ মতবাদী ছিলেন। চৈতন্যদেবকে এঁরা পরম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে 'গোপাল মন্ত্রের' পরিবর্তে এঁরা 'গৌরমন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করতেন। এঁরা চৈতন্যদেবকেও গোপীবল্লভ কৃষ্ণরূপে কল্পনা করে নিজেদের গোপীভাবে ভাবিত করবার সাধনপন্থা বরণ করেছিলেন। এই নবগোপীভাবের উদ্দীপন মানসেই তাঁরা চৈতন্যদেবকে 'গৌরনাগর' হিসেবে কল্পনা করেন। এই তত্ত্বের নাম 'গৌরনাগরবাদ'। মনে হয় পরবর্তীকালে বীরভদ্র-জাহ্নবা শিষ্যদের মধ্যে সহজিয়াতত্ত্বের দ্রুত প্রসারে এই গৌরপারম্যবাদ বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

৩. খ. চৈতন্যদেবের প্রধান সহচর ও পরিকর

বলেছি বিদেশী-বিধর্মীর বিজয়ে বিচলিত ও নবপরিচিত শাস্ত্রের, সমাজের ও সংস্কৃতির অভিঘাতে চঞ্চল ভারতে আটশতকে শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে ঔপনিষদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবলতার ও সমাজের পুনর্জাগরণের শুরু। তারপর ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ, রামানন্দ, কবীর, নানক, রামদাস, দাদু প্রভৃতি বহু সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী জ্ঞান ও কর্মমার্গ পরিহার করে ভক্তিমার্গের সাধনা জনপ্রিয় করে তোলেন। ফলে গীতা-স্মৃতি-সংহিতা ও বেদান্তধর্ম উচ্চবর্ণের, বৃত্তির ও বিত্তের সমাজে নিবদ্ধ হয়ে রইল। মুমুক্ষু অস্পৃশ্য ঘৃণ্য বৃত্তিজীবী নির্জিত মানুষ এবং অধ্যাত্মতত্ত্বরসিক বিরাগী মানুষ ভক্তিপন্থ গ্রহণ করে জীবনে সমাজে এবং অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় স্বস্তি পেল।

আট শতকের পরে ব্রাহ্মণ্যসমাজে 'সন্ন্যাস' জনপ্রিয় সাধনপন্থা হয়ে ওঠে। জৈন-বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ্যবাদীর পক্ষে এ মূলত জৈন-বৌদ্ধ-শ্রমণ-ভিক্ষু-সিদ্ধার ঐতিহ্যানুসরণ মাত্র। ক্রমে হিন্দু সমাজে গুরুবাদী বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যেমন পুরী, গিরি, অরণ্য, তীর্থ, ভারতী, আনন্দ, সরস্বতী, যতি, আশ্রম, অবধূত প্রভৃতি গুরুকেন্দ্রী সম্প্রদায় বা শাখা গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

চৈতন্যের আবির্ভাবপূর্ব কাল থেকেই বাঙলাদেশেও ভক্তিবাদী সন্ন্যাসদের প্রভাব প্রবল হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে মাধবেন্দ্রপুরীর ও ঈশ্বরপুরীর নদীয়াঞ্চলে শিষ্য ও অনুরাগীর সংখ্যা নগণ্য ছিল না। বিশেষত মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেমধর্মের আদি প্রচারক বলে বৈষ্ণবেরা মান্য করে এবং রাধাকৃষ্ণ লীলার অনুধ্যানী বলে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, বিষ্ণু,

কেশব, কৃষ্ণানন্দ, সুখানন্দ, রঙ্গ, রামচন্দ্র প্রভৃতি পুরীকে, কেশব, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভারতীকে, নৃসিংহ তীর্থকে এবং অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণভক্ত পূর্বসূরী ও সাধকরূপে বৈষ্ণবেরা স্মরণ করে। বলা বাহুল্য চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীর শিষ্য ছিলেন। ব্রজমোহন দাস তাঁর 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' ভক্তিবৃক্ষের 'নব' মূল এর সন্ধান দিয়েছেন ঃ

ভক্তিকল্পবীজ প্রভু আরোপিলা
প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবপুরী হৈলা।
ঈশ্বরপুরী সে অঙ্কুর পুষ্ট কৈল ;
পরমান্দপুরী আর কেশবভারতী
ব্রহ্মানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী কৃষ্ণানন্দপুরী
নৃসিংহতীর্থ আর সুখানন্দপুরী।
এই নবভক্তি বৃক্ষমূলরূপ
পরমানন্দপুরী মধ্যজড়ের স্বরূপ।
আপনেই মহাপ্রভু হৈলা আদিস্কন্ধ
দুইদিকে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।

অতএব উক্ত নয়জনেরই প্রয়াসে-প্রচারে চৈতন্যবাদ প্রসার লাভ করে।

মনে হয় রাধাকৃষ্ণের লীলানুধ্যান ও কীর্তন তাঁদের সাধন-ভজনের অঙ্গ ছিল। কারণ নদীয়াশান্তিপুরে চৈতন্যেরও আগে উৎসব-পার্বণে হরিসংকীর্তন করা হত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও হরিনাম সংকীর্তনের উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার সন্ন্যাসীরাও কীর্তনগান করত, সহজযানী বৌদ্ধদের মধ্যেও কীর্তনগান চালু ছিল। চৈতন্যদেব তিন প্রকারের কীর্তন প্রবর্তন করেন—লীলাকীর্তন, গুণকীর্তন ও নামকীর্তন। চৈতন্য প্রভাবিত হবার আগেই মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য, চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, নিত্যানন্দ ও ঈশ্বরপুরী নদীয়া-বর্ধমান অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের লীলানুগ ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, দেখতে পাই। কৃষ্ণভক্তিকে কৃষ্ণপ্রেমে [ভক্তিকে প্রেমে এবং ভক্তকে প্রেমিকে] উন্নীত করাই চৈতন্যদেবের নবঅবদান। বস্তুত কোন ভাব-চিন্তা অনুভবই দেশকাল-পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়। আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি কোন চিন্তা-চেতনাই নিরবলম্ব ও আকস্মিক হতে পারে না, ঘরে-সমাজে-পরিবেশেই জীবন-জীবিকার অবচেতন প্রয়োজন-প্রেরণা থেকেই চিন্তা-চেতনার বীজ উপ্ত হয়। আত্মপ্রত্যয়ী, সচেতন ও বুদ্ধিমানের মনে চিন্তা-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ও বৃক্ষরূপে ঋদ্ধ ও পল্লবিত হয়ে মানুষকে সমাজকে ফুল ফল ও ছায়াদানে সার্থক হয়, মানুষের শাস্ত্র-সভ্যতা সংস্কৃতি ও মানবতা এভাবেই হয় বিকশিত। অতএব, চৈতন্যদেবও তাঁর নবমত প্রচারে অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। কর্ষিত ভুঁইয়ে যেমন বীজ নির্বিঘ্নে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয় চৈতন্য মতবাদও তেমনি উচ্চারণ মুহূর্তেই গ্রহণ করবার মতো কিছু মন আগে থেকেই তৈরি ছিল—ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের এ সূত্রে স্মরণ করতে হয় ঃ

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়
পূর্বেই জন্মিলা সবে ঈশ্বর আজ্ঞায়।
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ .....
ভক্তি রসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার। [চৈতন্যভাগবত]

অদ্বৈতাচার্য—অদ্বৈতাচার্যের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ বা কমলাকর। শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে ছিল তাঁদের নিবাস। অদ্বৈতাচার্য বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীহট্ট থেকে এসে তিনি শান্তিপুরে বাস করেন। অদ্বৈত ছিলেন গৃহী বৈষ্ণব এবং পেশায় টোলের পণ্ডিত। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং চৈতন্যের পূর্বেই বৈষ্ণবভক্তিবাদে দীক্ষিত। অতএব অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণব অগ্রগণ্য [চৈতন্যভাগবত] ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশে', হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা

সূত্রমে, লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্রে' বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্বে' অদ্বৈত ও তাঁর পত্নী সীতা-দেবীর জীবনকাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এসব গ্রন্থের অকৃত্রিমতা বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করেন না।

অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী ছিলেন। চৈতন্যতিরোভাবের পরেও তিনি প্রায় ১৭/১৮ বছর জীবিত ছিলেন। বাঙলাদেশে চৈতন্যের অনুপস্থিতে চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ। অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবকে নারায়ণের অবতার বলে পূজাও করেছিলেন, চৈতন্যদেব তা পছন্দ করেন নি। অদ্বৈত ও সীতাদেবী নদীয়া শান্তিপুরে আমরণ নেতৃত্বদান করেন। পরে তাঁদের সন্তানেরাও গুরু হন এবং অদ্বৈতপন্থী শাখার বিস্তার হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের কাছে প্রেরিত তাঁর রচিত একটি তর্জা উদ্ধৃত রয়েছে ঃ

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।

১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে যখন যান, তখন অদ্বৈতপুত্র প্রখ্যাত বৈষ্ণব অচ্যুতানন্দের [জন্ম ১৫০৯ খ্রীঃ] বয়স ছিল পাঁচ বছর—'পঞ্চ বর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর' [চৈঃ ভাঃ]। ব্রজমোহন দাস চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে অদ্বৈতের জন্মের স্থান ও মাস উল্লেখ করেছেন—'জন্মিলা অদ্বৈত গোসাই শান্তিপুরতে। দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসেতে।।'

হরিদাস—যশোহর জেলার বুঢ়ণ পরগনার ভাটকলাগাছি গ্রামে ছিল হরিদাসের নিবাস। তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী। চৈতন্যের মৃত্যুর কয়েকমাস [১৫৩৩ সনের ৯ই মার্চ] আগে নীলাচলে তিনি দেহত্যাগ করেন, চৈতন্যদেব স্বয়ং তাকে সমুদ্র সৈকতে সমাধিস্থ করেন। জয়ানন্দের মতে ইনি হিন্দু সন্তান পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় মুসলিম ঘরে লালিত। তাঁর পিতামাতার নাম মনোহর ও উজ্জ্বলা। বৃন্দাবন দাসের মতে যখন হরিদাস 'হরিনাম' উচ্চারণের জন্যে অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের অপরাধে স্থানীয় প্রশাসক কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর উচ্ছিষ্ট খেয়ে বৈষ্ণবসমাজে তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি 'হরিদাস ঠাকুর' রূপে পরিচিত হন।

নিত্যানন্দ—নিত্যানন্দ 'মাঘে শুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিসুত বারে [মঙ্গলবারে চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ'] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ভক্তরা বলরামের অবতার মনে করত 'ভক্ত স্বরূপা নিতানন্দ ব্রজে যঃ হলায়ূদ [গৌরগণোদ্দেশদীপিকা] নিত্যানন্দের বাল্যনাম ছিল কুবের – "মা বাপে থুইলা নাম কুবের পণ্ডিত" [লোচনদাস] নিত্যানন্দ চৈতন্যদেব থেকে তেরো বছরের বড় ছিলেন। অতএব ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি মাসে তাঁর জন্ম। বীরভূম জেলার একচাকা বা একচক্র গাঁয়ে ছিল তাঁর নিবাস। মাতার নাম পদ্মাবতী পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ওর্ফে মুকুন্দ পণ্ডিত—তিনি ছিলেন তৈর্থিক সন্ন্যাসী। 'অষ্টাদশ বৎসরে ছাড়িল গৃহবাস' [জয়ানন্দ]। অতএব ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে দুটো স্ত্রী গ্রহণ করে তিনি গৃহী হন। তাঁর স্ত্রীদের নাম বসুধা ও জাহ্নবা বা জাহ্নবী। এঁরা সূর্য সারখেলের কন্যা। এই জাহ্নবা ও পুত্র বীরভদ্র [বসুধার পুত্র, জয়ানন্দ] সহজিয়া বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক প্রচারক হিসেবে প্রখ্যাত হয়েছেন। ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষায় 'নিত্যানন্দ ছিলেন বেশে অবধূত, আকারে মহামল্ল, ভোজনে-পানে নির্বিকার, মেজাজে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট।' বাঙলাদেশে নিত্যানন্দই চৈতন্য প্রতিনিধি হিসেবে অদ্বৈতাচার্যের সহযোগিতায় চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন। চৈতন্যদেবকে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-অবতার রূপে স্বীকার করে তাঁর মূর্তি পূজারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং তিনি বৈষ্ণব-আচার বিরোধী 'সোনা রূপা মুক্তা পট্টবাস, চন্দ্রমালা ধারণ করতেন' [চৈঃ ভাঃ]। এজন্যে বোধ হয় কোন কোন বৈষ্ণব নিত্যানন্দবিরোধী ছিলেন। কীর্তনের আসরে কেউ কেউ 'নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায়'। খড়দহে তাঁর মতবাদ তাঁর স্ত্রী জাহ্নবা ও পুত্র বীরভদ্রের হাতে আরো বিকৃত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ভিন্ন মতের বৈষ্ণবশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য। কবি

জয়ানন্দ বীরভদ্রের এবং কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বপ্নে নিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন বলে স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নিত্যানন্দের মৃত্যু তিথি ঃ আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি। [জয়ানন্দ]। বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী অনুসারে ১৫৪২ সনের উক্ত তিথিতে ঘটে তাঁর মৃত্যু। নিত্যানন্দ উড়িষ্যারাজ প্রত্যাপরুদ্রের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি 'নানা ধন দিয়া নিত্যানন্দে কৈল পূজা' [জয়ানন্দ, পৃঃ ২১৭]। নিত্যানন্দ উদার অবধূত ছিলেন—জাতিভেদ না করিমু ব্রাহ্মণে চণ্ডালে' [জয়ানন্দ, পৃঃ ২৩৫]।

নরহরি সরকার—কবি লোচনদাসের গুরু, পদকর্তা গৌরনাগরবাদের প্রবর্তক নরহরি সরকার। তিনি ও তাঁর ভাই মুকুন্দ দাস এবং মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন কাটোয়ার নিকটে শ্রীখণ্ডী [শ্রীবৈদ্য খণ্ড] সম্প্রদায় বা গৌরনাগরবাদী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। কীর্তনে-সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ও উৎকর্ষ তাদের হাতেই হয়। কেউ কেউ তাঁদেরও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভবের জন্যে দায়ী করেন, কেননা—তাঁরা আদিরসাত্মক নাগরীভাবের সাধক ছিলেন। রঘুনন্দন পরে শ্রীখণ্ডকেন্দ্রী শিষ্য সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করেন।

বাসুদেব সার্বভৌম—নীলাচলে প্রথমাবধি চৈতন্যদেবের সহচর। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য রূপেই পরিচিত ছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম সহস্রনাম শ্লোকে চৈতন্যচরিতও রচনা করেছিলেন বলে জয়ানন্দ উল্লেখ করেছেন ঃ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ব্যাস অবতার
চৈতন্য চরিত্র আগে করিল প্রচার।
চৈতন্যসহস্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে
সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে।

চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী সার্বভৌমের পিতা নরহরি [বা মহেশ্বর] বিশারদের সহপাঠী ছিলেন—

সার্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি।
মিশ্রপুরন্দর [জগন্নাথ মিশ্র] তার মান্য হেন জানি
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি।

অতএব বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য চৈতন্যদেবের বিশ-পঁচিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সার্বভৌম সম্ভবত নীলাচলে গিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত কিংবা পুরোহিত হয়েছিলেন। ন্যায়ে ও বেদান্তে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলে খ্যাত ছিলেন। সম্ভবত রঘুনাথ শিরোমণির ও সনাতন গোস্বামীর শিক্ষাগুরু ছিলেন এই সার্বভৌম।

স্বরূপ দামোদর—বৃন্দাবন দাসের মতে স্বরূপ দামোদরের অন্য নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। নদীয়াপ্রবাসী চট্টগ্রামের জমিদার ভক্তবৈষ্ণব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বন্ধু ছিলেন ইনি। ইনিও চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। স্বরূপ দামোদর চৈতন্যচরিতসূত্র [কড়চা] রচনা করেছিলেন বলে নানাগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে এবং এই রচনার সাহায্যও নেয়া হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃতে ও কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরেও দামোদরের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু মূল কড়চা আজো অপ্রাপ্ত। স্বরূপ দামোদর নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী ও কীর্তনে-নর্তনে সহযোগী ছিলেন। তিনি চৈতন্যলীলার অন্যতম তত্ত্বজ্ঞ ঃ

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার।
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত [চৈঃ চরিতামৃত]
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর

সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর। [ঐ]
আদিলীলা-সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্য শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদরে
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর। [চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ]

রায় রামানন্দ—ইনি পদকার এবং নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী ও চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমতত্ত্বের ভাষ্যকার। চৈতন্যচরিতামৃতে এর মুখেই চৈতন্যপ্রশ্নের উত্তরে চরমতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। রামানন্দ শাস্ত্রসম্মত ভক্তিধর্ম ও সাধ্যবস্তু ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু সেসব ব্যাখ্যা চৈতন্যদেবের মনঃপূত হয়নি। রামানন্দ যতরকম ব্যাখ্যাভাষ্য দিচ্ছিলেন, চৈতন্যদেব বার বার 'এহো বাহ্য আগে কহো আর' বলে তা প্রত্যাখ্যান করছিলেন। অবশেষে রামানন্দ বলেন—'কান্তভাব প্রেমসাধ্য সার'। তখন চৈতন্যদেব তা' অনুমোদন করলেন—'প্রভু কহে এই সাধ্যবিধি সুনিশ্চয়।' রায় রামানন্দের পদেই এ তত্ত্ব রয়েছে 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল....এবং ন সো রমণ, ন হাম রমণী'—একে মঞ্জুরী ভাব বা গোপীভাব বা সখীভাব বলে। এর অন্য নাম 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা'। আবার চৈতন্য স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার। চৈতন্যকে রায় [রামানন্দ] কহে—

রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
[তুল ঃ 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার
আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে'।

গদাধর পণ্ডিত— ইনি নদীয়ার মাধবমিশ্রের পুত্র এবং চৈতন্যের বাল্যবন্ধু ও অকৃত্রিম ভক্ত। গদাধর পণ্ডিত কবি জয়ানন্দের গুরু। ইনি নীলাচলে চৈতন্যসান্নিধ্যে তাঁর সহচর রূপে ছিলেন। অন্যমতে পিতাপুত্রের পূর্বনিবাস ছিল চট্টগ্রামে। [চৈ. চঃ উপাদান, পৃঃ ৫৭৩]

৪. চরিতকথার স্বরূপ

এক হিসেবে জীবনচরিতে ও কাব্য উপন্যাসে পার্থক্য সামান্য। রক্তমাংসের বাস্তব মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সারা জীবনের ভাব-চিন্তার, আচার-আচরণের কর্মের এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনার ও দেশ-কাল-মানুষের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থকে আমরা জীবনীগ্রন্থ বা চরিতকথা বলে থাকি। কৃতী ও কীর্তিমান মানুষ, ধনী-মানী কিংবা রাজা-বাদশাহ্ অথবা সাধু-সন্ত, ফকির-সন্ন্যাসী প্রভৃতি লোকশ্রুত, লোকবন্দ্য, লোকনিন্দ্য মানুষেরই জীবনী রচিত হয়। এঁদের ব্যক্তিত্ব গুণ, মান, মাহাত্ম্য, প্রভাব-প্রতাপ, দর্প-দাপট, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, কৃতি-কীর্তি অন্য মানুষের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগায়। এগুলো লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করে—সৎ ও মহৎ স্বভাবে ও কর্মে অনুপ্রাণিত করা কিংবা অসৎ-অপকর্মে নিবৃত্তি দান করা প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যেই জীবনবৃত্তান্ত রচিত হতে পারে।

কাব্য কিংবা উপন্যাসও মানুষের মনে শ্রেয়োবোধ জাগানো ও সমাজহিতৈষণা লক্ষ্যে দেশ-কাল-মানুষের শাস্ত্রিক-নৈতিক-সামাজিক-আর্থিক-শৈক্ষিক-রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার, মননের ও প্রজ্ঞালব্ধ চেতনার ও ভাবনার অনির্দেশ্য নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শায়িত আলেখ্য—এ জীবনায়নে যা' আছে, তার চিত্র যেমন মেলে, যা' হওয়া উচিত তারও নকশা তেমনি দেয়া থাকে।

কাব্যে-উপন্যাসে মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, চিন্তা ও চেতনা, ঘটনা ও আচরণ, লেখকের অভিপ্রায়ের অনুগত। বাস্তব মানুষের ক্ষেত্রে লেখক দর্শক ও ভাষ্যকার মাত্র—দুটোতে পার্থক্য এটুকুই। এ টীকা-ভাষ্য দানের অধিকার রয়েছে বলেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ভক্ত বা নিন্দক তিলকে তাল করার এবং তালকে তিল করার এবং ঘটনা ও আচরণবাদ দেয়ার ও বানানোর স্বাধীনতাই সাধারণত প্রয়োগ করেন। ফলে অপরের জীবনচরিত কিংবা আত্মকথা, স্মৃতিকথা সবটাই কাব্য-

উপন্যাসের গা ঘেঁষে চলে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের অবাধ অধিকারও তাই পাঠকের থেকে যায়। এ ত্রুটি থেকে বিবরণকে মুক্ত রাখা কিংবা এ মানস প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকা লেখকের পক্ষে অসম্ভব। মানুষের মন হচ্ছে জট-পাকানো সূতোর মতো, আর মানুষের বুদ্ধি হচ্ছে সীমিত। তাই মানুষ মাত্রেই এক একটি অনন্ত রহস্যের আধার। কাজেই পরের কিংবা নিজের মনের গতি-প্রকৃতি স্বরূপে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য—আগে থেকে আঁচ করা তো অসম্ভব বটেই। কাজেই মানুষের কর্মের ও আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অতি বড় প্রতিভারও সামর্থ্যাতীত। যে অদৃশ্য কাণ্ডার মনের, কর্মের ও আচরণের অধিকর্তা, সে তো চির অচেনা ও অধরা। অতএব অভিপ্রায়ের স্বরূপ ও যথার্থ কারণ জানার উপায় নেই বলেই কর্মের ও আচরণের নির্ভুল ও অভিন্নার্থক তাৎপর্য নিরূপণ মানুষের সাধ্যাতীত।

চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চরিতগ্রন্থ আলোচনার উপক্রম হিসেবেই কথাগুলো বলতে হল। কারণ চৈতন্যচরিতই পাঁচশ বছর আগে চোখে দেখা রক্তমাংসের বাঙালী মানুষের প্রথম সংস্কৃত-বাঙলা জীবনীগ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁকে ভক্তরা মানুষরূপে প্রত্যক্ষ করেন নি, করেছেন নররূপী নারায়ণ হিসেবে। ফলে তাঁর ও পার্ষদ-পরিকরের জীবনীগ্রন্থগুলোও হয়েছে দেব-অবতারের মঙ্গলপাঁচালী। আচারে-আচরণে, চিন্তায়-চেতনায়, কর্মে-শক্তিতে, ঐশ্বর্যে-অলৌকিকতায় এঁরা প্রমূর্ত দেবতা। চৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত-সীতা-জাহ্নবা-বীরভদ্র প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, শিব প্রমুখের অবতার। কাজেই চৈতন্য ও চৈতন্যপার্ষদদের জীবনীগ্রন্থগুলো কালান্তরে ও রূপান্তরে এবং নামান্তরে নব মহাভারত, নব ভাগবত ও নব দেবপাঁচালী। অতএব গ্রন্থের নায়করা নামে মাত্র মানুষ। এগুলি দেব মঙ্গলের অনুসৃতি মাত্র এবং উনিশ শতকের আগে আমাদের ভাষায় আধুনিক সংজ্ঞায় জীবনচরিত রচিত হয়নি। তবু জলে যে যতটুকু নামে, সে ততটুকু ভিজে। কৃষ্ণলীলার আদলে নরনারায়ণের জীবনলীলা বর্ণনা করতে গিয়েও লেখকরা দেশ-কাল-পরিবেশ এড়াতে পারেননি। তাই নানা প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে বাস্তব গাঁ, গঞ্জ, নগর, গিরি, নদী, কান্তার, ব্যক্তি, সমাজ, শাস্ত্র, শাসক, প্রশাসক এবং নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকথা ও ঘটনা। দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর ভারতের বৃন্দাবন অবধি গোটা এলাকার নানা সাময়িক সংবাদ নানা সূত্রে রয়েছে বর্ণিত। সেগুলো ষোল শতকের শাস্ত্রিক-সামাজিক-ভৌগোলিক, সাম্প্রদায়িক, প্রশাসনিক, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানের সংবাদ চিত্র বহন করছে। চরিতাখ্যানগুলোর সর্বাধিক গুরুত্ব এখানেই।

৫. চৈতন্য চরিতগ্রন্থ

ক. সংস্কৃত ভাষায়

১. মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্

১৬২০ খ্রীস্টাব্দে রচিত ব্রজমোহন দাসের চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় মুরারি গুপ্তের কড়চাই চৈতন্যদেবের আদি চরিতগ্রন্থ এবং চৈতন্যদেবের জীবৎকালে শ্লোকে সূত্রাকারে রচিত। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যজীবনের আদিকাণ্ড তথা সন্ন্যাসজীবন অবধি [গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত] বর্ণনা করেছিলেন। কাজেই তাঁর নামে প্রচলিত গ্রন্থের মধ্য ও শেষ লীলা অপব কারো যোজনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্ট ভাষায় এ তথ্যের সমর্থন মেলে ঃ

"আদি লীলা মধ্য যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্য শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদব
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।"

স্বরূপ দামোদরের চৈতন্যচরিতসূত্র পাওয়া যায় না। মুরারি গুপ্তের কড়চায় বর্ণিত মধ্য ও শেষ লীলা হয়তো স্বরূপ দামোদরেরই রচনা। দামোদরের ভণিতা বাদ দিয়ে পরবর্তী কেউ মুরারি গুপ্তের নামে চালিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যপারম্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা ও প্রবর্তক, 'দশাক্ষর গোপাল' মন্ত্রের পরিবর্তে গৌরমন্ত্রে দীক্ষাও দিতেন তিনি। কাজেই তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর রচনার গুরুত্ব অপরিমেয়। তাছাড়া এখনকার মুদ্রিত গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তরে রচিত, বক্তা মুরারি এবং শ্রোতা দামোদর। তাতেও মনে হয় দামোদরের রচিত চরিতসূত্রও মুরারির নামে চলে। তাছাড়া গ্রন্থে রয়েছে ভক্ত হিসেবে মুরারির নাম, তার প্রশস্তি ও নিত্যানন্দ প্রশস্তি। মুরারির যখন নিত্যানন্দের মতো, নিজেরই একটা মতাদর্শ ছিল তখন একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা কম থাকারই কথা। নিজেকে 'বৈদ্যসিংহ' বলে উল্লেখ, আর গ্রন্থের বিন্যাসে বিপর্যয় অন্যের হস্তাবলেপের প্রমাণ। বিশেষ করে কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন আদি লীলার পরে যখন আর মুরারি গুপ্তের অনুসরণ করেননি, তখন এ তথ্যকেও প্রমাণক হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরো বলেছেন ঃ

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
মুখ্য মুখ্য সূত্র লিখিয়াছে বিচারি।
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ
বিস্তারি বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন দাসই কবিরাজের মুখ্য অবলম্বন ছিল। একারণেই হয়তো কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে মুরারি গুপ্তের কিংবা দামোদরের শ্লোক বেশি উদ্ধৃত হয়নি। যদিও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থকে কড়চা [জীবনচরিত অর্থে] বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্তের গ্রন্থনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম'। সে যুগে বোধ হয় সাধারণ অর্থে বাস্তব ঘটনা বা কর্ম বা আচরণের বিবরণ বা বৃত্তান্তকে 'কড়চা' বলা হত। 'কড়চা' ডক্টর সুকুমার সেনের মতে সংস্কৃত কৃতকৃত্য-এর অপভ্রংশ। তাই যদি হয়, তা হলে জীবনকাহিনীর যথার্থ পরিভাষা কড়চাই। এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজও সে-অর্থেই ব্যবহার করেছেন—'আর আর কড়চা-কর্তা রহে দূর দেশে'। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী ও ভক্তবন্ধু ছিলেন। রামভক্ত মুরারি গুপ্ত চৈতন্যকে রাম বা কৃষ্ণ স্বরূপ দেখতেন। তাই পুরীতে সঙ্গীদের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করেও তিনি ফিরে গিয়ে প্রথমে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৃন্দাবন দাস, ব্রজমোহন দাস, নরহরি চক্রবর্তী, লোচন দাস, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন প্রমুখও মুরারি গুপ্তের কড়চা ব্যবহার করেছেন।

বৃন্দাবন দাসের কিংবা লোচন দাসের সময়েই মুরারি গুপ্তের ও দামোদরের রচনা অভিন্ন সত্তা লাভ করে। তাই লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে ও কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা 'শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতে'র বহুল ও প্রায় আক্ষরিক অনুসৃতি মেলে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিশ্চয়ই বিশ্বস্তজনদের মুখে শুনেছিলেন কিংবা লিখিত রচনায় পড়েছিলেন যে মুরারি গুপ্ত আদি লীলা এবং স্বরূপ দামোদর মধ্য ও শেষ লীলা বর্ণনা করেছিলেন। কাজেই আমরা মনে করি কড়চার সংশোধিত রচনা কালটি—

'চতুর্দশশতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে
আষাঢ় সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাংগতঃ।'

অতএব ১৪৩৫ শকাব্দের আষাঢ়ের শুক্ল সপ্তম তারিখে গ্রন্থ সমাপ্ত হয় [১৫১৩ খ্রীঃ]। কড়চা ভক্তের রচনা। কাজেই চৈতন্যজীবনের ও তাঁর পার্ষদদের বাস্তব জীবনের কিছু কর্মের, আচরণের ও সম্পর্কের কথাই কেবল অবৈষ্ণব পাঠকের জ্ঞাতব্য।

২. কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস [সেন] রচিত

ক. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্[১]
খ. শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাট্যম্
গ. শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা
ঘ. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী।

চৈতন্যদাস রামদাস আর পরমানন্দ সেন
তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর [চৈ. চ.]

পিতরংশ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং (গৌরগণেদ্দশদীপিকা)।

পদকার শিবানন্দ সেনের নিবাস ছিল কাঁচড়াপাড়ায়। গৌরপারম্যবাদের তিনিও ছিলেন একজন প্রবক্তা। পরমানন্দ সেন ভণিতায় প্রায়ই রমানন্দ দাস নামে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, চৈতন্যনির্দেশেই শিবানন্দ পরমানন্দপুরীর নামানুসারে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন—'এবার তোমার যেই হইবে কুমার/পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার। প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস'। তাঁর কৃতির ও ভক্তির জন্যে তিনি 'কবিকর্ণপুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। পরমানন্দের গুরু ছিলেন 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা' নামের ভাগবত টীকা প্রণেতা শ্রীনাথ। মুরারি গুপ্ত প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে পরমানন্দ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতকাব্যে মুরারির নামে প্রচলিত কড়চা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেছেন। এ কাব্যেব রচনা কাল—

'বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধি'
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিত দ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য।

বেদা-৪, রসা-৬, শ্রুতয়-৪, ইন্দু-১, 'অঙ্কস্যবামা গতি' নিয়মে ১৪৬৪ [১৫৪২ খ্রীঃ ২৯শে মে] শকের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে এ কাব্য রচিত হয়। কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবকে বাল্যকালে দেখেছিলেন এবং তাঁর কৃপা পেয়েছিলেন—

শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল
মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ট তার [পরমানন্দের] মুখে দিল। [চৈ. চ.]

এ কাব্য শিশু পরমানন্দ দাসের ষোল বা আঠারো বা বিশ বছর বয়সের অপরিণত রচনা, তাই মুরারি গুপ্তের কড়চার একাদশ সর্গ অবধি অনুসরণ আবশ্যিক হয়েছিল। তিনি মুরারির ঋণ স্বীকারও করেছেন ঃ

-----নমাম্যহ্মসৌ স মুরারিসংজ্ঞং---
যৎপ্রসাদাচ্চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতং।
অথবা আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ কোচিন্মুরারি....
...... স্তত্ত্বদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ।

বাদবাকী অংশ তাঁর পিতা শিবানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের মুখে শুনে লিখেছিলেন। এতেও মনে হয় মুরারি গুপ্ত তাঁর নামের পুরো কড়চার রচয়িতা নন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। এবং এটি 'শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্ত' সনে অর্থাৎ ১৪৯৪ শকে বা ১৫৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত। তবে নাটকের প্রস্তাবনা সূত্রে এ-ও স্বীকার করতে হয় যে রাজা প্রতাপরুদ্রের [মৃত্যু ১৫৪০ খ্রীঃ] আদেশে তাঁর জীবৎকালেই রচনা শুরু করেছিলেন কবি। এবং হয়তো প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর ফলে সাময়িকভাবে রচনা বন্ধ থাকে। তা হলেই কবিব প্রস্তাবনার উক্তি এবং নাটক সমাপ্তিকালীন উক্তি দুটো সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে এবং তাৎপর্যপূর্ণও হয় ঃ

১. গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোহ্মি। [সূত্রধার]
২. এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিবস্মৃত্যৈকশেষং গতে
কো জানাতু শৃণোতু কঃ স্তদনবাকৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং।

–অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রিয়মণ্ডল [পরিকরেরা] স্মৃতি লোকে, কে জানবে আর শুনবে এ নাট্যকথা গৌরগণোদ্দেশদীপিকা [চৈতন্য পরিকর পরিচিতি মূলক রচনা]। এটি 'শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে' সনে তথা ১৪৯৮ শকে বা ১৫৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত। অন্য একখানি পুথির 'শাকে রসারসমিতে মনুনৈবযুক্তে' পাঠ [১৪৬৭ শক] সম্ভবত ভুল। কারণ এ গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস 'বেদব্যাস' রূপে প্রশংসিত। কিন্তু ১৪৬৭ শকের দিকে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল [ভাগবত] রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলবার উপায় নেই। পরমানন্দ [দাস বা সেন] সংস্কৃতে পদরচনা করেছিলেন। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে পরমানন্দের একটি পদ সংকলিত রয়েছে।

৩. প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

প্রবোধানন্দ সরস্বতী পণ্ডিতকবি ছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাহিত্যরুচি, বৈদগ্ধ্য, ভক্তি সব কিছু সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। এটি ১৪৩ টি শ্লোকবিশিষ্ট স্তোত্রকাব্য। বারোটি প্রকরণে এটি বিন্যস্ত, যথা—স্তুতি, নতি, আশীর্বাদ, চৈতন্যভক্তমহিমা, চৈতন্য-অভক্তনিন্দা, দৈন্য, উপাস্যনিষ্ঠা, চৈতন্যের উৎকর্ষ, চৈতন্যাবতার মাহাত্ম্য, লোকশিক্ষা, রূপোল্লাস ও শোচন। এতে প্রায় সর্বপ্রকার সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। স্তোত্র কাব্য মাত্রই ভক্তির আতিশয্যদুষ্ট এ কাব্যও তাই।

প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়, অনুরাগবল্লীতে, ভক্তিরত্নাকরে এবং জীব গোস্বামীর, দৈবকীনন্দনের, বৃন্দাবন দাসের ও ব্রজমোহন দাসের বৈষ্ণব বন্দনায়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিমল্ল ও বেঙ্কট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ষড়গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের পিতৃব্য, শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। 'অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে/পূর্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে' [অনুরাগবল্লী]। প্রবোধানন্দং----চন্দ্রামৃতং রচিতং যৎশিষ্যো' গোপাল ভট্ট। [জীব গোস্বামীর বৈষ্ণব বন্দনা]। মনে হয় সরস্বতীসম্প্রদায়ভুক্ত প্রবোধানন্দ চৈতন্য সান্নিধ্যে [চৈতন্যচন্দ্রামৃতের সাক্ষ্যে, ৩৭, ৪১, ৫৮, ১৪১ সংখ্যক শ্লোক] এসে কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকেই সাধ্যরূপে বরণ করেন। তিনিও তাই গৌরপারম্যবাদী। তাঁর শিষ্য গোপাল ভট্টও গৌরপারম্যবাদী

ছিলেন–'স্বয়ং ভগবান জানি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য/সেবিলেন গোপাল ভট্ট কায় বাক্য মনে [অনুরাগবল্লী- মনোহর দাস]। চৈতন্য-পরিকরচরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশসূত্রে তিনি আদর্শ বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন ঃ

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্য-মুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুর ভাষিতা বিষয়গন্ধ–থূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদগুণা জগাত গৌরভাজামমী। [২৪ সং শ্লোক]

খ. বাঙলা ভাষায়

১. বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কৃষ্ণভাগবতের মতো বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্য ভাগবত রূপে নামে-গুণে মাহাত্ম্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবে রয়েছে। আর তত্ত্ব-দর্শন গ্রন্থ হিসেবে অনন্য মর্যাদা পায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

বৃন্দাবন দাস বালবিধবা নারায়ণীর অবৈধ সন্তান। তাই তিনি শ্রীবাস বা শ্রীনিবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর সন্তান বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এমনকি তাঁর মাতামহের নামও উল্লেখ করেন নি। শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম যে শ্রীনিবাসই ছিল তার প্রমাণ আছে 'চৈতন্যভাগবতে'

প্রভু বোলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত
আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার,
শ্রীনিবাস চরণে রহুক নমস্কার
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার। [চৈ. ভাঃ]

চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপেও পাই—'শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার। নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।' শ্রীবাসেরা চার ভাই—শ্রীনিবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি—এসব নাম ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে মেলে। প্রেমবিলাস মতে এঁদের মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতা নলিন পণ্ডিতই ছিলেন নারাণীর পিতা। অন্যমতে নারায়ণীর পিতার নাম শ্রীরাম। কলঙ্কভঞ্জনের জন্যে প্রেমবিলাসে বৃন্দাবন দাসের পিতার নামও উদ্ভাবন করা হয়েছে—

বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেক গর্ভে
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে।

পিতার পিণ্ডদান উপলক্ষে বিশ্বম্ভর (নিমাই) গয়া থেকে নদীয়ায় শ্রীবাসের বাড়ি যান। তখন নিমাইয়ের বয়স তেইশ বছর [১৪৩০ শক বা ১৫০৮ খ্রীঃ]। এ সময়ে শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর বয়স ছিল চার বছর [চৈ, ভাঃ] তিনি চৈতন্যদেবের 'চর্বিত পান' রূপে কৃপা পেয়েছিলেন [চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিতা---চৈ, ভাঃ] 'শ্রীবাস ভ্রাতৃতনয়া ভর্তৃকা মধুর দ্যুতি [মুরারিগুপ্ত]

"শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার
নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।
মহাভাবময় প্রভু দেখিয়া সম্মুখে
চর্বিত চর্বন প্রভু দিল তার মুখে।
'আল রাঢ়ি' বলি তেঞি কহেন তাহারে
বৃন্দাবন দাস জন্ম যাহার উদরে।" [চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ]

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর প্রমুখ সবাই স্বীকার করেছেন যে নারায়ণী বালবিধবা।
পদকর্তা উদ্ধবদাস বলেন ঃ

'প্রভুর চর্বিত পান স্নেহবশে কৈল দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে
শৈশবে বিধবা ধনি সাধ্বীসতী শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্বিতে।'

আজো সমাজে অবৈধ সন্তান বাঁচিয়ে রাখা যায় না, তেমন মা-ও পায় না সমাজে ঠাঁই। সেদিন চৈতন্যপ্রভাবে তাও সম্ভব হয়েছিল বাঙলাদেশে-নদীয়ায়। ব্যাসের মতো বৃন্দাবনও হয়েছিলেন চৈতন্যবেদব্যাস পরম ভক্তিভাজন মহাজন! নারায়ণী সপুত্র আশ্রয় পেয়েছিলেন বাসুদেব দত্ত স্থাপিত নবদ্বীপের মামগাছি সেবাপাটে। কৃতজ্ঞ বৃন্দাবন দাস তাই পরোক্ষ বাসুদেব দত্তের ঋণ স্বীকারও করেছেন.......

জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত
সর্বভূতে কৃপালু চৈতন্য রসে মত্ত।
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সবা প্রতি
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি। [চৈ. ভাঃ]

ব্রজমোহন দাস বলেছেন ঃ

নারায়ণী 'আলরাঢ়ি' ঘোষণা যাহার
বৃন্দাবন দাস হন যাহার কুমার।—

মামগাছি পাট বোধ হয় এখানকার নারায়ণীর পাট।

বাসুদেব দত্ত 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক সত্য'—এ মানবিক মূল্যবোধে আস্থাবান ছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল

বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে রচনাকাল উল্লেখ করেননি। সম্ভাব্য রচনাকাল নিরূপণের জন্যে বিদ্বানেরা বৃন্দাবনের জন্ম সন অনুমান করতে প্রয়াসী। চৈতন্যের জীবিতকালেই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। কিন্তু শেষ আঠারো বছর ব্যাপী নীলাচলবাসী চৈতন্যদেবকে বৃন্দাবন কখনো দেখেননি। কথিত আছে যে, নিত্যানন্দ বারো বছর বয়সে তৈর্থিক সন্ন্যাসীর সহচর হন এবং বিশ বছর পরে বত্রিশ বছর বয়সের নিত্যানন্দ নবদ্বীপে তেইশ বছর বয়সের [১৪৩০ শক] চৈতন্যদেবের সঙ্গে যোগ দেন। তাহলে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের চেয়ে নয়-দশ বছরের বড়। এ বছরেই অর্থাৎ ১৪৩০ শকে [১৫০৮ খ্রীঃ] নারায়ণী ছিলেন চার বছরের বালবিধবা। অতএব নারায়ণীর জন্ম হয় ১৪২৫-২৬ শকে। নারায়ণীর যৌবনারম্ভেই যদি বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় তাহলেও ১৪৪১-৪২ শকের আগে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক নয় এবং চৈতন্যভাগবত দৃষ্টে বোঝা যায় বৃন্দাবন দাস তরুণ বটে, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধিতে কাঁচা নন, এজন্যে অন্তত পঁচিশ বছর বয়স দরকার। অতএব তিনি অন্তত পঁচিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৪৬৬-৬৭ শকে ভাগবত রচনা শুরু করেন। পূর্বসূরীর গ্রন্থ দেখে, জ্যেষ্ঠবৈষ্ণবদের থেকে জেনে এবং নদীয়ার নানা লোক থেকে শুনে তাঁকে এ গ্রন্থ লিখতে হয়েছে—১. 'তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে,' ২. 'নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব/কিছু কিছু শুনিলাঙ সবাব মহত্ত্ব,' ৩. 'অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা,' ৪. গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি [তুল ঃ চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী, ৫. 'নিত্যানন্দ হেন প্রভু যাহার হারায়/ কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার'। ৬. জয় প্রভু গৌরচন্দ্র/দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।'—এতে বোঝা যায় গ্রন্থারম্ভে যাঁরা জীবিত ছিলেন, সমাপ্তির দিকে তাঁরা তিরোহিত। গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ কালে অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রমুখ বেঁচে ছিলেন। রচনা করতে যে বেশ কয়েক বছর লেগেছিল, এ-ও তার প্রমাণ। কাজেই গ্রন্থরচনা দ্রুত অগ্রসর হতে পারেনি। এ গ্রন্থ রচনা করতে অন্তত ৮/১০ বছর লাগার কথা। জয়ানন্দের উক্তিতে গুরুত্ব দিলে স্বীকার করতে হবে যে আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ড আলাদাভাবে ও সময়ের ব্যবধানে রচিত। জয়ানন্দ বলেছেন ঃ

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি
বৃন্দাবনদাস প্রচারিল সর্বোপরি।

জয়ানন্দ বইয়ের নাম বলছেন না, এর সরল অর্থ এই—বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ড রচনা করে প্রচার করেন, তারপর কালের ব্যবধানে মধ্যখণ্ড, তারও পরে শেষখণ্ড রচনা করেন। অর্থাৎ—তিনখণ্ড এক সঙ্গে রচিত ও প্রচারিত হয়নি। চৈতন্যভাগবতে সে প্রমাণও রয়েছে। বৃন্দাবন বৃদ্ধ নিত্যানন্দের কাছেই দীক্ষা নেন। ঠিক আঠারো বছর বয়সে যদি দীক্ষা নেন, তাহলেও আমাদের হিসেবে ১৪৫৯-৬০ শকের আগে তিনি দীক্ষিত হননি। এসময়ে নিত্যানন্দের বয়স ৬২-৬৩ বছর ছিল। তা হলে মানতে হবে নিত্যানন্দের জীবৎকালে গ্রন্থরচনার শুরু বটে ঃ

১. অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।
২. নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে
সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে।
৩. তাহান [নিত্যানন্দের] আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে
কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে।
৪. সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত রায়
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়।

কিন্তু গ্রন্থ রচনাকালে বৈষ্ণবসমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন গৌরনাগরবাদীরা, অদ্বৈতশিষ্যরা, গধাধর সম্প্রদায়, নিত্যানন্দের মত বিরোধী সম্প্রদায় প্রভৃতি একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞাপরায়ণ [অবশ্য যদিও চৈতন্যের জীবৎকালেই এসব মতভেদ ক্ষীণাকারে আত্মপ্রকাশ করছিল]–এটি কালিক ব্যবধানের সাক্ষ্য ঃ

১. অতএব যত মহামহিম সকলে
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি করে।
২. অদ্বৈতরে গাইলেক শ্রীকৃষ্ণ করিয়া ....
অদ্বৈতরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
৩. অদ্বৈতের পক্ষ হইয়া নিন্দে গধাধর।
৪. এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায়।
৫. নিত্যানন্দ নিন্দা করে [যাইবেক নাশ] হবে সর্বনাশ
[—এটি বার বার উচ্চারিত হয়েছে]।

এসব ভেদ-বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব প্রকট ও প্রচার হতে চৈতন্যোত্তর পনেরো বিশ বছর সময় লাগার কথা। চৈতন্যের জীবৎকালে নিত্যানন্দ বলরামের অবতাররূপে পূজনীয় ছিলেন, এবং বয়োবৃদ্ধ অদ্বৈতকে, চৈতন্যের নিত্যসঙ্গী সহপাঠী গদাধরকে প্রকাশ্যে নিন্দা করবার লোক ছিল না ১৫৩৩ সন অবধি। কাজেই দ্বন্দ্ব হচ্ছিল নতুন উত্তবপুরুষের মধ্যে।

১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৮ শকে রচিত কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বৃন্দাবন দাসকে 'বেদব্যাস' তুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বিদ্বানেরা মনে করেন যে, কবিকর্ণপুরের উক্ত গ্রন্থ রচনার বেশ কয়েক বছর আগে রচিত না হলে বৃন্দাবন দাসের 'বেদব্যাস' খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত না। কিন্তু এ যুক্তি অকাট্য নয়। কেননা বৃন্দাবন দাসকে 'বেদব্যাস' বলে অভিহিত করেছেন বিদ্বান. ভক্ত এবং গুরু শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা। বৃন্দাবন নবদ্বীপবাসী, কবিকর্ণপুরও সেখানকার শিবানন্দ সেনের পুত্র. তা ছাড়া বৃন্দাবনদাসই হচ্ছেন বাঙলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যচরিতকার, যদিও গুরু নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাবশে চৈতন্যের অন্ত্যলীলা, গম্ভীরালীলা বা দিব্যোন্মাদকালীন বারো বছরের বর্ণনা দেননি। সে অর্থে চৈতন্যলীলা এ গ্রন্থে অসম্পূর্ণ [নিত্যানন্দ

বর্ণনে হৈল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ–চৈ. ভা.]। নীলাচলে আঠারো বছর বাস করেন চৈতন্য, তাই বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক নিত্যানন্দের কথা আর বাঙলার বৈষ্ণব মতের প্রসার বর্ণনা সমার্থক। কাজেই এ বই লেখার সময়ে এবং রচনা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিপুরে, নবদ্বীপে, খড়দহে, শ্রীখণ্ডে ও বৃন্দাবনে প্রচারিত হওয়ারই কথা, ঐ সব কেন্দ্রের যেকোন বিদ্বান ও রসিক এবং চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ভক্ত পাঠকই মুগ্ধচিত্তে তাঁকে চৈতন্যভাগবতের নব 'বেদব্যাস' বলে সোচ্ছাসে প্রচার করতে পারেন, তার জন্যে স্বল্প সংখ্যক প্রবীণ, বিদ্বান ও গুরুর প্রয়োজন মাত্র—যাঁদের উচ্চারিত প্রশংসা শিষ্যদের মুখে মুখে দ্রুত প্রচার হওয়া ছিল সম্ভব এবং হতও তাই। বিশেষত, প্রথম পাঠকের মনেও তাঁকেই স্বয়ং 'বেদব্যাস' বলে আখ্যাত করার ইচ্ছা জাগবার মতো কারণ চৈতন্যভাগবতেই ছিল। ভক্ত বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলে মানতেন। তাই চৈতন্যলীলার বক্তাও যে 'নব বেদব্যাস' নামেই অভিহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা' বৃন্দাবনদাস নিজেই পরোক্ষে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন ঃ

১. মধ্য খণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা।

২. বর্ণিবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে
বর্ণিবেন নানা মতে অশেষ বিশেষে।

কাজেই ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার [চৈ. চ. উ. পৃ-১৮৮-৮৯] প্রমুখ বিদ্বানদের প্রদর্শিত যুক্তি তেমন দৃঢ় নয়। অতএব বিভিন্ন বিদ্বান কর্তৃক অনুমিত বৃন্দাবন দাসের জন্ম সন–১৪২৯, ১৪৫৯, ১৪৫৭, ১৪৪০ শক–এগুলোর মধ্যে ১৪৪০ শকই গ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ বৃন্দাবন দাসের একটি উক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, চৈতন্যতিরোভাবের পরই বৃন্দাবনদাসের জন্ম।–'হৈল পাপিষ্ট জন্ম না হৈল তখন' [এ উক্তি চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলাপ্রসঙ্গে উচ্চারিত]। কাজেই নবদ্বীপবাসী কবির পক্ষে চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার সময়ে জন্ম না হওয়ায় এ আফসোস স্বাভাবিক, কারণ কবির জন্মকালে নদীয়ার চৈতন্য তখন নীলাচলবাসী।

বৃদ্ধগুরু নিত্যানন্দের জীবৎকালে বৃন্দাবন তাঁর সান্নিধ্য ঘন ঘন পেয়েছিলেন বলে মনে হয় ঃ

বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছী গ্রাম
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান। [চৈ. ভা.]

বড়গাছী বৃন্দাবন দাসের মামগাছীর নিকটবর্তী গ্রাম। দেনুড়ে বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাঠ আছে। লোকশ্রুতি এই যে, তিনি ঐ দেনুড়ে বসে ভাগবত রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থ রচনায় দীর্ঘ সময় লাগলে অনুমান করা চলে ১৪৬৭ শকে যদি শুরু হয়, তা হলে অন্তত ১৪৭৫-৭৭ শক তথা ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩-৫৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি এই বিপুলকায় শ্রমবহুল, তথ্যপূর্ণ ও বর্ণনাবহুল গ্রন্থ রচিত হওয়ার কথা। অম্বিকানাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত রচনাকাল যদি অকৃত্রিম হয়, তা হলে ১৫৭৫ সন অবধি এ গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। [চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন/নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈল সমাপন।] রামগতি ন্যায়রত্নের ও বিমানবিহারী মজুমদারের মতে রচনাকাল ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দ। চৈতন্যের জীবৎকালে এ গ্রন্থের যে রচনা শুরু হতে পারে না, তার পূর্বোক্ত কারণগুলো ছাড়াও অন্য কারণ ভাগবতেই রয়েছে। বৃন্দাবন দাসই বলছেন, চৈতন্য জীবৎকালে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে লিখতে চৈতন্য স্বয়ং নিষেধ করেছিলেন–'যাবত থাকএ মোর এই অবতার/তাবত কহিলে কারে করিব সংহার' [চৈ. ভা]।

তাছাড়া অন্য ইঙ্গিতও রয়েছে–'সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস/অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত।'

বোঝা যাচ্ছে গ্রন্থরচনা কালে উল্লেখযোগ্য প্রবীণ চৈতন্যপার্ষদ দুর্লভ হয়ে উঠেছেন। এ অনুমান আরো স্পষ্ট হয় যখন বৃন্দাবন দাস বলেন,

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।

মনে হয় যেন তখন কেবল নারায়ণীই জীবিত রয়েছেন, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, নিত্যানন্দও তখন নেই।

গ্রন্থনাম

চৈতন্যভাগবত বাঙলাভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যচরিত। কথিত আছে যে, বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থের কোন নির্দিষ্ট নাম দেননি। প্রথমে এটি 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। বৃন্দাবনদাসকে যখন সবাই চৈতন্যলীলার সূত্রকার 'নবব্যাস' রূপে চিহ্নিত করল, তখন তাঁর গ্রন্থকেও ভাগবতের অনুকরণে চৈতন্যাবতারে বিশ্বাসী বৈষ্ণবেরা 'চৈতন্যভাগবত' নামে অভিহিত করে। অপর মতে লোচনদাসও প্রায় সম সময়ে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন, তখন অভিন্ন নামের দুই গ্রন্থের সনাক্তি-সমস্যা এড়ানোর জন্যে মাতা নারায়ণীর পরামর্শে বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে 'ভাগবত' রাখেন। কিন্তু লোচনদাস স্বয়ং বৃন্দাবনের গ্রন্থের এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে।

ব্রজমোহন দাস 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' [১৬২০ খ্রীঃ] চৈতন্যমঙ্গল ও ভাগবত উভয় রূপেই উল্লেখ করেছেন ঃ

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস
শ্রীবলরামের রাস লিখেন বিশেষ।
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে কৈলা বর্ণন।

এবং নাম পরিবর্তনের কথাও তিনি বলেছেন ঃ

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল
বৃন্দাবনের মহান্তরা ভাগবত আখ্যা দিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও চৈতন্যমঙ্গল বলেই উল্লেখ করেছেন, কাজেই বৃন্দাবন দাসের 'ব্যাস'-খ্যাতির পরেই তাঁর গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে 'ভাগবত' রূপে পরিচিত হয় বলে অনুমান করি।

নিত্যানন্দ শিষ্য বৃন্দাবন দাস নিমাই-নিতাইকে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন, কাজেই তিনি কৃষ্ণলীলার আদলে চৈতন্যলীলা কল্পনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত চৈতন্যের শৈশবের-বাল্যের এবং অবতাররূপে আমৃত্যুর অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী বৈষ্ণবদের অভিভূত করেছিল, তাই তিনি বেদব্যাস রূপে প্রশংসিত। অবৈষ্ণব পাঠকের কাছেও এ গ্রন্থ মূল্যবান, কেননা অতিশয়োক্তি ও কাল্পনিক কিছু ঘটনা থাকা সত্ত্বেও সমকালীন শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, রাজনৈতিক অবস্থা, দেশে শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব, হিন্দুর লৌকিক ধর্ম, শাস্ত্রাচারের শৈথিল্য, ব্রাহ্মণ্যসমাজের নীতিশিথিলতা ও দুর্নীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজবিপ্লব, প্রশাসনিকব্যবস্থা, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, বৈষ্ণবসমাজের উপমত, উচ্চবিত্তের মানুষের বিলাসবহুল জীবনচিত্র প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থে মেলে।

এত বড় বই সাধারণ পাঠক কখনো পড়বেন না অনুমান করেই ইতিহাসের উপাদান-উপকরণগুলো দীর্ঘ হলেও এখানে সংকলন করে দিলাম। এ সূত্রে কেবল ব্রাহ্মণে-যবনে বাদও স্মর্তব্য।

সমাজ ও সংস্কৃতি

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ নানা তথ্যের আকর ঃ

১. চৈতন্যের উক্তি ঃ মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি
আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।

২. ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়
চৈতন্যকীর্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়। [নিত্যানন্দগুরু]
বৃন্দাবন গুরু নিত্যানন্দ বলরামের অবতার।
তাঁর জন্ম মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।

৩. কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় [চৈতন্যকথা]
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।
বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম করহ প্রকাশ। [অবতার বুদ্ধ]

৪. চৈতন্যজন্ম-গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী। [চৈতন্যলীলাসূত্র]

৫. কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন। [কলিযুগ পরিণাম]

[নবদ্বীপে জীবন ও সমাজ চিত্র]

৬. নবদ্বীপ-সম্পতি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ।।
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।।
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বাসে।
ব্যর্থে কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।।
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার।।
'ধর্ম কর্ম' লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।
যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব।।
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে।।
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন।।
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি।।
অতি বড় সুকৃতী যে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।।
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির বাখান নাহি তাহার জিহ্বায়।।
ভক্তিযোগ শূন্য দেখি লোক দুঃখ পায়।।
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।।
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।।
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।।
কিছু নাহি জানে লোকে ধন-পুত্ররসে।
সকল পাষণ্ড মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে।।

[চৈতন্যপ্রবর্তিত কীর্তন ও প্রতিবেশীর প্রতিক্রিয়া]

৭. চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈস্বরে।।
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে "হইল প্রমাদ।
এই ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ।।
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে,প্রমাদ নদীয়ার"।।
কেহ বোলে, "এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে।।
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল।।
জগত প্রমত্ত ধন-পুত্র মিথ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সভে উপহাসে।। [ঐ]
আর্যা তর্জা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি" সতি, তপস্বীও যাইব মরিয়া।
তারে বলি সুকৃতী, যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে রড়ে।
এতে যে গোসাঞিভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত দারিদ্র-দুঃখ না হয় খণ্ডন।
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক।।
পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে।।

একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ।।
৮. কন্যা বিবাহ দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সভে তুমি আনিবে মাগিয়া।।
খই, কলা, সিন্দুর, তাম্বুল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া।।
[নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ]
৯. যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ।
কোট্যর্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র-রাজ।।
ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র বা আচার্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোন কার্য।।
যদ্যপিহ সভেই স্বতন্ত্র সভে জয়ী।
শাস্ত্রচর্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহি।।
[চৈতন্য-রসিকতা]
১০. বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
"কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া।।
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে 'হায় হায়।
তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চয়।।
পিতা-মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বোল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার।।
বুঢ়ণ গ্রাম্যেতে অবতীর্ণ হরিদাস
[হরিদাস-পরিচিতি]
১১. ফুলিয়ারে রহিলেন প্রভু হরিদাস।।
গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করিয়া লইয়া বুলেন সর্বস্থানে।।
কাজী গিয়া মুলকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে।
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে নাহি করহ বিচার।।"
পাপীর বচন শুনি সেহ পাপমতি।
ধরি আনাইল তারে অতি শীঘ্রগতি।।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন।।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত।।
শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর।।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহো কোরান পুরাণে।।
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেহ গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।।
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।।
শুনিয়া সন্তোষ হইল সকল যবন।
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।।
সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা, "শাস্তি করহ ইহারে।।
এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিব অনেক।
যবন কুলের অহমিকা আনিবেক।।
[কীর্তনগানে বিক্ষুব্ধ হিন্দুর প্রতিক্রিয়া]
১২. এ বামনগুলো রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হৈতে হইব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।।
এ বামনগুলো সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক-কীর্তন করি নানা ছলা পাতে।।
গোসাঞির শয়ন হয় বর্ষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক।।
নিদ্রা-ভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হৈব গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাঞি।
কেহো বোলে "যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।।
কেহো বোলে "রাত্রে নিদ্রা যাইতে নাপাই।
কেহো বলে "গোসাঞি রুষিভ ঘন ডাকে।
এগুলার সর্বনাশ হৈব এই পাকে।।"
কেহো বোলে "জ্ঞানযোগ করিয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সভার ব্যভার।।"
কেহো বোলে "কিসের কীর্তন কেবা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাস বামনে।।
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
'হরি' বলে ডাক ছাড়ে যেন মহা বাই।।
মনে মনে বলিরে কি পুণ্য নাহি হয়।
রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়।।
কেহো বোলে "আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ।।
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।।
শুনিলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ।
চৈতন্যদেব অদ্বৈতের উক্তি ঃ
১৩. স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।

বিদ্যাধন-কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে।
সে পাপিষ্ঠ সব মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ-গ্যায়া।।

[পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি]

১৪. বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহো তিহোঁ যে বৈষ্ণব॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম-পণ্ডিত।
পরম-আচার সর্বলোকে অপেক্ষিত।।
কৃষ্ণ-ভক্তি -সিন্দু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর।।
গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে।।
গঙ্গায় যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার।।
এসব দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা।।
বিচিত্র বিশাল আর এক শুন তান।
দেবার্চন-পূর্বে করে গঙ্গাজল পান।।
তবে সে করেন পূজা-আদি নিত্যকর্ম।
ইহা সর্ব পণ্ডিতের বুঝায়েন ধর্ম।।
চাটিগ্রামে আছেন, এথাহো বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে।।

[পুণ্ডরীকের বিলাস-ব্যসন]

১৫. বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়।।
দিব্য খট্টা-হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রতাপ তিন তাহার উপরে।।
তঁহি দিব্য শয্যা শোভা অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্ট নেত বালিস শোভায়ে চারিপাশে।।
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা, পাকা পান তাত।।
দিব্য আলবাটি দুই শোভা দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে।।
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহ সর্বক্ষণে।।
চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু বিন্দু মিলে।।
কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার।
দিব্যগন্ধ আমলকী বই নাহি আর।।
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যে না চিনে আর হয় রাজপুত্র-জ্ঞান।।

[শিব-সঙ্গীত]

১৬. একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়-গায় শিবের কথন।।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে।।

[চৈতন্যপার্ষদ]

নিত্যানন্দ, গধাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য হরিদাস।।
গঙ্গাদাস, বনমালি, বিজয়, নন্দন।
জগাদানন্দ, বুদ্ধিমন্তখান, নারায়ণ।।
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই।।
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর।।
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য-নাম জানি কত।।

[প্রতিবেশীদের বৈষ্ণবনিন্দা।]

১৭. শুনিয়া পাষণ্ডী-সব মরয়ে বল গিয়া।
"নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া।।
এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্রপড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।।
চারি-প্রহর নিশি-নিদ্রা যাইতে না পাই।
'বোল বোল' হুঙ্কার শুনিয়ে সদাই।।"
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বোলয়ে অপার।।
কেহো বোলে "এগুলো সকল নাহি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ-দ্বার না ঘুচায়।।"
কেহো বোলে "সত্য সত্য এই যে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্ট প্রহর।।"
কেহো বোলে "অরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।।"
কেহো বোলে "ভাল ছিল নিমাঞি পণ্ডিত।
তোর কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত।।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি পূর্বের সংস্কার।
কেবা বোলে সঙ্গদোষ হইল তাহার।।
নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই।

এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিলা নিমাই।।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সভার সনে।।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ।।
ভিন্ন লোক দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।"
কেহো বোলে "কালি হঁউ যাইব দেয়ানে।
কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে।।
যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন।।
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়।।
যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে।
"রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে।।
মহাচাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে।।
[নারায়ণী]

১৮. শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা–বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান।।
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।
শ্রীগৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।।
জগাইমাধাই]

১৯. একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল।।
সেই জনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি কবে, হেন পাপ নাহি আর।।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ।
দেয়ানে নাহিক দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্যপান বিনে আর নাহি যায় কাল।
দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায় তাহারে সে কিলায়।।
সর্বলোক নদীয়ার পুরুষে পুরুষে।
তিলার্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে।।
এই দুই গুণবন্ত পাসবিল ধর্ম।
জন্ম হৈতে এমত করয়ে অপকর্ম।।
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া।।
এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়।।
হেন পাপ নাহি যাহা না করে দুইজন।
ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভক্ষণ।
সে দুয়ের নাম প্রভু জগাই-মাধাই।
ব্রাহ্মণের পুত্র দুই জন্ম এক ঠাঞি।।
সঙ্গদোষে তা সভার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি।।
সে দুয়ের ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে।।
[কাজীর কীর্তনিয়াপীড়ন।]

২০. একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়।
হরি-নাম-কোলাহল চতুর্দিগে মাত্র।
শুনিয়া স্মাঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র।
কাজী বোলে "ধর ধর আজি করোঁ কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য।।"
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন।।
যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজী বোলে "হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।
ক্ষমা করি যাও আজি, দৈব হৈল রাত্রি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি।।
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগরে ভ্রময়ে কাজী কীর্তন চাহিয়া।
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দু কাজী সব আরো মারে কদর্থিয়া।।
[কাজী বাড়ি আক্রমণ, চৈতন্যদেব কর্তৃক]

২১. কেহো বোলে "এবে কাজী বেটা
গেল কোথা।
লাগি পাও এখনে ছিড়িয়া ফেলোঁ মাথা।"
রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে।।
কাজীর বাড়ির পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর।।
কাজী বোলে "জান ভাই কি গীত বাচন।।
কিবা করো বিভা, কিবা ভূতের কীর্তন।।

মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানী।
ঝাট জানি আয় তবে চলিব আপনি।।"
কাজীর আদেশে তার অনুচর ধায়।
সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়।।
অনন্ত অর্বুদ লোক বোলে "কাজী মার।"
ডরে ফেলাইল তবে বেষ্টন মাথার।।
রড দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট গিয়া।
কাজী বোলে "হেন বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত।।
এ বা নহে—মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানী করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে।"
আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।
ক্রোধে বোলে প্রভু "আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা।।
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈল সে কালযবন।।
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।
"ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বোলে বার বার।।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।।
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে।
সর্ব-বাড়ি বাড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে।।
দেখো মোরে কি করে উহার নরপতি।
কাজীর ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব নগরিয়া।
মহাশব্দে 'হরি' বলি যাবেন নাচিয়া।।

[হোসেন শাহের চোখে চৈতন্যদেব]

২২. যবনেও বোলে 'হরি' অন্যের কি দায়।
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।।
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্বার।
কা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার।।
কেশব-খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসায় রাজা বড় বিস্ময় হইয়া।
"কহত কেশবখখান। কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বোল যার।।
কেমত তাহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিহোঁ কহিব অবশ্য।।
চতুর্দিগে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবে ভাল মতে।।"
শুনিয়া কেশবখান—পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন।।
কে বোলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশন্তরি গবরি বৃক্ষের তলবাসী।।"
রাজা বোলে গরিব না বোলে কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কানে।।
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' খোদায় যবনে।
সেই তিহোঁ নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে।।
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তার আজ্ঞা সর্বদেশে শিরে করি বহে।।
তাহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে।।
বাজা বোলে "এই মুঞি বলিলুঁ সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।
সর্বলোক লই মুখে করুণ কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন।।
কাজী বা কোতাল বা তাহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে।।"
যে হুসেন-শাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলে দেউল বিশেষে।।
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে ন মানয়ে যত অন্ধ।
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের যশ শুনি পোড়য়ে অন্তরে।।

[সমকালীন ধর্মীয় অনাচার]

২৩. কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন।।
ধর্ম-কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাও সে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি।।
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে।।
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত।
ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত।।

[প্রেমধর্ম প্রচার ঃ নিত্যানন্দ]

২৪. মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে।
তুমিও নিত্যানন্দ থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি॥

আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার।।
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সংবরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে।।
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
মুর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যে জন।
ভক্তি দিয়া করো গিয়া সভার মোচন।।
[কাজীকে হুমকি দান]

২৫. সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার।
কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার।।
পরানন্দে মত্তা গধাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়।
যে কাজীর ভয়ে লোক পালায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে।।
নিরবধি হরি ধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইল গিয়া কাজীর বাড়ীতে।।
দেখে-মাত্র রহিয়া কাজীর সর্বগণে।
কাহারো বলিতে কিছু না আইসে বদনে।।
গদাধর বোলে "আরে" কাজী বেটা কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বোল, নহে ছিণ্ডোঁ এই মাথা।।"
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির।
,গদাধর দাস দেখি মাত্র হইল স্থির।।
কাজী বোলে "গদাধর তুমি কেনো এথা।"
গধাধর বোলেন "আছয়ে কিছু কথা।।"
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বোলাইলা 'হরি হরি।।
সবে তুমি মাত্র নাহি বোল হরিনাম।
তাহা বোলাইতে আইলাঙ তোমা স্থান।।
পরম মঙ্গল হরি নাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি" ।।
যদ্যপিহ কাজী মহা হিংসক চরিত।
তথাপি না বোলে কিছু হইল স্তম্ভিত।।
হাসি বোলে কাজী "শুন দাস গধাধর।
কালিকা বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর।।
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈল প্রেমমুখে।।
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে।।
হেন জন পাসরিল সর্ব হিংসাধর্ম।
[নিত্যানন্দ চরিত]

২৬. নবদ্বীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুতে না বুঝোঁ মুঞি করেন কিরূপ।।
সন্যাস আশ্রম তান বোলে সর্বজন।
কর্পুর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ।।
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা যে সকল কলেবরে।।
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দনমালা সদাই বিলাস।
দণ্ড ছাড়ি মোছ দন্ত ধরেন না কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে।।
শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখোঁ আচার।
এতেক মোহের চিত্তে সন্দেহ অপার।।
বড় লোক বলি তাঁরে বোলে সর্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে।।
পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যনন্দস্বরূপ নির্মল।
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ হরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।।
[রূপ-সনাতন]

২৭. শাকর মল্লিখ আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি।
শাকরমল্লিক-নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম।।
অদ্যাপিহ দুই ভাই রূপ সনাতন।

২. জয়ানন্দের চৈতন্যদেব

গদাধরশিষ্য জয়ানন্দ ছিলেন পেশায় গায়েন। তাই তিনি পালাগান হিসেবেই রচনা করেছিলেন চৈতন্যমঙ্গল। 'ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে / জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে', অথবা 'সর্বলোক হরি বোল জয়ানন্দ বলে। জয় জয় দেহ তবে শ্রীলোক সকলে'। 'চৈতন্যমঙ্গল' নয়টি

পালাগানে বিভক্ত গৃহস্থের মানতপূর্তি, পুণ্যার্জন, লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আসরে গেয় পালাগুলোর প্রত্যেকটি যদিও বক্তব্যবিষয় হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ তবু তার মধ্যে চৈতন্যলীলার ঐতিহাসিক ক্রম ও পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি, জীবনচরিতের পক্ষে তা' ছিল আবশ্যিক।

তাছাড়া বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সব রকমের গণশ্রোতার উদ্দেশ্যে রচিত ও গেয় বলে তাতে বৈষ্ণবসুলভ ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভক্তিতত্ত্ব অবিমিশ্রভাবে অভিব্যক্তি পায়নি। ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ আশ্রিত ও সনাতন যোগ-তন্ত্র ও কায়াসাধনশাস্ত্র প্রভাবিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য নিয়মে গণেশবন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু, যেমন ঃ

প্রথমে বন্দিব দেব শিবের নন্দনে
যাহার স্মরণে বিঘ্ন না রহে ভুবনে।

দেহতত্ত্ব ঃ আউট হাত ঘরখানি তাতে দশদ্বার
তার মাঝে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার।
একাদশ চোর তাহে দস্যু পাঁচজন
গঙ্গা-যমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ।
হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নারী সুষুম্নার মূলে। [বৈরাগ্য ১৯, পৃঃ ১৫]

—এসব বৌদ্ধ বজ্রযানী সহজযানীদের এবং পরবর্তী বৈষ্ণবসহজিয়া ও বাউলদের প্রিয় ও সাধ্যতত্ত্ব। এবং ইন্দ্র-জালিন্দ্রযুদ্ধ, বৃন্দা-হরির সম্পর্ক, ধ্রুব, জড় ভরত, সত্যবতী, জুয়াড়ী, অজামিল প্রভৃতির কাহিনী জয়ানন্দের কালে চৈতন্যাবতারে বিশ্বাসী বৈষ্ণবসমাজ কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেনি। চৈতন্যলীলার এ পাঁচালী তাই বৈষ্ণবসমাজে সমকালে গৃহীত হয়নি। নগেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কৃত, পরিচায়িত [১৩০৪-০৫ বঙ্গাব্দে] ও সম্পদিত [১৩২২ বঙ্গাব্দে] এই চৈতন্যমঙ্গল বস্তুত ১৩০৪ বঙ্গাব্দ থেকেই নতুন করে বিদ্বানদের ও বৈষ্ণবদের নজরে পড়ে। ১৯৭১ সনে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের একটি সংস্করণ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটির পাঠই এখানে উদ্ধৃত।

বর্ধমান জেলার আমাইপুরা (মাঞিপুরা) গাঁয়ে ছিল জয়ানন্দের নিবাস। তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গয়া যাবার পথে অথবা গয়া থেকে নবদ্বীপ হয়ে নীলাচলে ফেরার পথে আমাইপুরা গাঁয়ে সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। জয়ানন্দ তখন শিশু এবং তাঁর নাম ছিল গুহিঞা। চৈতন্যদেবই তাঁর নতুন নাম রাখেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের মা রোদনী গুহিঞাকে কোলে নিয়ে চৈতন্যের জন্যে রান্না করছিলেন, তাঁর সেই শ্রুতি-স্মৃতি গ্রন্থভুক্ত করেছেন জয়ানন্দ [পৃঃ ২১৯]। জয়ানন্দ ও তাঁর পিতা [গোসাঞির পূর্বশিষ্য] সুবুদ্ধি মিশ্র গুরু গদাধর গোস্বামীর কাছেই দীক্ষা নেন। জয়ানন্দ ভণিতায় পুনঃ পুনঃ চৈতন্য ও গদাধরকে একই সঙ্গে স্মরণ করেছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ।

কিংবা— আনন্দেতে তীর্থখণ্ড গাএ জয়ানন্দ.... ইত্যাদি।

জয়ানন্দ চৈতন্যলীলা বর্ণনায় পূর্বসূরী হিসেবে 'চৈতন্যসহস্রনাম' স্তোত্র প্রণেতা সার্বভৌম ভট্টাচার্য, চৈতন্যভাবগত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা গোপাল বসু [অপ্রাপ্ত] এবং 'গোবিন্দদাসবিজয়গীত' রচক পরমানন্দ গুপ্তের [অপ্রাপ্ত] নাম উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবন দাস সম্ভবত ১৪৪৭ থেকে ১৪৭৫-৭৭ [বা তারও পরে অর্থাৎ আনুঃ ১৫৪৫ সনে শুরু হয় ১৫৫৩-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সমাপ্ত] শকের সময় পরিসরে তাঁর তথ্যবহুল বিপুলাকায় গ্রন্থ রচনা করেন। কাজেই জয়ানন্দ সাতের বা আটের দশকে তাঁর চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। এ অনুমানের অন্যভিত্তিও রয়েছে,

যেমন চৈতন্যের ব্যক্তিত্বপ্রভাবিত বৈষ্ণবসমাজে যখন পূর্বে আবেগ ও নিষ্ঠা মন্দীভূত হয়েছে, পৌরাণিক ব্রাক্ষণ্য শাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করার একটা প্রয়াস চলছে পূর্ব সংস্কারের প্রভাববশে [কোন দেবালয়ে কেহ সেই বৃত্তি করি/ পরিবার পুষিবেক বৈষ্ণব রূপ ধরি] এবং মৌলিক যোগতন্ত্র, দেহতত্ত্ব যখন আবার জনগণকে আকৃষ্ট করছে, [বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদ মালা পাঞা], তখনই জয়ানন্দ পালা রচনা করেছেন। বৈষ্ণবসমাজেও নানা গুরুমুখী উপাশাখার মধ্যে ভেদ-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ দেখা দিয়েছে এবং বৈরাগ্য ও ভক্তির চেয়ে পার্থিবতা বৃদ্ধি পেয়েছে [নানা অলঙ্কারে কেহ দিব্যপরিচ্ছেদে। 'দোলায় ঘোড়ায় যাব কেহ মহান্ত সপদে'], সে সময়েই চৈতন্যমঙ্গল রচিত বলে মনে হয়।

চৈতন্যদেব যখন গয়া বা নীলচলের পথে [১৪১৫ শকে] জয়ানন্দের বাড়ি গিয়েছিলেন [জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে/উত্তপ্ত সিকতা পথে/বর্ধমান সান্নিকটে/ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে/মাঞিপুরা তার নাম, পৃঃ ২১৯] তখন জয়ানন্দ কোলের শিশু। অতএব জয়ানন্দের জন্ম হয় ১৫১৩-১৪ খ্রীস্টাব্দে [শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে পৃঃ ২১৮]। পালাগানের দলের গায়েন ও অধিকারী হতে তাঁর বয়স চল্লিশ বছরের মতো হয়েছিল অনুমান করলে ১৫৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাঁকে প্রখ্যাত গায়েন রূপে পাই। চৈতন্যমঙ্গলপালা রচনাকালে দেখা যাচ্ছে বীরভদ্রও প্রতিষ্ঠিত গুরু। বীরভদ্রের জন্ম সম্ভবত ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে। কেননা নিত্যানন্দ সূর্যদাস সারখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিয়ে করেন চৈতন্যের ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোভাবের পরে। গুরুর বয়স ৩০/৩৫ বছরের মতো হওয়ার কথা। কাজেই জয়ানন্দ ১৫৬৫ -৬৬ সনের আগে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেননি বলে মনে হয়। আর নিত্যানন্দ যদি চৈতন্যের জীবৎকালে ১৫২২ খ্রীস্টাব্দের দিকে বিয়ে করেন তা হলে অবশ্য ৩০/৩৫ বছর বয়স্ক বীরভদ্রকে ১৫৫৩ সনে মেলে। চৈতন্যমঙ্গল শোনাকথা ও বানানো গল্পের আকর। এতেও মনে হয় [পঞ্চাশের মতো বয়সে] চৈতন্য পার্ষদবিরল, ও বিভেদে দুর্বল বৈষ্ণবদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের আশঙ্কামুক্ত হয়ে প্রবীণ গায়ক চৈতন্যলীলার গান বেঁধেছেন স্বাধীনভাবে—পেশার খাতিরে ও সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন মানসে অবৈষ্ণবীয় ঢঙে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ঃ

১. দরিদ্র [চৈঃ ভাঃ–কিছু নাই সুদরিদ্র] জগন্নাথমিশ্রকে তিনি ধনী বলে বর্ণনা করেছেন [দাস দাসী যত মিশ্রের মন্দিরে খাটে/নিমাইর গলায় মণিমুক্তা প্রবাল হার]।

২. জয়ানন্দের মতে, ছাত্রাবস্থায় জগন্নাথ কীর্তনে উন্মত্ত হতেন। অন্য গ্রন্থে আছে জগন্নাথমিশ্রের পিতার নাম উপেন্দ্র মিশ্র, জয়ানন্দের মতে জনার্দন। এমনি তথ্যের ভুল সর্বত্র দৃশ্যমান। জয়ানন্দের মতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুসংবাদেই চৈতন্যমনে বৈরাগ্য দেখা দিয়েছিল ঃ

লক্ষ্মীর বিয়োগ কথা লোকমুখে শুনি
প্রেমানন্দে কীর্তনে নাচেন দ্বিজমণি।

এবং সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে চৈতন্য বলছেন ঃ

গৌরাঙ্গ বলেন আমার বৈরাগ্য স্বধর্ম
বৈরাগ্য ছাড়িয়া আমার নাই কোন কর্ম।
কুলধর্ম যুগধর্ম আমি না পালিব
কেমতে সংসারে লোকধর্ম প্রচারিব।

তবু জয়ানন্দ কতগুলো নির্ভুল তথ্যও পরিবেশন করেছেন, যেগুলো অন্যান্য চরিতগ্রন্থে সঠিকভাবে মেলে না। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কয়েকটি বিশিষ্ট ও নির্ভুল তথ্যের পরিবেশনের কৃতিত্ব জয়ানন্দের বলে উল্লেখ করেছেন[১]

যথা ঃ

ক. চৈতন্যের জন্ম–সন্ধ্যায় চাঁদের পূর্ণগ্রহণ ছিল [জয়ানন্দ ঃ ফাল্গুন মাসের রাহু চন্দ্রে সর্বগ্রাস, পৃঃ ২১৬]।

---

১. *ভূমিকা–জয়ানন্দ দাস রচিত চৈতন্যমঙ্গল।*

খ. চৈতন্যতিরোভাব ঘটেছিল—'আষাঢ় সপ্তমীতিথি শুক্লাতে–১৪৫৫ শকের শুক্লা সপ্তমী তিথি ছিল রবিবারে।

গ. যবন হরিদাসের নিবাস ছিল বুঢ়ণ পরগনার ভাটকলাগাছি গাঁয়ে। পিতার নাম মনোহর এবং মাতার নাম উজ্জ্বলা।

ঘ. যবন হরিদাসের মৃত্যু হয়–১৪৫৫ শকের ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দশীর উদয়লগ্নে [৯ই মার্চ, ১৫৩৩]।

ঙ. চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের [ইনিই সম্ভবত চৈতন্যচরিতামৃত ও বৈষ্ণবাচার দর্পণ-উক্ত সুবুদ্ধি মিশ্র] আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ১৪৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে।

চ. জয়ানন্দের পিতৃব্যরা [বাণীনাথ, মহানন্দ, কবীন্দ্র, বৈষ্ণবমিশ্র, রামানন্দ মিশ্র] ধার্মিক ও তৈর্থিক হলেও রঘুনাথ উপাসক ছিলেন। এঁরা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ। কেবল তাঁর পিতা সুবুদ্ধিই [সম্ভবত নিমাই (চৈতন্যদেবের) পণ্ডিতের ছাত্র] 'তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির (চৈতন্য?) পূর্ব শিষ্য ছিলেন। এজন্যেই সক্ষোভে জয়ানন্দ বলেন–'খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি'। জয়ানন্দের মা রোদনীও নিত্যানন্দের শিষ্যা ছিলেন—'মাতা রোদনী মোর নিত্যানন্দের দাসী' [পৃঃ ১২৮]।

ছ. জয়ানন্দ মাতামহের ঘরে 'বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী'র তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

জ. চৈতন্য পার্ষদ গধাধব পণ্ডিতের আদেশে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত। নিত্যানন্দশিষ্য অভিরাম গোস্বামী তাঁকে 'বল' বা গ্রন্থ রচনায় সাহস তথা উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এবং বীরভদ্র তাঁকে 'প্রসাদমালা' দিয়ে ধন্য করেছিলেন।

ঝ. যদুনাথ দাসের 'শাখা নির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে গদাধর শিষ্যরূপে জয়ানন্দের নাম মেলে।

ঞ. বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার যে সব স্থান জয়ানন্দ পর্যটন করেছিলেন, সে সব স্থানের সঠিক বিবরণ রয়েছে তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে।

ট. চৈতন্য জন্মের অব্যবহিত পূর্বে গৌড়ে নবদ্বীপে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

ঠ. উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র শত্রুতা ছিল। প্রতাপরুদ্রকে গৌড়সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব।

ড. কেবল জয়ানন্দই চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করেছেন ঃ

আষাঢ় বঞ্চিতা (?) রথ বিজয় নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে। .....
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে
সেই লক্ষে টোএটা শয়ন অবশেষে। ......
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা .....
মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি [জয়ানন্দ, পৃঃ ২৩৪]

তা ছাড়া নিত্যানন্দের ও অদ্বৈতের মৃত্যুতিথিও রয়েছে এ গ্রন্থে ঃ

আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিল ছাড়ি ক্ষিতি। [পৃঃ ২৩৬]

অদ্বৈত ঃ পৌষ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি হৈলা
আচার্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠবিজয় করিলা। [পৃঃ ২৩৬]

গ্রন্থ শেষে [উত্তর খণ্ডে] চৈতন্যের মর্ত্যলীলার সার ও সূত্র দেয়া হয়েছে।

চৈতন্য চরিতগ্রন্থের মধ্যে কেবল জয়ানন্দই বিচ্ছেদকাতরা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে 'বারমাস্যা' বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে শচীর বিলাপ ও স্ত্রীর বারমাস্যা কারুণ্যের নির্ঝর। চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত কাহিনী সূচী এরূপ ঃ

প্রথমে ত আদিখণ্ড যুগধর্ম কর্ম।
দ্বিতীয়ে নদীয়াখণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম।।
তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ডে ছাড়ি নিজ বাস।
চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস।।
পঞ্চমে উৎকলখণ্ডে গেলা নীলাচলে।
ষষ্ঠমে প্রকাশখণ্ডে প্রকাশ উজ্জ্বলে।।
সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি।
অষ্টমে বিজয়খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী।।
নবমে উত্তরখণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।
যুগাবতারে যত করিলা গৌরাঙ্গ।।
এই নবখণ্ড গীত চৈতন্যমঙ্গল।

জয়ানন্দ তাঁর পূর্ববর্তী চৈতন্যলীলা-লেখকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই রচনা আজো অপ্রাপ্ত—কালে বিলুপ্ত হয়েছে। এ সূত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য কবিদের স্মরণ করেছেন ঃ

রামায়ণ রচিল বাল্মীকি মহাকবি
পাঁচালী করিলা কৃত্তিবাস অনুভবি।
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
কৃষ্ণের চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ব্যাস অবতার
চৈতন্যচরিত আগে করিল প্রচার।
চৈতন্য সহস্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে
সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে।
পরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়
সংক্ষেপে করিলেন তিহোঁ গৌরাঙ্গবিজয়।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবনদাস প্রচারিল সর্বোপরি।
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী
সঙ্গীত প্রবন্ধে তাব পদে পদে ধ্বনি।
সংক্ষেপে করিল অতি পরমানন্দগুপ্ত
গৌরাঙ্গবিজয়গীত শুনিতে অদ্ভুত।
গোপাল বসু করিলেন গীতত [সঙ্গীত] প্রবন্ধে
চৈতন্যমঙ্গল তারা চামর বিছন্দে। [পৃঃ ৪]

সমাজ ও সংস্কৃতি চিত্র

চৈতন্যের আবির্ভাব মুহূর্তে জয়ানন্দের চোখে ও ভাষায় দেশের ও সমাজের অবস্থা ছিল এরূপ ঃ
চৈতন্যের পূর্বপুরুষ ঃ

চৈতন্য গোসাঞিঁর পূর্বপুরুষ
আছিল জাজপুরে [উৎকলের]
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাইয়া গেলো
রাজা ভ্রমরের ডরে।

দেশে কলির কুলক্ষন ঃ
এথা কলি যুগে বড় হইল অনাচার।
পৃথিবী কান্দিআ গেলা ব্রহ্মার দুয়ার।
প্রজাপতির চরণে করিল নিবেদন।
কলি যুগে হইল যত যত অলক্ষণ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ।
কলিযুগে ছাড়ে লোক নিজ নিজ কর্ম।।
পৃথিবী হরিল শস্য ইন্দ্র হরে নীর।
পুষ্প গন্ধ করিল কপিলা হরে ক্ষীর।।
আসুরীর ভাব হইল প্রতি ঘরে ঘরে।
স্ত্রী হত্যা স্বামীর বচন নাঞি ধরে।
বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস্য মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী।।
রাজা নাঞি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার।
দুই তিন চারি বর্ণ হৈল একাকার।।
দেবতা ব্রাহ্মণে হিংসা করে ম্লেচ্ছ জাতি।
ক্ষেত্রীযুদ্ধে শক্তিহীন নাঞি যতি সতী।।
গোপোষণ বলি যজ্ঞ ছাড়িল বৈশ্য দেবা।
শূদ্র সব ছাড়িলেক ব্রাহ্মণের সেবা।
কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন।
সর্বলোক হইল শিশ্নোদর পরায়ণ।।
ব্রত যজ্ঞ উপবাস নাঞি কার শক্তি।
গঙ্গা তুলসীর সেবা নাহি বিষ্ণুভক্তি।।
মা বাপ ছাড়িল পুত্র স্বতন্ত্রা যুবতী।
পরদারে রত হইল লঙ্ঘে নিজ সতী।।
স্নানসন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাহ্মণে।
শূদ্রের জীবিকা করে ভয় নাঞি মানে।।
শূদ্রস্ত্রী সঙ্গম করে শূদ্র ভক্ষ্যে রত।
মৎস্য-মাংসে লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত।।
সুতার শঞ্চম (২) ঘর নগর চাতর।
ইষ্টকার চিত দ্বার প্রাচীর ভিতর।।
নাটশাল পাঠশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী।
ধ্বজ কল হংস পারাবত করে কেলি।।
বৃক্ষ ঃ
নারিকেল পনস গুবাক আম্র বটে।
বকুল চম্পক তাল কদম্ব নিকটে।।
অশ্বত্থ তেতুল নিম্ব জাম্বু, খর্জ্জুরে।
নারেঙ্গ ছোলঙ্গ বিল্ব লবঙ্গান্তস্পুরে।।
হিঙ্গুল হরিতাল গুম্ভ চন্দ্রার্ক তিলাকে।
ময়ূর সারস শুক রহি দ্বার মুখে।।
চৌখণ্ডী চৌতারা টঙ্গী কত শাস্ত্রশালা।
প্রসাদ মন্দির প্রপা রক্ষ জাল মালা।।
শ্রীহট্ট ঃ
শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মরক লাগিল।।
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া।
নানা দেশে সর্বলোক গেল পালাইয়া।।
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুরে ছাড়িল উৎপাতে।।....
অনাচার দেশে বসতি যোগ্য নহে।
শ্রীহট্টে উত্তম জন তিলার্ধ না রহে।। ....
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পীড়ন ঃ
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লএ তারে জাতি নাশ করে।।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞ সূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লুটে তার লৌহ পাশে বান্ধে।।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
জীবন ভএ স্থির নহে নবদ্বীপবাসী।।
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।।
পিরল্যা গ্রামেতে বস্যে যতেক যবনে।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণে।।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যাগ্রাম নবদ্বীপ কাছে।।
গৌড়েশ্বর বিদ্যামানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপে বিপ্র তুমার করিব প্রমাদ।।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হএ পাছে।।
নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা।।
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।
খাদ্য ঃ
ঘৃতান্ন সভারে দিল শাক মুগ সুপ।
ছেনা বড়ি লফারা পটোল বস্তুক।।
হিঙ্গ ঝাল ঝোল ভাজা তলা কাঁজি বড়া।

বড়াম্বু শর্করা নাড়ু মিঠামুখ বিড়া।
খিরি অমৃত গুটিকা খেবাড়া নবাত।
মনোহর পুরি দুগ্ধপুলি দুগ্ধজাত।।
আস্যা নারিকেল পুলি শাঁকর কাঁকরা।
চন্দ্রকাতি পাএস পরমান্ন শর্করা।
পুটিকা ভালিমা মধু শ্রবাসাত পুলি।
মন সন্তোষ নয়ন সুখ গঙ্গাজল শিঅলি।
মচ্চা ছেনা দুগ্ধ পুলি কোবা মুণ্ড শর।
অনুপাম জগন্নাথ ভোগ সর্বসুখ মার।।
পিঠা পানা ভোজনে বৈষ্ণবে সন্তোষিলা।
মাল্য চন্দন দিয়া সভারে ভূষিলা।।
কর্পুর তাম্বুল দিল দিল সরু বাস।
অর্থ ঃ
অর্থ উপার্জ্জন বিনে সংসার না চলে।
বঙ্গদেশে জাই আমি অর্থের ছলে।।
অর্থ বিনা সংসার কভু নাহি চলে।
অর্থবিদ্যা অর্থরূপ সর্বলোক বলে।।
জগাই-মাধাই ঃ
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ দৈত্য জগাই মাধাই
ভূতালিয়া সিধলিয়া চোর দস্যু দুই ভাই।।
মনসরিয়া বৃত্তি করে থাকে নল বনে।
মহাপাপী জগাই-মাধাই দুইজনে।।
দস্যুগণ সঙ্গে থাকে বনে তেপান্তরে।
নিন্দ না জাএ কেহো জগাই মাধাইর ডরে।।
অন্ন যোনি বিচার নাহিক দুই ভাই।
স্নান সন্ধ্যা বিবর্জিত জগাই মাধাই।।
গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ জত।
বলে ছলে গুরুপত্নী হরে কত শত।।
গোমাংস শূকরমাংস করে সুরাপান।
ধর্মকথা না শুনে না করে গঙ্গাস্নান।।
শিশু সব আছাড়িয়া মারে শিলাপাটে।
কতশত গর্ভবতীর গর্ভ ফাটে।।
গলে যজ্ঞসূত্র বান্ধা জেন সিংহনাদ।
উত্তর বধির প্রায় মহা পরমাদ।
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে।
ঘূণিত লোচন চারুপূর্ণ শক্রাসনে।।
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই।
বুকে বাঁশ দিয়া কারো সর্বস্ব লেই।।
খড়গ তোদণ্ড ভ্রমে গঙ্গাতটে।
অপবাধ খণ্ডে যদি গঙ্গার ঘাট বন্ধ।।
প্রভুর আজ্ঞায় মাধাই ঘাট বান্ধিল।
পাপহরণ ঘাট তার নাম থুইল।
নবদ্বীপে গঙ্গাএ মাধাইর বান্ধা ঘাটে।।
স্নানমাত্র প্রেমযোগ বাড়িবে নিকটে।।
বৎসর ভিতরে এক মেরায় কাটে।
নর বা মেরায়াবলি ঃ
কোটাল দেবভট্ট চণ্ডীমন্ডপে সে খাটে।।
পূজার সময় তার হইল আসিয়া।
ধরা মেরায়া ভএ গেলা পালাইয়া।।
মেরাঞা না পায্যা কোটাল জড় ভরতেরে।
ধরিয়া আনিল সেই মণ্ডপ ভিতরে।।
মেরায়া কাটিতে রাজা গেলা রাত্রিকালে।
হাতে খড়গ সভে হৈল পশুবধশালে।
মেয়ারা বলিয়া জড়ভরতে উছর্গে।
আগে ছাগ মহিষ বলি দিল সেই পূর্বে।।
মেরায়া কাটিতে রাজা খড়গ তুলিল।
মেরায়া না গেল কাটা হাথে খড়গ রইল।।
দেহতত্ত্ব ঃ
আউট হাথ ঘর খানি তাহে দশ দ্বার।
তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার।।
একাদশ চোর তাহে দস্যু পাঁচজন।
গঙ্গাযমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ।
হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে।
ইঙ্গড়া পিঙ্গড়া নাড়ি সুষুম্মার মূলে।।
সহস্রদল পদ্ম মধ্যে শতদল পদ্ম।
তার মধ্যে রত্নসিংহাসন দেব সদ্ম।।
কীর্তনমাহাত্ম্য ঃ
নৃত্য সঙ্কীর্তন করি বিহরে নদীয়া পরী
ভোজন শয়ন সুখ ছাড়ি।
বৈষ্ণবী মালিনী সীতা নারায়ণী ধাত্রী মাতা
গদাধর জগদানন্দে বেড়ি।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম মন্ত্র দিয়া
সভারে কহিল একে একে।
শুনরে নদীয়ার লোক ছাড়িয়া সংসার শোক
কীর্তন করিয়া প্রেম সুখে।।
কীর্তন সকল কর্ম কীর্তন সকল ধর্ম
কীর্তন সকল ব্রহ্মজ্ঞান।
কীর্তন আগম বেদ রাজসূয় অশ্বমেধ
কীর্তন শ্রবণ গঙ্গাস্নান।।

কীর্তন সকল তীর্থ কীর্তন আবেশনৃত্য
শিব শুক সভার গোচর।
কীর্তন বৈকুণ্ঠ পদ কীর্তন সমুদ্র নদ
কীর্তন সভার পরাপর।।
কীর্তন অবলম্বন মাত্রে অধর্ম না রহে গাত্রে।
কীর্তন দর্শনে পাপ ক্ষয়।
কীর্তন রসের ভক্তি কীর্তন নর্তন মুক্তি
কীর্তন মার্জনে সর্বজয়।।
কলিকাল সর্প দংশিবে সর্বজীব।
সঙ্কীর্তন বিনা কার না কইল শিব।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঃ
শুন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া না কর ক্রন্দন।
পতি আজ্ঞা লঙ্ঘিলে কি ধর্মেত প্রয়োজন।
অরুণ উদয় কালে গঙ্গাস্নান করি।
মন্দিরে আসিয়া দিব্য ধৌত বস্ত্র পরি।।
এক মুষ্টি আতপ তুণ্ডুল ভূমে পেলি।
একটি তণ্ডুল লয়া হরে কৃষ্ণ বলি।।
হরিনাম বত্রিশ অক্ষর সাঙ্গ হইলে।
সেই তণ্ডুল গুটি থুইবে গঙ্গাজলে।।
এই মত তিন প্রহরে যত পার।
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে নিবেদন কর।।
সেই অন্নভক্ষণ করিও দেহ রক্ষা হেতু।
তুমার চরিত্র লোকে ধর্মশিক্ষা সেতু।।
কলিকাল ঃ
কলি যুগে হবেক যতেক দুরাচার।
একে একে কহেন সকল সারোদ্ধার।।
ব্রাহ্মণে হরিবেক বেদ ইন্দ্র হরিবেক জল।
নানা ছলে রাজা অর্থ হরিবেক সকল।।
পৃথিবী হরিবেন শস্য রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।।
কপিলা হরিবে ক্ষীর স্বতন্ত্রাযুবতী।।
ব্রাহ্মণ হরিবেক বেদ শূদ্র বৈশ্যাচার।
ভগিনী হরিবে ভাই যুগের বেভার।।
গুরুপত্নী হরিবেক শিষ্য পাপমতি।
স্থাপ্য হরিবেক যত উত্তম জাতি।।
ব্রহ্মস্ব দেবস্ব সব হরিব উত্তম।
নীচ উচ্চ হবেক উত্তম অধম।।
কুলধর্ম হরিবেক যত বৃক্ষ লতা।
কুলবধূ লজ্জা ভয় হরিব সর্বথা।।
গঙ্গা হরিবেন জল ছাড়িব তুলসী।
যবনে উচ্ছন্ন করিবেক বারাণসী।।
পূজা চর্চা হরিবেক যত দেবালয়।
তীর্থ আগম্য হরিবেক জানিহ নিশ্চয়।।
দেউল দেহাবা মঠ ভাঙ্গিবে যবনে।
সন্ধ্যাবেদ দেবার্চনা ছাড়িব ব্রাহ্মণে।।
ক্ষেত্রি সত্ত্বহীন হবে যুদ্ধ শৃগাল।
তিন জাতি সবে লক্ষ্মী বাড়িবে বিশাল।
গোপোষণ বাণিজ্য ছাড়িব বৈশ্য দেবা।
শূদ্র সব ছাড়িবেক ব্রাহ্মণের সেবা।।
পৃথিবী ছাড়িব অবধূত যতি সতী।
মাংস মৎস্য খাবে বিধবা যুবতী।।
পিতা লঙ্ঘিবেক পুত্র গুরু লঙ্ঘিবেক শিষ্য।
বিধবা ব্রাহ্মণী সব খাইব আমিষ্য।।
স্বামী লঙ্ঘিবে স্ত্রী কপটী সংসার।
ভাল বংশে জন্মিয়া হবেক দুরাচার।।
ব্রাহ্মণে ছাড়িব একাদশী যজ্ঞ দান।
শূদ্রসব করিবেক পুরাণ বাখান।।
চণ্ডালিনী শূদ্রী করিব একাদশী।
উত্তম জনের ঘর ছাড়িব তুলসী।।
শূদ্রাণী লইয়া ঘর করিবে সন্ন্যাসী।
অর্থ সঞ্চয় কারবেক জত তীর্থবাসী।।
শূদ্রিণী লইয়া ঘর করিবে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণী লইআ ঘর করিব সজর্বন।।
সন্ন্যাসী করিব অর্থ সঞ্চয় বাণিজ্যা।
শূদ্র দেবালয়ে হবে কৃষ্ণ পরিচর্যা।।
নাহা লুহা লবণ বেচিবে ব্রাহ্মণে।
কন্যা বেচিবেক যে সর্বশাস্ত্র জানে।।
ব্রাহ্মণ রাখিব দাড়ি পারস্য কহিবে।
মোজা পাগড়ি হাতে কামান ধরিবে।।
মনসবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবরে।
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তরে।।
শূদ্রে পূজিবেক মূর্তি শালগ্রাম শিলা।
কার্যাপণে বিকাবেক সুরভি কপিলা।।
ঘৃত মধু তিল কুশ যব জাতাঙ্কুর।
দধি লাজ দূর্বা ধান স্বস্তিক সিন্দুর।
এসব ছাড়িবেক পৃথ্বী কলি অবশেষে।
অশ্বত্থ কদম্ব নিম্ব না থাকিব দেশে।।
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ চামর চন্দ্রাতাপ।

কলি শেষে পৃথিবী ছাড়িব এসব।।
ছাগী প্রায় ধেনু হবে নৃত্য প্রায় মেঘ।
অঙ্গুষ্ঠ প্রায় মনুষ্য পতঙ্গ প্রায় বেগ।।
সাত আট বৎসরে স্ত্রী গর্ভ ধরিবে।
এক গর্ভে পাঁচ সাত ছাওয়াল জন্মিবে।।
শূদ্র জগৎগুরু হবে ম্লেচ্ছ হবেক রাজা।
রাজা সর্বস্ব নিবেক দুঃখী হবে প্রজা।।
দাতা দরিদ্র হবেক কৃপণ হবে হীন।
পাপী দিঘা পূর্বাট মারিবেক সদগুণ।।
অল্প বিদ্যায় হবেক মহা বিদ্বান।
অল্প ধনে হবেক সে মহা ধনবান।।

গৌড়ে উৎকলে শত্রুতা ঃ

গৌড়ে উৎকলে পড়িল মহা শাস্তি।।
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।
শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা।।
চৈতন্য দেবের রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল।।
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দুল দেখ কতেক আন্তর।।
উড্র দেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেন এতোদিনে।।

কবির পিতার গৃহে চৈতন্যদেব ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে উত্তপ্ত সিকতা পথে
তরুতলে করিল শয়ন।।
বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
মাঞিপুরা তার নাম।
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব শিষ্য
তার ঘরে করিল বিশ্রাম।।
তাহার নন্দন গুহিয়া জয়ানন্দ নাম থুয়া
রোঙ্গনী রান্ধিল তার লঞা।।

৩. লোচন দাস

লোচন দাস তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম কমল দাসকর, মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয়া দাসী, দীক্ষাগুরু শ্রীখণ্ডের নরহরিদাস সরকার। কবির নিবাস বর্ধমানের কোগ্রাম। এঁরা বর্ণে বৈদ্য। নরহরি সরকার ছিলেন গৌরপারম্যবাদী. কাজেই লোচন দাসও সে-মতাবলম্বী এবং গ্রন্থে গৌরনাগরবাদ প্রকট।

লোচন দাস চৈতন্যঅবতারের পটভূমি ও প্রমাণ হিসেবে ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র, মহাভাগবত প্রভৃতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু চৈতন্যলীলার মূলসূত্রগুলো মুরারি গুপ্তের কড়চাভিত্তিক, যদিও তার সঙ্গে নরহরির কাছে শোনা ও অন্যসূত্রে জানা কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। এবং বিমানবিহারী মজুমদারের মতে উড়িয়া কবি মাধবের চৈতন্যবিলাস অবলম্বনে লোচন দাস চৈতন্যের সন্ন্যাস সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন [চৈ. চ. উ. পৃ ২৮৩]। অতএব, লোচন মুখ্যত মুরারি ও মাধবের অনুসারী। লোচন নিজেই স্বীকার করেছেন যে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থই তাকে চৈতন্যমঙ্গল রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। চৈতন্যলীলার লেখক হিসেবে তিনিও পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন ঃ

পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস
কাশীশ্বর রূপ সনাতন পরকাশ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর
সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার। (পৃঃ ৩৪)

লোচন দাস বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'ভাগবতগীত' বলেই জানতেন–'শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যার ভাগবতগীতে'। কাজেই লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করে বা লোচনের অনুরোধে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গল এর নাম পরিবর্তন করে চৈতন্যভাগবত রেখেছিলেন বলে যে কাহিনী বৈষ্ণবসমাজে চালু রয়েছে, তা' বানানো। আমরা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাস ও ভাগবত যে স্বতস্ফূর্ত নাম তা' ব্যাখ্যা করে বলেছি। তাছাড়া লৌকিক দেবতার মঙ্গলগানের পাঁচালীর প্রভাবে চৈতন্যলীলাবিষয়ক কাহিনী মাত্রই মঙ্গল এবং সূত্র মাত্রই কড়চা বা বিজয়—এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়েছে বলেই মনে হয়। বহুকাল পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, 'বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল'। আর একটি জনশ্রুতিমূলক

কথা চালু আছে যে লোচনদাস চৌদ্দ বছর বয়সে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এটি যে ভিত্তিহীন ও অসম্ভব তার প্রমাণ লোচনের কাব্যে বৈদগ্ধ্যের ও জ্ঞান প্রজ্ঞার নিদর্শন রয়েছে।

'অতএব নির্ণয় কথা কেমনে বাখানি' (সূত্রখণ্ড পৃঃ ৩৩) কবির এ উক্তিতে গুরুত্ব দিয়ে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার লোচনদাসের গ্রন্থ ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কিন্তু এটি অকাট্য যুক্তি নয়, কারণ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' আগে রচিত হলেও লোচন সে-গ্রন্থ নাও পড়তে পারেন, পড়লেও পাপপুণ্য সম্পৃক্ত তত্ত্বে বিশ্বাস দৃঢ়মূল না হওয়ায় তা শুনে বা জেনে গ্রহণ করতে চাননি। তাই হয়তো কবি বলেছেন,

অতএব নির্ণয় কথা কেমনে বাখানি।
মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কানে
তাহা কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, কথিত আছে যে তিনি ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে নরহরি সরকারের আদেশে এ গ্রন্থ রচনা করেন। লোচন দাসের গ্রন্থে পূর্বসূরী হিসেবে জয়ানন্দের উল্লেখ নেই, বৃন্দাবন দাসের নাম আছে। কাজেই লোচন দাস জয়ানন্দের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বেই চৈতন্যলীলা রচনা করেছিলেন এ অনুমান অসঙ্গত নয়। সতেরো শতকে রচিত রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়ে' বৈদ্য বংশীয় লোচন দাস সম্পৰ্কে এরূপ তথ্য মেলে ঃ

আর এক শাখা বৈদ্য লোচন দাস নাম।
শ্রীচৈতন্যলীলা যেহ করিল বর্ণন
গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন।

—এর তাৎপর্য যদি এরূপ হয় যে, গুরু নরহরি সরকারের কিংবা কোন শিক্ষা গুরুর জন্যে ফিরিঙ্গির (ফরাসির বা পর্তুগীজের) কাছে জামিন থেকে তিনি অর্থ ঋণ করেছিলেন, এবং পরে সে ঋণের দায়ে জামিন লোচন দাসকেই ফিরিঙ্গি উত্তমর্ণ কয়েদ করেছিল, তা হলে লোচন দাস নিশ্চিতই ষোল শতকের শেষাবধি জীবিত ছিলেন। কেননা ষোল শতকের তৃতীয় পাদেও পর্তুগীজ কিংবা অন্য য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসায় অথবা মহাজনী সূত্রে দেশীলোকের এতো ঘনিষ্ঠতা হবার কথা নয়। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, তিনটি উদ্দেশ্যে লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন ঃ এক, গুরু নরহরি সরকারকে চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠপার্ষদ রূপে পরিচিতি করা, দুই, নরহরি সরকারকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ঠাঁই দেয়া, তিন, গৌরনাগর উপাসনা প্রচারে জন্যে নাগরীভাবকে জনপ্রিয় করা (চৈঃ উপাদান, পৃঃ ২৫৭)। শিয়া মুসলমানদের যেমন পাকপঞ্জাতন [রসুল, আলি, ফাতেমা, হাসান, হোসেন] তেমনি বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের অবতারের পার্ষদ প্রচারক ভক্ত হিসেবে পাঁচজন চৈতন্যের কিছু আগে-পরে নবদ্বীপে ও তার চার উপকণ্ঠে আবির্ভূত হন। কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্বরূপ দামোদরের হিসেবে চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর ও শ্রীনিবাস। লোচন দাসের হিসেবে চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গধাধর ও নরহরি—'জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ [সূত্র খণ্ড, পৃঃ ২ ও আদি খণ্ড]। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্য নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-শ্রীবাস-গধাধর (পৃ-৪)। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণব হিতৈষিণীতে বন্দনায় নামক্রম এরূপ—চৈতন্য, মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীধরস্বামী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র, বাণীবিলাস, তারপরে অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, নিত্যানন্দ অবধূত ও গদাধর পণ্ডিত। অতএব সনাতন স্পষ্টত পঞ্চতত্ত্ব মানেন নি। নারায়ণের নির্দেশে কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম' পালনের জন্যে ভাগবতরূপে চৈতন্যপরিকরদের মানব জন্ম গ্রহণ (চৈঃ ভাঃ পৃঃ ৯)। লোচন দাস বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত নাগরী ভাব রাধা-কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়ে দেয়। নদীয়ার নারীমাত্রাই এক অঙ্গে অপরূপ রূপ দেখে কামে-প্রেমে আবেগতাড়িত, গৌরাঙ্গও যেন কখনো কখনো বিচলিত : 'গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান শরঘাতে মানিনীর মান-মৃগ পালায় বিপথে।' শিশু নিমাইয়ের এক অঙ্গে এত রূপ দেখে নদীয়ার নাগরীদের 'অলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবিবন্ধ'। কেবল তাই নয় 'মরমে মদন জ্বরে ঢলিয়া পড়িল'। কেউবা 'গর গর কামে উনমতা'। কাজেই

গৌরপারম্যবাদীরা চৈতন্যকে কৃষ্ণের মতো কাম-প্রেমের আধার বলে জেনেছিল এবং রাধাভাবে সাধ্য বলেই মেনেছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদপুষ্ট বৈষ্ণবসহজিয়া মত এই গৌরপারম্যতত্ত্ব ভিত্তি করেই প্রবল হয়।

লোচন দাস একটি পদে চৈতন্যদেবের মূর্ত পার্ষদদের স্মরণ করেছেন ঃ

গোরাগুণে আছিলা ঠাকুর নরহরি
স্বরূপ রূপ সনাতন মুকুন্দ মুরারি।
প্রিয় গদাধর আর ঠাকুর শ্রীনিবাস

নিত্যানন্দের পরিচয় ঃ
নিত্যানন্দ রায় বন্দো রোহিনী সূত।
অন্যত্র ঃ পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম।
পিতামাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত।
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ যোগ মাঘ মাসে
পৃথিবী জনম লৈল পরম হরিষে।
আদ্যোপাস্তে যেইরূপে প্রেম প্রচারিল।
দামোদর পণ্ডিত সর্বপুছিল তাহারে
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে।
শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গচরিত
দামোদর সম্বাদ মুরারি মুখোদিত
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত।

পঞ্চতত্ত্ব ঃ
জয় জয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী।
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য মহেশ্বর।
লোক শিক্ষা হেতু প্রভু কৈল অবতার।
সার্বভৌম বসি তথা বেদান্ত পড়ায়।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে নর্তন কীর্তন।

চৈতন্যজন্মলগ্ন ঃ
শুভ দিন শুভ ক্ষণ পূর্ণিমার তিথি
ফাল্গুনের শুভ নিশি হিমকর জুতি।
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদ্ভুত বেলে
প্রভু জন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে।
ষষ্ঠীপূজা ষষ্ঠী পূজাবারে যাই বটতলে।

মৃত পার্ষদদের স্মরণ করেছেন :
প্রিয় বাসুঘোষ আর প্রাণ হরিদাস।
পরাণের পরাণ গেল শ্রীরঘুনন্দন
না মরে এসব শোকে এ দাস লোচন।

যোগতত্ত্ব ঃ
(মুরারির) সনে যোগশাস্ত্র বাখানে
সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ
চৈতন্য বিবাহ উৎসবে
গুবাক, চন্দন, মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দুর পরিল।।
খাদি, কদলক আর তৈল হরিদ্রা।
প্রত্যেকে সভারে দিল শচী সুচরিতা।।

বাদ্য ঃ
শঙ্খ, দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
মৃদঙ্গ পটাহ বাজে কাংস্য করতাল।।
ঢাকের দুড়দুড়ি শুনি যোজনেক পথে।
শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহিনী-শবদে।।
বীণা, বেণু, কুপিলা সব বংশীর নিশান।
রবাব, উপাঙ্গ, পাখোয়াজ একতান।।
দামামা দগড় বাজে পটাহ মৃদঙ্গ।
দোহরি মোহরি বাজে শুনিতে আনন্দ।।
নর্তক নাচয়ে গীত গাএত গায়েন।
শুভক্ষণ করি কৈল মস্তকমুণ্ডন।।

নর্তক ও ভাট ঃ
নর্তকেরে দিল দ্রব্য, আর ভাটগণে।
সভার সন্তোষকৈল নানাদ্রব্য দানে।।
বরস্নান বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুনঃস্নান।
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল সেকালে।
শ্রীঅঙ্গ-মার্জনা করে কুলবধূ মেলে।।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়েন গায় গীত।।
ব্রাহ্মণেতে বেদপঠে ভাটে কারবার।
কুলবধূ মেলি, দেহ হুলাহুলি,
আনন্দে মঙ্গল গাহরে।।

হার কেয়ূর, কঙ্কন, কিঙ্কিনী
নুপুর পরহ না কাট।
অলকা নিকপে, সিন্দুর ললাটে,
চন্দনবিন্দু তার হেট।।

তাম্বুল অধরে,   তাম্বুল বাম করে
লীলায় ঢুলি ঢুলি যায়।
বধূবরণ ঃ
পুত্র আর বধূকোলে করে শচীদেবী।
দূর্বা ধান্য ঘৃতবাতি দিয়া কোলে হও চিরজীবী
জগাই মাধাই ঃ
সেই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।
অতি দুরাচার সেই—পাপে নাহি অন্ত।।
মহাপাপী ব্রহ্ম সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর যে জগাই মাধাই।।
ব্রাহ্মণী, যবনী, গুর্বাঙ্গণা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে।।
দেব-গুরু-ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনা বধে না যায় ঘর।।
ব্রহ্মবধ, গোবধ, স্ত্রীবধ শত শত।
শুভযাত্রা ঃ
চুয়া-চন্দনের ছড়া দিল রাজপথে।।
খদি, দধি, মঙ্গল দূর্ব্বা, কুঙ্কুম, কস্তুরি।
সূক্ষ্মপুষ্প উজ্জ্বল, দীপ জ্বালে সারি সারি
যৌগীবেশে ঃ
মুঞি মুণ্ড মুড়াইয়া হইমু নাড়ি।।
রক্তবস্ত্র পরিব–কুণ্ডল দিমু কানে
যোগিনী হইয়া আমি যাব তোমার সনে।
চৈতন্য সহস্র নামতোস্ত্র ঃ
স্তুতি করে সার্বভৌম গদগদস্বর।।
গদগদ-স্বরে পড়ে সহস্রেক স্তব।
'চৈতন্যসহস্র' নামে জানে লোক সব।।

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যচরিতামৃত কেবল চৈতন্যলীলার বর্ণনাগ্রন্থ রূপে নয়, বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থ রূপেও সমাদৃত। বস্তুত তত্ত্বশাস্ত্রের আকর রূপে এটি ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছে। এ গ্রন্থে অবতার চৈতন্যের মর্ত্যলীলা, চৈতন্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব উচ্চ দার্শনিক সূক্ষ্মতায় বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৈষ্ণবদের ও দার্শনিকদের কাছে 'চৈতন্যচরিতামৃত মহৎ বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতার জন্যে লেখা' (সুকুমাব সেন, পূর্বার্ধ পৃঃ ৩৪৫)। চৈতন্যলীলা বর্ণনায় তাব প্রধান অবলম্বন ছিল স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস।
কবির ভাষায় ঃ

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরাবি
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি।
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে তেহোঁ ছাড়িল যে যে স্থান
সেই সেই স্থান কিছু করিব বাখান।

চৈতন্যলীলা রত্নসার/স্বরূপের ভাণ্ডার/তিহঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে/তাঁহা কিছু যে শুনিল/তাহা ইঁহা বিচারিল / ভক্তগণে দিল এই ভেটে। (চৈ. চ.)

অন্যত্র–   স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ। (পৃঃ ৫৭৯)

—এতে মনে হবে রঘুনাথ দাসও একটি কড়চা লিখেছিলেন।

বিশেষত বৃন্দাবন দাসের—

নিত্যানন্দ বর্ণনে হইল আবেশ
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।

এবং বৃন্দাবন দাস যে কিছু বর্ণিল সেই সংক্ষেপ করিয়া. লিখিতে না পারি–গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া' (পৃঃ ৬২৪), আর আশা করেছিলেন ভবিষ্যতে 'বিস্তারিয়া (চৈতন্য লীলার) বেদব্যাস করিব বর্ণনে'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসের উদ্দিষ্ট সেই ভাবী বেদব্যাস। কৃষ্ণদাসও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পদ্ম, আদি, কূর্ম, গরুড়, বৃহৎ নারদীয়, স্কন্দ, ব্রহ্ম পুরাণ এবং রামায়ণ, মহাভারত, নারদপঞ্চরাত্র, বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি থেকে শ্লোক ও প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিদ্বান ছিলেন–'কাব্যনাটক কত' / পরমানন্দাদি শত শত/ পড়িলেন বিবিধ প্রকারে। চৈতন্যচরিতামৃতশাস্ত্র সিন্ধু মথি কত / লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস' (উদ্ধবদাস, পদ)। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যজীবনের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো তাঁর পূর্ববর্তী চরিতকারদের গ্রন্থে নেই। তিনি ষড়গো স্বামী-ব্যাখ্যাত চৈতন্যতত্ত্ব ও বৈষ্ণবের সাধ্যতত্ত্বের অনুসরণ করেছেন। এবং ঐ মূল তত্ত্বের আলোকে তিনি চৈতন্যের অন্তর্লোকের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। এজন্যেই চৈতন্যচরিতামৃত ষড়গোস্বামী প্রভাবিত বৃন্দাবনী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ ঃ

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন
চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন।
ভাবতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব আর
ক্রমে ক্রমে লিখিয়াছেন করিয়া বিচার।
জ্ঞানযোগ বিধিভক্তি রাগ নিরূপণ
কাঁহু নাহি দেখি শুনি এমন বর্ণন।

(সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়–মুকুন্দ বিরচিত)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রথম কাব্য 'গোবিন্দলীলামৃত' সংস্কৃতভাষায় ২৫৮৮ শ্লোক সম্বলিত বিপুলকায় গ্রন্থ। এ কাব্য লিখেই হয়তো তিনি কবিরাজ উপাধি পেয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস ছিলেন বর্ণে বৈদ্য। প্রথম জীবনে তিনি গৃহী ছিলেন। তখন তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে কীর্তনোৎসব হত—'আমার বাড়িতে অহোরাত্র সংকীর্তন'। তিনি নিমাই-নিতাইকে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলেই মানতেন—

'দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ, ...
একে মানি আর না মানি এই মত ভণ্ড।'

গৃহী হিসেবেও গৃহদেবতা কৃষ্ণের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। পূজারী ব্রাহ্মণের নাম ছিল গুণার্ণব মিশ্র। কাটোয়ার অনতিদূরে ঝামটপুর গাঁয়ে ছিল তাঁর নিবাস। তাঁর অন্তত একটি ছোট ভাইও ছিল। স্বপ্নে নিত্যানন্দের আদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন। কাজেই নিত্যানন্দ তখন মৃত। বৃন্দাবনে যখন গেলেন তখন সনাতন ছাড়া অন্য গোস্বামীরা জীবিত। নিত্যানন্দের মৃত্যু যদি ১৫৪২ সনেও হয়, তা' হলেও বলতে হবে কৃষ্ণদাস হয় তখন অজাত অথবা তখন তাঁর বাল্যকাল। এদিকে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে যান, তার আগেই কোন সময়ে সনাতনের মৃত্যু [আঃ ১৫৫৮ খ্রীঃ] হয়েছিল। অতএব গৃহী কৃষ্ণদাস ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দের পরে মধ্যবয়সেই [৪০ বছর বয়সে] বৃন্দাবনে যান বলে অনুমান করি। তখন বীরভদ্রও সুখ্যাত গুরু। বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে—

সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু স্মরণ
যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ। (চৈ. চ.)

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের পরেই ত্রিশোত্তর বয়সে বীরভদ্রের এরূপ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। তা'ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিণত বয়সে—বৃদ্ধ বয়সে তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন—'আমি জরাতুর নিকট জানিয়া মরণ/অন্তলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণনা'। তাঁর গ্রন্থসমাপ্তির বিশ্বাসযোগ্য তারিখ হচ্ছে–তাঁর গ্রন্থোক্ত এই

শ্লোকটি ঃ শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে
সূর্যোহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাংগত।

সিন্ধু-[প্রাচীন মতে ৭ নয়]-৪, অগ্নি-৩, বাণ-৫, ইন্দু-১ অঙ্কস্যবামাগতি হিসেবে সূর্যাহ্ন-রবিবার, অসিত পঞ্চমী—কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি। ১৫৩৪ শক বা ১৬১২ [৭ই জুন] খ্রিস্টাব্দ হয়, অথবা সমুদ্র ৭ ধরলে ১৬১৫ [৭ই মে] খ্রিস্টাব্দ হবে। গ্রন্থসমাপ্তি কালে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ। 'প্রেমবিলাস' মতে বাঙলাদেশে শ্রীনিবাসের হাতে তাঁর গ্রন্থ পাঠানোর কালে পথে তা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হওয়ার সংবাদে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন বলে [অবিশ্বাস্য] জনশ্রুতি আছে। গ্রন্থ রচনা করতে যদি বারো বছর সময় লাগে এবং ১৬১২ বা ১৬১৫ সনে যদি কৃষ্ণদাসের বয়স ৭৫ বছর হয়,—[বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির] তাহলে তাঁর অনুমানিক জন্ম সন ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ এবং তাঁর বৃন্দাবন বাসের শুরু [৪০ বছর বয়সে] ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে। এবং তিনি সেখানে তাঁর প্রথম গ্রন্থ বিপুল কলেবর কাব্য গোবিন্দলীলামৃত রচনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-এর টীকা লেখেন। বিমানবিহারী মজুমদার ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে (চ. চ. উ. পৃ ২৯৬), সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম বলে মেনে নিয়েছেন, তা হলে গ্রন্থ সমাপ্তি ঘটে কবির ৮৫ বা ৮৮ বছর বয়সে যা অসম্ভব। ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে বাঁচার কল্পনা একালেও কেউ করতে পারে না, কৃচিৎ কেউ বাঁচে। এবং এও মানতে হবে যে চৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে ষড়গোস্বামীর কেউ বেঁচে থাকার কথা নয়, তবু তিনি প্রায় সব ভণিতায় 'শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ' বলে দু'জনকে স্মরণ করেছেন। কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃতে রূপ, জীব, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের নাম আদেষ্টা রূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতের আদেষ্টা রূপে কোন চৈতন্যপরিকর-পার্ষদের নাম করেননি, বরং যাঁরা তাঁকে এ গ্রন্থ রচনায় প্রবর্তনা দিয়েছেন, তাঁরা সবাই দ্বিতীয় বা তৃতীয় উত্তরপুরুষ বা প্রজন্মের লোক, যেমন-গদাধর গোস্বামীর প্রশিষ্য হরিদাসপণ্ডিত, চৈতন্যপণ্ডিত, কাশীরামের শিষ্য গোবিন্দ, শ্রীজীবসঙ্গী যাদবাচার্য, অদ্বৈতশিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি [চৈ. চ. আদিলীলা, ৮ম সর্গ]। জীবগোস্বামী ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'গোপালচম্পূ' রচনা শেষ করেন এবং এর অল্পকাল পরে তাঁর তিরোভাব ঘটে। বর্ধমান সাহিত্যসভায় রক্ষিত পাতড়া অনুসারে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে জীবগোস্বামীর প্রয়াণ ঘটে।[১]

যদুনাথ দাস 'গোবিন্দলীলামৃত' অনুবাদ করেছিলেন। যদুনাথের মতে কৃষ্ণদাস তিনখানি গ্রন্থপ্রণেতা-

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া....
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার----
কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে
তাহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রকটনে।

সহজিয়ারা 'বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা', 'স্বরূপ বর্ণনা প্রকাশ' প্রভৃতি কয়েকখানি জালগ্রন্থও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালিয়েছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আক্ষরিক অর্থেই বিনয়ী বৈষ্ণব ছিলেন—

১. জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।

২. চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে।
শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ।

আবার তিনি 'বিশ্বাসে মিলএ ধর্ম তর্কে বহুদূর' তত্ত্বেও আস্থাবান ছিলেন, তাই বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি ও মত তিনি সহ্য করতেন না ঃ

১. তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দূরাচার
কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার।

২. তর্ক না করিও তর্কে হয় বিপরীত [পৃঃ ৪৯৬]

১. *সুখময় মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (পৃঃ ১৯৭)*

আবার স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরধর্মের অপকর্ষ প্রদর্শনেও তাঁর উৎসাহ অশেষ। ইসলামের, বৌদ্ধধর্মের এবং শঙ্কর, মাধব প্রভৃতির মতবাদের নিন্দায় তিনি মুখর। চৈতন্যাবতারে অবিশ্বাসী পামর-পাষণ্ডদের তিনি দৈত্য ও অসুর বলে গালও দিয়েছেন। তাঁর কালের রাজধর্মের অসারতাও তিনি কাজীর মুখে স্বীকার করিয়েছেন ঃ

আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার বিচারসহ নয়
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।

অবশ্য এ কৃষ্ণদাসের দোষ নয়, আমরা জানি আস্তিক মানুষ মাত্রই পরধর্মে অবজ্ঞাপরায়ণ—এ তার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি বা মৌল শর্ত। পরধর্মের প্রতি সীমিত অর্থে উদার ও সহিষ্ণু হওয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব। কেননা, সেক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সে পরিমাণেই স্বধর্মে নিষ্ঠা হ্রাস পাবে। তাছাড়া আধুনিক ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের মতো ধর্মপ্রচার করতে হলে স্বমতের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরমতের অপকর্ষ প্রতিপাদন করতেই হয়। তাই প্রচার ও প্রচারণা প্রায় সমার্থক। এই প্রচারের ও প্রচারণার জন্যে তিনি বহু বহু মৌলিক ব্যাখ্যা-ভাষ্য তৈরি করেছেন এবং লৌকিক-অলৌকিক গল্প বানিয়েছেন।

ডক্টর বিমানবিহারীর মতে, 'কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া মনে হয় ভক্ষ্যদ্রব্য বর্ণনা করার প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল।—ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আহার্য বিষয় হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন।' যথা ঃ

১. প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান প্রণয়
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
যৈছে বীজ ইক্ষু রস, গুড়, খণ্ড, সার
শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর।

২. সাত্ত্বিক ব্যাভিচারী ভাবের মিলনে
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে।
যৈছে দধি, সিতা, ধৃত মরিচ কর্পূর
মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর।" [চৈ. চ. উ. পৃঃ ৩০৮]

এরূপ অদ্বৈতগৃহে, প্রতাপরুদ্র প্রেরিত জগন্নাথের প্রসাদরূপে এবং সার্বভৌমগৃহে চৈতন্যের ভোজ্যদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে।

সমাজ ও সংস্কৃতি চিত্র

'জাতিবৈর' তথা হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার কথা প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে, তবু এখানে একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ থেকে ভারতচন্দ্র অবধি অনেকের গ্রন্থেই মুসলিম শাসকদের হিন্দুপীড়নের কথা কিংবা হিন্দুর ধর্মের প্রতি অবজ্ঞার কথা বর্ণিত রয়েছে। এবং তখনো গাঁয়ে গঞ্জে বাঙলাভাষী সাক্ষর বা শিক্ষিত দেশজ মুসলিম ছিল, রাজশক্তির প্রতি প্রযুক্ত এসব অকারণ বা সকারণ নিন্দার জন্যে কোন দেশজ মুসলিম পাঠক বা শ্রোতা সেদিনকার রাজসরকারে নালিশ করেনি, বা নালিশ করলেও রাজশক্তি সে অপরাধের জন্যে কোন কবিকে রাজদণ্ড দেয়নি, এতে মনে হয়, তুর্কী-মুঘল শাসনকালে হিন্দুদের বাক্‌স্বাধীনতা ছিল, অথবা এসব মিথ্যা অপবাদ বা কাব্যিক অতিশয়োক্তি বলে প্রশাসকরা এসব নিন্দাবাক্যে কোন গুরুত্ব দেননি। দাঙ্গাও বাধেনি। চরিতামৃত বর্ণিত চৈতন্য ও কাজী এবং চৈতন্যশিষ্য দরজী সংক্রান্ত ঘটনা পাঠকালে একথাগুলো স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবাসের দরজীঃ

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন
প্রভু তারে নিজরূপে করাইলা দর্শন।
দেখিনু দেখিনু বলি হৈল পাগল
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল।

বৌদ্ধদের ষড়যন্ত্র ঃ

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা
সর্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা।
অপবিত্র অন্ন থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ করিয়া।
এ ষড়যন্ত্রের অপরাধে বৌদ্ধ পণ্ডিতের
মাথাকাটা গেল ও পরে চৈতন্য-দয়ায়
পুনর্জীবন লাভ করল।

ইসলামী শাস্ত্রে ঃ

আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার সহ নয়
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।

ফল ঃ

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কবিদার—
তুলসী মালতী যূথি মাধবী মল্লিকা

ম্লেচ্ছ ভয় ঃ

ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল আইল মথুরা নগরে।
হুসেন শাহ ও কেশব ছত্রীর কথোপকথন।

ষড়গোস্বামী ঃ

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।

অদ্বৈততত্ত্ব ঃ

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।

চারিরস ঃ

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার–চারি রস।
চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ।।
দাস সখা পিতামাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাষ্টি হঞা।।

স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্ব ঃ

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।।
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।

অভেদতত্ত্ব ঃ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোহে হৈলা এক ঠাঁই।।
মহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-যনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি।
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ।।
মৃগমদ তাব গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।
অতি গূঢ় হেতু এই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার।।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ।।
রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর
সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর।।
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।।
অত্যন্ত নিগূঢ় সেই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত।।
গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু কহে কাম।।
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা-ধরে প্রেম নাম।।
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল।।
সর্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দূর অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ।।

গোপীভাব ঃ

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব।।
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ।।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।।
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ।।
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে।।
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে।
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার।।

পঞ্চতত্ত্বভক্ত ঃ

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সংকীর্তন রঙ্গে।।
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ।।
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্ত স্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই।।
ভক্ত অবতার তার আচার্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সর্বরাধা করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি।।
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে সবার গণন।
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার।।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ ঃ

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীণা বর্ণিল সকল।।
সূত্র করি সবলীলা করিলা গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তার কৈল বিবরণ।।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সংকোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন।।

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।।

ভক্তিকল্পতরু ঃ

শ্রীচৈতন্যামালাকর পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু রুপিলা ইচ্ছাপানি।।
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তি কল্পতরু তেহোঁ প্রথম অঙ্কুর।।
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল।।
পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।।
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ।
এই নবমূল নিকলিল বৃক্ষমূলে।

চৈতন্যজীবনকথা ঃ

এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বছর প্রকট বিহরি।।
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।।
চব্বিশ বছর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বছর কৈল নীলাচলে বাস।।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে।।
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা-আদি লীলাখ্যান।
মধ্য-অন্তলীলা—শেষ লীলার দুই নাম।।

চৈতন্যচরিতকার ঃ

আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা প্রথিত।।
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া-শুনিঞা।।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিঞা।।
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর যৌবন-চারি ভেদ।
অতএব আদি খণ্ডে লীলা চারি ভেদ।

চৈতন্য জন্মলগ্ন ঃ

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।

—সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
দামোদর—স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি।।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন।।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।।
গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে তেহোঁ ছাড়িল যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান।।
প্রভুর লীলামৃত তেহোঁ কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ।
চৌদ্দ শত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভলক্ষণ।।

রাজ ভয় ও গ্রাম আক্রমণ ঃ

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।।
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তরুকধারী সাজিল।
আজি রাত্রে পলাহ গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন।।
গ্রাম উজাড় হৈল পালাইল সর্বজন।।
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইল।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিল।।
প্রভুকে দেখিয়ে ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতিপাশ ছিল সুবর্ণ অপার।।
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাইয়া।
মারি ভাগিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া।।
তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বান্ধিল।
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর।।
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া।
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো লইতে না পারয়।।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান।
অল্প বয়স তাহার রাজার কুমার।।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হৈলা।।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।

হোসেন শাহের উড়িষ্যাবিজয় ও সনাতন ঃ

তোমার বড়ভাই করে দস্যু-ব্যবহার।।
জীব পশু মারি সব বাকলা কৈলা খাস।
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য নাশ।।
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল।।
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।।
পালাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা।।
হেন কালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে।।
তেহোঁ কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে।।
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।

কীর্তন, কাজী ও চৈতন্যদেব ঃ

মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি।।
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।।
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কেন বল জানি।।
কেহ কীর্তন না করিয় সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।।
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল. পাঞা বড় শোক।।
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন।।
ঘরে গিয়া সব লোকে করে সংকীর্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে–চমকিত মন।।
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বালে ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।
এত কহি সন্ধ্যাকালে বলে গৌররায়।
কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।।
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করি হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য গোসাঞিঃ পরম উল্লাস।।
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।।

বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে।।
এই মত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজীর দ্বারে গেলা।।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোকে করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশয়ে পাগল।।
কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে।।
উদ্ধতলোকে ভাঙ্গে কাজীর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।।
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা।।
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিয়া।।
কাজী কহে—তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া।।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।।
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি।।
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়।।
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।।

চৈতন্যের বিরুদ্ধে হিন্দুর অভিযোগ ঃ

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল।।
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই।।
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য-গীত যোগ্য আচরণ।।
পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।।
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।।
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়।।
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি।
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বাওরাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।

খাদ্য ঃ

একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত।।
লেম্বু, আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার।।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন।।
এই মত বলিয়া আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল।।
এই মতে চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল।।
এই মতে পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র সেবা করে সর্বোত্তম।।
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃতে বহিয়া চলিল।।
দশপ্রকার শাক নিম্ব শুকতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছেনাবড়া বড়ীঘোল।।
দুগ্ধতুম্বি, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা।।
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার।।
নববিম্বপত্রসহ ভৃষ্টবার্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।।
ভৃষ্ট মাষ মুদ্গসূপ অমৃতর নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।।
মুগ্ধবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরুপুলি নারিকেলপুলি আর যত পিষ্ট।।
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিঁড়া দুগ্ধকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি।।
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।।
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য সব করাইল।

বৈষ্ণবের লক্ষণ ঃ

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।

সব কহা না যায় করি দিগদরশন ।।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম ।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শূনি, অকিঞ্চন ।।
সর্বোপকার, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, নিরীহ, স্থির বিজিত-ষড়্‌গুণ ।।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, আমানী ।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ।।

প্রেম ও সাধনতত্ত্ব ঃ

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য আত্মনিবেদন ।।
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ নতি ।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজা, তীর্থগৃহগতি ।।
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ সংকীর্তন ।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ।।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণানন্দে রুচি উপজয় ।।
রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর ।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম ।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দধাম ।।
প্রেম ক্রমে বাঢ়ে হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ।।
বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড সার ।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ।।
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ ।
রতি প্রেমাদিতে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ ।।
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর ।।
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রস ।।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ।
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি রস স্বরূপ পায় পরিণামে ।।
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ।
স্থায়ীভাব রস হয় মিলে এই চারি ।।
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে ।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বাস্বাদনে ।।
দ্বিবিধ বিভাব অবলম্বন উদ্দীপন ।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন ।।
অনুভাব, স্মিত, নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর ।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ।।
নির্বেদ হর্ষাদি ত্রৈত্রিংশ ব্যভিচারী ।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ।।
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য ।।
শান্তরসে শান্ত রতি প্রেম পর্যন্ত হয় ।
দাস্যরতি রাগ পর্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় ।।
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা ।
সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা ।।
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ।।
উধঘূর্ণবিবশচেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম ।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান ।।
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, দ্বিবিধ শৃঙ্গার ।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ।।
বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ পূর্বরূপ, মান ।
প্রবাসখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান ।।

সুবুদ্ধি রায়ের বৃত্তান্ত ঃ

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিল গৌড় অধিকারী ।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী ।।
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসার কৈল ।
ছিদ্র পাঞা রায় তাঁকে চাবুক মারিল ।।
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল ।
সুবুদ্ধি রায়ের তিহো বহু বাড়াইল ।।
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে ।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজস্থানে ।।
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা ।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ।।
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে ।
রাজা কহে জাতি নিলে এহো নাহি জীবে ।।
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা ।
করোয়ার পানি তাঁর মুখে দেয়াইলা ।।
তবু সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া ।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ।।
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেহ পণ্ডিতের স্থানে ।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ।।
কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয় ।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ।।
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা ।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ।
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন ।।

চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে কবির উক্তি ঃ

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বসার।।
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা–বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ।।
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ।
পূর্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন।।
আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন।।

রাজস্ব ও দুষ্ট রামচন্দ্র খান ঃ

সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান।।
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর।।
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি মাংস সে ঘরে রান্ধাইল।
স্ত্রীপুত্রের সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া।।
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিলা গমন।।
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল।

মুলুকপতি ও হিরণ্যদাস রঘুনাথ বৃত্তান্ত ঃ

হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী।
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে দেখিয়া।।
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধনে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ।।
রাজ ঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল।।
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আনহ নহে পাইবি যাতনা।।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ পায়।।
তুমি সর্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর প্রায়।।
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল।।
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আমি ছাড়াইমু তোমা করি একসূত্র।।
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল।।
তোমার জ্যেঠা নিবুর্দ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়।।
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যে মতে ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে।।
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।।

বাঙালীর বিচিত্রভাবে দধি-চিড়া-মুড়ি ভক্ষণ ঃ

ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া।।
শুঠিখণ্ড, নাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর।।
কোলি শুষ্ঠি, কোলি চূর্ণ কোলি খণ্ড আর।
কত নাম লব শত প্রকার আচার।।
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল।।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালি কাঁচুড়ি ধান্যে আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি।।
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ুকৈল কর্পূরাদি দিয়া।।
শালি তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া।।
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।।
শালি ধান্যের খই পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পুরাদি দিয়া।।
ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল।।

হরিদাসের কবর ঃ

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল।।
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের সঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।।
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকায় গর্ত করি তাহে শোয়াইল।।

রাহাজানি ঃ

বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে।
আগে সাবধানে, যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে।।

কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইবারে না দে।।
যোগী হঞা হইল ভিখারী।।

চৈতন্যের যোগী বেশ ঃ

কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-খালি ধরি
আশা-বুলি কান্ধের উপর।।
চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়, ধূলিবিভূতিমলিনকায়
হাহা কৃষ্ণ উ প্রলাপ উত্তর।
কাঁহা করো কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণপাও
দুহে মরে কহ সে উপায়।।
এই মত গৌর প্রভু প্রতিদিনে দিনে।

চৈতন্যের কাব্য ও কৃষ্ণনাম আস্বাদন :

বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে।।
সেই দুই জন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন।।
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ।।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়রামানন্দ।।

তর্জা ঃ

তবজা প্রহেলি আচার্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে।।
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কাব।
এই নিবেদন তার চরণে আমার।।
বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কার্যে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।

শিক্ষাষ্টক ঃ

পূর্বে অষ্টশ্লোক কর্রি লোক শিখাইল।
সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল।।
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে।।

৫. গোবিন্দদাসের কড়চা

শান্তিপুরবাসী অদ্বৈতাচার্যবংশীয় শিক্ষক ও কবি-ওপন্যাসিক জয়গোপাল গোস্বামীর কাছে জেনে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেন শিশিরকুমার ঘোষ 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল গোস্বামী 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে তা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত করেন। তারপর গত ৮৭ বছর ধরে দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,মতিলাল ঘোষ, জগদ্বন্ধু ভদ্র, নলিনীকান্ত ঘোষ, বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র অকৃত্রিমতায় সন্দেহ ও অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। পার্থক্য এই—কেউ বলেছেন, আংশিক কৃত্রিম আর কেউ বলেছেন, পুরোটাই জাল। অবিশ্বাসের কারণ কড়চাকার কর্মকার গোবিন্দদাস বলে চৈতন্যদেবের খড়ী-খড়ম বাহক কোন অনুচরের নাম চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বর্ণন প্রসঙ্গে কোন কড়চাকার, চরিতকার কিংবা কবি-নাট্যকার উল্লেখ করেননি। মুরারি গুপ্তের মতে চৈতন্যভৃত্য বিষ্ণুদাস, চৈতন্যচরিতামৃত মতে চৈতন্যভৃত্যের নাম দ্বিজ বা কালা কৃষ্ণদাস। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলই কেবল অন্য প্রসঙ্গে এক গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ মেলে। তাও পাঠান্তরে মুকুন্দ কর্মকার।

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য আর গোবিন্দ কর্মকার [পাঠান্তরে মুকুন্দ কর্মকার][1]
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার।

গোবিন্দ দাস বা গোবিন্দ নামে এক অনুচব অবশ্য চৈতন্যদেবের ছিল।

ব্রজমোহনদাসের চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে কীর্তনীয়া গোবিন্দ দত্ত অনুচর চৈতন্য গোবিন্দ ও গোবিন্দনন্দের নাম মেলে।

'রামদাস মাধব বাসুদেব ঘোষ গোবিন্দ
প্রভুর সঙ্গে রহিলা হরিষে।

১. *সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১২৫*

জয়গোপাল বর্ণিত পুথিটি কেউ দেখেনি, এ পুথির অন্য প্রতিলিপিও মেলেনি। দাক্ষিণাত্যের যেসব গাঁ-গঞ্জ-নগরের নাম রয়েছে এ গ্রন্থে, সেগুলোর কয়েকটা নিতান্ত আধুনিক, যেমন—রসালকোণ্ডা (Russell Konda), [পূর্ণনগর পুনা যা আধুনিক নগর বটে কিন্তু ষোল শতকে এক অখ্যাত নাম] এবং কড়চার ভ্রমণবৃত্তান্ত অন্য কড়চা ও চরিত গ্রন্থের সঙ্গে মেলে না। জানালা প্রভৃতি বহু শব্দও ভাষা আধুনিক। 'অষ্টখানি করলার ভাজা খাই সুখে"। দাক্ষিণাত্যে নাকি আজো উচ্ছে-করলা অজ্ঞাত।[১] আজকাল এ গ্রন্থ জাল বলেই সাধারণ্যে স্বীকৃত। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ডে।

৬. চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয়

চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' পুথির সন্ধান নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন জানতেন। এ পুথি দুর্লভ। ডক্টর সুকুমাব সেন আদ্যন্ত খণ্ডিত একমাত্র পুথি সম্পাদনা করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত করেছেন। অন্যান্য চৈতন্যচরিতগ্রন্থের মতো এটিতেও চৈতন্যের আদি, মধ্য ও অন্তলীলা তিন খণ্ডে বর্ণিত। হয়তো গোড়ায় প্রতি খণ্ড আলাদা করে রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল।

আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড কহিব
গৌরাঙ্গ বিজয় তিন খণ্ডে পূর্ণ হৈব।
গয়া দেখি আইলে পূর্ণ আদি খণ্ড পুথি।

প্রাপ্ত অংশে ভক্ত সুলভ আবেগের ও ভক্তির আতিশয্য দুর্লক্ষ্য। তাই বোধ হয় গৌরাঙ্গবিজয় বৈষ্ণব পাঠকদের আগ্রহ জাগায়নি এবং অবহেলায় বিলুপ্ত হচ্ছিল।

চূড়ামণি দাস নিত্যানন্দশিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। মনে হয় বাল্যকালে চূড়ামণি দাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও পেয়েছিলেন। অতএব চূড়ামণি দাসের জন্মস্থান একচাকা বড়গাছী বা খড়দহ ছিল।

কহিছে নিতাই গদাধর ধনঞ্জয়ে
সংসর্গে শুনিয়া আছোঁ কহিল নিশ্চয়ে।
কহিছেন নিত্যানন্দ / এই সব পদবন্ধ/গদাধর ধনঞ্জয় মনে।

শুধু তা-ই নয়, উত্তরকালে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশেই চূড়ামণি দাস গৌরাঙ্গালীলা রচনায় ব্রতী হন ঃ

সুস্বপ্ন কহিয়াছে নিত্যানন্দ রাএ
চূড়ামণি দাস কহে এই ভরোসাএ।

মনে হয় শ্রুতি-স্মৃতিই চূড়ামণি দাসের গ্রন্থ রচনায় মুখ্য অবলম্বন ছিল। তাই অন্যত্র মেলে না এমন অনেক চৈতন্য-নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। মুরারি গুপ্তের বা স্বরূপ দামোদরের চৈতন্যলীলা সূত্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যও গ্রহণ করেননি তিনি। এ গ্রন্থে নিত্যানন্দের বাল্যকাল ও ঘরোয়া জীবনের পরিচয়ও রয়েছে। নিত্যানন্দ-জ্ঞাতি আখণ্ডল আচার্যের বাস্তবঘেঁসা চবিত্রটি প্রত্যক্ষদর্শী অঙ্কিত বলে মনে হয়। এজন্য চূড়ামণি দাসের নিবাস নিত্যানন্দের স্বগাঁয়েই ছিল বলে অনুমান করি। আর চূড়ামণির গ্রন্থ রচনাকালেও বীরভদ্র বালক মাত্র, তাই নিত্যানন্দ-পুত্র হিসাবেও বীরভদ্র কবির কাছে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হননি। অতএব চূড়ামণি দাস ১৫৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গৌরাঙ্গবিজয় রচনা করেন বলে অনুমান করা সঙ্গত। সুকুমার সেন বলেন ঃ "১৫৪২ হইতে ১৫৫০ খ্রিস্টব্দের মধ্যে গৌরাঙ্গবিজয় রচিত হইয়া থাকিবে :" সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৫৫০ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গৌরাঙ্গবিজয় রচিত বলে অনুমান করেন।[২] ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যলীলাগ্রন্থ সংস্কৃত ও বাঙলায় কয়েকখানি রচিত হয়েছে, সে-অবস্থায় চূড়ামণি

---

১ *সুকুমাব সেন. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৭০।*

২ *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম পৃঃ ১১০।*

দাসের পক্ষে সেসব গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা ছিল স্বাভাবিক। কাজেই তাঁর অনুমতি কাল-পরিসর অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ। চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা আনন্দিত হয়েছিল বলে চূড়ামণি দাস উল্লেখ করেছেন। তাই নগেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বকোষ) চূড়ামণি দাসকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অনুমান করেছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তখন বাংলদেশে বৌদ্ধ থাকার কথা নয়। কিন্তু যক্ষ, বাসুলী,ক্ষেত্রপাল, ধর্ম ঠাকুরের পূজারীরা ও বজ্র-সহজযানী-যোগীতান্ত্রিক বৌদ্ধেরা ষোল শতকে হয়তো বৌদ্ধ নাম বা চিহ্ন পুরো ঘুচাতে পারেনি। চূড়ামণি দাসের উক্তির লক্ষ্য হয়তো তাঁরাই। চূড়ামণি দাসের একটি পদ [তাও হয়তো গৌরাঙ্গ বিজয়ের অংশ] পদকল্পতরুতে সংকলিত রয়েছে [পদ, সং ১১৪২]। চূড়ামণি কাব্যে [নাচাড়িগানে] ব্রজবুলির ব্যবহারও রয়েছে।

গ. প্রক্ষিপ্ত রচনা ও জাল গ্রন্থ

মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও মন-মননের গতি-প্রকৃতি বিচিত্র ও অদ্ভুত। এর দিশা কিংবা নাগাল পাওয়া ভার। তাই মানব চরিত্র চির রহস্যের আকর। মানুষ অকারণে মিথ্যে বলে, বানিয়ে গল্প করে, অপ্রয়োজনেও তোয়াজ করে, আবার অহেতুক নিন্দা করে। মানুষ অন্যের ক্ষতি যেমন করে, তেমনি স্বেচ্ছায় সাহায্যও করে। মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, সে কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ, কারো মিত্র, কারো শত্রু। সে কারণে অকারণে মিথ্যে যেমন বানায়, তেননি সত্যও স্বীকার করে। সে ভালো লাগলেই ভালোবাসে, তেমনি পছন্দ না হলেই সে হয় বিরূপ। তাই সত্য-মিথ্যা এবং নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই তার স্বভাবেব এপিঠ-ওপিঠ। তার কাছে দুটোই সমমূল্যের। যাকে ভালো লাগে, সে বানিয়ে তার গুণ-মান-মাহাত্ম্য প্রচার করে তৃপ্তি পায়, তেমনি যাকে তার অপছন্দ, সে তার দোষ আবিষ্কার করে আর নিন্দায় হয় মুখর। ওতেই তার সুখ। এজন্যেই দেখা যায় সৎকর্মে ও সদাচারে প্রবৃত্তি দানের জন্যেও মানুষ মিথ্যে ঘটনা রটায়, কাল্পনিক গল্প তৈরি করে, দোহাই কাড়ে আল্লাহর বা ইষ্ট দেবতার। মনে করে উপাস্যের অভিপ্রায়ের রূপায়ণে মিথ্যা ভাষণেও পুণ্য। যেন উপাস্যও একজন মর্ত্যমনিব' প্রিয়জনের মান-যশ-গৌরী গৌরব বৃদ্ধির এবং দুশমনের গুণ-মান-মাহাত্ম্য অপহ্নবেব প্রয়াস মানুষের সহজাত বৃত্তিরই অভিব্যক্তি। তাই আমরা আদিকাল থেকেই পরম ধার্মিক, জ্ঞানী-গুণী-মনীষীকেও সদ্বুদ্ধি বশে ও সদুদ্দেশ্যে মানব-হিতৈষণা লক্ষ্যে স্বশাস্ত্রে মিথ্যার মিশাল ও ভেজালের ভিয়ান দিচ্ছেন, দেখতে পাই। স্ব স্ব ধর্মগুরুকে নবী-অবতার বানানোর জন্যে কিংবা মহৎ ও শক্তিধর বলে প্রমাণের জন্যে কত কত 'যাদুর খেল' উদ্ভাবন করতে হয়েছে এবং আজো হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের কৃতি-কীর্তির, সভ্যতা-সংস্কৃতির ও ভাব-অনুভবের ইতিকথার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে এ বানানো ভাষণ। সেই মিথ-লিজেণ্ড-পুরাণ সিন্দাবাদের ভূতের মতো মানুষের মন-মস্তিষ্ক জুড়ে আজো অচল ও অটল হয়ে অবিসম্বাদী সত্য রূপে চেপে রয়েছে। তাই আজো মানুষের মন-মেজাজ-মনন, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ ওই বিশ্বাসের ভূতই নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজেই সেদিনকার বৈষ্ণবদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হতে পারেনি। কৃষ্ণের আদলে চৈতন্যদেবের স্বভাবচরিত্র, কৃতি-কীর্তি ও আচরণ পরিকল্পিত। 'অবতার' চৈতন্যের মধ্যে 'মানুষ' চৈতন্য বলতে গেলে বিলীন হয়ে গেছেন, তা ছাড়াও চৈতন্য পার্ষদ-পরিকর-পঞ্চতত্ত্বরাও এক একজন হারুন কিংবা বলরাম—বিশেষ করে মাধবেন্দ্র, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, নরহরি, বীরভদ্র। এদেরও গুণ মান-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে বানানো কৃতির, ঘটনার ও আচরণের। লেখা হয়েছে নামে-বেনামে ছোট বড় গ্রন্থ। এ শতকের বিদ্বানেরা সেসব গ্রন্থের অকৃত্রিমতা অস্বীকার করেছেন। তেমন কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে—অদ্বৈত-প্রকাশ, অদ্বৈত-মঙ্গল, সীতাচরিত্র, নিত্যানন্দের বংশবিস্তার, বিবর্তবিলাস, প্রেমবিলাস, গোবিন্দদাসের কড়চা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী প্রভৃতি। তাছাড়া অকৃত্রিম বলে স্বীকৃত জীবনচরিতগুলোতে বানানো কাহিনী ছাড়াও কালে ও ক্রমে সংযোজিত প্রক্ষিপ্ত অংশ তো রয়েইছে। এমনকি বিকৃতি-বিদ্রুপও রয়েছে ঃ 'মাগুর মাছের ঝোল/ভর-যুবতীর কোল/বোল হরি বোল'।

১. ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে (৪০৭ চৈতন্যাব্দে) প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী প্রকাশিত করেন চৈতন্যচরণ দাস। এক প্রদ্যুম্ন মিশ্র চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন, এ গ্রন্থ তাঁর রচিত এবং একখানি অতি প্রাচীন পুথির সম্পাদিত রূপ বলে দাবি করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৪৩২ শকে তথা ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে রচিত। তখন চৈতন্যলীলার শুরু মাত্র, তাছাড়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র ছিলেন উড়িয়া—সিলেটী নন, এসব কারণে পুথিটি জাল বলেই বিদ্বানেরা মনে করেন।

২. ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ'—ঈশান নাগর অদ্বৈতাচার্যের আশ্রিত ও ভৃত্য ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থটি তাঁর নামেই চলে। অচ্যুৎচরণ তত্ত্বনিধি এ পুথির আবিষ্কর্তা। এ গ্রন্থ নানা গুণে বিশিষ্ট। এ গ্রন্থে চৈতন্যজীবনের প্রধান, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বীকৃত ঘটনাগুলো আধুনিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ও নৈপুণ্যে সংগ্রথিত। সন-তারিখও আধুনিক ইতিহাসের মতো বিন্যস্ত। এ জন্যেই বিদ্বানেরা এ গ্রন্থকেও 'জাল' মনে করেন। যিনি এ গ্রন্থ ঈশান নাগরের নামে রচনা করেছেন—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ভাষায় ও যৌক্তিক বাকবিন্যাসে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার্য।

ঈশান নাগর গ্রন্থে বলছেন যে, অদ্বৈতপুত্র অচ্যুৎচরণ ও ঈশান সমবয়সী। মায়ের সঙ্গে পাঁচ বছর বয়স থেকেই অদ্বৈতগৃহে লালিত। চৈতন্যের ছাত্র অচ্যুতের, অদ্বৈতের, নিত্যানন্দের, পদ্মনাভ চক্রবর্তীর ও শ্যামদাসের মুখে শুনে এবং নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে চৈতন্যের লীলা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। আর একটি মাত্র গ্রন্থ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলাসূত্র' তিনি পড়েছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের গৃহেই ঈশান নিমন্ত্রিত চৈতন্যকে দেখার ও সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আহারের পর চৈতন্যপদসেবার সুযোগ পেয়ে কৌতূহলবশে ঈশান চৈতন্যের সঙ্গে আলাপ করেন ঃ

দয়া করি কহ কিছু এই ভক্তিশূন্যে।
সহাস্যে মধুর ভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা
শুনহ ঈশান শাস্ত্র, যাহা প্রকাশিলা।

বিমানবিহারী মজুমদার এ গ্রন্থের কৃত্রিমতায় সন্দেহের অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ও নরহরি সরকারের প্রভাবের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন (চৈ. চ. উ. পৃঃ ৪২৪-৩৫)।

৩. হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল-রসিকচন্দ্র বসু ১৭৩১ শকে (১৭৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে) লিপিকৃত একখানি পুথি পেয়েছিলেন। ঐটিই সম্ভবত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। অজ্ঞাতনাম কবির রচনা হিসেবে এর কিছু অংশ [সম্ভবত খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে] ব্রজমোহন সান্যাল ১৩০৮ সালে [১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দে] সম্পাদনা করেন।

আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া   কি বর্ণিতে পারি ইহা
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি
প্রভুর যে পুত্র সব   শিষ্য যত বড় সব
তাথে আমি ক্ষুদ্র অভিমানী
শ্রীঅদ্বৈত চরণ ধূলি   মস্তকেতে লই তুলি
হৃদয়েত করি পাদপদ্ম।........
প্রভুর আনন্দ আর শিষ্যাদি সকলে
আমারে আজ্ঞা দিল হৃদয় প্রবালে।

এতে মনে হয় অচ্যুতানন্দই কবির গুরু ও গ্রন্থ রচনার আদেষ্টা এবং অন্যান্য গুরু ভাইয়ের অনুরোধও তাঁকে গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করে। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃতকাব্যম' কিংবা 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' হরিচরণের পড়া ছিল। তাই তিনি বলেছেন ঃ

'চৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবিকর্ণপুর .....
আমি বর্ণিতে সে হয় পুনরুক্তি'

মুরারি গুপ্তের কড়চার, জয়ানন্দেব চৈতন্যমঙ্গলের ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের বর্ণিত কোন কোন ঘটনার সঙ্গে হরিচরণ-বর্ণিত ঘটনার মিল নেই। এসব নানা কারণে এ গ্রন্থে অচ্যুতানন্দ শিষ্য হরিচরণের হতে পারে না বলেই বিদ্বানদের বিশ্বাস (চৈ. চ. উ. ৪৪৩-৪৮৯)। হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে উদ্ধৃতি সূত্রেই অদ্বৈত্যশিষ্য শ্যামদাস রচিত অদ্বৈতাষ্টক মেলে। এ গ্রন্থে চৈতন্যের জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ, শান্তিপুরে আগমন, অদ্বৈতগৃহে জলকেলি ও দানলীলা অভিনয় অবধি বর্ণিত। বিষয়সূচী এরূপ ঃ

প্রথম সংখ্যায় হয় গুর্বাদি বর্ণন
কৃষ্ণলীলা অনুক্রম বস্তু নিরূপণ।
দ্বিতীয় সংখ্যায় পঞ্চ অবস্থার সূত্র
বিজয়পুরী আগমন পরম চরিত্র।
তৃতীয় সংখ্যায় বিজয়পুরীর সম্বাদ
শ্রীভাগবত অর্থ প্রভুর আস্বাদ।
প্রেমে গদগদ পুরী দুর্বাসা সাক্ষাৎ
শ্রীমাধবেন্দ্র সতীর্থ হয় যে বিখ্যাত।

এমনি জাল গ্রন্থ হচ্ছে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস [বাজাদিব্যসিংহ] বচিত 'বাল্যলীলা সূত্রম', বিষ্ণুদাসরচিত [অদ্বৈত পত্নী] 'সীতাগুণকদম্ব' লোকনাথ দাস রচিত [অদ্বৈত পত্নী] 'সীতাচরিত্র'। এ সম্পর্কে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের সাধারণ মন্তব্য এই ঃ 'আমি সীতা ও অদ্বৈতচরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পাঁচখানির [অদ্বৈত প্রকাশ ও অদ্বৈতমঙ্গলসহ] পরিচয় দিলাম। আমার বিচারে পাঁচখানি গ্রন্থই জাল বিবেচিত হইল। জাল শব্দের অর্থ যে গ্রন্থগুলি যে যে ব্যক্তির দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ, তাঁহারা উহা লেখেন নাই। পাঁচখানি গ্রন্থের প্রত্যেকখানিই সীতা বা অদ্বৈতের কৃপাপাত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। 'বাল্যলীলা সূত্রে'র গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের পিতার সমসাময়িক রাজাদিব্যসিংহ, অদ্বৈতপ্রকাশের গ্রন্থকার অদ্বৈতগৃহে পালিত ও তাঁহার শিষ্য ঈশান নাগর 'সীতাচরিত্রের' গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যে অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু লোকনাথ, 'সীতাগুণকদম্বের' গ্রন্থকার সীতার বিবাহের ঘটক বিষ্ণুদাস ; আর অদ্বৈতমঙ্গলের লেখক হরিচবণ অদ্বৈতের শিষ্য ও অচ্যুতের আদেশে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত। ইঁহারা যদি সত্য সত্যই গ্রন্থগুলির রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদের বর্ণনার সহিত মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার গুরুতর বিরোধ দেখা যাইত না। অথচ উক্ত লেখকগণের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে অদ্বৈতকে শচী-জগন্নাথের মন্ত্রগুরু বলা যায় না। অদ্বৈতের নিকট বিশ্বম্ভরের ভাগবত পাঠের কথা বলা যায় না, অচ্যুতকে বিশ্বম্ভরের ছাত্র করা যায় না এবং সীতা, অদ্বৈত ও অচ্যুতের নানারূপ অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রদর্শনের কথাও লেখা চলে না। তাই এই সমস্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতারা মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রামাণিক লেখকের উক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে পবস্পরবিরোধী উক্তি আছে যথেষ্ট"। (চৈ. চ. উ. পৃঃ ৪৬৩)।

'বাল্যলীলাসূত্র ও অদ্বৈতপ্রকাশ' ছাপার সময় সংশোধনের নামে অনেক কিছু অদল-বদল ও সংযোজনা করা হইয়াছিল (পৃঃ ৪৬৪)।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতের কোন কোন পুত্র চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং নিজেদের পিতাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।..... সেইজন্য অদ্বৈতের বংশধরদের লইয়া সমাজে কিছু আন্দোলন চলিতেছিল। সম্ভবতঃ এই আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।" (পৃঃ ৪৬৪)

অপর একটি গ্রন্থ হচ্ছে কর্ণানন্দ—এটি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য রঘুনন্দন দাসরচিত। কাটোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম মালিহাটির বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। গঙ্গাতীরবর্তী

'বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতি নিকটে' কবি পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে/ বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে।' বুধুইপাড়ায় হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকটে থেকে ১৫২৯ শকে তথা ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখী পুর্ণিমায় গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

হেমলতাই গ্রন্থের 'শ্রীমুখে রাখিলা নাম কর্ণানন্দ'। তাঁর আরো দুখানা গ্রন্থ রয়েছে—'রাধা-কৃষ্ণলীলারসকদম্ব' ও 'গোবিন্দলীলামৃত'।

৪. **নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস**—নরহরি চক্রবর্তীব আত্মপরিচয় এরূপ ঃ

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ।
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম।

অতএব তাঁর অপর নাম ঘনশ্যাম চক্রবর্তীও ছিল। নরহরি চক্রবর্তীর পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে ভাগবতের টীকা রচনা করেন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত অনুরাগবল্লীর উল্লেখ রয়েছে ভক্তিরত্নাকরে। অতএব ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস আঠারো শতকের মধ্যভাগে রচিত বলে অনুমান করা যায়। যদিও গ্রন্থ দুটো বৈষ্ণবসমাজের প্রিয় তবু শ্রুতি-স্মৃতি ও পূর্বসূরীদের গ্রন্থনির্ভর এবং বৈষ্ণবমতবাদ প্রচারের দুশ' বছর পরবর্তীকালের এসব গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। ভক্তিরত্নাকর বৃহদাকার গ্রন্থ। চৈতন্যের এবং তাঁর পার্ষদ-পরিকরের ও শিষ্যদের বৃত্তান্ত এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নামেই প্রকাশ নরোত্তম বিলাস নরোত্তম ঠাকুরের জীবনকাহিনী।

৫. **মনোহর দাসের অনুরাগবল্লী** বৃন্দাবনে 'বসুচন্দ্রকলাযুক্তে'—১৬১৮ শকে বা ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত। শ্রীনিবাস আচার্যের ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের বিষয় আলোচিত।

৬. **গোপীজন বল্লভদাসের** রসিকমঙ্গল ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে রচিত। এটি শ্যামানন্দশিষ্য রসিকানন্দের চরিতকথা।

ঘ. সহজিয়াবৈষ্ণবদের গ্রন্থ

সহজিয়াবৈষ্ণবরা বামাচারী ও পরকীয়া সাধক। বৌদ্ধযুগের সহজযানীরাই বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমান নামের আবরণে তাদের শাস্ত্র ও চর্যা রক্ষা করে আসছে। তারা নানা গুরুনামী সম্প্রদায়ে ও শাখায় বিভক্ত। সাধারণভাবে তারা বাউল নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে যারা বাহ্যত বৈষ্ণবমতবাদ গ্রহণ করেও ঐতিহ্যানুসারী, তারাই বৈষ্ণবসহজিয়া নামে পরিচিত, চৈতন্য-নিত্যানন্দ-জাহ্নবা-বীরভদ্রকে তারা এ মতের প্রবর্তক ও গুরুপরম্পরা বলে প্রচার করে। নরোত্তম দাস ঠাকুরের নামে সহজিয়াদের অনেক গ্রন্থও লিপিবদ্ধ রয়েছে। গৌরপারম্যবাদ, গৌরনাগরবাদ ও মঞ্জরীতত্ত্বের মধ্যেই সহজিয়ারা তাদের স্বমতের সমর্থন খুঁজে পায়। এসব তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা সতেরো-আঠারো শতকে বহুল প্রচারিত হয়। অকিঞ্চনের বিবর্তবিলাস, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, রামদাস রচিত অভিরামলীলামৃত, বৃন্দাবনদাস রচিত নিত্যানন্দের বংশবিস্তার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের (?) বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা, স্বরূপবর্ণনাপ্রকাশ, মুকুন্দের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এবং আগমসার, আনন্দবৈভব, অমৃতরত্নাবলী, অমৃতরসাবলী, রসভাবপ্রাপ্ত প্রভৃতি বেনামী সহজিয়াগ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

মঞ্জরীতত্ত্বের প্রথম মঞ্জরী রূপগোস্বামী—তিনিই রূপমঞ্জরী। তারপর সনাতন রতি বা লবঙ্গমঞ্জরী, রঘুনাথদাস রসমঞ্জরী, গোপালভট্ট গুণমঞ্জরী, রঘুনাথভট্ট রাগমঞ্জরী, জীব বিলাসমঞ্জরী, কৃষ্ণদাসকবিরাজ কস্তুরীমঞ্জরী, জাহ্নবা আনন্দমঞ্জরীরূপে পরিকীর্তিত।

শ্রীরূপ মঞ্জরীসার　　　শ্রীরতি মঞ্জরী আর
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলীলা
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে　　　কস্তূরীকা আদি রঙ্গে
প্রেম সেবা করি কুতূহলা।

এসব অনুগা হৈয়া প্রেম সেবানিব চাইয়া
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ

[প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা নরোত্তমদাস]

—এসব মঞ্জুরী বিকশিয়া পুষ্প হয়

পুষ্প হৈয়া করে নিত্য লীলার সহায় [রাগমালা ঃ নরোত্তম দাস] ভক্ত-ভগবান প্রথমে রাধা-কৃষ্ণরূপে পরে ভক্তগোপী বা সখীরূপে এবং গুরুমঞ্জরী বা সেবাদাসী বা সখীসহায় রূপে পরিকল্পিত। নারীভাবে পরমপুরুষের প্রেমাকর্ষণ তত্ত্বের প্রশ্রয়েই প্রচ্ছ সহজযানীরা চৈতন্যমতবাদে বামাচারী তান্ত্রিকপন্থার পরোক্ষ সমর্থন লাভ করে। তাছাড়া পরকীয়া সাধনা নতুনও নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও তার জড় মেলে। কেউ কেউ রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতেও পরকীয়া প্রেমের সমর্থন পেয়েছেন 'পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ' ইত্যাদি। সহজিয়ারা স্বমতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে বিদ্যাপতি-লছমী, চণ্ডীদাস-রজকিনী, জয়দেব-পদ্মাবতী [ও তার বোন রোহিণী] রূপ-মীরাবাঈ প্রভৃতির পরদারসম্পর্ক উদ্ভাবন করেছে। এমনকি চৈতন্যদেবও ঃ

বাহ্যেতে প্রকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়
বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয়। [রসভাবপ্রাপ্ত]

কৌলজ্ঞাননির্ণয়াদি বজ্র-সহজযানী তন্ত্রেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বামাচারী পরকীয়া নায়িকার গুণ ও শ্রেণী বর্ণিত রয়েছে চণ্ডালী, রজকী, ব্রাহ্মণী, ডোমনী প্রভৃতি।

মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ (অবজ্ঞার্থে) নির্দেশক নেড়া থেকেই প্রথমে বৌদ্ধ পরকীয়া সাধকরা তথা বজ্র-সহজযানীরা নেড়ানেড়ী আখ্যায় পরে জাহ্নবা-বীরভদ্র শিষ্যসম্প্রদায় নেড়ানেড়ী রূপে নিন্দার্থে চিহ্নিত হয়। প্রথম দিককার মাদারী ও কলন্দরী ফকিররাও মাথা নেড়া করত। সেই সূত্রেই অথবা নিন্দিত বৌদ্ধসূত্রেই মুসলমানরাও নেড়া বলে অবজ্ঞাত। আইয়োনিয়ান যবন যেমন পরে তুর্কী মুঘল ও মুসলমান অর্থে যোগরূঢ় হয়, কিংবা বিলাত বলতে যেমন কেবল ইংল্যাণ্ড বোঝায়, এও তেমনি। সুকুমার সেনের মতে "আগে হিন্দুরাজাদের খাসভৃত্যের মাথা নেড়া থাকিত। তাহা হইতে রাজা-জমিদারের প্রিয় পার্শ্বচর ভৃত্যের সাধারণ নাম হয় নাড়া-নাড়ী (> নেড়া-নেড়ী)।[১] বার শত নাড়া আর তের শত নাড়ী/কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী' [নিত্যানন্দের বংশবিস্তার]।

৭. নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস

শ্রীখণ্ডবাসী নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস নামের গ্রন্থে মুখ্যত শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দের জীবনী রচনা করেছেন। গ্রন্থটির বিভিন্ন সংস্করণে বিন্যাসবিরোধ রয়েছে। পুথিতে ষোল বিলাস রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রথম সংস্করণে আঠারো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে বিশ বিলাস দেখা যায়, আবার যশোদারঞ্জন তালুকদারের সংস্করণে সাড়ে চব্বিশ বিলাস মেলে। কবির আত্মপরিচিতি এরূপ ঃ

মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী
বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষাগুরু হয়।
মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস। ....
বলরাম দাস নাম পূর্বে মোর ছিল।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা।

কবির 'নিত্যানন্দ দাস' নাম জাহ্নবাদেবী বা বীরচন্দ্র প্রদত্ত। গ্রন্থরচনার নির্দেশ দেন জাহ্নবাদেবী। এ গ্রন্থের অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত (অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধরচরিত, কুলপঞ্জী প্রভৃতি) এবং শেষ ছয়টি

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পাদটীকা, পৃ. ৪২৮।

বিলাস পরে সংযোজিত বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর সঙ্গে এ গ্রন্থের তথ্যগত পার্থক্যও বহু। তবে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দাস ষোল শতকের শেষ পাদে, সতেরো শতকের প্রথম পাদে বৈষ্ণবসমাজে নেতৃত্ব দান করেন। বলতে গেলে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী উদ্ভাবিত ও ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবমতের বাঙলা-উড়িষ্যায় তাঁরাই প্রবর্তক ও প্রচারক।

১. **শ্রীনিবাস আচার্য** ষোল শতকের শেষার্ধ থেকেই বৈষ্ণবসমাজের অন্যতম নেতা এবং পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। শ্রীনিবাস যখন কিশোর ও চৈতন্যদর্শন উদ্দেশ্যে নীলাচলের পথে, তখন চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ধারণায় ১৫১৯-২০ সনে তাঁর জন্ম। শ্রীনিবাসের জন্মস্থান মাতুলালয় যাজিগ্রাম। পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ওর্ফে চৈতন্যদাস এবং মাতার নাম লক্ষ্মী। নিবাস নবদ্বীপের চাখন্দী গ্রাম (অধুনালুপ্ত)। নীলাচলে তিনি বাসুদেব সার্বভৌম, গদাধর পণ্ডিত ও রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ পান। পরে এক সময়ে তিনি বৃন্দাবনে যান, তখন দেশে ও নীলাচলে চৈতন্যপার্ষদ গদাধর পণ্ডিত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি পরলোকে। বৃন্দাবনেও রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন ও রূপ মৃত এবং গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও জীবগোস্বামী জীবিত। গোপাল ভট্টের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। আর জীবগোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনেই নরোত্তম দাসের ও শ্যামানন্দ দাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাঙলাদেশে এঁরা বৈষ্ণব মত প্রচারে তাঁর সহযোগী হন। শ্রীনিবাস প্রবীণ বয়সে দুই স্ত্রী [দ্রৌপদী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া] গ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সন্তানের জনক হন। জীবগোস্বামীর লিখিত পত্রসূত্রে তা জানা যায়। বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বীর (আনুঃ ১৫৭০–১৬১৬ খ্রীঃ) তাঁর শিষ্য ছিলেন। বীরহাম্বীর সম্বন্ধে [১৫৯০, ১৬০৮, ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দের দিকের] আকবরনামায় ও বাহারিস্তানগয়বীতে কিছু সংবাদ মেলে।

ভক্তিরত্নাকরে, প্রেমবিলাসে, শ্রীনিবাসশিষ্য নরসিংহ কবিরাজরচিত 'নবপদ্যে' শ্রীনিবাসশিষ্য কর্ণপুর কবিরাজরচিত 'শ্রীনিবাসআচার্যগুণলেশসূচকে' এবং অন্য অনেক গ্রন্থে শ্রীনিবাস সম্পর্কে তথ্য মেলে। বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলই বিশেষ করে তাঁর কর্মস্থল ছিল। মনোহরশাহী কীর্তনের প্রবর্তকও শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস আচার্যের অল্পকিছু বাঙলা-সংস্কৃত রচনা পাওয়া গিয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে একটি পদ রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' ও মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীতে একটি পদ মেলে। [দ্রঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১১-৩১] বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উদ্ভাবিত ও ব্যাখ্যাত তত্ত্বই শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বাঙলায়-উড়িষ্যায় প্রচার করেন। এঁদের প্রচেষ্টাতেই বৈষ্ণবমতের মুখ্যধারা দৃঢ়মূল হয়।

২. **নরোত্তম দাস** (দত্ত)–ইনি শ্রীনিবাসের সহযোগী ও বৈষ্ণবমত প্রচারক। এঁর পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ, মাতা নারায়ণী। নিবাস ছিল রাজশাহী জেলার নিকটস্থ গোপালপুরে। ইনি ধনীর সন্তান। গৌড়দরবারের পদস্থ কর্মচারী পুরুষোত্তম দত্ত ছিলেন তাঁর পিতৃব্য। নরোত্তমের শিষ্য ও পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত ছিলেন খেতরী উৎসবের উদ্যোক্তা। মনে হয় সতেরো শতকের প্রথম দশকেও নরোত্তম দাস জীবিত ছিলেন। নরোত্তম দাস পদকারও ছিলেন। কিন্তু তাঁর নামে সহজিয়ারা এবং বিভিন্ন মতের বৈষ্ণবেরা বহুগ্রন্থ চালায়। এদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি নরোত্তমের রচনা তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খেতরী কেন্দ্রে নেতৃত্ব ছিল নরোত্তম দাসের। খেতরী উৎসব [সম্মেলন] হয়েছিল তাঁর আগ্রহেই। গড়েরহাটী ঢঙের কীর্তনের প্রবর্তক নরোত্তম দাসই।

৩. **শ্যামানন্দ দাস**–এঁর পূর্বনাম নাকি ছিল দুঃখীকৃষ্ণদাস। এঁর জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা-বাহাদুরপুর। এঁর পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। মাতার নাম দুরিকা। ইনি বর্ণে সদগোপ। এঁর গুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য বা হৃদয়ানন্দ। পদকার দুঃখীশ্যামদাস ও শ্যামদাস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা সন্দেহ আছে। সম্ভবত এঁরা দুই ভিন্ন ব্যক্তি। শ্যামদাসের নামে কয়েকটি সাধননিবন্ধ মেলে— উপাসনাসার, ভাবমালা, অদ্বৈততত্ত্ব, বৃন্দাবনপরিক্রমা। গোবিন্দমঙ্গল রচয়িতা (দুঃখী) শ্যামদাসের জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগনার হরিপুর। বর্ণে কায়স্থ দুঃখীশ্যামদাস বা শ্যামদাসের পিতা-মাতার নাম শ্রীমুখ ও ভবানী। গোবিন্দমঙ্গল ষোল শতকের শেষপাদে সম্ভবত রচিত। শ্যামানন্দ উৎকলে বৈষ্ণবমত প্রচারে নেতৃত্ব দান করেন।

৪. **জাহ্নবাদেবী ও বীরভদ্র** [বা বীরচন্দ্র] সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিয়ে করেন নিত্যানন্দ। বসুধার সন্তান বীরভদ্র বা বীবচন্দ্র। নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর তাঁর পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং পুত্র বীরভদ্র নিত্যানন্দ শিষ্যসম্প্রদায়ে নেতৃত্ব দান করেন। উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব ছিল অসাধাবণ। চৈতন্যের জীবিতকালেই নিত্যানন্দের মতাদর্শে স্বাতন্ত্র্য ছিল। নিত্যানন্দ ভোগী, বিলাসী ও গৃহী ছিলেন, তাঁর পুত্র বীরভদ্রও ছিলেন দর্পদাপটের লোক। পিতাপুত্রের আচাব-আচরণ ছিল সামন্তসুলভ। জাহ্নবাও চলতেন রাণীর মতো। ভৃত্য অনুচরসহ অশ্বারোহণে সাড়ম্ববে তাঁরা চলাফেরা কবতেন। অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের মনের-মতের মিল ছিল না। অদ্বৈতপন্থীরা নিত্যানন্দের নিন্দাও করতেন। স্বয়ং অদ্বৈত নিত্যানন্দের আচার-আচরণে ও মত-পথে বিরক্ত হয়ে তর্জা [বাউলকে কহিও ইত্যাদি] মাধ্যমে নীলাচলবাসী চৈতন্যদেবকে তাঁর ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। খড়দহে ছিল নিত্যানন্দের আখড়া বা শ্রীপাট। কিন্তু জাহ্নবাদেবীর বা বীরভদ্রেব নেতৃত্বে নিত্যানন্দপন্থী বৈষ্ণব সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—নির্বিচাব দীক্ষাদানের ফলে জাহ্নবা বা বীরভদ্র দীক্ষিত শিষ্যরা [যারা ছিল শূন্যবাদী বজ্রসহজযানী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যেব ধারক] ক্রমে প্রকাশ্যে তান্ত্রিক ও সহজিয়া মতবাদী হয়ে ওঠে। এবং অচিবে বৈষ্ণবসহজিয়া সম্প্রদায় বিপুল ও প্রবল হয়। অবৈষ্ণব বজ্রযানীরা তথা বাউলরাও জুটে যায় ঐ দলে। ফলে জাহ্নবা-বীরভদ্র পরবর্তীকালে সহজিয়ার বাউলগুরু রূপেই প্রখ্যাত ও স্মরণীয় হয়ে থাকেন। সহজিয়ারা পরকীয়া বামাচারী সাধনায় আগ্রহী। মূলত ঘৃণ্য মানুষের চিহ্নস্বরূপ হয়তো দাস বা ভৃত্যদের [মস্তক মুণ্ডনের] মাথামুড়ানোর নিযম ছিল। তা থেকে নাড়া বা নেড়া ভৃত্যের নামান্তররূপে চালু হয়। বৌদ্ধ-জৈন-শ্রমণ-ভিক্ষু-শ্রাবকবা হয়তো দীনতা-হীনতাব প্রতীকরূপেই মাথা নেড়া করতেন। এককালে নেড়া-নেড়ী বলতে মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধদের এবং বামাচারী বৌদ্ধদের বোঝাত। বৌদ্ধবিলুপ্তির পবে মুণ্ডিতমস্তক মাদারিয়া-কলন্দরিয়া ফকিরদের বোঝাত। সম্ভবত সতোরো শতক থেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজিয়ারা বৈষ্ণবসহজিয়ারূপে যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন বামাচারী বলেই নিন্দার্থে তাদের নেড়া-নেড়ীরূপে আখ্যাত কবে ভিন্ন সম্প্রদায়েব লোকেরা। জাহ্নবা-বীরভদ্রেব শিষ্যসম্প্রদায় বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সবার কাছেই নেড়া-নেড়ী। 'নিত্যানন্দের বংশবিস্তারে' উভয় তাৎপর্যেই নাড়া (নেড়ী) ব্যবহৃত ঃ

বারশত নাড়া আর তেরশত নেড়ী
কেহো বলে গঙ্গাজল কেহো শোধে বাড়ি। ....
নাড়ি সৃষ্টি করি নাড়ার তেজ ক্ষয় হৈল।
তথাপি নাড়ার তেজ ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়।

সহজিয়ারা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও কবির নামে অনেক গ্রন্থ রচনা করে প্রচার করেছে। এভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে অন্তত তেরো খানা, নরোত্তম দাসের নামে এগারো খানা, মুকুন্দ দাসের নামে ছয় খানা, বৃন্দাবন দাসের নামে তিনখানা, বলরাম দাসের নামে তিন খানা এবং অন্য অনেকের নামে এক খানা দু'খানা মুদ্রিত গ্রন্থ মেলে। আর চণ্ডীদাসের নামে চলে অনেক জাল পদ।

[বাউল-সহজিয়াদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

১৭. পদাবলী

চৈতন্য-পূর্বে হর-পার্বতী, রাম-সীতা, মায়বন-নাপ্পিনাই, রাধা-কৃষ্ণ ছিল লৌকিক প্রণয়রস সৃষ্টির ও আস্বাদনের মাধ্যম। চৈতন্যোত্তর কালে গৌড়ীয় নববৈষ্ণবতত্ত্বের অনুশীলন ও সাধনচর্যার বাহনরূপে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বহুধা ও বিচিত্র রূপ অনুধ্যান ও কীর্তন বৈষ্ণবমাত্রেরই পক্ষে আবশ্যিক হয়। তাই সাধন-ভজন-কীর্তনের অবলম্বন হয় পদাবলী। প্রয়োজনের তাগিদে লিখতে হয় নানা রসের ও লীলার নতুন নতুন পদ। ফলে প্রতিভাবান ও শিক্ষিত বৈষ্ণবদের পক্ষে পদরচনা দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রমাণে অনুমানে বোঝা যায়, ন্যূনাধিক তিনশ' কবি প্রায় দশ হাজার

পদ রচনা করেছেন ষোল, সতেরো ও আঠারো শতকে। লক্ষণীয় যে, বাঙলায় বৈষ্ণবমতের প্রসার ও প্রভাব ক্ষেত্র মুখ্যত সীমিত ছিল প্রাচীন সুক্ষ্ম-রাঢ় অঞ্চলে বা আধুনিক প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগে। পদকারদের প্রায় সবাই ঐ এলাকার। চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম পদকারেরা বৈষ্ণবতত্ত্বানুগ কোন পদ রচনা করেননি।

তেমনি পদ সংকলন গ্রন্থগুলোও পশ্চিমবঙ্গীয় এবং সবগুলোই আঠারো শতকে সংকলিত।

	সংকলন	সংকলক	পদসংখ্যা	কাল
১.	ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি	শিবনাথ চক্রবর্তী, ওর্ফে বল্লভ দাস	৩০৯/৩১৫	আঠারো শতকে
২	গীতচন্দ্রোদয়	ঘনশ্যাম ওর্ফে নরহরি চক্রবর্তী	১১৬৯	আঠরো শতকের ২য় পাদ
৩.	পদামৃতসমুদ্র	রাধামোহন ঠাকুর	৭৪১	আঠারো শতকের মাঝামাঝি
৪.	পদকল্পতরু	বৈষ্ণব দাস [গোকুলানন্দ সেন] সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত	৩১০১	আঠারো শতকের ৩য় পাদ
৫.	কীর্তনানন্দ	গৌরসুন্দর দাস	১১১৯	১৭৬৬ খ্রীঃ
৬.	সংকীর্তনামৃত	দীনবন্ধু দাস	৪৯১	- -
৭.	পদরস সার	নিমানন্দ দাস	২৭০০	আঠারো শতকের ৩য় দশক
৮.	পদরত্নাকর	কমলাকান্ত দাস	১৩৫৮	১৮০৬ খ্রীঃ
৯.	পদকল্পলতিকা	[অপ্রকাশিত]	আনুঃ ১৪০০	আঠারো শতক
১০.	অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী	সতীশচন্দ্র রায় সংকলিত	৬০০	— —
১১.	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথি		৭০০	— —

আর প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ, গৌরপদতরঙ্গিণী, মহাজন পদাবলী প্রভৃতি বহু সংকলন গ্রন্থ আজ অবধি মুদ্রিত হয়েছে। এ সূত্রে উল্লেখ্য মুসলিম কবির পদসাহিত্য [সাড়ে তিন শ' পদ] এবং চট্টগ্রামের হিন্দু কবির পদ সাহিত্য অবৈষ্ণব কবিদের রচনা।[১]

বাঙলাদেশে আমরা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে ও অবহট্‌ঠে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার রূপ ও আলঙ্কারিক উল্লেখ আগেও দেখেছি। বাঙলাভাষায় লিখিতরূপে পাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে, চণ্ডীদাস-যশোরাজ খানের ও রায় রামানন্দের পদে। যশোরাজ খান ও রায় রামানন্দ অবশ্য চৈতন্যের সমকালীন। এসব ছিল অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্জিত সাহিত্যিক প্রয়াস। চৈতেন্যোত্তর যুগে সাধন-ভজন-কীর্তনের অবলম্বন হিসেবে বৈষ্ণবতত্ত্বানুগ [রাগাত্মিকা ও রাগানুগা] চৌষট্টি রসে বিন্যাসযোগ করে পদ রচিত হতে থাকে।

ডক্টর বিমাবিহারী মজুমদার[২] পদকারদের পাঁচ বর্গে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথম বর্গে রয়েছেন চৈতন্যপ্রভাবমুক্ত পদকার, [বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, যশোরাজ খান, রায় রামানন্দ] দ্বিতীয় বর্গে আছেন—চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যাঁরা তাঁর নবদ্বীপ লীলায় বা আদি লীলায় সাহচর্য পেয়েছিলেন তারা—মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য. রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, গৌরী দাস, মুকুন্দ দত্ত, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদন, যদুনাথ, কবিচন্দ্র, বলরাম দাস ও শঙ্কর ঘোষ—এই পনেরো জন।

১. *"পদসংকলন" গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা আমার 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।*

২. *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ৪-৬।*

তৃতীয় বর্গে রয়েছের যাঁরা, তাঁরা চৈতন্যের মধ্য ও শেষ লীলার সঙ্গী ও সাক্ষী—রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, কানাই খুঁটিয়া, অনন্ত আচার্য, দৈবকী নন্দন, নয়নানন্দ মিশ্র ও কানুরাম দাস–এই আট জন।

চতুর্থ বর্গে স্থান পেয়েছেন, চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে (১৫৩৩ থেকে) আবির্ভূত কিন্তু শ্রীনিবাস-নরোত্তমের প্রভাবমুক্ত (১৫৭০-এর পূর্বে) পদকারগণ—জ্ঞান দাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মাধবাচার্য (কৃষ্ণমঙ্গল-রচক) ও কৃষ্ণদাস—এই ছয় জন।

পঞ্চম বর্গে আছেন শ্রীনিবাস আচার্য, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীর হাম্বীর, নৃসিংহ দেব, নরোত্তম ঠাকুর, বসন্ত রায়, বল্লভ দাস, চম্পতি, শ্যামানন্দ—এ এগারো জন এবং শেখর রায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, দিব্য সিংহ, উদ্ধব দাস, গোবিন্দ গতি প্রভৃতি।'

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে' একচল্লিশ জন বৈষ্ণবপদকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এঁরা পদ রচনা করেছেন ১৫০০ থেকে ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে; সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে আঠার শতক অবধি প্রথানুগত্যবশে পদরচনা করেছেন বহু কবি। আগেই বলেছি, প্রায় দশ হাজারেব মতো পদাবলী বচিত হলেও রসোত্তীর্ণ পদের সংখ্যা চার-পাঁচশ'র বেশি নয়। অসার্থক অনুকৃতি, তরল ভাব ও আঙ্গিক দীনতা অধিকাংশ পদের মূল্যহীনতার কারণ। পদকারদের মধ্যে আজো যাঁরা রসোত্তীর্ণ পদাবলীর জন্যে পাঠকমাত্রেরই প্রিয় তারা হলেন—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস (কবিরাজ) এবং যাঁরা অনেকগুলো সুন্দব পদরচনা করেছেন তাঁরা হলেন—বলরাম দাস, অনন্ত দাস, উদ্ধব দাস, চম্পতি পতি, জগদানন্দ, নরোত্তম দাস, নরহরি সরকার, বংশীবদন, বাসুদেব ঘোষ, যদুনন্দন, যদুনাথ, রাধামোহন, রামানন্দ বসু ও রায় শেখর। অন্যান্যদের দু-একটি করে উৎকৃষ্ট পদ থাকলেও সাধারণভাবে তাঁদের পদ আকর্ষণীয় নয়। রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে স্বীকৃতি দিয়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক প্রথম পদ রচনা ও গান করেন অদ্বৈতাচার্য। সেই থেকেই চৈতন্য কিংবা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বলিত হতে থাকে।

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি
বলিলেন পরমানন্দে মত্ত হই অতি।
শুন ভাই সব এক কর সমবায়
মুখভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়।
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি
সর্বঅবতারময় চৈতন্য গোসাঞি। ....
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি
বোলাইয়া নাচে প্রভু জগৎ বিস্তারি
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।"
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ
ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ। (চৈ. ভা.)

অবতাররূপে স্বীকৃত গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র লীলাবিষয়ক পদও রচিত হতে থাকে চৈতন্যের জীবৎকালেই। পরে রসানুগ কীর্তনের আসরেও চৈতন্যের বন্দনা ও লীলানুগ পদ দিয়ে কীর্তন শুরু হতো, এখনো হয়। এসব পদই 'গৌরচন্দ্রিকা' বা প্রারম্ভগান হিসেবে আখ্যাত হয়েছে। রাধার অনুরাগ ও বিরহানুভূতিই চৈতন্যে আরোপিত। তাই চৈতন্যই ছিল ভক্তদের কাছে রূপসী অনুরাগিনী কিংবা বিরহিণী প্রমূর্ত রাধা ঃ

১. নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।

স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।

২. চম্পক, শোণ কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণিরে
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মন-মোহন ভাঙনি রে।

৩. কুন্দ-কনয় কলেবর কাঁতি.......
প্রেমভবে ঝর ঝর লোচনে চায়।

৪. বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে......

৫. আজ হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ
করতল করই বয়ন অবলম্ব।

আবার কৃষ্ণরূপেও—

১. গৌরবরণ মণি আভরণ
নাটুয়া মোহন বেশ
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল
টলল সকল দেশ।

২. মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা
নয়ানে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল পারা।

ব্রজবুলি ঃ পদকার ও পদাবলী আলোচনার পূর্বে ব্রজবুলি রীতির পরিচয় জানা প্রয়োজন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে[১], "ব্রজবুলির মূলে আছে প্রধানত দুইটি ভাষা। একটি অবহট্ঠ, অপরটি মৈথিল। ব্রজবুলি গানের ছন্দ পুরাপুরি অবহট্ঠের, ভাষাতে অবহট্ঠের চিহ্ন আছে। .....ব্রজবুলিতে মৈথিল অংশই বেশি। এ মৈথিল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দের ভাষা। বিদ্যাপতি এই ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব সময়ের (মৈথিল) কথ্য ভাষা হুবহু সমগ্র পূর্বভারতে রাজপুষ্ট শিষ্ট দেশীয় সাহিত্যে গীতিকবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। .... নেপালে, মোরঙ্গে, বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায়, আসামে।"[১]

এঁর মত মেনে নিলে স্বীকার করতে হবে যে ব্রজভাখা বা ব্রজভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি নামের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ব্রজভাখায় তথা হিন্দি-আওধি ভাষায় লেখ্য শিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয় ষোল শতকের শেষার্ধে। সুকুমার সেন 'ব্রজাওলি' (ব্রজ সম্বন্ধীয়) থেকে ব্রজবুলি নাম এসেছে বলে মনে করেন।

উড়িষ্যার 'পরশুরামবিজয়' নাটিকায় (১৪৩৫-৬৬ খ্রীঃ) একটি ব্রজবুলি গান রয়েছেঃ

এতোর চন্দবদন মেঘে কি ঢাঙ্কিলা জেহ্ন
তাহা দেখি বিকল মোর মন না।
আবর দেখই অবৃষ্টি রাজোত রুধির বৃষ্টি
পুর বেঢ়ি রোদন্তি শৃগাল না।

[বা. সা. ই. /পূ./৩, পৃঃ ১০০]

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নির্দশন হচ্ছে যশোরাজ খানের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) একটি পদ ঃ

এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর পয়োধর গোর
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর
মাধব, তুয়া দরশন কাজে

১. বাঃ সা ঃ ইং—১/পূর্বার্ধ/৩য় সং পৃঃ ৯৯-১০০।

আধপদচারি [পদ চালন] কবত সুন্দবী বাহিব দেহলি মাঝে

ডাহিন লোচন	কাজরে রঞ্জিত	ধবল রহল বাম
নীল ধবল	কমল যুগলে	চান্দ পূজল কাম
শ্রীযুত হুসন	জগৎ ভূষণ	সোই ইহ রস জান
পঞ্চ গৌড়েশ্বব	ভোগপুরন্দব	ভণে যশোরাজ খান।

[রসমঞ্জরী, পীতাম্বর দাস]

দ্বিতীয় পদটি উৎকলবাসী রায় রামানন্দের রচিত এবং প্রখ্যাত--

পহিলহিঁ বাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেশল জনি।. ....
বর্ধনরুদ্র—নরাধিপ মান
রামানন্দ রায কবি ভাণ।

যশোধরেরও একটি পদ আছে ঃ

ভণই জসোধর নব কবিশেখর
পৃহবী তেসর কাঁহা
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর
মালতি সেনিক তাঁহা

–এ যশোধর সম্ভবত মৈথিল কবি এবং তাঁর পদোক্ত শাহ হুসেনও হুসেন শাহ শর্কী।
ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্যেরও সভাপণ্ডিত রচিত একটি পদ মেলে ঃ

প্রথম তোহ্র	প্রেম গৌরব	গৌবব বাঢ়লি গেলি
অধিখ আদরে	লোভে লুবধলি	চুকালতে রতি খেড়ি
খেমহ্ এক অপ-	রাধ মাধব	পলটি হেবহ তাহি
তোহ্ বিন জএো	অমৃত পিএ	তৈএো ন জীবএ বাহি।
কালি পরসুঈ	মধুর যে ছলি	আজ সে র্ভেলি তীতি
আনুহ বোলব	পুরুষ নির্দয়	সহজে) তেজ পিরীতি
বৈরিহু কে এক	দোষ মরসিঅ	রাজপণ্ডিত ভাণ
বারি কমলা	কমল-রসিয়া	ধন্যমাণিক জান।

(সুকুমার সেন উদ্ধৃত)

এ পদটি নেপালে বিদ্যাপতির পদসংগ্রহে মিলেছে, ত্রিপুরায় বা বাঙলায় মেলেনি, তবু ধন্যমাণিক্য যে ত্রিপুরার রাজা এবং পদটিও যে এ রাজ্যের রাজপণ্ডিত রচিত, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থিত করেছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় 'রাজামালা' থেকে— 'ত্রিহুত দেশ হতে নৃত্যগীত আনি। রাজ্যেতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমণি।'

লক্ষণীয় যে উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্র, ত্রিপুরার ধন্যমাণিক্য, গৌড়ের হোসেন শাহ এবং শর্কীরাজ হোসেন শাহ সবাই ষোল শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। কাজেই কবিগণও সমসাময়িক। ষোল শতকের প্রথমার্ধের নরনারায়ণ-শুক্লধ্বজের আমলে অসমীয়া কবি শঙ্কর দেবও (মৃত্যুঃ ১৫৬৮ খ্রীঃ) ব্রজবুলি রীতিতে পদ রচনা করেছেন, যথা—

আয়ে জনক-সুতা করো পরবেশ
পেক্ষয়ে বদন মন মন্মথ ক্লেশ।
মাণিক মুকুট কুণ্ডল করু কান্তি।
দশন ওতিম নব মুক্তিম পান্তি।

ঈষত হাসি চন্দক রুচি চোব
নীল অলকে লোলে লোচন চকোর।
কঙ্কন কেয়ূর রঞ্জন কায়
রামক চরণ চিন্তি চিত্ত লগায়।
পদপঙ্কজ পংক্তি করু বোল
রূপে ভুবন ভুলে শঙ্করে বোলে।

(বা. সা. ই-১/পূ/৩, পৃঃ ২৬৮)

কাজেই দেখা যাচ্ছে পনেরো শতকের শেষ পাদ থেকে অবহট্‌ঠ-মিশ্রিত রীতিতে পদ বা গীতি রচনার রেওয়াজ বিহারে-বাঙলায়-উড়িষ্যায়-আসামে-নেপালে চালু ছিল। এমনি কৃত্রিম রীতি চালু করার দুটো কারণ অনুমান করা যায়,—এক, সাঙ্গীতিক লালিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন, দুই, বিস্তৃত অঞ্চলে - পূর্ব-দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে জনবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই কৃত্রিম মিশ্র ভাষার উদ্ভাবন ও সচেতন প্রয়োগ। এজন্যেই মধ্যাঞ্চলের অর্বাচীন অবহট্‌ঠ যা' শিষ্ট শৌরসেনীরই ভাঙা রূপ—গৃহীত হয়েছে। মুখ্যত বিদ্যাপতির ললিত মধুর পদাবলীই বৈষ্ণবদের মনোহরণ করে এবং তা' বৈষ্ণব পদকার গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রমুখ বহুল প্রয়োগে বাঙলায় জনপ্রিয় করে তোলেন এবং সম্ভবত তাঁদেরও বাসনা ছিল উত্তর ভারতেও তাঁদের রচিত পদ গণবোধ্য ও লোকগ্রাহ্য হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত প্রসারের সহায়ক হোক।

১৮. পদকার পরিচিতি

১, **যশোরাজ খান**—বৈদ্যখণ্ডের তথা শ্রীখণ্ডের লোক তিনি হোসেন শাহর পদস্থ কর্মচারী ছিলেন ঃ

যশরাজ খান দামোদর মহাকবি
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী

(রসকল্পবল্লী– রামগোপাল দাস)

২. **রামানন্দ রায়**—ইনি উৎকলবাসী। এঁরই 'জগন্নাথবল্লভম' নাটকের রাধা-কৃষ্ণলীলাগীতি চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন ঃ

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
(কৃষ্ণ) কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ .....
স্বরূপ (দামোদর) রামানন্দ (বসু) সনে
মহাপ্রভু গায় শুনে পরম আনন্দ।

রামানন্দ রায় উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলের প্রশাসক বা শাসনকর্তা ছিলেন, চৈতন্যপ্রভাবে ইনি কর্মত্যাগ করে পুরীতে বাস করতে থাকেন।

৩. **নরহরি সরকার**—তিনি শ্রীখণ্ডে গৌরনাগরবাদের প্রবর্তক। কীর্তনে নতুন ঢঙ ও সুর প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনিও শ্রেষ্ঠ পদকারদেব একজন। নরহরি সরকার চৈতন্যপার্ষদ-পরিকরের একজন।

'চৈতন্য' ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গ।–(শিবানন্দ সেন)

অথবা বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে প্রভু নরহরি সঙ্গ।(-গোবিন্দ ঘোষ)

০ ছুঁও ছুঁওনা বধুঁ ঐখানে থাক,
০ পিরীতি বলিয়া এক কমল রসের সায়র মাঝে
০ বঁধুহে কহ না রসের কথা শুনি
০ সুজন কুজন যে জন না জানে–

প্রভৃতি চণ্ডীদাসের নামে চালু পদগুলো নরহরি সরকারের ভণিতায়ও পাওয়া যায় (যো. শ, প. সা. পৃঃ ৮)। তাছাড়া নরহরি সরকারেরও পরবর্তী পদকার নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী আলাদাভাবে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য।

৪. **মুরারি গুপ্ত**—'কড়চা' নামের আদি চৈতন্যচরিত রচয়িতা ও চৈতন্য সহপাঠী বন্ধু ও ভক্ত মুরারি গুপ্তও পদাকার ছিলেন।

o ধর ধর ধর / ওরে নিতাই / আমার গৌরে ধর
আছাড় সময়ে / অনুজ বলিয়া / বারেক করুণা কর

o সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জীবন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও,—এই পদদুটো প্রখ্যাত।

৫. **ভ্রাতৃত্রয়**— গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ—চৈতন্যভক্ত ভ্রাতৃত্রয় নবদ্বীপে চৈতন্যের অনুচর ও কীর্তনের সাথী ছিলেন ঃ

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই,
যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি (চৈ. চ.)

এঁদের মধ্যে আবার মাধব ঘোষের মতো 'তেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর'। (চৈ.ভা.)

গোবিন্দ ঘোষের পদ ঃ

o হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও
o জয় রাধা- মাধব কেলি,
o গোরা গেল পূর্বদেশ নিজগণ পায় ক্লেশ
o শ্রীদাস সুবল সঙ্গে
o বিলাপয়ে কত পর কার।
o গৌরচাঁদ কিবা তোমার বদনমণ্ডল।

ভাইদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষই শ্রেষ্ঠ পদকার ছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদই বেশি রচনা করেছেনঃ

o মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা
o শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়
o আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কিভাব উঠিল
o কহ সখি জীবন উপায়
o এক মুখে কি কহব গোরাচাঁদের লীলা
o গৌরাঙ্গ চাঁদেরে হেরি
o আঁখি ফিরাইতে নারি।
o পহুঁ করুণা সাগর গোরা—
প্রভৃতি পদ প্রখ্যাত।

মাধব ঘোষের পদঃ

o উলসিত মঝু হিয়া। আজু আয়ব পিয়া।
দৈবে কৈল শুভবাণী
o শারদ সুধাকর কিয়ে মুখ-শোভা
o সজল ধনী চন্দ্রবদনী
o কারে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ
o যশোদানন্দন ফাগু খেলে
o নিজ নিজ মন্দির যাইতে
o শকতি ক্ষীণ অতি

৬. **রামানন্দ বসু**—চৈতন্যের পার্ষদ ও কীর্তনের সাথী বৈষ্ণব সমাজে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। রামানন্দ বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজ খান মালাধর বসুর বংশধর কিংবা পুত্র।

o মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে
o ধনি ঠমকি ঠমকি চলি যায়
o চূড়া বান্ধে মন্ত্র পড়ে
o চৌদিকে গোবিন্দ ধ্বনি
o তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী
o প্রাণনাথ কি আজু হৈল
o ভাল শোভা ময়ূরের পাখে

সম্ভবত 'দীন- হীন' রামানন্দ নামের আর একজন পদকারও ছিলেন।

৭. **বংশীবদন, বংশী, বংশীদাস**—ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে পদকল্পতরুতে বংশীবদন ভণিতায় ২৫টি, বংশীদাস ভণিতায় ৮টি ও বংশী ভণিতায় ৯টি পদ আছে। কিন্তু এরূপ বিভিন্ন প্রকারেব নাম থাকা সত্ত্বেও তিন নাম একই কবির, কেননা একই পালায় বিভিন্ন পদে বিভিন্ন প্রকার ভণিতাযুক্ত নাম পাওয়া যায়।... সুতরাং একজন কবিই ছন্দের অনুরোধে তিন প্রকারের নামে ভণিতা দিয়াছেন। এই কবি বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এই কথা নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন।... সুতরাং এই বংশীদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বংশীদাস হইতে পারেন না" (ষো.শ. প. সা.পৃঃ ৩৬-৩৭) নবদ্বীপবাসী এই বংশীবদন (চট্ট) অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকার। তাঁর বহু পদ জনপ্রিয় ।

o আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে
o ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি
o চিকন শ্যামল রূপ
o ঝমকি ঝমকি পড়িছে
o দানী কহে ফির ফির
o নয়নে লাগিল
o আল সই, কি হৈল মোরে প্রেমজ্বালা
o না বাও হে না বাও হে নবীন কাণ্ডারী
o না যাইও না যাইও রাই
o রাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
o রাই কানু যমুনার মাঝে
o রাই সাজে বাঁশি বাজে
o হেন রূপে কেন যাও
o শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ
o নীল পীত ধরা নন্দ পরায় আপনি
o বিনোদিনী মো বড় উদার দানী
o যমুনার দুকূল করিল আলা নায়্যার রূপে
o কেলি কদম্ব মূলে ও না নব মেঘের কোড়া
o আর না হেরিব প্রসর কপালে

৮. **বলরাম দাস**—এই নামে দুইজন পদকার রয়েছেন। একজন ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং চৈতন্যদেবের সমকালীন। অপরজন বৈদ্য এবং প্রখ্যাত পদকার গোবিন্দদাস (কবিরাজ) -এর বংশোদ্ভুত সতেরো শতকের কবি। পদকল্পতরুতে সংকলক বৈষ্ণবদাস বলেছেন ঃ " কবি-নৃপ (-কবিরাজ) বংশজ/ ভুবনবিদিত /ঘনশ্যাম বলরাম"
দেবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনায় ব্রাহ্মণ কবি বলরামের নিম্নরূপ পরিচয় দিয়েছেন ঃ

সঙ্গীত কারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস।

এই বলরাম সাধারণত বাঙলায় পদ রচনা করেছেন এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশধর গোবিন্দদাস কবিরাজের অনুকরণে ব্রজবুলি পদই রচনা করেছেন বলে ডক্টর সুকুমার সেনের ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের ধারণা। বৈদ্য বলরাম অনুকারক কবি (ষো.শ. প. সা. পৃঃ ৪৮-৪৯)। আদি ও ব্রাহ্মণ বলরামের বাঙলা পদ লালিত্যে মধুর ও কবিত্বসম্পদে ঋদ্ধ। এঁর কয়েকটি পদ।

o অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতার খেচনি
o আজু কানাই হারিল দেখ
o আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী
o একদিন গোপীভাবে জগত ঈশ্বর
o কপাল চন্দন চাঁদ
o কি রূপ দেখিনু সই
o কিবা সে মোহন বেশ
o কে মোরে মিলায়া দিবে সে চান্দ বয়ান
o গোঠে আমি যাব না গো
o চাঁদ মুখে বেণু দিয়া
o দুখিনীর ব্যথিত বন্ধু
o ভাল রঙ্গে নামে মোর শচীর দুলাল
o যমুনার তীরে কানাই
o শ্রীদাস-সুদাস দাম
o সবে বলে সুজন পীড়িতি

ব্রাহ্মণ বলরামদাস শ্রেষ্ঠ পদকারদের একজন।

৯. **যদুনাথ দাস**– ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও স্বগ্রামবাসী। ইনি সম্ভবত নিত্যানন্দের কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। এঁর উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। এঁর পিতা রত্নগর্ভ আচার্য। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলোতে এঁর উল্লেখ রয়েছে। এঁর অপর দুই ভাইয়ের নাম কৃষ্ণানন্দ ও জীব।

ক. তিন পুত্র তাঁর [রত্নগর্ভের] কৃষ্ণপদ মকরন্দ
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র। (চৈ. ভা.)

খ. মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র
তাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ। (চৈ. চ.)

তিনি নবদ্বীপে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ক. চৈতন্যের 'অরুণ নয়ানে বরুণ আলয়
বহয়ে প্রেমসুধা জল
যদুনাথ দাস বলে যেন সোনার কমলে
প্রসবিছে মুকুতার ফল।
(যো, শ, সা, উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৪)

খ. মুখ পাখালিয়া গৌরহরি নদীয়া নগরে হেন বিলাস
বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি যদুনাথ দেখে গদাই পাশ। (ঐ)

এঁর কয়েকটি বিশিষ্ট পদ ঃ

- অল্প বয়সে মোর শ্যাম রসে জর জর
- আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
- ওরে রে মদন তুমি
- আর শ্যামের মুখখানি পূর্ণিমার বাঁশী।
- কষিল কনয়া কমল কিয়ে
- কি পেখলুঁ যমুনার তীরে
- খলরে ভ্রমর তুমি
- গোপীর ক্রন্দন শুনি কান্দে
- ধনি তুহুঁ দূতি, ধনি তুয়া কান
- বৃন্দাবন তরুলতা
- রাই কত পরখসি আর
- শুন শুন মধুকর
- কি বলিলে সুধামুখি
আমি মাঠে ধেনু রাখি
- জননী কোড়ে বিলসত নন্দদুলাল
- বাঁশীরব শুনিল কানে চিত্তে ধৈরজ না মানে
- সে যে বিনোদনাগর বড় রসিয়া

১০. **কানুরাম দাস**—এঁর পিতা পুরুষোত্তম এবং পিতামহ সদাশিব কবিরাজও চৈতন্যভক্ত ছিলেন। এঁরা নিত্যানন্দ শিষ্য। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এঁদের পরিচয় রয়েছে ঃ

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।

কানু দাসের বা কানুরাম দাসের পদাবলী অনুভব-সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ললিত মধুর।

এঁর কয়েকটি পদ ঃ

- না কহ না কহ সখি
- রসের হাটেতে আইলাম
- পনবক পরশহি বিচলিত

১১. **অনন্ত দাস, রায় অনন্ত, অনন্ত আচার্য, অনন্ত**—এই চার ভণিতায় অভিন্ন কবির কিংবা একাধিক কবির পদ মেলে, তা' নিরূপণ করা সহজ নয়। পদকল্পতরুতে ও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে অনন্তের ভণিতায় এবং রায় অনন্তের ভণিতায়ও অনেক পদ মেলে। অনন্ত আচার্য ভণিতায়ও কয়েকটি পদ রয়েছে। তাই মনে হয় অনন্ত দাস ও রায় হয়তো অভিন্ন ব্যক্তি এবং অনন্ত আচার্য ভিন্ন এক কবি। ডক্টর বিমানবিহারীর মতে অনন্ত আচার্যই বিভিন্ন ভণিতায় সব পদ রচনা করেছেন।

○ আহির রমণী মত—অনন্ত আচার্য
○ চল চল মাধব করহ পয়ান—অনন্ত
○ ঢল ঢল মিঠ মিঠ রস বঞ্চক—অনন্ত
○ নব জলধর তনু থির—অনন্ত
○ না বোল না বোল কানুর বোল—অনন্ত
○ আজু রসের বাদর নিশি—অনন্ত দাস
○ কি হেরিলুঁ কদম্ব তলাতে—ঐ
○ দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা—ঐ
○ ধনি ধনি বনি অভিসারে—ঐ
○ নব নায়রি নব নায়র—ঐ
○ বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ—ঐ
○ কি কচ সরোজ ভাণ মুখমণ্ডল—ঐ
○ সজনী, মনে লাগল নন্দ কিশোর—ঐ
○ সরস বসন্ত সময় বন শোহন—ঐ

১২. চরিতকার **বৃন্দাবন দাস** এবং **লোচন দাস**ও অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। বৃন্দাবন দাসের 'বিমল হেম জিনি' পদটি এবং লোচন দাসের 'এস এস বঁধু এস' 'আরো শুনেছ অ লো সই গোরাভাবের কথা' পদ দুটো প্রখ্যাত।

১৩. **জ্ঞানদাস**–নিত্যানন্দের জীবৎকালই যে জ্ঞানদাসের জন্ম এবং বাল্যে যে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা' কবির কোন কোন পদে কীর্তনমত্ত নিত্যানন্দের আলেখ্য থেকে অনুমান করা যায়। কবির যে নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব ছিলেন, তাও তাঁর রচিত পদ থেকে বোঝা যায় ঃ

ক. চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়
জ্ঞানদাস নিশিদিশি নিতাইর গুণ গায়।

খ. অখিল লোক যত ইহ রস উনমত
জ্ঞানদাস নিতাই গুণ গানে।

জ্ঞানদাসের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে। এখানে জ্ঞানদাসের মঠ আছে। কাঁদড়া নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচাকা গাঁয়ের তিন-চার মাইল দূরে অবস্থিত। জ্ঞানদাস জাহ্নবার শিষ্য বলে বৈষ্ণবসমাজে লোকশ্রুতি আছে। প্রথম জীবনে জ্ঞানদাস মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অনুকারক ছিলেন এবং ব্রজবুলি পদ রচনায় তাঁর আসক্তি ছিল সে কারণেই। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর অনুকৃত পদের কিছু নমুনা দিয়েছেন। যেমন ঃ

ক. বিদ্যাপতি—কে কহে বালা কো কহে তরুণী
জ্ঞানদাস— কি যে ধনি বালা কিয়ে বরনারী

খ. বি— বদর সবিস কুচ পরসব লহু
কত সুখ পাওব করিত উহু উহু
জ্ঞা— উরজ উঠল জনু বদরি
করে জনি ঝাঁপহ সগরি।

গ. বি— কাঁচ কমলে ভ্রমরা ঝিক ঝোর
জ্ঞা— কলিকা কমলে ভ্রমর নহ মেলি (ষো. শ. প. সা. পৃঃ ৮৬-৮৭)

বিমানবিহাবী মজুমদার বলেন, "শিক্ষানবিশীর যুগে জ্ঞানদাস বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের পদ সামনে রাখিয়া গীত রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিপ্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিতে বেশি সময় লয় নাই; তিনি বিদ্যাপতিব আলঙ্কারিক রীতি পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের ও নরহবি সরকারের সহজ-সরল মরমী রীতিতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পথে তাঁহার সাফল্য হইল অনন্যসাধারণ। দেহের সঙ্গে মনের যে নিবিড় সম্পর্ক তাহা জ্ঞানদাসের পদে যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছে, এমনটি আর কোন বৈষ্ণব মহাজনের পদে নহে" (পৃঃ ৮৯)। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান।

পদাবলী সাহিত্যের পাঠকের কাছে চণ্ডীদাসের অনুসারী রূপে জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির অনুকারক রূপে গোবিন্দ দাস পরিচিত। বস্তুত এই চারজনের রচনাই বৈষ্ণব সাহিত্যকে লোকপ্রিয় রেখেছে ঃ

জ্ঞানদাসের প্রখ্যাত পদাবলী ঃ

০ লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি
০ কিরূপ হেরিলুঁ কালিন্দী কূলে
০ কমল বয়ান কনক কাঁতি
০ রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনে ভোর
০ কিবা রূপে কিবা গুণে মোর মন বান্ধে
০ আ লো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে
০ তরুমূলে কিরূপ দেখিলুঁ কালা কানু
০ একা কুম্ভ কাঁখে করি যমুনাতে জল ভরি
০ মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
০ মুরলীর স্বরে রহিবে কি ধরে
০ সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
০ বিনোদিনী পহিলে চাপিলা গিয়া নায়
০ বৃষভানুনন্দিনী রমণীর শিরোমণি
০ কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
০ মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার
০ রাঁধা তুয়া অনুরাগে হাম নিমগ্ন
০ আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
০ সুন্দরি কাহে কহসি কটু বাণী
০ চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি
০ আওরে ঋতুরাজ বসন্ত
০ দেখরি সখী শ্যামচন্দ
০ ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি
০ সুন্দরি আমারে কহিছ কি
০ চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কি দিল ময়ূর পুচ্ছ
০ পেখলুঁ নাগব পন্থ কি মাঝ
০ এই বনে মনে দানী হইয়াছ
০ এ ঘোর রজনী মেঘের গরজী

ার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে তাঁহার পূর্ববাগ, অক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদাবলী।' [বিমানবিহারী মজুমদার]

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোব
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

কিংবা–
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে অন্তর কান্দে কিবা করে প্রাণ।

অথবা,
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

এসব পদ তত্ত্বের দিক দিয়ে, বাস্তব জীবনের উপলব্ধ তথ্যের দিক দিয়ে যেমন জীবনসত্য উদঘাটিত করেছে, তেমনি আবেগের তীব্রতায়, ব্যঞ্জনার বিস্তারে, অভিব্যক্তির লাবণ্যে, অলঙ্কারের সহজ সুপ্রয়োগে, রসমাধুর্যে অসাধারণ ও চির-মানবের সম্পদ। জ্ঞানদাস যে সঙ্গীতবিদও ছিলেন তার প্রমাণ, তাঁর রচিত 'মুরলী করাও উপদেশ' পদটি।

১৪. **গোবিন্দদাস** (কবিরাজ)—বৈদ্য গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডের [তথা বৈদ্য খণ্ডের] সুনন্দা ও চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, মাতামহের নাম দামোদর। জীবগোস্বামী গোবিন্দদাসের পদের অনুরাগী ছিলেন এবং কবির কাছে দুটো পত্র লিখে তিনি তাঁর কাব্যরস মুগ্ধতার উল্লেখ করেছেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ। বর্ধমানের কুমারনগর ত্যাগ করে তৈলিয়া বুধরি [ভগবানগোলার কাছে] গাঁয়ে তাঁরা নতুন নিবাস তৈরি করেন। দুই ভাই ছিলেন শ্রীনিবাস আর্চাযের শিষ্য।

তাছাড়া গোবিন্দদাসের কোন কোন পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্য ও চম্পতি রায়ের উল্লেখ রয়েছে ---'ও রস গাহক প্রতাপাদিত্য দাস গোবিন্দ ভাণরে। প্রতাপ আদিত্য এরস ভাসিত। দাস গোবিন্দ গান। রায় চম্পতি রচন মানিয়ে দাস গোবিন্দ ভাণ রে। —কবির মাতামহ ছিলেন কবি। গোবিন্দ দাস (কবিরাজ) 'সঙ্গীতসাধক' নামের গ্রন্থও রচনা করেছিলেন,[১] [ভক্তিরত্নাকর]। অতএব,

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, তথ্য ও কালক্রম, পৃঃ ১১৪-৪৬

গোবিন্দ দাস (কবিরাজ) ষোল শতকের শেষ পাদেও বর্তমান ছিলেন। গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহও কবি ছিলেন গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন এবং ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন। তিনি এককথায় আলঙ্কারিক কবি। অনুভবের গভীরতায় নয়, ছন্দ শব্দ ও অলঙ্কারের ঘটাই তাঁব পদাবলীকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছে। তাই অঙ্গে ও অবয়বে গোবিন্দদাসের পদ বিশিষ্ট। তবে রূপের এ জৌলুসের সঙ্গে হৃদয়-মনের অকৃত্রিম স্পর্শ ক্বচিৎ সুলভ। রূপচিত্রণে আর পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, আক্ষেপানুরাগ ও বিরহ বিষয়ক পদ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বাঙালী কবিদের মধ্যে অতুল্য। কোন কোন ক্ষেত্রে গোবিন্দ চক্রবর্তী ও গোবিন্দদাসের পদের পার্থক্য নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। পরবর্তীকালে সতেরো-আঠারো শতকে গোবিন্দদাসের অনেক অনুকারক কবি ছিলেন।

গোবিন্দদাসেব অসংখ্য জনপ্রিয় পদের কয়েকটি ঃ

রূপ ঃ

- চম্পক শোণ কুসুম
- নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
- পতিত হেরিয়া কান্দে
- কুন্দ-কনয় কলেবর কাঁতি
- কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
- নন্দ নন্দন চন্দ-চন্দন গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ
- ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
- সুবপতি ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে

অভিসার ঃ

- কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ
- কঞ্জ চরণযুগ যাবক রঞ্জন
- শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা
- দিনমণি কিরণে মলিন মুখমণ্ডল
- মন্দির বাহির কঠিন কপাট
- কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ
- কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
- অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ
- নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
- মেঘ যামিনী চলল কামিনী
- ভীতক চীত ভুজগ হেরি যে ধনি
- কুন্দ কুসুমে তরু কববীক ভার
- মাথহি তপন তপ্ত পথ বালুক
- মাধব কি কহব দৈব বিপাক

মিলন ঃ

- দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
- দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল
- দোহেঁ দোহাঁ দরশনে ভাবে বিভোর
- দুহুঁজন আওল কুঞ্জক মাহ
- আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে ধরি
- কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
- কুঞ্চিত কেশিনী নিরূপম-বেশিনী
- যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি
- রূপে ভরল দিঠি সোঙর পরশ মিঠি
- আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
- চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
- মন্দ মন্দ মধুর তান

দান :

- এই মনে বনে দানী হইয়াছে
- রাধা মাধব নীপমূলে হো

মান ঃ

- শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরী
- অঙ্কল প্রেম পহিল নাহি জানলুঁ
- পদনখ হৃদয়ে তোহারি
- কাহা নখ চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরী
- চরণে লাগি হরি
- রাইক হৃদয়-ভাব বুঝি মাধব
- রাই অনাদর হেরি রসিক বর
- যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে
- সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে

বসন্ত ঃ

- শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত
- খেলত ফাগু-বৃন্দাবন চান্দ

রাস ঃ

- ঝর ঝর জলধর
- বৃষভানু নন্দিনী নব অনুরাগিণী
- অপরূপ ঝুলন নানা ফুল শোভন
- শরদ চন্দ পবন মন্দ
- বিপিনে মিলল গোপনারী
- রাধা শ্যাম নাচে রে

বিরহ ঃ

- এই ত মাধবী তলে
- তুহুঁ রহলি মধুপুর
- যাহাঁ যাহাঁ পহুঁ অরুণ চবণে চলি যাত

১৫. **শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস পুত্র গোবিন্দ গতি, (দ্বিজ) বসন্ত রায়, বিষ্ণু পুররাজ বীর হাম্বীর, মানভুমরাজ নৃসিংহ দেব, বল্লভদাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী** প্রমুখও পদ রচনা করছেন।

১৬. **যদুনন্দন দাস**—ইনি শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য ছিলেন। ইনি বর্ণে বৈদ্য। নিবাস মালিহাটি গ্রামে। যদুনন্দন 'গোবিন্দলীলামৃত' 'বিদগ্ধমাধব', 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদকও। অনুদিত গ্রন্থে তাঁর আত্মপরিচয় ও জীবৎকাল মেলে :

ক. শ্রীচৈতন্য দাসের দাস ঠাকুর শ্রীনিবাস
আচার্য সুতা যে হেমলতা
তার পাদপদ্ম আশ এ যদুনন্দন দাস
অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা। (গোবিন্দলীলামৃত)

খ. দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার। (কৃষ্ণকর্ণামৃত)

গ. পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন দিয়া মন। (কৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদ)

এতে ৫২৯ শক বা ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দ মেলে।

১৭. **দৈবকী নন্দন সিংহ,** কবিরঞ্জন, কবিশেখর, রায় শেখর ও বিদ্যাপতি-- এতগুলো উপাধিধারী কবি বিভিন্ন পদের ভণিতায় সব কয়টিই ব্যবহার করে পাঠকের ও ঐতিহাসিকের বিভ্রান্তির কারণ ঘটিয়েছেন। ইনি গোপালচরিত, গোপীনাথ বিজয়, গোপাল বিজয় ও দণ্ডাত্মিকাপদাবলী প্রণেতা। 'তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত/ গোপীনাথ বিজয় নাটক কৈল/ আর তবে কৈল গোপালের কীর্তন অমৃত/তবে সে পাঁচালী করি গোপাল বিজয়ে/ সিংহ বংশে জন্মনাম দৈবকীনন্দন/ শ্রীকবি শেখর নাম বলে সর্বজন/ বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হীরাবতী'--- শ্রীখণ্ডে ছিল কবির নিবাস (সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের'''' তথ্য ও কালক্রম পৃঃ ৮৬-৮৭)। ঐ কাব্যে কবিশেখর, শেখর ও রায়শেখর ভণিতাও দৃষ্ট হয়। সতেরো শতকের রামগোপাল দাসের ও রসিক দাসের 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে কেবল রঘুনন্দনাশিষ্য কবি-শেখরের উল্লেখ মেলে। রামগোপাল দাস তাঁর রসকল্পবল্লীতে কবিশেখরকে 'গোপালবিজয়' রচয়িতা বলে উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। কবিরঞ্জনও রঘুনাথশিষ্য। রামগোপাল দাস আবার স্পষ্টই বলেছেন যে কবিরঞ্জনই ছোট 'বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত-'ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।' এবং 'কবিরঞ্জন যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী' (-শাখানির্ণয়) তথা গৌড়দরবারের কর্মচারী (রাজসেবী) ছিলেন।

এঁর কয়েকটি পদ :

- গগনে অব ঘন মেহ দারুণ—রায় শেখর
- দেখ দেখ গোরা নটরঙ্গ—ঐ
- দুহুঁ মুখ সুন্দর—ঐ
- নাচত নাগর কান—ঐ
- হে দে রে নিলাজ কানাই—ঐ
- মনোহর কেশ বেশ মনোহর—ঐ
- অপরূপ রাধা মাধব—ঐ
- বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম—ঐ
- খেলা রসে ছিল কানাই—ঐ
- আরে সখি বাজাত বংশী মধুর—কবিরঞ্জন
- জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর—ঐ
- মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব—ঐ
- দণ্ডবৎ করি মায় চলিলা যাদব রায়—
- ঝর ঝর বরিখে সঘন—শেখর
- দূরে আওত নাগর রায়—ঐ
- শুন শুন সজনি কি কহব—ঐ

১৭. নানা সূত্রে জানা যায় দুইজন **বলরাম** [বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ] দুইজন **নরহরি** (সরকার ও চক্রবর্তী), দুইজন **উদ্ধব দাস** (দাস), দুইজন **গোবিন্দ** [বৈদ্য কবিরাজ ও চক্রবর্তী] ছিলেন। এজন্যে এঁদের পদ নিরূপণে বিভ্রান্তি ঘটে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির আগে দশ শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে আরো চারজন কবি **বিদ্যাপতি** সংস্কৃতে কবিতা বা শ্লোক রচনা করেছিলেন। এক বাঙালী শ্রীখণ্ডবাসী **বিদ্যাপতিও** বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। তারও উপাধি ছিল কবিরঞ্জন। তাঁর পদ ঃ

০ যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ লাবণি
০ যশোদা নন্দন দেখি আনন্দে পূর্ণিত আঁখি
০ সজনি সো বর নাগররাজ।

১৮. সতেরো শতকের পদকারদের মধ্যে গোবিন্দাদাস কবিরাজের পুত্র **দিব্যসিংহও** শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র পদ মেলে সংকীর্তনামৃতে, পদটির আরম্ভ ঃ

যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দীতীর
নয়নে ঝরএ কত বারি অথির।
শেষ ঃ দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা
রাই কাহ্নু একতুনু দুই এক ঠামা।

১৯. গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্যসিংহের পুত্র **ঘনশ্যাম** কবিরাজও পদকার ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলি পদরচনা করেছেন। বিদ্যাপতির বা শেখরের অনুকরণে রচিত একটি পদের আরম্ভ ও শেষ ঃ

ডাকে ডাহুকী/ঝমকে ঝুমকল/ঝিঁ ঝিঁ ঝদকত ঝাঁঝিয়া
..... নন্দ নন্দন/চরণে ভণ ঘন/শ্যামদাস নমন্তিয়া।

আঠারো শতকের **নরহরি চক্রবর্তী** নামের এক ব্যক্তিও 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় পদ রচনা করেছিলেন।

২০. **রাধাবল্লভ দাস, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ** ভণিতায় তিন জনের বা একজনের পদাবলীও মেলে। শুধু বল্লভদাসও রয়েছেন। ইনি সম্ভবত নরোত্তমশিষ্য শ্রীবল্লভ চৌধুরী। বল্লভ ও শ্রীবল্লভ ভণিতাও মেলে।'

এছাড়া শিবরাম দাস, রাঘবেন্দ্র রায়, রসিকানন্দ, রাধানন্দ, বিপ্রদাস ঘোষ, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, নিমানন্দ, প্রেমদাস, দুর্লভ রায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস, গৌরসুন্দর দাস, দীনবন্ধু দাস, গোকুলচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই সতেরো-আঠারো শতকে পদরচনা করেছেন, এগুলো প্রাণহীন মাধুর্য রহিত অনুকৃত রচনা, তাই মূল্যহীন। বিশেষ করে দেশকালের পরিসরে জীবনের প্রয়োজনে যে চিন্তা-চেতনার উদ্ভব এবং অভিব্যক্তি তা কালান্তরে অনুকৃত হলেও তার উপযোগ থাকে না—তখন তা পিছিয়ে পড়া মন-মানসেরই সাক্ষ্য মাত্র।

১৮. মুসলিম পদকার পরিচিতি

অনন্ত—এঁর জাতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রচনার প্রমাণে মনে হয় মুসলমান। কিন্তু নামে হিন্দু এমন অনেক নাম আজো আছে, যেগুলো হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ঐতিহ্য। কাজেই 'অনন্ত' মুসলমানের নাম হওয়া বিচিত্র নয়। পদকল্পতরু প্রভৃতির পদকার অনন্ত ভিন্ন ব্যক্তি।

আইনুদ্দীন (সৈয়দ)—আইনুদ্দীন ও মনোহর এক শাহ আইনুদ্দীনকে তাঁদের পীর বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য পদকার সৈয়দ আইনুদ্দীনই যে তাঁদের পীর তা জোর করে বলা যায় না। এক শাহ আকবর আইনুদ্দীনের পীর ছিলেন। এঁকে কেউ কেউ পদকার আকবর অনুমান করেন। আকবর শাহর পদটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রথম সংকলিত হয়। এতে মনে হয় তিনি হয়তো পশ্চিম বাঙলার লোক ছিলেন। আইনুদ্দীন সম্ভবত চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। তাই পদকার শাহ আকবর আইনুদ্দিনের পীর ছিলেন বলে মনে হয় না। নিকাহ্‌মঙ্গল নিবন্ধটিও আইনুদ্দিনের রচনা (পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩১)। আইনুদ্দিন সম্ভবত সতেরো শতকের কবি।

আকবর আলী—হাদিসের কথা, চোরাব হেকায়েত, সখিনার বারমাস, হানিফার বারমাস প্রভৃতি রচয়িতা আকবর আলীই সম্ভবত আমাদেব আলোচ্য পদকার। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থের পদকার শ্রীহট্টবাসী সৈয়দ আকবব আলি শাহ্ ভিন্ন ব্যক্তি। আলোচ্য আকবর আলী সম্ভবত আঠারো শতকেব শেষপাদে চট্টগ্রামে বর্তমান ছিলেন।

আকবর শাহ—সম্ভবত পশ্চিমবাঙলার লোক এবং ব্রজবুলির প্রধান কবিদের মতো তিনিও ষোল শতকের কবি বলে আমাদেব ধারণা। সম্রাট আকবর ও পদকার আকবর শাহ্ অভিন্ন ব্যক্তি বলে কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। এক আকবর শাহ্ পণ্ডিতের রাগমালাও আছে (পু. পবিচিতি পৃঃ ৪৫২)।

আফজল আলি—ইনি একটি পদে সম্ভবত গৌড়সুলতান সৈযদ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর পৌত্র ও নুসরত শাহর পুত্র সৈয়দ ফিরোজ শাহর (১৫৩২-৩৩) নামোল্লেখ করেছেন। আমাদের অনুমান সত্য হলে ইনি ষোল শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বর্তমান ছিলেন। চট্টগ্রামেব সাতকানিয়া থানার বিখ্যাত দরবেশ শাহ রুস্তমের এক শিষ্য আফজল আলি আঠারো শতকের পীবের আদেশে 'নসিয়তনামা' রচনা করেন। পদকার আফজল আলি ভিন্ন ব্যক্তি।

আফজল (সৈয়দ)—ইনি সম্ভবত কবি এতিম নাসিবেব পীব শাহ আফজল। আফজলও তাঁর পীর শাহ কাতালের প্রশস্তি গেয়েছেন। এই 'কাতাল' এর নামেই সম্ভবত চট্টগ্রাম শহবের একটি অঞ্চল কাতালগঞ্জ হয়েছে।

আবাল ফকির—এক বালক ফকিব ফায়দুল মুকতদী ও বুরহানুল আরেফিন নামে ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ও চৌতিশা রচনা করেছেন। বালক ফকির শাহ আলী বজার মুরিদ ছিলেন ঃ

শাহ আলী বজা গুরু পদে নমস্কারী
বালক ফকিবে ভণে কিতাব বিচাবি।

অতএব বালক ফকির আঠাবো শতকের শেষার্ধের কবি। এই বালক ফকিরই যে আবাল ফকির তা জোর করে বলাব উপায় নেই। তবে বালক আর আবাল একার্থবোধক।

আব্বাস—পরিচয় অজ্ঞাত।।

আম্মান ও আমান—আম্মান ও আমানকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি। এক আমানকে আমরা 'সখীর বারমাস' রচয়িতা বলে জানি (পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩৭৪)। আমাদের অনুমান তিন লেখকই অভিন্ন ব্যক্তি।

আলাউল—'পদ্মাবতী' প্রভৃতি বহু কাব্যের অনুবাদক। ইনি পদকারও ছিলেন এর পরিচিতি রোসাঙ্গ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

আলাউল খান—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পদ্মাবতীর (১ম খণ্ড) ভূমিকায় উদ্ধৃত এক পদে এক সাধক আলাউল খানের উল্লেখ আছে। কিন্তু "সই বড় অপরূপ সাজে" পদের ভণিতায় বিকল্পে যে আলাউল খান আছে, তা আমাদের ধারণায় 'ভাণ' স্থলে খান হয়েছে। বরিশালের আলাউল খান ভিন্ন ব্যক্তি।

আলিমুদ্দিন—এক আলিমুদ্দিন যোগকলন্দর পুথির লিপিকর ছিলেন। লেখা শেষ করে তিনি বলেছেন,

এক পুস্তক যে মুই সমাপ্ত করিলুম
আসলেও এহার অধিক না পাইলুম।
আর এক নিবেদন শুন গুণিগণ
লিপি করিলুম নাম থাকিতে কারণ।
মনবাঞ্ছা অধীনের এইমত ছিল
দিন 'মারফত' এই প্রচার করিল।
নতু কেহ নাম মোর করিলে বিচার
উপরের পঞ্চপদে পাইবেক সার।

আসলেত যে মত বচন পাইলুম।
কবি স্মরি মান্য করি যতনে রাখিম।
পদের আদ্যাক্ষর একত্র করিয়া
অধীনের নাম সবে চাহিবে পড়িয়া।
শাকে মঘী সহস্র যে কুরুপুত্র জান
নেত্র শেষে দ্রূপ-সুতা-পতি হয় মান।
ফাল্গুনের রোজ দিন তারিখ যে গণি
এই মতে হিসাব যে নও পরিমাণি।
(পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৪৫৩-৪৫)

সহস্র—১০০০, কুরুপুত্র—১০০, নেত্র—৩, দ্রুপসুতাপতি—৫, অথবা ১১৩৫ মঘী পাওয়া যায়।

অতএব আলিমুদ্দিন ১১৩৫ মঘী বা ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে যোগকলন্দর নকল করেন। এঁর অমরত্বের বাঞ্ছা ও কবিতা রচনার প্রবণতা দেখে আমাদের মনে হয় ইনিই পদকার আলিমুদ্দিন। আমাদের ধারণা সত্য হলে ইনি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন।

আলি মিয়া—গুলে বকাউলির [উনিশ শতকের প্রথমার্ধের] কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর সমকালীন চট্টগ্রামবাসী কবি হিসাবে সম্ভবত এই আলি মিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। 'হারি নাম' আলি মিয়া পদেত সালাম' (পুঃ পরিচিতি পৃঃ ১০১)। তা হলে আলি মিয়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। লোকশ্রুতি অনুসারে তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে। সুলতানপুর মুকিমের কর্মস্থল ছিল। আলি মিয়া সাধারণ্যে 'পণ্ডিত' বলে খ্যাত ছিলেন। পদকার মুহম্মদ হাসিমের পুত্র কবি আলি মিয়া ভিন্ন ব্যক্তি।

আলী রজা [জন্ম ঃ ১৭৫৯— মৃঃ ১৮৩৭ খ্রীঃ] আলী রজা ওরফে কানু ফকির বহু গ্রন্থ প্রণেতা। সুফীসাহিত্য পরিচ্ছেদে তাঁর বিস্তৃত পরিচিতি দেয়া হয়েছে। তাঁর দুই পুত্র **সরফতুল্লাহ** এবং **এর্শাদুল্লাহও** কবি ছিলেন। এঁরা পিতাকেই পীর করেছিলেন। এঁরা উনিশ শতকের শেষার্ধেও জীবিত ছিলেন।

আসক—পরিচয় অজ্ঞাত।

আসাউদ্দীন—কবি মনোহরের পীরভাই ছিলেন। অতএব উভয় কবি সমসাময়িক ছিলেন। তাদের পীর আইনুদ্দিন যদি পদকার সৈয়দ আইনুদ্দিনই হন, তাহলে তিন কবি একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। এঁরা সবাই আঠারো শতকের কবি বলে অনুমান করা যায়।

এতিম কাসেম—তিনি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ঈসাপুরবাসী ছিলেন। তাঁর 'আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি' নামের রচনায় তাঁর কিছু আত্মপরিচয় আছে। নিঃস্ব কবি স্থানীয় পর্তুগীজ জমিদারের বিধবা আওরা দ্য বারোজের কাছে যাচ্ঞা প্রসঙ্গে এ প্রশস্তি রচনা করেছেন। পরোক্ষ প্রমাণে জানা যায় তিনি লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) উক্ত প্রশস্তি রচনা করেন। কাজেই এতিম কাসেম আঠারো শতকের শেষার্ধের কবি। [বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় বর্ষ ঃ ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬৩ সন দ্রষ্টব্য]

এবাদত ও এবাদুল্লাহ—সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। পুথি পরিচিতির ক্রমিক ৩৯৬ এবং ৪০৮ সংখ্যক রাগমালায় এবাদতের পদ আছে। এবাদুল্লাহর নাম রাগমালাগুলোর কোথাও নেই। কাজেই ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' তৃতীয় খণ্ডে বিধৃত একটি পদের ভণিতায় যে এবাদুল্লাহ আছেন, তিনি সম্ভবত এবাদত। আমাদের ধারণা লিপিকর প্রমাদে—হয় এবাদত এবাদুল্লাহ হয়েছে, নয়তো এবাদুল্লাহ এবাদত হয়েছে।

এর্শাদুল্লাহ—কবি আলী রজার পুত্র। নিবাসও ওশখাইন, পিতাকেই পীর করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধেও বর্তমান ছিলেন।

শেখ কবীর—শেখ কবীর ও কবীরকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করি। সুলতান নাসির শাহর (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) প্রশস্তির প্রমাণে তাঁকে চৈতন্য সমসাময়িক ও ষোল শতকের প্রথমার্ধের লোক বলে মেনে নিতে হয়। কোন কোন বিদ্বানের মতে কবি শেখরই লিপিকর প্রমাদে 'শেখ কবির' হয়েছেন।

কমর আলী (পণ্ডিত)—চট্টগ্রামের খিতাবচরের ও সতরপটুয়ার পাশের গ্রাম করুল ডেঙ্গাতেই কমর আলী পণ্ডিতের জন্ম। ইনি শরীয়ৎ বিষয়ক সরসালের নীতি, রাধার সম্বাদ বা ঋতুর বারমাস নামের পদবন্ধ ও পদাবলী রচয়িতা। করুলডেঙ্গায় তাঁর বংশধরেরা আজো সাধারণ্যে কমর আলীর পরিচয়ে চলেন।

সরসালের নীতির রচনাকাল—

চন্দ্রশত বসু ঋত সন যদি হৈল
ছরসালের নীতি হীনে পঞ্চালী রচিল।

নবী করিয়াছে এই হিজরীর সন
বৈশাখেতে মঘী সন চৈত্রতে পূরণ।

এতে ১০৮৬ হিজরী বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ হয়। অতএব, কবি সতেরো শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

খলিল—'চন্দ্রমুখী' উপাখ্যান রচয়িতা খলিল সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। মিসর রাজকুমার গুলসনওয়ার ও গন্ধর্ব রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর প্রণয়কাহিনী নিয়ে এ কাব্য রচিত। কবি মুহম্মদ আকবরও এ কাহিনী নিয়ে 'গুলসনওয়ার' নামে উপাখ্যান রচনা করেছেন। ইনি সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন।

গেয়াস খান—গএস, গয়াস, গেয়াস খান বা গএয়াস যে 'গিয়াস' এর বিকৃতি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মুকিম গুলেবকাউলির উপক্রমে তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে অন্যান্য কবির সঙ্গে গেয়াসেরও নাম করেছেন ঃ

গেয়াস খাঁ (গেআছক) মুজাম্মিল সুধার উপাম। (পুঁথি পরিচিতি পৃঃ ১০১)

অতএব, গেয়াস খানও সতেরো শতকে কিংবা আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।

গোলাম হোসেন—সম্ভবত শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। শ্রীহট্ট সাহিত্য সংসদের এক পুঁথিতে এঁর কিছু গান সংকলিত আছে বলে জানা গেছে। ইনি আঠারো শতকের শেষপাদে কিংবা উনিশ শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করি।

গরীব খান—পদের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি দেখে মনে হয় ইনি বাউল কবি। অতএব উনিশ শতকের কবি হওয়াই সম্ভব।

চম্পাগাজী—পদাবলী ও রাগতালনামা রচয়িতা চম্পাগাজীর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের সতরপটুয়া গাঁয়ে। এখানে তাঁর বংশধরেরা আছেন এবং এ পরিবার আজো 'চম্পাগাজীর বাড়ি' নামে পরিচিত। চম্পাগাজী পণ্ডিত ও হাড়িদের সংগীত শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রাগনামার এক ভণিতা থেকে তাঁর পিতার নাম জানা যায় ঃ

'আব্দুল কাদির সুত চম্পাগাজী নাম' (পুঁথি পরিচিতি পৃঃ ৪৫২)

ইনিই সম্ভবত কাজী বদিউদ্দিনের বাঙলা শিক্ষক ছিলেন। কেননা সতরপটুয়া ও খিতাবচর পাশাপাশি গ্রাম, তখন হয়তো এক নামেই উভয় গ্রাম পরিচিত ছিল। এবং কবি চম্পাগাজী ও কাজী বদিউদ্দিন যে সমসাময়িক ছিলেন তা তাঁদের উত্তর পুরুষ পরম্পরার হিসাবেও প্রমাণিত হয়। একটি ভণিতা ঃ

এক গৃহের দশ দুয়ার ধরিয়াছে মুখে
শ্রীমুখের ধ্যান কহিলাম সুখে।
শাহ সুলতান পদে মানি চম্পাগাজী কহে
লাহুতের ঢেউ পড়ে মাণিক্য পলায়।

চম্পাগাজী আঠারো শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

চাঁদ কাজী—এর 'বাঁশী বাজান জান না' পদটি খুব জনপ্রিয়। এঁর প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন যে চৈতন্যদেবের সময়ে ইনি নদীয়ায় কাজী ছিলেন। ইনি প্রথমে জনসাধারণের অভিযোগক্রমে চৈতন্যের নবধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন, পরে চৈতন্যের মত প্রচারে বিশেষ আনুকূল্য দেখান। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে নদীয়ার উক্ত কাজীর নাম ছিল গোঁরাই কাজী—চাঁদ কাজী নয়। কিন্তু এখন আবার কেউ কেউ বলছেন, চাঁদ কাজীই নদীয়ার শাসনকর্তা এবং হোসেন শাহর পীর ছিলেন।

চামারু—চামারু পণ্ডিত নানা পুথির লিপিকর ছিলেন। এর লিপিকৃত সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের একখানা পাণ্ডুলিপির নানা স্থানে চামারু নিজের নাম—ঠিকানা এবং ৩৩ক পৃষ্ঠায়

আদেষ্টার পরিচয় দিয়েছেন। ৭খ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে 'লিখিত শ্রীচামারু পণ্ডিত সাং-ছুলতানপুর'। লিপিকাল নেই : কিন্তু দেখে মনে হয় পুথিখানি দুই শ' বছরের পুরোনো। কাজেই চামারু (পণ্ডিত) যে আঠারো শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়। মুকিম-উল্লেখিত 'চামু'ই চামারু কিনা বলা যায় না।

জীবন—-পরিচয় অজ্ঞাত। ইনিও 'বানু হোসেন বাহরাম গোর' রচয়িতা মুহম্মদ জীবন অভিন্ন কিনা বলা যায় না। জীবন আলি পণ্ডিত নামে আর একজন পদকার [?] ছিলেন উনিশ শতকের শেষপাদে পটিয়াব খানমোহনার্গায়ে।

তাহির মাহমুদ—এঁর নামও মুকিম পূর্ববর্তী কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন–'ফাজিল নাসির, তাহির সকল।' অতএব, তাহির মাহমুদ সতেরো শতকে বা আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। তাহির মাহমুদও রাগতালনামা রচনা করেছেন।

তুফানুদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত।

দানিশ (কাজী)—ইনি রাগনামা ও পদাবলী রচয়িতা। গুলে বকাউলির কবি মুহম্মদ মুকিম এঁকে জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঃ

'শ্রীযুত দানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া।'

পদকার বক্‌সা আলী এঁর শিষ্য ছিলেন। অতএব, ইনি আঠারো শতকের শেষপাদের ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি এবং চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

দুলামিয়া—পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবত আঠারো শতকের কবি।

নওয়াজিস খান—এর বিস্তৃত পরিচয় প্রণয়োপাখ্যান পরিচ্ছেদে রয়েছে।

নব বালক—পরিচয় অজ্ঞাত।

নজর মুহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত।

নাসির মুহম্মদ—নাসির মুহম্মদ সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর পদ দুটোর একটি পদকল্পতরুতে এবং অপরটি রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'তে প্রথম সংকলিত হয়। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু আঠারো শতকের গোড়ার দিকে সংকলিত হয়। কাজেই নাসির মুহম্মদ ষোল কিংবা সতেরো শতকের লোক হবেন।

নাসির মুহম্মদ (ফাজিল)—নাসির মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির একই ব্যক্তি। কবির পুরো নাম ফাজিল নাসির মুহম্মদ। নামটি দীর্ঘ হওয়ায় ইনি কখনো ফাজিল নাসির আবার কখনো নাসির মুহম্মদ বলে ভণিতা করেছেন। ইনি চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামের জমিদার ওয়াহিদ মুহম্মদ চৌধুরীর আদেশে ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে রাগনামা রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'ধ্যাননামা' এবং রাগতালের বইয়ের মধ্যে তার ধ্যাননামা সর্বশ্রেষ্ঠ। কবির পীরের নাম জান মুহম্মদ ঃ

সর্বশাস্ত্রে অবধান রূপে নব পঞ্চবাণ
শ্রীযুত জান মোহম্মদ।
মান্যগুরু শিরোমণি জ্ঞানের সমুদ্র জানি
পুন পুনি প্রণামি সে পদ।

আদেষ্টা পরিচিতি ঃ

অধিক উত্তমস্থান সুলতানপুর
সেই রাজ্যের অধিপতি শ্রীমন্ত শ্রীমত
ওয়াহেদ মোহাম্মদ সর্বগুণযুত।
শ্রীল শ্রীযুত ওয়াহিদ মোহাম্মদ
মুখশশী শারদ নির্মদ
আয়ু দীর্ঘ রোগনাশ পুর নর হাভিলাষ
শত্রু তান হোক পদতল।

তাহান আদেশ পালি নিজ মনে অবকলি
ফাজিল নাসির মোহাম্মদ।
বেয়াল্লিশ রাগের বাণী রঙ্গের প্রসঙ্গ জানি
'ধ্যানমালা' বিরচিত পদ।

রচনাকাল ঃ

ষষ্ঠ ঋত রাগ আদি সমাপ্ত হইল যদি
এবে কহি শাকের নির্ণয়
মঘীকত অব্দ হএ শকাব্দ কতেক কহে
দিবা দণ্ড কহিমু নিশ্চয়।
মঘী সন পরিমাণি হাজার ন আশি জানি
শকাব্দ ষোল শ ন চল্লিশে।
পৌষ মাস বহি গেল সংক্রান্তি দিবস ভেল
বিংশদণ্ড শনিবার দিবসে।
অক্ত যোহর সমে লেখা ভেল অনুক্রমে
সমাপ্ত হইল রাগমালা
পূর্ব সরা ধনু শশী তিথি কৃষ্ণ চতুর্দশী
সপ্তবিংশ জমাদিল আউয়ালা।

অতএব, ১০৮৯ মঘী বা ১৬৪৯ শকে তথা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গ্রন্থ রচনা করেন। কাজেই ফাজিল নাসির মুহম্মদ আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন।

নাসিরউদ্দিন (সৈয়দ)—'সিরাজ সবিল' রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির এবং 'বিসমিল্লার বয়ান' রচয়িতা নাসিরুদ্দিন আর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে হয়। সৈয়দ নাসিরউদ্দিন ওহাবের শিষ্য হলে আঠারো শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

নাসির (এতিম)—আমরা নাসির মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির মুহম্মদকে এক ব্যক্তি এবং নাসিরুদ্দিনকে অপর কবি এবং নাসির মাহমুদকে ভিন্ন কবি বলে মনে করি আর এতিম নাসির চতুর্থ কবি। কাজেই আমাদের ধারণায় নাসির চার জন। এঁর পীর ছিলেন শাহ আফজল। এই শাহ আফজল সম্ভবত পদকার সৈয়দ আফজল।

পীর মুহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবত আঠারো শতকের কবি।

পোতন—পরিচয় অজ্ঞাত। পোতন ও পদকার ফতন আর ফতে খান অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

ফকির ওয়াব—'বেনজির বদর-ই-মুনির' ও 'সিরাজ সবিল' (পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩৭৬ ও ৫৯৬) রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির তাঁর সিরাজ সবিলে বলেছেন ঃ

আব্দুল ওহাব পীর জ্ঞানের সাগর
যুগপদে তাহান প্রণামি বহুতর।

ওহাব ফকির ও সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরের পীর আব্দুল ওহাব সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। সৈয়দ মুহম্মদ নাসির এবং পদকার সৈয়দ নাসিরউদ্দীনও হয়তো অভিন্ন ব্যক্তি। অবশ্য নাসিরউদ্দিনের পীরের নাম 'শাহ আবদুল্লাহ'। 'আবদুল ওহাব' লিপিকর প্রমাদে আব্দুল্লাহ হওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক সিরাজ সবিলের কবি সৈয়দ মুহম্মদ নাসির আলী রজার সিরাজ কুলুব গ্রন্থের নাম করেছেন ঃ

সিরাজ কুলুব নামে কিতাব আছএ
খন্নাসের বিবরণ লেখিয়ে আছএ।

এতে মনে হয় ইনি আলী রজার কনিষ্ঠ সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের কবি ছিলেন। (জন্ম ঃ ১৭৪৯ - মৃঃ ১৮৩৭ খ্রীঃ) অতএব ফকির ওহাব ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরউদ্দিন উনিশ

শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ব্রজসুন্দর সান্যাল ওহাব ফকিরকে চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার হাওলা (খরন্দীপ) বাসী বলে অনুমান করেছেন।

ফকির ভোলা শাহ -সিলেটের 'বালগঞ্জ' থানার এক গাঁয়ে এর জন্ম। ইনি বাউল কবি। এর 'খবর নিশান' নামে গীতগ্রন্থ আছে। ইনি সম্ভবত উনিশ শতকের কবি।

ফকির শাহ—পরিচয় অজ্ঞাত।

ফকির হাবিব—পরিচয় অজ্ঞাত।

ফতন—পরিচয় অজ্ঞাত। পদকার পোতন ও ফতে খান আর ফতন অভিন্ন ব্যক্তিও হতে পারেন।

ফতে খান—ইনি যে নবীবংশ রচয়িতা পীর মীর সৈয়দ সুলতান (শাহর) এর মুরিদ ছিলেন, তা এর ভণিতাতেই প্রকাশ। অতএব ইনি ষোল শতকে কিংবা সতেরো শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। পোতন, ফতন ও ফতে খান অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা যায় না।

ফয়জুল্লাহ (মীর, মীর্জা, শেখ)—'নাথসাহিত্য' পরিচ্ছেদে এঁর বিস্তৃত পরিচিতি রয়েছে।

বকসা আলী—বকসা আলী রাগতালের পুথিও রচনা করেছেন। একটি রাগমালায় তাঁর ভণিতার মধ্যে কিছু আত্মপরিচয় আছে ঃ

১. দানেশ কাজীর পদ শিরেত বন্দিয়া
কহে হীন বক্‌সা আলী পয়ার রচিয়া।

২. কহে হীন বকসা আলী চট্টগ্রামে স্থিতি
আরব আলী চৌধুরী বেটা সায়ের মুহম্মদের নাতি।

৩ কহে হীন বকসা আলী বেলমোড়িতে বাড়ী
পিতার নাম মোহাম্মদ আরব চৌধুরী।

এ থেকে জানা যায় কবির নিবাস বেলমোড়ি গাঁয়ে। পিতার নাম মোহাম্মদ আরব আলী চৌধুরী, পিতামহের নাম শায়ের মুহম্মদ চৌধুরী এবং কবির পীর হচ্ছেন দানিশ কাজী। মুকিম তাঁর গুলেবকাউলিতে দানিশ কাজীকে জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঃ 'শ্রীযুক্ত দানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া' দানিশ কাজী রাগমালা ও পদাবলী রচনা করেছেন।

অতএব, বকসা আলী উনিশ শতকের শেষার্ধের কবি। কবি মুহম্মদ হারি জগৎ ও জীব সৃষ্টি বিষয়ক সৃষ্টি পত্তন ও 'জৈগুনের বারমাসী' রচনা করেছিলেন। তাঁরও বকসা আলী নামে এক পুত্র ছিল। কিন্তু আলোচ্য বকসা আলী ভিন্ন ব্যক্তি।

বদিউদ্দিন (কাজী)-পদাবলী ছাড়াও ইনি কায়দানী কেতাব, ফাতেমার সুরতনামা ও সিফৎ-ই-ইমান নামে তিনখানা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। 'ধর্মসাহিত্য' পরিচ্ছেদে এর পরিচিতি রয়েছে।

বদিউজ্জামান—পরিচয় অজ্ঞাত।

বহরাম—পদকার বহরামের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। আলি রজার জ্ঞানসাগরের ১৪৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে তাঁর তিনটি পদ পাওয়া গেছে (পুথি পরিচিতি পৃঃ ১৬৭-৬৮)। এর সঙ্গে লায়লী-মজনু ও কারবালাকাহিনী রচয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খানের কোন সম্পর্ক নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বোলন—পরিচয় অজ্ঞাত।

মছনজাত—পরিচয় অজ্ঞাত।

মনোহর, মনওয়ার, মনুয়র, মনুঅর—একই ব্যক্তি। উচ্চারণ বিকৃতির ফলেই নাম বিভিন্ন রূপ পেয়েছে। মনোহরের আর কোন পরিচয় জান যায় না। এক শেখ মনোহর আঠারো শতকের শেষার্ধে শমশের গাজীনামা ও গীত রচনা করেছেন। তাঁর বাড়ী ছিল ফেনী অঞ্চলে। তিনিই আলোচ্য পদকার মনোহর কি-না বলবার উপায় নেই। পদকার মনোহর শাহ আইনুদ্দিনের শিষ্য ও পদকার আসাউদ্দিনের পীর ভাই ছিলেন।

মর্তুজা (সৈয়দ, গাজী, আলি)—পিতৃভূমি বেবিলী। পিতা সৈয়দ হাসানই সম্ভবত মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর এলাকাব বালিয়াঘাটাতে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই তাঁব জন্ম হয় বলে লোকশ্রুতি আছে। আনন্দময়ী নামে এক ভৈরবী সাধিকা তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন বলে তাঁদের উভয়কে নাকি 'মর্তুজানন্দ' বলা হত। মতুর্জাব পীরেব নাম সৈয়দ আব্দুল রাজ্জাক শাহ। মর্তুজা সাধক হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

জঙ্গীপুরের কাছে সুতীগাঁয়ে তাঁর দরগাহ আছে এখানে আজো উরস হয়। গৌড়ের ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামতুল্লাহ নাকি সৈয়দ মর্তুজার সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে নিয়ামতুল্লাহর মৃত্যু হয়। কাজেই সৈয়দ মর্তুজা সতেরো শতকের লোক ছিলেন বলে নিসংশয়ে অনুমান করা যায়। এদিকে সৈয়দ কাসিম শাহ ১১৫৫ হিজরীতে বা ১৭৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দে বালিয়াঘাটে এক মসজিদ তৈরি করেন। ইনি নাকি মর্তুজার পৌত্রী (কেউ কেউ বলেন কন্যা) আসিয়াকে বিয়ে করেন। এতেও সৈয়দ মর্তুজাকে সতেরো শতকে পাচ্ছি। মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরীর 'খজীনাতুল আফসিয়া' গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার পরিচিতি আছে। তাতে মর্তুজাকে গজল গায়ক দরবেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই সৈয়দ মর্তুজার নামের সঙ্গে 'আনন্দ' যুক্ত হয়েছে বলে কারুর কারুর ধারণা। তিনি বাঙলা পদ রচনায় যুগের রেওয়াজ মতো রাধাকৃষ্ণ রূপক গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর ফারসি গজলে তা নেই। আলোচ্য বালিয়াঘাটাবাসী মর্তুজা ও চট্টগ্রামের পুথিতে পাওয়া পদাবলীর রচয়িতা মর্তুজা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। চট্টগ্রামে পাওয়া পদের একটিতে মর্তুজা আলি, অপর একটিতে মর্তুজা গাজী ভণিতা পাওয়া গেছে। সৈয়দ মর্তুজা 'যোগ কলন্দর' রচনা করেননি, একখানি যোগ কলন্দরের শেষ পত্রে পাওয়া—

বাপে দিল জনমখানি মায় দিল ক্ষীর
সৈয়দ মর্তুজা কহে জনমের ফকির।

ভণিতাটি আসলে একটি পদের ভণিতা, যোগকলন্দরের নয়।[১]

(পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৩৭, ৪৬৪)

মানিক দাস—পরিচয় অজ্ঞাত। নাম দেখে মনে হয় তিনি হিন্দু, কিন্তু পদ দেখে মনে হয় মুসলমান। মুসলমানের আজও 'মানিক মিয়া' নাম রাখা হয়।

মীর্জা কাঙ্গালী—পদকার মীর্জা কাঙ্গালীর কোন পরিচয় জানা যায়নি। কুলবাচী সাদৃশ্যে ব্রজসুন্দর সান্যাল কাঙ্গালী ও ফয়জুল্লার অভিন্ন ব্যক্তিত্ব কল্পনার প্রবণতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এঁরা যে দুই ভিন্ন কবি সে সম্বন্ধে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহও নেই।

মোছন আলী বা মোহসেন আলী—আফজল আলীর নসিয়তনামার লিপিকরের নামও মোছন আলি। 'মোকাম মঞ্জিলের কথা' রচয়িতা মোহসেন আলীর গুরু ছিলেন শাহ মইনুদ্দীন—

শাহ মইনুদ্দীন গুরু জ্ঞানের লহরী।
কহে হীন মোহসেন আলী গুরু পদ স্মরি।

(পুথি পরিচিতি ৪৩৭-৮)

---

১. *সৈয়দ মর্তুজা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের আলোচনা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত রচনাগুলোতে ঃ*

ক. সুধা–১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (মাঘ) নিখিলনাথ রায়ের প্রবন্ধ।

খ. Journal of the Asiatic Society of Bengal—1924

গ. মুসলমান বৈষ্ণব কবি–১ম খণ্ড ব্রজসুন্দর সান্যাল।

ঘ পদকল্পতরু–৫ম খণ্ড সতীশচন্দ্র রায়।

ঙ. বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি–যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

চ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য–ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

ছ. খজীনাতুল আফসিয়া–মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরী।

নসিয়তনামায় লিপিকরের পুষ্পিকা এরূপ ঃ

এই পুস্তক লিখিলাম মোছন আলী হীন।

সাঙ্গ হৈল ২৪ চব্বিশ মঘিব ১ আশ্বিন দিনে। হরফ দেখে ১২২৪ মঘী বলেই অনুমান করতে হয়। এই মোহসেন আলিই যদি পদকার হন ; তাহলে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। আমাদের ধারণা লিপিকর, পদকার ও মোকাম মঞ্জিলের কথা রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি।

মুহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত।

মোমতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত। 'মোমতাজ' কবি 'মছনতাজ' নামের বিকৃতি কিনা বলবার উপায় নেই।

মুহম্মদ আলী—ইনি হায়রাতুল ফিকাহ এবং শাহপরী-মল্লিকাজাদা ও হাসনাবানু নামে দু'খানা উপাখ্যান রচনা করেন। 'হায়রাতুল ফিকাহ্' তে কবির আত্মপরিচয় আছে। প্রণয়োপাখ্যান ও ধর্মসাহিত্য অধ্যায়ে এঁর পরিচিতি রয়েছে।

মুহম্মদ আলি রজা (অধীন রজা, পদের ক্রমিক সংখ্যা ঃ ৯৫) এঁর পুরো নাম মুহম্মদ আলি রজা। নিবাস ছিল ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে। ইনি 'তমিম গোলাল চৈতন্য ছিলাল', ও 'মিশরীজামাল' নামে দু'খানি উপাখ্যান রচনা করেন। প্রণয়োপাখ্যান অধ্যায়ে এর পরিচিতি রয়েছে। ইনিও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি।

মোহাম্মদ পরাণ—এই পরাণ কায়দানী কেতাব, নূরনামা রচয়িতা ও শেখ মুত্তালিবের পিতা সীতাকুণ্ডবাসী শেখ পরাণ নন। মোহাম্মদ পরাণ রাগনামা রচয়িতা। এছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ঃ

ছান্দন করিয়া তারে দিয়া মৃত চর্ম।
মাটির দবর বানাই করিলেক মর্ম।
অনলে পুড়িয়া তারে করিল নির্মাণ
গুরু গুরু বলিয়া দরবে দিল সান।
ছান্দন করিল তারে দিয়া মৃত চর্ম
আনন্দে তুলিয়া লৈলুম বাহিতে যে মর্ম।
মোহাম্মদ পরাণে কহে মনেতে ভাবিয়া
হয় কি না হয় চাহ শাস্ত্র বিচারিয়া।

(পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৫০-১৬)

মুহম্মদ হাসেম বা হাসিম—চট্টগ্রামের পটিয়া থানার শ্রীমতি বা শ্রীমাই গ্রামে এঁর জন্ম। সাধারণ্যে ইনি হাসিম পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। হাসিম উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। এঁর পুত্র আলি মিয়াও কবি ছিলেন। অপরিণত বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। আমাদের পদকার আলি মিয়া ভিন্ন ব্যক্তি।

মুহম্মদ হানিফ—পরিচয় অজ্ঞাত।

রজব আলী—পরিচয় অজ্ঞাত।

রেয়াছক বা রেয়াস খাঁ—'রেয়াছক' সম্ভবত রেয়াস খাঁর বিকৃতি। যেমন 'গেয়াস খাঁ-র বিকৃতি 'গ আছক' মুকিমের গুলেবকাউলিতে দেখা যায়। (পুথি পরিচিতি ঃ পৃঃ ১০১)।

লাল বেগ—পরিচয় অজ্ঞাত।

শমসের—এক শমসের আলীকে 'গুল ও হরমুজ' ও অসমাপ্ত রেজওয়ান শাহ (পরে আসমান সমাপ্তি দান করেন) উপাখ্যান রচয়িতা বলে জানি। শমসের আলী সতেরো শতকের শেষ

পাদে কিংবা আঠারো শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। পদকার শমসের ও উপাখ্যান রচয়িতা শমসের আলী অভিন্ন কিনা বলবার উপায় নেই।

শেখ চান্দ— পদটি সের চান্দের ভণিতায় পাওয়া যায়। সের চান্দ সম্ভবত লিপিকর প্রমাদজাত বিকৃতি। শেখ চান্দ সাধক পীর শাহদৌলার সাগরেদ এবং নিজেও সাধক ছিলেন। চরিতসাহিত্য পরিচ্ছেদে এঁর পরিচিতি রয়েছে।

শেখ ভিকন—পরিচয় অজ্ঞাত। কারো কারো মতে ইনি মাগনঠাকুরের ভাই বা জ্ঞাতি।

শেখ লাল—পরিচয় অজ্ঞাত। পদকার 'লাল বেগ' বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি।

সর্ফতুল্লাহ—কবি আলী রজার পুত্র। নিবাসও ওশখাইন। পিতার কাছেই মুরিদ হন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকে প্রায় আশী বছর বয়সে মৃত্যু বলে প্রকাশ।

সাল বেগ বা সালেহ বেগ—ইনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। 'দার্চ্যভক্তি' গ্রন্থে এর পরিচিতি আছে। মুসলমান সেনাধ্যক্ষের ঔরসে ও হিন্দু বিধবার গর্ভে এর জন্ম। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে লোক-শ্রুতি আছে। মিথিলায় বিদ্যাপতি যেমন বাঙলারও কবি, উড়িষ্যার সালেহ বেগও তেমান বাঙলার বৈষ্ণব কবির অন্যতম বলে স্বীকৃত।

সিরতাজ বা সেরতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত।

সুন্দর ফকির—চট্টগ্রামের প্রখ্যাত পীর দরবেশের নাম করতে গিয়ে মুকিম গুলে বকাউলিতে সুন্দর ফকিরের নামোল্লেখ করেছেন ঃ

শাহ জাহিদ, শাহ পস্থি আর শাহপীর
হাদি বাদশা আর শাহ সুন্দর ফকির।

অতএব, সুন্দর ফকির ষোল-সতেরো শতকের লোক।

সেরবাজ—শেখ সেরবাজ চৌধুরী মল্লিকার হাজার সওয়াল বা ফক্করনামা, কাসেমের লড়াই ও ফাতেমার সুরতনামা রচয়িতা। পদকার সেরবাজ ও ইনি অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর পীর ছিলেন বদিউদ্দিন, ওস্তাদ ছিলেন হাসান শরীফ এবং ফক্করনামা রচনায় আদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ বায়েজিদ। সেরবাজ আঠারো শতকের কবি।

সৈয়দ সুলতান—ইনি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে একজন কবিগুরু। 'চরিত শাখায়' পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

হাসমত আলী—ইনি কমরুচ রাজা ফুগফুব শাহ তথা মলয়া-মাহমুদ নামের উপাখ্যান রচয়িতা। কাব্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ আছে। অতএব ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে এ উপাখ্যান রচিত হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ভোজপুর গ্রামে এক জমিদার পরিবারে কবির জন্ম হয়। ইনি আলেফ লায়লার অনুবাদ করেছিলেন বলেও শোনা যায়।

হজরত—পরিচয় অজ্ঞাত। এটি পদকারের নাম কিনা তাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

আবদুল ওহাব—(রাগমালা সতীময়না রচয়িতা)

'পিতা মম তমিজউদ্দিন প্রকাশ সারাং..........
নিবাস ওয়াহেদপুর থানা মীরেরসরাই

সম্ভবতঃ উনিশ শতকের শেষার্ধের লোক। তাঁর একটি পদ (রাগমালা সতী ময়না পৃঃ ৬০) ঃ

দারুন নিঠুর কালা সর্বলোকে বলে ভালা
মুখে মায়া আঁখি পালটিয়া
শাশুড়ীর বিড়ম্বনে ননদীর পূর্বছলে

সখিসবে করে কানাকানি
পাড়াপড়শী লোকে কুবচন বলে মোকে
হইল রাধের দু'কূল হানি।
যতেক গোকুল নারী করে আঁখি ঠারাঠারি
সবে বলে রাধে কলঙ্কিনী
আর ও না সহে প্রাণি।
গরল ভক্ষিমু নিশ্চয় মরিমু
অভাগিনী।
আবদুল ওহাবে কহে এমত উচিত নহে
বৈরী সবে কি করিতে পারে
যারে বন্ধু দয়া করে কিসের ভাবনা তারে
এক দৃষ্টে সদায় হেরে যারে।[১]

১ সংকলিত পদাবলীর ও পদকারদের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য আমার 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

চট্টগ্রামের হিন্দু কবির পদ-সাহিত্য

১.

'রাগনামা' ও 'তালনামা' গুলোতে অজ্ঞাত কিংবা স্বল্পজ্ঞাত হিন্দু পদকারের পদও পেয়েছিলাম। এসব পদের কোন কোনটি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। সে-সব পদের ঢাকায় বসে খোঁজ নেয়া যেমন দুষ্কর, সন্ধান পাওয়াও তেমনি দুঃসাধ্য। এজন্যে আমরা সব পদ একত্রে প্রকাশ করছি। এ পদগুলো তেত্রিশখানি 'রাগ-তালনামা' থেকে সংগৃহীত। সুপরিচিত পদকারদের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কয়েকটি করে পদ পুথিগুলোতে কৃচিৎ পাওয়া যায়।[১] আমাদের সংকলিত পদাবলীর কবিদের কোন পরিচয় জানারও উপায় আপাতত নেই। প্রচলিত পদাবলীর সংকলন গ্রন্থগুলোতেও তাঁদের কারুর পদ বিধৃত হয়নি। এজন্যেই মনে হয়, তারা সবাই বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ও একদা আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত চট্টগ্রামেরই অধিবাসী।

চট্টগ্রামের পদকারদের মধ্যে মহিলাকবি শ্রীবরের ঝি (দুহিতা) এবং হীরামণিও আছেন। পুরুষ কবিরা হচ্ছেন ঃ

দ্বিজ রঘুনাথ, গোবিন্দ বল্লভ, শ্যামদাস, জয়রাম দাস, নট ঘনশ্যাম, শিবরাম দাস, দ্বিজ জানকীনাথ, দ্বিজ কুমুদ, কানুদাস, দ্বিজ পার্বতী, দীন (দ্বিজ) ভবানন্দ, উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্য, নন্দলাল রায়, (পাগল) শঙ্কর, শিবচরণ দাস, কৃষ্ণদেব দাস, মর্কট বল্লভ, দ্বিজমাধব, মোহন দাস, হীরামণি, শ্রীবরের ঝি [হীরামণি ?], দ্বিজ রামগোপাল, নটহি দাস, রাধাবল্লভ, হরিদাস, বংশীবদন, দীনবন্ধু, নট ভুঁইয়া, মিত্র, চাঁদরায়, নবচন্দ্র দাস, বাসুদেব, নিত্যানন্দ ও দ্বিজ গদাধর। আর 'সারদামঙ্গল' (১৭৪৭ খ্রীঃ) রচয়িতা শাক্ত কবি মুক্তারাম সেনের দুটো, দ্বিজ রামগোপালের একটি এবং মাধবানন্দের একটি শাক্ত পদও মিলেছে।

পাঁচজন হিন্দু কবি 'রাগতাল' বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন—দ্বিজ রামতনু, দ্বিজ ভবানন্দ তনু, দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামগোপাল ও দ্বিজ পঞ্চানন। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাদের রচনাংশ রাগ-তালনামায় সংকলিত রয়েছে।

২.

তত্ত্ববিদের চোখে যা-ই হোক, সাধারণের অনুভবে কামে ও প্রেমে পার্থক্য সামান্য এবং বিজ্ঞানীর চোখে নিরেট জৈবিক বৃত্তি। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়স অবধি মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে কাম-প্রেমের লঘু-গুরু লীলা চালু থাকে। কাজেই কাম মানুষের প্রবলতম বৃত্তি। সে বৃত্তি অভিব্যক্তি পায় প্রেমরূপে এবং কখনো কখনো স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরূপে। সবার চেতনায় প্রেমের প্রভাব থাকলেও সবার জীবনে প্রেম প্রকাশ ও বিকাশ পায় না। অবদমিত ও অবচেতন বাঞ্ছা তখন পরোক্ষ উপায় খোঁজে উপভোগের। শৃঙ্গার তথা রতিরস তাই কর্ম ও কলার মুখ্য অবলম্বন হয়েছে। এ কারণেই আদি মানুষের সমাজে Art ও Ritual ছিল অভিন্ন। অন্ন ও আনন্দ-প্রয়াস, কর্ম ও ধর্মসাধনা এক ধারায় ছিল একাকার। রাগ-বিরাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতি পেয়েছে জীবন।

আদি কৃষিজীবী সমাজে মৈথুন ছিল ফসল উৎপাদনে প্রতীক ও সহায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত সমাজে আজো তা অবিলুপ্ত—এ দেশের ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে এ তত্ত্ব—বাজসনেয়ি-সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে, মহাভারতে ও ছান্দোগ্যে। এ-তত্ত্বের ক্রমবিকাশে পাই সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র এবং সহজিয়া, বাউল, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, লিঙ্গায়েত প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়। অতএব দেবতত্ত্বের ও মানবমনের বিকাশ ধারায় রূপের ও রতিবোধের দান গভীর ও ব্যাপক।

শিল্প-সাহিত্যের সব শাখাই রূপ ও রতিভিত্তিক। অন্য কথায় রূপ ও রতি একাধারে কারণ ও কার্য এবং বীজ ও ফসল। এ দৃষ্টিতে রূপ ও রতির অনুধ্যানেরই প্রসূন মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

---

১. *'পুথি পরিচিতি' আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্রষ্টব্য।*

চিত্র ও মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প, নাচ ও গান, কবিতা ও গাথা, ধর্ম ও দর্শন, রূপকথা ও উপন্যাস সবকিছুই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে রূপ-রতি ভিত্তি করেই। বলতে গেলে মানুষের জীবনধারায় থাকে কাম-প্রেমেরই বিচিত্র বিকাশ। এর প্রকাশ প্রতিবেশ-নির্ভর। সেজন্যে এর অভিব্যক্তি ও বিকাশ সরল ও একরঙা হয়নি। জীবনপ্রবাহ ঝর্ণাধারার মতোই উপল ও বাঁক মেনে চলে তাই জীবনে আসে বৈচিত্র্য, বিকৃতি ও বক্রতা।

জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্র, মূর্তি, সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীত—তাই প্রেম-প্রতীক। এমন কি, বহু ধর্ম আর দর্শনও প্রেমবাদী।

পৃথিবীব্যাপী আদি সমাজে মানুষের মনে ও মননে, কর্মে ও ধর্মে, শৃঙ্গারই প্রাধান্য পেয়েছে। শৃঙ্গারের নামও তাই আদিরস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিশেষ স্তরে জীবনের ক্ষেত্রে এ আদিরসের বিচিত্র ও বহুধা প্রভাব স্বীকার করে ধন্য হয়েছে মানুষ, ধন্য করেছে দেবতাদের। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণ তার সাক্ষ্য।

৩.

পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি। তবু সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দাম্পত্যপ্রেমকেই আদর্শ ও মহিমান্বিত করবার প্রয়াস চলল। এই নৈতিক চেতনার যুগেই আমাদের দেশে হর-গৌরী, ইন্দ্র-শচী, রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রমুখের দাম্পত্য প্রেমের মহিমা কীর্তনচ্ছলে নিজের প্রণয়াকূতি প্রকাশ করেছে মানুষ। কিন্তু এই কৃত্রিম প্রয়াসে মানুষের তৃষ্ণা মেটেনি, ভরে ওঠেনি তার বুক। তাই আবার পরকীয়া রসে সিক্ত হয়েই প্রস্ফুটিত হল তার চিত্ত-উৎপল। এই রসেই তার হৃৎ-কমলে সঞ্চিত হল মধু, সৃষ্টি হল আত্মার আনন্দলোক। এভাবে নর-নারীর পরকীয়া প্রেম হল মহিমান্বিত। মানুষের অবদমিত ও অবচেতন বাঞ্ছা-অপূর্ণতার আকূতি গানে, গাথায়, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, চিত্রে, নৃত্যে, প্রতিমায়, অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় আজো অভিব্যক্তি পাচ্ছে বিচিত্র ও বর্ণালি হয়ে।

ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, কৃষ্ণ-নাপ্পিনাই বা রাধাকৃষ্ণ এ প্রেম প্রকাশের আদর্শ এবং বিকাশের অবলম্বন হয়ে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের মনের আকূতি মিটিয়েছে। সমাজ-কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক চেতনা যতই প্রবল হয়েছে, ততই সূক্ষ্ম অনুভবের স্তরে উন্নীত হয়েছে স্থূল প্রয়োজন, বাস্তব চাহিদা পেয়েছে মানসোপভোগে চরিতার্থতা। তাই বাস্তব জীবনে যা পাপ (Sin), যা নৈতিক দোষ (Vice) ও সামাজিক অপরাধ (Crime) এবং সেহেতু ঘৃণ্য ও পরিহার্য,— ভাবলোকে তা-ই আত্মার উল্লাস জাগায়। এ কেবল জীবনে আনন্দানুভবের উৎস হয়ে থাকেনি, পারত্রিক সুখ-স্বপ্নেরও আধার হয়েছে।

দেহে রূপ, রূপে কাম, কামে প্রেম আর প্রেমেই আত্মার মুক্তি। সূফী-বৈষ্ণবের এ ধারণা একদিনে গড়ে ওঠেনি। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকে বিস্তর, বাধা থাকে দুর্লঙ্ঘ্য। বাঞ্ছিত বস্তু মাত্রেই দুর্লভ ও দুঃসাধ্য। অথবা দুর্লভ না হলে কিছু বাঞ্ছনীয় হয় না। কাজেই তার জন্যে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি ও প্রয়াস প্রয়োজন। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই এ সাধনার সম্বল, হৃদয়ে দাহ ও চোখে অশ্রু প্রেমিকের নিয়তি. আর মিলনাকাঙ্ক্ষা তথা বিরহবোধই তার প্রেরণা ও সামর্থ্যের উৎস। এ জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিরহী আত্মার কান্নায় করুণ।

৪.

এই রূপ ও রতি, কাম ও প্রেমবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এগুলোতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ছিল না। এ দৈহিক প্রেম ঐহিক জীবনে আনন্দিত স্বপ্ন জাগানোতেই ছিল সীমিত। চৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে এ সঙ্গীত পারত্রিক ত্রাণের অবলম্বন হল। তখন অপ্রাকৃত হৃৎবৃন্দাবনের জীবাত্মা-রূপিণী রাধার ও পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুধ্যান ও আস্বাদনই এর অপার্থিব মহৎ ও পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এভাবে প্রেমকে তত্ত্বের অনুগত করে রাধা-কৃষ্ণের অবৈধ প্রেমকে করা হল মহিমান্বিত ও অনন্য। চৈতন্য-পূর্ব যুগে গোটা ভারতব্যাপী যা ছিল শৃঙ্গার রস উপভোগের বাহন, চৈতন্যোত্তরকালে তা-ই হল অধ্যাত্ম রসের আকর।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদসের পদাবলী ছিল শারীর প্রেমের আকৃতিমুখর ; বৈষ্ণবভক্তের চোখে পদকারেরা হলেন মহাজন ও গোস্বামী : আর পদাবলী হল সাধনশাস্ত্র ও ভজনগীতি। তারপরে চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় সব সঙ্গীতই অধ্যাত্ম রসাশ্রিত।

যদিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীরা রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতা কিংবা হরগৌরী বিষয়ক পদ অভিন্ন লক্ষ্যে রচনা ও আস্বাদন করেছেন, তবু তত্ত্বগত পার্থক্য যে ছিল না, তা নয়, কেবল দ্বৈতাদ্বৈতবাদে নয়, ভক্তি আর প্রেমতত্ত্বেও ছিল তফাৎ। দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, দীন চণ্ডীদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, আবদুর রহিম খানখানান, দাদু, এয়ারী, দরিযা, রজব, তাজ বেগম, আহমদ, রসখান কিংবা চাঁদ কাজী, সৈয়দ সুলতান, আলাওল, সৈয়দ মুর্তাজা, আলি রজা, মীর ফয়জুল্লাহ্ প্রমুখের পদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তাই অভিন্ন নয়।

৫.

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। চৈতন্যদেব বাঙালী এবং ষোল শতকের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক গণ-নেতা। হয়তো বাঙলাদেশে থাকেন নি বলেই বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রেমবাদ, তাঁর সাম্যের, প্রীতির ও করুণার বাণী, তাঁর উদার মানবতাবোধ বাঙালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গৌতমবুদ্ধের ও ইসলামের বাণীর ঐতিহ্য তাঁর মাধ্যমে নতুন করে পেয়ে বাঙালীর চিত্ত সঞ্জীবিত হল। এ জন্যে ষোল শতক বাঙালীর চিত্ত-প্রকর্ষের কাল — রেনেসাঁসের যুগ। আশ্চর্য, তবু ষোল-সতেরো শতকে পদাবলী রচয়িতা বাঙলাদেশের সর্বত্র মেলে না। এই সময়কার প্রায় সব বৈষ্ণব কবিই পশ্চিমবঙ্গের তথা প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের।

কিন্তু এক রকম আকস্মিকভাবে আমরা ষোল শতকের শেষপাদে আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে এবং সতেরো শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলিম বহু পদকার পাচ্ছি। এই স্থানিক জনপ্রিয়তার ঋজু কারণ দুর্লক্ষ্য। একি চৈতন্য-পার্ষদ চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তের প্রভাবের ফল!

আমরা দেখছি, রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে বাঙলাদেশের তথা উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগ রক্ষা করে চলেছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের রচনা বলতে প্রায় সবটাই তো চট্টগ্রামেরই দান, এমনকি, বাঙলাদেশের যে-কোন অঞ্চলের হিন্দুর চাইতে চট্টগ্রামের হিন্দুর দানও কম নয়। হয়তো আন্তর্জাতিক বন্দর এলাকার লোক বলেই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগের আহ্বানে তারা সহজেই সাড়া দিতে পেরেছিল।

মধ্যযুগের চট্টগ্রামী হিন্দু কবিদের মধ্যে ষোল শতকে পাচ্ছি চট্টগ্রামে প্রবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ও শ্রীকরনন্দীকে। এঁরাই বাঙলায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক। সতেরো শতকে পাচ্ছি মৃগলুব্ধ প্রভৃতি রচয়িতা দ্বিজ রতিদেবকে ও লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়ের কবি দ্বিজ ভবানীনাথকে। আর আঠারো শতকে পাই 'সারদামঙ্গল' প্রণেতা মুক্তারাম সেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মাহাত্ম্য লেখক ব্রজলাল সেন (ইনি মুক্তারামের ভাই), কালিকামঙ্গল রচক নিধিরাম আচার্য ও গোবিন্দদাস, মনসার ভাসান প্রণেতা রামজীবন বিদ্যাভূষণ, মৃগলুব্ধসম্বাদ রচক রামরাজা, গোকুলমঙ্গল লেখক ভক্তরামদাস, সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচক ফকির চাঁদ প্রমুখ ছাড়াও শঙ্করদাস, শঙ্কর ভট্ট, বলরাম দেব, রামতনু আচার্য, সদানন্দ ভট্ট প্রমুখকে।

সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে আঠারো শতক থেকে বাঙালী হিন্দুরাও প্রণয়োপাখ্যান রচনা শুরু করেন। এবং 'চন্দ্রাবলী' রচয়িতা দ্বিজ পশুপতি ব্যতীত সবাই চট্টগ্রামবাসী। কাজেই এক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব এঁদেরই। আজ অবধি আমরা আঠারো শতকের রামজীবন দাসের 'শশিচন্দ্রের উপাখ্যান', সুশীল মিশ্রের 'রূপবতী রূপবান উপাখ্যান', বাণীরাম-এর 'শীত বসন্ত,' গোপীনাথ দাসের 'মনোহর মধুমালতী' এবং উনিশ শতকের কবি মহেশচন্দ্র দাস চৌধুরীর 'সয়ফুলমুল্লুক জরুখভান' পেয়েছি। [প্রণয়োপাখ্যান অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

৬.

আমাদের সংকলিত পদগুলোর বহিঃরূপ বৈষ্ণব পদাবলীর মতো হলেও অনেক পদেই বৈষ্ণবীয় ভাব-সত্যের অভাব লক্ষণীয়। এমন কি, ভণিতাগুলোও অনেক ক্ষেত্রে মহাজন-পদাবলীসুলভ নয়, বরং মুসলিম-রচিত পদের মতোই। এ-ও হয়তো আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার ফল। মধ্যযুগে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সর্বাঞ্চলিক বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যে চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের উদ্ভব ও বিকাশ কেবল রাঢ় অঞ্চলেই নিবদ্ধ দেখি। আবার পূর্ববঙ্গেই যেন মনসাকাহিনীর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশও সীমিত দেখি পশ্চিমবঙ্গে এবং আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে (সিলেট ব্যতীত) বাউল সম্প্রদায় চিরকালই অনুপস্থিত। এমন কি, বহুকাল ধরে মুসলমানদের বাঙলা সাহিত্য চর্চাও বিশেষ করে নিবদ্ধ ছিল চট্টগ্রামে ও রোসাঙ্গে। তেমনি দোভাষী রীতির ও দোভাষী সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ এবং কবিওয়ালাদের আবির্ভাব সীমিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের এখনকার প্রেসিডেন্সী বিভাগে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ চর্চা হয়েছিল লৌকিক উপদেবতা ও পীরকাহিনীর এবং গাথা-গীতিকা রচিত হয়েছে বিশেষ করে ময়মনসিংহে ও চট্টগ্রামে।

অতএব, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি সর্ববঙ্গীয় চারিত্রের ও রূপের অনুধ্যানে যতই আমরা আনন্দিত হতে চাই এবং অখণ্ডতা ঐক্যবোধের আগ্রহে যতই কোন সামগ্রিক রূপ-কল্পনাকে প্রশ্রয় দিই, ভৌগোলিক দূরত্ব যে বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙলাভাষীদের পারস্পরিক মানসযোগ রক্ষার অন্তরায় ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না।

৭.

সংকলিত সব পদে কবিত্ব কিংবা লাবণ্য নেই। আঙ্গিক সৌন্দর্যও অনেক পদে অনুপস্থিত। তবু মধ্যে মধ্যে জীবন্ত চিত্র, অনুভূতির মাধুর্য ও আবেগের শিহরণ দুর্লভ নয়।

রাঘব রায়ের পদে রাখাল কৃষ্ণের বিচলিত অবস্থা বর্ণনাগুণে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

'রহ রহ ধবলী শ্যামল'—পাছে পাছে ধাএ
নীলগিরি পাছে করি চাঁদ চলি যাএ।
খসিল মোহন চূড়া উরে মন্দ বাএ
বান্ধিতে বান্ধিতে চূড়া ধবলী চলি যাএ।
ঘর্মেতে তিতিল তনু বিন্দু বিন্দু ঝরে
মরকত মণি জিনি মুকতা উদগরে।...
অবিরত ঝঙ্কর নূপুর রাঙ্গা পাএ
তছু পাএ পদ ধূলি রাঘব রাএ।

আবার উদ্ভট পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়াসও আছে। শ্যামদাসের পদে আছে ঃ

কুন্তীর নন্দন মূলে   কশ্যপ- নন্দন দোলে
তা দেখিয়া মন মূরছাএ।
গাঙেন্দ্র নিকটে রসীন্দ্রে পূরএ বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মন মোহে
ভব-অনুজ রথ   তাহার বিনতাসুত
উপরে কুমুদ-বন্ধু দোলে।

অর্থাৎ অর্জুন বৃক্ষ মূলে ময়ূর নাচে (ময়ূর পুচ্ছধারী কৃষ্ণ দোলে), তা দেখে মন মুগ্ধ হয়। যমুনার নিকটে রসিক শ্রেষ্ঠ (কৃষ্ণ) বাঁশি বাজিয়ে শ্রেষ্ঠ যোগী ও শ্রেষ্ঠ মুনির মন মুগ্ধ করে। হর-পুত্র কার্তিকের বাহন ময়ূরের উপরে চাঁদ দুলছে। এ সূত্রে বিদ্যাপতির প্রহেলিকা স্মর্তব্য।

আর একটি পদাংশ ঃ

মুবরীর আলাপনে পবন বহিয়া শুনে
যমুনা কি ধরিল উজান
না চলে রবির রথ ভাবিযা না দেখি পথ
ধারা বহে দারুণ পাষাণ।...
কান্দিতে না পারি রাএ শোকে বুক ফাটি যাএ
এ না দুঃখ কৈমু কাব ঠাই।

গোবিন্দবল্লভের এ পদ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভবানন্দ দীনের মুখে রূপমুগ্ধা রাধার আকৃতি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে ঃ

যে-বোল সে-বোল মোক যাব মনে যেই দেখ
ননদিনী বলৌক অসতী
গুরু গরবিত জন যে বোলে ননদীগণ
ছাড়ে বা ছাড়ৌক নিজপতি।

মর্কটবল্লভের রাধা বলে ঃ

খাইতে নারি শুইতে নারি রইতে নারি ঘরে
নিরবধি ডাকে বাঁশি—আয় কদমতলে।

আবার দ্বিজ রঘুনাথের রাধার মুখেও একই কথা শুনি ঃ

খাইতে না দে, শুইতে না দে, রহিতে না দে ঘরে
নাম ধরি ডাকে বন্ধের বাঁশি আয় আয় কদমতলে রে।
যাইমু রাতে যা'ক বাঁশি তার লাগ পাম
কাটারে কাটিয়া বন্ধের বাঁশি সাগরে ভাসাম রে।

[তুল ঃ মজনুর চন্দ্রনিন্দা ঃ লায়লী-মজনু—দৌলত উজির]

দ্বিজমাধবের রাধার আকৃতি বড় করুণ। সে কৃষ্ণকে মিনতি জানাচ্ছে ঃ

বদলে থুইয়া যাও বাঁশি
তবে সে আসিবা হেন বাসি।
ও বাঁশি যতনে থুইম গন্ধ চন্দন দিমু
হীরামণি মাণিক্য জড়িয়া
যখনে তোমার তরে ও বুক বেদনা করে
নিবারিমু দুখ-বাঁশি বুকে দিয়া।

মহিলা কবি হীরামণি নারীমনের প্রবণতা দিয়ে রাধার মনের কথাই বলেছেন ঃ

আগের দ্বারে প্রাণের বন্ধু
গাছের দ্বারে রান্ধি
ভিজা খড়ি গাছি আনল ভেজাইয়াছি
ধুয়ার ছলনায় বসি কান্দি।

বিচ্ছেদকাতর উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠ মানুষের প্রিয়মিলনাকূতি দাহ-দারুণ ও কান্নাকরুণ ভাষায় ও সুরে ধ্বনিত হয়েছে পদাবলীতে।[১]

১. *বিস্তৃত বিবরণ ও সংকলিত পদাবলী চট্টগ্রামের হিন্দুকবির পদসাহিত্য— বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঃ মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৮ সন দ্রষ্টব্য।*

২১. বৈষ্ণব সাহিত্যে ষোল শতকের বাঙলা ও বাঙালী

তেরো শতকের প্রভাতে বাঙলার একাংশে তুর্কী বিজয় ঘটে। শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ভাষা, বসন-ভূষণ, দেহাকৃতি প্রভৃতি কোনটাই ইতিপূর্বে এ দেশের কারো পরিচিত ছিল না। কাজেই এদের নিস্তরঙ্গ নিরুদ্যম জীবন-চেতনায় ও জীবন-যাত্রায় একটা ঝড়ো হাওয়ার অভিঘাত আকস্মিকভাবে চিন্তা-চেতনার ও সনাতন জীবন-পদ্ধতির ভিত নেড়ে দিল। নির্জিত নির্যাতিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা তুর্কীবিজয়কে মুক্তির আশ্বাসরূপে বরণ করল [নিরঞ্জনের রুষ্মা বা কলিমা জালাল], হিন্দুরা একে 'দেবতার মার' বলে মানল [উমাপতি ধরের শ্লোক, শেখ শুভোদয়া)। সাধারণত যেমনটি এমনি অবস্থায় হয়, তাই হল—অনেকেই ব্যক্তিস্বার্থে তুর্কীদের সঙ্গে জুটে গেল আখের গুছানোর লোভে, অন্যেরা অনুগত হল জীবন-জীবিকার তাগিদে। কিছু সংখ্যক স্বশাস্ত্র ও স্বসমাজ-প্রেমিক এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষোভে, উদ্বেগে ও গ্লানিতে ব্যাকুল হয়ে উঠল। একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য, প্রাণ–মনের স্বাস্থ্য এবং কর্মোদ্যম নিয়ে যে শাসকগোষ্ঠী এল, তাদের দেখে জন্মসূত্রে বর্ণে ও কর্মে বিন্যস্ত নিম্ন বর্ণের, বৃত্তির ও বিত্তের লোকের মনে জাগল বঞ্চিত ও প্রতারিত হওয়ার ক্ষোভ। মানবিক মর্যাদা লাভের ও স্বাধীনভাবে জীবন বিকাশের আকাঙ্ক্ষা এবং বুদ্ধি, প্রত্যয় ও উদ্যম বলে আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের অশেষ সম্ভাবনা চঞ্চল করে তুলল তাদের। ফলে শাস্ত্র ও সমাজ দ্রোহিতায় ঘটল এসবের প্রথম প্রকাশ। বলা বাহুল্য যেকোন চিন্তা-চেতনা-দ্রোহ-আন্দোলন সমাজক্ষেত্রে প্রকটিত ও ফলপ্রসূ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। বাঙলায়ও তা-ই হয়েছিল। তেরো শতকে উপ্ত ও অঙ্কুরিত এবং চৌদ্দ শতকের বর্ধিত ও পল্লবিত হয়ে পনেরো-ষোল শতকে তা' ফলপ্রসূ হল। লৌকিক দেবতার জনপ্রিয়তায়, লোকায়ত লোকধর্মের প্রসারে ও গীতা-স্মৃতি-সংহিতার প্রভাব-সংকোচনে এ বিপ্লবের প্রকাশ ও ক্রমস্ফীতি লক্ষণীয়।

নব চিন্তা-চেতনার উন্মেষকালে সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়—রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীতে। নবচেতনা যেমন প্রাণধর্মী মানুষে বাসন্তী-লাবণ্য দান করে, তেমনি রক্ষণশীলকে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করায়–সবাই অস্থির থাকে। তখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘর্ষ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন বাধাব আর প্রতিরোধের সংগ্রাম তীব্র হয়ে দেখা দেয়, বাঙলাদেশেও তাই-হয়েছিল। রক্ষণশীলেরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। ইসলামের আকর্ষণে যখন নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা ইসলামে আশ্রিত হচ্ছিল, তখন উদ্বিগ্ন শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা ভাঙনবোধে মরীয়া হয়ে ওঠেন। তার প্রমাণ—রাজা দত্তখাস বা দত্তখানের জাতিমালা কাচারী ও বাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদেব সাতান্নতম সমীকরণ ব্যবস্থা, উত্তরবঙ্গে উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পাটি, ও কাপ বন্ধন মাধ্যমে 'পরিবর্ত মর্যাদা' নিরূপণ, রাঢ়ে দেবীবর ঘটক কর্তৃক 'ছত্রিশ মেল' বিন্যাস, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী নামের কুলজী রচনা, স্মার্ত বঘুনন্দনের স্মৃতিব নবভাষ্য ও পাঁতি, রঘুনাথ শিরোমণির নবন্যায়, নুলু পঞ্চাননের 'গোষ্ঠীকথা'য় নবমেলবন্ধন, লৌকিক দেবতার পৌবাণিক স্বীকৃতি প্রভৃতি,—এসব করেও ইসলামের প্রসার প্রতিরোধেব ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয়নি—'প্রধান কারণ তার যবন অধিকার'। যবন অধিকারে 'কলিকালেব লোক সব বড় দুবাচাব'ই হচ্ছিল (প্রেম-বিলাস)। এ সময়ে এবং সতেরো শতকে উড়িষ্যায় দারুব্রহ্ম জগন্নাথ ও চৈতন্যদেব প্রতীকে বৌদ্ধমতের পুনঃস্মরণ চলছিল। সতেরো শতকে বাঙলায় কবি রামানন্দ ঘোষ নিজেকে বুদ্ধাবতার বলে দাবী কবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে। তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের পুনরুত্থানবাদী—'যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব/একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে (জগন্নাথে) দিব।'

সফল হল চৈতন্যদেবের প্রয়াস। এতে হিন্দুর শাস্ত্র অস্বীকৃত হল বটে, কিন্তু সুদূরপ্রসারী অর্থে হিন্দুর সমাজ ও জাতি টিকে রইল। বোঝা গেল, নতুনের প্রভাব প্রতিরোধ করে নয়, স্বীকার করেই টিকে থাকা সম্ভব। চৈতন্যদেবের মতবাদে ইসলামের সামাজিক, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, একক দেবতার আরাধনা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা দান, সতীদাহ উচ্ছেদ, সূফীর ইশ্‌ক (স্রষ্টাপ্রেম), যিকর (নামে

রুচি), দাবা ও সমা (নৃত্য ও নামকীর্তন), নামে রুচি, জীবে দয়া, নিরামিষ ভোজন, দশা (হাল), এবং রাধা-কৃষ্ণ লীলায় আশিক-মাসুক, সাকী, সমআ ও পরওয়ানা, প্রেম-শরাব, হিযবান, বিশাল, বিরহ-মিলন, কিরামত (ঐশ্বর্য) প্রভৃতির প্রভাব, অনুসৃতি ও আকস্মিক আদল মেলে। চৈতন্য চেতনায় জৈন-বৌদ্ধ প্রভাবও রয়েছে। দেব-দ্বিজ-বেদ বর্জন করে তিনি লৌকিক রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের রূপকে হৃদয়-রূপ বৃন্দাবনে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার অনুধ্যান ও আস্বাদন করলেন। জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রচিত প্রণয়গীতি তাঁকে নাচাত, কাঁদাত ও হাসাত। এসব গান নেচে নেচে গেয়ে আর শুনেই তিনি রাধাকৃষ্ণসিদ্ধি লাভ করলেন। চৈতন্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান 'নরে-নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম দর্শন।' বর্ণে ও কর্মে বিন্যস্ত অবিচল সমাজে মানুষের মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধ শতগুণে বৃদ্ধি পেল। সৌজন্যে, বিনয়ে, প্রীতির পরিচর্যায়, সহিষ্ণুতায় সেদিন দ্বন্দ্ব-কোন্দল জর্জরিত বাঙালীকে সহাবস্থান মন্ত্রে নবতর দীক্ষাদানে আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি। বাঙালী সেদিন প্রীতির আবেগে ও প্রণয়রসের আস্বাদন-সুখে ঈর্ষা-অসূয়া-অসহিষ্ণুতা অনেকাংশে পরিহার করতে সমর্থ হয়েছিল। চৈতন্যোত্তর বাঙলাসাহিত্য তারই প্রমাণ।

চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের চরিতগ্রন্থগুলো থেকে নানা প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে ষোল শতকের বাঙালীর জীবন ও জীবিকার এবং সমাজ, ধর্ম ও জীবনযাত্রার একটা স্থূল চিত্র পাই। পূর্বপরিচ্ছেদে উদ্ধৃতাংশগুলো স্মর্তব্য।

১. হিন্দুর ধর্মজীবন ঃ বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায়, পনেরো ষোল শতকের পশ্চিম বাঙলায় তথা গোটা বাঙলায় গীতা-স্মৃতি-সংহিতা নির্দেশিত ধর্মাচারের চেয়ে লোকায়ত ধর্ম ও আচার প্রবল ছিল। জনসমাজে লৌকিক দেবতা চণ্ডী, মনসা, যক্ষ, বাসুলী প্রভৃতির পূজার বহুল প্রচার ছিল। দস্যুরাও চণ্ডী পূজা করত। বৌদ্ধ যুগের যক্ষ, তারা, বাসুলী ছাড়াও যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীতির—তার সঙ্গে হয়তো নাথ-গীতিকারও পার্বণিক আনুষ্ঠানিক চর্চা ছিল। চালু ছিল হর-গৌরী লীলাগীতিও। ভিক্ষাজীবীরা শিবগান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করত। যদিও পশ্চিমবঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির প্রভাবে ভক্তিমার্গে সাধনা চালু হচ্ছিল, তবু তা জনপ্রিয় ছিল না (এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়।) বাউলবৈরাগীরও প্রাদুর্ভাব ছিল। 'বাউল' শব্দের বহুল প্রয়োগই তার প্রমাণ। আনন্দ, পুরী, তীর্থ, গিরি, সরস্বতী, ভারতী, যতি অবধূত প্রভৃতি শ্রেণীর সন্ন্যাসী ও গুরুবাদী সাধক সম্প্রদায় ছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব মাধবপন্থী সাধক ছিলেন। পরকীয়া সাধক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসহজিয়া নেড়ানেড়ীরাও (বাউল নামে ?) ছিল। রাম বা শিব বা হরি সংকীর্তন তখনো উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে চালু ছিল। শৈব-শাক্ত বৈষ্ণবদের মতো রামউপাসকও ছিল, তাই রামমন্দিরও ছিল। পনেরো-ষোল শতকেই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠেছিল পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দলও হ্রাস পেয়েছিল। সংখ্যাগুরুর লোকায়ত লোকধর্মের কাছে সংখ্যালঘু সনাতন ব্রাহ্মণপন্থীরা হার মানে। উভয় মতের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের জন্যে পুরাণগুলো স্ফীতকায় হতে থাকে। গীতা-স্মৃতি-সংহিতা পন্থীরাও মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুলী, শিব-শিবানী, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা-পাঁচালী স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং তবু লোকধর্মের প্রাবল্যের কালেও রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত, গীতা-স্মৃতি-সংহিতা-তন্ত্র প্রভৃতি অনুবাদের মাধ্যমে প্রচার করে উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরা সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মও চালু রাখার চেষ্টা করেন। পরিণামে পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে আপোস হয় এবং ফলে লৌকিক-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র স্থিতি পায়।

চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মতবাদে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। তাঁদের তিরোভাবের পরে শিষ্যদের মধ্যে তা প্রকট হয়। অদ্বৈত সন্তানেরা (অচ্যুতানন্দ ব্যতীত) অদ্বৈতকে কৃষ্ণাবতার বলে প্রচার করেন, অদ্বৈত নিত্যানন্দেও অপ্রকট দ্বন্দ্ব ছিল। এবং গৌরনাগরবাদ, গৌরপারম্যবাদও বৈষ্ণবদের মত-পার্থক্য তীব্র করে। ফলে শান্তিপুরী, শ্রীখণ্ডী, খড়দেহী ও বৃন্দাবনী মতবাদ বৈষ্ণবের সমাজ ও সম্প্রদায় সংহতি নষ্ট করে। এমন কি ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে অখ্যাত ব্যক্তিও অবতারত্ব দাবি করে। 'রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে (চৈঃ ভাঃ), 'রাঢ়ে এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে। সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল" (চৈঃ ভাঃ)।

২. **নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন ঃ** বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে বাঙলায় আবার বৃত্তিতে ও বর্ণে বিন্যস্ত সমাজ গড়ে ওঠে। বহু বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সাক্ষর ও শিক্ষিত ছিল। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-রাম উপাসকদের আচারে ও আচরণে শৈথিল্য ছিল। সমাজে সমাজপতিদের দাপট ছিল, নৈতিক-শাস্ত্রিক অপরাধে সমাজে পতিত হতে হত। দেশে দস্যু-তস্করের ভয় ছিল। ধনী মানীরাও দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করত যেমন রামচন্দ্র খান, বীর হাম্বির প্রভৃতি। পথ-ঘাট নিরাপদ ছিল না। রাজপুরুষেরা ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ করত, সনাতন ঘুষ দিয়েই কারামুক্ত হন। সামন্ত আর প্রশাসকরাও বিদ্রোহী হত। রূপ-সনাতনের জনপদ-শাসক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন শাহর আমলে বাকলায় বিদ্রোহ করে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। যশোরের জমিদার রামচন্দ্র খান ও বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির, বাকলার জমিদার (সনাতনের ভাই)-ও দস্যু ছিলেন। ব্রাহ্মণসন্তানেরাও রাহাজানিতে, গৃহদাহে ও খুন-জখমে আসক্ত ছিল। লোকেরা নাচে-গানে, জুয়ায়, লাম্পট্যে এবং গাঁজা-চরসে, তাম্বাকুতে ও মদে আসক্ত ছিল, নিমাই শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তন শুরু করলে প্রতিবেশীরা তাঁদের পঞ্চ-মকারের সাধক বলে সন্দেহ করেছিল। দারুটোনা-তুক-তাক যাদুতে ও ডাকিনী-যোগিণীতে লোকের আস্থা ছিল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণসমাজে বিদ্যার বহুল চর্চা ছিল, বিদ্বান ব্রাহ্মণরা সব টোল খুলে জীবিকা অর্জন করতেন। ন্যায়-স্মৃতি-ব্যাকরণ-অলঙ্কার-বেদ-বেদান্ত-সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হতেন পণ্ডিতেরা। পণ্ডিত সভায় বিতর্কের মাধ্যমে বিদ্যার পরীক্ষা ও স্বীকৃতি হত। রঘুনাথ, রঘুনন্দন, রামনাথ, মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির নেতৃত্বে ইসলামের অভিঘাতে বিচলিত হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন পনেরো ষোল শতকে ব্যাপক ও প্রবল হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবসমাজে কায়স্থ-বৈদ্য ও কিছু শূদ্র ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করেন এবং নারীরা পায় স্বাধীনতা ও শ্রদ্ধা। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, নিত্যানন্দ, জাহ্নবা ও বীরভদ্রের জীবনযাত্রায় মুঘলাই বিলাসের প্রভাব ছিল। সমাজে পাপাচার বৃদ্ধির ফলে মানুষ আর্থিক প্রাকৃতিক দুর্ভোগের শিকার হয় বলে কুসংস্কার ছিল—এ ব্রাহ্মণ (নিমাই) করিবেক গ্রামের উৎসাদ। এ পাপে ধানে কিছু মূল্য চড়ে বলেও আশঙ্কা। তখন সপ্তগ্রাম বর্ধিষ্ণু বন্দর।

হিন্দুদের ঘরে ঘরে নানা পার্বণ-অনুষ্ঠান হত—বালকউত্থান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণভেদ, হাতে খড়ি, উপনয়ন, দুর্গা, চণ্ডী, বাসুলী, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজাও কমবেশী চালু ছিল। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে প্রতিমা নির্মাণ এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে কীর্তন, বেদ-পুরাণ পাঠের আসর, পাঁচালী গান, বিতর্ক সভা, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি ব্যবস্থাও থাকত। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণরাও কপালে তিলক কাটত। তান্ত্রিক আচার চালু ছিল, পঞ্চমকার ও মধুমতী সিদ্ধি এবং পরকীয়া বামাচার বিরল ছিল না। সমাজে যৌতুক এবং পণপ্রথাও ছিল, তা পঞ্চ হরিতকী থেকে ধেনু, ভূমি, দাসদাসী, বস্ত্র, অলঙ্কার, বহুমূল্য সামগ্রী, শয্যা কিংবা তঙ্কাও হতে পারত। ধনীরা নানা উপলক্ষে ভোজনোৎসব করত এবং দানসমাগ্রী ছাড়াও গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল ও মালা প্রভৃতি দিয়ে ব্রাহ্মণদের এবং দরিদ্রদের বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে আপ্যায়িত করত। বিবাহোৎসবে নৃত্যগীতবাদ্যের ব্যবস্থা থাকত। গরীবেরা খই, কলা, দই, চিড়া, সিন্দুর, পান ও তেল দিয়েই নিমন্ত্রিত ও বরযাত্রীদের সেবা-সৎকার করত বলে মনে হয়। চৈতন্যের বিবাহে দরিদ্র শচীদেবী এ সব আয়োজনই করেছিলেন। ঘট, প্রদীপ, ধান, দূর্বা, দই, নারিকেল, আম্রসার প্রভৃতি বরণডালার উপকরণ ছিল। গৃহদ্বারের নিকটে কলা গাছ ও মঙ্গল ঘট থাকত। বিবাহোৎসবে বাজি পোড়ানো হত। ধনীরা নানা বর্ণের পতাকা (বানা) সজ্জাও করত। বৈষ্ণবরা সতীদাহ বিরোধী ছিল—বিষ্ণুপ্রিয়া-জাহ্নবা প্রমাণ। তখন সহমরণে বিরত থাকা নিন্দনীয় ছিল না। সতীদাহ বোধ হয় ক্বচিৎ হত, প্রমাণ শচীদেবী। হিন্দু নারীরাও পর্দা করত। হিন্দুরা অস্পৃশ্য মনে করত মুসলমানদের। তুর্কি প্রভাবে (উনিশ শতকের এজুদের মতো) শহুরে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অনেকেই শাস্ত্রাচারে উদাসীন ছিল, জুয়া, লাম্পট্য ইত্যাদি নানা কুকর্মও করত।

ক. সে যুগের বৈষ্ণবের তথা হিন্দুর খাদ্য ও গয়না ঃ "সে যুগের খাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিল নারকেল, সন্দেশ, মেওয়া, ক্ষীর, কর্কন্টিকা ফল, আখ, দই, দুধ, ঘি, সর, ননী, মুগ, কলা,

চিড়া, চালভাজা, লাফরা, পিঠা, পানা, ছানাবড়া, তেতুল পাতার অম্বল, নানা ধবনের শাক-যথা অচ্যুৎ, পটোল, বাহাক, কাল শালিঞ্চা, হিলঞ্চা প্রভৃতি। বৈষ্ণবদের অন্নের উপরে তুলসী মঞ্জরী দেওয়া হত। গরীবেরা খোলায় ভাত খেত ও পিতলের বাটি ব্যবহাব কবত। যাবা খোলা বিক্রি করত, তাবা থোড়, কলা এবং মূলাও বেচত। সে যুগে পান খাওয়াব বেশ চলন ছিল। সে যুগে লোকে আমলকী দিয়ে কেশ সংস্কাব করত। কেবল নাবীরা নয়, পুরুষেরাও নানা রকম অলঙ্কার পবতেন, যেমন—অঙ্গদবলয়, আংটি, নূপুর, কুণ্ডল : এই সব গযনা সোনার তৈরি হত, তাব সঙ্গে সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নার ব্যবহৃত হত।"

(বাংলার ইতিহাসেব দুশো বছব, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০৮)

খ. "সে যুগে লোকদেব বাড়ীতে শৌচাগারের পাট ছিল না, প্রয়োজনমত বাড়ীর বাইরে গিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করত।"

গ. চিকিৎসা ঃ "সে যুগে আয়ুর্বেদ ও টোটকা মতে লোকদের চিকিৎসা হত। কারও বায়ুরোগ হলে মাথায় বিষ্ণুতেল, নাবায়ণতৈল ও আবও সব সুগন্ধি পাক-তৈল দেওয়া হত, শুধু তাই নয়, তাকে তিনদ্রোণে (তেলে ভর্তি বিরাট পাত্রে) রাখা হত। অনেক সময় বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বেঁধেও রাখা হত, তাকে খেতে দেওয়া হত ডাবেব জল ; বায়ুর প্রকোপ বেশি হলে শিবাঘৃত প্রয়োগ করা হত। কফ বোগেব ওষুধ ছিল পিপ্পলি খণ্ড।"

ঘ. ফুল ও ক্রীড়া ঃ "সে যুগে যে সব ফুলের সমাদর ছিল, তার মধ্যে প্রধান—জম্বীর, কদম্ব ও দমনক (দনা)। লোকেরা জলে সাঁতাব কাটতে খুব ভালবাসত। বাংলাদেশে 'কয়া' নামে এক ধরনের জলক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তাতে লোকেবা জলে নেমে 'কয়া' বলে হাত তালি দিয়ে জলে বাদ্য বাজাত।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৯)

ঙ. ১ ব্যঞ্জন, ফলমূল ও পিষ্টক ঃ "নানা ধরনের শাক, নিম শুকতার ঝোল, মরিচের ঝাল, ছানা বড়া, বড়ী, দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা,, মোচাভাজা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন, ফুলবড়ী, নব নিম্বপত্র সমেত ভৃষ্ট বার্তাকী (বেগুনভাজা), পটোলভাজা, মানচাকী, ভৃষ্টমাষ, মুদ্গসূপ (মুগের ডাল), মধুরাম্ল (মিষ্টি ও টকের অম্বল), বড়াম্ল (বড়ার অম্বল), মুদগবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, ক্ষীরপুলী, নারকেল পুলী, কাঞ্জিবড়া, দুগ্ধলকলকী, দুগ্ধচিড়া, নানা ধরনের পিঠা, ঘৃতসিক্ত পরমান্ন, চাঁপাকলা, ঘনদুধ, আম-কাঁঠাল ও নানা ধরনের ফলমূল, দই, সন্দেশ অমৃতগুটিকা (?), পিঠাপানা—এইগুলি ছিল বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট খাদ্য।"(ঐ পৃঃ ৫১১)

২ "দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার সময় অথবা দূরদেশে অবস্থিত প্রিয়জনদেব উপহার দেবার জন্য লোকে এমন সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেত, যা সহজে নষ্ট হয় না। এই সব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান—আম্রকাসুন্দী, আদাকাসুন্দী, ঝালকাসুন্দী, নেম্বু (লেবু), আদা, আম্রকোলি, আমসী, আম্রখণ্ড (আমসত্ত্ব ?), তৈলাম্র, আমতা, পুরোনো সুকুতার গুড়া, ধনিয়া, মুহরী ও চাল গুড়া চিনি দিয়ে পাক করা নাড়ু, শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু, (কড়াইশুটি ও মিছরির নাড়ু) কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড, নারকেল খণ্ড নাড়ু, চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার (?), চিরস্থায়ী ক্ষীর, ক্ষীব সার ও মণ্ড, অমৃত কর্পূর, শালি কাঁচুটি, ধানের আতপ চিড়া, ঘিয়ে ভাজা চিড়া ও মুড়ি চিনি দিয়ে পাক করা নাড়ু, ঘি মেশানো শালি চালভাজার গুড়া, কর্পূর মরিচ এলাচ-লবঙ্গ রসবাসের বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, ঘিয়ে ভাজা শালি ধানের খই, চিনি দিয়ে পাক করা, কর্পূব মেশানো উখড়া, ঘিয়ের ভাজা ফুটকলাই গুড়া প্রভৃতি।" (ঐ, পৃঃ ৫১১ ১২)

৩. **রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ঃ** শাসক-শাসিতের মধ্যে লঘু-গুরু অবজ্ঞা বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণেই ছিল। বিশেষত নদীয়ায় রঘুনন্দন প্রভৃতির শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কার প্রয়াসের মধ্যে ওহাবী ফরায়েজী প্রভৃতির মতো গণমনে যবন বিতাড়নের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার প্রাসঙ্গিক চেষ্টাও ছিল, তাই গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, তাতেই গৌড়সুলতান হোসেন শাহ সম্ভবত নদীয়ায় সৈন্যসমাবেশ করেন ও ধরপাকড় শুরু হয় (আচম্বিতে নদীয়ায় হৈল

রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ইত্যাদি)। যশোহর-খুলনা-বশিরহাট অঞ্চলে সেনানী শাসক পীর খান জাহান আলী খান ও নবদীক্ষিত তাহের ঠাকুব প্রভৃতির আগ্রহে ইসলামে দীক্ষার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলে এবং ম্লেচ্ছস্পর্শ দোষে বহু হিন্দু সমাজে পতিত হয়ে ইসলাম বরণ করে। এতে অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। হিন্দুর শাস্ত্রী ও সমাজপতি ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে ইসলামের প্রসারেব মুখে হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজ রক্ষার প্রয়াস চলে বলেই কেবল 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে' বলে উক্ত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী ও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই যথাক্রমে দেশ এবং শাস্ত্র সমাজ শাসনের কর্তা ছিল। তাই আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রও বলেছেন—'যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে তুল্যমূল্য গজে মেষেরে'। (মানসিংহ খণ্ড) নবদীক্ষিত দেশজ মুসলমানদের কেউ কেউ চৈতন্যমতও গ্রহণ করে। তুর্কী-মুঘলদের শাসিত ও পৌত্তলিক বলে অবজ্ঞা ছিল হিন্দুর প্রতি -যেমন ছিল ইংজেরদেব ভারতীয়দের প্রতি। তাই কাজী বলছেন ঃ

আমবা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত .....
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত।

আবার স্বজাতিপ্রেমিক হিন্দুরও ছিল তুর্কী মুঘল তথা তুরুক যবনের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ ঃ 'নির্যবন করো আজি সকল ভুবন'।

কাজী ছিলেন বিচারক, তাঁর অধীনে শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষী পুলিসও থাকত। রাজস্ব আদায়ের জন্যে গ্রেফতার করার রেওয়াজ ছিল। প্রশাসক ফৌজদারগণ ছোটখাট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক থাকতেন। দেওয়ান ও দেওয়ানী ছিল বেসামরিক প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার জন্যে। পরবর্তীকালের শাসক ইংরেজের প্রভাবের মতো তুর্কী মুঘলদেরও ধর্মের, আচার-আচরণের, আদব-কায়দার, বসন-ভূষণের, খানাপিনার, দরবারী ভাষার প্রভাব পড়েছিল শহুরে শিক্ষিত হিন্দুর উপর। তাই ব্রাহ্মণও ফার্সী পড়ে, জালালউদ্দীন রুমীর রূপককাব্য 'মসনবী'র বয়েত (শ্লোক) আবৃত্তি করে, তুর্কী মুঘলের মতো পোশাক ও জুতা-মোজা পরে, দাড়ি রাখে, গোমাংস খায়, সেলাই করা কুর্তা তখন ব্রাহ্মণেও পরে--'শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন'। এসব স্বধর্মপ্রেমী ও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর বেদনা ও ক্ষোভের কারণ ছিল। রাজবৈদ্য বা রাজপণ্ডিতের পদে নয় কেবল, দবীরখাস ও শাকেরমল্লিক কিংবা জনপদ প্রশাসকের এবং দেওয়ানের (রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ পদে) এমনকি সেনাপতির পদেও (রাজ্যধব) হিন্দু নিযুক্ত থাকত। গৌরমল্লিক, যশোরাজ খান, অনুপম (বল্লভ), গোপীনাথ বসু, পরমানন্দ খান, কেশব ছত্রী, মুকুন্দ প্রভৃতি রাজকর্মচারী ছিলেন। সুযোগ পেলে জমিদার প্রশাসক বিদ্রোহ করত। বাকলার প্রশাসক রূপ-সনাতনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও যশোরের রামচন্দ্র খান তার প্রমাণ। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের দিকে হোসেন শাহর সঙ্গে উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হয়। ঈশান নাগরের নামে চালু 'অদ্বৈতপ্রকাশ' নামের জাল গ্রন্থে হরিদাসের মুখে দেবমূর্তি ভাঙার, পূজাসামগ্রী নষ্ট করার, ভাগবতাদি শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলার, ব্রাহ্মণের হাত থেকে শঙ্খ-ঘণ্টা কেড়ে নেয়ার, তুলসীব মূলে ও দেবমন্দিরে মল-মূত্র ত্যাগ করার ও পূজারত ব্রাহ্মণের গায়ে কুলকুচার পানি ছিটানোর অভিযোগ রয়েছে ম্লেচ্ছ তথা যবনদের বিরুদ্ধে।—এগুলো বানানো। নবদ্বীপে রাজভয় অপসৃত হওয়ার কারণ ও কালীর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হোসেন শাহর সুশাসনের কথা জয়ানন্দ এভাবে বলেছেন ঃ

গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু
রাজকর নাহি সর্বলোক চাষ চষু।
আজি হৈতে হাট ঘাট বিবোধ যে করে ....
দেউল দেহারা ভাঙ্গে অশ্বথ যে কাটে
ত্রিশূলে চড়াই তারে নবদ্বীপের হাটে।।

যে হোসেন শাহ উড়িষ্যা অভিযানে দেউল-দেহারা ভেঙ্গেছিলেন, পরে 'এহেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র' (চৈঃ ভাঃ)। বস্তুত, হোসেন শাহ, নুসরৎ শাহ, গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ, শের শাহ, ইসলাম শাহ—সবাই ছিলেন সুশাসক ও পরমতসহিষ্ণু। তাই চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদ

পরিকরেরা নির্বিঘ্নে নব মত প্রচার করতে, এমনকি মুসলমানকেও দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন ('যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম'—বলরাম দাস)। যবন হরিদাসও মুলুকপতির ছাড়পত্র পেয়েছিলেন— 'আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথাতথা। যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্বথা' (চৈঃ ভাঃ)।

খাজনা আদায় করতে না পারলে কিংবা সামন্তের বা প্রশাসকের কোন কারণে পীড়ন বাড়লে অথবা জীবিকা সংকট দেখা দিলে লোকে গোপনে অন্য জমিদারের এলাকায় অন্য অঞ্চলে পালিয়ে যেত। শ্রীহট্ট থেকে জগন্নাথ মিশ্র, অদ্বৈত, নীলমণি প্রভৃতি নৈহাটিতে, এবং বাকলায় যশোরে রূপ-সনাতনরা বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন। চৈতন্য-শিক্ষক গঙ্গাদাসও রাজভয়ে পালিয়ে ছিলেন। পথে ঘাটে নারীর সম্মানও নিরাপদ ছিল না। সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত নামের টীকাগ্রন্থে গৌড় সুলতানদের প্রশাসনপদ্ধতির ও মহল-সংস্কৃতির পরোক্ষ ইঙ্গিত মেলে বলে বিদ্বানদের ধারণা।

১. "সনাতন রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাই রাজা, মহারাজা ও সার্বভৌম নৃপতির বৈশিষ্ট্য তিনি কয়েক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। (১/১/৪৫-৪৬ ; ২/১/১)। গ্রামের এক একজন অধিকারী থাকতেন : কতকগুলি গ্রামের উপর এক একজন মণ্ডলেশ্বর থাকতেন ; তাঁহাদের উপর মহারাজ ও সর্বোপরি সার্বভৌম বা রাজচক্রবর্তী। মণ্ডলেশ্বরের উপাধি ছিলো রাজা। —মণ্ডলেশ্বর ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় রাজন্যদের মতন পর রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিরুদ্বেগ বাস করিতে পারিতেন না।---রাজচক্রবর্তী সর্ব মহলের অধিপ সম্রাটের বিবিধ আদেশ, যথা ' ইহা কর' 'উহা করিও না' ইত্যাদিরূপ আদেশ পরিপালন করিতে যাইয়া অনুভব হইত যে, তিনি অস্বতন্ত্র বা পরাধীন।"

[বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৯৯-৩০০]

২ "গোপকুমার বৈকুণ্ঠের প্রাসাদের গোপুরে বা প্রবাল ঘরে উপস্থিত হলে দ্বারপাল তাকে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে বলে তার 'প্রভু'কে অর্থাৎ উর্ধ্বতন কর্মচারিদের সংবাদ দিতে গেলেন। 'প্রভু' গোপকুমারের আগমন সংবাদ শুনে প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর প্রতি দ্বারে দ্বারপালেরা নিজের নিজের অধ্যক্ষকে জানিয়ে গোপকুমারকে প্রবেশ করাতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠেশ্বরের যত কাছে যে দ্বারপাল থাকেন, তিনি তাঁর চেয়ে দূরে অবস্থিত দ্বারপালের মাননীয়। দ্বারপালের এক দ্বার থেকে অন্য দ্বারে গমন করে সেই দ্বারের অধিবাসীদের প্রমাণ করতে লাগলেন। গোপকুমার দেখলেন যে, যারা প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন তাঁরা শুধু হাতে যাচ্ছেন না, নানা রকম ভেট নিয়ে যাচ্ছেন। বৈকুণ্ঠেশ্বরের সভায় প্রবেশ করে গোপকুমার দেখলেন যে, রত্নখচিত সুন্দর সুবর্ণময় সিংহাসনে গদি পাতা রয়েছে এবং তার উপরে সুন্দর সুন্দর সব তাকিয়া রয়েছে, বৈকুণ্ঠেশ্বর তাকিয়ায় কনুই রেখে বসে আছেন।" [এ বর্ণনা সুলতানী আমলের প্রভাবজ] [সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃঃ ৪৯১-৯২]

ষোল শতকে নবদ্বীপ শহর হয়ে উঠেছিলো—শিক্ষা ও ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে ছিল সুখ্যাত। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক কর্মোপলক্ষে এসে এখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে। বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক ছাড়াও তাঁতী, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলী, মালাকার, শঙ্খবণিক, খোলাবেচা, সন্ন্যাসী, যোগীরা যেমন ছিলো, তেমনী ফারসি শিক্ষিত লোকেরও অভাব ছিলনা, তাঁরা মসনবী আবৃত্তি করত, কামান ধরত, জুতা মোজা পরত, তুর্কী পোশাকও হয়তো পরত। রাজদরবার ও টোল বসত দিনে দুইবার--সকালে ও বিকালে। ঘোড়া ও দোলা ছিল ধনী লোকের বাহন। তাঁদের অনুচর-সহচর থাকত অনেক। গুরুদক্ষিণা রূপে ধনী সন্তানদের থেকে সোনা, রূপা, জলপাত্র, আসন দামী কম্বল প্রভৃতি মিলত। কিন্তু পনেরো শতকে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল না। তাই ফুলিয়ার কৃত্তিবাস উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন বিদ্যা অর্জনের জন্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাগবত ও কৃষ্ণমঙ্গল
কৃষ্ণভক্তি প্রচারমূলক পাঁচালী

পাণ্ডববর্জিত এ অস্ট্রিক-মঙ্গোল অধ্যুষিত বাঙলাদেশের অঞ্চলবিশেষে গুপ্ত অধিকারে গীতা-স্মৃতি-সংহিতা অনুগ শাস্ত্র ও আচার চালুর চেষ্টা নিশ্চয়ই ছিল--এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তারপর আবার পাল শাসনকালে সে-সমাজে সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ প্রভাবে আচারশৈথিল্য এসেছিল—এ অনুমানও অযৌক্তিক নয়। এ অনুমানের সমর্থনে বলা যায় লোকশ্রুতির আদিশূর কিংবা ইতিহাসের সেনরাজা বল্লাল সেন এদেশে শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যসমাজ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাগ্নিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরও অভাব ছিল এদেশে, সর্বজন স্বীকৃত ও মান্য ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীও ছিল দুর্লভ। তাই দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজেও শাস্ত্র আর শাস্ত্রাচার ছিল অনেকটা শ্রুতি-স্মৃতিনির্ভর ও লোক-সংস্কারদুষ্ট। সেনরাজাদের রাজকীয় প্রয়াসও যে রাজধানীর বাইরে বিশেষ সফল হয়নি, তার প্রমাণ পনেরো-ষোল শতকের আগে এখানে রামোপাসক বা বিষ্ণুভক্ত লোক ছিল বিরল। ভাগবতও ছিল না জনপ্রিয়, বস্তুত পনেরো শতকের আগে ভাগবত ছিল অজ্ঞাত। লৌকিক রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথার মতো রামায়ণ কথা ছিল, কিন্তু রামমূর্তি, রামমন্দির রামায়েৎ সম্প্রদায় ছিল না। পনেরো শতকে কিছু বিষ্ণুভক্ত (উত্তর ভারতীয় প্রভাবে) রঘুনাথ উপাসকের সন্ধান মেলে। তাও ভক্তিবাদের আবরণে।

মনে হয় মাধবেন্দ্রপুরীর প্রভাবেই রাঢ় অঞ্চলে বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্তি বিশেষ প্রসার লাভ করে। মধ্ব সম্প্রদায়েরও প্রভাব এ অঞ্চলে প্রবল হতে যাচ্ছিল। আনন্দ,পুরী, গিরি, তীর্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় পনেরো ষোল শতক থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে সুলভ হতে থাকে। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' তথা গোবিন্দবিজয়ই সম্ভবত সন্তপ্রভাবপ্রসূত ভক্তিমূলক প্রথম লিখিত গ্রন্থ।[১] অনুবাদমূলক হলেও রাগরাগিনীযুক্ত এই গেয় পাঁচালী রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-প্রতীকে ভক্তিবাদ প্রচার উদ্দেশেই রচিত। এই প্রথম ভাগবতের অংশ বিশেষের সঙ্গে লোক সমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলো। আমরা দেখেছি তুর্কী বিজয়ের ফলে নৃপতি ও শাস্ত্রীর হুকম-হুমকি মুক্ত গণমানব তাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার-সৃষ্ট ও পুষ্ট লৌকিক দেবতার গুণ-পূজা-মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসাহী হয়ে ওঠে, সনাতন ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রপন্থীদেরও দ্বিমুখী প্রতিরোধ প্রয়াসে সংগ্রামী হয়ে উঠতে হয়—এদিকে ইসলামের প্রসার রোধ করে সমাজের ভাঙন বন্ধ করা, অন্যদিকে লোকধর্মের প্রসার প্রতিরোধ করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও আচার চালু রাখা উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের পবিত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল—তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও অবস্থান রক্ষার জন্যেই—আত্মরক্ষার জন্যেই তা' আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। তাই রাজসেবীরাই অর্থাৎ দরবারের পদস্থ কর্মচারী কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্যরাই বাঙলার পুরাণ রচনায় নেতৃত্ব দেন। আবার লোকায়ত লোকধর্মের প্রসার ও স্থিতি লক্ষ্যেই গণমানবরা যেমন তাদের সৃষ্ট দেবতাদের জন্যে গীতা-স্মৃতি-সংহিতার সমর্থন ও স্বীকৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে উপলব্ধি করছিল, তেমনি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা স্বশাস্ত্র চালু রাখার জন্যে সংখ্যাগুরু গণমানবের সঙ্গে আপোসের জন্যে মন তৈরী করছিল ন্যায়-স্মৃতি-কাপ-পটি-মেল প্রভৃতির সংস্কার ও বিন্যাস করে। বিদেশাগত নব মতের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার গরজে উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণের ভিত্তিতে আপোস হয়ে গেল। এবং ইসলামের প্রভাব (সাম্য ও সূফীমত) আংশিক স্বীকার করেই ইসলামের প্রসার ঠেকানো যে সম্ভব দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় সে-উপলব্ধিবশে পনেরো ষোল শতকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ভক্তিবাদ উত্তর পশ্চিমবঙ্গে (আসামেও) প্রচারিত হতে থাকে। এটিকেই 'যুগধর্ম' বলে স্বজাতিবৎসল শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা মানল। মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী, কেশবভারতী, মালাধর বসু প্রমুখ দিয়ে এ আন্দোলনের শুরু এবং চৈতন্যদেবে তার পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ।

---

১ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও স্মর্তব্য।*

অতএব শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বাঙলার প্রথম ভক্তিবাদ প্রচারমূলক গ্রন্থ। তারপব চৈতন্যপ্রভাবে ভাগবতের জনপ্রিয়তা ও কৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ রচনাব বাহুল্য দেখা যায়। এর আগে গীতগোবিন্দ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবধি নিজেকে দেব-নারায়ণ বলে পরিচয় দিয়েও ভক্তির কথা দূরে থাক- রাধার সামান্য আস্থা অর্জন করাও ছিল কৃষ্ণেব পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু পনেবো শতকের শেষপাদ থেকে রচিত বাঙলা পাঁচালী মাত্রই ভক্তিরসাশ্রিত—রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কিংবা চণ্ডী-শিব-মনসার পাঁচালী যা-ই হোক না কেন।

কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাগণ

১. **যশোরাজ খান** রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' ঃ ষোল শতকের দ্বিতীয় পাদেব গোড়ার দিকে সৈয়দ নাসিরউদ্দীন নুসরৎ শাহর (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) পদস্থ কর্মচারী যশোরাজ খান উপাধিধারী পদকার যশোরাজ খান একখানি 'কৃষ্ণমঙ্গল' বচনা করেছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল' আজো অপ্রাপ্ত। যশোরাজ খান কৃষ্ণভক্ত হলেও চৈতন্যপ্রভাব স্বীকার করেছিলেন বলে মনে হয় না। চৈতন্যবাদী বৈষ্ণব কবিরা রাজা বা প্রতিপোষকের নাম ভণিতায় যুক্ত করেননি কখনো। কিন্তু যশোরাজ খানেব প্রাপ্ত পদের ভণিতায় রাজস্তুতি রয়েছে।

২. **গোবিন্দ আচার্য** রচিত কৃষ্ণমঙ্গল— গোবিন্দ আচার্য পদকারও ছিলেন। কৃষ্ণমঙ্গলের বিভিন্ন ভণিতা সূত্রে বোঝা যায়, মাতৃভক্ত ও গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত গোবিন্দ আচার্য গৌর-নিতাইয়ের ভক্ত ছিলেন ঃ

ক, প্রণমিয়া জননীর চরণ কমলে
গোপাল ভাবিয়া দ্বিজ গোবিন্দ বলে।

খ, চিন্তিয়া চৈতন্যদেবের চরণ কমল
দ্বিজগোবিন্দ বোলে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

গ, নিতাই চৈতন্যপাদ পাইয়া সরস
গান দ্বিজগোবিন্দ কৃষ্ণকথা রস।

ঘ, দ্বিজগোবিন্দ গাএ চৈতন্য চরণে। [বাঃ সাঃ ইঃ ১।পূ।৩ পৃঃ ৪৪৬]

দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় গোবিন্দ আচার্যের নাম মেলে

গোবিন্দ আচার্য বন্দো সর্বগুণশালী
যে করিল রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী।

কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়ও গোবিন্দ আচার্যকে কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আচার্য শ্রীল গোবিন্দ গীত পদকারক'।

এই গোবিন্দ আচার্য চৈতন্যদেবেব বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দেবকীনন্দনোক্ত 'ধামালী' এবং কবি কর্ণপুরোক্ত পদ্যাদি সম্ভবত কৃষ্ণমঙ্গলই নির্দেশ করছে। তাহলে দ্বিজগোবিন্দ ও গোবিন্দ আচার্য অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করা সম্ভব।

৩. পরমানন্দ রচিত 'কৃষ্ণলীলা' বা 'কৃষ্ণস্তবাবলী'।—এই পরমানন্দ কবি কর্ণপুর পরমানন্দ দাস (সেন) নন, ইনি মঞ্জরীভাবের সাধক (একটি পদের ভণিতায় 'শ্রীরূপমঞ্জরে হৃদয়ে ধরি'–পদকল্পতরু ২৯০৬ সংখ্যক পদ) পরমানন্দ গুপ্ত। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' 'পরমানন্দ গুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী' বলে এঁর উল্লেখ রয়েছে। জয়ানন্দও চৈতন্যমঙ্গলে এঁকে 'গৌরাঙ্গবিজয়' রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

'সংক্ষেপে করিলেন তিহঁ পরমানন্দ গুপ্ত
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'চৈতনচরিতামৃতে' বলেছেন ঃ

'পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি
পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।'

অতএব গৌর-নিতাইর প্রত্যক্ষদর্শী ও লীলাআস্বাদক নবদ্বীপবাসী পদকার পরমানন্দ ও কৃষ্ণস্তবাবলী বা কৃষ্ণলীলা ও গৌবাঙ্গবিজয় রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি। ইনি হয়তো শেষ বয়সে বৃন্দাবনী তত্ত্বধারার প্রভাবে মঞ্জরীভাবের সাধক হয়েছিলেন। কৃষ্ণলীলার পুথির পরমানন্দের পিতার নাম দুর্লভ (বাঃ সাঃ ই।১।পৃ।৩ পৃঃ ৪৪৭)।

৪. **রঘুনাথ পণ্ডিত** ভাগবতাচার্য রচিত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী—এ গ্রন্থ ভাগবতের মূলানুগ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্দ সংক্ষেপে এবং শেষ তিন স্কন্ধ পুরো অনুবাদ করেছেন। এঁর নিবাস ছিল বরাহনগবে। চৈতন্যদেব নাকি গৌড় থেকে নীলাচলের পথে এঁর বাড়িতে বিশ্রাম করেছিলেন। এই বঘুনাথ ভাগবতাচার্য উপাধি স্বয়ং চৈতন্যদেব থেকেই—'প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে। এতেকে তোমাব নাম ভাগবতাচার্য' (চৈঃ চঃ)। এবং এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর কাব্যের ভণিতায়ও 'ভাগবতাচার্য' বহুল ব্যবহৃত। ভণিতা 'কহে রঘুপণ্ডিত গোবিন্দগুণগান'। চৈতন্যভক্ত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য রচিত 'কৃষ্ণপেমতরঙ্গিনী' আদি বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল এবং কবিও ছিলেন বৈষ্ণবপূজ্য।

১. নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যা গৌরাঙ্গাত্যন্ত বল্লভঃ।
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, কবিকর্ণপুর।

২. বন্দে ভাগবতাচার্যাগৌবাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম
যেনা করি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী।
—শাখানির্ণয়ামৃতম্, যদুনাথ দাস।

রঘুপণ্ডিত পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুক্ত গদাধর তথা চৈতন্যপার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। এ গ্রন্থ যে ষোল শতকের প্রথমার্ধে রচিত তাতে সন্দেহ নেই।

৫. **দ্বিজ মাধব** রচিত কৃষ্ণমঙ্গল (ভাগবতসার)—ষোল শতকের কবি দ্বিজ মাধব বহুগ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর রচিত গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলচণ্ডীর গীত) বা সারদাচরিত ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ষোল শতকে (পরেও) কোন চৈতন্যমতাবলম্বী অন্য লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা রচনা করেননি। কাজেই দ্বিজ মাধবও সম্ভবত বৈষ্ণব ছিলেন না, যদিও ভণিতায় তার চৈতন্যভক্তি সুপ্রকট ঃ

১. চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল
দ্বিজ মাধব কহে গঙ্গামঙ্গল ; (গঙ্গামঙ্গল)

২. চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল
দ্বিজ মাধবকহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। (কৃষ্ণমঙ্গল)

মনে হয় বৈষ্ণব অধ্যুষিত সপ্তগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী কবি দ্বিজ মাধব বৈষ্ণবতোষণ লক্ষ্যেই চৈতন্য চরণ ধ্যান করেছেন, অথবা কৃষ্ণমঙ্গলের বৈষ্ণব লিপিকর পাঠক ভণিতা বদল করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের চৈতন্যযুক্ত ভণিতা প্রক্ষিপ্ত। দ্বিজ মাধবের পিতার নাম পরাশর ঃ

ক. পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসাব।। (কৃষ্ণমঙ্গল)

খ. পরাশর সুত হয় মাধব তার নাম
কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম। (চণ্ডীমঙ্গল)

গ. সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর
যাগযজ্ঞে জপে-তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।

মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু
আচারে বিচারে বুদ্ধ্যে সম সুরগুরু।
অথবা–

ঘ. তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য। (চণ্ডীমঙ্গল)

বোঝা যাচ্ছে কবির পিতা পরাশর স্ব-এলাকায় প্রখ্যাত ধনী, মানী ও দানশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল' ও চণ্ডীগীত সুদূর চট্টগ্রাম অবধি প্রচারিত ছিল। মনে হয় দ্বিজ মাধব কর্মসূত্রে চট্টগ্রামে দীর্ঘকাল বাস করেছেন এবং সে কারণে তাঁর পাঁচালীগুলো সেখানে লোকপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিজ মাধব মাধবাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন ঃ

মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
–বৈষ্ণববন্দনা, দেবকীনন্দন।

তাঁর চণ্ডীগীতিতে রচনা কাল রয়েছে ঃ

ইন্দুবিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত।

এর থেকে ১৫০১ শক বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দ মেলে। এ গ্রন্থে চার বছর আগে বঙ্গবিজেতা সম্রাট আকবরের স্তুতিও রয়েছে ঃ

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার
তাহে একাব্বর বাশ্চা (বাদশা) অর্জুন অবতার।
প্রতাপে সকল জিনে বুঝে বৃহস্পতি
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি।"

মনে হয় কৃষ্ণরাম দাস-উক্ত 'দক্ষিণ রায়' পাঁচালীও সম্ভবত দ্বিজ মাধব রচিত। বৈষ্ণব প্রাবল্যের যুগে কৃষ্ণমঙ্গল বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হয়, অন্য রচনাগুলো তখন রচনাস্থল অতিক্রম করতে পারে নি। এঁর এবং পরবর্তী কবি দ্বিজ ভবানন্দের কাব্যেরও এক বিলুপ্ত রাধাকৃষ্ণলীলাসম্বলিত সংস্কৃত 'হরিবংশ' অবলম্বন ছিল।

৬. **শ্যামদাস** রচিত 'গোবিন্দমঙ্গল'—দুঃখী শ্যামদাস, শ্যামানন্দ দাস সম্বন্ধে পদকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গোবিন্দমঙ্গল রচয়িতা দুঃখী শ্যামদাসের মাতার নাম ভবানী এবং পিতার নাম শ্রীমুখ। ইনি বর্ণে ভরদ্বাজবংশীয় কায়স্থ। নিবাস মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগনার হরিপুরে। কবি কাশীরাম দাসের পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতারও নাম ছিল শ্রীমুখ, তিনিও ছিলেন দে বংশীয় কায়স্থ, তাঁরও নিবাস ছিল হরিপুরে। গোবিন্দমঙ্গল সম্পাদক ঈশান বসু পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে ডক্টর সুকুমার সেন শ্যামদাসকে কাশীরাম দাসের পিতৃব্যস্থানীয় জ্ঞাতি বলে অনুমান করেছেন এবং গোবিন্দমঙ্গলের রচনাকাল ষোল শতকের মাঝামাঝি বলে মেনেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় এ সিদ্ধান্তে ত্রুটি দেখেছেন। তাঁর মতে "কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহ বর্ধমান জেলার ইন্দ্রানী পরগণায় থাকতেন, ...আর কাশীরাম দাসের অনুজ গদাধর দাস লিখেছেন যে, তাঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কায়স্থ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় নন।"

৭. **কবিশেখর** দেবকীনন্দন রচিত 'গোপালবিজয়'—কবিশেখর দেবকীনন্দন সম্বন্ধে 'পদকার' প্রসঙ্গেও আলোচনা রয়েছে। তাঁর আত্মপরিচিতি এরূপ ঃ

"সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন
শ্রীকবি শেখর নাম বলে সর্বজন।
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হীরাবতী
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি।"

এর রচিত সর্বগ্রন্থই কৃষ্ণবিষয়ক। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ—'গোপালচরিতমহাকাব্য', 'গোপালের-কীর্তনামৃত', 'গোপীনাথবিজয়' নাটক। অতএব কৃষ্ণ যথাযথই তাঁর 'প্রাণধনকুলশীল জাতি'। শেখর, কবি শেখর, রায় শেখর, কবি শেখর রায় ভণিতায় তাঁর পদাবলীও রয়েছে। সুকুমার সেন 'তিনজন কবি শেখর'-এর অন্তত দুইজনে আস্থা রাখেন।

৮. কৃষ্ণদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'–কৃষ্ণমঙ্গলের গ্রন্থোক্ত নাম—মাধবচরিত 'মাধব চরিত গান যাদবনন্দন'। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। নিবাস 'জাহ্নবী পশ্চিম কূলে'। তিনি ছিলেন অপর কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্যের ভৃত্য বা সেবক—'আচার্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্য কার্য, দেখিয়া করিল দয়া মাধবাচার্য'। তাই মাধবের নির্দেশ তাকে মানতে হয়েছিল। স্ব এলাকায় তাঁর গ্রন্থ প্রচার করা সম্ভব হয়নি—

'দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার
এখানে গাহিতে গ্রন্থ রহিল আমার।'

এই মাধবাচার্য চৈতন্যদেবের শ্যালক ও প্রতিবেশী।

৯. মাধবাচার্য রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল'—ইনি কৃষ্ণদাসের প্রভু এবং চৈতন্যদেবের শ্যালক বা খুড়তুতো শ্যালক ছিলেন। অতএব ইনিই দ্বিজ মাধব (দ্রষ্টব্য ৫ সংখ্যক) যিনি 'গঙ্গামঙ্গল'–চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

ক সব অবতার শেষ কলি পরবেশ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত প্রতিবেশ।
প্রেমভক্তি রস করেন প্রকাশ
কহে দ্বিজ মাধব তাহার দাসের দাস।

খ. কলিযুগে চৈতন্য প্রকাশ
কহে দ্বিজ মাধব তার দাসের দাস।

কবিবল্লভ রচিত রসকদম্ব নামের বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থেও রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থের রচনাকাল 'বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত' তথা ১৫২০ শক বা ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ। বল্লভের পিতার নাম রাজবল্লভ। মাতার নাম বৈষ্ণবী। নিবাস করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রামে। কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস। 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়'–এই অনন্য পদটি হয়তো এঁরই রচনা।

সতেরো-আঠারো শতকের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থাবলী

সমাজবদ্ধ মানুষের দেশকালের পরিবেশে ও প্রয়োজনে যে ভাব-চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে, তার সঙ্গে সমকালীন মানুষের প্রাণ-মনের নিবিড় যোগ থাকে। তখন তা' প্রাণধর্মের তাগিদে, অনুভবের অকৃত্রিমতায়, উপলব্ধির স্বচ্ছতায় থাকে সমুজ্জ্বল ও স্বাভাবিক। কালান্তরে তা-ই প্রথাগত কৃত্রিম অনুসৃতি ও প্রাণহীন অনুকৃতিতে ম্লান ও পৌনঃপুনিকতাদুষ্ট হয়ে যায়। সতেরো-আঠারো শতকের কৃষ্ণলীলা গ্রন্থগুলোও তেমনি কৃত্রিম সাহিত্যিক অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে—তাতে না আছে বৈষ্ণবসাধকের নিষ্ঠা, না আছে বৈষ্ণবতত্ত্বের নিষ্ঠ অনুসরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাম-প্রেমের উত্তেজক ইন্ধনই মুখ্য বিষয়। এবং গীত হওয়ার জন্যে, কথকতার জন্যে অথবা কাহিনী হিসেবে বর্ণিত ও শ্রুত হওয়ার জন্যে রচিত। তবু দীন ভবানন্দ অনূদিত অধুনালুপ্ত সংস্কৃত 'হরিবংশ' সাহিত্য হিসেবে বিশেষ উল্লেখ্য।

ভবানন্দ [দীন]–'হরিবংশ' প্রণেতা বা অনুবাদক তাঁর প্রায় সব ভণিতায় নিজেকে দীন ভবানন্দ বা ভবানন্দ দীন বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তাঁর কাব্যটি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। দীন ভবানন্দের পিতার নাম শিবানন্দ—'শিবানন্দ সুত কহে দীন ভবানন্দ;' ভবানন্দের দাবি তাঁর কাব্য ব্যাসরচিত হরিবংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ঃ

সত্যবতী সৃত মুনি [ব্যাস] নারায়ণ অংশ
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ।
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে
লোক বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে।

তবে ভবানন্দের হরিবংশ আদিরসাত্মক একটি সুখপাঠ্য কাব্য। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর আদল ও গীতিময় লালিত্য রয়েছে। সাধারণভাবে কাব্যের কাঠামো পুরাণানুগ। ভবানন্দ সম্ভবত কিশোরগঞ্জ বা সিলেট অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি সতেরো শতকের কবি, তাঁর কাব্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রতিলিপি কাল ১০৯৬ সাল বা ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ।

নবহরি দাস (ভাগবত), অচ্যুত দাস, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী (গোবিন্দমঙ্গল বা ভাগবতামৃত), দ্বিজ মাধবেন্দ্র (ভাগবতসার), অভিরাম দাস, বলরাম দাস (কৃষ্ণমঙ্গল), দ্বিজ রামেশ্বর, দ্বিজ রামনাথ (কৃষ্ণবিজয়), নরসিংহ দাস, শিবরাম, পঞ্চানন প্রমুখ অনেকেই কৃষ্ণবিষয়ক রচনায় ভাষা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্য

রামায়ণ

১. অনুবাদকের যোগ্যতা

অনুবাদেব প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে অনুবাদকের আবশ্যিক যোগ্যতা সম্পর্কে বলছি। শুদ্ধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর অনুবাদ এক বস্তু নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুদ্ধ অনুবাদ আবশ্যিক। ধর্মশাস্ত্র, আইন ও দর্শনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু অনুবাদ প্রয়োজন আর সাহিত্যে সুন্দর অনুবাদই বাঞ্ছনীয়। কারণ সাহিত্য তত্ত্বও নয়, তথ্যও নয় ; সাহিত্য মনগড়া ভাবের ও অনুভবের আর ব্যক্তিক উপলব্ধির অভিব্যক্তি মাত্র। অতএব তথ্যের শুদ্ধ, তত্ত্বের সুষ্ঠু এবং সাহিত্যের সুন্দর অনুবাদই অভিপ্রেত।

সাহিত্যের অনুবাদ শিল্পসম্মত হওয়া আবশ্যিক বলেই সাহিত্যের অনুবাদ বিশেষত কাব্যের অনুবাদ আক্ষরিক হতেই পাবে না। ভিন্ন ভাষার শব্দ সম্পদের পরিমাণ, প্রকাশক্ষমতা ও বাগভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত কথার সংকোচন, প্রসারণ, বর্জন ও সংযোজন আবশ্যিক হয়।

তাই সাহিত্য-অনুবাদকেব তিনটি গুণ থাকা আবশ্যিক। এ তিন গুণের যেকোন একটির অভাব থাকলে, সে অনুবাদককে অযোগ্য বলেই মানতে হবে।

১. অনুবাদক স্বভাষায় ব্যুৎপন্ন হবেন।
২. যে ভাষা থেকে তিনি গ্রন্থ অনুবাদ করবেন, সে ভাষাব বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন ও বুলির সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে, নইলে গাঁট-কাটা আব ঠোঁট কাটাব অর্থপার্থক্য বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।
৩. তিনি অবশ্যই সৃষ্টিশীল লেখক বা সৃষ্টিপ্রবণ সাহিত্যবসিক হবেন, সুরুচি ও বৈদগ্ধ্য হবে তাঁর বিশেষগুণ।

অনুবাদকের এ তিন গুণ না থাকলে গদ্যে বা পদ্যে তাঁর অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ ও শিল্পসুষমাহীন তথা অসার্থক হবেই। সাহিত্যে তথ্যানুগ অনুবাদের ব্যর্থতার নজীর একটা দুটো নয়, বহু।

অনুবাদকের কৃতি বিচারে ও অনুবাদের মূল্যাযনে মূল গ্রন্থ অনূদিত গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ —এ অঙ্গীকার থাকা চাই। কেননা তর্জমা মূলের অবয়বের ভাস্কর মূর্তিমাত্র— অন্যকথায় কাগজের ফুলেব মতো কিংবা খেলনার ফলের মতো। রূপে-লাবণ্যে মূল গ্রন্থের মতো প্রমূর্ত হয়ে উঠলেও বচয়িতার প্রাণের কথা যে-প্রাণের ভাষায অভিব্যক্ত হযেছে ভিন্ন ভাষাব শব্দ প্রয়োগে ভিন্নজন তা' কখনো অবিকল করে তুলতে পারে না।

২. রামকথা ও ভারতকথা

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসাবে রাম ত্রেতাযুগের এবং কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের অবতাব। অতএব রাম কৃষ্ণের এক যুগ আগে আবির্ভূত। কাজেই রাম-কথা কৃষ্ণ-কাহিনীর আগেই চালু ছিল বলে মানতে হয়। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে আমরা রাম-কাহিনী যেভাবে পাই তাতে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় এই রামায়ণ কৃষ্ণকথার আধার মহাভারতের মূল কাহিনীধারাব পরবর্তী রচনা। উইন্টারনিজ, হপ্‌কিন্স, জেকোবী প্রভৃতি বিদ্বানের মতেও বাল্মীকি রামায়ণ মহাভারতের পরে রচিত। অবশ্য উভয় কাব্যেই গল্পে ও তত্ত্বে পরবর্তী যোজনা অনেক,—কালে কালে মুখে মুখে কাহিনী বিভিন্ন তাৎপর্যে পল্লবিত হয়ে হয়ে এবং গায়ক-কথক লিপিকর (সুত, ভাট, মাগধ) পরম্পবায় লিপিবদ্ধ ও সংযোজিত হয়ে বিপুল কলেবর লাভ করেছে। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম কাণ্ড তথা বালকাণ্ড এবং শেষকাণ্ড তথা উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির রচনা নয় তা এখন আর কেউ অস্বীকার করে না। তাছাড়াও বাল্মীকিরচিত

বলে স্বীকৃত অন্য পাঁচকাণ্ডেও প্রক্ষিপ্তাংশ কম নয় ; ভাব ও ভাষার কালিক ব্যবধান ও অসঙ্গতির চিহ্নও দুর্লক্ষ্য নয়। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ও শেষ কাণ্ড মহাভারতের কাহিনী ও তত্ত্ব প্রভাবিত। রামায়ণের ভাষা ও ছন্দ মহাভারতের প্রাচীনতর অংশের তুলনায় অর্বাচীন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভাষাতাত্ত্বিক বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' নামের ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে মহাভারতের বাসুদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্তচ্ছলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রামায়ণের কোন চরিত্রের উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায়, পাণিনির কালে বাল্মীকির রামায়ণ রচিত হয়নি বা রামকথা তখন জনপ্রিয় বা সর্বভারতীয় হয়ে ওঠেনি কিংবা গ্রন্থধৃত হয়ে প্রখ্যাত হয়নি।

মহাভারতে পাই শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার গঠনযুগের বা যুগান্তরের সন্ধিকালের কাহিনী—সেখানে যৌনজীবনে বিবাহ আবশ্যিক নয়, নারীও বহুপতিক, সমাজপতিদের অনেকেই হয় ক্ষেত্রজ নয়তো আকস্মিক মিলনজাত সন্তান, নারী তখনো বীরভোগ্যা ও হরণযোগ্যা। কুন্তী, দ্রৌপদী, জাহ্নবী, সত্যবতী, শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ভীষ্ম, বিদুর, শুক, নারদ, ব্যাস, কর্ণ প্রভৃতির জন্ম ও জীবন এ ধারণাই দান করে। মহাভারতে কালে কালে নানা তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্বলিত বহু শাখা-উপশাখা কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। ফলে মহাভারত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীন হলেও শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে গীতা মূলত মহাভারতেরই একটি অধ্যায়। পক্ষান্তরে রামায়ণ জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় একটি শ্রেয়োবাদমূলক কাব্য।

ভারতীয় শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা যখন দৃঢ়ভিত্তিক ও সুগঠিত হয়েছে, বাল্মীকির রামায়ণ তখনকার রচনা। নারীর সতীত্বই এর কেন্দ্রীয় বিষয়। সতীত্বের ও পবিত্রতার এ ধারণা আজো সমাজে অটুট ; তখন নারী মহাভারতীয় কুন্তী-দৌপদীর মতো স্বাধীন নয়। তা ছাড়া হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজ এবং ন্যায়-নীতিও রামায়ণে প্রায় মধ্যযুগীয় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। রামায়ণ একটি প্রায়-ঋজু কাহিনীর মাধ্যমে নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনবেদ হিসেবে তথা আদর্শ জীবনাচরণ শিক্ষাদান লক্ষ্যে রচিত। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। রামায়ণ মুখ্যত মানুষ ও মনুষ্যত্বের আদর্শ নায়ক রামের জীবনকথা। যখন এ কাব্য রচিত হয় তখন রাম ইষ্ট বা উপাস্য দেবতা নন। কাজেই এটি একটি শিক্ষামূলক আদর্শ কাব্য। অযোধ্যাকাণ্ডে ঈর্ষা-অসূয়া যে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি বিনাশী, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রাজনীতিক গৃহবিবাদে প্রাসাদষড়যন্ত্রে বিদেশী-বিজাতির সহায়তা গ্রহণ যে নামান্তরে পরাধীনতা বরণ এবং লঙ্কাকাণ্ডে কামুকতা ও নারীর মর্যাদা হানিজাত পাপ যে আত্মবিনাশী এবং জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও পরানুগ্রহ যে পরিণামে অকল্যাণকর তা-ই তিনটে শিথিলগ্রন্থি কাহিনী মাধ্যমে পরিব্যক্ত। প্রথমটি উত্তর ভারতের নরসমাজ, দ্বিতীয়টি দাক্ষিণাত্যের বানরসমাজ এবং তৃতীয়টি লঙ্কার রাক্ষস সমাজ সম্পৃক্ত কাহিনী। অতএব ঘটনা সর্বভারতে পরিব্যাপ্ত। এখানে কালিক প্রয়োজনে রাজার আদর্শ, ভ্রাতার আদর্শ, সাপত্ন্যের আদর্শ, স্ত্রীর আদর্শ, পুত্রের আদর্শ, মাতার আদর্শ, সততার আদর্শ, সত্যবাদিতার আদর্শ, বিচারের আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, তিতিক্ষার আদর্শ, বীরের আদর্শ, অনুচর-পরিজনের আদর্শ, ভৃত্য ও ভক্তের আদর্শ, শত্রুর আদর্শ প্রভৃতি জগতে ও জীবনে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ও আচরণীয় আদর্শসমূহ চরিত্র সমূহের ভাবে-চিন্তায় ও কর্মে আচরণে প্রতিফলিত করার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। নানা তত্ত্বের তাৎপর্যের উপকথা কণ্টকিত মহাভারতে জগৎচেতনার ও জীবনভাবনার এমন কোন স্পষ্ট ও ঋজু ধারণা মেলে না। তাই স্বীকৃত অবতার কৃষ্ণ নির্দেশিত অনুসৃতব্য শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদায় অবিসম্বাদিতরূপে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতের চেয়ে হিন্দুর ঘরোয়া জীবনে রামায়ণের প্রভাবই বেশি। যদিও বারো শতকের আগে রাম-সীতা বিষ্ণু-লক্ষ্মীর অবতার রূপে স্বীকৃত হননি এবং সম্ভবত এ কারণেই পরবর্তীকালে রাম পূজক 'রামায়েত' সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতে কালে রাম-সীতা অবতারের মর্যাদায় ও গুরুত্বে সামাজিক ও শাস্ত্রিক প্রতিষ্ঠা পান। চৈত্রমাসে রামনবমী উপলক্ষে পূজা এবং রামমূর্তি ও রামমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বারো শতক থেকেই চালু হয় বলে বিদ্বানদের ধারণা। 'মহাভারত' শাস্ত্রগ্রন্থ রূপে সম্মানিত বলে রচয়িতা ব্যাসকে কবিরূপে চিহ্নিত বা অভিহিত করা হয় না এ জন্যেই

এবং নিছক কাব্যরূপে রচিত বলেই আর হয়তো ত্রেতাযুগের অবতার রামকথাব রচয়িতা বলেই বাল্মীকিকে আদি কবির সম্মান দেয়া হয়। রামকথা কৃষ্ণকথার চেয়ে প্রাচীনতর হলেও বাল্মীকি রামায়ণ যে মূল মহাভাবতের পরবর্তী রচনা সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

৩. রামকথার উৎস ও কাল

বাল্মীকি-রামাযণ বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে উত্তর-পূর্বে কাহিনীগত ও বর্ণনাগত পার্থক্য নিয়ে চালু রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উত্তর দক্ষিণাঞ্চলে চালু রামায়ণটিই অধিকতর প্রামাণ্য বা মূলানুগত বলে কোন কোন বিদ্বানের বিশ্বাস অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে গৌড়ীয় পুথি, উত্তরাঞ্চলের উদীচ্য পুথি ও দক্ষিণাত্যের পুথি দাক্ষিণাত্যে অধিক। বাল্মীকি রামায়ণের রচনাকাল ২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দ অবধি বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। বাল্মীকি রামায়ণ অনুষ্টপ ছন্দে রচিত ২৪০০০ শ্লোকে গ্রথিত। এগুলোর মধ্যে ৬০০০ শ্লোকই বাল্মীকির রচনা বলে পণ্ডিত জেকোবী মনে করেন। রামায়ণ আঙ্গিকে, আদর্শবোধে, সততায়, ন্যায়পরায়ণতায়, কতর্ব্যনিষ্ঠায়, ধৈর্যে, অধ্যবসায়ে এবং বীর্যে ও চরিত্রে নরশ্রেষ্ঠ বামের জীবনকথা। রাম পুরাণের ও মহাভারতের প্রভাবে ব্রহ্মও অবতার রূপে আর নানা তত্ত্বে ও তাৎপর্যে চিত্রিত হয়েছেন প্রথম ও শেষ কাণ্ডে—যা পরবর্তী যোজনা বলে স্বীকৃত।—এ দুটোর প্রভাবেই রাম বিষ্ণুর অবতার ও ব্রহ্ম রূপে পূজ্য হয়েছেন বারো শতক থেকে। বিষ্ণুর অবতার রূপে তিনি ভক্তিবাদেরও উৎস হয়েছেন।

পদ্ম, অগ্নি, মৎস্য, কূর্ম, ভাগবত, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্ম, কল্কি, জৈমিনি ভারতে রাম-কথা বর্ণিত। এবং বিষ্ণুপুরাণে ও বায়ুপুরাণে রাম বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত হন।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা রামকথার বিভিন্ন ধারার ও রূপকার্থের আলোচনা করেছি। বেবর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিদ্বানরা আদি রূপকার্থের সমর্থক। অন্য রূপকার্থেও রামায়ণ পরবর্তীকালে রচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেমন অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ। বানরেরা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়। আর্যদের তুলনায় অবয়বে শ্রীহীন বলেই তারা বানর নামে এবং লঙ্কাবাসীরা রাক্ষস নামে অবজ্ঞায় অভিহিত অথবা তাদের 'টোটেম'-'টেবু' অনুযায়ী তারা যথাক্রমে বানর ও রাক্ষস রূপে ছিল পরিচিত। যা হোক বৌদ্ধ রচিত 'লঙ্কাবতার সূত্রে' (রচনাকাল ২য়-৩য় শতক), দাক্ষিণাত্যবাসী জৈন হেমচন্দ্র রচিত রামায়ণে (১২০০ শতক) কিংবা বৌদ্ধ লেখক ধর্মকীর্তির হাতে স্বজাতি রাবণই উত্তর ভারতের রামের চেয়ে মহত্তর ব্যক্তির রূপে চিত্রিত ও কীর্তিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

৪. অদ্ভুত-বাশিষ্ট-অধ্যাত্ম রামায়ণ

অন্য তিন ধরনের রামায়ণ মরমীয়াবাদের ও ঔপনিষদিক দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রসার সঞ্জাত। যেমন অদ্ভুত রামায়ণ বাল্মীকিব রচনা হতেই পারে না। অথচ বাল্মীকির নামে ১৩৬০ শ্লোকে রচিত ও সাতাশ সর্গে বিভক্ত এই অদ্ভুত রামায়ণে সাংখ্য যোগ প্রভৃতি তত্ত্বের আবরণে তান্ত্রিক শাক্ত ভক্তিবাদ বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সীতা রাবণকন্যা। রাবণ এখানে সহস্রশির বা সহস্রানন এবং রাবণ হন্ত্রী হচ্ছে সীতা আর রাম হচ্ছেন ব্রহ্ম। অধ্যাত্ম রামায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে। এখানে মহাদেব পার্বতীর কাছে রামেব ব্রহ্মত্ব ও তৎসংক্রান্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত এটি বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের রামাশ্রিত ব্যাখ্যা। যোগবাশিষ্ট রামায়ণও বাল্মীকির নামে চলে। এতে ঋষি বশিষ্ঠ উপদেশচ্ছলে বিষয়বিরাগী রামচন্দ্রকে কর্তব্যে প্রবর্তনা দিয়েছেন ষড়দর্শনের নানাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। ঋগ্বেদীয় আর্যেরা বিজেতা হলেও ভারতে ছিল নিতান্ত সংখ্যালঘু। ফলে দেশী বিশ্বাস সংস্কারের শাস্ত্র সমাজের ও রীতি-রেওয়াজের প্রভাব তারা এড়াতে পারেনি। জন্মান্তরবাদ, নারী, পশু ও বৃক্ষদেবতার পূজা, মূর্তি ও মন্দির উপাসনা, সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র এবং দেহতত্ত্ব ও ধ্যান প্রভৃতি তারা অতি অল্পকালের মধ্যেই গ্রহণ করে এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রসারের পরিণামে উপনিষদ ও পুরাণ প্রভৃতি রচিত হতে থাকে। এই ধারার তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার

উত্তর স্বরূপ উপনিষদ ও পুরাণের সংখ্যা এবং কলেবর যেমন স্ফীত হতে থাকে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ভাষ্য এবং তত্ত্ব প্রতীক উপকথাও তেমনি বহু বিচিত্র এবং পরস্পর সঙ্গতিহীন ও জটিল হতে থাকে। বাল্মীকি রচিত মূল জাগতিক-বৈষয়িক জীবনকথাও কালে কালে ও ক্রমে ক্রমে মানবিক তত্ত্ব প্রবণতার ফলে অদ্ভুত, অধ্যাত্ম ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণের রূপ পায়। 'এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার। কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার'-কৃত্তিবাস।---কৃত্তিবাসও জৈমিনি ভারত, নানা পুরাণ বা লোক প্রচলিত উপকথা থেকে কাহিনী তাঁর রামায়ণে সংযোজন করেছেন বা পরে কেউ কেউ তাঁর গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। বলেছি মোটামুটি বারো শতকের আগে থেকেই রাম-সীতা বিষ্ণু-লক্ষ্মীর অবতার রূপে দ্বাপরযুগের পূর্ববর্তী ত্রেতাযুগের অবতার রূপে কিংবা বৈদান্তিক ব্রহ্মরূপে তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পুরাণে ভাগবতে পেতে থাকলেও বারো শতকের আগে রাম কৃষ্ণের মতো উপাস্য ও পূজ্য হয়ে ইষ্ট দেবতা হয়ে ওঠেননি। কিন্তু বৈদান্তিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অবলম্বন হয়ে রাম পুরাণাদির আবশ্যিক অংশ রূপে সমাজমনকে প্রভাবিত করেন। এবং বারো শতক থেকে ভক্তিবাদের অবলম্বন হয়ে রাম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের সমূর্তি উপাস্য ও ইষ্ট দেবতা হয়ে ওঠেন। 'রামায়েত' সম্প্রদায়ের নয় শুধু মধ্ব, রামানুজ, রামানন্দ প্রভৃতি সন্ত প্রবর্তিত ভক্তিমতবাদেও রাম-সীতা-হনুমান সাধন-ভজনের অবলম্বন হলেন। তবু বাঙলাদেশে রাম ইষ্ট দেবতা বা উপাস্যের মর্যাদা কখনো সামাজিক ভাবে পাননি। এবং সংস্কৃতে অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত রচনা করেছেন বটে, কিন্তু সম্ভবত কৃত্তিবাসের বাঙলা রামায়ণের প্রভাবে অথবা বাল্মীকি রামায়ণ কাহিনীর শ্রুতিফলে বাঙালীর ঘরোয়া জীবনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা চরিত্র গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালী হিন্দুর অন্তর্জীবন ও পারিবারিক সামাজিক আচরণে আজো রাম-লক্ষ্মণ-সীতার আদর্শে নিয়ন্ত্রিত।

৫. রামকথার বিশ্বরূপ

মৃত্যুর কিছুকাল আগে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামকথার উৎস সম্বন্ধে নতুন কথা বলেছিলেন, তাতে স্বজাতির ঐতিহ্যগর্বী হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে সুনীতিকুমারের নিন্দা করেন এবং তাঁর উচ্চারিত তথ্য ও তত্ত্বের প্রতিবাদে মুখর হন। বই লিখে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছে ছিল সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু আয়ুতে কুলোয়নি। সুকুমার সেন তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে 'রামকথা' রচনা করেছেন। আমরা এখানে সুনীতিকুমারের বক্তব্যের সারাংশ তুলে দিলাম ঃ

"রামায়ণী কাহিনীর মূল উৎস কোথায় তাহা সঠিক নির্ধারণ করা সহজ নহে। আমরা বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকেই মূল বলিয়া মানিয়া রাখিয়াছি বটে কিন্তু এখনো এদেশে ও বৃহত্তর ভারতে বাল্মীকির রামায়ণ হইতে অল্প বিস্তর বিভিন্ন বহু রামায়ণী গল্প প্রচলিত আছে। বস্তুত রামায়ণী গল্প বিভিন্ন গল্পের সংমিশ্রণে, বহু উৎস হইতে রস আহরণ করিয়া বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই গল্পে যে বহু জোড়া-তাড়া আছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে আর্যদিগের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই অনার্য জাতিসমূহের মধ্যেও এই গল্প প্রচলিত ছিল। সম্ভবত অনার্যেরাই এই গল্পের আদি জন্মদাতা। অন্তত পালি 'দশরথ জাতক' পাঠে মনে হয় যে, তখনও গল্পটি স্পষ্ট আকার ধরিয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও নানাদিক হইতে অন্য নানা গল্পের দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি সাধন চলিতেছিল। ইহা খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত বৎসর পূর্বেকার কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই গল্পের মালমসলা হাতে পাইয়া ইহাকে একটি নতুন রূপ দান করিলেন ছন্দে ও ভাবৈশ্বর্যে যাহা অপরূপ। সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ইহাই প্রথম সজ্ঞান শিল্পসৃষ্টি প্রচেষ্টা। এই ঘটনাটা আন্দাজ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ রামায়ণের নায়ককে বিষ্ণু-অবতার রূপে খাড়া করিয়া অন্যান্য বীর, বানর, রাক্ষস অযোধ্যার রাম ও লঙ্কার রাবণকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া একটি মহাকাব্য গড়িয়া তুলিলেন। এই সংস্কৃত মহাকাব্য বাল্মীকির নামের সহিত যুক্ত হইল। ইহাই রামায়ণের আদর্শ গল্প বলিয়া বিবেচিত হইলেও অন্যান্য রামায়ণী গল্পও চলিতে লাগিল। এই কাহিনী জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল এবং নানা দেশে বিভিন্ন গল্প

লইয়া ইহার বিভিন্ন পাঠান্তর দেখা যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রচারিত রামায়ণে যে সকল ঘটনা বিবৃত হয় নাই এমন সকল ঘটনাও ভিন্ন ভিন্ন রামায়ণী গল্পে ক্রমশঃ যুক্ত হইয়া গেল। এই সকল পৃথক রামায়ণী গল্প আজিও ভারতবর্ষে, হিন্দুচীনে ও দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত।"[১]

"প্রাম্বানানে রামায়ণী চিত্রাবলীর শিল্প-কলার দিক দিয়া প্রাধান্য ছাড়া ভারতীয় কথাসাহিত্য ও পুরাণ কাহিনীর দলিল স্বরূপেও এগুলি অমূল্য। এগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শিল্পীরা বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়িয়া অন্য কোনও প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীকেই চিত্রবদ্ধ করিয়াছিলেন।"[২]

প্রাচীনতর ভারতীয় মাইথলজি-তে রাবণের অনুরূপ রূপকল্পনা দেখা যায় না, প্রাচীন গ্রীক সৃষ্টি-পুরাণকথায় কয়েকটি চরিত্রেব [চারমাথাওয়ালা ফেনেস আর শতভুজ ব্রিয়ারিয়াস প্রভৃতি] কতিপয় আধা মানুষ মানবের রূপকল্পনার সঙ্গে রাবণের রূপকল্পনার একটা মিল দেখতে পাওয়া যায় আর রামায়ণ মহাকাব্য গড়ে উঠবার আগেই গ্রীসের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল।[৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমানে বাল্মীকি রামায়ণকথার আদি রচয়িতাও সম্ভবত চ্যবনমুনি।

বাঙলাভাষায় আদি রামায়ণ বচক কৃত্তিবাস। তিনি বাল্মীকি রামায়ণ হুবহু তর্জমা করেননি। গ্রহণে বর্জনে সংযোজনে তা বলতে গেলে মৌলিক রচনাই। তাছাড়া আদর্শে, উদ্দেশ্যে ও বর্ণনায়ও স্বকীয়তা সর্বত্র প্রকট। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনেক অংশ বর্জন করেছেন, অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ যোগবাশিষ্ট রামাযণ ছাড়াও জৈমিনিভারত ও পুরাণ থেকেও স্বকল্পিত কাহিনী যোজনা করেছেন। অথবা গায়ক কথক লিপিকররা তাঁর মূল রচনার সঙ্গে কালে কালে সংযোজিত করেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণেব সব কাণ্ডেই বর্ণনাগত ও ভাষাগত আঞ্চলিক ও কালিক বিকৃতি, সংযোজন, বর্জন, সংক্ষেপণ প্রভৃতি এতো অধিক ও বিচিত্র যে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনায় আজ অবধি কেউ তেমন নির্ভরযোগ্য সাফল্য লাভ করেননি। এমনকি সম্পাদকেবা কেউ কেউ অসাধ্য কার্য দেখে হতাশ হয়ে সম্পাদনাব ইচ্ছা ত্যাগও করেছেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসের রচনা কতটুকু আছে তা নির্ণয় কবা আজ আর সম্ভব নয় বলে কোন কোন বিদ্বানের ধারণা। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের রচনার মূল রূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন তাঁর সম্পাদিত রামায়ণে। কৃত্তিবাস-পরবর্তী বামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে কেউ আর সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ বা বচনা করেননি বললেই চলে। বিভিন্ন কাণ্ডের অনুবাদ অনেকেই করেছেন। তাঁরাও কেউ বাল্মীকিকে নিষ্ঠভাবে অনুসবণ করেননি।

ডক্টর সুকুমার সেন 'বামকথার প্রাক্ ইতিহাস' নামে ডক্টর সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় ক্রমে যে গবেষণা পুস্তিকা বচনা করেছেন তা থেকে বোঝা যায় দিওয়ানা মদিনার মতো এক অজ্ঞাতনাম রাজমহিষীর সৎসন্তান বিদ্বেষই ছিল এ কাহিনীর মূলে। কালে তা পল্লবিত ও কলেবরে স্ফীত হয়ে দশরথ বাজার [বৌদ্ধ জাতক কাহিনীতে যার জড় মেলে—৪৬১ সংখ্যক জাতক দশরথ ও তাঁর পুত্রগণ] উপদেশাত্মক ক্ষুদ্র গল্পে সীমিত রয়েছে। এরই তাত্ত্বিক অংশ মেলে সুত্তপিটকেব খুদ্দক নিকায়ের তেরোটি শ্লোকে। এ মূল কাহিনীর সঙ্গে পরে তত্ত্বকথার আধাররূপে আরো দুটো গল্প সংযোজিত হয়েছে—বানরকুলের / বালি-সুগ্রীবকাহিনী এবং লঙ্কার রাক্ষস রাবণকাহিনী। কালে নায়ক-নায়িকা রূপে রাম-সীতা সূত্রে গ্রথিত হয়ে তা মহাকাব্যের আকার ধারণ করেছিল বাল্মীকির হাতে। কিন্তু মানতেই হবে বাল্মীকিব আগেই অন্তত মুখে মুখে কাহিনী পল্লবিত ও জটিল হয়ে সুদীর্ঘ হয়েছিল বহুমনের কল্পিত সংযোজনে ও বহুজনের বিবৃত অবদানে। তা-ই সমুদ্রব্যাপী নাগ-রাবণ কাহিনীসহ পরে ভারত বহির্ভূত বৌদ্ধ জগতে স্মৃতি বিভ্রাটে সংযোগ সূত্রের অভাবে ও অজ্ঞতার ফলে নানা বিকৃতি লাভ করেছে কাহিনী বিন্যাসে, পাত্রপাত্রীর নামে ও পরিণামে। স্বদেশেও কালিক ব্যবধানে এবং সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে রামকথা কাহিনীগত নানা

১. পরিচয় : সুনীতি স্মারক সংখ্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ সন, পৃঃ ২১৮।

২. পরিচয় : সুনীতি স্মারক সংখ্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ সন, পৃঃ ২২০।

৩. পরিচয় : সুনীতি স্মারক সংখ্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ সন, পৃঃ ২৪০।

বৈচিত্র্যে ও তাত্ত্বিক বিভিন্নতায় লঘু-গুরু বিকৃতি লাভ করেছে। সুকুমার সেন রামকথার আভাস পেয়েছেন ঋকবেদের একটি শ্লোকে (১০-৩-৩ রামকথার প্রাক ইতিহাস পৃ ৪)। শ্লোকের অর্থ 'ভদ্রার পাশাপাশি একা এগিয়ে গেলেন। ভগিনীর পিছনে প্রেমিক চলছে। সমুজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি জ্যোতির্ময় আভা দিয়ে রামকে বিদায় দিলেন।'- সুকুমার সেনের ধারণায় ঋকবেদীয় ভাবনায় রামকথার তিনজনের ভাইবোন ও বাপের অবস্থা ছবি জেগেছে ; দশরথ যেন ছেলে-মেয়েদের বনে পাঠাচ্ছেন। (পৃঃ ৪)।

মহাভারতের শান্তিপর্বে, দ্রোণপর্বে, বনপর্বে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে, কালিদাসের রঘুবংশে, ভট্টিকাব্যে, অভিনন্দের রামচরিতে রামকথার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঈষৎ বিভিন্নতায় ও তাৎপর্যে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ পালি-প্রাকৃতে বা সংস্কৃতে তিনটিতে, জৈন সংস্কৃত ভাষায় একটিতে এবং প্রাকৃতে কয়েকটি কাব্যে কাহিনী ভিন্ন আকারে, নামে ও তাৎপর্যে বর্ণিত রয়েছে।

অতএব, রামকথার তিনটে কাহিনী অর্থাৎ অযোধ্যার ঘরোয়া বিপর্যয়, বানররাজের গৃহবিবাদ এবং রাবণের পাপজনিত পরিণাম কালে কালে এবং মুখে মুখে বিবর্তিত, বিস্তৃত এবং নানা উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ও একীভূত হয়ে ব্রাহ্মণ্য বাল্মীকি রামায়ণে ও জৈন-বৌদ্ধ দশরথ ও রাম-রাবণ কাহিনীতে সংহত হয়েছে। পরে ব্রাহ্মণসমাজেও রামায়ণ বিভিন্ন তাৎপর্যে স্থানিক ও কালিক বিবর্তন, বিকাশ ও বিকৃতি লাভ করেছে। —অহীরাবণ মহীরাবণ ও সীতাতত্ত্ব এবং যোগবাশিষ্ঠ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ তার প্রমাণ। এমনকি, বাঙলা রামায়ণের তরণীসেন প্রভৃতিও তার সাক্ষ্য। এ কাহিনী তিনটে সর্বমানবিক কোন মটিফের অন্তর্গত। সে অর্থে এতে রয়েছে মানবিক উত্তরাধিকার ও আন্তর্জাতিক-আন্তর্দেশিক ঐক্য ও ঐতিহ্য। তাই ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, "একথা ঠিক যে রামকথাগুলির মালমশলা এদিক ওদিক বাইরে থেকে এলেও গাঁথুনি হয়েছিল ভারতবর্ষের জলহাওয়ায় ও মাটিতে। তবে সে গাঁথুনি কোন একজন কবির কণ্ঠে অথবা লেখনীতে হয়নি, বহুজনের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে লালিত হয়ে এসেছিল। সেইজন্যই রামকথার এত বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্র রস।" (পৃঃ ৫৬ রামকথার প্রাক ইতিহাস)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ রচয়িতা হিসেবে চ্যবন মুনির উল্লেখ করেছেন। সুকুমার সেনের মতে প্রচেত বা বরুণপুত্র হচ্ছেন ভৃগু। ভৃগুর অপত্য মাত্রই ভার্গব। এবং ভার্গব মাত্রই প্রাচেতসও। কালিদাস রামায়ণের কবিকে তাই প্রাচেতস বলেছেন। ভৃগুরা সঙ্গীত শিল্পী। এবং চ্যবন বাল্মীকির পূর্বপুরুষ বা পিতা ; সেহিসেবে চ্যবনও গোত্রনাম। মহাভারতে রামকথার বক্তা মার্কণ্ডেয় ও ভার্গব। অতএব, বাল্মীকি একাধারে ভার্গব ও চ্যবন- চারণ কবি, গীতিকার ও গায়ক।

৬. রামায়ণ ও অনুবাদকগণ [ষোল, সতেরো ও আঠারো শতক]

কৃত্তিবাসকে আমরা পনেরো শতকের কবি বলে জেনেছি। তারপরে গোটা ষোল শতকে আমরা আর কোন রামায়ণ রচয়িতার সন্ধান পাইনে। এর তিনটে কারণ অনুমান করা চলে ঃ এক, ষোল শতকে যাঁরা রামায়ণ রচনা করেছেন, উৎকর্ষের অভাবে তাঁদের রচনা লোকপ্রিয় হয়নি, বর্ণনাগুণে ও কাব্যরসে হৃদয়গ্রাহী কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে ষোল শতকের কোন কাব্যই কথক, গায়ক, পাঠক ও লিপিকরের স্বীকৃতি পায়নি। দুই, চৈতন্য-চেতনার প্রবল প্রভাবে বাঙলাদেশে যখন 'রাধা ছাড়া সাধা নেই, কানু ছাড়া গীত নেই', তখন সাহিত্যের আর সব শাখার প্রতি হিন্দুর আকর্ষণ বিলুপ্ত। তাই চর্চা বন্ধ এবং নতুন উদ্যোগ অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে সাধারণভাবে ষোল শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদে হিন্দুরা মহাভারত কিংবা মঙ্গলকাব্যও বিশেষ লেখেননি। এ সময়ে যেন চৈতন্যের প্রেমবাদ ও তজ্জাত রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়তত্ত্ব বাঙলার অবৈষ্ণব হিন্দুকেও অভিভূত ও বিমূঢ় রেখেছিল। তিন, সৈয়দ নাসির উদ্দীন নুসরত শাহর (১৫৩২ খ্রীঃ) পর থেকে বাঙলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা দেখা দেয়। আবদুল বদর ওর্ফে গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, শেরশাহ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বে শামসুদ্দীন মুহম্মদ গাজী, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর, তাজ খান

করবানী, সোলেমান, দায়ুদ ও মুঘল শাসনে এখানে নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত অবস্থা ছিল না, বস্তুত ১৬১৭ সনেই মুঘলশাসন এদেশে সুদৃঢ় ও নিষ্কণ্টক হয়। তখনো গোড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজে শাস্ত্রপতি ও সমাজনেতাদের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসম্পৃক্ত কাহিনীর বাঙলায় অনুবাদ পাপকর্ম বলে বিবেচিত। স্মর্তব্য যে কৃত্তিবাসই বিধর্মীর রাজশক্তির প্রশ্রয়প্রাপ্ত প্রথম দ্রোহী অনাচারী ব্রাহ্মণ যিনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, অন্যেরা— মালাধর বসু, পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ সবাই কায়স্থ এবং বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী রাজশক্তির আশ্রিত। কাজেই ১৫৩২-১৬১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সাহিত্যের অনুবাদ অনুকূল পরিবেশের [রাজশক্তির প্রশ্রয়ের] অভাবে না হওয়ারই কথা, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দীর রচনা হোসেন শাহের আমলের।

আবার সতেরো শতকেই যখন চৈতন্য-চেতনা প্রাথমিক উচ্ছ্বাসবিরহী, চৈতন্য মতবাদীরা দলীয় কোন্দলে আসক্ত এবং দৃঢ়মূল মুঘলশাসনে প্রশাসনিক, সামাজিক ও আর্থিক জীবন স্থিতিশীল আর লোকায়ত দেবতার পূজা-পার্বণ গণমানবে প্রসারমান, তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষণের সচেতন প্রয়াসে উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের শিক্ষিত মানুষ লৌকিক দেবতার প্রভাবরোধ লক্ষ্যে গীতা-স্মৃতি-সংহিতা সম্পৃক্ত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতির বাঙলামাধ্যমে চর্চা ও প্রচার প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। বৃহত্তর স্বার্থবশে বঙ্গানুবাদ তখন শাস্ত্রবিরোধী বলে মনে করা হয়নি। তখন হয়তো সর্বনাশের মুখে অর্ধেক ত্যাগ করার সুবুদ্ধি সমাজকে চালিত করেছে। তাই সতেরো-আঠারো শতকে আমরা রামায়ণ মহাভারতের এতো অনুবাদকের সন্ধান পাচ্ছি।

সতেরো শতকে যাঁরা সম্পূর্ণ বা বিভিন্ন কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে চন্দ্রাবতী, নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য, কৈলাস বসু, রামশঙ্কর দত্ত (অদ্ভুতাচার্য), দ্বিজ লক্ষ্মণ, দ্বিজ ভবানী দাস, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যাম, গুণরাজ প্রভৃতির পুথি সংগৃহীত ও নাম ইতিহাসভুক্ত হয়েছে। আর আঠারো শতকে পাই জগৎরাম, রামানন্দ ঘোষ, শঙ্কর চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র, দ্বিজ সীতাসুত, কৃষ্ণদাস, রামগোবিন্দ দাস, ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গারাম দত্ত, দ্বিজ সাফল্য রাম, দ্বিজ ধনঞ্জয়, দ্বিজ রাজীব, কুমুদ দত্ত, দ্বিজ পঞ্চানন্দ, দ্বিজ মানিকচন্দ্র, দ্বিজ রামচন্দ্র, দ্বিজ শিবরাম (বন্দ্যোপাধ্যায়), দ্বিজ শম্ভুসুত, উৎসবানন্দ, রামনারায়ণ, দ্বিজ দুর্গারাম, কল্যাণদেব, মনোহর সেন, জীত ঘটক (ইনি মহাভারত প্রণেতাও), দ্বিজ দর্পনারায়ণ, লক্ষ্মীরাম, দ্বিজ রঘুরাম, দ্বিজ রুদ্রদেব, দেবীনন্দন, দ্বিজ ব্রজসুন্দর, লোকনাথ শর্মা, সারদানন্দ, বংশীমোহন প্রভৃতির রচিত বিভিন্ন কাণ্ড পাওয়া গেছে। এদের কেউ কেউ গায়েন কথক মাত্র ছিলেন বলে মনে হয়। এসব গ্রন্থ হয়তো স্থানীয়ভাবে গীত ও পঠিত হয়েছে। এবং কালে বিলুপ্ত হবার পথে ছিল।

অন্য প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, মানুষের মন-মনন, রুচি-সংস্কৃতি ও আচার-সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই বহতা নদীর মতো। চলমান জীবন যতই মন্থর হোক, পরিবর্তন বিবর্তন থাকেই। নতুন সূর্যোদয়ে জীবনের নতুন বাঁকে নতুন কিছু অর্জিত ও সঞ্চিত হয়ই। স্থানান্তরে ও কালান্তরে সে পরিবর্তন, বিবর্তন বা বিকাশ-বিকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রামায়ণ-কাহিনীর ব্যাপারে আমরা তা দেখতে পাই। বাল্মীকি রামায়ণ যে সংস্কৃত ভাষাতেই কালিক বিবর্তন ও স্ফীতি লাভ করেছিল তা নয়, আধ্যাত্মিক ও যোগতাত্ত্বিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে কাহিনীও বিবর্তিত ও ভিন্নতর হয়েছে। বাঙলা রামায়ণেও আমরা বিভিন্ন মন-মননের এবং স্থানের ও কালের প্রভাব লক্ষ্য করি। এখানেও নানা তাৎপর্যে কাহিনী উদ্ভাবিত, বিকৃত, পল্লবিত, বর্জিত ও সংযোজিত হয়েছে।

অহীরাবণ, মহীরাবণ, তরণীসেন, পাতালপুরীর সীতা নয় কেবল, চৈতন্য প্রভাবে বিনয়, সহিষ্ণুতা, প্রেম-ভক্তি প্রভৃতিও মন-মননের রুচি-সংস্কৃতির লাবণ্য বহুলাংশে বাড়িয়েছে, বাঙালীর জীবন-জীবিকার পদ্ধতির ও বাঙলার পরিবেষ্টনীর প্রভাবও ছায়া ফেলেছে সব রচয়িতার সব রকমের রচনায়। বাঙালীর চাওয়া-পাওয়ার, নীতি-রীতির গাঢ় বা তরল ছাপ পড়েছে সবার সব লেখায়। কোন ভাব কর্ম-আচরণই ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনা মুক্ত থাকতে পারে না। তাই আমরা রামায়ণেও

খণ্ড কবিতা রূপে 'রায়বার' নামের রচনার সাক্ষাৎ পাই। ডক্টর সুকুমার সেন রায়বার 'রাজদ্বার' জাত বলে মনে করেন, তাঁর মতে 'রায়বার শব্দের অর্থ, রাজদ্বারের অর্থাৎ রাজসভার বর্ণনা এবং রাজস্তুতি।' (বা-সা-ই-অপ/১৯৬২ সন, পৃঃ ৪০৫)।

যুদ্ধকাব্যে এবং প্রণয়োপাখ্যানে আমরা 'রায়বার' প্রেরণ দেখেছি। সেখানে আমরা রায়বারকে রাজদূত বা রাজার মুখপাত্র (Envoy) বা এক রাজার বক্তব্য বা প্রস্তাব অন্য রাজার কাছে পেশ করবার জন্যে প্রেরিত ব্যক্তি বা বক্তা কিংবা বাণীবাহক রূপে পাই। আঠারো উনিশ শতকে রামায়ণের বিভিন্ন পাত্রের যেমন অঙ্গদ, বিভীষণ, কালনেমী প্রভৃতির রায়বার লিখেছেন রাঢ়ের মল্লভূমের ব্রাহ্মণ কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী, (১৭০১-০২) রচক ফকিররাম কবিভূষণ, জয়রামপুরনিবাসী রামনারায়ণ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মীপুরনিবাসী কাশীরাম, দ্বিজ তুলসী, মতিরাম, খোশাল শর্মা, জগন্নাথ দাস, আমুদাননিবাসী দ্বিজ দুলাল প্রভৃতি (বা-সা-ই/অপ, পৃঃ ৪০৫-০৬)। আঠারো-উনিশ শতকে আরো এক প্রকার খণ্ড কাহিনী পালাগান রূপে চালু হয়েছিল, যেমন শিব রামযুদ্ধ, সহস্রমুণ্ড রাবণ বধ, ইন্দ্র-দশরথ, রাবণ কন্যা সীতা, লক্ষ্মণভোজন, তরণীসেনের যুদ্ধ, মহীরাবণ বধ, নরমেধযজ্ঞ প্রভৃতি প্রণেতা বাল্মীকি পুরাণ-পূর্বোক্ত দ্বিজ দয়ারাম, দ্বিজ সর্বানন্দন, দ্বিজ লক্ষ্মণ, দ্বিজ সীতাসুত প্রভৃতি অনেকে এ সবের রচয়িতা। বাঙলায় রামকথার ধর্ম বর্ণ ও কাল নিরপেক্ষ ফলশ্রুতি হচ্ছে জ্ঞাতিদ্রোহিতার পরিণামচেতনা ও ঘৃণা—ঘরের শত্রু বিভীষণ, নারীঘটিত ক্ষমার অযোগ্য পাপাচার আর অহঙ্কারের পরিণাম চেতনা। 'এক লক্ষ পুত্র যার সোয়া লক্ষ নাতি— কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি।'—রাবণের অনিবার্য চিত্ত-ভীতি বা বিভীষিকা। এবার কয়েকজন কবি সম্বন্ধে নানা সূত্রে জানা কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। অনেকের পুঁথি অপ্রকাশিত কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নেই এঁদের সম্বন্ধে।

১. **অদ্ভুতাচার্য বা নিত্যানন্দ আচার্য**—অদ্ভুতাচার্য ভণিতায় ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণেরও অনুসরণে রামকথা রচনা করে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণে সহস্রমুণ্ড রাবণের কাহিনী বিধৃত ছিল। মূলত বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ হলেও অদ্ভুত রামায়ণও অনুসৃত বলেই বটু বা বড়ু নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য ভণিতায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'অদ্ভুত আচার্যের কবিত্ব মধুর ভারতী' অথবা 'রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ। নিত্যানন্দের অদ্ভুত আচার্যনাম তাহার কারণ'। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য এবং মায়ের নাম মেনকা। আধুনিক পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগনার সাঁতোলের নিকটবর্তী করতোয়া তীরে অমৃতকুণ্ডা গাঁয়ে ছিল তাঁর নিবাস। (করতোয়া কূলে বাড়ী অমৃতকুণ্ড গ্রাম)। সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর প্রতিপোষক। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 'নিত্যানন্দের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দের শেষ।' (বা-সা ই, অপ-পৃঃ ১২৩)—অদ্ভুতাচার্য রামকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রামায়ণ রচনা করেছেন বলে দাবি করেছেন—'স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল রঘুপতি।' নিত্যানন্দ আচার্যের তিনপুত্র জয়ানন্দ, বিজয়ানন্দ এবং শিবানন্দও সম্ভবত রামায়ণ গায়ক ছিলেন—'তিন ভাইকে এক বর দিল রামচন্দ্র' নিত্যানন্দ তাঁর কাব্যে অনেক লোকায়ত রাম-সীতা কাহিনী সংযোজন করেছেন।

২. **চন্দ্রাবতী**—সতেরো শতকের মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস (চক্রবর্তী)। তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতী অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বন গাথার বা গীতিকার আকারে রামকথা রচনা করেছিলেন। চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিগত প্রেম ও তার ব্যর্থতা দিয়ে রচিত করুণ রসের শ্লোকগাথা চন্দ্রনাথ দে সংগৃহীত ও দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকায় বিধৃত রয়েছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণগাথাও পূর্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গাথার সংগ্রাহক চন্দ্রনাথ দে এবং সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন। চন্দ্রাবতী সম্ভবত বাঙলা ভাষায় দ্বিতীয় মহিলা কবি প্রথম কবি চৈতন্যদেবের কালের মাধবী। রাধাকৃষ্ণপদরচয়িতা হরিধরের ঝি (কন্যা) আঠারো শতকের বলে মনে হয়। চন্দ্রাবতী রচিত এই গাথা নারীসমাজেরই সম্পদ, তারাই গায় ও শোনে। এটি অদ্ভুতরামায়ণের স্বাধীন ও সংক্ষিপ্ত অনুসৃতি অথবা লোকায়ত রামকাহিনী—অনুবাদ নয়। মুখে মুখে চালু এই গাথার ভাবে ও কাহিনীতে চন্দ্রাবতীর মূল রচনার কতটুকু রয়েছে, তা আর বলবার উপায় নেই। ভাষা নিঃসন্দেহে

আধুনিক। মনসার ভাসান এবং মলুয়া ও কেনারাম দস্যু নামের গাথা চন্দ্রাবতীর রচনা বলে অনুমিত হয়।

৩. সতেরো শতকে **কবি কৈলাস বসু**, ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সংস্কৃতে রচিত অদ্ভুতরামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন। রাম-শঙ্কর, দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানী দাস, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

৪. ঢাকার মানিকগঞ্জের অধিবাসী **রামশঙ্কর দত্ত রায়**। ইনি কবিরাজ বা চিকিৎসক ছিলেন—'পদবন্ধ করি কহে ভিষক শঙ্কর।' ইনি বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে ইচ্ছে মতো কাহিনী গ্রহণ করে রামায়ণ রচনা করেন।

৫ **দ্বিজ লক্ষ্মণ**—অধ্যাত্ম, যোগবাশিষ্ঠ ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী নিয়ে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচিত জনপ্রিয় পালা 'শিব-রামের যুদ্ধ'-এর একটি প্রতিলিপি ১০৬১ শকাব্দের বা ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দের। অপর একটি পুথির লিপিকাল ১১০৫ বঙ্গাব্দ (১৬৯৮-৯৯)। অতএব কবি যে সতেরো শতকের তাতে সন্দেহ নেই।

৬. **ঘনশ্যাম দাসের** একখানি পুথির প্রতিলিপির সন ১০৩৫ বঙ্গাব্দ বা ১৬১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই কবি সতেরো শতকের বলে অনুমান করি। ঘনশ্যামের সীতার বনবাস জৈমিনী ভারত থেকে নেয়া।

৭. **দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ** কৃত্তিবাসের একই বংশে উদ্ভূত বলে অভিহিত। তাঁর রচিত রামলীলার পুথি সংগৃহীত হয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়ও ছিলেন এ বংশীয়।

৮. **গুণরাজ খান** (ষষ্ঠীবর দত্ত) মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত রামকথা অনুসরণে পাঁচালী রচনা করেছিলেন সম্ভবত সতেরো শতকেই।

৯. **দ্বিজ জগৎরাম**—আঠারো শতকের শেষ পাদে (১৭৯১ খ্রীঃ) জগৎরাম রায় তাঁর পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করেছিলেন। পঞ্চকোটের নিকটবর্তী ভুলুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এঁরা। এঁদের অদ্ভুত রামায়ণ নয় কাণ্ডে বিভক্ত ছিল আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা, পুষ্কর, রামরাস ও উত্তরকাণ্ড। রচনাকাল ১৭১২ শকাব্দ। দুর্গাপঞ্চরাত্রি (১৬৯২ শকাব্দ) আধ্যাত্মিক তত্ত্বগ্রন্থ, আত্মবোধ (১৭০৯ শকাব্দ) প্রভৃতির রচয়িতা। ডক্টর সুকুমার সেন এঁর বিস্তৃতি পরিচয় দিয়েছেন (পৃঃ ৪১২-১৫)। আর অধ্যাত্ম রামায়ণ রচনা করেছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী।

১০. **ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস**—সম্পর্কে পিতা ও পুত্র। এঁদের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার জিনারদি (দীনারদ্বীপ) গ্রামে।এঁরা উভয়েই রামায়ণ রচক। ষষ্ঠীবরের মনসার ভাসানও রয়েছে।

১১. **দ্বিজ কবিচন্দ্র** (নাম ঃ শঙ্কর)। ইনি বাঁকুড়া জেলার 'লেগোর দক্ষিণে ঘর পাতুয়ায় বসতি' বলে ভণিতায় বলেছেন। বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, রঘুনাথ সিংহ, বীর সিংহ ও গোপাল সিংহ—এ চারজনের নামোল্লেখ করেছেন। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে এই দীর্ঘায়ু কবির মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

১২. **দ্বিজ ভবানী দাসের** লক্ষ্মণদিগ্বিজয়ে আদেষ্টা রামচন্দ্রের নাম রয়েছে। এক ভবানী দাসের রামের স্বর্গারোহণ নামের পুথি মিলেছে। অন্য এক দ্বিজ ভবানীনাথ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। তিনি রাজা জয়চ্ছন্দ নামের চক্রশালার এক সামন্তের আমলে (কারো কারো মতে ১৪৮২-১৫৩৭ খ্রীঃ) অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় বা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক' কাণ্ডটি রচনা করেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে তিনি নোয়াখালির ভুলুয়ার অধিবাসী ছিলেন। ত্রিপুরারাজ জগৎ মাণিক্যের আদেশে তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসরণে 'রাম-সীতা কাহিনী' রচনা করেন বলে মনে করেছেন।

১৩. **রামানন্দ ঘোষ** (বুদ্ধাবতার)-ইনি রামলীলা রচয়িতা। ইনি নিজেকে বুদ্ধাবতার বলে দাবি করতেন এবং ভণিতায় বুদ্ধ নাম ব্যবহার করেন। রামানন্দ ঘোষ সম্ভবত সতেরো শতকের শেষ পাদের বা আঠারো শতকের মধ্যভাগের কবি। আর এক রামানন্দ যতিও রামকথা বা রামতত্ত্ব ও চণ্ডীমঙ্গল (১৭৬৬ খ্রীঃ) রচনা করেছিলেন—উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তিও হতে পারেন। তাঁর ভণিতার কয়েকটি নমুনা—

কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার।
আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার।
শূদ্র কুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল
বুদ্ধ বেশ ধরি এবে তত্ত্ব লিখে গেল।

আবার তাঁর লক্ষ্য ছিল—

যবন ম্লেচ্ছর রাজ্য বলে ক্যাড়ি লব
একচ্ছত্র রাজা করি দারু ব্রহ্মে দিব।

ইনি শেষ জীবনে হতবাঞ্ছার বেদনায় ভুগেছিলেন ঃ

ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানি
মিথ্যা ধন্ধে গেল মোর দিবস রজনী।
দারা ছাড়ি পাপ ভরা ভরিনু অপার
অস্থি চর্ম সার কৈলা অভিশাপ তার।
দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই (ঠাই)।

নিরন্ন কবি দেবতার উপরও আস্থা হারিয়েছিলেন ঃ

দারুব্রহ্মে সেবা করি জেরবার হৈল
বৃথাকাষ্ঠ সেবি কালকাটা নহে ভাল।
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ—
নিজ কষ্ট দায় আর লোক মধ্যে লাজ।

এতে মনে হয়, শূদ্র রামানন্দ বর্ণেবিন্যস্ত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলেন, ঘৃণ্য শূদ্রবর্ণের অভিশাপ এড়াতে চেয়েছিলেন। আর পূর্বোক্ত (১১ সং) আঠারো শতকে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন রামলীলা উপাখ্যান বা শ্রীরামমঙ্গল। তার অঙ্গদের রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার, শিব-রামের যুদ্ধ প্রভৃতি পালার অনেক পুথি সংগৃহীত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের আমলে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

এভাবে এ সব কবি-কাব্য পরিচিতির গুরুত্ব বা সার্থকতা নেই বললেই চলে। মন-মননের ও সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপাদানের আধার স্বরূপ এসব পালা-পাঁচালী সম্পাদিত ও মুদ্রিত হলে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থ থেকে উপাদান-সংগ্রহ করে সমাজ-সংস্কৃতির কালিক-স্থানিক বিবর্তনধারার ইতিহাস রচনা ও আলোচনা করা সহজে সম্ভব হত।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাভারত

১. জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত পরিচিতি

জাতীয় মহাকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা রয়েছে। আঙ্গিকের আদলে মহাকাব্য না হলেও মহাভারত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জাতীয় মহাকাব্যই নয় কেবল, এটি তাদের প্রাচীন শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আকর গ্রন্থও। এ অর্থেই 'যা নেই মহাভারতে, তা নেই জগতে'।—প্রবাদের সার্থকতা। তুল ঃ "যদি হাস্তি তদন্যত্র ; যন্নে হাস্তি ন তৎক্বচিৎ।"–এতে যা আছে, তা অন্যত্র থাকতে পারে, এতে যা নেই তা কোথাও নেই। বস্তুত জৈন-বৌদ্ধেরাও এ গ্রন্থের কাছে নানাভাবে ঋণী। এক অর্থে ব্যাসরচিত মহাভারত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতকোষ। হিন্দুর চোখে মহাভারত পঞ্চম বেদ---ধর্ম, অর্থ ও কামশাস্ত্র। এটি কথা–উপকথার কাব্য নয়-- নীতিকথার ও লোককাহিনীর আকর। এতে ভারতবর্ষের ভূগোল, প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ, জনজীবন, রাজনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, ন্যায়-নীতি, জীবিকাপদ্ধতি, ধর্মার্থকামমোক্ষপন্থ, দ্বন্দ্ব-মিলন, আর শাস্ত্র-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস বিম্বিত, চিত্রিত ও বিধৃত রয়েছে। ব্যাসের নামে চললেও হাজার বছরের কালপরিসরে কালিক-সামাজিক প্রয়োজনে শত শত মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ-উদ্দেশ্য নানা নব নব কাহিনীর মাধ্যমে রূপায়িত ও সংযোজিত হয়েছে এ গ্রন্থে। তাই কলেবরে স্ফীত যেমন, তেমনি অসমঞ্জস অপ্রাসঙ্গিক ও অসংহত আদর্শে, লক্ষ্য, বক্তব্যে, তত্ত্বে ও তথ্যে মহাভারত বিচিত্র ও জটাজটিল রূপ লাভ করেছে। এতে ভারতীয় শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনধারার যেমন একটি প্রায় স্পষ্ট সামগ্রিক ছবি মেলে, তেমনি ব্যক্তিক বা সাম্প্রদায়িক মত-পথের দ্বান্দ্বিক ও স্বতন্ত্র উদ্ভব-বিকাশের তথ্য ও তত্ত্ব এতে দুর্লভ নয়। তাই মহাভারত আজো ব্রাহ্মণ্যবাদীর জীবনবেদ—প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এ বিপুলকলেবর গ্রন্থ নানা যুগের, বিচিত্র মনের, অসংখ্য মতের মানুষের জীবন-ভাবনা ও জগৎচেতনা ধারণ করে রয়েছে --উৎস হয়ে রয়েছে প্রেরণার ও প্রয়োজনের। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই মহাভারতকে মানুষের উচ্চারিত চিন্তা-চেতনার আকর হিসেবে মহাসাগর ও তার কল্লোলের সঙ্গে অথবা গ্রন্থাগার ও তার গ্রন্থরাজিধৃত অশ্রুত ধ্বনিমুখর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তুলনা করা চলে। আজো পঞ্চাশ কোটি মানুষের মহাভারতই একাধারে সহচেতনার, সংহতির, সাধর্ম্যের, জাতীয়তার যোগসূত্র বা রাখিস্বরূপ : অন্যকথায় মহাভারত জাতীয় আত্মার বা জাতি সত্তার নামান্তর। রামায়ণে যেমন রামই নায়ক, তেমনি বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণই এ কাব্যে নায়ক। 'কৃষ্ণার্জুন উবাচ' মাধ্যমে পরিব্যক্ত কৃষ্ণের বাণীই হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র। গীতা মূলত ঐ মহাভারতেরই একটি অধ্যায়। গীতানুসারী মাত্রই জ্ঞানকর্মবাদী ও মূলত বিষ্ণু উপাসক। তাই বিষ্ণু বা কৃষ্ণউপাসক বৈরাগী ও ভক্তিবাদীদের স্বতন্ত্রভাবে 'বৈষ্ণব" নামে চিহ্নিত করা হয়। মহাভারতই হিন্দুর চিন্তা চেতনার ও কর্ম-আচরণের ঐতিহ্য শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস। তাই মহাভারত একাধারে তার জাতীয় জীবনবেদ, জাতীয় আত্মার জাতীয় মহাকাব্য ; তার জাতিসত্তার মূল বা বৃন্ত।

দু হাজার বছরের ভারতীয় সাহিত্যের উপকরণ-উপাদান, আদর্শ ও বক্তব্য যুগিয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, অবহট্‌ঠে কিংবা আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের দেহের ও প্রাণের জন্যে রামায়ণ মহাভারতের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী।

মহাভারতের মূল কাহিনীর উদ্ভবকাল, কুরু-পাণ্ডবের সম্পর্ক, মহাভারতের আদি রচনাকাল ও রচক সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশেষ বিতর্কের আশঙ্কা না করে বলা চলে মহাভারতের মূল অংশ হচ্ছে কৌরবপাণ্ডবের যুদ্ধ----এ অংশের রচয়িতা মৎস্যগন্ধাসত্যবতীসন্তান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। এ অংশের রচনাকাল আনুঃ ৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। কুরু ও পাণ্ডু বা পাঞ্চাল দুই

পৃথক গোত্র নয়, পরস্পর জ্ঞাতি। এবং দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সন্তান ভরতের বংশধর। এই ভরতের রাজ্যই ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত। রাম যেমন সূর্যবংশীয়, কুরু-পাণ্ডব তেমনি চন্দ্রবংশীয়। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' ভীম, নকুল ও সহদেব কুরু বংশীয় তথা কৌরব বলে উল্লেখিত। বৌদ্ধ জাতকে (৪৯৫ সং) কৌরব (কোরব্ব) যুধিষ্ঠির (জুধিটঠিল) ইন্দ্রপ্রস্থে (ইন্দ্রপত্তে) রাজত্ব করতেন বলে বর্ণিত। কৌরব-পাণ্ডব দুই ভিন্ন গোত্রীয় নয়। ভরতের নামবংশী বা বংশধরের বিবরণ বলেই গ্রন্থনাম ভারত বা মহাভারত অথবা কলেবরে বিপুল ও ভারী বলেই কিংবা মহাকথার ভারী বলেই ভারত বা মহাভারত। দুটো নামই চালু ছিল। কেউ কেউ মনে করেন ছোট আকারের আদি কাহিনী 'ভারত' নামে খ্যাত ছিল। কলেবর বৃদ্ধির ফলে নাম মহাভারত হয়েছে। ৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীস্টাব্দ অবধি নানা সূত বা সারথি, মাগধ, ভাট-ব্রাহ্মণ পাঠক-গায়ক-লিপিকারের মনের, মতের, আদর্শের ও উদ্দেশ্যের প্রশ্রয়ে মহাভারতের মূল বক্তব্য পল্লবিত, বিকৃত বিবর্জিত এবং নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক সঙ্গত-অসঙ্গত, সদৃশ ও স্ববিরোধী কাহিনী ও উপকথা কালে কালে মানুষের নৈতিক-সামাজিক-শাস্ত্রিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে কল্পিত, রচিত ও সংযোজিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কাজেই বর্তমান আকারে উত্তরাপথে বা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মহাভারত কোন ব্যক্তিক রচনা নয়—জাতীয় সৃষ্টি।

লিখিত কিংবদন্তী অনুসারে মহাভারতের যুদ্ধকালীন যুদ্ধকাহিনীর প্রথম বিবরণদাতা সঞ্জয়, শ্রোতা স্বয়ং অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। ব্যাস লিখিত কাহিনীর বিবরণের প্রথম শ্রোতা বা পাঠক হলেন ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন। তখন শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮৮০০। সেসময়ে শ্রোতা ছিলেন আরো চার জন, ব্যাস পুত্র শুকদেব ও ব্যাসের অপর তিন শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি ও পৈল। মহাভারতের আদি পর্বের দুটো শ্লোকসূত্রে [১ম অধ্যায়, ৮৮-৮৯ শ্লোক] প্রকাশ—ব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবসহ পাঁচজন শিষ্যকে বেদ পড়িয়ে পরে মহাভারত পড়ালেন—এবং ওঁরা পরে প্রত্যেকেই একটি করে ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন ঃ

> বেদানধ্যাপয়াসাস মহাভারত পঞ্চমান।
> সুমন্তং জৈমিনিং পৈল শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম।।
> প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমোবচ
> সংহিতাস্তৈ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ।[১]

সর্পদংশনে যখন রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু ঘটে, তাঁর পুত্র রাজা জনমেজয় সর্পসত্রের বা সর্পযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই যজ্ঞকালে বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নির্দেশে 'মহাভারত' কাব্য পাঠ করেন। তখন শ্লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৪০০০। বৈশম্পায়নই হয়তো নানা তত্ত্ব ও মন্তব্যযোগে অতিরিক্ত ১৫২০০ শ্লোক রচনা করে গুরুর কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন। সর্পসত্রে উপস্থিত শ্রোতা সূত তথা সারথি উগ্রশ্রবাঃ পরে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষি আয়োজিত যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিদের কাছে মহাভারত কাহিনী পড়ে বা মুখে শুনান। তখন শ্লোক সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষ। প্রাচীন ও লিখিত প্রবাদ হলেও এগুলি বিশ্বাস করবার প্রয়োজন নেই। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে-কোন চাঞ্চল্যকর স্থানিক ঘটনা ও যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করত কথক, গায়ক, চারণকবি ভাট ও মাগধরা বিশেষ করে যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করত যুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শী সারথিরা। সূত বা সারথিরা যুদ্ধোত্তর কালে পেশাদার চারণকবি হিসেবে যুদ্ধকাহিনী বসিয়ে বসিয়ে বর্ণনা করে জীবিকার্জন করত। এই শ্রেণীর লোককবির বা চারণকবির গাথাই কালে রূপে ও রসে, কথায় ও উপকথায়, তত্ত্বে ও তথ্যে পল্লবিত ও স্ফীত হয়ে প্রতিভাধর কবির হাতে বিবৃতি-ও বর্ণনামূলক কাব্য-মহাকাব্যের রূপ লাভ করেছে। ৮০০ বছরের সময় পরিসরে বর্তমান মহাভারত কাহিনীসমূহ ও কাব্য পূর্ণতা পেয়েছে বলেই বিদ্বানদের ধারণা। কাব্যের বিভিন্ন অংশের ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও

১. *অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৫৬৭।*

বর্ণনার পার্থক্যে, বিভিন্ন অংশের অসংগতির সাক্ষ্যে, যবন (আইওনীয়ান গ্রীক) ও বৌদ্ধদের উল্লেখে, রামকথার সংযোজনে আর আঞ্চলিক ও কালিক বর্জনে, গ্রহণে, সংক্ষেপণে প্রসারণে ও পরিবর্তনে উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের পুথি এ ধারণাই সমর্থন করে। মনে হয় কুমারিল (৫ম শতক?) ও বাণভট্টের (৭ম শতক) আবির্ভাবের পূর্বেই মহাভারত বর্তমান আকারে পূর্ণতা লাভ করেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও মহাভারতের আদি অংশ পাণিনিরও জানা ছিল। প্রচলিত বাল্মীকির রামায়ণে প্রথম ও শেষ কাণ্ড মহাভারতের কাহিনীপ্রভাবিত। বৌদ্ধ বিধুরপণ্ডিতজাতক, ঘটজাতক, কুণালজাতক প্রভৃতি কাহিনীও মহাভারতে মেলে। এসব উভয় রচনার সমকালীনতার কিন্তু সম্প্রদায়গত দৃষ্টির পার্থক্যের সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বলেছি,'যা নেই ভারতে, তা নেই জগতে'। মহাভারতে রাজনীতি, শাসননীতি, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র, ছল-চাতুরী, প্রতারণা-বিশ্বাসঘাতকতা, যুদ্ধ, সন্ধি, প্রেম-প্রীতি-বিশ্বাস-ভরসা, লিপ্সা-রিরংসা, অসূয়া, প্রতিহিংসা, ক্ষমা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ন্যায়-নীতি, বিবেক-বিচার, অবাধ যৌনচর্চা, নারীহরণ, চুরি, দস্যুবৃত্তি, ছদ্মবেশ, জয়ের উল্লাস, পরাজয়ের গ্লানি, নির্যাতন-লাঞ্ছনার ক্ষোভ, শোক,কাম, ক্ষুধা, বৈরাগ্য, নীচতা, মহত্ত্ব, সততা, সত্যবাদিতা, মিথ্যাবাদিতা, ঔদ্ধত্য, বিনয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবিক দোষ-গুণের, চারিত্রিক বিভিন্নতার, অনুভবের, বৈচিত্র্যের এবং নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত রয়েছে। এখানে সর্বকালের সর্বপ্রকার মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি সঞ্জাত ভাব-চিন্তা ও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্বন্ধীয় চিন্তা-চেতনার, শ্রেয়োবোধের, জীবন চেতনার ও জগৎ-ভাবনার তাত্ত্বিক দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। 'একটা দেশের বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনের অযুত তরঙ্গলীলা যদি কোন একখানি কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা নিঃসন্দেহে মহাভারত।'[১] রবীন্দ্রনাথের কাছে মহাভারত 'একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস'।[২] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চোখে 'মহাভারত বর্ণিত ইতিহাস মানব সমাজের বিপ্লবের ইতিহাস'।[৩] বলেছি, মহাভারত প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানা উপকথার সংযোজনে স্ফীতকায়। এতে মোটামুটি আট প্রকার বিষয় বর্ণিত রয়েছে , ক, কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ- বৈরিতা ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ, খ. পাণ্ডবদের রাজ্য ও রাজকন্যাজয়, গ. গণ অশ্বমেধ যজ্ঞ-এ সূত্রে ভারবর্ষের রাষ্ট্রিক- ভৌগোলিক পরিচিতি, ঘ. রাজবংশোচিত কাহিনী ঙ. মুনি-ঋষি দ্বিজ ও দেবকাহিনী, চ. তীর্থ পরিচিতি, ছ. পশু-পক্ষীর রূপক কাহিনী, জ. রাজনীতি, সমরনীতি, অধ্যাত্মতত্ত্ব, নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব।

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় মহাভারতে "জয়ধ্বনি ও শ্মশান-সঙ্গীত একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া মানব জীবনের অনন্ত বেদনাকে, ব্যর্থ পরিণামকে, মুখর আকাঙ্ক্ষার নিদারুণ নিঃসঙ্গতাকে বৈরাগ্যের ধূসর আস্তরণে আবৃত করিয়াছে। মহাভাবত মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি, সফলতার নিস্ফল পরিণতি, জীবনাসক্তির জৈবিক বৈরাগ্য [রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ/ সফল আশার বিষাদ মহান]'। তাই মহাভারতে (সত্যের, ধর্মের, ন্যায়ের) সাফল্যের মধ্যে পরাভবের বিষণ্ণতা নিহিত রহিয়াছে।—কেননা গ্রীক নাট্যকার মানুষের বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জয়ী হওয়ার মধ্যে এত বড় নিদারুণ ট্র্যাজেডি কল্পনা করিতে পারে নাই। তাই মহাভারতে মানবজীবনের বিষামৃতের কাহিনী মূর্তিলাভ করিয়াছে।"[৪] মহাভারতম নয়—' ভারতম' বলেও প্রাচীন উল্লেখ মেলে। কিংবদন্তী এই আট হাজার শ্লোকবিশিষ্ট ' ভারতম' ক্রমে ২৪ হাজার ও লক্ষ শ্লোক সমন্বিত হয়ে মহাভারত হয়েছে।

২. মহাভারত উত্তরাপথের সম্পদ ঃ ওখানেই তা রচিত। কাজেই উত্তর ভারতের পুথিই স্বেচ্ছাসংযোজনে কলেবরে স্ফীত, ফলে বর্ণিত বিষয়ে স্ববিরোধ, অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি বৃদ্ধি পায়।

---

১. অসিত বন্দ্যো ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯।

২. ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।

৩. মহাকাব্যের লক্ষণ।

৪ বা-সা-ই ঃ ১ম খণ্ড, ৩য় সং পৃঃ ৫৫৮-৫৯।

পরে দক্ষিণ ভারতে যখন মহাভারত গৃহীত হয়, তখন তা গ্রহণে বর্জনে ও সঙ্গতি সাধনে সুশৃঙ্খল, সুসংকলিত ও সুসম্পাদিত হয়। ফলে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ব্যাসদেবের মহাভারত পাঠককে বিভ্রান্ত করে না, যদিও দাক্ষিণাত্যে চালু মহাভারত আয়তনে বৃহৎ ও বর্ণনায় প্রায়ই পৃথক। বলাবাহুল্য উত্তর ভারতেও বিভিন্ন কালের অঞ্চলের এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক হরফের পুঁথিতে পাঠগত পার্থক্য সামান্য নয়। উত্তর ভারতের মহাভারত আঠারো পর্বে সমাপ্ত, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মহাভারতে পর্ব সংখ্যা চব্বিশ।

জৈনরা মহাভারতের প্রভাব স্বীকার করে হরিবংশ, উত্তরপুরাণ, পাণ্ডুপুরাণ, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি রচনা করেছে, কিন্তু বৌদ্ধরা মহাভারতের প্রভাব এড়িয়ে চলেছিল। জাতকই তাদের মহাভারতের অভাব মিটিয়েছে।

ব্যাসদেবের নামে চালু মহাভারত ছাড়া সংস্কৃতে জৈমিনি রচিত অশ্বমেধপর্ব মেলে। একটি মাত্র পর্ব নিয়ে কাব্যটি রচিত বলে এখানে ঘটনা শাখাবহুল ও বর্ণনা পল্লবিত ও দীর্ঘায়ীত হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও জৈমিনিভারত থেকে কাহিনী গৃহীত হয়েছে। বাঙলায় অনেক কবিই অনুবাদে জৈমিনিভারত অনুসরণ করেছেন। এ জৈমিনি যদি বেদব্যাসের শিষ্য হন, তা হলে জৈমিনিভারতও ব্যাস মহাভারতের প্রাচীনতম মূলাংশের সমকালীন রচনা। অবশ্য জৈমিনিভারতেও কাহিনীগত ও বর্ণনাগত কালিক প্রক্ষেপ থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক।

৩. বাঙালীর চোখে মহাভারত

মহাভারতের বিরাটত্ব, জাতীয় মানসে ও জীবনে এর গুরুত্ব, জাতিসত্তার মর্মমূলে এর স্থিতি, এর জাতীয় আত্মপ্রতীকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। বাঙালীরাও মহাভারতীয় কৃষ্ণ ও তাঁর গীতার অনুসারী। তবু বাঙালী মানসে এবং বাঙালীর সমাজে ও ঘরোয়া জীবনে সমাগ্রিকভাবে মহাভারতের স্থান ছিল মধ্যযুগে সামান্য ও সীমিত। শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে মহাভারতকে বাঙালীরা সসম্মানে শিরোধার্য বলে মেনে নিয়েছিল বটে, কিন্তু বউ-ঝিয়ের ঘরে-সংসারে তার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি কামনা করেনি। তার কারণ কালান্তরে নীতিবোধ ও সমাজ-সংস্কৃতি হয়েছিল পরিবর্তিত এবং পালনীয় নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে মহাভারতীয় নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল দুস্তর ব্যবধান। কুন্তীর, দ্রৌপদীর, রুক্মিনীর, সত্যবতীর কাহিনী কিংবা ব্যাস, ভীম, বিদুর, কর্ণ প্রভৃতির জন্ম বৃত্তান্ত, ক্ষেত্রজ সন্তান তত্ত্ব, বহুপতিকতা, কানীন মাতৃত্ব প্রভৃতি, এমনকি স্বয়ং কৃষ্ণের অন্যায় রাজনীতিক কূটকৌশল প্রভৃতি মধ্যযুগের বাঙালীর সমকালীন জীবনাদর্শের ও রুচির অনুকূল ছিল না। তাই মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ পাঠেও উৎসাহ ছিল না বাঙালীর। এ যাবৎ কেবল তিনজন বাঙালীরই সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদের অভিপ্রায় ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এঁদের একজন কবীন্দ্র পরমেশ্বর [অশ্বমেধ পর্ব ছাড়া] সঞ্জয়, অপর জন কাশীরামদাস [যদিও অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।]

আগেই বলেছি, সমকালীন নীতিশাস্ত্রের, রুচির ও জীবনাদর্শের অনুকূল হওয়ায় রাম উপাস্য না হয়েও বাঙালীর কাছে আদর্শ মানুষ ও প্রমূর্ত মনুষ্যত্ব। রামায়ণ তার পারিবারিক-সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে আদর্শের প্রতীক ও সৎপ্রেরণার উৎস। আর শাস্ত্র-সংহিতার মর্যাদা পেয়েও মহাভারত তার অন্তরে মননে আশ্রয় পায়নি।

তাই সততার, মহত্ত্বের, ত্যাগের, ন্যায়ের, বীরত্বের, নৈতিক চেতনার অংশটুকুই বাঙালী কবিগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে অনুবাদ করেছেন। যেমন দ্রোণপর্ব, ভীষ্মপর্ব, নল-দময়ন্তীর আখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবান-উপাখ্যান, সুভদ্রাহরণ, অশ্বমেধপর্ব, বনপর্ব প্রভৃতি। ফলে বাঙালীর ঘরোয়া ও মানস জীবনে মহাভারতের প্রভাব সামান্য আর রামায়ণের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক, এককথায় সর্বাত্মক। বিশেষত বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদকালে বাঙালী কবিরা বাঙালীর রুচি আর্দশ ও প্রয়োজন সম্মত করে রচনা করেছিলেন, অবশ্য মহাভারতের পর্ব ও আখ্যান অনুবাদেও বাঙালীরা তাই করেছেন।

৪. মহাভারতের বাঙলায় অনুবাদ-প্রেরণা

বাঙলাভাষায় অনুবাদকর্মের সূচনা হয় রাজদরবারে। রাজকর্মচারী গুণরাজখান মালাধর বসু (ছত্রী) সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৮-৭৬) আমলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবত অনুবাদ শুরু করেন ১৪৭২-৭৩ সনে এবং শেষ করেন শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহর আমলে ১৪৮১ সনে ['তেরশ পঁচানব্বই শতকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন।'] কৃত্তিবাসও সুলতান রুকুনউদ্দীন বারবক শাহর শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন। চট্টগ্রামের সেনানী শাসক পরাগল খানের কর্মচারী কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস তো পরাগলের নির্দেশেই 'মহাভারত' রচনা করেন, শ্রীকর নন্দীও তেমনি ছুটিখানের প্রত্যক্ষ আগ্রহে ও প্রতিপোষণে 'অশ্বমেধপর্ব' রচনা করেছিলেন। এতে বোঝা যায় বিদেশী বিভাষী বিধর্মী শাসক শাসনের সুবিধের জন্যে দেশী লোকদের জাতীয় সত্তার ও জাতীয় আত্মার সন্ধান নিতে আগ্রহী ছিলেন। প্রশাসনিক প্রয়োজনও ছিল, শাসিত জনের জীবন চেতনার ও জগৎভাবনার, তথা তার ধর্মতত্ত্ব, শাস্ত্র, ঐতিহ্য, জীবনাদর্শ, আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ, ন্যায়-অন্যায়বোধ জানা না থাকলে শাসক-শাসিতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে, আশঙ্কা থাকে প্রজার অসন্তোষের, বিক্ষোভের, বিদ্রোহের। তাই ইংরেজরা যেমন করেছিল পরবর্তীকালে, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল তুর্কীদেরও। তাঁরা হিন্দুর বিধিবিধান জানার জন্য দরবারে পণ্ডিত এবং প্রশাসনে সাহায্য-সহায়তা করার জন্যে হিন্দুকর্মচারী রাখতেন। যেহেতু হিন্দুর-মন-মনন, আচার-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-ইতিহাস তাদের জাতীয় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত মাধ্যমে জানা সহজ, সেহেতু ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদে সুলতানেরা পনেরো শতক থেকেই উৎসাহ দান করেন। এর আগে তা সম্ভব ছিল না দু'কারণে— এক, পনেরো শতকের আগে বাঙলা ভাষায় লিখিত সাহিত্য রচনার রেওয়াজ চালু হয়নি ; দুই, শাস্ত্র ও দেবকথা বাঙলায় লিপিবদ্ধ করায় পাপভয়জনিত আপত্তি ছিল। 'বদং শত মা লিখ'-এ আপ্তবাক্য শাস্ত্রের লিখিত অনুবাদের প্রশ্নে দুনিয়ার সব জাতিই মানত। লক্ষণীয় যে গোড়ার দিকে সাহস করে অনুবাদকার্য শুরু করেন দরবারাশ্রিত কায়স্থরাই, কৃত্তিবাস ব্যতিক্রম মাত্র। গরজও তাঁদের সাহস যুগিয়েছে। লৌকিক দেবতার ও লোকায়ত আচারের দ্রুত প্রসাররোধ লক্ষে উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর পৌরাণিক ধর্মের কথা গণমানবের মধ্যে প্রচার করার গরজও এ সময়ে অনুভূত হয় তীব্রভাবে।

৫. কবি পরিচিতি

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস

বিজয় পণ্ডিত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী এবং সঞ্জয়ের ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি নিয়ে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে যে বিতর্কের শুরু, আজো পুরো অবসান ঘটেনি তার। ইতিমধ্যে বিজয়পাণ্ডব কথা ও বিজয় পণ্ডিত-সমস্যা মিটে গেলেও কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী সমস্যার পুরো সমাধান হয়নি। বিদ্বানদের মধ্যে এখনো দ্বিমতের দুটো দল রয়ে গেছে।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মণীন্দ্রমোহন বসু, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী থেকে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসকার অবধি বিদ্বানদের কেউ প্রবন্ধে, কেউ সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায়, কেউবা স্বলিখিত ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে এ সমস্যার ও বিতর্কের সমাধান খুঁজেছেন। প্রমাণের স্বল্পতাহেতু আলোচনা হয়েছে সাধারণভাবে যুক্তিপ্রধান। এসূত্রে উল্লেখ্য যে সঞ্জয় সম্প্রতি অনুকারক কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

পরমেশ্বর দাস সম্বন্ধে একটি পরোক্ষ প্রমাণ সম্প্রতি আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিশ্বভারতীর 'পুথি পরিচয়' তৃতীয় খণ্ডে সংকলক ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল পনেরো শতকের কবি কবিচন্দ্র মিশ্র রচিত অন্তে খণ্ডিত কাব্য 'গৌরীমঙ্গল'-এর প্রাপ্ত পুরো পাঠ মুদ্রিত করেছেন, এবং ভূমিকায়ও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে।

কবিচন্দ্র মিশ্রের উক্ত 'গৌরীমঙ্গল' পাঁচালী একখানি পূর্ণাঙ্গ পুথি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে সংগ্রহ করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। পুথিটি চট্টগ্রামের এবং ১১৯৬ মঘীসনে তথা ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত। ১-৫২ পত্রে সমাপ্ত। দানসূত্রে এ পুথি বর্তমানে রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রয়েছে।

বিশ্বভারতীর ও সাহিত্যবিশারদের পুথির মূল পাঠ অভিন্ন। লিপিকর পরম্পরাজাত প্রমাদ ও বিকৃতি উপেক্ষা করলে পার্থক্য থাকে কেবল গ্রন্থোৎপত্তি অংশে এবং ভণিতায়। সাহিত্যবিশাবদ-সংগৃহীত পুথির উপক্রমে আদেষ্টা ও প্রতিপোষক পরমেশ্বর দাসেব পরিচিতিমূলক স্তুতি তো রয়েইছে, তাছাড়া পুথির উনচল্লিশপত্র অবধি প্রায় প্রতি ভণিতায় বয়েছে আদেষ্টা পরমেশ্বর দাসের নাম। অথচ বিশ্বভারতীর পুথির কোথাও পরমেশ্বর দাসের উল্লেখমাত্র নেই।

উভয় পুথিতেই যথাস্থানে রচনাকাল রয়েছে এবং সে বচনাকালও বিদ্বানদের মতে অভিন্ন, যদিও সাহিত্যবিশারদের পুথির রচনাকাল-জ্ঞাপক শ্লোকটির পাঠ প্রমাদযুক্ত ও বিকৃতি-দুষ্ট। বিশ্বভারতীয় পুথিতে পাই ঃ

নবশশী সুর ইন্দ্র শক পরিমিত
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।

সাহিত্যবিশারদের পুথিতে রয়েছে ঃ

নবসিসু সিন্দু ইন্দু সব নিজোজিত
কবিচন্দ্র মিশ্র বোলে চণ্ডীর চরিত।

—এর থেকে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল (নব ৯, শশী ১, সুর ৪, ইন্দ্র ১ ধরে) এবং অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় (নব ৯, শশী ১, ইন্দ্র ১৪ ধরে) অভিন্ন রচনাকাল অর্থাৎ ১৪১৯ শক তথা ১৪৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন।

বিশ্বভারতীর পুথিতে সমকালীন গৌড় সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) চার চরণ প্রশস্তি রয়েছে। সাহিত্যবিশারদের পুথিতে লিপিকর প্রমাদে হোসেন শাহর নাম সম্বলিত চরণটি বাদ পড়েছে।

এবাব দুটো পুথির গ্রন্থোৎপত্তি অংশ পাশাপাশি উদ্‌ধৃত করছি ঃ

সাহিত্যবিশারদের পুথি

১. গুরুর চরণ বন্দম পরম ভকতি
ধরণী লুটাইআ বন্দম মাতা **নিলাবতি।**
বাপের চরণ বন্দম গুণের সাগর
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত **ভারত** তৎপর।
বসিষ্ট পণ্ডিত নামে অতি সুচরিত
জাহার বিমল জস জগত বিদিত।

২. পৃথিবীর সার রাজ্য **পঞ্চম গৌর** নাম
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপেত **পাম।**
জার তরে কম্পিত সকল নৃপগণ
মহাসত্য নরপতি প্রজার পালন।

৩. গৌব মধ্যে পুণ্যতির্থ সপ্তগ্রাম নাম
তৃপিনির তিরে সপ্ত রিষির বিশ্রাম।
তথা সপ্তরিষি তপ কৈলা ম [হা] সুখে
তেকারণে সপ্তগ্রাম নাম লোকমুখে।
সেই সপ্তমগ্রাম মধ্যে **রণ্ডা** নামে পুরী
পূর্বে জাএ জমুনা পশ্চিমে সুরেশ্বরী।
উত্তরেত চণ্ড [চক্র] তির্থ নামে পুণ্যস্থান
দেবচক্রপানি তথা নিত্য অধিষ্ঠান।
দক্ষিণে পবিত্র জল নামে বিদ্যাধরি
জার জল ছুইলে সকল পাপ হরে।

অনেক পণ্ডিত তথা বৈসে মহাজন
কুলে সিলে গুণের নিধান দ্বিজগণ।
নিজ ধর্ম্মে সাবহিত নৃপতি পূজিত
ক্ষেত্রি বৈস্যগণ বৈসে অতি সুচরিত।
সুদ্রগণ বৈসে বিপ্র সেবনে তৎপর
নৃপতির হিত করে সুবুদ্ধি সাগর।

৪. সর্বগুণে থাকে সেই উঞ্চল সমাজ
তথাপতি মহামহি [ম] **গুণরাজ**।
হরগৌরী চরণে কমল মধুকর
দ্বিজগুরু ভকত ধর্ম্মেত তৎপর।
দানে দারিদ্র হরে সর্ব্বসিদ্ধিসার
জাহার বিমল জস করি কণ্ঠহার।
পিতা সুত.....ছিল প্রকৃতি সুন্দর
মহাধীর মহাসত্ত্ব বুদ্ধি এ সাগর।
সুবুদ্ধি গম্ভীর ধীর তাহান তনএ
শ্রীপরমেশ্বর দাস মহাশএ
চণ্ডির চরণ ছারি আন নাহি চিত
পুরাণ ভারতে সুনে দেবির চরিত।
চণ্ডি পুজে চণ্ডি জপে চণ্ডিভাবে মনে
গোআএ দিবস রাত্রি চণ্ডির ধেয়ানে।

৫. একদিন সভামধ্যে বসি মহাশএ
কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ।
পাঞ্চালী প্রবন্ধে রচ চণ্ডির চরিত
তোমার **কবিত্ব** জেন ভ্রমে পৃথিমিত।
পরম ভকতি জেন সর্বলোকে পুজে
পুরাণ বচন জেন সাবধানে বুঝে।
নব সিসু সিন্দু ইন্দু সব নিজোজিত।
কবিচন্দ্র মিশ্র বোলে চণ্ডির চরিত।

বিশ্বভারতীর পুথি

১. দেবদ্বিজ গুরু বন্দো করিয়া ভকতি
ধরনি লোটাইআ বন্দো মাতা **লিলাবতি।**
বাপের চরণ বন্দো গুণের নিধান
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত **ভারথি** অধিষ্ঠান।
সসিষ্য পণ্ডিত নাম অতিসুচরিত
জাহার বিমল যস জগত বিদিত।

২. পৃথিবীর সার রাজ্যে **পঞ্চগৌড়** নাম
নৃপতি হুসেন শাহা কলিযুগে রাম।
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে **তপন**
জার ভয়ে কপিত [কম্পিত] সকল নৃপগণ।

৩. গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম মহাপুণ্য স্থান
ত্রিবিনির তিরে সপ্ত ঋষির বিশ্রাম।
তথা সপ্তমুনি তপ কৈল সুখে
তেকারণে সপ্তগ্রাম বলে লোকমুখে।
সেই সপ্তগ্রাম মধ্যে **বালাণ্ডা** নামে পুরি
পূর্বে জার যমুনা পশ্চিমে ষুরেস্বরি।
উত্তরেত চক্রতির্থ নাম পুণ্যস্থান
দেব চক্রপানি তথা নিত্য অধিষ্ঠান।
দক্ষিণে পবিত্র জল নাম বিদ্যাধরি
জার জল পরসিলে সকল পাপে তরী।
অনেক পণ্ডিত [ত] থা অনেক মহাজন
কুলে সিলে তপের নিধান দ্বিজগণ।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত নৃপতি পূজিত
ক্ষেত্রি বৈদ্য বৈসে যতি ষচারী বৈস্য।
ষুদ্রগণ বৈসে দ্বিজ সেবা এ তৎপর
নৃপগণ হিতকারি ষুবুদ্ধি সাগর।
[৪ সংখ্যক পাঠ নেই]

৫. **তথা শুণি সঙে করিআ সমাজ**
কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলে [ক] কাজ।
গন্ধমাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান
সভে মিলিআ বলিলেন পাচালি বিধান।
পাচালি প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল
তোমার **মহিমা** জেন ভ্রমে মহিতল।
ভকতি করিআ জেন সর্বলোকে পুজে
পুরাণ বচন জেন সর্বলোকে বুঝে।
নব সসি সুর ইন্দ্র সক পরিমিত
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।

উভয় পুথির পাঠ পরীক্ষা করলে আমরা নিচে লেখা তথ্যগুলো পাই ঃ

১. সমকালীন গৌড়সুলতান ছিলেন সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)।
২. গৌরীমঙ্গলের রচনারম্ভকাল ১৪৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দ। রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটির কবিরচিত পাঠ 'নবশশী সুর ইন্দ্র' কিংবা 'নবশশী সুর ইন্দু' ছিল।

স্থূলাক্ষর উভয় পুথির পাঠভেদ-নির্দেশক। মৎসম্পাদিত গৌরীমঙ্গল দ্রষ্টব্য।

৩. সপ্তগ্রামের **'বালাণ্ডা'** গ্রাম চট্টগ্রামের পুথিতে লিপিকর প্রমাদে **'রণ্ডা'** হয়েছে।

৪. সাহিত্যবিশারদের পুথির আদর্শ কোন পুথিতে হোসেন শাহর নামের চরণটি কোন লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়েছিল। পরবর্তী লিপিকর পদান্তমিল রক্ষার খাতিরে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে 'নৃপতি হোসেন শাহ কলিযুগে **'রাম'** বাদ পড়ায়, প্রথম চরণের **'নাম'** এর সঙ্গে পদান্ত মিল দেওয়ার গরজে লিপিকর তৃতীয় চরণের **'প্রতাপে তপন'**কে **প্রতাপেত পাম** করেছেন। আর আবশ্যিক চতুর্থ চরণটি 'মহাসত্য নরপতি প্রজার পালন' তাকে তৈরি করতে হয়েছে।

৫. কবিচন্দ্র মিশ্রের পিতার নাম বশিষ্ঠ পণ্ডিত–'সশিষ্য' বিকৃত পাঠ। মাতার নাম নীলাবতী বা লীলাবতী।

৬. সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত ৫২ পত্রে সমাপ্ত পুথির ৩৯ক পত্র অবধি সর্বত্র আদেষ্টার নাম পরমেশ্বর দাস। কোথাও কবীন্দ্র নেই। এবং ৩৯খ-৫২ পত্রের মধ্যে কোন ভণিতাতেই পরমেশ্বর দাসের নাম যুক্ত হয়নি।

৭. ক. কোন এক অজ্ঞাত কারণে গৌরীমঙ্গলের গ্রন্থোৎপত্তি অংশে পরমেশ্বর দাস-পরিচিতি এবং ভণিতায় তাঁর নাম সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতীয় পুথি তা-ই প্রমাণ করে।

খ. অথবা চট্টগ্রামের কোন এক অমরত্বলোভী পরমেশ্বর দাস সাহিত্য বিশারদ-সংগৃহীত পুথির আদর্শ পুথিতে লিপিকালে সযত্নে নিজের নাম বসিয়েছেন বন্দনা অংশে ও ভণিতাগুলোতে।

যেভাবেই হোক, দুটো পুথির যে-কোন একটির গ্রন্থোৎপত্তির অংশবিশেষ ও ভণিতা পুনর্লিখিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এখন দুটোর **কোনটি** এবং **কেন** পরিবর্তিত হয়েছে, তা অনুমান করা যাক।

আমরা গৌরীমঙ্গলোক্ত পরমেশ্বর দাস ও চট্টগ্রামের 'পরাগলী মহাভারত' রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি। তার কারণ উভয়েই হোসেন শাহর সমসাময়িক ব্যক্তি। সপ্তগ্রাম অঞ্চলের বালাণ্ডা গাঁয়ে রচিত কবিচন্দ্র মিশ্রের গৌরীমঙ্গলের চট্টগ্রামে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে পরমেশ্বর দাসের নাম মেলে। কবি, কাব্য ও রচনাকাল অভিন্ন। যে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয় বা শাস্ত্রসম্পৃক্ত না হলে দেশের এক প্রান্তের পুথি অন্য প্রান্তে পৌঁছত না, সে যুগে বালাণ্ডার ও চট্টগ্রামের পরমেশ্বর দাস অভিন্ন ব্যক্তি না হলে গৌরীমঙ্গল চট্টগ্রামে প্রচারিত হত বলে মনে হয় না। তাই বালাণ্ডাবাসী ও চট্টগ্রামে প্রবাসী পরমেশ্বর দাসকে একই ব্যক্তি বলে অনুমান করি। অবশ্য অনুমান কখনো প্রমাণের মর্যাদা পাবে না, তাই এ অনুমানের গুরুত্ব সামান্যই।

এখন ৭ সংখ্যক তথ্যের দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চট্টগ্রামের কোন অমরত্বকামী পরমেশ্বর দাস গৌরীমঙ্গলের গ্রন্থোৎপত্তি অংশে ও ভণিতাগুলোতে সযত্নে নিজের নাম বসিয়েছেন—অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলে এ অনুমান বাতিল করা যায়। কারণ তেমন অধ্যবসায়ী জালিয়াত ভণিতা হয়তো পুনর্নির্মাণ করতে পারতেন, কিন্তু অচেনা সপ্তগ্রামের বালাণ্ডায় নিবাস ছিল বলে দাবি করলে নাম ও নিবাসের অসঙ্গতি আদেষ্টা হিসেবে তাঁর অমরত্বের বড় বাধা হয়ে দাঁড়াত–এ বুদ্ধিটুকু তাঁর থাকার কথা! কাজেই আমরা ৭ সংখ্যক তথ্যের প্রথমটিই সত্য বলে মানব।

বলেছি, সাহিত্যিবিশারদ-সংগৃহীত ৫২ পত্রে সমাপ্ত পুথিটির ৩৯ক পৃষ্ঠার ভণিতায় শেষবারের মতো আদেষ্টা পরমেশ্বর দাসের নাম মেলে—পরবর্তী তেরো পাতার ভণিতায় আদেষ্টার নাম যুক্ত হয়নি। অর্থাৎ পুথির ঠিক তিন ভাগে আছে প্রতিপোষকের নাম—শেষ ভাগে নেই। আমরা এর একাধিক কারণ অনুমান করতে পারি ঃ

ক. ৩৯ক পৃষ্ঠার পাঠ রচিত হওয়ার পরে আদেষ্টা ও প্রতিপোষক পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে কবির কোন কারণে সুসম্পর্ক নষ্ট হয় বা বিবাদ বাধে।

খ. ৩৯ক পৃষ্ঠার পাঠ রচিত হওয়ার পরেই পরমেশ্বর দাস চাকরি পেয়ে চট্টগ্রাম চলে যান। তখন কবির ভাতাও বন্ধ হয়ে যায়। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' তত্ত্বে আস্থাবান বিরক্ত কবি কড়ি ফেলা বন্ধ হল বলে প্রাক্তন প্রতিপোষকের নামে ভণিতায় তেল মাখাও বন্ধ করলেন।

গ. রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ কবি পরে তাঁর পাঁচালী থেকে পরমেশ্বর দাসের নাম বাদ দেয়ার জন্যেই সংশোধন করেন গ্রন্থোৎপত্তি অংশ এবং ভণিতাগুলো করেন পুনর্নির্মাণ। আর পরমেশ্বর দাস-পরিচিতির ও পরমেশ্বর-প্রশস্তির স্থলে গাঁয়েব জনগণের আগ্রহ ও অনুরোধজ্ঞাপক অংশ যোগ করেন।

ঘ. রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপোষক পরমেশ্বর দাসকে প্রতিলিপি দেওয়া হত বলে পরমেশ্বর দাসের হস্তগত প্রতিলিপির প্রশস্তি ও ভণিতা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। বালাণ্ডাবাসী পরমেশ্বর দাস গৌড়সুলতান হোসেন শাহ থেকে নিয়োগপত্র পেয়ে গৌরীমঙ্গলের এই প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়েই চট্টগ্রামে পরাগল খানের অধীনে রাজকার্যে যোগ দেন। তাঁর হস্তগত প্রতিলিপিকে পূর্ণতা দানের জন্যে পরে কোন সময় গৌরীমঙ্গলের শেষাংশও সংগ্রহ করেন পরমেশ্বর দাস। চট্টগ্রামে এ ভাবেই প্রচারিত হয় সপ্তগ্রামের কবিচন্দ্র মিশ্র রচিত পূর্ণাঙ্গ গৌরীমঙ্গল।

ঙ. কবিচন্দ্র মিশ্রের আচরণে হয়তো পরমেশ্বর দাস বিশেষ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়েছিলেন। তাই হয়তো স্বয়ং উদ্যোগী হলেন কাব্যরচনায়। 'পরাগলী মহাভারত' তাঁর সেই উদ্যোগেরই প্রসূন। কালিকপ্রথা অনুযায়ী তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করলেন লস্কর পরাগল খানের কাছে। লস্কর পরাগল খানের আগ্রহে বা আদেশে এবং রেওয়াজ মতো তাঁর দেওয়া 'কবীন্দ্র' উপাধি নিয়ে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন মহাভারত কাহিনী।

কবিচন্দ্র মিশ্র-রচিত গৌরীমঙ্গলের প্রমাণে ও তজ্জাত প্রাসঙ্গিক অনুমানে বলা যায়,–পরমেশ্বর দাস ধনী-মানী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা সমাজপতি এবং মহামহিম রূপে সমাজে খ্যাত ও সম্মানিত। তিনি 'গুণবাজ' উপাধিধাবী অথবা তাঁব নামই ছিল গুণরাজ। এমনি পিতার পুত্রেরও ছিল সমাজে প্রভাব-প্রতাপ। তাই তাঁরও ছিল সভা বা দরবারগৃহ। কেবল তা-ই নয়, তিনি কবি পণ্ডিতেরও প্রতিপোষক ছিলেন—গৌরীমঙ্গল তার সাক্ষ্য, কবিচন্দ্র মিশ্র স্বয়ং তাব প্রমাণ। তা ছাড়া বড় ঘরের সন্তান বলেই গৌড় সুলতানের দরবারেরও তিনি অপরিচিত ছিলেন না। তাই দক্ষিণরাঢ়ের বালাণ্ডা গাঁয়ের অধিবাসী পরমেশ্বর দাসকে গৌড়ের সুলতান রাজকার্যে নিয়োগ করে সুদূর চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামের কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশ কাব্যে (১৫৮২-৮৩ খ্রীঃ) বলেছেন,

> লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
> কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি।
> হিন্দু-মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
> খোদা-রসুলের কথা কেহ না সোঙরে। (নবীবংশ–ভূমিকা)

অতএব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস যে পরাগলী মহাভারতকথার রচয়িতা তার ষোল শতকী সাক্ষ্যও মেলে।

কবীন্দ্র-অনূদিত মহাভারতই যে আসামী বিকৃতি লাভ করে আসামে প্রচারিত হয়েছিল, তার সাক্ষ্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশপর্ব মহাভারত'ও। রাজবংশী ভাষায় চালু পরমেশ্বরের মহাভারত' অবশ্য চিরকালের জন্যে আসামের সাহিত্যে সম্পদ হয়ে থাকবে। তবে সম্পাদক গৌরীনাথ শাস্ত্রীর কবীন্দ্রকে নবহরির পৌত্র বাণীনাথ কবীন্দ্রপাত্র বলে প্রমাণের জন্যে যেসব যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, সেসব আমাদের পাথুরে প্রমাণের ঘায়ে বালির বাঁধের মতো, তাসের ঘরের মতো অস্তিত্ব হারিয়েছে।

ডক্টর সুকুমার সেন 'পরাগল' নামটির উৎস সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'পরাগল' সম্ভবত তুর্কীনাম, বিশুদ্ধ উচ্চারণ 'ফরাগল। গুলবদন রচিত 'হুমায়ুননামা'য় এক মওলানা মুহম্মদ ফরাঘলীর নাম মেলে (বাবুর পরিচিতি অংশে)। চট্টগ্রামে পরাগল পরাওল হয়েছে। কর্ণফুলী

নদীর একটি প্রাচীন ঘাটের ও একটি খালের নাম যথাক্রমে পরাওলী ঘাট ও পরাওলী খাল। 'শাহপরীর কিস্সা' নামের মধ্যযুগের একটি বাঙলা গ্রন্থের রচয়িতার নাম পোরওয়াল। কাজেই ফরাঘল পরাগল পরাওল, পরায়ল, পোরওয়াল হয়েছে বলে মনে হয়। পরাগলপুরে পরাগল খানের বংশধর চৌধুরীরা আজো সম্পদশালী এবং উচ্চশিক্ষিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী যে একই লস্কর দরবারের দুজন সমকালীন কবি, তা উভয়ের গ্রন্থ দুটোর 'পরাগলী' ও 'ছুটিখানী' বিশেষণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থেকেও বোঝা যায়। লোকপ্রচলিত এ নাম দুটোও তথ্যপ্রমাণ হিসেবে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। কাব্যসূত্রে প্রমাণ, দুই কবির আদেষ্টাও অভিন্ন নন। পরাগল খানের আগ্রহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পুরো মহাভারত এবং ছুটি খানের [নসরত খানের] আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন।

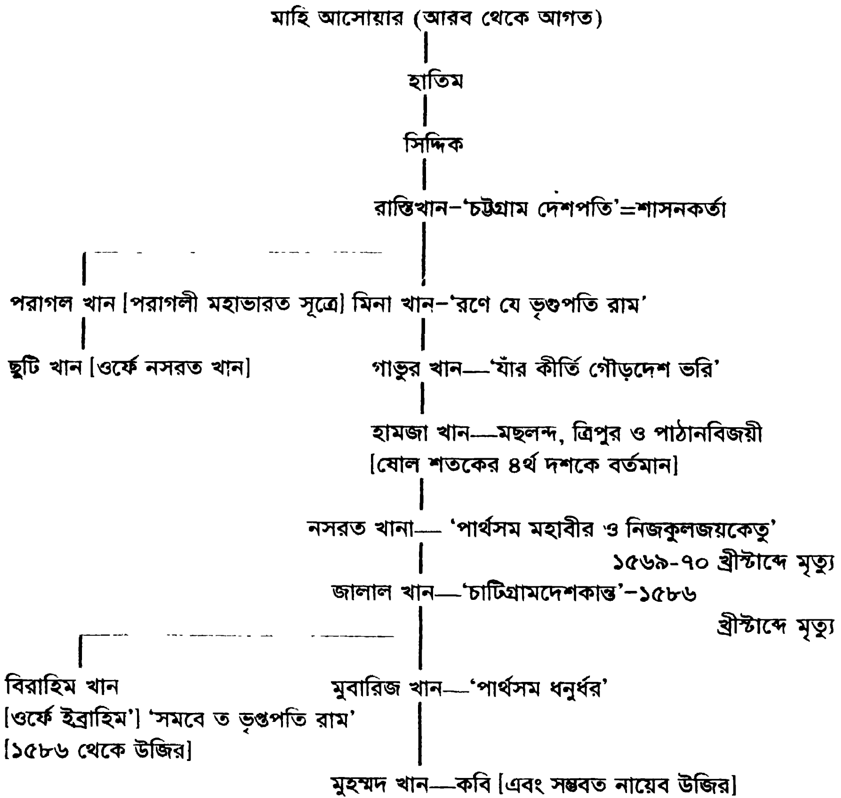
সেকালে বিভিন্ন কবি-রচিত একই বিষয়ক পাঁচালী বা গীতাবলী থেকে শ্রেষ্ঠ বা সুলিখিত অংশ নিয়ে সংকলন তৈরি করতেন গায়ক-কথক-পাঠক-লিপিকরেরা। গাথাসপ্তসতী, সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, দোহাকোষ, চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদাবলী, বাইশ কবির মনসামঙ্গল এবং মধ্যযুগের রাগতাল গ্রন্থ প্রভৃতি তার প্রমাণ। একারণেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে মঙ্গলকাব্য অবধি যেকোন জনপ্রিয় কাব্যেও বিভিন্ন কবির রচনার মিশ্রণ মেলে। এ ছাড়াও পুথির জগতের সন্ধানীরা জানেন,–গায়েন-কথক-লিপিকরেরা ইচ্ছে করে, অজ্ঞতাবশে কিংবা অনবধানতাবশে ভণিতা বদল করতেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের ও শ্রীকর নন্দীর রচনার এবং ভণিতার মিশ্রণ ঘটেছে এভাবেই এবং একারণেই। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে দুজনই মহাভারতের আদি অনুবাদক। অন্য অনুবাদের অভাবে এ দুটোই জিজ্ঞাসুর অবলম্বন ছিল। একারণেই কবীন্দ্রের 'পাণ্ডববিজয়কথা' বা 'ভারতকথা' একসময়ে বাঙলার, উড়িষ্যার ও আসামের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল।

আজকাল অবশ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে বিভ্রান্তির অনেক কুয়াশা কেটে গেছে। এখন কেউ যদি দুজনের গ্রন্থের শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে সব সংশয়-সন্দেহ নির্মূল হবে।

২. পরাগল খান ও ছুটি খান

'সত্যকলিবিবাদসম্বাদ' (রচনাকাল ১৬৩৫ খ্রীঃ) ও 'মক্তুল হোসেন' (রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীঃ) রচয়িতা কবি মুহম্মদ খান তাঁর গ্রন্থে তাঁর পিতৃকূল ও মাতৃকুলের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরও পিতৃপুরুষ রাস্তি খান। চট্টগ্রামের জোবরা গাঁয়ে রাস্তিখানের নামের দীঘি, মসজিদ এবং মসজিদের দেয়ালসংলগ্ন একটি শিলালিপি (১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ) রয়েছে। শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাতা রাস্তি খানের নাম এবং রুকনউদ্দীন বারবক শাহর প্রশস্তি রয়েছে। রাস্তি খানের উপাধি ছিল মজলিস-ই-আলা। অতএব রাস্তি খান ছিলেন রুকনউদ্দীন বারবক শাহর অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা।

পরাগলী মহাভারতের পরাগল খানকে রাস্তি খানের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ-কাল ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে পরাগল খানের পিতা রাস্তি খান এবং কবি মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষ রাস্তি খান অভিন্ন ব্যক্তি। উভয়েই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। অতএব, মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষ মিনা খান ও পরাগল খান উভয়েই ছিলেন এই রাস্তি খানের সন্তান। তবে তাঁরা সহোদর না-ও হতে পারেন। সাধারণত পিতৃপুরুষের পরিচয়দানকালে দুপুরুষ আগেকার কোন পুরুষের শাখা-প্রশাখার উল্লেখ বাহুল্যবোধে কেউ করে না। কেবল পিতৃপরম্পরার নামই থাকে। মুহম্মদ খানও রাস্তি খানের অন্য সন্তানের নাম উল্লেখ করেননি, যেমন স্বকালেও করেননি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী। মুহম্মদ খান তাঁর পিতৃব্য বিরাহিম ছাড়া সর্বত্রই কেবল একক পুত্রপরম্পরার নামই লিখেছেন। ছকে কবি মুহম্মদ খান প্রদত্ত বংশলতা এরূপ ঃ



হামজা খান থেকে জালাল খান অবধি সবাই আরাকান রাজ্যের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা যে ছিলেন তা চট্টগ্রামের ইতিহাস, স্থানীয় ঐতিহ্য বা কীর্তিচিহ্ন-সূত্রে জানা যায়।

ইতিহাসসূত্রে আমরা জানি হোসেন শাহ্ আরাকানরাজের ও ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে চট্টগ্রাম (১৫১২ সনে) ও ত্রিপুরার কিছু অংশ অধিকার করেন। এতেই বোঝা যায় রুকনউদ্দীন বারবক শাহর তথা রাস্তি খানের পরে কোন সময়ে সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম গৌড়সুলতানের হস্তচ্যুত হয়। ১৫৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে সম্ভবত চট্টগ্রাম আবার আরাকান রাজ্যের দখলে আসে, যদিও গৌড়সুলতান এবং ত্রিপুরারাজ মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রামের উপর হামলা চালাতেন বা নিতান্ত সাময়িক অধিকারও পেতেন। ১৬৬৬ সনেই শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান আরাকানীদের বিতাড়িত করে উত্তর চট্টগ্রাম স্থায়িভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

কাজেই আমাদের আপাত অনুমান ঃ ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের দিকে গৌড়সুলতান চট্টগ্রাম দখল করেন এবং প্রাক্তন শাসনকর্তা রাস্তি খানের পুত্র পরাগল খানকে লস্কর পদ (উজির-সেনাপতি) দিয়ে ফেনী নদীর নিকটস্থ পরাগলপুরে সীমান্ত রক্ষী সেনানী-শাসক নিযুক্ত করেন। কাব্যসূত্রে জানা যায় পিতা পরাগল ও পুত্র ছুটি খান উভয়েই ত্রিপুরারাজের আক্রমণ ঠেকিয়েছেন। চট্টগ্রামের মূল ভূখণ্ডে তখন হয়তো মিনা খান ও তাঁর পুত্র গাভুর খান গৌড়সুলতানের প্রতিনিধিরূপে পর পর

শাসনকর্তা ছিলেন। দরবারে কবি পুষে পরাগল-ছুটি খান বিশ্রুত ও অমর। আর কবির স্তুতিবঞ্চিত মিনা খান-গাভুর খান আজ বিস্মৃত। মনে হয় পরাগল খান ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এবং ছুটি খান ওর্ফে নসরত খান ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যথাক্রমে পরাগলী ও ছুটি খানী মহাভারত বচনা করিয়েছিলেন।

কবীন্দ্রের উক্তি অনুসারে সেনানীশাসক লস্কর পরাগল খান বৃদ্ধ। তিনি পুত্র-পৌত্র নিয়ে বসবাস করছেন ['পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি']। মিনা খান তাঁর বড় কি ছোট ভাই, তা আমরা জানিনে বটে, তবে তাঁকেও রাস্তি খানের সন্তান হিসেবে তখন বৃদ্ধ বলে অনুমান করাই সঙ্গত। বৃদ্ধ পরাগলের জ্যেষ্ঠপুত্র ছুটি খান তখন পুরো প্রৌঢ় না হলেও অবশ্যই যৌবনের প্রান্তসীমায় বলে মানতে হবে। কেননা আমরা মিনা খানের পৌত্র হামজা খানকে ১৫৩৮-৪০ খ্রীস্টাব্দের দিকে উত্তর চট্টগ্রামের শাসক হিসেবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসক খুদাবখ্সের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ দেখি। এসব অনুমান মিনা খানের বংশধর ও সতেরো শতকের প্রথমার্ধের কবি (গ্রন্থরচনাকাল ১৬৩৫ ও ১৬৪৬ খ্রীঃ) মুহম্মদ খানের বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বংশলতার সাক্ষ্যে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে পরাগল খানেরা বহুপুরুষ ধরে চট্টগ্রামের অধিবাসী—গৌড়াগত বা বহিরাগত নন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পরাগল খানকে 'রুদ্রবংশ রত্নাকর' বলে অভিহিত করায় রাস্তি খানকে কেউ কেউ হিন্দুবংশোদ্ভব বলে বিশ্বাস করেন। 'শ্রীবাৎস্য চরিতম্' (১৯১৫ সনে প্রকাশিত) গ্রন্থে লেখক জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ তাঁকে আধুনিক পটিয়া অঞ্চলের এক বিদ্রোহী সামন্ত প্রতাপরুদ্রের বংশধর বলে অনুমান করেছেন। আরব থেকে আগত আদিপুরুষ মাহি আসোয়ার ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেন বলে কবি মুহম্মদ খান সূত্রে জানা যায়। সে-বধূ রুদ্রবংশীয়া ছিলেন বলে অনুমান করে একটি সহজ সমাধান দিয়েছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। আমাদের মনে হয় 'সাহসীযোদ্ধা' অর্থেই রুদ্রবংশরত্নাকর, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি রূপক ব্যবহৃত। তোয়াজস্তুতির ভাষা চিরকালই অতিশয়োক্তি-দুষ্ট।

কবীন্দ্রের উক্তি অনুসারে সেনানী-শাসক হিসেবে পরাগল খান বৃদ্ধ। তিনি পুত্র-পৌত্র নিয়ে বসবাস করছেন। তাহলে ছুটি খানও তখন অন্তত চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের। পিতৃব্য মিনা খানও তখন নিশ্চয়ই প্রৌঢ় (পরাগলের সঙ্গে ২০ বছরের পার্থক্য থাকলে)। অতএব গাভুর খানও ছুটি খানের কনিষ্ঠ সমসাময়িক। এভাবে অনুমান করলে ১৬৪৬ সনে প্রৌঢ় মুহম্মদ খানকেও পাওয়া যায়। মীনা খান পুত্র গাভুর খান কীর্তিমান বটে, কিন্তু সে কীর্তি কোন্ ক্ষেত্রে অর্জিত বলা হয়নি। হামজা খান সম্ভবত আরাকান রাজেব হয়ে ত্রিপুরাবাহিনীকে পরাজিত করেন—অন্যরা ছিলেন আরাকানরাজের অধীনে চট্টগ্রামশাসক। যে কোন কারণে হোক ব্যাসভারতের অনুবাদক জৈমিনিভারত থেকে অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ না করায় সে কাজ করলেন শ্রীকর নন্দী। কাজেই শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টা যে ছুটি খান নন—পরাগল খানই—সুখময় মুখোপাধ্যায় এমত স্বীকার করেন না। কারণ কোন কোন অংশ আদেষ্টারূপে ছুটি খানের নামও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মতের সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ শ্রীকর নন্দীর নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির প্রতি বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি ঃ

ক. খান পরাগল সুত দানে কল্পতরু
পিতার দুর্লভ বড় গুরুভক্তি চারু।
চিরজীবী হউক নৃপতি ছুটি খান
বলি কর্ণ দধীচি সমান যার দান।
তাহার আদেশ পাঞা পয়ার রচিল
জয়মুনি (জৈমিনি) পুরাণ গ্রন্থ যেরূপ দেখিল।
শ্রীকর নন্দী কহে বিচারিয়া পোথা
পরম রহস্য ভারতের পুণ্য কথা।

খ. খান পরাগল সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
মেদিনী মণ্ডল সমসর
বন্ধুকুল বিকাশক অবিমল কমলক
পুত্র লভে যেন শশধর।
লস্কর ছুটি খান কর্ণসম যার দান
বলবন্ত ভীমসেন সম।
তাহার আদেশ লভি শ্রীকর নন্দী যে কবি
পোথা খণ্ড কৈল অনুপম।

পরাগলের রাজকর্মে সহকারী ও যুদ্ধে সহযোগী এবং রাজকর্মচারী ও বয়স্কপুত্র ছুটি খানের তোয়াজ-স্তুতিও কবিদ্বয় স্বাভাবিক সৌজন্যবশে ও পিতা-পুত্রের সন্তোষ সঞ্জাত অনুগ্রহলোভে না করে পারেন নি। শ্রীকর নন্দী যেমন করেছেন—হোসেন শাহ ও নুসরৎ শাহের নাম—

নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা
রামবৎ নিত্যপালে সব প্রজা।
নৃপতি হোসেন শাহ্ হএ ক্ষিতিপতি
পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম যে খ্যাতি।-শ্রীকর নন্দী

অন্য পাঠ ঃ নসরত সাহ নাম অতি মহারাজা
পুত্র সম রক্ষা করে সকল পরজা।
নৃপতি হোসেন শাহা তনয় সুমতি
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী- [ঐ]

তাই উভয় কবির রচনায় ঘন ঘন ছুটি খানের নাম ও প্রশস্তি এসেছে। এবং তা একালে গবেষকদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিভ্রান্তির কারণ বিভিন্ন পুথিতে পণ্ডিতদের প্রাপ্ত গায়েন-লিপিকর প্রমাদ জাত কিছু ভণিতা—

১. খান পরাগল সুত পিতৃভক্ত অতি
বাপের সংহতি সে নৃপতি সেনাপতি।- [শ্রীকর নন্দী]

২. চিবকাল জীবন্ত লস্কর ছুটি খান
যাহার লভিয়া সে প্রেম সন্নিধান।
শ্রীকর নন্দী এ যে পয়ার রচিল।
জৈমিনি কহিলেক যেহেন দেখিল। – [শ্রীকর নন্দী]

৩. লস্কর পরাগল খানের তনয়
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়।
তাহার যতেক গুণ শুনিয়া নরপতি
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি।
নৃপতি অগ্রেত তার বহুত সম্মান
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান।
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ
পর্বত গহ্বরে গিয়া কবিল প্রবেশ। -[শ্রীকর নন্দী]

৪. লস্কর পরাগল গুণের সাগর
তাহান আদেশ মাল্য মাতে আরোপিয়া
শ্রীকর নন্দী এ কহে পঁঞ্চালী রচিয়া।

৫.	লস্কর যে পরাগল প্রণমিল বহুতর
নাম কীর্তি বাড়ে দিনে দিনে।।
শ্রীকর যে নন্দী কবি তাহার বচন ধরি
রচিলেক পাঞ্চালী প্রকার।

৬. শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি/ কুতুহলে পুছিলেন্ত ভারত কাহিনী।
পুরাণ ভারত কথা পাঞ্চালী রচিয়া/শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালী রচিয়া। [অসিত বন্দ্যোঃ]

৭. লস্কর ছুটি খান/কর্ণসম যার দান/মেদিনী মহিমা সম মযার।
তাহান আদেশ মাথে / যুধিষ্ঠির নরনাথে/কবীন্দ্রে যে রচিল পয়ার। [ঢা. বি. পুথি]

৮.	শ্রীচরণ বন্দিয়া অশ্বমেধ সমর্পিয়া
শেষ কহি কবীন্দ্র কৃত সব বিরচিয়া
অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কখন
কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ। [দীনেশচন্দ্র সেন]

অনুমিত পাঠ ঃ শ্রীচরণ বন্দিয়া অশ্বমেধ সমর্পিয়া
শেষে কহি কবীন্দ্র না কৈল সব বিরচিয়া
অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কখন
কবীন্দ্র রচিত গাথা অলিখিত কারণ।

৯.	অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী
পিবন্ত ভকত জনে দুই কর্ণ ভরি।
লস্কর পরাগল খান তনয়
কর্ণসম দাতা ছুটি খান মহাশয়।
তাহান আদেশ মালা মাথে আরোপিয়া
কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাঞ্চালী রচিয়া।

১০.	অশ্বমেধ যজ্ঞ শত তন্ত্রের সার
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পয়ার।

১১.	তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল—

১২.	অশ্বমেধ যথতথ তন্ত্রের সার
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পয়ার।
লস্কর পরাগল খানের তনয়
সংগ্রামে বিজয় খান মহাশয়।
অষ্টাদশ ভারতের পুরাণ বাখান
রাত্রি দিন ভারতের কথা অবধান
অশ্বমেধ সমাপিয়া হরষিত মন
স্বর্গেতে হইল তবে পুষ্পি বরষণ। [মুদ্রিত কাব্য, পৃঃ ১৪০]

উভয় কবিই যে হোসেন শাহর জীবিতকালেই নব বিজিত চট্টগ্রামের সীমান্তে সামরিক শাসনকেন্দ্র পরাগলপুরে (সৈয়দ সুলতান-লস্করের পুরখানি আলিম বসতি/ কবীন্দ্র ভারত কথা রচিল বিচারি ইত্যাদি) বসেই পরাগল খানের অভিপ্রায়ক্রমে কাব্য দুটো রচনা করেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ পাঁচালী দুটোতেই রয়েছে। অতএব কাব্য দুটো ১৫১৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত। শ্রীকর নন্দীর পাঁচালী অশ্বমেধপর্ব সম্ভবত ১৫১৭-১৮ সনে রচিত। গ্রন্থ দুটোর যথাক্রমে

পরাগলী ও ছুটি খানী নাম পরবর্তীকালে পাঠকের বা গায়েন লিপিকরেরা চালু করেছেন বলে এ শতকের বিদ্বানরা স্বীকার করেছেন। তবে পিতা-পুত্রের নামে চিহ্নিত 'পরাগলী' ও 'ছুটি' খানী মহাভারতও দুই কবির দুই আদেষ্টা নির্দেশ করে। লোক প্রচলিত এই নামও তথ্য-প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবার যোগ্য।

কাব্যসূত্রে জানা যায় পরাগল ও ছুটি খান উভয়েই রণনিপুণ, সাহসী যোদ্ধা ও বিজয়ী ছিলেন। ছুটি খানও পরে কোন সময়ে রাজ্য পুনরুদ্ধারকারী ত্রিপুররাজকে পরাজিত করেছিলেন। উভয়ের কর্মে ও আনুগত্যে হোসেন শাহ তুষ্ট ছিলেন। ছুটি খান সম্পর্কে শ্রীকর নন্দী লিখেছেন ঃ

লস্কর পরাগল খানের তনয়
সমরে নির্ভীক ছুটি খান মহাশয়।
তাহার যথেক গুণ শুনিয়া নরপতি
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি।
নৃপতি আগ্রেত তার বহুত সম্মান
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান।
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ
গজবাজী কর দিয়া করিল সম্মান
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ।
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি—
তথাপি আতঙ্কে থাকে ত্রিপুর নরপতি।
আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া সবিশেষ
সুখে বৈসে লস্কর আপনার দেশ।

পিতা পুত্র উভয়েই রাজকর্মচারী—শাসক পিতা বড় খানের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশক (তুল ঃ বড় সাহেব ছোট সাহেব) ছোট বা ছুটি খানের প্রকৃত নাম নসরত খান—

লস্কর পরাগল খানের তনয়
শুনিয়া যজ্ঞের কথা সরস হৃদয়।
ছুটি খান নাম নরসত মহামতি
পশ্চাতে কি হৈল হেন বুঝিল ভারতী।
শ্রীকর নন্দী এ কহে শুনিয়া সংহিতা
জয়মুনি (জৈমিনি) কহিলেক ভারতের কথা।

পরাগলকে দানশীল বলে বারবার উল্লেখ করেছেন কবীন্দ্র—

লস্কর পরাগল খান/মহাদাতা কর্ণসম/দারিদ্র্য ভঞ্জায় নিত্যনিত্য
শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি/দরিদ্র ভুঞ্জন যেই অনাথের গতি।

পরাগলপুরের চৌধুরীরা পরাগল খাঁর বংশধর বলে পরিচিত।

মুহম্মদ খানের পিতৃকুল পরিচিতি সূত্রে জানা যায় রাস্তি খান থেকে মুহম্মদ খানের পিতৃব্য ইব্রাহিম বা বিরাহিম খান অবধি প্রায় পৌনে দুইশ' (আনুমানিক ১৪৫০-১৬৩০) বছর ধরে এ বংশ প্রশাসক রূপে কিছুকাল গৌড়ের অধীনে বাকি কাল আরাকান রাজের অধীনে চট্টগ্রাম শাসন করেছেন। পরাগল খানকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস 'রুদ্রবংশ রত্নাকর' বলে অভিহিত করায় কেউ কেউ রাস্তি খানকে হিন্দু বংশোদ্ভব বলে বিশ্বাস করেন। শ্রীবাৎস্যচারিতম্ গ্রন্থে জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে প্রতাপরুদ্র নামের এক বিদ্রোহী সামন্তের বংশধর বলে মনে করেছেন। মাহবুবুউল আলমও এ তথ্যে আস্থা রাখেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় মুহম্মদ খানের উক্তির অনুসরণে একটা সহজ ব্যাখ্যা

দিয়েছেন। তাঁর মতে মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষ মাহি আসোয়ার আরব থেকে এসে চট্টগ্রামে এক ব্রাহ্মণী বিয়ে করেছিলেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অনুমান এ ব্রাহ্মণ কন্যা আসলে রুদ্র বংশীয়া ছিল।

কিন্তু 'রুদ্র বংশ রত্নাকর' কিংবা 'ক্ষত্রিয় বংশ' রূপকার্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। সাহসী যোদ্ধা বংশে জন্ম বলেই হয়তো তোয়াজের ভাষায় হিন্দু কবি রুদ্র (তেজস্বী) এবং যোদ্ধা শাসক বংশীয় রূপে ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছেন।

কাজেই রাস্তি খানের পুত্র পরাগল খান ও পৌত্র ছুটি খান ওর্ফে নসরত খান চট্টগ্রামবাসীই ছিলেন—গৌড়াগত নন। এবং তারা ছিলেন ফেনী নদীর তীরে পর্বত গোড়ায় ত্রিপুরারাজ্য সীমার অদূরে সীমান্তরক্ষী সেনানী শাসক।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরদাস সংস্কৃতজ্ঞ কবি। কবিত্ব তেমন উঁচু শ্রেণীর না হলেও সুবিন্যস্ত ভাষায় প্রাঞ্জল করে বক্তব্য প্রকাশে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দগতি। শ্রীকর নন্দীর ভাষা আড়ষ্টতাদুষ্ট এবং কবিত্বগুণেও দরিদ্র।

৩. ষোল শতকের মহাভারত

৩. রামচন্দ্র খান ঃ কাব্যে কবির আত্ম-পরিচয় আছে ঃ

কবির গুরু ঃ
কঙ্কগ্রাম স্থান আছে মধ্য রাঢ়া দেশ
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্বকাল বৈসে।
সেই গুরু প্রসাদে মোর ধর্মে হৈল মন
অশ্বমেধ কথা কহো শমন দমন।

কবির আত্মকথা ঃ
রাঢ়া দেশে বসতি আছএ পুণ্য স্থানে
দণ্ড সিমলিয়া ডাঙ্গা সর্বলোকে জানে।
কায়েত (ব্রাহ্মণ) কুলেতে জন্ম লস্কর [দণ্ডত] পদ্ধতি
কাশীনাথ জনক জননী পুণ্যবতী
রামচন্দ্র খান কৈল পাঞ্চালী [কবিত্ব]বচন
সপ্তদশ কথা সব শ্লোক [সংস্কৃতে] বন্ধ
মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ।

ভণিতা ঃ
জন্ম জন্মান্তরে ভক্তি রহু নারায়ণে
অশ্বমেধ কথা কহে রামচন্দ্র খানে।

পাঠান্তরে ঃ
কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ নিবাস জঙ্গপুর, পিতার নাম মধুসূদন।
স্বদেশে বসতি ভাগরথী পুণ্যস্থানে
জাঙ্গিপুর সহর নাম সর্বলোকে জানে।

রামচন্দ্র খান সম্ভবত সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন, তাঁর অবলম্বন ছিল জৈমিনি ভারত। কিন্তু তাঁর কেবল অশ্বমেধ পর্বেরই তিনখানি পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। রামচন্দ্র খান গৌড়-সরকারে লস্কর ছিলেন। তিনি সম্ভবত সীমান্তরক্ষী সেনানী ছিলেন। চৈতন্যভাগবত সূত্রে জানা যায় চৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রায় তিনি তাঁকে সীমান্ত অতিক্রমণে সাহায্য করেছিলেন। রামচন্দ্র খান স্থানীয় জমিদারও ছিলেন এবং ছত্রভোগে গিয়ে চৈতন্য শিষ্য হন। দুটো পুথিতে রচনাকালও রয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শুদ্ধপাঠ হবে ইন্দ্রবেদ ইষু যুগ (১৪৫২/৫৪ শক=১৫৩২-৩৩/৩৪-৩৫ খ্রীঃ)

কিংবা ইন্দুবেদ মুনি যুগ (১৪৭২/৭৪ শক = ১৫৫০-৫১/৫২-৫৩ খ্রীঃ)

রচনার নমুনা ঃ

পুত্র যোগিনাশ্ব মাতাকে তীর্থ ভ্রমণে পাঠাতে চাইলে মাতা উত্তরে বলেন ঃ

বুড়ি বোলে কিবা কার্য গোবিন্দ সেবিএগ্রা
কিবা কার্য গঙ্গাস্নানে যজ্ঞস্থানে গিএগ্রা
ধর্মকার্যে গৃহকার্য সব নষ্ট হৈব
ধান্য গোধূম শস্য কেবা সম্বরিব।
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈল সব নষ্ট হৈব
দাসীগণ বধূগণ সব ভ্রষ্ট হৈব।
সকল সম্পদ যাবে কথায় মন দেহ
না পারো যাইতে পুতা আর না বলিহ।[১]

৪. **দ্বিজ রঘুনাথ**–দ্বিজ রঘুনাথের 'অশ্বমেধ পর্ব'-এর একটি মাত্র পুথি সংগৃহীত হয়েছে। লিপিকাল ১৫৪৬ শক, ১০৩১ সাল তথা ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দ। কবি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের আশ্রিত ও তাঁরই নির্দেশে ভারত পাঁচালী রচনায় হাত দেন। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে সুলায়মান কররানী উড়িষ্যা অধিকার করেন। অতএব মুকুন্দের প্রতিপোষণে কবি দ্বিজ রঘুনাথ তার আগেই কাব্য রচনা করেছেন বলে স্বীকার করতে হবে।

৪. সতেরো শতকের মহাভারত

সঞ্জয়কৃত মহাভারত

ডক্টর দী.নেশচন্দ্র সেনই প্রথম সঞ্জয়কৃত মহাভারতের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর ধারণায় সঞ্জয়ই বাঙলাভাষায় মহাভারতের আদি অনুবাদক। তিনি কৃত্তিবাসের সমকালীন অর্থাৎ চৌদ্দশতকের কবি এবং পরে ষোল শতকের প্রথম পাদে তাঁর মহাভারতই সংক্ষিপ্ত আকারে প্রচার করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত তথাকথিত 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত'-এর ভূমিকায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মত খণ্ডন করে বলেছেন যে বিজয় পণ্ডিতই (তথা এখনকার কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস) মহাভারতের আদি অনুবাদক এবং সঞ্জয় মূলত তাঁর পাঁচালীকে কিছু কিছু স্বরচিত সংযোজনের মাধ্যমে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। "এক ব্যক্তি [কবীন্দ্র] রচনা করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি [সঞ্জয়] তাহাই নকল করিয়াছেন।" প্রবন্ধকার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেও কবীন্দ্রের রচনাই সঞ্জয় ভণিতায় চালু হয়েছিল, "সঞ্জয় মহাভারত ও পরাগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রন্থ।"[২]

মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে কবির প্রকৃত নাম হরিনারায়ণ দেব এবং তার তাখাল্লুস বা কবিনাম সঞ্জয়। আরো কয়েকজন প্রবন্ধকার সঞ্জয় সম্বন্ধে আলোচনা করে কোন গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি।

ডক্টর সুকুমার সেন সঞ্জয়কে পরোক্ষ নকলবাজ বলেই মনে করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬৯ সনে) ডক্টর মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত প্রকাশিত হওয়ার পরেও—ক. [illegible] সঞ্জয় ওর্ফে হরিনারায়ণ দেবকে সতেরো শতকের কবীন্দ্র-অনুকারক ভরদ্বাজবংশীয় [illegible]ক্ষণ বলে মনে করেন। খ. ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সিদ্ধান্ত এই "কবীন্দ্রের পরে সঞ্জয় নামীয় (ইহা ছদ্ম নাম হইতে পারে, আসল নাম হয়তো হরিনারায়ণ) কোন কবি বা লিপিকার বা পাঁচালী গায়ক কবীন্দ্রের রচনাকে নিজের বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া এবং কোন কোন অংশকে এ[illegible]টু আধটু বর্ধিত করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া একখানি নতুন

১. ডক্টব সুকুমাব সেন ১ম/পূ/৩য় পৃঃ ২৫৪-৫৫।

২. ১৩৩৪-সা-প-প।

মহাভারতের অনুবাদের কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছেন।—কবীন্দ্রের রচনাকে অবলম্বন করিয়া কোন অল্পমেধাবী লেখক লিপিকাব বা পাঁচালী গায়ক পৌরাণিক সঞ্জয়ের নামেব অন্তরালে বসিয়া কবীন্দ্রের যশে ভাগ বসাইয়াছেন"।[১]

ডক্টর মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ দীর্ঘ সাত বছর ধরে কঠোর কায়িক মানসিক শ্রম স্বীকার করে সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত সম্পাদনা করেছেন। তিনি প্রাপ্ত সব খণ্ড-অখণ্ড পুথিও সযত্নে পরীক্ষা করেছেন। তাঁরও স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে ক. কবির নাম সঞ্জয়—হরিনারায়ণ (গতি, বেদ, দেব) নয়।

খ. কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং সম্ভবত সিলেটের সুনামগঞ্জের অন্তর্গত সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ লাউড়ে অদ্বৈতাচার্যাদির একই বংশে জন্ম।

গ. সঞ্জয়ই বাঙলাভাষায় মহাভারতের আদি বা প্রথম অনুবাদক। কবীন্দ্র সঞ্জয়েরই পাঁচালী সংক্ষিপ্ত করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনও এ মতই পোষণ করতেন।[২]

ডক্টর মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ ২২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ সযত্নে একত্রিত করেছেন। এজন্যে বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস পাঠক ও গবেষকমাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকবেন। কিন্তু তাঁর ভূমিকা কাঁচা মন, তরলযুক্তি, পুনারাবৃত্তি এবং অপটু অসংহত বিন্যাস-দোষের সাক্ষ্য বহন করে। ২২৭ পৃষ্ঠার এ ভূমিকা ৫০ পৃষ্ঠায় সংহত হতে পারত। পুনরাবৃত্ত তথ্য পাঠককে কেবল বিভ্রান্তই করে, সাহায্য বা উপকৃত করে না।

১. তার প্রথম সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বিভিন্ন পুথিতে হরিনারায়ণের কয়েকটি ভণিতা মিলেছে, হরিনারায়ণ নামের অন্য কোন মহাভারত রচয়িতার সন্ধান না মিললেও ঐ নাম লিপিকরের বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। 'দ্রৌপদী যুদ্ধ' নামের নতুন আখ্যানটির রচয়িতা রামকৃষ্ণ দাস যে নন, (পদবন্ধ রচি রামকৃষ্ণ দাস কএ) তারও প্রমাণ আবশ্যিক। এবং 'সঞ্জয় কবি নামে রচে পাঞ্চালী প্রচার' -এর একটি গ্রহণীয় ব্যাখ্যা দরকার।

২. কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হতে পারেন কিন্তু 'দেবকুলে (অংশে) উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার'—ইনি কবি সঞ্জয় না 'মহাভারত' কথক আদি সঞ্জয় ?

সুদূর আর্যাবর্তের মহাকাব্যের একটি চরিত্র রাজা ভগদত্ত যে লাউড়বাসী ছিলেন তা কিংবদন্তী সূত্রে জানার উল্লাস বশে তাঁর পাঁচালীতে সে তথ্য বারবার পরিবেশন করে কবি আনন্দিত হয়েছেন। কবি হয়তো দৈশিক জ্ঞাতিত্বচেতনায় গর্বও বোধ করেছেন, আমরা যেমন স্বদেশী বলে গৌরব বোধ করি অশোক, অজন্তা, তাজমহল, পাণিনি, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির জন্যে। আর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণও বাঙলাদেশে দুর্লভ নয়। কাজেই সঞ্জয় লাউড়বাসী ছিলেন এ নিতান্তই অনুমান। অবশ্য সঞ্জয় যে পূর্ববঙ্গবাসী, তার সাক্ষ্য তাঁর পাঁচালীর প্রতিলিপির পূর্ববঙ্গে সিলেটে, কুমিল্লায় বহুল প্রাপ্তি। এসব অঞ্চলের কোথাও তাঁর বাড়ি ছিল। সঞ্জয় যে মহাভারতের আদি অনুবাদক নন, সৈয়দ সুলতানের উক্তি ছাড়াও অন্য প্রমাণ হচ্ছে–আসামে পশ্চিমবঙ্গে ও উড়িষ্যায় তথাকথিত বিজয় পণ্ডিতের বা কবীন্দ্র-শ্রীকর নন্দীর পুথির বহুল প্রচার, এবং গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত আসামের কবীন্দ্র মহাভারত। সঞ্জয় মহাভারতের পুথি পূর্ববঙ্গের একটা সীমিত অঞ্চলের বাইরে মেলেনি। সরস ও শ্রেষ্ঠ বলে নয়, আদি ও একমাত্র বলেই কবীন্দ্রকৃত মহাভারত উৎসুক গায়ক পাঠকদের আগ্রহে ও প্রয়োজনে তিন প্রদেশে বহুল প্রচারিত হয়েছিল।

৪. কবিবর অদ্ভুত সঞ্জয় যে গুণযুত / সঞ্জয় যে কবিবর অতি বিচক্ষণ।
সঞ্জয় কহিল কবি ভবরিত্রাতা/ভণে কবিরাজ যে সঞ্জয়।

ইত্যাকার ভণিতা এবং 'দেবকুলে জন্ম ব্রাহ্মণ কুমার' পরিচিতি দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী সঞ্জয়ের, না বাঙালী পাঁচালীকার সঞ্জয়ের তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না।

---

১. বা-সা-ই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১০, ৬১৩।

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৭ম সং ১৪২।

৫. কবি হরিনারায়ণ দেব যদি সঞ্জয় এই ছদ্মনামে বা ডাকনামে অথবা কবিনামে পাঁচালী লিখবেন বা গাইবেন বলে সংকল্প করে থাকেন এবং সর্বত্র সে নামই ব্যবহার করেন আর ক্বচিৎ যদি প্রকৃত নামে দু'একটি ভণিতা দিয়ে থাকেন, তা হলে প্রকৃত নামটি প্রক্ষিপ্ত বলে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। নিঃসংশয় হতে হলে হরিনারায়ণ দেবের 'মহাভারত' বা কোন গায়েন-লিপিকর হরিনারায়ণ দেব-এর নাম অন্য কোন পুথিতে আবিষ্কার করতে হবে। বিশেষ করে সঞ্জয় যদি কবির প্রকৃত নাম হত, তা হলে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজে এতোগুলো ভণিতার দু'একটি স্থলে হলেও (এমনকি ছন্দের খাতিরেও) কবির সঞ্জয় নামের সঙ্গে কুলপদবীও [অন্তত দ্বিজ যুক্ত] হত। তাহলে দু' সঞ্জয়ের ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের জন্যে এমন আকুলভাবে 'সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়ের। সঞ্জয়ে রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা/ সঞ্চয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে বাখানে। সঞ্জয়ের কথা শুনি সঞ্জয়ের কথা পুনি/সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে প্রকাশে।' এমনি সব ভণিতার প্রয়োজন হত না। বাঙালী কবি সঞ্জয় স্বয়ংই এ সব ভণিতা যোগেই পাঠক গবেষক মনে সন্দেহ জাগিয়েছেন। তার প্রকৃত পরিচয় যেন রহস্যাবৃত। যাঁরা সঞ্জয়কে কবিযশ লোভে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মহাভারতে নিজের নাম ও রচনা যোগ করেছেন বলে অনুমান করেন, দ্বিজ বা 'কুলপদবী' ব্যবহার না করার পিছনে ঐ জালিয়াতি বাঞ্ছাই ক্রিয়াশীল ছিল বলে তাঁরা বিশ্বাস করবেন। এমনি কিছু অভিসন্ধি যদি না-ই থাকবে, তাহলে হাজারো বার মহাভারতীয় সঞ্জয়ের নাম এতো ঘটা করে উচ্চারিতই বা হবে কেন? অনুবাদ তো আরো অনেকেই নানা গ্রন্থের করেছেন, তাঁরা তো মূল কবির নাম এতো বার উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেননি—

৬. ক. সঞ্জয়ে পয়ারে কথা কহিল জেন মত
হেন মতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত।
খ. কর্ণপর্ব সঞ্জয়ে কহিল জেন মত
হেন মত কেহ নাহি রচয়ে ভারত।

এ দুটো ভণিতা সম্বলিত উক্তিই প্রমাণ করে যে সঞ্জয় নিজেও আদি অনুবাদক বলে দাবি করেন না। এর সরল অর্থ তাঁর দাবি, এমন সুষ্ঠু বা বিস্তৃত বা প্রাঞ্জল বা সরস করে আর কেউ অনুবাদ করেনি।

৭. 'ভারত সমুদ্র অতি অন্ধকারময়/প্রদীপ জ্বালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয়/
অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর/পাঁচালী সঞ্জয়ে তাকে করিল উজ্জ্বল।

—ইত্যাকার বক্তব্য দেখে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয়কে আদি কবি বলে মনে করেছিলেন, ডক্টর মুনীন্দ্র ঘোষও তাই বিশ্বাস করেন। উভয়ের যুক্তি অভিন্ন। কিন্তু আমরা যদি চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল বা মনসামঙ্গলের পুচ্ছগ্রাহী কবিদের কাব্য রচনার কারণ বর্ণন সূত্রে দেয়া গতানুগতিক যুক্তি স্মরণ করি, তা হলে এসব কথা মধ্যযুগীয় কবির প্রথাসিদ্ধ বাগাড়ম্বরে বা আত্মম্ভরিতা বলেই মানতে হবে। এক্ষেত্রে 'ইউসুফ-জোলেখা' রচয়িতা সগীর, আবদুল হাকিম ও গরীবুল্লাহর স্ব স্ব উক্তি স্মর্তব্য। এক্ষেত্রে আরো একটি কথা বিবেচ্য ঃ সেকালে যানবাহনের সুবিধে ছিল না বলে সাধারণ গ্রন্থাদির প্রচার অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করত না। এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের গ্রন্থের নামও শুনতে পেত না। কাজেই অনেকেই স্ব স্ব অঞ্চলে পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারত। কিন্তু আগেই বলেছি সঞ্জয়ের সততা প্রশ্নাতীত নয়।

এ প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায়ও (কালক্রম পৃঃ ২০) বলেন—দীনেশচন্দ্র সেনের "এই যুক্তির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ 'লোক বুঝাইতে' (লোক বুঝিবারে) অনুবাদ করার দোহাই বহু অর্বাচীন কবিও দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সনাতন ঘোষাল তাঁর ভাষা ভাগবতে লিখেছেন ঃ

ব্যাসের বচনে বোধ নহে সভাকারে/এ হেতু করিতে চাই ভাষা অনুসারে। সুতরাং দীনেশবাবুর যুক্তি থেকে সঞ্জয়ের প্রাচীনতা প্রমাণ হয় না। এমনি প্রথাসিদ্ধ কথা সবাই বলে ঃ

সপ্তদশ পর্বকথা সব শ্লোক বন্ধ /মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ। (রামচন্দ্র খান)।

'শ্লোকবন্দে ব্যক্ত কথা ব্যাস ঋষি মুখে/ রচিলোঁ পাঞ্চালী যেন বুঝে সর্বলোকে।[১]

ডক্টর সুকুমার সেন উক্ত একটি তত্ত্বও ব্রাহ্মণ সঞ্জয়ের প্রাচীনত্বের বিরোধী। সুকুমার সেনের মতে "রামায়ণ গান আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল, কবিরা সকলেই ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালা মহাভারত পাঠ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না, তাই কবিরা সাধারণত কায়স্থ, দৈবাৎ ব্রাহ্মণ বা অন্যজাতি।"[২] [পৃঃ ২৪৮/১/পৃ/৩]

অতএব 'এমত ভারত কথা কহিল সঞ্জয়/গীত হেন গাহে লোক মোহিত হৃদয়। পাতকী তরিতে তবে/নরলোক বিস্তারিতো কহিল সঞ্জয়,—প্রভৃতি কথা প্রথাসিদ্ধ তাই তাৎপর্যহীন। সঞ্জয়ের ভাষা প্রাচীন নয়, ভাবে-ভাষায় ছন্দে কিংবা অলঙ্কার প্রয়োগেও অনন্যতা নেই।

আমাদের ধারণায় সঞ্জয় কবিযশপ্রার্থী কোন গায়েন-কবি। কবীন্দ্র মহাভারতই তাঁর অবলম্বন। তাঁর স্বকীয় যোজনাও রয়েছে, এমনকি গায়েন লিপিকর পরম্পরায় পাঁচালীর স্থানিক ও কালিক স্ফীতিও ঘটেছে। সঞ্জয় নকলবাজ বলেই কুলপদবী ব্যবহার করেননি। অথবা তাঁর প্রকৃত নাম হরিনারায়ণ দেব। তাই নামের সঙ্গে কোথাও দ্বিজ সঞ্জয়ও ব্যবহার করেননি। দেবকুলে ভরদ্বাজ গোত্রে জন্ম তাঁর নয়, মহাভারতের প্রথম বক্তা সঞ্জয়ের।

১৭১৪-১৭২৯ খ্রীস্টাব্দের[৩] প্রতিলিপিতে যখন সঞ্জয়ের নাম পাওয়া গেছে, তখন সঞ্জয় বা হরিনারায়ণকে সতেরো শতকের লোক বলে স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য পুথিতে রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস, ষষ্ঠীবর সেনের রচনাংশও রয়েছে, ২য় পুথিতে আছে কবীন্দ্র নিত্যানন্দ ঘোষ প্রভৃতির ভণিতা। এবং এরকম ভণিতা বিরল বা দুর্লভ হলেও আমরা এসব ভণিতায় আস্থা রাখি ঃ

ক. হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মতি
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী।[৪]

খ. রচনা বিশেষত নানা রসময়
হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জয়।[৫]

সতেরো ও আঠারো শতকে আর যাঁরা মহাভারতের বিভিন্ন খণ্ড বা সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন তাঁরা দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ অভিরাম, দৈবকীনন্দন, রামচন্দ্র খান, নিত্যানন্দ ঘোষ (পূর্ণাঙ্গ), নন্দরাম দাস, অনন্তমিশ্র, দ্বিজ গোবর্ধন, রাজা রামদত্ত, ষষ্ঠীবর সেন, কবিচন্দ্র (শঙ্কর চক্রবর্তী) ভবানী দাস, দ্বিজ শ্রীনাথ দাশ, কাশীরাম প্রভৃতি।

৫. সতেরো শতক

কাশীরাম দাস

মহাভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। যদিও তিনি আঠারো পর্ব মহাভারতের মাত্র সাড়ে তিনটে পর্বই রচনা বা স্বাধীন অনুবাদ করেছিলেন, তবু কথক, গায়েন ও লিপিকরের আনুকূল্যে তিনি লোকপ্রিয় গোটা মহাভারত রচক হিসেবেই গত চারশ বছর যাবৎ সাধারণ্যে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কাশীরাম দাসের কৃতিরূপেই প্রথম বাঙলা মহাভারত মুদ্রিত করে প্রকাশিত করেন। তখন থেকেই আধুনিক শিক্ষিত সমাজও সমগ্র মহাভারত রচনার গৌরব কাশীরাম দাসকেই দান করে থাকেন।

আধুনিকতর গবেষণায় কাশীরাম দাস সম্পর্কে যে সব তথ্য মিলেছে, সেগুলো সংক্ষেপে এই ঃ

---

১. পীতাম্বর দাস—সুকুমার সেন পৃঃ ২৫৮।

২. পৃঃ ২৪৮-১ম/পৃ/২য় সং।

৩. সুকুমার সেন/১ম অ/১ম সং, পৃঃ ১২১, পাদটীকা।

৪. প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৪২।

৫. ঐ।

১. ক. কাশীরাম দাসের পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল সিদ্ধি গ্রামে—সিঙ্গি গাঁয়ে নয়। কাশীরাম দাস রচিত আদি পর্বে রয়েছে ঃ

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধিগ্রাম (পাঠান্তরে সিঙ্গিও মেলে)
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা
কৃষ্ণদাসানুজ গধাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অন্যত্র— ইন্দ্রানী নামতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবী ভাগীরথী।

খ. কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস 'জগন্নাথ মঙ্গল' পাঁচালী রচয়িতা। তিনিও বলেছেন ঃ

ভাগীরথী তটে বাটী ইন্দ্রায়নী নাম
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধি গ্রাম (পাঠান্তরে সিঙ্গি)
অগ্রদ্বীপ গোপনীথ রায় পদতলে
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে।

গদাধর 'জগন্নাথ মঙ্গলে' বিস্তৃত বংশলতাও দিয়েছেন, তার পুত্র-পরম্পরার সংক্ষিপ্ত রূপ এই ঃ

দৈত্যারিদেব-দামোদর দু-বরাজ-মীনকেতন-ধনঞ্জয়-রঘুপতি (পাঠান্তরে বসুপতি) প্রিয়ঙ্কর-সুধাকর-কমলাকান্ত। এবং কমলাকান্তের তিন পুত্র—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম দাস ও গদাধর দাস (কমলাকান্তের হল্য এ তিন কোঙর—গদাধর)। গদাধর সূত্রে আরো জানা যায় তাঁদের পিতা

"দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড়ে কৈল বাস।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কাশীরামের পৈত্রিক বাড়ি সিদ্ধি গ্রামে ছিল বলে বিশ্বাস করেন। তাঁর যুক্তিগুলো এই ঃ ১. ইন্দ্রানী একসময় প্রসিদ্ধ (বন্দরগঞ্জ নগর) স্থান ছিল। বৃন্দাবন দাসের ও মুকুন্দরামের কাব্যে ইন্দ্রানীর উল্লেখ রয়েছে। এই ইন্দ্রানীর নিকটে ভাগীরথী তীরে সিদ্ধি গ্রাম ২. এবং অগ্রদ্বীপের সংলগ্ন-গ্রাম সিদ্ধি—সিঙ্গি নয়। সিঙ্গি কাটোয়ার কাছে।[১]

২. গদাধর সূত্রে আরো জানা যায় তাঁদের পিতা উড়িষ্যায় জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন। এবং গদাধর কটকের নিকটবর্তী মাখনপুরে বসেই তাঁর 'জগন্নাথ মঙ্গল' রচনা করেন। এতে বোঝা যায় গদাধর পিতৃ নিবাসেই বাস করতেন। কিন্তু কাশীরাম দাস হরিহরপুর গ্রামের পুরুষোত্তমপুত্র অভিরাম মুখোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়ে (প্রতিপোষণে ?) মহাভারত রচনায় হাত দেন ঃ

হরিহরপুর গ্রাম সর্বগুণধাম
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম।
কাশীরাম বিরচিল তার আশীর্বাদে।

৩. নারায়ণপুত্র[২] নন্দরাম দাসের [মৃত্যু ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে] জ্ঞাতি সম্পর্কের জ্যেষ্ঠতাত। কাশীরামদাস হয়তো পরিণত বয়সেই মহাভারত অনুবাদে আগ্রহী হন।

তাই আদি সভা বিরাট বনের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।"[৩]

এতে মনে হয় বন পর্বের আগেই বিরাট পর্ব অনূদিত হয়। আমরা দেখেছি, গোটা আঠারো পর্ব মহাভারত অনুবাদে আগ্রহ গোড়া থেকেই কোন অনুবাদকের মধ্যে ছিল না। প্রমাণ কবীন্দ্র

---

১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৭৯।
২. নারায়ণ-নন্দন সেনিয়া রাধাশ্যাম/পাণ্ডব বিজয় বিরচিল নন্দরাম।
৩. অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুথি—সুখময় উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮১।

পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ। কেবল নিত্যানন্দ ঘোষ, সঞ্জয় প্রভৃতি কয়জনই মাত্র এ শ্রমসাধ্য কাজে আগ্রহী হয়েছেন। অন্যরা বিভিন্ন প্রিয়পর্বই অনুবাদ করেছেন। এর প্রধান কারণ মহাভারতোক্ত অনেক কাহিনী, রীতি-রেওয়াজ ও নীতি-আদর্শ বাঙালী হিন্দুর ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনের নীতি-আদর্শের অনুকূল ছিল না বলে তা লোকসমাজে প্রকাশকাম্য ছিল না। এজন্যেই বেছে বেছে নির্দোষ ও যুগোপযোগী উপদেশাত্মক ও সুনীতিমূলক অংশের বা পর্বের স্বাধীন অনুসৃতির রেওয়াজ চালু হয়। দ্বিতীয় কারণ মহাভারতের বিপুল কলেবরভীতি। রামায়ণের ক্ষেত্রে এরূপ কুচিৎ ঘটেছে। তাছাড়া রামায়ণ বর্ণিত আদর্শই আজ অবধি হিন্দুর নৈতিক পারিবারিক সামাজিক জীবন নির্ধারণ করে। কাশীরাম দাস বেঁচে থাকলেও যে বিপুলকায় সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করতেন তা অনুমান করার সঙ্গত কারণ নেই। বনপর্বের আগে বিরাটপর্ব অনুবাদ আমাদের এ ধারণাই সমর্থন করে। যদিও বা জ্ঞাতি সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ-নন্দন নন্দরাম দাস (যিনি উদ্যোগ, দ্রোণ ও কর্ণ পর্বত্রয় রচনা করেছিলেন) বলেছেন—

১. কাশীরাম দাসয় তিঁহ জ্যেষ্ঠতাত
মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়ে হাত।
আয়ু অবশেষে বাপু যাই পরলোকে
রচিতে না পালাঙ পোথা পাই বড় শোকে।
আশীর্বাদ করি আমি বলিহে তোমারে
পাণ্ডব চরিত্র বাপু রচিবা আদরে।[১] (দ্রোণ পর্ব)*

এমনি পাঠ উদ্যোগপর্বেও মেলে

কাশীরাম দাস মহাশয় রচিলেন পোথা
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহো খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে
রচিবে পাণ্ডবকথা পরম সাদরে।[২]

খ. জ্যেষ্ঠ তাত কাশীদাস পরলোক কালে
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে।
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন।[৩]

এসব কথা আক্ষরিক ভাবে বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি নেই। কারণ নন্দরামও মহাভারতের বাকি অংশ অনুবাদ করেননি। তাঁর তিন পর্বই মেলে। আমাদেব ধারণা নন্দরাম পাঠক-কথক-গায়কের আস্থা অর্জনের জন্যেই কাশীরাম দাসের নির্দেশের দোহাই কেড়েছেন।

৪. কাশীরাম দাসের কাব্যরচনার কাল ঃ

কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁর জগন্নাথমঙ্গল [বা জগৎমঙ্গল] রচনা করেন ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে।[৪] তার আগেই কাশীরাম মহাভারত রচনা করেন। জগন্নাথমঙ্গল সূত্রে তাও জানা যায় ঃ

১. উদ্ধৃত—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।
২. সুকুমার সেন উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৫-৫৯/১/২য় সং।
৩. সাহিত্য পরিষৎ পুথি ঃ উদ্যোগ পর্ব, পুথি সং ১২৪২, পত্র সং-৩-সুখময় মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮৪-৮৫।
৪. সুখময়, পৃঃ ২০৫।

কমলাকান্তের হল্য এ তিন কোঙর
প্রথমে সে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর।
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদধার দাস।
জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ।

ক. কাশীরাম দাসের বিরাট পর্বে একটি রচনাকাল মেলে ঃ

চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।

এর থেকে ১৫২৬ শক বা ১৬০৪-০৫ খ্রীস্টাব্দ মেলে।[১]

খ. আদি পর্বেও একটি রচনাকাল রয়েছে ঃ

শকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে
রুক্মিনী নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে।

—এর থেকে যোগেশচন্দ্র রায় নিম্নরূপ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিধুমুখ-পঞ্চাননশিব, এর তিন গুণ ৫×৩ = ১৫। রুক্মিনী নন্দন অঙ্ক (কামের পঞ্চশব ১৫-এর ৫-এর পর) ৫ কোল —দুই বাহু অর্থে-২ এবং জলনিধি ৪ (সংস্কৃত নিয়মে) ১৫২৪ শক বা ১৬০২ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছিলেন।

সুখময় মুখোপাধ্যায় নিম্নরূপ সংখ্যা ধরে—

বিধুমুখ তিনগুণ ৫×৩ = ১৫, রুক্মিনী নন্দন–১৩, সাগর–৭ = ১৫১৩+৭ = ১৫২০ শকাব্দ বা ১৫৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দ বলে মনে করেন। আর ডক্টর সুকুমার সেন ঃ বিধুমুখ–৪, তিন গুণে–৩, রুক্মিনী নন্দন অঙ্কে ১৫,=১৫৩৪ শকাব্দ বা ১৬১২ খ্রীস্টাব্দ। যেভাবেই হোক সতেরো শতকের প্রথম ১০-১২ বছরের মধ্যেই যে কাশীরাম দাস সাড়ে তিনটে পর্ব রচনা করেন তাতে সন্দেহ নেই। এসূত্রে নগেন্দ্রনাথ বসুসূত্রে পাওয়া নন্দরাম দাসের মৃত্যুর সনটিও (১৬৭৭ খ্রী ঃ বা ১০৮৩ সন) স্মর্তব্য। ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে যাঁর মৃত্যু তিনি ১৬০৪-০৫ সনেও প্রকট কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ২৫-৩০ বছরের যুবক ছিলেন বলে মানতে হবে, যদি মহাভারত রচনাসম্বন্ধীয় কাশীরাম দাসের আরব্ধকর্ম সমাপ্তি সম্পর্কিত মৃত্যুপথযাত্রী 'কাশীরাম-নন্দরাম সম্বাদের' সত্যতা স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে নন্দরাম অন্তত ১০৫-০৭ বছর আয়ু পেয়েছিলেন—অতএব, হয়, নগেন্দ্রনাথ বসু পরিবেশিত তথ্যে ভুল রয়েছে, অথবা নন্দরাম দাস নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে গল্প বানিয়েছিলেন।

৫. অক্ষয়কুমার কয়াল আবিষ্কৃত বনপর্বের এক পুথির সাক্ষ্যে জানা যায় ঃ 'শেকরতনয় জিত' বা জিত ঘটক, কাশীরামদাসের অসমাপ্ত বনপর্ব সমাপ্ত করেন ১৬০৫ শকাব্দে। এ সূত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী এক কবির কৃতিরও উল্লেখ করেছেন। জিত বলেছেন ঃ

ধন্য ছিল কায়েস্থ কুলেতে কাশীদাস
চারিপর্ব মহাভারত করিলা প্রকাশ।
আদ্য সভা বিরাটের রচিলা পাঁচালি
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি।
পূর্বে তিহোঁ আরম্ভ করিলা এই পুথি
কাল বশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি।

---

১. *সুখময়, ঃ ১৮৩।*

আগস্ত উপাক্ষণ (অগস্ত উপাখ্যান) করি হৈল কাল প্রাপ্ত
বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত।[১]

অন্য পুথিতে পাঠান্তরে–তিন পর্ব ভারতের করিলা প্রকাশ।[২]

অগস্যি আক্ষাণ (অগস্ত আখ্যান) করি হৈল কৃষ্ণপ্রাপ্তি
বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্তি।[৩]

এই অগস্ত উপাখ্যানেরও কতটুকু কাশীরাম দাস রচনা করেছিলেন তারও সঠিক উল্লেখ পাই কয়াল সংগৃহীত একটি বনপর্বে ঃ

মুনি কহে কহিলাঙ অগস্ত আখ্যা
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা হরষ বিধান।
কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান
কর্ণপথে সাধু নর সদা কর পান।
এতবধি বনপর্ব কাশীদাস কৈল
অবধান করি সভে একান্তে শুনিল।
না হইতে বনপর্ব কথা সমাধান
কাশীদাস করিলেন স্বর্গের পয়ান।[৪]

তারপর ১৬০৫ শকে জিত ঘটক বনপর্বের বাকি অংশ রচনা করেন ঃ

তেকারণে প্রসঙ্গ বনের যত শেষ
পাঁচালী প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ। ....
পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমাণ শক
পাঁচালি প্রবন্ধেতে শেষ আরণ্যক।

১৬০৫ (লিপিকর প্রদত্ত সংখ্যা)[৫]

(পঞ্চ-৫, পুষ্প-০, রস-৬, শশী-১ হয় বামাগতি-১৬০৫ শকাব্দ বা ১৬৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দ) জিত ঘটক আরো বলেছেন ঃ

আদি সভা বিরাট বন (অসমাপ্ত) করিল লিখক
এর চারি পর্ব পুস্তক কাশী দাসি।
উদ্যোগ আদি ছয় পর্ব শিবরাম ঘোষি
ঐষীক আদি আট পর্ব চাহিয়া বেড়াই।

অর্থাৎ শেষ আটপর্ব ১৬৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি জিত ঘটকের জ্ঞাতসারে অনূদিত হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কাশীরাম দাস সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত যা জানলাম তা এই ঃ

কাশীরাম দাস সিঙ্গি গ্রামের কমলাকান্ত দাসের পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাসও কবি ছিলেন। কাশীরাম দাস আদি, সভা, বিরাটপর্ব এবং বনপর্বের অংশ বিশেষ রচনা করে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কাব্য রচনাকাল ঃ ১৫৯৮ থেকে ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি। এই সাড়ে তিন পর্ব রচনা করেই তিনি বিস্তৃত অঞ্চলে লোকপ্রিয় ও প্রখ্যাত হয়েছিলেন। যার ফলে পরে কথক, গায়েন, লিপিকর সবাই অন্যান্য কবির রচিত বিভিন্ন পর্বগুলোও কাশীরাম দাসের রচিত বলে আসরে প্রচার করে একাধারে আসর জমিয়েছেন এবং কাশীরাম দাসকেও অপ্রাপ্য গৌরবে মণ্ডিত ও অমরতা দান

---

১. *সুখময়, পৃঃ ১৮১।*
২ *ঐ, পৃঃ ১৮০।*
৩. *ঐ, পৃঃ ১৮১।*
৪. *ঐ, পৃঃ ১৮২।*
৫. *সুখময়, পৃঃ ১৮৬।*

করেছেন। এঁদের হাতে 'কাশীরাম দাস' তখন ব্যবসায়িক 'টেডমার্ক' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুর মিশন প্রথম মুদ্রিত মহাভারত মাধ্যমে এ নামের মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা চিরস্থায়ী করেছেন। যে-পাঁচালীর সাড়ে পনেরোটা পর্বই বিভিন্ন সময়ের নানাজনের রচনা, তার কাব্য-সৌন্দর্যের বা অনুবাদের সুষ্ঠুতার আলোচনা নিরর্থক। তা ছাড়া কাশীরাম দাসের লোকপ্রিয় রচনাংশও এতোকাল পরে সর্বত্র অবিকৃত থাকার কথা নয়।—কথক-গায়েন-লিপিকরের মনের ও রুচির ছাপমুক্ত অকৃত্রিম রচনা নিরূপণ সাধনাসাধ্য কর্ম নিশ্চয়ই। এ সূত্রে ডক্টর সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তাঁর মতে "কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারত অনুবাদ করেন নাই। কাশীরাম কেন, উনবিংশ শতাব্দের আগে কোন বাঙালী কবিই সংস্কৃত মহাভারত-রামায়ণের অনুবাদ করেন নাই। তাঁহারা মহাভারত-রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই মাত্র।"[১]

সাহিত্য বিশেষ করে কাব্য তথ্য বা জ্ঞানের আকর নয়—ভাবের অবলম্বন এবং অনুভবের ও উপলব্ধির উৎস মাত্র। সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতার আক্ষরিক অনুবাদে শিল্প-সৌন্দর্য ও ছন্দ-মাধুর্য বজায় রাখা সর্বত্র সম্ভব হয় না। ফিট-জার্‌যান্ডের 'রুবাইয়াতে উমর খৈয়াম' এ-ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। সেজন্যে কাব্য অনুবাদে চিরকাল গ্রহণ-বর্জন সংযোজনের স্বাধীনতা অনুবাদকরা গ্রহণ করেছেন। কোথাও আক্ষরিক, কোথাও ভাবিক, কোথাও ছায়িক অনুবাদের স্বাধীনতা অনুবাদকগণ চিরকালই গ্রহণ করেছেন। তা'ছাড়া দেশান্তরে কালান্তরে প্রয়োজনে আর রুচির পরিবর্তনেও গ্রহণ-বর্জন আবশ্যিক হয়। তাই রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কিংবা প্রণয়োপাখ্যান অনুবাদে সর্বত্র স্বাধীন অনুসৃতির সাক্ষ্য মেলে। তাই বলে মূল রচনার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কবিহীন কেবল শ্রুত কাহিনীর অনুসৃতি বলে অভিহিত করা যাবে না। বস্তুত সব গ্রন্থেই স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদের সাক্ষ্য প্রকট। কাশীরাম দাসেও তা সুলভ। তবে রামায়ণের ক্ষেত্রে বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ যেমন একই গ্রন্থের উপকরণ হয়েছে তেমনি মহাভারতের ক্ষেত্রেও ব্যাস-জৈমিনি মহাভারত কাহিনী মিশ্রিত হয়েছে।

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে মহাভারতের এক বা একাধিক বিভিন্ন পর্ব রচয়িতা রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, পীতাম্বর, অনিরুদ্ধ, গোপীনাথ বিশারদ, কবিশেখর গোবিন্দ, শ্রীনাথ, রুদ্রদেব, দ্বিজ রঘুরাম, জয়দেব, হরেন্দ্র নারায়ণ, ব্রজসুন্দর, কৌশারী, দ্বিজ বলরাম, বৈদ্যনাথ পরমানন্দ, মহীনাথ শর্মা, রামবল্লভ দাস, লক্ষ্মীরাম, বৈদ্য পঞ্চানন, রামনন্দন, কীর্তিচন্দ্র, মাধবচন্দ্র প্রভৃতি ষোল শতকের কবি। এবং কাশীরাম দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, সঞ্জয়, কৃষ্ণবসু, রামনারায়ণ দত্ত, জয়ন্তদেব, রমাকান্ত, নন্দরাম, শিবরাম ঘোষ, অনন্তমিশ্র, দ্বিজ হরিদাস, ঘন শ্যামদাস, দ্বিজ প্রেমানন্দ, দ্বিজ অভিরাম, কৃষ্ণরাম প্রমুখ সতেরো শতকের কবি আর ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস সেন, সারণ, সদানন্দ নাথ, গোপীনাথ দত্ত, সুবুদ্ধি রায়, অম্বষ্ঠ বল্লভ, দ্বিজ রামলোচন, দ্বিজ গোবর্ধন, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, নিমাই, দৈবকীনন্দন, দ্বৈপায়ন দাস, রামেশ্বর নন্দী, রাজীব সেন, দ্বিজ ঘনশ্যাম, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, মহেন্দ্র, রাজারাম দত্ত, হরিদেব বসু, রামেশ্বর দাস, রাজেন্দ্র দাস, লোকনাথ দত্ত, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি আঠারো শতকের কবি।

এসব কবির পুথি আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত বটে, কিন্তু ক্বচিৎ কারো পুথি মুদ্রিত হলেও বাকি সবগুলোই অমুদ্রিত। আমাদের এসব পুথি পড়া নেই। কাজেই আলোচনা করা সম্ভব নয়। আর বিদ্বানদের গবেষণালব্ধ ও অনুমিত তথ্য নকল করে দেয়ার কোন সার্থকতা আছে বলেও আমরা মনে করি না। কেননা, শ্রীরামপুর মিশনের বদৌলতে গত পৌনে দু'শ বছর যাবৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতই পাঠ্য ও লোকপ্রিয়। মধ্যযুগীয় আর কোন কবির রামায়ণ-মহাভারত গবেষক ও ইতিহাসকার ব্যতীত অন্য কেউ কখনো পাঠে আগ্রহী হবে, কবির পরিচয় জানতে চাইবে–এমন সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কাজেই ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধি করা অসমীচীন বলেই মানলাম। তবু কয়েকজন সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি ঃ

---

১. *বা-সা-ই ধ ১/অপ/পৃঃ ১০৮-০৯/১৯৬৩ সন।*

১. **নিত্যানন্দ ঘোষ** -কবি নিত্যানন্দ রচিত সভা, ভীষ্ম, শল্য, স্ত্রী, শান্তি প্রভৃতি পর্বের পুথি সংগৃহীত হয়েছে। তিনি পুরো মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কিনা জানা নেই। উনিশ শতকে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'গৌরীমঙ্গলে' নিত্যানন্দের উল্লেখ রয়েছে— অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস/ নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।—এই 'পূর্বে' শব্দ 'কাশীরামের' পূর্বে নির্দেশক কিনা বলা যাবে না। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত স্ত্রীপর্বের একটি পুথির লিপিকাল ১০৮৩ সন, এটি বঙ্গাব্দ হলে ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে আর মল্লাব্দ হলে (১০৮৩+৬৯৪) ১৭৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে এটি লিপীকৃত। পূর্বোক্তটি ধরলে কবি সতেরো শতকের এবং শেষোক্তটি যথার্থ হলে কবিকে আঠারো শতকের বলে অনুমান করা চলে। কাশীদাসী মহাভারতেও নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা মেলে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃতিযোগে নিত্যানন্দকে 'করুণ রস বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত' বলে মন্তব্য করেছেন।[১]

খ. **দ্বিজ অভিরাম, রামচন্দ্র খান, রঘুনাথ** ও **দ্বিজ হরিদাস** রচিত কেবল 'অশ্বমেধ' পর্বই পাওয়া গেছে। আর দৈবকীনন্দনও হয়তো কেবল কর্ণপর্বই রচনা করেছিলেন। এই দৈবকীনন্দন ও বৈষ্ণববন্দনা' রচয়িতা দৈবকীনন্দন অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তা' নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। রামচন্দ্র খান ও রঘুনাথ ছাড়া উক্ত কবিগণের সবাই ষোল শতকের কি-না তাও নিশ্চিতভাবে জানা নেই। কৃষ্ণভক্তির বাহুল্য দেখে দ্বিজ হরিদাসকে ষোল শতকের কোন বৈষ্ণব বলেই অনুমান করা চলে।

গ. **ঘনশ্যাম** (সেন) দাস-বৈদ্য বংশীয়। তাঁকে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের পৌত্র বলেও কেউ কেউ অনুমান করেন। সেক্ষেত্রে এই ঘনশ্যাম ও পদকর্তা ঘনশ্যাম দাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মানতে হবে।

ঘ. একটি উক্তি থেকে মনে হয় আঠারো শতকের কবি গঙ্গাদাস সেন সম্ভবত গোটা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন, যদিও তাঁর রচিত খুব কম পর্বই আবিষ্কৃত হয়েছে।

'গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব।

ঙ. **শিবরাম ঘোষ**- কবি জিত ঘটক সূত্রে জানা যায়—

'উদ্যোগ আদি ছয় সর্ব শিবরাম ঘোষি' রচনা করেছিলেন।

শিবরাম ঘোষের আরো দু'খানি গ্রন্থ রয়েছে ১. কালিকামঙ্গল ও ২. একাদশীর পাঁচালী। উক্ত দু'খানি গ্রন্থে তাঁর পিতা-মাতার রাজেন্দ্র ঘোষ ও রাধিকা নাম রয়েছে ঃ

১. রাজেন্দ্র ঘোষের সুত রচিল কৌতুকে!
রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভনে। (কালিকামঙ্গল)

২. বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী
মহাগুরু দুইজন বন্দো পুট পাণি। (একাদশীর পাঁচালী)

একাদশীর পাঁচালী আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬০৩ শকে বা ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে রচিত। শশী-১, রস-৬ শূন্য-০ অগ্নি-৩ শকের বৎসরে / পাৎসা অরং সাহা দিল্লীশ্বর। শশী রস শূন্য অগ্নি (সুখময়)-১৬০৩ শক।

অতএব শিবরাম ঘোষ সতেরো শতকের শেষার্ধের কবি।

ষোল শতক থেকে আঠারো শতক অবধি রচিত মধ্যযুগের যে কোন শাখার বা ধারার রচনায় কালিক ও স্থানিক প্রভাব কিছু না কিছু মেলেই। তা অবশ্য নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিবর্তন সম্বন্ধে অর্থাৎ মধ্যযুগের মন্থরগতি জীবন-জীবিকাপদ্ধতির কালিক ও স্থানিক বিবর্তন সম্বন্ধে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা দেয় না। তবে স্থান ও কাল প্রভাবিত ব্যক্তিপুরুষ কবির মন ও রুচির প্রভাব রচনায় অপ্রকট থাকে না। এ কারণে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে, তেমনি থাকে কবির রুচি- সংস্কৃতির আভাস। সবটা মিলে প্রতি গ্রন্থেই কালিক ও স্থানিক প্রভাবজ পরিবর্তন আপাত বিরল হলেও লক্ষণীয়। মহাভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

---

১. ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৬।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রণয়োপাখ্যান

১. উপাখ্যান তত্ত্ব

প্রাণী হিসেবে মানুষের কাম ও ক্ষুধা সহজাত। আর জীবনটা হচ্ছে ঐ ক্ষুধা ও কামের বিচিত্র লীলার ক্ষেত্র। যৌথজীবনের প্রয়োজনে মানুষ পরিশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব আর ক্রমে ক্রমে অর্জন করে অন্য অনেক গুণ এবং আয়ত্ত করে অনেক কৌশল। সবটাই করে ক্ষুধা আর কামের শোভন, সহজ ও সুন্দর পরিচর্যার জন্যেই। কারণ সুখ আছে ক্ষুধার নিবৃত্তিতে, সুখ আছে কামচর্চায়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অথবা মানবিক অনুশীলনের ক্রমোৎকর্ষের ধারায় মানুষের ক্ষুধা ও কাম স্থূলতা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে হয়েছে সূক্ষ্ম, পরোক্ষ, বিচিত্র ও সমগ্রচেতনায় পরিব্যাপ্ত। তাই মানুষ আর প্রাণী মাত্র নেই, জীব হলেও সে জীবন-জিজ্ঞাসু ও জীবনবিলাসী। তার নিজের চেতনায় প্রাণ ধারণ করলেও সে প্রাণী নয়, জীবজগতের জীবও সে নয়, সে আলাদা সৃষ্টি সে কেবল মানুষ। প্রকৃতিকে এবং প্রবৃত্তিকে দাস ও বশ করেই সে হয়েছে স্বসৃষ্ট, স্বাধীন ও স্বনির্ভর।

আদিতে কিন্তু মানুষ এমনটি ছিল না। সে তখন সত্যই প্রাণী হিসেবে প্রবৃত্তি পরবশ জীবজগতে বাস করত। সে ছিল বুনো ও বর্বর। এক সময় সে ছিল ফলমূল ভোজী, পরে হাতিয়ারের উৎকর্ষে এক সময়ে মৃগয়াজীবীও ছিল সে। এ স্তরে মানুষের সংখ্যা ছিল কম, ফলমূল-মৃগের অভাব ছিল না কোথাও। তাই ক্ষুধা নিবৃত্তির সমস্যা ছিল না, কিন্তু কামচর্চায় বল-বয়সের প্রশ্ন আছে, আছে পছন্দ-অপছন্দের কথা, আরও আছে সবিঘ্ন প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কামুক পুরুষের হৃদয়ঘটিত দুর্বলতার সুযোগে যে শুধু মাতৃপ্রধান-মাতৃকেন্দ্রী সমাজ গড়ে উঠল তা নয়, ব্যক্তিক তো বটেই, কৌমী ও গোত্রীয় বিবাদের এবং রক্তক্ষয়ী লড়াইয়েরও শুরু ঐ নারীকে নিয়েই। নারীসম্ভোগ নিয়ে প্রথম সংঘর্ষের সংবাদ পাই আদমের আমলে। তাঁর দুই সন্তান হাবিল ও কাবিলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে হাবিল হয় নিহত। এই প্রথম রক্তপাত ও নরহত্যা।

তারপর থেকে দুনিয়ার তাবৎ রূপকথার মুখ্য বিষয় হচ্ছে নারীহরণ, নারীউদ্ধার কিংবা নারীরত্ন রাজকন্যের সন্ধানে সংকল্পবদ্ধ রাজকুমারের প্রাণপণ প্রয়াস ও জীবনপণ- অভিযান। এ সংগ্রামে দেব- দৈত্য-নর সবাই সমভাবে উৎসাহী। দেব-দানবের যুদ্ধের, নর-দৈত্যের লড়াইয়ের, মানুষে মানুষে সংঘর্ষের আদি কারণ ঐ রূপবতী নারীই। কেবল রূপকথার নয়, লিখিত কাব্য-গাথারও মূল বিষয় ঐ নারীহরণ-নারীউদ্ধার। আকিমা, সারা, বতসা, উষা, শচী, সীতা, সুভদ্রা-রুক্মিনী অসংখ্য কাহিনীই দুনিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিখিত- অলিখিত সাহিত্যের মুখ্য বিষয়।

জরু নিয়ে বিবাদের পর এল জমি। মানুষের সংখ্যা তখন বেড়েছে। কৃষির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও স্থায়ী নিবাস নির্মাণ শুরু হয়েছে। কাজেই জমির গুরুত্ব অসীম এবং অধিকার রাখা জরুরী। তাই দখল রাখা ও দখল বিস্তারের সংগ্রাম হল শুরু। এ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ শুধু তীব্রই হল না, হল সর্বব্যাপী হল রাজ্যে-সাম্রাজ্যে চিরস্থায়ী।

এরপরে মানবিক শক্তির তথা সভ্যতার আরো বিকাশ-বিস্তার হল, তখন কেনা বেচার, লেন-দেনের মাধ্যম হিসেবে চালু মুদ্রা। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে চলল পণ্য বিনিময়। তখন গুরুত্ব পেল জওহর, জেবর, সোনা, রূপা, মণিমুক্তা। এবার আর জরু নয়, জমি ও জওহরই হল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ ও বিষয়—এ সবই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয় বা উপকরণ।

আজকাল নারীহরণ বীরত্ব বলে নন্দিত নয়, জমি হরণও নিন্দিত, মুদ্রাদি ধাতু-পাথর হরণও গর্হিত বলে বিবেচিত। তবু এসব অপকর্ম বিলুপ্ত না হলেও এসব আর সাহিত্যের মুখ্য বিষয় নয়। একালে নারীর কিংবা পুরুষের হৃদয় হরণ করতে হয়, জমি ক্রয় কিংবা কৃচিৎ জয় করতে হয় আর মুদ্রা-জওহর -জেবর অর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। তাই দুনিয়াব্যাপী আধুনিক সাহিত্যের বিষয় ভিন্ন।

জীবনের জন্যেই, জীবন নিয়েই সাহিত্য, তাই সাহিত্য জীবন থেকে উৎসারিত। এ কারণেই যে কালে জীবন যেমন, সাহিত্যে তেমনটি প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য হচ্ছে জীবন-বিম্বিত দর্পণ। এককালে মানুষের বিশ্বাসের জগতে দেওদানু -ভূত-প্রেত-জীন-পরী মানুষেরই নিত্যকার প্রতিবেশী ছিল। তার কল্পনার জগতে ছিল নানা শক্তিপ্রতীক দেবতা, তার সংস্কারে ছিল তিথি-নক্ষত্র-দিন-ক্ষণ-লগ্ন-হাঁচি-কাশি-টিকটিকি, শুভাশুভ, ইষ্ট-অনিষ্ট, যাদু, টেবু-টোটেম এবং দৈব-প্রতীকের –আলৌকিকশক্তির নিত্যলীলার স্থিতি। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে এ সবকিছুর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ এবং প্রভাব স্বীকৃত। এ তাৎপর্যে চিরকালই সাহিত্য বাস্তব জীবনের ভাব- চিন্তা-কর্ম-আচরণেরই প্রতিরূপ। তাই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও জীবনমুখী কল্পনাপ্রধান নয়। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাস একাধারে মানবের মন-মননের, বিশ্বাস-সংস্কারের, কালিক বিবর্তনের, বিকাশের আর বিলুপ্তির ইতিকথাও।

রূপকথায় উপাখ্যানে দৈশিক-কালিক ছাপ থাকলেও মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বরূপ, এবং সদৃশ প্রতিবেশে আচরণও অভিন্ন বলে পৃথিবীর যাবতীয় রূপকথার এবং উপাখ্যানের বক্তব্যে আর প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। আজকাল লোকবিজ্ঞানীরা এই সামান্য গুণের লক্ষণ ধরে রূপকথার ও উপাখ্যানকে শ্রেণীতে বা বর্গে বিন্যস্ত করেন। তাঁদের পরিভাষায় এ সাদৃশ্যতত্ত্বের নাম 'মটিফ্'(Motif)।

যে জপের পিপাসায় প্রেম হল জীবন অধিক!

প্রেমের পথ চিরকালই দুর্গম ও দুস্তর। দেহ-মন-আত্মার অভিন্ন ঐকিক ঐকান্তিক প্রয়াসেই কেবল এ সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব। তাই লোক-লস্কর, ধন-সম্পদ সম্বল করে যাত্রা করলেও শেষ পর্যন্ত রাজকুমার হয় নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল। দেহ–প্রাণ-আত্মার এই কৃচ্ছ্রসাধনায় সঙ্গ- সাক্ষ্য সহায়ক নয়— বাধা। বাহুবল, মনোবল, প্রণয়বাঞ্ছা ও রাগনিষ্ঠা পাথেয় করে প্রেমিককে অতিক্রম করতে হবে মৃত্যুসঙ্কুল 'গিরি -মরু- কান্তার ও দুস্তর পারাবার।' এরই ফলে রূপ রসে , কাম প্রেমে ও মোহ আত্মিক আকর্ষণে হয় উন্নীত। এভাবেই ঘটে প্রেমতীর্থে উত্তরণ। সোনা যতই জ্বলে ততই বাড়ে তার ঔজ্জ্বল্য, তেমনি বাধাবিপত্তি যতই হয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রেমের উপলব্ধি ততই পায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা। খাঁটি সোনার মতো দুঃখের দাহনেই মেলে খাঁটি প্রেম।

প্রথমে প্রেমের রস বিচ্ছেদে পুড়এ
আনলে উনাইলে জান হেম গলএ।

দৈহিক পীড়ন, মানসিক নির্যাতন ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই আসে প্রেমে সাফল্য ও সার্থকতা। তাই বিরহেই হয় প্রেমের বিকাশ। মানুষকে তিলে তিলে নতুন করে সেই অনুভব। এমনি করে প্রেম মানুষকে করে মহৎ, জীবনে দেয় কর্মের প্রেরণা , বাড়িয়ে দেয় আনন্দের ঐশ্বর্য , প্রসারিত করে অনুভবের জগৎ। এ জন্যেই কবি বলেন ঃ

ভাবে সে ভাবক হএ প্রেমে হএ পিয়া
প্রেমহীন যে জন বিফলে থাকে জিইয়া।

প্রেমই জীবনের মূলধন, জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন। তাই প্রণয়োপাখ্যান মাত্রেই প্রেমৈক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বেদনামধুর কাহিনী। কাজেই প্রণয়-পথ কুসুমাস্তীর্ণ হতেই পারে না—হতে পারে না ঋজু ও সহজ। এ জন্যেই প্রণয়োপাখ্যানে ঝড়, দৈত্য, রাক্ষস কিংবা নাগকবলিত হয় নায়ক, এ যুগের নাটক-উপন্যাসের নায়ক যেমন পায় পারিবেশিক বাধা ও মানসিক যন্ত্রণা কিংবা গ্রীক নাটকের নায়ক যেমন হত নিয়তি-নির্যাতিত।

তাই হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনা, মর্মভেদী কান্না, প্রত্যাশী আত্মার আর্তনাদ ও ব্যাকুল বাসনাপ্রসূত দাহ প্রেমিকের নিত্যসঙ্গী। এ সঙ্গে থাকে ধৈর্য ও অধ্যবসায়, লক্ষ্যগত নিষ্ঠার আর আবেগতাড়িত প্রাণের প্রেরণা।

আস্তিক মানুষের সৃষ্ট এ সব সাহিত্যে যে জীবন-দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত, তা হচ্ছে 'দুখ বিনা সুখ নেই', কিংবা দুর্লভ বস্তু মাত্রেই দুঃসাধ্য, অথবা 'চেষ্টা বিনা সিদ্ধি নেই, কষ্ট ছাড়া নেই ইষ্ট'—তত্ত্বে

আস্থাপ্রসূত স্বপ্ন। কোন ঐকান্তিক চাওয়া ও আন্তরিক প্রয়াসই ব্যর্থ হবার নয়—এ জীবনসত্যের উপলব্ধি বা স্বীকৃতিই নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জীবনযাত্রা। আমাদের দেশী সাহিত্যে রাধা-শকুন্তলা শর্বরীও এই তত্ত্বের প্রতীক। তখন মানুষের চেতনাও বহির্মুখ ছিল বলে দেব-দৈত্য, শাহ-সামন্ত, উজির-কোটালের নীচের কোন মানুষের জীবনের মর্যাদার বা অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না, কেবল নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ আনন্দ ছিল আলোচ্য। তাই লক্ষ মানুষ যখন ঝড়ের মুখে নৌকাডুবিতে মরে, তখনও কবি কিংবা পাঠক একটুও দুঃখ অনুভব করে না, ওদের মা-বাপও যে পুত্রহারা হল, সন্তান হল পিতৃহারা, স্ত্রী হল বিধবা সে-চেতনাই জাগত না।

আর একটি কথা। হিন্দুরা মনে করত শিক্ষিত লোকের জন্যে তো সংস্কৃতসাহিত্য রয়েছে। কাজেই অশিক্ষিত লোকদের প্রতিষ্ঠমান লৌকিক দেবতার কথা জানাবার জন্যেই পাঁচালী রচনায় প্রয়াসী হন কবিগণ। এ জন্যে আঠারো শতকের আগে হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সন্ধান মেলে না। দেশজ মুসলিমরা বিদেশী ধর্মমত গ্রহণ করে জ্ঞাতিদের ও পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যকে করল পরিহার। কাজেই দেব পাঁচালী বা রামায়ণ মহাভারতও হল তাদের নবলব্ধ শাস্ত্র সংস্কৃতির পরিপন্থী, অতএব অবশ্য পরিহার্য। তাদের শাস্ত্র-সংস্কৃতির আধার আরবি-ফারসি রইল জনগণের অনায়ত্ত। আর এদিকে মানুষের মনের রসতৃষ্ণা ও মননের চাহিদা অপ্রতিরোধ্য। এ প্রয়োজন-প্রেরণাতেই মুসলিমরা গোড়াতে অনুবাদে অগ্রসর হয়। সেকালের হিসেবে উত্তর ভারতীয় ভাষা শহুরে শিক্ষিতদের আয়ত্তে ছিল। তাই উত্তরভারতীয় উপাখ্যানই গোড়াতে অনূদিত হতে থাকে—চান্দাইন, মৈনাসৎ, পদুমাবৎ, মধুমালৎ প্রভৃতি।

স্বদেশে দেশজ মুসলিমের সংখ্যালঘুতাই তাদেরকে স্বশাস্ত্র-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিপন্নবুদ্ধি দান করেছে, এই Minority complex বশে তারা ছিল স্বাতন্ত্র্য—সচেতন, ফলে আরব-ইরানমুখী। অন্তর্মুখী না হলে কেউ স্বস্থ, সুস্থ ও স্বজনশীল হয় না। বহির্মুখিতা কেবল অনুকরণ করতে প্রবর্তনা দেয়। মৌলিক ভাব-চিন্তার উন্মেষের জন্যে আত্মবিকাশের জন্যে প্রয়োজন দেশ-কালগত জীবন-জীবিকা সচেতনতা। জীবনের বাস্তব চাহিদার অনুগত করে জীবন রচনা ও রক্ষণ করতে প্রয়াসী নয় যারা, তাদের পক্ষে সৃষ্টিশীল হওয়া, উদ্ভাবক হওয়া কিংবা আবিষ্কর্তা হওয়া অসম্ভব। মধ্যযুগে, এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে এ যুগেও, শাস্ত্র-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আরব-ইরান প্রীতি তাদের করেছে ঊর্ধ্বমুখী আত্মভোলা, শিখিয়েছে বাস্তব জীবনকে তুচ্ছ জানতে, প্রবর্তনা দিয়েছে আদর্শলোকের অলীক জীবনকল্পনায় বিভোর থাকতে। ফলে তারা পারেনি সৃষ্টিশীল হতে। অনুকৃতিতে ও অনুবাদেই নিঃশেষ হয়েছে তাদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা। জীবননদীর সংকীর্ণ সীমায় প্রাণের আকুতি তরঙ্গ বৃথা প্রয়াসে আছড়ে পড়ে পড়ে হয়েছে বিলীন, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো চিন্তা-চেতনার, অনুভবের অসীম আকাশে বিচরণের স্বপ্ন কখনো জাগেনি তাদের মনে। তাই আঠারো শতক অবধি আমরা পাইনি কোন মহৎ কাব্য, মানবমনীষার কোন কালজয়ী ফসল। অতএব বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে অনলসভাবে বিচরণ করেছে বটে, কিন্তু অগ্রসর হয়নি, ঘুরেছে কিন্তু সম্মুখগতি পায়নি, পরাধীনতাপ্রসূত অন্যান্য কারণও অবশ্য এ সূত্রে স্মর্তব্য।

২. মধ্যযুগের মুসলিম রচিত বাঙলাসাহিত্য ও চট্টগ্রাম

প্রশ্ন জাগে মনের মধ্যে—আঠারো শতকের প্রথমার্ধ অবধি মুসলিম সমাজের বাঙলা সাহিত্যচর্চা আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষ করে চট্টগ্রাম জিলায় সীমিত কেন ? গোটা বাঙলাদেশে সেদিনেও অর্থাৎ পনেরো-ষোল-সতেরো শতকে দেশজ মুসলিমের অভাব ছিল না। অথচ সে সব মুসলিমের বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে বিচরণের কোন নিদর্শন মেলে না। এদিকে সতেরো শতক অবধি প্রায় পঞ্চাশ জন কাব্য-কবিতা রচয়িতার সন্ধান পেয়েছি আমরা কেবল চট্টগ্রামেই। আর পেয়েছি নোয়াখালিতে একজন, কুমিল্লায় তিনজন কবি। মুসলিম রচিত সাহিত্যে এ আঞ্চলিক বিকাশের নিশ্চিত কোন কারণ আমাদের জানা নেই। তবে কিছু কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়।

১. দেখা যাচ্ছে, যে অঞ্চলে মুসলিম লিখিয়েদের আবির্ভাব ঘটেছে, সে অঞ্চল প্রায় চিরকাল (সাময়িক বিচ্ছিন্নতা অবশ্য ছিল) আরাকান-ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দুই রাজ্যেরই রাজারা ছিলেন ভিন্ন গোত্রের ভিন্ন ভাষার ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ। এঁদের রাজ্যের এক অংশের প্রজারা অবশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম বাঙালী। সে কারণে বাঙালী প্রজাদের গৌড়রাজ্যের বাঙালীদের সঙ্গে শাস্ত্রিক-ভাষিক-সাংস্কৃতিক যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার দরুন পারিবেশিক কিছু পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ছিল, এখানকার যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগে সংহত পৃথিবীতেও যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের জীবনযাত্রায় ও জীবনাচারে নানা পার্থক্য প্রকট, তখন সেকালে স্বাতন্ত্র্য আরো বেশি ছিল বলে মানতে হবে।

২. ভিন্ন গোত্রের বিভাষী শাসকের রাজ্যে ভিন্ন ভাষী ভিন্ন গোত্রের প্রতিবেশীর সঙ্গে ত্রিপুরা-আরাকানে বাঙালী হিন্দু-মুসলিমকে বাস করতে হয়েছে বলেই গৌড়রাজ্যের বাঙালীদের মতো তাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বার্ণিক স্বাতন্ত্র্য, অপরিহার্য পেশাভিত্তিক জীবন, সার্বক্ষণিক ঘৃণা-বিদ্বেষ ও সুদৃঢ় শাস্ত্রিকশাসন ছিল না। তা ছাড়া বিজাতি-বিভাষীর সংখ্যালঘু প্রজা হিসেবে ভাষা-সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার স্বনির্ভর থাকার একটা প্রয়াসও ছিল।

৩. প্রাচীন ও মধ্য যুগে কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য ও কিছু সংখ্যক কায়স্থের মধ্যেই পেশার প্রয়োজনে লেখাপড়ার চল ছিল। অন্যদের শিক্ষার কোন ঐতিহ্য ছিল না। বাঙলার দেশজ-মুসলিমরা যে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও নিম্নবিত্তের নির্জিত বৌদ্ধদেরই বংশধর তা আজকাল আর কেউ অস্বীকার করে না। কাজেই গৌড়রাজ্যের দেশজ মুসলিমদের মধ্যে ক্বচিৎ কারো শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল। যারা লেখাপড়া করত, তারা শাস্ত্রের বাহন আরবি ও দরবারী ভাষা ফারসি শিক্ষায় ছিল আগ্রহী, তাতে ছিল ঐহিক ও পারত্রিক সুখের ও সিদ্ধির আশ্বাস। এ কারণেই ব্রিটিশ আমলেও ১৯২০-৩০ খ্রীস্টাব্দ অবধি পুরানো ধারার মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্বচিৎ কারো বাঙলা বর্ণমালা চেনা ছিল।

৪. তা ছাড়া গৌড়রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুরাই দেব-কথার ব্যতীত বাঙলায় কোন রসকথার সাহিত্যচর্চা করেনি। কাজেই গৌড়রাজ্যে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হবার মতো অনুকূল প্রতিবেশ ছিল না। ধর্মকথার ভাষায় তথা বাঙলায় লিখিত রূপ দেয়া যেখানে পাপ বলে হিন্দু সমাজেই নিন্দিত, লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য কথাও ব্রাত্যাচার বলে ঘৃণিত, সেখানে গাঁয়ের নগণ্য সংখ্যক নিঃস্ব নির্জিত খেটে খাওয়া মানুষের সমাজে দু'একজন স্বল্পশিক্ষিত আরবি-ফারসি জানা ব্যক্তিই বা মুসলিম শাস্ত্রকথা বাঙলায় লিপিবদ্ধ করে নিশ্চিত জাহান্নাম বরণে উৎসুক হবে কেন! কাজেই গৌড়রাজ্যে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ অবধি মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে কেউ ধর্মকথা বা প্রেমকথা রচনা করেননি। ধর্ম সম্পৃক্ত বিষয়ে কাব্যরচয়িতা জায়েনউদ্দীন কিংবা শেখ ফয়জুল্লাহকে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত করতে হবে। অথবা এঁরা হয়তো আরাকানরাজার প্রজাই, গৌড়রাজ্যে ছিলেন প্রবাসী।

৫. আমরা জানি, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-উপাখ্যান রচিত হবার পরে মৃতভাষা সংস্কৃতের সাহিত্যক্ষেত্রও ছিল অনেককাল বন্ধ্যা। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও সাহিত্যচর্চা হয়েছে সামান্যই। তুর্কো-আফগান শাসনকালে দেশজ মুসলমানরাই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা উপকরণে সাজিয়ে লৌকিক গাথা, রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথা প্রভৃতিকে নব্যভারতীয় ভাষায় তথা উত্তরভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় শৈল্পিক রূপ দিতে থাকেন। ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রাচীন গ্রীসের দর্শন বিজ্ঞানের সাথেই য়ুরোপকে পুনরায় পরিচিত করানর কৃতিত্ব যেমন মুসলমানের, তেমনিই সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদান ও ভাবকে মধ্যযুগের লৌকিক 'ভাষা'য় রূপদান করে ভারতের সাহিত্যের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার কৃতিত্বও তাদেরই। ভারতীয় ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর ধারা প্রবর্তন আরবি ফার্শি সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকেই হয়েছে একথা না বললেও চলে।—স্বপ্নে দেখে নায়ক-নায়িকার প্রণয়াবিষ্ট হওয়ার প্রাচীনতম ইরানি রোমান্স Zariadres ও Odatis-এর প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম প্রণয়কাহিনী সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় সুস্পষ্ট।'[১]

---

১. *বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলেবকাওলী-সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ সন, পৃ ২-৩, ৫, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্যে—বেরারে, বিদরে, আহমদনগরে, বিজাপুরে, গোলকুণ্ডায় ইরানি বংশীয় সুলতানদের উৎসাহে ও প্রতিপোষণে ফারসিতে ও দাখিনী উর্দুতে প্রণয়োপাখ্যান রচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। ত্রিপুরা-আরাকানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিক সম্পর্ক ছিল না বটে, কিন্তু বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ আর বিদেশী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে, চট্টগ্রামবন্দরকেন্দ্রী সে-সম্বন্ধ উত্তর ভারতের সঙ্গেও ছিল ব্যাপক। এজন্যেই হয়তো উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দি-আওধির ও দাখিনী উর্দুর আর ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে চট্টগ্রামবন্দরের ও রোসাঙ্গ শহরের কলারসিক পাঠকদের। এবং তাঁরা উৎকৃষ্ট কাব্যগুলো স্বভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশী পাঠক-শ্রোতার চিত্তবিনোদনের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। এভাবে আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং এর প্রভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলিমদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অবিচ্ছিন্নভাবে জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করে, যা গৌড় রাজ্যে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ অবধি হতে পারেনি অনুকূল প্রতিবেশের অনুপস্থিতিতে। তাছাড়া বিজাতি-বিভাষীর রাজ্যে স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজও তাদের সাহিত্যচর্চায় প্রণোদনা দান করেছিল।

৬. সাহিত্যক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সাক্ষ্য মেলে চট্টগ্রামে রচিত কারবালা ও জঙ্গনামা কাব্যগুলোতে। দাক্ষিণাত্যের তথা আহমদনগরের, বিজাপুরের, গোলকুণ্ডার, বেরারের, বিদরের সুলতানরা ছিলেন ইমামিয়া দলের শিয়া। কারাবালাকাহিনী ছিল তাঁদের শাস্ত্রসম্পৃক্ত অবশ্যস্মর্তব্য পবিত্র বিষয়। রাজশক্তির আগ্রহে, প্রচারে ও প্রশ্রয়ে তাঁদের রাজ্যে দেশজ শিয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, তা ছাড়া ইরান থেকে আগত শাসক-প্রশাসক, সৈনিক-বণিক, ধনী-মানী শিয়া তো ছিলই। ফলে ইরানি প্রণয়োপাখ্যান ছাড়াও মর্সিয়াসাহিত্য, মহররমের তাজিয়া পার্বণ, এবং হযরত মুহম্মদ, হযরত আলী ও হামজার কাল্পনিক দিগ্বিজয় ও ইসলাম প্রচারমূলক মাগাজী বা জঙ্গনামাও দাখিনীতে আর ফারসিতে রচিত এবং জনপ্রিয় বিষয় হতে থাকে। সে-তরঙ্গ চট্টগ্রাম বন্দরেও অভিঘাত হানে। জয়কুমরাজার লড়াই, জয়গুণ বিবির কিস্সা, হামজার জঙ্গনামা, আলী বা হানিফার দিগ্বিজয়মূলক কাব্য আন্তর্জাতিক বন্দর চট্টগ্রামেও জনপ্রিয় হয় শিয়া সম্প্রদায় না থাকলেও ইসলামের উন্মেষযুগের ও রসুলের আত্মীয়দের কৃতি-কীর্তি হিসেবে। তাই বাঙলায় এগুলোর স্বাধীন অনুসৃতি মেলে ষোল-সতেরো শতক থেকেই, দৌলতউজির বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, শাহ বারিদ খান, মুহম্মদ খান, আবদুন নবী প্রমুখের কাব্য এ সূত্রে স্মর্তব্য।

৩. ষোল শতকের প্রণয়োপাখ্যান

মনোহর-মধুমালতী উপাখ্যান

এ পর্যন্ত আমরা ছয় জন 'মনোহর-মধুমালতী' উপাখ্যান রচয়িতার সন্ধান পেয়েছি ঃ মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, গোপীনাথ দাস, মুহম্মদ চুহর ও জোবেদ আলী। এঁদের মধ্যে কবি চুহরের কাব্যখানা পাওয়া যায় নি। তাঁর 'আজরশাহ সমনরোখ' নামের কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে এর উল্লেখ রয়েছে মাত্র। এ কয়জন কবির মধ্যে মুহম্মদ কবীর প্রাচীনতম।

।। গল্পসার।।

কবি মুহম্মদ কবীরের কাব্য থেকে এই চমৎকার উপাখ্যানটির সারাংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রাণী কমলাসুন্দরী। মনোহর তাঁদের সন্তান। মনোহর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজা বললেন ঃ

মনে শ্রধা আছে মোর হৈতে দেশান্তরী।
রহিতে প্রভুর পদে মোর শির এড়ি।।

ফলে রাজ্যভার মনোহরের উপর অর্পিত হল। মনোহর এক রাত্রে উদ্যানে নিদ্রামগ্ন ছিল। এ সময় কয়েকজন পরীজাদী ভ্রমণকালে তাকে দেখতে পায়। তারা

কুমারের রূপ দেখি বোলে বিপরীত
যথ যথ পরীজাদী হইল মোহিত।।

মনোহরের যোগ্য নারীর কথা ভাবতে গিয়ে পরীদের মনে পড়ল, 'মহারস রাজ্যের রাজা বিক্রমঅভিরাম ও রাণী রূপমঞ্জরীর পরমা সুন্দরী কন্যা মধুমালতীর কথা ঃ

নৌআলি যৌবনি বালি সাজিছে নব রঙ্গে।
সোনার পোতলা যেন সুতিছে পালঙ্কে।।

তারপর ঃ

কন্যার পালঙ্ক পাশে কুমার পালঙ্ক।
পরী সবে থুইলেক নিয়া এক সঙ্গ।।

নিদ্রা ভঙ্গে উভয়ের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। কুমার মনোহর মুগ্ধ হয়ে 'এক শশিমুখী দেখে পালঙ্ক উপর'। মনে মনে সে ভাবে ঃ

রূপে গুণে কুলে শীলে চন্দ্রিমা সমান।
এ কন্যা মানবী নএ অপ্সরা জন।।
পূর্ণ শশী নিন্দে মুখে নিন্দে অরবিন্দ।
চক্ষে ধরএ জুতি সে রূপের চন্দ।।

এ রূপবিভা সহ্য করতে না পেরে মনোহর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মালতী মনোহরের মাথা কোলে তুলে নিয়ে অভিভূতার মতো বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে কুমার চৈতন্য ফিরে পেয়ে বলে উঠল ঃ

শুন আএ শশিমুখী কমল নয়ান।
তোমার অঙ্গের ছন্দে বান্ধিলা পবাণ।।

মনোহর নিজের পরিচয় দিল। কন্যাও বলল সে মহারসরাজবিক্রমের কন্যা, তার মায়ের নাম রূপমঞ্জরী এবং তার নিজের নাম মধুমালতী বা মালতী। উভয়েই পরস্পরের রূপে মুগ্ধ ও প্রেমে আসক্ত। আর প্রণয়ের নির্দশন স্বরূপ তারা পরস্পরের অঙ্গুরী ও পালঙ্ক বদল করল। অনেকক্ষণ রঙ্গেরসে অতিবাহিত হওয়ার পর কায়িক অবসাদে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল আর ফিরবার পথে পরীজাদীরা কুমারকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে গেল। সকালে উঠে উভয়েই রাত্রের ঘটনা স্মরণ করে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ও কি স্বপ্ন, না বাস্তব! অস্থির রাজকন্যা মধুমালতী বিলাপ শুরু করে দিল ঃ

মুঞি সে চকোর মরি চাঁদের সেবিনী।
সদাএ আকুল হিয়া তাপিত রোহিণী।।

এদিকে মনোহরও পাগল হয়ে উঠল। পিতা সূর্যভানের কাছে খবর গেলে তিনি সৈন্যসামন্ত দিয়ে মনোহরকে তার স্বপ্নে পাওয়া সুন্দরীর সন্ধানে প্রেরণ করেন ; কিন্তু পথে এক নদী পার হওয়ার সময়ে তার সৈন্যসামন্ত সব মারা পড়ে। মনোহর কোন রূপে রক্ষা পেয়ে এক বনে গিয়ে পৌঁছে। সে বনে এক দৈত্য 'জটবহর' রাজ্যের রাজা ছত্রসেনের কন্যা 'পায়মা'কে [প্রেমাকে] হরণ করে এনে এক টঙ্গীতে রেখেছিল। পায়মার সঙ্গে মনোহরের সে টঙ্গীতে সাক্ষাৎ হয়। রূপসী পায়মাকে দেখে মনোহর ভাবে ঃ

এক রূপ লাঘি মুঞি হৈলুঁ দেশান্তরী।
আর রূপ চাহে মোর প্রাণ নিতে হরি।।

মনোহর ও পায়মার পরিচয় হল। মধুমালতী পায়মার সখী, কথা প্রসঙ্গে এ খবর শুনে মনোহর আশ্বস্ত হল। দৈত্যটিকে কৌশলে বধ করে মনোহর পায়মাকে উদ্ধার করে জটবহর রাজ্যে নিয়ে আসে। পায়মা মালতী ও তার মাকে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আনে। এরূপে মনোহর ও মালতী এখানে মিলিত হবার সুযোগ পায়। মালতির মা তাদের মিলন স্বচক্ষে দেখে কুলকলঙ্কের ভয়ে মন্ত্র বলে মালতীকে শুকপক্ষী করে ছেড়ে দেন। শুক উড়ে উড়ে বহু দূরে 'মানিক্য রস' রাজ্যে গিয়ে পৌঁছে। এখানে সে স্থানীয় রাজা তারাচাঁদের হাতে ধরা পড়ে।

শুকের মুখে পরিচয় পেয়ে তারাচাঁদ তাকে তার পিতৃরাজ্য 'মহারস'-এ নিয়ে যান। পিতা রাজা বিক্রমঅভিরাম মালিনীর বাড়িতে শুক রূপিণী কন্যাকে দেখতে পেলেন। রাজা তারাচাঁদের মুখে

মনোহরের সঙ্গে কন্যার প্রণয় কাহিনী শুনে মনোহরকে এনে তার হাতে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তারাচাঁদের সঙ্গে পায়মার বিয়ের ব্যবস্থাও এ সঙ্গে হয়ে যায়। এখানেই পুঁথি সমাপ্ত।[১]

মূল রচক ও ভাষা

আমাদের পাণ্ডুলিপির দুটো ভণিতা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, কবি ফারসি থেকে এ কাব্য অনুবাদ করেছেন ঃ

১. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পাঁচালি।।

২. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালি।।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রামের জোরওয়ারগঞ্জ গ্রামে কোন বাড়ীতে একখানি পুথি দেখেছিলেন, তাতে তিনি পুথির সমাপ্তিসূচক একটি শ্লোক পেয়েছিলেন ঃ

এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
দেশি ভাষাএ মুঞিঃ পঞ্চালি ভণিল।।

কাজেই কবি ফারসি না হিন্দী থেকে উপাখ্যান গ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিত রূপে বলবার জো নেই।

তবে মনোহর-মধুমালতী নামেই প্রকাশ, কাব্যখানির বিষয়বস্তু ভারতীয়। প্রথমোক্ত ভণিতা দুটোতে কবি বলেছেন, তিনি ফারসি থেকে অনুবাদ করেছেন। শেষে উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা অন্যরূপও হতে পারে। কবি হয় তো বলতে চেয়েছেন, এ কাহিনী হিন্দীতে ছিল, বাঙলায় ছিল না ; তাই তিনি ফারসি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করলেন। আমাদের এই অনুমানই হয়তো যথার্থ। কেননা, এমনও হতে পারে যে এই ভারতীয় উপাখ্যানটি নিয়ে কেউ ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন সে-ফারসি কাব্য থেকে কাহিনীটি নিয়ে কবি মুহম্মদ কবীর এ চমৎকার প্রণয় কাব্যটি রচনা করেছেন। 'পাএমা' নামটি সম্ভবত প্রেমা (বতী) বা পদ্মা নামের ফারসি বিকৃতি। কয়েক স্থানে ফাতেমাও লিখিত হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে, কবির আদর্শ ফারসি কাব্যই ছিল। অবশ্য গ্রন্থের কোথাও অনুবাদের জড়তা বা উপমাদি অলঙ্কারের অনুবাদের আভাস মাত্র নেই।

কাজী দৌলতের সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্যে মনোহর-মধুমালতীর কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায় ঃ

মধুমালতীর লাগি বিবাগী হইয়া
মনোহর গেল মা ও বাপ তেয়াগিয়া।।

মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যেও মনোহর-মধুমালতীর উল্লেখ রয়েছে। এতে মনে হয় কাহিনীটি অতি প্রাচীন। আমাদের মনে হয় কাহিনীটি মূলত ভোজরাজ দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উদ্ভুত হয়, ভারতীয় প্রায় উপাখ্যানই বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ সম্পৃক্ত। 'ভোজবাজি' শব্দটি আজো ভোজরাজের আমলের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন তুক তাক, টোনা প্রভৃতির কথায় বৌদ্ধযুগের কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনী-যোগিনীর কথা মনে পড়ে। কাহিনী ভাগে রূপমঞ্জরীর মধুমালতীকে মন্ত্রযোগে শুক করে দেয়ার বর্ণনা আছে, রূপমঞ্জরী নিজেও পরীকন্যা। এ সব দেখে মনে হয় কাহিনীটি অতি পুরাতন। অবশ্য এ সব ফারসি সাহিত্যের প্রভাবের ফলও হতে পারে। এ কাহিনী সংস্কৃতেও ছিল। ১০৬৮ হিজরীতে বিজাপুরের সুলতান আলী আদিল শাহর সভাকবি শেখ নুসরতী এ কাহিনীর 'গুলসনে এশক' নাম দিয়ে সংস্কৃত থেকে দাখিনী হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

১. বোধ হয় লিপিকর সম্পূর্ণ অংশ লেখেননি।

৪. মুহম্মদ কবীর

সরস্বতী বন্দনা, বাঙলাভাষা অর্থে 'হিন্দুয়ালী' শব্দের প্রয়োগ ভাষার প্রাচীনতাজ্ঞাপক শব্দাবলীর ব্যবহার, কাজী দৌলতের কাব্যে উপাখ্যানটির উল্লেখ, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অসমাক্ষর প্রয়োগ প্রভৃতি থেকে আমাদের মনে হয়, কবি মুহম্মদ কবীর আমাদের প্রাচীন কবিদের একজন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও বলেন ঃ

"সন ১১০১ মঘীর (১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে শ্রী আবদুল আলী সাং পরাগলপুর, চট্টগ্রামে অনুলিখিত একখানা মধুমালতী কাব্যের পাণ্ডুলিপি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে জোবওয়ারগঞ্জে (চট্টগ্রাম থানা মিরেরসরাই) দেখিবার সুযাগ আমার হইয়াছিল। ইহার শেষভাগের আবশ্যক অংশটুকু নকল করিয়া লইয়াছিলাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও পুথিখানি হস্তগত করিতে পারি নাই। পুথিখানির শেষ অংশটুকু এই ঃ

মনোহর মালতীর আকুল পিরীত।
গাহি সকল লোক মন হরষিত।।
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশি ভাষাএ মুঞি পঞ্চালী ভণিল।।
অন্ত অন্তে অন্তর-এ সিন্ধু তার পাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজিরার পাঁচ।।
পণ্ডিত জনার ঘিন্না মূর্খের গোহারি।
শিবে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি।।
মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এই কূল অই কূল।।

ইহা হইতে দেখা যায়, ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকটির লেখা সমাপ্ত হয়' কিন্তু ইহার রচনা আরম্ভ হয় আরও পাঁচ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। সম্প্রতি ইহার রচনার তারিখ লইয়া একটু গোল বাধিয়াছে। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (মৃত্যু–১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে) সাহেব ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখের পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন 'সম্প্রতি মধুমালতী পুথির একটি পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছিল ইহার শেষ পত্রে ভণিতার আগে হেয়ালীতে একটা তারিখ ছিল তাহা এই ঃ

অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরার পাঁচ।।"

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এর নিম্নরূপ পাঠশুদ্ধি দিয়েছেন ঃ

অঙ্গ সঙ্গ রহে রস বিন্দু তার পাছ
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ।[১]

এতে ৮৯০ হিজরী বা ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে পাওয়া যায় ; কিন্তু উক্ত দুটো তারিখের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই কোথাও গলদ রয়েছে নিশ্চয়ই। লক্ষণীয় যে শেষ চরণটি উভয় পাণ্ডুলিপিতে অবিকৃত রয়েছে। অতএব ভুল ঐ প্রথম চরণেই লুকায়িত আছে। অবশ্য দুটো পাঠের সমন্বয়ে আরো কয়েকটি পাঠ অনুমান করা যায় ঃ

১. অন্ত সঙ্গে অঙ্গ রএ সিন্ধু (বা বিন্ধু) তার পাছ
–৯৮৭ বা ৯৮০=১৫৭৯ বা ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দ

২. অঙ্গ অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ
–৮৯৭ বা ৮৯০=১৪৯২ বা ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দ

---

১ *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য ঃ পৃঃ ৯৬-৯৮।*

৩. অঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ রএ সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ
−৮৮৭ বা ৮৮০=১৪৮৩ বা ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ

৪. অন্ত সঙ্গে রএ রস সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ
−৯৯৭ বা ৯৯০=১৫৮৯ বা ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ

যা হোক, আরো পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলে শেষ কথা বলা যাচ্ছে না ; তবে এটা যে ষোল শতকের পরের রচনা নয়, তা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে।

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্যে' মুহম্মদ কবীরের কাব্য উনিশ শতকের রচনা বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির অনুলেখনের তারিখ অনুসারেই (১১০১ মঘী বা ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ) নিঃসন্দেহে ভুল প্রমাণিত হল।

আমাদের আলোচ্য পুথিখানা ও অসংগৃহীত পাণ্ডুলিপি দুটো চট্টগ্রামের সম্পদ। এতে মনে হয়, মুহম্মদ কবীর চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

অন্য প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত আপাতত তা-ই মনে করা যাক। বিশেষত, গোড়া থেকেই চট্টগ্রামের মুসলমানেরাই বাঙলাসাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রণী, এমনকি পথিকৃৎ ছিলেন। কাজেই মুহম্মদ কবীরের চট্টগ্রামবাসী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চট্টগ্রামে প্রচলিত কতগুলো বিভক্তি, প্রত্যয় ও শব্দের কাব্যে প্রয়োগ থেকেও আমাদের অনুমানের সর্মথন মেলে। যেমন, মিখ (−দিকে, পানে), কোনে (−কেকুনি (−কোথায়), লুলালুলি (−মৃদুভাবে মর্দন), ফেলেফ্যারি (−ফ্যালফ্যাল) তু(−থেকে) থু(−থেকে) ইত্যাদি।

মধুমালতীর অন্যান্য রচয়িতা

সৈয়দ হামজার 'কেচ্ছা মধুমালতী' দেখে মনে হয়, পরবর্তী মধুমালতী কাব্য রচয়িতাগণ মুহম্মদ কবীরের কাব্যখানি অনুসরণ করেননি, তাঁরা সতেরো শতকের হিন্দুস্থানী বা ফারসি কাব্যগুলিকেই আদর্শ করেছিলেন। এখানে সৈয়দ হামজার পুথির সঙ্গে মুহম্মদ কবীরের কাব্যের পাত্র-পাত্রীর নাম ও স্থানগত যে সব বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা দেখাচ্ছি ঃ

	মুহম্মদ কবীরের কাব্য	সৈয়দ হামজার পুথি
১	মনোহরের ধাত্রির নাম −'পহেজা'	কোন নাম নেই
২	সূর্যভান−কঙ্গিরা দেশেব রাজা	সূর্যভান-বঙ্গের প্রধান রাজা
৩	মালতীর সখী−পাএমা বা ফাতেমা	মালতীর সখী−প্রেমা
৪	সূর্যভানের রাজধানী−কঙ্গিরা শহর	সূর্যভানের রাজধানী-বঙ্গ মধ্যে কিঙ্করনগর
৫	পাএমার পিতৃরাজ্য−জটবহর	প্রেমার পিতৃরাজ্য-বিচিত্র বিশ্রাম

কবীরের অনুসৃত কাব্য

মধুমালতীর উপাখ্যান মধ্যযুগের আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী প্রচলিত ছিল। প্রথমে মৌখিক রূপকথার আকারে, পরে অন্তত ষোল শতক থেকে লিখিত উপাখ্যানরূপে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। হিন্দীতে এ উপাখ্যানের প্রথম কাব্যায়ন ঘটে শেখ মুহম্মদ মনঝন নামের এক কবির হাতে। তিনি ছিলেন চুনার নিবাসী। শেরশাহ শূরের পুত্র সেলিম শাহ শূরের রাজত্বকালে ৯৫২ হিঃ বা ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে এটি রচিত। শাত্তারী তরিকার প্রখ্যাত সূফী শেখ মুহম্মদ গাউস গোয়ালিয়রীর (মৃঃ ৯৭০ হিঃ বা ১৫৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দ) ভক্ত ছিলেন মনঝন। তাঁর কাব্য আসলে স্রষ্টা-প্রেমের রূপক। এ জন্যে তাঁব কাব্যে বিভিন্ন সূত্রে নানাভাবে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর মতে—

প্রথমহি আদি প্রেম পরিবিষ্টি
তৌ পাছেঁ ভই সকল সিরিষ্টি।

উৎপতি সিষ্টি পেম সোঁ আঈ
সিষ্টি, রূপভর প্রেম সবাঈ।

প্রথমেই প্রবিষ্ট হয়েছিল আদি প্রেম। তারপরে হল সব সৃষ্টি। সেই প্রেম থেকেই সৃষ্টির উৎপত্তি। সৃষ্টিরূপে সবটাই ভরে তুলল প্রেম অর্থাৎ পুরো সৃষ্টিটাই প্রেমজ। কাব্যটি কেবল তত্ত্বকথার আকর নয়–কবিত্বেরও আধার। এরপরে মনোহর-মধুমালতীর রূপকথা প্রণয়োপাখ্যান রূপে বর্ণিত হয়েছে হিন্দী, ফারসি ও দাখিনী উর্দু ভাষায়, যেমন ঃ

১.	শেখ নুর মুহম্মদ-মসনবী-ফারসি	রচনাকাল	১০৫৯ হি-১৬৪৯ খ্রীঃ
২.	অজ্ঞাত-কিসসা-ই মধুমালত ওয়া কুঁওর মনুহর ফারসি	"	১০৫৯ হিঃ ঐ
৩.	মীর আসকারী-মিহর ওয়া মাহ্-ফারসি	"	১০৬৫ হিঃ ১৬৫৪-৫৫ খ্রীঃ
৪.	নাসির আলী-মসনবী	"	১১০৮ হিঃ ১৬৯৬ খ্রীঃ
৫.	মাধোদাস (গদ্যে) মীকা ওয়া মনোহর		১০৯৮ হিঃ ১৬৮৭ খ্রীঃ
৬.	অজ্ঞাত (গদ্যে) মধুমালতী-মনোহর		- -
৭.	নুসরতী (কাব্য) গুলশান-ই-ইশক	"	১০৬৮ হিঃ ১৬৫৭-৫৮ খ্রীঃ
৮.	চতুর্ভুজ দাস-মধুমালতী	"	–সতেরো শতক।

সৈয়দ আলী আহসান[১] কয়েকটি চরণের বক্তব্যগত শাব্দিক মিল লক্ষ্য করে মুহম্মদ কবীরের মনোহর-মধুমালতী উপাখ্যান মনঝনের কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ বা অনুসৃতি বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছেন। ডক্টর মনতাজুর রহমান তরফদার এ প্রকার সাদৃশ্যকে অনুসৃতির সাক্ষ্য রূপে উপস্থাপিত করার অযৌক্তিকতা ও অসারতা দেখিয়েছেন, তাঁর মতে এই মিল তথ্যগত এবং অনুবাদের নির্দেশক নয়।[২] ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার তার 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী আওয়াধী পটভূমি[৩]গ্রন্থে বিস্তৃত উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে মুহম্মদ কবীরের অবলম্বন ছিল ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে অজ্ঞাতনাম কবি রচিত ফারসি কাব্য 'কিস্‌সা-ই-মধুমালত ওয়া কুঙর মনুহর।' এবং যেহেতু অনুসৃত ফারসি কাব্যটি ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত, সেহেতু মুহম্মদ কবীরের 'কাব্যটির রচনাকাল সতেরো শতকের শেষার্ধ বা আঠার শতকের প্রথমভাগ।"[৪]

সৈয়দ আলী আহসান হিন্দি কাব্যের সঙ্গে ও ডক্টর তরফদার ফারসি কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে মুহম্মদ কবীরের অবলম্বন মূল কাব্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কোন কোন পাত্র-পাত্রীর ও স্থানের নামের ভিন্নতার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাতে পারেন নি। এবং অনুবাদেও আক্ষরিক অনুসৃতি দেখাতে পারছেন না।

মনঝনের কাব্যই যদি কবীরের অবলম্বন হয়, তা হলে অনুবাদ এমন সংক্ষিপ্ত হল কেন, প্রেমতত্ত্বই বা বাদ গেল কেন, রূপ-বর্ণনাই বা ভিন্ন হল কেন—এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রয়োজন। আর 'কিস্‌সা-ই-মধুমালত ওয়া কুঙর মনুহর'ই যদি কবীর অনুবাদ করে থাকেন, তা হলে সে কাব্যটির ও কবির নাম তাঁরও অজ্ঞাত ছিল, তাই কবির ও কাব্যের নাম উল্লেখ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর অনুবাদেরও মূলানুগত্য নেই।

ডক্টর তরফদারের তুলনার নমুনা এরূপ ঃ রাজপুত্রের জন্মলগ্নে জ্ঞানী ও গণক উপস্থিত হলেন, সূর্যের মতো উজ্জ্বল (শিশুর) কাছে গেল, তারা নাম রাখল মনোহর। সে জগতে সূর্যের চেয়ে

১. *মধুমালতী উপাখ্যান—সাহিত্য পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭১, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৪১-৪৭।*

২ *পদ্মাবতী ও মধুমালতীর রূপক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য ঃ ইতিহাস (ঢাকার ইতিহাস পরিষদের মুখপত্র) ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৩৪-৩৯।*

৩. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ প্রকাশিত, ১৯৭১ সন, পৃঃ ৩২৮-৬৮-৩৭৫-৭৮।*

৪ *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী আওয়াধী পটভূমি, পৃঃ ৭৮।*

উজ্জ্বল হবে, তার ধন, রাজত্ব ও সুখ্যাতি হবে। পনের বছর বয়সে তার কারো জন্যে হৃদয়ে জ্বালাময়ী কামনা দেখা দেবে। একবছর কাল সে তার জন্যে ঘুরবে, পরে ঘরে ফিরবে।

—কিসসা-ই-মধুমালত।

'জন্মলগ্নে ওলিগনে গুণিতে মাগিতে লাগিল', রাশিক্রম পুরাণ দেখে শিশুর নাম রাখিল মনোহর। এ শিশু চন্দ্রের সমান, চন্দ্রমুখীর জন্যে পনেরো বছর বয়সে বিরাগী হবে।

—কবিরের মধুমালতী।

মনঝনের কাব্যেও প্রভাতে পণ্ডিতরা এসে রাশি পরীক্ষা করে গ্রহ গণনা করেছে, এ শিশু ছত্রপতি হবে অন্য রাজারা, মুনি গন্ধর্বও তাকে নমস্কার করবে, এ জ্ঞানী যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় হবে, তার নাম হবে মনোহর, ১৪ বছর, ১১ মাস ৯ দিন বয়সে জন্ম স্থানে সূর্য, সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকবে, তখন তার সঙ্গে কোন প্রিয় স্বরূপ মিলিত হবে। ইত্যাদি ফারসির দ্বিগুণ এবং বাঙলার তিনগুণ দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে তথ্যগত মূল বক্তব্য অভিন্ন। কেবল ভাষাভেদে ব্যক্তিভেদে এবং বর্ণনার প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিভেদে তিন ভাষার কাব্যের একই বিষয়ক বর্ণনা শুধু হ্রস্ব-দীর্ঘ হয়নি, উপমারও প্রয়োগভেদ এবং ন্যূনাধিক্য ঘটেছে।

আসল কথা মনোহর-মধুমালতী এবং অন্যান্য রূপকথা শত শত বছর ধরে মুখে মুখে কানে কানে চালু ছিল। পনেরো-ষোল-সতেরো শতকে নব্যভারতীয় ভাষায় সে রূপকথাগুলো প্রেমকথা রূপে, অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতীক রূপে, কিংবা নিছক গল্পরসের আধাররূপে গাথায়, মসনবীতে ও কাব্যে রূপায়িত এবং লিপিবদ্ধ হতে থাকে, সে সঙ্গে মধ্যযুগীয় নিয়মে অনূদিত বা অনুসৃতও হতে থাকে। কোন দুইজনের হস্তাক্ষর যেমন একরকম নয়, তেমনি অনুবাদ-অনুসরণ হলেও কোন দুজনের রুচি, বুদ্ধি ও প্রয়োজন-চেতনা অবিকল একরূপ নয় বলে তাঁদের রচনা প্রায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে।

'এহি সে সুন্দর কিসসা হিন্দিতে আছিল।
দেশি ভাষাএ মুঞি পঞ্চালি রচিল।।

উক্ত ভণিতা দৃষ্টে মনে হয় মুহম্মদ কবীর জানতেন যে মধুমালতী কিসসার উদ্ভব উত্তর ভারতে, এটি কোন হিন্দিকাব্যের বিষয়ও কি-না তা তাঁর জানা ছিল না।

আর ১. 'মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি
আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পঞ্চালি।
২. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি
আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালি।

গ্রন্থোক্ত এ দুটো ভণিতার প্রমাণে মানতেই হবে তাঁর আদর্শ ছিল কোন ফারসি কাব্য। তবে সে ফারসি কাব্য অজ্ঞাত নামা কবির 'কিসসা-ই-মধুমালত' কিনা তা জোর করে বলা যাবে না। ষোল শতকে রচিত আজ অবধি অনাবিষ্কৃত অন্য কোন ফারসি কাব্যও তাঁর অবলম্বন হতে পারে। দু'দুটো পাণ্ডুলিপিতে যখন রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া গেছে, তখন সেগুলো লিপিকর প্রমাদে বিভ্রান্তিকর হয়েছে বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কাব্যের ক্ষুদ্রকলেবর, উপাখ্যানের ঋজুতা, বর্ণনার সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা এবং প্রাচীনতা দ্যোতক বহু শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি মুহম্মদ কবীরকে সতেরো শতকের শেষপাদের বা আঠারো শতকের কবি বলে গ্রহণ করার পক্ষে বড় বাধা।

অতএব হয় কিসসা-ই-মধুমালত আরো একশ বছর আগের রচনা, ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দের নয়, এটি হয়তো লিপিকর প্রদত্ত লিপিকাল। কবিরই নাম নেই যে গ্রন্থে সে গ্রন্থে রচনাকাল থাকার কথা নয়। অথবা কবীরের আদর্শ ছিল অন্য কোন অধুনালুপ্ত বা অপ্রাপ্ত কাব্য। ডক্টর তরফদারই স্বীকার করেছেন যে ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত অপর গ্রন্থ শেখ নূর মুহম্মদ রচিত মসনবী বা ১৬৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত মীর আসকারীর 'মিহর-ও-মাহ' অনুসৃত হয়নি। আসলে কবীর বহুশ্রুত কিস্‌সার বা অনেকবার পঠিত কাব্যের অনুসরণে সংক্ষেপে গল্পকথনে আগ্রহী ছিলেন—অনুবাদে নয়।

এখন প্রশ্ন ওঠে---কার ফারসি বা হিন্দী 'কেতাব' দেখে মুহম্মদ কবীর তাঁর কাব্যখানা রচনা করেছিলেন ? বাঙলাদেশে কোন পুথিপত্র নেই। আমরা বিভিন্ন পুথিশালার Descriptive Catalogue-গুলো ঘেঁটে দেখেছি, সেগুলোর মধ্যে যাঁদের রচনার খোঁজ পাচ্ছি তারা কেউ সতেরো শতকের পূর্বের নন।

প্রথম হিন্দী রচনার সাক্ষাৎ পাচ্ছি শেখ জুম্মনের মধুমালতীর। এটা সতেরো শতকের গোড়ার দিকে রচনা। দ্বিতীয় হিন্দী রচনাটি শেখ মনঝনের। ইনি ১০৫৯ হিজরী বা ১৬৫০-৫১ খ্রীস্টাব্দে উপ্যাখ্যানটি রচনা করেন।

১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে শেখ জুম্মনের মধুমালতীর ফারসি অনুবাদ করেন নাসির আলী। সম্রাট আওরঙজেবের সভাকবি ও এলাহাবাদের সুবাদার মীর আসকাবীও ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে শেখ জুম্মনের হিন্দী 'মধুমালতীর ফারসি অনুবাদ করেন। এঁর কাব্যের নাম মীর ও মা (Mihr-o-Maa)। তাঁর কলমী নাম (তাখাল্লুস) ছিল 'রাযী'। এবং সম্রাট আওরঙজেব থেকে তিনি 'আকিল খান' উপাধি পেয়েছিলেন। জুম্মন মনঝন নামের বিকৃতিও হতে পারে।

বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহর সভাকবি শেখ নুসরত 'গুলসনে এশ্‌ক' নাম দিয়ে ১০৬৮ হিজরী বা ১৬৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে মীর আশকারীর (মতান্তরে সংস্কৃত থেকে) 'মীর ও মা'-এর দাখিনী হিন্দী অনুবাদ করেন। আঠারো শতকের কোন সময়ে কবি মুন্সী আলী রিযা মনঝনের কাব্যখানা অবলম্বন করে আর একখানা ফারসি মধুমালতী কাব্য রচনা করেছেন। বর্তমানে এখানে আমাদের এর অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ সংগ্রহ করার উপায় নেই।

তবে পদুমাবতে মধুমালতী কাহিনীর উল্লেখ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে এ কাহিনী সুপ্রাচীন এবং কবীরের কাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলোর আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর কাব্যখানা ষোড়শ শতকেই রচিত হয়েছিল। কাজেই মুহম্মদ কবীরের আদর্শ ফারসি বা হিন্দী কাব্যখানা কোন্ আদি কবির রচিত ছিল তা জানা গেল না।

সতেরো আঠারো শতকে মনোহর-মধুমালতী উপাখ্যানটি যে ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা এযুগের একাধিক ফারসি, হিন্দী ও বাঙলা কাব্য রচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

এবার আমরা বাঙলা 'মধুমালতী' কাহিনী রচয়িতাদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

১. চট্টগ্রামের বাঁশখালী নিবাসী বহুগ্রন্থ প্রণেতা উনিশ শতকের কবি মুহম্মদ চুহর একখানি মনোহর-মধুমালতী কাব্য রচনা করেছিলেন বলে তাঁর 'আজর শাহ-সমনরোখ' নামের কাব্যে উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু কাব্যখানি আজো পাওয়া যায়নি।

২. হুগলীর ভুরসুট পরগণার উদনা নিবাসী কবি সৈয়দ হামজা দোভাষী পুথি সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। দোভাষী পুথির আদি রচয়িতা ফকির গরীবউল্লাহ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কবি সৈয়দ হামজা ১১৯৫ সনে তথা ১৭৮৮-৮৯ খ্রীস্টাব্দে মধুমালতী কিস্‌সাখানা রচনা করেন। এ পুথিটি যে তাঁর প্রথম রচনা, তার হাতেম তাই পুথি থেকে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে ঃ

কবিতার বাত কহি দেলেতে বুঝিতে ছহি
যতেক রসিক বন্ধুগণ।
আছিনু বসন্তপুরে মইনদ্দি মোল্লার ডেরে
সেইখানে করিনু যতন।।
কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুন পুথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খায়েস পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে।।

লক্ষণীয় যে মধুমালতী কাব্যখানা সৈয়দ হামজা অবিমিশ্র বাঙলায় রচনা করেছেন। এ কাব্য রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে কিংবা স্ব-এলাকার লোকের সহজবোধ্য করাব জন্যে তিনি তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলো দোভাষীরীতিতে রচনা করেছেন, তা জানবার উপায় নেই। সময়ের হিসেবে তাঁর রচনার বিশেষ কোন মূল্য নেই। রচনানৈপুণ্য বা অন্য কোন প্রকারের বৈশিষ্ট্যও নেই।

৩. মনোহর-মধুমালতী কাহিনীর অপর রচয়িতা হচ্ছেন সাকের মাহমুদ উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত মুক্তিপুর পরগনার রিকাইতপুর গ্রামে ১৭৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে কবি সাকের জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মাহমুদ, পিতামহের নাম (শেখ) কাবিল ঃ

রিকাইতপুর গ্রামে বসতি আমার।
মুক্তিপুর নাম বটে শুন পরগণার।।
সরকার অশ্বঘাট হিস্যাব নওআনী।
রাজরাজেশ্বর গৌরনাথ নৃপমণি।।
কাবিল-তনয় শেখ মামুদ মোর পিতা।
কোনো মণ্ডল জ্যৈষ্ঠভ্রাতা মুক্তিপুরের কর্তা।।

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে গৌরনাথ বর্ধনকুটীর জমিদার ছিলেন। গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি বলেছেন ঃ

মধুমালা মনোহর কিতাব নিকটে।
পাইয়া পাঁচালী দীর্ঘ রচি কহো ঝাটে।।
আনন্দ উৎসব মন ঈদের দিবসে।
সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে।।
একাদশ শত সাল উন অষ্ট আশী।
ফারসি বাঙলা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি।।
বয়ক্রম শুন মোর কুড়ি পর দুই।
বাইশ বছর মাত্র না বুঝি প্রমাই।।

সুতরাং কবি বাইশ বছর বয়সে ১৭৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

৪. একজন হিন্দু কবিও 'মালতী-মনোহর' উপাখ্যান রচনা করেছেন। তাঁর নাম গোপীনাথ দাস। চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত হাওলা চাকলার পোপাদিয়া গ্রামে তাঁর বাস ছিল। কবির পরিচয় ও রচনার তারিখ এরূপ ঃ

হরিধ্বনি করহ সকলে কবি গাএ।
ভাবিআ গোবিন্দ পদ গ্রন্থ হৈল সায়।।
মিত্র পৃষ্ঠে ঋতু নেত্র শক নিরূপণ।
প্রথম নিদাঘ মাসে নেত্র নিরূপণ।।
শনৈশ্চর বাসর বেলা দ্বিপ্রহর।
সাঙ্গ হৈল আখ্যান মালতী-মনোহর।।
স্বয়ক্ষর গোপীনাথ চট্টগ্রাম স্থান
তার অন্তঃপাতী গ্রাম হাওলা প্রধান।।
সেই জন্মভূম বাস চিরকাল বাস।
দৈবের কারণে মম কারাগারে বাস।।

বলা বাহুল্য তারিখটির পাঠ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ 'মিএপৃষ্ঠে ঋতু নেত্র সন নিরূপণ হবে, এতে আমরা ১২৬২ বাঙলা সন, তথা ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ পাচ্ছি।

৫. আর একখানা 'মধুমালা কেচ্ছা' রচনা করেছেন বিশ শতকের প্রথম পাদে দোভাষী পুথিকার জোবেদ আলী। এতে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব নেই।

৬. কবি নুর মোহাম্মদ রচিত 'মদনকুমার মধুমালা' পুথির প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। ওটাও মনোহর-মধুমালতী কাহিনী ভিত্তিক. কিন্তু কাহিনী আরো পল্লবিত হয়েছে এবং পাত্রপাত্রীর নামভেদও ঘটেছে। এযুগে মদনকুমার মধুমালা নাটিকা রচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীন।

প্রায় একই সময়ে সৈয়দ হামজা. সাকের মাহমুদ এবং মুহম্মদ চুহর ও গোপীনাথ দাসের দ্বারা উপাখ্যানটি রচিত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে. আঠারো-উনিশ শতকে এটা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

মুসলমান কবি যেমন 'বাণী' স্মরণ করে লেখনী ধারণ করেছেন, তেমনি হিন্দুরাজাও মুসলমান ওলী দিয়ে নবজাতকের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাচ্ছেন এবং ভাগ্য গণনা করাচ্ছেন ঃ

ওলিগণে গুণিতে মাগিতে লাগিল।
ভালমন্দ কুমারের সকল গুণিল।।

শুধু-তা-ই নয়, এখন থেকে ভূতপেত্নী গর্ন্ধব নয়, পরীও হিন্দু নায়ক-নায়িকার প্রণয় সহায়। হিন্দুরাজা অভিষেক-উৎসবে মুসলিম পোশাকে ভূষিত হয়েছেন ঃ

মণিকলা পাগ শিরে থোপা থোপা মুক্তা ঝরে....
সুবর্ণ কাবাই দেহ 'পরে।

দরবারের পরিবেশটাও মুসলিম প্রভাবিত। তাই অভিষেক অন্তে ঃ

রাজা উজিরেহ করিলা সালাম।

সেকালে বাজবাড়িতেও 'মঙ্গল' গান হত। তাতে

রাজ্যে যথ লোক ছিল 'মঙ্গলা' শুনিয়া আইল
নাট গীত বাদ্যের কল্লোলে।

এতে থাকত ঃ

মন্দিরা মৃদঙ্গ কাড়া শিঙা ঢাক দোতারা
শঙ্খ সানাঞি কর্ণাল ফুকরে।
মধু বেলি চঙ্ক বাঁশি নানা বাদ্য রাশি রাশি
যথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে।।

এমন 'মঙ্গল' গানেও নর্তকীর নাচ ছিল ঃ

নর্তকীব দেখি সাজ মোহ যায় দেবরাজ
নাচে যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী।

শুধু তাই নয়. অন্য লোকেরাও

কেহো নাচে কেহো গাএ কেহো হাসি যন্ত্র বাএ
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।

সে যুগে চিত্রল ছাঁদের কুন্তল, সপ্তছড়ি মুক্তার হার, বিচিত্র কাঞ্চুলী, হেমরি শাড়ী. নূপুর, কঙ্কণ, বাজু প্রভৃতি রাজঅন্তঃপুরিকাদের অঙ্গাভরণ ছিল।

রাজকন্যারও সতীত্ববোধ ও সমাজচেতনা শিথিল ছিল না ঃ

শুনি লোকে দিব লজ্জা হৈলু কলঙ্কিনী।।
কি মুখে বসিনু মুঞি নারীর সভাত।

ডাকিনী-যোগিনী প্রভাবজ তুক-তাক-টোনায় বিশ্বাস তখনও প্রবল ছিল। মালতীকে তার মা রূপমঞ্জরী নিজেই মন্ত্র পড়ে পাখী করে দিলেন। নদীমাতৃক এ দেশের নৌকার বর্ণনা যথার্থই হয়েছে ঃ

নব ইন্দু ছন্দ জিনি নৌকার গঠন।
আগে পাছে গাছুল দোল-এ ঘন ঘন।।
রজতের বৈঠা সব হেম কেরুয়াল।
চলিতে চঞ্চল অতি না ছোএ কিলাল।।
তবু 'নদী পার হতে সবাই জপে প্রভু নাম'।

মনোহর-মধুমালতী বিয়ের আগে মিলিত হচ্ছে। মিলনটা গান্ধর্বরীতি সম্মত ঃ
তোহ্মা সনে আদ্যে আহ্মি দঢ়াই করিছি।
সেই ধর্ম বাক্য আহ্মি মনেত রাখিছি।।
অন্যে অন্যে দোহানের ধর্মাধর্ম ভেল।
তবে সে লজ্জার বাস দোহন দূরে গেল।।[১]

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান

১. কাহিনীর উৎস

বাঙলা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানগুলো যদিও 'কালিকামঙ্গল' শাখার অন্তর্গত তবু গৌড় সুলতানের আগ্রহে প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে রচিত বলে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের বিদ্যাসুন্দরকে এবং মুসলিম কবি রচিত উপাখ্যান হিসেবে শাহ বারিদ খানের বিদ্যাসুন্দরকে এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করলাম।

বিদ্যাসুন্দরের সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় অনেক কবি পাঁচালী বা গীতি-নাট্য রচনা করেছেন। এ কাহিনীর উদ্ভব সম্বন্ধে আজো মতানৈক্য বর্তমান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বররুচি নামক কোন কবিকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের [সংস্কৃত] আদি রচয়িতা বলে মেনে নিয়েছেন।[২] অবশ্য তিনিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন। তিনি বিশ্বাস করেন—বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের অনহিলপত্তনে ইংরেজি ১১ শতকে। সেখানে বিলহন নামে একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন, ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। সেই সময় তিনি ৫০টি কবিতা রচনা করেন, সেই পঞ্চাশটি কবিতার নাম 'চৌর পঞ্চাশিকা'।[৩]

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রও বররুচিকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি রচয়িতা সাব্যস্ত করেছেন।[৪] এ কাব্যের কতগুলো শ্লোকের সঙ্গে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত 'কাব্য সংগ্রহের' তৃতীয় খণ্ডে ধৃত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের শ্লোকগুলোর মিল রয়েছে।[৫] আবার উক্ত কাব্যসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের চৌর-পঞ্চাশিকা ও ২য় খণ্ডের খণ্ডিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর শ্লোকগুলো একত্র সংগৃহীত হয়ে ঈশান চন্দ্র ঘোষের প্রকাশনায় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাসুন্দর' নামের গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। কবি রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নন্দলাল দত্ত ভূমিকায় একটি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু অধ্যাপক মিত্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অনুরূপ। অধ্যাপক মিত্রের গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ৫৪৫ এবং ঈশান ঘোষের বিদ্যাসুন্দরের বা কাব্য সংগ্রহের, বা রাম তর্কবাগীশের কাব্যসন্দীপনীর বিদ্যাসুন্দরের শ্লোক সংখ্যা ৫৪ টার অধিক নয়।[৬] সুতরাং আমরা অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম'কে পূর্ণাঙ্গ বলে মেনে নিতে পারি। এবং এভাবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতা কোন এক বররুচি বলেও প্রমাণিত হচ্ছে।

---

১. *বিস্তৃত আলোচনার জন্যে মৎসম্পাদিত মধুমালতীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*

২ *বিদ্যাসুন্দর বররুচি প্রণীত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।*

৩. *মুখবন্ধ ঃ বলরাম কবিশেখর রচিত কালিকামঙ্গল-চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত।*

৪ Proceeding of 2nd Oriental Conference, pp. 215-20

৫. *বলরামের কালিকামঙ্গল-ভূমিকা।*

৬. *ত্রিদিবনাথ রায় প্রদত্ত পরিচিতি অনুসরণে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখিত) ভূমিকা (২য় ভাগ)।*

কিন্তু এ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি হচ্ছে চৌর-পঞ্চাশিকা বা চৌর-পঞ্চাশৎ নামক ৫০টি শ্লোক সমষ্টি। উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কবি বিলহন, রাম তর্কবাগীশের মতে নায়ক সুন্দর নিজে এবং অন্য অনেকের মতে চৌর নামক কবি। এ বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ এই যে 'চৌর' পঞ্চাশিকা বিদ্যাসুন্দরকাহিনী নিরপেক্ষ শ্লোক হলেও বররুচির কাব্যে ওগুলো উক্ত কাব্যের অঙ্গস্বরূপ কল্পিত হয়েছে ; ফলে 'চৌর পঞ্চাশিকা' বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেরই অন্য নাম রূপে ধারণা হয়ে গেছে। বিলহন্ কাহিনী ও সাদৃশ্যবশত 'চৌর পঞ্চাশৎ' এর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে চৌর-কবি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঙালী কবি জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন। "ইঁহার নাম বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই। জয়দেব তাঁহার "প্রসন্ন রাঘব" নাটকের প্রারম্ভে চৌর-কবি সম্বন্ধে প্রশস্তি করিয়াছেন।"[১]

বিল্হন বা বিহলনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধেও রাজকন্যার সঙ্গে প্রণয়ঘটিত কাহিনী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রয়েছে। নানা কারণে মনে হয় বিলহন কাব্য, চৌর-পঞ্চাশিকা এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রচার ও প্রসার বাঙলাদেশেই বিশেষভাবে হয়েছিল, এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ[২]

'কঙ্ক রচিত বিদ্যাসুন্দর ছাড়া (এটি সত্যপীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক) বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সকল বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত কাব্য এবং কালী মাহাত্ম্য প্রচার কল্পে রচিত। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্ পুথিতে সূত্রপাতেই "ওঁ নমঃ কালিকায়ৈ" লিখিত আছে এবং তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার কালীকে তাঁহার কুলদেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালিকামাহাত্ম্য এক বঙ্গদেশেই বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের অন্যত্র অবাঙ্গালীদের মধ্যে কালী সাধনা বিরল। বাংলার বাহিরে কালী মাহাত্ম্য প্রচারক কোনও কাব্যই দৃষ্ট হয় না। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও অন্যত্র প্রসার লাভ করে নাই। বররুচির বিদ্যাসুন্দর কাব্যও বাংলাদেশেই অবস্থিত হইয়াছে পুথিও বাংলা অক্ষরে লিখিত। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে, সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য কোনও প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরই রচনা। গ্রন্থকারের নাম হয়ত বররুচি ছিল, না থাকিলেও তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঙলা বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী বা গীতিনাট্যগুলোর আদি উৎস হচ্ছে বররুচির সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্', এবং এটিই কোন কোন বাঙালী কবির কাছে চৌরের কাহিনী বা চৌর-পঞ্চাশিকা নামে পরিচিত ছিল। তিন দেশের [চৌরের কাশ্মীর, বিহলনের দাক্ষিণাত্য অনহিলপত্তন এবং বাঙলার বর্ধমান] তিনটি কাহিনীর সাদৃশ্যবশত বিভ্রান্তির ফলে বিভিন্ন কবির মধ্যে দেশ ও নামগত কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। নিছক মানবীয় রোমান্স এ কাহিনীটিও মধ্যযুগের পরিবেশে কালিকামঙ্গলের আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে তবু জনসাধারণ একে মানবীয় প্রণয়কাহিনীরূপেই আস্বাদন করত। তাই একজন মুসলিম কবিও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন। ইনি কবি শাহবারিদ খান [সাবিরিদ খান]।

এমনিতেই ভারতের প্রাচীনসাহিত্য ও রূপকথায় চুরি-বিদ্যা ও চুরি-কৌশল সম্বন্ধে নানা কথা ছড়িয়ে রয়েছে। চুরি-বিদ্যা অন্যান্য বিদ্যার মতো অর্জন সাপেক্ষ শাস্ত্র বলে পরিগণিত হত। এ শাস্ত্রে দু'খানি গ্রন্থের নাম—সম্মুখ কল্প ও চোরচর্যা।[৩]

চুরির পূর্বে চোর কর্তৃক কালীপূজার কথা 'চৈতন্য ভাগবতে' আর ধর্মমঙ্গলেও উল্লিখিত আছে। চোরের মতো সুন্দরের বিদ্যা-বিহারে গমন সম্বলিত কাহিনী তাই বোধ হয় কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদ্যাসুন্দরের চৌদ্দজন কবির কাব্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে ঃ দ্বিজ শ্রীধর, শাহবারিদ খান, কঙ্ক, কৃষ্ণ, রাম, প্রাণরাম, বলরাম, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত, রামপ্রসাদ, কবীন্দ্র, মধুসুদন চক্রবর্তী, মদন দত্ত ও নিধিরাম প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই আঠারো শতকের কবি।

---

১. *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী ; (২য় ভাগ) ভূমিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।*

২. *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*

৩. *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৪৬২ পৃষ্ঠা।*

বিদ্যাসুন্দরের চারজন কবির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। এ চারজনের মধ্যে দ্বিজ শ্রীধর গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র (১৫৩২-৩৩) আদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেন। গোবিন্দদাস [মুনি অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত। এই কালে রচিত কালিকা-চণ্ডীর গীত।] ১৫১৭ শকে অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে কালিকামঙ্গল রচনা করেন। নিধিরাম আচার্য [শকাব্দ ষোড়শ শতক জলনিধি বসু সময়ে] ১৬৭৮ শকে অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। শাহবারিদ খানের সঠিক সময় পাওয়া যায় নি। অপর কবি কৃষ্ণরাম তাঁর 'কালিকামঙ্গল' সম্ভবত ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেন।

অরং সাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজ সর্বজনে বলে
নবাব শায়েস্তা খাঁ অধিকারী সাত গাঁ
বহু সরকার করতলে।
সারসাসনের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ শক বিচারিয়া সভে।।

এর থেকে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। আর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে রচনাকাল ১৫৮৬ শক বা ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজই বাঙলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতা। সাহিত্যবিশারদ শ্রীধরের দুটো খণ্ডিত পুথি পেয়েছিলেন, একটায় নয় পাতা ও অপরটায় একপাতা মাত্র ছিল। শা'বারিদ খানের পুঁথিতেও উভয় পৃষ্ঠায় লেখা আটটি মাত্র পাতা আছে। শা'বারিদ খানের অপর দুটো খণ্ডিত কাব্য 'রসুল বিজয়' আর 'হানিফার দিগ্বিজয়'তেও রচনার তারিখ নেই।[১]

২. দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ

দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ফিরোজ শাহ্‌র আদেশে তাঁর গ্রন্থখানি রচনা করেন। সুতরাং ফিরোজ শাহ্ আর কিছু না হোক, পিতামহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ ও পিতা নুসরত শাহ্‌র মতো কলারসিক এবং পিতৃ-পিতামহের মতো বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথি দু'খানি খণ্ডিত হওয়ায় শ্রীধরের কাব্যের কি নাম ছিল তা জানা যায় না, তবে কালিকার বরে রাজারাণীর পুত্রসন্তান লাভ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ শ্রেণীর অন্যান্য কাব্যের মতো এ কাব্যেরও নাম ছিল কালিকামঙ্গল।

এ কাব্যখানি গীতিনাট্যের আকারে রচিত। এতে অনেক ভাগ আছে। একজন পাত্র প্রবেশ করে তার পরিচয় ও বক্তব্য বলে যাচ্ছে—এ ধরনে লিখিত। কবি সংস্কৃত ভাষায় পাত্র-ও দৃশ্য পরিচিতি দিয়েছেন। একে একথায় 'নেপালে বাংলা নাটকের প্রথম নাটক কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকের অনুরূপ রচনা বলে অভিহিত করা চলে। শা'বারিদ খানের বিদ্যাসুন্দরও এরূপ রচনা এও আমাদের আলোচ্য 'বিদ্যাসুন্দর' পুথিদ্বয়ের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয়। কবি গ্রন্থ রচনার কারণ স্বরূপ বলেছেন ঃ

সাবধান নর লোক পায় যেন মতে।
দেশীভাষে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে।।

এখানে লক্ষণীয় যে, ষোলশতকের প্রথম ভাগেও আমাদের দেশীভাষা বাঙলা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হত।

শ্রীধর যখন ফিরোজ শাহর আদেশে কাব্য রচনায় ব্যাপৃত, তখনও ফিরোজ যুবরাজ মাত্র, যদিও মধ্যে মধ্যে তিনি ফিরোজকে 'রাজা' এবং 'সাহা' বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

১. *মৎসম্পাদিত শাবারিদ খানের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*

ক. শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ।।
খ. রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ।।

ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ) কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে যে, ফিরোজ শাহ্ পিতার রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালিকামঙ্গল রচনা শুরু করিয়েছিলেন। কবি শ্রীধর তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রতি বিগলিত চিত্ত ছিলেন, তাই আমাদের আলোচ্য আট পাতার খণ্ডিত পুথিতেও আমরা নয়টা ভণিতা পাচ্ছি। কবি ফিরোজ শাহ্র সভাকবি না হলে শুধু রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্যে কখনো সব ভণিতায় ফিরোজ শাহ্র নামোল্লেখ করতেন না। সম্ভবত 'কবিরাজ' ফিরোজ শাহ্ প্রদত্ত উপাধি।

যুবরাজ ফিরোজ তাঁর পিতা নুসরত শাহ্র মতো যুবরাজ থাকাকালে চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন কিনা তা কোন সূত্রে জানা যায়নি। কাজেই দ্বিজ শ্রীধরের পুথি চট্টগ্রামে পাওয়া গেলেও আমাদের অনুমান করতে হবে যে, শ্রীধর কবিরাজ গৌড়েই যুবরাজের সভাকবি ছিলেন। অন্য পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীধর সম্বন্ধে আর কিছু জানবার উপায় নেই। আমাদের বিশ্বাস, শা'বারিদ খান দ্বিজ শ্রীধরের সমকালীন ব্যক্তি। উভয়ের 'বিদ্যাসুন্দর'ই অনুবাদ কাব্য।

উভয়ের উপাখ্যানে ঐক্য এত বেশি যে দুটো কাব্য যে একই কাব্য অবলম্বনে রচিত তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়। কবিদ্বয় মূল কাব্যের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

উভয়ের কাব্য-কাহিনী নাট্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। শা'বারিদ খান একটি ভণিতায় স্পষ্টভাবে তাঁর রচনাকে গীতিনাট্য বলে উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

শা'বারিদ খানে ভণে বিজ্ঞ জন স্থানে
অশুদ্ধ দেখিলে পদ শুধিবা যতনে।।
এ নাট্যগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িবে মনোরঙ্গ।

এতে মনে হয়, আদিতে 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান গীতিনাট্যরূপে প্রচলিত ছিল। অথবা এ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কোন অজ্ঞাত সংস্কৃত নাটকই তাঁদের কাব্যের উৎস ছিল।

উভয় কাব্যের কুশীলব পরিচিতি, দৃশ্য-সংকেত ও বক্তব্যের মর্ম সংস্কৃতেই প্রদত্ত হয়েছে। প্রতি দৃশ্যের বা সর্গের শীর্ষে সংস্কৃত শ্লোকও রয়েছে। কিন্তু উভয় কাব্যের সংস্কৃতাংশে বিশেষ অনৈক্য নেই। এতে মনে হয়, সংস্কৃত শ্লোকগুলো কবিদ্বয়ের সুরচিত নয়। উভয়ের শ্লোকে পুরোপুরি মিলও নেই। মনে হয়, আদর্শ সংস্কৃত গ্রন্থের সর্গশীর্ষের শ্লোকগুলো তাঁরা ইচ্ছামত পরিবর্তন করেছেন। বাঙলা গ্রন্থে সর্গশীর্ষে বিষয় বা বক্তব্যের মর্মনিদের্শক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা একটি প্রাচীন রীতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আমরা অনুরূপভাবে শ্লোক উদ্ধৃতি দেখতে পাই। উনিশ শতকের বাঙালী সাহিত্যিকদের কেউ কেউ তা-ই করেছেন।

শ্রীধরের কাব্যে চৌর-কাহিনীর উল্লেখ আছে, শা'বারিদের কাব্যে নেই। শ্রীধরের ভাষা সরল, বর্ণনভঙ্গী ঋজু, বর্ণনা কিছু সংক্ষিপ্ত।

আর শা'বারিদের ভাষা শালীন, বিশেষ বৈদগ্ধ্যাশ্রিত এবং গতিশীল। বর্ণনভঙ্গী রসাল ও বর্ণনা কিছু দীর্ঘায়িত।

শ্রীধরের ভাষার প্রাচীনতা বা সংস্কৃতানুগত্য কম, পক্ষান্তরে শা'বারিদের ভাষা সংস্কৃতানুগ ও প্রাচীনতার পরিপোষক। উপমা ও অপরাপর অলঙ্কার প্রয়োগে শা'বারিদ খান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীধরের সে শক্তি বিরল।

শাবারিদ খান বিভিন্ন ছন্দ প্রয়োগেও কাব্যে রস-বৈচিত্র্য দান করেছেন। কিন্তু শ্রীধর কবিরাজের কাব্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য তেমন নেই। শা'বারিদ খান বৈদগ্ধ্যপ্রিয় কবি। শ্রীধরের কাব্যেও

কবিত্বের প্রভা দুলর্ক্ষ্য নয়। শ্রীধরের কাব্যের সর্গ-শীর্ষে রাগ-রাগিণীর নাম আছে। শা'বারিদের কাব্যে নেই।

শা'বারিদ খানের কাব্যও 'কালিকামঙ্গল'।

তবে, এ নাট্যগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িবে মনোরঙ্গ।।

মুসলমান কবি যে রোমান্স হিসেবেই এ কাহিনী রচনা করেছেন—কালিকার প্রসাদের কামনায় নয়, তা এ ভণিতা থেকেই স্পষ্ট। হিন্দু কবি হলে ধন, পুত্র বা মোক্ষ লাভের লোভ দেখাতেন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সেকালের সমাজ-সংস্কৃতির কিছু খবর মেলে। হিন্দু সমাজে সেবায়, দানে ও ব্রতপালনে লোকের উৎসাহ ছিল। সুন্দরকে চার বছর বয়েসে 'অজ্ঞানের জ্ঞান হেতু হাতেখড়ি দিল' আর পাঁচ বছর বয়েসে বিদ্যাকে 'গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল।' বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই বিদ্বানের জ্ঞানের পরীক্ষা হত। রাজ-রাজড়ার সমাজে 'স্বয়ম্বর' প্রথা চালু ছিল। মালিনীরা ছিল কুটনী। তারা ফুলের সঙ্গে প্রেমও করত ফেরী।

৩. শাহবারিদ খান ওর্ফে সাবিরিদ খান

আধুনিক কাগজে লিখিত শা'বারিদ খাঁর ভণিতায় চট্টগ্রামের কুলীন পরিবারের পরিচয়জ্ঞাপক একটি 'পদবন্ধ' পেয়েছিলেন সাহিত্যবিশারদ। তা এরূপ ঃ

আদ্য সৃষ্টি কহি জান শুন উপদেশ।
ভাটি মধ্যে বাইশ বাঙ্গালা চাটিগাঁ প্রধান দেশ।
হাওলা, দেয়াঙ্গি মৈষামূড়া কাঞ্চনা মহাম্মদপুর।
হাশিমপুর, বাজালিয়া এই আষ্ট শ্রী।
চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ী।
তীরাতীরি গোলাগুলি সব গেল উড়ি।
কাঞ্চনা প্রহরী রৈল জমসের চৌধুরী।।
আলি মুন্দার, হাদু মুন্দার, বড়াইয়া মুন্দার ভাই.।
ফরমানী মুন্দার পাইল জামিজুড়ি যাই।।
আলি মুন্দার হাদু মুন্দার বড়াইয়া মুন্দর ভং।
হাওলার নিমুন্দার করে নানা রং।
রাজা দিল খোঁআঝাগিরি উজির দিল বাজী।
তের ঘর খোঁআঝার মাঝে সাত ঘর কাজি।।
জগদীশ মনোহর তারা দুই ভাই।
বর্ধমানী ছেগা পাইল গরুর মাংস খাই।।
শঙ্খ নদীর দক্ষিণকূলে শঙ্খ নদীর মোড়।
সাধু খাঁ সাবেরিদ খাঁ তারা দুই ঘর।।
মহর্ত সকল জান রাজার সঙ্গে ছিল।
সেই সব সকলেরে খোঁআঝাগিরি দিল।
কহে হীন সাবেরিদ খাঁ এহার রহস্য।
বচনে না ধরে যারে সে নহে মনুষ্য।।

উদ্ধৃত ছড়ায় কবির সমকালীন দক্ষিণ চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর পরিচয় রয়েছে। উদ্ধৃতাংশের মর্ম এই ঃ এক সময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসামের কতকাংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এই

ভাটি ছিল বাইশ পরগনায় বিভক্ত। কর্ণফুলীর পূর্ব-দক্ষিণ তীর থেকে রামু পর্যন্ত অঞ্চলেব মধ্যে হাওলা (খরণদ্বীপ), দেয়াঙ্গী (বড় উঠান প্রভৃতি গ্রাম), মৈষামুড়া (শঙ্খ নদের তীরস্থ গ্রাম), কাঞ্চনা (সাতকানিয়া থানাব অন্তর্গত গ্রাম), মোহাম্মদপুর, হাশিমপুর (পটিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম) ও বাজালিয়া [সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম] এই আটটি সমৃদ্ধ গ্রাম বা চাকলা অবস্থিত।

পটিয়া থানা থেকে দু'মাইল দূরে চক্রশালা গ্রাম। বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে এই চক্রশালাতেই আরাকান রাজ্যের চট্টগ্রামস্থ অধিকারের রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাঞ্চনায় জমশের চৌধুরী সীমান্ত-রক্ষী সেনানী নিযুক্ত হলেন। জামিজুড়ি চাকলায় গিয়ে (জামিজুড়ি গ্রাম এখনও বিদ্যমান) আলি মুন্দার, হাদু মুন্দার ও বড়াইয়া মুন্দার—এই তিন ভাই মুন্দারী (মুহুন্দারী বা মজুমদারী) ফরমান লাভ করেন। এই মুন্দারত্রয়ের চেয়ে হাওলা চাকলার নিমুন্দার ঐশ্বর্যে ও বিলাসিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আরাকানরাজ কর্তৃক 'খোঁয়াঝা' খেতাবে বিভূষিত হন এবং আরাকানরাজমন্ত্রী তাঁকে ঘোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রামে সরকারী 'খোঁয়াঝা' খেতাবধারী তেরোটি সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী জমিদারবংশ ছিল এবং এদের মধ্যে সাতটি কাজীপরিবার ছিল।[১]

জগদীশ ও মনোহর ভ্রাতৃদ্বয় গোমাংস ভক্ষণ করে সমাজে পতিত হলে আরাকানরাজের কৃপায় 'বর্ধমানী ছেগা' (বড় মানী ছেগা-উচ্চ সম্মানজনক উপাধি) পেয়ে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

শঙ্খনদের বাঁকের দক্ষিণ তীরে সম্ভ্রান্ত সাধু খাঁ ও শা'বারিদ খাঁ পরিবার দুটোর বাস।

যাঁরা আরাকানরাজের পারিষদ ছিলেন, তাঁরা সবাই 'খোঁয়াঝা' উপাধি লাভ করেন। এ ইতিকথা যারা অবিশ্বাস করে, কবির মতে তারা 'মানুষ' নয়।

এ ছড়ায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রয়েছে। আলি মুন্দার, বড়াইয়া মুন্দার ও নিমুন্দার বংশীয়রা ও বংশখ্যাতি আজো বিদ্যমান। এঁদের অনেকের আভিজাত্য-গৌরবও আজো অম্লান। আরকানরাজ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের খোঁয়াঝা, পাঁঝা, সাদা, ছুয়ান, ঠাকুর, রোঁয়াঝা প্রভৃতি পদ বা উপাধি দান করতেন।

চক্রশালায় এক সময়ে আরাকানরাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নাম এই ছড়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

অতএব, এই ছড়ায় নিশ্চিতই মুঘল বিজয়েব পূর্বেকার দক্ষিণ চট্টগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত ঃ

চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ী।
তীরাতীরি গোলাগুলি সব গেল উড়ি।।

এই চরণদ্বয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপর আরাকানরাজের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জয়লাভের আভাস দান করছে। সম্ভবত এটি সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্র চট্টগ্রাম বিজয়কালীন ঘটনার স্মারক।

ইতিহাস সূত্রে জানা যায় ঃ ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্যের সহযোগিতায় গৌড়ের হোসেন শাহর পুত্র নুসরত খান উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন, এর পরে কোন সময়ে নুসরত শাহ দক্ষিণ চট্টগ্রামও স্বল্পকালের জন্যে অধিকার করেন। ১৫১৭ সনে আরাকানরাজ দক্ষিণ চট্টগ্রাম আবার মুক্ত করেন। এবং এ সময়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামে বর্তমান পটিয়া থানা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত চক্রশালায় আরাকানরাজ নতুন শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। এবং এটি ১৫৮৬ সনে আরাকানরাজের উত্তর চট্টগ্রাম পুনর্বিজয় অবধি শাসনকেন্দ্র থাকে।[২]

---

১. চট্টগ্রামের একটি সুপ্রচলিত ছড়ায় আছে ঃ

সাত ঘর কাজী তের ঘর ভূঁইয়া।
আর সব টেইয়া আর টুঁইয়া।।

এতে দেখা যায় 'সাত ঘর কাজী, তের ঘর খোঁয়াঝা বা ভূঁইয়ার অন্তর্গত নয়।

২. চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল)–মাহবুব-উল আলম।

চক্রশালা পূর্বেও শাসনকেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় 'মহেশ[১] রুদ্রের পৌত্র ভরত রুদ্র গৌড়ের হাবশী আমলে (১৪৮৭-৯০ খ্রীঃ) চক্রশালায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে আরাকানশক্তি কর্তৃক পরাজিত হয়ে সানুচর ও সপরিজনে বিতাড়িত হন।

এই চক্রশালা সাময়িকভাবে নুসরত কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে আরাকানরাজ কর্ণফুলীর তীর অবধি গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রাম সম্ভবত স্বাধিকারে প্রাপ্ত হন। উদ্ধৃত চরণদ্বয়ে এ যুদ্ধের অথবা ১৫২২ খ্রীস্টাব্দে দেবমাণিক্যের দক্ষিণ চট্টগ্রাম অভিযানের আভাস দান করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অতএব ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দের পরে এবং ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে এই ছড়া রচিত হয়েছিল বলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। কিন্তু এই ছড়াকার ও কবি শা'বারিদ খান অভিন্ন ব্যক্তি কি-না বলা যাবে না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শা'বারিদ খান যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা এরূপ ঃ

পিয়ার মল্লিক সূত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত,
উজিয়াল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জিঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুসা খান ॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্ক সুত।
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসব গুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত॥
তান সুত গুণাধিক নানুরাজ মহল্লিক
জগতে প্রচার যশ খ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥

এ থেকে বংশলতিকা এরূপ দাঁড়ায় ঃ পিয়ার মল্লিক—উজিয়াল-মুসা-খান-নানুরাজ-সাবিরিদ খান।

চট্টগ্রামে ফটিকছড়ি থানায় নানুপুর নামে এক গ্রাম আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী -মতে নানুরাজার নামানুসারেই গ্রামের নাম নানুপুর হয়েছে। এ নানুরাজা কে—তা কেউ বলতে পারে না। তবে, নানুপুরবাসী এক পরিবার নানুরাজার বংশধর বলে পরিচয় দেন। কবি শা'বারিদ খানকেও তাঁদেরই পূর্বপুরুষ বলে দাবি করেন।

কবি মুসলমানী কায়দায় উর্ধ্বতন চার পুরুষের নামোল্লেখ করেছেন।

উদ্ধৃতাংশ থেকে জানা যায়, কবি মল্লিক উপাধি ধারণ করেন না। ঠাকুর উপাধি দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, 'জিঠাকুর' আরাকান-রাজসরকারের অধীনেই ' সরকার' ছিলেন। 'ঠাকুর' উপাধি পেয়েছিলেন বলেই তাঁর নামের শেষে 'মল্লিক' লিখিত হয়নি। জিঠাকুর উপাধি মাত্র। তাঁর মুসলমানী নামটি বাহুল্যবোধে উল্লিখিত হয়নি।

আমাদের পূর্ব-উদ্ধৃত ছড়ায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের কথাই বর্ণিত হয়েছে। নানুপুর উত্তর চট্টগ্রামে অবস্থিত। জিঠাকুর আরাকান রাজকর্মচারী ছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাঁর পুত্র ও কবির পিতা নানুরাজার নামেই গ্রামের নাম নানুপুর রাখা হয়েছিল বলেই যদি মেনে নিই, তবে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান ও ত্রিপুরারাজ কর্তৃক যৌথভাবে উত্তর চট্টগ্রাম বিজিত হলে আরাকানরাজের পদস্থ কর্মচারী 'সরকার' জিঠাকুরের ভাইয়ের পৌত্র শা'বারিদ খান

---

১. *ক. পবাগলী মহাভাবত-জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সংগৃহীত পুথি ও তৎরচিত শ্রীবাৎস্যচরিতম্। খ. চট্টগ্রামেব ইতিহাস (পুরানা আমল) মাহবুব-উল-আলম। গ. মাসিক গৃহস্থ চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ঘ. বিস্তৃত বিববণের জন্যে দৌলত উজীব বাহরাম খানের লায়লী-মজনু কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*

আরাকানীদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলে পালিয়ে যান এবং আরাকান অধিকারে সগৌরবে বাস করতে থাকেন। ছড়ায়ও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল কথা আছে। যেমন ঃ

শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কূলে, শঙ্খ নদীর মোড়।
মহর্ত সকল জান রাজার সঙ্গে ছিল।
সেই সব সকলেরে খোঁয়াঝাগিরি দিল।

'মহর্ত সকল জান রাজার সঙ্গে ছিল'—এই পংক্তিটি বিশেষ অর্থগর্ভ। এতে রাজার দুঃসময়ের মহন্তগণ রাজার সহায়ও সঙ্গী ছিলেন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ রাজা তাঁদের খোঁয়াঝা পদ বা উপাধি দান করেন। সম্ভবত ছড়াউক্ত শা'বারিদ খানই আমাদের কবি এবং তিনিই শঙ্খনদের বাঁকে বাড়ী তৈরি করে বসবাস করেন।

আর একটি ভণিতার দ্বারা (আমাদের অনুমিত পাঠ বিশুদ্ধ হলে)এ অনুমান যথার্থ বলে ধারণা হবে। যথা ঃ

সাবারিদ খানে ভণে মধুর পয়ার ।
শুনিয়া রসঙ্গ [রসজ্ঞ?] জন হরিষ অপার ॥

শেষ চরণের বিশুদ্ধ পাঠ যদি ঃ

'শুনিয়া রোসাঙ্গ জন হরিষ অপার' হয়, তবে কবি যে আরাকান রাজ্যান্তর্গত শঙ্খ নদের বাঁকে ঘর করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

পূর্বেই বলেছি কবির পিতামহের ভাই জিঠাকুর আরাকান রাজকর্মচারী ছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। অতএব ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তিনি ও তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র নানু বর্তমান ছিলেন বলে ধরে নিতে হয়। নানুরাজার নামে যখন গ্রামের নাম হয়েছে, তখন ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন বলে মানতে হবে। সম্ভবত ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং ১৫১২-১৭ খ্রীস্টাব্দের সংগ্রামকালে শা'বারিদ খান প্রৌঢ় বয়সের ছিলেন বলে মেনে নিতে বাধা নেই। কারণ, নানুপুরে তাঁর নামের একটি দীঘি আজো বিদ্যমান। এতে এ-ও মনে হয়, শা'বারিদ খান ১৫১২-১৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে অন্তত একখানা কাব্য রচনা করেছিলেন। যে কোন দিক দিয়ে বিচার করা হোক না কেন, ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই যে শা'বারিদ খান বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা একরূপ নিঃসংশয়।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ কর্তৃক উত্তর চট্টগ্রাম বিজিত হওয়ার পরেই সম্ভবত শা'বারিদ খানের বংশধরগণ পিতৃভূমি নানুপুরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

কবি শা'বারিদ কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর ছিল অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রীতি, অপ্রচলিত, দুর্লভ ও বিরল প্রযুক্ত শব্দের প্রতি তাঁর মোহ ছিল প্রায় অপ্রতিরোধ্য। বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে এ বিষয়ে তাঁর সমমর্মিতা লক্ষ্য করি পদকার গোবিন্দ দাসে ও উনিশ শতকের মধুসূদনে। সুন্দর করে বলার এক নাম যদি সাহিত্য হয়, তা হলে মানতে হবে ধ্বনিসৌন্দর্যই কাব্যের প্রধান উপকরণ, আর ধ্বনি-মাধুর্য সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন ধ্বনি-চেতনা, তথা সূচিত শব্দের সুবিন্যাস। এ ক্ষেত্রে তাঁর চেতনা ভারতচন্দ্রের মতো সামগ্রিক ছিল না। ভারতচন্দ্রে Diction ছিল নিঁখুত। একটা সামগ্রিক আঙ্গিক Symmetry, সুরের Harmony এবং অঙ্গ ও আত্মার একটা Symphony রয়েছে তাঁর রচনায়। ছন্দে-সুরে-রসে-রূপে ও তাৎপর্যে একটি পূর্ণাবয়ব মায়ামূর্তি পাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে। কিন্তু শা'বারিদ খানে পাই খণ্ড চেতনার সাক্ষ্য, দুর্লভ শব্দপ্রীতিতেই তাঁর প্রয়াস সীমিত। এ ব্যাপারে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য থাকলেও মধুসূদনের মতো আঙ্গিক শিল্পচেতনা তাঁতে অনুপস্থিত। তবু ষোল শতকের এক বাঙালী কবির যুগ- দুর্লভ এ শব্দচেতনা ও অনন্য সৌন্দর্যে কাব্যিক কথা নির্মিতির এই সযত্ন প্রয়াস, আটপৌরে ভাষাকে নতুন অবয়ব দানের এই আগ্রহ, বিরল শব্দের বহুল প্রয়োগে কাব্যের লাবণ্য বৃদ্ধির এই উৎসাহ আমাদের বিস্মিত করে। শা'বারিদ খান রূপ-সাধক শিল্পী। কাব্যের আঙ্গিক পরিচর্যায় তাঁর প্রযত্ন, কাব্যদেহ নির্মাণে তাঁর বিরল উপকরণ-প্রীতি এবং অঙ্গসজ্জার ও রূপচর্চার প্রবণতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। আমাদের কাছে গণনীয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবার পক্ষে তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যই যথেষ্ট। আমাদের সাহিত্যের পাঁচালী কাব্যধারায় তিনিই প্রথম রূপসচেতন কবি-শিল্পী।

বাঙলা পাঁচালী কাব্যের শৈল্পিক ক্রম-উৎকর্ষ-ধারায় শা'বারিদ খানের দানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কেননা তিনিই প্রথম কাব্যের ভাষাকে লৌকিক ও গ্রামীণ প্রভাবমুক্ত করে শালীন ও শহুরে সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করতে প্রয়াসী হন। সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগে রচনাকে বৈদগ্ধ্যাশ্রিত করার প্রয়াস তাঁর রচনাতেই প্রথম প্রত্যক্ষ করি। ষোল শতকের দৌলত উজিরে, সতেরো শতকের কাজী দৌলতে ও আলাউলে এবং আঠারো শতকের ঘনরামে ও ভারতচন্দ্রে কাব্যকলার উল্লেখ্য উৎকর্ষ ও বিকাশ সুলক্ষ্য হলেও পথিকৃতের গৌরব শা'বারিদ খানের। এঁর মতো সযত্ন বাগ্বৈদগ্ধ্য-প্রীতি ছিল আরো দুজনের—একজন মধ্যযুগের পদকর্তা গোবিন্দ দাস, অপরজন উনিশ শতকের মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এঁদের অনুসৃত রীতিকে ক্লাসিকরীতি বলতে হয়তো আপত্তি উঠবে না।

শাহ বারিদ খানের 'রসুলবিজয়' ও 'হানিফার দিগ্বিজয়' কাব্য দুটো 'জঙ্গনামা' অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৪. লায়লী-মজনু উপাখ্যান

দৌলত উজির বাহরাম খান

কবির আত্ম-পরিচয় ঃ কবি কিছু আত্মকথা বলেছেন তাঁর কাব্যের উপক্রমে। তাতে রয়েছে তাঁর পীর, পূর্বপুরুষ ও তাঁর নিজের কথা।

হামদ ও না'তের পরে পাই পীরের পরিচয়। পীর সদর জাহাঁর পুত্র পীর শাহ জুনদ, তাঁর পুত্র পীর মুহম্মদ সৈয়দ। আর এঁরই পুত্র শাহ আসাউদ্দিন (আসহাবউদ্দীন) ছিলেন কবির পীর। কবির ভাষায় পীরের গুণপনা এরূপ ঃ

সিদ্দিক সমান জ্ঞান হাতিম সমান দান
আসাউদ্দিন দয়াময়

এবং তাঁর নিবাসও ছিল ফতেয়াবাদে ঃ

বঙ্গদেশ মনোহর তার মধ্যে শোভাকর
নগর ফতেয়াবাদ নাম
আসাউদ্দিন পীর নির্মল শরীর ধীর
তথাত বসতি অনুপাম।

পীর-পরিচিতি এখানেই শেষ।

এর পরেই পাই কবির বংশ ও জন্মভূমি চট্টগ্রামের পরিচয়। কবির দেয়া বর্ণনা এরূপ ঃ

পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হুসেন শাহাবর
তান রত্ন-সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েতে শোভিত মনোহর।
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহার গুণের অন্ত নাই।
অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।—
আর, বাতুল আতুর যথ পালিলেন্ত অবিরত
দান ধর্ম করিলা বিশেষ।

তাঁর দানের খ্যাতি শুনে এবং জনপ্রিয়তা দেখে নৃপতির ঈর্ষা হল। তিনি হামিদের ঃ

শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হৈল নৃপমণি
ডাকাইয়া আনিলেন্ত তাএ।

এবং কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার
তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।

সব পরীক্ষাই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক। উজিব হামিদ খান যখন সব কয়টি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ তাঁর ঃ

দেখিয়া ধর্মের সাজ ভালবাসি মহারাজ
তাঁকে প্রসাদ করিলা দুই সিক।

এভাবে উজির হামিদ খান চট্রগ্রামে জায়গীর-স্বরূপ দুটো সিক (পরগনা) লাভ করে সেখানে চলে গেলেন। স্বদেশের মায়া-মুগ্ধ কবি চট্রগ্রামের এক মনোরম চিত্র তুলে ধবেছেন এ প্রসঙ্গে

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুর এ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ
মনোভাব মনোরম অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
তাতে শাহা বদর আলাম।
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রামে।

সেখানে হামিদ খান ঃ

আদ্য রূপে দান ধর্ম করিরা পুণ্যের কর্ম
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম।

এবং, তারপর,

অনুক্রমে বংশ কথ গঞিলেন্ত এই মত
গৌড়ের অধীন (অদিন) হৈল দূর
চাটিগ্রামে অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহা সুর।
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর ॥
রজনী সময় হৈলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর।

এই নৃপতি নিযামশাহ্র দরবারেই কবির পিতা মুবারক খান ও কবি বাহরাম 'দৌলত উজির' ছিলেন। কবি তাঁর আত্মপরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান
তাহান বংশেত উৎপত্তি।
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
সদাএ ধর্মেত তান মতি।
তান প্রতি মহীপাল খেতাব অধিক ভাল
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজির
সাধু সৎলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিত রঙ্গে
ধর্মরূপে তেজিল শরীর।
তান পুত্র ক্ষুদ্র -সম নাম মোর বহরম
মহারাজ গৌরব অন্তরে।

পিতাহীন শিশু জানি দয়া ধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে।

'চৌতিশা'য় কবি আর একবার নিযামের নাম করেছেন ঃ

খ্যাত বিখ্যাত অতি ক্ষমাকর মুখজ্যোতি
ক্ষিতিত নেজাম শাহা বীর।

অন্যত্র 'শ্মশান বৈরাগ্য' সর্গে কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

এবে মোর বৃদ্ধকাল হৈল উপস্থিত
যুক্তি সুদ্ধি পরাক্রম সকল খণ্ডিত।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে, কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে) প্রধান সচিব ছিলেন। হোসেন শাহ হামিদ খানকে চট্রগ্রাম অঞ্চলে দুই 'সিক' বা পরগনা জায়গীর দিয়ে চট্রগ্রামের 'অধিকারী' তথা প্রশাসক নিযুক্ত করলে হামিদ খান চট্রগ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। তারপর গৌড়ে কয়েক বংশীয় রাজার শাসনের অবসানে চট্টগ্রাম হল গৌড়ের অধীনতামুক্ত এবং নিযাম শাহ হলেন চট্টগ্রামের নৃপতি। অবশ্য 'ধবল অরুণ গজেশ্বর' আরাকানরাজ রইলেন 'সভানের অধিকারী।' অর্থাৎ চট্টগ্রাম তখন আরাকান অধিকারে এবং নিযাম চট্টগ্রামে আরাকানরাজের নিযুক্ত বা স্বীকৃত শাসনকর্তা। চট্টগ্রামের পূর্বতন শাসক হামিদ খানের বংশধর মুবারক খানকে নিযাম করলেন তাঁর দৌলত উজির আর মুবারকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহরাম খান পেলেন সে-পদ। নিযামের আমলে নগর ফতেয়াবাদ ছিল রাজধানী। রাজধানীর নামানুসারে গোটা চট্টগ্রামও হত ফতেয়াবাদ নামে অভিহিত। 'লায়লী-মজনু' রচনাকালে দৌলত উজির বার্ধক্য সীমায় উপনীত। গ্রন্থসূত্রে এর অধিক কিছু মেলে না। দৌলত উজিরের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. ফতেয়াবাদের ঐতিহ্য পাই হোসেন শাহর পুত্র নুসরত শাহ নির্মিত ইমারত ও দীঘি প্রভৃতির শ্রুতিস্মৃতিতে আর কোটের বাড়ির (ফতোয়াবাদে ও জাঁহাপুরে কাঠিরহাট 'কোটেরহাট'-এর বিকৃত রূপ) ধ্বংসাবশেষে ও কবি বাহরামের উক্তিতে। হোসেন শাহর চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলেই যে ফতেয়াবাদ নামের উদ্ভব হামিদুল্লাহ খানের[১] এই ধারণায় হয়তো ভুল নেই।

পরাগলপুর, কাঠগড়, জাফরাবাদ ও মাহমুদাবাদের খবর মেলে পরাগলী মহাভারতে, বাহারিস্তান গয়বীতে, কবি দৌলত উজীরের কারবালা সম্বন্ধীয় জঙ্গনামায় ও জনশ্রুতিতে।

খ. শঙ্খনদের দক্ষিণ তীর অবধি অঞ্চল সাধারণভাবে ১৭৫৬ সন পর্যন্ত আরাকান শাসনে ছিল। এ জন্যে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আজো রোসাঙ্গী বা রোঁসাই (রোয়াই) নামে পরিচিত।

শঙ্খের ও কর্ণফুলীর মধ্যে স্থিত অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল চক্রশালা। কর্ণফুলীর মোহনার অদূরে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণফুলীর অপব তীরে ছিল দেয়াঙ বা দেবগ্রাম। এখানে ছিল পর্তুগীজদের ঘাঁটি, গির্জা ও বাণিজ্যবন্দর।

গ. আরাকানরাজেরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব মুসলিম উজীর বা শাসকের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন—এমন ধারণা অযৌক্তিক। মাহবুব-উল-আলমের মতে 'বসউপিউর আমল (১৪৫৯-৮২) থেকেই রাজার চট্টগ্রামস্থ অধিকার 'রক্ষার জন্য রাজার কোন ভ্রাতা বা বিশ্বস্ত আত্মীয় নিযুক্ত হইতে থাকে।' কাজেই মেঙ রাজাগীর (সলীমশাহ ১৫৯৩-১৬১২) আমলের আগেই এ-প্রথা চালু ছিল। তবে মুসলিম উজীরই সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতেন।

আলোচ্য সময়ে আমরা চট্টগ্রাম শহরকেন্দ্রে প্রশাসক রূপে পাই রাস্তি খানের অপর পুত্র মিনা খানের পৌত্র হামযা খান মসনদ-ই-আলাকে (মৃত্যু ১৫৫৫), তাঁর পুত্র নুসরত খানকে (মৃত্যু ১৫৬৭), তাঁর সন্তান জালাল খানকে (মৃত্যু ১৫৮৬) ও তাঁর পুত্র ইব্রাহিম খানকে (আরম্ভ ১৫৮৬)।

১. *আহাদীসুল খাওয়াননী*—J. Long. JASB, 1872.

এঁরা গৌড়, আরাকান ও ত্রিপুরা রাজের অধীনে (চট্টগ্রাম যখন যাঁর অধিকারে থাকত) উজীর ছিলেন।

ঘ. নিযামপুর পরগণা ১৬১৬ সনে মুঘল সেনাপতি কাসিম খানের চট্টগ্রাম অভিযানেব পূর্বেও ছিল, তা' বাহারিস্তান গয়বী থেকে নিঃসংশয়ে জানা যায়। কাসিম খানের আরাকান রাজ্য আক্রমণ প্রসঙ্গে 'বাহারিস্তান গয়বী'তে নিযামপুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ The imperial army (Mughal) halted at the village Nizampur which was a possession of the Mags. The Mags being besieged, its Zamindar accepted the vassalage and came to see 'Abdun Nabi and the aforesaid village was occupied by the imperial army...... Inspite of the fact that the Zamindar of Nizampur had transferred his allegiance from the Mags to the imperialist, that place went out of possession..... the village of Nizampur yielding revenue of six hundred rupees (per annum) has also been given up and left in a state of confusion'.[১] এই নিযামপুর এবং এই সূত্রে বর্ণিত কাঠগড় আজও বর্তমান।' নিযামপুর একটি পরগণা—মীরেরসরাই থানার পুরো আর সীতাকুণ্ড থানার অধিকাংশ এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত এবং কাঠগড় বাড়বকুণ্ড রেল স্টেশনের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ষোল শতকে কোনো এক ধনী ও মানী নিযাম চট্টগ্রামে ছিলেন, যাঁর নামে ছয়শ' রাজস্বের একটি পরগণা সৃষ্টি হয়েছিল। ইনি যদি শেরশাহের ভাই কিংবা শুরংবশীয় নাও হন, তবু একজন সামন্ত যে ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ উদ্ধৃতাংশে সতেরো শতকের গোড়ার দিকেও পরগণার একজন জমিদার বা সামন্ত পাওয়া যাচ্ছে। বাহরাম যদি আলোচ্য নিযামের দৌলত উজীর হন, তা হলে আমাদের নিরূপিত কবির আবির্ভাবকালের সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটে না।

ঙ. আমরা দৌলতউজীর বাহরাম খানের অপর গ্রন্থ থেকে নিশ্চিতরূপে জেনেছি, নৃপতি নিযামের নিবাস ছিল জাফরাবাদে। প্রদেশপাল শ্রেণীর শাসকের নিবাস হয় শহরেই, গাঁয়ে থাকেন সামন্ত জমিদার। জাফরাবাদ গাঁ নিযামপুর পরগণার কেন্দ্রস্থলেই স্থিত। এটি মীরেরসরাই থানার বারইয়ারঢালা রেলস্টেশনের অদূরে আজো বিদ্যমান। আমাদের ধারণায় এই নিযাম পরাগল-ছুটি খানের পরে ফেনী নদী ও চন্দ্রনাথ পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলের সামন্ত শাসক ছিলেন। তাঁর দিওয়ানের (দৌলত উজীরের) তোয়াজের ভাষায় তিনি 'নৃপতি' হয়েছেন। নিযাম শাহর সময়ে উত্তর চট্টগ্রামে সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রশাসক ছিলেন হামযা খান মসনদ-ই-আলা। সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলে নিযামের নিয়োগ আর আরাকানরাজ দিখার আমলে (১৫৫৩-৫৫ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু ঘটে। চট্টগ্রামের প্রধান মুসলিম শাসকের পদবী ছিল 'উজীর'।

চ. কবি জানিয়েছেন, গৌড়ের অধীনতা দূর হবার পরে নিযাম শাহ নৃপতি হয়েছিলেন এবং তাঁর দৌলত উজীর (দিওয়ান) থাকাকালে তিনি 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছেন। আমরা জানি ঃ

১. ১৩৪৯-৫০ থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম সাধারণভাবে গৌড় শাসনে ছিল, আবার ১৪৭৪ সনেও চট্টগ্রামে গৌড়ের আধিপত্য দেখি।

২. ১৪৭৪ সনের পরে কোনো সময় থেকে ১৫১২ সন অবধি চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারে ছিল।

৩. ১৫১২ থেকে ১৫২৫ সন অবধি চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ চলে।

৪. ১৫২৫ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি চট্টগ্রামে গৌড়-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত দেখি।

৫. ১৫৩৮ থেকে ১৫৫৩ সন অবধি হামযা খান মসনদ-ই-আলার স্বায়ত্তশাসনে বা প্রতিনিধিত্বে আরাকানরাজের প্রভাব কিংবা আধিপত্য প্রত্যক্ষ করি।

---

১. *এ তথ্য আমার দৃষ্টিগোচর করেছিলেন শেখ এ. টি. এম, রহুল আমিন।*

M. I. Borah, Vol. pp 407, 409, Vol II, p 842

৬. ১৫৫৩-৫৫ সনে ছিল গৌড়-সুলতান শামসুদ্দীন শাহ্ গাজীর অধিকার। ১৫৫৫-৬৭ সনে ছিল ত্রিপুরারাজ বিজয়মাণিক্যের আধিপত্য। ১৫৬৭ সনে সম্ভবত সুলেমান কররানী চট্টগ্রামে সাময়িক অধিকার লাভ করেন। তারপর ১৫৬৭-৭৩ অবধি আবার ত্রিপুরা শাসনে থাকে। ১৫৭৩-৭৫ সনে থাকে দাউদ খান কররানীর দখলে।

৭. ১৫৭৫ থেকে ১৫৮৫ সন অবধি চট্টগ্রামে ত্রিপুরারাজের আধিপত্য ছিল, যদিও তা' নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন ছিল না। কেননা, আরাকানরাজও চট্টগ্রামে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে ঘন ঘন হামলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৮. ১৪৮৬ থেকে ১৬৬৬ সন অবধি চট্টগ্রামে আরাকান শাসন সুদৃঢ় ছিল। অতএব, আমাদের ধারণায় নিযামশাহ একজন সামন্ত-জমিদার। তাঁর নিবাস ছিল জাফরাবাদ। তাঁর জায়গীর নিজামপুর নামে আখ্যাত। তিনি হয়তো শুর বংশীয় আফগান ছিলেন অথবা বীর অর্থেই তাঁর নামের সঙ্গে 'শূর' শব্দ যুক্ত হয়েছে। তিনি ছিলেন আরাকানরাজের নিযুক্ত বা স্বীকৃত আঞ্চলিক প্রশাসক। হামযা খান মসনদ-ই-আলা যখন উত্তব চট্টগ্রামের উজীর বা শাসন কর্তা (আনুঃ ১৫৩০-৫৫ খ্রীঃ মৃত্যু) তখন নিযাম শাহ্ ছিলেন উক্ত অঞ্চলের সামন্ত-শাসক। তাঁরই দিওয়ান বাহরাম খান তোয়াজের ভাষায় তাঁকে বানিয়েছেন নৃপতি আর নিজে হয়েছেন দৌলত-উজীর। এমনি ব্যাপার আমাদের সাহিত্যে নতুন নয়। ১৫৩৮ সনে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর পতনের সুযোগে হামযা সম্ভবত স্বাধীনভাবে কিছুকাল উত্তর চট্টগ্রাম শাসন করে পরে আরাকানের আধিপত্য স্বীকার করেন। তাই আমরা অনুমান করি, ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ সনের মধ্যে 'লায়লী-মজনু' কাব্য রচিত হয়। এটি বাহরাম খানের দ্বিতীয় গ্রন্থ। কারবালা কাহিনীই তাঁর প্রথম রচনা ; সে সময়ে তিনি পীরের মুরীদ হন নি, তাই পীর আসাউদ্দীনের নাম পাইনে ভণিতায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পীর আসাউদ্দীনের পূর্ব-পুরুষ সদরজাঁহা ও কবি মুহম্মদ খানের মাতামহ সদরজাহাঁ দুই ভিন্ন ব্যক্তি। 'লায়লী-মজনু' রচনাকালে কবি বার্ধক্য সীমায় উপনীত তথা প্রৌঢ়।[১]

লায়লী-মজনুর প্রণয় কাহিনী

লায়লী-মজনুর প্রণয়কথা একটি কল্পিত উপাখ্যান। এই অপরূপ উপাখ্যানটি কার মানস-সন্ততি তা' জানার উপায় মেলেনি আজো। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস এ উপাখ্যান সম্বন্ধে নীরব। লায়লী-মজনু সম্পর্কে কোন কিংবদন্তীও চালু নেই আরবে। অতএব অনুমান করি, এ-কাহিনী আরব উদ্ভূত নয়, যদিও ঘটনাস্থান আরব এবং পাত্র-পাত্রীও আববীয়। অথচ এমন একটি বানানো উপাখ্যানকেও ঐতিহাসিকতা দানের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। কবি আবদুর রহমান জামীর কাব্যে লায়লী উম্মাইয়া বংশীয় খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) পদস্থ কর্মচারীর কন্যা। আমীর খসরুর কাব্যের সাক্ষ্যে লায়লী-মজনু ছিল মারওয়ান ইবন হাকামের (৬৮৩-৮৪ খ্রীঃ) সমসমায়িক। এমন কি এই কাব্যে লায়লী-মজনুর বংশ-পরিচয়ও রয়েছে। আমীর খসরুর বর্ণনায় লায়লী ছিল বনি আমর গোত্রীয় কন্যা। তার পিতার নাম মেহেদী, পিতামহ সাদ এবং প্রপিতামহ মেহদী। মজনু ছিল আদির প্রপৌত্র, মোফাহামের পৌত্র এবং মলুহ্‌র পুত্র।

ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ-এ তিনটি প্রণয়কাহিনী বিশ্ব মুসলিমের ঘরোয়া সম্পদ। এ তাদের কিতাব পড়ে পাওয়া বিদ্যা নয়, পুরুষানুক্রমে ধরে রাখা রিক্‌থ–ঐতিহ্যের সম্পদ। রূপকথার মতো এসব কিস্‌সা-কাহিনী শ্রেণী ও বয়স অবিশেষে সব নারী-পুরুষের মুখে মুখে আজো উচ্চারিত। লায়লী-মজনু ও শিরি-ফবহাদ-খসরুর প্রণয়কথা ইরানে উদ্ভূত এবং সুফী কবিদের লালনে পুষ্ট। প্রেমোন্মত্ত অর্থে বাঙলায় 'মজনু' শব্দের বহুল ব্যবহারও এই লায়লী-মজনু কিস্‌সা শোনার ফল।

বাইবেলে আর কোরানেও পাই ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী। কাজেই এটি শামীয় গোত্রের খুব পুরোনো ইতিকথা। ইউসুফের সংযম-সুন্দর চরিত্রমাহাত্ম্য এবং জোলেখার সুগভীর প্রেম ও

১. তথ্যসমূহ মৎসসম্পাদিত 'লায়লী-মজনু'র ভূমিকা থেকেই উদ্ধৃত

কৃচ্ছ্রসাধনাই বর্ণিত বিষয়। এ কাহিনীতে অধ্যাত্মতত্ত্বের তথা মরমীয়া রসের কোন ইঙ্গিত নেই। এক হিসেবে এটি নিছক মানবীয় প্রণয়কথা। সেজন্যেই এ ইতিকথা অবলম্বনে কয়েকখানি কাব্যই রচিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বাঙলায়। এমন কি শাহ মুহম্মদ সগীর বিবচিত ইউসুফ-জোলেখা (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) আমাদের প্রাচীনতম কাব্যের একটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফারসি-হিন্দুস্থানী প্রণয়কাব্য মাত্রই অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক। কিন্তু বাঙলা অনুবাদে সবকয়টিই মানবিক প্রেমকাব্যে রূপায়িত। এ বাঙালীর পার্থিব জীবনরসিকতার এক সাক্ষ্য। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের পূর্বে দৌলতউজীর বাহরাম খান ছাড়া আর কেউ লায়লী-মজনু উপাখ্যান রচনা করেছেন বলে জানা যায় নি। শিঁরি-ফরহাদের প্রণয় কাব্যও বোধ হয় রচিত হয়নি তখন। এ ব্যতিক্রম সম্ভবত অহেতুক নয়। লায়লী-মজনু ও শিঁরি-ফরহাদ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মতো অধ্যাত্মপ্রেমের রূপকাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান। কাহিনী-দুটো বোধ করি সুফীদেরই সৃষ্ট। ইরানই সূফীমতের বিকাশ ও প্রসার ক্ষেত্র। তাই কিস্‌সা দুটো উদ্ভূত হয় ইরানি ভাষাতেই। সৃষ্টি আশক ও স্রষ্টা মাশুকের পবিত্র ইশকের ভাষ্যস্বরূপ এ উপাখ্যান দুটোকে মুসলমানরা ধর্মসম্পৃক্ত পরম পবিত্র সত্য ঘটনা রূপেই জানে ও মানে। পাছে নিছক লৌকিক প্রেমকাব্য রূপে গৃহীত হয়ে বাঙলায় এদের গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয় এ ভয়েই বোধ করি বাঙলা ভাষায় এসব উপাখ্যান রচনের, পঠনের ও শ্রবণের দুঃসাহস হয়নি কারো। ফলে এমন ঘরোয়া কিস্‌সাও বাঙলা কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারেনি। মধ্যযুগের দৌলত উজীরই কেবল লায়লী-মজনুর লৌকিক প্রণয়-কাব্য রচনা করে অর্জন করেছেন দুঃসাহসিকতার গৌরব।

আজ অবধি বাঙলায় রচিত যে-কয়খানি লায়লী-মজনু উপাখ্যানের নাম জানি সেগুলোর ও রচয়িতাদের নাম দিচ্ছি ঃ

বাঙলা

১.	লায়লী-মজনু ঃ	দৌলত উজির বাহবাম খান (১৫৩৫-৫৩ খ্রীঃ)
২.	ঐ	মুহম্মদ খাতের (দোভাষী পুথি ১৮৬৪ খ্রীঃ)
৩.	ঐ	আবুজদ জহিরুল হক (ঐ-১৯৩০ খ্রীঃ)
৪.	ঐ	ওয়াজেদ আলী (ঐ-১৯৪৪ ?)

গদ্যে ঃ

১.	লায়লী-মজনু ঃ	মহেশ চন্দ্র মিত্র (১৮৫৩ খ্রীঃ)
২.	ঐ	শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৯০৩)
৩.	ঐ	আবদুব গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ।
৪.	ঐ	শাহাদাৎ হোসেন।
৫.	ঐ	মীর্জা সোলতান আহমদ।
৬.	ঐ	দ্বারকানাথ রায় (১৮৫৯)
৭.	ঐ	(নাটক) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৯১)

ফারসি

ফারসিতে লাযলী-মজনু কাব্যের আদি রচয়িতা কে তাও আমাদের জানা নেই। তবে দশ শতকের ইরানি কবি রুদকীর (রুদগীর) কবিতাতেই সম্ভবত প্রথম উল্লেখ পাই। এ ছাড়া বিভিন্ন সূত্রে যাঁদের সন্ধান মেলে, তাদের কালানুক্রমিক নাম দেওয়া হল ঃ

১. নিযামী গঞ্জাবী (গিয়াসউদ্দিন আবু মুহম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ) ৫৮৪ হিঃ বা ১১৮৮ খ্রীস্টাব্দ।

২. আমীর খসরু (দিল্লী) ৬৯৮ হিঃ বা ১২৯৮ খ্রীঃ।

৩. আবদুর রহমান জামী (ইরান) ৮৮৯ হিঃ বা ১৪৮৪ খ্রীঃ।

৪. আবদুল্লাহ হাতিভী (ইরান) ৯১৭ হিঃ বা ১৫১১ খ্রীঃ।

৫. হিলালী আস্ত্রাবাদী (আস্ত্রাবাদ) ৯৩৯ হিঃ বা ১৫৩৩ খ্রীঃ।

৬. দামিরী (ইরান, শাহ-তামাস্পের সভাকবি) ৯৩০-৮৪ হিঃ ১৫২৪-৭৬ খ্রীঃ।

৭. মীর্জা মুহম্মদ কাসেম কাসেমী গুণাবাদী (খোরাসান) ৯৭৯ হিঃ বা ১৫৭২ খ্রীঃ।

৮. মীর মুহম্মদ আমীর শাহ বোস্তানী ওরফে মীরজুমলা (ইরান, ভারতে শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সেনানী) ১১০১ হিঃ বা ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ।

৯. জনৈক হিন্দু কবি (শাহজাহানের আমলে) ১০৫৫ হিঃ বা ১৬৪৫ খ্রীঃ।

১০. আরিফ লাহোরী (আওরঙ্গজেবের নামে উৎসর্গিত গ্রন্থনাম মিহির-ই-ওয়াফৎ) ১৬৬০-১৭০৭ খ্রীঃ। এটি মুহম্মদ হবিবর রহমান খান শেরওয়ানীর সম্পাদনায় ১৩৪৫ হিঃ সনে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে আলীগড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দুস্থানী

১. হায়দর বখশ

২. মুহম্মদ তকীখান ঃ (১৮৬২ খ্রীঃ)

৩. ওলী মুহম্মদ মনজীর ঃ ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে মুদ্রিত।

৪. আবদুল্লাহ ইবন গোলাম ঃ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে মুদ্রিত। সম্ভবত নিযামীর, খসরুর কিংবা আবদুর রহমান জামীর কাব্যকাহিনী ভিত্তি করে কবি দৌলত উজীর বাহরাম খান স্বাধীনভাবে তাঁর কাব্যখানা রচনা করেন। এ জন্যে উক্ত তিনটে কাব্যের কোনটার সঙ্গেই তাঁর কাব্যকথার পুরোপুরি মিল নেই।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে 'লায়লী-মজনু' কাব্য নানাগুণে অনন্য। এ কাব্য বাল্যপ্রেমে অভিশপ্ত দুই বিরহী হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনার জমাট অশ্রু। এর গীতোচ্ছ্বাস, এর কারুণ্য, এর নীতিনিষ্ঠ মানবিকতা অভিভূত করে পাঠককে।

অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ, বিরহে তার বিকাশ, কিন্তু মিলনেই তার সার্থকতা। যে-প্রেম মিলনমুখী নয়, তাতে আছে কেবল দাহ, মন-আত্মা-দেহের অপমৃত্যুই তার পরিণাম। লায়লীর ও মজনুর প্রেম বিরহেই অবসিত। দুই দগ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা জমাট হয়ে আছে এ কাব্যে। 'হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কান্দিতে জনম ভেল'—লায়লীর ও মজনুর জীবনে এ তত্ত্ব প্রমাণিত সত্য। আলোচ্য কাব্যে বিরহানলে দগ্ধ দুটো হৃদয়ের জ্বালাযন্ত্রণার ইতিকথা পরিব্যক্ত। তাছাড়া লোকে বলে, প্রেম মানুষকে মহৎ করে এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে প্রেমজ মহত্ত্ব দুর্লক্ষ্য নয়।

আত্মবিশ্বাস, আদর্শনিষ্ঠা, সহনশীলতা, প্রত্যয়দৃঢ়তা, তিতিক্ষা, সাহসিকতা এবং নির্যাতন প্রসূত কারুণ্য ও যন্ত্রণাজাত বেদনাই মহৎ কাব্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু। এ কাব্যেও আমরা করুণ রসে ও বিয়োগান্ত বিষয়ে কবির অনুরাগ প্রত্যক্ষ করি। তাঁর অপর কাব্য 'মক্তুল হোসেন' বা 'ইমামবিজয়' ও 'কারুণ্যের-নির্ঝর'। অতএব, কারুণ্য ও বেদনা লক্ষ্যেই কবি লেখনী ধারণ করেছিলেন। আঘাতে ব্যর্থতার ও হতাশায় ভরা জীবনের রক্ত-ঝরা ক্ষত, হৃদয়ের গভীরতম বেদনা, আর চিত্তের কোমলতম বৃত্তির স্বরূপ উদঘাটন এবং পরিস্ফুটনই কবিব্রত। রুচি দিয়েই মানুষের পরিচয়। কবি যে রুচি নিয়ে আমাদের সুমুখে উপস্থিত, তাতে তাঁকে জীবনের গভীরতর

রূপ-সচেতন, সংবেদনশীল সহৃদয় ব্যক্তি বলে চিনতে দেরী হয় না। তাঁর শিল্প-রুচি, কবিত্ব ও মনীষা প্রথম শ্রেণীর। তাঁর গোড়ামিমুক্ত উদার সহানুভূতি, দরদী দীল এবং সংযম-সুন্দর অভিব্যক্তি ষোলশতকী বিরলতায় বিশিষ্ট।

লায়লী-মজনু কাব্যে কাহিনী অত্যন্ত ঋজু। ঘটনা বিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস ছিল অবশ্য। ইবন সালামের পুত্রের সঙ্গে লায়লীর বিবাহে কিংবা লায়লীর রূপ-বহ্নিতে নয়ফলরাজের আত্মাহুতির প্রয়াসে ঘটনা বক্র ও বিপুল হতে পারত, কিন্তু আশু-সমাধান-বুদ্ধির প্রয়োগে কবি অঙ্কুরেই নষ্ট করেছেন সে সম্ভাবনা। ফলে অসম্পৃক্ত ঘটনা ও দৃশ্যের সমাবেশে কাহিনীকে গতিদানের কৃত্রিম আয়োজনে অবসিত হয়েছে কবিকৃতি। যেমন দুই যোগীর উপদেশ ও আশীর্বাদ কামনা, নজদ বনে মজনুর পুন পুন বাস, পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্যে মজনুর পিতার একাধিকবার নজদ বনে গমন, পর্যায়ক্রমে মজনুর ও লায়লীর বিলাপ প্রভৃতি কাহিনী নির্মাণে কবির অসামর্থ্যের সাক্ষ্য।

লায়লী-মজনু উচ্ছ্বাসপ্রধান কাব্য, হৃদয়াবেগই এর প্রাণ। সেজন্যে এ কাব্যে চরিত্র গড়ে ওঠেনি। কএস-লায়লী দু'জনই পরম সজ্জন। প্রণয়ে একনিষ্ঠতা ছাড়াও পিতামাতা, সমাজ-ধর্ম, রীতি-নীতি প্রভৃতির প্রতি গতানুগতিক আনুগত্যে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। দু'জনেই জীবন-চেতনার ক্ষেত্রে প্রেমিক এবং সে কারণে দু'জনেই অসূয়ামুক্ত উদার ও তিতিক্ষু। এ ছাড়া আর সব রকমে তারা নিতান্ত সাধারণ। নায়ক-নায়িকার যোগ্য কোনো অনন্যগুণে বিশিষ্ট নয়।

পুরুষের তথা নায়কের বারমাসী এ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চৌতিশায় ও বারমাসীতে পুরুষের বিরহ-বিলাপ দেখিনি আর কোনো কাব্যে। ঋগ্বেদে উষার জন্যে পুরুরবার বিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ—এ দেশের সাহিত্যে এ তিন নায়কের মধ্যেই দেখি নারীসুলভ বিরহ-বিকার। দৌলতউজীর এই আখ্যায়িকার অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন নর-নারীর হৃদয়ের সহজ ও স্বাভাবিক বেদনা। বলতে গেলে বিলাপে এর শুরু এবং বিলাপেই এর শেষ। মজনুর ও লায়লীর পুনঃ পুন বিলাপ ছাড়াও এখানে রয়েছে লায়লীর মাতার ও মজনুর পিতামাতার বিলাপ, মজনুর বন্ধুর এবং লায়লীর সখীর রোদন। তাই একে 'বিরহকাব্য' না বলে 'বিলাপকাব্য' বলাই হয়তো সঙ্গত। এই কাব্যের নায়ক নায়িকার বিরহ-বিলাপ ও ষড়ঋতুর আবর্তনে তাদের যৌবনোদ্বেগ স্মরণ করিয়ে দেয় পদাবলীর রাধাকে। তবু ডক্টর মুহম্মদ এনামুক হক বলেছেন 'লায়লী-মজনু' ফারসি কবি জামীর ঐ নামীয় কাব্যের ভাবানুবাদ। স্থানে স্থানে মূল ঘেঁষা অনুবাদ যেমন আছে, স্বাধীন রচনাও তেমন দেখা যায়।[১]

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ স্বীকার করেন যে ভিক্ষুকবেশী মজনুর ঘটনা, কুকুর চুম্বন ও কুকুরের দশগুণ বর্ণনা, নয়ফলের মতিভ্রম, বিষপ্রয়োগে মজনু হত্যার ষড়যন্ত্র ও মৃত্যু, দ্বারী কর্তৃক মজনুকে হত্যার চেষ্টা, যোগ প্রভাবে দ্বারীকে নিষ্ক্রিয় করা, 'হেতুবতী-লায়লী সম্বাদ' নামের ঋতুপরিক্রমা, যোগী-মজনু সম্বাদ, যোগতত্ত্ব প্রভৃতি কবি বাহরাম খানের স্বকীয় সৃষ্টি। আর কাব্যে বর্ণিত পরিবেশ তো আরব-পারস্যের নয়ই। নিযামীর কাব্যের অনেক চরিত্র ও ঘটনা এখানে নেই। তবু তিনি বলেছেন 'বাঙলার কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী-মজনুর আখ্যানভাগ নিযামীর কাব্যের আখ্যানভাগের কাঠামোর সঙ্গে মোটামুটি মিল আছে। দু'চারটি ঘটনা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। অন্যত্র কাহিনীর আদলটির সম্পূর্ণ মিল আছে।[২] আবার নিযামীর মূলের সঙ্গে আক্ষরিক মিল দেখাবার চেষ্টাও করেছেন তিনি।[৩]

---

১. *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য ২য় সং, পৃঃ ৯৪।*

২. *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পৃঃ ১৯৪, ২০০।*

৩। ঐ পৃঃ ২০১, ২০৫।

একজন বলেছেন জামীর কাব্যের অনুসরণ, অন্যজন দেখেছেন নিযামী গঞ্জাবীর কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ।

এ সিদ্ধান্তের বা মন্তব্যের প্রতিবাদে বারবার এক কথাই বলতে হয়, মধ্যযুগের সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হত না, হত কিছু কায়িক, কিছু ছায়িক, কিছু ভাবিক। আর দেশ-কালের ও রুচির প্রয়োজনে গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন স্বাধীনভাবেই চলত। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিও এমনি স্বাধীন অনুবাদ। আমাদের ধারণায় মুসলিম জগতের ঘরে ঘরে শোনা ও জানা ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু ও শিরি-ফরহাদ উপাখ্যান বা কারাবালাযুদ্ধ বৃত্তান্ত নিয়ে যে-কোন কাব্যের কবি-পাঠকের পক্ষেই স্বাধীনভাবে নতুন কাব্য রচনা করা সহজ। তাই নিযামীর (১৮৮০ খ্রীঃ), আমীর খুসরুর (১২৯৮ খ্রীঃ) আবদুর রহমান জামীর (১৪৮৪ খ্রীঃ) কাব্যেও রয়েছে কাঠামোগত মিল। দৌলত উজির বাহরাম খানের একটা বা একাধিক ফারসি কাব্য পড়া ছিল, আর এ উপাখ্যান মুখে মুখে শোনা তো ছিলই। তাঁর পক্ষে এ কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে অন্য কাব্যের উপর তেমন নির্ভর করার প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ করে এ কাব্য ঘটনাবিরল একটি বিলাপকাব্য।

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ যে দু'একটি চরণের বক্তব্যগত আক্ষরিক মিল খুঁজে পেয়েছেন, তা নিতান্তই আকস্মিক। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই ঃ কাম-প্রেম, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, রোগ-শোক প্রভৃতি চিরন্তন ও সর্বমানবিক অনুভূতির প্রকাশে দেশ-কালের ও ভাষায় ব্যবধান সত্ত্বেও শব্দগত ও ভঙ্গিগত ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকেই। এমনকি উপমাদি অর্থালঙ্কারেও সাদৃশ্য থাকে। ডক্টর ওয়াকিল যে সাদৃশ্যকে অনুবাদের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা মানবিক আবেগগত সাদৃশ্য মাত্র।

গল্পসার

দেবধর্ম আরাধনা করে আমীর অবশেষে এক পুত্র সন্তান লাভ করলেন। তার নাম রাখলেন 'কএস'। জন্মাবধি তার ছিল রূপানুরাগ। লায়লী ছিল মালিককন্যা। উভয়ে যখন অতিক্রান্ত শৈশবে পাঠশালায় পড়তে গেল, তখনই দু'জনের মধ্যে হল প্রেমের সঞ্চার। প্রথমে সহপাঠীরা পরে শিক্ষক, মা-বাবা ও চারদিকের সবাই জানল তাদের প্রেমের কথা। তারা দু'জনেই অঙ্গীকার করল—'যাবজ্জীবন প্রেম না করিব ভঙ্গ'।

কলঙ্কভয়ে লায়লীর বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করল তার মা, এবং পাছে পত্র লেখে এ ভয়ে মা 'লুকাইলা লেখনী ভাঙ্গিলা মস্যাধার'। এখানেই শেষ নয়,

ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ
প্রখর নূপুর দিলা কন্যার চরণ।

ফলে লায়লীর আর মজনুর

রাবণের চিতাসম জীবন দহএ
শ্রাবণের ধারা জিনি নয়ন বহএ।

এভাবে দু'জন বিরহানলে জ্বলে পুড়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ অস্থির জীবন কাটাতে লাগল। একবার ভিখারী বেশে দেখা করতে গেলে কএস লায়লী ' দিলেন্ত দর্শন দান জুড়ি চারি আঁখি'।

কিন্তু লায়লীর পিতা গুণ্ডা দিয়ে কএসকে লাঞ্ছিত করল। মারের চোটে

শোণিত লুলিত মুখ পাষাণ প্রহারে
চন্দ্রিমা উদয় যেন অরুণ আকারে।

অবশেষে কএস মজনু বা পাগলপারা হয়ে গেল, ঘর ছাড়ল, বনে গেল, যোগী হল। লায়লীকে জোর করে বিয়ে দেয়া হল ইবন সালামের পুত্রের সঙ্গে। বাসরে লায়লী হল বিদ্রোহিনী। লায়লীর পিতা একবার সপরিবার যাচ্ছিল শাম দেশে। মজনুর তখন নজদ বনে বাস। এ বনের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে লায়লী উটের পিঠস্থ দোলা থেকে গোপনে নেমে পড়ল, আর দেখা করল কএসের সঙ্গে। প্রস্তাব দিল বিয়ের। কএস উত্তরে জানাল ঃ

গুপ্তরূপে তোমাকে করিলে পরিণয়
আরব নগরে লোকে দূষিব নিশ্চয়।

'চন্দ্রবিনে গগন প্রদীপ বিনে ঘর/পুত্র বিনে জগত লাগএ ঘোরতর'। তাই একবার কএসের পিতা লায়লীর পিতা মালিকের কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে গেল। কএসের পাগলামির কথা মালিক আগেই শুনেছিল, তাই ছেলে দেখতে চাইল, অতিকষ্টে মজনুকে লায়লীর বাড়ি নেয়া হলে লায়লীর কুকুরকে, অতি সোহাগে চুম্বন করল মজনু। প্রত্যাখ্যাত হল বিয়ের প্রস্তাব।

কাজেই বিয়ে হল না, মজনু বলে 'কণ্ঠ শুকাইল মোর পয়োনিধিকূলে'। এর পরে দু'জনেরই অসহ্য দিনগুলো কাটে বিরহ যন্ত্রণায়।

সহজে প্রেমের পীড় তাপিত সদাএ
রূপ রঙ্গ দূরে গেল তনু হৈল ক্ষীণ।

অকালে অবসিত হল লায়লীর জীবনবসন্ত। হেমন্তকালে তার বিরহ-তপ্ত দেহে নেমে এল মৃত্যুর শীতলতা ও প্রশান্তি। মৃত্যুর পূর্বে লায়লী শেষ অনুরোধ জানাল মাকে–

যেক্ষণে শরীর তেজি আহ্মি চলে যাই
বারতা জানাইবা মোর মজনুর ঠাঁই।
কহিবা তোমার ভাবে লায়লী দুখিনী
জন্মিল প্রেমের পীড় হারাইল প্রাণি।

কথা রেখেছিল লায়লীর মা। খবর শুনে ছুটে এল মজনু। লায়লীর কবর আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল মজনু আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ঃ

দুই ভুজ প্রসারিয়া কবর কোলেত লৈয়া
প্রেমভাবে মজনু সুজন
লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি
ততক্ষণে তেজিল জীবন।

লায়লী-মজনু কাব্য 'রোমিও-জুলিয়েট' নাটকের মতোই একটি ট্র্যাজেডী। এদের মিলনে বাধা হয়েছে সমাজ, শাস্ত্র ও পরিবার। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা কারবালা বিষয়ক কাব্যে বা অন্যান্য করুণরসাত্মক রচনায় সত্যিকার ট্র্যাজিক এফেক্ট নেই। রামায়ণে একটা রাজকীয় আদর্শের লালনে সীতাবর্জনের বেদনায় প্রলেপ ও প্রবোধ মিলেছে। ন্যায়ের স্বীকৃতিতে, স্বর্গে আত্মীয় মিলনের আশ্বাসে ও পরীক্ষিতের রাজ্যলাভের মাধ্যমে বেদনার বিমোচন ঘটেছে মহাভারতে, রবীন্দ্রনাথের মতে এ 'সফল আশার মহান বিষাদ' মাত্র। কারবালা কাহিনীতেও প্রশান্তি এসেছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, এজিদের নিধনে আর জয়নুল আবেদিনের জয়ে। অতএব বিয়োগান্ত কাব্য রচনায় দৌলতউজির বাহরাম খান পথিকৃৎ এবং বাঙলায় নতুন কাব্যাদর্শ প্রবর্তনের গৌরব তাঁরই। দেশ-কালের হিসেবে এ কাব্য বাস্তব জগৎ ও জীবনভিত্তিক। এখানে দেব - দৈত্য-রাক্ষস নেই, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসর। এটি প্রেমকথার কাব্য হলেও এ কাব্য অশ্লীলতামুক্ত, ঋতুপরিক্রমায় কামচেতনা দানের চেষ্টার মধ্যে কিংবা মজনুর মদনজ্বালার মধ্যে রুচির ও সংযমের সীমা অতিক্রান্ত হয়নি। কএস-লায়লীর প্রেম একান্তই মানবিক—কামগন্ধহীন নয়। ফারসি-উর্দুকাব্যের মতো এতে কোন জীব-ব্রহ্ম-প্রেমের রূপক নেই। সেকালে জনপ্রিয় যোগের কথা আছে বটে, সেকালে ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকারা এবং গার্হস্থ্য জীবনে নানাভাবে প্রতিহত হতাশাগ্রস্ত মানুষেরা যোগী-যোগিনী হয়েই ঘর ছাড়ত, হত বিবাগী। এখানে মজনুচরিত্রে সে ঐতিহ্যেরই অনুসরণ রয়েছে মাত্র। ঋতুপরিক্রমাটি নামে 'হেতুবতী-লায়লী সম্বাদ', আকারে গীতিনাট্য, প্রকারে কামোদ্দীপক বটিকা এবং স্বরূপে সম্বাদী-প্রতিবাদী সংলাপ। লায়লী-মজনু কাব্যে ঋতুপরিক্রমা ব্রজবুলিতে রচিত। যেমন বর্ষায়——

এ ধনি আওত বারি বরিখত যুগল নয়নে বহে বারি
চাতক পিউ পিউ নাদ শুনি ডাউক দর্দূর কলরবত মত্ত মউর

বিরহিনীচিত চমকিত
বরিখত বারি এ জগত ভরি
রজনী ভীম আন্ধিয়ারী
শুনহে ধনি যো বিরহিণী
কৈসে জীব নব কামিনী।
উর হতে পিউ দূর উলূপ উগএ দূর
কৈসে গোঁওব যামিনী। ইত্যাদি।

চৌতিশায় লায়লী-মজনুর বারোমাসীও বর্ণিত হয়েছে। চৌত্রিশটি বাঙলা হরফের এক একটিকে চরণের প্রথম শব্দের আদ্যক্ষর রূপে প্রয়োগ করে বিরহী হৃদয়ের উপর এক এক মাসের বা ঋতুর প্রাকৃতিক প্রভাব বর্ণনার অথবা স্তব-স্তুতির উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক চরণ রচনার শৈল্পিক রীতির নাম চৌতিশা বা চৌত্রিশা। বিরহী নায়িকা বা নায়কের সংবৎসরের মানসিক অবস্থায় বা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দানের জন্যে বারোমাসের, বা ষড় ঋতুর কিংবা প্রতি চার মাসের প্রকৃতির রূপে বিরহী বিরহিণীর হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা বর্ণিত হয় বারমাসীতে, ঋতুপরিক্রমায় ও হিন্দিসাহিত্যে চৌমাসায়।

সতেরো শতকে রোসাঙ্গে বাঙলা সাহিত্য

রোসাঙ্গে রচিত বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ক. রোসাঙ্গরাজ্য পরিচিতি

বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে রখইঙ্গ (রক্ষতুঙ্গ?) নামে একটি রাজ্য ছিল। সংস্কৃত রক্ষঃ (রাক্ষস) তুঙ্গ বা টুঙ্গী থেকে এ নামের উৎপত্তি বলে অনুমিত![১] লামা তারানাথের ইতিহাসে[২] 'রখন' নামে এবং আইন-ই-আকবরীতে 'আখরঙ' নামে অভিহিত হয়েছে এ দেশ। বাহারিস্তান গয়বীতে মীর্যা নাথান এ দেশকে ও দেশের মানুষকে আরখঙ ও রখঙ্গী বলে উল্লেখ করেছেন,শেহাবউদ্দীন তালিসের ফাতিয়া-ই-ইবরিয়াতেও 'রখঙ' নামই মেলে। Pelo Vino-র লাতিন ভাষায় রচিত ভূগোলে আরাকান নাম রয়েছে। ফন লিনচটোয়েন অঙ্কিত মানচিত্রে এবং ফ্রায়ার ম্যানরিকের[৩] গ্রন্থেও মেলে Aracan নাম। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি এলাকার নাম 'রাই খইঙ' (Rai Khaing)। মুসলিম রচিত বাঙলা উপাখ্যানে রোকামশহর বা রাজ্য হচ্ছে জ্বীন-পরীদের দেশ। এটিও হয়তো 'রখন'-এর বা রখইঙ-এর বিকৃত রূপ। বার্মার ইতিহাসকার ফেয়ার (Phayre : Aracan) আরাকান নাম এই 'রখইঙ' নামের বিকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে উচ্চারণে 'অ'ও 'র'- এর স্থিতি বিপর্যয় ঘটার ফলেই 'রখঙ' আরাকান হয়েছে।[৪]

বার্মার মূল ভূখণ্ড ও আরাকানের মধ্যেকার দুরতিক্রম্য পর্বতই আরাকানের স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীন সত্তার এবং সমুদ্রসান্নিধ্য তার সমৃদ্ধির কারণ। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাজ্য বলে কথিত আরাকান একেবারে হামলা মুক্ত ছিল না। মাঝে মধ্যে বার্মার রাজাদের আক্রমণে আরাকানরাজারা ধন-জন ও স্বাধীনতা হারিয়েছেন সাময়িকভাবে। আবার মধ্যযুগে পরাক্রান্ত আরাকানরাজারা পূর্ব বাঙলার ঢাকা অবধি তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছেন কখনো কখনো। চট্টগ্রাম বিশেষত কর্ণফুলীর দক্ষিণতীর থেকে টেকনাফ অবধি সমগ্র অঞ্চল দশ শতক থেকে প্রায় ১৬৬৬ সন অবধি অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকানরাজ্যভুক্ত ছিল এবং শঙ্খনদ থেকে টেকনাফ অবধি অঞ্চল ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান-অধিকারে ছিল বলে জানা যায়। এমন কি ৯৫১ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামবিজেতা আরাকানরাজ সুল তইঙ সন্দ উচ্চারিত চিৎ -তৌৎগঙ' (যুদ্ধ করা অন্যায়)

---

১. JASB Vol.,XIII pp.144,p24, Phayre, History of Burma, pp 42-43.

২. JASB.1898, Pagsam Jon Zam (Antiquity of Chittagong) Sarat Chandra Das.

৩. The Land of the Great Image. Ed.Maurice Collis.

৪. Bhattasali Commemoration Volume, Dacca Museum pp.334-35.

থেকেই চাটিগাঁ -চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি বলে কিংবদন্তী রয়েছে। মধ্যেযুগে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়-ত্রিপুরা-আরাকানে মাঝে মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। গৌড় বা ত্রিপুরা কখনো কখনো স্বল্পকালীন দখলও পেয়েছে বটে, তবে আগেই বলেছি ১৬৬৬ সনের আগে উত্তর চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সনের আগে শঙ্খনদ থেকে টেকনাফ অবধি গোটা ভূখণ্ড মুখ্যত ছিল আরাকানরাজ্যেরই অংশ।[১]

বার্মারাজ পাইইন সিঙ সউ ওরফে মেঙখামঙ-এর আক্রমণে আরাকানরাজ মেঙসামোন ওরফে নরমিখলা ১৪০৪ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয়ে গৌড়সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহর (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) আশ্রিত হন। এবং গৌড় সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহর (১৪১৯-৩১খ্রীঃ) সহায়তায় ১৪৩০ সনে আরাকানের রাজধানী লঙ্গিয়েতে রাজাসনে পুনরাধিষ্ঠিত হন তাঁবেদার মিত্ররাজা রূপে।[২] অবশ্য আরাকানের ইতিকথায় সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ্ নন, সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ-ই ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেঙ সাউমোনকে আরাকানের সিংহাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তি কাল থেকেই আরাকানে গৌড় সুলতানদের তথা তুর্কীদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবল হতে থাকে, যদিও মেঙ সাউমোনের মৃত্যুর সঙ্গেই আরাকান গৌড়ের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়, রাজার মুসলিম নাম ধারণ, মুদ্রায় কলেমা লেখন ও ফারসি হরফ তার প্রমাণ।[৩] রাজাদের নাম যেমন,

মঙখ্রী——আলী খান
বাসপিউ——কলিমা শাহ
গজপতি বা গজবাদী——ইলিয়াস শাহ
মেঙ মেঙ বা মিন বিন——সুলতান যৌবক শাহ
মেঙ ফালঙ——সিকন্দার শাহ
মেঙ ইয়াজাগী——সলিম শাহ
মেঙ খামঙ——হোসেন শাহ

খ. রোসাঙ নামের উৎপত্তি

নবমিখলা লঙ্গিয়েতে অধিষ্ঠিত হয়েই বার্মারাজার ভয়ে ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের রামু বা টেকনাফের শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত ম্রোহঙ- এ (Mrohaung অন্যনাম Mrauk-u) নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি সাড়ে তিনশ বছর ধরে ম্রোহঙই আরাকানের রাজধানী ছিল। ম্রোহঙ বর্তমানে আকিয়াব জিলায় অবস্থিত। এখনকার লোকপ্রচলিত নাম পাথুরেকেল্লা ।

এ ম্রোহঙ সাধারণ চট্টগ্রামবাসীর মুখে বিকৃত হয়ে রোহাঙ, রোয়াঙ হয়েছে। সাধু ভাষার শ,ষ,স, পূর্ব বাঙলার বুলিতে 'হ' হয়ে যায়। কিন্তু লিখিত ভাষায় 'শ' রক্ষিত হয়। এ বিকৃত কথ্য বা বুলির 'হ'-এর সাদৃশ্য বশে রোহাঙ- এর 'হ'-ও 'স' রূপে সম্ভবত লিখিত হতে থাকে। ফলে রোহাঙ রোসাং, রোসাঙ্গ হয়েছে। আমাদের অনুমানের নিঃসংশয় সমর্থন মেলে কাজী দৌলত ও আলাউলের উক্তিতে—

১. কর্ণফুলী নদীপূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ——কাজী দৌলত

---

১. ক. Phayre p.42.
খ সৈয়দ সুলতান ও তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, ১ম অধ্যায়।
গ. চট্টগ্রামের ইতিহাস, পুরানা আমল, মাহবুব-উল আলম।
২. JASB. Vol. XIII pt. I,1844, p.45.
৩. Outline of the Burmese History,G.E. Harvey, History of Chittagong, S.M.Ali

২. ক্ষিতি তলে অনুপাম রোসাঙ্গ শহর নাম
শস্য মৎস্য সতত পুর্ণিত।* (আলাউল/ সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্য)

দিল্লী সাম্রাজ্যের মতো রাজধানী রোসাঙ্গের নামে—গোটা আরাকান রাজ্যেকে রোসাঙ্গরাজ্য এবং রাজাকে রোসাঙ্গরাজ নামে অভিহিত করা হয়েছে রোসাঙ্গে রচিত বাঙলা সাহিত্যে। আজো শঙ্খনদ থেকে টেকনাফ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম লোকমুখে রোসাঙ্গ/রোয়াঙ এলাকা নামে অভিহিত। এবং ঐ এলাকার অধিবাসীরা সামাজিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে উত্তর চট্টগ্রামবাসীর কাছে রোসাঙ্গী বা রোয়াঁই বলে অবজ্ঞাত। উনিশ শতকের দিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের কবিরা কখনো কখনো আবার 'মোরঙ্গ (ও ম্রোহঙ) নামও ব্যবহার করেছেন ঃ

১. নামে নাম থুইলেন্ত মোরঙ্গ রায়। পুথি পরিচিতি, পৃঃ ২৪২

২. যত মোরঙ্গ আইসে করএ গৌরব। দুল্লা মজলিশ

রাজধানী রোসাঙ্গ এখন দক্ষিণ চট্টগ্রামবাসীর কাছে 'পাথুরেকেল্লা' নামে পরিচিত। ভাঙা কেল্লার নিদর্শন ও স্মৃতি থেকেই এ নামের উদ্ভব, এটি এখন একটি গ্রাম মাত্র।

গ. রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য সৃষ্টির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

বার্মার আরাকানে চট্টগ্রামে অন্তত আট-নয় শতক থেকে আরবের মুসলিম বণিকদের বাণিজ্য চালু হয়, তা প্রাচীন আরব ভৌগোলিকদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। আরাকানরাজ মহতোইঙ্গ সন্দঅয় (৭৮৮-৮১০ খ্রীঃ)- এর আমলেই নয় শতকের প্রথম দশকেই ভাঙা জাহাজের বিপন্ন আরবেরা আরাকানের রনবী বা রামরী দ্বীপে আশ্রিত হয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে আরাকানরাজ্যে বাস করতে থাকে বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম যখন দশ শতক থেকেই আরাকান রাজ্যের অংশ তখন চট্টগ্রাম হিন্দু-মুসলমান দেশের রাজধানী রোসাঙ্গে ব্যবসা, চাকরীও অন্য নানা কাজে গেছে এবং বাস করেছে। যেমন রাজ্যের অন্য অংশ চট্টগ্রামে এসেছে এবং বাস করেছে আরাকানী বৌদ্ধরা। এদের বংশধরেরা বড়ুয়া, মুৎসুদ্দী, চৌধুরী উপাধি এবং একালে হিন্দুর মতো সংস্কৃত-বাঙলা নাম ধারণ করে আজো চট্টগ্রাম জিলায় বাস করে। অতএব দ্বিজাতি-মঘ ও বাঙালী অধ্যুষিত আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যের রাজধানীতে ও রোসাঙ্গ সরকারে চট্টগ্রামবাসী অমাত্য, মন্ত্রী থেকে ক্ষুদ্র চাকুরে অবধি সব শ্রেণীর লোক থাকা স্বাভাবিক। এবং অন্যান্য পেশার ও ফিকিরের বাঙালীও সেখানে বাস করার কথা। এখনকার য়ুরোপ-আমেরিকার লোকেরা যেমন প্রাগ্রসর বিদ্যার, চিন্তা-চেতনার ও প্রকৌশল-কৃৎকৌশলের অধিকারী বলে আমাদের শ্রদ্ধেয়, মধ্যযুগে তেমনি শ্রদ্ধেয় ছিল আরব-ইরানি-তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা এবং সে সূত্রে দেশী শিক্ষিত মুসলিমরাও। তাই কাব্যসূত্রে কেবল মুসলিম মন্ত্রীর নাম পাই। হিন্দু মন্ত্রী থাকলেও মুসলিম কবি প্রতিপোষণ পাননি বলে তাঁদের নাম নেননি, যেমন নাম উল্লেখ করেননি কোন মঘমন্ত্রীর। রাজনীতিক-ব্যবসায়িক কিংবা বৃত্তিক কাজে রোসাঙ্গে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের একটি প্রবাসী সমাজও গড়ে ওঠে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ছাড়াও রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে সমস্বার্থে স্বভাষী-স্বজাতির মধ্যে সহযোগিতার অঙ্গীকারে সহাবস্থান প্রয়োজন হয়েছিল, এই সামাজিক গরজেই বাঙালী অমাত্যদের বাঙালী সমাজে মেলামেশা করতে হয়েছে।

পাড়া আছে, সমাজ আছে, নিজেদের আলাদা ভাষা আছে, স্বতন্ত্র বিশ্বাস-সংস্কার আছে, বিশিষ্ট নিয়ম-নীতি আছে, আছে রীতি-রেওয়াজও। কাজেই তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূর্তির জন্যে, মানসচাহিদা পূরণের জন্যে, মনের রসতৃষ্ণা মিটানোর জন্যে সেখানে গুণীজন দিয়ে গান-

---

* *এমনি আরো দৃষ্টান্ত ঃ শাহ সুজা-দৈব পাকে আইলা রোসাঙ্গ শহর। ভ্রাতৃসঙ্গে যুঝি আইলা রোসাঙ্গ শহর। রোসাঙ্গ দেশেত এক মহাগুণবান। সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল। —ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী—মরদন, রোসাঙ্গ শহরে এক গ্রাম মনোহর। —দুল্লা মজলিশ-আব্দুল করিম খন্দকার। তান নাম গুণ ধাম প্রচার রোসাঙ্গে-আইনুদ্দিন (তফসিব) [পুথি পরিচিতি ঃ পৃঃ ২৪১.২৪২.৩৪৯ ইত্যাদি]*

গাথা-রূপকথা-প্রেমকথা জানানোর, রসকথা শুনানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে, সৃজনশীল কেউ কেউ নতুন সৃষ্টি দিয়ে তাদের রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। কাজী দৌলত, আলাউল প্রমুখ প্রণয়োপাখ্যান অনুবাদ করে এবং মাগনঠাকুর দেশী রূপকথার কাব্যায়নে সতেরো শতকের রোসাঙ্গ শহরে বাঙালীর সংস্কৃতির ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন। এর জের চলেছিল আঠারো-উনিশ শতকের দক্ষিণ চট্টগ্রামে।

ঘ. 'রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য' নামের যাথার্থ্য

রোসাঙ্গে বাঙলা সাহিত্যচর্চার ও সৃষ্টির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ এ-ই। এই সঙ্গে ভিন্নভাষী মঘ-বৌদ্ধ রাজাদের কোনই সম্পর্ক নেই। কাজেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রদত্ত 'আরাকানরাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামটি অসার্থক ও বিভ্রান্তিকর। এ নামটি বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসকারদের বদৌলতে জনপ্রিয়ও হয়েছে, তবু এ নাম তথ্যবিরোধী বলে পরিহার্য। বরং বলা চলে 'রোসাঙ্গের অমাত্যসভায়' বাঙলাসাহিত্য, যদিও সব কবি অমাত্য প্রতিপোষিত নন। আবার আলাউল প্রমুখ রচিত সাহিত্যের 'আরাকানরাজ্যে বাঙলাসাহিত্য' নামও হবে অযৌক্তিক। কারণ, এঁরা রাজধানী রোসাঙ্গবাসী বা রোসাঙ্গে প্রবাসী কবি। এ সময়ে আরাকানরাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামবাসী হিন্দু-মুসলিম অনেক কবিও স্বগাঁয়ে স্বঘরে বসে কাব্য রচনা করেছেন। অতএব, 'রোসাঙ্গে বাঙলা সাহিত্য' নামই সঙ্গত ও সমীচীন। নেপাল, কামরূপ, ত্রিপুরা বা কোচবিহার রাজ্যে বাঙলা সাহিত্যচর্চা নামও তেমনি সঙ্গত ও সুপ্রযুক্ত।

অতএব, দ্বিজাতি (মঘ ও বাঙালী) অধ্যুষিত আরাকানরাজ্যের বর্মী উপভাষী আরাকানীদের অংশে অবস্থিত রাজধানী রোসাঙ্গে বসে রাজ্যের অপর এক অংশের লোক অর্থাৎ চট্টগ্রামবাসী স্বজাতীয় রাজকর্মচারীর তথা মন্ত্রীর প্রতিপোষণ পেয়ে বা স্বাধীনভাবে বাঙলাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মাত্র। ব্যাপারটা পাকিস্তান আমলে পূর্ববাঙলার লোকের করাচীতে বা দিল্লীতে বসে পশ্চিম বাঙলার লোকের বাঙলা লেখার মতো। বিদেশীরা যখন ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় বই লেখেন তখন তা ইংরেজ-ফরাসির আধিপত্যজাত ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এতে ইংরেজ-ফরাসির গৌরবের গর্বের কারণ থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সেরূপ নয়, কাজেই বাঙলার বাইরে অবাঙ্গালীর বাঙলাসাহিত্য চর্চা নয় বলেই রোসাঙ্গে রচিত সাহিত্যের জন্যে আমাদের গৌরব বোধ করার কোন কারণ ঘটে না। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ম্যাকলে বা কিপলিঙ যেমন ভারতগৌরব নন, তেমনি কাজী দৌলত কিংবা আলাউলও রোসাঙ্গমণি নন।

বলেছি, এক হিসেবে কয়েকজন ছাড়া মধ্যযুগের চট্টগ্রামবাসী কবিমাত্রেই আরাকানরাজ্যের বা রোসাঙ্গরাজ্যের কবি। আর তাঁদের মধ্যে কাজী দৌলত, মরদন, আলাউল, মাগনঠাকুর ও আবদুল করিম খোন্দকার রাজধানীর কবি। তফাৎ মাত্র এ-ই। নেপাল, কামরূপ, কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙালী কবি সম্বন্ধেও একই রূপ নাম প্রযোজ্য।

আর বাঙলাভাষায় প্রণয়োপাখ্যান রচনার শুরু রোসাঙ্গে নয়, সাধারণভাবে চট্টগ্রামে।

ঙ. 'মঘ' নামের উৎপত্তি

এক সময়ে বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙলায়, আরাকানে ও বার্মায় প্রচারিত হয়, আরাকানে বার্মায় কেবল বৌদ্ধ মতই টিকে থাকে, অন্যগুলো কালে লোপ পায়। আভিজাত্যলোভী হিন্দুমাত্রই যেমন আর্য ও আর্যাবর্ত উদ্ভূত, বৌদ্ধ মাত্রই তেমনি এই মগধ উদ্ভূত এবং মুসলিম মাত্রই মক্কা-মদিনা-ইরান-সমরখন্দ-বুখারা থেকে আগত বলে দাবি করেন এবং আরাকানরাজেরা সংস্কৃতভাষায় নিজেদের ও রাজধানীর নাম রাখেন যেমন মহৎচন্দ্র, সুলতচন্দ্র, নরপতিগী, রাজগী, শ্রীসূর্য, বড় ধর্মরাজা, মুনিধর্মরাজা, চন্দ্রসূর্যধর্ম, শ্রীসুধর্মা, শ্রীচন্দ্রসুধর্মা প্রভৃতি, রাজধানীর নাম বৈশালী, ধন্যাবতী, চম্পাবৎ ইত্যাদি। আরাকানী অক্ষমতায় এগুলো বিকৃতভাবে উচ্চারিত ও লিখিত হয়েছে মাত্র। একসময়ে সাধারণ আরাকানীরাও নিজেদের মগধাগতদের বংশধর বলে

পরিচয় দিতে থাকে। ফলে কালক্রমে অবৌদ্ধ চট্টগ্রামবাসীর কাছে (ঢাকার মঘবাজারও এ সূত্রে স্মর্তব্য) মঘ 'আরাকানী'র ও 'বৌদ্ধের' প্রতিশব্দ মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। নিরক্ষর অবৌদ্ধ চট্টগ্রামবাসীর নিকট আজ কেবল চট্টগ্রামের বা বার্মার বৌদ্ধ নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোল চেহারার বৌদ্ধ মাত্রই মঘ। এ মঘ বৌদ্ধের প্রতিশব্দ। বলাবাহুল্য এ মগ বা মঘ 'মগধ' শব্দজাত। মগধ>মগহ মঘ>মগ। চট্টগ্রামে ও রোসাঙ্গে রচিত বাঙলাসাহিত্যে আমাদের এ ধারণার পাথুরে প্রমাণ রয়েছে। যেমন ঃ

১. রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।

২. মগধ রাজ্যের যথ যন্ত্র অনুপাম [কাজী দৌলত, সত্যেন্দ্রনাথ
ঘোষাল সম্পাদিত সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, পৃঃ ৪৫, ৪৭।]

৩. যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি [আহমদ শরীফ সম্পাদিত
সত্যকলি বিবাদসম্বাদ, পৃঃ ১০০।]

৪. নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্বান বিদগধ [আরাকানী ভাষা অর্থে
আরবি-ফারসি আর হিন্দুয়ানি মগধ [সপ্তপয়কর, আলাউল]

৫. মগধের সন কহি শুন গুণিগণ— ঐ

৬. মগধের সনের শুনহ বিবরণ—[সতীময়না, আলাউলের অংশ, ঘোষাল, পৃঃ ১০]

৭. মগধের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়—[তোহফা, আলাউল, পৃঃ ১২০,
আহমদ শরীফ সম্পাদিত]

৮. আধারমানিক মৌজে কদম রসুল
ফাজিল সে অধিকারী মগধ বহুল
বৌদ্ধ অর্থে মগধ
[আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি, এতিম কাসেম রচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫ সাল পৃঃ ৩৯, ৪০]

৯. হাড়ি ডোম মগধ জাতি আর যে কুলাল [ঐ]
তোমার কল্যাণ হেতু মাগে সর্ব কাল।

ফেনীর শেখ মনোহর রচিত 'শমশের গাজী নামা'য়ও বৌদ্ধ অর্থে মগধ ব্যবহৃত হয়েছে। আরাকানরাজ্যে প্রচলিত সন মঘীসন নামে আজো চট্টগ্রামে চালু রয়েছে—মঘীসন অনুসারেই আজো রাজস্ব দেয়া-নেয়া হয়। সামাজিক কাজে-কর্মেও মঘীসন চলে। চট্টগ্রামে এখনো ভূমির পরিমাণ মঘীকানির (৪০ শতাংশে এক কানি) হিসাবেই চলে। এই মঘী প্রত্যক্ষে আরাকানী অর্থে এবং পরোক্ষে মগধসম্ভূত আরাকানী 'বৌদ্ধ রাজকীয়' অর্থে ব্যবহৃত।

আর্মাডান পর্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে যখন আরাকানী বৌদ্ধরা হাত মিলায় তখন থেকেই হার্মাদদের মতো মঘেরাও বাঙলায় নিন্দিত ও ঘৃণ্য হতে থাকে। তখন 'মঘ' ও 'মঘের মুলুক' নতুন অভিধা লাভ করে। আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে এ অভিধা এখনো জনপ্রিয় ও বহুলপ্রযুক্ত এবং বাগ্বিধির অন্তর্গত। কাজেই মগ বা মঘ শব্দ সংস্কৃত বা ফারসিজাত বলে অনুমানের কোন সঙ্গত কারণ নেই।

চ. রোসাঙ্গশহরের কবি ও কাব্য পরিচিতি

রাজধানী রোসাঙ্গ নগরের প্রথম কবি কাজী দৌলত, দ্বিতীয় কবি আলাউল, তৃতীয় কবি মাগন। কবি মরদন কাজী দৌলতের সমকালীন রোসাঙ্গরাজ্যের কাঞ্চীপুরের কবি। এঁরা সতেরো শতকের কবি। আবদুল করিম খোন্দকার আঠারো শতকের কবি।

১. কাজী দৌলত ঃ রোসাঙ্গ শহরে বসে কাব্য লেখার সময়ে কবি জন্মস্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে রোসাঙ্গের অবস্থান নির্দেশ করেছেন ঃ

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ-নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।

এর থেকে বোঝা যায়, জন্মস্থানের নিকটস্থ কর্ণফুলী নদী কবির পরিচিত ও প্রিয়। রাউজান থানা এলাকা এই নদীরই পশ্চিম তীরবর্তী। কবির জন্মভূমি বলে কথিত সুলতানপুর এই রাউজানেরই একটি প্রখ্যাত গ্রাম, এখানে কাজী বংশে দৌলতের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে 'রেজওয়ান শাহ' নামের অসমাপ্ত কাব্য রচক সুলতানপুর গ্রামবাসী কবি শমসের আলি প্রাসঙ্গিক ভাবে পরোক্ষে দৌলতের কাব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

খণ্ড গ্রন্থ হতে যদি ছন্দ চুরি করি
বঙ্গভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা ধরা পড়ি।

সুলতানপুরে বসে আঠারো শতকে কবি ফাজিল নাসির মুহম্মদ সঙ্গীত শাস্ত্রের বই ধ্যানমালা বা রাগতালনামা (১৭২২ খ্রীঃ) এবং উনিশ শতকে কবি মুহম্মদ মুকিম 'গুলে বকাউলি' (উনিশ শতকের প্রথমার্ধে) রচনা করেন। যাঁর আগ্রহে ও প্রতিপোষণে কাজী দৌলত 'সতীময়না' রচনা করেছিলেন, আরাকানরাজ্যেব মহামাত্য সেই আশরাফ খানের নিবাসও ছিল রাউজানের অদূরবর্তী গ্রাম চারিয়ায়। এ গ্রামে এখনো তাঁর দালানের নিদর্শন ও তাঁর নামের দীঘি রয়েছে। চারিয়া গ্রাম এখন হাটহাজারী থানার অন্তর্গত। রাউজান থানার কদলপুর গাঁয়েও লস্কর উজির আশরাফ খানের দীঘি তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। কাজী দৌলত তাঁর আদেষ্টা ও প্রতিপোষক আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য ও লস্কর উজির (সৈন্য মন্ত্রী বা সমর সচিব) আশরাফ খানের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর ভাষায় তা এরূপ ঃ

ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান
হানাফি মজাব ধরে চিশতি খান্দান।
পীরগুরু অভ্যাগত পুষেন্ত তৎপর
লোক উপকার করে নাহি আত্মপর।
রাজনীতি লোকধর্ম বুঝন্ত সকল
মিত্রের সহায় করে অরি রসাতল।
মসজিদ পুষ্করণী দিলা বিবিধ বিধান
শ্যাম তনু যুক্তিমন্ত বচন মিষ্টতা
শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা।
মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধমন
তান হস্তে রাজনীতি কৈল সমর্পণ।
শ্রীআশরাফ খান লস্কর উজির
যাহার প্রতাপব্রজে চূর্ণ অরিশির।
নৃপতি সম্পাশে বৈসন্ত দিবারাতি
যথা যাএ রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি।
সৈন্যসনে অভিষেক করিলা রাজন
মহামাত্যে করিলেক রাজ্যের ভাজন।
মঙ্গল বিধানে সর্ব কৈলা সমর্পণ
বিবিধ প্রসাদ দিলা কল্যাণ কারণ।
ছত্রসমে দিলা সৈন্য-পতাকা দুন্দুভি
স্বর্ণ অঙ্গরাখ দিলা আর বহুমূল্য টুপি।
দশ হস্তী প্রদান দিলেক বহু ঘোড়া
রাজখড়্গ সমর্পিলা লস্করী কাপড়া।
সেনাপতি হৈলা নানা সৈন্য অধিপতি
আশরাফ খান নামে শোভা হৈল অতি।
মহাদেবী অনেক ভাবিল সুনিশ্চিত
রাজপুত্র হস্তে ধিক সুপাত্র নিশ্চিত।
নৃপতিহ পুত্রভাবে হরিষে সাদরে
মহামাত্য করিলেন আশরাফ খানেরে।

H. G. Harvey লিখিত ইতিহাস সূত্রে জানা যায় শ্রীসুর্ধমা [থিরিথুধম্মা] সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর বছরখানেকের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবেন–গণকের এ ভবিষ্যদ্বাণীর দরুণ ষোল বছর (১৬২২-৩৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করার পরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

'মহারাজ আয়ুশেষ জানি শুদ্ধমন' চরণটি উক্ত আশঙ্কারই ইঙ্গিত দান করেছে। তাই মহামাত্য আশরাফকে রাণীর সম্মতিক্রমে রাজা রাজ্যশাসনের দায়িত্ব দিলেন। এর থেকে বোঝা যায় কবি

১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে অভিষেকের পরেই মহামাত্য আশরাফ খানের আগ্রহে সতীময়না রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬৩৮ সনে রাজার মৃত্যুর আগেই কবি আরব্ধ কাব্যের অতি সামান্য অংশ অসমাপ্ত রেখে স্বয়ং মৃত্যুবরণ করেন। অতএব কাব্য রচনাকাল ১৬৩৫-১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়।

তবে মহাপাত্র আশরাফ মহামতি
আপনা সভাতে আইলা রাজ অনুমতি।
সভাতে বসিলা শ্রীআশরাফ খান
সৈয়দ শেখ আদি মোঘল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর——
শ্রীযুক্ত আশরাফ খান অমাত্য প্রধান
ষোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান।
নীতিবিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসচয়
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়।
হেন মতে সভা করি বসিয়া থাকিতে
কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে।
গুজ্রাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র।
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি
শুনিতে লোরকরাজ ময়নার ভারতী।
কোন্ মতে হৈলা ময়না পতিব্রতা সতী
ঠেটা চোপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।
দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দে
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ সানন্দে।
তবে কাজী দৌলত বুঝিয়া সে আরতি
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।

আশরাফ খানের আগ্রহ ছিল 'ময়নার ভারতী' শোনার। একথার একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আজকাল ঠেট-চোপাই-গোহারী ভাষায় রচিত মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' মেলে, আরো মেলে সর্বপ্রাচীন লিখিত রচনা মৌলানা দাউদের 'চান্দায়ন-গাথা'। এগুলো ছাড়াও রয়েছে একই বিষয়ক কাব্য চতুর্ভুজ দাস রচিত মধুমালতী কাব্যে মৈনাসৎ প্রসঙ্গ, খেমদাস প্রণীত 'মৈনাকো সতু'! দাখিনী উর্দুতে রয়েছে কবি গাওয়াসী রচিত 'কিসসা-ই মৈনা' এবং হামিদী রচিত 'অসমৎ নামা'।[১] তাছাড়া বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রিয়ার্সন, হান্টার, এল্যুইন প্রমুখ সংগৃহীত গ্রাম্যগাথাও রয়েছে।[১]

সাধনের কাব্যে কেবল মৈনার বিরহ, স্বামীনিষ্ঠা, কৃচ্ছ্রসাধনা, ও সাতনের দূতী রত্নামালিনী প্রদত্ত প্রলোভনের প্রতিরোধপ্রয়াস বর্ণনায় সীমিত। রত্নামালিনী ও ময়নার উত্তরের প্রত্যুত্তরে রচিত বারমাসীটি একটি উৎকৃষ্ট গীতিনাট্য। লোরকের চন্দ্রানী সংযোগ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত মাত্র। মৈনা মাথা মুড়িয়ে মুখে কালো হলুদ-রঙ মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঝাঁটাপিটে করে রত্নাকে নদীর ওপারে তাড়িয়ে দিল। এবং অনুতপ্ত লোরক ও ময়নার মিলনেই সাধনের গ্রন্থ সমাপ্ত। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারী আবিষ্কৃত মানের পাণ্ডুলিপির লিপিকাল ৯১১ হিজরী অথবা ১৫০৫-০৬ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই সাধন অন্তত পনেরো শতকের কবি। অতএব কাজী দৌলতের স্বীকৃতি অনুসারেই ময়নার কাহিনী বর্ণনায় তিনি সাধনকেই অনুসরণ করেছেন। এ অনুসরণ কোথাও আক্ষরিক অনুবাদে, কোথাও ছায়া অবলম্বনে এবং কোথাও ভাবানুসরণে পরিব্যাপ্ত। কাব্যের তথা সাহিত্যের অনুবাদ দেশকালভেদে নানা প্রয়োজনে এমনি গ্রহণে বর্জনে ও সংযোজনেই হয়ে থাকে। কাজী দৌলতের বারমাসী সাধনের অনুসরণে আষাঢ় দিয়ে শুরু হয়েছে। কাজী দৌলত বর্ণিত লোরক-চন্দ্রানীর গল্পাংশের সঙ্গে মৌলানা দাউদের মসনবী 'চান্দায়ন'-এর কাহিনীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এতে মনে হয়, বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে চালু আহীর সম্প্রদায়ের প্রাচীন লোকগাথা—লোরিকমল্লের গাথাই উভয়ে অনুসবণ করেছেন। সাদৃশ্যটা এ কারণেই। মৌলানা দাউদের 'চান্দায়ন' লোরক-চন্দ্রানী প্রেমের প্রথম লিখিত গান বা গাথা। ৭৭২ হিজরীতে তথা ১৩৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ শাহর আমলে উজির খান-ই-জাহান জুনা শাহর সম্মানে অধ্যাত্মভাবের এ মসনবী রচিত। 'চান্দায়ন' কাব্যে লোরকের উক্তিতেই কাহিনীসার মেলে ঃ আমি জাতিতে আহীর। আমার নাম লোরক, গাউর নগরে আমার নিবাস, চান্দা হচ্ছে সহদেব মহরের কন্যা। তার স্বামী বাবন, আমি তাকে স্ত্রীরূপে পেয়েছি। আমি বাঁঠাকে যুদ্ধে নিহত করেছি। ঘরবাড়ি ছেড়ে চান্দাকে নিয়ে আমি হরদীপাটনে চলে এসেছি।

১ *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী-আওয়াধী পটভূমি—ডক্টর, এম. আর তরফদার, পৃঃ ৬৩-৭৭, ৪১৯-২৪।*

দাউদের চান্দা গৌরনগরের রাজা সহদেব মহরের রূপসী কন্যা। চার বছর বয়সে বাবনের (বামনের) সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নপুংসক স্বামী দূরে দুরে থাকে। অবশেষে চান্দা বাপের বাড়ী চলে যায়। চান্দার রূপে প্রথমে এক বিদেশী গাইয়ে, মধ্যে রাজা রূপচান্দ, এবং পরে গৌরনগরের বীরযোদ্ধা বিবাহিত লোরক মুগ্ধ হয়। লোরকের সঙ্গে বিবাহিত রাজকন্যা চান্দা পালিয়ে যায় গঙ্গার ওপারে হরদী রাজ্যের দিকে। খবর পেয়ে চান্দার স্বামী আত্মসম্মানের খাতিরে লোরকের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। পথে দুবার দুই সাপ চান্দাকে দংশন করে। একবার এক ওঝা আরেকবার এক যোগী তাকে বাঁচিয়ে তোলে। পথে লোরককে মাঝি, মহীপতি, অসিপতি, যোগী প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে হয় এবং পরিশেষে হরদীপাটনের রাজার সহায়তায় দুজনে সুখের সংসার পাতে। এদিকে 'সিরজন' নামের বণিকের মাধ্যমে মৈনা তার বারোমাসের বিরহযন্ত্রণার সংবাদ পাঠায় হরদীপাটনে লোরকের কাছে। অনুতপ্ত লোরক ময়নার কাছে ফিরে আসে।

'চান্দায়ন'-এর মধ্যে মধ্যে অনেক স্তবক নেই, অন্তেও নেই কয়েকটি স্তবক। মৌলানা দাউদ নিশ্চয়ই দেশজ মুসলিম কবি। তাই তাঁর এলাকার আভীর জাতির লোকগাথাকেই তিনি তাঁর অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক রচনার আধার করেছেন। আর তাঁর ভাষাও তাই আঞ্চলিকতাদুষ্ট। উল্লেখ্য যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার উৎসও একই অঞ্চলের ও একই সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্য। লোরক-চান্দার উল্লেখিত স্থান গৌরনগর, রোহিণী, হরদী বিহারেই অবস্থিত। (এম. আর. তরফদার পৃঃ ৮৬)। কাজী দৌলত তাঁর কাব্য অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই ঋণ স্বীকার করতেন, যেমন স্বীকার করেছেন সাধনের ঋণ। দাউদের কাব্যে লোরক-চান্দাই নায়ক-নায়িকা আর সাধনে ময়নাই নায়িকা, তাই নামও কেবল মৈনাসৎ। দৌলত দুটো গল্পই সমান গুরুত্বে গ্রহণ করে সযত্নে বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগে চিত্রকলার মাধ্যমে লোরক-চান্দার প্রেমকথা এক সময়ে সর্বভারতে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কাজী দৌলতের কাব্যে ময়না রূপে মৈনা, চন্দ্রানী রূপে চান্দা, লোর-লোরক রূপে লোরক, মোহরী রূপে মহর, ছাতন রূপে সাতন, বামন রূপে বাবন এবং রত্না হয়েছে।

যোগীর মুখে চন্দ্রানীর রূপের কথা শ্রবণ, নপুংসক বামনপত্নী চন্দ্রানীকে নিয়ে লোরকের পলায়ন, বামনের সঙ্গে যুদ্ধ ও চন্দ্রানীকে সর্পের দংশন ও যোগীর চিকিৎসা এবং অনেক কাল পরে লোর-চন্দ্রানীর গোহারী প্রত্যাবর্তন আর শুরুতে আছে রাজা লোরকের রাণী ময়নাকে ঘরে রেখে শিকার-সুখের জন্যে বনে গমন, যোগীর মুখে চন্দ্রানীর রূপের কথা শুনে বিবাগী হয়ে যাত্রা—কাজী দৌলতের অনুসৃত সাধনের মৈনাসৎ দৃষ্টে মনে হয় রত্নার মাথা মুড়িয়ে মুখে চুনকালি মাখিয়ে রত্নাকে নদীর পরপারে তাড়িয়ে দেয়া ও অনুতপ্ত লোরের চন্দ্রানীসহ গোহারী রাজ্যে ময়নার কাছে ফিরে আসার সঙ্গেই কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। কাজী দৌলতের উক্তিতেও এ আভাস মেলে দুতী—

'ময়না সঙ্গে ছাতনকে মিলাইতে নারিল।
লোর ময়না চন্দ্রানী হৈল এক স্থান
সে-সকল কহি শুন আশরাফ খান।' [ঘোষাল, পৃঃ ১১০]

আলাউলের উক্তিতেও এর সাক্ষ্য রয়েছে—

আশরাফ আজ্ঞা এ দৌলত কাজী ধীর
রচিল চন্দ্রানী কথা অতি সুরুচির।
শেষ খণ্ডে ময়নার কথা করিল প্রকাশ
দূতীর সম্বাদ পদুত্তর বারমাস।
সুচারু পয়ার মিলে নানা ছন্দ গীত
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত।[১]

তবে কাজী দৌলত স্বর্গেত হৈলা লীন
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন।
যেন মতে ময়না কৈল দূতীর দুর্গতি
পুনরপি আসিয়া মিলিল লোরপতি।
এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্মার শেষে তিন নরপতি চলি গেল।

১. *বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত ৪৮৬ সংখ্যক পুথিতে মালিনীর জ্যৈষ্ঠ মাসের উক্তি এবং ৪৭৬ সংখ্যক পুথিতে ময়নার উত্তর কাজী দৌলতের ভণিতায় পুরোটাই মেলে। যদিও আলাউল বলেছেন ঃ একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত।*

অতএব আর কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র লিখতে পারলেই দৌলত কাজীর কাব্যটি সুসম্পন্ন হত। আলাউল অকারণে অপ্রাসঙ্গিক 'আনন্দবর্মা-রতনকলিকা' কাহিনী জুড়ে দিয়ে কাব্যের রসাভাস ঘটিয়েছেন। কাজী দৌলতের 'সতীময়না' কাব্যটি আদিরসপ্রধান হলেও ভাষায় ছন্দে অলঙ্কারদির সুপ্রয়োগে গোটা মধ্যযুগের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। আজো আমাদের কানে হিন্দি গানের, দোহার ও কবিতার ভাষিক লালিত্য বাঙলার চেয়ে বেশি হয়ে বাজে। এ লালিত্যবৃদ্ধি লক্ষ্যে কাজী দৌলতও বারমাসীর কোন কোন পদে ব্রজবুলির আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

কাজী দৌলতের ময়নাবতীর বারমাস তথা 'রত্না-ময়নাবতী সম্বাদ' বা 'সাতন-ময়নাবতী'[১] অনুবাদমূলক হলেও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনা। এমনি তুল্য রচনা হচ্ছে ষোল শতকের লায়লী-মজনু কাব্যের বারমাসী বা 'লায়লী হেতুবতী সম্বাদ'। এগুলো নামে বারমাসী, ভাষায় বাঙলা ব্রজবুলি, আঙ্গিকে গীতিনাট্য, বিষয়ে কামজ প্রলোভনের প্রতিরোধ প্রয়াস বা সংযম সাধনা, রত্না-ময়না সম্বাদ আকারেও দীর্ঘতম। আর প্রকারেও অনন্য, দুটোই উত্তর-পদুত্তর রূপে অর্থাৎ তাত্ত্বিক বিতর্করূপে বিন্যস্ত। বাঙলা বারমাসী সাহিত্যের আরো দুটো ব্যতিক্রম লক্ষণীয়—একটি মুকুন্দরামের ফুল্লরার বারমাসী—এতে সংবৎসরের দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণিত, অপরটি শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জুলেখার বারমাসী—এতে ষড়ঋতুর রূপবৈচিত্র্য বিধৃত। আর সব বারমাসীতে নারীর বিরহ বিকারের বর্ণনাই রয়েছে। তবে লায়লী-মজনুতে নায়ক কএসের বিরহযন্ত্রণাও বর্ণিত হয়েছে।

সতীময়না কাব্যে চরিত্রগুলো প্রায় স্বাভাবিক রূপেই চিত্রিত হয়েছে, লোরক, বামন, রত্নামালিনী প্রভৃতি আমাদের চেনা লোক। রত্নাও সুপটু কুটনীকুলের গৌরব। এ কাব্যে ময়নাবতী ও চন্দ্রানী চরিত্র দুটো এ কাব্যের বক্তব্য প্রতীক বা প্রতিপাদ্য বিষয়প্রতীক। ময়নাবতী ও চন্দ্রানী চরিত্র নারী স্বরূপের দু'দিকের দুই কোটির দুটো স্তম্ভ। একদিকে আদর্শবাদ অপরদিকে জীবনবাদ, একজন আদর্শবাদের কাছে— শাস্ত্রনীতির ও সমাজরীতির কাছে জীবনকে বলি দেয়, অপরজন জীবনভোগের নামে সম্ভোগের গরজে আদর্শকে দলিত করে। আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংযম ও স্বৈরাচার, সতীত্ব ও নারীত্ব, মর্যাদা ও লালসা, ত্যাগ ও ভোগ, ক্ষোভ ও তিতিক্ষা, লোভ ও ক্ষান্তি প্রভৃতির দ্বন্দই চরিত্র দুটোতে কবি সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করেছেন। মানবমনের বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বরূপ উদঘাটনে কামবিষের জ্বালা রূপায়নে কাজী দৌলত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারের ও সুভাষিত বুলির প্রয়োগে ও বহুলতায় মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজী দৌলতের বিরল ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় মেলে।

সতীময়না কাব্যের লোকপ্রচলিত অপর নাম হচ্ছে 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'। সতীময়না কাব্যে উপস্থাপিত চিরন্তন মানবিক সমস্যা আজো তেমনিই রয়ে গেছে। আজো প্রশ্ন জাগে—শাস্ত্র সমাজের, নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের অনুগত থাকার জন্যেই জীবন কিংবা এ সুন্দর পৃথিবীতে ভোগ-উপভোগের জীবনকে অনুভব ও সার্থক কবার জন্যেই জীবনধারণ। ব্যক্তির বা জীবনের জন্যে সমাজ, নাকি সমাজের জন্যে ব্যক্তি বা জীবন! কে ঠকল, জিতলই বা কে ময়না না চন্দ্রানী ?– এ প্রশ্নের সর্বসম্মত উত্তর মিলবে না কখনো। পরিশেষে কাজী দৌলতের ভাষায় সব কথার উৎস মানববন্দনা করেই আমাদের আলোচনা শেষ করছি ঃ

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান।
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান
নর সে পরম দেব মন্ত্রতন্ত্র জ্ঞান।
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।

এ সূত্রে নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম দেখার তত্ত্ব স্মর্তব্য।

---

১. *পুথিতে তিন নামই মেলে, পুথিপরিচিতি ঃ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ দ্রষ্টব্য।*

২. মাগন ঠাকুর

আরাকানরাজ নরপতিগীর (১৬৩৮-৪৫ খ্রীঃ) অমাত্য হিসাবেই মাগন ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। নরপতিগী তাঁর কুমারী কন্যার অভিভাবক করেন মাগনকে। নরপতিগীর ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হলে রাজকুমারীর সঙ্গে মাগন রাজভ্রাতুস্পুত্র সাউদ মেঙদারের বিয়ে দেন এবং তাঁকে সিংহাসন দান করেন। এ সময়ে মাগনকে কৃতজ্ঞ রাজদম্পতি মুখ্যমন্ত্রী বা মহামাত্য করেন। আহত আলাউল যখন হার্মাদদের কবল এড়িয়ে রোসাঙ্গে আশ্রিত হন, তখন এই মাগন ঠাকুরই হয়তো রাজ-অশ্বারোহী পদ দিয়ে সাহায্য করেন, পরে তাঁকে বিভিন্ন কলাবিদ রূপে জানতে পেরে তাঁকে সঙ্গীতশিক্ষক বা কাব্যগুরু হিসেবে গ্রহণ করেন, আর অশ্বারোহী সৈনিকের পদ ছাড়িয়ে আলাউলকে কাব্য অনুবাদে নিয়োগ করেন। 'দুঃখনাশহেতু তান (মাগনের) সঙ্গে দরশন/সতত পোষন্ত আমায় অন্ন-বস্ত্র দানে/তান সভামধ্যে থাকোঁ হৈয়া সভাসদ (পদ্মাবতী)। মাগনের প্রতিপোষণে আলাউল প্রথমে পদ্মাবতী (১৬৫১খ্রীঃ)এবং পরে সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল রচনা আরম্ভ (১৬৫৮খ্রীঃ) করেন। মাগনের যে ১৬৫৮ সনের শেষে বা ১৬৫৯ সনের গোড়ার দিকে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়, তার প্রমাণ প্রতিপোষণের অভাবে আলাউল সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামালের অনুবাদ কর্ম ত্যাগ করে মাগনের পীরভাই দৌলতউজির বা অর্থমন্ত্রী সোলায়মানের প্রতিপোষণ পেয়ে তাঁর আদেশে কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য ' সতীময়না' পূর্ণাঙ্গ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে। এ মাগনের পিতার নামও শ্রীবড়ঠাকুর এবং তিনিও ছিলেন রাজার অমাত্য। বাজ্যপাল সৈন্যমন্ত্রী আছিলেন তাত/শ্রীবড়ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত। (সয়ফুলমুলুক)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুল হক চৌধুরী সূত্রে'[১] কবির বংশধরদের পারিবারিক শ্রুতিস্মৃতি যা জানা যায়, তা এই ঃ

কবি কোরেশী মাগন ঠাকুরের প্রপিতামহ ছিলেন আরব থেকে আগত কোরেশ। তিনি গৌড় হয়ে চট্টগ্রামের চক্রশালায় [চাশখালায়] বসতি স্থাপন করেন। এ চক্রশালায় বা চাশখালায় মাগনেব জন্ম হয়। মাগনের পিতা রোসাঙ্গে গিয়ে রাজকর্মচারীর পদ পান। এবং পিতৃবিয়োগের পব চাশখালা থেকে পরিবার কর্মস্থল রোসাঙ্গে নিয়ে যান। মাগন ও তাঁর ভাই ভিকন এভাবে রোসাঙ্গবাসী হলেন। মাগনও রাজকর্মচারী ছিলেন। যথাসময়ে দু ভাইয়ের মৃত্যুর পরে একজন মাগনপুত্র সুজাউল এবং ভিকনপুত্র মুজাহেদ কোন কারণে এক রাজকর্মচারী মঘকে (আরাকানী বৌদ্ধকে) হত্যা করে রাজরোষ এড়িয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন, এঁদেরই এক পাড়াব্যাপী বংশধর এখন বাস করছেন চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াজিশপুরে [ওর্ফে ফতেনগরে]। মাগনের ভাই ভিকনের রচিত একটি রাধা-কৃষ্ণ পদ মেলে। এঁরই বংশধর রইসউদ্দীনের গৃহ থেকেই ১৯৩৩ সনে আদ্যন্ত খণ্ডিত চন্দ্রাবতী পুথি বন্ধু মারফত সংগ্রহ করেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। এ বংশের আবুল হোসেন চৌধুরীর জন্যেই সুজাউদ্দীন চৌধুরী ঐ পুথির প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। পারিবারিক শ্রুতিস্মৃতিতে মাগনের কোন মুসলিম নাম নেই, নেই তার পিতার, পিতামহের বা প্রপিতামহের নামও।

এর থেকে মাত্র দুটো তথ্য মেলে——চট্টগ্রাম থেকে মাগনের পিতা রোসাঙ্গে গিয়ে রাজকর্মচারী হয়েছিলেন এবং মাগনের সন্তান চট্টগ্রামে পালিয়ে এসেছিলেন আর কবি কোরেশী মাগনের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিও ঐতিহ্য রক্ষার্থে এ বংশ রক্ষা করেছিল।[২]

কোরেশী মাগন রচিত আদ্যন্ত খণ্ডিত চন্দ্রাবতী কাব্যে এগারোটি ভণিতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পাঁচটিতে 'কোরেশী মাগন' এবং ছয়টিতে 'মাগন' নাম মেলে। যেমন—

১. শুন শুন চন্দ্রসেন রাজা গুণধাম
সান্তাইল কোরেশী মাগন গুণনাম।

---

১. চট্টগ্রমের ইতিহাস প্রসঙ্গে, পৃঃ ১০৫-১৪, ১৫১-৫৮।

২. বিস্তৃত আলোচনার জন্যে মৎসম্পাদিত 'চন্দ্রাবতী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. রচিল পাঞ্চালী ছন্দে কোরেশী মাগন।
৩. ক্ষেমাত সদয় প্রভু কহিল মাগন।
৪. শুনি উথলিয়া দুঃখ কান্দএ মাগন।

প্রথম ভণিতায় 'কোরেশী মাগন গুণনাম' কথার সাজ অর্থ মাগন বা 'কোরেশী মাগন' সাধারণ্যে তার ডাকনাম বা প্রচলিত নাম–এটি তাঁর ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পৃক্ত পোশাকী নাম নয়। অতএব গুণনাম 'মাগন' আর কুলনাম 'কোরেশী' ছাড়াও তাঁর একটি পোশাকী নাম ছিল। টোনা ঠাকুর, হাবুত রোয়াজা, শেখ পরাণ, হারি, গাভুর ঠাকুর, হিরাগাজি, আজিজ খাঁ রোঁয়াঝা, আলী হোসেন ঠাকুর, মাগন চৌধুরী, জিঠাকুর, নানুরাজা, শেখ চাঁদ, আউলচাঁদ, মনগাজী, তিতাগাজী, দোনাগাজী, মঙ্গলচাঁদ প্রভৃতি নাম পুথিতেই মেলে।[১] আর চাঁদ, সুরজ, কালাচাঁদ, শেখ গোপাল, ধীর আলি, হাঁচি, সিরু, সোনা, মনা, ননা, বাচামিয়া, চুন্নু মিয়া, ছোট্ট মিয়া, ইধা, বুধা, বেচা, শেখ বাবু, শেখ লাল, শেখ পাঁচু, (পাঞ্জু), শেখ কানাই, শেখ বানু প্রভৃতি নাম আমাদের চারপাশে আজো শুনতে পাই–একেবারে বিরল হয়ে যায়নি।

তা ছাড়া আমরা স্থানীয়সূত্রে জানি আরাকানরাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে রোয়াঝা, পাঁঝা, সাধা, ছুয়ান, ঠাকুর, সাদিকনানা প্রভৃতি খেতাব বা পদবীধারীর বংশধর আজো বিদ্যমান। এঁদের নামে পটিয়া থানায় আজো পাঁঝারপাড়া (বরলিয়াগ্রাম) সাধার পাড়া (গৈড়লা গ্রাম) ছুয়ানপাড়া (লড়িহরা) প্রভৃতি রয়েছে। কাজেই মন্ত্রী 'ঠাকুর' উপাধিই পেয়েছিলেন, তাই পিতাপুত্র যথাক্রমে বড় ঠাকুর ও মাগন ঠাকুর নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। আলাউল 'মাগন' নামের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন পদ্মাবতী কাব্যে এবং সে সঙ্গে মাগনের বিদ্যাবত্তারও বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ

এবে তার নামগুণ কর অবধান
রাজসৈন্যমন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর
প্রভুত মাগিয়া পাইল কুলদীপ শূর .....
তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ....

এর সঙ্গে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও রয়েছে

মান্যের 'ম'-কার আর ভাগ্যের 'গ'-কার
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল 'ন'-কার
এ তিন অক্ষরে নাম 'মাগন' সম্ভবে।

সয়ফুলমুলুকেও পাই 'মহাদেবী' [মাগনের মাতা] মাগি পুত্র পাইলা প্রভুস্থান
ঠাকুর মাগন নাম থুইলা তেকারণ।

অতএব মুসলিমের নাম 'মাগন' হতে পারত এবং বোসাঙ্গে খেতাব 'ঠাকুর'ও যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। মাগনের জন্ম 'মহাসত্ত্ব মুসলমান [১ম খলিফা] সিদ্দিকের বংশে। সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা জাত।' এবং তিনি ছিলেন 'নানাগুণে পারগ মহন্ত কুলশীল।' আর তাঁর বিদ্যাবত্তা এরূপ ঃ

আরবি ফারসি আর মঘী হিন্দুয়ানী
নানা শাস্ত্র পারগ সঙ্গীতজ্ঞাতা গুণী।
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা
শিল্পগুণ মহৌষধি নানাবিধ শিক্ষা।

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিকের বংশধর হলে যুগপৎ কোরেশী ও 'শেখজাদা' হওয়া চলে। আর এতো বিদ্যা যাঁর এবং যিনি আলাউলের সঙ্গীত ও কাব্য শিষ্য তাঁর পক্ষেই সম্ভব 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা। হয়তো মাগন ঠাকুর সংকোচবশে তাঁর কাব্য রচনার কথা গোপন রেখেছিলেন। কিংবা আলাউলের পদ্মাবতী রচনাকালে এ কাব্য রচিত হয়নি এবং সয়ফুলমুলুক রচনাকালে রচিত হলেও মাগন তা মৃত্যুর আগে সাধারণ্যে জানান নি। তাই আলাউলের গ্রন্থ দুটোতে মাগন প্রসঙ্গে

---

১. *পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৩৯, ৬১, ১০১, ১০৮, ১১১, ১৩৮, ২৪২, ৩৬৬-৬৭, ৪৭১, ৫০৬, ৫৭৯, ৫৯৪ প্রভৃতি।*

মাগনের কাব্যের উল্লেখ নেই। আলাউল যখন যাঁর আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, তখন কেবল তাঁরই প্রশস্তি গেয়েছেন, এ জন্যে আলাউলের অন্যগ্রন্থেও এ কাব্যের উল্লেখ নেই।

মাগন ঠাকুরের পীর ছিলেন শাহ মাসুম, মন্ত্রী সোলায়মান ছিলেন মাগনের পীরভাই। কাজেই আলাউল পীর হিসেবে গুরু ছিলেন না, সঙ্গীতশিক্ষক কিংবা কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রেরই উস্তাদ ছিলেন। আলাউলের উক্তি 'আহ্মারে বুলিয়া গুরু কর অবধান।' আলাউলের প্রতি মন্ত্রী সৈয়দ মুসার উক্তি '(মাগন) আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন।' মাগনের কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি যদি পাওয়া যায়, তা হলেই কেবল তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাবে। কেননা, রাজপ্রশস্তি, আত্মকথা প্রভৃতি প্রথাসিদ্ধ বিষয়গুলো তাঁর কাব্যেও থাকার কথা। উপযুক্ত সব তথ্য ও তত্ত্ব জেনে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক কবি কোরেশী মাগন ও মন্ত্রী মাগন ঠাকুরকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেছিলেন। তাদের মতে ঃ

ক. মন্ত্রী কোরেশী মাগন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কলারসিক ছিলেন, কাব্য রচনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

খ. ফাতেমীয়রা ছাড়া কোরেশগোত্রের অন্যান্য শাখার লোকেরা সাধারণত 'শেখ' নামে পরিচিত। মন্ত্রী মাগন কোরেশ গোত্রের খলিফা আবুবকর সিদ্দিকী বংশীয় শেখজাদা। কবি মাগনও কোরেশবংশ সম্ভূত বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অতএব, নামে উভয়েই অভিন্ন।

গ. মন্ত্রী মাগনের নামকরণের আলাউল-ব্যাখ্যাত একটি তাৎপর্য আছে। কবি মাগনও বলেছেন এটি তাঁর গুণনাম।

গ. কবি মাগন ভণিতায় দীন, হীন, অধীন প্রভৃতি বিনয়জ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহার করেননি, এটিও রাজমন্ত্রী সুলভ পদ-চেতনার ফল।

ঙ. 'ঠাকুর' রাজপ্রদত্ত উপাধি বলেই কবি মাগন তাঁর নামের সঙ্গে 'ঠাকুর' যোগ করেননি।[১]

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে মাগনপরিচিতি বিভ্রান্তিকর।[২] তথ্যের স্বল্পতাই এ বিভ্রান্তির কারণ।

কোরেশী মাগনের চন্দ্রাবতী কাব্যটি দেশী রূপকথাভিত্তিক। এর সঙ্গে ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত কবি ওয়াজীর দাখিনী উর্দু কাব্য 'কুতুব মশ্‌তরী'র[৩] নাকি কাহিনীগত ঐক্য আছে। এতে রূপকথার সব বৈশিষ্ট্য তো আছেই তার উপর রয়েছে প্রণয়কাব্যের দেশীবিদেশী সব উপাদান। এখানে ভোজবিদ্যা বলে মানুষকে পাখি করে রাখা, চিত্রদর্শনে প্রেমে পড়া, ঝড়, সাপ, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির কবলে পড়া এবং অরণ্য থেকে অপহৃতা পাত্রকন্যা উদ্ধার করা, দুষ্মন্তের মতো স্মৃতিভ্রষ্টতা, সাহসী, অনুগত ও বুদ্ধিমান মন্ত্রীপুত্রের সাহচর্য প্রভৃতি আর উপকাহিনীরও সমাবেশ রয়েছে। এ উপাখ্যানে কিছু অনন্যতাও রয়েছে—এখানে অপহৃতা হয়েছে পাত্রকন্যা, রাজকন্যা নয়, অপহরণকারীও রাক্ষস বা দৈত্য নয়—যক্ষ, এখানে নায়কের পথের শত্রুও বাঘ, সিংহ, রাক্ষস বা দৈত্য নয়,—মুখ্যত নাগ।

ভদ্রাবতীনগরের চন্দ্রসেন রাজার বীরপুত্র বীরভান। সে 'সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ইন্দ্রের সমান'। মন্ত্রী সঞ্জয়ের পুত্র 'সুত' ছিল তার আবাল্য বন্ধু। সরন্দ্বীপরাজ শূরপালের রূপসীকন্যার নাম চন্দ্রাবতী। বীরভানের রূপগুণের কথা শুনেই এবং তার চিত্রার্পিত রূপ দেখেই সর্বদা 'কুমারের রূপ ধ্যান করে গুণযুতা'। এবং বীরভানকে পতিরূপে পাবার জন্যে 'চন্দ্রাবতী আরাধএ দেবত্রিলোচন'। চন্দ্রাবতীর সখী চিত্রাবতী রূপসী চন্দ্রাবতীর এক মনোরম আলেখ্য তৈরি করে তাতে চন্দ্রাবতীর নামধাম লিখে সে নিজেই 'উড়া দিল লইয়া চিত্ররূপ'। এবং ঘুমন্ত 'কুমারের বুকে নিয়া রাখিল স্বরূপ'। তারপর যেমনটি ঘটে, জেগে কুমার ওই চিত্রপট দেখে রূপবতী কন্যার সন্ধানে বিবাগী হয়ে ছোটে,

---

১. *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৩০-৩৩।*

২. *বা. সা. ই. ১মা অপা ৩য়, পৃঃ ৩০০, ৩২৬, ৩৩৫, ৩৪২-৪৩।*

৩. *বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস (১ম সং), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, পৃঃ ২৬৭।*

নাগের-বাঘের-যক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে জয়ী হয়ে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিক্রম করে, ষড়যন্ত্র দুঃখ-বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে চন্দ্রাবতীকে লাভ করবে। পুথি খণ্ডিত হলেও আভাসে বোঝা যায় রূপবতীর সঙ্গে সুতের এবং চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বীরভানের বিবাহোৎসবেই উপাখ্যান সমাপ্ত।

কবিত্বে পাণ্ডিত্যে মাগন প্রথম শ্রেণীর একজন নন বটে, তবে তাঁর ভাষা সুন্দর ও সুবিন্যস্ত, ভঙ্গি ঋজু এবং কাব্যটি বিভিন্ন রসের ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশের দরুন সুখপাঠ্য। দেশী ঐতিহ্যসম্মত উপকরণে ও আদর্শে তিনি সুপ্রাচীন দৈশিক রীতিতে নির্মাণ করেছেন এ কাব্যসৌধ।

রোসাঙ্গের কবি আবদুল করিম খোন্দকার, আইনুদ্দীন সম্বন্ধে ধর্মসাহিত্য অধ্যায়ে এবং আবদুল গণি সম্বন্ধে জ্যোতিষ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

চন্দ্রাবতী কাব্যে চিত্রিত সমাজপ্রতিবেশ ঃ

বলেছি 'চন্দ্রাবতী' দেশে প্রচলিত প্রাচীন রূপকথা-ভিত্তিক রচনা। তাই এ কাব্যে হিন্দু সমাজের আবহই দৃশ্যমান।

ক. হিন্দু নায়িকা চন্দ্রাবতী তাই পতিকামনার 'আরাধএ দেবত্রিলোচন'। এবং স্বয়ম্বরা হওয়াই রীতি।

খ. চন্দ্রাবতীর সখী চিত্রাবতী কেবল যে চিত্রশিল্পে নিপুণা তা নয়, ভোজবিদ্যায়ও পটু, আকাশেও উড়ে সে। অন্যত্র 'শুন কন্যা তিলিচমাত শঙ্কর বাখান।'

গ. অশ্ববিরলদেশে রাজপুত্র চলে গজারোহণে।

ঘ. এখানকার গিরি-সিন্ধু কান্তারে থাকে নাগ, রাক্ষস, দানব ও যক্ষ। পরী ও দৈত্যকন্যার পরিবর্তে পাই গর্ন্ধব ও রাক্ষস কন্যা।

ঙ. এখানকার গাছে গাছে মেলে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, গৃধ-গৃধিনী।

চ. বৌদ্ধতন্ত্র-মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীর দেশে অসাধ্য সাধন করে মন্ত্রপূত ধনুর্বাণ ও মুনিমন্ত্র। অর্ধচন্দ্রবাণ, গরুড়বাণ, বিষ্ণুচক্রবাণ, গাণ্ডীব প্রভৃতিই হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র।

ছ. পর্তুগীজ প্রভাবকালে রচিত উপাখ্যনে আমরা দেশী নৌকার নাম পাইনে, পাই জালিয়া, গোরাব প্রভৃতি পর্তুগীজ ডিঙ্গার নাম।

জ. এখানে রাজা সত্যবাদী, আর ধার্মিকের আদর্শ ব্যাস ও যুধিষ্ঠির 'ধর্মবাদী জিতিনিত্য ব্যাস যুধিষ্ঠির'।

ঝ. নায়ক-নায়িকা ও মঙ্গলপাঁচালীর সেই শাপভ্রষ্ট দেবসন্তান। বীরভান ও চন্দ্রাবতী 'শিব বরে দুইজন মর্ত্যেত আসিয়াছে'। এবং নায়কের যখন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন ইষ্টদেবতা স্বয়ং মর্ত্যে এসে করেন ত্রাণের ব্যবস্থা ঃ

শিব বোলে শুনহ কুমার বীরভান
ধনুত জুড়িয়া মার বিষ্ণুচক্রবাণ।
এ বুলিয়া চক্র সঙ্গে মন্ত্র শিখাইল
এবং তারপর 'অলক্ষিতে শিবদুর্গা অন্তর্ধান হৈল।

ঞ. চার বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রই সমাজের নিয়ামক।

তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালী

সে-যুগে বুদ্ধি, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরীক্ষার বিষয় ছিল তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালী। রাক্ষসের এরূপ প্রশ্নের ও পাত্রপুত্র সুতের উত্তরের কিছু নমুনা ঃ

১. কেবা তুমি বসিয়াছ কার তুমি বশ ?–যোগরস মৃত্তিকাতে বসে আছি পবনের বশ।
২. সঙ্গতি তোমার বোল কেবা আছে মিত ?–সঙ্গে মোর মিত্র আছে বিদ্যাগুণধর।
৩. চন্দ্র সূর্য হোন্তে বড় কার জুতি আছে ? –আঁখি হোন্তে পৃথিবীত জুতি আছে কার।
৪. চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র পড়ে কি কারণ ?–শাস্ত্র পড়ে হিত বিপরীত বুঝিবার।

৩. আলাউল

কবির নাম আলাওল বা আলাউল। বটতলার বুদ্ধিমান প্রকাশকরাই কবিকে কাদেরী শাখার সূফী জেনে সূফী দরবেশেব যোগ্য বিশেষণগুলো বসিয়ে 'শাহ সূফী সৈয়দ আলাওল' বানিয়েছে। ঈশান নামের এক কবির রচনায় আলাউল নাম পাওয়া গেছে, নুব কুত্‌ব-ই-আলমের পিতার নাম ছিল আলাউল হক, ভুইয়া ঈসা খানের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নামও ছিল আলাউল খান, অতএব কবির অবিকৃত নাম আলাউল এবং লোকমুখে ও লেখনীমুখে আলাওল হয়েছে—যেমন আতাওল ইমাওল রেজাওল বদিওল হয়।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং লোকশ্রুতিতে আলাউল বহু গ্রন্থপ্রণেতা মহাকবি আর বিরল প্রতিভার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আলাউলের এ খ্যাতির উৎস তার 'পদ্মাবতী' কাব্যের প্রথমাংশের কয়েক পৃষ্ঠার কাব্যসৌন্দর্য। জেনে অনুরক্ত হওয়ার চেয়ে শুনে ভক্ত হওয়া সহজ। আলাউলের খ্যাতি বিস্তারের ক্ষেত্রেও লোকের হুজুগপ্রিয়তার পরিচয়ই রয়েছে—রসিক পাঠকের মুগ্ধতার আভাস নেই।

আলাউল মুখ্যত অনুবাদক। পদাবলীই তাঁর মৌলিক রচনা আর রাগতালনামা প্রচলিত সঙ্গীততত্ত্বের রূপায়ণমাত্র।

'আনন্দবর্মা রতনকলিকা' গল্পটি সম্ভবত দেশজ রূপকথারই অনুসৃতি। কাজেই অনুবাদক হিসেবেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দানের মূল্যায়ন করতে হবে।

আমরা আবেগ বশে আলাউলকে সৃজনপটু কবি হিসেবে উচুঁ আসন দিতে চাই। এতে তাঁর মান বাড়ে না, কেননা মূল কবির পাশে তিনি অনেকক্ষেত্রে ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়েন। আলাউলের কৃতির মূল্যায়ন কালে তিনি যে অনুবাদক সেকথা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আলাউল বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত কবি। বাঙলা, মৈথিল, ব্রজভাখা, ঠেট, খাড়িবোলি প্রভৃতি বিভিন্ন উত্তরভারতীয় উপভাষায়, আরবিতে, ফারসিতে এবং সংস্কৃতেও তাঁর যুগদুর্লভ ব্যুৎপত্তি ছিল। তা'ছাড়া যোগে-তন্ত্রে তাসাউফেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। কাব্যক্ষেত্রে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণই প্রমাণ করে সে-যুগের আরবি-ফারসি হিন্দি-সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যুগোপযোগী পরিচয়ও ছিল গভীর ও ব্যাপক। কাব্যতত্ত্বে, ছন্দবিজ্ঞানে আর অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান অনিন্দ্য। কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দও তিনি বাঙলায় প্রয়োগ করেন। আর সঙ্গীতশিক্ষকরূপেই রোসাঙ্গে তাঁর পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সত্য বটে উপাখ্যান-প্রেমী কবি আলাউলের মন রূপকথাপ্রবণ। তাই উপাখ্যানে রোমান্স সৃষ্টির যতটুকু লক্ষ্য তিনি রেখেছেন, ততটুকু দৃষ্টি দেননি বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা, মানবিকতা বা চরিত্র চিত্রণের দিকে। অবশ্য এক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতাও সীমিত। তাছাড়া যুগগত সাহিত্যাদর্শ বা সাহিত্যচেতনাও এ সূত্রে স্মর্তব্য।

মধ্যযুগের গ্রাম্যতার প্রতিবেশে [পদাবলী ব্যতীত] রচিত পাঁচালী কাব্যের যুগে যে অপরিশীলিত রুচির একটা ছাপ ছিল অধিকাংশ কবির ভাষায়, তার থেকে মুক্ত হওয়ার সচেতন প্রয়াস দেখি আলাউলের কবিভাষায়, যে প্রয়াস পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করি ঘনরামে ও ভারতচন্দ্রে। ব্যঞ্জনাঋদ্ধ ধ্বনিসুষমাযুক্ত সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারে ছিল তাঁর প্রবণতা। পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা এর সাক্ষ্য ঃ যখন পবিপূর্ণ প্রৌঢ় বয়সে তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেন তিনি দেহ আত্মার প্রযত্নে ও একাগ্রতায়। নিজেই বলেছেন ঃ

আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী
যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি।

এবং পদ্মাবতীতে 'স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি'।

দেশকাল নিরপেক্ষ সূফীভাবের তথা জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেম ও অভেদতত্ত্বের রূপক হিসেবে হিন্দি ও ফারসি উপাখ্যানগুলো রচিত। শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলতউজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, আলাউল প্রমুখ সব উপাখ্যান অনুবাদকই বাঙলায় রূপকথার সে-রূপক বর্জন করেছেন অনুবাদকালে। তার কারণ এঁরা প্রতিপোষকের অবসরকালীন সবান্ধব উপভোগের উপকরণ

হিসেবেই কাব্যগুলো অনুবাদ করেন এবং সাধারণ সাক্ষর ও নিরক্ষর জনগণের প্রণয়-রসগ্রাহী মানসের তৃষ্ণা মিটানোরই আয়োজন করেছিলেন এভাবে—তত্ত্বকথা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের রূপক সাধারণের কাম-প্রেম-রস উপভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। সেকালের প্রতিবেশে সাহিত্যে জীন-পরী মানুষ-রাক্ষস-দৈত্য নির্বিশেষে সবাই ছিল প্রেমকাঙাল ও প্রেম-প্রত্যাশী। এ হচ্ছে সাধারণ শাস্ত্রশাসিত সমাজ নিয়ন্ত্রিত বঞ্চিত মানুষের আকাঙ্ক্ষারই বিম্বিত রূপ। তাই এখানে বিশ্বজগতের শক্তিমান প্রাণীমাত্রই প্রেমিক। যেহেতু নারীও ছিল উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী বীরের ভোগ্যা, সেজন্যেই শক্তিমান রাক্ষস জীন-দৈত্য আর রাজপুত্র এসেছে নায়ক রূপে, সুন্দরী জীন, পরী ও রাজকন্যা হয়েছে আদর্শ নায়িকা। এ কারণে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে সহজ বিচরণে কিংবা সমুদ্র-অরণ্য পর্বত অতিক্রমণে দেব-দৈত্য-রাক্ষস-মানুষের স্থান-কাল-জাত-বর্ণ ধর্মের কোন বাধা নেই। সে-জগতে সাপ হয় শত্রু, বাঘ হয় অরি, দেব-দৈত্য-রাক্ষস হয় প্রতিদ্বন্দ্বী, আবার দেবতা-মৎস্য-পক্ষী হয় সহায়, যোগী বাতলায় বুদ্ধি। এমনি রূপকথার জগতেও তবু আলাউদ্দীনের অন্তর্দাহী জ্বালাধরা সর্বধ্বংসী রূপমুগ্ধতা এবং তজ্জাত ক্রুরতা, নির্মমতা এবং পরিণামে মহৎ চেতনায় ও চিত্রপ্রশান্তিতে উত্তরণ, পদ্মিনীর স্বাজাত্য, সতীত্ব ও অকুতোভয়তা, গোরা-বাদলের মর্যাদাবোধ, বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যচেতনা আমাদের মুগ্ধ করে। জীন-মানুষের প্রণয়োপাখ্যান সয়ফুলমুলুকেও সায়াদের আনুগত্য, বন্ধুপ্রীতি, আন্তরিকতা ও নির্ভীকতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আনন্দবর্মা, রতনকলিকা, দারা, সিকান্দর প্রভৃতি চরিত্রও একেবারে তুচ্ছ নয়। আলাউলের বহু উক্তি সুভাষিত বুলি, আপ্তবাক্য বা প্রবচন রূপে স্বীকৃত হবার যোগ্য, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেগুলো মুখে মুখে চলেও খুব। সর্গশীর্ষের শ্লোকই প্রমাণ করে আলাউল সংস্কৃত জানতেন, পদ্মাবতীর অনুবাদেই বোঝা যায় তাঁর হিন্দি জ্ঞান, পঞ্চভাষার (আরবি ফারসি পহলবী হিব্রু ও আর্মানীয়) শব্দ মিশ্রিত কাব্য 'সিকান্দরনামা' অনুবাদই তাঁর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য। তিনি নিজে কাদেরিয়া শাখার সূফী ছিলেন, দেশ কালের প্রভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ যোগে তন্ত্রে দেহতত্ত্বে ও মুসলিম তাসাউফে তাঁর ছিল সমান ব্যুৎপত্তি। তবু শরীয়তে তাঁর অবহেলা ছিল না, তোহফার অনুবাদই তার প্রমাণ। ধর্মেও তাঁর সুমতি ছিল, তাঁর শাস্ত্রনিষ্ঠার, অধ্যাত্মতত্ত্বে জ্ঞানের ও ধার্মিকতার আর অধ্যাত্মসিদ্ধির স্বীকৃতি রয়েছে পীরের খিলাফৎ প্রাপ্তিতে।

সামন্তঘরের রাজকীয় আবহে লালিত হয়েছিলেন বলে পলো, পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় যেমন তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল, তেমনি সঙ্গীতশাস্ত্রী সঙ্গীতরচক ও গায়ক হিসেবেই হয়েছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠিত ও প্রখ্যাত। সঙ্গীতশিক্ষক রূপেই তিনি অমাত্যগৃহে প্রবেশাধিকার পান এবং তাঁর নানা গুণগ্রামের পরিচয় পেয়ে অমাত্যরা তাঁকে আদর-কদর করতে থাকেন। মাগনঠাকুরের বিদ্যাবত্তার যে বর্ণনা আলাউল দিয়েছেন, তা আলাউলের প্রতিও প্রযোজ্য ঃ

আরবি ফারসি আর মঘী হিন্দুস্তানী
নানাগুণ পারগ সঙ্গীত জ্ঞাতা গুণী।
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা।

আলাউল তাঁর সর্বগ্রন্থেই অল্পবিস্তর আত্মকথা বলেছেন। এগুলোর মধ্যে সমকালীন রাজার নাম, আদেষ্টার পরিচিতি প্রভৃতি রয়েছে। পিতার কর্মস্থলেরও উল্লেখ আছে, নেই কেবল আমাদের বাঞ্ছিত অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য অর্থাৎ কবির পিতার নাম ও পিতৃভূমির ঠিকানা। তাই আলাউলের জন্মভূমি নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। এ বিতর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি ও অনুমানই তাঁদের সম্বল। আলাউল-পরিচিতির উৎস তাঁর আত্মকথাগুলো পরে উদ্ধৃত করেছি। এখানে কেবল প্রাপ্ত তথ্যগুলোই বিন্যস্ত করে দিচ্ছি, এ থেকেই আলাউলের বহির্জীবন জানা যাবে, আর তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয়তো তাঁর কাব্যেই ফাঁকে-ফুকুরে সুপ্রকটিত।

রাজ পরিচিতি

মারাকানের রাজবংশের ও রাজাদের প্রাসঙ্গিক অংশের পরিচয় ছকে এরূপ ঃ

সলিম শাহ্‌র বংশ

মিনাইয়াজা বা মেঙরাজা (১৫০১-২৩ খ্রী)

কাসাবদি বা কাসাপতি (১৫২৩-২৫)　　মেঙবেঙ বা মিনিবিন (১৫৩১-৫৩)

দিখা (১৫৫৩-৫৫)　　মেঙফালঙ ওর্ফে সিকান্দরশাহ (১৫৭১-৯৩)

সাউলা (১৫৫৫-৬৪)　　মেঙচৈত্য (১৫৬৪-৭১)

মেঙইয়াজাগী ওর্ফে সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খ্রী)

মেঙখামঙ ওর্ফে হোসেন শাহ্ [১৬১২-২২]

থিরিথুধম্মা

[এ বংশের অপর দুই শাখার মেঙসাঙ (১৫২৫) এবং খাতাসা (১৫২৫-৩১) ছয়বছর রাজত্ব করেন। থাতাসার প্রপৌত্র নরপতিগী ছিলেন থিরিথুধম্মার মন্ত্রী। রানীর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রণয়। শিশু মেঙসানিকে (১৬৩৮) হত্যা করে রানী নপতিগীকে রাজা হবার সুযোগ দেন।]

নরপতিগী বা নরবদিগী [১৬৩৮-৪৫]

কন্যা-সাউদ মেঙদার [নরপতিগীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা] [১৬৪৫-৫২]　　থিরিথুধম্মা (১৬২২-৩৮)

থিরিসান্দথুধম্মা (শ্রীচন্দ্রসুধর্মা) (১৬৫২-৮৪)　　মেঙসানি (১৬৩৮/২৮ দিনের রাজত্ব)

থিরিথুরীয় (১৬৮৪-৮৫)　　বড়ধম্মরাজা (১৬৮৫-৯২)　　মুনিয় ধম্মরাজা (১৬৯২-৯৪)　　সান্দথুরীরয়ধম্ম (১৬৯৪-৯৬)

নঙরাতজ (১৬৯৬ খ্রী)

আরাকান থাতাসার (১৫২৫-৩১ খ্রীঃ) প্রপৌত্র এবং থিরিথুধম্মার (শ্রী সুধর্মার) জ্ঞাতি নরবদিগী (নরপতিগী) থিরিথুধম্মার মন্ত্রী ও লঙ্গিয়েতের সুবাদার ছিলেন। থুধম্মার পত্নী নাৎসনিমে-এর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রণয়। উভয়ের ষড়যন্ত্রে থিরিথুধম্মার মৃত্যু ঘটে। তারপর থুধম্মা-নাৎসিনমে-এর অসুস্থ শিশু সন্তান মেঙসানি মাত্র আটাশ দিন রাজা থাকেন। মায়ের কারসাজিতে অসুস্থ শিশুরাজার মৃত্যু হয়। এর পর নরবদিগীই (১৬৩৮-৪৫ খ্রীঃ) আরাকানের সিংহাসন দখল করেন।

অপুত্রক নরবদিগী বা নরপতিগীর ছিল একটিমাত্র কন্যা। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু আশঙ্কায় কাতর রাজা কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ভেবেচিন্তে চরিত্রবান বিশ্বস্ত অমাত্য মাগনঠাকুরকে কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত করে রাজা নিশ্চিন্ত হন।

নরপতিগীর মৃত্যুর পরেই মাগন ঠাকুর নরপতিগীর ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমেঙতার বা সাদউ মেঙদারের সঙ্গে নরপতিগীর কন্যার বিয়ে দেন এবং জামাতা হিসেবে সাদাউ মেঙদার সিংহাসন পান।

১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে সাদউ মেঙদারের মৃত্যু হলে পাত্রদের অনুরোধে রানী (ঈশ্বর দুহিতা তুমি ঈশ্বর বণিতা) শিশুপুত্র থিরিসান্দ থুধম্মার তথা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার (১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ) নামে মাগনের সহায়তায় রাজ্য শাসন করতে থাকেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার হাতেই ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে শাহজাহান পুত্র সুজা নিহত হন। এঁর রাজত্বকালেই আলাউল 'পদ্মাবতী' ব্যতীত অপর গ্রন্থগুলো রচনা করেন।

পদ্মাবতী রচনাকালে নবাগত আলাউল সাদউ মেঙদারের যথার্থ পরিচয় জানতেন না। তাই তিনি সাদউ মেঙদারকে নরপতিগীর পুত্র মনে করে পদ্মাবতীতে বলেছেন ঃ

সলিম শাহার বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগৃহ (নরপতিগী) হৈল রাজ্যপাল—
একপুত্র এককন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব।
সাদউ মেঙদার নাম রূপেগুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেখ।

আবার বছর আটেক পরে (১৬৫৮ খ্রীঃ) সয়ফুলমুলুক রচনাকালে কবির এ ভুল ভাঙে। তখন তিনি বলেছেন ঃ

নৃপতিগিরির কন্যা পরমাসুন্দরী
সাদউমেঙ নৃপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী।
সাদউমেঙদার যদি গেল পরলোকে
ব্রতধর্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে।
শ্রীচন্দ্রসুধর্মা নৃপতি শিশু দেখি
সকল অমাত্যগণ হৈল একমুখী.....।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তর ....
পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি
ঈশ্বর দুহিতা তুমি ঈশ্বর ভণিতা।[১]
তোমা বিনু কেবা আছে ঈশ্বর পালয়িতা।

শিশুপুত্রের পক্ষে—

পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন।

এবং

'তাহান অমাত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মাগন
শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ।
যথেক সম্পদ ধন দুহিতাকে দিলা
তান (মাগনের) হস্তে আনিয়া সকল সমর্পিলা
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈলা যশস্বিনী
মুখ্যপাত্র হইলা মাগন গুণমণি।[২]

পিতৃনিযুক্ত অভিভাবক মাগনকে বিধবা রানী মুখ্যপাত্র বা প্রধানমন্ত্রী করে তাঁর সাহায্যে সন্তানের পক্ষে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। বিদ্বানদের সংশয় বিমোচন কল্পে এখানে মাগনেরও বিস্তৃত পরিচয় দেয়া দরকার।

রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর
প্রভুস্থানে মাগী পাইল প্রার্থনা করি
তেকারণে (পুত্রের) মাগন ঠাকুর নাম ধরি .....

মুসলিম সৈন্যমন্ত্রী শ্রীবড় ঠাকুরের পুত্র মাগন ঠাকুর ছিলেন নরপতিগীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী এবং নানাগুণে গুণী। এহেন মাগনকেই বৃদ্ধ রাজা নরপতিগী অল্পবয়স্কা কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত করলেন, যাতে বৃদ্ধ রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে কন্যার কোন বিপদ না ঘটে। এ তথ্যের আলাউল পুনরাবৃত্তি করেছেন এভাবে

কন্যার শৈশব দেখি ভাবে নরপতি
তাহাকে (মাগনকে) আনিয়া রাজা কন্যা সমর্পিল।
বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী।
এই কন্যা হৈল জান মুখ্য পাটেশ্বরী।
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহভাবি
মুখ্যপাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী।[৩]

এতে একটা সত্য উদঘাটিত হচ্ছে। থদোমেঙতার বা সাদউ মেঙদারের বিবাহ কালে ও সিংহাসনে আরোহণ সময়ে (১৬৪৫ খ্রীঃ) আলাউল রোসাঙ্গে পৌছেন নি এবং লোকস্মৃতিতে বিবাহ ও রাজ্যাভিষেকের উৎসব ম্লান হয়ে আসার পরে তিনি রোসাঙ্গে উপস্থিত হন, তাই রাজাকে রাজপুত্র বলে মনে করেছেন, আবার লোকমুখে রাণী রূপিণী রাজকন্যার প্রভাবপ্রতিপত্তির কথাও শুনেছেন, অথচ উভয়ের প্রকৃত সম্পর্ক নবাগত কবি বুঝতে পারেননি। মনে করেছেন রাজা ও রাজকন্যা ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী নন ঃ

'বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী
এই কন্যা হৈল জান মুখ্য পাটেশ্বরী'।

আমাদের অনুমান আলাউল ১৬৪৭-৪৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে রোসাঙ্গে উপস্থিত হন।

আলাউল পরিচিতি

আজ অবধি আলাউলের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যত প্রশ্ন উঠেছে এবং যতরকমের বিতর্ক রয়েছে আমাদের নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি যোগে তথ্য-প্রমাণ প্রয়োগে আমরা সেগুলো মীমাংসা করতে প্রয়াস পেয়েছি আলাউল রচিত 'তোহফা'র ভূমিকায়।[১] এখানে কেবল তথ্য-প্রমাণে প্রাপ্ত আলাউল পরিচিতি সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

আলাউলের আত্মকথা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতেহাবাদ পরগণার শাসনকেন্দ্র জালালপুর আলাউলের পিতার কর্মভূমি ছিল। তাঁর পিতা পরগনাধিপতি মজলিসকুতুবের অমাত্য তথা উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কবির ভাষায় ঃ

১-৩ *অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যাযের মতে যেহেতু বার্মায় একসময়ে ভাইয়েবোনে বিয়ে চালু ছিল, সেহেতু এ ক্ষেত্রে নরপতিগীর পুত্রে-কন্যায় বিয়ে হয়েছিল। প্রথমত উদ্ধৃত চরণগুলো এক সঙ্গে পড়লে সে অর্থ করা যাবে না, দ্বিতীয়ত সতেরো শতকের মধ্যভাগে আরাকানী বৌদ্ধদের মধ্যে ভাইবোনে বিয়ে চালু ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। তবু উদ্ধৃত তথ্যগুলো দেখে কেউ ভেবেছেন মাগনই রাজকন্যা বিয়ে করেন (সমর্পণ), কেউ মনে করেছেন, রাজকন্যা রাজ্যাংশ পেয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য ঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল পৃঃ ৭৯-৮৪ বাঃ সাঃ ইঃ ২য় সং ৫৭৪-৭৫, ৫৮৪, ...কালক্রম।*

১. *'তোহফা'—আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, শীত সংখ্যা, ১৯৬২ সাল।*

গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ
মধ্যভাগে বহে তার গঙ্গা ভাগরথী .....
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান
মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর
তাহান অমাত্যসুত মুঞি সে পামর।

পিতা জালালপুরে সপরিবারে বাস করলে, জালালপুর আলাউলের জন্মস্থানও হতে পারে— এখন যেমন চাকুরদের সন্তানের জন্মস্থান বাপের কর্মস্থলই। কিন্তু জালালপুরকে কবির পিতৃভূমি বা পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান বলার মতো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে জালালপুর বা ফতেহাবাদ অঞ্চল কবির জন্মভূমি হলে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত ফতেহাবাদ ও পিতার মৃত্যু প্রসঙ্গের মধ্যে কোথাও অবশ্যই উচ্ছ্বসিত উল্লেখ থাকত। কিন্তু বর্ণনায় স্পষ্টত ফতেহাবাদকে কেবল পিতার কর্মভূমি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আলাউল তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আত্মকথায় একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন, তা এই [পিতাপুত্র কোন্ কাজে জলপথে যাচ্ছিলেন তা কিন্তু বলা হয়নি কোন কাব্যেই] ঃ

'দৈবগতি কার্যহেতু যাইতে নৌকাপন্থে
দরশন হইলেক হার্মাদ সহিতে।
শহীদ হইল বাপ বুঝি বহুতর
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ একসর।
রাজ আসোয়ার হৈল এথাত আসিয়া।

পিতাপুত্র কোন্ কাজে জলপথে কোথায় যাচ্ছিলেন তা কিন্তু বলা হয়নি কোন কাব্যেই। হার্মাদের সঙ্গে সংঘর্ষকালে কবির পিতা শহীদ হন। এবং আহত কবি পালিয়ে রোসাঙ্গে গিয়ে পৌছেন আর সেখানে অশ্বারোহী সৈনিক হয়ে জীবিকার সংস্থান করেন। রাজ-আসোয়ার মানে রাজার দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈন্য কি-না আমাদের জানা নেই।

রোসাঙ্গে এ সৈনিকের গুণপনা গুহায়িত রইল না, অচিরেই তিনি সঙ্গীতবিদ ও গায়করূপে সুপরিচিত হলেন এবং সঙ্গীতশিক্ষকরূপেই তাঁর অমাত্যঘরে প্রবেশাধিকার ঘটে। তখন তিনি সৈনিকপদ ত্যাগ করেন।

তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরেরে
অন্ন বস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে।

তারপরে তাঁর কবিত্ব-পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গীতশিক্ষক কবি সম্ভবত গান রচনার মাধ্যমেই এ খ্যাতি লাভ করেন। এবং তিনি তারপর এক এক অমাত্যের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে এক এক কাব্য রচনা করতে থাকেন ১৬৫১ থেকে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি।

বহু গ্রন্থ রচিলুঁ মোহন্ত সব নামে
মোর বাক্য এথা প্রকাশিলুঁ সর্বঠামে।

মধ্যখানে রাজরোষে পড়ে পঞ্চাশদিন কারাবাস করেছেন এবং প্রায় এগারো বছর রাজভয়ে কেউ তাঁকে প্রতিপোষণ দেননি। কবির ভাষায় ঘটনাটি এই ঃ

শাহ্ শুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্রসব (শুজাকে) দিল হতমতি।
আপানর দোষ হন্তে (শুজা) পাত্র অবসাদ

মির্জা নামে- এক পাপী আমারেহ দিল মিথ্যাবাদ।
কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার—

কারাগার- গর্ভবাস (সম) আছিলাম পঞ্চাশ দিবস।
এহি মতে একাদশ (এদশ?) অব্দ গঞি গেল।

এ বিপর্যয়ের পরে বৃদ্ধকালে কবি এগারো বছর আর্থিক দৈন্যে ভুগেছিলেন। তখন তাঁর

'সব ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যায়।'
অস্থানে পড়িয়া পাইলুঁ বহু অবসাদ
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ।......
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র-দারা রাজকর।

তারপরে মহামাত্য নবরাজ মজলিসের প্রতিপোষণে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি 'সিকান্দরনামা' রচনা করেন। এটিই তাঁর শেষ গ্রন্থ। এরপরে কত বছর তিনি জীবিত ছিলেন, আমরা তা জানি না। তবে নিশ্চিতভাবে বলা চলে তাঁর কবি জীবনের শুরু ও শেষ হচ্ছে ১৬৫১-৭৩ খ্রীস্টাব্দ।

আগেই বলেছি আমাদের ধারাণায় আলাউল সাদউমেণ্ডদারের সিংহাসন প্রাপ্তির (১৬৪৫ খ্রীঃ) দু'তিন বছর পরে ১৬৪৭-৪৮ সনের দিকে রোসাঙ্গে উপনীত হয়েছিলেন। পদ্মাবতী রচনাকালে (১৬৫১ খ্রীঃ) কবি প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে ছিলেন। তাই আট বছর পরে ১৬৫৮ সনে সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল রচনারম্ভকালে কবি সখেদে বার্ধক্যের কথা বলেছেন—

আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী
যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি।
বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তিটুটি আসে
যৌবনকালের সম মন না উল্লসে। ....

অন্যত্র— বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হএ।

উক্তো দুটো কাব্যই মাগন ঠাকুরের আগ্রহে রচিত। মুখ্যমন্ত্রী মাগন আলাউলের সঙ্গীতশিষ্য হয়তো বা কাব্যশিষ্যও ছিলেন। এ তথ্য আলাউলের ও সৈয়দ মুসার উক্তিতে নিহিত দেখি ঃ

শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ
আহ্মারে বুলিলা গুরু কর অবধান। .....
মোর মন তোষ এই প্রেমের কথনে
প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুলমুলুক।

মাগনের মৃত্যুতে সয়ফুলমুলুক অসমাপ্ত থেকে যায়, সৈয়দ মুসা তা সমাপ্ত করার জন্যে কবিকে অনুরোধ জানাচ্ছেন এভাবে—

পুস্তকর (সয়ফুলমুলুক) আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন
আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন। ......
বিশেষ সঙ্কটকালে যেই (মাগন) করিছে (কবিকে) রক্ষণ
যোগ্য দরে রাখিয়াছে জুড়িয়া পুথিধন।

আলাউল রাজরোষে পড়ায় অমাত্যদের প্রতিপোষণ হারিয়েছিলেন। দশ-এগারো বছর সপরিবারে দৈন্যের মধ্যে প্রায় অন্নাভাবে কাটিয়েছেন [পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈল পরবশ/ভিক্ষা করি পুত্র-দ্বারা দেয় রাজকর।]

এতে মনে হয় ১৬৭৩ সনের দিকে তাঁর ছেলেরা হয় নাবালেগ ছিল অথবা অযোগ্য ছিল। তাই ভিক্ষাবৃত্তিতে তথা অমাত্যদের অনুগ্রহেই তাঁর পরিবারের অন্নবস্ত্র জুটত। এরা কি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্র! কারণ ছয়ের দশকে আমরা তাঁকে বৃদ্ধ বলে খেদ করতে দেখি। সেকালের নিয়মে তিনি জালালপুরে নিশ্চয়ই বিবাহিত ছিলেন। ফলে দুটো সম্ভাবনার কথা মনে জাগে, হয় রোসাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কবি পত্নী ও সন্তানদের রোসাঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অথবা রোসাঙ্গে বিয়ে করে নতুন সংসার পাতেন। সেকালের প্রতিবেশে দ্বিতীয় অনুমানই গ্রহণযোগ্য। এবং প্রথমা স্ত্রীর সন্তান থাকলে তারা জালালপুরে বাস করতো, অথবা আলাউলের পিতৃ-পুরুষের বাস্তুতে ফিরে গিয়েছিল তা যেখানেই হোক। সিকান্দরনামা সূত্রে প্রমাণ আলাউল ১৬৭৩ সন অবধি রোসাঙ্গশহরে বাস

করতেন। অমাত্যদের দানে কিংবা বৃত্তির অর্থে তাঁর সংসার চলত। এমন মানুষ ১৬৬৬ সন থেকে মুঘলশাসিত চট্টগ্রামে ভাতে মরবার জন্যে আসতেই পারেন না। কাজেই চট্টগ্রামে আলাউলের নিবাস কিংবা বংশধর সংক্রান্ত লোকশ্রুতিতে কোন সত্য নেই। বরং এখনকার পাথুরেকেল্লায় (সাবেক রোসাঙ্গ শহরে) আলাউলের কবর ও মসজিদ রয়েছে বলেও লোকমুখে শোনা যায়। তাছাড়া 'গুলে বকাউলি' কাব্যরচক উনিশ শতকের প্রথমার্ধের চট্টগ্রামের রাউজানের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামের কবি মুকিম পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিদের নামোল্লেখকালে আলাউল সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

'গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাউল নাম।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি যে লোকশ্রুতি চট্টগ্রামে চালু ছিল, তা' অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। অতএব আলাউল চট্টগ্রামের লোক নন, অবশ্য ফতেহাবাদও তাঁর পিতৃভূমি নয়। রোসাঙ্গরাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামের মুসলমানরাই আলাউলের পাঠক ছিল বলেই আলাউলের নাম চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে এ কালের রবীন্দ্র-নজরুলের মতোই উচ্চারিত হতো, এখনো হয়। এ নাম হাউজহোল্ড ওয়র্ড। আলাউলের উক্তি থেকেই বোঝা যায় আলাউলের পিতৃভূমি চট্টগ্রাম ছিল না, ছিল না রোসাঙ্গও। এবং মাগন ও আলাউল একই দেশের লোক ছিলেন না ঃ

মাগন তানদেশী যথেক আলিম গুণবন্ত
মান্য করি আনি নিত্য আদরে পূজন্ত।
মুঞি পরদেশী এক আলাউল হীন—
রোসাঙ্গে পড়িলুঁ আসি আপনা কুদিন। [সয়ফুলমুলুক]

সোলায়মানও— পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আহ্মারে (কবিকে)
অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত আদরে।

আরাকানের রাজধানী আকিয়াবে পাথুরেকেল্লায় আলাউল সম্বন্ধে সেখানকার সাহিত্যে ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে বা জনশ্রুতিতে কোন কিছু মেলে কি-না সন্ধান করা যেতে পারে। এখানে বসে আর কিছু অনুমানের অবকাশ নেই।

এখানে ছকে আলাউলের রচনাবলী সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য দেয়া হল ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	মূল লেখক/উৎস	রচনার নাম	আদেষ্টা অমাত্য	রচনাকাল
১.	মালিক মুঃ জায়সী	পদ্মাবতী	মাগন ঠাকুর	১৬৫১ খ্রীঃ
২.	অজ্ঞাত রূপকথা	রতন কলিকা আনন্দবর্মা আনন্দবর্মা (সতীময়নার পরিশিষ্ট রূপে রচিত)	শ্রীমন্ত সোয়ালমান	১৬৫৯ খ্রীঃ
৩.	আলেফ লায়লা	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল	প্রথমাংশ মাগন ঠাকুর শেষাংশ–সৈয়দ মুসা	১৬৫৮ খ্রীঃ ১৬৬৯ খ্রীঃ
৪.	নিযামী গঞ্জাবী	সপ্তপয়কর	সৈয়দ মুহম্মদ খান	১৬৬৩ খ্রীঃ
৫.	ইউসুফ গদা	তোহ্‌ফা	শ্রীমন্ত সোলায়মান	১৬৬৪ খ্রীঃ
৬.	নিযামী গঞ্জাবী	সিকান্দরনামা	নবরাজ মজলিস	১৬৭৩ খ্রীঃ
৭.	মৌলিক রচনা	রাগতালনামা		
৮.	ঐ	পদাবলী		

পদ্মাবতী—মধ্যযুগের ভারতে যেসব মুসলমান প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবারই ধমনীতে মাতৃ বা পিতৃসূত্রে কিংবা মাতৃপিতৃসূত্রে দেশী রক্ত বহমান ছিল। আমীরখসরুও রাজপুতকন্যার সন্তান। আবদুর রহমান, মোল্লা দাউদ, কুত্তবন, মনঝন, মিয়া সাধন, মালিক মুহম্মদ জায়সী, উসমান, শেখ নবী, কাসিম শাহ, নূর মুহম্মদ প্রমুখ সব উত্তরভারতীয় কবির কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে স্থানীয়। এঁরা নিজেরা দেশজ মুসলিমের বংশধর না হলে দেশীভাষা, ছন্দ, কাব্যের আলঙ্কারিক ঐতিহ্য, গল্প- কাহিনী, লোকশ্রুতি এবং লোকাচার ও শাস্ত্র সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে এঁদের এমন অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হতেই পারত না। এঁদের কারো কারো নাম এবং পরিচিতি আমাদের ধারণার সাক্ষ্য ও সমর্থক। এঁদের উদ্দিষ্ট পাঠকও দেশজ মানুষ। অতএব দেশজ মুসলমান মাতৃভাষায় স্থানীয় বিষয় নিয়ে তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন। তাঁদের অনেকেরই কাব্যের নামকরণও হয়েছে নায়িকার নামেই—মৈনাসত, চান্দায়ন, পদুমাবত, মৃগাবত, ইন্দ্রাবত, মধুমালত, চিত্রাবলী, গুলেবকাউলী। পদুমাবত অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক ফারসি প্রেমকাব্যের প্রভাবজ। ইরানরাজের আশ্রিত হুমায়ুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনকাল থেকেই ভারতের রাজনীতিতে, প্রশাসনে ও সংস্কৃতিতে ইরানিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই ফারসি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাও সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগের শাসকরা ছিলেন উত্তরভারতের বা উত্তরভারত হয়ে আসা মানুষ। তাই বাঙলার শাসকদের লিখিত দরবারী ভাষা গোড়ার দিকে কিছুদিন আরবি ও পরে ফারসি থাকলেও কাজকর্ম চলত উত্তরভারতীয় মিশ্রভাষায়। ফলে শিক্ষিত বাঙালীমাত্রই সেদিনও হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝত, জানত এবং বলতেও পারত, তা ছিল আজকের মতোই লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা তথা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাববিনিময়ের কথ্যভাষা। সে যুগের উচ্চশিক্ষায় দরবারীভাষা ফারসিও ছিল অবশ্য শিক্ষণীয়, শাস্ত্রের ভাষা আরবি বা সংস্কৃতও ছিল অবশ্য পাঠ্য এবং দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে দেশী প্রবাদ, প্রবচন, কিংবদন্তী উপাখ্যান ছাড়াও এদেশের ভাব, চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চিরবাহন সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে, তার ছন্দ-কাব্য-অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রাখতেই হত। লিখিত বাঙলা ভাষা-সাহিত্য আগে গড়ে ওঠেছে সংস্কৃত ও শৌরসেনী প্রাকৃত অবহটঠের আদলে আর মধ্যযুগে প্রভাবিত হয়েছে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের রূপ, রস ও ভঙ্গির দ্বারা। এখন বিকশিত হচ্ছে ইংরেজির প্রভাবে।

আমেঠীতে মালিক মুহম্মদের জন্ম, অযোধ্যার রায়বেরেলী জেলার জায়সনগরে তাঁর দরগাহ বর্তমান। তাঁর মাতৃভাষা আওধী। সম্রাট বাবুরের সময়ে (১৫২৬-৩০) তাঁর আখেরি কালাম নামের গ্রন্থ রচিত এবং সম্রাট শেরশাহের আমলে ৯৪৭ হিজরীতে তথা ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পদুমাবত কাব্যের রচনা আরম্ভ হয়। তিনি চিশতিয়া-নিযামিয়া খান্দানের সূফীসাধক ছিলেন, তাঁর পীর ও মুর্শিদ হচ্ছেন শেখ মুহীউদ্দীন ও শাহমুবারক বুদলা। তিনি তাঁর রূপককাব্যের ভিত্তি করেছিলেন রাজপুতনায় বহুল প্রচলিত এক লোকগাথাকে—রত্নসেন-পদ্মিনী, পদ্মিনী-দেওপাল ও পদ্মিনী-আলাউদ্দিন কাম-প্রেমগাথা। পদুমাবত কাব্যে এ কাহিনী দীর্ঘায়িত ও পল্লবিত হয়েছে। মালিক মুহম্মদ প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তা ছাড়া উত্তরভারতীয় উপভাষার একটা সহজ লালিত্য ও মাধুর্য রয়েছে। সহজ আওধী বুলি ঠেট ভাষায় রচিত গল্পরসপূর্ণ, উচ্চ ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসমন্বিত এ কাম-প্রেমকথা লোকপ্রিয় হয়েছিল। ভাবুকের কাছে এ জীবাত্মা-পরমাত্মাবিষয়ক তত্ত্বের আকর, প্রেমিকের কাছে এ প্রেম ও কামতত্ত্ব, সাধারণ পাঠকের কাছে বাস্তব ঘটনাশ্রিত রসকাব্য। জায়সী তাঁর কাব্যের উদ্দীষ্ট প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্য নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এ অংশ পদুমাবতের বহুপুথিতে মেলে না তাই প্রক্ষিপ্ত বলেও কারো কারো ধারণা।

তন চিতউর মন রাজা কীন্হা
হিয় সিংঘল, বুদ্ধি পদুমিনি চীন্হা।
গুরু সুআজেই পংথ দেখাবা
বিনু গুরু জুগত কো নিরগুণ পাবা।

নাগমতী য়হ দুনিয়া ধংধা
যাঁচা সোই ন এহি বংধা।
রঘব দূত সোই সয়তানু
মায়া আলাউদীং সুলতাননু
প্রেমকথা এহি ভাঁতি বিচারহু।

এ অংশ যাঁরই রচনা হোক, পদুমাবত কাব্যের যথার্থ তাৎপর্য এতে বিধৃত হয়েছে।

আলাউল জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যটির অনুবাদকালে দেশ-কালের চাহিদানুসারে ইচ্ছামত গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন করেছেন, তাই অনুবাদ হয়েছে কোথাও কায়িক বা আক্ষরিক, কোথাও ছায়িক, কোথাও বা ভাবিক। যেহেতু অবসরকালীন চিত্তবিনোদনের জন্য রস-কাব্য হিসেবে কেবল গল্পাংশকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সে-সঙ্গে তত্ত্বপ্রতীক দোহার অনুবাদও প্রায়ই বাদ দেয়া হয়েছে, সেহেতু অনুবাদে কাহিনীও হয়েছে অনেক ঋজু। তাছাড়া অনুবাদ বিচারকালে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে রচিত হাতের লেখা পুথির যে প্রতিলিপি একশ' বছর পরে অযোধ্যা থেকে রোসাঙ্গে আলাউলের হাতে এল, তার পাঠ কিরূপ ছিল এবং কিরূপ থাকা সম্ভব তাও আমাদের আলোচনাকালে স্মরণ রাখা কর্তব্য।

আলাউলের পদ্মাবতী কাহিনীর কাঠামো এরূপ ঃ

সিংহলদ্বীপের রাজা গন্ধর্বসেন, রাণীর নাম চম্পাবতী। তাঁদের পরামাসুন্দরী কন্যা যৌবনবতী পদ্মাবতী তখনো অনূঢ়া। হীরামন নামে পাখির সঙ্গেই সে করে প্রেমালাপ। রাজা এ সংবাদ পেয়ে শুক পাখিকে হত্যার আদেশ দিলেও কন্যার করুণ আবেদনে পাখির প্রাণ রক্ষা পেল। তবু শঙ্কিত পাখি একদিন সুযোগ পেয়ে পালাল। পরে ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে এবং নানা হাত ঘুরে এক সময়ে চিতোররাজ রত্নসেনের হাতে আসে। রাজা হীরামনের মুখে পদ্মাবতীর অসামান্য অতুল্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে পদ্মাবতীর উদ্দেশে গৃহত্যাগ করলেন। তারপর নানা সমুদ্র পার হয়ে দুর্গম সিংহলে উপস্থিত হলেন। রত্নসেন ও পদ্মাবতী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হলেও গন্ধর্বসেন রত্নসেনের সঙ্গে কন্যার বিবাহে রাজি ছিলেন না। অবশেষে হীরামন ও হরপার্বতীর মধ্যস্থতায় বিয়ে হল।

এদিকে পাখির মুখে নাগমতীর দুঃখ-যন্ত্রণার সংবাদ শুনে বিচলিত রত্নসেন পথে নানা ভাবে বিপন্ন হয়েও অবশেষে পদ্মাবতীকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

রত্নসেন তাঁর সভাপণ্ডিত রাঘবচেতনকে যক্ষিণীসিদ্ধ যাদুকর বলে পদচ্যুত করেন। পদ্মাবতী করুণাবশে রাঘবচেতনকে তার একটি কঙ্কন উপহার দেয়। দুষ্ট রাঘবচেতন দিল্লীতে সুলতান আলাউদ্দীনকে পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্যের কথা জানিয়ে পদ্মাবতীকে চেয়ে পাঠাবার জন্যে প্ররোচিত করে। সুলতান সুজার বা সরজার হাতে পদ্মাবতীকে চেয়ে পত্র পাঠালেন রত্নসেনের কাছে। ফলে যুদ্ধ হলো অনিবার্য। বারো বছর ধরে তুমুল যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, শঠতা প্রভৃতি চলল। তুমুল যুদ্ধে গোরা ও বাদল নিহত হল। অন্যদিকে সুলতান আলাউদ্দিনের কারাগারে বন্দী রত্নসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে কুম্ভলনের রাজা দেবপাল কুটনী কুমুদিনীর মাধ্যমে পদ্মাবতীকে পাবার চেষ্টা করে। পরে দ্বৈরথ যুদ্ধে রত্নসেন দেবপালকে নিহত করে প্রতিশোধ নেন। কিন্তু যুদ্ধে আহত রত্নসেনও অচিরে প্রাণত্যাগ করলেন। ফলে তাঁর দুই রানী নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমৃতা হল।

কয়েকদিন পরই সুলতান আলাউদ্দীন চিতোর দখল করে দেখলেন---সব শেষ এবং তখন তিনি দুঃখিত হলেন। কোন কোন পুথিতে আছে তখন অনুতপ্ত সুলতান পদ্মাবতীর চিতা সালাম করে অর্থাৎ মৃতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিল্লীতে ফিরে এলেন। আলাউলের ভাষায় বিষয়-সূত্র এরূপ ঃ

শেখ মোহাম্মদ যতি   যখনে রচিল পুথি
সংখ্যা সপ্তবিংশ নবশত
চিতাওর গড়েশ্বর   রত্নসেন নৃপবর
শুকমুখে শুনিয়া মহত্ত্ব

যোগী হৈয়া নরাধিপ চলিল সিংহল দ্বীপ
ষোলশত কুমার সংহতি
বনখণ্ড বাট উত্তরে সিংহল ঘাট..........
সিংহল দ্বীপেত গিয়া নানাবিধ দুঃখ পাইয়া
বহুযত্নে পাইল পদ্মাবতী।
পক্ষীমুখে শুনি কথা নাগমতী দুঃখবার্তা
পুনি দেশে চলিল নৃপতি
সাগরে পাইয়া ক্লেশ আইলা চিতাওর দেশ
কৈলা বহু উৎসব আনন্দ।
রাঘবচেতন জ্ঞানী অবিমর্ষি কহি বাণী
প্রতিপদে দেখাইল চান্দ।
তত্ত্ব জানি নৃপবর কৈলা তাকে দেশান্তর
যাইতে কৈলা কন্যা দরশন
বহুল আদর মনে করের কঙ্কন দানে
পরিতোষি পাঠাইলা ব্রাহ্মণ।
সোলতান আলাউদ্দিন দিল্লীশ্বর জগজিন
প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিল কন্যার কথা
শুনি হরষিত নৃপবর।
শ্রীজা নামে বিপ্রবর পাঠাইল দিল্লীশ্বর
কন্য মাগি দিল্লীশ্বর স্থানে
পদ্মাবতী না পাইয়া শ্রীজা আইল পলটিয়া
শুনি শাহা ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
বহুল মাতঙ্গ বাজী চতুরঙ্গ দল সাজি
গেল চিতাওর মারিবারে
দ্বাদশ বৎসর রণ তথা ছিল অখণ্ডন
রত্নসেনে ধরিল প্রকারে।
দিল্লীশ্বর পাটে আইল নৃপ কারাগারে থুইল
তাড়না করিলা নানা ভাতি
গোরা-বাদিলা নাম ছিলা রত্নসেন ধাম
মুক্ত কৈল কপট যুকতি।
চিতাওর দেশে আসি বঞ্চিলেক সুখে নিশি
পদ্মাবতী সঙ্গে করি রঙ্গ
দেওপাল নৃপকথা নাগমতী মুখে তথা
শুনি নৃপমন হৈল ভঙ্গ।
সর্বারম্ভে তথা গিয়া দওপাল সংহারিয়া
যুদ্ধক্ষতে আইলা নৃপতি
সপ্তম দিবসান্তর মৈল রত্ন নৃপবর
দুই রানী সঙ্গে হৈল সতী

পুনি সাজি দিল্লীশ্বর আসি চিতাওর গড়
চিতাধূম্র দেখিলা বিদিত
সতীগতি পদ্মাবতী শুনি শাহা মহামতি
মনে হৈল পরম দুঃখিত।[১]

মালিক মুহম্মদ জায়সী ছিলেন কবি-ভাবে অনুপ্রাণিত মৌলিক কবি, তাঁর কাব্যটি তাঁরই দেহ-মন-আত্মা দিয়ে লালিত মানস-সন্তান, আলাউল হচ্ছেন রসমুগ্ধ পাঠক ও অনুবাদক মাত্র—তাঁর ভূমিকা বড় জোর ধাত্রীর। মূলের সৌন্দর্য, লালিত্য ও উৎকর্য অনুবাদে আশা করা যায় না। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে উৎকর্ষ বিচার কবলে অনুবাদের প্রতি অনর্থক অবিচার করা হয়। জায়সী কবি, ভাবুক ও সাধক, তাঁর রচনা আঙ্গিকে চোপঈ ও দোঁহা। আলাউল কাব্যরসিক। আলাউলের রচনা বর্ণনাত্মক। জায়সীর কাব্যে মেলে ভাবসৌন্দর্য ও তত্ত্বকথা, আলাউলের কাব্যে রয়েছে রসমাধুর্য। আলাউল সংস্কৃত শব্দের, ছন্দের ও অলঙ্কারের প্রয়োগে সুষম সুন্দর কাব্যসৌধ নির্মাণে ছিলেন নিষ্ঠ। ঈশ্বরস্তুতি থেকে সিংহলদ্বীপ বর্ণনা বা বিবাহ ও ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি অবধি আলাউলের মৌলিক রচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে, অন্যত্রও তাঁর ব্যবহৃত উপমাদি অলঙ্কারে তাঁর রুচি বুদ্ধির ছাপ সুপ্রকট । আলাউল যে জায়সীকে সর্বত্র অনুসরণ করবেন না, তা তিনি গোড়াতেই বলে রেখেছিলেন 'স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি'।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পদ্মাবতী রচনার কালজ্ঞাপক' যে দুর্লভ চরণটি পেয়েছিলেন তা এই ঃ

যুগ ভুগ ভাব রস শব্দ নিত্য দশা
যেজন তাহাতে বশ পুরিবেক আশা।

প্রথম চরণের দুটো ভাগ [ক] 'যুগ ভুগ ভাব রস' আর [খ] 'শব্দ নিত্য দশা' হরিদাস পালিতের মতে এখানে ১০১৩ মঘী সন উক্ত হয়েছে। অতএব ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে পদ্মাবতী রচিত। পদ্মাবতী রাজা সাদউ মেঙদারের (১৬৪৫-৫২) রাজত্বকালে রচিত। কাজেই এ রচনাকাল নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য।

মূলের তুল্য না হলেও যেহেতু
'বিষতুল্য বচন বচন সুথারস
বচন বচনে পুনি দেব হএ বশ।

অতএব বচনের আধার বলেই পদ্মাবতী আমাদের প্রিয়কাব্য।

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল ঃ রোসাঙ্গরাজের মহামাত্য মাগন ঠাকুরের আগ্রহে আলাউল তাঁর দ্বিতীয়গ্রন্থ সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল রচনায় হাত দেন। ১৬৫৮ সনে মাগনের আকস্মিক মৃত্যু হয়। প্রতিপোষণের অভাবে তিনি গ্রন্থটি অসমাপ্ত রাখেন। দশ-এগারো বছর পরে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মুসার অনুরোধে ও প্রতিপোষণে সুজাহত্যার নয় বছর পরে তিনি ১৬৬৮-৬৯ সনে সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল গ্রন্থের শেষাংশ রচনা করে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করেন।

রচনাকালটি এরূপ ঃ কলা অব্দ হন্তে কহি শুন গুণিগণ
মৃগাঙ্গ গগন রস করিয়া স্থাপন।
অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ বার বৃহস্পতি
দিবা অর্ধে লেখা হৈল ক্ষেম দোষ মতি।

---

১. *'পদুমাবৎ' কাব্যকাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, সবটাই কল্পনাপ্রসূত। —পদ্মিনী উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা', ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো –প্রবাসী ৩০শ ভাগ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৩৭ সন। পৃঃ ৬৫৯, ৬৬৩ ৬৫৫-৬৫ এবং প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৯ সন : এবং 'মালিক মুহম্মদ জায়সী' (উর্দু) পুস্তক-সৈয়দ কলবে মুস্তফা রচিত দ্রষ্টব্য।*

(মৃগাঙ্গ-১০, গগন-৭, রস-৯ তথা ১০৭৯ হিঃ বা ১৬৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দ)।

এ গ্রন্থের প্রথমাংশে মাগনের প্রস্তাব কবিভাষায় এরূপ ঃ

শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ
আহ্মারে বুলিলা গুরু কর অবধান
ফারসি ভাষাতে এই প্রসঙ্গ পুরাণ—
মোর মন তোষ এই প্রেমের কথনে
প্রেম পুস্তক এই সয়ফুলমুলুক।

তারপর সাঙ্গ না হৈতে পুথি (মাগন) পাইল পরলোক।

সৈয়দ মুসা কবিকে বললেন—পুস্তকর (সয়ফুলমুলুকের) আজ্ঞাকারী শ্রীযুক্ত মাগন
আছিল তোমা শিষ্য মোর বন্ধুজন।

কাজেই উভয়ের খাতিরে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন কবিকে। যদিও ' বৃদ্ধ কালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হএ' তবু অনুরোধ রক্ষা করতে হল।

দোনাগাজী চৌধুরী প্রসঙ্গে বলেছি সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল উপাখ্যানের আদি উৎস আলেফ-লায়লা। আলাউল বলেছেন তাঁর উপাখ্যানের উৎস ফারসি (ফারসি ভাষেতে এই প্রসঙ্গ পুরাণ)। এ ফারসি উপাখ্যান কার রচনা তা আলাউল, দোনাগাজী কিংবা মালে মুহম্মদ জানতেন না। কারণ মহফিল রচিত কাব্যটি ছাড়া অন্য ফারসি কাব্যগুলোতে রচয়িতার নাম নেই। মনে হয় তাঁদের স্ব স্ব আদর্শ ফারসি কাব্যে প্রণেতার বা অনুবাদকের নাম ছিল না, অথবা ফারসি গ্রন্থের নাম তাঁদের শোনা ছিল, কিনতু আয়ত্তে ছিল না, তাঁরা আলেফ লায়লার শোনা কাহিনীই স্বাধীনভাবে অনুসরণ করেছেন। দোনাগাজী চৌধুরীর, আলাউলের ও উনিশ শতকের মালে মুহম্মদের কাব্যের মধ্যে নামগত ও কাহিনীগত অমিল অনেক, যেমন পার্থক্য রয়েছে আলেফ-লায়লার উপাখ্যানের সঙ্গেও। দোনাগাজীর গল্পে বৈচিত্র্য, থ্রিল ও বিস্তৃতি বেশি, আলাউলের কাব্য তুলনায় হীনপ্রভ, আর মালে মুহম্মদের কাব্য ওই দুটোর সঙ্গে ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে তুলিত হবার যোগ্য নয়।[১]

রতনকলিকা-আনন্দবর্মা উপাখ্যান ঃ মাগনের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রতিপোষণের অভাবে দরিদ্র কবি আলাউল সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল রচনা অসম্পূর্ণ রেখে অপর এক অমাত্য শ্রীমন্ত সোলেমানের আদেশে কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না'র সমাপ্তিদানে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ তিনি 'অন্নবস্ত্র দিয়া নিত্য পোষন্ত সাদরে', আর 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান।' সতীময়নার অতি সামান্য অংশই বাকি ছিল—রত্নামালিনীর অভিসন্ধি বুঝে তাকে লাঞ্ছিত করে বিতাড়ন এবং বিরহিণী পত্নীর দুর্দশার সংবাদে বিচলিত ও অনুতপ্ত লোরকের চন্দ্রানীসহ স্বঘরে প্রত্যাবর্তন এবং ময়নার সঙ্গে মিলন। আলাউল এ সামান্য অংশ লিখে তৃপ্ত হননি, তিনি অকারণে এক অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান জুড়ে দিয়ে গ্রন্থের কলেবর স্ফীত করেছেন। মানুষের স্ব স্ব ভাগ্যনির্ভরতা ও অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা বা অমোঘতা প্রতিপাদনই এ গল্পের উদ্দেশ্য। আলাউলের আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্তসার এই ঃ

ধর্মবতীপুরীর রাজা উপেন্দ্রদেব। তাঁর চার রানী। এঁদের নিয়েই তিনি সমুদ্রতীরে এক সুউচ্চ টঙ্গীতে বাস করতেন। একদিন রাজা কথা প্রসঙ্গে রানীদের বললেন ঃ

আমার ভাগ্যের লাগি তুমি সব সুখ ভোগী
আমি বিনে না জানি কি গতি।
সংসারের নারী জাতি স্বামী ভাগ্যবতী
রাজভাগ্য সবার অধিক
পুরুষ আশ্রয় বিনে নারী সবে কদাচনে
না পারএ বঞ্চিতে খানিক।

১. তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আমার সম্পাদিত দোনাগাজী রচিত 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য, বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৭৫ সন।

তিন রানী স্বামীর কথায় সায় দিলেন। কিন্তু চুপ করে রইলেন রানী রতনকলিকা। কৌতূহলী রাজা তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলে তিনি সসঙ্কোচে জানালেন--

একজন ভাগ্যে আনে না করএ সুখ
নিজভাগ্য অনুরূপে ভুঞ্জে সুখ ভোগ।
যার যেই কর্মে থাকে কর্ম নিয়োজিত
নিবন্ধেতে আনি থাকে করে সেই রীত।
মোর কর্মে আছে হৈতে রমণী তোমারি
তে কাবণে যোগ্য গৃহে হৈলুঁ অবতারি।

হৃতদর্প রাজা রেগে বললেন ঃ

যদি বল কর্ম অনুরূপ ফল ফলে
ভাসাইয়া চাহি তোমা সমুদ্রের জলে।
যদি মোর গৃহে পুনি ফিরে আইস তুমি
প্রত্যয় তোমার বাক্য তবে মানি আমি।

যেই কথা সেই কাজ। রাজা ছয় মাসের খোরপোষ দিয়ে 'মাঞ্জসে' করে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন গর্ভবতী রানী রতনকলিকাকে। যথাসময়ে সন্তানের জন্ম হলে রানী তার নাম রাখলেন 'আনন্দবর্মা'। এ আনন্দবর্মাই উপাখ্যানের নায়ক। বহু অলৌকিক ঘটনার পরে আনন্দবর্মা মাকে নিয়ে দেশে আসে এবং পিতা ও আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটে।

আঠারো শতকের কবি রামজয় বা রামজী দাসের 'শশিচন্দ্রের পুথি'রও উপজীব্য এ উপাখ্যানটি। পার্থক্য রয়েছে কেবল পাত্রপাত্রীর ও স্থানের নামে। শশিচন্দ্রের পুথিতে ঘটনার স্থান কাঞ্চননগর, রাজার নাম বিকর্ণ, রাণীর নাম তারাদেবী ও রাজকুমারের নাম শশিচন্দ্র। এতে মনে হয় দুটো ভিন্ন পুথিই তাঁদের অবলম্বন ছিল, অথবা মুখে মুখে চালু লৌকিক রূপকথার শ্রুতিস্মৃতি থেকেই উভয়ে উপাখ্যান রচনা করেছেন। কারো কাছে তাঁরা ঋণস্বীকার করেননি, তাতে মনে হয় লোকপ্রচলিত কাহিনীই ছিল তাঁদের অবলম্বন। এ কাহিনী 'কিং লিয়ার' নাটক স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদেষ্টা পরিচিতি ও রচনাকাল ঃ

আদেষ্টা মন্ত্রী শ্রীমন্তসোলেমান মহাগুণবন্ত।
মহাহরষিত হৈল পাইয়া আমারে
অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত সাদবে।
জ্ঞান-উক্তি রসকথা শুনন্ত সতত .....

একদিন 'প্রসঙ্গ হইল লোব-চন্দ্রানীর কথা
অসাঙ্গ রহিল এই রস কাব্য গাথা।....
হরষেতে আদেশ করিল আমা প্রতি
এই খণ্ড পুস্তক পূরাও মোর নামে।

আলাউল সতীময়নার সম্পূরক হিসেবে 'রতনকলিকা আনন্দবর্মা' উপাখ্যান রচনা করেন। হিজরী সন ঃ

সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপন দুই দিকে
সুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে,
মঘীসন, দুই শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাসন
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম।

১০৭০ হিজরী ও ১০২০ মঘী দুটোতেই ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দই হয়। একেই পরোক্ষ প্রমাণ ধরে আমরা মাগন ঠাকুরের মৃত্যু সন ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ অনুমান করেছি। মাগনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সয়ফুলমুলুক রচনা বন্ধ রেখে কবি সতীময়না পূর্ণাঙ্গ করার কাজে হাত দেন।

সপ্তপয়কর ঃ সোলেমানের প্রতিপোষণে এটি অনূদিত। নিযামী গঞ্জাবীর (১১৪৫-১২০৭ খ্রীঃ) দুটো ফারসিকাব্য আলাউল বাঙলায় অনুবাদ করেছেন ঃ একটি সপ্তপয়কর এবং অপরটি সিকান্দরনামা। নিযামী গঞ্জাবীর পুরো নাম নিযামউদ্দিন আবু মুহম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ নিযামী গঞ্জাবী, পিতার নাম ইউসুফ পিতামহ যকী, প্রপিতামহ মুয়াইদ নিযামদ্দীন। কবির মায়ের নাম রইসা। জন্মস্থান গঞ্জা। এটি বর্তমানে রুশ অধিকৃত মধ্য এশিয়ার আরানের একটি শহর। ফারসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কবি নিযামী পাঁচটি কাব্য প্রণেতা। একত্রে এগুলোর নাম 'খমস্' পঞ্চকাব্যরত্ন।

ফারসি হপ্তপয়কর সাতটি গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থের বাঙলা নাম সপ্তপয়কর। গ্রন্থসূত্রে জানা যায় সপ্তপয়কর শাহজাহান-পুত্র সুজা আরাকানে আশ্রিত হওয়ার পরে এবং সম্ভবত নিহত হওয়ার আগে রচিত। যেমন রাজপ্রশস্তি সূত্রে পাই ঃ

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা।

একটি রচনাকালও গ্রন্থে রয়েছে ঃ

মুসলমানি সন কহি শুন গুণিগণ
চন্দ্রশূন্য কলানিধি গ্রহের স্থাপন।

এ তারিখে নিশ্চয়ই লিপিকর প্রমাদ রয়েছে। 'মুসলমানিসন'-এর স্থলে 'মগধের সন' পাঠ ধরলেও ১০১৯ মঘী তথা ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে মেলে মাত্র, কিন্তু এটি ১৬৬০ সনের পরে ১৬৬৯ সনের আগের কোন সন হওয়ার কথা। কারণ সুজা ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে আরাকানে পালিয়ে যান এবং ১৬৬১ সনের গোরার দিকে আরাকানরাজ বালখ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার (১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ) অভিভাবকের হাতে নিহত হন। এ কাব্যে সুজার মৃত্যুসংবাদ নেই, সিকান্দরনামায় আছে। আর আছে সয়ফুলমুলুকের শেষাংশে। যেমন মৃত্যুর পরপরই সুজার সহযোগী সন্দেহে কবিকে পঞ্চাশদিন কারারুদ্ধ রাখা হয় 'গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস' এবং 'এহি মতে চলি গেল নবম বৎসর', তারপরে সৈয়দ মুসার আদেশে সয়ফুলমুলুকের শেষাংশ রচনা শুরু করেন। এ রচনা আরম্ভকাল ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ। সিকান্দরনামায় আছে এ ঘটনার পর এই মতে একাদশ (এদশ ?) অব্দ গঞি গেল' অতএব সিকান্দরনামা রচনার আরম্ভকাল ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দ।

সপ্তপয়কর রচনায় প্রবর্তনা ও প্রতিপোষণ দান করেন আরাকানরাজের সৈন্যমন্ত্রী বা সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদ ঃ

তান (রাজার) মুখ্য সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদ
অঙ্গ দূর্বাদলশ্যাম মুখ পূর্ণশশী।
তিনি নানাশাস্ত্র পরাগ বিদ্বান বিদগধ
আরবি ফারসি আর হিন্দুয়ানী মগধ।
মোহন্ত সঙ্গীত জ্ঞাতা ভাবরসে লীন
অন্নবস্ত্র দানে আমা (কবিকে) পোষন্ত সতত।

'ফারসি-আরবি ভাষা বয়েতের ছন্দ-'এ লিখিত 'সপ্তপয়কর কথা অতি মনোহর' বাঙলায় রচনা করে সৈয়দ মুহম্মদকে শুনিয়ে অন্নবস্ত্র পাওয়ার ঋণ শোধ করলেন কবি।

বলেছি সপ্তপয়কর মানে সাত গল্প। কাব্যে বর্ণিত উপাখ্যানের কাঠামো এরূপ ঃ

নোমান ছিলেন আরব ও আজমের অধিপতি। তাঁর পুত্রের নাম বাহরাম গোর। জ্যোতিষীর উপদেশে রাজা নোমান পুত্রকে য়নমনদেশে রাজত্ব করবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে ছিল

ময়না নামের এক শিল্পী। সে রাজকুমারের জন্যে একটি প্রাসাদেই সাতটি সুরম্য টঙ্গী বা সুউচ্চ কক্ষ তৈরি করে দিল। এক এক টঙ্গীর ছিল এক এক রঙ। অর্থাৎ সাত টঙ্গী ছিল সাত রঙের। কাছে অভিভাবক না থাকায় বাহরাম বিলাসী হয়ে ওঠে, সে মৃগয়ায় ও নাচে গানে মশগুল থাকে। অবশেষে তার অনুপস্থিতিতে পিতার যখন মৃত্যু হল, মন্ত্রী সুযোগ পেয়ে তার পিতৃসিংহাসনে বসে গেল। খবর পেয়ে বাহরাম সসৈন্য গিয়ে পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করল তো বটেই, সে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে চারপাশের সাতটি রাজ্য জয় করে সাতরাজ্যের সাত রাজকন্যাকে বিয়ে করে সাত টঙ্গীতে রাখলো। এরূপে—

আনন্দ উৎসবে রায় যেদিন যে গৃহে যায়
সবে পরে সেই বর্ণ বাস
নৃত্যগীতে অবশেষে গোঞাইলা কেলিরসে
শয়ন সমএ বাহরাম

এমনি করে প্রতি রানীকে এক একটি প্রসঙ্গ বা কাহিনী শোনানোর জন্যে বাহরাম নির্দেশ দেন।

এই মতে সপ্তরাত্রি সপ্তবিজ্ঞা কলাবতী
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ।

এভাবে সাত রানী সাতটা চমৎকার উপাখ্যান রাজাকে শুনিয়েছিল, সেগুলোই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। সিকান্দরনামা কাব্যটি জঙ্গনামা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

আলাউলের আত্মকথা

আমরা এখানে আলাউলের 'আত্মকথা' উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এর থেকে যা পাওয়া যাবে, তাতেই আপাতত তুষ্ট থাকতে হবে।

পদ্মাবতী–

মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান।।
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা।।
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি।
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি।।
কার্য হেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলু এথাত।।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলু রাজ আসোয়ার।।
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত।
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষি বহুতর।
তালিম আলিম বলি করন্ত আদর।।
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঠাকুর মাগন।
ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন।
দুঃখ-নাশ-হেতু তান সঙ্গে দরশন।।
বহুল আদর করি বহুল সম্মানে।
সতত পোষন্ত আমা অন্নবস্ত্র দানে।।
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন।
তান গুণ-সূত্র হৈল গ্রীবাএ বন্ধন।।
গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত-নাট-যন্ত্রবাদ্যে রঙ্গ-ঢঙ্গ করি।
নানা সুপ্রসঙ্গ কথা কহিয়া রসদ।
তান সভা মধ্যে থাকো হৈয়া সভাসদ।
একদিন সভা করি বসিছে মাগন।
নানারঙ্গ প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণ।।
কেহ গাহে কেহ বাহে কেহ খেলে খেলা।
সুধাকর বেড়ি যেন তারাকুল মেলা।।
হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল সভাজন মন।।
কর্তাএ আদেশ কৈল পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজ যেন অমিয়া বরিষে।।
"এই পদ্মাবতীর সে-সব রস কথা।

হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।
রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষা।
পয়ারে রচিলে পূরে সভানের আশা।।
যেহেন দৌলতকাজী চন্দ্রানী রচিল।
লস্করউজীর আশরফ আজ্ঞা দিল।।
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি।"
এ কথা শুনিতে মনে বহু শ্রদ্ধা করি।।
তাহান আদেশ-মাল্য করিয়া মস্তক।
অঙ্গীকার কৈলু মুই রচিতে পুস্তক।।
বিমর্সি চাহিলুঁ পাছে মুই অল্প বুদ্ধি।
কেমতে জানিমু মুই রচনের শুদ্ধি।।
অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিলুঁ উপায়।
তান ভাগ্য-যশঃ-কীর্তি আছএ সহায়।।
সেই বলে রচিমুঁ পুস্তক পদ্মাবতী।
নিজ বুদ্ধি বলে নহে এথেক শকতি।।
প্রেম-কবি আলাউল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পূর্ণ প্রেমের পাবক।।
বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরসন।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতিঃ হৈল জ্ঞানের অঞ্জন
কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপাণে।
রসনা সরষ হৈল প্রেমের বচনে।।
প্রেম-পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশাএ।
অসাধ্য সাধন মোর গুরুর কৃপাএ।।
ভকতি প্রণতি করি মাগো এই বর।
শুনি গুনিগণ মনে হউক আদর।।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল—
(মাগন ঠাকুরের আদেশে রচিত প্রথমাংশের ভূমিকা)

হেন মহা মহিম মাগন গুণনিধি।
গুণরাশি দিয়া তানে সৃজিলেক বিধি।।
রূপে কাম জিনিয়া গুণের নাহি অন্ত।
সর্বদেশে ব্যাপিত তান অতুল মহত্ত্ব।।
সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা জাত।
কুলশীলে সৎকর্মে ভুবন বিখ্যাত।।
আপনে আলিমাধিক বিদ্যাএ নিপুণ।
গুণবন্ত হইলে বুঝএ গুণাগুণ।
তান দেশী যথেক আলিম গুণবন্ত।
মান্য করি আনি নিত্য আদরে পূজন্ত।।
মুঞি পরদেশী এক আলাউল হীন।
রোসাঙ্গে পড়িলুঁ আসি আপনা কুদিন।।
গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ।
অতি পুণ্যবন্ত স্থান নাহি পাপলেশ।।
বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা।
আলিমজনের কথা দিতে নাহি সীমা।
হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণ সজ্জন সত্যমতি।
মধ্যভাগে বহে তার গঙ্গা-ভাগীরথী।।
মজলিসকুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি সে পামর।
দৈবগতি কার্যহেতু যাইতে নৌকাপন্থে
দরশন হইলেক হার্মাদ সহিতে।।
শহীদ হইল বাপ যুঝি বহুতর।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলু একসর।।
নিজ দুঃখ কথেক কহিমু বিরচিয়া।
রাজ-আসোয়ার হৈলু এথাত আসিয়া।।
রোসাঙ্গেত মোসলেম প্রধান আছে যত।
ধর্ম কর্ম বিশারদ অতুল মহত্ত্ব।।
তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরেরে।
অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে।।
তাতে বিধি দুঃখনাশ করিতে কারণ।
ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন।।
মধুর পীরিতি-রসে বশ মোর মন।
তান সভাসদ হৈয়া থাকোঁ অনুক্ষণ।
আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী।
যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি।।
বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে।
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে।।
দ্বিতীয় আদেশ মোকে হৈল যেন মতে।
সয়ফুলমুলুক কথা পুস্তক রচিতে।।
তার বিবরণ কহি শুন গুণিগণ।
রস-কথা শুনিতে রসিক পুষ্ট মন।।
রোসাঙ্গ দেশেত এক মহাগুণবান।
রাজার অমাত্য শ্রীযুত সোলেমান।।
হেমরত্ন নৃপতির যথেক ভাণ্ডার।
সকলের উপরে তাহান অধিকার।।

এই সোলেমান ও মাগন ঠাকুর পীর-ভাই ছিলেন, তাঁদের পীর শাহ মাসুম। একদিন সোলেমান পীরকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়ি আনলেন, পীরজাদা সৈয়দ মুস্তফা, মাগনঠাকুর, আলাউল প্রভৃতি এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হন, ভোজনশেষে পীরজাদা মুস্তফার মুখে সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামালের উপাখ্যান শুনে সবাই মুগ্ধ হন। ফলে–

শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ।
আহ্মারে বুলিলা গুরু কর অবধান।
ফারসি ভাষেতে এই প্রসঙ্গে পুরাণ।।
সকলে না বুঝে এই ফারসি কিতাব।
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব।।
যার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘিলে হএ পাপ।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ।।
তাহান আদেশ-মাল্য ধরি শির পাগে।
অঙ্গীকার করিলুঁ রচিতে সভা আগে।।
শক্তিহীন যদি হয় আমার প্রবল।
তান ভাগ্যদীপ্তি হস্তে হইব উজ্জ্বল।।
এথেকে সাহস কৈলুঁ রচিতে পয়ার।।
গুণিগণ চরণে মাগিএ পরিহার।।
যেই পুঁজি আছে মোর হৃদয় ভাণ্ডারে।
লাজ ছাড়ি আলাওলে ব্যক্ত করে তারে।।
নত মুণ্ড শক্তিহীন জ্ঞানের কৃপাণ।
শ্রীঘ্রে ছেদি বাক্য-পন্থে হও আগুয়ান।
প্রেম-কথা শুনি আজ্ঞা কৈলা মহাজনে।
মোর মন তোষ এই প্রেমের কথনে।।
প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুলমুলুক।
নানা অপরূপ কথা শুনিতে কৌতুক।।
গুরুপাদ ভজিয়া কহে হীন আলাউল।
নাশিয়া মনের ঘোর করহ নির্মল।।

সয়ফুলমুলুকের দ্বিতীয়াংশ—
(সৈয়দ মুসার আদেশে রচিত)

এবে অবধান কর সাধু গুণবন্ত।
যেনমত রহস্য পুস্তক আদি অন্ত।।
আদেশএ মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন।
সয়ফুলমুলুক পুথি করিতে রচন।
সাঙ্গ না হৈতে পুথি পাইল পরলোক।
কথকাল মনে মোর আছিলেক শোক।।
তার পাছে শাহ সুজা নৃপকুলেশ্বর।
দৈব পরিপাক আইল রোসাঙ্গ শহর
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে কবি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হোন্তে পাইল অবসাদ।।
যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হৈল।
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহুলোক মৈল।।
মির্জা নামে এক পাপী সত্যধর্ম ভ্রষ্ট।
নিগ্রহ করিয়া বহু লোক করে নষ্ট।।
যার সঙ্গে ছিল তার তিলমন্দ ভাব।
অপরাধী করি তারে পাইলেক লাভ।।
নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ।
যে জনে মাগএ আগি নর্ক মাগে আপ।।
এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি কথ লোক করাইছে বন্ধন।।
আয়ুমুক্ত সব নষ্ট পড়িল অস্থান।
পাপরাশি ধর্মনাশি মৈল শালবাণ।।
আহ্মারেহ অপরাধ দিল পাপীছারে।
না পাইয়া বিচার পড়িলুম কারাগারে।।
বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম ক্লেশ।
গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস।।
আয়ুলেশ আহ্মা ছিল রাখে বিধাতাএ।
সবভিক্ষা জীবরক্ষা ক্লেশে দিন যাএ।।
এই মতে চলি গেল নবম বৎসর।
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর।।
সৈয়দ মুসা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন বদন রূপ মহাগুণবন্ত।।
[অতঃপর সৈয়দ মুসার গুণ বর্ণিত হয়েছে।]
আহ্মি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতিবহুতর।
তালিম আলীম বলি করএ আদর।।
দানে পরিপুরন্ত পোষন্ত অনুক্ষণ।
প্রেম বশে মান্যরসে বাঁধা মোর মন।।
একদিন ডাকিয়া যে আপন আলএ।
বহুল করিয়া কহিলা যে মহাশএ।।
পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন।
আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন।।
খণ্ডবাক্য আছিল পুস্তক মনোহর।
সমাপ্ত হইলে রস হএ বহুতর।।
আহ্মার গৌরব মনে তাহার বচন।

আজ্ঞা করি তোষ যথ পাঠকের মন।।
ভাবিয়া উত্তর দিলুঁ শুন দয়ামএ।
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম উচিত না হএ।।
রচিলুঁ বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝালা।
রহিতে ঈশ্বর ভাবে যুক্ত এই কালা।।
বিশেষ অভাবে পরিচিন্তাযুক্ত মন।

মুসার উক্তি—
"অন্যজন নহ তুমি আলাউল শুন।।
যাহার বচনে লোকে পা এ উপদেশ।
তাহার এহেন যুক্তি না হএ বিশেষ।।
বিশেষ সঙ্কটে যেই করিছে রক্ষণ।
যোগ্য দরে রাখিছে জুড়িয়া পুথিধন।।
তাহান অস্তুত মাত্র সতত সম্ভবে।
দরিদ্রের নাশে ভয় অধিক বৈভবে।।
তুহ্মি না করিলে খণ্ড-বাক্য নহে পোথা
এরূপে করিতে আর কেবা আছে এথা।।
তিন মতে বাক্য সাঙ্গ করিতে উচিত।
প্রথমে মাগন নিষ্ঠা গুণিগণ বিদিত।।
দ্বিতীয় কুমার যে রহিল বন্ধনে।
না রচিলে পুস্তক দুঃখ উপজএ মনে।।
তৃতীয়ে আহ্মার মন রাখিতে জুয়াএ
এড়াইতে না পারিবা রচিবা সর্বথাএ।।"

আলাউল—
মোহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রবেশিলুঁ কাব্য-ঘরে করতার স্মরি।।
পুস্তক গ্রথন-কর্ম সমুদ্র সঞ্চার।
গুরু লক্ষ্য ঈশ্বর কৃপাএ হএ পার।।
কাব্যরস গুপ্ত ভাণ্ডারে দিব্যরত্ন।
বিচারিলে পাই তারে কৈলে বহু যত্ন।।
বিশেষ যত্তনে ভাবে যাএ নিশিদিন।
বৃদ্ধ হইলুঁ অখনে হইলুঁ বলহীন।।
তথাপিহ সত্যবাক্য এড়াইতে না পারি।
সঙ্কটে প্রবেশ করি মহন্ত বাক্যধরি।।

সতীময়না লোরচন্দ্রানী—
অখনে পণ্ডিত সবে শুন দিয়া মন।
মোর নিজ বৃত্তান্ত পুস্তক বিবরণ।।
গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসে সামাজিক লোক উক্তি ভক্তি শিষ্ট।।
বিস্তর দানিশমন্দ খলিফা সুজন।
আউলিয়া সবের বহুল গোরস্থান।।
হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুক্ষণ।।
মজলিস কুতুব এথাতে অধিপতি।
তাহান অমাত্যসুত মুই হীনমতি।।
কার্যহেতু যাইতে পন্থে নৌকার গমনে।
দৈবগতি দেখা হৈল হার্মাদের সনে।।
বহু যুদ্ধ করি শহীদ হইল পিতা।
রণক্ষতে ভাগ্যবশে আহ্মি আইলুঁ এথা।।
কথেক আপনা দুঃখ কহিমু প্রকাশি।
রাজ আসোয়ার হৈলুঁ রোসাঙ্গেতে আসি।।
শ্রীমন্ত সোলেমান মহাগুণবন্ত।
পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত।।
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আহ্মারে।
অন্ন-বস্ত্র-দানে নিত্য পোষন্ত সাদরে।।
তাহান সভাত গুণিগণ অবিরত।
জ্ঞান-উক্তি রসকথা শুনন্ত সতত।।
একদিন হরিষে বসিয়া গুণনিধি।
জিজ্ঞাসন্ত কাব্য-কথা রসের অবধি।।
প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রানীর কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রসকাব্য গাথা।।
সাঙ্গ হলে পুস্তক সম্পূর্ণ রস হএ।
শ্রোতা পাঠকের মন আরতি পুরাএ।। ....
এথেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরষেতে আদেশ করিল আহ্মা প্রতি।।
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও একঠামে।
মহন্ত আরতি যে শুনিয়া আলাউল।
অঙ্গীকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল।।
তাহান দয়ায় করি বহুত সহায়।
বিরচিতে কৈলুঁ আশ গুরুর কৃপায়।।....
সংসারেত যথ বস্তু সৃজিয়াছে বিধি।
মনুষ্য করিছে শ্রেষ্ঠ দিয়া কাব্যনিধি।।....
নর মধ্যে আলাউল অতি হীন মতি।
লঘুবুদ্ধি গুরুতর করিল আরতি।। ....
মহাজনের আদেশ সহজে পূজ্যমান।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান।। ....

শ্রীমন্ত সোলেমান সত্যে-রত্নাকর।
শুনিতে সতীব কথা হরিষে অন্তর।।
অদেশ-কুসুম তান শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাউলে কহে পঞ্চালি রচিয়া

সেকান্দারনামা–
এবে অবধান কর গুণী মহামতি।
আপনা বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপত্তি।।
গৌড়মধ্যে মুলুক ফতোয়াবাদ ভূমে।
বৈসে সাধু সৎলোক দেশ মনোরম।
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।
বহুল আলিম গুরু আছে সেই স্থান।।
হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধাবা বহে মধ্যরাজ্য।।
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
মুই ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়।।
কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্মলেখা।
দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা।।
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ।।
না পাইলুঁ শহীদ (সইদ, সৈদ) পদ
ছিল আয়ুলেশ (আয়ুশেষ)
রাজ আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ।।
রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত।
তালিম আলিম বলি আদর করন্ত।।
বহু (রস) গ্রন্থ রচিলুঁ মোহন্ত সব নামে
মোর বাক্য এথা প্রকাশিলুঁ সর্বঠামে।।
এই মতে সুখে গোঞাইলুঁ কথকাল
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল।।
শাহশুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি।।
আপনার দোষ হোন্তে পাএ অবসাদ।
এক পাপী আমারেহ দিল মিথ্যাবাদ।।
কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।
যথ ইতি বসতি হইল ছারখার।।
শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইলুঁ বহু অবসাদ।।
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্রদ্বারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ।।
গুণহেতু মহাজনে করন্ত আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র-দারা রাজকর।।
সৈয়দ শহীদ (সৈয়দ) শাহ রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী।।
দয়াল চরিত্র পীর অতুল্য মহৎ।
কৃপা করি দিল মোরে কাদেরী খিলাফৎ।। ..
আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সম্মুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক।।
এইমতে একাদশ (এদশ) অব্দ গঞি গেল।
পুনরপি ভাগ্য-অংশু প্রকাশিত ভেল।।
শ্রীমন্ত মজলিস অতুল মহত্ত্ব।
নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য।[১]
মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ।
সাদরে আনিয়া আমা কৈল সভাসদ।।
অন্নে-বস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসময়ে শুধি রাজকর।।
বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনুভাএ।।
একদিন মজলিস করি মেহমানি।
মহা মহা মুসলমান ভুঞ্জাইল আনি।।
ষটরসে ভুঞ্জাইল নানা পাকোয়ান।
চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ রন্ধন।।
চন্দন কস্তুরী আদি গোলাপ সুগন্ধ।
কর্পুর তাম্বুলে সভা হইল সুললিত।
কেহ কেহ মধুর সুস্বরে গায় গীত।।
মজলিসে সকলে করন্ত আশীর্বাদ।
"বিধি পুরাউক তোমা মনে যেই সাধ।।
আনন্দের স্থলমাত্র তোমার সমীপ।
মুসলমানী দীনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ।।
মসজিদ পুষ্করণী আদি কৈলা পুণ্যকাম।
স্বদেশে বিদেশে পূর্ণ তোমা কীর্তি নাম।।
সুজনে করএ বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য।
অন্তে যার নাম রহে সেই ধন্য ধন্য"
মজলিস .....
শুনি মজলিস বাক্য বলিলা সকল
মসজিদ পুষ্করণী রহিব কথকাল।।
পূর্বকালে মহন্তে করিছে নানা কাম।

১. *পাঠান্তর ঃ শ্রীমন্ত নবরাজ অতুল মহত্ত্ব। মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য।*

সবেমাত্র কিতাব গ্রথনে তান নাম।।
মসজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থকথা যথাতথা আর্তিভাবে কহে।।
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হএ মন।
নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন।
মুর্খ হএ পণ্ডিত খলে পাএ জ্ঞান।
গ্রন্থ সম মহিমা কোথাতে আছে আন।।
প্রলয় অবধি রহে শুভ-কীর্তি যশ।
নামের মহিমা-বাক্যে সর্ব হএ বশ।।
হীন জাতি নানা দুঃখে উপাজিয়া মাল।
পুষ্কর্ণী মসজিদ দেয় কথেক বাঙ্গাল।।
মহন্তে বিনু গ্রন্থ জ্ঞান না উপার্জএ।
স্বদেশে বিদেশে লোকে কীর্তিগুণ গাএ।
এথ ভাবি আমার প্রতি করিল আদেশ।
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্নে সবিশেষ।।
তবে আমি মনেতে ভাবিয়া কৈলুঁ সার।
সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।।
সভা শোভাযুক্ত কথা নাহিক অধিক।
আলিম সভান মনে অমূল্য মাণিক।।
মুসাফেত ইঙ্গিতে কহিছে নিরঞ্জন।
বহুল বাড়িছে কথা অর্থ বিচারণ।।
নিজামীর ঘোর বাক্য বুঝনে কর্কশ।
ভাঙ্গিয়া কহিলে তারে আছে বহু রস।।
আমার বচনে মজলিস মহাশয়।
রচিবারে আজ্ঞা দিল সরস হৃদয়।।
তবে আমি নিবেদিলুঁ হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষত রাজদায় অধিক জঞ্জাল।।
নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিসে দয়া হৈল অতি।।
দানিয়া ভক্ষ্য-বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধ দানে মন সন্তোষিয়া।।
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার।।
সমুদ্রে সাঁতার সম গ্রন্থের গ্রথন।।
বিশেষ পারস্য ভাষা বয়েত ভাঙ্গন।।
মহন্ত নিজামী বাক্য ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চ-ভাষ কিতাব মাঝার।।
আরবি ফারসি আদ্য নসরাণী এহুদী।
পাহলবী সঙ্গে পঞ্চ ভাষের অবধি।।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য।
কেবল শ্রীমন্ত মজলিস ভাগ্য লক্ষ্য।।
ভাগ্যধব উপরে ঈশ্বর কৃপা অতি।
লঙ্ঘিতে আদেশ তান কাহার শকতি।।
শাস্ত্র কহে অন্নদাতা ভয়ত্রাতা বাপ।
না ধরিলে তান আজ্ঞা ঘোরতর পাপ।।
তেকারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকাব।
গুরুকে স্মরিয়া দিলুঁ সাগরে সাঁতার।।

সপ্তপয়কর ঃ

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল নাহি তাহে ছল বল।
হেমরতন জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সৎলোকে সতত আনন্দ ভোগে
শস্য মৎস্য সদাএ পূর্ণিত।।
তাহে নৃপ অনুপাম শ্রীচন্দ সুধর্ম নাম
খলনাশা দুঃখিতের গতি। .....
দিল্লীশ্বর-বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা। ....
হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমন্ত্রী সৈদ মহাম্মদ।।
অঙ্গ দূর্বাদলশ্যাম মুখ পূর্ণশশী।
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদুমন্দ হাসি।।
নানা শাস্ত্র পরাগ বিদ্বান বিদগ্ধ।
আরবি ফারসি আর হিন্দুয়ানি মগধ।।
মোহন্ত সঙ্গীত-জ্ঞাতা ভাব রসে লীন।
রাগ-রঙ্গে বিনোদ থাকন্ত নিশিদিন।।
সতত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ।
তত্ত্ব রস কথা কহি থাকন্ত সদাএ।।
নানা পরস্তাব নানা গ্রন্থ সুকথন।
আনন্দে শুনন্ত বসি হৈয়া একমন।।
আমিহ সভাএ তান থাকি অবিরত।
অন্ন-বস্ত্র-দানে আমা পোষন্ত সতত।।
মোর মন বান্ধএ-লবণ-যবাগূয়াএ।
বিশেষ করন্ত বশ আদর কৃপাএ।।
সভা মধ্যে থাকি সভাসদ হৈয়া।
শাস্ত্রনীতি রসকথা প্রসঙ্গ কহিয়া।।
সপ্তপয়কর কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিলুঁ তাহান গোচর।।
একনিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশএ।

কথা-রসে বসিছন্ত আপনা আলএ।।
আমা প্রতি আজ্ঞা দিল হরষিত মন।
উত্তর প্রসঙ্গ এক কহিতে তখন।।
নপ্ত সয়কর-কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিলুঁ তাহান গোচর।।
যেন মতে নৃপ এক পবি বস্ত্র শ্যাম।
নিশিদিশি কান্দিয়া গোমায় অবিশ্রাম।।
পশ্চাতে কহিমু আমি না কহিলু এথা।
মহা উল্লসিত হইল শুনি সেই কথা।।
তবে মোরে আজ্ঞা দিলা হাসিতে হাসিতে।
যত্ন করি এই কথা পয়ার রচিতে।।
ফারসি আরবি ভাষা বয়েতের ছন্দ।
বিশেষ নিজামী বাক্য সরস প্রবন্ধ।।
এই গ্রন্থ মাঝে যথ আছে ইতিহাস।
পয়ার প্রবন্ধে তার করহ প্রকাশ।।
একে মহাপুরুষ বিশেষ পালয়িতা।
পিতার সমান শাস্ত্রে বোলে অন্নদাতা।।
তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত
যদ্যপি পিঞ্জঁরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত।।
যদি বা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যালোকে হৈব সমুদ্র সাঁতার।।

পদ্মাবতী রচনাকালে আলাউল থদোমেঙদাবের যথার্থ পবিচয় জানতেন না। তাই তিনি থদোমেঙদারকে নরপতিগীব পুত্র মনে করে পদ্মাবতীতে বলেছেন ঃ

'সলিম শাহার বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগৃহ হৈল রাজ্যপাল।
রাজসুখ ভোগ মূল কি দিব তাহার তুল
রসভোগে গোঞাইল কাল।।
একপুত্র এককন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা বাজ্যদান
যাবে দেখি লজ্জিত বাসব।।
সাদউ মেঙদার নাম রূপেগুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেখ।

সয়ফুলমুলক রচনাকালে কবির এ ভুল ভাঙে। তখন তিনি বলেছেন ঃ

নৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী।
সাদউমেঙ নৃপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী।।
সাদউমেঙদার যদি গেল পরলোকে।
ব্রতধর্ম আচারি রহিল স্বামী শোকে।।
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা নৃপতিক শিশু দেখি।
সকল অমাত্যগণ হৈল এক মুখী।।
দণ্ডবৎ হইয়া মহাদেবীর গোচর।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তব।।
শিশু নৃপে কেমনে পালিব বসুমতী।
পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি।।
ঈশ্বর দুহিতা তুহ্মি ঈশ্বর বণিতা।
তোহ্মাবিনু কেবা আছে ঈশ্বর পালয়িতা।।
রাজ্যকর্তা পুনি নৃপ হইব যখন।
ব্রতধর্ম আচরি দেবী রহিও তখন।।
এথেক বিনয় যদি কৈলা পাত্রগণ।
পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন।।
হেন মত কোথা আর নাহি দেখি শুনি।
রাজ্যের ঈশ্বরী রাজগৃহে তপস্বিনী।।
তাহান অমাত্য-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুত মাগন।
শিশকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ।।
যথেক সম্পদধন দুহিতাক দিল।
তান হস্তে আনিযা সকল সমর্পিল।।
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈলা যশস্বিনী।
মুখ্য পাত্র হইলা মাগন গুণমণি।।

এতে একটা সত্য উদঘাটিত হচ্ছে। সাদউমেঙদার বা থদোমেঙতারের সিংহাসনারোহণের বা রাজ্যাভিষেকের (১৬৪৫ খ্রীঃ) বেশ কিছুকাল পরে (অন্তত দু'বছর পরে) আলাউল রোসাঙ্গে পৌছেন বলে মনে হয়। তাই অনতিকাল পরে পদ্মাবতী বচনাকালে নরপতিগীব কন্যার ও থদোমেঙাতারের

বা সাদউমেঙাদারের সম্বন্ধটি পুরোপুবি বুঝে উঠতে পারেন নি ; পদ্মাবতীতে প্রদত্ত রাজপরিচিতি নির্ভুল মনে করা হলে, পাঠকের ধারণা হবে যে ভাইয়ে-বোনে বিয়ে হয়েছিল :

যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিপতি।
যশস্বিনী কন্যা রাজগৃহে উপনীতি।।
রূপেগুণে সুলক্ষণা অতি জ্ঞানবন্ত।
ধর্মে মর্মে শুভ কর্মে সুমহন্ত।
কন্যার শৈশব দেখি ভাবে নরপতি।
এথেখ সম্পদ সমর্পিব কার প্রতি।।
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে।
মহাসত্য [সত্ত্ব] মুসলমান সিদ্দিকের বংশে।।
নানাগুণে পারগ মহন্ত কুলশীল।
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল।।
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
বহুস্নেহে ননৃপতি পোষিলা নিজ সুতা।।
বহু ধন রত্ন দিলা বহুল ভাণ্ডাব।
বহুল কিঙ্কর দিলা বহু পরিবার।।
বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী।
এই কন্যা হৈল জান মুখ্য পাটেশ্বরী।
শৈশবেব পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি।
মুখ্যপাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী।।

এরূপ বিবৃতির দ্বারা আলাউল এতকাল যে শুধু সাধাবণ পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন তা নয়, এ যুগে ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও বিচলিত করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন রাজকন্যার মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, কেউ বা বলেছেন রাজকন্যা বাজ্যাংশ পেয়েছিলেন।

৪. মরদন

মরদন বা মরদান রোসাঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় কবি। তিনিও শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে (১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) কাঞ্চীপুরীতে বসে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তিনি কোন অমাত্যের প্রতিপোষণ পাননি। কাঞ্চীর বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় এটি রোসাঙ্গ শহরে নয়, রোসাঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত চট্টগ্রামের একটি গ্রাম বা প্রশাসন কেন্দ্র। এখানে মঘ নেই। কবির তোয়াজ-স্তুতির ভাষায় আরাকানরাজার ও কাঞ্চীপুরীর সম্বন্ধে কিছু অতিকথন আছে। যেমন ঃ

১. ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গনগরী
রাবণের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী।
শ্রী শ্রীসুধর্ম শাহা তথাত ঈশ্বর
(ধ্বজ) ছত্র ধবলগজ লোক অধিপতি
ধনঞ্জয় সমসর বলবন্ত অতি।—

আর ২. সে রাজ্যেত (রোসাঙ্গরাজ্যে) আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী
মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী
আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ
কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তাত বৈসএ পণ্ডিত
নানা কাব্য রস সব কহএ সুরীত।

কবিও হয়তো কাঞ্চীনিবাসী ছিলেন। আমাদের অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে নিম্নে উদ্ধৃত চরণগুলো ঃ

সিঞ্চরের কাস্থ পিতা (?) প্রণামি তান পদ
তান দুই পুত্র মানি মর্দ মোহাম্মদ (?)
একদিন দুই ভাই বসিয়া থাকিতে
দুই সাধু কথা তবে লাগিলা কহিতে।

শেষের দুটো চরণ দৃষ্টে মনে হয় লোক-প্রচলিত উপাখ্যানই এ কাব্যের অবলম্বন। কবিও বোধ হয় সে আভাসই দিয়েছেন, কাব্যের আরম্ভ এরূপ ঃ

[নসিব] নামা পঞ্চালিকা শুন নরগণ
পূর্বকালে আছিলেক হেন বিবরণ।
প্রণাম করিয়া কহি পণ্ডিত গোচরণ
পুস্তক যেহেন মতে হৈল উতপন।

'বিবরণ' লিখিত পাঁচালী নয়-লোকশ্রুতি। তা হলে উক্ত দুই ভাইয়ের মুখে দুই সদাগরের কিস্‌সা শুনে কবি তা কাব্যে রূপায়িত করেছেন। গল্পের বীজ এই ঃ

পূর্বে দুই সাধু ছিল নগরে সিরাজ
মিতালি করি দেখ পাইল এক লাজ।
যে মতে নসিরাবিবি (নুরুদ্দিন) বিহা
সেসব বৃত্তান্ত কহি পঞ্চালী রচিয়া।

কবির পীর ছিলেন—সৈয়দ ইব্রাহিম, (পাঠান্তরে ইব্রাহিম খলিল)

সৈয়দ ইব্রাহিম পীর রূপে পঞ্চবাণ
কহে হীন মর্দনে নুরুদ্দিন বাখান।

যদিও কবি 'দুই সাধু কথা', 'নসিরাবিবি-নুরুদ্দিন বিহা' এবং 'নুরুদ্দিন বাখান' বলে উপাখ্যানটিকে অভিহিত করেছেন, উপাখ্যানটির প্রকৃত নাম মনে হয় 'নসিব নামা' বা নিয়তিকথা বা বিধিলিপি। কবি শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ' উপাখ্যানের এবং এ 'নসিবনামা' কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। দুটো কাব্যেরই লক্ষ্য অদৃষ্টের বা নিয়তির বিধান অমোঘ বা অখণ্ডনীয় বলে প্রমাণ করা।

আল্লাএ যে কিছু করে কেহ খণ্ডাইতে নারে
শর্ত সব নিষ্ফল হইল।

মরদনের কাব্যের মূল বিষয় ঃ সদাগর আবদুল করিমের ও সদাগর আবদুন নবীর মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব। উভয়ের স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। তারা সে-সময়ে অঙ্গীকার করে যে তাদের দুজনেরই ছেলে হলে বন্ধুত্ব করাবে, মেয়ে হলে সখ্য পাতাবে এবং ছেলে ও মেয়ে হলে বিয়ে দেবে। দৈবক্রমে আবদুল করিমের সদাগরী নষ্ট হওয়ায় সে অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়ল। তাই আবদুন নবী যথাসময়ে অঙ্গীকার অনুযায়ী আবদুল করিমের কন্যা নাসিরাবিবিকে বধূ না করে, পুত্র আবদুল সবিরের সঙ্গে আবদুল গনির কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করল। এ সূত্রেই স্বামীকে প্রবোধ দানচ্ছলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবদুল করিমের স্ত্রী আসামরাজ্যের সদাগর রাজু খানের চার পুত্রের পুরস্কার ও ভাগ্যের উপাখ্যান বর্ণনা করল। এ চারপুত্রের নাম মুসাখান, ঈসাখান, ইসমাইল খান ও এবাদত খান। রাজু খান একদিন পুত্রদের বলল—

'বাপের মায়ের ধন কথদিন খাইব।
আপনা অর্জন ধন খাইলে না ফুরাইব।

তারপর চারপুত্রের ধন উপার্জন সম্পৃক্ত ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। 'কর্মভোগ সংসারে এড়াইতে কেহ নারে।' আবদুল করিমের স্ত্রীর দ্বিতীয় গল্প আদর্শ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত ঃ

পূর্বে যে মিসির দেশে দুই মিত্র ছিল
মিত্রের কারণে মিত্র মরণ ইচ্ছিল।

মিসরের সদাগর পেরু খানের কন্যা খাণ্ডাবতী মক্তবে পড়ে, সেখানে জামালও পড়ে। উভয়ের প্রেমের ও সম্ভোগের কাহিনী সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। আর জামাল যখন গুপ্ত প্রেমের অপরাধে সুন্দরের মতো মৃত্যুদণ্ড পেল, তখন তার বন্ধু কামাল জামালকে বাঁচানোর জন্যে অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে চাইল। জামাল বলে আমি অপরাধী, কামাল বলে আমি।

এরপর দেশের ধার্মিক রাজা নুরুদ্দিনের ফকিরবেশে রাত্রে নগর পরিক্রমা। আবদুল করিমের মুখে তার দুঃখের কাহিনী ও আবদুন নবীর অঙ্গীকারভঙ্গের কথা শুনে ফকিরবেশী রাজা নুরুদ্দিন প্রবোধ দানচ্ছলে পূর্বের এক কিসসা বর্ণনা করলেন ঃ

পূর্বে যেন গরীব হোসেন একজন
ব্যাঘ্র হাতে কন্যা দিয়া পাইল বহুধন।

গরীব হোসেন নামে এক মৌলানা মিসরে সোলায়মান বাদশাহর কাছে গিয়ে অর্থাভাবে মেয়ের বিয়ে দেয়ার সমস্যার কথা জানায়। বাদশাহ বলেন–কাল আউয়াল ফজরে অর্থাৎ ঊষাকালে 'প্রথমে যাহারে দেখ তোমার দুয়ারে। তাকে কন্যা বিভা দিবা হইয়া নির্ভএ।'

প্রাতে এল মানুষ নয়—এক বুড়ো বাঘ, তাকেই কন্যা সমর্পণ করতে হল। তারপর অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এর পরে রয়েছে মুসা নবী ও তিন নিঃস্ব জনের কিস্‌সা ঃ এরা তিনজনের একটি বস্ত্র, তাই তারা গর্তে বাস করে, তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন মুসা যেন তিনজনে তিনটি বস্ত্র পায়, আল্লাহ বলেন—'আদ্যের লেখন তাব কেমতে মিটিব'—তবু মুসার অনুনয়ে আল্লাহ তৃতীয় দিবসে আমি তিন বর দিল। এ বরপ্রাপ্তদেরও কিসসা রয়েছে। এদিকে ফকিরবেশী রাজা নুরুদ্দিন আবদুল করিমকে অর্থদান করেন, সে-অর্থ মূলধন করে করিম আবার ধনী সদাগর হল। আর পূর্ব শর্তানুসারে ফকিরকে কন্যাদান করল। এ বিয়েতে খুব জাঁকজমক হয়।

নানান দ্রব্য আনিলেক নাহি লেখাজোখা
হেন মতে তেলোয়াই করে সাধু ঘরে
পান ফুল ফিবাওন্ত প্রতি ঘরে ঘরে।

আর বরও যেন মুসলিম শিবঠাকুর ঃ

মাথাএ যে কাল পাগ গলাএ শিকলি
কান্দেত তুলিয়া লৈল ফাটা কাঁথাখানি
হস্তে শোভে লাঠিগুটি কান্দে শোভে ঝুটি
কমরবন্দ আছে বেড়িয়া কাঁকাল
টেনিয়া (তেনা) পিন্ধন পরিধান চাদব ফাটা
হাতে জপমালা শেখরে যোগবোটা।
পাএত পাদুকা দিয়া আইল ফকির
বরের আসনে তবে বসিলা মহাবীর।
হেন মতে বিভা কৈলা নৃপতি ফকির
আর রাত্রি তিন প্রহরেক হৈল জুলুয়া।

আবদুন নবীর পুত্রের বিয়েতে করিম পানফুলসহ নিমন্ত্রণ পেল, পেল মেয়ে-জামাইও। ফকির নাসিরাবিবিকে নবীপুত্র আবদুল সবিরের বিয়েতে যেতে নির্দেশ দেয় ঃ

'পদাতি হইয়া যাইবা সাধুর দুয়ার
যথা দামাদেরে সবে তেল চড়াএ মুখে
ধুলি চাপি চাহি তুমি বসিবা সমুখে।'

ফলে উনচল্লিশ নারীসহ বিয়ে বাড়ি রওয়ানা হল নাসিরা। এখানেই পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত। মনে হয় নাসিরাবিবির সঙ্গেই সবিরের বিয়ে হয়েছিল পরিণামে, যেমনটি হয়েছিল রেজওয়ান শাহর কন্যার সঙ্গে হোসামপুত্রের। আমাদের অবলম্বন দুটো পাণ্ডুলিপির একটি ১-২২ পৃষ্ঠায় খণ্ডিত। অন্যটিও আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রথমদিকের কয়েক পৃষ্ঠা নেই এবং মধ্যেও অনেকাংশ বাদ পড়েছে, এবং শেষের দিকেও খণ্ডিত। দুটো পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভাষাগত তথা শব্দগত পাঠান্তর অনেক।

মরদন সতেরো শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যেকার কবি। তাঁর কাব্যের কালগত গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহর লীলা ও নিয়তির অমোঘতাই প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও এসব উপাখ্যানেও রোম্যান্সের এবং আদিরসের ভিয়ান রয়েছে। সেকারণে ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন রসিক মানুষের এ জাতীয় উপাখ্যান প্রিয় হওয়ার কথা। মরদনের কবিত্ব কিংবা পাণ্ডিত্য উল্লেখযোগ্য নয় বটে, তবে লোকশিক্ষালক্ষ্যে বানানো লোকশ্রুতির উপাখ্যানকে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত করে কাব্যে রূপায়িত করার গৌরব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে উপাখ্যানের রসকথার মাধ্যমে মুসলিমদের ধর্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান দানের জন্যেই হিন্দুদের মঙ্গলকাব্য রচনার পাশাপাশি এগুলো রচিত হচ্ছিল। সেদিন স্বতন্ত্র জাত-বর্ণ-ধর্ম ও অঞ্চল ভেদে সাহিত্যকর্মও বিভিন্ন হতো।

মঙ্গলপাঁচালীর সঙ্গে এ ধরনের উপাখ্যানের তুলনা করলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর মানুষের জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার তথা জীবনের মূল্যবোধের, আদর্শের ও লক্ষ্যের আর চাওয়া-পাওয়ার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৫. শমশের আলী

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকই প্রথম তাঁদের আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য গ্রন্থে কবি শমশের আলী ও তাঁর রচিত উপাখ্যান 'রেজওয়ান শাহ'র পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদের অবলম্বন ছিল বটতলার ছাপা পুথি। নামে অভিন্ন হলেও উর্দু ও ফারসি 'রেজওয়ান শাহ' উপাখ্যানের সঙ্গে এটির কোন সম্পর্ক নেই। উর্দু ও ফারসি কাব্যটি হচ্ছে রেজওয়ান ও পরী রুহআফজার প্রণয়কাহিনী। উর্দু ও ফারসি দুটো কাব্যের কবি হচ্ছেন ফয়েজ (১৬৮৩ খ্রীঃ) ও মুহম্মদ বাকের আদা (১৭৯৬ খ্রীঃ)। শেষোক্তটির নাম 'গুলজার-ই-ইশক'। মুদ্রিত পুথিটি আমাদের হাতে নেই। আমাদের এ আলোচনার অবলম্বন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত ১২২৬ মঘীসনে বা ১৮৬৪ সনে অনুলিখিত পুথি। এটি তিনি তাঁদের উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হবার পরে সংগ্রহ করেছিলেন। মুদ্রিত পুথিতে তাঁরা নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পেয়েছিলেন ঃ

১. মহাকবি শমশের আলি স্বর্গে হল বাস
খণ্ড কাব্য পুস্তক পূরিতে মোর আশ।
২. জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটাজারী থানা
সে সাকিনে শমশের মহাকবিবর
সুলতানপুর মৌজা জানে সর্বজনা।
৩. রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ্যে শেষে চট্টগ্রাম।

এগুলো আমাদের আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে নেই। প্রথমত এ পাণ্ডুলিপি অক্ষত রয়েছে। কাব্যটিও পূর্ণাঙ্গ। ঈশ্বরস্তুতি দিয়ে শুরু এবং রেজওয়ান শাহর কন্যা জমিলা খাতুনের সঙ্গে হোসামপুত্রের বিয়েতে কাব্যকথা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। পুথির ৮৫,৮৭, ১০৬ পত্রে অর্থাৎ শেষাংশে তিনটি ভণিতা রয়েছে। গোড়া থেকে আর কোথাও কোন ভণিতা নেই।

১. ক্ষুদ্রবুদ্ধি জ্ঞানহীন শমশের আলি
রূপকাব্য বিরচিলা করিয়া পঞ্চালী।
২. হীন শমশের কহে
রাজকন্যার পণ নহে।
৩. হীন শমশের আলি কহে হৈলে শুদ্ধভাব
আবশ্যক দুঃখ শেষে হয় বাঞ্ছা লাভ।

কাজেই খণ্ডকাব্য রেখে শমশের আলী স্বর্গে যাননি। আর আছলাম, মোহাম্মদ হাকিম আলী ও ছেদমত আলী এ কাব্যে সমাপ্তি দান করেন নি। কবির নিবাসও কোথাও উল্লেখিত হয়নি। আর এ পাণ্ডুলিপির আদ্যে রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ এবং শেষেও চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ নেই। যদিও আদ্যে আল্লাহ ও রসুল

প্রশস্তি রয়েছে। গ্রন্থের রচনাকালও নেই। কবির কাব্যে জন্মভূমির, পীরের, পিতামাতার কিংবা সমকালীন রাজার কোন পরিচয় নেই। পরোক্ষে কাজী দৌলতের সতীময়নার উল্লেখ অবশ্য আছে, নায়িকার রূপবর্ণনার প্রারম্ভে কবি বলেছেন ঃ

খণ্ড গ্রন্থ হতে যদি ছন্দ চুরি করি
বঙ্গভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা ধরা পড়ি।

এ খণ্ডগ্রন্থ হচ্ছে সতীময়না, এবং আলাউল কর্তৃক ১৬৫৯ সনে পূর্ণাঙ্গ করার পূর্বেকার উক্তি এটি, আর সতীয়ময়না যেহেতু রোসাঙ্গে রচিত, কবিও হযতো ছিলেন রাজধানী রোসাঙ্গে প্রবাসী এবং কবি যে আরকানরাজ্যান্তগর্ত চট্টগ্রামবাসী ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই, কারণ সেযুগে এ সব কাব্যের প্রচার রাজ্যসীমা অতিক্রম করেনি। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' -এর লেখকরাও এমনি অনুমান করেছিলেন।

এর থেকে কাব্য রচনার কাল ১৬৩৯-৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় বলে মনে হয। আবার সতীময়নার উল্লেখ থাকলেও পদ্মাবতীর উল্লেখ নেই। কাজেই ১৬৩৯-৫১ সালের মধ্যেকার রচনা বলেও অনুমান করা চলে। তবে এ নিছক অনুমান মাত্র। এখানে পাণ্ডুলিপির লিপিকর প্রদত্ত পুষ্পিকা উদ্ধৃত করছি ঃ

সন ১২শ ২৬ মং তারিখে ১৮ বৈশাখ
সমাপ্ত মুনসী শমসের সাহে
বর কৃৎ মুনসী মচকুর (?) ২৬ মগির ভাদ্র
মাস মিত্ত হইআছে মিত্র সকলের
প্রাণে সুল মারীআ।
ভণতি শ্রীযুক্ত মুনসী শামসের আলী
সাহেব পীং অযালি চৌধুরি
এই পুষ্পিকায় গুরুত্ব দিলে কবিকে উনিশ শতকের
প্রথমার্ধের কবি বলে সনাক্ত করা সম্ভব।

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে লিপিকার শমশের আলীর পিতার (সন ১২শ ২৬ মঘীর ভাদ্র মাসে) নামও জানেন, এ যদি সত্য হয় তা হলে এ কাব্য উনিশ শতকে রচিত বলে মানতে হবে। 'রেজওয়ান শাহ' উপাখ্যানের প্রতিপাদ্য বিষয় আল্লাহর অখণ্ডনীয় বিধান। এটিই মানুষের অদৃষ্ট বা বিধিলিপি। যা ঘটবার তা ঘটবেই, মানুষের কোন চেষ্টাতেই তা ব্যর্থ করা যাবে না।

মূল কাহিনী হচ্ছে ঃ নিঃসন্তান ছিলেন রাজা রেজওয়ান শাহ ও তাঁর মন্ত্রী হোসাম। উভয়ের ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে [স্বপ্নাদিষ্ট হলেন রাজা ধন বিবর্তিয়া দিলে (বাঞ্ছা) পুরাইব ঈশ্বর] রাজার কন্যালাভ ঘটে, সে-সঙ্গে হোসামেরও জন্মে এক পুত্র। বন্ধুত্বের খাতিরে সন্তানের গর্ভাবস্থাতেই একের কন্যার সঙ্গে অপরের পুত্রের বিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করে। পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ রেজওয়ান শাহকে ভিখারী করে দিলেন, মন্ত্রী হোসাম রাজ্য পেয়ে গেল। তখন হোসাম আর অঙ্গীকার অনুযায়ী রেজওয়ানের কন্যাকে বধূ করতে চাইল না। দরিদ্র রেজওয়ানকে তাঁর দ্বারী লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিল। রেজওয়ানকে প্রবোধ দানচ্ছলে সিদ্ধা বা ঋষি বা মুনি খোরাসানরাজ ফিরোজ শাহর একটি উপাখ্যান বর্ণনা করল। তাও নিঃসন্তান রাজার প্রার্থনা করে সন্তান লাভ এবং অন্তরীক্ষ বাণী অনুসারে রাজ্য ত্যাগ, মধ্যখানে হীরালাল সদাগর কর্তৃক রানীহরণ, দুই সন্তান হারানো এবং পরে ভিন্ন রাজ্যের নিঃসন্তান রাজার শূন্য সিংহাসন প্রাপ্তি ও স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে পূনর্মিলন। রেজওয়ান শাহও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সাত রাজার গুপ্ত ধন মাটির ভেতর থেকে উদ্ধার করে আবার নতুন রাজ্য স্থাপন করে রাজা হলেন, এ সময়ে হোসামকে শাস্তি দিতে চাইলেও ঋষির কথায় ক্ষমা করতে হল। এদিকে বুদ্ধিমান হোসাম তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ও মন্ত্রীকে পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী ঘটনারূপে পাঠালেন রেজওয়ান শাহর কাছে। দ্বারী হোসামের ভাইকে প্রাসাদে প্রবেশে

বাধা দিল, তখন হোসামের ভাই দ্বিতীয় উপকাহিনীটি বিবৃত করে উদ্ভূত সমস্যার পূর্ব দৃষ্টান্তরূপে ঃ এটি হচ্ছে পারস্যরাজপুত্র চন্দ্রপ্রভা ও চীনরাজকন্যা চন্দ্রাবতীর প্রেমাকহিনী ঃ এক বিয়ে-ঘটানো সন্ন্যাসীরূপী দেবতার মুখে চন্দ্রপ্রভা জানতে পায় যে চীনরাজের চিররুগ্না কুৎসিত কন্যার সঙ্গে তার বিয়েই প্রজাপতির নির্বন্ধ। নিয়তিকে ব্যর্থ করার জন্যে রাজকুমার চন্দ্রপ্রভা সদাগরের ছদ্মবেশে রাজকন্যাকে হত্যার উদ্দেশ্যে চীনে গেল, রাজকন্যার ছিল অর্শরোগ, অন্ধকারে কন্যাহত্যা করতে গিয়ে সে অজ্ঞাতে অর্শ অংশেই অস্ত্রোপচার করে। কন্যা রোগমুক্ত হয়ে পরমাসুন্দরী হয়ে ওঠে। সাত বছর পরে চন্দ্রপ্রভা চীনরাজের আয়োজিত নৃত্যগীত উৎসবে যোগদান করতে গেলে উভয়ের চার চোখের মিলন ঘটে। এভাবে মিলনে সম্ভোগে ও বিবাহে সমাপ্ত এ উপকাহিনী। এ গল্প শোনার পরে দ্বারী হোসামের ঘটকরূপী ভাইকে রেজওয়ান শাহর কাছে নিয়ে গেল, ঋষির মধ্যস্থতায় পূর্ব অঙ্গীকার মতো জমিলা-নসরতের বিয়ে হল। 'আল্লাহ সে কারক মাত্র নব নাম ধরে' আর 'ঈশ্বর নিয়ম নহি লড়ে'।

গল্পগুলো বোধ হয় লোকপ্রচলিত উপাখ্যানের আদলে তৈরি, কোন বিশেষ কাব্যের অনুকৃতি নয়। কবির কবিত্ব-পাণ্ডিত্যও উচ্চমানের নয়। পূর্বোক্ত উর্দু ও ফারসি কাব্য দুটোর খবর জানা ছিল কবির অনুসরণে রচিত নয়, তাই কারো ঋণ স্বীকৃত হয়নি। প্রমাণ কবির উক্তি ঃ এইস্থানে যোগ্য হয় রূপের বর্ণনা কিন্তু আমি শক্তিহীন করিতে রচনা/ উর্দুপুস্তকেতে যোগ্য ব্যাখ্যা নাই। পারস্য গ্রন্থেও ব্যাখ্যা অখণ্ড না পাই। খণ্ডগ্রন্থ হন্তে যদি ছন্দ চুরি করি। বঙ্গভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা উজনপড়ি।... দিল্লীর খসরু কবি রচিত পারস্যভাষার 'শিরি-ফরহাদ' অবলম্বনে কবি চন্দ্রাবতীর রূপ বয়ান করেন। প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিবৃত। উপমাদি অলঙ্কার সংগ্রহে ও প্রয়োগে সুরুচি, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রয়াস সুপ্রকট, এ কারণে রূপবর্ণনাটি সুদীর্ঘ। সম্ভোগচিত্র দানে কবির আদিরসে আসক্তিও সুপ্রকট। এ কাব্যে চন্দ্রপ্রভা-চন্দ্রাবতী রোমান্স অংশটিই আকর্ষণীয়। গল্পগুলো উপদেশাত্মক বলেই নীরস।

সতেরো শতকের অন্যান্য উপাখ্যান প্রণেতা

ফারসি-উর্দু- হিন্দি ঃ তুর্কো-আফগান বিজয়োত্তর কিছুকাল ভারতের দরবারী ফরমানাদির ভাষা ছিল আরবি, কৃচিৎ ফারসি। তারপর ক্রমে ফারসিই দরবারীভাষা হিসেবে চালু হল গোটা ভারতে। পরিণামে কয়েকশ' বছরের মধ্যে ফারসি হরফে ফারসি শব্দবহুল একটি লেখ্য হিন্দুস্তানী লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা বা ভাববিনিময়ের সর্বজনীন মিশ্রভাষাও হল চালু। ষোল শতক থেকে এর একটি আলাদা নামও মিলে গেল—সিপাহি শিবিরে ও বাজারে—উর্দুতে ও উর্দুবাজারে চালু ভাষার নাম হল উর্দু। উর্দু ও হিন্দি বাকরীতির তথা বাক্যগঠন পদ্ধতির দিক দিয়ে একান্তভাবেই নব্যভারতীয় আর্যভাষা। উভয় নামের লেখ্যভাষা মূলত অভিন্ন। পার্থক্য অত্যন্ত স্থূল ও সাম্প্রদায়িক। মুসলিমরা লাহোর থেকে বিহার অবধি অঞ্চলে এবং পাকিস্তানে ফারসি হরফে [কৃচিৎ নাগরী বর্ণমালায়] ফারসি শব্দবহুল [ফারসিতে চালু আরবি-তুর্কি শব্দসহ] উর্দু নমের হিন্দি ব্যবহার করে, যেমন 'মহব্বত করনে কা খায়েস নেহি হৈ'। আর হিন্দুরা স্বাতন্ত্র্যচেতনাবশে নাগরী অক্ষরে আর্য-ভারতীর শব্দবহুল হিন্দি নামের [এর মধ্যে আঞ্চলিক উপভাষা বা বুলি রয়েছে যেমন ঠেট, আওধি, ব্রজভাখা, ভোজপুরী ইত্যাদি] উত্তর প্রদেশের লেখ্যভাষাকে মাতৃভাষা বলে জানে—যেমন 'প্রেম/পেয়ার করলে কা ইচ্ছা নেহি হৈ'। দাক্ষিণাত্যের সুলতানদরবারে ব্যবহৃত ফারসি শব্দবহুল ও ফারসি হরফে লেখা ভাষার নাম 'দাখিনী উর্দু'। এভাবেই উর্দু হিন্দিতে হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্যও সৃষ্টি হচ্ছিল। উর্দুওয়ালার হিন্দিতে এবং হিন্দিওয়ালার উর্দুতে কমবেশি অধিকার ছিলই। প্রমাণ উত্তরভারতের মুসলিম কবিদের মৈনাসৎ, পদুমাবৎ, মৃগাবৎ, মধুমালৎ, গুলেবকাউলি প্রভৃতি লৌকিক উপাখ্যান গ্রহণ। কারণ গোড়াতে এর মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি ছিল না। বিদেশাগত শাসকগোষ্ঠীর স্বদেশী স্বজনেরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানীয় শব্দ-সম্পদ অর্জনে অসমর্থ হয়েই ফারসি-তুর্কি শব্দ যোগে যেমন-তেমন করে মনোভাবের অভিব্যক্তি দিতে চেয়েছে। গোড়াতে

মিশ্রণের মূলে ছিল এ-ই। কালক্রমে তা দ্বেষ-দুষ্ট স্বাতন্ত্র্যচেতনার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলিমের শাস্ত্র-সংস্কৃতিব স্বাতন্ত্র্যপ্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—জল-পানি, লোটা -বদনা, থালা-বর্তন প্রভৃতি। রাজনীতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিব ফলে উনিশ শতকেব শেষপাদ থেকে শুরু হয়ে স্বাধীন ভারতে ও পাকিস্তানে হিন্দি হচ্ছে ফারসিবিহীন ও সংস্কৃতঘেঁষা এবং উর্দু হচ্ছে দেশীশব্দদ্বেষী ও ফারসি ঘেঁষা।

আমরা অন্য প্রসঙ্গে আগেই বলেছি উনিশ শতকের আগে সাহিত্যের বিষয়ে, বক্তব্যে ও লক্ষ্যে শাস্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও শ্রেণীক ভেদ ছিল। তা সত্ত্বেও দেশজ মুসলিম কবিদের কাব্যের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে স্থানীয় রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথা থেকে, সংস্কৃত কাব্যাদর্শ, ছন্দ ও অলঙ্কারতত্ত্বই হয়েছে অনুসৃত আর ভাষা মুখ্যত স্থানীয়, ক্বচিৎ ফারসি। পারস্যে পলাতক সম্রাট হুমায়ুনের ভারতে প্রত্যাবর্তন ও দিল্লীর তখতে প্রতিষ্ঠা ঘটে পারস্যরাজের ও ইরানিসৈন্যের প্রত্যক্ষ সহায়তায়। এমনি রাজনীতিক সহায়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ ভারতে ইরানি চাকুরের সংখ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রবল ও অমোঘ হয়ে ওঠে। ফারসি যদিও অনেক আগে থেকেই দরবারীভাষা, তবু ফারসি সাহিত্যের প্রভাব উত্তর ভারতে ছিল ক্ষীণ। এবার বহু ইরানির সমাবেশের ফলে এবং পরে সাফাভী বংশীয় রাজত্বের অবসানে ভারতে ইরানির সংখ্যা সর্বত্র বৃদ্ধি পায়। কাজেই আকবরের আমল থেকেই দেশজ মুসলিমদের কাব্যের বিষয়রূপে ইরানি উপাখ্যানাদি বিশেষভাবে এবং বেশি করে চালু হল। এ বিষয়গত প্রভাবতরঙ্গ উত্তরভারতে এবং বাঙলাদেশে ও রোসাঙ্গে প্রায় সমভাবেই মানুষের মনে-মননে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য দাক্ষিণাত্যে—বেরারে বিদরে বিজাপুরে আহমদনগরে গোলকুণ্ডায় শিয়া সুলতানের আগ্রহে ও প্রভাবে ফাবসি কাব্যের ও ইরানের শিয়াসাহিত্যের চর্চা ও অনুবাদ আগেই চালু হয়।

উপাখ্যানে জীবনচিত্র

আমাদের সাহিত্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দেব-দৈত্য-রাক্ষস-যক্ষ-গন্ধর্ব-অপ্‌সরা আগেও ছিল, এবার এদের সঙ্গে যুক্ত হল জীন-পরী-দেও-পরীলোক রোকামশহর কিংবা গুলিস্তাঁ-ইরান প্রভৃতি।

অন্য প্রসঙ্গে বলছি যে সে-যুগের সাহিত্যে পাঠাক-শ্রোতার জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার স্তর অনুযায়ী তাদের জগতে অবাস্তব অসম্ভবের পরিধি ছিল সীমিত। অলৌকিক অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাদের আস্থা ছিল গভীর, ব্যাপক ও অবিচল। তাই অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনাব সমাবেশ প্রায় অপরিহার্য ছিল সাহিত্যে তাদের রসের, বিশ্বাসের ও প্রয়োজনের জগৎ নির্মাণের জন্যে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে, নদ-নদী-নগরীর পরিবেশে, জীন-পরী-ভূত-প্রেত-অপ্সরী-কিন্নরীর উপস্থিতিতে, দেব-দৈত্য-রক্ষ-যক্ষ প্রভৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় মানবজীবনের বিশেষ করে উচ্চকোটির নায়ক-নায়িকার জীবনের বিচিত্রলীলার বর্ণালি অতিমানবিক কাহিনীই ছিল আমাদের কবিদের অবলম্বন এবং দেবতা-রাজা-উজির-কোটাল প্রভৃতি শাহ-সামন্ত শ্রেণীর মানুষ কিংবা দৈত্য-দানব-রাক্ষস-খোক্ষসের ভাব-কর্ম -আচরণই ছিল বর্ণিতব্য বিষয়, তার নীচে কেউ নামেনি। তাই রাজপুত্রের হাজার হাজার অনুচর ঝড়ো সমুদ্রে ডুবে গেলেও, না কবি, না পাঠক—কারো মনে বিপন্ন মানুষের করুণ মৃত্যুর ও স্বজনের শোকের কথা জাগেনি, রাজপুত্তর বাঁচলেই হল! তাঁদের জীবনবোধও ছিল স্থূল। তাঁদের চেতনায় বাহুবল মনোবল আর লিপ্সা-বাঞ্ছাই ছিল নায়ক জীবনের আদর্শ। রূপতৃষ্ণাই ছিল জীবন-প্রেরণার উৎস, সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল সে জীবনের ব্রত এবং জয় আর জরু ও জমি ভোগই ছিল লক্ষ্য। সে-উপাখ্যানের জগতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সঞ্চরণে, নদী-গিরি-অরণ্য-মরু-কান্তার অতিক্রমণে, নাগের বাঘের কবল উত্তরণে নায়কের পক্ষে বাধা বিঘ্ন সামান্যই। সেখানে পাখি তত্ত্বকথা বলে, রাক্ষস প্রতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়ায়, দৈত্য হয় বৈরী, দেবতা করেন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

দেব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ দিয়ে শুরু হলেও ক্রমবিকাশের ধারায় দেব-দৈত্যের জীন-পরীর পাশে মানুষও হলো জিজ্ঞাসাব বিষয়। এভাবেই সাহিত্যে মানুষের অলীক আকাঙ্ক্ষার ও কল্পনার জগতে অধিক পরিমাণে মানবিকরস অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রতিযোগিতায়, দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামেই জীবনের স্ফূর্তি, প্রাণের প্রকাশ, চিত্তের উল্লাস। দ্বান্দিকজীবনই মানুষের কাম্য। দুর্বল এ বৃত্তি চরিতার্থ করে ক্রীড়ায়, সবল করে সংগ্রামে। বাহুবল, মনোবল ও বিলাসবাঞ্ছাই রূপকথার ও উপাখ্যানের জগতে মানুষের জীবনবেদ। প্রাণশক্তি আর দুর্বার কামনাই এ জগতে জীবনের নিয়তি। অন্ধ আবেগনিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম সিদ্ধিবাঞ্ছাই এ জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এ জীবনের ব্রত এবং ভোগ-উপভোগের সুখই লক্ষ্য। এককথায় বীরযোগ্য সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে প্রকাশিত।

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

আমাদের আলোচ্য সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল সে ধরনের রচনা। এরূপ প্রণয়োপাখ্যান হচ্ছে জেবল মুলুক-শামারোখ, লালমোতি-তাজলমুলুক, আজরশাহ সমনরোখ প্রভৃতি। নামেই প্রকাশ এগুলোর উৎস ফারসিসাহিত্যে এবং আরবি আলেফ লায়লা প্রভাবিত। এসব হচ্ছে পরী-মানুষের প্রেম ও পরিণয় কাহিনী। 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' আলেফ লায়লার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যানগুলোর একটি। আলেফ লায়লার ৭৫৭-তম রজনীতে এ উপাখ্যানের শুরু এবং ৭৭৮-তম রজনীতে এর সমাপ্তি। এই রোমাঞ্চকর প্রণয়োপ্যাখ্যান নিয়ে অনেক গ্রন্থে রচিত হয়েছে ফারসি ও তুর্কি ভাষায়। কবিগণ নিজেদের ভাষায় ও নিজেদের কথায় উপ্যাখ্যান বিবৃত করেছেন বটে, কিন্তু এ কাহিনী জগদ্বিখ্যাত বলেই হয়তো কেউ সাহস করে নিজের নাম রচনার সঙ্গে যুক্ত করেননি। তাই ফারসি ও তুর্কি কিস্‌সাগুলো অজ্ঞাতনাম কবিদের। ভারতে, ইরানে ও মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন কবি রচিত কয়েকটি তুর্কি-ফারসি পুথি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করবার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আবার কোন কোন পুথিতে কাহিনী হয়েছে পল্লবিত, এমন কি কাহিনীর জের পর প্রজন্মেও টেনে নেয়া হয়েছে।

য়ূরোপের ও পাক-ভারত-বাঙলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথিগুলোর মধ্যে তিনটে পুথি উল্লেখ্য ঃ একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ফারসি পুথি। এতে সাইফুলমুলুকের পুত্র তাজলমুলুকের সিংহাসনারোহণ ও তার মাতা বদিউজ্জামালের আত্মহত্যার কাহিনী বিবৃত। আর একটি গ্রন্থ মুহম্মদ আব্দুর রশিদের সম্পাদনায় নেওলকিশোর কর্তৃক লাহোর থেকে ১৯১০ সালে প্রকাশিত। এই ফারসি কাব্যের রচয়িতা মহফিল। এটি কবির তখল্লুস বা কলমীনাম। কাব্যের নাম নুসসাহ-ই-খায়ের অল মুলুক মশহুর বাহ্‌ তুহফাহ্‌ অল মুলুক। কবির স্বনামে এটিই একমাত্র ফারসি গ্রন্থ। আর আদিলশাহী দরবারের কবি গওয়াসি দাখিনী উর্দুতে 'সইফুলমুলুক-বুদিউজ্জামাল' উপাখ্যান রচনা করেন ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলায় আমরা দোনাগাজী,আলাউল ও শায়ের মালে মুহম্মদ রচিত উপাখ্যান পেয়েছি। বাঙলা পুথিতেও কাহিনী কোথাও দীর্ঘ আবার কোথাও হ্রস্বীকৃত।

হাজার পুরানো আলেফলায়লার এই কিস্‌সার ঔজ্জ্বল্য আজো অম্লান। আজো এ কাহিনী রোমান্টিক মনের ক্ষুধা মিটায়। চলচ্চিত্র দর্শকরাও মুগ্ধ হয়েছে এই বেদনা-মধুর প্রণয়-চিত্রের প্রেমৈক প্রাণময়তায়।

গল্পের রূপ-রেখা ঃ মিসররাজ ছিলেন নবী সোলায়মানের করদ রাজা। তিনি নবীর ধর্মে নিলেন দীক্ষা, সোলায়মান খুশী হয়ে তাঁকে তিনটে উপহার দিলেন আঙটি, কাবাই (আলখল্লা) ও ঘোড়া। তিনটেই অলৌকিক শক্তিধর। আঙটির যাদুবলে দেও-দৈত্য বন্দী রাখা চলে আর রাক্ষস ও দানবের অবধ্য হওয়া যায় এবং গর্ন্ধব-কিন্নরও থাকে বশে। আর কাবাইতেই মিসররাজপুত্র এক ঘুমভাঙা রাতে অপরূপ রূপসী বদিউজ্জামালের অবয়ব দেখে, এবং অশ্বের গুণ হচ্ছে—

অতি লম্ব গতি চলে জিনি জলধার।
অগ্নি জিনি তেজবন্ত বাউ জিনি গতি।

এই তিন উপহার মিসররাজের তিন প্রিয়জনকে দেয়ার নির্দেশ ছিল। সোলায়মান বলেছিলেন 'এক স্থানে তিন দ্রব্য না দিও কাহারে।' রাজকুমারের নাম সয়ফুলমুলুক আর রাজবন্ধু ও মন্ত্রী সালেহ্‌র পুত্রের নাম ছিল সায়াদ। সায়াদ কুমারের সহচর ও বন্ধু। 'দুই মাত্র একপ্রাণ দুই কলেবর'। জন্মও হয়েছিল একই দিনে। ওদের বয়স যেদিন চৌদ্দ বছর পূর্ণ হল, সেদিনই রাজা পুত্রকে আঙটি আর কাবাই এবং সায়াদকে দিলেন অশ্ব। রাজকুমার সে-রাত্রেই শয়নকক্ষে রাখা কাবাইতে অঙ্কিত প্রাণবান তসবীর দেখল আর তখন থেকেই হল বিরহী ও বিবাগী। জামাতে দেখা রূপসীর নাম-ঠিকানা জানা ও তার কাছে পৌঁছা সহজ ছিল না। তাই নৌবহরযোগে বন্ধু সায়াদকে নিয়ে সয়ফুলমুলুকের নিরুদ্দেশ যাত্রা হল শুরু রূপসী সন্দর্শন লক্ষ্যে। তারপর সাত সমুদ্দরের অনিশ্চয়তায় পাড়ি জমানো, চীন-কর্তিত-জঙ্গীদেশ ভ্রমণ, এবং মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে লোকলস্কর ও সায়াদকে হারিয়ে বিপন্ন ও নিঃসঙ্গ সয়ফুলমুলুক আজব জন্তুর সাগর ও আজব চর কপি রাজ্য, পিপঁড়ের চর, সরন্দীপ, ওয়াচীন প্রভৃতি অদ্ভুত সব দেশ হয়ে মানুষখেকো গুলের, দানবের সাগরকন্যার, ভাল্লুকের, কুমীরের রাক্ষসরাজের কবলমুক্ত হয়ে অবশেষে এক দৈত্যের বন্ধুত্ব লাভ করে তার কাঁধে চড়ে হাজার বছরের দূরত্ব আকাশপথে অতিক্রম করে বদিউজ্জামালের বাপের রাজ্য গুলেস্তাঁইরামে পৌঁছতে পারল। পথে অবশ্য সায়াদের সঙ্গে আকস্মিকভাবে সয়ফুলের মিলন ঘটে। তারপর আরো বড় ছোট অনেক বিপদ সঙ্কট উত্তীর্ণ হবার পবে বিশ্বের বহু অতিথির উপস্থিতিতে বিশেষ ধুমধামে জাঁকজমকে বিয়ে হল মনুষ্যসন্তান সয়ফুলমুলুকের পরীরাজ শাহাবাল-কন্যা বদিউজ্জামালের সঙ্গে এবং সায়াদের সঙ্গেও বিয়ে হলো সরন্দীপরাজকন্যা মালেকার। এ-ই হল বিপুল কলেবর কাব্যের দীর্ঘ কাহিনীর রূপরেখা।[১]

আলেফলায়লার, দোনাগজীর, আলাউলের ও মালে মুহম্মদের উপাখ্যানে বৈসাদৃশ্য অনেক। এতে বোঝা যায় কেউ কারো গ্রন্থের নিষ্ঠ অনুসরণ করেন নি, কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে স্বাধীন অনুসৃতিই সর্বত্র দৃশ্যমান, তার সঙ্গে স্ব স্ব ভাব, কল্পনা, রুচি ও ভঙ্গি-যুক্ত প্রত্যেক কাব্যই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ও কবিত্বে পাণ্ডিত্যে বিশিষ্ট। অবশ্য সব কবির শক্তি যে সমান নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলাউল ও মালে মুহম্মদের কাব্য যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

এ কাব্যের সর্বত্রই adventure ও thrill উচ্ছলিত। কালিদাস যেমন মেঘদূতে যক্ষদম্পতির অন্তর্বেদনা বর্ণনাচ্ছলে ভারতবর্ষের প্রকৃতির ও জীবনের পরিচয় দিয়ে গেছেন, এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি মেঘকে বাঁকা পথে পাঠিয়েছিলেন অলকায়, কবি দোনাগাজীও তেমনি প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই যেন লেখনী ধারণ করেছিলেন। এখানেও কবি নায়কের অভিসারের বা প্রণয়াভিযানের নিরুদ্দেশযাত্রা বর্ণনার সুযোগে জীব ও উদ্ভিদ জগতের অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়েছেন। কালিদাস তাঁর উদ্দেশ্যের অনুগত করে আকাশের মেঘকে কৃত্রিম উপায়ে চালিত করেছেন; দোনাগাজীও ঝড়ের পর ঝড়ের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ঝড়ো সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত এবং আকাশে 'সিমুর্গ' কবলিত সয়ফুলমুলুকের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল পৃথিবী পরিক্রমা। এ কাব্য পাঠকালে মনে পড়ে যায় য়ুরোপীয় পর্যটক ও অভিযাত্রীদের কথা। নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় বেরিয়ে তাঁরাও লাভ করেছিলেন এমনি সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যেখানে জ্ঞানের শেষ, সেখানেই কল্পনার ও বিশ্বাসের শুরু; সেকালে মানুষের জ্ঞান ছিল সীমিত, তাই কল্পনা দিয়েই পূর্ণ করতো তাদের জ্ঞানের কোঠা, আর বিশ্বাস তো অজ্ঞতারই সন্তান। তাই সেকালের অনভিজ্ঞ মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস-কল্পনার উৎস ও আশ্রয় ছিল সোলায়মানী পুরাণ ও সিকান্দরী জরিব। আবার এ দুটোই যে জিজ্ঞাসু মানুষের কল্পনার প্রসূন, তা বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। সেকালে মানুষের জীবন অঞ্চলের সীমায় বদ্ধ থাকত বটে, কিন্তু মনে জানত ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝত যে পৃথিবী অনেক বড়। কাজেই লোকালয়ের বাইরে যে জগৎ জ্ঞানের অগোচর, সে-জগতে রয়েছে এমন সব প্রাণী ও উদ্ভিদ যার কেবল কল্পনাই সম্ভব। একেবারেই মিথ্যা কিছু কল্পনা করেনি মানুষ। জীব-উদ্ভিদ জগতে বহু বিচিত্র, ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত সব জীব ও উদ্ভিদ তো সত্যি রয়েছে জলে স্থলে সাগরে সাহারায় পরিব্যাপ্ত হয়ে।

---

১. *বিস্তৃত আলোচনা মৎ সম্পাদিত 'দোনাগাজী রচিত সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।*

সে-যুগের স্বল্পজ্ঞান মানুষের জীবন ছিল ভয়, বিশ্বাস, বিস্ময় ও কল্পনা নির্ভর। তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানে ও তাত্ত্বিকবোধে পার্থক্য ছিল সামান্যই। কাজেই দোনাগাজীর কাব্য অদ্ভুতরসাশ্রিত নয়, সমকালীন জীবন-চেতনারই প্রতিকৃতি মাত্র। আজকের যুগে এ কাব্য আমাদের কাছে অদ্ভুত, অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বলে মনে হলেও সেদিন পাঠকের ও শ্রোতার কাছে এ কাব্য ছিল বাস্তব জীবনরসসিক্ত চেতনাজগতের আলেখ্য। কেননা তাদের চেতনায় স্বপ্নের ও কল্পনার,বিশ্বাসের ও বাস্তবের ব্যবধান আজকের মতো এমন প্রকট ছিল না। তাদের বোধে জীবন ছিল নিয়তিনির্দিষ্ট। কাজেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, ধন-জন, মান-যশ ছিল আল্লাহর হাতে। অতএব তাদের ধারণায় এ সব ক্ষেত্রে মানুষের কোন ভূমিকা নেই তারা কেবল নিমিত্ত—অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নিজের জীবনের এই নিষ্ক্রিয়তা তাদের মনোজগতে ঐশ্বর্যবান দুঃসাহসিক নায়ক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল, জীবনের বৈষয়িক ভাবনামুক্ত রাজকুমারই তাদের প্রতিভূ ও প্রতিনিধি—তাদের বাঞ্ছা রাজপুত্রের মাধ্যমেই সিদ্ধি ও অভিব্যক্তি খুঁজেছে।

সুন্দর ও কদাকার, শান্ত ও হিংস্র, আশ্চর্য ও বিভীষিকাময় স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণীর বিস্তৃত বর্ণনায় কবির উৎসাহ অশেষ। তরুলতায় আর ফুলফলের বর্ণনায়ও কবির অবহেলা ছিল না। নিসর্গপ্রকৃতির ও প্রাণিজগতের প্রতি কবির এই আকর্ষণ, এই মানষপ্রবণতা ও সাফল্য কবিকে করেছে বিশিষ্ট, কাব্যকে দিয়েছে অনন্যতা। নাতিস্থূল রুচি ও অপরিণত মনীষাসম্পন্ন পাঠকের কাছে কাব্যের আবেদন আজো অশেষ। এ যুগেও উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য হিসেবে এর অনেক অংশই পাবে বিশেষ কদর।

রোমান্টিক কল্পনার এমন অবাধ বিস্তার মধ্যযুগেও ছিল বিরলতায় দুর্লভ। এ কাব্যে রস আছে, রস-বৈচিত্র্যও আছে, নেই কেবল কাব্যোক্ত নর-নারীর চারিদিকে রঙভেদ। ভালো যারা তারা অতি ভালো, মন্দ যারা তারা নিরেট মন্দ। অবশ্য আত্মার ও আত্মত্রাণের গরজে ভালোরাও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। এ কাব্যে যারা মন্দ তারা কেউ পুরো মানুষ নয়। এদের কেউ কুকুরমুখো, কেউ শুকরমুখো, আবার কেউ বা বানরমুখো নিগ্রো এবং সবাই আরণ্যজন—জঙ্গলী বা জঙ্গী। তবু এদের মধ্যেও দেখতে পাই হৃদয়বান দৈত্য, সঙ্গীতরসিক জঙ্গী, রূপমুগ্ধা নারী যারা মানুষখেকো হয়েও হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তির প্রভাব স্বীকার করে। বানর হয়েও সংস্কৃতিবান কিংবা দানব হয়েও শত্রুর গুণমুগ্ধ, সুবিবেচক, প্রীতিপরায়ণ ও উদার। সবাই স্বধর্মনিষ্ঠ এবং নীতিবোধও তাদের তীক্ষ্ণ ও প্রবল, এমনকি যে-দানব লম্পট তারও। তবু কাব্যোক্ত পাত্র-পাত্রীদের বহির্জীবনে বৈচিত্র্য আছে, মনোজগতে কিন্তু তেমন কোন বর্ণালি বিকাশ নেই।

উৎকণ্ঠ অকুতোভয় নায়কের সম্পর্কেই এসেছে অন্য পাত্র-পাত্রীরা, তার জীবনেই এসেছে বাধাবিপত্তি ও প্রেম-বিরহ-মিলন, তাকে জড়িয়েই কবি বর্ণনা করেছেন সব ঘটনা দৃশ্য ও জীব-উদ্ভিদের কাহিনী, প্রকাশ করেছেন সব বক্তব্য। তাই কোন বর্ণনাই অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। তবু কবির বর্ণনায় সর্বত্র অতিশয়তা লক্ষণীয়। তাঁর হাতে কাহিনী বিস্তৃতি পেয়েছে। কবি কথক, বাক-পটু ও আবেগপ্রবণ। সংযত বর্ণনার সৌন্দর্য-বুদ্ধি তাতে অনুপস্থিত। বাক্-জাল বিস্তারের আগ্রহই তাঁর বিশেষ প্রবল। এ ক্ষেত্রে মালে মুহম্মদ সংযতবাক এবং আলাউল মধ্যপন্থার অনুসারী। ফলে দোনাগাজীর কাব্যই বাঙলার 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' উপাখ্যানের বৃহত্তর গ্রন্থ।

দোনাগাজী চৌধুরীর দেখবার দৃষ্টি, ভাববার মতো হৃদয় ছিল। তাই তাঁর সমাজের আচার-আচরণের রীতিনীতির ও উৎসব-পার্বণের নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করতে পেরেছেন তিনি। অবশ্য রাজা-বাদশার ব্যাপার বলে তা অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শায়িত; কিন্তু তবু বাস্তবের ছোঁয়ামুক্ত নয়। তা ছাড়া আকর্ষণীয় করে বলার কায়দাও ছিল তাঁর আয়ত্তে। তাঁর বাকভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রভা ও রসিক মন। আর বুদ্ধিদীপ্ত উক্তির আপ্তবাক্যের সুউক্তির ও উপমাদির সুপ্রয়োগে ও সুবিন্যাসে তাঁর কাব্য উজ্জ্বল। কবিত্বের দ্যুতিও সুলভ। সবটা মিলে একটা স্নিগ্ধ সুষমায় এ কাব্য প্রীতিপদ।

১. দোনাগাজী চৌধুরী

কবি পরিচিতি ঃ সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত দোনাগাজীর সয়ফুলমুলুক-বদি-উজ্জামাল পুথির একমাত্র ও প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে [প্রায় আড়াইশ' বছর আগের] দোনাগাজী চৌধুরীর তিনটে ভণিতা পাওয়া যায় ঃ

১. দোনাগাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেশ/রচিল বিরহ পুথি চিত্তের আবেশ। ঢাঃ বিঃ ৫২৪ পৃঃ ৫৮

২. কহে দোনাগাজী শুন দুঃখের কাহিনী/এ হৃদএ জলএ অতি বিরহ আগুনি। ঐ পৃঃ ৯০

৩. কহে দোনাগাহী দুঃখ ধীরে ধীরে যাএ/যাইতে নাহিক শ্রধা ফিরে ফিরে চাহে। ঐ পৃঃ ১০০

আর অধ্যাপক আলী আহমদ-সংগৃহীত ও বাঙলা একাডেমীতে রক্ষিত দুটো পুথিতে [২৩০ এবং ৪৬২ সংখ্যক] একই প্রসঙ্গে একটি ভণিতা মেলে। যথা ঃ ১. কহে শ্রী দোনাগাজী হিমালের দৃষ্টে/ভোজন করিতে যাএ গজ লৈয়া পৃষ্ঠে। ২৩০ সং।

২. কহে হীন দোনাগাজী নিয়তি নির্দিষ্টে/ভোজনের কালে পুনি গজ রহে পৃষ্ঠে। ৪৬২

আর সব সংগৃহীত অর্বাচীন পুথিতে রয়েছে এক গায়েন-লিপিকার 'বিরহিম'-এর ভণিতা। লোকটির বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল স্বল্প। তাই তাঁর দেয়া চারটি ভণিতাই ভাবে ভাষায় ছন্দে ত্রুটিপূর্ণ। [বাঙলা একাডেমী পুথি ঃ ২৩০, ২৬২, ৪৫৩, ৪৬৩ দ্রষ্টব্য] দোল্লাই দেশ বা পরগনা ছিল আধুনিক কুমিল্লা জেলায়। চাঁদপুর মহকুমার 'সোসাইর দ্বীপ' গাঁয়ে কবির বংশধর আছে বলে জেনেছি। পাণ্ডুলিপির প্রাচীনতার সাক্ষ্য, ভণিতার বিরলতা আর

তুরুকি এরাকি ছিল মিসির ফারসি
রুমী ঘোরাসানী তবে আর যথ দাসী।
রুম শাম এরাক ফারসি হিন্দুস্তান
ইরান তুরান চীন বঙ্গ খোরাসান।

বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্তধারণার অভিব্যক্তি প্রাচীনতার দ্যোতক বলে মনে হয়। তাই দোনাগাজীকে আমরা অন্তত সতেরো শতকের কবি বলে অনুমান করি। তাঁর চৌধুরী উপাধি থেকে বোঝা যায় তিনি ধনী-মানী ঘরের সন্তান।

২. আব্দুল হাকিম

আবদুল হাকিম বহু গ্রন্থ প্রণেতা। বটতলার ছাপাপুথি সূত্রে জানা যায়, নোয়াখালীর সুধারামে ছিল তাঁর পৈতৃক নিবাস। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রাজ্জাকও ছিলেন পীর-দরবেশ এবং স্থানীয়ভাবে প্রখ্যাত। তাই কবি ভণিতায় প্রায়ই নিজেকে শাহ রাজ্জাক-নন্দন আবদুল হাকিম বলে পরিচয় দিয়েছেন। এবং ভণিতায় ঘন ঘন পীর মুহম্মদ শাহাবুদ্দীনের নামও যুক্ত করেছেন। এমনকি পীরের নামে স্বরচিত নসিয়তনামার নাম 'শাহাবুদ্দীননামা' রেখেছিলেন–'শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ পীর গুণবান/রাখিলাম শাহার নামে পুস্তকের নাম।' [শাহাবুদ্দীননামা, পুথিপরিচিতি পৃঃ ২৭৮।] আবদুল হাকিমের সময়েও শাস্ত্র-সম্পৃক্ত কথা বাঙলায় লেখা দূষণীয় তথা পাপজনক বলে মনে করা হতো। তাই আবদুল হাকিম তাঁর শাহাবুদ্দীননামায় বলেছেন ঃ

এলেম প্রদীপে নাশ ঘর অন্ধকার।........
আরবি পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বচন।
যথেক এলম মধ্যে আরবি প্রধান।
আরবি পড়িতে যদি না পার কদাচিত
ফারসি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত।
ফারসি পড়িতে যদি না পার কদাচিত
নিজেদেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত।

মুল আরবি পড়ে শাস্ত্রকথা জানা উত্তম, তারপরে স্থান ফারসি ভাষার এবং শাস্ত্রকথার ক্ষেত্রে তারপরে স্থান দেশী ভাষায। তাই কবি বলেন—

আরবি এলম জান শাস্ত্র মুসলমানি
যথেক এলম মধ্যে আরবি বাখানি।
ফারসি এলম হএ আরবি তনএ
আরবি অনুরূপ ফারসি লিখএ।
হিন্দু (বাঙলা অর্থে) শাস্ত্র পুস্তক যে ফারসির নন্দন
পুস্তকে লিখ এ ফারসির বিবরণ।
এ তিন এলম মধ্যে এক নাহি যার
নিশ্চএ তাহার দীন ঘোর অন্ধকার। (পু. পরিচিতি, পৃঃ ২৭৯)

আরবি কিংবা ফারসি বা বাঙলা যে জানে না তার দীন (ধর্ম) বা দিন (দিবস) ঘোর অন্ধকার। এখানে কবির উক্তি থেকে আরো একটি তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে 'হিন্দুশাস্ত্র পুস্তক যে ফারসির নন্দন'। অর্থাৎ দেশীভাষায় রচিত শাস্ত্র গ্রন্থগুলো সাধারণভাবে ফারসি থেকে অনূদিত।

শাস্ত্রকথা বাঙলায় রচনা করে কবি নিন্দিত হয়েছিলেন, তাই 'নুরনামা' রচনা কালে বিক্ষুব্ধ কবি বলেছেন ঃ

(আরবিতে) কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস
সে সবে কহিল মোতে মন হাবিলাষ...
তে কাজে নিবেদি বাঙ্গলা করিয়া রচন
নিজ পরিশ্রমে তুষি আমি সর্বজন।
আরবি-ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত
যদি বা লিখএ আল্লা-নবীর সিফাত।
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়াএ
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে ন যা এ
মাতাপিতাসহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি-
দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।---
সর্ববাক্য প্রভু কিবা হিন্দুয়ানি
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যথ ইতি বাণী।—
আল্লা-খোদা-গোঁসাই সকল তান নাম
সর্বগুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম।
মারফত-ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর (হিন্দুস্তানের/বাঙলা) অক্ষর
হিংসে সে সবের গণ।
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
নিজ দেশী ভাষাএ করি গ্রন্থ সকল[১]
আমি সব আগে কর সঙ্কট কুশল।'
কিতাব পুস্তক দোহে নাহি ভিন্ন ভেদ
রচিল পুস্তক অক্ষর হিন্দুয়ানী।[২]

শাহ রাজ্জাব-নন্দন আবদুল হাকিম নুরনামা, শাহাবুদ্দিননামা (নসিয়তনামা) সভারমুখতা, চারিমোকামভেদ, দোররেমজলিস প্রভৃতি তত্ত্বগ্রন্থ এবং ইউসুফ-জোলেখা ও লালমোতি-সয়ফুলমুলুক নামের দু'খানা প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন।, ভণিতা—

১. শাহাবুদ্দিন মহম্মদ পীর গুণবান
২. সেই পদ বিনা অন্য নাহি মোর ত্রাণ
আবদুল হাকিম শাহ রাজ্জাকনন্দন।
রচিলেক জলেখার বিরহ বেদন।

---

১. পুথির পাঠ ঃ নিজ দেশীভাষা করি গ্রহতে সকল। পুথি পরিচিতি, পৃঃ ২৬১

২ অধ্যাপক আলি আহমদ তাঁর সম্পাদিত নূরনামায় উদ্ধৃত শেষ আট চরণ পুথিতে মেলে না—এ যুক্তিতে এ অংশটি প্রক্ষিপ্ত মনে করেছেন। কিন্তু শাহাবুদ্দীননামার ও নুরনামার বক্তব্য স্মরণে রাখলে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবে অশ্লীল বলে রুচিবান কিংবা বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগহীন লিপিকার এ অংশ বাদ দিয়েছেন বলেই আমার ধারণা।

৩. শাহাবুদ্দীন মহম্মদ চরণ বন্দিয়া।
আবদুল হাকিম শাহ পাঁচালী রচিয়া।—লালমোতি

শাহ মুহম্মদ সগীর প্রসঙ্গে আমরা ইউসুফ-জোলেখা কাহিনীর উৎস ও কাহিনীর কাঠামো আর প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করছি। সগীরের গ্রন্থে 'ইবন আমীন ও চন্দ্রপ্রভা' উপাখ্যান যুক্ত রয়েছে। আবদুল হাকিমের কিংবা শায়ের ফকির গরীবউল্লাহর অথবা উনিশ-বিশ শতকের শায়ের ফকির মুহম্মদ, গোলাম সাফাতুল্লাহ ও সাদেক আলীর কাব্যে ওই উপাখ্যান নেই। ফিরদৌসীর নামে চালু আদি ইউসুফ-জোলেখা ছাড়া আবদুর রহমান (১৪১১-৯২) জামীর ইউসুফ জোলেখাই (১৪৮৩ খ্রীঃ) মুসলিম জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, যদিও ফিরদৌসীর পূর্বেও অজ্ঞাতনামা দুই কবির অপ্রাপ্ত দুখানি ইউসুফ-জোলেখা কিস্‌সা-কাব্য ছিল বলে ইরানে জনশ্রুতি রয়েছে। পরেও অনেকে গদ্যে ও পদ্যে এ কাহিনী রচনা করেছেন। আবদুল হাকিম জামীর কাব্যই অনুসরণ করেছেন—

মোল্লা জামীর বাক্য শিরেত লইয়া
আবদুল হাকিমে কহে বাঙ্গলা রচিয়া।
ইউসুফ-জোলেখা কিস্‌সা হৈল সমাপ্ত
ফারসি কিতাব ভাঙ্গি বাঙ্গলা পদস্থ। [পু. পরিচিতি, পৃঃ ১৯]

কাজেই শাহ মুহম্মদ সগীর মৌলিকতায়, সৃষ্টিশীলতায় ও কবিত্বে প্রথম ও প্রধান। আবদুল হাকিম জামীর কাব্যের শ্রেষ্ঠ ও সুষ্ঠু অনুবাদক নন। তবে তাঁর কাব্যে কবিত্বের দ্যুতি দুর্লভ নয়। আর গরীবুল্লাহর কাব্যে নবীর মহিমা ও চরিত্র খর্ব হয়েছে। যথাস্থানে শায়ের ফকির গরীবুল্লাহর কাব্য আলোচিত হবে। আবুদল হাকিমের কাব্যে আজিজমিসির আর জোলেখার প্রেম হচ্ছে ঃ

কুমুদের প্রেম যেন চন্দ্রের সঙ্গতি
জলমধ্যে কুমুদ গগনে নিশাপতি।
ভূমিপৃষ্ঠে কমলগগনে দিবাকর
কমলের প্রেম যেন সূর্যের উপর।
চকোরের প্রেম যেন চন্দ্রের সহিত
গ্রাসিবারে শশধর উঠে প্রতিনিত।
তেহেন আজিজ প্রেম জোলেখার উপর
ধরিতে না পারে চন্দ্র আপনার কর।
একস্থানে আজিজের জোলেখার পিরীত
জোলেখা আকাম যেন আজিজ ভূমিত।

এ অংশটি প্রখ্যাত বৈষ্ণবপদ ঃ ভানু কমল বলি-সেহো নহে হেন
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ......
ইত্যাদি সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুবচন আর তত্ত্বকথাও রয়েছে অনেক, যেমন

১. অকাজে পুষ্পের রূপ মনেত উল্লাস
প্রভাতে বিকাশে পুষ্প সন্ধ্যাতে বিনাশ।

২. তৃষ্ণাকুলে উচিত বিলম্বে জলপান।

লালমোতি-সয়ফুলমুলক

আবদুল হাকিমের অপর প্রণয়োপাখ্যান হচ্ছে লালমোতি-সয়ফুলমুলুক। এটিও কোন ফারসি উপাখ্যানের আদলে ও অনুসরণে রচিত।

শুন কহি গুণিগণ কেতাবের লিখন
সত্য জানহ নিশ্চয়।

গল্পের কাঠামো এই ঃ নবী জুলকর্ন সিকান্দর বাদশাহর পুত্র সয়ফুলমুলুক এক পর্যটকের মুখে পশ্চিম দেশের তথা এমরান রাজকন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনে বিবাগী হয়ে তার সন্ধানে ঘর

ছাড়ে। তার সহায় জলদেবতা খাওজা খিজির এবং স্থলদেবতা ইলিয়াস। সমুদ্র উত্তরণে সহায় হয় সর্পরূপী ফিরিস্তা। এমরান রাজ নির্দেশিত ছয়টি পরীক্ষায় যথা ১. সহস্র মণ ওজনের কুঠারের এক কোপে পর্বত আকারের কাষ্ঠ দুখণ্ড করা ২. পৃথিবীব্যাপী ছিটানো শস্য কুড়িয়ে আবার মেপে দেয়া, ৩. হাজার মণের অন্ন রেঁধে একা ভোজন করা ৪. মানুষখেকো ঘোড়া বশ করে তার পিঠে চড়া ৫. পর্বতপ্রমাণ বিপুলকায় হিংস্র গাভীর দুধ দোহন করে পান করা ৬. সহস্রগজ দীর্ঘ ও গভীর কূপ ধন দিয়ে পূর্ণ করা—উত্তীর্ণ হয়ে এমরানকন্যা লালমোতিকে লাভ করে সয়ফুলমুলুক এবং এ অভিযাত্রায় রাজকন্যা অপহারী চণ্ডালকে ও সর্পরাজকে সংহার করে রোখবানু নামে কুপিশহরের আমীরজাদীকেও সে পত্নীরূপে গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে দুই রানী নিয়ে সুখে জীবন কাটায় 'লালমতি রোখবানু মানবদুহিতা'। দুই পত্নীর দুটো সন্তানও হলো। লালমোতির সন্তানের নাম জেবলমুলুক আর রোখবানুর পুত্রের নাম থুইল কামিলমুলুক। পিতামহ সিকান্দর ও পিতামহী রৌসনক (দারাকন্যা) পৌত্রদের পেয়ে আনন্দিত। এ কাব্যের সমাপ্তি ভাগে সয়ফুলমুলুকের শ্বশুর-শাশুড়ীগণকে কন্যাদর্শনার্থে স্বরাজ্যে নিমন্ত্রণ করে আনার বর্ণনা রয়েছে। সে-সূত্রে কবি নানা রূপকথার জীনপরীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজা-রানীর ও নায়ক-নায়িকার নামোল্লেখ করেছেন নিমন্ত্রণ অতিথি হিসেবে। রোখবানুর ভাই মালিকজাদা শাহপরী, রোকামরাজ্যের ঈশ্বর-এর কন্যা কয়রাপরী, লালপরী, নীলপরী সবুজপরী, গোলেস্তাঁ এরামের বাদশাহ শাহবালপত্নী রওশনজামাল, সুফিয়ানপুত্র সয়ফুলমুলুক ও তার পত্নী শাহবালকন্যা বদিউজ্জামাল, আর তাদের কন্যা মেহেরজামাল, সার্কিস্তানের আসমাপরী, চিত্র-মাদ্রাবতী, মৃগমালা. এমরানপত্নী শশিকলা, কুপিরাজ্যের আমীরপত্নী চন্দ্রভান, এলাহাজাপরী-নলিনীকুমার,শ্বেতপরী-রুদ্রদেব, মৃগমালা-চন্দ্রভান প্রভৃতি প্রেমিক-প্রেমিকা। বলা বাহুল্য এসব নর-পরী রাজরানীদের একে অপরের আত্মীয়-কুটুম্ব। লালমোতিপুত্র জেবলমুলুক যথাকালে শামারোখের প্রণয়ী হয়।

আমাদের রূপকথার ও প্রণয়োপাখ্যানের একটা জগৎ গড়ে উঠেছিল ইরানের বাইরে সুদূর বাঙলাদেশে ফারসি ভাষাসাহিত্যের প্রভাবে। এ সাহিত্যেই মুখ্যত দেশজ মুসলিমদের মিশ্র সংস্কৃতির জগৎ নির্মাণের সহায়ক হয়েছিল। এ সংস্কৃতিজগৎ তৈরির অপর উপকরণ হয়েছে দেশজ শাস্ত্রিক, সামাজিক, পৌরাণিক ঐতিহ্য, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যপ্রসূত দৈশিক ছন্দবিজ্ঞান, রাগতাল, অলঙ্কারশাস্ত্র ও সাহিত্যতত্ত্ব। তাই আব্দুল হাকিম অন্যান্য মুসলিম কবিদের মতো যে কেবল দেবতা, যক্ষ, বাসুকী, গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রাহ্মণ, গণক, পুরাণ, গর্ন্ধব, কিন্নরকে নানা প্রয়োজনে স্মরণ করেছেন তা নয়, দেশী দেব-মানবের আদর্শ দাম্পত্য ও প্রণয়কথাও স্মরণ করেছেন, সে সঙ্গে ফারসি সাহিত্যেরও ঃ

জিনিলেক নববালা চন্দ্রের রোহিণী	জিনিল হোসেনবাণু বাহরামের নারী
জিনিলেক গঙ্গাগৌরী হরের রমণী।	সরজাবাগে পরীজাত নৃপতি কুমারী।
জিনিল লীলায় রূপ দ্রূপদকুমারী	জিনিলেক দশানন নারী মন্দোদরী
জিনিল পরম রূপে উষা সুচরিতা	হইল পরম রূপে জিনি শাহাপরী
জিনিল চন্দ্রানী ময়না লোরের বনিতা।	রূপবতী প্রভাবতী জিনিল লীলায়।
জিনিল লীলায় রূপে শচীরম্ভাবতী	জিনিলেক দময়ন্তী পরম রূপসী
জিনিল মোহনরূপে মদনের রতি।	নৌসাদের প্রাণধনি মুখ পূর্ণশশী।

এভাবে য়ুরোপপ্রভাবিত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মতোই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ফারসি সাহিত্যের ও ইরানি সংস্কৃতির প্রভাবে ঋদ্ধ হয়েছিল আব সমৃদ্ধ হয়েছিল বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মন ও মনন। উদ্ধৃতাংশ থেকে কবি আব্দুল হাকিমের সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণের পরিধিও অনুমান করা যায়।

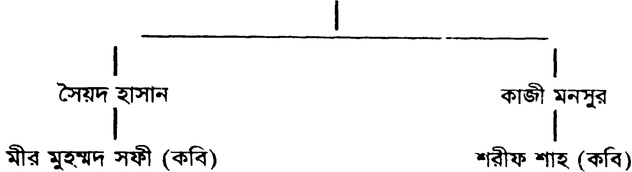
পাপভায়ে শাস্ত্রের বাঙলাভাষায় অনুবাদে আপত্তি সতেরো শতকের প্রথমার্ধেও অল্পবিস্তর ছিল। আব্দুল হাকিমও শাস্ত্রকথা অনুবাদ করে নিন্দিত হয়েছেন, বিক্ষুব্ধ কবির উচ্চারিত চরম গালিই তার সাক্ষ্য। ষোল শতকের শেষার্ধ থেকেই ফারসি সাহিত্যের বহুল চর্চা শুরু হয়, আব্দুল

হাকিমের ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল নিবিড়, প্রমাণ তাঁর রচিত কাব্য। ষোল শতকের শেষার্ধ থেকেই পর্তুগীজরা প্রবল হয়। পর্তুগীজদের আনীত বলে স্বীকৃত 'আনারস' ফলের উল্লেখ (গোলাব জামন আর আনারস ফল) রয়েছে লালমোতি-সয়ফুলমুলুক কাব্যে। ষোল শতকের শেষপাদ থেকেই মুসলিম শাস্ত্রগ্রন্থের—ধর্মকথার অনুবাদ আর যোগ-সূফীতত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ রচনার শুরু। আব্দুল হাকিম রচিত শাস্ত্র যোগ ও সূফীতত্ত্ব গ্রন্থ রয়েছে, এবং ভাষার সাধারণ লক্ষণ দেখে মনে হয় হাকিম সতেরো শতকের প্রথম পাদের কবি।

আব্দুল হাকিমের অন্যান্য কাব্য যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

৩. শরীফ শাহ

লালমোতি-বা লালমতী-সয়ফুলমুলুক উপাখ্যান আব্দুল হাকিম ছাড়া আরো দুজন কবি রচনা করেছেন। একজনের নাম শরীফ শাহ এবং অন্যজন গিয়াস খান। এঁরা চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। শরীফ শাহ নবীবংশ (রচনারাম্ভকাল ১৫৮৪/ ৮৬ খ্রীঃ) রচয়িতা পীর মীর সৈয়দ সুলতানের পৌত্র।



মোটামুটি হিসেবে সৈয়দ সুলতানের পৌত্রকে আমরা সতেরো শতকের শেষার্ধে পাই। সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ' নুরনামা'র রচক মীর মুহম্মদ সফী আর দৌহিত্র মুজাফফরও কবি ছিলেন। এঁরা ছিলেন বংশগত পেশায় পীর।

শরীফ শাহর পীর ছিলেন এক হামিদ ঃ

চরণে হামিদ পীর শরীফের শিরে ধীর[২]।

শরীফ শাহর পিতৃপরিচয়ও রয়েছে কাব্যে ঃ

শাহ সুলতান সুত সর্বগুণে অলঙ্কৃত (?)
তানপদে করিয়া ভকতি
কাজী মনসুর মানি তাহান তনয় জানি
শরফী যাহার (?) ভবতি।

একটি ভণিতা— মিনতি শরীফ শাহ বিনয় বচন
শোকে সিকান্দার শাহ করএ কান্দন।

শরীফ বলেছেন একদিন বন্ধুদের আডডায় 'সয়ফুলমুলূক কিস্‌সা পড়ে একজন, কিতাবের মধ্যে এ পূর্ব কথন'... দেখে আর শুনে কবি শরীফ শাহ স্বেচ্ছায় এ উপাখ্যান বাঙলায় রচনার বা অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

সয়ফুলমূলুক কিস্‌সা পড়ে একজন
কিতাবের দরমেয়ান দেখি অপূর্ব কথন।
সেই মহাশয় যদি কিতাবে পড়িল

এ মহামহিমা সব মশরিক পতি
ফকির শরীফ ছিল সে সব সংহতি।
কহেন্ত শরীফ হীনে মনেত ভাবিয়া।

---

১. *মৎসম্পাদিত সৈয়দ সুলতান ঃ তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ পৃঃ ৫৪।*
২. *পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৯৮।*

যথ দোস্তগণে শুনি হরষিত হৈল।
মর্মলোকে এই সব রসবাণী শুনি
প্রচার করিতে যুক্ত এ সব কাহিনী ।
এ সকল কথা আমি দিমু প্রচারিয়া।
মুর্শীদ চরণ শিরে করিয়া বন্দন
লালমতী কিসসা লিখি করিয়া যত্তন।

আব্দুল হাকিমের উপাখ্যানের সঙ্গে শরীফ শাহর কাব্যের কাহিনীগত ঐক্য রয়েছে, পার্থক্য যা আছে তা রুচি ও শক্তিগত ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত শরীফ শাহর কাব্যের তিনখানা পাণ্ডুলিপির একখানায় মাত্র[১] ৩-৯৪ পত্র বিদ্যমান। অন্য দুটোর একটিতে সাতটি এবং অপরটিতে নয়টি পত্র রয়েছে।[২]

৪. গেয়াস খান

ইনি রাধাকৃষ্ণপদ, হামজারবিজয় নামের জঙ্গনামা এবং লালমোতি-সয়ফুলমুলুক উপাখ্যানের রচয়িতা এবং হামজারবিজয় কাব্যে এঁর সামান্য পরিচয় রয়েছে। কবির পিতা দরিয়া খান রাজপাত্র তথা পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। কবির পিতামহের নাম বুধা খান, আর পীরের নাম বুরহানুদ্দিন। জঙ্গনামা অধ্যায়ের আরো কিছু তথ্য দ্রষ্টব্য।

৫. মুহম্মদ আকবর

'জেবলমুলুক-শামারোখ' উপাখ্যানের সব পুথি এখনকার কুমিল্লা জেলা থেকে সংগৃহীত। তাই মুহম্মদ আকবরকে কুমিল্লা অঞ্চলের লোক বলে অনুমান করা হয়। নায়িকা শামারোখের রূপবর্ণন প্রসঙ্গে কবি আবেগভরে বলেছেন যে শব্দ সম্পদের অভাবে সে-রূপের কথা—

কহন না যায় দেখি বাঙ্গলার ভাষে।
ফারসি হইত যদি কহিত বাখানি
কলাঅব্দ বয়সেতে রচিল কাহিনী।

[পুথিপরিচিতি, পৃঃ ১৬০ক ১৩৬]

'কলাব্দ'কে চাঁদের ষোলকলা ধরলে ষোল আর নৃত্যগীতাদি চৌষট্টিকলা ধরলে চৌষট্টি বছর বয়সে কবি 'জেবলমুলুক-শামারোখ' নামের প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। সেকালে ষোল বছর বয়সে দেশী বা বিদেশী ভাষার শিক্ষা সম্পূর্ণ করা স্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া এ কাব্যে বালভাষণের নিদর্শন নেই। যুদ্ধ ও রূপ বর্ণনায় পাকা হাতের ছাপ আছে। কাব্যের প্রারম্ভে স্তুতি-প্রশস্তি অংশে প্রজ্ঞাবান প্রবীণের উদার মনের পরিচয় রয়েছে। ত্রুটি যা-ই থাক প্রশস্তিটি গোটা বাঙলা সাহিত্যেই অনন্য ঃ

বিনএ করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ
তখত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবারে
পয়গাম্বর সকল বন্দি করিয়া ভকতি
হযরত আদম বন্দি জগতের বাপ
মা হাওয়া বন্দম জগত জননী
হজরত রসুল বন্দি প্রভুর নিজ সখা
খোয়াজ খিজির বন্দম জলেত বসতি
আসব্বা সকল বন্দি নবীর সভাএ
আউলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান
পীর মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ
সুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে।
হিন্দুকুলে দেবতা হেন হৈল প্রকৃতি।
হিন্দুকুলে অনাদির প্রচারে প্রতাপ।
হিন্দুকুলে কালীনাম প্রচারে মোহিনী।
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।
হিন্দুকুলে দোয়াদশ গোপাল ধেয়াএ।
হিন্দুকুলে মুনিভাব আছএ পুরাণ।
হিন্দুকুলে গুরু যেন করএ পূজন।

[সাহিত্যবিশারদপ্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্র ঃ ১৩৮। পুথি সং ৫০৮]

---

১. *পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৯৯।*
২. *ঐ পৃঃ ৪৯৬-৫০০*

এ বন্দনা 'নিরঞ্জনের রুব্বাবা কলিমাজালাল আর গায়েনের দিগ্বন্দনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি ষোল বছরের কিশোরের রচনা হতে পারে না। এ সব তথ্যের ও যুক্তির ভিত্তিতে আমরা এ কাব্য কবির চৌষট্টি বছর বয়সের রচনা বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। গ্রন্থশেষে কবি আবজাদ রীতিতে রচনাকাল নির্দেশ করেছেন বলে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিশ্বাস করেন—

লিখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল
আরবা অনাসের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল।

আরবা অনাসের (অরবতুউনাশ্বীর) মধ্যে ১০৮৪ সংখ্যা মেলে। এটি হিজরী সন হলে ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ আর ত্রিপুরাব্দ হলেও হয় ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দ। অতএব ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে এ কাব্য রচিত এবং কবির জন্ম সন ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দ। কবির নাম মুহম্মদ আকবর। বটতলার প্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর আলি বানিয়েছে। বইয়ে ভণিতায় সৈয়দ বা আলি মেলে না। যেমন মোহাম্মদ আকবরে কহে / মোহাম্মদ আকবরে কহে শুনহ রাজন। যার যে নিবন্ধ হয়/প্রভুএ মিলাএ তারে আনি।' মুদ্রিত[১] পুথির একস্থানে এরূপ পাঠ মেলে ঃ

মোহাম্মদ কাজেম আলী আওলিয়া আল্লার
তাঁহার চরণে মোর ভকতি অপার।
অধীন আকবরে কহে পাঞ্চালির ছন্দ
অবশ্য পূরিবে যার যেমন নিবন্ধ।

মোহাম্মদ কাজেম আলী কোন স্থানীয় দরবেশ—কবির পীর নন। ভণিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব রয়েছে ঃ

১. অধীন আকবরে কহে থাক দৈর্য ধরি।
২. অধীন আকবরে কহে স্মর কন্যা বিধি।
৩. অধীন আকবরে কহে মন শান্ত কর।

তাঁর উপাখ্যান কানে শোনা কিংবা বইয়ে পড়া কোন ফারসি উপাখ্যানের আদলে পরিকল্পিত। তাই চামরী দেশ কিংবা কর্ণাট রাজ্যের নাম থাকলেও গল্পের পাত্রপাত্রী দেও-দৈত্য-গন্ধর্ব, পাখি-সাপ-যক্ষ, মোষ-সিংহ আর জীনপরী-মানুষ। স্থানও পৃথিবী আর তার থেকে বাষট্টি বছরের পথ হেমপুর ও কন্দিল-এমরান নামের যক্ষ-পরী-দৈত্য রাজ্য। এতে যুদ্ধ আছে, তেলেসমাৎ আছে, ষড়যন্ত্র আছে, তেমনি আছে পাখির কিংবা দৈত্যের সহায়তা। এখানে রূপই প্রেমের ভিত্তি, তাই অনুরাগ জন্মে রূপবান-রূপবতী নারী-পুরুষের সাক্ষাৎমাত্রই। দেশ-কাল নিরপেক্ষ রূপকথার তথা প্রেমকথার রোম্যান্সের আধার হচ্ছে এ ধরনের সব উপাখ্যান। কাব্যের কাহিনীসার এই ঃ

চামরীদেশের প্রতাপে প্রবল রাজা সুলতান মুহম্মদ কর্ণাটরাজকন্যা রতিকলাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিয়ে করে। তাদের সন্তান কাব্যের নায়ক জেবলমুলুক। জন্মের পরেই জ্যোতিষী শাহভান কুমারের ভবিষ্যৎ গননা করে বলেছিল ঃ

তিন রাজকন্যা সে করিবে পরিণয়
যৌবন সময় শিশু পাইবে বহু দুঃখ—
শিকার করিতে যাইবে অতি ঘোর বন
যক্ষকন্যা সঙ্গে তার হবে দরশন।
কন্যা উদ্দেশিয়া যাই পাইবে লাঞ্ছনা
পরেতে পাইবে আর কন্যা দুইজনা।

তিন কন্যা সঙ্গে করি চলিয়া আসিতে
শক্রুশরে বিষ দিয়া বধিবেক পথে।
গন্ধর্ব কন্যারে শিশু করিবেক বিয়া
দ্বাদর্শ বৎসরে শিশু বিদেশ গমন
পন্থেতে খাইয়া বিশ অবশ্য মরণ।

জেবলমুলুকের প্রাণের বন্ধু আছে উজিরপুত্র ফর্রোখপাল। বারো বছর বয়সেই যক্ষকন্যা নায়িকা শামারোখের সঙ্গে বনে সরোবরতীরে সাক্ষাৎ ঘটে জেবলমুলুকের। শামারোখ ছিল কন্দিল

১. *সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয়, ঢাকা. পৃঃ ৯৮।*

এমরানরাজ কমলকেশরের কন্যা। তাঁর মাতামহ হচ্ছে পৃথিবী থেকে বাষট্টি বছরের পথ হেমপুরের রাজা বলবন্ত কেশর। জন্মের পরেই শিশু শামারোখের রূপে মুগ্ধ দৈত্যরাজ গর্দফোস তার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে রাখে। জেবল-শামারোখ প্রথম দেখাতেই পরস্পর প্রেমে অভিভূত। কাজেই বিদায়ের আগেই শামারোখ আঁচলে জেবলের চিত্র এবং জেবল তার পাগড়ীর প্রান্তে শামারোখের চিত্র অঙ্কিত করে রাখল। পরে কন্যার সন্ধানে যাত্রা করে শিরিলব ও সনুবর নামের আরো দুই অনুরাগিণী রাজকন্যাকে বিয়ে করে জেবলমুলুক। বিষক্রিয়া নষ্ট করার দারু জানত জ্যোতিষী শাহভান। বন থেকে সে এক শিকড় এনে অস্ত্রোপচার করে কুমারের উরুতে রাখল। সেই শিখড়ের প্রভাবে বিষ পানের চল্লিশ দিন পরেও ধড়ে প্রাণ থাকে আর শিকড় পিষে রসপান করালে দেহ হয় নির্বিষ। দুবার এভাবে বেঁচে যায় জেবলমুলুক। এমনি করে প্রথাসিদ্ধ উপায়ে কন্যার উদ্দেশে নিরুদ্দেশযাত্রাপথে বাঘ, সিংহ, সাপ, দেও, রাক্ষস আর তেলেসমাতি প্রভৃতির কবলে পড়ে নানা দুঃখ পেয়ে হেমপুরে শামারোখের সঙ্গে মালিনীর মাধ্যমে মিলন ও বিয়ে হল, আর তার তিন পত্নী নিয়ে বন্ধু ফর্রোখপালসহ বাড়ি ফিরলো জেবলমুলুক। সঙ্গী ফর্রোখপালও পথে পিয়ারেখাকে বিয়ে করে সুখী হয়।

এ কাব্যে রূপবর্ণনায় কবির উৎসাহ, যত্ন ও নৈপুণ্য পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। রাশি তিথি নক্ষত্র লগ্ন, বর-কনের সাজ, উৎসবের নানা আচার, যুদ্ধাস্ত্রের ও অলঙ্কারের বর্ণনায় কবির অবলম্বন ছিল দৈশিক ঐতিহ্য ও আচার। দীপ, ধান, দূর্বা, চন্দন, উলুধ্বনি, দেশী অলঙ্কার, প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি তার সাক্ষ্য।

'জেবলমুলুক শামারোখ' উপাখ্যানের অপর কবি মুহম্মদ রফিউদ্দীনের জন্ম, কুমিল্লা জেলার নারানএ়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আশরাফ। তাঁর সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

৬. মুকুল ওর্ফে মঙ্গল

কবি মুকুলের কাব্যের নাম 'শাহজালাল মধুমালা'। এটি একটি প্রণয়োপাখ্যান হলেও মঙ্গলপাঁচালীর আদলে পরিকল্পিত। এটি মূলত দেহতত্ত্ব ও সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। মঙ্গলকাব্যের নায়কের মতো এ গ্রন্থের নায়কবিশেষ উদ্দেশ্যে মর্ত্যে প্রেরিত। নায়ক জালালের সহায় হন হজরতমীর নামে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ।

কাব্যে রচনাকাল রয়েছে ঃ

এ সব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল বাড়এ তাহা না লেখিল।
আছিল এ সব কথা আদ্যের বিচার
বাসত্তের সনে তাহা হইল প্রচার।

কবির নিবাস কুমিল্লা অঞ্চলে হলে ১০৭২ সন ত্রিপুরাব্দ হওয়ারই কথা। অতএব ১০৭২+৫৯০=১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে এ কাব্য রচিত। আর এটি বঙ্গাব্দ হলে ১০৭২+৫৯৩ = ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে এবং হিজরী সন হলে ১৬৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দে আর মঘীসন হলে ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে রচিত। যেভাবেই হোক এ গ্রন্থ সতেরো শতকের সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে রচিত।এ সূত্রে কবি পূর্বসূরী সৈয়দ সুলতানকে এবং সমকালের কবি মুহম্মদ খানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন ঃ

সৈয়দ সুলতান আর মোহাম্মদ খানে
এ সবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জনে।

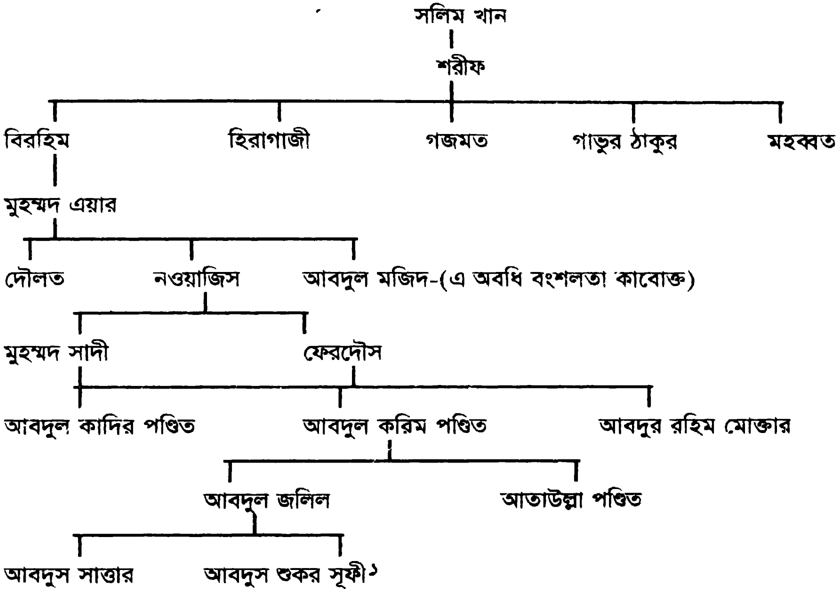
উক্ত দুজনই চট্টগ্রামের কবি। মুকুলও হয়তো চট্টগ্রামেরই—কুমিল্লার নন।

৭. নওয়াজিস খান

কবি নওয়াজিস খান তাঁর 'গুলেবাকাউলি' কাব্যে বিস্তৃতভাবে বংশপরিচয়, আদেষ্টার নাম, পিতৃপুরুষের নিবাসাদি প্রয়োজনীয় সব তথ্য পরিবেশন করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর পরিচিতি এরূপ ঃ

প্রপিতামহের পিতা গৌড় হন্তে আসি
গোত্র সনে চাটিগ্রামে করিলা নিবাস।
সিলিম খান তাহান নাম সভার প্রধান।—
নিজ গ্রামে গ্রাম বৈসালই কথদূর
সংসারে প্রচারে সেই দেশ সিলিমপুর।—
মোড়লী বিষয় পাইল মহারাজ হোন্তে—।

কবির প্রপিতামহের পিতা অর্থাৎ কবির পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ সলিম খান গৌড় থেকে সগোত্র বা সজ্ঞাতি চলে এসে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে নতুন বাস্তু তৈরি করেন এবং তাঁর নামানুসারে গাঁয়ের নাম সলিমপুর বা সিলিমপুর রাখা হয়। এ গ্রাম এখনো বিদ্যমান। তবে কবির পিতা মুহম্মদ এয়ার সলিমপুর ছেড়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আধুনিক সাতকানিয়া থানার আমীরাবাদ গাঁয়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। কবির বংশধরেরা বর্তমানে সুখচড়ি গাঁয়ে বাস করেন। পুরো বংশলতাটি এরূপ ঃ



নওয়াজিস খানের মুর্শিদ ছিলেন মৌলবী আতাউল্লাহ্

শ্রীযুক্ত আতাউল্লা মৌলবী সুজন
খেলাক্ষত মুরীদ লৈনু তান স্থান।

নওয়াজিস খান চট্টগ্রামের বর্তমানে বাঁশখালি থানার অন্তর্গত বাণীগ্রামের জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের আগ্রহে এ কাব্য রচনা করেন ঃ

১. ধন্য ধন্য আজ্ঞাকর্তা হএ যেজন
যাহার আদেশে হৈল পুস্তক রচন।
শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মহানরপতি
ধন্যহেতু সুকল্পনে করিল আরতি।
হীন নওয়াজিস কহে ভাবি নিজ মনে
বকাউলি পুস্তক রচিল তেকারণে।

২. শ্রীযুক্ত বৈদন্যাথ মহানৃপকুলজাত
দাতা অতি দানী শুদ্ধরীত
তাহান আরতি শুনি হীন নওয়াজিসে
বকাউলি পুস্তক রচিত।

১. *ইনিই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে কবির অধস্তন বংশলতা দিয়েছিলেন।*

লক্ষণীয় যে এ প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে গায়ে হিন্দু-মুসলিমের আদেষ্টা লেখক সম্পর্কের কথা জানা গেল। উনিশ শতকেও চট্টগ্রামে মুসলিম জমিদারকে আদেষ্টা এবং হিন্দু কবি মহেশচন্দ্রকে লেখকরূপে দেখেছি।

নওয়াজিস খান যখন কাব্য রচনা করছেন তখন আলাউল শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় নওয়াজিসের উক্তি থেকে এ তথ্য জানা যায় ঃ

না রহে ভাণ্ডার ধনরত্ন লক্ষাবধি
কবির কবিতা রহে প্রলয় অবধি।
এই লাগি মহাজনে কবি সন্তোষএ
কবি হোন্তে আপনা প্রশংসা নাম রহে।
কে জানিত বহরমগোর কথা রহে
সপ্তনারী সপ্তকার সুপ্রসঙ্গ কহে।'
আর কত সুপ্রসঙ্গ বহুলে রচিল
প্রলয় অবধি সব পুস্তকে রহিল।
কে জানিত এ সকল ভাবি চাহ মনে
জ্ঞানবন্ত আলাওল রচনা কারণে।

নওয়াজিস খানের পেশা ছিল খোন্দকারী অর্থাৎ মসজিদসংলগ্ন মক্তবের শিক্ষকতা [পাঠানপ্রশংসা] ও পাল-পার্বণে মোল্লার কাজ করা।

অনুগ্রহ প্রাপ্তিলোভে কবি শঙ্খনদের উত্তরতীরস্থ দোহাজারীর মুঘল সীমান্তরক্ষী সেনানী আধুখানের ও জোরওয়ার সিংহের প্রশস্তি বা কসিদা রচনা করেছিলেন।

তোমা পিতৃ দান দিছে সুফলিত ভূমি
উচ্চগিরি বন দান মোকে দাও তুমি।

এঁরা প্রতেকে ছিলেন একহাজার সৈন্যের মনসবদার। এ দুটো রচনায় সাহিত্য বিশারদপ্রদত্ত নাম 'পাঠানপ্রশংসা' ও 'জোওয়ারসিংহ কীর্তি'। এ ছাড়া নওয়াজিস খান তত্ত্বভাবের গান ও বয়ানাত রচনা করেছেন। সেগুলো যথাস্থানে আলোচিত হবে।

কবির বংশধর আতাউল্লাহ পণ্ডিতসূত্রে সাহিত্যবিশারদ কবির জন্মসন ১০০০ মঘী (১৬৩৮ খ্রীঃ) এবং মৃত্যুসন ১১২৭ মঘী (১৭৬৫ খ্রীঃ) বলে জেনেছিলেন। কিন্তু কবির প্রপৌত্র আতাউল্লাহর পক্ষে প্রপিতামহের জন্মসন জানা সম্ভব নয় দুই কারণে, প্রথমত সেযুগে সাধারণ ঘরে জন্মসনে কোন গুরুত্ব ছিল না বলে লিখে রাখা হত না, সাধারণ মুসলিমঘরে জন্মপত্রিকাও তৈরি হতো না। তা ছাড়া চারপুরুষ পরে পারিবারিক কিংবদন্তী বা শ্রুতিস্মৃতিও প্রমাণ হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়। তবে মৃত্যুসনটি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য হতেও পারে। কিন্তু আমাদের হাতে কিছু পরোক্ষ প্রমাণ[১] রয়েছে ঃ

১. নওয়াজিস খান আলাউলের পরবর্তী।

২. মুঘলবকশী হামীদের কন্যা বিয়ে করেন কবির প্রপিতামহ শরীফ।

৩. বকশী হামীদ স্বয়ং বিয়ে করেন বাজালিয়া গাঁয়ের টোনা ঠাকুরের (আরাকানরাজ প্রদত্ত উপাধি ঠাকুর) কন্যা।

৪. গাজী মল্লের কন্যা বিনানু হচ্ছেন কবির পিতামহী।

৫. আদি পুরুষ সলিমখানপ্রাপ্ত 'মোড়ল' উপাধি থেকেই এ বংশ মোড়ল [মল্ল] বংশ।

৬. বৈদ্যনাথ রায় ও করিমদাদ ছিলেন কবির অঞ্চলের জমিদার। তাঁর তোয়াজের ভাষায় তাঁরা হয়েছেন নৃপতি।

৭. হাজারী আধুখান ও লছমনসিংহ ১৬৬৬ সনে বুজর্গ ওমেদ খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের পরে দোহাজারীতে সীমান্ত সেনানী নিযুক্ত হন। আধুখানের পুত্র শেরজামাল খান, আর লছমনসিংহের পুত্র হলেন জোরওয়ার সিংহ। কবি আধুখানের মৃত্যু সংবাদ জানেন—'আধুখান নৃপতি স্বর্গে চলি গেল।'

কবি আধুখান পুত্র শেরজামালের বিবাহোৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন।

---

১ *পুথি পরিচিতি, পৃঃ ১০৪-১৬, ১৭২-৭৩, ৩০৭-৯।*

৮. 'স' বর্ণ আধ্যক্ষর রূপে প্রয়োগে কোন জমিদার হোসেন ও তাঁর পুত্র রহমত শাহ সম্বন্ধে একটি কসিদা বা প্রশস্তিও হয়তো নওয়াজিস খানের রচনা। এই হোসেন খান ও রহমত খান দেয়াঙ্গের জমিদার—কবির ভাষায় নৃপতি। লোকগাথার নায়িকা দেয়াঙের বেলচুড়া গাঁয়ের কালাবিবি চৌধুরানীর পূর্বপুরুষ ছিলেন হোসেন খান ও রহমত খান। কবি বলছেন—'সুরঙ্গে হোসেন নৃপ গেল স্বর্গ স্থান'। এবং রহমত খান জীবিত।

এ সব স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্যেব ও লোকশ্রুত পরিবারের পরোক্ষ প্রমাণে বোঝা যায় কবি আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। এবং সতেরো শতকের শেষপাদের প্রখ্যাত পরিবারের ও ব্যক্তির খবর রাখতেন।

তাছাড়া আমরা জানি নওয়াজিস খান কিতাব দেখে তাঁর গুল-ই-বকাউলি রচনা করেছেন—

মহন্তের আজ্ঞা মন-পাটেত রাখিয়া
হীন নওয়াজিসে কহে কিতাব দেখিয়া।

এ কিতাব ফারসি ভাষায় রচিত বলেই মনে হয়। ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে দাখিনী উর্দুতে রচিত একখানা গুলে বকাউলির পাণ্ডুলিপি অযোধ্যার নওয়াবের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল বলে শোনা যায়। ফারসি ভাষায় রচিত একমাত্র কাব্য হচ্ছে শেখ ইজ্জতউল্লাহ বঙ্গালী রচিত বকাউলি। এটি ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে রচিত। ১৭৩৮ সনে রচিত উর্দু রেখতাকাব্য 'তুহফা-ই-মজলিসে সালাতিন' এবং ১৭৯৮ সনে রায়হানরচিত উর্দু 'মসনবী খইয়াবান' আর ১৮৫২-৫৩ সনে আমানত রচিত উর্দু নাটক ইন্দারসভা শেখ ইজ্জতউল্লাহর ফারসি গুলেবকাওলিরই অনুসৃতি। দোভাষী শায়ের ফকির গরীবুল্লাহর আগে অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের আগে বাঙলায় উপাখ্যানসাহিত্য বিষয়ক যেসব গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, সেগুলো হিন্দি- আওধি কিংবা ফারসিভাষা থেকেই অনূদিত। কাজেই মনে হয নওয়াজিসের গুলে বকাউলিও ইজ্জতউল্লাহ বঙ্গালীর গ্রন্থেরই স্বাধীন অনুসতি। অতএব, কবি নওয়াজিস খান ১৭৩০ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্টব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা চলে।

তাজুলমুলুক গুলেবকাউলি নায়ক-নায়িকাব এ নাম আরবি-ফারসি হলেও কাহিনীটি ভারতীয়। হয়তো কোন মৌখিক রূপকথাই এ কাব্যের উৎস। উত্তর ও মধ্যভারতে নার্সিসাসের মতোই পানির ধারে হলদে বকাউলি ফুল ফোটে, এগুলো চোখের পীড়ায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্ধ পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা থেকেই এই রূপক রোম্যান্সের উৎপত্তি বলে 'ফারহাঙ্গে আফসিয়ার' লেখক সৈয়দ আহমদ মনে করেন।[১]

মধ্যভারতে প্রচলিত কোন হিন্দি গল্প কিংবা ১০৩৫ হিঃ বা ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত দাখিনী উর্দু কাব্যটিই (বর্তমানে অপ্রাপ্য) শেখ ইজ্জতউল্লাহ বঙ্গালীর অবলম্বন ছিল। মুসলিম কবির কাব্যভাবনার অবলম্বন এ ভারতীয় রূপকথাটিতে ইরানি ও ভারতীয় মন-মননের ও পাত্র-পাত্রীর মিশ্রণ ঘটেছে। মুসলিম রচিত অন্যান্য উপাখ্যানে পাত্রপাত্রীর আরবি-ফারসি নাম থাকলেও ধর্মে তারা প্রায়ই অমুসলিম এবং কিছু চরিত্র সংস্কৃত বা ভারতীয় ভাষায় নাম ধারণ করে। এ কাব্যেও তা আছে।

নওয়াজিস খানের কাব্যের কাহিনীর কাঠামো এরূপ ঃ শর্কস্তানের জয়নুল মুকুলের পঞ্চম পুত্র তাজমুলুক। এর জন্মলগ্নে গণকরা বলেছে যে এ পুত্রের বারো বছর বয়সকালে পিতা জয়নুলমুলুক দৃষ্টি হারাবেন। এ জন্যে শিশুকে অন্যত্র রাখা হলো, তবু নিয়তি অমোঘ। তাই রাজা মৃগরায় গেলে সেখানে অকস্মাৎ পুত্রের দেখা পান আর তৎক্ষণাৎ অন্ধ হয়ে যান। ওঝারা বলল বকাউলি ফুল চোখে লাগালেই এ অন্ধত্ব ঘুচবে। বকাউলি ফুল ফোটে বকাউলি পরীর উদ্যানে। তা কোথায় কেউ জানে না। অতএব বকাউলি ফুলের উদ্দেশে যাত্রা করে তাজলমুলুক। তার চার ভাইয়ের সঙ্গে তাজল আইয়ারা নামের বেশ্যাকে বিয়ে করে তার ও হেমালা দৈত্যের সহায়তায় বকাওলি ফুল সংগ্রহ করে। কিন্তু তার ভাইরা তার থেকে ফুলগুলো কেড়ে নিয়ে দেশে গিয়ে পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনে। এদিকে তাজলমুলুক ইররাজ্যের ফিরোজশাহর কন্যা বকাওলী পরীর প্রেমে পড়ে,

১. *বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান ঃ গুলে বকাওলী—আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৬৪, ঢা. বি. বাঙলা বিভাগ।*

স্ত্রী আইয়ারা, মাহমুদা ও দৈত্য হেমালার সাহায্যে অবশেষে বকাওলিকেও পত্নীরূপে লাভ করে, আবার সিংহলরাজ চন্দ্রসেনকন্যা চিত্রাবতীকেও স্ত্রী রূপে পায়। পরিশেষে পিতা-পুত্রেরও মিলন ঘটে। এ কাহিনীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে মনুষ্যদেহের নারীতে, পুরুষে, দৈত্যে, পাষাণে রূপান্তরের ঘটনা ও পুনর্জন্ম নায়ক নায়িকার জীবনে ঘটানো হয়েছে। কামরূপ-কামাখ্যার আর ডাকিনী-যোগিনী অপ্সরার মর্তে আগমনের মতে পরী বকাউলির ইন্দ্রসভায় গমন ও নৃত্য গীতে অংশ গ্রহণও রয়েছে। একটি উপকাহিনীও রয়েছে, বকাউলীর পিতৃব্য ফিরদৌসরাজ মুজাফফর শাহর কন্যা রূহ আফজা দৈত্য কবলিত হয়, তাজলমুলুক তাকে উদ্ধার করে এবং তাজলমুলুকের অমাত্য বাহরামের সঙ্গে রূহ আফজার বিয়ে হয়।

আঠারো শতকের চট্টগ্রামবাসী কবি মুহম্মদ আলীও একখানা গুলেবকাওলি রচনা করেছিলেন, আর একখানা গুলেবকাউলি রচনা করেছিলেন উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি মুহম্মদ মুকিম। উনিশ-বিশ শতকের পদ্যে গদ্যে কোলকাতায় আরো ছয়খানা গুলেবকাউলি রোমান্স রচিত হয়। এতেই এ উপ্যাখ্যানের বাঙলায় বিশেষ জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য মেলে। এগুলো ঃ

১. গোলেবকাওলি ও তাজলকুমারের পুথি—এরাদত আলী বা উল্লাহ (১৮৪০ খ্রীঃ)
২. গুলেবকাউলি ইতিহাস—উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র (১৮৪৩)
৩. গোলে বকাওলি—আবদুস শুকুর ওর্ফে মানিক মিয়া
৪. (গদ্যেঃ) গোলেবকাওলি— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৪)
৫. গুলে বকাওলী—সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯৪৯)
৬. নাটক ঃ গোলে বকাওলি—কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৮)
৭. গোলে বকাওয়ালী–কুঞ্জবিহারী বসু (১৮৮১)

আঠারো শতকের উপাখ্যান প্রণেতা

১. মুহম্মদ আলী রাজা

মুহম্মদ আলী রজা বা রাজা দুখানা প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা। এই কবির জন্ম হয়েছিল ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের স্বগ্রাম বখতপুরে। এটি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত। কবির বংশধরেরা এখনো সে-গ্রামে বাস করেন। বংশধর সূত্রে জানা যায় কবির ১০৫৩ মঘীসনে (১৬৯১ খ্রীঃ) জন্ম এবং ১১২৯ মঘীতে (১৭৬৭ খ্রীঃ) মৃত্যু হয়। অতএব কবি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর কাব্য দুটো রচনা করেন। তাঁর 'তমিম গোলাল চতুর্নসিলাল' কাব্যের ভণিতায় তিনি তার নাম তিন রকমে ব্যবহার করেছেন ঃ যেমন

১. মহম্মদ রাজাএ বোলে নানা রঙ্গ মহীতলে।
২. হীন আলি কএ ভাব মনে মনে।
৩. হীন আলি রাজা কএ যেখানে যে মনে লএ।

তাঁর 'মিসরী জামাল' উপাখ্যানের ভণিতায় প্রায়ই মহম্মদ রাজাএ কহে বা 'মহম্মদ রাজাএ বোলে' রয়েছে। 'তমিমগোলাল চতুর্নসিলাল' বটতলায় মুদ্রিত হয়েছিল 'মিসিরীজামাল' অপ্রকাশিত।[১]

তমিমগোলালের উপাখ্যানের কাঠামো এই ঃ শিমালরাজ ইউসুফজালালের পুত্র তমিমগোলাল আর শিরাজরাজকন্যা চতুর্নসিলাল স্বপ্নে পরস্পরকে দেখে প্রেমে পড়ে এবং উভয়েরই স্বপ্নে গান্ধর্ব মতে বিয়ে হয়। স্বপ্ন ভঙ্গে উভয়েই বিরহী ও ব্যাকুল, মিলনের কোন উপায় জানা নেই তাদের। রাত্রে মিলন প্রত্যাশায়

প্রতি দিবসে বসিয়া কন্যা গাথে পুষ্পহার
রাত্রিতে গোলাল চন্দ্র গলেত দিবার।

---

১. *পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৪২৮-৩০।*

কিন্তু বিরহিনীর প্রত্যাশা কোন দিনই পূর্ণ হয় না। এদিকে শিরাজরাজ পাঁচটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কন্যার বিয়ের জন্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। শর্তগুলো এই ১. এক বুনো পার্বত্য ঘোড়াকে বাগ মানিয়ে তার পিঠে আরোহণ ২. শহর ধ্বংসকারী এক অজগর হত্যা, ৩. শিরাজ শহরের মানুষখেকো রাক্ষসীকে বধ করা ৪. শিরাজ শহরে হামলাকারী দৈত্যকে বন্দী করা এবং ৫. সাত কোটি সৈন্য নিয়ে যে শত্রু রাজা ফি বছর শিরাজনগর লুণ্ঠন করে তাকে পরাজিত করা।

অন্যান্য রাজকুমারের মতো তমিমগোলালও স্বয়ম্বর সভায় হাজির হয় এবং অন্যেরা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে স্ব স্ব দেশে ফিরে গেল, আর বীর তমিমগোলাল ঐ পাঁচটি শর্ত পূবণ করে প্রেয়সী চতুর্নসিলালকে লাভ করে।

মিসরী জামাল

কবির অপ্রকাশিত 'মিসরী জামাল' কাব্যের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। কুর্বার শহরের অধিপতির নাম আবদুল করিম শাহ, তাঁর রানীর নাম নাসিবা—সুন্দরী-নাযিকা মিসরীজামাল তাদেরই কন্যা। বিমলনগরপতি ছিল শরীফ সুলতান। তারই পুত্র তোরাবহামীম হল এ উপাখ্যানের নায়ক। চিত্রপট দেখেই উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়, তারপর এ ধরনের উপাখ্যানে যে সব ঘটনা ঘটে থাকে, সে সব ঘটবার পরে নায়ক-নায়িকার মিলনে এবং নায়কের সস্ত্রীক মাতৃদর্শনে স্বদেশ যাত্রায় কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

মুহম্মদ আলী রাজার কাব্য দুটো কবিত্বসম্পদে ঋদ্ধ নয়। তত্ত্বকথা দিয়ে কবি কাব্যরসের অভাব পূরণ করতে চেয়েছেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যমূলক তত্ত্বকথনে তাঁর আগ্রহ অধিক। 'হামদ' ও 'নাত' দিয়ে তিনি কাব্যরচনা শুরু করেননি, দোভাষী শায়েরদের মতো তিনি গ্রন্থারম্ভ করেছেন প্রভুর নামমাত্র স্মরণ করে। যেমন ঃ

মহাম্মদ রাজাএ কহে প্রভু প্রণমিয়া
মিসিরীজামাল এক পুস্তক রচিয়া।

কবি ভণিতাও বসিয়েছেন ইচ্ছেমতো বর্ণনার আদ্যে, মধ্যে ও অন্তে। যদিও তিনি এ উপাখ্যান দুটোর জন্যে কারুর বা কোনভাষার ঋণ স্বীকার করেননি, তবু এটি স্পষ্ট যে ফারসি উপাখ্যান বা ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত রূপকথাই ছিল তাঁর অবলম্বন। এ দুটো উপাখ্যান অবিকল অনুকৃত হয়নি পরে কখনো।

কবির বৈরাগ্যমূলক দেহতাত্ত্বিক উক্তির একটি নমুনা এরূপ ঃ

নারীর ফান্দে হৈলা বন্দী মিছামায়াজালে
ছিড়িয়া প্রেমের ডুবি যাইবা কত কালে।
বেলা গেল বুদ্ধি গেল রৈলা কোন্ আশে
ভরণ ঠেলিয়ার পানি শুকাএ বাতাসে।
ঘরের ধন পরে নিল বোলে হায় হায়
হারাইলে মাণিক্যধন ফিরিয়া না পায়।

এরই পারিভাষিক অভিব্যক্তি এরূপ ঃ

বামেতে যমুনা বৈসে ডানেতে ত্রিবেণী
শ্রীগোলার হাটের মধ্যে বাজে বাধ্যধ্বনি।
শুকাইল সমুদ্র সব ত্রিবেণী সিন্ধু
লাহুত লবণি জান নাহি এক বিন্দু।
মলকুতে নাহিক বাণী জবরুতে মণি
নাসুতে না শুনি সব পবনের বাণী।
মহম্মদ রাজাএ কহে মধুরসের বাণী
প্রেমনগরের বস্তি ছাড়ি দেশে যাইবা তুমি।

বৌদ্ধ ঐতিহ্য অম্লান ছিল বলেই বাঙলায় সূফীমত ও সূফীসাধনা যোগ-তন্ত্র মতের ও চর্যার কায়াধর্ম ভিত্তিক ছিল।

২. পরাগল

ফরাগল সম্ভবত তুর্কি ভাষার শব্দ। গুলবদনের 'হুমায়ুননামায়' এক মৌলানা ফরাঘলের নাম মেলে। আমাদের ধারণা পরাগল সেই ফরাগলেরই বিকৃতরূপ। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসপাঠক

মাত্রই গৌড়সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)-র চট্টগ্রামে নিয়োজিত সীমান্তরক্ষক সেনানী শাসক পরাগল খাঁর নাম জানেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস রচিত পরাগলী মহাভারতই প্রথম বাঙলা মহাভারত।

আমাদের আলোচ্য কবি পরাগল (পুথিতে পোরাওল, পোরাগল) অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এক সময়ে পরাগল নাম চালু ছিল। রাউজান এলাকায় কর্ণফুলী নদীর একটি ঘাটের নাম 'পরাওলীঘাট', একটি খালের নাম পরাওলী বা পরাগলী খাল।'

আমাদের আলোচ্য কবি পরাগল রচিত কাব্যের দু'খানা পাণ্ডুলিপির একখানায় রয়েছে জীর্ণ ছিন্ন দুটো পত্র, অপরখানায় রয়েছে একটি পত্র। এবং সে পত্রটা কাব্যের শেষপত্র, তাতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্য ঃ

শাহপরীর কেচ্ছা এবে সমাপ্ত হৈল
ফারসি কিতাবেতে নেজামী রচিত।
বএত ভাঙ্গি পোবয়াওলে পএআর করিল।

আমাদের অনুমান শাহপরীর এ কিস্‌সা নিযামী গঞ্জাবীর (১১৪০-১২০৭ খ্রীঃ) সপ্তপয়করের (১১৯৬ খ্রীঃ) একটি গল্প অবলম্বনে রচিত। পুথির পত্র দুটোর একটি হল কাব্যের কাহিনীর সূচনা নির্দেশক এবং দ্বিতীয় পত্রটাও প্রথমমোক্ত পাণ্ডুলিপি কাব্যের সমাপ্তিসূচক। এ দুটো পত্র থেকে উপাখ্যানের রূপরেখার ধারণা পাওয়া যায়। এটিও পরীমানুষের প্রেমকাহিনী। আভাসে বোঝা যায়- রোকামশহরবাসিনী শাহপরীর সঙ্গে কোথাও আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ ঘটে রাজকুমার রূপবানের বা রূপভানের প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় প্রেম। কিন্তু শাহপরী শিগগির অনুভব করে প্রথম দর্শনেই যে প্রেম এবং সহজে প্রাপ্ত যে-প্রেয়সী কোনটাই আদর-কদর পায় না। তাই একদিন কুমারকে কোন ছলে বনে পাঠিয়ে ধাইকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়ে—

'বিনে দুঃখে মোরে পাই তিলেক আদর নাই'
কহিঅ কুমার বরাবর।
এতেক বুলিয়া সতী উড়া দিল সর্গগতি
আপন মন্দিরে চলি গেল।

এবং শাহপরী যাবাব কালে ধাইকে আরো বলে গেল ঃ

কুমারের মনে যদি থাকএ আদর
চলিয়া যাইতে কহিঅ রোকামশহর।

কুমার ফিরে এসে ধাইয়ের মুখে সব শুনে

'আজ্ঞাদিল যুবরাজে ভাণ্ডারীর স্থান
যত ধনআছে মোর আন বিদ্যমান।।
কুমার বোলএ যেবা যাইবা মোর সন
এই ধন বিবর্তিয়া লও সর্বজন।
রোকাম শহরে আমি করিমু গমন
শাহপরী উদ্দেশিয়া তেজিমু জীবন।

এভাবে বিরহী বিরাগী কুমার গিরিদরিকান্তার আর সমুদ্র বহু দুঃখে কষ্টে অতিক্রম করে অবশেষে রোকামশহরে পৌছল তার মনে শঙ্কা ছিল—এতকাল পরে শাহপরী তাকে চিনবে কি ! কিন্তু—

দেখিয়া কুমারের মুখ যেন রূপবান
জোড় হস্ত করি কন্যা আইল বিদ্যমান।
শাহ পরীর মুখ যদি কুমারে দেখিল
আকাশের চন্দ্র যেন হাতে হাতে পাইল।
আল্লাএ সোঙরিয়া বুলিল বচন—

কুমাব অনুযোগের সুরে শাহপরীকে জানাল ঃ

মায়া করি আমারে পাঠাইয়া বনে
তুমি আইলা আপনা ভুবনে।
আর আমি পন্থে যত পাইলাম দুঃখ
সাগরে ভাসিল অনাহারে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর গুলেবকাউলি কাব্যের উপক্রমে তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালের চট্টগ্রামবাসী কবিদের নামোল্লেখ করেছেন তাতে পূর্বকালের কবি হিসেবে আমাদের আলোচ্য পরাগলের নামও রয়েছে ঃ

হাবুত রোআজা, সে (ক) পরাণ, পরায়ল
ফাজিল নাসির, তাহির সকল।

এর থেকে আমাদের অনুমান শাহপরীর কিস্‌সা প্রণেতা পরাগল সতেরো শতকের না হলেও সুনিশ্চিতভাবে আঠারো শতকের কবি।

আঠারো শতকের শেষপাদের কবি মুহম্মদ আলী রচিত অপ্রাপ্ত শাহপরী মালিকজাদা উপাখ্যানটিও হয়তো নায়কের নামভেদে অভিন্ন বিষয়ক।

৩. মুহম্মদ আলী

কবি মুহম্মদ আলী তাঁর 'হায়রাতুল ফেকাহ' নামের শাস্ত্রগ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন[১], তা থেকে জানা যায় চট্টগ্রামের ওর্ফে ইসলামাবাদের উত্তরে ফটিকছড়ি থানার আসিমনগর এলাকায় অবস্থিত ইদিলপুরে কবির জন্ম। কবি সাধারণ্যে ব্যক্তিক পেশা পরিচয়ে মুহম্মদ আলী মিয়াজী নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁর পণ্ডিত খ্যাতিও ছিল। পার্শ্ববর্তী অদূরের লেলাঙ্গ গাঁয়ের জমিদার বা ধনীলোক (কবির ভাষায় লেলাঙ্গ রাজ্যের নৃপতি) ইউসুফ হাফিজের (গৃহশিক্ষক ও মুয়াজ্জিন রূপে) প্রতিপোষণে কবি 'হায়রাতুল ফেকাহ' রচনা করেন। এবং হায়রাতুল ফেকাহ আছিল ফারসিকিতাব / করিনু বাঙ্গালা।

এয়ার আলী নামের এক রসিকের অনুরোধে তিনি প্রণয়োপাখ্যান হাসনবানু রচনা করেছিলেন——

শ্রীমন্তে এয়ার আলী গুণবান
রচে মোহাম্মদ আলী আরতি তান।

আর আমীর হোসেন নামের আর এক ব্যক্তির আগ্রহে কবি মুহম্মদ আলী রচনা করেন শাহপরী মালিকজাদা নামের রোমান্স।

আমীর হোসেন আরতি কারণ
হীন মোহাম্মদ আলী ভান।

এঁর তিনটে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদও সংগৃহীত রয়েছে। কবি মুহম্মদ আলীর গ্রাম ইদিলপুরে কবি মুনশী মুহম্মদ মুকিম পণ্ডিতেরও জন্ম হয়েছিল।

বহু লোক জ্ঞানবন্ত পণ্ডিতেরও নাহি অন্ত
মুকিম পণ্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ।

এ গ্রন্থের এক স্থানে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ গ্রন্থেরও উল্লেখ রয়েছে ঃ

তার কত অব্দ শেষে খলিফা সৃজিছে
তার সন নিরূপণ নবী বংশে আছে।

মুহম্মদ আলীর হাসনবানু কিংবা শাহপরীমালিকাজাদা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপির অভাবে সম্ভব নয়।

---

১. *ধর্মসাহিত্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য।*

৪. মোহাম্মদ আকবর

মুহম্মদ আকবর নামের এক কবির একটি আদ্যন্তখণ্ডিত প্রায় শতেক পৃষ্ঠায় প্রণয়োপাখ্যান সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে ছিল। বিষয়বস্তু কাউসশহর রাজ্যের রাজা মনোহরের কন্যা সনুবরের প্রণয়কাহিনী।

৫. মুহম্মদ রফিউদ্দীন

কবির নিবাস ছিল কুমিল্লা জেলার নারাঞা নামের গ্রামে, তাঁর পিতার নাম আশরাফ। কুমিল্লা অঞ্চলের সতেরো শতকের কবি সৈয়দ আকবরের অনুসরণে মুহম্মদ রফিউদ্দিন তার জেবলমুলক-শামারোখ নামের প্রণয়োপাখ্যানখানি রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গি মার্জিত রুচির পরিচায়ক। নায়ক জেবলমুলুক তিনপত্নী নিয়ে শেষ বয়সে সুখীই হয়েছিল ঃ

শিরিলব, শামারোখ আর সনুবর
একপতি কোলে মিলি বঞ্চে পরস্পর।

বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ।
উজিরেহ নিজ সুত আর বধূমুখ
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক।

মুহম্মদ রফিউদ্দীন সম্ভবত আঠারো শতকের কবি।

কবিবিদগ্ধ এবং ছান্দসিক ঃ

১. কোকিলান করে গান মোহজ্ঞান রঙ্গে — সুবাসিত শুনে গীত পুলকিত অঙ্গে।
২. শ্বাসে হয় আয়ুক্ষয় না কৈল্যে বিচার — ভাব ভাল গতকাল আসিবে না আর।

৬. মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক

ইনি 'সয়ফুলমুলুক-লালবানু' নামে একখানি প্রণয়োপাখ্যান ত্রিপুরারাজ বলরাম মাণিক্যের ও কৃষ্ণমাণিক্যের (১৭৬০-৮৩) সময়ে রচনা করেন। তাঁর নিবাস ছিল পরগনা রওশনাবাদের অন্তর্গত আধুনিক ফেনীর বেদরাবাদ চাকলায়।

৭. মুহম্মদ জীবন

মুহম্মদ জীবন চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানা অঞ্চলের লোক ছিলেন। এ অঞ্চলের পরবর্তী কবি মুহম্মদ চুহর পূর্বসূরী হিসেবে জীবনের যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা এই ঃ

মজলিস সিরাজের বংশেত উৎপতি
অলি মুহম্মদ নাম জ্ঞানবন্ত অতি।
তান পুত্র সুচরিত্র কুলের মার্তণ্ড।
শ্রীযুত জীবন মুনসী শাস্ত্রেত প্রচণ্ড।
কৃতির শব্দ তান সংসার পূর্ণিত
রচিল অনেক কাব্য অমিয়া ভাষিত।

কামরূপকুমার কুমারী কালাকাম
রচিল আপনাগুণে অতি অনুপাম।
কন্যা বানুহোসেন নৃপতি বহরম
দৃঢ় রীতে বিরচিল অতি মনোরম।
জাফর আলী নৃপতির মাতুল ঘনান
শাস্ত্রপাঠ অভ্যাস করিল তান স্থান।

অতএব কবি জীবন মুনশী মজলিস সিরাজ নামের কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির বংশধর। কবির পিতার নাম ছিল অলি বা ওলি মুহম্মদ। ধনীমানী জাফর আলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাতুল ও শিক্ষক ছিলেন কবি জীবন। এ জাফর আলী ছিলেন কবি চুহরের আশ্রয়দাতা ও তাঁর 'আজর শাহ সমনরোখ' কাব্যরচনার আদেষ্টা। জাফর আলী প্রথম জীবনে কোলকাতার টাকশালে কাজ করেছেন, পরে চট্টগ্রামে উকিল ছিলেন। জীবন 'রচিল অনেক কাব্য' বলে চুহর উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু নাম করেছেন মাত্র দু'খানা কাব্যের কামরূপ-কালাকাম এবং বানুহোসেন-বাহরামগোর এবং প্রথমটি অপ্রাপ্ত আর দ্বিতীয়টির একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করেছিলেন।

কবি তাঁর পোষ্টা ও কাব্য রচনাব আদেষ্টা কাজীকমিশনার আবদুল মজিদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। কবি চুহরের কাব্যেও এঁর বিস্তৃত পরিচিতি রয়েছে। কবি জীবন ও কবি চুহর সূত্রে জানা যায় ঃ

ক. আবদুল মজিদের পিতা আবদুল হাকিম চুহরের পিতা ওয়াইজুদ্দীনের পীর ছিলেন, এবং আবদুল মজিদ চুহরের প্রতিপোষক ছিলেন, অতএব আবদুল মজিদ চুহরের পিতার প্রায় সমবয়সী ছিলেন বলে অনুমান করা চলে।

খ. কাজীকমিশনারের পদ ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বিলোপ করা হয়। কাজেই আবদুল মজিদ এর আগেকার লোক।

গ. ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতায় টাকশাল স্থাপিত হয়, কবি জীবন মুনশীর ছাত্র ও চুহরের পোষ্টা জাফর আলী এ টাকশালে প্রথম জীবনে চাকুরী করেন। অতএব মজিদ এবং জীবন উভয়েরই ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের আগেই যথাক্রমে কাজীকমিশনার ও কাব্যপ্রণেতা ছিলেন। কাজেই জীবন আঠারো শতকের শেষপাদে বা শেষ দশকে তাঁর কাব্য বানুহোসেন-বাহরামগোর রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করি, যদিও চুহরের 'আজরশাহ-সমনরোখ' কাব্য রচনা কালেও কাজীকমিশনার আবদুল মজিদ উনিশ শতকের প্রথমপাদের গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন। জীবনকবিও তখনো

১. এবে কহোঁ পুস্তকের কথা যথাযুক্ত।
বক্তার পারস্যভাস গ্রন্থুন ভাঙ্গিয়া
পদবন্ধে ভণে হীন জীবনে রচিয়া।

২. বক্তার পারস্য গ্রন্থ পূর্ব ইতিহাস
সহীন জীবনে পদে করিল প্রকাশ

৩. বানুহোসেনের কাব্য অমৃত সদৃশ ভব্য।

কবি হীন, অজ্ঞান বলে ভণিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন বারবার। ইরানের বাদশাহ বাহরামের সঙ্গে পরীকন্যা বানুহোসেনের প্রণয় ও পরিণয়ই এ কাব্যের বর্ণিত বিষয়। 'গোরখর নাম জন্তু নিতি আখেছিল। তাহে নৃপ নাম হৈল বাহরাম গোর'। এখানেও শ্বেতদেও-ব গোখরারোহণে আকাশপথে পরীরাজ্যে গমন, সরোবরতীরে পরীকন্যা বানুহোসেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই প্রেম ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ ঘটনাবলী রয়েছে। কবি যে রসজ্ঞ ও রুচিবান পণ্ডিত ছিলেন, তার প্রমাণ এ আদ্যন্ত খণ্ডিত কাব্যের সর্বত্র দৃশ্যমান। যেমন ঃ

১. বিরহ কণ্টক হৃদে চক্ষে ফুটে যায় — ধন-প্রাণ-জগ-সুখ অসার তাহার।
২. রদমুতি পাঁতি দাড়িম্বক জিতি — বিধুনিন্দি বক্ত্রখানি।
হাস্য মৃদুতর অতি সুমধুর — আলোকিত হয়ে প্রাণি
চরণের তল সরোজ কমল — হেরি কাম-প্রাণ মজে।

কিংবা

৩. রদকুন্দ মুতি পাঁতি বঙ্কিম বিহাস — পীবর নিতম্ব জিত গ্রীবে রত্নহার
লখি মীনকেতন সর্বাঙ্গে হৈল নাশ। — শৈল ভেদি যেন গঙ্গা যমুনা সঞ্চার।

শব্দচেতনায়, বাকবিন্যাসে, বর্ণননৈপুণ্যে, অলঙ্কারের সুপ্রয়োগে, পরিমিতিবোধে, রুচিশীলতায় ও শালীনতায় কবি মুহম্মদ জীবন ওর্ফে 'জীঅন মুনশী' যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা মধ্যযুগীয় ধারার কাব্যে সুলভ নয়। এককথায় কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, সুরুচির ও বাককুশলতার সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে কবি জীবনের 'বানুহোসেন-বাহরামগোর' একখানি সুখপাঠ্য কাব্য।[১]

উনিশ শতকের প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতা

কোলকাতার বাইরে দেশের অভ্যন্তরে যাঁরা উনিশ শতকেও মধ্যযুগীয় ধারায় সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁদের সাহিত্য আমাদের চোখে মূল্যহীন এবং কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও তা সামান্য। কেননা ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাবিনিময় ভিত্তিক নয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মাধ্যমে যে নতুন

১. *বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৭ সন ঃ প্রণয়োপাখ্যানের কবি মুহম্মদ জীবন—আহমদ শরীফ দ্রষ্টব্য।*

আর্থনীতিক ও আর্থিক জীবন বন্দরনগর ও নতুন রাজধানী কোলকাতায় শুরু হল–যার সর্বগ্রাসী ও আপাত সর্বনাশকর প্রভাব গাঁয়ে-গঞ্জে গভীর ও ব্যাপক হতে থাকল, তার ফলে শ্রীরামপুর মিশনের কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এক লক্ষ্যের সীমিত প্রয়াসের কথা বাদ দিলেও ১৮১৮ সন থেকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গদ্যে-পদ্যে বিশেষ করে গদ্যে তার প্রভাবজাত অস্পষ্ট কিন্তু নতুন জীবনদৃষ্টি ও জগৎচেতনা প্রকাশ পেতে থাকে এবং ১৮৪০ সনের পরে বিশেষ করে ১৮৬০ সনের পরে কোলকাতায় বিদ্বানের ও বিত্তবানদের মনোজগতে এক কৃত্রিম লণ্ডন শহরও গড়ে ওঠে। কাজেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়পাদ থেকে যাঁরা প্রাচীন ধারায় সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁরা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সমকালীনতা হারিয়েছেন এবং পিছিয়েপড়া মানুষের মন-মননের প্রতিভূ হিসেবেই তাঁদের সাহিত্য বিবেচ্য। উপযোগবিরহী এ সাহিত্য মন্থন করে যা পাওয়া যায় তাতে পরিশ্রমের ক্ষতি পোষায় না। তবু তাঁদের হিতবুদ্ধি, সংস্কৃতিচেতনা ও নিষ্ঠসাধনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, কেননা তাঁদের কোন দোষ ছিল না। কারণ চেতনা-সূর্য তখনো গাঁয়ে গঞ্জে পৌঁছে নি, তাই তাঁদের ও তাঁদের রচনার পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি। প্রসঙ্গত কোলকাতা শহরকেন্দ্রী কবিওয়ালা ও শায়ের সম্বন্ধে এমনি প্রশ্ন জাগতে পারে। তবে যুগসন্ধিক্ষণের—নবযুগের জন্মলগ্নে পুরোনো যুগের ক্ষীয়মান ধারার অবলুপ্তিমুহূর্তের সাহিত্য হিসেবে যুগান্তরলগ্নের ঐতিহাসিক সামাজিক নৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিস্থিতির সাক্ষ্য হিসেবে এগুলো মূল্যবান। বর্ণহিন্দুরা অধিক সংখ্যায় য়ুরোপীয় বিদ্যা ও সমকালীন বিত্ত অর্জন করায় হিন্দুসমাজে কবিওয়ালাযুগ ১৮৬০ সনের আগেই অবসিত হয়, আর দেশজ মুসলিমের শিক্ষায় ঐতিহ্যহীনতার দরুন ইংরেজিশিক্ষা মুসলিম সমাজে বিলম্বে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার দোভাষী শায়েরের প্রভাব মুসলিম সমাজে উনিশ শতকব্যাপী তো বটেই, এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দুই দশক ধরেও প্রবল ছিল। উনিশ শতকের কবিগান এবং দোভাষীসাহিত্য একই কারণে—সমকালতা ও উপযোগ বিহীন বলে তুচ্ছ।

১. কবি মুহম্মদ চুহর

কবি চুহর প্রধানত পণ্ডিত কবি। ইনি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক সার্থক ভাবেই অনুসরণ করেছেন। শাহ বারিদ খানের ও আলাউলের কবিত্ব পাণ্ডিত্যমুগ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর খণ্ড কাব্যের স্থানে স্থানে তার আভাস আছে।

কবি মুহম্মদ চুহরের 'আত্মকথা' থেকে জানা যায় তিনি চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেই 'মনোহর-মধুমালতী', 'কলিমশাহ-দিলারাম', 'সুজন-চিত্রাবতী' ও 'আজর শাহ-সমনরোখ' কাব্য রচনা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আরো কাব্য লিখেছিলেন কিনা সে-খোঁজ আজো নেয়া হয়নি। কবি কথিত এ চারখানা কাব্যেরও তিনখানা আজতক্ পাওয়া যায়নি। হাতে এসেছে মাত্র 'আজর শাহ-সমনরোখ'। তারও একমাত্র পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত।

ক. কবি পূর্বসূরী হিসাবে পীর-কবি সৈয়দ সুলতান, আলাউল ও কবি মুহম্মদ খানের নামোল্লেখ করেছেন এবং কবির আদেষ্টা জাফর আলীর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের তুলনা প্রসঙ্গে কবি শাহ বারিদ খানের নাম করেছেন।

খ. কবি চুহরের পিতা ওয়াইজুদ্দিনের পীর মোল্লা আবদুল হাকিম আর তাঁর দুই পুত্র কাজী আবদুল হামিদ ও কাজী আবদুল মজিদের নামও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হচ্ছে। কাজী আবদুল মজিদ প্রথমে বাঁশখালির পরে দোহাজারীর কাজীকমিশনার ছিলেন এবং এঁরই আদেশে ও প্রতিপোষণে কবি মুহম্মদ জীবন ওরফে জীঅন মুনশী কাব্য রচনায় ব্রতী হন। কাজী আবদুল মজিদ ছিলেন চুহরেরও পোষ্টা। আদেষ্টা জাফর আলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাতুল ও গৃহশিক্ষক ছিলেন জীবন।

গ. কবির পীরের নাম মতিউল্লাহ। ইনি দরিদ্র চুহরকে আবাল্য ভাত-কাপড়ে পুষেছেন। তাঁরই অভিপ্রায়ে চুহর কৈশোরে 'মনোহর-মধুমালতী' এবং যৌবনে 'কলিমশাহ দিলারাম' কাব্য রচনা করেন।

কবির বংশলতা এরূপ—আজমত—কামালমৃধা—ইউসুফ—আবদুস শুকুর—ওয়াইজ উদ্দীন—কবি মুহম্মদ চুহর।

ঙ. কাব্য রচনার আদেষ্টার 'কুর্সিনামা' ঃ আদেষ্টা জাফর আলী চৌধুরী চট্টগ্রামে উকিল ছিলেন। চুহরের তোয়াজের ভাষায় তিনি বাল্যে 'কুমার' ও যৌবনে 'নৃপতি' রূপে বর্ণিত হয়েছেন।

চ. জাফর আলীর আরবি শিক্ষক বদিউদ্দিন মিয়াজী, ফারসি শিক্ষক ইমাম শরীফ, বাঙলা (হিন্দুয়ানি) শিক্ষক বিজয়পণ্ডিত এবং অন্যতম শিক্ষক ও মাতুল অলি মুহম্মদের পুত্র কবি মুহম্মদ জীবন। জীবন 'অনেক' গ্রন্থের প্রণেতা। চুহর নাম করেছেন মাত্র দুটির 'কামরূপ-কালাকাম' ও 'বানুহোসেন-বাহরাম গোর'।

ছ. কবির প্রতিপোষক জাফর আলী কর্মজীবনের প্রথমে কলকাতা টাকশালে চাকুরি করেন এবং অল্পকাল পরে চট্টগ্রামে ওকালতি করতে থাকেন। সম্ভবত জাফর সরকারি উকিল (কোম্পানীর উকিল) ছিলেন। তিনি বয়সে চুহরের ছোট ছিলেন এবং 'তাঁকে ভক্ষ্য বস্ত্র দানে নিত্য' তুষ্তেন এবং 'গুরুসম মান্যাদরে পুত্রসম পুষতেন।' তাঁরই আদেশে অতিক্রান্ত যৌবনে চুহর 'সুজন-চিত্রাবতী' উপাখ্যান লেখেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে তাঁরই অভিপ্রায়ে আলোচ্য 'আজর শাহ-সমনরোখ' কাব্যখানি রচনা করেছেন।

মতিউল্লাহর নির্দেশে উপাখ্যান দুটি লেখার পরে এবং জাফর আলীর আদেশে কাব্য রচনার আগেই পীর কমিশনার (আবদুল মজিদ) কবির কপালে হাত দিয়েছিলেন ; ফলে. কবিব মতিচ্ছন্ন হয়। অর্থাৎ দরবেশের হাতের স্পর্শে যে অধ্যাত্ম-চেতনার সঞ্চার হল, তার তীব্রতা সহ্য না হওয়ায় কবি পাগল হয়ে যান। পরে সুস্থ হয়ে জাফর আলীর আগ্রহে কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'আজর শাহ-সমনরোখ' রচনার পরে কবি আরো কাব্য লিখেছিলেন কিনা জানবার কোন উপায় আপাতত নেই।

কবির আবির্ভাবকাল

এবার প্রাপ্ত উপাদানের আলোকে কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যাক ঃ

ক. আব্দুল মজিদের পিতা আবদুল হাকিম ছিলেন চুহরের পিতার পীর এবং আব্দুল মজিদ ছিলেন চুহরের আর উকিল জাফর আলীর মাতুল ও গৃহ শিক্ষক কবি জীবনেব প্রতিপোষক। অতএব মজিদকে চুহরের পিতার প্রায় সমবয়সী বলে অনুমান করা যায়।

খ. কাজী কমিশনারের পদ ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বিলোপ করা হয়, আবদুল মজিদ এর আগেকার লোক। চুহরের বালক বয়সে মনোহর-মধুমালতী রচনার আগেই যে মজিদের আদেশে কবি জীবন 'বানুহোসেন-বাহরামগোর' প্রভৃতি কাব্য রচনা শেষ করেন, তার আভাস আছে চুহরের উক্তিতে ঃ

মনোহর-মধুমালতী প্রেম-গাথা
রচাইল' ধিক দামে কমিশনর দাতা।

গ, ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতায় টাকশাল স্থাপিত হয়। এই টাকশালেই জাফর আলী এক সময়ে কাজ করতেন ; কাজেই জাফর আলীর আদেশে রচিত প্রৌঢ় চুহরের কাব্য আজরশাহ-সমনরোখ ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের পরের রচনা।

চুহরের মনোহর-মধুমালতী রচিত-হওয়ার পরেও মজিদ জীবিত ছিলেন ঃ'ললাটেত হস্ত দিল পীর কমিশনর' এই উক্তি থেকেই তা জানা যায়।

বাঁশখালি প্রজ্বল্য ভূমি হন্তে সেই কাজী
দোহাজারী কমিশনরী হইল কর্তা রাজী।

—এ উক্তি থেকে বোঝা যায় মুহম্মদ জীবনের সময়ে মজিদ 'কাজী কমিশনার' নিযুক্ত হয়ে বাঁশখালিতেই কাজে যোগ দেন ; আর চুহরের 'আজর শাহ-সমনরোখ' রচনার আগে তিনি সেখান থেকে বদলী হয়ে দোহাজারীর কাজী কমিশনার হন। কাজেই তখনও কাজী কমিশনের পদ লোপ করা হয়নি। তাহলে আজরশাহ-সমনরোখ ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই রচিত।

অতএব চুহর ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি ; আর তাঁর পূর্ববর্তী কবি মুহম্মদ জীবন যদি মজিদের বা চুহরের পিতার বয়সী হন, কিংবা চুহরের চেয়ে বিশ-পঁচিশ বছরের বড় হন, তাহলে জীবন আঠারো শতকের শেষপাদে তাঁর কাব্যগুলি রচনা করেছেন বলে নিঃসংশয়ে অনুমান করা যায়।

গল্পসার

আবিজ দেশের রাজা আজর শাহ। রানীর নাম সুনালা। রাজা-রানীর সুখেই দিন যাচ্ছিল ; কিন্তু নিঃসন্তান বলে তাঁদের মনে বড় দুঃখ। রাজাই বিচলিত হলেন বেশি। পুত্র না হলে বংশ লোপ পায়। রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই আজর শাহ নানা দেশ থেকে গুণী, পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞ আনিয়ে ভবিষ্যৎ জানার ব্যবস্থা করলেন। দৈবজ্ঞরা বললেন, রানী সুনালার সন্তান হবে না। অবশ্য রাজা যদি মস্‌রিক রাজকন্যা সমনরোখকে বিয়ে করেন তাহলে পুত্র পাবেন। এক বুড়ো মন্ত্রীর ঘটকালিতে সমনরোখের সঙ্গে আজর শাহর বিয়ে হল। এতে রানী সুনালা ঈর্ষা-বিষে জর্জরিত হলেন। তিনি রাজাকে টোনা করে বীর্যহীন করে দিলেন। রাজা দৈবজ্ঞের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে প্রতিষেধকের সাহায্যে আবার সুস্থ হলেন এবং সমনরোখের গর্ভসঞ্চার হল। সমনরোখ শিগগির পুত্রবতী হবেন শুনে সুনালা আবার তুকতাকের আশ্রয় নিলেন ; ফলে, সমনরোখের জীবন সংশয় দেখা দিল। কত তবীব, কত দাওয়াই, কত ব্যবস্থা কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে জানা গেল বাগদাদের পীর সফাহান ছাড়া কেউ এ রোগের প্রতিকার করতে পারবেন না। আবার বুড়ো মন্ত্রীর ডাক পড়ল। তিনি ছুটলেন বাগদাদ দেশে। এ রীতিমত অভিযান। পবীরাজ্যে গিয়ে, নানা অঘটন ঘটিয়ে, বহু অসাধ্য সাধন করে তিনি অবশেষে বাগদাদে পৌছলেন এবং যথাস্থানে পীরের দেখা পেলেন। এখানেই পুথি খণ্ডিত।[১]

ভণিতা ঃ ক. বিজ্ঞ নৃপ জাফর আলি পুরুষ উত্তম
ভণএ চুহর পাই তাহান মরম।

খ. নৃপতি জাফর আলি দানে জিনি কর্ণ বলি
দুঃখীমন তোষে প্রতিনিত।
নৃপতি আদেশে ভাবি চুহর নির্বুদ্ধি কবি
দাতার দাতব্য কৃতি গায়।

২. কবি বাকের আলী চৌধুরী

বাকের আলী চৌধুরী মধ্যযুগীয় উপাখ্যানের মূলধারার ক্রান্তিকালের কবি। প্রাচুর্যের দিক দিয়ে বিচার করলে আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে উপাখ্যানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ সময়টাতেই বেশিরভাগ ফারসি উপাখ্যানের বাঙলা তর্জমা হয়। ১৮৫০-এর পরে দোভাষী শায়েরদের হাতে যে-সব উপাখ্যান রচিত হয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোই উর্দু-হিন্দির স্বাধীন অনুবাদ কিংবা অনুকৃতি। তখন দরবারী মর্যাদাচ্যুত হওয়ায় ফারসির চর্চা কমে আসছিল, তাই শায়েরদের কেউ হয়তো অনুবাদ করবার মতো ব্যুৎপন্ন ছিল না ; ফলে, এ সময় থেকেই ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর যোগসূত্র ছিন্ন হতে থাকে। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ অবধি যাঁরা ফারসি উপাখ্যান অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে এ কয়জনের পরিচয় পাওয়া গেছে ঃ তমীম গোলাল-চতুর্নসিলাল ও মিসরিজামাল রচয়িতা কবি মুহম্মদ আলী রাজা, গুলেবকাউলি রচক মুহম্মদ মুকিম আর মৃগাবতী ও কামরূপ-কালাকাম প্রণেতা মুনশী মুহম্মদ মুকিম, শাহপরী-মালিকজাদা ও হাসনবানু কাব্যের কবি মুহম্মদ আলী, আজরশাহ-সমনরোখ, সুজন-চিত্রাবতী, দিলারাম প্রভৃতি রচক মুহম্মদ চুহর, বানুহোসেন-বাহরামগোর, কামরূপ-

১. *বিস্তৃত পরিচিতির জন্যে বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৭ সন দ্রষ্টব্য।*

কালাকাম প্রভৃতি রচয়িতা মুহম্মদ জীবন, লালমতী-তাজলমুলক রচয়িতা কবি তমিজী, মিশররাজকুমার আব্দুল আজিম প্রণেতা ঈশ্বর-গোলাম, মলয়া-মাহমুদ রচয়িতা কাজী হাসমত আলী চৌধুরী এবং আলোচ্য মনুচেহের-মা'সুমা পরী রচক বাকের আলী চৌধুরী।

১১"×৬" পরিমিত কাগজের বই। পত্র সংখ্যা ৩৭৩। হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট। সম্পূর্ণ আছে। পাণ্ডুলিপির আবরণপত্রে নীচের কথাগুলি লেখা হয়েছে ঃ

> শ্রীশ্রী হক নাম। মনুচেহের মাহাছিমা পরীর প্রস্তাব।
> চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা নিবাসী মৃত
> সেখ মাহাম্মদ রফি চৌধুরির পুত্র সেখ মাহাম্মদ বাকর আলী
> চৌধুরি কৃত আরবি অক্ষরে ছিল। ঐ বাকর আলী চৌধুরির
> পুত্র শ্রীযুক্ত সেখ মুন্সি বসারত আলী সাহেবের অনুমতি মতে
> আমি তাঁহান পুত্র শ্রী সেখ তোপজ্জল আলীর বকলমে বাঙ্গালা
> অক্ষরে লিখিত হইল। সন ১২৯৩ বাঙ্গালা মোতাবেক ১২৪৮
> মঘী তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ।

অতএব, কবিরই পৌত্র শেখ তোফাজ্জল আলীই লিপিকর এবং লিপিকাল ১২৯৩ সন বা ১২৪৮ মঘী তথা ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ ; আর কবি আরবি হরফেই কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি কবির বাড়ীতে যত্নে সংরক্ষিত আছে।

সপ্ত সোরা পদে মোর হাজার ছালাম
যা হোন্তে যাহের হৈল ফারসি কালাম।
হজরত ওস্তাদ মোর সাদেক মোহাম্মদ
কোটি কোটি নমস্কার তার যুগপদ।
রাঙ্গুনিয়া গেরামেতে তাহান বসতি
পুষ্প বন মধ্যে যেন সুগন্ধি আকৃতি।
বহুল বিস্তর কেচ্ছা চতুর্দশ বার
কেতাবেত কহিয়াছে তার পরস্তাব।
তাহান কিঙ্কর মুই মিচকিন অধীন
বাকর আলী মোর নাম সভা হন্তে হীন।
গহিরাতে বসবাস থানা রাউজান
চৌধুরি রফির পুত্র জানে সর্বজন
মনুচেহের কেচ্ছাবাণী ফারসি জবান
কেতাবেতে লিখা আছে তাহার বয়ান।
বাঙ্গালার ভাষে তাকে করিনু পদবন্ধ
সকলে জানিতে হেতু পয়ার সুছন্দ।

এ থেকে জানা যায়, কবি 'সপ্ত সোরাহ্'র ফারসি কাব্য অবলম্বনে 'মনুচেহের মা'সুমা পরী' কাব্য রচিত হয়। বাঙলা কাব্যটির কবি প্রদত্ত নাম 'মনুচেহের কেচ্ছা'। কাব্যটি চৌদ্দ বাবে সমাপ্ত। কবির উস্তাদের নাম সাদেক মোহাম্মদ। তাঁর নিবাস ছিল রাঙ্গুনিয়া গাঁয়ে। কবির বাড়ী ছিল রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা গ্রামে। জমিদার বংশেই কবির জন্ম। তাঁর সময়েই জমিদারী নিলাম হয়ে যায়। কবির বংশধরেরা আজো গহিরা গ্রামে বাস করেন এবং বিত্তে ও আভিজাত্যে তাঁরা আজো সুখ্যাত।

একটি ভনিতা ও আবরণ পত্রোক্ত বিবৃতির আলোকে কবির কুর্সিনামা দেয়া হল। ভণিতাটি এই ঃ

কহে হীন বাকর আলী রফির নন্দন
গহিরা গেরামে ঘর জানে সর্বজন
দাদা মোর আজিজুল্লা সর্বগুণ ধাম
আবদুল মজিদ মোর পরদাদার নাম।
জমিদারী ছিল মোর গোলাম আজিজ
লঘু হন্তে বেচা গেল নিলামেত নিজ।

আগেই বলেছি, মনুচেহের মা'সুমা পরী উপাখ্যানটি কবি সপ্ত সোরাহর ফারসি কাব্যের অনুবাদ। কবির স্বগ্রামবাসী সফর আলী নামের এক ব্যক্তির অনুরোধেই কবি এ কাব্য রচনায় ব্রতী হন ঃ

শ্রীদেওয়ান আলী সুত সফর আলী নাম
ভাগ্যবন্ত কুলশীল গহিরা গ্রাম
তাহান আরতি মতে বাকর আলী
সমাপ্ত নবম বাব রচিল পঞ্চালি।

রচনাকাল

কাব্যের উপসংহারে তারিখ দেওয়া আছে ঃ

পুস্তক সমাপ্ত হৈল চতুর্দশ ভাগ
বার শত একাদশ অব্দ পঞ্চ মাঘ।
শুভ শুক্রবারে আমি পড়িয়া নামাজ
সমাপ্ত করিলাম এই পুস্তকের কাজ।

চট্টগ্রামে মঘী সনই প্রচলিত ; কাজেই ১২১১ অবদ মঘী সনই নির্দেশ করে। অতএব ১২১১ মঘীর ৫ই মাঘ শুক্রবার (১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে) কাব্য রচনা শেষ করে কবি সবিনয় পাঠকের হাতে তুলে দেন।

কাহিনীটি সুদীর্ঘ হলেও বৈচিত্র্যহীন। মা'সুমা পরীর প্রতি মনুচেহেরের আসক্তি, তজ্জাত বিকাব এবং নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রমণের পর উভয়ের মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। কবির ভাষা ও ভঙ্গী সাধাবণ।

একটি ভণিতা ঃ

সফরালি আরতি শুনি মনুচেহের কেচ্ছা বাণী
কহিলেন্ত হীন বাকর আলী
বাঙ্গালা দখল হানি ফারসি কালাম জানি
প্রচারিল পয়ার পঞ্চালি।[১]

৩. মুহম্মদ মুকিম

মুহম্মদ মুকিম উনিশ শতকের প্রথমপাদের কবি। তাঁর গ্রন্থে চট্টগ্রামেব ইতিহাসের নানা উপকরণ রয়েছে বলেই গ্রন্থটি মূল্যবান। গুলে বকাওলির কবির পিতার নাম সৈয়দ মুহম্মদ দৌলত। কবির বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। মুহম্মদ মুকিমের জন্ম আঠারো শতকের শেষ পাদে এবং তিনি উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি। গুলে বকাউলি বা তাজুল বকাউলি সম্ভবত কবির একমাত্র রচনা। আলোচ্য কবি মুহম্মদ মুকিমেব আদর্শ ছিল ফারসি কাব্য—

নর-পবী প্রসঙ্গ এক ফারসি কিতাব
তাজুল বকাওলি কিসসা ফারসি বয়ান
বঙ্গভাষে মুহম্মদ মুকিম যে ভাণ।

ইজ্জতউল্লাহর কাব্যই ছিল তাঁর অবলম্বন।

কবিব পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল ফেনীর পশ্চিমভাগে যুগদিয়া দেশে। সেখান থেকে এসে চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদে এবং তার পরে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিমপুর গাঁয়ে কবির এক পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। তারপরে আর এক পূর্বপুরুষ রাউজান থানাব নযাপাড়া গ্রামে এসে বাস করেন। এ গাঁয়েই কবির জন্ম। কবি রাউজানের জমিদার আলি বা মুহম্মদ আকবর চৌধুরীর গোমস্তা ছিলেন। মনে হয় কবি জমিদাব আকবর চৌধুরীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাই গ্রন্থ রচনাকালে কবি আকবর চৌধুরীর তিন পুত্রের নামোল্লেখ করেছেন। যদিও এঁর ছিল পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। কাজেই কবি উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে গ্রন্থ বচনা সমাপ্ত করেন বলে মনে হয়। কবির মনিব আলী বা মুহম্মদ আকবর চৌধুরীর মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। এবং আকবর চৌধুরীর পুত্র সাদত আলী চৌধুরী ওর্ফে হারি মিয়া চৌধুরীর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। অতএব, মুহম্মদ মুকিমের জন্ম হয়তো আঠারো শতকের শেষার্ধে তখন ইংরেজ নৃপতি যে ফিরিঙ্গির জাত। চিরদিন ইঙ্গরেজ এথা মহিপাল।' উনিশ শতকেই 'চিরদিন ইঙ্গরেজ এথা মহিপাল' বলা সম্ভব।

কবির শিক্ষক ছিলেন এক নজুমউদ্দীন। আর পীর ছিলেন কবি সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র বংশীয় এক মীর বা সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ।

১. *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৮ সন, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়।*

কাব্যরচনায় কবিকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন শাহ গাজীশরীফ বংশীয় শাহ আসহাবুদ্দীন এবং মোহাম্মদ তকী ও মোহাম্মদ দানিশ।

মুকিম পণ্ডিত কবি। স্তুতিখণ্ডে হামদ, না'ত, আসহাব, চারপীর, বারো ইমাম, চৌদ্দ খানদান, সাত আসমান, সাত দ্বীপ, সাত সমুদ্র, সাত খণ্ড ভূমি, পর্বত, রাজসিংহাসন প্রভৃতির বন্দনা রয়েছে। রাজসিংহাসন বর্ণনায় শাহজাহান পুত্রদের বিবাদ ও আওরঙজেবের সিংহাসন প্রাপ্তির বর্ণনাও রয়েছে। তা'ছাড়াও আছে কবির সুবিস্তৃত বংশ পরিচয়। সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য হচ্ছে মুকিমের পূর্ববর্তী ও সমকালের মুসলিম কবিদের নামোল্লেখ। পূর্ববর্তী কবি হচ্ছেন ঃ সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, কাজী দৌলত, আলাউল, আবদুন নবী, গিয়াস, মুজাম্মিল, হাবুত রোয়াজা, শেখ পরাণ, পরাগল, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, তাহিরহ মুহম্মদ আলী, চামু এবং কবির সমকালের তথা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত কবিরা হচ্ছেন আলি রজা [১৭৫৯-১৮৩৭] হারি, আলি মিয়া, মুনশী মুহম্মদ মুকিম [ফায়দুল মুকতদী রচনা ১৭৯১ খ্রীঃ], কাজী দানেশ, মুহম্মদ তকী ও মুহম্মদ দানিশ। আর চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ দরবেশ হচ্ছেন শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, শাহ পীর, হাদী বাদশাহ, শাহ সুন্দর ফকির, শাহ সুলতান, শেখ ফরিদ ও বদর।

গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় অংশগুলো কবির ভাষায় এখানে সংকলন করে দিলাম ঃ

মুকিম আসহাবুদ্দীনের মুখে কিসসা শুনে তাঁর থেকেই নিয়েছিলেন ফারসি কেতাব বাঙলায় অনুবাদের জন্যে ঃ

নর-পরী প্রসঙ্গ এক ফারসি কিতাব
হেরিয়া কহিল মধুভাসে পরস্তাব।
তানপদে নিবেদিয়া লইলুঁ কিতাব
রঙ্গভাবে কহিবারে হৈল মনে ভাব।

কটিকা গ্রামের মোহাম্মদ তকী তথা সবশ্রেষ্ঠ হএ...
তাঁর-পদ নমি আজ্ঞা লৈলুঁ কহিতে সুকৃতি।

এবং চট্টগ্রাম শহর সংলগ্ন সুলুফবহর গ্রামের
মোহাম্মদ দানিশ নামে বুদ্ধি পরবল
গুণবন্ত মহাধীর প্রায় আলাওল।
তানপদ নমস্কারি লই শুভ বিধি।

——কবি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেন। এবং শুরুতে পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন ঃ

তবে প্রণামিব আমি পূর্বকবি জান
পীর মীর চক্রশাল [বাসী] সৈয়দ সুলতান।
মোহাম্মদ খান বিতর্পন দৌলত কাজীবর
এহি তিন আর এক আছএ তৎপর।
গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম।
আর বৃদ্ধ মহাশক্য আবদুল নবী নাম
গয়াছক, মুজাম্মিল সুধীর উপাম।
আলি মোহাম্মদ আর চামু বুধজন
পূর্বধীব নামে নামে প্রণামী চরণ।
অখনের পণ্ডিত আছএ হথাতথা
হাবুত রোয়াঝাঁ, শেখ পরান, পরাগল
ফাজিল নাসির, তাহির সকল।
সেসব প্রণাম করি কহিবাম ভ্রাতা।
শাহা আলী রাজা পদ করিয়া প্রণাম
হারি নাম্ম আলি মিয়া পদেত সালাত
মুনশী নাম মোহাম্মদ মুকিমে বন্দিয়া।
অগ্রগামী মিয়া চলিলুঁ পাছে পাছে।
পীরের নাম——
পীর মীর মোহাম্মদ সৈয়দক সালাম।

ভণিতা ঃ
শ্রীযুত মোহান্ত সৈয়দ পীরবর
তানপদ প্রণমিয়া শ্রীলয় মুকিম
কিংবা, শ্রীলয়এক মোহাম্মদ মুকিম রচিত।[১]

১. *বিস্তৃত বিবরণের জন্য পুথিপরিচিতি, পৃঃ ৯৪-১০৪ দ্রষ্টব্য।*

৪. মুনশী মুহম্মদ মুকিম পণ্ডিত

ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের ইদিলপুর গ্রামবাসী। ইনিই অপ্রাপ্ত মৃগাবতী, কামরূপ- কালাকাম, আইউব নবীর কিসসা ও প্রাপ্ত ফায়দুল মুকতবী–এ চারখানা গ্রন্থ প্রণেতা। গুলেবকাউলির কবি মুকিম উনিশ শতকের প্রথমপাদে কেবল ওই একখানা গ্রন্থই রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক নামের সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।[১] 'মুসলিম ধর্মসাহিত্য' অধ্যায়ে এঁর পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

৫. সৈয়দ মুহম্মদ নাসির

সৈয়দ মুহম্মদ নাসির রচিত আদ্যন্ত খণ্ডিত একখানি 'বেনজীর বদর ই-মুনীর' পাওয়া গেছে। এটি সুপরিচিত ফারসি ও উর্দু প্রণয়োপাখ্যানের বাঙলা অনুবাদ বা অনুসৃতি। উর্দু কবি মীর হাসান দেহলভী ১১৯৯ হিজরীতে তথা ১৭৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে বেনজীর-বদর-ই-মুনীর উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। রাজকুমার বেনজীর এবং রাজকন্যা বদর-ই মুনীরের প্রেম ও মিলন কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। বিশ শতকে দোভাষী শায়ের শেখ কমরউদ্দীন এ বিষয়ক একখানা এবং আজিমউল্লাহ খান অপর একখানা কাব্য রচনা করেছেন। সৈয়দ মুহম্মদ নাসির ও 'সিরাজ সবিল' রচক কবি সৈয়দ নাসির সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। বিস্তত বিবরণের জন্যে 'ধর্মসাহিত্য' অধ্যায়ের কবি সৈয়দ নাসিরউদ্দীন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৬. আজগর আলী পণ্ডিত

'চিনলেম্পতি' নামের এক উপাখ্যান রচনা করেন আজগর আলী পণ্ডিত। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গাঁয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর বংশধরেরা এখনো নানুপুর গ্রামে বাস করেন। কবি মঘী, বাঙলা, হিজরী ও খ্রীস্ট অব্দ উল্লেখ করেছেন প্রথানুসারে হেঁয়ালিতে। তা' থেকে ১২৭৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৯০৫ সনে কবির পুত্র ওবেদুর রহমানের উদ্যোগে বটতলা থেকে ৩৪০ পৃষ্ঠার এ বিপুল কলেবর পুথি প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যে কবির আত্ম পরিচিতি রয়েছে। গৌড় থেকে আসেন হাফেজ কালামণি, তাঁর পুত্র পরম্পরা এরূপ ঃ হীরাগাজী-এয়ার মোহাম্মদ—আজিজ—মুহম্মদ সাদেক–আজগর আলী (কবি)। তাঁর কাব্যরচনার আদেষ্টা ছিলেন স্বগ্রামবাসী মুন্‌শী আমানুল্লাহ ঃ

মুন্সী আমানুল্লা নাম বাসস্থান সেই গ্রাম
বিদগধ দেশের প্রধান
লেম্পতির সুপ্রসঙ্গ পারস্য করিয়া বঙ্গ
ভাষে কবি দেও রসজ্ঞান।

অতএব চিনলেম্পতি কাব্য ফারসি উপাখ্যানের অনুসৃতি।

১. উনিশ শতকের কুমিল্লার পশ্চিমগাঁওর জমিদার নওয়াব ফয়জুননিসা বেগম আত্মকথামূলক এক বিপুল কলেবর উপাখ্যান রচনা করেন গদ্যে-পদ্যে ১৮৬০-৭০ সনের দিকে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বইটি মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থের নাম 'রূপ জালাল'। আত্মকথামূলক বলেই এটি মৌলিক রচনা।

২. ঈশ্বর গোলাম নামের এক কবি 'মিশররাজকুমার আবদুল আজিমের উপাখ্যান' রচনা করেছেন।

৩. বিশ শতকের গোড়ার দিকে উজির আলি মুন্‌শী রচনা করেছেন সায়েদ কুমারের পুথি। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামের পটিয়া থানার নিকটস্থ হাইদগাঁও গ্রামে।

৪. চট্টগ্রামের পটিয়া থানার জঙ্গলখাইন গাঁয়ের ফজলুর রহমান চৌধুরী 'গুলশনে বাহার' নামের প্রণয়োপ্যাখ্যান রচনা করে ১৩২৬ (?) সনে নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেছিলেন।

৫. চট্টগ্রামবাসী কায়েমউদ্দীন পণ্ডিতের কাব্যের নাম 'চমন বাহার'। এটিও বটতলা থেকে ছাপা হয়েছিল।

---

১. *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ২৮৩-৮৭।*

৭. কবি তমিজী
প্রতিপোষণ ও সাহিত্যশিল্প

আগেকার যুগে দেশে শিল্প-স্থাপত্যের ও সাহিত্য সংস্কৃতিব চর্চা হত ধনী-মানীদের আগ্রহে ও তাঁদের অকুণ্ঠ বদান্যতায়, এবং অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতায়। ধনে কাঙাল কিন্তু মনে ধনী বুদ্ধিজীবী কবি পণ্ডিতগণ ধনীর আশ্রয় পেলে খোরপোষের ভাবনা মুক্ত হয়ে মনের দ্বার খুলে দিতেন। এভাবে যুগযুগ ধরে দেশে দেশে সাহিত্য-শিল্পাদি কলার পরিচর্যা সম্ভব হয়েছে। সেযুগে লেখকেরা ধনীর খেতেন তাই তাঁদের তোয়াজ-তারিফে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। এ যুগ গণ-যুগ, জনসাধারণই লেখকের ভোক্তা, তাই এ যুগের সাহিত্য ও শিল্প গণস্বার্থের জয়গানে মুখর। এতেই বোঝা যায়, কারো আশ্রয় ও প্রশ্রয় না পেলে কলাসেবীর চলে না। সেদিনও চলত না, আজো চলে না। ধনীর দানের প্রয়োজন আজো রয়েছে, তবে কালভেদে ধরন পাল্টে গেছে। আগে ছিল তা ব্যক্তিক, এখন হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আগে ছিল রাজকীয়, তন্ত্রভেদে এখন হয়েছে সরকারী। আগেকার দিনে ইত্যাকার পোষকতার পশ্চাতে ছিল আভিজাত্য গর্ব, বিলাস ও অনুগ্রহ, আর এযুগে রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। গেল শতকের এই সময়টায় মধুসূদনও কলম ধরেছিলেন পৃষ্ঠপোষকতায়। কলার চর্চা ও পরিচর্যা সেকালে তো বটেই, একালেও আভিজাত্যের ও সংস্কৃতিপরায়ণতার প্রধান পরিচায়ক।

এখানে আমরা বাঙলাসাহিত্যের পোষক একজন জমিদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কালের দিক দিয়ে এ বিদ্যোৎসাহিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা তেমন মূল্যবান না হলেও কীর্তি হিসেবে তা তুচ্ছ নয়।

কক্সবাজার মহকুমার রামু থানার অন্তর্গত 'মিঠাসরাহ' গাঁয়ে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে আলী হোসেন চৌধুরী ওরফে কালাচাঁদ চৌধুরী (১৮১৫-৬৬) ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।
তাঁর বংশলতা এরূপ ঃ

মুহম্মদ রুহুল আমীন–নূরমুহম্মদ–মুহম্মদ আসকর চৌধুরী—রুস্তম আলী চৌধুরী—আলী হোসেন চৌধুরী (জ, ১৮১৫ মৃঃ ১৮৬৬ খ্রীঃ)—আবদুল ফতাহ চৌধুরী (১৮৫৭-৭৮)—এম বদরদ্দোজা (১৮৭৬-১৯৫১ খ্রীঃ)।

জমিদার আলী হোসেন চৌধুরী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কালাচাঁদ চৌধুরী নামেই সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রজাহিতৈষণা, বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতা তাঁকে জনপ্রিয়তা ও নৃপতির মর্যাদা দিয়েছিল। তিনি নিজের বাড়িতে দালান, প্রাচীর ও মসজিদ তৈরি করেছিলেন এবং রামুর আলী হোসেন চৌধুরীর হাট ও গর্জনিয়ার হাট প্রতিষ্ঠা করেন ; রামুর হাইস্কুল ও মাদ্রাসা তাঁরই কীর্তি। গরীব ছাত্রেরা তাঁর বাড়িতে নিখরচায় খেতে পেত। বহু লোক নিয়ে (জাহাজের আধখানা ভাড়া করে) তিনি দু'বাব হজ করেন। চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরায় তাঁর বাসাবাড়িতে কক্সবাজার অঞ্চলের ছাত্র ও মুসাফিরেরা বিনা ভাড়ায় থাকতে পারত।

আলী হোসেন চৌধুরীর সভার চারজন কবির নাম ও রচনা পাওয়া গেছে তাঁদের নাম তমিজী, হাজী আলী, ফকির আসকর আলী ও লোকমান আলী। আরো কবির তিনি আশ্রয়দাতা ছিলেন কিনা, আজো জানা যায়নি। উক্ত কবিগণের তোয়াজের ভাষায় তিনি 'ঠাকুর', 'নৃপতি' ও 'সুলতান' হয়ে উঠেছেন। 'ঠাকুর' মগ আমলের উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও দক্ষিণ চট্টগ্রামে রোসাঙ্গ—সংস্কৃতির রেশ ছিল।

আলী হোসেন চৌধুরীর সমকালে কোলকাতায় পাশ্চাত্য আদর্শে বাঙলা গদ্য রচনার প্রয়াস দেখা দিলেও কোলকাতার বাইরে তখনো পুরোনো ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি চলছিল। কাজেই বাঙলার প্রান্তসীমা রামুতেও পুরোনো ধারার পরিচর্যা হচ্ছিল ; আর একটি কথা, দোভাষীরীতি যে কোলকাতা অঞ্চলের বাইরে চালু ছিল না, তারও নতুনতর প্রমাণ মিলল আলোচ্য এ চারজন কবির ইসলামী সাহিত্যের ভাষায়।

কবি তমিজী

আলী হোসেনের আশ্রিত কবি তমিজী 'লালমতী-তাজলমুলুক' নামে একখানি উপাখ্যান রচনা করেন। তমিজী কবির কলমী নাম (তাখাল্লুস) কিংবা প্রকৃত নাম বোঝা যায় না। পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় প্রসঙ্গে তমিজী বলেছেন ঃ

নিধনী আলেম অলি পণ্ডিতের গণ।
অন্ন বস্ত্র ভূমি দানে করএ পালন।।
পিতামহ অবধি ধনের অধিকার।
আদ্য হন্তে এবে হৈল শত গুণ ভাণ্ডার।।

পিতা হন্তে এখনেত হাজারে হাজার
অসাধিত বহু রাজ্য সাধিল কুমার।।
সর্ব গুণে বিশারদ এলম সাগর।
গুণী জ্ঞানী'ধিক মানী রসের নাগব।।
সুন্দর শরীর যেন মূরতি মদন।
ফুটিয়াছে চম্পা যেন রস বিনোদন।।

একটি ভণিতা ঃ

ঠাকুর আলী হোসেন ধীর আরতি করিয়া স্থির
রামু গ্রামে বৈসে মহাশএ।
তাহান আরতি শুনি আপনার মনে গুণি
হীন তমিজী ভণএ।।

অন্যত্র,

রস 'দধি গুণধাম আলি হোসেন নাম
সুআরতি শুনিয়া তাহান।
তাহান পীরিতি রসে আর তান উপদেশে
হীনমতি তমিজীএ ভাণ।।

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ–সংগৃহীত তমিজীর লালমতী-তাজলমুলুক উপাখ্যানের পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। যা আছে তারও কয়েকটি পত্র অর্ধ ছিন্ন এবং মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নেই। কাজেই কাহিনীটা পুরো অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি, তবে এ কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এ উপাখ্যানের সঙ্গে নবী সোলেমান ও এক বেঙ্গমা পক্ষী জড়িত এবং ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আল্লাহরও প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এ কাহিনীতে বিহঙ্গম চরিত্রের মাধ্যমে নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আত্মপ্রত্যয়পুষ্ট প্রতিরোধ-প্রয়াস মহিমার রূপ নিয়েছে। যদিও নিয়তির বা আল্লাহর ইচ্ছারই জয় হয় সর্বত্র।

নবী সোলেমান মহাপ্রতাপশালী রাজা। তাঁর প্রভাব সর্বত্র ঃ

অষ্টাদশ সহস্র আলম জীবধারী
অনুমতি মানে সবে কিবা দেও-পরী।

একদিন জিবরীল এসে নবীকে জানালেন, মশরেকী রাজ্যের রাজা জেবলমুলুকের পুত্র তাজলমুলুকের সঙ্গে মগরেবী রাজ্যের রাজকন্যা লালমতীর মিলন হবে। কেননা ঃ

দোহান যোটক প্রভু আর্শেত বান্ধিলা
দোহ মধ্যে সম্বন্ধ হইতে আজ্ঞা দিলা।
দোয়াদশ অব্দ মধ্যে করিব মিলন

বিনি বিভা দোহানে জন্মিব ফরজন।
পঞ্চশত অব্দ পন্থে দ্বাদশ বৎসরে
একত্র করিব প্রভু আজ্ঞা অনুসারে।

আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথি থেকে তমিজীর পরিচয় ও কাব্যের রচনাকাল জানা গেল না, তবে আলী হোসেন চৌধুরীর পরিচয় কবি যেভাবে দিয়েছেন, তাতে মনে হয় তখন আলী হোসেন প্রৌঢ়। কাজেই অনুমান করা যায়, ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই[১] তমিজী উপাখ্যানটি রচনা করেন।

১. *বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৬ সন, দ্রষ্টব্য।*

৮. আসাদ আলী চৌধুরী

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার হোসেনাবাদ ওর্ফে খীলমগল ওর্ফে রাজানগর গাঁয়ে আসাদ আলী চৌধুরীর তালুকদার পরিবারে জন্ম। তাঁর পিতার নাম বেচাগাজী চৌধুরী। ৪৫৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ বিপুলকায় প্রণয়োপাখ্যান ১২৫২ মঘীতে বা ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে রচিত—

সন মঘী রাখি এথা তারিখ বানিয়া
কর শর ভুরু গুরু নিয়মে ধরিয়া।
মিথুনের আদ্যপক্ষ ভুবন বিদিত
লিখা অবসান দিলুঁ ভার্গব লুকিত।
(কর–২, শর–৫, ভুরু–২. গুরু–১, ১২৫২ মঘী)।

কবির পীব ছিলেন চট্টগ্রামের পোমরা গ্রামবাসী নজুম। প্রথম চব্বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী হামদ, না'ত ও কবির আত্মপরিচয় অংশে কয়েকজন পণ্ডিত সুজনের বর্ণনাও রয়েছে। কবি কোন লোকপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে তাঁর 'দ্বিজনন্দিনী' নামের কাব্যে 'নটনন্দিনী রহস্য' উদঘাটন করেছেন। 'বিদগধ ধীর জনে কহিছে কাহিনী'—এ উক্তিই আমাদের অনুমানের ভিত্তি।

৯. খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী

আধুনিক বাঙলা গদ্য রচনায় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী অন্যতম। কিন্তু তিনি শুধু গদ্য রচনা করেন নি, কাব্যচর্চাও করেছিলেন। তাঁর কাব্যখানার নাম 'ভাব-লাভ'। ভাব-লাভ নামের অর্থ 'উদ্দেশ্যানুসারে সিদ্ধি'।

কাশ্মীর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন মুহম্মদ শাহ, তাঁর মন্ত্রী ছিলেন আহমদ। উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান কামনায় সাধনা করে যথাসময়ে সুলতান ও মন্ত্রী উভয়ে পুত্রসন্তান লাভ করলেন। শাহজাদার নাম রাখা হল সৈয়দ আহমদ আর মন্ত্রীপুত্রের নাম রাখা হল নূর আহমদ। সুলতান মন্ত্রীর কাছে 'জবান' দিয়েছিলেন. যদি একের পুত্র এবং অপরের কন্যা হয় তবে উভয়ের বিয়ে দেবেন আর যদি উভয়ের পুত্র বা কন্যা হয় তবে তাদের মধ্যে দোস্তী করিয়ে দেবেন। এভাবে সৈয়দ আহমদ ও নূর আহমদ পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হলো। তার পরের কাহিনীতে পরী ও মধুমালতীর এবং লোর-চন্দ্রানীর আদল আছে।

'ভাব-লাভ' একটি রোমান্টিক কাব্য। কবির চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্য বা কবিত্ব শক্তি উচুঁ দরের নয়, পাণ্ডিত্যও উল্লেখযোগ্য নয়। অবশ্য কাব্য থেকে সেকালের সামাজিক রুচিপ্রকৃতিরও কিছু আভাস পাওয়া যাবে। কবির মধ্যে একটু অধ্যাত্মপ্রবণতা আছে। তাই তিনি কাহিনী বর্ণনায় যেখানেই একটু সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই আধ্যাত্মিকতা শুনিয়েছেন। তাঁর কাব্যান্তর্গত বাঙলা ও হিন্দিগানগুলোতে আমাদের উক্তির সমর্থন মিলবে।

কবি শামসুদ্দিন সিদ্দিকীর নিবাস ছিল বর্ধমান জিলায়। তিনি 'উচিত শ্রবণ' নামে গদ্যে-পদ্যে অপর একখানি অধ্যাত্মবিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। এইটে প্রকাশিত হয় ১২৭১ বাঙলা সনে (১৮৬৫ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থেই আমরা তাঁর গদ্য রচনার পরিচয় পাই। মনে হয় তাঁর 'ভাব-লাভ' কাব্যটিতে রয়েছে প্রাচীন ধারার শেষ নিদর্শন। সেকালে পঠিতব্য বিষয়—ফারসি, আরবি, নাগরী, ভৈরবী যত বিদ্যা সব ছিল। উক্ত নিয়মেতে বুদ্ধির বিদ্যাতে সকলেরে শিখে নিল।'

১০. কাজী হাসমত আলী চৌধুরী

কাব্যটির দুটো খণ্ড। প্রথম খণ্ড কয়ম্রুস রাজার সঙ্গে রুম রাজার যুদ্ধ বৃত্তান্ত। এটি ৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দ্বিতীয়টি ৪১ পৃষ্ঠায় খণ্ডিত।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিখানির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দেয়া নাম ছিল 'কয়ম্রুচ রাজার কেচ্ছা'। কেননা, পুথিতে কাব্যের নাম নেই। কিন্তু এ নাম বর্ণিত বিষয়ে পরিচায়ক নয়, তাই নায়ক-নায়িকার নামে কাব্যের নাম দেয়া যেতে পারে 'মলয়া-মাহমুদ'।

গোড়াতে ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি আছে। এ থেকে রচনা কালের আভাস পাওয়া যায় ঃ

আছে বিকুটিয়া (ভিক্টোরিয়া) নারী সভা অধিকারী
বলবন্ত ন্যায়বন্ত মহাছত্রধারী।

কবি কাজী হাসমত আলী চৌধুরীর পিতার মৃত্যু হয় মগদের দোয়াদশ শত সপ্ত সনে অর্থাৎ ১২০৭ মঘী সনে বা ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে। অতএব ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পরে 'মলয়া-মাহমুদ' উপাখ্যানটি রচতি হয়। কবির শিশুকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ আছে অতএব কবি ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী আত্মবিবরণে কবি অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। এ থেকে জানা যায়, কবি জমিদারসন্তান ও জমিদার ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার ভোজপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। লোকশ্রুতি এই যে, তিনি প্রবলপ্রতাপ জমিদার ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'আলেফ-লায়লা'র বঙ্গানুবাদ করেছিলেন বলেও শোনা যায়। তাঁর 'ফগফুর শাহ' কোন পৃথক রচনা নয়, আলোচ্য 'মলয়া-মাহমুদ' কাব্যেবই দ্বিতীয় খণ্ড। এ কাব্যের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে মিসররাজ কয়মুসের সঙ্গে রুমরাজ আবদুল মজিদের যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে চীনরাজ ফগফুর শাহর কন্যা মলয়াজোহরার সঙ্গে মিশররাজ কয়মুসপুত্র সুলতান মাহমুদের মিলনকাহিনী।

কবির আত্মকথা থেকে তাঁর বংশপীঠিকা পাওয়া গেছে—মহব্বত সাধু—সাদুল্লাহ—আনিস মুহম্মদ—কাজী শাহাবুদ্দীন—হায়দর আলী—কবি হাসমত আলী। দুটো ভণিতা ঃ

১. যুগ হাতে লই মাথে গুরু পদধূলি
গুঁথএ মুকতাহার শিশু হাসমত আলী।

২. মস্তক উপরে গুরু যুগপদ ধরি
রচে হীন হাসমত আলী সুধা সুলহরী।

সম্ভবত কাব্যটি মৌলিক রচনা। কাব্যের কোথাও অনুবাদ বলে উল্লেখ নেই। কাহিনীর গঠনশৈথিল্যও আমাদের এ অনুমানের পক্ষে ইঙ্গিত দান করে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের রচনা হলেও কাব্যটিতে ক্রিয়াপদ প্রাচীন রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—চাহসি, গণসি, করসি প্রভৃতি। ক্রিয়াপদের এরূপ প্রাচীন প্রয়োগ আমরা আঠারো শতকের কবি মুহম্মদ জীবন ও মুহম্মদ দানিশের রচনায়ও দেখেছি। সম্ভবত এ সময়ে কবিসমাজে প্রাচীন রীতির প্রতি আগ্রহ জাগে।

মনে হয় ভাব-লাভ, মলয়া-মাহমুদ, দ্বিজনন্দিনী, আনন্দবর্মা-রতনকলিকা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি প্রচলিত স্থানীয় রূপকথারই কাব্যায়ন। সেজন্যে এগুলোকে বিষয়ে না হলেও বক্তব্যে মৌলিক রচনা হিসেবেও গ্রহণ করা চলে।

আঠারো শতকের প্রণয়োপাখ্যানের হিন্দু রচয়িতা

তুর্কি মুঘলের ও ফারসি সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করে আঠারো শতক থেকে কয়েকজন হিন্দুকবি দেবকাহিনী পরিহার করে প্রণয়োপাখ্যান রচনায় ব্রতী হন। অবশ্য এর আগেই কালিকামঙ্গল নামের আবরণে নিছক রসসাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণায় কেউ কেউ বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকথা রচনায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আঠারো-উনিশ শতকের যে-কয়টি প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন 'চন্দ্রাবলী' রচয়িতা দ্বিজ পশুপতি, মনোহর-মধুমালতী প্রণেতা গোপীনাথ দাস, শশিচন্দ্রের উপাখ্যান রচয়িতা রামজী বা রামজয় দাস, শীতবসন্তের লেখক বাণীরাম ধর, রূপবান-রূপবতী উপাখ্যানরচক সুশীল মিশ্র এবং সয়ফুলতমিজ-জরুখভান রচয়িতা মহেশচন্দ্র দাস।

বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী এসে কোন দেশ দখল করে চেপে বসলে দেশের মানুষ তা' প্রসন্নচিত্তে সেকালেও বরণ করতে পারত না, যদিও রাষ্ট্রিক ও দৈশিক জাতীয়তাবোধ কিংবা স্বদেশপ্রেম রাজতন্ত্রের সেকালে একালের মতো সুস্পষ্টও লক্ষ্যনির্দিষ্ট ছিল না। তবে শাস্ত্রের

সমাজের ও আচারের ক্ষেত্রে সে-যুগের মানুষ একালের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও রক্ষণশীল ছিল। এবং স্বধর্মীর ঐক্যচেতনা ছিল প্রবল। বস্তুত এটিই ছিল সে-যুগে সমাজবদ্ধ মানুষের একমাত্র বন্ধনসূত্র।

সিন্ধুতীরের অধিবাসী অর্থে বিদেশীর দেয়া 'হিন্দু' নামের সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে একক জাতিচেতনা লাভের পূর্বে ভারতের অধিবাসীরা কোন একক নামে পরিচিত ছিল না। নিবাসের আঞ্চলিক নামে এবং ইষ্টদেবতার নামেই ছিল তাদের পরিচয়। যেমন শৌরসেনী মাদ্র শাক্ত লিঙ্গায়েত প্রভৃতি।

বিদেশীবিদ্বেষীদের কিংবা স্বাতন্ত্র্যরক্ষাকামীদের মধ্যেও চিরকাল কিছু লোক থাকে যারা ব্যক্তিগত লাভলোভের বশে শাস্ত্রের সমাজের ও স্বদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে জুটে যায়। তুর্কি-মুঘল-ব্রিটিশ আমলে আমরা তেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখেছি। এরা বৈষয়িক জীবনে উন্নতির জন্যেই মুখ্যত সরকারের শাসকের সহযোগী হয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে বিদেশী বিজাতির মানসসম্পদ আর ব্যবহারিক সংস্কৃতিও মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ ও বরণ করে ; তাতে স্বদেশী মনন ও সংস্কৃতিপুষ্ট ও সুষ্ঠুই হয়, ক্ষতি হয় না কিছুই। চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছে সভ্যতা সংস্কৃতির য়ুরোপীয় অবদানে আমাদের মানসঋদ্ধি ও বৈষয়িক বৃদ্ধি।

তুর্কি-মুঘল যুগে কালগত নানা কারণে শাসক-শাসিতদের মনের ও মতের এবং মননের ও সংস্কৃতির প্রাথমিক দ্বন্দ্ব উত্তরণ অন্তে তাদের মিলন ঘটাতে দীর্ঘতর সময় লেগেছিল বটে, কিন্তু মন্থরগতিতে হলেও দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম, উত্তর ভারতের সন্তধর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে শাসক-শাসিতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এবং দেয়া-নেয়ার বিভিন্ন ধারা বিচিত্রখাতে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে শাসক-শাসিতের জন্যে প্রায় অভিন্ন জীবনচর্যার মিলনময়দান তৈরি হচ্ছিল সর্বক্ষেত্রে—ভক্তিবাদে, সূফীবাদে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে, পোশাকে, রাজনীতিতে। এমনি সময়ে এল ইংরেজ। ইংরেজ আমলে য়ুরোপীয় অবদানে জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার ক্ষেত্রে শহুরে জীবনযাত্রায় সে-বাঞ্ছিত অভিন্নতা ও ঐক্য পূর্ণতা পেল—আজ সরকারী ভোজে উৎসবে পার্বণে কিংবা প্রাত্যহিক কাজের দপ্তরে পোশাকে, স্পর্শে ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য।

বাঙলাদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে চৈতন্যযুগ থেকেই তার শুরু এবং পীর-নারায়ণ 'সত্যের' মাধ্যমে তার বিকাশ আর প্রণয়োপাখ্যান রচনায় তার পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কার, দেশী রাগতাললয় এবং ফারসি উপাখ্যান ও আঙ্গিক প্রভৃতির মিশ্রণে বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

আমাদের আলোচ্য উপাখ্যান প্রণেতারা এ বিকাশের প্রসাদ হিন্দু সমাজে বিতরণ করেন। এ প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে অভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন লক্ষ্যে হিন্দু ও মুসলিম লেখক মিলিত হলেন না। কেননা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীতে হিন্দু-মুসলিম পদকারের ভাবগত ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ছিল, এক্ষেত্রে তা ছিল না। নওয়াজিস খানের গুলেবকাউলির আদেষ্টা একজন হিন্দু জমিদার বৈদ্যনাথ রায় আর মহেশচন্দ্র দাসের 'সয়ফুলতমিজ-জরুখভানে'র আদেষ্টা একজন মুসলিম ধনী আশরাফ।

পরিবেশ অনুকূলে ছিল বলেই চট্টগ্রামের হিন্দুরাই প্রথম নিছক প্রণয়োপাখ্যান রচনায় এগিয়ে আসেন।

১. রামজীবনদাস বা রামজয় রচনা করেছিলেন শশিচন্দ্রের কাহিনী। এ উপাখ্যান ও আলাউল রচিত 'আনন্দবর্মা-রতনকলিকা কিস্সা' অভিন্ন। কেবল কিছু নামভেদ রয়েছে মাত্র। শশিচন্দ্রের পুথিতে রাজ্যের নাম কাঞ্চননগর, রাজার নাম বিকর্ণ, রাজার পিতার নাম গন্ধর্বগত। রানীদের নাম বিষমুখী ও তারাদেবী। কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ স্ব স্ব ভাগ্যেই চলে। পরিণামে মিলনাত্মক এ কাহিনীতে শেক্সপীয়ারের 'কিং লিয়ার' গল্পের আদল রয়েছে। কবি রামজয় বা রামজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে পুথি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এবং উপাখ্যানটিও চট্টগ্রামে চালু অন্য কাব্যকাহিনীর সদৃশ। তাই কবি চট্টগ্রামনিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করি।

২. সুশীল মিশ্র

প্রণয়োপ্যাখ্যান মানবজীবনের প্রখরতম ও প্রধানতম বৃত্তি। কাম-প্রেমই বর্ণিত বিষয়, তাতে আনুষঙ্গিকভাবে থাকে মানুষের ভাব ও চিন্তা, কর্ম ও আচরণ, প্রীতি ও বিদ্বেষ, প্রেম ও ঘৃণা, আবেগ ও উচ্ছ্বাস, আশা ও প্রত্যাশা, সংবেদনশীলতা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, ক্ষোভ ও তিতিক্ষা, সৌন্দর্য ও বীভৎসতা, কঠোরতা ও কোমলতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রকাশ ও প্রয়োগ। রূপবান-রূপবতী উপাখ্যানেও জটিল ও বিস্তৃতপটে মানুষের নানা অবস্থার ও অবস্থানের, জীবনের সম্বলের ও সমস্যার চিত্র রয়েছে।

রূপব্যান-রূপবতী উপাখ্যান রচনা করেছেন সুশীল মিশ্র। একটি পুথিই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রমকুণ্ঠ লিপিকর প্রারম্ভিক বন্দনাদি ও কবির আত্মকথার অংশ বাদ দিয়েই অনুলিপি শুরু করেছেন, তাতেও জীর্ণপাতায় কালি উঠে যাওয়ায় প্রথম তিনপত্র দুষ্পাঠ্য। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর। প্রায় দু'শ সোয়াদু'শ বছরের পুরোনো। ১০"× ৩" পরিমিত তুলোট কাগজে লিখিত। ভণিতা এরূপ ঃ

ক. শুনরে রসিকজন একচিত্ত মন
কহেন সুশীল মিশ্রে অপূর্ব কথন।

খ. বলভদ্র মিশ্র মুনি তাহান তনয় গুণী
সুশীল মিশ্রে তাহা ভণে।

অতএব কবির পিতার নাম বলভদ্র মিশ্র। কবি চট্টগ্রামের বলেই আমাদের ধারণা।

গল্পসার এই ঃ গন্ধর্ব চিত্রসেন ও চন্দ্রলেখা ইন্দ্রসভায় নৃত্য করবার সময়ে তালভঙ্গ হলে অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্য-জীবন লাভ করে। এভাবে চিত্রসেন হল উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজার ও রাণী ভানুমতীর পুত্র রূপবান আর চিত্রলেখা হল বিদর্ভরাজকন্যা রূপবতী। রূপবান অতিক্রান্ত কৈশোরে বিদর্ভরাজ্যের রাজধানী হেমবতীপুরে গেল সওদাগরের ছদ্মবেশে, আশ্রয় নিল মালিনীর ঘরে। রাজা নগর পরিক্রমায় বের হয়ে পথে দেখলেন অতুল্যরূপের রূপবানকে। রূপমুগ্ধ রাজা তাকে নিয়ে এলেন প্রাসাদে, উদ্দেশ্য কন্যা সমর্পণ। এদিকে কন্যা রূপবতী রূপ-গুণের কথা শুনে উজ্জয়িনীর রাজপুত্রকেই মনে মনে হৃদয় দান করেছে বটে, কিন্তু তখনো চাক্ষুষ করেনি, ফলে প্রাসাদে এলেও, একগুরুর কাছে সহপাঠী হলেও অচেনা ও সাধুবেশী রূপবান অবহেলিত। এদিকে রূপবতীর প্রণয়প্রার্থী হয়েছে মন্ত্রীপুত্র শুদ্ধমতি। প্রণয় প্রত্যাখ্যাত হলে সে আত্মহত্যা করবে জানালে রূপবতী তার সঙ্গে নৌকাযোগে রাত্রে দেশত্যাগী হতে রাজি হল। ঈর্ষ্যু রূপবান টের পেয়ে শুদ্ধমতিকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে নিজে নৌকায় রূপবতীর প্রতীক্ষায় রইল। যথাসময়ে রূপবতী নৌকায় এসে উঠল, নৌকা ঘাট ছেড়ে চললো। প্রভাতে রূপবতী সবিস্ময়ে দেখল রূপবানকে। তাকে তিরস্কার করলেও তারই সঙ্গী হল নিরুপায় রূপবতী।

তাদের নৌকা ভিড়ল কাঞ্চিপুরনগরে। সে-নগরের রাজা বিক্রমসিংহ, রানীর নাম লীলাবতী আর রাজকন্যার নাম প্রভাবতী। এখানে রূপবান দিনে লক্ষটাকা বেতনের চাকরী নিল রাজদরবারে। একশ' নিজের জন্যে রেখে সব টাকাই সে দান করতো ব্রাহ্মণদের। এমনিভাবে চলল ছয়মাস। অকস্মাৎ মগধরাজ সুসেন পুত্র ও শত অক্ষৌহিণী নিয়ে এল 'কাঞ্চিপুর জিনিবারে'। তার লক্ষ লক্ষ হাতীর ও কোটি কোটি মহারথীর রব শুনে রাজা বিক্রমসিংহ পালিয়ে বাঁচার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কিন্তু রূপবান তাঁকে অভয় দিল, বলল—

একা রথে সুসেন জিনিম।
সারথি উত্তম জানি রথ এক দেঅ আনি।'

অতুল্য বীর রূপবান সুসেন-পরিচালিত লক্ষ লক্ষ মাগধী সৈন্যকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত তো করলই, এমনকি ভূপতিত মঘধরাজ সুসেন যখন—

'শরণ লইলুম' করি ডাকি বলিল
তেকারণে মহাবীরে প্রাণে না মারিল।

তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ কাঞ্চিরাজ রূপবানকে সিংহাসন দান করতে চাইলে রূপবান সবিনয় জানায়–

মাথে সিংহাসন লইতে না হএ উচিত
তুহ্মি রাজা দেখি আহ্মি বাপের সমান।
—না হইব নরপতি কর যুবরাজ।'

যুবরাজ হয়ে রূপবান প্রেমিক রূপবতীর মন জয় করতে পারল না. মালিনীর বাড়ি থেকে যুবরাজ প্রাসাদে নিতে এলে রূপবতী চরম অবজ্ঞায় বলে 'সেবকের বাড়ি যাইমু কিসের কারণে।' যদিও নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাসাদে বাস করতে গেল নিরুপায় রূপবতী।

এদিকে লীলাবতীর ইচ্ছে কন্যা প্রভাবতীকে রূপবানের কাছে বিয়ে দেয়া। রাজার মনে দ্বিধা—কারণ রাজার ধারণা রূপবতী রূপবানের পত্নী। রানী লীলাবতী ওদের প্রকৃত সম্পর্ক জানার জন্যে প্রাসাদে স্বামীরাজব্রত নামের এক মহোৎসবের আয়োজন করেন. সেখানে পুরীর অভিজাত সব দম্পতির নিমন্ত্রণ—স্ত্রী সেখানে স্বামীকে পানগুয়া যোগাবে। মালিনী পদ্মাবতী অনেক সাধাসাধি করছে পত্নী-পরিচয়ে অর্থাৎ উৎসবে কিছুক্ষণ পত্নীর ছদ্মভূমিকা পালন করে, রূপবানকে আপন্ন সামাজিক অসম্মান থেকে রক্ষা করার জন্যে। রূপবতী অটল, সে বলে—

ভানুমতিপুত্র ছাড়ি আর নাহি মন
দাসের সহিতে না জাইমু রূপবতী।

অবশেষে এ সঙ্কটে পড়ে রূপবান 'তেজিব পবাণ' মালিনীর মুখে এ কথা শুনে রাজি হল রূপবানের পত্নীর ভূমিকা পালন করতে। উৎসবে দায়ে পড়ে রূপবতী বলে. 'গুয়া ধর দাস রূপবান'। রূপবানও 'গুয়া ধরে হরষিত মনে।'

উৎসবের সমাপ্তি পর্বে প্রখ্যাত 'সুনয়নী' বেশ্যা মহাসভা মধ্যে নৃত্য করে। নাচ-গান বাজনার নিম্নমান দেখে রূপবতীর মনে অমরাবতীর স্মৃতি জেগে উঠলো সে বলে 'একি নাচ, একি বাজনা! নাচ হবে চিত্রলেখার মতো, বাজিয়ে হবে চিত্রসেন। অবচেতন প্রেরণায় উভয়ে আসরে নামল। রূপবতী নাচে, রূপবান মৃদঙ্গ বাজায়। আর 'দেখি সভা মোহ পাএ'। তারপর রূপবান আত্মপরিচয় দিল, রূপবতী জানল–এ-ই তার ধ্যানের পুরুষ, এ-ই তার প্রাণেশ্বর উজানিনগরের রাজকুমার। বিয়ে হল উভয়ের। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন চৌদোলে যাওয়ার সময়ে চৌদোলস্থ এক কালসাপের কামড়ে রূপবানের মৃত্যু ঘটে। বাহকেরা রাজভয়ে পালাল মৃতদেহ ফেলেই। বেশ্যা সুনয়নী যাচ্ছিল সে-পথ দিয়েই। মন্ত্রৌষদ তার জানা ছিল, সে-ই রূপবানকে বিষমুক্ত করল, কিন্তু রূপবানের রূপমুগ্ধ সুনয়নী তাকে মন্ত্রবলে শুক পাখি বানিয়ে ঘরে নিয়ে গেল 'মনিষ্য আছিল বীর হৈয়া গেল শুক।' রাত্রে স্মৃতিভ্রষ্টপুরুষ বানিয়ে কামকেলি করে, সকালে শুক রূপে খাঁচায় সোনার শিকলে বাঁধে। একমাস পরে ঔষধের ক্রিয়া হ্রাস পেলে রূপবানের পূর্বস্মৃতি জাগল এবং সোনার শিকল 'ছিড়ে 'উড়িয়া চলিল বীর পুরীর উদ্দেশে।' সেখানে সে প্রভাবতীর হাতে ধরা দিল। শুক এখানে প্রভাবতীকে প্রবোধ দানের ছলে ক্রোশগন্ধা সুবাহু যক্ষপতি' উপাখ্যান শুনিয়েছে। এদিকে ঔষধের প্রভাব শেষ হলে শুকরূপী রূপবান কামিনীমোহন পুরুষ হয়ে গেল। প্রভাবতীর' কামসাগরে ডুবিল রূপবান।' প্রভাবতী হল অন্তঃসত্তা। প্রভাবতীর অনুরোধে পালাল রূপবান 'তুমি পালাইলে প্রভু মোর ঘুচে লাজ।' কুমোরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল রূপবান, কুমোরের বউও পড়লো তার প্রেমে। এদিকে সুনয়নীও আবার তাকে ধরল। ওদিকে রূপবতী বিরহে কাতর, প্রভাবতী লাঞ্ছিতা। অবশেষে এ চার নারীরই ডাক পড়ল রাজসভায়। রাজা আনুপূর্বিক সব ঘটনা শুনলেন। ফলে কুমোরবউ মুক্তি পেল, নাক চুল কাটা হল সুনয়নীর, বিয়ে হল প্রভাবতীর। রাজকুমার রূপবান রূপবতী-প্রভাবতীকে নিয়ে স্বদেশে গেল—উজানিনগরে আনন্দ আর ধরে না।

কবি সুশীল মিশ্র কাহিনীর কাঠামোর জন্যে কোন পূর্বসূরীর কাছে ঋণী কিনা জানিনে, তবে ঘটনার উন্মোচনে যে মুনশীয়ানা আছে, তা স্বীকার করতে হবে। এ কাহিনীর মূলসূত্রটির সঙ্গে ছায়াছবি 'অগ্নিপরীক্ষা' গল্পের মিল রয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে ও রূপায়নে কবির ফারসি ও সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান সুব্যবহৃত হয়েছে। নায়িকা রূপবতী সতীত্বে সংযমে একনিষ্ঠতায় সাহসিকতায় ও ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। কবি এ বিপুলকায় উপাখ্যানে তাঁর সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

৩. দ্বিজ পশুপতি

'চন্দ্রাবলী' উপাখ্যান খানি 'বড় চন্দ্রাবলীর পুথি' নামে বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ভণিতা বদল করে সায়ের মুন্সি মোহাম্মদ আবেদের নামে চালাত (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) মুন্সী মনিরুদ্দিন এ্যাণ্ড সন্স নামের প্রকাশক। তবু অনবধানতার দরুন কিছু সাক্ষ্য মুদ্রিত পুথিতে থেকে গিয়েছিল। যেমন ঃ

ক. সরস্বতীপদে মোর কোটি নমস্কার
রচিব চন্দ্রাবলীর পুস্তক করিব প্রচার।

খ. কহে দ্বিজপশুপতি স্মরিয়া ঈশ্বর
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর।

গ. কহে দ্বিজপশুপতি কালিকার চরণ গতি
লাচারি রচিল মধুসর বাণী।

পরে অবশ্য পশুপতির 'চন্দ্রাবলী' কাব্যের পুরোনো পুথিও সংগৃহীত হয়েছে। কালীভক্ত তথা শাক্ত ব্রাহ্মণ কবি পশুপতির আর কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই। গল্পাংশ এই ঃ

পশ্চিমদেশে কনকা নামে রাজ্য। রাজার ঐশ্বর্যের সীমা নেই। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের বারো বছরেও সন্তান হল না বলে রাজারানীর মনে সুখ নেই। অবশেষে রানী কালিকার শরণ নিলেন। কালিকার বরে লাভ করলেন পুত্ররত্ন। সাতবছর বয়সে হল কুমারের হাতেখড়ি এবং সে—

পণ্ডিত ভজিয়া শিখে পণ্ডিতের বিচার
সিঙ্গল পিঙ্গল পড়ে ঝমকে ঝঙ্কার।
ফারসি নাগরী পড়ি হৈল বিশারদ
চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র পাইলেক ভেদ।
ইছন্দ পিছন্দ পড়ে পিক বাসলি (?)
স্বর্গের যতেক তারা পাতালের বালি।

এসব শেখার পরে সঙ্গীত শেখার জন্যে কুমার গেল দক্ষিণ বিহারে, কারণ–

বিজয়ানগর নামে দক্ষিণ বিহার
শ্রীবৎস নামে রাজা তাহার অধিকার।
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে যত বৈসে ত্রিভুবনে
সেই রাজা বিনে গতি অন্য নাহি জানে।

শ্রীবৎসের কাছে সঙ্গীতশাস্ত্র শিখে রাজকুমার বিশ্বকেতু সঙ্গীতে হল পারঙ্গম।

এদিকে স্বর্গের শ্রেষ্ঠপুরী রত্নময়ে রাজা ছিলেন চন্দ্রসেন। তাঁর ছিল পরমা সুন্দরী পাঁচ কন্যা। তাদের মধ্যেও অন্যান্য ছিল চন্দ্রাবলী। একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্যরতা চন্দ্রাবলীর রূপমুগ্ধ ইন্দ্র তার কাছে সম্ভোগপ্রস্তাব করলে চন্দ্রাবলী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, 'পিতাদায় দিয়া দন্তে তৃণকাটা খাইল।' কামোন্মত্ত ইন্দ্র তাকে দিলেন শাপ ঃ

শুন রানী চন্দ্রাবলী বনভূমি যাও
অরণ্যেতে যাঞা দন্তে তৃণ-কাটা খাও।
বার বৎসর ভ্রম তুমি যাঞা অরণ্যেতে
তবে সে খণ্ডিবে শাপ বিশ্বকেতুর হাতে।
সেই বন মধ্যে আছে কাম সরোবর
তাতে স্নান করিলে শাপ খণ্ডিবে তোমার।

ইন্দ্রের শাপে চন্দ্রাবলী বনে হরিণ হয়ে বিচরণ করে। সে-বনে একদিন বিশ্বকেতু গেল মৃগয়ায়। বিশ্বকেতু হরিণীর পিছু ধাওয়া করল। হরিণীও কাম-সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে নারী মূর্তি লাভ করল। আর পিতৃগৃহে গেল চলে। ফেরার প্রতীক্ষায় সরোবরতীরে রয়ে গেল বিশ্বকেতু। সংবাদ পেয়ে পিতা অশ্বকেতু এসে অট্টালিকা তৈরি করে দিল পুত্রের বাসের জন্যে। এদিকে একদিন চার বোন নিয়ে সরোবরে স্নান করতে এল চন্দ্রাবলী। যখন তারা জলে নামল, তখন বিশ্বকেতু লুকাল চন্দ্রাবলীর বস্ত্র। চন্দ্রাবলীর পরামর্শে স্নানান্তে চলে গেল চার বোন, রয়ে গেল বিবস্ত্রা চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী

বিশ্বকেতুর বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিশ্বকেতুকে বিয়ের আয়োজন করতে রাজধানীতে পাঠিয়ে চন্দ্রাবলী আবার পালিয়ে গেল। দুর্লভ না হলে কিছু মূল্যবান বিবেচিত হয় না—এ আপ্তবাক্যে আস্থা রেখে তবে বহুদিন পরে বিশ্বকেতুকে পিতৃরাজ্যে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানাল। বিশ্বকেতু রত্নময় রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করে পথে রাজা বসুদত্তকে হত্যা করে, গুরু শ্রীবৎসকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, মুনিপুত্রকে স্বমূর্তি দান করে, সীমানরাজ্যের রাক্ষসবিতাড়িত করে, রাজকুমার শ্রীজীবকে ও রাজকুমারী রামধনীকে উদ্ধার করে ও সীমানরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, শ্রীজীবকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসের কবল থেকে এক রাজকন্যা চিত্রমালাকে উদ্ধার করে ও তাকে বিয়ে করে, ক্ষেমঙ্কর রাজার দরবার হয়ে অরণ্যে এক বুড়ী থেকে নানা কথা জেনে নিয়ে কুমার বিশ্বকেতু ভরতমুনির আশ্রমে গেল। আশ্রমে আগমতত্ত্ব অধিগত করে এবার কুমার চন্দ্রাবলীর উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করলো। পথে ভীষণ অজগরের কবলে পড়েও রক্ষা পেল, পৌছল চন্দ্রাবলীর নগরে। দূতীর সাহায্যে গোপনে সাক্ষাৎ ঘটল উভয়ের। এ অভিসাররূপ অভিযাত্রায় পথের দুঃখ-কষ্ট-শ্রম ও বিপদাদির সব বর্ণনা দিল চন্দ্রাবলীকে। উভয়ের বিয়ে হল মহাধূমধামে। বিয়ের পরে প্রথানুসারে চন্দ্রাবলীর সতীত্বের পরীক্ষা হল, সে পরীক্ষায় চন্দ্রাবলী সগৌরবে হল উত্তীর্ণ। তারপরে বিশ্বকেতু সুখে সস্ত্রীক স্বদেশযাত্রা করল, সুখে থাকল।

দ্বিজ পশুপতি পণ্ডিত কবি, ভাষায় তাঁর বৈদগ্ধ্যের ছাপ সর্বত্র দৃশ্যমান। কাব্যের কাহিনী পরী-মানুষের প্রেমের আদলে পরিকল্পিত। দ্বিজ পশুপতি সম্ভবত আঠারো শতকের গোড়ার দিকের কবি।

৪. গোপীনাথ দাস—'মনোহর-মধুমালতী' রচক কবি গোপীনাথ চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত পোপাদিয়া গ্রামবাসী ছিলেন। তিনি 'মিত্র পৃষ্ঠে ঋতু নেত্র' সনে তথা ১২৬২ বঙ্গাব্দে বা ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর সম্বন্ধে অন্যত্র মুহম্মদ কবীর প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ রয়েছে।

৫. বাণীরাম দাস—শীতবসন্ত উপাখ্যান আমাদের সুপ্রাচীন রূপকথা। লোকসাহিত্যের এ উপাখ্যানটি বাণীরাম দাস নিজের ভাষায় নতুন করে বর্ণনা করেছেন মাত্র। গল্পের কাঠামো এই ঃ রাজার সুয়োরানীর ছিল তিন কুৎসিত রোগাপাতলা পুত্র আর দুয়োরানীর ছিল দুটো সুন্দর সন্তান, নাম শীত ও বসন্ত। সুয়োরানী ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করলে রাজা ওদের প্রাণদণ্ড দেন, জল্লাদ মমতাবশে ওদের প্রাণদণ্ড কার্যকর না করে, ওদেরকে অরণ্যে ছেড়ে দিয়ে আসে। এক শ্বেতহস্তী এসে শীতকে পিঠে তুলে এক রাজবাড়িতে নিয়ে এল রাজঅমাত্যরা তাকে মৃতরাজার সিংহাসনে বসাল।

এদিকে অসহায় বসন্তকে আশ্রমে আশ্রয় দিল এক সন্ন্যাসী। ওদিকে সুয়োরানী দুয়োরানীকেও টিয়া পাখি বানিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ধরা দিল অন্যদেশের এক রাজকুমারীর রূপবতীর হাতে। রূপবতী ঘোষণা করেছিল–যে গজমোতি এনে দিতে পারবে, তাকেই সে বরণ করবে বর রূপে। শীত রূপবতীর এহেন ঘোষণা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বন্দিনী করে রাখল। এদিকে বসন্ত সন্নাসীর ঐন্দ্রজালিক ত্রিশূল যোগে ক্ষীরসাগর শুকিয়ে সাগরের শাদা হাতীকে সোনালী পদ্মে পরিণত করে তার মধ্যস্থ গজমোতি সংগ্রহ করল। পথে মাটি খুঁড়ে তার তিন মৃত বৈমাত্রেয় ভাইকে (সুয়োরানীর সন্তান) রাঙ্গামাছরূপে বাঁচিয়ে তুলে সঙ্গে নিল, পরে শীত-বসন্তের পরিচয় হল। সুয়োরানীর মাছরূপী ছেলেদেরও মানুষ করে দেয়া হল। মাতাপিতা ও রূপবতীকে নিয়ে পাঁচ ভাই সুখে জীবন কাটাল।

৬. উনিশ শতকের কবি মহেশচন্দ্র দে

কবি মহেশচন্দ্র দে (পরে দাস, চৌধুরী) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত চাফরা গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর 'সয়ফুলতমিজ-জরুখভান' কাব্য রচনা করেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার আশরাফ আলি চৌধুরীর আগ্রহে। কবির কৃতিত্ব এই যে তিনি ফারসি উপাখ্যানের আদলে দেশী প্রণয়োপাখ্যানের সব নিয়মনীতি ও রীতিরেওয়াজ মেনে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কাহিনীবিন্যাসে ও

বর্ণনায়, এমন কি প্রশস্তিতেও আলাউলের অনুসারী হয়ে এ ক্ষুদ্রকায় কাব্য রচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে রাধাচরণ গোপও দোভাষী রীতিতে শায়েরদের এমনি নিখুঁত অনুকরণে রচনা করেছিলেন 'জঙ্গনামা বা ইমামের কিসসা' আঠারো শতকে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি কবির স্বহস্তলিখিত। কবির পুত্রের জন্যেই কবি স্বয়ং এ প্রতিলিপি তৈরি করেছেন কাব্য রচনার পনেরো বছর পরে। তখন কবিপরিবারের কুলবাচির ও ধন-মানের উন্নয়ন ঘটেছে, তাই কবি তখন চৌধুরী এবং সন্তান দে চৌধুরী যথা–লিখীতং স্বয়ং। অত্র পুথির হকদার শ্রীমান বাবু সতীষ চন্দ্র দে চৌং পীছরে শ্রীমহেশ চন্দ্র চৌধুরী সাং চাফরা। ইতি সন ১২৪৬ মঘী তাং ২৩ মাঘ বুধবার চাফরা ইস্কুলে লিখন হইল। (১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ)। উল্লেখ্য যে রচয়িতাদেরও বানানবোধ সুষ্ঠু ছিল না, সর্ব বর্ণাশুদ্ধির জন্যে লিপিকরেরা দায়ী নয়। কবি মহেশচন্দ্র সম্ভবত গাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় শ্রীমহেশ চন্দ্র চৌ-র রাবার মোহরের ছাপ রয়েছে, রয়েছে তাঁর বাঙলায় ও ইংরেজিতে স্বাক্ষর–মহেশচন্দ্র চৌধুরী। M. C. Chowdhury (দুষ্পাঠ্য) কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হিসেবে পুথিটি মূল্যবান। এ উপাখ্যানে রচনা আরম্ভের কালও দেয়া রয়েছে ঃ

ধাতা নেত্র ভুজ শশী করিয়া স্থাপন
তবে সে জানিতে পার গুরুর কথন।

অতএব ১২৩১ মঘী সনে তথা ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এ প্রণয়োপাখ্যানটি রচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য

১. জিগীষা

আরবিতে যা মাগাজী, ফারসিতে তা-ই জঙ, সংস্কৃতে যুদ্ধ এবং বাঙলায় লড়াই। বাঘ-সিংহের প্রতি ভয়াল বলেই যেমন মানুষের একটা আকর্ষণ রয়েছে, গা-পা বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হিংস্র শ্বাপদ-সরীসৃপ দেখা যেমন আনন্দজনক, তেমনি নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদের লড়াই বা যুদ্ধ দেখা, তার বর্ণনা শোনা সুখকর। এ যুগে যুদ্ধের ধরন বদলে গেছে, বিবর্তিত হয়েছে যুদ্ধাস্ত্র, তবু আজো তরবারীর প্রতীকি মান, অশ্বের ও হস্তীর পার্বণিক মর্যাদা আর সেনানিবাসে রণবাদ্যের প্রাত্যহিক প্রয়োজন ফুরায়নি।

স্বস্ত ও সুস্থ মানুষের চেতনার গভীরে জীবনের যা মূল প্রেরণা তা হচ্ছে জিগীষা, সেই ভিনি-ভিসি-ভিডি। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ বাস্তবে এ জিগীষা চরিতার্থ করে, আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল মানুষ বিকৃত উপায়ে তা অনুভব উপভোগ করেই থাকে তুষ্ট। বিভিন্নভাবে অপরকে উপকৃত করে ঋণী ও কৃতজ্ঞ রেখেই সাধারণ মানুষ জিগীষা পূরণ করে, অন্যেবা গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতর হয়ে কিংবা ধনবলে, জনবলে, বাক্যবলে, জ্ঞানবলে অতুল্য কর্মে-ক্রীড়ায়-কৌশলে নৈপুণ্যে উৎকর্ষে অনন্য অজেয় হয়ে মানুষ বিজয়ানন্দ অনুভভ করে। আর রাজতন্ত্রের যুগে দিগ্বিজয়ী রাজারা, সেনারা, মল্লরা, পাহলোয়ানরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাহুবলে কিংবা অস্ত্রযোগে লড়ে জয়ী হয়ে বিজয়গৌরব উপভোগ করত। এ যুগেও সৈনিকরা তা-ই করে, সমুদ্রতলার পর্বতচূড়ার ও গ্রহলোকের অভিযাত্রীরাও এ জিগীষু বীর। মৃত্যুকে যে ভয় পায় না সে-ই বীর।

আজো ব্যক্তিক, পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, জাতিক, রাষ্ট্রিক জীবনে লড়াই-ই—যুদ্ধই জীবনের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। এ লড়াইয়ের নাম প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধনের-মানের-যশের কথার লড়াই, ক্ষমতার ভোগের চিন্তার মতের লড়াই চলছে সর্বদা ও সর্বথা। জেতাই লক্ষ্য।

তাই লড়াই করতে-করাতে নয় শুধু লড়াই দেখতেও সুখ। যেখানে প্রতিযোগিতা, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেখানে যুদ্ধ সেখানেই মানুষের উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাই যুদ্ধকাব্য লোকপ্রিয়, পৃথিবীর প্রাচীন মহাকাব্যগুলো নয় কেবল, রূপকথাগুলোও রাজকুমারদের প্রাণপণ সংগ্রামের বিপন্ন নায়কের সঙ্কট উত্তরণের এবং বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিকথা। কাজেই সাহিত্যেও ছিল শৃঙ্গার রসের পরেই বীর রসের স্থান।

২. মাগাজী

হযরত মুহম্মদ স্বয়ং বত্রিশটা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের বদরের ওহুদের খন্দকের ও খয়বরের যুদ্ধ ছিল দৈশিক ও কালিক ইতিহাসে যুগান্তকর। কাজেই সে সব যুদ্ধবিবরণ গাথার ও কাব্যের আকারে ইসলামের উন্মেষ যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল—ইসলামেরই বিজয়গৌরব হিসেবে। কিন্তু বাস্তবকে রোমান্টিক করে তোলা সহজ নয়, তাই স্থানান্তরে ও কালান্তরে হযরত মুহম্মদ, হযরত আলী, হামজা এবং আলির পুত্ররূপে পরিচিত হানিফা অনেক কাল্পনিক যুদ্ধের ও দিগ্বিজয়ের নায়করূপে মুসলিমজগতে যুদ্ধকাব্যের ও রূপকথার অবলম্বন। জয়কুম রাজার লড়াই, জয়গুনের কিস্সা, হানিফা-কয়রাপরী, সোনাভান, সূর্যউজাল প্রভৃতি এমনি বানানো যুদ্ধ ও প্রেম কাব্য। আবার শাহনামার সঙ্গে পরিচয় ঘটার ফলে দু'চারটি ইরানি যুদ্ধেরও বাঙলায় কাব্যায়ন সম্ভব হয়।

৩. মর্সিয়া সাহিত্য

মর্সিয়াকাব্য বা শোককাব্য ঃ যুদ্ধকাব্যের মধ্যে কারবালাযুদ্ধ কাব্যই ষোল সতেরো শতক থেকে বাঙলার মুসলিম সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হতে থাকে। তার কারণ দাক্ষিণাত্যের বাহমনিরাজ্যে–বিজাপুরে-বিদরে-বেরারে-গোলকুণ্ডায় আহমদনগরে ইরানি বংশজ শিয়ারাই সুলতান ও শাসকগোষ্ঠী ছিলেন। শিয়ারা কারবালা যুদ্ধকে স্মরণ করা অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় পার্বণ বলেই জানে। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শিয়াদের ও ইরানি-শিয়াদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, সে-সূত্রে ষোল শতক থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'মক্তুল হোসেন' [হোসেন নিধন] কাব্য রচিত হতে থাকে, তারপর শিয়া সাফাভী শাসিত ইরানে আশ্রিত হুমায়ুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পরে দরবারসূত্রে ইরানের ও ইরানির প্রভাব প্রবল ও সর্বব্যাপী হতে থাকে। আবার আঠারো শতকে সাফাভী রাজত্বের অবসানে ভারতে বাঙলায় আশ্রিত শিয়া ইরানিদের প্রভাবে মুহররম তাজিয়াদি সহ একটি জনপ্রিয় জাতীয় পার্বণের মর্যাদায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়।

যদিও ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি সমকালে হযরত আলীর ভক্ত-অনুগতদের ছাড়া আর কারো তেমন সমর্থন সহানুভূতি ছিল না, তবু কালক্রমে আল্লাহর বান্দা ও রসুলের নাতি বলেই মুসলিম মাত্রই হাসান-হোসেনের ভক্ত সমর্থক এবং মুয়াবিয়া এজিদের নিন্দক হয়ে ওঠে। যেহেতু পরবর্তীকালে মুসলিমমাত্রই রসুলের আত্মীয় বলেই তাঁর হতভাগ্য দৌহিত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পরাজিত পক্ষের সমর্থক হয়ে যায়, যেহেতু নায়ক বিজয়গৌরব হীন, সেহেতু তার প্রধান রস করুণ হতেই হয়–শোকের বা কান্নার আধার বলেই এ বিলাপপ্রধান সাহিত্যের নাম 'মর্সিয়া সাহিত্য' বা শোকসাহিত্য। বাঙলায়ও আহাজারি শব্দজাত জারীগান বা জারীজঙ্গনামা নামে কারবালাবিষয়ক রচনা অভিহিত হয়।

'কারবালা' যুদ্ধোত্তর যুগে কালিক ব্যবধানের ফলে মুসলিম মাত্রই যে হোসেন ভক্ত হল, তাতে যুক্তির জোরের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল আবেগের তীব্রতা। তাই হোসেনের ন্যায্য দাবি কিংবা এজিদের অন্যায় যুদ্ধ প্রমাণের যুক্তি কালে কালে নানা মনের এবং মনীষার প্রভাবে সংযুক্তি আর সঞ্চিত হলেও ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে তত্ত্ব—তা হচ্ছে 'শির দেগা, শের দেগা নেহি দেগা আমামা—শির দেব, শের দেব কিন্তু মান [উষ্ণীষ] দেব না, কারণ জানের চেয়ে মান বড়ো, তার চেয়েও বড়ো স্বাধীনতা। হোসেন এজিদের বশ্যতা স্বীকার করলে অনুগত থাকার অঙ্গীকার করলে ভোগ উপভোগের স্বস্তিকর নিশ্চিন্ত জীবন সুখে কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি মান ও স্বাধিকার রক্ষার জন্যে প্রাণ দেয়ার শ্রেয়োত্বই মেনে নিয়েছিলেন। সাধারণ শ্রোতার কাছে কারবালাকাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে অমানুষ এজিদের সৈন্যদের অমানবিক নিষ্ঠুরতার দরুন তৃষ্ণার্ত অসহায় হোসেনের সপরিবার সপরিজন করুণ মৃত্যু। ধর্মীয় আবেগজড়িত বলেই কারবালাযুদ্ধ হিন্দুদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মতো এক জাতীয় মহাযুদ্ধ। উভয় যুদ্ধেই জীবনের প্রাণের বিনিময়েই ন্যায়ের ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

৪. পূর্বকথা

'কারবালাযুদ্ধ' কাব্য বুঝবার জন্যে কিছু পূর্বকথা জানা দরকার।

মরুভূ আরব উদ্ভূত ইসলামে রাজতন্ত্র স্বীকৃত নয়। মক্কা-মদিনার ঐতিহ্য অনুসারে সর্দারতন্ত্রেই তারা স্বস্তি খুঁজেছে। গোত্রপতি শেখদের সম্মতি ও আনুগত্য গ্রহণ করেই একজন সমাজপতি বা শাসনকর্তা নিয়োগ ছিল প্রাক-ইসলামি রীতি। সাধারণ কাবার সংরক্ষকই ছিল সমাজপতি। রসুলের প্রয়াণ-মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী যে বিবাদ বিতর্ক চলে, তাতে রসুলপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী রসুলের জীবিতা কন্যা ফাতেমার স্বামী-সন্তানেরই প্রাপ্য বলে দাবি করেন ফাতেমা, মদিনাবাসীরাও দুর্দিনে ইসলামের সংরক্ষক বলে খিলাফত দাবি করে। এভাবে নানাদল বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে খিলাফত দাবি করতে থাকে, অবশেষে প্রায়সর্বজন শ্রদ্ধেয় তেয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ হযরত আববুকরকে 'খলিফা' পদ দিয়ে সঙ্কট নিরসন করা হয়। এবং আবু

বকরের উচ্চারিত অভিপ্রায় ক্রমে তাঁর মৃত্যুতে নির্বিবাদে দ্বিতীয় খলিফা হন হযরত উমর। বারো বছর পরে উমর আততায়ীর হাতে নিহত হলে বিভিন্ন গোত্রপ্রধান শেখেরা কোরআন ও সুন্না অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এ অঙ্গীকারের বিনিময়ে হযরত আলীকেই খলিফাপদ দান করতে চাইল। ধার্মিক আলী এ অঙ্গীকার করতে দ্বিধা করায় এবং হযরত উসমান তখনই সাগ্রহে শর্ত মানতে স্বীকৃত হওয়ায় তার আনুগত্যই স্বীকার করল প্রধানরা। একটা সুযোগ হেলায় হাতছাড়া করাতে হযরত আলীকে তাঁর হাশেমী জ্ঞাতিরা তিরস্কার করে। এর ফলেই তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান স্বজনপ্রীতি ও শাসনশৈথিল্যের দায়ে বিদ্রোহী মিসরী সৈন্যদের হাতে নিহত হওয়ার পর আলী প্রধানদের সম্মতি ও আনুগত্য গ্রহণের জন্যে অপেক্ষা না করেই দু'তিন প্রধানের সহায়তায় নিজেকে চতুর্থ খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে প্রদেশপাল জোবায়ের, তালহা, মুয়াবিয়া এমনকি রসুলপত্নী হযরত আয়েশাও আলীর খেলাফত অস্বীকার করেন। একারণেই উটের যুদ্ধ (জমলযুদ্ধ) হয়েছিল। অবশেষে সিরিয়ার শাসনকর্তা বা সুবাহদার মুয়াবিয়ার সঙ্গে আলীর একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তি অনুসারে প্রথমে আলী পরে মুয়াবিয়া এবং মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরে আলীর পুত্র খেলাফত পাওয়ার কথা। কিন্তু মুয়াবিয়া তার জীবৎকালেই প্রাদেশিক শাসকদের ও প্রভাবশালীদের বশ করে তাঁর খ্রীস্টানপত্নীপ্রসূত সন্তান এজিদের প্রতি ভাবী খলিফা হিসেবে তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়ে নেন। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরে দামেস্কে এজিদ খলিফা হয়ে বসলে আলীপুত্ররা এ বিশ্বাস ভঙ্গে রুষ্ট হয়ে পিতার প্রাক্তন রাজধানী কুফায় গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইমাম হাসানের মৃত্যুর পরে হোসেন কুফা যাত্রা করে কারবালায় এজিদ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে সপরিজন যুদ্ধে প্রাণ হারান। দুই ব্যক্তির স্বার্থে উভয়ের মধ্যে খিলাফত নিয়ে আপোসচুক্তিই খিলাফতের মৌলনীতি বিরুদ্ধ। কাজেই একপক্ষ চুক্তি বা বিশ্বাস ভঙ্গ করলেও একে অন্য পক্ষের ন্যায়যুদ্ধ বলা যাবে না, কারণ চুক্তিটি ছিল উভয় পক্ষেরই অধিকারবহির্ভূত ও নীতিবিরুদ্ধ। এ চুক্তি ছিল বংশগত রাজত্ব প্রতিষ্ঠামুখী। মুয়াবিয়া ও তাঁর উমাইয়া জ্ঞাতিরা এবং পরে আব্বাসীয় হাশেমীরা বংশগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন চিরকালের মত। এভাবে সর্দারতন্ত্র বা সর্দারদের মনোনয়নভিত্তিক খলিফাতন্ত্র বিলুপ্ত হল। গোত্রপ্রধানদের খলিফাতন্ত্র বিলুপ্ত হল বটে, কিন্তু অভাবিত বলেই বংশগত রাজত্বে সিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়ে কোরআন-হাদিস নীরব। তাই সাড়ে তেরোশ' বছর ধরে দুনিয়ার মুসলিম রাজবংশগুলোতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদ, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধ অবিরল ছিল।

৫. শিয়া পরিচিতি

'শিয়া' শব্দের আক্ষরিক অর্থ দল বা অনুসারী গোষ্ঠী, হযরত আলি ও মুয়বিয়ার দ্বন্দ্বকালে দু'জনের দুটো দল গড়ে ওঠে, মদিনায়-কুফায় আলির দল এবং সিরিয়ায়-দামেস্কে মুয়াবিয়ার সমর্থক দল। গোড়াতে দুটোই ছিল রাজনীতিক ক্ষেত্রে সমর্থক দল। বিদ্বান, ধার্মিক ও জ্ঞানী আলির দল ক্রমে ধর্মীয় মতবাদী দলে পরিণতি পায় এবং পূর্বের মতো 'শিয়ৎ আলি সংক্ষেপে শিয়া' নামে পরিচিত হতে থাকে। শিয়াদের মতে রসুলপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী রসুলের জীবিতা কন্যা ফাতেমার স্বামী ও সন্তান। এ ধারণাবশে এবং আবদুল্লাহ ইবন সাবাহর প্রচারণায় তারা বেশি করে বঞ্চিত আলির ভক্ত ও অনুগত হয়। হযরত আলি নিহত হওয়ায় এবং কিছুকাল পরে কারবালায় আলি-সন্তানও নিহত হওয়ায় শিয়ারা নিজেদের উদ্যোগহীনতার জন্যে বিবেকের দংশন অনুভব করে, এবং এভাবে হযরত আলিকে ও হাসান-হোসেনকেই ইসলামের ' 'অসিহ' ভাবতে থাকে—এমনকি হযরত আলিরই নবী বা রসুল হওয়ার কথা—জিবরিলের ভুলেই ওহি হযরত মুহম্মদের কাছে পরিব্যক্ত বা অবতীর্ণ হয় এরূপ বিশ্বাসও কালক্রমে গোঁড়া শিয়ামনে দানা বাঁধে। এবং আলি ও আলিবংশীয়দের পবিত্র আত্মা বলে মানতে থাকে। শিয়ারা আলিবংশীয় ইমাম জাফর সাদেকের ব্যাখাত ইসলামেরই ধারক, যদিও উপসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মতপার্থক্যও রয়েছে।

আমরা আগেও অন্য প্রসঙ্গে বলেছি যে দাক্ষিণাত্যের শিয়াশাসিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, আরব-ইরানি সওদাগরদের সঙ্গে ছিল এ বন্দরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক। কাজেই ইরানি সাহিত্যের ও দাক্ষিণাত্যের ফারসি-উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে আরাকান-ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সরাসরি পরিচয় ঘটে। তার ফলেই চট্টগ্রামে রচিত বাঙলাসাহিত্যের উপর ফারসি-উর্দু এবং উত্তরভারতীয় ঠেট হিন্দি-আওধি সাহিত্যের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব দেখতে পাই। এককথায় চট্টগ্রামে-আরাকানে রচিত বাঙলাসাহিত্য উক্ত ভাষাগুলোতে রচিত সাহিত্যের অনুবাদ-অনুসৃতিমাত্র। ব্যতিক্রম বিরল এবং ক্বচিৎ মৌলিক।

দাক্ষিণাত্যে ইসলামের উদ্ভবযুগের বীরদের নায়ক করে অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ, হযরত আলী, হামজা, হানিফা প্রমুখ বীরদের বীরত্ব ও দিগ্বিজয় বর্ণনচ্ছলে কাল্পনিক যুদ্ধ কাব্য রচিত হয়েছে ফারসিতে ও উর্দুতে। তাই দাক্ষিণাত্যেও সিরিয়ারাজ কিংবা ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে রসুলের ও আলির কাব্য, হানিফার সঙ্গে চান্দালশাহ্ কন্যা যয়তুনের বা জয়গুনের লড়াইর কিসসা রচিত হতে দেখি। দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে বাঙলায়ও রচিত হয়েছে এসব বিষয়ে কাব্য।

৬. জয়কুম রাজার লড়াই

প্রথম খণ্ডেই আমরা কবি জয়েনউদ্দীন প্রসঙ্গে বসুল বিজয় বা জয়কুম রাজার লড়াইয়ের পরিচয় দিয়েছি। একই বিষয়ে ষোল শতকের সৈয়দ সুলতান, শাহবারিদ খান (সাবিরিদ খাঁ) এবং সতেরো শতকের মুহম্মদ আকিল কাব্য রচনা করেছেন। সতেরো শতকের পরে আর কোন জয়কুম রাজার লড়াই রচয়িতার সন্ধান মেলে না। শাহবারিদ খানের কাব্যের নাম 'রসুল বিজয়'—শাবিরিদ খানে কহে রসুল বিজয় /নবী জয় বাক্যচক্র জঙ্গনামা নাম'। বলা বাহুল্য রসুলের সময়ে ইরাক কিংবা সিরিয়া বিজিতই হয়নি। অতএব, এ যুদ্ধ কবিকল্পনাপ্রসূত। ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যেই এসব দিগ্বিজয় কাহিনী পরিকল্পিত। এক হাতে কোরআন অন্য হাতে তরবারী নিয়ে এসব বীর ইসলাম প্রচার লক্ষ্যে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছেন—বিজিত দেশের কাফির রাজাকে ডেকে বলছেন...'হয় সপ্রজা ইসলাম বরণ কর, নয়তো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।' একথাগুলো সগর্বে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন স্বধর্মগর্বী কবিগণ। আজকাল তরবারীর সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে বিধর্মীরা মন্তব্য করলে মুসলিমরা রুষ্ট ও ক্ষুদ্ধ হয়। ফারসিতেই এ সব কাব্য রচিত হতে থাকে। পরে উর্দুতে ও বাঙলায় অনুসৃত হয়েছে।

উক্ত চারখানা কাব্যের কোনটিরই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসেনি। তবে খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ডের ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য মেলে। এক হাতে তরবারী ও আর হাতে কুরআন নিয়ে ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে রসুল তাঁর শিষ্য ও আত্মীয় বীর আবুবকর, উমর, উসমান, আলি, হামজা, হানিফা, সায়দা, খবাইল প্রভৃতিকে নিয়ে কাফের রাজ্যে হানা দেন, বিনাযুদ্ধে ইসলাম কবুল করলে তো সহজেই দ্বন্দ্ব মিটে যায়, নইলে যুদ্ধ বাধে।

জয়কুম রাজার চারপুত্র সালার, মালেকশাহ্, খাখান ও কওয়াস অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। রসুল পক্ষের বহুবীরের মধ্যে আলি ও হানিফার বীরত্ব বিশেষ করে সুপ্রকট। এ যুদ্ধে স্বয়ং রসুলও অস্ত্রধারণ করেছিলেন। জয়কুম সম্মুখযুদ্ধে সুবিধে হচ্ছে না দেখে গোপনে রণক্ষেত্রে পরিখা (কূপ) খনন করান। কূপে পড়ে আলি যন্ত্রণাগ্রস্ত হন। তারপর কূপ থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার যুদ্ধ করে জয়ী হলেন। শাহবারিদ খানের রসুলবিজয়ে পাই, রসুল পক্ষীয় বীর খবাইলের সাথে জয়কুমকন্যার বিয়ের মাধ্যমে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

এ চারটি কাব্যের কাহিনী ভাগে কিছু কিছু উপেক্ষণীয় অমিল থাকলেও মূল কাহিনী অভিন্ন। বৈদগ্ধ্যে ও কবিত্বে এঁদের ক্রমিকস্থান এরূপ শাহবারিদ, সৈয়দ সুলতান, জয়েনউদ্দীন ও মুহম্মদ আকিল।

সৈয়দ সুলতানের কিংবা শাহবারিদ খানের কাব্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, তবু শাহবারিদ খানের কাব্য সৈয়দ সুলতানের কাব্য থেকে অধিক সুখপাঠ্য,আর জয়েনউদ্দীনের ও সৈয়দ

সুলতানের কাব্যে সাদৃশ্য অনেক। বর্ণিত বিষয়ের অভিন্নতা এবং ঋজুতাই এর কারণ। মুহম্মদ আকিলের কাব্যও বৈশিষ্ট্য বর্জিত। সৈয়দ সুলতান, শাহবারিদ খান ও মুহম্মদ আকিলের পরিচিতি অন্য অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৭. জয়গুনের বা জৈগুনের কিস্‌সা

হযরত আলির পত্নী হুনয়ফা বা হনুফার গর্ভজাত সন্তান মুহম্মদ ইবনুল হনুয়ফা বা মুহম্মদ হানিফা অনেক রোমান্সের ও দিগ্বিজয়ের নায়ক। তিনি খলিফা আবদুল মালিকের আমলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এবং তার আগে তিনি এজিদের অনুগত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু শিয়ারা তাঁকে এজিদশত্রু ও বীররূপে নানা গাথার নায়ক করেছে। শিয়া প্রভাবে কালক্রমে মুসলিম জগতে ও সাহিত্যে মুহম্মদ হানিফা অনেক কাল্পনিক যুদ্ধকাহিনীর নায়ক এবং অনেক পরাজিত কাফের রাজকন্যার স্বামী। বাঙলাসাহিত্যেও হানিফা, জয়গুন, সোনাভান, মালিকা আকার, সমর্তভান, পবনকুমারী ও সূর্যউঝল প্রভৃতির হৃদয়বিজয়ী নায়ক। ইন্দোনেশীয়ার হামজা-হানিফাও এমনি নানা রূপকথার নায়ক।

দাক্ষিণাত্যের কবি ফজল বিন মুহম্মদ, গুজরাটের ভাবনগরের কবি নুরউদ্দীন এবং অন্য এক মুহম্মদ হানিফা কিস্‌সা-ই যৈতুন (জৈগুন) বা জঙ্গে যৈতুন উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন। এই যৈতুন পাকদামন বিবি হল চান্দাল শাহর কন্যা। বাঙলায় শাহ বারিদ খান রচিত ' হানিফার দিগ্বিজয়' (সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত নাম হানিফা ও কয়রাপরী) গ্রন্থে সহিরামরাজকন্যা জয়গুনের সঙ্গে হানিফার যুদ্ধ এবং পরে উভয়ের বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। তারপরে হানিফার জীবনসঙ্গিনীরূপে হানিফার বিপদের সহায়রূপে হানিফার অনুরাগিণী পরীকন্যা কয়রা হানিফাকে একান্ত ভাবে পাবার আশায় স্বরাজ্য রোকামশহরে হরণ করে নিয়ে গেলে জয়গুনই অসমসাহসে ভর করে রোকামশহরে গিয়ে স্বামীকে উদ্ধার করে। এখানে হানিফার দিগ্বিজয় কাব্যের বিষয়সূচী দেয়া হলো ঃ হানিফার পরিচয়, জয়গুন পরিচিতি, জয়গুনের মুক্তি, হানিফার নিরুদ্দেশ যাত্রা, জনুদশাহর সঙ্গে হানিফার লড়াই, হানিফা ও এম্রানশাহ, সহীরাম রাজ্যে হানিফা, পরিখা খনন, হানিফার কূপে পতন, হানিফার উদ্ধার সাধনে জয়গুন, এম্রানরাজ্যে হানিফা ও জয়গুন, কয়রাপরী কর্তৃক হানিফা হরণ, জয়গুনের বিলাপ, জয়গুন ও মোকাবিলের মদিনা গমন, আলির গড়ে শোকের ছায়া, জয়গুনের রোকামশহর যাত্রা, মিন্নাজশাহের সঙ্গে জয়গুনের দ্বন্দ্ব, দুর্মিক রাজার সঙ্গে জয়গুনের যুদ্ধ, শাহপরী সমীপে জয়গুন ও মিলন। এসব যুদ্ধের লক্ষ্য একটিই...' কলেমা পড়িয়া হও মুসলমান। মূর্তি ভাঙ্গিয়া কর মসজিদ নির্মাণ।' এ সব অভিযান ছিল অনেকটা অশ্বমেধের মতো। একই বিষয় নিয়ে আঠারো শতকেব দোভাষী শায়ের সৈয়দ হামজা ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে (১২০৪ সালে) জৈগুনের কিসসা বা পুথি রচনা করে ছিলেন। সৈয়দ হামজার কাব্যে হানিফা-জৈগুনই নায়ক-নায়িকা। জয়গুনের বিবাহেই কাহিনী সমাপ্ত। যথাস্থানে সৈয়দ হামজা আলোচিত হবেন।

৮. সিকান্দরনামা

নিযামীর সিকান্দরনামা দু'খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ডের নাম ' সিকান্দর নামা-ই-বরবী' (স্থল) অপর খণ্ডের নাম সিকান্দরনামা-ই বাহরি (সাগর)। এ দু'খণ্ডের অপর নাম ইকবালনামা। নিযামী তাঁর গ্রন্থে নায়ককে দিগ্বিজয়ী সিকান্দর, জ্ঞানীপুরুষ সিকান্দর এবং নবী সিকান্দর রূপে চিত্রিত করেছেন। আলাউল অনূদিত সিকান্দরনামার সিকান্দরের দিগ্বিজয় বর্ণিত হয়েছে। এযে শুধু পারস্য জয় নয়, আরো যুদ্ধে অনেক দেশ জয়ের কথাও রয়েছে, কাজেই বটতলার প্রকাশকের দেয়া 'দারা-সিকান্দারনামা' নাম ভুল। হাতে লেখা পুথিতে রয়েছে 'ইতি সিকান্দরনামা পুস্তক সমাপ্ত।'[১]

১. *মৎ সম্পাদিত সিকান্দরনামার ভূমিকায় দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৫*

১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত বটতলা সংস্করণে গ্রন্থের নাম ছিল 'সেকান্দারনামা', তাছাড়া আলাউলের নিজের উক্তিতেও গ্রন্থনাম সিকান্দরনামা—'সিকান্দরনামাসম গ্রন্থ নাহি আর'। এ গ্রন্থ যুদ্ধকাব্য বা জঙ্গনামা হিসেবেই এ অধ্যায়ে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু কাব্য রোমান্স বর্জিত নয়, তাই উপাখ্যান হিসেবেও আলোচিত হতে পারতো।

আলাউলের আত্মকথায় প্রকাশ শাহজাহানপুত্র সুজা নিহত হওয়ার এগারো বছর পরে তিনি সিকান্দরনামা রচনা শুরু করেন। সুজা ১৬৬০ সনে রোসাঙ্গ রাজের আশ্রিত হন এবং ঐ সনেরই শেষের দিকে কিংবা ১৬৬১ সনের গোড়ার দিকে [১৭ই আগস্টের অনেক পূর্বে][2] আরাকান রাজের হাতে প্রাণ হারান। অতএব ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত হয় বলে অনুমান করি। কারণ সপ্তপয়কর, রতন কলিকা, তোহ্ফা, সয়ফুলমুলকের শেষাংশ প্রভৃতি প্রতিটি গ্রন্থই এক বছরের সময় পরিসরে রচনা করেছেন দেখা যায়। একপর কবি আর কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। সিকান্দরনামা রচনাকালেই কবি' 'বৃদ্ধ হৈলুঁ অখনে হইলুঁ বলহীন' এবং 'নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।' – বলে আফসোস করেছেন। তাছাড়া তখন তাঁর আর্থিক মানসিক দুরবস্থা চরমে উঠেছে.....

মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
পুত্রদারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ।
ভিক্ষা করি পুত্র-দারা দেয় রাজকর।

নবরাজ মজলিসের কাছে—

তবে আমি নিবেদিলুঁ হৈল বৃদ্ধকাল
বিশেষত রাজদায় অধিক জঞ্জাল।
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি
তাহা শুনি মজলিসে দয়া হৈল অতি।

দানিয়া ভক্ষ্য বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া
আর নানাবিধ দানে মন সন্তোষিয়া।
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার
ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার।

আদেষ্টা ও প্রতিপোষক নবরাজ মজলিসও চন্দ্র সুধর্মার (১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ) মহামাত্য ছিলেন—

শ্রীমন্ত মজলিস অতুল মহত্ত্ব
নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য।

ইনি 'মসজিদ পুষ্করণী আদি কৈলা পুণ্য কাম' ফলে স্বদেশে-বিদেশে তাঁর কীর্তি ও নাম ছড়িয়ে পড়ে। মজলিসের আরো অনেক গুণের বর্ণনা রয়েছে। আলাউল তোয়াজপটু কবি, যখন যাঁর নুন খেয়েছেন, তখন বিগলিত চিত্তে কৃতজ্ঞ কবি তাঁর গুণ গেয়েছেন।

যদিও 'সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।
তবে 'নিযামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ।
কারণ মহন্ত নিযামী-বাক্য ইঙ্গিত আকায়
বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার।
আরবি ফারসি আদ্য নসরানী এহুদী
পাহলবী সঙ্গে পঞ্চভাষের অবধি।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য।

তাই আরবি-ফারসি-আর্মেনিয়-হিব্রু-পাহলবী ভাষামিশ্রিত কাব্যে

একেক বয়েত লৈয়া ঝগড়া বহুল
কেহ হএ কেহ নহে বলে বিজ্ঞকুল।
বহু পরিশ্রমে আহ্মি এথেক কহিল
কিমাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িল।

---

২. *১৬৬১ সনের ১৭ ই আগস্ট বাণিজ্যতরীর নাবিক ৰিশাখাপত্তন বন্দরে সুজার হত্যা সংবাদ বয়ে আনেন।*

অতএব সিকান্দরনামায় আলাউল কেবল কাহিনীসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াসী ছিলেন নিযামী ফারসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, সে-কবিভাষার লাবণ্য তর্জমায় বিরল। তাই আলাউলের কাব্যে গল্পসার পাই—কাব্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য তেমন পাইনে। কাব্যে বর্ণিত বিষয় এই ঃ সিকান্দরের জন্ম, আরাস্তুর পিতা নকুমাখিসের কাছে শিক্ষালাভ, জঙ্গীযুদ্ধে জয়লাভ, দারার সঙ্গে বিরোধ, দর্পণ আবিষ্কার,দারার সঙ্গে যুদ্ধ ও দারার মৃত্যু, পারস্য জয়, দারাকন্যা রৌসনক-সিকান্দর বিবাহ, সিকান্দরের দিগ্বিজয়—এরাক্, বারদা, বারদারনী, নওশাবা-সিকান্দরসম্বাদ, পার্বত্যগড় অধিকার, তিলিসমাত যোগে ধনরত্নরক্ষণ, সরিরজয়' 'কয়' রাজার পাট জামদর্শন, ইস্তরখ, খোরাসান, হিন্দুস্তান, কনোজবিজয়, চীন অভিযান, সিকান্দর ও খাগানরাজসম্বাদ, শিল্পকথা, রুচ-সিকান্দরের প্রচণ্ড যুদ্ধ ও সিকান্দরের জয়, আব-ই-হায়াতের জন্যে যাত্রা এবং সিকান্দরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।[১]

আগেই বলেছি, সাদউমেঙদারের ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে অকালে মৃত্যু হলে রানীব অভিভাবকত্বে শিশুপুত্র শ্রীচন্দ্রসুর্ধমা রাজা হন। ১৬৬০-৬১ সনে সুজার আশ্রয় প্রাপ্তি ও নিহত হওয়ার সময়ে চন্দ্রসুধর্মা আট/দশ বছরের বালকমাত্র। এসময়ে আরাকানরাজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সৈয়দ মুসা, আর সর্বময় ক্ষমতা ছিল রানীর হাতে। নারী ও শিশু এবং মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী দেখেই হয়তো আওরঙজীবের ভয়ে পলাতক শাহজাহানপুত্র সুজা রোসাঙ্গ সিংহাসন দখলে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এবং ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে কেবল সপরিজন ও সপরিবার নিহত হননি, বহু মুসলিমের লাঞ্ছনার এবং প্রাণহানির কারণ হয়েছিলেন। বন্দী অবস্থায় বোনদের ইজ্জত বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সুজাপুত্র নিজেই বোনদের হত্যা করেন। মসলিপত্তনের বাণিজ্যতরীর নাবিকের মাধ্যমে আওরঙজেবের পক্ষে এ খবর সংগ্রহ করেছিলেন মীর জুমলা ৩০শে আগস্ট ১৬৬১ সনে।[২]

সৈয়দ মুসার পরে নবরাজ উপাধিধারী মহামাত্য বা প্রধানমন্ত্রী মজলিসের সময়েই বয়োপ্রাপ্ত রাজা শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। রাজপ্রশস্তির পরে অভিষেকের বর্ণনা রয়েছে সাহিত্যবিশারদপ্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমিক সং ৫৩৫। পুথি সং ২৭৬ পাণ্ডুলিপিতে। এটি ১২ সংখ্যক পত্রের পাঠ। ১৩ সংখ্যক পত্রটি না থাকায় অভিষেক বর্ণনা খণ্ডিত হয়ে গেছে।

রোসাঙ্গরাজের অভিষেক ঃ

। জমকছন্দ ।

হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব
মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য।
রোসাঙ্গ দেশে আছন্দ যথ মুসলমান
মহাপাত্র মজলিস সবার প্রধান।
মজলিস পাত্রের মহত্ত্ব শুন এবে
নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে।
যুবরাজে আইসে যবে পাটে বসিবারে
দয়াল চরিত্রে হৈবা সত্য ধর্মবন্ত
সুজনেরে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত।
ক্ষেমা ধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা।'

দাণ্ডাই পূরব মুখে তক্তের বাহিরে।
মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সমুখে দাণ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন।
'পুত্রবৎ' প্রজারে পালিবা নিরন্তর
না করিবা ছলবল লোকের উপর!
শাস্ত্র-নীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত
নিবর্লীরে বল না করৌক বলবন্ত।
আর নানাবিধি প্রকাশস্ত রাজনীতি
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি।
প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ।

এখানে রাজধর্মের ও রাজকর্তব্যের কথা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একটা মানবসম্পর্কের, মানবিক অনুভূতির, শিষ্টাচারের আর সুরুচির ও সংস্কৃতির একটা উদার মধুর চিত্র। সামাজিকভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ হিতকামী হিসাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ।'

---

১. *কাহিনীসার ও মূল্যায়ন মৎসম্পাদিত সিকান্দরনামার ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৭৭ সন।*

২. *অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদে রক্ষিত দলিল সূত্রে জ্ঞাত।*

উনিশ শতকের শেষের দিকে দোভাষী শায়ের শেখ আয়েজউদ্দীনেরও একটি সিকান্দরনামা কাব্য রয়েছে।

আলাউল-রচিত 'তোহফা' রাগতালনামা ও পদাবলী যথাস্থানে আলোচিত হবে।

৯. আবদুন নবী

শেখ চান্দের রসুলবিজয়, সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ আর আবদুন নবীর আমীর হামজা বা হামজার বিজয় এত বিশালাকার গ্রন্থ যে 'থাকুক লেখিবে কেহ পড়িতে লাগে ডর।' আশী পর্বে সমাপ্ত 'আমীর হামজারবিজয়' ফারসি 'দস্তান-ই-আমীর হামজার' স্বাধীন অনুসৃতি। কবি বলেন—

আমীর হামজা কিস্‌সা ফারসি কিতাব
না বুঝিয়া লোকে মনেত পায় তাপ।
বঙ্গেত ফারসি না জানএ লোক সবে—
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুঁ অঙ্গীকার
অবশ্য— মুসলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গলা ভাষে কোপে কি গোসাঁই।
তবে— লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুঁ হৃদএ।

কাব্যের উপক্রমে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায়, কবি- আরবের হযরত আবুবকর সিদ্দিক বংশজ। কবির পিতার প্রপিতামহ বোধ হয় চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন করেন। কবির পিতার পিতামহের নাম শাহদুল্লাহ, কবির পিতার নাম, মুহম্মদ শরীফ। 'মুহম্মদ শরীফ জান। সেই মোর পিতা গুণীচিত।' কবির গ্রামের নাম সিলিমপুর। চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এ গ্রামটি কবি নওয়াজিস খানের আদি পুরুষ সলিমখান স্থাপিত।

কবি বলেন— চট্টগ্রামরাজ্য মাজে সিলিমপুর স্থান—
সেই স্থানে আছে মোর ক্ষুদ্র উয়ারী
এই গাঁয়েই বিরচিত পঞ্চালিকা তথা ধর্ম স্মরি।

কাব্যরচনাকালও মিলেছে অসংগৃহিত একখানা পাণ্ডুলিপিতে।[১]

ঋতু নিধি অভ্র আদি হিজরী রহিল
আমীর হামজার পুথি সমাপ্ত হৈল।
(ঋতু-৬, নিধি-৯, অভ্র-০, আদি-১)

অতএব, ১০৯৬ হিজরী সনে বা ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে (৮ই ডিসেম্বর ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে ১০৯৬ হিজরী শুরু) আমীর হামজা 'বা' হামজাব বিজয়' রচিত হয়।

'বিজয় হামজা নাম পুণ্যকথা অনুপাম'--- কবির এ উক্তি থেকেই কাব্যর নাম 'হামজার বিজয়' অনুমান করছি।

আঠারো শতকে বিপুলকলেবর দস্তান-ই-আমীর হামজা অনুবাদ করেন দোভাষী শায়ের ফকির গরীবুল্লাহ (প্রথমাংশ) এবং সৈয়দ হামজা (শেষাংশ)।

হামজা ছিলেন হযরত মুহম্মদের বয়োকনিষ্ঠ পিতৃব্য। আবদুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠা স্ত্রীর সন্তান। বলে-বীর্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ, এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু যতই দিন গেছে, ইসলামের উন্মেষযুগের এ বীরকে মুসলিমরা ততই বেশি করে স্মরণ ও শরণ করেছে দিগ্বিজয়ী ও রাজকন্যাদের হৃদয়বিজেতা রোমান্টিক নায়ক রূপে। ফলে তাঁর ইসলাম প্রচার লক্ষ্যে পৃথিবী

---

১ *পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৩।*

পরিক্রমায় যুদ্ধ, বিজয় ও প্রেম-পরিণয় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। কবিদের কল্পনা জগতে নিদ্বর্ন্দ্ব নির্বিঘ্ন বিহারে আকাশ সমুদ্র অরণ্য পর্বত বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বর্ণিত বিষয়ের সূচী দেখলেই গ্রন্থ সম্বন্ধে ধারণা হবে। ১৪২ অধ্যায়ে দেও-দানু-জীন-পরী, যাদু-টোনা-তেলেসমাত, ইসলাম প্রচার, সি-মোরগাদি নানা অদ্ভুত ও বিরাটকায় পাখি, নরখাদক প্রাণী, নদনদীনগরী, সমুদ্র-অরণ্য-পর্বত-আকাশ-পাতাল, জীন-পরী, দেওরাজ্য। যুদ্ধবিগ্রহ, নারীপ্রেম, নায়িকা তাহমিনা, মেহেরনিগার, জমিলা কর্সিবেগম, হেন্দা, এবং বীর লোন্দখোর, রুস্তম হুরুম, মরজক, নওশেরওয়াঁ প্রভৃতি বহুবিচিত্র স্থান, পরিবেশ, ঘটনা ও মানুষের সমাবেশে এক বিচিত্র বর্ণালি জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। উমর উম্মিয়া হল প্রাচীন ডনকুইকসোট, কবির ভাষায় সে

ফল নাহি তীর হাতে বেওর কামান
শিয়ালের লেজ ছেড়ে বাওরা সমান।
কাঠের তলোয়ার হাতে কাগজের ঢাল
মকবেল হালটি হাসে দেখিয়া খেয়াল।

আমীর হামজার বিজয়ের ফলে—

দেউল দেহারা আর বুতে কৈল ছারকার।

আর সব মুমীন হয়ে ঠাঁই ঠাঁই মসজিদে পড়িছে নামাজ।

১০. কবি গেয়াস খান

হামজার বিজয় নামে রসুলের পিতৃব্য বীব আমীর হামজার দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন গয়াস খান বা গেয়াস খান। এ কাব্য রচনার আদেষ্টা ছিলেন এয়ার মুহম্মদের পুত্র নাসির মুহম্মদ। কবির পিতা দরিয়া খান ছিলেন 'রাজপাত্র' তথা পদস্থ রাজপুরুষ। কবির পিতামহের নাম বুধা খান। কবির পীরের নাম বুরহানউদ্দিন। এ বুরহানউদ্দিন, যদি কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের পূর্বপুরুষ হন, তাহলে কবি সতেরো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। কাব্যটি কবির বৃদ্ধকালের রচনা ঃ 'বৃদ্ধকালে পদ রচি বা দূষিবা তথা'। সম্ভবত পদকার গয়াস আর এ কবি গয়াস খান অভিন্ন ব্যক্তি এবং চট্টগ্রামবাসী। এ কবিও হয়তো আঠারো শতকের।[১]

১১. নসরুল্লাহ খোন্দকার ঃ শরীয়তনামার আলোচনা সূত্রে জঙ্গনামা ও মুসার সওয়াল রচয়িতা আঠারো শতকের মধ্যভাগের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের বিস্তৃত পরিচয় দেয়া হয়েছে। তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'জঙ্গনামা' সংগৃহীত হয়নি। সাহিত্যবিশারদ প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ডুমোরিয়া গাঁয়ের আমীর আলী চৌধুরীর বাড়ীর পাণ্ডুলিপি দেখে কবির ও কাব্যের পরিচিতি লিখেছিলেন। সেটিই আমাদের সম্বল। কবির পীর ছিলেন হামিদউদ্দীন। এ জঙ্গনামায় বর্ণিত বিষয় হচ্ছে হয়রত মুহম্মদের সহযোগী হিসাবে রণবীর আলীর কাফির রাজ্য বিজয় ও সপ্রজা রাজাদের ইসলামে দীক্ষাদান। হানিফা-হামজার দিগ্বিজয় ও ইসলাম প্রচার লক্ষ্যেই সংঘটিত। এ সূত্রে জয়কুমরাজার লড়াই সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতি কাব্য স্মর্তব্য। এ সব কাব্য যে কাল্পনিক যুদ্ধ নিয়ে রচিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১২. শেখ ফয়জুল্লাহই যে 'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা, তারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁর 'গাজীবিজয়' ও 'সত্যপীর' গ্রন্থের খবরও সঠিকভাবেই জানা গেছে। গাজী বিজয় আজো সংগৃহীত না হলেও ষোল শতকের কাব্য ও কবি সমন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। তাই এ জঙ্গনামা অধ্যায়েও ফয়জুল্লাহ গাজীবিজয় প্রণেতা রূপেই স্মরেণ্য। শেখ ফয়জুল্লাহর আবির্ভাবকাল

---

১. *এ কাব্যেব পাণ্ডুলিপিরও মালিক প্রখ্যাত সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরী। আমরা পুথি পড়তে পায়নি, তাই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া সম্ভব হয়নি। পুথির লিপিকব কালিদাস নন্দীর পিতা মধুরাম এবং মধুরামের পিতার নাম ভৃগুরাম। [নির্বাস ধলঘাটগ্রাম-চট্টগ্রাম পুথির মালিক-মুহাম্মদ জমা [জামান], লিপিকাল ১১৯৫ মঘী তথা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।]*

সম্বন্ধেও এখন আর কোন সংশয় থাকার কথা নয়। 'সত্যপীর পাঁচালী' থেকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক উদ্ধৃত নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটি শেখ ফয়জুল্লাহর রচনা ও আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত ধারণা দিয়েছে ঃ

গোর্খবিজয় আদ্যে মুনিসিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত
খোঁটা দূরের পীর ইছমাইল গাজী
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী।

এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে রহে সন
শেখ ফয়জুল্লা ভাণ ভাবি দেখ মন।[১]

সুতরাং 'সত্যপীর পাঁচালী'র রচনাকাল ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ শকাব্দ মোতাবেক ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ। গোরক্ষবিজয় তাঁর আদি রচনা এবং গাজীবিজয় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। অতএব, শেখ ফয়জুল্লাহ ছিলেন ষোল শতকের মধ্যভাগের কবি ; ডক্টর সুকুমার সেনও সত্যপীর পাঁচালী পেয়েছেন।[২] অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার নাথ সাহিত্যে'[৩] শেখ ফয়জুল্লাহকে ষোল শতকের কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাঁর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম গ্রন্থে তাঁর পূর্বমত পরিবর্তন করেছেন। এই মত বদলের হেতু তিনটি ঃ
১, গোরক্ষবিজয়ের পাঠের স্থানে স্থানে অর্বাচীন শব্দের প্রয়োগ ; ২. ষোল শতকে 'সত্যপীর পাঁচালী' রচিত হওয়ার অসম্ভাব্যতা এবং ৩. গোরক্ষবিজয় পুথির উনিশ শতকের আগেকার পাণ্ডুলিপির অপ্রাপ্যতা।[৪] তাঁর যুক্তিগুলো যাচাই করে দেখা যেতে পারে ঃ ১. পাঠে শব্দের অর্বাচীনতা যে কবিকেও অর্বাচীন করে তোলে না, তার প্রকৃষ্ট নজির মালাধর বসু, কৃত্তিবাস ও কয়েকজন আদি পদকর্তা। সবাই জানেন, গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান, মনসার ভাসান তথা মধ্যযুগের পাঁচালীগুলো 'পালা' হিসেবে গায়েনের দ্বারা গীত হত, অন্তত 'কথকতার মাধ্যমেই যে এগুলো বেঁচে-বর্তে ছিল, তা তো অস্বীকার করবার নয়। কাজেই গায়েন, কথক আর লিপিকর যে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের স্থানের শ্রুতিমধুর প্রচলিত শব্দ বসিয়েছেন, এমনকি প্রয়োজন ও পছন্দমতো কথাও জুড়ে দিয়েছেন, এখন আর তা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। ২. পনেরো শতকের শেষের বা ষোল শতকের গোড়ার দিকেই যে বাঙলাদেশে অন্তত উত্তর-পশ্চিমে ও মধ্য বঙ্গে উপদেবতা পূজার প্রচলন শুরু হয়, বিভিন্ন সূত্রে তার আভাস পাওয়া যায়। পালরাজত্বের শেষের দিকে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিতে তন্ত্র-মন্ত্র ও উপদেবতা পূজা প্রচলিত হয়, সহজযান, বজ্রযান, নাথপন্থ প্রভৃতিই তার প্রমাণ বহন করছে। সেনআমলের শেষ সময়ে চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার প্রাধান্য লোকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; গৌড় সুলতানদের শাসনের শেষ ভাগে হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব ধর্মমত ভুলে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড় খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায় এবং ওলা বিবি-শীতলা পূজা শুরু করে। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী হিন্দু রামায়ণ-মহাভারত পড়ে পৌরাণিক ধর্ম ফিরে পায় এবং ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানও শরীয়ৎমুখী হয়ে ওঠে। আদিকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, কোন বহিরারোপিত ধর্মমত যা জীবনাদর্শ বাঙলাদেশে টেকেনি, বাঙালীরা সব সময়ে নিজেদের জীবন-জীবিকার গরজমত ধর্মমত, ইষ্টদেবতা এবং জীবনাদর্শ তৈরি করে নিয়েছে। গৌড়-সুলতানদের শাসনের শেষের দিকেও হিন্দু-মুসলমান এক মিলন-ময়দানে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তাদের এ মিলনরাখী হয় 'সত্য' (Truth) এবং প্রমূর্ত সত্যই যুগপৎ সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর রূপে পূজা-শিরণী পেতে থাকেন। প্রায় শতেক সত্যনারায়ণ পাঁচালীকারই সত্যনারায়ণের অপ্রতিহত প্রভাবের সাক্ষ্য দান করছেন। সত্যপীর বা নারায়ণ মুসলিম মানসজাত। তাই শিরনীই তাঁর ভোগ।

---

১. *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ৮৯।*

২. *বাঃ সাঃ ইঃ ১ম খণ্ড ২য় সং পৃঃ ১০৪৩-৪৪।*

৩ *সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী)। সুখময় মুখোপাধ্যায়।*

৪ *প্রাচীন বাংলাসাহিত্যেব কালক্রম, পৃঃ ২৬২-৬৩।*

বাঙলার বাইরেও এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। লালমোনের কিস্‌সায় সুলতান হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) উল্লেখ রয়েছে, কেউ কেউ সত্যপীরকে হোসেন শাহ্‌র রক্ষিতা গর্ভজাত সন্তান বলে বিশ্বাস করেন। হোসেন শাহর নামোল্লেখ, ষোল শতকের কবি (?) কঙ্কের রচনা, সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে কবি ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণ প্রশস্তি [ব্রাহ্মণের ঘরে ব্রাহ্মণের দ্বারা সত্যনারায়ণ পূজিত হচ্ছেন, কাজেই সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার কাল সহজেই দেড়শ বছর পিছিয়ে দেয়া যায়, সেকালে যেকোন কিছুর প্রচার নিশ্চয়ই সময়সাপেক্ষ ছিল] প্রভৃতির আলোকে বিচার করলে শেখ ফয়জুল্লাহকে ষোল শতকের কবি বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হবে না। বিশেষত কঙ্ককে যখন কেউ কেউ এখনো ষোল শতকের কবি বলে স্বীকৃতি দেন, তখন ফয়জুল্লাহকে স্বীকার না করে উপায় নেই। ৩. চট্টগ্রামে মঘীসনই বহুল প্রচলিত। মঘীসন লিখতে 'সন' 'সাল' প্রভৃতি ব্যবহৃত হত না,–এখনো হয় না, অনেক সময়ে পাশে 'মঘী' শব্দটি বসানো হয়। তাই চট্টগ্রামের পুথিতে 'সন' বা 'সাল' বসালেই বুঝতে হবে তা বাঙলা সন।[১] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত গোরক্ষবিজয়ের যে পাণ্ডুলিপি খানার লিপিকাল ১১৮৫ সন তা যথার্থ বাঙলা সন। অতএব, এর লিপিকাল যে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ আঠারো শতক।[২] কাজেই অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত তথ্যভিত্তিক নয়।

এখন শুধু একটি বিষয়ই অমীমাংসিত রয়ে গেল : পদকর্তা মীর ফয়জুল্লাহ আর শেখ ফয়জুল্লাহ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হবার মত কোন তথ্য বা উপাদান আজও মেলেনি।

পদকর্তা হিসেবে আমরা সর্বত্র 'মীর (ক্বচিৎ মির্জা) ফয়জুল্লা' নামই পাচ্ছি। আমাদের মনে হয়, শেখ ফয়জুল্লাহর নাম সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হয়ে লিপিকর 'রাগমালা'র ভণিতায় 'মীর মির্জা' স্থলে শেখ বসিয়ে দিয়েছে।[৩] মীর ফয়জুল্লাহ রচিত সুলতান 'জমজমা' পুথিও মিলেছে। আপাতত শেখ ফয়জুল্লাহ ও মীর ফয়জুল্লাহকে দুই ভিন্ন ব্যক্তি বলে মেনে নেয়াই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত এবং দোভাষী শায়ের ফৈজুল্লা ভিন্ন ব্যক্তি। এ সূত্রে প্রথম অধ্যায়ে গোরক্ষবিজয় সম্বন্ধে আলোচনাও স্মর্তব্য।

কারবালাযুদ্ধ

১৩. দৌলতউজির বাহরাম খান

দৌলতউজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' আলোচনা কালে কবি পরিচিতি বিস্তৃত ভাবে দেয়া হয়েছে। দৌলতউজিরের 'ইমাম বিজয়ে' পীরের নাম নেই, তাই এটিকে কবির প্রথম রচনা মনে করা হয়। ইমামবিজয় সম্পাদক অধ্যাপক আলী আহমদ[৪] পর্তুগীজ-উক্ত নোগাজিলকে শেরশাহ সুরের ভাই নিজাম-এর বিকৃতি বলে মনে করে না নোগাজিলকে ডক্টর সুনীতিভূষণ কানুনগো Nau Khoda > Nakhoda নও-খোদার (নৌকার মালিক, নৌবহরের মালিক) বিকৃতরূপ বলে মানেন।[৫] এ কারণে আলী আহমদের মতে দৌলতউজির তাঁর গ্রন্থ দুটো ১৫৪৫-৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, কিন্তু আমাদের ধারণায় ১৫৪৩-১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন।

ইমাম বিজয়ে গবেষণাসাপেক্ষ একটা মূল্যবান তথ্য রয়েছে :

'শহর জাফরাবাদ নামে চট্টগ্রাম
তাহাতে বৈসএ পীর বদর আলাম।'—
নৃপতি নিজাম শাহ রাজ্য অধিপতি
যশোবন্ত বলবন্ত শক্তিবন্ত অতি
তাহাকে সেবক হএ দৌলত উজির।

---

১. *দৃষ্টান্তের জন্য পুথি পরিচিতি দ্রষ্টব্য।*
২. *ঐ পৃঃ ১৩১-৩২।*
৩. *ঐ পৃঃ ৪৫৬, ৪৬৩, ৫৪১, ৬৫৪*
৪. *প্রাক্তন বাঙলা উন্নয়নবোর্ড প্রকাশিত, ১৯৬৯ সন।*
৫. JASB, Dhaka. Vol, XXI No. 2 August, 1979, Chittagong During Afghan Rule, *কলকাতার 'না-খোদা' মসজিদ এ নৌও-মালিক নির্দেশকই।*

মনে হয়, ফেনী নদীকে চট্টগ্রামের সীমা ধরা হত। এবং আধুনিক মীরেরসরাই সীতাকুণ্ডর মধ্যস্থানে সীমান্তরক্ষী সেনানী শাসকের শাসনকেন্দ্র ছিল। পরাগলের আমলে পরাগলপুরে, নিজামের আমলে নিজামপুরে এবং কোন জাফরের আমলে জাফরাবাদে বা জাফরনগরে এ শাসনকেন্দ্র ছিল, উক্ত সব চাকলাগুলো উত্তর চট্টগ্রামে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় শাসক থাকতেন চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার সীমায় ফতেহাবাদে। কর্ণফুলীর পূর্বদক্ষিণে শাসনকেন্দ্র ছিল চক্রশালায় চকরিয়ায় ও রামুতে।

ইমামবিজয়ের পল্লবিত কাহিনীসার এই ঃ হযরত মুহম্মদের গুপ্ত ও ব্যক্ত শক্তি ও মহিমা, হাসান-হোসেনের জন্মবৃত্তান্ত, এঁদের অপমৃত্যু সম্বন্ধে রসুল-জিবরাইল সম্বাদ, পিতা আলির কাছে হাসান-হোসেনের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা, এঁদের ঈদের বস্ত্র, পাপী ফিরিস্তার বৃত্তান্ত, সাপবেশী ফিরিস্তা, ডালিমে বিষের ও শোণিতের স্বাদ, কারবালার মাটি ও রসুল, আশুরার মাহাত্ম্য, এজিদের জন্মবৃত্তান্ত, হাশেমী উমাইয়া পরিচিতি, কারবালাযুদ্ধ, হোসেন-ভৃত্যের কাহিনী, হোসেনশিবির লুণ্ঠন, বন্দীদের দামেস্কে উপস্থিতি, তাহানার সন্ধান, আলী আজগরের এজিদের নামে খোৎবাপাঠ, মুহম্মদ হানিফা পরিচিতি, এখানে কাব্য খণ্ডিত। পুরো কাব্যটিই অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনার আকর। প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনীর কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে এখানে সেখানে। কবির ভাষা সর্বত্র পরিচ্ছন্ন। সুসম্পাদনায় কাব্যটি সুখপাঠ্য হতে পারতো। পরিচিত বিষয়ের পরিচিত ভাষা-ভঙ্গিতে অভিব্যক্তি এ কাব্যেও মেলে। যেমন ঃ

যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়ঙ্করতা বোঝানোর জন্য ঃ

অসুরের রণ কিবা সুরের সংগ্রাম
পৃথিবী মণ্ডল মাঝে হেন মহারণ
মনুষ্য কুলেতে যে না হৈছে কদাচন।
পুত্রক ছাড়িয়া বাপ ধাএ প্রাণ লৈয়া
বাপ তেজি পুত্র ধাএ না চাহে ফিরিয়া।

সদ্য বিধবা—

সতী নারী সাহাবানু অতি বিকলিত তনু
ধরণীতে কান্দএ গড়িয়া
আউল মাথার কেশ বাউল মলিন বেশ
সঘনে হানএ নিজ হিয়া
তেজিল কণ্ঠের হার খসাইলা অলঙ্কার
মুছিলেক শিরের সিন্দূর
ভাঙ্গিল হস্তের চুড়ি অঙ্গুরী ফেলিল গুড়ি
বেশর করিল পুনি দূর।
কান্দএ দীঘল রাএ প্রাণ বিদরিয়া যাএ
হা হা মোর প্রাণের সাঙ্গাত।

কবিত্বে পাণ্ডিত্যে ও স্বাভাবিকতায় কবির পরিণত বয়সের রচনা লায়লী-মজনুই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

১৪. শেখ ফয়জুল্লাহ

গাজীবিজয় এবং গোরক্ষবিজয় রচয়িতা শেখ ফজুয়ুল্লাহর পরিচয় প্রথম অধ্যায়ে ও উপরে গাজীবিজয় প্রসঙ্গে রয়েছে। এখানে তাঁর রচিত 'যয়নবের চৌতিশা'র পরিচয় দিচ্ছি।

ঊ, ঌ. ঙ. এতে, ণ য়, ড়, ঢ়, ষ, ং, ঃ, ঁ এবং কখনো কখনো ঈ, ঐ, ঔ ব্যতীত অপর চৌত্রিশটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে এক বা একাধিক চরণের আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহার করে স্তুতি, প্রশস্তি বা নায়ক কিংবা নায়িকার সংবৎসরের বিরহ দারিদ্র্য দুঃখ কিংবা ঋতুবর্ণনার যে রীতি ছিল, তা আলঙ্কারিক পরিভাষায় চৌতিশা বা 'চৌত্রিশা'। এ চৌত্রিশায় বর্ণানুক্রম রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া অন্য অনেক কবির মতো ফয়জুল্লাহও খ-ক্ষ, জ-য, শ-স প্রভৃতি প্রয়োগে বা নানাবিভ্রাট ঘটিয়েছেন। এ চৌতিশায় হাসানের অপমৃত্যুর পর হাসানপত্নী যয়নবের শোক ও বিরহ-বিলাপ করুণভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ফয়জুল্লাহ কারবালা কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ 'জঙ্গনামা' রচনা করেছিলেন কি-না জানা যায়নি।[১]

১. *মৎসম্পাদিত যয়নবের চৌতিশা—বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৬ সাল দ্রষ্টব্য।*

১৫. মুহম্মদ খান

সত্যিকলিবিবাদসম্বাদ ও মক্তুলহোসেন কাব্য রচয়িতা মুহম্মদ খান তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুলের বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মক্তুল হোসেন কাব্যে। মুহম্মদ খানের জন্ম উজীরশ্রেণীর প্রশাসক বংশে। তাঁর মাতৃকুলও আরব থেকে আগত পীরবংশ। ফলে কবির পিতৃকুল চট্টগামের তিনশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে ছিল জড়িত। এ জন্যেই মুহম্মদ খানের কাব্যের চেয়ে তাঁর আত্মপরিচিতি অংশের গুরুত্ব বেশি।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে বলেই আমরা এখানে কবির পিতৃকুল ও মাতৃকুলের দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃতি করছি ঃ

মাতৃকুল

I

একমনে প্রণাম করম বারেবাব।
কদল খান গাজী পীর ত্রিভুবন সার।
যার রণে পড়িল অক্ষয় রিপুদল।
ভএ কেহ মজ্জি গেল সমুদ্রের তল।।
একেশ্বর মহিম হইল প্রাণহীন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন।।
বৃক্ষডালে বসিছিলা কাফিরেরগণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিলা নিধন।।
তান একদশ মিত্র করম প্রণাম
পুস্তক বাড়এ হেতু না লেখিলুঁ নাম।।
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম।
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম।।
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান।।
শএখ শরীফুদ্দিন ত্রিভুবনের জান।।
একমনে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু অতি বিতপণ।।
প্রণামহোঁ তান সুত গুণের সাগর।
কুলগুরু কাজী সে আলম নাম ধর ॥
মহাসত্য মীর কাজী তাহান নন্দন।
একমনে প্রণামহোঁ এ দুই চরণ ॥
তান সুত গুণযুত খান কাজী নাম।
তাহান পদে ত মোর সহস্র প্রণাম ॥
তাহান নন্দন জান সর্বগুণালয়।
করতার ভাবে মগ্ন তাহান হৃদয় ॥
শএখ হামিদ পীর জানে ত্রিভুবন।
এক মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ ॥

II

তান সুত সুতনয় বুদ্ধি সুরগুরু।
দুঃখিত জনের প্রতি ভব-কল্পতরু।।
যার করমেতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
বাবা ফরিদের পদে করম বন্দন।।
তাহার ঔরসোদ্ভব ত্রিভুবনের সার।
দশদিক ভরি কীর্তি হইল যাহার।।
ক্ষেণেকে মক্কাতে চলি যাএ যেই জন
তথা গিয়া সেবন্ত নিরূপ নিরঞ্জন।।
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশ।।
যথাবিধি করতার সেবন্ত বিশেষ।।
হামিদ আলাম পীর ভুবনের গতি।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি।।
তাহার ঔরসোদ্ভব কুলের কেতন।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অতি বিতপণ।।
বধিল সে রিপুকুল করিয়া সংগ্রাম।
আপনেহ স্বর্গবাসী হৈলা পরিণাম।
শাহা নাসিরুদ্দিন পীর মর্যাদা সাগর
চরণ রাজীবে প্রণামহোঁ বহুতর॥
তাহান ঔরসে বিবি মানিক্য ধরিলা।
সর্বসুলক্ষণ শিশু তাতে উপজিলা॥
পরম উঝল কান্তি কমললোচন।
আখেরে কুতুব হেন বোলে সর্বজন ॥
পীর মোকারম নাম ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণামি বারেবার
তাহান কনিষ্ঠ সে যে পূজিত ভুবন
পূর্ণ চন্দ্রাধিক মুখ কমললোচন ॥
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন-কান্তি উঞ্চ নাসাদণ্ড।
দীর্ঘবাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড ॥

III

তাহান নন্দন শ্যাম-সুন্দর শরীর।
পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্বশাস্ত্রে থির ॥
গৌড়রাজ্য অধিপতি যাকে প্রশংসিলা।
ভিক্ষুক জনের পতি যাহাকে বুলিলা॥
চাটিগ্রাম পতি জান নসরত খান।
আপনার প্রিয়া সুতা দিলা যার স্থান॥
বার বাঙ্গালার রাজা ঈসা খান বীর।
দক্ষিণ-কূলের রাজা আদম সুধীর॥
স্নেহভাবে যাহাকে পূজন্ত প্রতিনিধি।
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি ॥
সদর জাঁহা করি যার ভুবনে বাখান।
পরম পাণ্ডিত্য গুণে রসের নিদান ॥
'পীর মুলুক' যারে বোলে সর্বজন।
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ॥
একমনে ভাবে যেবা একা নিরঞ্জন।
ক্ষমাকুল দয়াশীল মধুর বচন ॥

IV

শাহা আবদুল ওহাবের করম বন্দন।
শাহা ভিখারী তানে বোলে সর্বজন ॥
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ।
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসে 'দধি।
বহুলপ্রকারে যারে সৃজিলেক বিধি ॥
নিরন্তন নিরঞ্জন ভাবে সেই জন।
প্রভুভাবে ঝরে নীর কমল লোচন॥
অঙ্গে বঙ্গে সকলে পূজএ যার পদ।
আল্লার কালাম যার হএ কণ্ঠগত॥
কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধির হেতু
মহাশয় মাতামহ কুলজয় কেতু ॥
ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে বাখানে
যা হোন্তে পাইল পদ রোসাঙ্গীর গণে
শাহা আহমদ পীর করম বন্দন।
উদ্ধারহ মাতামহ পশিলুঁ শরণ ॥
মোহাম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুক্ষিমাত্র সহায় নরক হৈতে পার ॥

বংশলতাটি এরূপ ঃ শেখ শরীফউদ্দীন-কাজী আলম-মীর কাজী-খান কাজী শেখ হামিদ-বাবা-ফরিদ-হামিদ আলম-শাহ নাসিরউদ্দীন

মোকারম

আব্দুল ওহাব ওর্ফে শাহভিখারী

সদর-ই-জাঁহা

শাহ আহমেদ

[কবির মাতামহ]

পিতৃকুল পরিচিতি

তবে পিতামহ গণ প্রণমিএ এক মন
পিতামহ মাহি আছোয়ার।
সিদ্দিকের বংশে জন্ম উমরের সদৃশ ধর্ম
লজ্জাএ ওসমান সমসর ॥
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী দানেতে হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু সর্ব অস্ত্রশাস্ত্রের গুরু
জন্ম হৈল আরবের স্থান ॥
আল্লার অদ্ভুত করিসে-মৎস্যের পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরি দুই পীর আইলা চলি

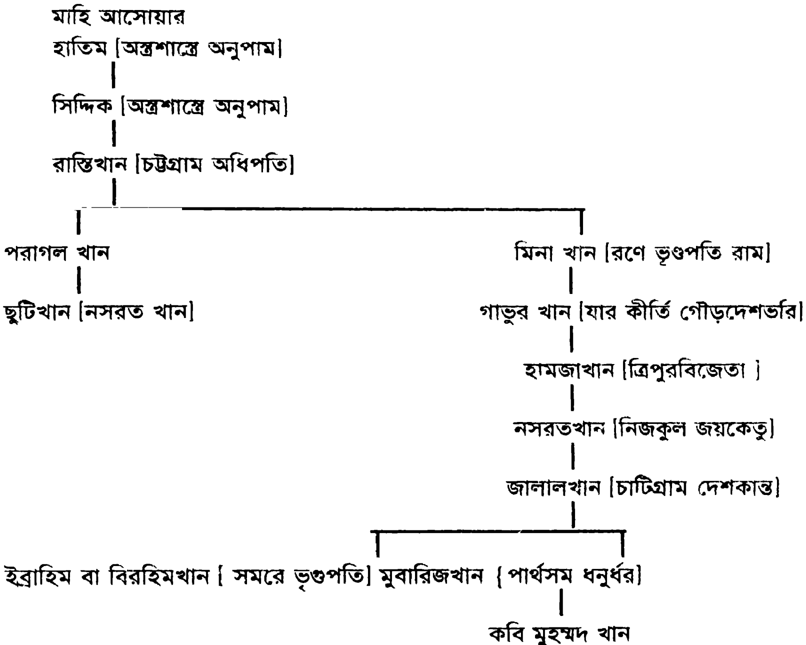
হাজী খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার॥
সহরিষে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
আসিতে সমুদ্রতীর সে হাজী খলিল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফরমান পাই এক মৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ ॥
সিদ্দিক তাহান নাম অস্ত্র শাস্ত্রে অনুপাম
বদন কমল কলানিধি॥
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু

চাটিগ্রাম দেশের মাঝার ॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে
দুই পীর বাড়ি লই গেলা।
হাজী খলিলক দেখি বদর আলাম সুখী
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে সে দেশ ভ্রমন্ত যবে
দেখিলেন্ত আচার্য নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধরী জিনি সুধাহাসি মধুবাণী
নয়ান চকোর কমলিনী॥
তান মুখ জুতি দেখি চকোরী ভ্রমর আঁখি
পরস্পর বাঝিলেক দ্বন্দ্ব
বিধি ভাল সীমা কৈল সমুখে নলিনী হৈল
ললাটে শ্রীখণ্ড অর্ধচন্দ্র ॥
দেখি মাহি আছোয়ার পিতা স্থানে সে কন্যার
মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে।
আচার্য না দিল যবে ব্যাঘ্রে আরোহি তবে
বিপ্র দ্বারে আইলে তুরিতে॥
ভএ ধায় বিপ্রগণ আচার্যে ভাবিয়া মন
দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথকাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি
পুত্র প্রসবিলা যশস্বিনী॥
হাতিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
দানে জ্ঞানে দ্বিতীয় হাতিম।
পালন্ত ভিক্ষুক কুল বিক্রমে হামজা তুল
শৌর্য বীর্য দিতে নাহি সীম॥
তান পদ শিরে ধরি পঞ্চালি রচনা করি
তাহান নন্দন গুণনিধি।
তাহান নন্দনবর রসে যেন রত্নাকর
ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর।
ঐশ্বর্যাদি নৃপ যযাতি॥
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজ কুল জয়কেতু
জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ।
গান্ধারী-নন্দন মানে কর্ণ বলি জিনি দানে
সত্যবাদী সিদ্দিক সমান।
তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু
রাস্তিখান রূপে পঞ্চবাণ॥
চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন শচীপতি
তাহানে প্রণামি বারেবার।
তাহান নন্দন বলি রসে 'দধি বলে শূলী
দানে হরিচন্দ্র সমসর॥
তেজে অগ্নি কোপে যম মানেত কৌরবসম
রণে যেন ভৃগুপতি রাম।
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিনাখান রূপে অনুপাম ॥
তান পুত্র গুণবান ভীমসম বলবান
কার্তবীর্য সম ধনুধারী।
জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু
যার কীর্তি গৌড় দেশ ভরি॥
ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যযাতি
ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
গাভুর খান গুণনিধি থিরে ক্ষিতি রসে' দধি
তাহানে প্রমামি বহুতর।
করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহুবলে লভি জয়
বাপহেন্তে কৈলা রাজধ্বনি॥
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
হামজা খান মছলন্দ হাস্যবাণী মকরন্দ
তাহাকে প্রণামি বারেবার॥
মুখ জতি পূর্ণ চন্দ্র হাস্য জিনি মকরন্দ
অমল কমল দল আঁখি॥
দসন মুকতা পাঁতি অধর রঙ্গিম অতি
ভুরুযুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘবাহু মধ্যচারু গজশুণ্ড দুই উরু
চরণ অমল কমলিনী॥
নারী-মুখ-পদ্ম-ভৃঙ্গ সমরে সদৃশ সিংহ

ভিক্ষুক জনের যেন বাপ।
বিজয়ে বিজয় সমবিপক্ষ কুলের যম
চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুবলিত বর
পুরান্ত সকল নারী আশ ॥
প্রজার পালক রাম বাপ হোন্তে অনুপাম
বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরত খান জান
তান পদে করম মিনতি॥
প্রণামি তাহান পদ রচিব পঞ্চালি পদ
তান পুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথিবী জিনি ধৈর্যবন্ত
গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর॥
সান্ত দান্ত গুণদন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপগণি।
ক্ষেপন্ত করাল শেল নাশন্ত রিপুর কুল
জ্বলন্ত অনল হেন জানি॥
প্রশংসন্ত সর্বদেশ কীর্তি গান্ত সবিশেষ
মহিষ মারন্ত এক শরে।
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
একশরে শার্দুল সংহারে॥
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত শিব সম
প্রজা পালিলেন্ত ধর্ম রাখি।
ধর্মে ধর্ম জ্ঞানে গুরু সর্বসিদ্ধ কল্পতরু
মর্যাদায় সদৃশ রত্নাকর।
মধুসম বাক্য জান শ্রীযুত রহিম খান
তাহানে প্রণমি বহুতর।।
তাহান অনুজবর পার্থসম ধনুর্ধর
বলে ভীম ধর্মে যুধিষ্ঠির ।।
কোপে অগ্নি মানে কুরু দানে কর্ণ কল্পতরু
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম স্থির ।।
শাস্ত্রে অস্ত্রে অনুপাম রূপে অভিনব কাম
বদন অমল কমলিনী।
পর উপকার চারু দ্বিতীয় কল্পতরু
মধুহাসি অমিয়া সে বাণী।।

মধুবাণী সুধা সম হাসি।
তেজি গুরুজন ভীতসকল কামিনী চিত
শ্যাম ঘন মিলিবারে আসি॥
কেহ বোলে হর ভএ দেখি আইল কামরাএ
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পূর্ণ শশী কেহ বোলে নহে বাসি
কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক॥
কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর
কেহ বোলে নহে এ সকল।
সুবশশী পঞ্চবাণ এহি সে জালাল খান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর॥
সে পদ-পঙ্কজ রেণু শিরে ধরিফাগু জনু
রচিলুঁ পঞ্চালি অনুপাম।
তাহান নন্দন বলি বলে ভীম মহাশূলী
সমবেত ভৃগুপতি রাম॥
সুমেরু সদৃশ স্থিরদানে জিনি কর্ণবীর
নতু কিবা হাতিম সমান।
বান্ধব পালক রাম রূপে অভিনব কাম
নতু ষড়াননের সমান॥
কোপে যুগান্তরের যম তেজশালী হুতাসন
দহএ যেহেন কানন
শ্যাম নবজলধর যেন স্বর্গ বিদ্যাধর
চন্দ্রমুখ কমল নয়ান॥
নিরঞ্জন অনুক্ষণ ভাবে আবিশ্রাম মন
তিলেক নাহিক বিস্ময়!
কমল নয়ন নীর বহএ যে অনিবার
মরিতে যে নিরূপ আকার ।
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণে তান
প্রণমিএ সহস্রেক বার।
তান সুত অল্পজ্ঞান মোহাম্মদ খান জান
পঞ্চালি রচিলুঁ শিশুবুদ্ধি।
শুন কহি গুণীলোক অপরাধ ক্ষেম মোক
গুণ কহিলুঁ সকল সুদ্ধি।।

ঢ়কে কবির বংশলতা এরূপ ঃ



কবির আদি পিতৃপুরুষ মাহি আসোয়ার এবং হাজী খলিল ও (মাতৃকুলের আদি পুরুষ) শেখ শরীফউদ্দীন যখন চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেন, তখন এক কদর খান গাজী তাঁর এগারো মিত্রের সাহায্যে চট্টগ্রাম জয় করে ইসলাম প্রচারে নিরত। সে সময় পীর বদরও জীবিত, এঁরাই হাজী খলিল ও মাহি আসোয়ারকে সাদরে গ্রহণ করেন। বাঙলার ইতিহাসে বিভিন্নসূত্রে আমরা জানি সম্রাট মুহম্মদ তুঘলকের আমলে গৌড় তিন খণ্ডে ভাগ হয়ে গেলে এক খণ্ডের প্রথম শাসক বাহরাম খানের মৃত্যু হলে সোনারগাঁয়ে বিদ্রোহী কর্মচারী ফকররা ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নাম নিয়ে সোনারগাঁয়ে স্বাধীন সুলতান হন, যখন ভিন্ন এক কদর খান লখনৌতির শাসনকর্তা এবং মালিক ইজ্জুদ্দীন এহিয়া সাতগাঁওয়ে শাসক ছিলেন। চট্টগ্রাম বিজয়ে ফখরউদ্দীনের সেনাপতি কদর বা কদল খান ছিলেন বলে চট্টগ্রামে বহুল প্রচারিত কিংবদন্তী রয়েছে। ফখরউদ্দীন ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেন, সোনারগাঁ থেকে চট্টগ্রাম অবধি চাঁদপুর-লালমাই দিয়ে একটি সড়ক তিনি নির্মাণ করান, এটি এখনো সর্বত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এবং চাঁদপুর-কুমিল্লার লোকের স্থানী উচ্চারণে 'ফঅরদ্দিনের অথ' (ফখরুদ্দীনের পথ) এখনো পরিচিত। ইবন বতুতা এ সময়েই চট্টগ্রামে এসে ফখরউদ্দীনের বিশ্বাসঘাতক প্রতিনিধি শায়দার কথা লিখেছেন। কদর খান সেনাপতি রূপে এবং শায়দা প্রশাসকরূপে একই সঙ্গে চট্টগ্রামে থাকতে পারেন। অন্যসূত্রে জানা যায় এক প্রখ্যাত বদরউদ্দীন বদর-ই-আলমের ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু হয় বিহারে এবং বিহারের ছোট দরগাহ তাঁরই সমাধি। মুহম্মদ খান-উক্ত পীর বদর ভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে কিংবদন্তীর নায়ক বদরপীরের চেরাগ রয়েছে শহরের কেন্দ্রে জামাল খাঁ রোডের মাথায় এবং বকশী বাজারে রয়েছে 'বদরপাতি'। ইনি ঝড়তুফানে দরিয়ার মাঝিমাল্লার অভয় শরণ। একেই মুহম্মদ খান কদর খান গাজী, মাহি আসোয়ার, হাজী খলিল ও শেখ শরীফউদ্দীনের সমকালীন বলে উল্লেখ করেছেন।

শেখ শরীফউদ্দীনের বংশধরদের নাম দেখে মনে হয় তাঁরা শাস্ত্রবিদরূপে কাজীগিরি ও পীরালি দুটোকেই পারিবারিক পেশা হিসেবে বজায় রেখেছিলেন তিন পুরুষ ধরে। পরে কেবল পীর ও ফকিহ হিসেবেই সমাজে উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত থাকেন। তার ফলেই পীর-ই-মুলুক শাহ ভিখারী আবদুল ওহাব সদর-ই-জাঁহা চট্টগ্রামের শাসক নসরত খানের জামাতা হতে পেরেছিলেন। আরকানরাজ সাউলা, মেঙ সেক ইহা বা মেঙফালঙ প্রশংসিত—আবদুল ওহাব ভিখারীর সহায় বা পীররূপে শাহ ভিখারী চট্টগ্রামের দক্ষিণকূলের রাজা আদমেরও ভাটির রাজা ঈসা খানের শ্রদ্ধেয় (পীর?), বহুজনের প্রখ্যাত পীর হিসেবে 'পীর-ই-মুলুক' এ গুণনামে খ্যাত এবং সরকার প্রদত্ত সদর-ই-জাঁহা পদ বা উপাধিধারী আবদুল ওহাব সদর-ই-জাঁহার কবর রয়েছে পটিয়া থানার পীরখাইন গাঁয়ে। নসরত খানের (মৃত্যু ১৫৬৯ খ্রীঃ) জামাতা ও জালাল খানের (মৃত্যু ১৫৮৬ খ্রীঃ) ভগ্নীপতি আবদুল ওহাব ষোল শতকের শেষপাদ অবধি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা চলে। আবদুল ওহাবের কন্যাকে বিয়ে করেন জালাল খানের পুত্র মুবারিজ খান। অর্থাৎ কবি মুহম্মদ খানের পিতা ফুফাতো বোনকে বিয়ে করেন। কবির আদি পিতৃপুরুষ মাহী আসোয়ার ১৩৪০-৪৫ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে আসেন অনুমান করলে, তাঁর এ দেশী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হাতিমের জন্ম ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ ধরলে, তাঁর পুত্র সিদ্দিকের জন্ম সন ১৩৮০ বলে মনে করলে, সিদ্দিক-পুত্র প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ 'মজলিস-ই-আলা' উপাধিপ্রাপ্ত রাস্তি খানকে ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে গৌড়সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহর অধীনে চট্টগ্রাম-শাসক হিসেবে পাওয়া সম্ভব।

আমরা জানি রাস্তিখানের অপর পুত্র পরাগল খান ও পৌত্র ছুটি খান ওর্ফে নসরত খান ফেনী নদীর দক্ষিণপূর্বতীরে গৌড়সুলতান হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯) ও নসরত শাহর (১৫১৯-৩১) আমলে সীমান্তরক্ষী সেনানী তথা লস্কর ছিলেন. পরাগলপুরে ১৫১২-১৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের বর্ণনানুসারে আমরা পরাগল খানকে পুত্র-পৌত্র নিয়ে সংসার করতে দেখি। (পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি) মুহম্মদ খানের বর্ণনাদৃষ্টে অনুমান করা চলে যে মিনা খান এবং তাঁর পুত্র গাভুর খানও চট্টগ্রামের কেন্দ্রে বা অন্যত্র শাসক বা প্রশাসক ছিলেন। গাভুর খানের পুত্র হামজা খান (পর্তুগীজদের উচ্চারণে) আমরজা কাম/কাও মসনদ-ই-আলাকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে আমরা গৌড়সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহর অধীনে উত্তর চট্টগ্রামের (ফতেয়াবাদ কেন্দ্রে) শাসনকর্তারূপে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা খোদা বখশ খানের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত এবং চট্টগ্রাম বন্দর দখলের জন্যে শেরশাহ সুর প্রেরিত নৌবহরের নায়ককে (Nau khoda>Nakhoda কে পর্তুগীজ উচ্চারিত নোগজিলকে) বিতাড়িত বা বন্দী করবার চেষ্টায় রত দেখি। পর্তুগীজদের সহায়তায় নৌবহর বিতাড়নে তথা নৌসেনাকে বন্দী করতে সমর্থ হওয়ায় তিনি 'পাঠান (শেরশাহ) বিজেতা' এবং ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্যকেও হয়তো চট্টগ্রাম দখল প্রয়াসে প্রতিহত করেছিলেন ও সে অর্থে তিনি 'ত্রিপুরবিজেতা'ও। তারপর নসরত খান ও জালাল খানকে আরাকানরাজের অধীনে আমরা চট্টগ্রামের শাসকরূপে পাই। এঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সমকালীন ব্যক্তি হচ্ছেন সদর-ই-জাহাঁ আবদুল ওহাব, দক্ষিণকূলের রাজা আদম এবং বারবাঙ্গালার রাজা ভূইয়া ঈশা খান, বিজয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্য, শেরশাহ, মুহম্মদ খান সুর (১৫৫৫ মৃত্যু) গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ (মৃত্যু ১৫৬০) দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর (১৫৬৩ মৃত্যু) তৃতীয় গিয়াসুদ্দীন (১৫৬৪), তাজখান কররানী (১৫৬৪ খ্রীঃ) সোলায়মান ও দাউদখান কররানী (১৫৭৬ খ্রীঃ)।

দেখা যাচ্ছে ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব থেকেই ইব্রাহিম খান (সতেরো শতকের প্রথমার্ধে) অবধি হাতিম-বংশের লোক গৌড়-ত্রিপুরা-আরাকান রাজের অধীনে চট্টগ্রামে শাসক-প্রশাসক পদে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে জটিলতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা এড়ানোর জন্যেই বংশলতায় পুরুষানুক্রম বর্ণনায় মানুষ একক পূর্বপুরুষের নামই উল্লেখ করে, তারপর প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো পিতামহের ভাইয়ের এবং পিতা-পিতৃব্যের নামোল্লেখ করে মাত্র। রাস্তিখানের বংশধররূপে পরাগল-ছুটিখানের নামোল্লেখ না করার কারণ এ-ই। এ সূত্রে জোড়াসাঁকোর ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের বিচ্ছিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্যচেতনা স্মর্তব্য।

মুহম্মদ খানের 'মক্তুলহোসেন' কাব্যটি বিপুলকলেবর। কারবালা সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠও বটে। এ কাব্য কারুণ্যের নির্ঝর—

'মুহম্মদ খানে কহে শুনিতে মরম দহে
পাষাণ হইয়া যাএ জল'।

এ কাব্যটি মুহম্মদ খান তাঁর অধ্যাত্মগুরু পীর মীর কবি সৈয়দ সুলতানের অভিপ্রায়ক্রমে তাঁরই 'নবীবংশ' কাব্যের সম্পূরক বা পরিপূরক হিসেবে রচনা করেছিলেন ঃ

শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর—
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষপ্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেতে আকলি
চারি আসব্বার কথা কৈলুঁ পদাবলী।

দুই ভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া
প্রলয়ের কথা সব দিলুঁ প্রচারিয়া।
অন্তে পুনি বিরচিলুঁ প্রভু দরশন
এহা হোন্তে'ধিক কথা নাহি কদাচন।
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করএ
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ।

দুই পঞ্চালিক নবীবংশ ও মক্তুলহোসেন নির্দেশক। মধ্যযুগে আদম থেকে কেয়ামত অবধি সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় সম্বন্ধে ইসলামি ধারার একটা ইতিহাস রচনাই ছিল সৈয়দ সুলতানের মহান ব্রত। হয়তো বার্ধক্যের কারণে তিনি তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে তাঁর কবিশিষ্য মুহম্মদ খান গুরুর আরব্ধ কর্মে সার্থক সমাপ্তি দান করেন, নবীবংশ রচনার আরম্ভকাল ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দ, মক্তুলহোসেনের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ।

এমনি করে গুরু-শিষ্য দুই কবির প্রযত্নে সৃষ্টিকাল থেকে প্রলয়কাল অবধি বর্ণিত হয়েছে দুই কাব্যে।

কবির ভাষায় মক্তুলহোসেনে বর্ণিত বিষয়সূচী ঃ

১. আদি পর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব
দুই ভাইর জন্মতবে পাছে বিরচিব॥
২. কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন
চারি আসহাবার কথা শাস্ত্রের নিদান।—
৩. কহিব তৃতীয় পর্বে হাসানের বাণী
জয়নবকে বিবাহ করিলা মনে গুণি।—
৪. চতুর্থ মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন—
৫. কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধের অবশেষ—
৬. ষষ্ঠমে হোসেন পর্ব কহিবাম পাছে—
৭. সপ্তমেত স্ত্রীপর্ব কহিবাম পুনি
৮. অষ্টমেত দূত পর্ব কহিবাম পুনি
৯. নবমে ওলিদ পর্ব শুন গুনিগণ
১০. দশমে এজিদপর্ব কহিবাম এবে
১১. একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব।
যেন মতে দজ্জাল-পাপী ভুলাইব নর
যেন মতে আসিয়া পুনি ঈসা পয়গাম্বর।
মুহম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি
যেমতে পালিবা লোক দজ্জাল-সংহারি।
এয়াজুজ মাজুজ সেই দুই বাহিনী
যেন মতে হিসাব দিবেক সর্বজানি।

অতএব ফাতেমার বিবাহ বর্ণনায় কাহিনীর শুরু আর কেয়ামত ও হাসর বর্ণনায় কাহিনীর শেষ। বাঙলায় পুণ্যকথা রচনার পাপ-ভীতিও কবির মনে উঁকি দিয়েছে ঃ

হিন্দুস্তানে লোক সবে না বুঝে কিতাব
না বুঝি না গুণি নিত্য করে মহাপাপ।
তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালি রচিলুঁ
ভালমন্দ পাপপুণ্য কিছু না জানিলুঁ।—

অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ
মহাজন আশীর্বাদে খণ্ডিবে প্রমাদ।
বিশেষ পীরের আজ্ঞা না যাএ লঙ্ঘন
রচিলুম পঞ্চালিকা তাহার কারণ।

মক্তুলহোসেন কাব্যে রচনাকালও দেয়া রয়েছে ঃ

মুসলমানি তারিখের দশশত ভেল
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল।
এবং হিন্দুয়ানি তারিখের শুন বিবরণ

বাণ বাহু শত অব্দ আর বাণ শত
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া 'দধি
পঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি।

মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে।
হইয়া নক্ষত্র রূপ উড়ি গেল শশী।
দশদিক প্রসন্ন পাতকীতম নাশি।

সুরগুরু শেষ দৈত্য গুরু আগে

মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল
সেই রাত্রি পঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল

এতে মুসলমানি হিজরী—১০০০+৫০+৬=১০৫৬ হিঃ বা ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ হয়।
[এ বছর ১৭ই ফেব্রুয়ারি মাসে হিজরী বছর শুরু হয়।]

এবং হিন্দুয়ানি বা শকাব্দ-৫×২= ১০০০+৫০০+২০×৩ +৭=১৫৬৭ শক তথা ১৫৬৭ +৭৮ =১৬৪৫ এবং মাধবী মাসে ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ হবে। ১৫৬৭ শকের ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবারে অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে।

রচনার সামান্য নমুনা—ইমাম হোসেন নিহত হওয়া মাত্র ঃ

স্বর্গমর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার
কান্দন্ত ফিরিস্তা সব গগন মাঝার।
বিলাপন্ত যতেক গন্ধর্ব বিদ্যাধর
আর্শকুর্সি লওহ আদি কাঁপে থরথর
অষ্টস্বর্গবাসী যত করন্ত বিলাপ....
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ
কম্পমান সূর্য দেখি হোসেন নিধন।
ক্ষীণ হৈল নিশাপিত আমীরের শোকে
মঙ্গল অরুণ বন রক্ত মাখি মুখে।

বুধে বুদ্ধি হারাইল গুরু এড়ে জ্ঞান
শুনি কালা বস্ত্র পিন্ধে পাই অপমান।
জোহরা নক্ষত্র কান্দে তেজি নাট গীত
ফাতেমা জোহরা কান্দে শোকে বিষাদিত।
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরশি আকাশ।
কম্পিত পর্বত ছাড়ে সঘন নিঃশ্বাস।
কম্পমান পৃথিবী যতেক বরাবর
হইল শোণিত বর্ণ দিক দিগন্তর।
জল তেজে মীনগণ পক্ষী তেজে বাসা
সব কান্দে হাসে ইব্লিস অনাআশা।

একালের কবির 'নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া' ইত্যাদি এ সূত্রে স্মর্তব্য। বিপুলকায় গ্রন্থ বলেই মুহম্মদ খানের মক্তুলহোসেন কাব্যের বিভিন্ন পর্ব—যেমন কেয়ামতনামা, দজ্জালনামা, হানিফার লড়াই প্রভৃতি আলাদা খণ্ড হিসেবে অনুলিখিত ও পঠিত হত।

ঘ. হামিদ

'সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার'
'ফারসি ভাঙ্গিয়া মূর্খে সুখে বুঝিবার'।

এ কবি ফারসি মক্তুলহোসেন অবলম্বনে তাঁর 'হোসেনসংগ্রাম' কাব্য রচনা করেন তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

শাহ তামাসের চরণ প্রসাদে
তাহান আজ্ঞাএ তবে কহ এ হামিদে।
মক্তুলহোসেন এক কিতাব আছিল
বাঙ্গালা করিতে হবে তান আজ্ঞা হৈল। .....
সংগ্রাম হোসেন নাম রাখিলুঁ ইহার।

এ শাহ তামাস কবির পীর। কাব্যরচনায় প্রবর্তনাও দেন তিনিই। ভণিতায় শাহ তামাসের নাম ঘন ঘন উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যের কবি প্রদত্ত নাম 'সংগ্রাম হোসেন'। নামটিতে নতুনত্ব রয়েছে।

কবি হামিদের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির লিপিকাল ১১৪৭ বঙ্গাব্দ তথা ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ. এটি সিলেট জিলার ফেঞ্চুগঞ্জ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এ কাব্য আঠারো শতকের ঊষাকালে কিংবা সতেরো শতকের শেষপাদে রচিত বলে অনুমান করি।

ঙ. হায়াত মাহমুদ

আঠারো শতকের মধ্যকালের কবি হায়াত মাহমুদ বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি রংপুর জিলার ঝাড়বিসিলা গ্রামবাসী ছিলেন। ধর্মসাহিত্য অধ্যায়ে তাঁর পরিচয় রয়েছে। জঙ্গনামা কাব্যে তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম শাহ কবির বা কবিরউদ্দীন, পিতামহের নাম কিতাবউদ্দীন এবং প্রপিতামহের নাম দোয়া খান। কর্মজীবনে কবি হায়াত মাহমুদ কাজীপদে নিযুক্ত ছিলেন। জঙ্গনামাই তাঁর প্রথম বচনা। পরগনাতি সনে কাব্যে রচনাকাল দেয়া রয়েছে ঃ

শকাব্দ পরগনাতি যাহে বিরচিনু পুথি
সন এগারশ' ত্রিশ সাল
হেয়াত মামুদ বলে মুহম্মদেব পদতলে
মোকে দয়া কর সর্বকালে।

১২০২ খ্রীস্টাব্দে পরগনাতিসনের শুরু অতএব ১১৩০ সাল ভুল। তবে তিনি ১৭২০-৬৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর গ্রন্থগুলো রচনা করেন। ইতিহাসানুগ করে কারবালা কাহিনী রচনাই ছিল কবির উদ্দেশ্য ঃ

যতেক শুনিনু মুঞি পুস্তক বয়াতে তাহা শুনি মনে মোর দ্বিধা সর্বক্ষণ
কত আছে কত নাহি কিতাবের মতে। রচিনু পুস্তক তবে জানিতে কারণ।
নাহি জানে আদ্য কথা নাহি পাএ তত্ত্ব

চিত্তউত্থান, আম্বিয়াবাণী, হিতজ্ঞানবাণী, কামালনসিয়ত, ফকিরবিলাস প্রভৃতি হায়াত মাহমুদের অন্যান্য গ্রন্থ। দৌলতউজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হামিদ, হায়াত মাহমুদ ও নসরুল্লাহ খোন্দকার ... এ পাঁচজন কারবালা কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেছেন।

চ. জাফর

জাফর সম্ভবত কেবল কারবালা যুদ্ধটি সংক্ষেপে [পাণ্ডুলিপির দশ পত্রেই[১]] রচনা করেছিলেন। কারণ প্রাপ্ত ৩-১০ পত্রে সমাপ্ত পাণ্ডুলিপির আদ্যের দুই পত্র অপ্রাপ্য বটে, কিন্তু শেষাংশের পাঠ সমাপ্তিজ্ঞাপক। শহীদের লাশ ঃ

একে একে যত সব ওলিগণ আসিল। রসুলেতে হুকুম দিল জিব্রিলে পরাইল।
আনিয়া স্বর্গের জল সিনান করাইল। স্বর্গে চলি গেল সবে হোসেনেরে লৈয়া
বিহিস্তের কাফন লৈয়া জিব্রিল আসিল ভিহিস্তে রহিল সবে হুর সব লৈয়া।

ভণিতা ঃ

১. কহে জাএআফরে হেন পাপীগত
মোর দোষ ক্ষেমিবনি প্রভু নিরঞ্জন।

২. সবার স্থানে কহে জাএআফরে

এ জাফর অন্যের রচনার লিপিকরও হতে পারেন।

ছ. আব্দুল আলিম (হালিম)

আর একজন মোহাম্মদ হানিফার লড়াই রচয়িতা কবির নাম আব্দুল আলিম (হালিম?)। তিনি আঠারো শতকের শেষভাগের কবি। কবি নওয়াজিস খান উক্ত বখসী হামিদের ভ্রাতৃসুত মনু চৌধুরীর পুত্র কবি আব্দুল আলিম। তিনি গ্রন্থে আত্মপরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

---

১. *পুথি পরিচিতি*, পৃঃ ৫১৩-১৪

বাঁশখালি গ্রামে জান ইলশা যে নাম।
বসতি করিয়া আমি থাকি অবিশ্রাম।।
তথা বকসী হামিদ আছিল মোহাবলবন্ত।
তাহান ভ্রাতৃর পুত্র মাং মনু চৌং মোহান্ত।।
মুঞি ক্ষুদ্র মতি জান তাহান তনয়।
কবির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির একটু নমুনা ঃ
যদ্যপি করিল দোষ এজিদ দুর্মতি।
বল কিবা দোষ কৈল নারীগণ প্রতি।।
যদ্যপি নবীর বংশ যথেক যুবতী।
আন্নি সব বন্দী কৈল এজিদ দুর্মতি
সেই পাপে শাস্তি তারে দিলা মহামতি।
অঘোর নরকে তার হইব বসতি।।
সর্ব সৈন্য উঠি গেলে কার্য এই ফল।
ভাবযোগে কান্দি বীরে হইল বিকল।।
দেখা দেখি দুই ভাই কান্দে পরস্পর।
যথ জঙ্গী সবে মিলি কান্দে উঞ্চস্বর।
সন্তরার চর্ম যদি সব খসাইল।..
মৃত্যু হই অঘোর নরকে চলি গেল।।
বাপ ভাই ইষ্ট মিত্র হারাইলুঁ সকল।
নিরবধি দাহ শ্বাস জ্বলন্ত অনল।।
সেই অগ্নি জল তুমি খুড়া মহাশয়
না দেখি মোহর স্থির প্রাণি না রহএ।।

কবি সর্বত্র এরূপ নীরস কথার মালা গেঁথে গেছেন। তাই বোধ হয় কবি আমাদের মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছেন—

মহাজন পাইলে দোষ ঢাকিয়া রাখএ।
ক্ষুদ্রজনে পাইলে দোষ প্রচার করএ।।
পুস্তক মাঝার বহু অশুদ্ধ আছএ।
পণ্ডিতে পাইলে দোষ ক্ষেমিবা নিশ্চয়।।

এর পরে আমরা আর কি বলব!

দুটো ভণিতা ঃ

১. এ আব্দুল আলিমে কহে পঞ্চালি পত্রআর
জয়নুল আবেদিন কথা অমৃতের ধার।

২.আব্দুল হালিমে (আলিম) ভণে পঞ্চালী পয়ার।
কি কহিমু তা সভান মহিমা অপার।।

জ. নজর আলী

রচিত একখানি পুথি প্রায় সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। কিন্তু 'কতেক আগুনে-পোড়া' তাই সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। পুথিখানি ১০৪ পত্রে সমাপ্ত। কাজেই বেশ বড়ই বলতে হবে। পত্র পেয়ে হানিফা কারবালা যাত্রা করেন, তারপর পৌঁছে দেখেন তার আগেই হোসেন শাহাদৎ বরণ করেছেন। ভণিতা ঃ

আমীব হোসেন বাণী বিদরে পাষাণ।
শুনিতে মরম দহে নজব আলী ভাণ।

গ্রন্থের শেষাংশ ঃ

নবিবংশ মুক্তি পাই হরিষ অপার।
বিপক্ষ সকল আদি পাইল সংহার।।
স্থির হই রহিলেন্ত ভাবি নিরঞ্জন।
তাব পাছে মদিনাত করিলা গমন।।
মদিনা যাইয়া সব আলির সন্ততি।
জয়নুল আবেদিনে সবে কবিলা নৃপতি।

ইত্যাদি

ইনি আব্দুল আলিমের চাইতে অধিক শক্তিমান কবি ছিলেন বলে মনে হয়। এঁর আবির্ভাবকাল অজ্ঞাত।

ঝ. আমানউল্লাহ নামের অপর এক কবি 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' রচনা করেন। তাঁর একখানি মাত্র খণ্ডিত পুথি সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কবি কোন শতকের লোক তা জানার উপায় নেই। কবি ভণিতায় পিতা ও পীরের নাম বারবার উল্লেখ করেছেন। এতে মনে হয়, তিনি

আত্মপরিচয় বিস্তৃতভাবেই দিয়েছিলেন। প্রথম দিকের ১২৯ পত্র নেই, শেষদিকও খণ্ডিত। পুথি দৃষ্টে তাঁকে সতেরো শতকের কবি বলে অনুমান করা যায়। কাব্যে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় আছে। তাঁর পিতার নাম মনোহর এবং পীরের নাম মোহাম্মদ লালশাহ। তাঁর ভণিতা ঃ

১. পীরগুরু পদযুগ ধরি শিরস্থান।
পিতা মনোহরের পদ করিএ বন্দন।।
২. মোহাম্মদ লাল শাহ জরিফ সন্ততি।
কহে হীন আমানুল্লা তাহান আরতি।।
৩. মনোহর গুণালয় সে মোর জনক হয়।
উত্তর এজিদ যুদ্ধ মনে সঙ্কল্পিয়া।
কহে হীনে আমানুল্লা পঞ্চালি রচিয়া।।
সুপ্রশংস ভাব যাহার।
আমি আমানুল্লা হীন সুভাষী নন্দন ক্ষীণ
বিরচিলুম পঞ্চালি লোহুর।।

কবির রচনার একটু নমুনা—

যখনে আমির যুদ্ধে প্রবেশ করিল।
সর্ববলে দুই সৈন্য তুমুল বাজিল।।
অস্ত্র জালে আবরিল কুফী সৈন্যগণ।
মধ্যাহ্নের সূর্য যেন ঝাঁপিলেন্ত ঘন।।
ধূম্রময় হই গেল দিগ দিগান্তর।
না রহিল একে কেহ চিন আত্ম পর।।
মহা ঘোরতর হৈল যুঝে দুই বল।
সমুদ্র হিল্লোলে যেন উঠএ কল্লোল।।...
ঝিলিমিলি হই গেল অস্ত্রজাল জ্যোতি।
যেহেন ভিমর্সী মধ্যে খদ্যোত আকৃতি।।

ইত্যাদি

কবির ভাষা প্রাঞ্জল ও সুবিন্যস্ত। বর্ণনভঙ্গি সুন্দর এবং উপমা-রূপকের-ব্যবহার চমৎকার।

ঞ. আবদুস সোবহান—সম্ভবত উত্তরবঙ্গের কবি, তাঁর মুদ্রিত কাব্যের নাম 'ইমাম সাগর'। এটি সাধুভাষায় রচিত, মনে হয় কবি আঠারো শতকের শেষপাদে কিংবা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এ কাব্য রচনা করেন। বোঝা যাচ্ছে সেকালের লেখক-পাঠকের করুণ রসের চেয়ে বীররসে আকর্ষণ ছিল বেশি। সে জন্যেই কেউ কেউ হানিফার লড়াই, সরূপের লড়াই (আলি আহমদ রচিত) রচনা করেছেন, আবদুল হাকিম, আমানুল্লাহ, আবদুল আলিম বা হালিম, নজর আলি প্রভৃতি 'হানিফার লড়াই' রচয়িতা।

আবার বিলাপের কারুণ্যেও তাহাদের আগ্রহ কম নয়। তাই সকিনার বিলাপ, যয়নবের বিলাপ, জহরমহরা (মুহম্মদ সুলতান রচিত) প্রভৃতি এবং অন্য অনেকের যেমন আলি আজগরের বারমাসী রচিত হয়েছে। আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের বারমাসী, দোভাষী শায়েরদের রচিত মর্সিয়া সাহিত্য বা কারবালাকাব্যও জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ্য। ফকির গরীবুল্লাহ আঠারো শতকে, উনিশ শতকে রাধাচরণ গোপও জঙ্গনামা রচনা করেন। জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী, সাদ আলি ও আবদুল ওহাব [যৌথভাবে] 'শহীদ-এ-কারবালা' রচনা করেছেন, খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খানের 'শাহাদৎনামা' দাখিনী উর্দু থেকে অনূদিত। এটি ষোল শতকের শিয়া কবি হোসেন ওয়ায়েজ কাশিফীর 'রওজাতুস সুহাদা'র অনুবাদ। চট্টগ্রামশহরবাসী হামিদুল্লাহর ভাষা দোভাষী নয়। বিশ শতকে 'জঙ্গনামা' বা শহীদ-এ-কারবালা রচনা করেছেন ওয়াহিদ আলি, মুহম্মদ ইসহাকুদ্দীন, কাজী আমিনুল হক প্রভৃতি। আধুনিক সাহিত্যে মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু, কায়কোবাদের মহরমশরীফ কাব্য, আবদুল বারীর কারবালা কাব্য, আবু মা' আলা হামিদ আলির কাসেমবধকাব্য, খয়রাতুল্লাহর 'কারবালা তরঙ্গ' কাব্য প্রভৃতি গদ্যে-পদ্যে অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে ও হচ্ছে।

উনিশ শতকে রচিত যুদ্ধকাব্য

উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী শায়েরা ইসলামের উদ্ভবযুগের অনেক যুদ্ধ নিয়ে উর্দু-ফারসি কাব্য অবলম্বনে বাঙলায় যুদ্ধকাব্য রচনা করেছেন। স্বকালে স্বদেশে স্বজাতি ছিল নির্জিত, ব্রিটিশ-শাসিত ও প্রত্যক্ষভাবে বিধর্মী জমিদার-মহাজন ও ব্যবসায়ী শোষিত। তাই ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় কাল স্মরণ করে তারা আত্মপ্রবোধ পেতে এবং আত্মগৌরব অনুভব করতে চেয়েছে। এজন্যে

এ সব যুদ্ধকাব্য লেখক, পাঠক ও শ্রোতার প্রিয় ছিল। ফলে জনাব আলী লেখেন জঙ্গে খয়বর ও মজমুয়ে ফতুহশাম, মুহম্মদ খাতের লেখেন জঙ্গে সোহরাব (শাহনামা অবলম্বনে) সফিউদ্দীন জঙ্গনামা, হাবিবুল হোসেন জঙ্গে সোহরাব, আজহার আলী জঙ্গে রসুল ও আলী, দোস্ত মুহম্মদ খয়বরের জঙ্গনামা প্রভৃতি। এঁদের কেউ হচ্ছেন মূল লেখক, কেউবা অনুকারক।

'মজমুয়ে ফতুহশাম' বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে, কেননা এটি মুসলিমদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার ও রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস সম্পৃক্ত রচনা। এতে রয়েছে রোমসাম্রাজ্যের সিরিয়া, বসোরা, প্যালেস্টাইন, মিসর প্রভৃতি দেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিকথা। এ গ্রন্থের অবলম্বনও ছিল আরবি ইতিহাস।

ওয়াকাদী রহমতুল্লা আরবি ভাষাতে
লিখিয়াছিলেন খুব তহ্‌কিকের সাথে।

আরবি ইতিহাসের স্বাধীন উর্দু তর্জমা থেকেই জনাব আলির নেতৃত্বে আজিমুদ্দীন আহমদ ও মুহম্মদ মুসা—এ তিনজন এ বিপুলকায় গ্রন্থ বাঙলায় তর্জমা করেছেন। এ গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে ৬৬, দ্বিতীয় খণ্ডে ৬১, তৃতীয় খণ্ডে ৬৩ এবং চতুর্থ খণ্ডে ৩২টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম খণ্ডে খলিফা আবুবকর ও উমরের কৃতি ও কীর্তি বিবৃত, এ অংশের লেখক আজিমউদ্দীন, দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ রচক জনাব আলী। রচনাকাল (১২৯৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ) 'বাঙ্গালা বারশত চুরানব্বই সালে তেসরা ভাদ্রে মাহে বরিষাবকালে, খোদার মদদে হৈল এ খণ্ড তামাম।'।

চতুর্থ খণ্ড 'ফতহ-উল মেসের' রচয়িতা জনাব আলী। রচনাকাল ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

এই তক্ ফতহুল মেসের হৈল সায়
বারশ নব্বই সাল বারই বৈশাখে—
তর্জমা তামাম হৈল খোদার খায়েশ।
মেসের শাহর এস্কন্দরিয়া তামাম—
আর সব জজিরা আছিল যত দেশ
একে একে দখল করিয়া নিল শেষ—
নবীজির হিজরীবাদে ষোল বছরেতে
রুমশাম মিশর হইল সব ফতে।

খলিফা হজবত আবু বকর পররাজ্য বিজয়কামী সেনাপতিকে অভিযানের প্রাক্কালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা' আজো মানবিক মহত্ত্বের ও মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে গণ্য। দীর্ঘ হলেও তা উদ্ধারযোগ্য ঃ

ক. সৈন্যদের সঙ্গে ব্যবহারনীতি—
শুন সরদার-

বিদেশেতে তুমি খুব রবে হুশিয়ার
খিমা উঠাইয়া যবে চলিতে থাকিবে
জোরে চলিবার তরে নাহি ধমকাইবে।
এমত জোরেতে না চালাও সৈন্যগণে
যে-চলনে কষ্টবাজে তাহাদের মনে।
না হও তফাত কভু লস্কর হইতে
কবিবে কাজের যুক্তি সঙ্গীদের সাথে।
সকল সময়ে যেন ন্যায়ে লক্ষ্য রয়
খবরদার অত্যাচার যেন নাহি হয়।
অত্যাচারীগণ কভু শক্রব উপর
জয়যুক্ত নাহি হয় জানিবে খবর।

খ. পরাজিত শক্রর প্রতি ব্যবহারনীতি—

আর এক কথা সদা রাখিবে স্মরণ
শক্রর উপরে জয়ী হইবে যখন।
কাহাদের বাচ্চাদিগে আর বুড়া দিগে
না মারিবে, হবে দায়ী খোদার নজদিগে।
তাহাদের স্ত্রীদিগকে না মারিও আর
খোর্মাব গাছের কাছে না যাইও আর
আবাদ ফসল নাহি দিবে জ্বালাইয়া
ফলবতী গাছ নাহি ফেলিবে কাটিয়া।
সন্ধি বা চুক্তিতে যদি আবদ্ধ হইবে
খবরদার বে-ওয়াফায়ী কভু না করিবে

গ. কবি বীরাঙ্গনা কীর্তি বর্ণনায়ও উৎসাহী ঃ
নারীগণ নিজ হাতে ধরে তলোয়ার
কাফেরের সাথে লড়ে মদদে খোদার
নারী শক্তি যেই সেথা হইল উদয়
লড়াইয়ের গতি ফিরে গেল সে-সময় ....
জেয়ারের ভগ্নী সে খাওলা নাম যার

উৎসাহী ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম
উম্মে হেকিম নামে এক নারী আর।
লবনী সলমী এই নারী চারিজন
ধরিল ভীষণমূর্তি লড়িল ভীষণ।–
নারী শক্তি দ্বারা খোদা এয়ারমুক মাঝাব
ইসলামের বলবালা করে এ প্রকার।

সত্য-কলি-বিবাদ-সম্বাদ বা যুগসম্বাদ

কবি মুহম্মদ খান আমাদের সাহিত্যে প্রথম রূপক কাব্য রচয়িতা। আজকাল বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকেও রূপক রচনা বলে ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। কিন্তু সে-সবের রূপক এমন প্রত্যক্ষ নয়, পাণ্ডিত্যের জোরে ব্যঙ্গ্যার্থ বের করা হয় মাত্র। যুগসম্বাদের রূপক স্পষ্ট। কবি নিজেই বলেছেন ঃ

১. উপদেশ পঞ্চালিকা কবির রচন।
সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ বিবরণ।।

২. বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে।
তেকারণে বিরচিলু' ভাবি নিজ মনে।।

রচনাকাল

আনন্দের কথা মুহম্মদ খানের উভয় গ্রন্থের রচনাকাল পাওয়া গেছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ' বা যুগসম্বাদ। এর রচনাকাল ঃ

দশ শত বাণ শত বাণ দশ' দধি। রাত্রি হইয়া গেল পঞ্চালিকা অবধি।।

এতে ১০০০+৫০০+৫০+৭=১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়।

সত্য-কলি-বিবাদ-সম্বাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি মৌলিক রূপক কাব্য। এ ধরনের রচনা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে নেই। আর সব রূপক কাব্য... যেমন নল-দময়ন্তী, বিদ্যাসুন্দর, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতির রূপকের আবেদন পরোক্ষ। এটির উদ্দিষ্ট তত্ত্ব একেবারে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট; কাব্যটির কবি প্রদত্ত নাম দুটো.....

'সত্য-কলি-বিবাদসম্বাদ' ও 'যুগসম্বাদ' ঃ

উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন
সত্য-কলি বিবাদ সম্বাদ বিবরণ।
এবং যুগ সম্বাদের কথা অমৃত বরিষে।

কাব্যটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। কবির ভাষায় অধ্যায়ভাগ ও গল্পের কাঠামোর ঃ

ক. প্রথমে সত্যক সত্যবতীদুই মিলি।
যেন মতে কলির দুঃশীলা সঙ্গে কেলি।।
সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন।
মিত্র কণ্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ।।
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর।
মুহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল ঘর।।

গ. তৃতীয় অধ্যায়ে তবে কহিলুঁ কথন।
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন।।
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী।।
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী।।
জ্ঞান-বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল।

না করিল সন্ধিপত্র আইল পুরোহিত।
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত।।

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই সৈন্যের সংগ্রাম।
সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম।।
যোগী-সত্যবতী যেন সম্বাদ ঘুচিল।।

ঘ. চতুর্থ অধ্যায়ে পুনি সত্য পাইল জয়
পুনি মুহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয়।
মৃতবৎ কলি লৈয়া দুঃশীলা কান্দিল।।
ভোগী ধন্বন্তরী আসি কলি চেতাইল।।
যোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সংবাদ।।

৬.	পঞ্চম অধ্যায়ে পুনি যুদ্ধের বিবাদ।
তৃতীয় [ত্রেতা ?] দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ।
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুজন।।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'যুগসম্বাদে' কবির পীরের নাম খুঁজে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন মুহম্মদ খান মুরীদ হওয়ার আগেই ' যুগসম্বাদ' রচনা করেছিলেন কিন্তু যুগ-সম্বাদের সমাপ্তি অংশে একটি ভণিতায় পীরের নাম আছে, অবশ্য একে কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথমত গ্রন্থের কোথাও আর পীরের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত যে-স্থানে ও যেভাবে প্রায় অসংলগ্ন অবস্থায় ভণিতাটি পাওয়া গেছে, তাতে তাকে কবির রচনা বলে মনে করা যায় না। যেমন ঃ

মুহম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে
শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ।
যুগ সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল।
হরষিতে মিত্রকণ্ঠ আশীর্বাদ দিল।।
হরষিত পাত্র সব স্তবে জোড় হাত।
যার যে দেশেতে গেলা তিন নরনাথ।।
সিদ্দিক বংশেত ভব নব কল্পতরু।
শাহা সুলতান পীর জ্ঞানে শুক্রগুরু।।

তৃতীয়ত গ্রন্থারম্ভে কবি নিজের পীরের স্তুতি করেননি ঃ

' একে একে প্রণামহু যথ নবীপদ।
যথপীর প্রণামহুঁ খণ্ডাও আপদ।।
জনক জননী দোহা প্রণাম করিয়া
গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া।
উপদেশ পঞ্চালিকা কবির রচন।
সত্য কলি বিবাদ সম্বাদ বিবরণ।।

কাজেই ডক্টর হকের সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে মনে করা যেতে পারে।

অতএব, মুহম্মদ খান ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'যুগসংবাদ' এবং ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে 'মক্তুল হোসেন' রচনা করেন। এ যাবৎ তাঁর আর কোন রচনার সন্ধান মেলেনি।

এ কাব্যে সত্য ও কলির রূপকে ন্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যা ও পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাতে তত্ত্ব-কথা একঘেঁয়ে হয়ে না পড়ে তার জন্যে উপ-কাহিনী হিসেবে রোমান্সও জুড়ে দেয়া হয়েছে। একটি নামান্তরে বেতালপঞ্চবিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান, একটি চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী-উপাখ্যান অপর দুটো সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা নামের রূপকথার ও কিস্মির রাজার কাহিনী।

'সত্যের জয় মিথ্যার লয়' বা পুণ্যের প্রসার ও পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই কবির লক্ষ্য হলেও কবি শিল্পীসুলভ সংযম রক্ষা করেছেন এবং বাস্তব জীবনে উপলব্ধ সত্যে তাচ্ছিল্য দেখান নি, পাপও যে পুণ্যকে আচ্ছন্ন ও ঘায়েল করে এবং মিথ্যাও যে আমাদের জীবনে সত্যের উপর জয়ী হয়, (তা যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন), সর্বোপরি সত্য ও পুণ্যের পথ যে অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ও লাঞ্ছনা-দুষ্ট তা কবি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। এতে কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি এক একটা দোষ বা গুণের প্রতীকস্বরূপ এক একটি পাত্র বা পাত্রী সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কিন্তু নিতান্ত জড় প্রতীক নয়. একান্তভাবে রক্ত- মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছায়া আছে।

পাত্র-পাত্রীর নামগুলো যেমনি গুণজ্ঞাপক, তেমনি সুন্দর ঃ কলীন্দ্র, দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষন (দুর্শন), মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুদাতা, যোগী প্রভৃতি। সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। এ দুটোও গভীরতর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। সূর্য অগ্নিময়.. সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও রমণীয়... পাপ আপাতমধুর।

যোগী-সত্যবতী ও ভোগী- দুঃশীলা সম্বাদে ব্যবহারবিধি নিয়মনীতি, পাপপুণ্য ও সংযমের যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে, তা মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যার ইতিকথা।

সত্য-কলি-বিবাদসম্বাদ কবির প্রথম রচনা। এতেই তাঁর হাতে খড়ি। তাই বোধ হয় মক্তুল-হোসেন কাব্যের মতো এতে রসামৃত ধারা সর্বত্র বয়ে চলেনি। অবশ্য বিষয়বস্তুও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। ভাষা ও তাঁর দ্বিতীয় কাব্যের মতো ললিত মধুর নয়। কিন্তু তবু এ রচনা মক্তুল হোসেনের কবির অযোগ্য বলা যায় না। রূপ বর্ণনা ও সম্ভোগচিত্র অন্য কবির রচনার তুলনায় হীন-প্রভ নয়। মাঝেমধ্যে কবিত্বের বিজুলি ছটারও অভাব নেই। অলঙ্কারাদিও সুপ্রযুক্ত হয়েছে। কয়েকটি প্রাবচনিক বা সুভাষিত বুলির দৃষ্টান্ত দিই ঃ

১. নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসা ঘর
দীপহীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর।।

২. অতি রূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।

৩. বহু বহু নষ্ট হইল বাদে পরিবাদে।
সবংশে রাবণ মৈল রামের বিবাদে।

৪. দুগ্ধে সিদ্ধে কভু মল না ভেজে অঙ্গার।

৫. কোথাত অমৃত ফল বানরের ভোগ।

৬. বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত।

৭. লবণ ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে।

৮. যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্য- কাষ্ঠ পোড়ে।
লোভের লাকড়ি দেই ঔষধ-বড় লাড়ে।।

সত্য-কলির পৌরাণিক দ্বন্দ্ব বাঙালী মাত্রেরই নৈতিক-সংস্কারের অঙ্গীভূত। বৃহত্তর অর্থে এ দ্বন্দ্ব সর্বমানবিক ও সর্বকালিক। তাই কবির উদ্দিষ্ট তত্ত্ব সত্য-কলির রূপক ছাড়া আর কিছুতেই এতখানি স্বচ্ছ, সুন্দর ও কার্যকর হতো না।

কবি প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর সমকালীন লোকচরিত্রের যে আভাস দিয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় সতেরো শতকে আর বিশ শতকে তফাৎ নেই কিছুই। মানুষের অমানুষিকতা আজো তেমনি রয়েছে।[১]

১. এ গ্রন্থে বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতি চিত্রের জন্যে মৎপ্রণীত 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ-সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিম ধর্মসাহিত্য

গোড়ার দিকের দেশজ মুসলিম সমাজ

তুর্কিবিজয়ের আগেই বাঙলাদেশে প্রচারক দরবেশ প্রবেশ করতে থাকেন 'শেখ শুভোদয়া'র সাক্ষ্যে কিংবা চট্টগ্রামবন্দরে আরব-ইরানি বণিকের যাতায়াতের প্রমাণে আমরা তা জানতে পাই। অতএব তেরো শতকের উন্মেষকাল থেকে উত্তরবঙ্গে তেরো শতকের শেষার্ধে রাঢ়অঞ্চলে এবং চৌদ্দ শতকের গোড়া থেকে পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারিত হতে থাকে। প্রচার করেন বিভিন্ন খান্দানের সূফিরা। প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৫১-৫৯) আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সূফীরা কোরআন-হাদিসের নিষ্ঠ অনুসারী নন, তাঁরা তত্ত্বপ্রবণ মরমী। কাজেই সূফী-দরবেশদের হাতে দীক্ষিত দেশজ মুসলিমদের শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হতে পারেনি-- শাস্ত্রের ভাষা আর বিজ্ঞানের অভাবে।

গাঁয়ে গাঁয়ে দীক্ষিত মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে, তাদের একটা গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠতে, দেশজ মুসলিমের আরবি শিখে কোরআন-হাদিস-জানা শাস্ত্রী হতে দেশ-কালের প্রতিকূল পরিবেশে সুদীর্ঘকাল প্রয়োজন হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদেরকে আল্লাহ-রসুল-কলেমা-সম্বল ইসলাম বরণ করে তুষ্ট থাকতে হয়েছে। শাস্ত্র রইল তিন সমুদ্র তেত্রিশ নদীর ওপারে, নামসার নিরবলম্ব নিরক্ষর মুসলিম সমাজ গড়ে উঠল গাঁয়ে গাঁয়ে। ফলে নিরুপায় দেশজ মুসলিমরা পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের এবং আচারিক ঐতিহ্যের অবচেতন ও সক্রিয় প্রভাব কিছু কিছু হিন্দু-বৌদ্ধ লৌকিক দেবতা, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অনেক সংস্কার এবং কায়াবাদ ও গুরুবাদ অবলম্বন করে নবলব্ধ স্বধর্ম রক্ষা করলো। বিদ্বানেরা এর নাম দিয়েছেন 'লৌকিক ইসলাম'। আমরা অন্য এক অধ্যায়ে বাঙলার সূফীমতের ও চর্যার স্বরূপ দেখেছি মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তায়[১] মুহম্মদ খানের সত্যকলিবিবাদসম্বাদে[১] নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'শরীয়তনামায়' এবং গৃহগত নানা লোকাচারই[১] শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের নামে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি টিকেছিল। পনেরো শতকের দিকে হয়তো আরবি ভাষায় ব্যুৎপন্ন শাস্ত্রবিৎ দেশজ-মুসলিম সংখ্যায় নগণ্য হলেও গ্রামাঞ্চলে দুর্লভ ছিল না। মসজিদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরবি জানা ইমাম-মুয়াজ্জিনের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কাজেই গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমের সংখ্যাবৃদ্ধির ও সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আরবি মাধ্যমে শাস্ত্রশিক্ষা ও জন প্রয়োজনেই জনপ্রিয় হচ্ছিল, আর মন্থরগতিরত শাস্ত্রীয় উচ্চশিক্ষা প্রসার লাভ করছিল বলে অনুমান করা চলে।

২. অনুবাদে বাধা

তবু ষোল শতকের শেষপাদের আগে শাস্ত্রকথা দূরে থাক, শাস্ত্রসম্পৃক্ত মানুষের কথাও বাঙলায় লিপিবদ্ধ করতে সাহস পায়নি কোন দেশজ মুসলিম। এ পাপ-ভীতি তখনকার পৃথিবীতে ছিল সার্বত্রিক ও সর্বমানবিক। শাস্ত্রোক্ত বাণী মুখে মুখে চিরকালই মানুষ স্বভাষায় তর্জমা করেছেন শ্রোতাদের জ্ঞানদানের জন্যে। তাতে কিন্তু পাপভীতি জাগেনি কারো মনে। অনুবাদ লিপিবদ্ধ করাতেই ছিল আপত্তি। যুক্তি ছিল—এতে ঐশীবাণীর পবিত্রতা, গুরুত্ব, মূল্য, মর্যাদা এবং সর্বোপরি ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয়, ফলে ঈশ্বর হন রুষ্ট পাপ বাড়ে প্রজার। আসলে সেকালের নিরক্ষর অজ্ঞেয় সমাজে পুরোহিতবর্গের শ্রেণীস্বার্থে শাস্ত্রের একাধিপত্য রক্ষার, এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা স্থায়ী রাখার উপায় হিসেবে বিদ্যার ও জ্ঞানের প্রসাররোধ এবং পেশাগত প্রয়োজনে সম্পদ অর্জন লক্ষ্যে মন্ত্রগুপ্তিই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কথা এ সূত্রে স্মর্তব্য।

---

১. *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।*

হিব্রু থেকে লাতিনে এবং লাতিন থেকে আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ নিয়ে সতেরো শতক অবধি দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কিংবা আঠারো পুরাণ আর রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদে পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি বাঙালী হিন্দুর আপত্তি জ্ঞাপক শ্লোক-ছড়া এবং শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে আব্দুল হাকিম অবধি কবির দ্বিধাজড়িত ভক্তিই মধ্যযুগীয় এ সর্বমানবিক সমস্যার প্রমাণ।

তবু প্রাকৃতিক নিয়মেই অবচেতন প্রয়োজনের প্রবল প্রেরণায় অবচেতনভাবেই মানুষ ঘোষণা করে দ্রোহ। তখন তার গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী কিংবা যুগান্তকারী পরিণাম সমকালের কেউ উপলব্ধিও করতে পারে না। এমনি ভাবে মুসলিম সমাজে শুরু হলো ধর্মসম্পৃক্ত বিষয়ের ও ব্যক্তির বাঙলাভাষার মাধ্যমে আলোচনা, যেমনটি লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠায় ও জনপ্রিয়তায় বিচলিত, রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের উচ্চবিত্তের ও উচ্চশিক্ষার হিন্দুরা শুরু করেছিল রামায়ণের মহাভারতের ভাগবতের ও পুরাণের অনুবাদ লোকায়ত ধর্মের প্রসাররোধের অবচেতন প্রেরণায় ও স্ববর্ণের কল্যাণকামনায় আপাত দ্রোহীর ছদ্মবেশে। যুগে যুগে কল্যাণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনার মানুষই বিকাশের ধারা প্রবহমান রাখেন। যারা পুরোনোকে ভালোবাসে, যারা আসলে রক্ষণশীল তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তারাই নতুনের সঙ্গে আপোস রফার মাধ্যমে পুরোনো নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার টিকিয়ে রাখার সাধনা করে, তাদেরকে সমকালীন সাধারণ মানুষেরা উদার-প্রগতিবাদী চিন্তাশীল মানুষ বলে জানে ও মানে, তাদেরকেই যুগন্ধর রিফর্মার বা সংস্কারক তথা মুজাদ্দিদ রূপে জাতির বা সমাজের কিংবা শাস্ত্রের সঙ্কটকালে ত্রাণকর্তারূপে চিহ্নিত করে ধন্য করে, নিজেরা হয় কৃতার্থ। এভাবে আপোসকামী রক্ষণশীল হন যুগন্ধর সংস্কারক আর দেশ-কালের মানবিক চাহিদা মিটানোর জন্যে যাঁরা নতুন মত পথ বাতলান, যাঁরা নতুন কথা উচ্চারণ করেন, তাঁরা সমকালীন সাধারণ লোকের কাছে দ্রোহী বলে নিন্দিত।

মধ্যযুগে লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠাকামীরা ছিলেন দ্রোহী। আর রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রচারকারী ছিলেন বিদ্রোহীবেশী রক্ষণশীল সংস্কারক। মুসলিম সমাজেও তেমনি যারা যোগ-তন্ত্র কায়াতত্ত্ব আর মরমীবাদের সমন্বয়ে সূফীশরীয়তী হয়েছিল, তারা ছিল ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীল। তারাই সমাজে সতেরো শতকে হয় পীরনারায়ণ সত্যের পূজারী। আর যারা কোরআন-হাদিসের অনুগত করে জীবনরচনায় ছিল উৎসুক, সেদিনকার দেশজ মুসলিম সমাজে তারা ছিল সমাজকল্যাণকামী প্রগতিশীল দল। কারণ তারা পুরুষানুক্রমে লব্ধ সর্বপ্রকার বিশ্বাস-সংস্কার বর্জনে ছিল বদ্ধপরিকর।

৩. অনুবাদে আগ্রহ

ষোল শতকের শেষপাদে আরাকানরাজ্যে ও ত্রিপুরারাজ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে জনবহুল স্বস্থ ও সুস্থ এক একটি মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল। তাদের আত্মপ্রত্যয় ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি তাদেরকে শরীয়তী ইসলামের অনুরাগী করে তোলে। তাই এ সময় থেকেই বাঙলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে শাস্ত্রকথা তর্জমার পাপভয় পরিহার করে, কিংবা সংশয়ে দুর্বল কেউ কেউ দ্বিধাজড়িত হাতে মাতৃভাষায় শাস্ত্রকথা ও শাস্ত্রসম্পৃক্ত কথা লিপিবদ্ধ করে সমাজমানসে যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন।

যেহেতু পুরুষানুক্রমে আশৈশবলব্ধ দেশজ কিংবা শাস্ত্রজ ভয়-ভরসার উৎস বিশ্বাস সংস্কারের কালিক-দৈশিক-শাস্ত্রিক রূপান্তর ঘটে বটে, কিন্তু বিনাশ নেই, সেহেতু সব সমাজেই শাস্ত্র ও সংস্কারের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে শাস্ত্রীয় নীতি-নিয়ম রীতি-পদ্ধতি। বস্তুত ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে রামায়ণ-মহাভারত পাঠক হিন্দু সমাজে গীতাশ্রয়ী ধর্মমত এবং ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনে ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে মুসলিম সমাজে শরিয়তী সাধনা প্রতিষ্ঠা পায়। বাঙলায়ও দু'ধরনের ধর্ম সাহিত্য গড়ে উঠেছে। একটি ধারা হচ্ছে-নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ওজু, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, মোস্তাহাব, মকরূহ, কাফন, জানাজা, স্নান প্রভৃতি অবশ্য, জ্ঞাতব্য বিষয়ের, অন্যটি হচ্ছে—শাস্ত্রের মাহাত্ম্য, তাৎপর্য, ব্যাখ্যামূলক নীতিকথা, তত্ত্বকথা, নবী-রসুলের চরিতকথা, ওলি-

দরবেশের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি। এবং এগুলোর সবটাই কোরআন-হাদিস কিংবা ইতিহাস-অনুগ নয়, ফেকাহ, কিয়াজ, এজমা, কালাম ছাড়াও অনেক বানানো গল্প কাহিনী ধর্মতত্ত্বকে বিচিত্র, জটিল ও অসমঞ্জস করে তুলেছে। এ জন্যে এ সম্বন্ধেও কিছু ঐতিহাসিক আলোচনা প্রয়োজন।

৪. মুসলিম ধর্মসাহিত্যের ধারা

ধর্ম-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙলার মুসলমানও উদাসীন ছিলেন না। তাঁরা জনগণকে ধর্মবুদ্ধি দানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা যত্ন করেছেন। রসুলচরিত, নবীকাহিনী, ইসলামের উদ্ভবযুগের বীরবৃত্তান্ত-শবীয়ৎশাস্ত্র, মারফততত্ত্ব, পীর-পাচালী প্রভৃতি রচনা করে তাঁরা ইসলাম প্রচারের গৌরব, স্বধর্মের প্রসারগর্ব এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ববোধ গণমনে জিইয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাঙলায় ইসলামের রূপ

সৃষ্টি ও স্রষ্টার দ্বৈততত্ত্বই ইসলামের ভিত্তি। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে বান্দার ও মনিবের। 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব–'ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাহি রাজিউন'। সেজন্যে আল্লাহর অনুগত থাকাতেই তথা কোরআন নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মেনে চলাতেই মানুষের কর্তব্য সীমিত। মানা না মানার উপর নির্ভর করছে পুরস্কারের বেহেস্তী শান্তি ও তিরস্কারের দোজখী শাস্তি। এ ছাড়া আল্লাহর সঙ্গে মানুষের আর কোন সম্পর্ক স্পষ্টত স্বীকৃত নয়। এ দিক দিয়ে ইসলাম অত্যন্ত ঋজু ও আচরণসাধ্য ধর্ম। আসলে সব ধর্মেই মৌল অঙ্গীকার একটিই এবং তা অত্যন্ত সরল–'ভাল হও আর ভাল চাও'। কিন্তু মানুষের আচরণ কিংবা অনুভূতি তো সরল নয়। তাই কার্যত ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে মৌল শিক্ষা পল্লবিত ও জটিল হয়েছে। বিচিত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনে উচ্চ-তুচ্ছ নানা ব্যাপারে হাদিস, ফেকা, উসুল, কালাম, ক্বেয়াজ, এজমা প্রভৃতি বহু উপাত্ত তৈরি হয়েছে। আবার মানসপ্রয়োজনেও জিজ্ঞাসু মননশীল ও অনুভূতিপ্রবণ মানুষ এর উপর নানা সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাজাল বুনে তাকে সাধারণের বোধাতীত এবং অসামান্য করে তুলেছেন। এভাবে স্থূল হলো সূক্ষ্ম, সত্য হল সুন্দর আর আটপৌরে নীতিকথা ও আপ্তবাক্য মনের বৈভবে ঋদ্ধ হয়ে জীবনের দিগন্তে 'দর্শন' হয়ে জেগে উঠল। এতে করে ভাবুক ও জ্ঞানীর জীবন-ক্ষেত্র হল প্রসারিত। জীবন সূক্ষ্মরসে হল বিদগ্ধ ও নন্দিত, বাড়ল জীবনের মহিমাও। মনুষ্যত্ব পেল জৈব স্থূলতা থেকে মুক্তি। জীবনের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার আনন্দে মানুষ নতুন মুক্তদ্বার দিগন্তে পাড়ি জমাল তার সীমা খুঁজে ফেরার বাসনায়। এমনি করে তত্ত্বে ও তথ্যে শাস্ত্রের ও দর্শনের কলেবর হল বিপুল। কিন্তু মুশকিলে পড়ল স্বল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষ। সে মূল নিয়মের বাঁধাপথেও জীবনের স্বাদ পায় না কলুর বলদের মতই হাঁপিয়ে ওঠে জীবন-যন্ত্রণায়। ধর্ম সাধারণের পতন যেমন রোধ করে, তেমনি যে অসামান্য তাকেও পিছুটান দেয়। কারণ রুটিনের ছকে বুদ্ধির ও চিন্তার স্বাধীনতা নেই। আবার ছকের বাইরে পা বাড়াবার সাহস কিংবা যোগ্যতাও নেই তার। চেতনার গভীরে সে জীবনের স্বতোস্ফূর্তির বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে, অথচ বাস্তবে জীবনের বিভা ও বৈভব হতে সে থাকে বঞ্চিত। গুণী-জ্ঞানীরা মানবিক কৃপাবশে এগিয়ে এলেন এসব বিড়ম্বিতজীবন ভাগ্যাহতদের সাহায্যে। শিশুদেরকে হাঁটতে শেখানোর মতো পাঁতি দিয়ে ধর্মের আওতা প্রসারিত করে তাদেরকেও দিলেন জীবনের দু'চারটে বিহারভূমির সন্ধান।

ইসলামে ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের বীজ উপ্ত হয় উম্মীয়া শাসনকালে। প্রথমেই শাস্ত্রব্যাখ্যায় দ্বি-মতের সৃষ্টি হয়—শিয়া ও সুন্নী মত। এ ব্যাপারে ইরানিরাই অগ্রণী ছিল। এ প্রেরণার উৎস গ্রীক দর্শন আর উপকরণ মিলেছে খ্রীস্টীয়, বৌদ্ধ, জোরাস্ট্রীয় এবং মানীয় দর্শন থেকে। শাস্ত্রকথা ক্রমে দর্শন চর্চার রূপ নিল। আব্বাসীয় যুগে হাসান বসরীর সাগরেদ ওয়াসিল ইব্‌ন আতা যুক্তিবাদী মুতাযিলা মত প্রবর্তন করেন। একদল হলেন সংশয়বাদী, এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিল আল আশআরীর (জন্ম-৮৭৩ খ্রীঃ) প্রবর্তিত আশআরীয় মতবাদ। আর এ সব কিছু ছাপিয়ে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল মরমীবাদ বা সূফীবাদ। এতে ভারতীয় যোগ ও বেদান্ত দর্শনের

প্রভাব অত্যধিক হলেও পূর্ববর্তী সব ধর্মের তত্ত্বচিন্তার নির্যাস নিয়েই এর জন্ম। এর আগে এমনি সমন্বিত চিন্তাধারার আভাস ছিল শিয়াদের ইসমাইলী শাখাব মতবাদে। কাজেই সূফীমত প্রসারেব পরিবেশও ছিল অনুকূল।

কিন্তু সূফীবাদ বলতে কোন একটি বিশিষ্ট মতকে নির্দেশ করে না। বিভিন্ন তাত্ত্বিকের দার্শনিক চিন্তায় এও বিচিত্র অবয়ব নিয়েছে। কোরআনের কয়েকটি আয়াতের মধ্যে এ মতের সমর্থন খোঁজা হয়েছে। অতএব সূফীদের মতে কোরআনই সূফীমতের একমাত্র উৎস। হাসান বসরী (মৃঃ ৭২৮ খ্রীঃ), রাবিয়া (মৃঃ ৭৫৩ খ্রীঃ), ইব্রাহিম অদহম (মৃঃ ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃঃ ৭৭৭), দায়ুদ ত্বয়রী (মৃঃ ৭৮১), মারুফ করখী (মৃঃ ৮১৫) প্রমুখ আদি মরমী বলে স্বীকৃত। এঁরা সবাই আরবি, সিরীয় বা ইরাকি এবং এঁদের মতবাদ কোন সম্প্রদায় গড়ে তোলেনি। কাজেই ইরানই সূফী মতবাদের বিকাশ ও প্রসারক্ষেত্র। আর জুন্নুন মিসরীর (মৃঃ ৮৬০) হাতে সূফীমতবাদ একটি বিশিষ্ট সাধনমার্গ ও তাত্ত্বিকচিন্তারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এখন থেকেই সূফীবাদের দার্শনিক ভিত্তি স্বীকৃতি পেতে থাকে। তারপরে সারা মুসলিমজগতে অল্পকালেব মধ্যেই সূফীবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে এগারো শতক থেকে সূফীসাধকেরা প্রবেশ করতে থাকেন। তবে তেরো শতক থেকেই তাঁদের প্রভাব সর্বাত্মক হতে থাকে। তেরো থেকে ষোল শতক অবধি সূফীমত প্রসারের স্বর্ণযুগ। এ সময়ে সূফী সম্প্রদায়ের সংখ্যা চৌদ্দ ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। তারপরেও এদেশের মাটিতে সূফীমত নতুনতর ও বিচিত্রতর অবয়বে গড়ে ওঠে। বেদান্তের, যোগের ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে তা দেশজ রূপ নেয়। এ দেশজ মুসলমানেরা নিজেদের পূর্ব সংস্কার, ঐতিহ্যবোধ ও মানসপ্রবণতা বশে নতুনকে বরণ করেও পুরোনোকে দূরে সরিয়ে দেয়নি। ফলে সূফীবাদ এক সঙ্কর দর্শনের রূপ নিল। নির্বাণবাদ ফানাফিল্লাহ্ হয়ে, সর্বেশ্বরবাদ ব্রহ্মবাদ অদ্বৈততত্ত্বরূপে এবং কুণ্ডলিনী লতীফা নামে সূফীমতে ঠাঁই করে নিল। এই সমন্বিত মিশ্রদর্শন বিভিন্ন সূফীসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটায়। বহিরাগত চিশ্তিয়া, সুহরওয়ার্দিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এখানে অবিকৃত থাকেনি। আর দেশজ কলন্দরিয়া কবীরপন্থী মাদারিয়া, গওসিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

সূফীমত প্রসারের ফলে ইসলাম আর মুসলমানের ধর্ম অভিন্ন রইল না। সূফী সাধকদের কাছে দীক্ষিত মুসলমানের কোরআনের ইসলামের সঙ্গে পরিচয় ছিল সামান্যই। কাজেই মুসলমান ধর্ম নানা সংস্কারের ও ঐতিহ্যবোধের এবং বিভিন্ন দর্শনের মিশ্রণে ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। একথা হয়তো নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মরমীবাদ কোন ধর্মেরই লক্ষ্য নয় ; সব ধর্মেই তা আনুষঙ্গিক এবং এর অনুপ্রবেশও অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এ হচ্ছে জিজ্ঞাসু মানুষের জগৎ ও জীবন রহস্যভেদের চিরন্তন বাসনার অপ্রতিরোধ্য প্রকাশ।

ভারতবর্ষে দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কার তো ছিলই, আর্যপূর্ব যুগের দেশজ সংস্কারও ছিল। এভাবে শরীয়ৎ ও দেশজ আচারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের তথা বাঙালী মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই এদেশে রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে অবিমিশ্র শরীয়ৎ কথা পাইনে, মরমীদের বিভিন্ন মোকাম মঞ্জিলের সঙ্গে লৌকিক আচারের পাঁতিও পাই।

মুসলমানের ধর্মবোধ পুরোপুরি কোরআন অনুগ নয় বলেই শরীয়তেই শাস্ত্রের শেষ নয়। তারপরে রয়েছে তরিকত, হকিকত ও মারফত। এ সবের আবার মঞ্জিল রয়েছে—এগুলো বিভিন্ন সাধনস্তর। যেমন শরীয়ৎ মোকাম-এর মঞ্জিল হল নাসুত (দেহের জগৎ), তরিকত মোকামের মঞ্জিলের নাম মলকুত (বোধির জগৎ) হকিকত মোকামের মঞ্জিলকে বলে জবরুত (শক্তির জগৎ), আর মারফতের প্রথম মঞ্জিল হল লা'হুত (অহং বিহীন জগৎ) এবং দ্বিতীয় মঞ্জিল হা'হুত (তথা অদ্বৈতসত্তার কিংবা বাকাবিল্লাহর স্তর)। যোগীদের যেমন কায়াসাধনই মুখ্য, সূফীদেরও তেমিন কায়াস্থিত মনের বা প্রবৃত্তির (নফস্), হৃদয়ের বা বিবেকের (কল্‌ব্) এবং প্রাণের বা চৈতন্যের (রুহ)-উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বিমল চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এমনি অবস্থা প্রায় ত্রিগুণাতীত। সূফীসাধনা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে গুরুবাদ নির্ভর। সদ্‌গুরুর পরিনিয়ন্ত্রণ ভিন্ন এ

সাধনায় সিদ্ধি নেই। এ প্রভাব এমনি সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে যে নিতান্ত শরীয়ৎপন্থীরও পীর ছাড়া চলে না। 'পীর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ স্থবির (বৌদ্ধ থের)–জ্ঞানবৃদ্ধ তথা অভিজ্ঞতাঋদ্ধ প্রবীণ প্রজ্ঞাবান অর্থেই সম্ভবত প্রযুক্ত।

লৌকিক ইসলামে যে সব হিন্দু আচার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলে কথিত হয়, আসলে তা গোড়া থেকেই ছিল, নতুন করে গ্রহণ নয়, মূলত বর্জন করাই সম্ভব হয়নি, আর এসব হিন্দুয়ানিও নয়। ভারতবর্ষের আর্যপূর্ব অধিবাসীর বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ যুগ পার হয়ে মুসলমান ধর্মাচারেও দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। "এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারে ছোঁয়াছুয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।"[১] ধান, দূর্বা, কলা, হলুদ, পানসুপারী, কলাগাছ, কুলা, ঘট, কড়ি, দই, মাছ প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার আদিবাসীর। এ সব প্রাচীনতম যাদুবিশ্বাসের প্রতীক। এ ছাড়া বনবিবি, উদ্ধারবিবি, বাস্তুবিবি, ষষ্ঠী প্রভৃতিও মুসলিমসমাজে ঠাঁই ছাড়েনি। তবু ইসলামের শিক্ষার প্রচণ্ড প্রভাব স্বীকার না করে উপায় নেই। কেননা অসংখ্য বিশ্বাস আচার ও অপরিমেয় আদিম সংস্কারের প্রায় সবগুলোই তো মুসলমানরা ছাড়তে পেরেছিল, যা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ যুগে সম্ভব হয়নি। এর পশ্চাতে অন্য একটি কারণও অনুমান করা চলে। বাঙলায় তথা ভারতে ইসলাম প্রচারের জন্যে সূফীদের হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মোকাবেলাও করতে হয়েছিল। যোগ-দেহতত্ত্ব ও গুরুনির্ভরতা ছিল এ দেশী লোকের মজ্জাগত। অতএব, এ দুটোর কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে ইসলাম এদের সহজে আকৃষ্ট করতে পারত না।

৫. ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

পূর্বালোচিত প্রতিবেশের প্রশ্রয়ে বাঙলায় যোগনির্ভর তথা দেহতত্ত্বভিত্তিক অধ্যাত্ম সাধনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। বস্তুত সতেরো শতকের প্রথমপাদ অবধি এই পদ্ধতির সাধনাই ইসলামী অধ্যাত্ম সাধনারূপে স্বীকৃতি পায়। এ কারণেই শেখ ফয়জুল্লাহ গোরক্ষ-বিজয় ; সৈয়দ সুলতান 'জ্ঞান প্রদীপ', হাজী মুহম্মদ 'নুরজামাল', মীর মুহম্মদ সফী 'নূরনামা', শেখ চান্দ 'তালিবনামা' (শাহদুল্লাহনামা) ও হরগৌরী সম্বাদ, আবদুল হাকিম 'শাহাবুদ্দীননামা', শেখ মনসুর 'শির্নামা' আলি রজা 'আগম জ্ঞানসাগর', শেখ জাহিদ 'আদ্যপরিচয়', শেখ জেবু 'আগম', অজানা-লেখক 'যোগকলন্দর' রহিমুল্লাহ 'তনতেলাওত', রমজান আলি 'আদ্যব্যক্ত', আবদুর রহিম 'মুহম্মদী বেদতত্ত্ব', 'শাহেজুল্লাহ' খান 'যোগীকাচ', শেখ কিনু 'আশেকী কামাল' প্রভৃতি যোগপদ্ধতিব তত্ত্ব-গ্রন্থ রচনা করেন। এ ধারার গ্রন্থ আমাদের জ্ঞানে ষোল শতক থেকে আজ অবধি রচিত হয়ে চলেছে। বিশেষ করে মুসলিম বাউলেরা [যারা সাধারণ্যে মারফতী বা মুর্শিদপন্থী বলে পরিচিত] এ রীতি আজও ক্ষীণ ধারায় বাঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করি সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে। মনে হয়, তখন গাঁয়ে গঞ্জে মুসলিমসমাজ জনবহুল হয়ে দৃঢ়মূল হয়েছে এবং গণমনে শরীয়তী ইসলামপ্রীতি প্রবল হয়ে উঠেছে। এর আরো তিনটে কারণ অনুমান করি ঃ এক, তখন পর্তুগীজদের দৌরাত্ম্যে আরবের সঙ্গে চট্টগ্রাম হয়ে সমুদ্রপথে হজযাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। উত্তর ভারতের হজব্রতীরা এ পথে যাতায়াত করতে থাকে। দুই, সতেরো শতকে ইসলাম আর প্রসারকামী তথা প্রচারশীল ছিল না। তখন মুসলিমরা সমাজ সংগঠনের ও ইসলামের শিক্ষার স্বরূপ অনুধ্যানে হয়তো ব্রতী হয়েছে, আর সমাজ স্থিতিশীল হতে চলেছে। তিন, মুঘলবিজয়ের ফলে হয়তো তখন উত্তরভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ওখান থেকে শাস্ত্রবিদ যেমন এদেশে এসেছেন, এদেশী কিছু লোকও তেমনি উত্তরভারত থেকে শাস্ত্র শিক্ষা করে এসেছেন। এঁরাই হয়তো ইসলামের স্থানিক বিকৃতিতে বিচলিত হয়ে শরীয়তী ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। এর আভাস

১. *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৫৭৬।*

কিফায়তুল মুসল্লিন গ্রন্থেও মেলে। মৌলবী রহমতুল্লাহ—'মুসলমানি দীনকাম শিখায়ন্ত অবিশ্রাম/মুসলমানি করন্ত উঝল।' কিফায়তুল মুসলেমিন' লেখক কবি আশবাফও বলেন ঃ

দীন ইসলাম হেতু এথ যত্ন ভাব।
নহে পঞ্চালিকা কৈলে কি ফল লাভ।

এর ফলেই আলাউল উত্তরভারতীয় লেখক ইউসুফ গদার 'তোহফা' অনুবাদ করেন। শেখ পরাণ লেখেন কায়দানী কেতাব, তাঁর পুত্র মুত্তালিব মৌলবী বহমতউল্লাহর প্রবর্তনায় ও সহযোগিতায় 'কিফায়তুল মুসল্লিন' রচনা করেন। এভাবে তাঁদের অনুসরণে নেয়াজ লিখেছেন কায়দানী কেতাব, তাঁর পুত্র আশরফ লিখেছেন 'কিফায়তুল মুসলেমিন', খোন্দকার নসরুল্লাহর হাতে পেয়েছি 'শরীয়তনামা', 'হেদায়েতুল ইসলাম', আবদুল করিম খোন্দকার রচনা করেছেন 'হাজার মসায়েল ও দুল্লা মজলিস' এবং সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের 'সিরাজসবিল', আবদুল্লাহর 'নসিয়তনামা', মুনসী মুহম্মদ মুকিমের 'ফায়দুল মুকতদী', বালক ফকিরের 'ফায়দুল মুকতদী', কাজী বদিউদ্দীনের 'কায়দানী কিতাব', 'সিফতে ইমান', সৈযদ নুরুদ্দীনের 'দাকায়েকুল হেকায়েক', আইনুদ্দীনের 'তফসীর', মুহম্মদ আলীর 'হায়রাতুল ফেকা', সোলায়মানের 'নসিয়তনামা' প্রভৃতি গ্রন্থ পেয়েছি। গাঁয়ের মুসলমানও যে শরীয়তকথা তথা ইসলাম সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠেছে, তার আভাস 'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থেও মেলে। এর গ্রন্থোৎপত্তি অংশ স্মর্তব্য।[১]

কয়েকজন কবির জীবৎকাল নিরূপণ প্রসঙ্গ

শেখ মুত্তালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থের ভণিতায় 'পরাণতনয়' ও 'পরাণনন্দন' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। যেমন ঃ

ক. কিফায়তুল মুসল্লিন শুন দিয়া মন,
বঙ্গ ভাসে কহে শেখ পরান-নন্দন।
সব মসায়েল তিনি (আনি?) করি একত্তর
কহিয়াছে কায়দানী কেতাব ভিতর।

খ. পীর পদে প্রণামিএ সৈয়দ হাসান
মীর মুহম্মদ সফী তাহান নন্দন।

গ. সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন
তাহান নন্দন হীন মুতালিব ভাণ।

ঘ. মৌলবী রহমতুল্লাহ সর্বগুণ ধাম
চতুর্দশ এলেম অবধান অনুপাম।
তাহান আদেশে শেখ পরাণ-নন্দন
হীন মুতালিব কহে শাস্ত্রের বচন।

ঙ. বঙ্গভাষে কহে শেখ পরাণনন্দন।

চ. ওয়াজিব কথা কহি শুন যেই হএ
হীন মুতালিব শেখ পরাণ-তনএ।

ছ. শাস্ত্র কথা কহে সব পরাণ-নন্দন।

জ. আরবীর ভাষে হএ কর্ম মুসলমানি
হীন মুতালিবে কহে করি বঙ্গবাণী।

১. পিতা খ্যাতিমান না হলে পুত্র আত্মপরিচয়ে পিতার নামোল্লেখ করতেন না। আর কবি-খ্যাতির চেয়ে অন্য কোন খ্যাতিই বেশি প্রসার লাভ করে না। তাই আমরা মুত্তালিবকে কবি পরাণের পুত্র বলেই মনে করি। বিশেষ করে মুত্তালিবের 'ক' ভণিতায় শেষ পংক্তিগুলো আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে ইঙ্গিত দেয়। 'খ' ভণিতায় মীর মুহম্মদ সফীর পিতা সৈয়দ হাসানকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন। 'গ' ভণিতায় কবির পিতা শেখ পরাণেরও স্বগ্রাম সীতাকুণ্ডের নাম আছে। শেখ মুত্তালিব আরবি 'আবজদ' রীতিতে তাঁর গ্রন্থরচনার কাল নির্দেশ করেছেন ঃ

ক. এসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।
সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম।

খ. পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম
কিফায়তুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম।

---

১. *মৎসম্পাদিত শেখ মুত্তালিব প্রণীত 'কিফায়তুল মুসল্লিন' দ্রষ্টব্য।*

এ থেকে যথাক্রমে ১০৪৮ ও ১০৪৯ হিজরী তথা ১৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। শেখ মুত্তালিব শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৬৩৮ সনে মুত্তালিবকে ৩৫বছর বয়স্ক এবং মুত্তালিব পিতার যদি মধ্যবয়সের সন্তান হন আর পিতা-পুত্রের বয়সের তফাৎ ৪০ বছর ধরে নিয়ে হিসেব করলে মুত্তালিবের জন্ম সন ১৬০৩ এবং তাঁর পিতার জন্ম সন ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা যায়। শেখ মুত্তালিব যদি দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হন, তা হলে পরাণের মৃত্যু সন দাঁড়ায় ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ। অতএব পরাণের জীবৎকাল মোটামুটি ১৫৬০-১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ বলে মনে করা যায়।

২. শেখ পরাণ দুখানি গ্রন্থের রচয়িতা ঃ নূরনামা ও কায়দানি কিতাব। শেখ পরাণ তাঁর নুরনামায়[১১] সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের উল্লেখ করেছেন ঃ

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান।
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমান
নবীবংশে রচিছন্ত সৈদ সুলতান।

কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর বিখ্যাত কাব্য নবীবংশ রচনা শুরু করেন ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে।[২২] আবার এই শেখ পরাণই তাঁর কায়দানি কিতাবে[৩৩] হাজী মুহম্মদ ও তাঁর একখানি পুথির নামোল্লেখ করেছেন ঃ

যদি বোল গোর হোন্তে না উঠিব পুনি
কাফির হৈয়া যাইব নরকেতে জানি।
সুরত নামার মধ্যে ইমার সিফত
কহিছন্ত হাজী মুহম্মদ ভাল মত।
তে কারণে এথা মুঞি না কৈলুঁ সমস্ত
কিঞ্চিত কহিলুঁ মুঞি ইঙ্গিতে বুঝিতে।

এতে মনে হয়, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরাণের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন।

অতএব, আমাদের আগের অনুমান অনুসারে শেখ পরাণ ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন বলে ধরে নিলে হাজী মুহম্মদ ষোল শতকের শেষ দশকে 'সুরতনামা' রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করতে হয়।

৩. এদিকে সৈয়দ সুলতানের পৌত্র শেখ মুত্তালিবের পীর সৈয়দ হাসানের পুত্র ও 'নূরনামা' রচয়িতা শাহ মীর মুহম্মদ সফী হাজী মুহম্মদকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন ঃ[৪৪]

ক. কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখমতি
এহলোকে পরলোকে সেই দুরগতি।
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ।

খ. বলি পীর কহি দেও আদ্য সমাচার
কিরূপে হইল নূর আল্লার দিদার।
কোন মতে হৈল স্বর্গ ক্ষেতি উৎপন
কেমতে হইল বোল জীবের সৃজন।

গ. কহে মুহম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
যার মর্মে সৃষ্টি উৎপন।
পীর হাজী মুহম্মদ শিরে বন্দী তান পদ
পাইতে সে নূরের দরশন।

শেখ মুত্তালিব মীর মুহম্মদ সফীর পিতা সৈয়দ হাসানের শিষ্য ছিলেন। কাজেই মীর মুহম্মদ সফী ও শেখ মুত্তালিব প্রায় সমবয়সী ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। অতএব, ছকে ফেলে দেখলে এরূপ দাঁড়ায় ঃ

---

১. *পুথি পরিচিতি ঃ পৃঃ ২৯৯, ক্রমিক সংখ্যা ঃ ২৫৭।*

২. *পুথি পরিচিতি ঃ ১৪৮৬-৪।*

নবীবংশ-এর কবি
সৈয়দ সুলতান ও তাঁর ভাই
(১৫৮৪-৮৬ খ্রীঃ)

শাহদুল্লাহ[১]
(সৈয়দ সুলতানেব জামাতা)

সৈয়দ হাসান ১৫ — কাজী মনসুর

মীর মুহম্মদ সফী — শরীফ শাহ — মুজাফ্‌ফর — অজ্ঞাত

তাজুদ্দিন — সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ

খ. সৈয়দ হাসান — গ। হাজী মুহম্মদ

শিষ্য — শিষ্য

শেখ মুত্তালিব — মীর মুহম্মদ সফী

ঘ। শেখ পরাণ

পুত্র

শেখ মুত্তালিব

আমরা আগেই দেখেছি, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরাণের পূর্বসুরী ছিলেন। হাজী মুহম্মদকে সৈয়দ হাসানের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সৈয়দ সুলতান বয়ঃকনিষ্ঠ রূপে কল্পনা করলে তাঁর আবির্ভাব কাল ১৫৬০-১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা যায়। হাজী মুহম্মদ 'সুরতনামা বা নূরজামাল' রচনা করেছিলেন।

কবি পরিচিতি

ক. শেখ পরাণ

শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণও কায়দানী কিতাব ও নুরনামা নামে দুইখানা পুস্তিকা রচনা করেন। কায়দানী কিতাবে ওজু ও নামাজের ফরজ, চার কুর্সীর ও মজহাবের নাম, গোসলের ফরজ, সিফতে ঈমান, ওজুদের নাম, রাগের নাম শরীরের লোমের সংখ্যা প্রভৃতি বর্ণিত।

পুস্তিকায় হাজী মুহম্মদের গ্রন্থের উল্লেখ আছে ঃ

সুরতনামার মধ্যে ইমার সিফত — তে কারণে এথা মুঞি না কৈলু সমাপ্ত (সমপ্ত)
রচিছন্ত হাছী মুহম্মদ ভালমত — কিঞ্চিৎ কহিলুঁ মুই ইঙ্গিতে বুঝিতে।

এঁর নুরনামায় সৈয়দ সুলতান ও তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃ

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান।
ফাতেমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান
নবীবংশে রচিছন্ত সৈয়দ সুলতান।

---

১. মুকিম রচিত গুলে বকাউলিতে এ তথ্য মেলে ঃ তান পুত্র [পৌত্র] শ্রীসৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ

ক. চক্রশালা ভূমি মধ্যে পীরজাদা ঠাম
সৈয়দ সুলতান বংশে শাহদুল্লা নাম
একে তান ভ্রাতৃপুত্র দূতী এ জামাত
সর্বশাস্ত্র বিশারদ শরীয়ত জ্ঞাতা
নিজ পীব স্থানে সেই হৈল মুরীদ
খ. পীর মীর মুহম্মদ সৈদক সালাম
গ. শ্রীযুত মুহম্মদ সৈদ পীরবর
তান পদ প্রণামিয়া শ্রীলএ মুকিম
নর-পরীভাব গ্রন্থ কহে সুকৃত্রিম।

মুকিমের পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতানের প্রদৌহিত্র সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ

অতএব হাজী মুহম্মদের ও সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থ জনপ্রিয় তথা সাধারণ্যে খ্যাত হওয়ার পরে শেখ পরাণ লেখনী ধারণ করেন। নুরনামা মনে হয় কায়দানী কেতাবের অংশ।

একটি ভণিতা .. শেখ পরাণে কহে শুন গুণিগণ
সভানের পদতলে করম নিবেদন।

খ. নেয়াজ

নেয়াজ ছিলেন 'কিফায়তুল মুসলেমিন' রচয়িতা আশরফের পিতা। ইনিও এক কায়দানী কিতাবের রচক। শেখ পরাণ ও নেয়াজ দুজনেই পুত্র-সূত্রেই বিখ্যাত। পরাণ-পুত্র মুত্তালিব এবং নেয়াজ-পুত্র আশরফ ভণিতায় পিতৃনাম যোগ করেছেন। এটি সম্ভবত আরবিরীতির প্রভাব প্রসূত। এরূপ আর এক কবি ছিলেন, 'রাজ্জাকনন্দন' আবদুল হাকিম। এঁর পুথির পাণ্ডুলিপি মেলেনি।

ভণিতা ঃ হৃদমুখ সঙ্গে হইল এবাদ নামাল ১।
হেন দাতা নিতে চাহে নরক ভুবন।

নেয়াজ সতেরো শতকের তো বটেই, ষোল শতকের শেষার্ধের লেখক হওয়াও অসম্ভব নয়।

গ. শেখ মুত্তালিব

শেখ মুত্তালিব কবি শেখ পরাণের পুত্র। পরাণ দু'খানা শাস্ত্রগ্রন্থের রচক ঃ কায়দানী কিতাব ও নুরনামা। পরাণ বোধ হয় খ্যাতিমান ছিলেন, তাই শেষ মুত্তালিব তাঁর ছয়টি ভণিতাতেই (মোট সাতটির মধ্যে) নিজেকে শেখ পরাণ-নন্দন বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড গ্রামে।

শেখ মুত্তালিব 'কায়দানী কিতাব' নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন ঃ

পড়িবার অক্তে বাপ মরি গেল মোর।
গৃহবাস বলা আর দুনিয়ার বেভার
বেড়িল আপদে মোর দরস্ মাঝার।
এই জন্য পড়িবারে নারিলুঁ বিস্তর
অল্প অল্প জানিলুঁ শরার খবর।
যদি দৃষ্টি কর কভু কোন মহাজন
আরবি বাঙ্গলা দেখি না ফিরাও মন
অবুঝ সকলে যেন মতে বুঝ পান
তেন মতে বুঝাইবারে কহিছে আল্লাএ।

অতএব, শেখ মুত্তালির অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তখন নানা বিপদ সংকটের মধ্যে দিয়ে তাঁর দিন কাটে। সে জন্যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে মাদ্রাসা (দরস্) ত্যাগ করতে হয়। কবির পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতানের পৌত্র মীর মুহম্মদ সফী।

'মহিত, ফতাবিখনিয়া, ফতাবিকোবরা, শরা-বেকায়া, হেদায়া ক্দুরীকঞ্জ, আকায়েদ প্রভৃতি কিতাবের সার সংকলিত হয়েছে কায়দানী কিতাবে। সেই কায়দানীকে মুখ্য অবলম্বন করে রচিত হয়েছে মুত্তালিবের কিফায়তুল মুসল্লিন।

মুত্তালিবের মনেও সে-দ্বিধা, সে-সংশয় এবং সেরূপ আশ্বাসের দ্যুতি ঃ

আরবিতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তেকারণে দেশীভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।
এসব জানিয়া যদি করএ রক্ষণ
তবে সে মোহোর পাপ হইবে মোচন।

সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থেরও বরাত দেয়া হয়েছে দুইবার। একবার

ক., হাওয়া বিবির হায়েজ প্রসঙ্গে ঃ
নবীবংশে সে সকল প্রসঙ্গ আছেএ
পুনি তাক লিখিবারে উচিত না হএ।

দ্বিতীয়বার ঃ খয়বর যুদ্ধ প্রসঙ্গে ঃ
'শবে মেরাজে' আছে যুদ্ধ বিবরণ
পুনি এথা কহি তাক নাহি প্রয়োজন।

সৈয়দ সুল৲ । গ্রন্থ তখন এত জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত যে গ্রন্থকারের নাম উচ্চারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

শেখ মুত্তালিব 'কায়দানী কিতাব' নামে একটি পুস্তিকা বচনা করেছিলেন কিফায়তুল মুসল্লিন গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসারই পুস্তিকায় বর্ণিত। কবি নিজেই বলেছেন ঃ

শরীয়ত কায়দা এই শুনহ বয়ান।
কহিছি অপর কায়দা কিতাবেতে পাই
নামাজের কায়দা পুনি কহিবারে চাই।

অপর কায়দা অর্থে কিফায়তুল মুসল্লিন গ্রন্থই নির্দেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থও ফাজিল মৌলবী রহমতুল্লাহর প্রবর্তনায় রচিত ঃ

উত্তর দেশেতে ছিল ফাজিল মহাজন
তান নাম রহমত কহি সর্বজন।
কিতাব পড়িয়া দেখি বুঝাইল মোরে
মুই হীন দুর্গতিয়া কহি মুখে কারে।

এই পুস্তিকায় কবির কিছু আত্মকথা মেলে ঃ

ত্রিশ রোযা ত্রিশ নিয়ত কহিলাম পুনি
একশত ত্রিশ ফর্জ লন্ত জানি গুনি।
ফাজিলের পদে গিয়া এই কথা শুন
আহ্মি হোন্তে বাড়া ফাজিল আছে মনে গুন।
কি জানি কি বুঝি আমি কিতাব বেওর
পড়িবার অক্তে বাপ মরি গেল মোর।
গৃহবাসে বলা আর দুনিয়ার বেভার
বেড়িল আপদে মোর দরস মাঝার
এ জন্য পড়িবারে নাবিলুম বিস্তর
অল্প অল্প জানিলুম শরার খবর।

ঘ. আশরাফ

মধ্যযুগে জনগণকে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে দীন-ই-এলম্ শিক্ষা দিয়ে যাঁরা ধন্য হয়েছেন, শেখ মুহম্মদ নিয়াজসুত আশরাফ তাদের অন্যতম।

নিয়াজ-পুত্র আশরাফ রচিত গ্রন্থের নাম 'কিফায়তুল মুসলেমিন' দুই গ্রন্থের নামের সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়ে মিল নাই। এই গ্রন্থে বিভিন্ন নামাজের ফজলিয়ত বর্ণিত। বিশেষ করে রমজান মাসে কোন দিনে কিভাবে কত রাকাত অতিরিক্ত নামাজ পড়তে হয় এবং তার ফজলিয়ত বা পুণ্য এবং 'শবে কদর' নামাজের তর্তিব ও ফল বর্ণিত হয়েছে। প্রথমদিকে ষোল পত্র নেই। সেজন্যে রচয়িতার পূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুথির লিপিকাল ১১৫০ মঘী বা ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ। আশরাফ নিয়াজের পুত্র ও মুহম্মদ আবিদের মুরীদ। ভণিতায় (আঙ্গিকেও) শেখ মুত্তালিবের অনুকৃতি রয়েছে। তাতে মনে হয় আশরাফ মুত্তালিবের পরবর্তী লেখক। অবশ্য বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও বাধা নেই। নিয়াজও এক কায়দানী কিতাব রচনা করেছিলেন। মুত্তালিবের পিতা পরাণও কায়দানী কিতাব রচনা করেন। কাজেই উভয় ক্ষেত্রেই পিতা-পুত্রের কৃতি সমান।

আশরাফের ভণিতা ঃ

ক. জনক চরণ চুম্বি আশরাফ বাওরা
কহন্ত নমাজ কথা রসুলের শরা।
সাফল্য জনম শেখ মোহাম্মদ নেয়াজ
জীববন্তে না তেজিল এ রোজা নামাজ।
তাহান আদেশে ছিরি আশরাফ হীন
কহন্ত নামাজ কথা কারণে মুমীন।

খ. মোহাম্মদ নেয়াজ সুত আশরাফ হীন
কহন্ত পুস্তক কিফায়তুল মুসলেমিন।
তাহান আদেশে ছিরি আশরাফ হীন
কহন্ত কদর কথা কারণে মুমীন।

ঘ. যোগিস তপসী শাহা পরম ভকত
মুহম্মদ আবিদ ছিরি শাহা উল্‌ফত।
তাহান আদেশে শেখ নেয়াজ-নন্দন
আশরাফ ক্ষুদ্রে কহে কিতাব কথন।
মুহম্মদ রাজাসুত মহম্মদ নেয়াজ
আশরাফ হীন তান সন্ততি সমাজ।

গ. মোহাম্মদ আবিদ শাহা ভক্ত ভাগ্যবন্ত
নিরবধি ভাবে চিত্তে আখেরের পন্থ।

কিফায়তুল মুসলেমিন পুণ্যের কথন
মুসলমান হেতু কৈলুঁ পঞ্চালি রচন।
দীন ইসলাম হেতু এথ যত্নভাব
নহে পঞ্চালিকা কৈলে কি ফল কি লাভ।

এ থেকে জানা যায় আশরাফ পিতা নিয়াজের আগ্রহ এবং পীর শাহ মুহম্মদ আবিদের আদেশে কিফায়তুল মুসলেমিন গ্রন্থটি বচনা করেন। আবিদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বা পীর ছিলেন শাহ্ উলফত। আশরফের পিতামহের নাম মুহম্মদ রাজা। প্রাপ্ত পুথির পুষ্পিকা এরূপ ঃ ইতি কিফায়তোল মোছলমিন বয়ান সমাপ্ত। পুস্তকর মালিক শ্রী মোহাম্মদ কাছিম পীছবে আবদুল রজ্জক ইবনে জুগীন আখন। সাকীন ইছাপুর মোং ধর্মপুর ইতিসন ১১৫০ মঘী তারিখ ১০ কার্তিক।

১১৫০ মঘীতে অর্থাৎ ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত পাণ্ডুলিপি যখন আমাদের হাতে আছে, তখন আশরফ যে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে অন্তত বর্তমান ছিলেন, তা বিশ্বাস করতে বিশেষ বাধা নেই।

এ গ্রন্থে শব-ই-কদর নির্ণয় সম্পর্কে কিছু বিরলতত্ত্ব ও তথ্য শেখ আবুল হাসানের বরাত দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। পয়লা রমজান মঙ্গলবার হলে কদর হবে সাতাইশে, বুধবার হলে হবে বাইশে, বৃহস্পতিবার হলে হবে পঁচিশে, শুক্রবার হলে হবে ছাব্বিশে, এবং শনিবার হলে কদর হবে তেইশে রমজান।

ঙ. আলাউল

ইউসুফ গ'দার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন রহমান আলী। অবশ্য সে মোটেই প্রয়োজনীয়নুরূপ নয়। তিনি লিখেছিলেন,—"আলিম-ই রব্বানী, চেরাগ ই-দিল্ল শেখ নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শিষ্য শেখ ইউসুফ দেহলভী হাদিস ও তফসীরে বিচক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'তোফাতুননেসায়েহ' নামক একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এতে ফরজ, সুন্নত ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৭৭৪ হিজরীতে (১৩৭২-৭৩ খ্রীঃ) তাঁর ইন্তিকাল ঘটে।"[১]

শেখ ইউসুফ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাই তাঁর নামের সঙ্গে গ'দা (দরবেশ) উপাধি যুক্ত হয়েছে। তিনি দিল্লীনিবাসী ছিলেন, তাঁর নামের শেষে 'দেহ্লভী' প্রয়োগই তার প্রমাণ। অতএব, তাঁর পুরোনাম ছিল গ'দা শেখ ইউসুফ দেহলভী। ইউসুফের পীর সেকালের ভারতবিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম নাসির অল-দীন-মাহমুদ ইবনে এহিয়া ইবনে আবদুল লতিফ অল হোসাইনি অল ইয়াজদী অল আওধী। তিনি 'চেরাগ-ই-দিল্লী' উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। নাসিররুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন হজরত নিযামউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য। মহিয়্যুদ্দীন খাশানী ও শামসুদ্দীন মুহম্মদ আল-আওধী ছিলেন তাঁর সতীর্থ। তিনি অযোধ্যার লোক, বাস করতেন দিল্লীতে। এখানে ৭৫৭ হিজরীর ১৮ই রমযান রোজ শুক্রবারে (১৩৫৬ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে) তিনি দেহত্যাগ করেন।[২] ইউসুফ গ'দার মতে পীর দস্তগীর মাহমুদ নাসির উদ্দীন চেরাগ-ই-আউলিয়া-ই-দেহলভী মূল নাম মুহমুদ আর নাসিরুদ্দীন প্রভৃতি তাঁর লঘব্ বা উপাধি।[৩] আলাউলের তোহ্ফায় এর সমর্থন আছে।

গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে আলাউল যা বলেছেন, তা এই ঃ

শ্রীযুত ইসুফ গদা মহামন্ত ওলি।
রচিলা বয়েত ছন্দ মনেত আঁকলি।।
সপ্তশত একাশী বয়েত কৈল সার।।

শ্রীযুত ইসুফ গদা মহা দানেশমন্দ।
কিতাব তোহফা নামে রচিলা সুছন্দ।।—
শেখ মাহমুদ নামে জান তান পীর।

১. তাজকিরায়ে উলেমায়ে হিন্দ-রহমান আলি, পৃঃ ২৫৬।
২. Indian Contribution to the Study of Hadith Literature—Dr. Md Ishaque p. 63
১. তোহফাতুন নেসায়েহ—আবদুল জলিল পেশোয়ারীকৃত সটীক সং ১৩১৭ হিঃ লাহোর।

রবিউল আখের দশদিন সোমবার।।
তান পদে ভক্তি করি হৈয়া পৃষ্ঠগামী।
ঘৃত অবশেষে ঘোলঝাঁকি লৈলুঁ আমি।।
বিশেষ মহন্ত আজ্ঞা না যায় লঙ্ঘন।
এ কারণে কষ্ট-পন্থে করিলুঁ গমন।
শ্রীযুত সোলেমান জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
যদ্যপি সংসারে ভোর প্রভুগত চিত।।
তাহার আদেশমাল্য শিরেতে ধরিয়া।
হীন আলাউলে কহে পঞ্চালি রচিয়া।।—

আবুল ফতেহা নামে পুত্র গুণবান।।
রচিলা তোহ্ফা গ্রন্থ নিমিত্তে তাহান।।
'তোহ্ফা' কেতাব জান শরীয়তের ঘর।
পঞ্চ উপর চল্লিশ দ্বার মনোহর।।
আরবি কেতাব হন্তে ফারসি ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইসুফ গদাএ।।—
'তোহফাতুন্নেসায়েহ' বাছিয়া থুইলা নাম।
হাদিয়ারে 'তোহ্ফা' আরবি ভাষে বলে।
মহতেরে দেয় ডালি দিব্যবস্তু হৈলে।।
এ থেকে 'তোহ্ফা' নাম থুইল বাছিয়া।।

অতএব, ইউসুফ গ'দার 'তোফাতুন্নেসায়েহ'ও মৌলিক রচনা নয়। এর অবলম্বন কোন আরবি 'হেদায়া' যদিও 'রচিলা বয়েত ছন্দ মনেত আকলি' আছে তবু আমরা একে 'স্বাধীন অনুবাদ' বা ছায়াবলম্বন বলে মনে করতে পারিনে। কেননা আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও আলাউল বলেছেন— (তোহফা) 'পরিশ্রমে রচিলাম মনে ভাবি উক্তি'। তবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান দেবার জন্য কিছু কিছু স্বকীয় যোজনা যে রয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই। গ'দার গ্রন্থে বয়েত সংখ্যা ৭৮১।

রচনকাল ঃ

শেখ ইউসুফ গ'দা তাঁর গ্রন্থশেষে রচনার সমাপ্তি সন ৭৯৫ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। যথা—

দরখতম কিতাব ও মোনাজাত আখির শরানিস্ত।
হফ্সদনওদ্ পঞ্জে দিগর হিজরত মোহাম্মদ মোস্তফা।
আশের রবিউল আখেরী ওয়াক্ত-এ জোহা রোজে কমর।।

আলাউলেও গ'দা প্রদত্ত সনের সমর্থন রয়েছে ঃ

সিন্ধুশত গ্রহ দশ সন বাণ'ধিক।
রচিলা ইসুফ গদা তোহ্ফা মানিক।।
দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর বহিল।
আলিমে পাইল মর্ম 'আমে' না পাইল।।
এবে আম-লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার।।

অতএব, সিন্ধু-৭, শত-১০০, গ্রহ-৯, বাণ'ধিক (=তৎ অধিক বাণ)-৫,= ৭×১০০+৯×১০+৫= ৭৯৫ হিজরী বা ১৩৯৩ খ্রীস্টাব্দ (৭৯৫ হিঃ ১৭ই নবেম্বর ১৩৯২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৫ই নবেম্বর ১৩৯৩ খ্রীস্টাব্দ)। উক্ত ৭৯৫ হিজরীর সঙ্গে ২৭৮ হিজরী বছর যোগ করলে ১০৭৩ হিঃ দাঁড়ায়। সুতরাং ১০৭৩ হিঃ (১৬ই আগস্ট ১৬৬২ ৫ই আগস্ট ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ) বা ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে (১০৭৩ হিঃ) ৮ই জুলাই থেকে ১৯শে জুলাই ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ) আলাউল তোহ্ফা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তোহ্ফার রচনা-সমাপ্তিকাল ঃ

পুস্তক সমাপ্ত সং সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি।।
পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দশ দিন সমবার।
সম্মুখ বরাত নিসি সুব জোগ সার।

তরুণ ওরুণ সমে বেলা দুই জাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম।।
মগদের সন সংক্ষ বুঝহ নিন্যএ।
রিতু জোগ অম্র [অম্ন] এক বসন্ত মসএ।।

অথবা

পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মোছলমানি।
রসসিন্ধু রমধিক লঅ পরিমাণি।
সাবানের চতুর্দ্দশ দিন চন্দ্রবার।
সমুখে বরাত নিসি সুভ জোগ সার।।
তরুণ অরুণ সঙ্গে বেলা দুই জাম।
তত্ত উপদেশ করি পোস্তকের নাম।।

মগদের সন সংখ্যা বুজহ ণ্রি এ।
রিতু জোগ অম্রেত জে বসন্ত সমএ।।
ফাল্গুন মাসে ত জান চতুর্থ বিংস সম।
সমাপ্ত হইল পোস্তক মনোরম।।

আমাদের অনুমিত বিশুদ্ধ পাঠ ঃ

পুস্তক সমাপ্ত-সংখ্যা সন মুসলমানি।
রাম সিন্ধু নবধিক লও পরিমাণি।।
সাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার।
সমুখে 'বরাত নিশি' শুভ যোগ সার।।

তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্বউপদেশ এহি পুস্তকের নাম॥
মগদের সন-সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়।
ঋতু যুগ অম্র এক বসন্ত সময়।।
ফাল্গুন মাসে ত জান চতুবিংশ সোম।
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম।।

মুসলমানি সন ঃ রাম-৩ সিন্ধু-৭, নবধিক (নব অধিক)-১০। অঙ্কস্য বামাগতি নিয়মে ১০৭৩ বা ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ। (১৪ই সাবান বা ২৪শে ফাল্গুন, ১০২৬ মঘী হয় ১০ই মার্চ ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ।

আর, মঘী সন ঃ ঋতু-৬, যুগ-২, অভ্র-০, এক-১। এভাবে ১০২৬ মঘী বা ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ হয়। অতএব ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দের শেষার্ধে তোহফার অনুবাদ কার্য শুরু হয়ে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে শেষ হয়। এবং তার আগে 'চন্দ্র যোগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন-এর অনুমতি বিশুদ্ধ পাঠ ঃ চন্দ্রশূন্য কলানিধি গ্রহের স্থাপন—অনুসারে চন্দ্র-১, শূন্য-০, কলানিধি-১৬, গ্রহ-৯, ১০১৬+৯ = ১০২৫ মঘীতে বা ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে কবি 'সপ্তপয়কর' রচনা করেন।[১]

সুতরাং রহমান আলী প্রদত্ত ইউসুফ গ'দার মৃত্যু তারিখটি ভুল।

তোহফায় কোরআন আছে, হাদিস আছে, কেয়াজ এজমা আছে, আরো আছে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার। যথা ঃ

১। বিদ্যা ও আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে ঃ

নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কর দুঃখকাজ।
লজ্জা না করিও তাহে মাগিলে সে লাজ।।
বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদ সম যে আলস্য করে।।—
পৃষ্ঠে মুণ্ডে আনিব পর্বত কাষ্ঠ শিলা।
পরগৃহ অন্ন হোতে শতগুণে ভালা।।

শাক অন্ন রুক্ষ শুষ্ক যেই মিলে খাও।
স্বাদ হেতু নৃপতির গৃহেতে না যাও।।
মনে ত করিয়া আশা কতক্ষণে খায়।
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায়।।
পর-গ্রাসে আশা ভাবি না থাকিব মনে।
কুকুর সমান তারে দেখে সর্বজন।।

বিয়ে সম্বন্ধে ঃ

(যে নারী) অতি স্থূল, পুষ্টকায়া, অধিক দুর্বল।
কর পদে লোমাবলী থাকে যে সকল।।
না ঢাকএ মস্তক, সাক্ষাতে দেএ গালি।
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি।।
দাসী ভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।

কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাসে।
করিয়া পীড়ার ছল নিকটে না আসে।।
(তার চেয়ে)আপনা হারিষে যদি চাহ চিরকাল।
কিনিয়া সুন্দব দাসী গোঙাইলে ভাল।।
সদা ত্রাসযুক্ত থাকে, বুঝে কার্য-মর্ম।।

(বার ১২ নিকাহ)

১. *৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তপয়কব বচনাকাল অনির্ণীত বয়েছে।*

দাসী সম্ভোগ সম্বন্ধে ঃ

যদি দাসী কিনিগৃহে আনে কোন জন।
তৎমাত্র না কর চুম্বল আলিঙ্গন।।
উদর পবিত্র আছে বুঝিয়া মরমঁ।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভবম।।
বেচিলে বেচিবে দাসী পবিত্র উদরে।
মাসাধিক যায় সে চরিত্র বুঝিবাবে।।
(বার ১৮. সদাগরী)

ভিখিরীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ইদানীং কোরআন-হাদীসের বাণী সম্বলিত বহু কবিতা রচিত হয়েছে আলাউলের এ অংশ ওসব কবিতার পাশে হীনপ্রভ হবে না

কৃপা ভাবে ভিক্ষুক করিলে এক দৃষ্টি।
তোমা পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি।
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পর দুঃখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু-কৃপা-ভাগী।।
দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।
না দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি।
ঈশ্বরে বোলএ, 'আমি গেলুঁ তোর দ্বারে।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলা আমারে'।।
দ্বার হন্তে কেহ যদি মাগুয়া খেদাএ।
'মোকে খেদাইলে' হেন বোলএ খোদাএ।।
গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক।
সহস্র বৎসব দোজখেত পাইব দুঃখ।।
(বাব ৩০, দান)

লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে ঃ

১. না লেপিঅ ঘর বেড়া গো-লাদ মিশ্রিত।
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত।।

২. পতি পত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ।

চ. মুজাম্মিল

গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম নীতিশাস্ত্রবার্তা যথা ঃ

ক. নীতিশাস্ত্র বার্তা যেবা পড়এ শুনএ
আয়ুযশ বাঢ়ে তার দারিদ্র্য খণ্ডএ।

খ. নীতিশাস্ত্র বার্তা জান পাষাণের রেখ
এ সব জানিলে লোকে জ্ঞান বাঢ়িবেক।

গ. নীতিশাস্ত্র বার্তা যেন মরকত রেখ
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হইব পরতেক।

কবি মুজাম্মিল বলেছেন ঃ

ক. রচিলেক মুজাম্মিলে হাদিস দেখিয়া
নববস্ত্র পরিবেক দরুদ পড়িয়া।
আরবি ভাষায় সবে না বুঝে কারণ
সভানে বুঝিতে কৈলু পয়ার রচন।

খ. হাজামত বিবরণ হাদিসে দেখিয়া
দেশীভাষে রচিলেক মনে বিমর্সিয়া।

গ. আরবির ভাষে লোকেঁ না বুঝে কারণ
দেশীভাষে কৈলুঁ তবে পয়ার রচন।
যে বলে বলৌক লোকেঁ করিলুঁ লিখন
ভালে ভাল মন্দে মন না যাএ খণ্ডন।

ঘ. শাহা বদরুদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি
শতমুখে সেই বাখান কহিতে না পারি
তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া
রচিলেন্ত মুজাম্মিলে মনে আকলিয়া।

ঙ. এই বিবরণ কিতাবে লিখন
আছএ আরবিভাষ
আরবি বচন বঙ্গদেশীগণ
সবে না বুঝে বিশেষ।
নিজ দেশে বুলি ভণিলুঁ পঞ্চালি
লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে
তবে সর্বজন এসব কথন
বুঝিবেক মন কুতুহলে।

অতএব, লোক হিতার্থে কবি পীরের আদেশে আরবি হাদিস গ্রন্থ অবলম্বন করে এ পুথি রচনা করেছেন। আরবি কিতাবটার নামোল্লেখ করেননি তিনি, তবে তাঁর গ্রন্থ যে আরবি বইয়ের হুবহু অনুবাদ নয়, তা কোনো পাঠককে বলে দিতে হবে না। কেননা, কবি যদিও তাঁর রচনাকে কিতাবানুগ বলে দাবী করেছেন ঃ

কিতাবে লিখন আছএ যেমন
শুন কহি সব পঞ্চালি।

তবু, বাঙলা মাস, ঋতু এবং বাঙালীসুলভ। বহু আচার-আচারণের বর্ণনাই কবির মৌলিকতার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করেছে।

পীর প্রশস্তি ও পীরের পরিচয়

কবির পীবের নাম বদরউদ্দীন শাহ। আলোচ্য গ্রন্থের দু জায়গায় পীরের রূপ গুণ বর্ণিত রয়েছে ঃ

ক. শান্তদান্ত গুণবন্ত যেহেন লোকমান
ধৈর্যবন্ত ধীর স্থির পৃথিবী সমান।
প্রসন্ন হৃদয় তান যেহেন মুকুর
কে কহিতে পারে তার বাখানের ওর।
শাহা বদরউদ্দীন পরি কৃপাকুল হরি।
শতমুখে সেই বাখান কহিতে না পারি।
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া
রচিলেন্ত মুজাম্মিলে মনে আকলিয়া।

খ. প্রেমের সাগর গুণে রত্নাকর
রূপে যেন পঞ্চবাণ।—
শাহ বদরউদ্দীন নিরঞ্জন লীন
ভবকল্পতরু আশা—
চরণ যুগলে হীন মুজাম্মিলে
তোহ্মারে করম ভকতি
মোর মনোরথ গোপত বেকত
তুহ্মি বিনে নাহি গতি।

এ ছাড়া পুথিতে পীরের আর কোনো পরিচয় নেই।

ক. আমাদের 'আদর্শ' প্রতিলিপির লিপিকাল ১৬৭৯ শক তথা ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ১১৯ সংখ্যক পুথিতে লিপিকাল না থাকলেও এর কাগজ ও লিপি দেখে মনে হয়, এটি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে অনুলিখিত। ক্রমিক ২৩৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি তত পুরোনো না হলেও এর পাঠ প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। (যেমন বুলৌক, লুকেঁ ইত্যাদি) অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিটিও হিন্দুয়ানি রীতিতে অগ্রথিত পত্রে লিখিত এটিও প্রাচীনতা দ্যোতক ;

খ. এ রচনার আর একটি বিশেষত্ব 'র' ও 'ল' এর পদান্ত মিল
এটি প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। যথা ঃ
ঘর-বহল আখেরে-মিলে, গোসলে শরীরে আওয়ালে ভিতরে, নির্ভরে
আওয়ালে-আখেরে, বিস্তরি-পঞ্চালি, কতুহলে—উপরে।

একস্থানে ল-ন-এও মিল দেয়া হয়েছে ঃ সকল-খণ্ডন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (প্রকৃত নামঃ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ] 'র' ও 'ল'-এ এমনি পদান্ত মিল প্রচুর রয়েছে।

গ. 'প্রভু' অর্থে 'হরি' শব্দের ব্যবহারও প্রাচীনতার ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় ঃ
শাহ বদরউদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি।

ঘ. কবি বলেছেন ঃ

১. নিজেদের 'বুলি' ভণিলুঁ পঞ্চালি
লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে।
দেশীভাষে কৈলুঁ পয়ার রচন।
যে বলে বলৌক লোকে করিলুঁ লিখন।

২. আরবিব ভাষে লোকেঁ না বুঝে কারণ

মুসলমানের কাছে বাঙলা ছিল 'হিন্দুয়ানি ভাষা'। ষোল-সতেরো শতক অবধি এ ভাষায় শাস্ত্রকথা লিখন নিন্দনীয় ও পাপজনক ছিল। শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯), সৈয়দ সুলতান (১৫৮৪-৮৬) হাজী মুহম্মদ (১৫৮০-১৬০০), আবদুল নবী (১৬৮৪), শেখ মুত্তালিব (১৬৩৯) রজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিম প্রমুখ কবির রচনায় বাঙলাভাষার প্রতি মুসলমানদের অবজ্ঞার এবং 'শাস্ত্রকথা' বাঙলায় 'লিখনের পঠনের ও কথনের নিন্দার প্রতিবাদ আছে। আঠারো শতকের

মুসলমানদের রচনায় এ সমস্যার উল্লেখ দেখা যায় না।[১] এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুজাম্মিলকে ষোল শতকের কবি বলে স্বীকার করা চলে।

এবার গ্রন্থবহির্ভূত তথ্যের আলোকে আলোচনা করা যাক ঃ

ক. গুলে বকাউলির কবি মুকিম (উনিশ শতকের প্রথমপাদ) তাঁর পূর্ববর্তী চট্টগ্রামবাসী কবি হিসেবে মুজাম্মিলের নামোল্লেখ করেছেন ঃ

আর বৃদ্ধ মহাশক্য আবদুল নবী নাম
গআছক, মুজাম্মিল সুধীর উপাম।[২]

খ. পীর বদরউদ্দীন বদর-ই-আলম চট্টগ্রাম আবাদ করেছেন বলে প্রবাদ আছে। তিনি চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিলেন বলেও কিংবদন্তী রয়েছে। এতে অনুমান করা চলে যে, তিনি চট্টগ্রামে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের বুকে 'বদরচেরাগ' ও 'বদরপাতি' নামের কৃত্রিম সমাধিটিও আমাদের এ অনুমানের অন্যতম অবলম্বন। কাজেই ডক্টর হকের অনুমান ও সিদ্ধান্ত সত্য হতেও পারে। তবে মুজাম্মিল পনেরো শতকের কবি কি-না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তিনি যে ষোল শতকের পরবর্তীকালের লোক নন, সে বিষয়ে সংশয় থাকার বিশেষ কোনো গুরুতর কারণ নেই, এ সত্য বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়। তাই আমরা মুজাম্মিলকে ষোল শতকের কবি বলে স্বীকার করে নিলাম।

মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তায় ঃ গৃহ নির্মাণ, খঞ্জন বাখান, স্নান বাখান, নববস্ত্র, ভূমিকম্পা, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে, এখানে বিষয়বস্তুর আভাস দানের জন্য কিছু উদ্ধৃত হল ঃ

গৃহনির্মাণ ঃ ১. শ্রাবণ মাসেত যদি কেহো বান্ধে ঘর
সেই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর।
মাধবী মাসে ত নব মন্দির বান্ধিব
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী সব তাহার বাড়িব।

২. আদিত্য বারে যদি সে গৃহ নির্ম এ
অনলে দহিবে কিবা ঝড়েতে ভাঙ্গএ।
সোমবারে গৃহ যদি বান্ধে কোন নর
সুত না জন্মিব সুতা জন্মিব সে ঘর।।

নববস্ত্র রবিবারে কেহো যদি ফাড়এ বসন
মনো দুঃখ কভু তার না যাএ খণ্ডন।।

এসব সংস্কারে সত্যের, তথ্যের আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্পর্কও যে নেই তা নয়। যেমন আষাঢ় মাসে বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বর্ষাকালে এমনিতেই

মনুষ্য থাকিতে যদি নিরমিল ঘর
সেই ঘরেতে মশক হইব বহুল।

মশার উপদ্রব বাড়ে, তার উপর নতুন ঘরের স্যাঁতসেতে মেঝের মশা যে আসর জমাবে, তা তো জানা কথাই।

আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ রাত্রি অন্ন খাই দুই বিশ কাঞিক দিব
খর্ব খর্ব কাঞিক দিব হাঁটিব সত্বব।

তুলনীয় ঃ আফটার সাপার ওয়ক এ মাইল।

---

১. *পুথিপরিচিতি এবং বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য (১ম খণ্ড)।*

২. *মৎসম্পাদিত মুজাম্মিল রচিত 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত, দ্রষ্টব্য।*

মুজাম্মিল যদিও বলেছেন, আরবি হাদিস গ্রন্থই তিনি অনুবাদ করেছেন, তবু তবু তিনিও যে মুফতির আসনে বসে নিজেই বহু ফতোয়া হেঁকেছেন, তার প্রমাণ রচনার সর্বত্রই মিলবে। আসলে কবি বাঙলাদেশের মুসলমানদের আচারিক জীবনশাস্ত্রই রচনা করেছেন।

ছ. আবদুল হাকিম

ইউসুফ-জোলেখা ও লালমোতি-সয়ফুলমুলুক নামের প্রণয়োপাখ্যান প্রণেতা শাহ আবদুর রাজ্জাকপুত্র ও পীর মুহম্মদ শাহাবউদ্দীনের মুরিদ কবি আবদুল হাকিম পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে তিন চারখানি ইসলামি তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ঃ সভারমুখতা, নসিয়তনামা বা শাবাবনামা তথা শাহাবউদ্দীননামা এবং দোবরেমজলিস। এ সঙ্গে ভণিতাহীন চারিমোকামভেদও তাঁর রচনা বলে অনুমান করা হয়। নূরনামা আদি নূর বা জ্যোতিরূপী হযরত মুহম্মদ সৃষ্টি বিষয়ক রচনা। আবদুল করিম খোন্দকারেরও নূরনামা বা নুরফরামিশনামা নামেরও এরূপ একটি রচনা রয়েছে। আবার আবদুল করিম খোন্দকারের দুল্লামজলিস আর হাকিমের দোররে মজলিস একই বিষয়ক রচনা। নসিহতনামারই অপর নাম শাহাবউদ্দীননামা। কবি স্পষ্টত বলেছেন ঃ

আবদুল হাকিম শাহা রাজ্জাক-নন্দন রাখিলাম শাহার (পীরের) নামে
রচিল কিভাবে যেবা ছিল বিবরণ। পুস্তকের নাম
শুনিতে বাড়এ পুণ্য বাক্য অনুপাম।

শাহাবউদ্দীননামার পাণ্ডুলিপি (১১´´×৭´´) ১৪৫ পত্রে সমাপ্ত। অতএব গ্রন্থটি ছোট নয়। মনে হয় আবদুল হাকিম দরবেশ বা পীর পিতা শাহ রাজ্জাক ও পীর মুহম্মদ শাহাবউদ্দীনের আগ্রহেই এ শাহাউদ্দীননামা বা নসিয়তনামা রচনা করেছেন—

শাহা রাজ্জাক শাহাবুদ্দীন বচন আবদুল হাকিম শাহা রজ্জাক-নন্দন
কোটি কোটি প্রণাম করিএ একমন, রচিল কিতাবে যেবা ছিল বিবরণ।

এবং তাঁদের উপদেশও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

শাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ পীর গুণবান নসিয়ত কৈল মোরে যেসব প্রকার
মোহর তিমির গৃহে দীপক সমান।— ভাল মনুষ্যের তরে রচিল পয়ার।

এ গ্রন্থে নামাজ, রোজা, ধনসম্পদ, নারীর ইজ্জত, বিদ্যা, কুকুর পোষার পাপ (কুকুর পালএ যেবা কুকুর নন্দন) প্রভৃতি বিষয়ে সুকর্ম ও দুষ্কর্ম কি তা শরীয়ত অনুসারে কবি ব্যাখা করেছেন, পাঠককে বলেছেন—

আএ ভাই শাস্ত্র পড়ি করহ আমল . জীবন যৌবন ধন জান অকারণ
মানব দুর্লভ জন্ম না হইয়া বিফল। নিজ গৃহ দীপ্ত কর শাস্ত্রে দিয়া মন।

তবু সেকালের নিয়মানুসারে কবি কায়াতত্ত্ব এবং কায়সাধনতত্ত্ব হয়তো আলোচনা করেছেন, তার জন্যে প্রয়োজন ঃ

শরিয়ত তরিকত কিবা হকিকত সাফল্য করিতে নিজ ভবের জনম।
সাধিয়া এসব অর্জিবারে মারফত। সবেরে জানিব মুখ্য আপ্ত জানি কম।

আল্লাহর নূরে মুহম্মদ সৃষ্ট, তাঁর নূরে জগৎ ও জাগতিক সব প্রাণী ও জড়বস্তু সৃষ্টি-এমনি এক বিশ্বাস মুসলিম মনে বদ্ধমূল। এ নূরতত্ত্ব মূলত অদ্বৈতবাদ ও সূফীমত প্রসূত। মুসলিম সমাজে চালু লৌকিক তত্ত্ব এই ঃ আল্লাহ বলেছেন মুহম্মদকে 'যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে জগতও সৃষ্টি করতাম না' অর্থাৎ তোমার প্রতি প্রীতিবশেই তোমার খাতিরেই সৃষ্টিকর্মে আমার এ আগ্রহ।

নূরনামায় বর্ণিত পর্বগুলো এই ঃ আল্লাহস্তুতি, রসুলপ্রশস্তি, বাঙলা ভাষায় গ্রন্থরচনার কৈফিয়ত, নূরনবী মুহম্মদ সৃষ্টি, দশ সমুদ্র সৃষ্টি ও সমুদ্র মধ্যে নূর বীর সাধনা, নুর-ই মুহম্মদ থেকে সৃষ্টির উদ্ভব, চতুর্ভূতের (আব-আতশ-খাক-বাত) সঙ্গে মুহম্মদের কথোপকথন, কলমপ্রসঙ্গ, কলেমা মাহাত্ম্য, নূরনামা গ্রন্থের মাহাত্ম্য, নূরনামা গ্রন্থের প্রতি ইমামগাজ্জালী ও সুলতান মাহমুদের শ্রদ্ধা, মুহম্মদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টির রহস্য ও নূরনামা গ্রন্থ পাঠের সুফল। আবদুল হাকিমের নূরনামা আরবির অনুকরণে অভিন্ন নামের হিন্দি গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ।

আবদুল হাকিম শাহা রজ্জাকনন্দন
রচিল পঞ্চালী নুরনবীর সৃজন।
নূরনামা কিতাব দেখি করিল বচন।
কিতাবে বৃত্তান্ত সব আছএ লিখন।।

হিন্দিগ্রন্থ রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। হিন্দিগ্রন্থে গাজ্জালী রয়েছে, হাকিমের গ্রন্থেও অভিন্নরূপে তা বিদ্যমান। এতেই মনে হয় হিন্দি গ্রন্থটিই ছিল আবদুল হাকিমের অবলম্বন। উনিশ শতকের দোভাষী শায়ের মুহম্মদ খাতেরের নূরনামায় গাজ্জালী ও মাহমুদের কথা নেই এবং বর্ণিত বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও হাকিমের ও খাতেরের অবলম্বন অভিন্ন গ্রন্থ ছিল না। 'নূরনামা' আরবি 'ক্বাসিদাতুল বুর্দা' শ্রেণীর গ্রন্থের অনুসৃতি।

নূরনামায় বর্ণিত সৃষ্টির উৎস প্রেম। শূন্যকায় আল্লাহ ছিলেন শূন্যে ঃ

শূন্যেত আছিল প্রভু শূন্যময় কায়।
হেতুমূলে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর
ভাবসিদ্ধি উপজিলা প্রেম বন্ধুনূর।
তিমিরে প্রচণ্ড জ্যোতি সয়াল সম্পদ
প্রভুর পরম বন্ধু নূর মুহম্মদ।

প্রভু নূর মুহম্মদকে বলেন ঃ

সৃজন হইলা মোর প্রেমের প্রতাপে।
একেশ্বর নির্বন্ধের আছিলাম আপে।

বাঙলা ভাষায় ধর্মকথা রচনা প্রসঙ্গে কবি-প্রদত্ত যুক্তি ঃ

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মন হাবিলাষ।
নূরের সৃজন মর্ম আদ্য পরস্তাব
শুনিবারে শ্রধা অতি না বুঝি কিতাবে।
তেকাজে নিবেদি বাঙ্গালাএ করিয়া রচন
নিজ পবিশ্রমে তোষ আমি সর্বজন—
আরবি ফারসি কিবা শাস্ত্র হিন্দুয়ানী
সর্বশাস্ত্রে লিখে আল্লা নবীর কাহিনী।—
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিঞ্জরন।
যার যেবা নিজ বাক্যে প্রভু আরাধএ
পদুত্তর দেন্ত প্রভু আপনে লক্ষএ।—
হিন্দুয়ানী অক্ষরে বয়ানমুসলমানী
লিখিয়া বুঝিল তত্ত্ব পণ্ডিত বাখানি।—
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেবগণ।
যেসবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়াএ
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যাএ।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনহিত অতি।
নিজ দেশী ভাষা এ করি গ্রন্থ সকল
আমি সব আগে কর সঙ্কট কুশল।

'চারিমোকামভেদে' ভণিতা নেই, সাহিত্যবিশারদ এটিও আবদুল হাকিমের রচনা বলে অনুমান করেছিলেন মাত্র। অনুমানের কারণ ছিল দুটো—চারিমোকামভেদ নসিয়তনামার পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একত্রে বাঁধা ছিল, এবং বক্তব্যেও পারম্পর্য বা প্রাসঙ্গিকতা ছিল।

এখানে চারমোকামভেদ-এর প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

শরিয়ত তরিকত হকিকত মারফত
একে একে সে সকল কহিএ বেকত।
শরিয়তে কলেমা মুখে কহিব নিশ্চএ
তরিকতে নামাজ রোজা করিব সদাএ।।
শরিয়ত কিস্তি তরিকত পাল।
হকিকত নোঙ্গর মারফত পাতয়াল (করুয়াল ?)
হকিকতে হালত ধেয়ান নিঞ্জরন
মারফতে পাইবেক আল্লার দর্শন।

যোগসাধন ঃ

এবে কহি যেই মতে যোগ সাধিবেক
এচারি মোকামের ভেদ যেমতে পাইবেক।
প্রথম মোকাম জান নাসুত কহএ
শরিয়ত মোকাম নাম জানিঅ যে তাএ।
শরিয়ত যত কর্ম পূর্বে লিখিয়াছি
তাহার প্রকৃতি সব আগে প্রচারিছি।
পুনি কহি যেন মতে সাধক মোকাম
নাসুত মোকাম জান মৃত্তিকার ঠাম।

অন্য সব মোকামকথা শেষ করে কবি হাহুত মোকাম সম্বন্ধে বলছেন ঃ

হাহুত মোকাম কথা সব শূন্যাকার
পীরমুর্শিদের আজ্ঞা নহি আছে তার।
গুপ্তবিচারিতে ত্যাত নিষেধ আছএ
তেকারণে সেই কথা নহি বিস্তারএ।

'চারিমোকামভেদ' সূফী সাহিত্যের অন্তর্গত দোররে মজলিস এবং দুল্লামজলিস 'জীবনচরিত' শাখায় আলোচ্য।

মুহম্মদ আকিলের 'মুসানামা' [সওয়াল সাহিত্য অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য] এবং মুহম্মদ খানের সত্যকলিবিবাদসম্বাদ [জঙ্গনামা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য] এক হিসেবে মুসলিম ধর্মসাহিত্যই।

জ. সৈয়দ নুরউদ্দীন

সৈয়দ নুরউদ্দীন আঠারো শতকের শেষার্ধের লোক এবং গ্রন্থগুলো আঠারো শতকের শেষ দশকে ও অন্তিমলগ্নে রচিত। সৈয়দ নুরউদ্দীন ১. দাকায়েক আখবার, ২. রাহাতুল কুলুব বা কেয়ামত নামা,৩. বুরহানুল আরেফিন বা হিতোপদেশ এবং মুসার সওয়াল রচনা করেছেন। এখন সংশয়ের কথা এই যে এসব গ্রন্থ অভিন্ন নামের দুই কবির রচনা, নাকি একজনের? এতোকাল আমরা সৈয়দ নুরউদ্দীনকে চট্টগ্রামবাসী বলে জানতাম এবং তার পিতার নাম আজিজ। সৈয়দ নুরুউদ্দীন কয় আজিজ নন্দন।'

এখন 'দাকায়েক-এর এক পাণ্ডুলিপিতে এর পূর্বপুরুষ পরম্পরার নাম মিলেছে ; গৌড়বাসী সৈয়দ আলি / সৈয়দ রাজা-সৈয়দ মীর এর পুত্র সৈয়দ হাসান।

[চট্টগ্রামের চকরিয়ায় ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বসতি স্থাপন করেন।] সৈয়দ আবদুল্লাহ / সৈয়দ আবদুল কাদির / সৈয়দ আতাউল্লাহ / সৈয়দ নুরউদ্দীন। এ আত্মবিবরণীসূত্রেও কবি সৈয়দ নুরুউদ্দীনকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে সনাক্ত করা সম্ভব। অন্য সূত্রে জানা যাচ্ছে যে চট্টগ্রামের খন্দকিয়া বা আম্বিরাবাদে কিংবা মির্জাপুরে ছিল কবি সৈয়দ নুরুউদ্দীনের নিবাস। এবং তাঁর পিতার নাম আতাউল্লাহ—আজিজ নয়। ডক্টর খন্দকার মোজাম্মিল হক সৈয়দ নুরুউদ্দীনের গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

কবির পীর ছিলেন ঢাকার আজিমপুর দায়রাশরীফের (পীরবাড়ির) সূফী মুহম্মদ দাইমের শিষ্য শাহ মুহম্মদ জাহিদ ঃ

সূফী মুহম্মদ দাইম দরবেশ আল্লার
জাহিঙ্গনগরে বসি ভাব করতার।
তান শিষ্য মুহম্মদ জাহিদ দরবেশ
সদায় আল্লার ভাবে মগ্ন তনুশেষ।—
এত দেখি শাহ জাহিদের পদে যাই
বিকাইলুঁ এ জন্মেত আল্লার নাম পাই।

দাকায়েক আখবার রচনা শুরু হয় ১১৯৭ বঙ্গাব্দে বা ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে এবং সমাপ্ত হয় ১২০৩ সালে বা ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে।

'এগারশ' সাত্তানব্বই সন হৈল যবে।
পুস্তক বাঙ্গালা কৈলুঁ শুন নর সবে।
পুস্তকের বয়াতে যত লিখা যাএ
কদাঞ্চিৎ এক মিথ্যা না বুঝ সভাএ—
বারশ তিন সনে পুস্তক লিখা যাএ
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিব সভাএ।

দাকায়েক আখবার আরবি 'কঞ্জু দাকায়েক' নামের ফিকাহ গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ। আরবি গ্রন্থটির রচনাকাল ৭১০ হি বা ১৩১০ খ্রীস্টাব্দ। রচয়িতার নাম হাফিজউদ্দীন আবুল বরকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ নফসী। বর্ণিত বিষয়গুলো বাইশ বাবে বা পর্বে বিভক্ত।

কিতাবেতু রচি কহি পঞ্চালী কথন
বিংশ দুই বাব লেখে কিতাব মাজার।
একস্থানে সব বাব কহি একবার।

মৃত্যু, মৃত্যুর জিকির, বুহর তফসীর, প্রাণ হরণ, আজরাইল, ইব্লিস ও মুমূর্ষুর প্রয়াণ, রুহর দুঃখ, সবর, মৃত ও ফিরিস্তা, গোর-যন্ত্রণা-মনকির-নকির, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার, ইস্রাফিল ও সিঙ্গা, বোররাক, মৃতস্নান, কাফন, মৃতের কল্যাণে দান ইত্যাদি উক্ত বাইশ বাবে [দ্বারে] বা পর্বে বর্ণিত। সৈয়দ নুরউদ্দীনের সব গ্রন্থই কোলকাতার বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

ডক্টর মোজাম্মিল হকের মতে মুসার সওয়াল নুরুউদ্দিন রচিত নয়। এবং মুবদানুল আরেফিন-এর অনুবাদই দাকায়েতুল আখবার।' আর বুরহানুল আরেফিন মুহম্মদ কামিল। রচনাকাল ১২০৩ সাল।

২. রাহাতুল কুলব (বা কেয়ামতনামা) এটি নাকি মূলত বুরহানুল আরেফিনের অংশ

এ গ্রন্থের অবলম্বন আরবি ও ফারসি অনেক কিতাব ঃ

নানামত তফসীর লেখা ছিল পরস্তাব
রাহাতুল কুলুব নামে আছিল কিতাব।
কারাহুল বকায়া আর আসহাবুল শাহাদাৎ
উমাদাতুল ওয়াইজ আর তাতে ফতেহুল আলি

আবদুরু উমদাতুল আজিজ আর হেদায়া
ফাতেহল আলি আউল উলুমত এর শিবস যাওয়া
কুঞ্জ আরাদি আর সালাত মসউদি
আর বহু কিতাবে রোয়ায়াত সুধি।
দেশী ভাষে কহিতেছি গুণিগণের ঠাঁই।

এ গ্রন্থ উনিশ বাবে তথা দ্বারে বা পর্বে সমাপ্ত।

১. বাণ ঋতু বসু দিয়া বাব কৈলুঁ সার
একস্থানে সব বাব কহি একবার।[১]
(৫+৬+৮=১৯ বাব)
২. বাণ শর বসু আদি বাবে কৈল সার।
একস্থানে সব বাব কহিত্র সুমার।[২]

(৫+৫+৮+১=১৯ বাব)
প্রথম বাবে ত জান কেয়ামত বাণী
দ্বিতীয় বাবে ত কেয়ামতের ভয়ভীতি কথা
তৃতীয় বাবেত দোজখের কথা—

এমনি করি কেয়ামত ভিহিস্তের দোজখের কথা, মাতাপিতার কথা, সুদখোরের কথা, রোজা-নামাজের কথা, সুরার কথা, সওয়াব-নামাজ, কোরান পাঠ, রোজার পুণ্য, স্ত্রী-পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য, মিথ্যাভাষণ, পরচর্চা, হিংসার বা হাসদের কথা, নেকির বয়ান, ক্ষমা সংযম, নসিয়ত এবং

নবদশ বাবে শুন নানা পরস্তাব।
এই মতে বহু কথা কিতাবে খবর
সে সব রচিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
সৈয়দ নুরউদ্দীনে কহে ভাবি চাহ মন
দুনিয়ার সম্পদ সুখ নিশির স্বপন।

একটি দুর্বোধ্য রচনা-তারিখ রয়েছে ঃ

সন সংখ্যা বুঝিবেক মনে করি জ্ঞান
চন্দ্র শশী আগে করি গুণ পাছে জান
তার পাছে গোর (?) আনি একত্র করিয়া
মঘদের সন সংখ্যা বুঝ বিমর্সিয়া।[৩]
(চন্দ্র–১ শশী–১, গুণ-৩, গোর-৮ কবর-০
১১৩১+৬৩৮=১৭৬৯ খ্রীঃ

---

১. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৭৯-৮০।
২. ঐ পৃঃ ৪৭৮।
৩. পুথি পরিচিতি, পৃ: ৪৮৮-৮৯।

৩. রাহাতুল কুলবের অংশ আত্মা ও কেয়ামত বিষয়ক গ্রন্থ। এটির রচনাকাল

'বারশ তিন' সনে পুস্তক লিখা যায়।
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিবে সবাএ।
বোরহানুল আরেফিন কিতাব দেখিয়া
কহিলুঁ হিতোপদেশে বাঙালা রচিয়া।

১২০৩ বঙ্গাব্দ হলে ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দই রচনাকাল। এটি তত্ত্ব গ্রন্থ পর্যায়ে আলোচ্য।

৪. মুসার সওয়াল ঃ মাত্র বাবো পাতাব এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে নবী মুসার ও আল্লাহর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব বিষয়ক সংলাপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বর্ণিত। এটি কোন পৃথক গ্রন্থ নয়,দাকায়েকুল আখবারেরই একটি পর্ব -২২তম বাব।

মুসার নিবেদন শুনি প্রভু করতার
কৃপাযুক্ত হই তবে লাগে কহিবার।
সওয়ালের বিবরণ কিতাবে দেখিয়া।
রচিলেক নুরুদ্দিন প্রভুকে ভাবিয়া।

এ গ্রন্থ সওয়াল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম একে দাকায়েকুল আখবারই একটি পর্ব বলে অনুমান করেছেন।

ক. নসরুল্লাহ [খান] খোন্দকার

হযরত আলির যুদ্ধ বৃত্তান্ত 'জঙ্গনামা', 'শরীয়তনামা' ও 'মুসার সওয়াল' রচয়িতা নসরুল্লাহ খোন্দকার চট্টগ্রামের আধুনিক বাঁশখালি থানার অন্তর্গত জলদী গ্রামবাসী ছিলেন। কবি নিঃসন্তান ছিলেন, তবে উক্ত গ্রামে তাঁর ভ্রাতৃবংশীয়রা আজো বর্তমান। কবিরচিত জঙ্গনামা সংগৃহীত হয়নি। তবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ডুমোরিয়া গাঁয়ের আমীর আলী চৌধুরীর বাড়ির 'জঙ্গনামা' পুথিতে কবির যে দুটো বংশ পরিচিতি পেয়েছিলেন তা এরূপ ঃ

১. ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পিতামহ হামিদুল্লাহ খান
তান পুত্র কল্পতরু বোরহানুদ্দীন জগগুরু
রূপ তার ইউসুফ সমান।
মহীপাল রোসাঙ্গের ধবল মাতাঙ্গিবর
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে
তান পুত্র মহাবীর অস্ত্রেশস্ত্রে রণে স্থির
ইব্রাহিম খান নাম ধরে।
তান পুত্র জ্ঞানবান শ্রী সুজাউদ্দীন খান
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান মেলা
অনেক গ্রামের পতি যাকে কৃপা করি অতি
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা।
তান পুত্র রূপবান শ্রীযুত বাবু খান
অবিরত ফকিরিতে মন
তেজিয়া সংসার মায়া প্রভুভাবে চিত্ত দিয়া
করিলেন্ত আগমে গমন।
আছিলেন পুত্র তান শ্রী ইসহাক খান
শরীয়ত খাদেম প্রধান
তান পুত্র শীল ধর্ম সৈদানী উদরে জন্ম
শরীফ মনসুর গুণবান।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান হীন নসরুল্লাহ খান
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি
শুনি সব গুণিগণ কৌতূহল করি মন
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি।

২. কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেত বিজ্ঞান
পিতামহ কাজী ইসহাক গুণবান
তান পুত্র শরীফ মনসুর খোন্দকার
রাষ্ট্রদেশ নরপতি নামে ফতে খান
যাকে মান্য করি বসাইল বিদ্যমান
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত
আনিলেক দিল্লীশ্বরব্যূহে যেবা গিয়া।
হেন জনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান
নমাজ করন্ত সাঙ্গ যত মুসলমান।
যাহার মধুরস্বরে খোতবা শুনন্ত
যাহাকে আলিমসব নিতি প্রশংসন্ত।

যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত।
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া

তান পুত্র নসরুল্লাহ আমি হীন জ্ঞান
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান।

'শরীয়তনামা' থেকে ডক্টর আবদুল করিম বিধৃত পাঠ ঃ

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
নামে হামিদ্দীন মতিমান
গৌড়দেশ বাঙ্গালা নাম রসে কষে অনুপাম
সে ব্যূহপাল উজীর প্রধান।
তান পুত্র গুণবান অস্ত্রেশস্ত্রে পূজ্যমান
জগে ঘোষে বুরানুদ্দীন নাম
দৈবগতি দেশ ছাড়ি ইষ্টমিত্র সঙ্গে করি
রোসাঙ্গ দেশেত কৈল ধাম।
তখনে রোসাঙ্গ দেশে কিবা আদ্যে কিবা শেষে
অশ্ব আসোয়ার না আছিল
হয় গজ বহু সঙ্গে দেখি তানে নৃপ রঙ্গে
লস্কর উজির তানে কৈল।

ইব্রাহিম তান সুত রূপেগুণে অদ্ভুত
অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ
সুজাউদ্দীন নাম অস্ত্রেশস্ত্রে অনুপাম
নাম ধরে তাহান নন্দন।
শেখ রাজা তান পুত্র প্রভুগতে সুপবিত্র
লোকে ঘোষে ফকির মোড়ল
তান সুত গুণধাম কাজী ইসহাক নাম
ছিল দীন তা হন্তে উজ্জ্বল
তাহান ঔরসে কর্ম সৈয়দানী গর্ভে জন্ম
শরীফ মনসুর খোন্দকার।
নসরুল্লাহ সুত জান (তান) হীনবুদ্ধি পশুজ্ঞান
রচিলেক পঞ্চালী পয়ার।

'শরীয়তনামা' থেকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিধৃত পাঠ :

ধর্মবন্ত ধৈর্যবন্ত– মর্যাদার নাহি অন্ত
নাম হামিদুদ্দীন খান জান
গৌড়দেশে বাঙ্কুনাম দুইশিক অনুপাম
সৈন্যপাল উজির প্রধান।
তানপুত্র আগুয়ান অস্ত্রেশস্ত্রে অনুমান
জগ ঘোষে বোরহানুদ্দীন খান
দৈবগতি দেশ ছাড়ি অষ্টমিত্র সঙ্গে করি
রোসাঙ্গ দেশেত কৈল গাম।
তখন রোসাঙ্গ দেশে কিবা আদ্যে কিবা শেষে
অশ্ব আসোয়ার না আছিল
হয়গজব্যূহ সংখ্য দেখি তানেনৃপমুখ্য
লস্কর উজির তানে কৈল।

ইব্রাহিম তান সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ।
শ্রীসুজাউদ্দীন খান অস্ত্রেশস্ত্রে অনুপাম
নাম ধরে তাহান নন্দন।
বাবু খান (সেক রাজা) তান পুত্র প্রভুগত সুপবিত্র
লোকে বলে ফকির মোড়ল
তানসুত গুণবান কাজী ইসহাক খান
তাহার ঔরসকর্ম সৈয়দানী গর্ভে জন্ম
শরীফ মনসুর খোন্দকার
নসরুল্লাহ সুত তান হীনবুদ্ধি অল্পজ্ঞান
রচিলেক পঞ্চলী পয়ার।

ডক্টর আবদুল করিম ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিধৃত পাঠে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ঘটে ঃ

বাঙ্গালা	বাঙ্কু
নৃপরঙ্গে	নৃপমুখ্য, রঙ্ক
শেখ রাজা	বাবুখান ওর্ফে শেখ রাজা
রসেকষে অনুপাম	দুই শিক অনুপাম
ইষ্টমিত্র	অষ্টমিত্র

এগুলোর মধ্যে বাঙ্গালা ও বাঙ্কু, রসেকষে ও দুই শিকই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। তাহলেও কবি পরিচিতি ক্ষেত্রে এগুলো তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তবু দুই বিদ্বান স্ব স্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কবি পরিচিতি অত্যন্ত জটিল করে তুলেছেন।[১]

১ক. শরীয়তনামা : ডক্টর আবদুল করিম সম্পাদিত, ভূমিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের পাণ্ডুলিপি পত্রিকায় প্রকাশিত, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৮১ সাল।

খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ: ১৭০-৭৮।

সাহিত্যবিশারদ বিধৃত 'জঙ্গনামা'র কবির বংশপরিচিতি থেকে জানা যায় এক প্রখ্যাত ধনীমানী হামিদউদ্দীন খানের পুত্র ইউসুফ সম রূপবান এবং গুণবান এবং আরাকানরাজের প্রশংসাপ্রাপ্ত বুরহানুদ্দিন-এরঁ পুত্র রণনিপুণ ইব্রাহিম খান-এঁর পুত্র জ্ঞানবান সুজাউদ্দিন খান-এঁর পুত্র মরমী ফকির বাবুখান ওর্ফে শেখ রাজা-এঁর পুত্র ইসহাক খান আলিম ও কাজী ছিলেন-এঁর পুত্র শরীফ মনসুর পেশায় খোন্দকার (মক্তবের শিক্ষক) এবং তাঁর পুত্র আমাদের কবি নসরুল্লাহও পেশায় খোন্দকার ছিলেন। অতএব কবি ছিলেন খানবংশীয়। তাঁর পিতামহ ছিলেন কাজী, তাই সাধারণ্যে ইসহাক কাজীরূপে এবং কবির পিতা ও কবি স্বয়ং বৃত্তি অনুযায়ী খোন্দকার রূপে পরিচিত ছিলেন। তাই তিন পুরুষ ধরে তাঁরা 'খান' রূপে পরিচিত ছিলেন না। এ জন্যে 'নসরুল্লাহ খোন্দকার' নামই ভণিতায় পাচ্ছি। মনে রাখতে হবে কবি পারিবারিক শ্রুতিস্মৃতি সূত্রেই ফতেহ খান ও রোসাঙ্গের নৃপতির সম্বন্ধে শুনেছিলেন। কাজেই কবির বর্ণিত ব্যক্তিদের অঞ্চলের অন্য এক প্রখ্যাত ব্যক্তি (যিনি দিল্লীর সম্রাট থেকে কয়েকটি গ্রামের মালিকানা সনদ লাভ করেছিলেন) কবির পিতা শরীফ মনসুর খোন্দকারকে বিশেষ সম্মান করতেন এবং শেষোক্ত জমিদার শরীফ মনসুরকে ইমাম করে জামাতে নামাজ পড়াতেন। 'শরীয়তনামা' সূত্রে জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষ হামিদউদ্দীন খান গৌড় দেশে ওর্ফে বাঙলাদেশে (বাঙ্গালানাম' কবির আঠারো শতকে আবির্ভাবের ইঙ্গিতবাহী) ব্যূহপাল বা সৈন্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র বুরহানুদ্দীন দৈবগতি গৌড় ছেড়ে বিপন্ন অবস্থায় সপরিজন (ইষ্টমিত্র) আরাকানরাজ্যে আশ্রিত হয়ে আরাকান রাজের আগ্রহে এই প্রথম আরাকান বাহিনীতে অশ্বারোহী সৈন্য সৃষ্টি করে তিনি লস্কর উজির হন। তাঁর পুত্র ইব্রাহীমও অশ্বারোহী সৈনিক দলে ছিলেন, ইব্রাহিম-পুত্র সুজাউদ্দীনও সৈন্য ছিলেন। সুজাউদ্দীন-পুত্র দরবেশ হলেন, তাঁর পুত্র ইসহাক কাজী হলেন এবং তাঁর পুত্র শরীফ মনসুর ও পৌত্র নসরুল্লাহ হলেন খোন্দকার। কিন্তু সাহিত্যবিশারদ আরো কোন এক সূত্রে নসরুল্লাহর বংশলতা সংগ্রহ করেছিলে একটি ফুলস্কেপ কাগজে লেখা সেটি এরূপ ঃ

গৌড় নামে এক দেশ সুখ ভোগে মহারস
তথা বসে এক অধিকার
দানে ধর্মে পুণ্যবান অস্ত্রশস্ত্রে জ্ঞানবান
পাত্র এক আছিল তাহার।
হামিদউদ্দীন খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
নৃপসঙ্গে বিবাদ করিয়া
বহু গজ অশ্ব সঙ্গে পুত্র দারা লয়ে রঙ্গে
চলিলেন সে দেশ ত্যাগিয়া।
রোসাঙ্গ দেশেত গেলা নৃপ আগে বাড়াই
নিলা
বিষয় নিলেক যদি কাড়ি
তান পুত্র ইব্রাহিম রণমধ্যে সহি ক্ষেম
বিষয় লইতে চাহে ফিরি।
নৃপতি না দিল যবে অশ্ববার সঙ্গে তবে
বিষয় লইতে চাহে মারি।
নৃপ সঙ্গে যুদ্ধ দিল রণে যদি না আটিল
একে একে হইল নিধন
তান এক পুত্র ছিল লোহারাতে দিয়াছিল
পড়িবারে গুরুর ভবন।
সুজাউদ্দীন খান নাম শিশু বড় গুণধাম
মান্য করি নিকটে বসাইল
অশ্ববার সব সঙ্গে রাখিলা নিকটে রঙ্গে
লস্কর উজির তানে কৈল।
বোরানউদ্দীন নামে সুত রূপেগুণে অদ্ভুত
হামিদউদ্দীন যদি মৃত্যু পাইলা
গজ অশ্বসহ তারে নৃপ মোক্ষ (মুখ্য)
কৈল্য তারে
বোরানউদ্দীন যদি সে মরিলা।
গজ-অশ্ব সওয়ার একে ধন দিয়া
নৃপতিকে
রাজু খান বলে যারে ফকির মরল (মোড়ল)
তারে
বলেন সেদেশের লোকগণে।
তান সুত অনুপম কাজি ইছাহাক নাম
শরীয়ত খাদিম সেখানে
তান পুত্র গুণবান জ্ঞানবন্ত শাস্ত্রবান
সৈদানী গর্ভে উৎপন্ন
মনছুর নাম তার বসে [বলে] ছোট
খোন্দকার
প্রভুগত ছিল তান মন।

গুরু ধরে [ঘরে] এই বার্তা পাইল
নৃপ পাইলে সংহারিব জীববস্ত না রাখিব
বাহারছরাহ দেশে রউক যাই
এত ভাবি নৌকা 'পরে যদি পাইল তারে
সেদেশে ভবনে (?) তারে পাই।
আপন দুহিতা তানে বিহা করাইল যত্নে
তাতে জন্ম রাজুখান হৈল

তান পুত্র হীনবুদ্ধি জ্ঞান মন নিশুদ্ধি
নছরউল্লা সরিপ (?) অজ্ঞান
না চিন্তিয়া ভাল মন্দ রচিলেক পদবন্দ
ভাবিলেক আখের কল্যাণ।

কাজি ইছাহাক তান পুত্র আবদুল নবী চৌং তান পুত্র রোহল্লা চৌং তান পুত্র আবদুল গণি চৌং তান পুত্র মুন্সী আশরাফ তান পুত্র বকসু চৌং আজগর আলী চৌং তান পুত্র মহব্বত আলী চৌং তান পুত্র শ্রী শেখ ওয়াজেদ আলী চৌধুরী নিং (নিবাস) জলদী।

পূর্বপুরুষের ছজরার ঠিকানা ঃ

১. আলতাপের বাপের বাঙ্গালা ভাষার ১টি
২. উক্ত মিঞাজীর পার্শিয়ান ভাষার ১টি
৩. মোশারফ আলী চৌং স্ত্রী জুনুর মাতা হইতে তাহান উক্ত চৌধুরী ১টি পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত ছজরা সকল নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আছে শ্রী মৌলভী ছাদি পীং আছিমদ্দিন মিঞাজী শ্রী আবদুল বারি মিঞাজী সাকিন চুনতী, থানা-সাতকানিয়া জিঃ চট্টগ্রাম। ভণিতা দেখে মনে হয় এটি কবির মুসার সওয়ালের অংশ। অথচ অন্য দুই গ্রন্থের আত্মকথার সঙ্গে সঙ্গতির অভাবও দেখা যাচ্ছে ঃ

১. হামিদউদ্দীন খানই—তাঁর পুত্র বুরহানউদ্দীন নন-গৌড়সুলতানের সঙ্গে বিবাদ করে রোসাঙ্গ রাজার উজির হন।
২. বুরহানউদ্দীনও পিতার মৃত্যুর পরে রোসাঙ্গ দরবারে চাকরী পান, কিন্তু তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলের এক অশ্ববার সৈন্য নৃপতিকে বশ করে মৃত বুরহানউদ্দীনের জায়গীর কেড়ে নেয়। এবং বুরহানউদ্দীনের পুত্র ইব্রাহিম রাজার কাছে সুবিচার না পেয়ে বাহুবলে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন। ফলে পরিবাবেব সবাই পরাজিত ও নিহত হল।
৩. কেবল গুরুগৃহে থেকে শিক্ষারত পুত্র সুজাউদ্দীনই বেঁচে রইলেন। তাঁর পুত্র রাজুখান—শেখ রাজা বা বাবু খান নন—ছিলেন দরবেশ ফকির মোড়ল নামে খ্যাত, তাঁর পুত্র কাজী ইসহাক 'শরীয়ত খাদেম' নামে প্রশংসিত আর তাঁর পুত্র মনসুর ছোট খোন্দকার নামে পরিচিত এবং ইনিই কবি নসরুল্লাহর পিতা।
৪. সুজাউদ্দিনকে রাজভয়ে বাহারসরাহ্ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাহারসরাহ্ এলাকা বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চল। জলদীও এ এলাকার অন্তর্ভুক্ত।
৫. সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত আলোচ্য বংশলতা ছজরা-হয়তো পারিবারিক শ্রুতিস্মৃতি থেকে সংকলিত, অথবা পূর্বে কবির রচনা থেকে মুখস্থ করা কিন্তু স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করা। তাই ত্রিপদী ছন্দে লিপিবদ্ধ হলেও গন্থিশৈথিল্য, ছান্দসিক ত্রুটি এবং তথ্যগত বিস্মৃতি এড়ানো সম্ভব হয়নি।
৬. নসরুল্লাহ খোন্দকারের পিতৃব্য আবদুন নবীর বংশ এখনো জলদী গাঁয়ে বাস করছেন, এঁরা সম্ভ্রান্ত ধনী ও মানী। কাজী ইসহাক-আবদুন নবী-রুহুল্লাহ-আবদুল গণি-মুন্সী আশরফ—বকশ চৌধুরী-আজগর আলী চৌধুরী,-মহব্বত আলী চৌধুরী-ওয়াজেদ আলী চৌধুরী-এঁর বংশধরেরা এখনো জীবিত।

এ বংশলতিকা দৃষ্টেও নসরুল্লাহ খোন্দকার যে আঠারো শতকের প্রথমার্ধের লোক, তা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে।

অতএব, জঙ্গনামা ও শরীয়তনামাসূত্রে কবির পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে যে-সব বৃত্তান্ত প'ওয়া গেছে সেগুলোই গ্রহণীয় বলে মনে করি।

গ্রন্থনাম শরীয়তনামা। যেমনঃ

শরীয়তনামা বাণী কর অবধান।
শরীয়তনামা বাণী অমৃতের ধার।
শরীয়তনামা বাণী অধিক মধুর।

ভণিতা ঃ কহে হীনজ্ঞান নসরুল্লাহ খোন্দকার।
কহে হীন নসরুল্লাহ গুণিগণ ঠাম।
কহে নসরুল্লাহ খোন্দকার পদবন্ধে।

শরীয়তনামায় রচনাব সন-মাস-দিন-ক্ষণ দেয়া রয়েছে ঃ

এবে কহি তুমি সবে শুন মন দিয়া
পুস্তক আদায় সন লওত গুণিয়া।
চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস।
পুস্তক গ্রন্থন দুঃখ কহন না যায়
মাত্র যেই নারী বালক প্রসবএ।
যত দুঃখ পাইলাম মুর্খের কারণ
অবশ্য দুঃখের ফল দিব নিরঞ্জন।
শরীয়তনামা বাণী লেখা সাঙ্গ ভেল
সন তারিখ লেখিবারে শ্রদ্ধা বাড়ি গেল
চতুর্বিংশ অঘ্রানের জোহর সময়।
বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয়।
আছিল ইদের দিন রোজ সোমবার
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার।

চন্দ্র–১, ঋতু-৬, সিন্ধু-৭, গগন (সপ্ত আসমান)-৭ ১৬৭৭ শক ২৪ অগ্রহায়ণ সোমবারে লেখা শেষ হয়।

তথা ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দেব ৯।১০ই ডিসেম্বরে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়।

বলাবাহুল্য, ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বরের ৯।১০ তারিখে ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবারে ঈদ হয়েছিল এবং সে বছর রোজা হয়েছিল ২৯টা (বিংশ-গ্রহ ২০+৯=২৯)।[১]

কবিপ্রদত্ত রচনাকাল যে নির্ভুল তার প্রমাণ গ্রন্থে 'দোহাজারী' গাঁয়ে সংঘটিত সৈন্যদের জেলেনীর কাছে অশ্লীল প্রস্তাব সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। 'দোহাজাবী' নামের উদ্ভব ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের পরে। এখানে ১৬৬৬ সন থেকে শঙ্খনদের তীবে হাজার সৈন্যের মনসবদাব দু'জন মুঘল সীমান্তসেনানী থাকতেন। তাঁরা মুঘল রাজ্যেব আরাকান সীমানা পাহারা দিতেন। প্রথম দু'জন হাজারী হচ্ছেন আধু খান ও লছমন সিংহ, এঁদের বংশধররা এখানে পুরুষানুক্রমে বাস কবেন। ফলে এঁগায়ে এখনো এঁদের সৈন্যদের বংশধরবা বাস কবে। কবির সমকালে চট্টগ্রামে মুসলিম সমাজে কি কি হিন্দু ও বৌদ্ধ (আরাকানী বৌদ্ধ মঘ আচারও) আচার সংস্কার ও পার্বণ রয়ে গেছে তার সক্ষোভ বর্ণনা রয়েছে, এবং ইসলামি আচার ও পার্বণ কিরূপ হওয়া উচিত, তাও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। রজস্বলা নারীর কর্তব্য, স্নান, পুকুর খনন, কবব, কাফন, শবস্নান, সূতিকা-উত্তর আচার, ঘোমটা-পর্দা, অস্পৃশ্যতা, ধূমপান, জাতিভেদ, মহরমের, তাজিয়া, বেনামাজী দরবেশ, পাশাখেলা, আলিমচরিত্র, মারোয়া জলুয়া, গেরুয়া, যৌন-অসংযম প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা রয়েছে শরীয়তনামা গ্রন্থে। শরীয়তের বিধি (আমর) নিষেধই (নেহী) এ গ্রন্থে আলোচিত। কবির ভাষায়—

'আমর' 'মানাই' যত আছে শরীয়তে
সহরিষে কহি আমি শুন রঙ্গচিতে।
হুকুম শরারে শাস্ত্রে আমর বোলএ
মানারে বোলএ 'নেহী' আরবি ভাষাএ।

ঠ. আফজল আলি

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বিখ্যাত দরবেশ শাহ রুস্তমেব শিষ্য আফজল আলি পীরের আদেশে 'নসিহতনামা' রচনা করেন। পদকার আফজল আলি ভিন্ন ব্যক্তি। তবে অনুমান করি পদকার সৈয়দ আফজল আলি ও পদকার আফজল আলি অভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং নসিহতনামা প্রণেতা আফজল আলি আঠারো শতকের লোক এবং ভিন্ন ব্যক্তি।

---

১. *ডক্টর কবিম গগন–১ ধরে বচনাকাল ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দ নির্ণয় করেছেন, কিন্তু ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে ঈদ হয়নি।*

নসিহতনামায় আফজল আলির কিছু আত্মপরিচয় আছে, তা থেকে জানা যায় তিনি চট্টগ্রামের আধুনিক সাতকানিয়া থানার 'মিলুয়া' গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভংগু ফকির। 'পিতা মোর ভঙ্গু ধৈর্যধর'। পীর শাহ রুস্তমের আগ্রহেই তিনি নসিহতনামা রচনা করেন। পীর প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

চাটিগ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম
মিলুয়া করিয়া আছে সে গ্রামের নাম।
সেই গ্রামে ছিল এক ফকির আল্লার।
চারি মঞ্জিল-ভেদ দিল করতার।
শাহা সে রুস্তম করি ছিল তার নাম
আল্লাহ হৈল কৃপা গুণে অনুপাম।
গায়েবী মর্তবা প্রভু তাহানে যে দিলা
গায়েবী ভেদ যত কহিতে লাগিলা।
গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর
তান খ্যাতি একে একে হইল প্রচার।

এই রুস্তম শাহর রুস্তমের হাট এবং হাটের কাছেই দরগাহ আছে। লোকশ্রুতি রুস্তম তিন-চার শ'বছর আগের লোক। রুস্তমের গায়েবীশ্রুত বাণীই আফজল তাঁর মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ আছে 'শাহরুস্তম দুই যুগ অব্দ ভরি স্বপ্ন দেখিল যতেক, তার অল্প কিছু' কবি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষা ও বর্ণন ভঙ্গি বিচারে আফজল আলিকে আঠারো শতকের শেষার্ধের কবি বলে মনে করি। অতএব, শাহ রুস্তমও এই সময়ের লোক হবেন। গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বেই শাহ রুস্তমের মৃত্যু হয় ঃ

মৃত্যুর কথক দিন ফকির আল্লার
বহু উপদেশ কৈল না লিখিল তার।
কৃপার সাগর মুর্শিদ মোক গেল এড়ি।

নসিহৎনামার লিপিকরের পুষ্পিকা এইরূপ ঃ 'এই পুস্তক লিখিলাম মোসন আলী হীনে। সাঙ্গ হৈল ২৪ চব্বিশ মঘির ১২ আশ্বিন দিনে।' হরফ দেখে ১২২৪ মঘী বলেই অনুমান করতে হয়।

দ্বিতীয়ত 'মোকাম মঞ্জিলের কথা' রচয়িতা পরিচয় আমাদের জানা নেই। তাঁর গুরু ছিলেন শাহ্ মইনুদ্দীন—

শাহ মইনুদ্দীন গুরু জ্ঞানের লহরী
কহে হীন মোহসেন আলি গুরুপদ স্মরি।

মোহসেন আলীর রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদও পেয়েছি। 'নসিহতনামা'র লিপিকাল আমাদের ধারণায় ১২২৪ মঘী (১৮৬২ খ্রীঃ) সন। এবং লিপিকার, পদকার ও 'মোকাম মঞ্জিলের কথা' প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে করি। তা'হলে মোহসেন আলি উনিশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

আফজল আলিকে ষোল-সতেরো শতকের কবি বলে অনুমানের পক্ষে দুটো বাধা আছে। এক, ভাষা অত্যন্ত অর্বাচীন, এবং বক্তব্য গোঁড়া শরীয়তপন্থীর। শরীয়ত-প্রীতি সতেরো শতকের আগে দুর্লক্ষ্য। দুই, লেখকের নিষ্ঠাহীনতা। কোরান-হাদিসের নামে অনেক বানানো আরবি বাক্য তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে প্রয়োগ করেছেন। যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁকে একজন প্রাচীন সাধক শাহ রুস্তমের সহচর শিষ্য বলে গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করি।

গ্রন্থে তামাক সেবনে কুফল বর্ণিত হয়েছে। তামাক এদেশে সতেরো শতকের আগে চালু হয়নি। তা ছাড়া আফজল আলির একটি উক্তি এরূপ ঃ

বার সন্দীতে জন্মি তের সন্দী পাইছে
সে সকল লোকে দো-আঁসলা হইয়াছে।
তের সন্দীতে জন্ম যে সকল হইব
খানে দজ্জালের নায়েব সে সকল হৈব।

এর থেকেও বোঝা যায়, আফজল আলি খ্রীস্টীয় আঠারো শতকের উত্তরার্ধের তথা হিজরী বারো শতকের শেষার্ধের এবং তেরো শতকের প্রথম পাদের তাহলে তাঁর আনুমানিক জীবৎকাল ১১৫০-১২২৫ হিজরী বা ১৭৩৮-১৮১১ খ্রীস্টাব্দ।[১]

১. মৎসম্পাদিত 'নসিয়তনামা' দ্রষ্টব্য।

৫৪. মুহম্মদ ফসিহ

পুথিতে কোন নাম নেই। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর আঙ্গিক ও বিষয়ানুগ নাম 'আরবি ত্রিশ হরফে মুনাজাত' রেখেছিলেন।[১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এর নাম দিয়েছেন 'মুনাযাৎ'[২]। আঙ্গিকের ও বিষয়ের পরিচায়ক বলে আমরা সাহিত্যবিশারদের দেয়া নামই গ্রহণ করলাম ঃ

আরবির এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার।
মুনাজাত করিবাম গোচরে আল্লার।
একেক অক্ষর প্রতি চতুর্পদ বন্ধে।
মুহম্মদ ফসীএ কহে পয়ারের ছন্দে॥

পুথির শেষে লেখা আছে ঃ

ইতি সমেআপ্ত মুনাজাত সন ১২২২ ব ২৬

আসাড় রোজ রবিবার বেলা দেড় পহর উদয়ে লিখা সমেয়াপ্ত মনাযাতের সোদ। এর পর ফারসি হরফে মালিক ও লিপিকারের নাম লেখা রয়েছে ঃ

মালিক-হাসেম আলী, পিতা শেখ মোহররম খাঁ পরগণা
ভুলুয়া, সাকিনহ—রকানপুর।
লিপিকর-শেখ আলী রজা, পিতা মোহাম্মদ সবির পাটওয়ারী,
পরগণা-ভুলুয়া, সাকিন-হাটহাজারী, জিলা ত্রিপুরা।

এটি নিশ্চয়ই লিপিকরের দেওয়া তারিখ এবং তারিখটি ত্রিপুরাব্দসূচক। কেননা, কবির দেওয়া হলে এটি পদ্যেই লেখা হত, তাই ছিল নিয়ম। আর মুনাজাতটি কবির মূল রচনার শেষাংশ মাত্র। কাজেই কবির দেওয়া সমাপ্তিসূচক তারিখে শুধু মুনাজাতের উল্লেখ থাকতে পারে না এবং পুথিটি ত্রিপুরা অঞ্চলে অনুলিখিত। ওখানে ত্রিপুরাব্দ চলে। এটিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুথি মনে করে পুথির তারিখটিকে মঘী রূপে হয়েছে।[৩] অতএব, লিপিকাল ১২২২ সন ত্রিপুরাব্দ বা ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ।

গ্রন্থারম্ভে আছে ঃ

আর এক কথা কহি শুন গুণিগণ।
চিত্ত দিয়া শুন কহি মোর নিবেদন॥
আরবির এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার।

এবং দশম পৃষ্ঠায় মুনাজাত শেষে রয়েছে ঃ

মোহাম্মদ ফসীএ কহে শুন গুণিগণ।
মুনাজাত করিলাম প্রভুর চরণ॥
কোরানের মধ্যে আছে এ ত্রিশ হরপ।
দেশী ভাষে পঞ্চালী কহিলুম স্বরূপ॥
এর সব অক্ষর দেখি কোরান মাজার।
মোল্লা সবে কহিলেক কিতাব সঞ্চার॥
ফারসির মধ্যে দেখি পণ্ডিতের গণ।
বাঙালার ভাষে তবে করিল রচন॥
যার যেবা ইচ্ছা মতে নানা প্রকার।
হিত বাক্যে বুঝিবারে কহিছি পয়ারে
মুঞি ক্ষুদ্র অল্প না পাইএ ওর।
প্রভুপদে নিবেদিলুঁ হই মতি ভোর॥

তেরোতম পৃষ্ঠায় পাচ্ছি ঃ

এবে পুনি প্রণামিএ পয়গম্বর গণ।
আদম প্রভৃতি আর রসুলে চরণ॥
মুখ্য চারি ফিরিস্তা প্রভৃতি যথ আর।
একে একে প্রণামিও সহস্রেক বার॥
হজরত মীরের পদ করি সিরতান।
যতেক সাধ মধ্যে সেই সে প্রধান॥
আওলিয়া আম্বিয়া যত পীর যে ফকির।
প্রণামি সে সব পদ রাখি মোর শির।
তোমরার পদে করি সহস্র বিনএ।
অধমের প্রতি স্নেহ রাখ মনে॥

১. মৎসম্পাদিত 'আরবী ত্রিশ হরফের বয়ান' দ্রষ্টব্য।
২. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ২১৮।
৩. পুথিপরিচিতি, পৃঃ ১০।

প্রথমত, আগে কোন কথা না বললে, কবি কখনো 'আর এক কথা' বলে গ্রন্থারম্ভ করতেন না। 'এ ত্রিশ অক্ষরে' কথার মধ্যে আরবি ত্রিশ হরফ সম্বন্ধীয় পূর্ব বিবৃতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে. দ্বিতীয়ত, একটি মাত্র 'মুনাযাত'কে 'পঞ্চালী' বলে অভিহিত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। 'মুনাজাত'ই উদ্দিষ্ট হলে কবি পঞ্চালী ছন্দে কথাটি প্রয়োগ করতেন। আর, 'মোল্লা সবে করিলেক 'কিতাব' সঞ্চার। ফারসির মধ্যে দেখি পণ্ডিতের গণ। বাঙ্গালার ভাষে তবে করিল রচন। এবং 'হিতবাক্যে বুঝিবারে কহিছি পয়ারে।'—চরণগুলোতে আরবি পুরো কিতাব, ফারসি গ্রন্থ, ফসীহর পূর্ববর্তী বাঙালী পণ্ডিতগণের বাঙলা বই ও ফসীহর লেখা বাঙলা রচনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এতে অনুমান করা চলে, আরবি প্রতিটি হরফের গূঢ়ার্থসূচক ও মহিমাজ্ঞাপক রচনার কথাই কবি এখানে উল্লেখ করেছেন, তৃতীয়ত, 'এবে পুনি প্রণামিএ' কথায় এবং প্রণম্যদের নামসার উল্লেখে সহজেই বোঝা যায়, কবি গ্রন্থের 'উপক্রমে সবিস্তার 'বন্দনা' সেরেছেন। আমাদের এ অনুমানের পেছনে আরো যুক্তি আছে আরবি হরফের মহিমা, কোরানে প্রতি হরফের প্রয়োগসংখ্যা এবং হরফের মারফতী রূপকাদির বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ আমরা আরো পেয়েছি। এরূপ একটি অংশ (সম্ভবতঃ সতেরো শতকের প্রথম পাদের কবি শেখ পরাণের রচিত) আমরা আলোচ্য মুনাজাতের সঙ্গে সঙ্কলিতও করেছি।[১] এ ছাড়া আবদুল নবীর 'কোরাণের কায়দা'[২] অ-জানা কবির 'কোরান পাঠের ফল'[৩], মোহাম্মদ হোসেনের নামহীন পুথি (মোহাম্মদ হোসেন আপনে খাকসার। তিরিশ হরফের কথা অজুদের মাজার)[৪] কায়েমউদ্দীনের 'কোরানের কায়দা' প্রভৃতি এ শ্রেণীরই রচনা। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে আলোচ্য মুনাজাত মুহম্মদ ফসীহর ইত্যাকার কোন রচনারই শেষাংশ।

আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

আঙ্গিকের দিক দিয়ে ফসীহর মুনাজাত আমাদের 'চৌতিশা' জাতের রচনা। বলতে গেলে চৌতিশা বাঙলার এক রকম বিশিষ্ট সাহিত্যসম্পদ। অন্য কথায় বাঙালীর উদ্ভাবিত মৌলিক শিল্পপদ্ধতি। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন ঃ

> খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' নামক একখানি উপপুরাণে মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি চৌতিশা স্তবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। আব কোনও গ্রন্থে কিংবা সংস্কৃত পুরাণে অনুরূপ রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্য নিজস্ব রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।[৫]

কাজেই এ রীতি সংস্কৃত থেকে পাওয়া নয়। ডক্টর মদনমোহন গোস্বামী বলেন ঃ

> বাংলা সাহিত্যে চৌতিশা বহু পুরাতন। আরবি ও ফারসি ভাষায় আলিফ 'বে', 'তে' ইত্যাদি বর্ণক্রমে অনুরূপ রীতিতে কবিতা লিখিবার রেওয়াজ আছে। তদনুসারে উর্দুতেও এই রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে।[৬]

তাহলে হয়তো এটিই আরবি-ফারসির কাছে বাঙলার আদি ঋণ ; কিন্তু তাও প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। আরবিতে ইত্যাকার পদান্ত মিলেরই রেওয়াজ আছে, আদ্যক্ষরের নয়। তাতে একটি কবিতায় সব হরফের আনুক্রমিক প্রয়োগ থাকে না। আর ফারসিতে বাঙলার মতো আদ্যক্ষর রূপে বর্ণের ক্রমবিন্যাস প্রথা চালু ছিল বটে, কিন্তু তাও কোন ব্যক্তির একক রচনা রূপে নয়, বিভিন্ন জনের প্রতিযোগিতামূলক যৌথ রচনা। যেমন একজন 'আলিফ' থেকে 'ছে' অবধি হরফ প্রয়োগে

---

১. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৮১।
২. ঐ পৃঃ ৬৮।
৩. ঐ পৃঃ ৮৩।
৪. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ২২৬–৯৭।
৫. বাঙ্গলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (৩য় সং) পৃঃ ৭৭।
৬. রামগুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃঃ ৫১।

কয়েকটি চরণ রচনা করলেন, অপর কবি 'জিম' থেকে 'দাল' পর্যন্ত প্রয়োগ করলেন, আর তৃতীয় কবি আরো কয়েকটি হরফযোগে পদ রচনা করলেন। এভাবেই চলতো এবং তা সাধারণত মুখে মুখেই রচিত হত, লিখিত ভাবে নয়। বাঙলার হিন্দু রচিত সাহিত্যে চৌতিশায় স্তবই বিশেষ প্রচলিত।

মুসলিম রচিত চৌতিশা কিন্তু বারমাসী, বিরহ, স্তুতি ও বিলাপ রচনার বাহন হয়েছে। বাঙলা চৌতিশায় চৌত্রিশটি হরফই যে থাকবে, এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। আদিতে অবশ্য তাই ছিল। নইলে এ নাম হল কি করে ? কিন্তু পরবর্তীকালে বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। কেউ কেউ 'অ' থেকে 'হ' অবধি শব্দ-সম্ভব সব বর্ণই চরণের আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহার করেছেন, কেউ বা কেবল ব্যঞ্জনবর্ণই গ্রহণ করেছেন। কেউ বর্ণ দিয়ে এক চরণ রচনা করেছেন, কেউ দুই পংক্তি আর কেউবা চার ছয় আট চরণ অবধি চালিয়ে নিয়েছেন।

আমাদের আলোচ্য কবি, মনে হয়, বাঙলা চৌতিশা স্তবের অনুকরণেই আরবি ত্রিশ হরফের মুনাজাত রচনা করেছেন।

সনেট যেমন অন্যান্য কবিতার তুলনায় সচেতন প্রয়াসসাধ্য কিছুটা কৃত্রিম রচনা ; কেননা, সনেট রচনায় ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশের চাইতে আঙ্গিক সৌষ্ঠবের দিকে বেশি নজর দিতে হয়, সনেটে যেমন আঙ্গিকই প্রধান, তেমনি চৌতিশায়ও কাব্যের আঙ্গিকই কবি-প্রচেষ্টার মুখ্য লক্ষ্য, ভাবের প্রকাশ গৌণ। তাই চৌতিশা প্রায়ই কৃত্রিমতাদুষ্ট প্রাণহীন রচনা হয়ে দাঁড়ায় ; তবু শিল্পকর্ম হিসেবে ভাষা-ভাস্কর্য হিসেবে এর রূপ আছে, মূল্যও আছে এবং আলঙ্কারিক কবির কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে এ জাতীয় রচনাই।

ট. কাজী বদিউদ্দিন

কাজী বদিউদ্দিন আঠারো শতকের লোক। তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের পটিয়া থানা-সংলগ্ন বাহুলী গ্রামে। এখানে তাঁর বংশধর আছে। তাঁর এক পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'চিকন কাজী'। এখনো সে পাড়াটি চিকন কাজীপাড়া নামে অভিহিত হয়। কাজী বদিউদ্দিন কায়দানী কিতাব, সিফৎ-ই-ইমান প্রভৃতির প্রণেতা।

ক. কায়দানী কিতাব শরা-শরীয়ত বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরে ওজু-নামাজ প্রভৃতির নিয়মাবলী আলোচিত।

যেমন অজু মধ্যে কথ ফর্জ কথেক সুন্নত ? কথেক কারণে আর অজু ভঙ্গ হয় ?
কথ মস্তাহাব কথ মকরুহ কেমত ?

পাঁচ নবী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রবর্তক ঃ

আদম ইব্রাহিম ইউসুফ জানএ
ইসা মুসা পঞ্চ অক্ত নামাজ গুজারি আছএ।

ভণিতা—চক্ষু মুখ হস্তে যদি ইশারা করএ
কহন্ত বদিউদ্দীন নামাজ ভাঙ্গএ।

খ, সিফৎ-ই-ইমান ঃ মুসলমানের অবশ্য জ্ঞাতব্য শরা-শরীয়ত বিষয়ক শাস্ত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় ও শিক্ষকদের নাম আছে ঃ

চক্রশালা পুরান বস্তি জানে সব গ্রাম
তাতে এক মৌজা বাহুলী আছে নাম।
সেই স্থানে চিকন কাজী করিছে বসতি
উত্তম পুরুষ ছিল ভাগ্যবন্ত অতি।
তান পুত্র আয়ুব শরীফ ছিল নাম
তাপোমন্ত ছিল সেই দর্বেশ উপাম।
তান ঘরে এক পুত্র সৃজন হইল
তামায়ুদ্দিন খোন্দকার নাম যে আছিল।
তাহান ঔরসে জন্মি দেখিএ সংসার।

অতএব বংশলতা এরূপ ঃ চিকন কাজী-কাজী আয়ুব শরীফ-তামায়ুদ্দিন কাজী বদিউদ্দিন।

কবির শিক্ষকগণ ঃ

আহমদ শরীফ প্রথম গুরু বুলি
জীবের জীবন মোর আঁখির পুতলি।
খেতাবচর শুভগ্রাম তাহান বসতি।
বাঙ্গালা অভ্যাস মোর সেই গুরু হতে

অমূল্য বত্তন গুরু মুহম্মদ নকী
আর গুরু আর্শাদুল্লাহ মুহম্মদ তকী।
আর গুরু চম্পাগাজী নয়ানের জ্যোতি
মুখে (মোকে) পাঠ লেখি চিনাইছে
নিজ হাতে।

বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত এই খিতাবচর গ্রামের চম্পাগাজী রাগতালনামাব লেখক ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। এর কাছেই কাজী বদিউদ্দিন বাঙলা শিখেছিলেন। অতএব উভয়েই আঠারো শতকের লোক। শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্ণনার ফাঁকে কবিব মন্তব্য ভাবিয়ে তোলে ঃ

ভরণ কলসী যদি কিন্তু ছিদ্র হএ
বিন্দু বিন্দু ঝরি ঝরি সে ভাণ্ড শুকাএ।
এই মত সকলের আয়ু যাএ চলি।

সিফৎ-ই-ইমানের উৎস ঃ

সিফৎ ইমা নামে এক কিতাব জানএ
ফেতবি জাহিজ হোন্তে নিকালি আছেএ।
উত্তম মসলা সেই কিতাব হেরিয়া
কহিমু সওয়াল কিছু পয়ার রচিয়া।
ফারসিভাষে যারে 'সআল' বোলন্ত
আরবি জবানে তাকে 'মসলা' কহন্ত।

ভণিতা ঃ ১. কহন্ত বদিউদ্দীনে গুন্থিয়া পয়ার।
২. সোয়াল আজিম নাম কিতাব হেরিয়া
কহন্ত বদিউদ্দীনে পয়ার রচিয়া।

কেবল 'ফেতাবি জাহিজ' নয়, ও 'সওয়াল আজিম'ও কবিব অবলম্বন ছিল।

নামাজ না পড়ি সেই দুশমন হৈল।
নামাজ দ্বীনের খাম্বা বুলি না জানিল।

কাজী বদিউদ্দীনের সিফৎ-ই-ইমানের অপর এক পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর আবদুল আলী (লিপিকাল ১২২৩ মঘী) সর্বত্র স্বনামে ভণিতা দিয়েছেন।

কিতাব দলিল চাহি করিয়া সুমার
হীন আবদুল আলি কহে রচিয়া পয়ার।
লেখিলুম পুস্তক হীন আবদুল আলী নাম
পিতা দেবান আলী পণ্ডিত সুজ্জান।
সাকিন ইসাপুর যে চাকলাএ ফটিকছড়ি
মৌজে ঢালকাটা হএ নানুপুর বাড়ি।

আবদুল আলীর পিতা দেবান আলি (মিয়াজী) সম্ভবত নুরনামা[১] নামের রাগতালের উৎপত্তিকাহিনী রচক ছিলেন।

দিজ (দীন?) দেবান আলী কহে আলীর কাহিনী।

ঠ. মুহম্মদ জান

মুহম্মদ জান সম্ভবত আঠারো শতকের শেষার্ধের লোক। এর প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ১২১৪ মঘীতে তথা ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে লিপিকৃত। চট্টগ্রামের কবি। তেরো পত্রে সমাপ্ত। নামাজের ফজিলত বর্ণিত।

১. মুহম্মদ জান কহে রচিয়া পয়ার।
২. জান মুহম্মদ কহে শুন নরগণ
আকুল হাদিস বাণী শুন দিয়া মন।

কবির বক্তব্য ঃ

সংসারের ভোগ সুখ কিছু নহে সার
যেজনে করএ শ্রদ্ধা অতি গুণাগার।
যতেক সম্পদ পুনি আনন্দ অপার
প্রলয়ের কালে সুখ নাহিক তাহার।

সবচেয়ে গুরুতর কথা এই, উনিশ শতকে বাঙলা হরফ না জানা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের পড়ার জন্যে আরবি হরফে বাঙলা পুথি লেখা শুরু হয়। কবি মুহম্মদ জানের এতে ঘোর আপত্তি ছিল, তিনি বলেন—

আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন
আরবি আঙ্গুলে যদি বাঙ্গালা লিখন।
বুঝি সুঝি কর্ম কৈলে পাপ ঘোরতর
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর।[২]

---

১. *পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৪৫৬।*
২. *ঐ পৃঃ ২১৬*

ড. আজমত আলি

ইনি লিখেছেন নামাজেব কেতাব। এটি ছোট গ্রন্থ নয়। নামাজের নিয়ম, তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিতাব ফতুবি আর মুক্তসর সাফিতার
লিখিলেক এসব বারতা
শ্রী আজমত আলি হীন লোকে দেখি করে ঘিন
যেন তেন করিলুঁ কবিতা।

ঢ. আব্দুল্লাহ

আবদুল্লাহ রচিত 'নসিয়তনামা' আরবি গ্রন্থের অনুবাদ ঃ

দোয়েতুন নামেহীন মধ্যে আছে যে মরম, তাহার বাঙ্গালা করে আবদুল্লা অধম।

রসুলের আমলের নানা উপকথা বা ইতিবৃত্ত বর্ণনার মাধ্যমে কবি স্বামীর ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তব্য ও দায়িত্বসম্পর্কে উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ঃ

প্রতিনিতি যেই নারী বেজার হইয়া নারীমন মৌন দেখি পতি দুঃখ পায়
চিন্তাযুক্ত থাকে নারী দুঃখিত হইয়া। লাহানত সে নারীকে করেন খোদায়।

মনে হয় কবি উনিশ শতকের গোড়ার দিকের লোক।

ণ. শেখ সোলায়মান

সোলায়মান রচিত নসিয়তনামায়ও[১] স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এটি ফারসি থেকে অনূদিত। নোয়াখালীর ভুলুয়ায় ছিল কবির নিবাস।

ক. ভুলুয়া শহর জান দিব্য একস্থান মুই হীন জান দোষ ক্ষেমিতে জুয়াএ
শেখ সোলেমান নাম তাহাত প্রধান। ফারসিকে বাঙ্গালা করিলুম দুনিয়ায়।
খ. অসিয়তনামা এক কিতাব আছিল বাঙ্গালার ভাষে তাকে করহোঁ রচন।
নারী-পুরুষের কথা তাহাতে লেখিল। ভাষাএ ফারসি কেহ নারএ পড়িতে
ফারসি বচন কহি বুঝ সর্বজন বাঙ্গালা রচিলুঁ তবে সকলে পড়িতে।

গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় ঃ

একদিন 'নবীর বিদিত নারী আইল চলিয়া স্বামীর যতেক দায় নারীর উপর।
বলল–এক নিবেদন কহি তোমার গোচর ভনিতা ঃ হীন সোলেমান কহে পাঞ্চালী রচিয়া
নারী পুরুষের কিছু কহত খবর।
কার কিং দোষগুণ কহ পয়গাম্বর সোলেমান কহে শুন আয় নরগণ।

কবি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষার্ধে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ সূত্রে উনিশ শতকের দোভাষী শায়ের মুহম্মদ খাতেরের তম্বিয়তুন্নেসা এবং ঢাকার রহমতগঞ্জবাসী মুন্সী গরীবুল্লাহ বেপারী রচিত 'নেকবিবির বয়ান' এবং 'কলিকালের আওরতের বয়ান' স্মর্তব্য।

ত. সৈয়দ নাসির

এই সৈয়দ নাসির আর বেনজীর বদর-ই মুনীর রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। সৈয়দ নাসির দীর্ঘ আত্মকথা লিখেছেন গ্রন্থের উপক্রমে। তা থেকে জানা যায় ঃ

---

১. *পুথি পরিচিতি*, পৃঃ ৩৪-৩৫, ১৫১-৫২, ২৭৪-৭৫, ৩০০-০১।

শাহ সুজা আছিলেন নৃপকুলেশ্বর শাহার সঙ্গতি আইল তেজি নিজ স্থান।
ভ্রাতৃ সঙ্গে বুঝি আইল রোসাঙ্গ শহর। আমীরাবাদ নামে এক গ্রাম ভাল
সৈয়দ আবদুল গণি ছিল আলিম প্রধান তথা গৃহবাস করি গোয়াইল কাল।

অতএব, শাহজাহান-পুত্র শুজার অনুচররূপে কবির পূর্বপুরুষ আলিম আবদুল গনি আরাকানরাজ্যের চট্টগ্রামে এসে আধুনিক সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত আমীরাবাদ গায়ে বসতি স্থাপন করেন।

একস্থানে কবি সিরাজকুলুব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন :

সিরাজকুলুব নামে কিতাব আছএ
খন্নাসের বিবরণ লেখিয়া আছএ।

এটি যদি আলি রজা [১৭৫৯-১৮৩৭] রচিত বাঙলা সিরাজকুলুব হয়, তাহলে কবির আবির্ভাব কাল আঠারো শতকের শেষ দুই দশক কিংবা উনিশ শতকের প্রথমপাদ।

এ 'সিরাজ সবিল' অর্থ পথের প্রদীপ। এ গ্রন্থের উৎস আরবি হাদিস।
কবির ভাষায়—

বচন হাদিস নানান কিতাব কথন সিরাজ সবিল নামে পুস্তক রাখিলুঁ।
অন্যবাক্য নহে এই জান গুণিগণ। সিরাজ সবিল কহে আরবের গণ
গুরু স্মরি নবী ভজি প্রভুতে মাগিলুঁ পস্থেন চোরাগ কহে বাঙ্গালা বচন।

সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে এ কাব্যের শুরু। প্রশস্তি অংশে ইরানি কবি সাদীর ও জামীর এবং বাঙালী কবি সৈয়দ সুলতানের ও আলাউলের নাম রয়েছে :

সৈয়দ সুলতান কবি আলাউল আর পীর আবদুল ওহাব পীর জ্ঞানের সাগর,
শিক্ষা গুরু আজিজুল্লাহ মৌলবী সাদেক।

এবং গুরু লাঞ্ছনাকারী মুহম্মদ নামের এক অকৃতজ্ঞ ছাত্রের কথা রয়েছে। কবি দরিদ্র ছিলেন, তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যায়—খাজনার বিনিময়ে এক টুকরো জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন বাস্তুভিটে তৈরির জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি[১]। একদিন এক মজলিসে পাশের লোকের হাতে হাদিসকথার গ্রন্থ দেখে কবি 'রচিতে পয়ার মুই মনেতে ইচ্ছিলুঁ। সে-মজলিসে জান আলী নামের দৌলতপুরবাসী এক জমিদার বা ধনী লোক ছিলেন, তিনিই—

কহিল মোহর স্থানে সেই মহামতি বুঝিতে রচ পুস্তক বাঙ্গালা বচন।
রচিবারে গ্রন্থ এই করিয়া আরতি। রহিব তোমার নাম অবধি প্রলয়।
হাদিস না বুঝে সব আরবি রচন তান আজ্ঞা অনুদিন করিলুঁ রচন।

তা ছাড়া পুত্রদের শিক্ষা দানও ছিল লক্ষ্য :

সৈয়দ আবদুর রহমান পুত্রের কারণ।
বহু শাস্ত্র পড়াইতে নারিলু তাহারে
তেকারণে রচিলুঁ অল্পে বুঝিবারে।

ভণিতা :

সৈয়দ নাসির (মুই) হই হীন মতি
গুণিগণ পদযুগে করিএ মিনতি।

আলাউলের অনুকরণে কবি পরিচ্ছেদ শেষে মাঝে মাঝে গুরুকে স্মরণ করে উদ্দীপিত হতে চেয়েছেন :

১. আইস গুরু হৃদে বৈস প্রদীপের তুল
জ্ঞানের পতঙ্গ মোর ভ্রমিতে বহুল।

২. আইস গুরু হৃদে বৈস যেন পুষ্পে অলি
তবে মোর জ্ঞান পুষ্পে ফুটিবারে কলি।

কবি স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন করেছেন এভাবে :

যে চাহ সে কর তুমি আয় নিরঞ্জন কাষ্ঠের পোতলা সব তেমত নাচএ।

---

১. *পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৫৯৮।*

তুই ঢেউ মুই তৃণ আয় জগপতি–
শিল্পীকে অঙ্গুলি ডোরে যে মত নাড়এ
যেমতে বাজাএ যন্ত্রী সে বোলে যন্ত্র—
তুই যন্ত্রী মুই যন্ত্র আয় নিরঞ্জন।

বলাবাহুল্য হাদিসের কথা হলেও তাতে লোকাচারের প্রভাবও রয়েছে।

থ. আইনউদ্দীন

রোসাঙ্গবাসী এই আইনউদ্দীন 'তফসীর' রচনা করেছেন। 'তফসীর প্রভাবে পাপ করহ মোচন'। বিশেষত এ তফসীর হাদিয়া যাহার'। আরবি 'তফসীর হোসেনী ও ফুতুহল আজিজ' তার মুখ্য অবলম্বন।

কবি কাব্যের উপক্রমে অনেকের প্রশস্তি গেয়েছেন, আরবি হরফে লেখা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি[২] দুষ্পাঠ্য ও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত। রহমত আলী, রাজু (রামু?) নিবাসী জৈনুদ্দীন, 'কিম্' গ্রামের ইব্রাহিম ও কাজী-পুত্র আছিরাঙ্গ এবং মোরঙ্গ (ম্রোহঙ্গ ?) দ্বীপের বিহারচক্র গ্রামের মুন্সী কাসিম আলি আর ইব্রাহিমের সঙ্গী ফতেহ আলী ও ঈসা আলীর সাহেব ক্যেযুক বা ক্যেবুক কাজি।

শ্রীযুত আছিরাঙ্গ কাজির সন্তান
শরাজ্ঞাতা ইব্রাহিম ও ভগ্নীসুততান।

আছিরাঙ্গ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—'তান নামগুণধাম প্রচার রোসাঙ্গ'। আছিরাঙ্গ সম্ভবত এর ডাকনাম 'খ্যাতিচন্দ্র দীপ্তিবর ডাক আছিরাঙ্গ'। এবং এই আছিরাঙ্গের পিতা ছিলেন রোসাঙ্গ রাজের (কাজী?) অমাত্য

তান পিতা মহাদাতা অমাত্য রাজার
প্রতিষ্ঠার পতিবর সুবর্ণ হীরার (?)

মনে হয়, আছিরাঙ্গের পিতা রাজসভায় কাজি ছিলেন, এবং সে-অর্থেই অমাত্য বলা হয়েছে। আছিরঙ্গের ভাগ্নে ইব্রাহিম শরাজ্ঞানী তথা আলিম ছিলেন। 'শরাজ্ঞানে আল্লা তানে করিছে প্রধান'।

ভণিতা ১. দীন হীন আইনুদ্দীন অতি পুণ্যক্ষীণ
২. দীন হীন পুণ্যক্ষীণ পাপী আইনুদ্দীন।

'তারাবীর নামাজের বিদায় আমার'—কবির এ উক্তিতে মনে হয় তিনি 'হাফিজে কোরআন' ছিলেন।

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে আরাকানরাজ্য ধর্মরাজ্যভুক্ত হয়। অতএব রাজধানী রোসাঙ্গ কেন্দ্রীয় আরাকানেই ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই কবি আইনউদ্দীন 'তফসীর' রচনা করেন। আঠারো শতকের আরাকানরাজ্যের আর দুইজন কবি হচ্ছেন আবদুল করিম খোন্দকার ও 'ফালনামা' প্রণেতা আবদুল গণি। 'নিকাহ মঙ্গল' প্রণেতা ও পদকার (সৈয়দ) আইনুদ্দিন ভিন্ন ব্যক্তি ও চট্টগ্রামবাসী।

দ. বালক ফকির

বালক ফকির 'ফায়দুল মুকতদী' নামের শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একজন মুসলিমের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধীয় তথা নিত্যকার আচার-আচরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এটা। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মৃগাবতী, কালাকাম প্রভৃতি প্রণেতা ইদিলপুরবাসী মুনশী মুহম্মদ মুকিম পণ্ডিতও একটি 'ফায়দুল মুকতদী' রচনা করেছিলেন।

গৌড়ের এক ধনী সওদাগর মহব্বতের পুত্র সা'দুল্লাহ চট্টগ্রাম শহরের ত্রিশ মাইল উত্তরে মণ্ডলানগরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দিন কাজী প্রথম জীবনে নিমকমহলের দারোগা ছিলেন। আঠারো শতকের শেষ পাদে-তিনি দানে-ধর্মে ও বিদ্যায়-বিত্তে প্রখ্যাত ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।[১] তিনি ফারসিতে একটি ফায়দুল মুকতদী লেখেন। বালক ফকির সেটিই বাঙলায় অনুবাদ করেন। বালক ফকিরের পীর ছিলেন আঠারো উনিশ শতকের কবি দরবেশ জ্ঞানসাগর প্রণেতা আলি রজা (১৭৫৯—১৮৩৭ খ্রীঃ)।

২. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৬৪৬-৫০।

১ হাসমত চৌধুরী রচিত 'মলয়া-মাহমুদ' কাব্য দ্রষ্টব্য।

পূর্বের কথন এবে শুন গুণিগণ
যেইমতে হৈল এই কিতাব রচন।
শাহাবুদ্দিন নামে এক আলিম প্রধান
সৈয়দ বংশেত জন্ম অতি গুণবান।
চাটিগ্রাম দেশে ছিল তাহান বসতি।
সাহসিক ধনবন্ত সুকুলীন অতি।
ধীর স্থির দেখি সব ফিরিঙ্গির গণে
বৃত্তি দিয়া তুষিলেক আদবে সম্মানে।—
সেই মহামতি তবে ভাবি নিজ চিত।
কুলধর্ম শাস্ত্রনীতি সবে আচরিতে
অল্পজ্ঞানী লোক সবে নিয়ম বুঝিতে
নানাশাস্ত্র হতে এই বাছি বাছি মূল
একস্থানে লেখিলেন্ত বচন বহুল।—
মনে গুণি লেখিলেন্ত ফারসি এবাবতে।
যুক্তিহীন ক্ষুদ্রমতি কিতাব কথন
বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে করিলুঁ রচন।

এ কাজে গুরুর প্রবর্তনাও ছিল ঃ

দীন শেষ হৈল এবে যথ মুসলমান
অনাচার করে নিত্য হারাইয়া জ্ঞান।
তা নিবৃত্তে গুরু আজ্ঞা পাই হীনমতি
পয়ার প্রবন্ধে ইতি লেখিলুঁ ভারতী।—
ফায়দুল মুকতদী এই কিতাবের নাম
বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লেখিলুঁ উপাম।
শাহ আলি রজা গুরু পদে নমস্কার
বালক ফকিরে ভণে কিতাব বিচারি।

কাজী শাহাবুদ্দীন ও আলি রজা আঠারো শতকের শেষার্ধের ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। অতএব, বালক ফকিরও ঐ সময়কার কিংবা উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কবি।

ধ. (মুন্সী) মুহম্মদ মুকিম (পণ্ডিত)

ফায়দুল মুকতদীর অপর লেখক হচ্ছেন গুলেবকাউলি রচয়িতা উক্ত 'মুন্সী নাম মুহম্মদ মুকিম' এবং 'হায়রাতুল ফিকাহ' রচয়িতার স্বগ্রাম ইদিলপুরবাসী 'মুকিম পণ্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ'। ফায়দুল মুকতদী সম্ভবত কবির শেষ রচনা। তার আগে তিনি কালাকাম ও মৃগাবতী নামে দুটো প্রণয়োপাখ্যান এবং 'আয়ুব নবীর কথা' নামের নবী চরিতকথা রচনা করেন। কবির ভাষায়—

প্রেমরসকাব্য কথা সুগন্ধি শীতল
কালাকাম ভাঙ্গি কৈলুঁ পয়ার নির্মল।
মোরে আজ্ঞা দিল পীর রচিতে পয়ার
দেশীভাষে রঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার।
মৃগাবতী নামে আর পরীর নন্দিনী
মিত্রজনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী।
আয়ুব নবীর কথা আছিল কিতাবে
কিঞ্চিৎ লেখিলুঁ তাহে প্রকাশি পরায়।

কবির কালাকাম, মৃগাবতী ও আয়ুব নবীর কথা আজো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফায়দুল মুকতদীতে রচনাকাল রয়েছে ঃ

কিতাব হইল সাঙ্গ যেদিন অবধি
প্রকাশি কহিয়ে শুন দিন সন আদি।
ঋতুবেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়
ইতি সার জানমঘী সনের নির্ণয়।
শ্রাবণের শেষপক্ষ দিন জুমাবার
বেলা অবসানে হৈল পয়ার সুসার।

এর থেকে ১০৪৬+৮০+৯ = ১১৩৫ মঘী বা ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ মেলে। কিন্তু এ সন তাঁর পীর আলি রজার (১৭৫৯-১৮৩৭) বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না, তাই বিশুদ্ধপাঠ 'বেদ ঋতু চন্দ্র শত আশী আর নয়' হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অর্থাৎ ৪+৬+১ শত = ১১০০+৮০+৯০ = ১১৮৯ মঘী বা ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ। অতএব, কবি উনিশ শতকের প্রথমভাগে তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেন। কবি মুন্সী মুহম্মদ মুকিম পণ্ডিত কবি-দরবেশ আলি রজার (১৭৫৯-১৮৩৭) মুরিদ ছিলেন।

ন. ফয়জুল্লাহ

বাঙলা সাহিত্যে সম্ভবত চারজন ফয়জুল্লাহ ছিলেন। গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয় ও সত্যপীর প্রণেতা শেখ ফয়জুল্লাহ, সুলতান জমজমার কবি ফয়জুল্লাহ, পদাবলী রাগতালনামার মীর ফয়জুল্লাহ

এবং সত্যপীর প্রণেতা দোভাষী শায়ের ফৈজুল্লা। কারো কারো মতে মীর ও শেখ ফয়জুল্লাহ অভিন্ন ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা। ফয়জুল্লাহর সুলতান জমজমা পুথিতে তিনটে কাহিনী রয়েছে। অর্থাৎ মৃত সুলতান জমজমার শির ও ঈসা নবীর কিস্সা ছাড়াও তাতে আরো দুটো উপদেশাত্মক গল্প রয়েছে। একটি হচ্ছে, হযরত মুহম্মদ যখন আয়েশার সঙ্গে দাম্পত্য সুখে নিরুদ্বেগে তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন ক্রুদ্ধ আল্লাহ বলেন ঃ

শুন মুহম্মদ তুমি আমা পাসরিয়া — সৃজন করিল তোমা আমারে সেবিতে
আছিলা শয়ন-সুখে মাঝে নির্ভয় হইয়া— হিত উপদেশ কহি উম্মত পালিতে।

এখন নবীর ঔদাসীন্যের দরুন-কবির উম্মত তোমার নরক যাতন

পাপী কিবা পুণ্যবন্ত সব জনে জন।

তারপর ভীতত্রস্ত রসুল ঘর ছাড়লেন, অনুশোচনা কবলেন, ক্ষমা পেলেন। উপদেশ হচ্ছে কর্তব্যে ও এবাদতে উদাসীন ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে ঃ

শুন কহি গুণিগণ প্রলয়ের কালে
পাপ ফলে পাইব দুঃখ শুনরে সকলে।

হাসরের সময়ে রসুলেব উম্মতদের পাপপুণ্যের মাত্রা অনুসারে বিশ ভাগে বিন্যস্ত করা হবে। যারা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেছে, গুরুজনকে মান্য করেছে, হিংসা ঘৃণা পোষণ করেনি, পরোপকার করেছে, তারাই প্রথম শ্রেণীর পুণ্যবান।

দ্বিতীয় গল্পটিই হচ্ছে সুলতান জমজমা ও ঈসা নবীর বৃত্তান্ত। একদিন নবী ঈসা পথে এক মৃতলোকের মুণ্ডের দুর্গতি লক্ষ্য করে আল্লার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন

নিজ নুর দিয়া (মনুষ্য) তনু করিছ সৃজন
অবশেষে এতেক দুর্গতি কি কারণ।

আল্লার হুকুমে মুণ্ডধারী ব্যক্তি জীবন্ত হলেন। তিনি ছিলেন সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর প্রজাহিতৈষী দানশীল বিদ্বানানুরাগী আদর্শ রাজা। ইমান ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন গাজী পূজক। তাই চারশ' বছর ধরে সুশাসন করেও মৃত্যুর পরে তাঁর এই দুর্দশা হয়েছে। ঈসা নবীর আবেদনক্রমে আল্লাহ সুলতান জমজমাকে আবার বাদশাহ করলেন এবং ঈসা নবীর শিষ্যরূপে সত্তর বছর প্রজাপালন করে তিনি বেহেস্তের অধিকারী হলেন। এসূত্রে ষড়মুণ্ড আজরাইল, মৃত্যুযন্ত্রণা, কবর-আজাব, নরকযন্ত্রণা প্রভৃতির ভয়ালতা বর্ণিত হয়েছে। ফয়জুল্লাহ সম্ভবত আঠারো শতকের এবং কুমিল্লা অঞ্চলের কবি।

প. মুহম্মদ কাসিম

মুহম্মদ কাসিম নামে অপর এক কবিও 'সুলতান জমজমা' কাহিনী রচনা করেছিলেন। এ কবিও আঠারো শতকের শেষ পাদে কিংবা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এ উপদেশমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকে দোভাষী শায়ের বহুগ্রন্থ প্রণেতা মুহম্মদ খাতের এবং পুস্তক ব্যবসায়ী শায়ের গোলাম মওলাও [আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদের পিতা] এ বিষয়ে পুথি রচনা করেছিলেন।

ফ. হায়াত মাহমুদ

ইনি রংপুর জেলার ঘোড়াঘাটের 'ঝাড়বিশিলা' গ্রামবাসী ছিলেন। এঁর পিতার নাম শাহ কবির। ঘোড়াঘাটে কবির পিতা দেওয়ান ছিলেন। এর রচিত জঙ্গনামা (১৭২৩ খ্রীঃ), চিত্তউত্থান বা সর্বভেদবাণী (১৭৩২ খ্রীঃ), হিতজ্ঞানবাণী (১৭৫৩ খ্রীঃ) আম্বিয়া বাণী (১৭৫৮ খ্রীঃ) এবং কামালনসিয়ত ও ফকিরবিলাস—এ ছয় খানা কাব্য রয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

এখানে আমরা তাঁর রচিত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ 'হিতজ্ঞানবাণীর' পরিচয় দিচ্ছি। ১১৬০ সালে তথা ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে কবি বৃদ্ধকালে এ শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন পাঠকদের দোয়া পাবাব উদ্দেশ্যে ঃ

বৃদ্ধ যোগে ভাবি অতি বিরচিনু এই পুথি
সন এগারশত ষাট সালে
পড়িয়া শুনিয়া সবে আশীর্বাদ করে যবে
মোর গতি হয় অন্তকালে।

ওয়াজেব, একশ ত্রিশ ফরজ, ফরজ নামাজ, কেয়ামত প্রভৃতির শাস্ত্রীয় নানাকথা আলোচিত।

ব. ফৈজুদ্দীন

১৩৮৭ সনের মাঘ-চৈত্র সংখ্যা 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'য় অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভূঁইয়া শব-ই-মেরাজ রচয়িতা এক ফৈজুদ্দীন পরিচিতি ও তাঁর আদ্যন্ত খণ্ডিত কাব্য ছেপে দিয়েছেন, ভাষাদৃষ্টে মনে হয় কবি দোভাষী পুথির পাঠক এবং উনিশ শতকের উষাকালে রচিত তাঁর এ কাব্য। তিনি মূলত সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থের লিপিকর।

ভ. ননাগাজী

ননাগাজী নামের এক কবি ইব্লিসনামা রচনা করেছেন। ১৫ পত্রের ক্ষুদ্র পুথি। কি কি কাজে কিভাবে মানুষ শয়তানের কবলে পড়ে এবং তার থেকে সাবধান থাকার উপায় প্রভৃতি এ পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। ননাগাজী এক বাহাউদ্দীনের আগ্রহে ইব্লিসনামা রচনা করেছেন ঃ

হীন ননাগাজী বাহাদ্দিনের আজ্ঞাএ
ইব্লিসের যত কথা হইল আদাএ।

এ গ্রন্থ আঠারো শতকের শেষ পাদে কিংবা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত বলে মনে হয়। কারণ পাণ্ডুলিপিগুলোর লিপিকাল ১৮৫১, ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ।

ম. আবদুন নবী

আবদুন নবী নামের এক ব্যক্তি নসিয়তনামা ও কোরানের কায়দা তথা কোরআন পাঠের নিয়মাবলী রচনা করেছেন। আমীর হামজা (১৬৮০ খ্রীঃ) রচয়িতা আবদুন নবী ভিন্ন ব্যক্তি। এ আবদুন নবীই সম্ভবত গুলেবকাউলির কবি মুকিম উক্ত 'অতি বৃদ্ধ মহাশক্য আবদুন নবী'। অতএব আঠারো শতকের শেষার্ধের এ কবি উনিশ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন। এক পদকার আকবর আলিই সম্ভবত 'হাদিসের কথা' রচনা করেছেন আঠারো শতকে।

এসব শাস্ত্রগন্থ ছাড়াও উনিশ বিশ-শতকে বটতলার দোভাষী শায়েররা নানা বিষয়ে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে বাঙলার জিজ্ঞাসু মুসলিমদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। কেয়ামতনামার ফকিরচাঁদ, নামাজের কেতাবের আজমত আলী, মফীদুল মুমেনীনের আতাউল্লাহ, আসুরার সালাতের আবদুল ওহাব, মওতনামা ও আজাবুল কবরের আবেদ আলি খাঁ ও আশরাফ আলি খাঁ, নসিয়তনামার আবদুস সামাদ, ফরায়েজনামার ইসমাইল সেরেস্তাদার ও মুয়াজ্জম, নামাজ, দরুদ, কবর প্রভৃতির জনাব আলি, একশত বত্রিশ ফরজের মুহম্মদ খাতের, তম্বীয়তুননিসা, আহাকামুল জুমা, সেরাতুন মুমীন প্রভৃতি রচয়িতা মালে মুহম্মদ প্রমুখের নাম এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

য. মুজাফফর

কবি সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র চট্টগ্রামের প্রাচীন চক্রশালাবাসী কবি মুজাফফর 'ইউনানদেশের কথা' নামে এক পুস্তিকার প্রণেতা। কবি সৈয়দ সুলতানের পৌত্র মীর মুহম্মদ সফী এবং শরীফ শাহও কবি ছিলেন।

মুহম্মদ খান রচিত মক্তুল হোসেন কাব্যের মোহাম্মদ হানিফাব লড়াই পর্বের লিপিকর হিসেবে মুজাফফর নিম্নরূপ আত্মপরিচয় দিয়েছেন ঃ

সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি
কহে হীন মুজাফফরে এজিদ উত্তর।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে সহি।

মনুষ্যজ্ঞানের পরিমিতি ও মনুষ্যশক্তিব তুচ্ছতা এবং আল্লার অপার মহিমার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রীক পণ্ডিতদের অহমিকা, দাম্ভিকতা এবং পতনের কথাই এ ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

যবে বলে এ আকাশ হইয়াছে পুরান
আর এ কথা কহি শুন গুণিগণ
নামাই বদলি দিমু নবীন বয়ান।

ইনান (য়ুনান) দেশেব কথা শুন দিয়া মন। ভণিতা ঃ

ইনান দেশের লোক বহুল পণ্ডিত
হেন কহে মুজাফফর মুসলমানি সার
প্রভুর কদুরুত তারা পারএ গণিত।
রোজাতুন নামাজ হোন্তে করিবা উদ্ধার।
একদিন চারিজন বসি একত্তব
শেষঃ ইমান দেশের পুথি হৈল আদএ
আকাশ উপরে দৃষ্টি করে নিরন্তর
যেবা পড়ে যেবা শুনে বহু পুণ্য পাএ।

'আব এক কথা কহি শুন গুণিগণ' এভাবে আরম্ভ হওয়ায় মনে হয় এটি অন্য কোন পুস্তিকার বা পর্বের অংশ।

র. জিনাত

মধ্যযুগের বাঙলায় খণ্ড কবিতা বিরল। পাঁচালীর উপক্রমে স্তব-প্রশস্তি-বন্দনাদি রয়েছে বটে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা হিসেবে এরূপ বাঙলা রচনার অস্তিত্ব দুর্লক্ষ্য। হিন্দু-রচিত পাঁচালীতে থাকে নানা দেবদেবীর বন্দনা, মুসলিম-লিখিত কাব্যে পাই হাম্‌দ (আল্লাহ-স্তুতি) না'ত (রসুল প্রশস্তি) এবং আসহাব, পীর ও পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাম। আমাদের আলোচ্য স্তুতি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। এটিই কবিতার স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর নাম দিয়েছিলেন জগদীশ্বর স্তোত্র।[১] এ নাম তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল ঈশ্বর বন্দনা বললে এর তাৎপর্য অনেকখানিই থাকত অপ্রকটিত। কবিতাটি আঙ্গিকে স্তোত্র জাতীয় হলেও কসিদা, বন্দনা, স্তব কিংবা প্রশস্তিমূলক কবিতায় দুর্লভ ভাবচিন্তা একে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

৯´´ × ৫´´ পরিমিতি কাগজের বই। ডান দিক থেকে শুরু। অর্ধছিন্ন ও নিতান্ত জীর্ণাবস্থা। ধরতেই পত্র ছিড়ে যায় এমনি অবস্থা। লিপিকাল কিংবা লিপিকরের নাম নেই। প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো। ১-১০ পত্রে সমাপ্ত। পুরোপাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব।

প্রতিলিপির বয়স যদি দেড়শ বছর হয়, তাহলে কবির আবির্ভাবকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ অনুমান করা চলে। ভাষায় অবশ্য প্রাচীনতার ছাপ নেই। এমনকি উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও যদি এ কবিতা রচিত হয়ে থাকে, তাহলেও এর মূল্য কমে না। কেননা এতে যে উদার মন ও উন্নত চিন্তার পরিচয় পাই, তা সে যুগে তো বটেই, একালের উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যেও দুর্লভ।

আলোচ্য প্রশস্তিটি নানাগুণে বিশিষ্ট ঃ

ক. এর দুটো ভাগ। প্রথম ভাগের আল্লাহর মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও মানব-বোধের সত্য সম্পর্কে এক উদার ও নিরপেক্ষ দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। স্বল্প কথায় গভীর তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কবির অসামান্য ধীশক্তির ও প্রকাশ পটুতার পরিচায়ক। দ্বিতীয় ভাগে কবি আল্লাহ্‌র করুণা ও পাপ মুক্তি কামনা করেছেন।

খ. প্রথম ভাগে ব্যবহৃত ছন্দ মালঝাঁপ জাতীয় তরলপয়ার। মালঝাঁপে চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ণে মিল থাকে। আর তরলপয়ারে থাকে চরণের কেবল চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণে মিল। যেমন,

১. *সাহিত্য পত্রিকা ঃ শীত সংখ্যা, ১৩৭৩ সাল, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য।*

মালঝাঁপ ঃ সদাকাল সুরসাল হয় মাল ঝাঁপ। তরল পয়ার ঃ

রীতি এর মিলনের সোপানের ধাপ
চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার
মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি-অক্ষর আর।

চতুর্থেতে অষ্টমেতে থাকে মিল যার
ভিন্নাকারে বলে তারে তরল পয়ার।

শেষাংশ সাধারণ পয়ারে রচিত।

গ ঃ বিশ্বাসের অঙ্গীকারে ধর্মের উদ্ভব। ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে মানুষ সাধারণভাবে চিরকালই যুক্তিবিরোধী ও বিশ্বাসপ্রবণ, এবং সে কারণে গোড়া ও অসহিষ্ণু। চৈত্তিক সংকীর্ণতা ও গ্রহণবিমুখতা ধার্মিকতার অন্যবিধ লক্ষণ। আমাদের প্রাজ্ঞ কবি যুগ-দুর্লভ উদারতার ও মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আস্তিক আর ধার্মিক হয়েও তিনি কত সহজে ধর্মবুদ্ধির অসম্পূর্ণতার কথা দ্বিধাহীনচিত্তে অকপটে ব্যক্ত করেছেন, দেখে বিস্ময় মানি। কবি 'অন্ধ হস্তী' ন্যায় প্রয়োগে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। 'অন্ধের হস্তী দর্শন' নামের জনপ্রিয় গল্পের রূপক অবলম্বনে দুটো তত্ত্বের—ধর্মবুদ্ধির ও নাস্তিক্যের—রহস্য প্রকটিত। আটজন অন্ধের একজন ছিল রুগ্ন। যেতে পারল না সে হাতী দেখতে। সাত অন্ধ ফিরে এলো সাত প্রকার ধারণা নিয়ে। আর সাত ভাবে বর্ণনা দিয়ে তারা রুগ্ন অন্ধটিকে হাতীর স্বরূপ বোঝাতে পেল প্রয়াস। রুগ্ন ব্যক্তিটি দেখল ঃ 'সপ্ত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব অনৈক্য কথায়।' তখন তার মনে হল 'ভবে হস্তী স্বয়ং নাস্তি'। হাতী যদি প্রকৃতই থাকত তাহলে এদের বর্ণনাও অভিন্ন হত। অতএব সে হল নাস্তিক। তাই সে বলে তোমাদের বর্ণিত রম্ভা কুলা ডাণ্ডা মূলা স্তম্ভ বেড়া বা লাঠি'—স্বরূপ হাতী বাস্তবের নয়—কল্পনার, এবং সবকিছুর সমন্বয়ে হাতীর পুতুল তৈরি করে তোমরা ধোঁকা দিচ্ছ লোককে।

হস্তে ঠেলে হস্তী বলে শিশুরা খেলাএ
লোকে বোলে হস্তী চলে লোকেরে ভাড়াএ।

আবার, সব ধর্মের সত্য রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সত্য কোথাও নেই। কোনো একক মানুষের বোধের মধ্যে সত্য পূর্ণাবয়বে ধরা দেয়নি। খণ্ড সত্যকে অখণ্ড রূপে চালিয়ে দেবার ব্যর্থপ্রয়াসে তাদের জীবন ও মনন অপচিত। ধর্মান্ধদের গোড়ামির, চিত্তসংকীর্ণতার, গ্রহণবিমুখতার ও অসহিষ্ণুতার মূলে রয়েছে এ সীমিত বোধ ও বুদ্ধি। আল্লাহর পুরো ধারণা দেয়া যাচ্ছে না বলে আল্লাহ নেই বলা যেমন নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহ সম্বন্ধে সামান্য বোধকে পূর্ণ জ্ঞান বলে দাবী করাও তেমনি নির্বোধের অহমিকা মাত্র।

প্রত্যেকেই নিজের মত অভ্রান্ত বলেই জানে, কেননা, এর মূলে রয়েছে অন্ধের মতোই স্বতোপলব্ধ সত্যের বীজ। বিশ্বাসের দৃঢ়তা এসেছে এ পথেই। এর ফলেই জেগেছে স্বধর্মে আস্থা, আর পরধর্মে অবজ্ঞা। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পরধর্মবিদ্বেষের তথা অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মূলে রয়েছে এসব কারণ। কবি তাই বলেন ঃ 'শাস্ত্রিকের নাস্তিকের ধর্ম সে প্রকার'।

তার কথা মানে কোথা পর্শিয়াছে করে
আত্মকথা সপ্ত বৃথা প্রত্য নাহি করে।

অর্থাৎ একজনের আত্মোপলব্ধ সত্যও অন্যের প্রত্যয় জন্মায় না। একের সত্য অপরের আস্থা অর্জন করে না। কেবল যার যেই শাস্ত্র সেই জানে এই সত্য। কেননা, সবাই 'হস্তে ধরি দেখে করী মুদিয়া নয়ন'। ফলে 'জাতি যত শাস্ত্র তত নানা মত পাঁতি।' মনুষ্য জীবনের ও সমাজের বিড়ম্বনার, অনৈক্যের, বিদ্বেষের, অপ্রেমের ও কোন্দলের বীজও নিহিত এখানেই। ধর্মবোধই লালন করে মানুষের মন-মনন, দান করে রীতি-নীতি-আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করে প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ, বিকাশ ঘটায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের। কাজেই বিচিত্র ধর্মবুদ্ধিই বিভিন্ন মতের সম্প্রদায় ও নানা দ্বান্দ্বিক সমাজ গড়ে তুলেছে। মানুষের জীবনের অর্ধেক দুঃখ-বিপদ এসেছে ধর্মবৈচিত্র্য থেকে। আজো হয়নি তার অবসান। হবেও না হয়তো কখনো। কেননা, সবজানার, সব বোঝার ও সব থাকার অহমিকা থেকে এর উৎপত্তি।

জ্ঞান-অস্ত্রে শাস্ত্র-শস্ত্রে বুঝে পরস্পর
কাজেই, কি আফারে পূজি তারে কি লিখি মহিমা।

ঘ. কবি বলেন,

আদি যার নাহি তার অন্ত্য কোথা পাই
বুঝ সার করতার আদি অন্ত নাই।

কবির ধারণায় আল্লাহ লীলাময়ও—

যেই মানে যে না মানে পোষে দুই কূলে
আবার অকারণে, কার মাতা কার ভ্রাতা কার হরে পতি।
শিশু মরে যুবে মরে বৃদ্ধের সাক্ষাত।
কেবল তাই নয়, আঁখি পলে রসাতলে ক্ষেপে সে ভূপালে
সেইক্ষণে সিংহাসনে বসাএ কাঙ্গালে।
আজি কবে কিবা হবে নাহি বুঝি আজি
অগুস্পটে অপ্রকটে করে ছায়া বাজি।

কেবা জানে কোন স্থানে থাকে সে দয়াল
তিন ঘরে নৃত্য করে অসংখ্য পুতুল।
অতএব, মহিমার সিন্ধু তার নাহি পাএ কূল

আল্লাহ্ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাও রয়েছে তাঁর ঃ

ছিলে যেন আছ তেন থাকিবে তেমনি।
কার মধ্যে নহ তুমি কারে ছাড়া নাই
যথা দেখি মহিমা তোমার তথা পাই।
আঁখি হৈতে নিকটে ব্রহ্মাণ্ড হৈতে দূর।

আল্লাহ্র অপার মহিমা যে বর্ণনসাধ্য নয়, সে অনির্বচনীয়তার কথাও তিনি ইসলামি ভঙ্গিতে বর্ণন করেছেন (অবশ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধেও হিন্দুপুরাণে এমনি কথা রয়েছে) ঃ

শক্তি কার কহে তার মহিমার সীমা
যদি, সিন্ধু জলে বৃক্ষ ডালে লিখি নিরবিধি
তবু তার মহিমার অঙ্ক না পুরিবে।

ঙ ঃ সৃষ্টিলীলায় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ একটি চিত্তের পরিচয় মেলে গোটা 'হাম্‌দে'। আল্লাহর মহিমার অপরিমেয়তার কথা বলতে গিয়ে আলাউল-চিত্তেরও এমনি আকুলি বিকুলি শুনেছি আমরা পদ্মাবতীর 'প্রভুস্তুতি'তে।

আত্মত্রাণ-কামনায় কবির দ্বিতীয়াংশে যে স্তব করেছেন, তাও সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্জিত নয় কবির কণ্ঠে পাই আবদারের সুর, সে সুরে আছে স্বাতন্ত্র্য, আছে ভক্ত হৃদয়ের মাধুর্য। কবি বলেন ঃ

আমি হেন পাপীহ কাহারে নাহি পাই
তুমি হেন দাতাহ কোথায় কেহ নাই।
তুমি দাতা আমি পাপী যার যে কর্তব্য।
না হের আমারে হের আপনা দাতব্য।
আমি পাপী বলিয়া কি দাতব্য ছাড়িবে ?
সকলি তোমার সৃষ্টি কোথা খেদাইবে। ?

বিশেষত, যখন আমি দুঃখ পাইলে তোমার লভ্য নাই,
তখন হইলে তোমার দয়া আমি রক্ষা পাই।

কোন পুণ্যকর্মের দাবীতে এই মুক্তি-প্রার্থনা নয়, কবির একমাত্র ভরসা যে তিনি মুমীন ঃ

সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড যেই সখার কারণ
আমি তাকে তোমার প্রেমের সখা মানি
আর, তোমাকেহ (আল্লাহকে) আমি দৃঢ় মনে এক জানি।

সাধন-ভজনে অবহেলা সম্পর্কে নিজের সমর্থনে কবির যুক্তি এই ঃ

অন্তরে অনন্ত তুমি অনাদ্যের আদ্য

কাজেই দয়া করে ক্ষমা কর পাপ হর দেহগো নিস্তার।

পরিশেষে সব মুমীনের মতোই কবিও কামনা করেছেন, ইমানের সাথে মৃত্যু ঃ

দীনহীন জিনতের এই মনস্কাম
দেহ ত্যাগে লইয়া তোমার আদি নাম।

চ ঃ আল্লাহ্‌র মহিমার অনুধ্যানে কবি আশ্রয় করেছেন ইসলামি ইতিকথা। তিনি এ সূত্রে স্মরণ করেছেন শাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, আবাবিল পাখী, হযরত আদম-হাওয়া, ইউসুফ, সোয়ালমান ও রসুল মুহম্মদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বলেছি এ প্রশস্তি কবিতাটি নানাগুণে অনন্য। ললিতমধুর ছন্দের লাবণ্যে, কবিতার আঙ্গিক সৌষ্ঠবে, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার অবতারণায়, আল্লাহর অনির্বচনীয় মহিমার অনুধ্যানে মুসলিম ঐতিহ্যের অনবরত সুপ্রয়োগে, মনের স্বচ্ছতায়, চৈত্তিক ঔদার্যে, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতায়, সিদ্ধান্তের ঋজুতায় এবং পরিস্রুত মননের সামগ্রিক প্রতিফলনে কবিতাটি বিশিষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

সওয়ালসাহিত্য

দেশী মুসলমানের পক্ষে ইসলাম ছিল সুদূরের, শাস্ত্রের ভাষা ছিল অনায়ত্ত, ঐতিহ্য ছিল অজানা। তাই তথ্যে ও তত্ত্বে, জ্ঞেয়ে ও জ্ঞানে, সত্যে ও কল্পনায়, প্রাপ্তিতে ও প্রত্যাশায় তারা সঙ্গতি-সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেনি কখনো। ফলে একদিকে যেমন সূফীমতের আবরণে দেশী ঐতিহ্য তাদের অধ্যাত্ম সাধনা চলেছে, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাও আকৃষ্ট করেছে তাদের। জীবনের বাস্তব প্রতিবেশের ও আদর্শের জগতের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর। সাধে ও সাধ্যে ছিল না সমতা। তাই জ্ঞেয় ও জ্ঞান—দু-ই লঘু ও মনগড়া এবং ক্ষেত্রবিশেষ প্রাতিভাসিক।

কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় মন-মতের ও শাস্ত্রশাসিত সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনধারার ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এ সব রচনার মূল্য তুচ্ছ নয়।

গ্রীক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চার ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সেকালের গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসুর ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সব রকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাঙলাভাষায়ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও অনুশীলন গ্রন্থে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহ্র সওয়াল, মালিকার হাজার সওয়াল, গদা-মালিক সম্বাদ, সিরাজকুলব, হরগৌরীসম্বাদ, তালিবনামা, হায়রাতুল ফিকাহ প্রভৃতি উক্ত রীতিতে লিখিত বাঙলাগ্রন্থ। এই বৈশিষ্ট্যে গুরুত্ব দিয়ে এগুলোকে 'সওয়াল সাহিত্য' নামে চিহ্নিত ও অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

একের অভিজ্ঞতাই অপরের কাছে জ্ঞান। কাজেই অভিজ্ঞতায় লভ্য জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার চিরকালই মন্থর। তা ছাড়া অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিকতায় জন্মায় পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞান, সব ক্ষেত্রে তেমন পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটে না। তাই আদি কালের মানুষের নানা বিষয়ক অনেক জ্ঞানই ছিল ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যোগ্যতা তখনো অর্জিত হয়নি। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যতো প্রশ্ন মনে জেগেছে তার বুদ্ধিগ্রাহ্য ও কল্পনাপ্রসূত উত্তর সন্ধান করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এমনি মনোময় ধারণা ভিত্তিক শাস্ত্র, জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষের জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা।

বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ সাধারণত উদাসীন। তাই জ্ঞান, বিদ্যা ও ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ পরবুদ্ধিজীবী ও পরচিন্তানুসারী। তা ছাড়া আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার ঘরোয়া ও সামাজিক সমর্থনে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্তরে উন্নীত হয়ে ধর্মশাস্ত্রীয় বিশ্বাসে পরিণতি পায়। এ কারণেই আজকের দিনেও মানুষ বিদ্যালব্ধ জ্ঞানকে অবহেলা করে এবং শাস্ত্রোক্ত সত্যকে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়। সুতরাং মানবসভ্যতার শৈশব-বাল্যের সে-সব ধ্যান-ধারণা জগৎ-চিন্তা ও জীবন-ভাবনা আজো পরচিন্তানুসারী উদাসীন মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যেসব রহস্যজিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আকুল করেছে, সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতিজ্ঞানপ্রসূত উত্তরদানের চেষ্টা আছে 'সওয়াল সাহিত্যে'। যেহেতু জগতের ও জীবনের উৎস ও আধার হচ্ছেন স্রষ্টা আল্লাহ, সেহেতু জ্ঞানও আল্লাহপ্রোক্ত। রসুলের মাধ্যমে সে-জ্ঞান প্রচারিত ও প্রচলিত হয় মর্ত্যে। তাই মুসলিমজীবনে হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি নবী পরম্পরায় জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মুহম্মদ আকিলের মুসানামা, নসরুল্লাহ খোন্দকারের মুসার সওয়াল, আবদুল করিম খোন্দকারের হাজার মসায়েল, ফয়জুল্লাহ্র সুলতানজমজমা, শেখ চান্দের তালিবনামা,

হরগৌরীসম্বাদ ও শাহদৌলাপীর, মুহম্মদ খানের সত্যকলিবিবাদসম্বাদ, আলি রজাব সিরাজকুলুব, এতিম আলমের আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, শেখ সাদীর গদা-মালিকা সম্বাদ, সেববাজের মালিকার হাজার সওয়াল বা ফক্করনামা, সৈয়দ নুরুদ্দীনের মুসার সওয়াল, মুহম্মদ আলীর হায়রাতুল ফিকাহ্, আদম ফকিরের জোহরার সওয়াল, মুহম্মদ খাতেরের সওয়াল ও জওয়াব প্রভৃতিতে মুখ্যত শাস্ত্রীয় জ্ঞান দানের চেষ্টা আছে। সে-জ্ঞান কখনো শরীয়তী, কখনো বা মারফতী। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা ধর্মশাস্ত্রানুগ নয়—লৌকিক বিশ্বাস ও শ্রুতিস্মৃতিভিত্তিক। লেখকদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা অধ্যাত্মতত্ত্বে আগ্রহ, পীরনির্ভরতা ও দেশগত লৌকিক সংস্কারের প্রভাবই এ বিকৃতির মুখ্য কারণ। তা ছাড়া মুমীনের কাছে কোরআনই সব জ্ঞানের ও চিরন্তনতত্ত্বের উৎস ও আধার। এ বিশেষ তাৎপর্যেই হয়তো লেখকেরা সব বিষয়েই প্রায় নির্বিচারে কোরআনের, রসুলের ও আল্লাহ্র দোহাই বরাত দিয়েছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই না জেনে দিয়েছেন, জেনে দিয়েছেন ক্বচিৎ। কাজেই তাঁদের পরিবেশিত সত্য ও শাস্ত্র, তথ্য ও তত্ত্ব, তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা, তাঁদের লব্ধজ্ঞান ও তাঁদের অর্জিত ধারণা তাঁদের কল্পনার ও জীবন-ভাবনার প্রসূন মাত্র। সাধারণ সত্য কিংবা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক পরোক্ষ কিংবা অনির্ণীত।

শাস্ত্রকথার ফাঁকে ফাঁকে অন্য জ্ঞানদানের চেষ্টাও আছে। কিছু ভৌগোলিক কিছু পৌরাণিক, কিছু প্রাকৃতিক জ্ঞানদানের আয়োজন যেমন রয়েছে, ধাঁধা-হেঁয়ালীর ব্যবস্থাও তেমনি বিরল নয়। বিদ্যা ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্যে অথবা রহস্যচিন্তা উদ্রিক্ত করার জন্যেই হয়তো এগুলো দেয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে ধাঁধা-হেঁয়ালীর উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার্য।

মধ্যযুগের এই গ্রন্থের লেখকরা লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ দৃষ্টিতে এঁদের 'সওয়ালসাহিত্য'কে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতিস্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো। আর এভাবে লব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবাবিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে হত যত্নবান। সেদিক দিয়ে এ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা, এতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলেও সমাজশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল, একটি স্থূল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতন-পথ রুদ্ধ রেখেছিল।

১. মুহম্মদ আকিল

মুহম্মদ আকিলের পুথিতে একটি ভণিতা পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কবির পরিচয় জ্ঞাপক আর কিছু পাওয়া যায়নি। নানা কারণে আলোচ্য কবি মুহম্মদ আকিলকে আমাদের প্রাচীনতর কবিদের মধ্যে অন্যতম বলে মনে হয়।

এক, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত পাণ্ডুলিপিই আঠারো শতকে এ পুথির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দুই, প্রায় সমকালীন দুই পাণ্ডুলিপিতে পাঠান্তরের প্রাচুর্য এ গ্রন্থের বহুল চর্চা ও প্রাচীনতার আভাস দান করে। তিন, সতেরো শতকের শেষার্ধের ও আঠারো শতকের এ বিষয়ক গ্রন্থগুলোর নাম মুসার সওয়াল এবং এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গেও সওয়াল শব্দটিযুক্ত রয়েছে যেমন, আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, মল্লিকার হাজার সওয়াল ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সওয়াল সংখ্যাও অনেক বেশি। তাই বইগুলো আকারেও বড়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের নাম 'মুসানামা' এবং এর সংক্ষিপ্ততা ও একাধিক ভণিতার অভাব প্রাচীনতাদ্যোতক। বিশেষ করে সতেরো শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকে 'মুসার সওয়াল' যখন সওয়ালাধিক্য, বিষয়ে বিস্তৃতি ও বৃহদাকার লাভ করেছে, তখন মুসানামার মত সংক্ষিপ্তগ্রন্থ রচনার প্রয়াস—মনে সহজেই সংশয় জাগায়। চার, এ জাতের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের বিষয়বস্তুতেও এ গ্রন্থের তেমন মিল নেই।

এ সব বিষয় বিবেচনা করে আমরা মুহম্মদ আকিলকে সতেরা শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে অনুমান করি। নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া না গেলে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু বলা যাবে না। ক'নে (কে) থু (থেকে) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখে তাঁকে চাটগাঁর কবি বলে মনে হয়।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানবমনের চিরন্তন প্রশ্নের মনোময় উত্তর খোঁজা হয়েছে। কেতাবীদের বিশ্বাস হযরত মুসা 'তুর' পর্বতে বসে আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করে করে জগৎ ও জীবনের নানা তত্ত্ব জেনে নিতেন। সাঁইত্রিশ শ' বছর আগেকার হযরত মুসার সে তত্ত্বালোচনা আজো প্রাকৃত মনের কৌতূহলাবেগ তৃপ্ত করে। বলেছি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানবমনে যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা রয়েছে তারই জবাব খুঁজেছেন কবি। মুহম্মদ আকিল প্রাকৃতজনের কবি, তার সিদ্ধান্তও তাই প্রাকৃত মনানুগ। জগৎ ব্যাপারে কবি স্রষ্টার অনন্ত মহিমায় ও সৃষ্টির বিরাটত্বে অভিভূত এবং জীবন সম্পর্কে নারীমহিমায় মুগ্ধ।

হযরত মুসা আল্লাহকে প্রশ্ন করেছেন ঃ

যেখনে না ছিল পূর্বে স্বরূপ আকার
কোহ্ন রূপে কথাএ আছিলা করতার।
যেখনে না ছিল কিছু দুনিয়া পত্তন
কথাএ আছিলা প্রভু কহ নিরঞ্জন।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

যেখনে আছিলাম পূর্বে জান ব্রহ্ম কাএ
অখনেহ আছি তথা জান সর্বথাএ।
সেই স্থান এড়ি আহ্মি কথাহ না যাই
ত্রিভুবনের লক্ষ্য আহ্মি আহ্মার লক্ষ্য নাই।
সর্বঘটে আছি আহ্মি ভাবি চাহ মন
বাহিরে ভিতরে আহ্মি আছি সর্বক্ষণ।
আঠার হাজার আলম হইব নিধন ;
কদাচিৎ না টলিব মোর সিংহাসন।....
আকাশের তারা যথ সমুদ্রের ধূলি।....
একস্থানে বসি আহ্মি দেখিএ সকল
হস্ত নাহি আহ্মার নাহিক রূপ রেখ
সুরত সূরত নাহি জানিঅ প্রতেক (প্রত্যক্ষ)
বালি হন্তে ছোট আছি আহ্মি সর্বথাএ
হারাইতে না পারি আহ্মি জানিঅ নিশ্চয়।
সর্বঘটে আছি আহ্মি দুগ্ধ মধ্যে ননী
জল মধ্যে বিন্দু আহ্মি ঢেউ মধ্যে পানি।
আহ্মার দর্শন হেতু চাহে যেই জনে
আপনা আতমা সে সেবিব আপনে।
আত্মা চিনিয়া সিদ্ধি ঘরে কৈল সার
নিশ্চয় পাইব সে আহ্মার দিদার।

আল্লাহর সৃষ্ট জগৎগুলো হচ্ছে হাজার 'হাজার ডিম্বস্বরূপ। কৌতূহলী মুসা' একডিম্বে প্রবেশ করে দেখেন—রবি-শশী, সপ্তসাগর, জল-স্থল-কানন-গগন-দেও-পরী-পক্ষী-নর। এভাবে সতেরো হাজার বছর এক ডিম্বে ভ্রমণ করেও এক ডিম্বেরও 'ওর' বা সমগ্ররূপের নির্ণয় পেল না। কাজেই 'আঠারো হাজার আলমে না জানি কথেক'। কবি জননীর ও জায়ার মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন। জায়াঃ

শরীরের অর্ধঅঙ্গ ঘরের রমণী
দুই হস্তে দুনিয়াতে ভাবের ভাবিনী
নারী না থাকিলে পুরুষ কিছু না হএ
নারী-পুরুষ এক জানিঅ নিশ্চিএ।
পুরুষ আর্ত জান রমণীর হাতে॥

এছাড়া রয়েছে গুণ-জ্ঞানও পাপপুণ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ। সতেরো শতকের মানসধর্মের সাক্ষ্য হিসেবে মুসানামার মূল্য কম নয়।

২. শেখ সাদী

গ্রন্থে কবি শেখ সাদী 'রাজপ্রশস্তি' করেছেন। সেই প্রশস্তি থেকে পরোক্ষে কবির আবির্ভাবকাল ও কাব্যের আনুমানিক রচনাকাল নিরূপণ করা সম্ভব। প্রশস্তির প্রয়োজনীয় অংশ এখানে বিধৃত হচ্ছে ঃ

ত্রিপুরা নামেতে এক আছএ দেশ
এবে আমি কহি কিছু তাহাব উদ্দেশ।
ধর্মবন্ত নরপতি মহিমা সাগর
অবিশ্রান্ত দান ধর্ম করে নিরন্তর।....
রত্নসেন নামে তথা বৈসে মহারাজা
কুকি মেখল সব করে যার পূজা।
চম্পা রাএ নাম তাত ধর্ম যুবরাজ
রাজ্যের পালন করে মন্ত্রীর সমাজ।

ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের সময়ে শেখ সাদী তাঁর কাব্য রচনা করেন। রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল ১০৯২-১১২২ অথবা ১১১৬ ত্রিপুরাব্দ. ভূপেন চক্রবর্তীর মতে ১৬৮২ থেকে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ অবধি। রত্নমাণিক্য মহারাজ রামমাণিক্যের সন্তান। সিংহাসনারোহণ কালে রত্নমাণিক্যের বয়স ছিল পাঁচ বছর। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে বয়োপ্রাপ্ত রাজা শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। রামমাণিক্যের দ্বিতীয় ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পক রায় কিছুকাল রত্নমাণিক্যের প্রথমে দেওয়ান ও পরে যুবরাজ ছিলেন। 'চম্পক বিজয়' গ্রন্থ এই চম্পক রায়ের কীর্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে-গ্রন্থ অপ্রকাশিত ও অনালোচিত।

চম্পক রায় ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দেই যুবরাজ হন এবং বয়োপ্রাপ্ত রাজার আমলে ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের অনতিকাল পরে কোন সময়ে নিহত হন। এতে মনে হয়, শেখ সাদী ১৬৮৪-১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

লোক উপকারী ছিল চম্পারায়।
ধর্মশীল কীর্তিমন্ত সবে গুণ গায়॥

—এটি সম্ভবত চম্পক রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের কোন লিপিকারের সংশোধিত পাঠ। অথবা এটিই শুদ্ধ পাঠ। তা হলে মানতে হবে যে চম্পক রায়ের মৃত্যুর পরে কোন সময়ে সাদী তাঁর কাব্য রচনা করেন। অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত [?] একটি খণ্ডিত পুথিতে দুটো অর্থপূর্ণ চরণ পাওয়া যায় ঃ

পড়িয়া বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ।

একাদশ বিংশ দুই= ১১২২। এটিকে ত্রিপুরাব্দ ধরলে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও একে রচনার তারিখ ও বঙ্গাব্দ রূপে ধরে ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে 'গদা-মালিকা' রচিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক আলী আহমদও বলেন, "আমরা যদি ধরিয়া লই যে, শেখ সাদী তাঁহার গদা-মালিকা কাব্য ১৬৮৪ (সনের) পরে ও ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন তবে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়।"[১]

চম্পক রায় যখন চট্টগ্রামে পলাতক-জীবনযাপন করছেন, তখন এই শেখ সাদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে চম্পক রায় সাদীকে বলেছেন[২] ঃ

ত্রিপুর বংশেত জন্ম বসি উদয়পুর
জ্ঞাতি সঙ্গে বাদ করি হইছি বাহির।

সাদী নিজে বলেছেন ঃ

শেখ সাদী তাত ক্ষুদ্র একজন
সভাসদে বড় সে যে অতি বিচক্ষণ।

সম্ভবত ধার্মিক সাদীর দ্বারা পলাতক চম্পক রায় দুর্দিনে উপকৃত হয়েছিলেন এবং সৌভাগ্য-উদয়ে তিনি সাদীকে উদয়পুরে এনে রাজদরবারে কোন চাকুরী দিয়েছিলেন। অতএব শেখ সাদীর জন্মভূমি তথা পিতৃভূমি সম্ভবত চট্টগ্রাম।

কবি শেখ সাদী রচিত 'গদা-মালিকাসম্বাদ'ও সওয়ালসহিত্য। অন্যান্য সওয়াল সাহিত্যে মুসা ও আল্লাহ্, আলী ও রসুল মুহম্মদ, হর ও গৌরী, আবদুল্লাহ ও রসুল, শিষ্য ও পীর প্রভৃতির কথোপকথনের মাধ্যমে গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়েছে। পাঠকের ও শ্রোতার কৌতূহল জাগাবার উদ্দেশ্যে শেখ সাদী ও কবি সেরবাজ স্বয়ম্বরকামী বিদুষী রাজ্ঞী বা রাজকন্যা কর্তৃক বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভাবী বরের যোগ্যতা পরীক্ষাচ্ছলে প্রশ্নোত্তর পরিবেশন করেছেন। কবির উদ্দেশ্য সফল

---

১. *বাঙলা একাডেমীতে রক্ষিত। 'বাঙালী কবি শেখ সাদী' প্রবন্ধ পৃ. ১৬।*

২. *মৎসম্পাদিত সওয়ালসাহিত্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।*

হয়েছিল। তার প্রমাণ কবি শেখ সাদীর ও কবি সেরবাজেব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কুমিল্লায় চট্টগ্রামে আজো সুলভ। বোঝা যাচ্ছে সন্ধানী পাঠক-শ্রোতা পবম আগ্রহে উক্ত দুটো পুথি পড়েছেন ও শুনেছেন। রোমান্সের মোড়কে নীরস ধর্মকথা শোনানোর এই সদিচ্ছা এ কালের মিষ্টি-ওষুধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্নোত্তবের কিছু নমুনা দিচ্ছি। শাস্ত্র কথায় দলিল হিসেবে নিঃসঙ্কোচে কোরআনেব আয়াতের দোহাই দেয়া হয়েছে, যদিও কোরআনে তা কৃচিৎ মিলবে। দেশ-দুনিয়ার নানা কথাও প্রশ্নোত্তরে বিধৃত। আব প্রহেলিকাও বিরল নয় ঃ

প্রশ্ন ঃ কোথা হন্তে আসিয়াছ কহ তুমি সাচ্ ?
কোন স্থানে থাক তুমি কহ মোর ঠাই ?
উত্তব ঃ পিতার ঔরস আর মাতৃগর্ভ হতে
নানা স্থানে থাকি আমি স্থান স্থিতি নাই।
প্রশ্ন ঃ কি খাও এবং কি পান কর ?
উত্তর ঃ খাই আখেরের গম এবং 'গুনা পিই অবিরত'।

আল্লাহর উদ্ভব, বসুলসৃষ্টি ও জগৎ-পত্তনের দীর্ঘ বর্ণনার পরে—

প্রশ্ন ঃ তবে পুছে কথা হতে স্বর্গ নরক সৃজন?
উত্তর ঃ আল্লার গজব দৃষ্টে দোজখ হইছে
কোহ্তুরের দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।

অন্যত্র, (আল্লার গৌরব দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।)

প্রশ্ন ঃ তবে পুছে রবি শশী কা হতে জন্মিল ?
বীর্যের উৎপত্তি বোল কিরূপে হইল ?
উত্তর ঃ প্রভুর ধ্যান হইতে তারা (রবী শশী) উপজিল।
নূরের যে অঙ্গ হতে (বীর্য) ফকিরে কহিল।

তারপর, দিন রজনী, সুমেরু কুমেরু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত।

প্রশ্ন ঃ আব আতশ খাক বাত কিরূপে হইছে ?
উত্তব ঃ নূরের অঙ্গের ঘর্মে প্রভুএ সৃজিছে;

রিজিক ও দৌলত ঃ

পূর্বদিক হন্তে জান রিজিক আইসএ
পশ্চিম দিক হন্তে দৌলত জানিও নিশ্চএ।

দেহের হাড়েরও রগের সংখ্যা ঃ

–গদা বোলে তিনশত ষাটখান জান।
তিনশত ষাট 'রগ' জানিও নিশ্চএ।

মালিকা এবার প্রহেলিকার আশ্রয়ে প্রশ্ন করল ঃ

তবে আর এক কথা পুছে মালিকাএ
এক বৃক্ষের বার ডাল আছএ নিশ্চএ।
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত,
বেশ কম নাহি জান সমসর তাত।
এক পুষ্ঠে 'ছহা' রঙ্গ শুন কহি সার।
এক এক পত্র মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।

উত্তর হচ্ছে ঃ

বৃক্ষ হল বৎসর, ডাল হল মাস, পাতা হল দিন,
পাতার সাদা কাল রঙ হল দিবা-রাত্রি এবং
পঞ্চফুল হচ্ছে দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ নবী বাদশাহও ছিলেন ?
উত্তর ঃ ইউসুফ, সোলেমান, জুলকর্ণ ও মুহম্মদ–এই চারজন।
প্রশ্ন ঃ চিরজীবী কারা ?
উত্তর ঃ ঈসা আর ইলিয়াস, আশি আজগর (ইদ্রিস)
খিজির যে পয়গম্বব এই জান চার।

এঁদের মধ্যে ঈশা ও ইদ্রিস যথাক্রমে আকাশে ও স্বর্গে বাস করেন, এবং খিজির জলে এবং ইলিয়াস স্থলে বিচরণশীল।

আরো কিছু তত্ত্বকথা ঃ
নামাজ দীনের 'ঠুনি' বোলএ ফকিরে।
রোজা দীনের টাটি জানিঅ নিশ্চয়।
এলম দীনের 'ছানি' ফকিরে যে কএ।

কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তামাক সেবন ঃ

গদা কহে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।
অন্ন হতে তামাকু জানিব বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে
হাঁটিতে চলিতে লোকে পিব পথে পথে।
পিতায় তামাকু পিতে পুত্রে করে আশ
তামাকু তু করিবেক ভুবন বিনাশ।

কলিযুগে অন্যান্য লক্ষণ ঃ

ক. লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার
বে-ইমান হৈব লোক সংসার মাঝার।
খ. নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ না থাকিব
পুরুষ নারীর কথা ধরিয়া চলিব।
পুরুষের কথা কভু নারী না ধরিব।
গ. বাপে পুতে দ্বন্দ্ব করিব প্রতিনিত —
ঘ. সোয়ামীর সহিঁতে নারীর না রৈব পিরীত।
ঙ. অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
চোর উজ্জ্বল রৈব সাধু হৈব মলিন
চ. বিষৎ-প্রমাণ জান নর সব হৈব।

আল্লাহ, রসুল ও কোরআনের দোহাই দিয়েই বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্যে কবি তাঁর কাব্যকে ফারসি কাব্যের অনুবাদ বলে দাবি করেছেন।

মুঞি দাসাধম কিছু কিতাব দেখিয়া
শেখ সাদীএ কহে পাঁচালী রচিয়া।
এক নিবেদন করম সবার চরণ
ফার্‌সি বাঙ্গালা করি করিলুঁ বচন।
যে সবে কিতাব না পড়িছে পৃথিবীত
সে সকলে বুঝিবার করিলুঁ রচিত।

এমনকি 'কোরান আয়াত পড়ি' ফরিক দেহে চাঁদ-সূর্য-নক্ষত্র-পবন আর রাশি-চক্রের সংস্থিতিও বর্ণনা করে।

৩. এতিম আলম

সওয়ালসাহিত্যের অন্তর্গত আর একখানা গ্রন্থ হচ্ছে কবি এতিম আলমের 'আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল'। হাজার মসায়েল নামে একই বিষয়ে আবদুল করিম খোন্দকারও অপর একটি কাব্য রচনা করেছেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর খবদেশের ইহুদী নৃপতি সালামপুত্র আবদুল্লাহকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে হযরত মুহম্মদ এক পত্র লেখেন। পত্র পেয়ে মুহম্মদের নবুয়তের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে আবদুল্লাহ সপ্রজা ও সসৈন্য মদিনায় আগমন করলেন। এবং মুহম্মদকে এক হাজার প্রশ্ন করে ও সদুত্তর পেয়ে তিনি সপ্রজা ইসলাম কবুল করে ধন্য হলেন।

ইসলামোত্তর যুগের উপকথানির্ভর এসব গ্রন্থ মৌলিক রচনা নয়। আরবি-ফারসি গ্রন্থোক্ত কাহিনীর পল্লবিত বাঙলা রূপায়ণ মাত্র। অতএব মূলানুগত্য যেমন রয়েছে, দৈশিক-লৌকিক প্রভাবও তেমনি ঠাঁই পেয়েছে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এতিম আলমের গ্রন্থের একখানিমাত্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। সেটিই আমাদের অবলম্বন। পুথিপরিচিতির ক্রমিক ২৪৯ সংখ্যক বিবরণী এ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

এতিম আলম সম্বন্ধে আজো কিছু জানা যায়নি। এই একটিমাত্র আবিষ্কৃত পুথিই তাঁর নাম ও কৃতি স্মরণীয় করে রেখেছে।

কবির পীরের বা মুরশিদের নাম শাহ কুতুব বা মনওর। 'শাহ কুতুব (মনওর) মোর মুর্শিদের নাম।' এবং কবি এ পাঁচালী 'নিজ মনে কল্পি কহে কিতাব হেরিয়া'।

ইহুদী রাজা আবদুল্লাহ গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। রসুলের আহ্বানপত্র পেয়ে তিনি অভিযানে অহঙ্কারে রুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হন নি বরং মুসা নবীর বাণী উল্লেখ করে তাঁর প্রজাদেরকে শেষ নবী মুহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণের পরামর্শ দিলেন।

তিনি বললেন—

আবদুল্লার সুত নবী মোহাম্মদ নাম
আল্লার পরম সখা গুণে অনুপাম।
অবশেষে হইবেক রসুল প্রধান
পৃথিবীতে না হৈছে তাহান সমান।
যদি সে কহিতে পারে বচন আহ্মার
নিশ্চয় জানিব তারে রসুল আল্লার।

প্রশ্ন ঃ কোন্ চারি চিজ বাড়া (শ্রেষ্ঠ) ভুবন মাঝার ?
উত্তর ঃ মানুষ, স্বর্গের তুবাবৃক্ষ কোরান এবং ভিহিস্ত।
প্রশ্ন ঃ কোন্ সংখ্যা কার বা কিসের প্রতীক ?
উত্তর ঃ এক-আল্লাহ, দুই-আদম-হাওয়া, তিন-তালাক, চার-চার কিতাব
পাঁচ-নামাজ, ছয়-সৃষ্টিপত্তনের ছয়দিন, সাত-আকাশ ও পাতাল,
আট-আল্লাহ্‌র, অষ্ট ফিরিস্তা ইত্যাদি।

অতপর দ্বিতীয় পর্বে সৃষ্টিতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত রয়েছে। সপ্তম আকাশে রয়েছে আবে হায়াতের নদী। তার কাছে আছে আর এক নদী, তার জল সুবাসিত এবং তাঁর নাম 'কমকম'। এক এক আকাশের এক এক রঙ, এক এক অমূল্য পাথরে ও ধাতুতে নির্মিত—এয়াকুত, জমরুদ, রজত, কাঞ্চন, মুক্তা, লাল।

প্রশ্ন ঃ চন্দ্রসূর্য আছে কোন্ আকাশ উপর ?
উত্তর ঃ চতুর্থ আকাশ 'পরে আছে দিবাকর
প্রথম আকাশে চন্দ্র থাকএ নিশ্চিত।

আটস্বর্গ ঃ রজতের নির্মিত দারুসসালাম, এয়াকুতের করার, জমরুদের খয়রল, জবরুদের ইদ্রিস, মুক্তার চুমাহোজ, মাণিক্যের আদনান, নূরের জিন্নত।

নবীদের পুরুষানুক্রমিক পরিচিতিঃ

আদম-শিশ-ইনুস-হুনান-মোহালাল-ফর-আক্কাস-মসুয়া-মলক-নূর-শাম-আফতমা-শেখ-হুদ-কাতেয়া-আগুয়াস-তাখুর-তারক-আজর-ইব্রাহিম খলিল-ইসমাইলএকদার-হাম-কএস- সজীব-আলাম-বসিয়া-আহুদ- আদ-আদনান-সায়াদ-নজীব-মর্জর-ইলিয়াস-মদ্রক-আদিয়া-কর্নিয়ান-নজর-

মালিক-কএর-গালিব-ওহাব-আদিয়ন-মরত নসর-কুলাব-কৌস-আবদুল মুনাফ-হাশিম-মুত্তালিব-আবদুল্লাহ-মুহম্মদ।

এইভাবেই চিরকাল লোকসাধারণ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে এবং শাস্ত্রকথারূপে এগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করেছে। তাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাদের জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা।

৪. আলি রজা [১৭৫৯–১৮৩৭]

ইদানীং সাহিত্যক্ষেত্রে আঠারো শতকের কবি আলি রজার নাম সুপরিচিত। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর রচিত সব কয়টা গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রচিত পদাবলী এবং জ্ঞানসাগর প্রকাশিত করে এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যবিশারদ আলি রজাকে বাঙালী পাঠকের কাছে প্রখ্যাত করে তোলেন। আলি রজা পদাবলী, আগম-জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা (সঙ্গীত শাস্ত্রগ্রন্থ), সিরাজ কুলব রচনা করেছেন। 'ষটচক্রভেদ' কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়। এটি ধ্যানমালার একটি অধ্যায় এবং আলোচ্য বিষয় রাগসংস্পৃক্ত ষড়ঋতু। এটি জ্ঞানসাগরেরও একটি সর্গ।

চট্টগ্রাম জেলার আধুনিক আনোয়ারা থানার ওশখাইন গাঁয়ে ছিল আলি রজার নিবাস। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ শাছি এবং পিতামহের নাম মনোহর আর প্রপিতামহ মুহম্মদ আকবর। তাঁর একাধিক স্ত্রী ও অনেকগুলো সন্তান ছিল। পুত্রদের মধ্যে এর্শাদুল্লাহ ও শরফতুল্লাহ পদকার ছিলেন। এঁরা পিতাকেই পীর করেছিলেন। আলি রজা স্বকালে ওয়াহেদ কানু বা কানু ফকির নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দরগাহ ও বংশধর আজো বর্তমান। আলি রজা ছিলেন গৃহী দরবেশ। পীরালি ছিল তাঁর পেশা। উনিশ শতকের কবি 'ফায়দুল মুকতদী' ও 'জ্ঞানচৌতিশা' প্রণেতা বালক ফকির, ফায়দুল মুকতদী প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা মুনসী মুহম্মদ মুকিম ছিলেন তাঁর মুরিদ বা শিষ্য। আলি রজা সাধক, তাত্ত্বিক, কবি ও পীর হিসেবে স্বদেশে ও স্বকালে শ্রদ্ধেয় ও প্রখ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি কবি আলি রজার পুত্র এর্শাদুল্লাহর পঞ্চম অধস্তন পুরুষ শাহজাদা মাওলানা এস, এম, আবদুল আলীম 'খাবনামা' নামের একখানা ক্ষুদ্র পুথি আমাকে দেখিয়েছেন। এ পুথি রিক্‌ত হিসেবে প্রাপ্ত তাঁর পারিবারিক সম্পদ। পুথিটি কবির স্বহস্তলিখিত [অটোগ্রাফ] বলে বিশ্বাস করবার মতো কিছু সাক্ষ্য বহন করে। যেমন, কবির ছোট ভাই আব্দুল খালেকের মৃত্যু তারিখ [১১৫১ মঘী; ২১শে ভাদ্র শুক্রবার], কবির পিতা মুহম্মদ সাঁছি ইবনে মনোহরের মৃত্যু তারিখ [১১৪২ মঘী, ২৯শে পৌষ, বুধবার], কবির পীর শাহ কেয়ামউদ্দীন ইবনে আলীউদ্দীনের মৃত্যু তারিখ [১১৫২ মঘী, ২৩শে পৌষ] কবির কন্যা শুকুরাবিবির মৃত্যু তারিখ [১১৫৩ মঘী, রোজ শুক্রুবার] এবং সর্বোপরি কবির নিজের জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ

> "ইতি সন ১১২১ মঘী তাং ১৭ সতর শ্রাবণ রোজ সোমবার দোপহর তিন ঘরি বাদে জন্ম শ্রী আলি বজা পিছরে মাং ছাছি। সন ১১৬১ এক সট্টি মঘি তাং ১৫ পোন্দর ভাদ্র, রোজ শুক্রুবার।"
>
> [অতএব কবি ত্রিশ বছর বয়সে নিজের জন্ম তারিখ তাঁর স্বরচিত ও স্বলিপীকৃত 'খাবনামা' গ্রন্থে লিখে রেখেছেন বলেই বিশ্বাস করতে হয়।]

এ পুথিতেই কবির মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে সম্ভবত কবির সাগরেদ বা আত্মীয় কানাইমাদারী গ্রামবাসী এক আবদুল করিম ১২০৫ মঘী সনে কবির মৃত্যুকাল লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

> ইতি সন ১১৯৯ মঘী তারিখ ৫ই মাঘ ১৯শে সউআল রোজ বুধবার বিকাল তিন ঘরি বাদ চার ঘরিতে অফাত পিরানপির সাহ সুপি আলি রজা সাং ওসখাইন ইতি লিং আবদুল করিম কানাইমাদারি ১২০৫ মঘী।

এ তথ্য প্রাপ্তির ফলে আলি রজা সম্বন্ধে আমাদের অনুমানের পালা শেষ হল। এখন আমরা জানলাম সাঁছির পিতা আকবর নন মনোহর। আকবর হয়তো মনোহরের পিতার নাম। কবি আলি রজা ১১২১ মঘীতে বা ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১১৯৯ মঘীতে বা ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে আটাত্তর বছর বয়সে। অতএব আলি রজা আঠারো-উনিশ শতকের কবি।

তাঁর পীব ছিলেন শাহ কেয়াম উদ্দীন। পীরের পিতা শাহ আলাউদ্দীনও ছিলেন পীর। এখনকার কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জে ছিল পীরের নিবাস। 'সিরাজ কুলুবে' কবি পীরের প্রশস্তি বিস্তৃতভাবেই গেয়েছেন ঃ

শাহ আলাউদ্দীন সুত মহাগুণবন্ত।
কেয়ামুদ্দীন শাহা তান নাম আছিলেন্ত।
ফেনীর দক্ষিণে এক শহব উপাম
হাজীগাঁও করি ছিল সেই দেশের নাম।
সেই শুভ গ্রামে ছিল তাহান বসতি
সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণতি।

এর থেকে বোঝা যায় 'সিরাজ কুলুব' রচনাকালে কবির পীর শাহ কেয়ামুদ্দীন [মৃত্যু ১৭৯০ খ্রীঃ] জীবিত ছিলেন না। অতএব এটি কবির সর্বশেষ রচনা। আগম-জ্ঞানসাগরের ভণিতা দৃষ্টে মনে হয় ঐগুলো পীরের জীবিত কালে রচিত। কবি আমাদের জানিয়েছেন ঃ

সিরাজ কুলুব নামে আছিল কেতাব
উত্তম মসলা তাতে শুদ্ধ পরস্তাব।
গুরু মুখে এসব যে হাদিস পাইলুঁ
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা করিলুঁ।
ইঞ্জিল কেতাবে এই মসলা সকল
যুহুদ সকলে মিলি করিলা আমল।
বিচারি ইঞ্জিল সবে মসলা তুলিয়া
পুছিলেন্ত নবী পদে যুহুদে আসিয়া।
যদি তুহ্মি হও সত্য রসুল আল্লার
এহার উত্তর তুহ্মি পারিবা দিবার।

মনে হয়, কবি নিজে 'সিরাজ কুলুব' কিতাব দেখেননি। তিনি 'গুরু মুখে' অর্থাৎ তাঁর পীর শাহ কেয়ামুদ্দীনের মুখে শুনে এ সব 'মসলা' বা শাস্ত্রকথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কবি এতিম আলমের 'আবদুল্লাহর হাজার সওয়ালে' আমরা দেখেছি, হযরত মুহম্মদ ইহুদীরাজ সালাম-পুত্র আবদুল্লাহকে স্বপ্রজা ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র পাঠালে প্রজাদের অনুরোধে আবদুল্লাহ মদিনায় এসে রসুলকে তৌরাতসমর্থিত এক হাজার প্রশ্ন করে তাঁর নবুয়তের যাথার্থ্য যাচাই করেছিলেন। স্পষ্টত এখানে কবি আলি রজা বিভ্রান্ত। তিনি ইহুদীর তৌরাতের বদলে নসরাদের ইঞ্জিলের কথা বলেছেন, আবার ইহুদী নেতার নামও তিনি উল্লেখ করেননি। তাছাড়া এই গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য বিষয়ও সংক্ষিপ্ত এবং স্বতন্ত্র।

এ গ্রন্থে আলোচ্য একুশটি বিষয় একুশটি মসলায় বিভক্ত। এবং প্রস্তাবনায় সূফীর 'প্রেমতত্ত্ব' আলি ও রসুলের কথোপকথনের মাধ্যমে পরিব্যক্ত।

সিরাজ কুলুবও সওয়ালসাহিত্য। এক ইহুদীর সওয়ালের জওয়াবে রসুল একুশটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। লক্ষণীয় সে এখানে প্রশ্নকর্তা ইহুদীর নাম নেই, ইহুদীরাজ সালাম-পুত্র আবদুল্লাহ-ই সম্ভবত এই অজ্ঞাত ইহুদী! যে-কোন কারণে হোক, কবি ইহুদীর নামে গুরুত্ব দেননি।

কবি প্রথমে আলির প্রতি রসুল মুহম্মদের উপদেশচ্ছলে প্রেমতত্ত্ব (অধ্যাত্মপ্রেম) ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

প্রেমভাবে করতারে সৃজিলা রসুল
তেকারণে ত্রিভুবন পিরীতি আমূল।

অতএব, প্রেমভাবে কর আলি পবম সাধনা।

প্রেম-মাহাত্ম্য ঃ
ধনের বদলে প্রেম নহে কদাঞ্চিত।
বিনি ভাব তপে কার পিরীতি রহিছে।
তনে মনে ভজি করে পরম ভকতি।
ভাব বিনে যোগ নাহি তপ বিনে ধ্যান।
প্রেম সম রসখেলা নাহি ত্রিভুবনে
পিরীতি অমৃত ফল না পাকে না ঝরে
পিরীতি কণ্ঠের মালা মরণে না ছাড়ে।

আবদুল্লাহর হাজার সওয়ালের মতো এখানেও জিব্রাইল নেপথ্যে রসুলকে প্রশ্নের উত্তর বাতলে দিচ্ছিলেন।

জিব্রাইল 'মসলা'র ভেদ সব নবীক কহিলা।
একে একে সকল জানিয়া পয়গাম্বর
যুহুদ সবের যে উত্তর প্যুত্তর।

এমনি করে পাঁচ–নামাজের, ছয়–সৃষ্টির ছয়দিনের, সাত/স্বর্গের, আট/ফিরিস্তার নয়–মুসানবীলব্ধ নয় আয়াতের, দশ–'দশাক্ষর' বীজ মন্ত্রের [দশঅক্ষর' নাম আছএ গোপত], এগারো–এগারোজন প্রধান নবীর ঃ আদম, নুহ, ইব্রাহিম, ইউসুফ, আয়ুব, ইউনুস, মুসা, দাউদ, সোলেমান, ঈসা আর মুহম্মদের প্রতীক। বারো ঃ ইমাম-আলি-হাসান-হোসেন-জয়নুল-বাকর-কাফির-তকী-নকী-আশকর-মুসা ও ভাবী ইমাম মেহ্‌দী। এমনি করে সপ্তবিংশ প্রতীক বর্ণিত। এক্ষেত্রে এতিম আলমের বর্ণনা স্মর্তব্য।

অষ্টস্বর্গ ঃ সালাম-করার-খেলদ-মাওয়া নঞ্জিম-আদন-জিন্নত-ফিরদৌস,

সপ্ত-দোজখ ঃ জাহান্নাম-তলজি-সুন্না-অসীম-খিরজ-মাছক-হারিয়া।

একবিংশ মসলায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদ্ভবতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত।[১]

শাস্ত্রীয় তথ্য ও জ্ঞানলব্ধ সত্যের পার্থক্য কোন দিনই ঘুচবার নয়। কারণ শাস্ত্রীয় তথ্য ধ্রুব সত্যের প্রতীক। এর হ্রাস নেই, নেই কোন পরিবর্তন। পক্ষান্তরে জ্ঞানলব্ধ সত্যের উন্মেষ, বিকাশ ও বিবর্তন আছে। কেননা জ্ঞান প্রতি মুহূর্তে সত্যকে আবিষ্কার করছে, তার স্বরূপ তুলে ধরছে এবং সেকারণই খণ্ড সত্য পূর্ণতা পাচ্ছে, প্রাতিভাসিক সত্য অপসৃত হচ্ছে।

অতএব শাস্ত্রীয় সত্য হচ্ছে বিশ্বাসভিত্তিক। বিশ্বাস না হারালে সে সত্যের মৃত্যু নেই, সিন্দবাদের ভূতের মতো জগদ্দলের মতো চিরকাল সংস্কার-প্রবণ বিশ্বাসীর মনে-মেজাজে জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায় তা অনড় হয়ে সংস্থিত থাকে। সংস্কার ও বিশ্বাস প্রত্যয়রূপে প্রতিষ্ঠা পেলে তা ধর্মবোধের রূপ লাভ করে। তখন মানুষের চেতনা হয় বন্ধ্যা, মানুষ হয় পোষমানা প্রাণী। এই বন্ধন থেকে আস্তিক মানুষের মুক্তি নেই।

আলোচ্য শাস্ত্রীয় জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাসই আস্তিক মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই মানুষের অনেক দুর্ভোগের উৎস হয়েছে এই মনুষ্যনির্মিত শাস্ত্র। পরীক্ষিত জ্ঞান তাই আজো চিত্তলোকে অবহেলিত। শাস্ত্রানুগত মানুষ চোখ থেকেও অন্ধ, কান থেকেও কালা, মুখ থেকেও বোবা আর মন থেকেও মননহীন। দেশজ মুসলমানের পক্ষে সেকালে ইসলাম ছিল সুদূরের। শাস্ত্রের ভাষা-ছিল অনায়ত্ত, ঐতিহ্য ছিল অজানা। তাই তথ্যে ও তত্ত্বে, জ্ঞেয়ে ও জ্ঞানে, সত্যে ও কল্পনায়, প্রাপ্তিতে এ প্রত্যাশায় তারা সঙ্গতি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে নি কখনো। ফলে একদিকে যেমন সূফীমতের আবরণে দেশী ঐতিহ্যে তাদের অধ্যাত্ম সাধনা চলেছে, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী তত্ত্বজিজ্ঞাসাও আকৃষ্ট করেছে তাদের। জীবনের বা বাস্তব প্রতিবেশের ও আদর্শের জগতের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর। সাধে ও সাধ্যে ছিল না সমতা। তাই জ্ঞেয় ও জ্ঞান–দু-ই লঘু ও মনগড়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাতিভাসিক। কিন্তু শাস্ত্রীয় মনের, মতের ও শাস্ত্রশাসিত সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনধারায় ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এসব রচনার গুরুত্ব কম নয়।

৫. শেখ সেরবাজ চৌধুরী

শেখ সেরবাজ চৌধুরীর 'ফক্করনামা'র বা 'মালিকার হাজার সওয়াল'-এর সাহিত্য-বিশারদ-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর অধিকাংশই দু'শ বছরের বেশি প্রাচীন। পাণ্ডুলিপির সুলভতায় মনে হয় এ চট্টগ্রামে খুব জনপ্রিয় ছিল। শেখ সাদীর 'গদা মালিকা সম্বাদের'ও এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অভিন্ন। এখানে নায়কের নাম আবদুল্লাহ, শেখ সাদীর গ্রন্থে নায়ক আবদুল আলিম বা হালিম।

সেরবাজের অবলম্বন ছিল ফারসি কিতাব ঃ

'ফক্করনামা' করি এক আছএ কিতাব
কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব।
সকলে না বুঝে দেখি ফারসি বচন
কহিমু বাঙ্গালা ভাষে বুঝিতে কারণ।

---

১. মৎসম্পাদিত সওয়ালসাহিত্যে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কবির শিক্ষক ছিলেন হাসানশরীফ, পীর ছিলেন বদিউদ্দীন, গ্রন্থরচনায় আদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ বায়েজিদ, প্রতিপোষক ছিলেন বৈদ্য (চিকিৎসক) উমর।

১. আদ্য গুরু প্রণামিএ শরীফ হাসন।
হাসন শরীফ নাম সেই গুরু অনুপাম
তান পদ শিরেতে ধরিয়া।

২. বদিউদ্দীন জান পীরের যে নাম।

৩. সৈয়দ বাজিদ পদে করহুঁ প্রণাম
তাহার আদেশ শিরেতে ধরিয়া
রচিলাম কিতাববাণী মনে বিমর্সিয়া।

৪. শেখ সেরবাজ কহে সভানের পদে
রচিলুঁ পঞ্চালী বৈদ্য উমর প্রসাদে।

অন্যত্র–
ফক্কর নামা নামে এক কিতাব আছিল
পীরের প্রভাবে কিছু প্রচার করিল।

গ্রন্থের একস্থানে 'চন্দ্রানীর রূপ দেখি লোর নৃপবর' কথাটি রয়েছে, অন্যত্র রয়েছে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ কাব্যের (১৫৮৪-৮৬) উল্লেখ ঃ

নবীবংশে লেখিয়াছে সেসব কথন
রচিয়া কহিলে কথা নাই কোন ভাল।

লোকশ্রুতি অনুসারে সেরবাজ চৌধুরীবংশীয় ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রামে সুলভ ছিল, সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির কোন কোনটি মনে হয় আঠারো শতকের গোড়ার দিককার। তাই সেরবাজকে সতেরো শতকের শেষার্ধের বা শেষপাদের কবি বলে অনুমান করি। তাঁর কাব্য যত্নে রচিত এবং কাব্যটি কবিত্বসম্পদেও ঋদ্ধ, যেমন মালিকার সখীদের অর্থপূর্ণ কবিত্বদীপ্ত নামগুলো সেরবাজের দেয়া ঃ

রূপে মনোহর বালা গুণে অনুপাম
বাছি বাছি রাখিয়াছে সখীসব নাম।
হীরাধার, চম্পাছড়ী কমলনয়নী
কাজলরেখা যে আর মুকতাদশনী।
প্রভাবতী, মৃগআঁখি কমলমঞ্জরী
এ সকল সখী থাকে কুমারীকে ঘেরি।

একটি উৎপ্রেক্ষা ঃ
কুমারীর যুক্তি শুনি হরিষ সকল
চন্দ্রের উদয়ে যেন বিকালে উৎপল।

পথের ফকির আবদুল্লাহ হাজার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে রুমরাজ্যের মালিকার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জন করল। উভয়ের খুব জাঁকজমকে বিয়ে হল।

ভাগ্যের লীলায় আস্থাবান কবি বলেছেন ঃ
যাহার রিজিক যথা লই যাএ ধরি।
যাহার আছিল জান তৃণেত শয়ন যে ছিল ফকির,
সে জন যাএ নিদ্রা খাট-সিংহাসন।
সেই সে আবদুল্লা হৈল রুমের রাজন।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা ঃ
১. কলিকালের নারী কিরূপ হবে ? প্রশ্নের উত্তরে আবদুল্লাহ বলে
পুরুষ ঘরে থুই নিকলিব নারী
পঞ্চ নারীএ এক পুরুষ বরিব
ভয় পাই যে পুরুষ কাকে না চাহিব।

২. মুর্শিদ বড়, না মাতাপিতা বড় ?
জনক জননী হোন্তে মুর্শিদ যে বেশ
যাহার প্রসাদে পরমার্থের উদ্দেশ।

সেরবাজের আর দু'খানি রচনা হচ্ছে কারবালার বীর হাসানপুত্র কাসেমের লড়াই এবং ফাতেমার সুরতনামা বা রূপবর্ণনা।

৬. আবদুল করিম খোন্দকার

দুল্লামজলিস, তমিম আনসারী, নুরফরামিসনামা প্রভৃতি রচয়িতা আঠারো শতকের আবদুল করিম খোন্দকার হাজারমসায়েল নামে একখানা ক্ষুদ্র আবদুল্লাহর হাজার সওয়ালই রচনা

করেছিলেন। ইহুদীরাজ আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান পেয়ে মুহম্মদের নবুয়তের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর প্রজাদের অনুরোধে প্রজাদের পক্ষে মুহম্মদকে একহাজার প্রশ্ন করেন। এবং সদুত্তর পেয়ে স্বপ্রজা ইসলাম বরণ করেন। আল্লাহর পরম স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঃ

রসুলে বুলিলা শুন এহুদী রাজন
প্রভুর গোপত মর্ম কুদরুত আল্লার
কিবা আছে তার পরে জানে নিরঞ্জন।
তারপরে কহিবারে কি শক্তি আমার।
কোন সাক্ষি না পাইছি শাস্ত্রে না লেখিছে
প্রভুর রসুল সবে কেহ না কহিছে।

কবি আবদুল করিম খোন্দকারের পরিচয় দুল্লামজলিস প্রসঙ্গে চরিতকথা অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

৭. সৈয়দ নুরুদ্দীন

'দাকায়েকুল হাকায়েক', রুহনামা, রাহাতুলকুলুব প্রভৃতি রচয়িতা আঠারো শতকের পীর-কবি সৈয়দ নুরুদ্দীনের পরিচিতি রয়েছে ধর্মসাহিত্য অধ্যায়ে। তিনিও মুসাব সওয়াল নামে প্রশ্নোত্তরে একটি ক্ষুদ্র তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কোন ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে কবি অতি সংক্ষেপে 'শরার খবরই' মাত্র লিখেছেন।

এই মতে লিখিয়াছএ কিতাবে বিস্তর
অল্প অল্প কহিলুঁ শরার খবর।

প্রশ্নকর্তা নবী মুসা-এবং উত্তরদাতা স্বয়ং আল্লাহ :

মুসার নিবেদন শুনি প্রভু করতার
কৃপাযুক্ত হই তবে লাগে কহিবার।
সওয়ালের বিবরণ কিতাবে দেখিয়া
রচিলেক নুরুদ্দীন প্রভুকে ভাবিয়া।

একটি সওয়াল-জওয়াবের নমুনা :

আর এক রোয়ায়েত শুন পরস্তাব
যেই মতে মুসা নবী পাইল জওয়াব।
প্রথমে সওয়াল মুসা নবীএ পুছএ
এলম পড়িলে তবে কিবা পুণ্য হএ।
এত শুনি করতাএ কহিলেন খবর
রহমত বখশিএ আমি তাহার উপর।

ফেনী এককালে চট্টগ্রাম জেলাভুক্ত ছিল। কবি ফেনী অঞ্চলের লোক।

৮. নসরুল্লাহ খোন্দকার

জঙ্গনামা ও শরীয়তনামার রচয়িতা আঠারো শতকের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের বিস্তৃত পরিচয় 'ধর্মসাহিত্য' অধ্যায়ে রয়েছে।

মুসার সওয়ালে কোহ-ই-তুরে নবী মুসার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের আকারে এলম, এবাদত, দয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে আল্লাহর আলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কবি বলেন মুসার সওয়াল ফারসি ভাষায় ছিল, দেশী লোকেরা ফারসি ভাষাজ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারে না বলেই তিনি 'হিন্দুয়ানি' (তথা হিন্দুস্তানী ভাষা বাঙলা) করলেন :

মুসার সওয়াল এক কিতাব প্রধান।
তেকারণে ফারসি করিলুঁ হিন্দুয়ানি।
বাঙ্গালা না বুঝে এই ফারসি কিতাব
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাব বাণী।
না বুঝি ফারসি ভাষে পাএ মনস্তাপ।
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ
ইচ্ছাসুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন।

ভণিতা :

কহে হীন নসরুল্লাহ মনসুর তনএ

রচনার নমুনা :

বোলে শুন নামাজ মহিমা

কলিমা তৈয়ব যত মহিমা ধবএ।
পীর : পীব স্থির মহাধীর মুহম্মদ হামিদ।
তম নাশি হৈলে নুর উদয় না হৈতে সুর
ফজর নামাজ সে সমা।

কবির উপদেশ :

বাক্য আলাপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে
হৃদয়ে মনে কোরান পড়হ মনোরঙ্গে।
পঞ্চগানা নামাজ পড়হ একমন
সভা করি বস নিত্য নামাজীর সন।

৯. মুহম্মদ আলি

শাহপরী-মালিকজাদা ও হাসনাবানু নামের দুখানা প্রণয়োপাখ্যান প্রণেতা মুহম্মদ আলির পরিচিতি অন্য অধ্যায়ে দিয়েছি। ইনি চট্টগ্রামের ইদিলপুরবাসী ছিলেন। তাঁর 'হায়রাতুল ফিকাহ' নামের ফিকাহ্ শাস্ত্রগ্রন্থ ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত। 'হায়রাতুল ফিকাহ্' নামের অর্থ হচ্ছে প্রশ্নোত্তরে ফিকাহ।

আছিল ফাবসি কিতাব কবিলুঁ বাঙ্গালা
বুঝিতে সকল লোকে কিবা মন্দ ভালা।
অপূর্ব আছএ যত কিতাবের বাণী
বিচারিয়া কহি আমি করি হিন্দুয়ানি

এঁর সমকালীন কবি মুন্সী মুহম্মদ মুকিম পণ্ডিতও কবির স্বগ্রামবাসী ছিলেন।
প্রশ্নোত্তরের নমুনা এরূপ :

১. একজনে নারী সনে রতি বিলাসিল স্নান বিনে ওজু করি নামাজ পড়িল।
এ লোক ইসলামে সদ্য দীক্ষিত। অজ্ঞতাই স্নান না করার কারণ, কাজেই–
নামাজ দোরস্ত তার কিতাবে বোলএ।

২. বন্দীতে রাখিছে এক মুসলমান (কে) ধরি দুই তিন দিন কিবা রাখে অনাহার।
অন্নজল ভক্ষ্য দ্রব্য না দেয় ভক্ষিবার।

এমনি অবস্থায় তাকে যদি নিষিদ্ধ শূকরমাংস দেয়া হয়, আর সে খায়, তা হলে পাপ হবে কি?

খাইয়া প্রাণ রাখিব তাহার না খাইয়া যুক্ত নহে মৃত্যু হইবার।

কবি লেলাঙ্গ গাঁয়ের ইউসুফ হাফিজের বাড়িতে থেকে তাঁর মসজিদের মুয়াজ্জিন রূপে কাজ করতেন। তাঁরই আগ্রহে তিনি হারায়তুল ফিকাহ রচনা করেন।

নবম অধ্যায়

চরিতকথা

মুসলমান কবিগণ এক বিরাট জীবনীসাহিত্যও সৃষ্টি করে গেছেন, প্রচলিত অর্থে জীবনচরিত বলতে যা বোঝায় এগুলো কিন্তু তা' নয়। চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চরিতকথাগুলো যেমন একাধারে জীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও রূপকথাজাতীয় কাহিনীকাব্য এগুলোও তেমনি গ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও চৈতন্যচরিতগুলোর অনুকরণে এগুলো রচিত। নবীবংশ, রসুলবিজয়, জঙ্গনামা, মক্তুলহোসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল আম্বিয়া, সিফতুল আম্বিয়া, হাতেমতাই, আমীর হামজা প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা সাধারণভাবে জীবনী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।

অলৌকিক, অসাধারণ, অস্বাভাবিক এবং অঘটন ঘটনপটু শক্তিসম্পন্ন না হলে অধ্যাত্মজগতে কেউ কোথাও কোনকালেই মহাপুরুষ বলে স্বীকৃতি পাননি, তাই মহাপুরুষরূপে পরিচিত হবার বাসনা জাগলে বা কাউকে মহামানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করলে চাই কেরামতি, চাই ঐশ্বর্যের প্রকাশ। কারণ যে তোমার আমার মতো প্রকৃতি-চালিত অসহায় মানুষ, তাকে তোমার আমার চেয়ে বড় বলে স্বীকার করবো কোন্ নিরিখে! বিশেষত যিনি স্রষ্টার প্রিয়, যিনি স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁর অসাধারণত্ব না থাকলে মানায় না। তাই মানুষ চিরকাল অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে অলৌকিকশক্তি ও অসাধারণ-মহিমা খুঁজে ফিরেছে। মানুষ অবিশেষের এই স্বাভাবিক দাবি মেটাবার জন্যে চিরকাল দেশে দেশে ভক্তগণ ভক্তিভাজনের জীবনে ও চরিত্রে সত্য-মিথ্যা সম্ভব-অসম্ভব নানা গুণ ও কীর্তি আরোপ করে তাঁকে অতিমানব করে তুলেছে। ফলে মহামানবের জীবনী মনুষ্যচরিত হতে পারেনি, হয়েছে এমন কিছু যা স্বপ্নসম্ভব বা দেব দৈত্য-ফেরেস্তায় শোভন।

মুসলিমরচিত এসব জীবনচরিত্রগুলোতেও অতিপ্রাকৃত এবং অতিমানবীয় কাহিনীসমূহ রয়েছে। কিন্তু মানুষের মন-বুদ্ধির ও আত্মার বিকাশ না হলে এবং রুচি-সংস্কৃতি ও উচ্চতর জীবনবোধ না থাকলে যা হয়, এখানেও তা-ই হয়েছে। স্বল্পশিক্ষিত আদর্শ-অজ্ঞ বিচার-বিবেচনাহীন এসব কবিদের ইসলাম সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অভাবে এঁদের হাতে ইসলামের কিছু অপব্যাখ্যা হয়েছে এবং আদর্শ-চরিত্র ও উন্নতজীবনবোধ না থাকায় মহাপুরুষ চরিত্রে কিছু ব্যজস্তুতিও প্রকট হয়েছে।

অধিকন্তু যে কয়জন বাঙালী মুসলমান কবি রসুলচরিত রচনা করেছেন, তাঁদের আদর্শ দেশীয় রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্য। রসুলকে এঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠরূপে চিত্রিত করার প্রেরণাই ছিল মূলে। তাঁদের মানসপটে যে স্থান-কাল ও পরিবেশ ছিল, তাও একান্তভাবে ভারতবর্ষ তথা বাঙলাদেশ, কাফের বলতে তাঁরা হিন্দুকেই দেখেছেন, ফলে তাঁদের তুলিতে যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে ভারতে হিন্দুশক্তির বিরুদ্ধে মুসলমান রাজন্যবর্গের বিগ্রহ-সন্ধির ও হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ছায়া পড়েছে। অবশ্য কাব্যকাহিনীর উপাদান হিসেবে তা অসার্থক হয়নি।

কিন্তু আমরা ভাবছি, এই যে রসুলের চরিতকথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণ, রাম ও চৈতন্য-চরিতের সঙ্গে তাঁর জীবন-কাহিনীর সামঞ্জস্য বিধানের সচেতন প্রয়াসের এবং ইসলামের সঙ্গে হিন্দুয়ানি দর্শন-পুরাণের সাদৃশ্য সন্ধানের মূলে লেখকদের কোন্ প্রকার মনোভাব কাজ করেছে? একি ইসলামি আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যবোধের অভাবের অথবা হীনমন্যতার ও ইসলামপূর্ব সংস্কারের বশ্যতার ফল, না হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা-সমন্বয় সাধনের সচেতন প্রয়াস? অথবা তুলনায় উৎকর্ষ ও উন্নতমানের দেখিয়ে ইসলামের প্রতি বিধর্মীকে আকৃষ্ট করাও এঁদের হয়তো অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। এ শেষোক্ত অনুমানই সত্যের সন্নিকট বলে মনে হলেও, অনার্য বাঙালীর প্রাচীন সংস্কার, স্থানীয় পারিবেশিক প্রভাব, ইসলামী আদর্শের ও ঐতিহ্যবোধের অভাব এবং পরস্পর প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের (বা রক্ষার) উদার মনোভাব আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট করার বাসনা প্রভৃতি এসব বিচিত্র সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে।

সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি-পরিচয় এবং সৈয়দ সুলতানের ভাব-শিষ্য কবিগণ ও আবির্ভাবকাল ঃ

সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তা আজকাল আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা তাঁর নাম নানা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামবাসী অনেক কবির মুখেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। কবির নবীবংশ রচনারম্ভের কাল মিলেছে : 'গ্রহশত রস যুগ-৯৯২-৪ হিঃ (১৫৮৪-৬ খ্রীঃ)' এছাড়া কিছু পরোক্ষ প্রমাণও রয়েছে যেমন :

১. 'কিফায়তুলমুসল্লিন' [১৬৩৯ খ্রীঃ] নামের জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা সীতাকুণ্ডবাসী মুত্তালিব কবি শেখ পরাণের পুত্র এবং মীর মুহম্মদ সফীর পিতা সৈয়দ হাসান তাঁর পীর ছিলেন।[১]

২. মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণ দু'খানি গ্রন্থের রচয়িতা ঃ নুরনামা ও কায়দানি কেতাব। শেখ পরাণ তাঁর 'নুরনামায়' সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের উল্লেখ করেছেন :

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান।
ফাতেমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান
নবীবংশে রচিছেন্ত সৈয়দ সুলতান।

কবি সৈয়দ সুলতান নবীবংশ রচনা শুরু করেন ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে। আবার এই শেখ পরাণই তাঁর কায়দানী কিতাবে হাজী মুহম্মদ ও তাঁর গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন :

যদি বোল গোর হোন্তে না উঠিব পুনি — কহিছন্ত হাজী মুহম্মদ ভাল মত।
কাফির হৈয়া যাইব নরকেত জানি। — তেকারণে এথা মুঞি না কৈলুঁ সমস্ত
সূরত নামার' মধ্যে ইমার সিফত — কিঞ্চিত কহিলুঁ মুঞি ইঙ্গিতে বুঝিতে।

এতে মনে হয়, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরাণের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন।

৩. এদিকে সৈয়দ সুলতানের পৌত্র, শেখ মুত্তালিবের পীর সৈয়দ হাসানের পুত্র ও 'নুরনামা' লেখক শাহ মীর মুহম্মদ সফী হাজী মুহম্মদকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

সৈয়দ হাসানের পুত্র ছিলেন মীর মুহম্মদ সফী। আর শিষ্য হলেন শেখ মুত্তালিব। অতএব সফী ও মুত্তালিব প্রায় সমবয়সী।[৩]

আগেই দেখেছি, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরাণের পূর্বসূরী ছিলেন।

৪. মুহম্মদ খানের 'মুহম্মদ হানিফার লড়াই' পর্বের লিপিকর মুজাফফর উক্ত পুথির যে কয় জায়গায় নিজের ভণিতা যোজনা করে দিয়ে কবিযশ আত্মসাৎ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন (অবশ্য মুজাফফর নিজেও কবি ছিলেন। ইউনান দেশের পুথি তাঁরই রচনা।) তার একটিতে কবি সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন[৪]।

৫. লালমোতি সয়ফুলমুলুকের কবি শরীফ শাহও সৈয়দ সুলতানের পৌত্র।[৫]

৬. চট্টগ্রামের নয়াপাড়া নিবাসী উনিশ শতকের কবি মুহম্মদ মুকিম 'গুলেবকাউলি' উপাখ্যান রচনা করেছেন। সৈয়দ সুলতানের বংশীয় সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ মুকিমের পীর ছিলেন আর মুকিম কবি-প্রণামে বলেছেন :

এবে প্রণামিব আমি পূর্ব কবি জান
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান।[৬]

---

১. ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য : মুত্তালিব।
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৫. ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৬. ঐ

৭. 'শির্নামা' রচয়িতা শেখ মনসুরেরও (১৭০৩ খ্রীঃ) পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতান বংশীয় শাহ তাজুদ্দীন ঃ

সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন — তানপদ পাদুকার রেণু ভুরুদেশ
ভাগ্যফলে হৈলুঁ আমি তাহার অধীন। — দিয়া মনে আশা করি আছিএ বিশেষ।[৪]

৮. 'আজরশাহ-সমনরোখ' প্রণেতা মুহম্মদ চুহর (১৮০৪-৫০ খ্রীঃ) চট্টগ্রামবাসী কবি প্রণামে বলেছেন :

আদ্যগুরু কল্পতরু সৈদ সুলতান
কবি আলাওল পীর মোহাম্মদ খান।[৫]

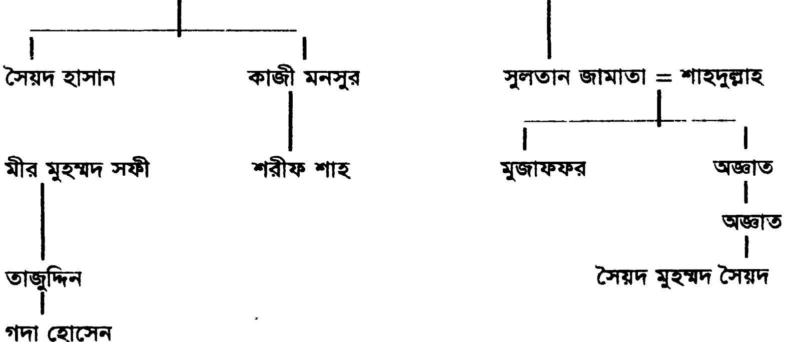
৯. সতেরো শতকের প্রথমার্ধের পদকার ফতে খানের পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতান এবং মনিব ছিলেন ইব্রাহীম খান। তিনি বলেছেন :

কহে ফতে খান, সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত ইব্রাহিম খান
ভবকল্পতরু জানহ আমার পীর মীর শাহ সুলতান।

এই ইব্রাহিম খান সম্ভবত রাস্তি খানের পুত্র মীনা খান-বংশীয় চট্টগ্রামস্থ আরাকানী উজির জালাল খানের (১৫৬৯-৮৫ খ্রীঃ) পুত্র ইব্রাহিম খান। ইনিও চট্টগ্রামে আরাকানী উজির (১৫৮৫ খ্রী) ছিলেন। কবি মুহম্মদ খান তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। ফতে খান অপর একটি পদে আলাওল খান-এর নামোল্লেখ করেছেন। গোটা চট্টগ্রাম ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি আরাকান শাসনে ছিল। কাজেই উক্ত আলাওল রাজধানী রোসাঙ্গপ্রবাসী কবি আলাউল হতে পারেন। ভণিতাটি এরূপ:

কহে ফতেখানি যোহি পাইল ধ্বনি
সোহি পুরুষবর জান।
পুরল মনোরথ সকল কলাবত
শ্রী আলাওল খান।

উপরে উদ্ধৃত তথ্যগুলো থেকে সৈয়দ সুলতানের একটি বংশলতাও দাঁড় করানো সম্ভব :



সৈয়দ সুলতানের পীর সৈয়দ হাসান সম্ভবত আঠারো শতকের শেষ দশকের কবি সৈয়দ নূরউদ্দীনের প্রপিতামহ সৈয়দ হাসান (গৌড় থেকে ১৫৭৫ সনে মনেমারীশাস্ত্র চট্টগ্রামে আগত ও চকরিয়া / আম্বরাবাদ বাস করেন)

---

৪ ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫. ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. আঠারো শতকের প্রথমার্ধে শমসের গাজী নামে এক দুঃসাহসী ব্যক্তি ফেনী অঞ্চলে এ রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁরই কীর্তিকথা বর্ণিত হয়েছে মনোহররচিত 'শমশেরগাজী নামা'য়। সৈয়দ সুলতানের এক বংশধর পীর মীর গদা হোসেন খোন্দকার শমশের গাজীর পীর ছিলেন।

১১. দুল্লামজলিস (১৭৪৫ কিংবা ১৭৮৫-৮৮ খ্রীঃ) প্রণেতা আবদুল করিম খোন্দকারও সৈয়দ সুলতানকৃত নবীবংশ-এর উল্লেখ করেছেন :

বিশেষ ন কহি আমি আদমের কথা
নবীবংশ পুস্তকেত আছএ ব্যবস্থা।

দুল্লামজলিসে আদম. ইব্রাহিম, লুত, শোএব, আয়ুব, মুসা, সোলেমান, ঈসা, মুহম্মদ প্রমুখ নবী এবং ফাতেমা, আলি, সফী ইউসুফ, খালেদ, বিলাল, হাসান বসোরী, হাসান কোরাইশী, সুলতান আবু সৈয়দ প্রভৃতির এবং রোজা ও বেহেস্তের বিবরণ আছে।

১২. আঠারো শতকের শেষার্ধের কবি সৈয়দ নাসির তাঁর 'সিরাজ সবিল'[১] নামের গ্রন্থে কবি প্রণামে সৈয়দ সুলতানের নামোল্লেখ করেছেন :

সৈয়দ সুলতান কবি আলাওল আর
দোহ পদে প্রণামিএ হাজারে হাজার।

১৩. শাহপরী, হাসনবানু প্রভৃতি উপাখ্যান এবং হায়রাতুল ফেকাহ্[২] রচক মুহম্মদ আলি তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থে 'নবীবংশ'-এর উল্লেখ করেছেন। কবি মুকিমের নামোল্লেখ থেকে প্রমাণ ইনি আঠারো শতকের শেষার্ধের লোক।

তার কত অব্দ পরে খলিফা সৃজিছে
তাব সন নিরূপণ নবীবংশে আছে।

১৪. কবি মুকুল ওর্ফে মঙ্গল মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত তাঁর ইসলামের মহিমা জ্ঞাপক উপাখ্যান 'শাহজালাল মধুমালা'[৩] কাব্যে (১৬৬৫ খ্রীঃ) সৈয়দ সুলতান ও মুহম্মদ খানের দোহাই দিয়েছেন ঃ

এসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল বাড় এ দেখি তাহা না লেখিল।
আছিল এ সব কথা আদ্যের বিচার
বাসত্তের সনে তাহা হইল প্রচার।
সৈয়দ সুলতান আর মোহম্মদ খান
এ সবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জন।

১৫. 'মালিকার সওয়াল বা ফক্করনামা' নামের তত্ত্বগ্রন্থ লেখক শেরবাজ চৌধুরীও[৪] (সতেরো-আঠারো শতক) সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের উল্লেখ করেছেন :

নৃপতি নন্দিনী বালা কৈল জিজ্ঞাসন
মাতাপিতা বিনে জন্ম বল কোন জন।
প্রথমে আদম সফি দ্বিতীয় হাওয়ার
তৃতীএ হইল জন্ম নামে সালেহার।
চতুর্থে হইল জন্ম নামে ইসমাইল
মরিয়ম সৃত ইসা পঞ্চমে জন্মিল।
আবদুল্লাএ বলে, শুন, আয় দণ্ডধর!
মাতাপিতা বিনে জন্ম পঞ্চ পয়গম্বর।
মাতাপিতা বিনে জন্মে এই পঞ্চজন
নবীবংশে লেখিয়াছে সে সব কথন।
রচিয়া কহিলে কথা নাহি কোন ভাল।

১৬. রাগমালা ও পদাবলী রচক চট্টগ্রামবাসী চম্পাগাজীও (আঠারো শতক) শ্রদ্ধার সঙ্গে সূফীসাধনার গুরু হিসেবে সম্ভবত সৈয়দ সুলতানকেই স্মরণ করেছেন :

---

১. *৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।*
২. *৯ম " "*
৩. *৬ষ্ঠ " "*
৪. *৯ম " "*

এক গৃহের দশ দুয়ার ধরিয়াছে মুখে
শ্রীমুখের ধ্যান কহিলাম সুখে।
শাহ সুলতানপদ মানি চম্পাগাজী কহে
লাহুতের ঢেউ পড়ে মাণিক্য পালায়।

১৭. কক্সবাজারের পেতাগাজী পণ্ডিত ওর্ফে হাসান আলী তাঁর 'জমিদার পরিবার' নামক প্রশস্তি পুস্তিকার (১৩২৪ সনে প্রকাশিত) কবি হিসেবে সৈয়দ সুলতানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

১৮. পীর সৈয়দ সুলতানের ভক্ত শিষ্য কবি মুহম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের রূপগুণের বর্ণনা দিয়েছেন :

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নররস 'দধি।
শ্যাম নব জলধর সুন্দর শরীর
দানে কল্পতরু পৃথিবীর সম স্থির।
পূর্ণচন্দ্র ধিক মুখ কমললোচন
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন।
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর
সেবক-বৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর।
ভাবে ভবকল্পতরু গুণে রত্নাকর
সিদ্দিক সিদ্দিক সম ধর্মেত উমর।
উসমান সদৃশ লজ্জা আলি সম জ্ঞান
অসীম মহিমা পীর শাহ সুলতান।...
উদরেত বৈসে তান জগতের গুণ
বিজয় করিলা শাস্ত্র পৃথিবী ত্রিকোণ।
হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার
বহু যত্নে এহি রত্নে কৈলা করতার।...
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।

মুহম্মদ খানের এ বিবৃতি থেকে যে তথ্য মেলে, তা এই : সৈয়দ সুলতান ফাতেমীয় সৈয়দ ছিলেন। তিনি শ্যামসুন্দর পুরুষ ছিলেন। দানে দয়ায় ও ভক্ত-বাৎসল্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁব ছিল আবুবকরের মতো সত্যবাদিতা, উমরের মতো ধার্মিকতা, উসমানের মতো লজ্জা ও আলির মতো জ্ঞান। অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞ, অনন্য জ্ঞানীপুরুষ সৈয়দ সুলতান ছিলেন আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট সৃষ্টি।

সৃষ্টিপত্তন থেকে কেয়ামত অবধি ইসলামী ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনার ইচ্ছে ছিল সৈয়দ সুলতানের। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি আদি থেকে ওফাত-ই-রসুল অবধি ইসলামী ধারার সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে লেখনী ত্যাগ করেছেন। মুহম্মদ খানের বাচনভঙ্গি দেখে মনে হয়, ১৬৪৬ সনে মক্তুল হোসেন কাব্য রচনাকালেও সৈয়দ সুলতান বেঁচে ছিলেন। তবু কি কারণে তিনি আরব্ধ কর্ম-সমাধা করেননি, গুরু-শিষ্য কারো উক্তি থেকে তার হদিস মেলেনি। সৈয়দ সুলতানের পীরের নাম সৈয়দ হাসান। কবির পুরো নাম ছিল মীর সৈয়দ সুলতান। পীরের নামানুসারে কবি পুত্রের নাম রেখেছিলেন সৈয়দ হাসান। তাঁর যে পীরালি পেশা ছিল, তা তাঁর উক্তিতে প্রকাশ :

মুঞি যদি গুরুপদে করিলুঁ সেবন
তবে স্থান পাইবেক মোর শিষ্যগণ।
মুঞি যদি পদবন্ধ না করিতুম সার
মোহোর শিষ্যের হৈব এহেন প্রকার।

বিশেষ করে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ রচনারম্ভ সনটি উক্ত কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে :

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।
গ্রহ শত রস যুগে অব্দ গোঞাইল
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।
আরবি ফারসি ভাষে কিতাব বহুত
আলি মানে বুঝে ন বুঝে মুর্খ যত।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক।

এই 'গ্রহ শত রসযুগ' থেকে ৯৯২ বা ৯৯৪ হিজরী সন তথা ১৫৮৪ বা ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ মেলে। ডক্টর সুকুমার সেন 'দশ শত রসযুগ' পাঠ বানিয়ে সৈয়দ সুলতানকে সতেরো শতকের

(১৬৬৪-৬৫) কবি বলে অনুমান করেছেন।[১] কিন্তু মুহম্মদ খানের দীক্ষাদাতা ও কাব্যগুরু সৈয়দ সুলতান মুহম্মদ খানের পরবর্তীকালের লেখক হতে পারেন না। আবার অধ্যাপক আলি আহমদ[২] ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ[৩] 'রস'-এর মান ছয় ধরে ৯৬২ হিজরী সন নিরূপণ করেছেন। পূর্বালোচিত পরোক্ষ তথ্য প্রমাণের উপর আস্থা রেখে আমরা সৈয়দ সৈয়দ সুলতান ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে (৯৯২ হিঃ) নবীবংশ রচনায় হাত দেন বলে বিশ্বাস করি। সৈয়দ সুলতান সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার লস্করপুরবাসী ছিলেন বলে দাবি করেন মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন ও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।[৫] কিন্তু আমাদের পরিবেশিত তথ্য তাঁদের দাবি সমর্থন করে না। আবার ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের,[১] অধ্যাপক আদমউদ্দীনের[২] এবং অধ্যাপক আলি আহমদের[৩] মতে সৈয়দ সুলতান পরাগলপুরবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধারণাও পুরো সত্য নয়, অবশ্য কবি পরাগলপুরে সাময়িকভাবে বাস করেছেন।[৪] বিশেষ করে নবীবংশ শুরু করার সময় তিনি পরাগলপুরেই ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন :

লস্করের পুর খানি আলিম বসতি
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।

পরাগল খাঁ কর্তৃক পরাগলপুর পত্তনের ষাট-পঁয়ষট্টি বছর পরে (১৫৮৪-৮৬ সনে) সৈয়দ সুলতান 'লস্করের পুর'-এর উল্লেখ করেছেন। এতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এক. ১৬৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে পরাগলপুর অন্তত আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল। দুই. তখনো লস্কর বলতে প্রখ্যাত পরাগল খানই লোকস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। অথবা এই কেন্দ্রের শাসনভার তখনো লস্কর উপাধি কিংবা পদবীধারী কর্মচারির উপর ন্যস্ত ছিল। তবে শেষোক্ত অনুমানের অবকাশ অল্প। কেননা আমাদের উদ্ধৃত চরণ দুটো আগেই কবি উল্লেখ করেছেন :

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত-তথা কহিল বিচারি।

কাজেই লস্করের পুর যে পরাগলপুরই তাতে সন্দেহ থাকে না। অতএব, আমাদের উপস্থাপিত তথ্যে ও সাক্ষ্যে আস্থা রেখে সৈয়দ সুলতানের পৈত্রিক নিবাস ও জন্মভূমি চক্রশালা চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোথাও ছিল বলে বিশ্বাস করি।[৫]

সৈয়দ সুলতান নবীবংশ, জ্ঞানপ্রদীপ ও পদাবলী রচয়িতা এবং জয়কুম রাজার লড়াই নামে একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ কাব্যেরও রচক।

'জ্ঞানচৌতিশা' স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে চালু থাকলেও তা জ্ঞানপ্রদীপেরই অংশ। সম্ভবত স্মৃতিতে ধরে রাখার সুবিধার জন্যেই জ্ঞানপ্রদীপোক্ত সারকথা চৌতিশায় বিধৃত হয়েছে।

---

১. *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস. ১/অপ. ৩য় সং. পৃঃ ৩৪৩।*

২. *ওফাতে রসুল, ভূমিকা।*

৩. *বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩।*

৪. *মাসিক সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৪৩ সাল।*

৫ *ক. আলইসলাহ, ৮ম বর্ষ ১-৩ সংখ্যা।*
খ. বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি. পৃঃ ১৩০-৩১।
গ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা. ১৩৫১ সন. বর্ষ. ৩য়-৪র্থ সংখ্যা।

১. *ঐ—, ১৩৪১, ৪১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৮।*

২. *মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫২, বৈশাখ, ২৭২-৭৩।*

৩. *ওফাতে রসুল, ভূমিকা. পৃঃ দথ১।*

৪. *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ১৪৮।*

৫ *ক. বাংলা সাহিত্যের কথা-ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃঃ ২৯।*
খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য-ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক পৃঃ ১৪৮।

এছাড়া সৈয়দ সুলতান সাধনতত্ত্বানুগ পদাবলীও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রাপ্ত পদের সংখ্যা চৌদ্দ।

'জয়কুম রাজার লড়াই'-এর আরবি হরফে লিখিত একখানা আদ্যন্ত খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন সাহিত্যবিশারদ। ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের পুথিশালা থেকে তা কয়েক বছর আগে খোয়া গেছে। পুথি পরিচিতিতে (পৃঃ ১৭৪) তার বিবরণ আছে। সম্প্রতি আরবি হরফে লিখিত আর একখানা পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে। সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিটিতে ছিল জয়কুম রাজার কূপ খনন থেকে মালেক শাহ বা মুলুকশাহর যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন অবধি। আমার পুথিও আদ্যে ও মধ্যে খণ্ডিত। শেষ পত্র দুটো আছে। জয়কুমের রাজ্যসীমায় পৌঁছে রসুল জয়কুমের কাছে যখন কাসেদ পাঠাচ্ছেন সেখান থেকে শুরু। রসুল-চরিত পর্বের কোন পুথিতেই এ কাহিনী মেলেনি। তাই মনে হয়, এটি কবির স্বতন্ত্র রচনা। কিন্তু এ নিছক অনুমান মাত্র। জয়কুম রাজার লড়াই-এর প্রথমাংশ পাওয়া গেলে হয়তো সহজেই বোঝা যেত এটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা কিংবা রসুল চরিতের একটি অংশ।

কাব্যের 'নবীবংশ' নামটি 'রঘুবংশ'ও 'হরিবংশ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবীবংশ নামটি একালের আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে তাৎপর্যহীন বলে মনে হবে। কেননা এটি প্রথমত কেবল নবী-কাহিনী—তাঁদের কারুর বংশধরের বর্ণনা নয়। অবশ্য 'নবীবংশ'-কে দরাজ অর্থে আদমবংশধর কাহিনী বলে ধরলে এ নামের কেবল আংশিক যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ এ কাব্যে তাঁর সব বংশধরের কথা নেই। মনে হয় 'নবীবংশ' নামে কবি মুখ্যত নবীপরম্পরা নির্দেশ করেছেন। আমাদের অনুমান সত্য হলে 'রঘুবংশ' কিংবা 'হরিবংশ' নামের অনুকৃতি এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ও অসার্থক হয়েছে। কেননা, 'বংশ'-এর যে সামান্য অর্থ চালু রয়েছে, তার সঙ্গে এ অভিধা মেলে না। সব নবী অভিন্ন গোত্রেরও নন। অতএব 'বংশ' শব্দটিকে কুল, পরম্পরা, সমূহ, গণ, বর্গ প্রভৃতি অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এবং এই অভিধায় চিহ্নিত করলেই 'নবীবংশ' নামের যাথার্থ্য ও সার্থকতা স্বীকার করা সহজ হবে। এই তাৎপর্যে আস্থা রাখলে নামটি রঘুবংশ বা হরিবংশ-এর অনুকৃতি বলেই মনে হবে না।

বাঙালী কবি আরবদেশের চিত্রাঙ্গনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর দেশের মানুষ, সমাজ, আচার, আহার্য প্রভৃতিই তাঁর কল্পনাকে ঘিরে রেখেছিল, তাই তাঁর হাতে আমরা মরুভূ আরবের কোন আবহ পাইনে, বাংলাদেশকেই তিনি আরব নামে চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কেবল তিনিই নন, অন্য সব কবিই আরবের বিনামীতে বাংলাদেশ ও বাঙালীকে তুলে ধরেছেন। যিনি লিখেছেন তাঁর যেমন সে-দেশ ও দেশের মানুষ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তেমনি যারা পড়ুয়া ও শ্রোতা তাদেরও কোন ধারণা ছিল না। কাজেই কাহিনীর আবেদন কিংবা কাব্যরস কোথাও ব্যাহত হয়নি। আবার নবীদের সম্বন্ধে বর্ণিত কাহিনীগুলোও সব কাল্পনিক। অবশ্য সেগুলো সৈয়দ সুলতানের বানানো নয়, তাঁর আগে হাজার বছর ধরে ওসব কাহিনী লোক-পরম্পরায় তৈরি ও পল্লবিত হয়ে তাঁর কানে এসেছে। সে-যুগের বিশ্বাস-প্রবণ অজ্ঞ মানুষের সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগেনি, সেদিক দিয়েও কাব্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। বিশেষ করে বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব। কাজেই ধর্ম কথায় যৌক্তিকতা অচল তো বটেই বরং অলৌকিক অস্বাভাবিক কিছু না থাকলে ঐশ্বরিক অভিজ্ঞান মেলে না। একারণে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ব্যাপ্ত জগতে ও মহৎজীবনে অসামান্যকে প্রত্যক্ষ করাই লোকচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আজো মানুষের চরিত্রে এই প্রবণতা প্রবল। যে আমার মতো প্রকৃতির ও নিয়মের দাস সে আর বড় কিসে! কাজেই মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব প্রমাণের জন্যে অলৌকিককে লোকায়ত, অসম্ভবকে সম্ভব এবং অস্বাভাবিককে স্বভাবধর্মে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। অতএব, কেরামতি দেখাতেই হবে তা যাদু দিয়েই হোক আর টোনা করেই হোক।

তা ছাড়া, অজ্ঞতা বশে সেকালের মানুষ ছিল অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈবনির্ভর ও স্বাপ্নিক। তাদের মনোজগতে বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট, যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্য। তাদের কাছে রূপকথা মনে হতো বাস্তব আর বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠতো রূপকথা।

কেননা তারা ভূত-প্রেত দেও-দানুতে বিশ্বাস রাখতো। ঝাড়-ফুকে, তুক-তাকে ও দারু-টোনাতে পেত ভরসা। রোগে-শোকে, সুখে-সৌভাগ্যে ও দুর্যোগে-দুর্দিনে তারা অনুভব করতো অলৌকিক শক্তির অদৃশ্য হাতের লীলা। এর ফলেই তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিচ্ছবি পাই তাদের আচরণে ও সাহিত্যে।

এও স্বীকার্য যে, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতিভাষণের বীজ। নিদর্শন পাই তার ভাষায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাগ্বিধিতে। মানুষের এ অতিভাষণেই তো কাব্য-কবিতার জন্ম। আবার, নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তির বা প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটে। শ্রদ্ধা বা ঘৃণা মানুষকে অতিকথনে এবং দোষ-গুণের বিকৃতি সাধনে প্রবর্তনা দেয়। ভক্তিশ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি ঘৃণার বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা যোগায়। লোকচরিত্রের এই প্রবণতা শ্রদ্ধেয় জনকে করে অতিমানুষ আর ঘৃণ্যকে বানায় অমানুষ। একারণেই মানুষের ইতিহাস, চরিতকথা এবং কিংবদন্তী যুক্তিবুদ্ধির, বাস্তব-অবাস্তবের এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করে এবং রূপকথাকেও সময়ে সময়ে হার মানায়।

পূর্বে রচিত আরবি-ফারসি নবীকাহিনীকে আদর্শ করে সৈয়দ সুলতান স্বাধীনভাবে তাঁর নবীবংশ রচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের পটভূমিকায় এঁদের জীবনচিত্র এঁকেছেন।

বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব ও স্থিতি। 'বিশ্বাসে মিলয় ধর্ম তর্কে বহু দূর' জাতীয় প্রবচনের সৃষ্টিও এ বোধের পরিচায়ক। ধর্মবিধি লোকে ও লোকান্তরের প্রসারিত জীবনের নিয়ন্তা। মানুষের যেখানে অভিজ্ঞতার ও জ্ঞানের এবং আত্মবিশ্বাসের ও আত্মশক্তির শেষ, সেখান থেকেই বিশ্বাসের বিস্ময়ের কল্পনার ও ভীতির শুরু। অতএব, বিশ্বাস মানুষের জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির উর্ধ্বে। যা বাহুবলের আয়ত্তে নয়, যা জ্ঞানের ও যুক্তি-বুদ্ধির অগোচর, তাতেই মানুষের ভয় এবং সেখানে মানুষ দুর্বল ও অসহায়, তাই সে ভীরু। ভীতির থেকে মুক্তির জন্যে চাই শক্তির আশ্রয় ও পোষণ। সে শক্তিও আবার হওয়া চাই আস্থা রাখার মতো, ভরসা পাওয়ার মতো এবং নির্ভর করার মতো অপরিমেয়, অসীম এবং বিস্ময়কর। তাই এ শক্তির উৎস হবে অপৌরুষেয়, অপার্থিব ও বোধাতীত। নইলে অন্ধবিশ্বাস ও ভরসা রাখা অসম্ভব। মর্ত্য-মানবের মধ্যে যিনি এই অলৌকিক ও অপৌরুষেয় নিশ্চিত শক্তির নবী-অবতার হবেন না প্রতিনিধিত্ব দাবি করবেন, তাঁর মধ্যে থাকা চাই অসামান্যতা ও অদ্ভুতাচরণের শক্তি। তিনি করবেন অসম্ভবকে সম্ভব, অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক এবং অসাধ্যকে আনবেন সাধ্যের মধ্যে। তাই দুনিয়ার তাবৎ জাতির নবী, রসুল, পীর, অবতার, ফকির, সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায়ের প্রথম ও প্রধান অঙ্গীকার হচ্ছে ঐশ্বর্য বা কেরামতী প্রদর্শন। হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি ইসলামী ধারার সব নবী-রসুলের জীবন তাই অলৌকিকতা দিয়ে শুরু ও শেষ। কেবল কয়েকজন ব্যক্তি ও ঘটনাস্থলই মাত্র ঐতিহাসিক। অতএব এগুলো ঐতিহাসিক নাম-সার বানানো গল্প।

হযরত মুহম্মদের জীবনেও নবুয়ত ও ওহি প্রাপ্তির অভিজ্ঞান স্বরূপ সিনাছাক, চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং মে'রাজ ছাড়াও তাঁর আরো নানা মো জেজার কথা ভক্ত-সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন আবদুল রহমান ইবনে আবু বকর বলেছেন, একদিন হযরত মুহম্মদ বকরীর কলিজা ও গোস্ত একশ' ত্রিশ জন লোককে পেটপুরে খাইয়েছিলেন, তার পরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।[১] জাতকেও বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে এমনি গল্প পেয়েছি। রসুলচরিতে এবং সহি হাদিসে এমনি নানা অলৌকিক তথ্য ও গল্প ঠাঁই পেয়েছে।

ভক্তের অভিভূতির আচ্ছন্নতা যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিদ্বেষের তীব্রতাও তেমনি মনগড়া দোষের ফিরিস্তি বাড়ায়। ফলে ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি ঘৃণা বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা দেয়।

---

১ *তজরীদুল বুখারী ঃ বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত, হাদিস সং ১১৫৭, পৃঃ ৪৯৩।*

অতএব, অতিপ্রাকৃত অঙ্গীকারে যহরী প্রমুখ মুমীন, ইমাম, মহাদ্দেস ও ঐতিহাসিকগণ যতটা তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন বলে অনুমান করি, পরবর্তীকালে ততটা নিষ্ঠা বিরল ছিল। তত্ত্বপ্রবণতার প্রশ্রয়ে তথ্য বিকৃত হয়েছে। যতই দিন গেছে, লেখক সংখ্যাও বেড়েছে, কাসাসুল আম্বিয়া, মাগাজী আর সিরাতগুলোও সে-সঙ্গে তত্ত্বে, উপকথায় ও মোজেজা সংযোজনে স্ফীত হয়ে উঠেছে। কল্পনার ও কলেবরের সঙ্গে গ্রন্থগুলোর আকর্ষণও হয়তো বেড়েছে—যার পরিণামে ও পরিণতিতে আমরা দেশী পরিবেশে 'জয়কুম রাজার লড়াই'র মতো বানানো কাহিনীও পাচ্ছি। কাবিল ও তার সন্তানদের হাতে দেখেছি রাম-রাবণের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র, বেদে মিলেছে হযরত মুহম্মদের নাম, আর পাই তরবারির সাহায্যে উন্মেষ যুগের ইসলাম-প্রচারক বীর রসুল, আলি, হামজা, হানিফা প্রভৃতিকে দেখি একহাতে তরবারি আর হাতে কোরআন নিয়ে কাফেরদেরকে বাহুবল প্রয়োগে দীক্ষিত করতে। এতে অমুসলমানদের কাছে মুসলমানকে করেছেন তাঁরা লজ্জিত, বীরদের করেছেন নিন্দিত, আর ইসলাম হয়েছে অবজ্ঞেয়। এ ব্যাপারে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খানের মন্তব্য মূল্যবান ঃ

'মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না, তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয়কূল রক্ষা করার জন্য কতগুলি আজগৈবী অনৈতিহাসিক অলৌকিক ও অস্বাভাবিক গল্প-গুজব ও উপকথার আবিষ্কার করেন এবং উচ্চ কণ্ঠে মহাপুরুসের নামের জয়জয়কার করিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে কথিত কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনীগুলি...শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। (মোস্তফা চরিত পৃঃ ২) পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইলেই প্রত্যেক মিথ্যা এবং প্রত্যেক্ষ অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক কিংবদন্তী ইতিহাসে এবং তাহা হইতে ত্বরায় উন্নীত হইয়া ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল (পৃঃ ১০)।

এবং আদি জীবনীকার মুহম্মদ বিন ইসহাক (মৃঃ ১৫১ হিঃ) এবং মুহম্মদ বিন ওমর ওয়াকেদী (মৃঃ ২৩৭ হিঃ) থেকেই লিখিতভাবে এর শুরু। আবার তকলিদ (অভিমত)-কে রওয়াইত (সাক্ষ্য) বলে চালিয়ে দেয়ার ফলেও বহু মিথ্যা ও বিকৃতি প্রবেশ করেছে। [মোস্তফাচরিত, পৃঃ ১০২-০৮, ৬-১১]

নবীবংশ পরিচিতি

যে দেশজ মুসলিম সমাজ গাঁয়েগঞ্জে গড়ে উঠেছে, ইসলামী ইতিকথায় ও ঐহিহ্যে সে-সমাজকে দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যই রচিত হয়েছে কবির নবীবংশ। পরাগলী মহাভারতই কবিকে এসব দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে ঃ

এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়াএ
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি লএ।
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র 'ভারত কথা' কহিল বিচারি।
হিন্দুমুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।

গ্রহশত রসযুগে অব্দ গোঞাইল
দেশীভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক।....
কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবি বচন।
তাই— আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল।

অতএব সৈয়দ সুলতানই প্রথম ব্যক্তি যিনি সাহস করে নবী-রসুলের ইতিবৃত্ত এবং ইসলামের মর্মকথা বাঙলা ভাষায় রচনা করতে শুরু করলেন। একে তিনি আল্লাহ-রসুলের ও মুসলিম সমাজের প্রতি আলিমের ও পীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই মানলেন ঃ

আল্লাএ বুলিব তোরা আলিম আছিলা
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না কৈলা।

আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে পাপী শিষ্য বলবে—

গুরু ভেটিলাম গুরু না জানাইল মোরে।
কাজেই দেশেতে আলিম থাকি যদি না জানাএ,
সে আলিম নরকে যাইব সর্বথাএ।
এহি ভএ ভাবিয়া রচিল নবীবংশ
শুন পাপীগণে যেন পাপে নহে ধ্বংস।

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কবি রক্ষণশীলদের কাছে হলেন নিন্দিত ঃ

সে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পাঁচালী রচিলাম করি আছএ দূষিতে।
মুনাফিকে বোলে আহ্মি কিতাবেতু কাড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানী করি।

কবি এ অকারণ নিন্দা থেকে রেহাই পাবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির—খোরাসানী, যাভানী, চোল, রুমী, এরাকী, সামী, ইয়ামানি, ইরানি, পাঠান প্রভৃতির অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে অবশেষে বলেছেন ঃ

আলিমে কিতাব পড়ি বাখানে যে কালে
হিন্দুয়ানী করি যদি না বাখানি বোলে।
বঙ্গদেশী সকলেরে কিরূপে বুঝাইবে ?
যারে যেই ভাষে প্রভু করিয়াছে সৃজন
সেই ভাব তাহার অমূল্য সেই ধন।
আল্লাএ বুলিছে, 'মুঞি যেদেশে যে ভাষ,
সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রসুল প্রকাশ।'

শাস্ত্র চিরকালই জনগণের ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে মুখে মুখে, কেবল লিপিবদ্ধ করণেই ছিল বাধা। মুর্খের নিন্দা অগ্রাহ্য করে কবি বলেন—

পয়গম্বর সকলের মহিমা প্রচারিলুঁ
পাপমতি ইব্লিসের অযশ ঘোষিলুঁ।
তোহ্মারা সবের মুঞি জান হিতকারী
ইমা ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি।

নবীবংশে বর্ণিত বিষয় ঃ

যে রূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন
যেরূপে সৃজিল জান সুরাসুর গণ।
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হৈল
যেরূপে যথেক পয়গাম্বর উপজিল।
বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল
নবীবংশ পাঞ্চালীতে সকল কহিল।
মুঞি পাপী এ সকল প্রচার করিলুঁ
তোহ্মারা সবের লাগি দর্পণ সৃজিলুঁ।
এ দর্পণ দর্শিলে খণ্ডিব যথ ধন্ধ
নিরক্ষিলে দর্পণ জানিবা ভাল মন্দ।

'নবীবংশ' রূপ জ্ঞানদর্পণ সৃষ্টি করে কৃতার্থ কবি সগর্বে দাবি করছেন ঃ

মাএ বাপে তোহ্মারে জনম দিয়া গেছে,
দিব্য আঁখি তোহ্মারে দিলাম আহ্মি পাছে।

নবীবংশ রক্ষণ-পঠনের যৌক্তিকতা ও সুফল সম্বন্ধে কবি বলেন ঃ

যে সকল মুমীন হএ করুণা হৃদএ
নবীবংশ পুস্তক রাখিতে জুয়াএ।
এহি পুস্তক যদি পারে রাখিবারে
আল্লার গৌরব হৈব তাহার উপরে।

কবি ভারতীয় প্রতিবেশ স্মরণে রেখে নবীবংশ রচনা শুরু করেন। হিন্দুর সুরাসুর, বেদ, অবতার প্রভৃতি সব কিছুর সত্যতা তিনি সৃষ্টির ও শাস্ত্রের আনুক্রমিক ধারায় স্বীকার করেন। কিন্তু ইব্লিসের প্রভাবে সুরাসুর বিভ্রান্ত, বেদ বিকৃত, অবতার বিপথগামী, ঈসার কিতাবও বিকৃত। কাজেই একালের সর্বশেষ শাস্ত্র ইসলামই হচ্ছে সর্বজনগ্রাহ্য ও বরেণ্য ধর্ম। অর্থাৎ সৈয়দ সুলতান ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকৃতিজাত অসারতা ও পরিহার্যতা যুক্তি প্রমাণ

যোগে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল এতে দেশজ মুসলিম হবে ইসলামনিষ্ঠ আর হিন্দুও হবে ইসলামের সত্যতায় আকৃষ্ট।

মুসলিম-মনে ঐতিহ্য-চেতনা, আত্মপ্রত্যয় ও স্বধর্মগৌরব জাগ্রত করাই ছিল সৈয়দ সুলতানের মুখ্য লক্ষ্য। তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। হিন্দুর জীবনে সমাজ সংস্কৃতিতে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের যে ভূমিকা, গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল তেমনি ভূমিকা ও প্রভাব ছিল সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ নামের এই কিস্‌সাসুল আম্বিয়ার চট্টগ্রামের মুসলমানদের উপর। এ প্রভাব অবশ্য চট্টগ্রামেই ছিল সীমিত। কেননা মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের স্থানিক বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিবেশে হস্তলিখিত গ্রন্থের অঞ্চলান্তরে প্রচার সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না।

মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস আদম থেকে নবী পরম্পরার সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কিংবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ কিংবাা চল্লিশ হাজার। এঁদের মধ্যে নাম জানা আছে মাত্র বিশ-পঁচিশ জনের। এবং কেতাবী নবী হচ্ছেন চারজন মাত্র এবং অন্যেরা স্বপ্নাদিষ্ট নবী। নবীবংশে কবি পীর মীর সৈয়দ সুলতান আদম থেকে ঈসা অবধি মাত্র আঠারোটি কিসসা বা নবীকাহিনী বর্নণা করেছেন ঃ

সৈয়দ সুলতান পঞ্চালী ভণিল — অষ্টাদশ কিসসা নবী সমাপ্ত হৈল।

তারপর দ্বিতীয় পর্ব শুরু করার আগে প্রথম পর্বের শেষে বলেছেন ঃ

এবে শুন যেরূপে জন্মিব মুহম্মদ — শুনিলে সে সব কথা খণ্ডিব আপদ।

'নবীবংশের' 'হামদ' অংশে 'আল্লাহ্‌র' স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে ঃ

আদি অন্ত নাহি তার নাই স্থান স্থিত
খণ্ডন বর্জিত রূপ সর্বত্র ব্যাপিত।.....
সবার বিদিত আছে না হএ বেকত...
শূন্যঘটে শূন্যাকার হইছে প্রকাশ......
আনলে তপনে রূপ আছএ ব্যাপিত
শীতল সুগন্ধি রূপে পবন বাহিত......।

এবং—রজগুণ ধরি প্রভু সংসার সৃজএ
সত্ত্বগুণ ধরি প্রভু সংসার পালএ।
তমগুণ ধরি প্রভু করএ সংহার
এহি তিনগুণে তান মহিমা অপার।

ভালমন্দ দু-ই লীলাময় আল্লাহর সচেতন সৃষ্টি ঃ

সৃজিলেক রাবণক জানকী হরিতে।
রামক সৃজিলা প্রভু রাক্ষস মারিতে।
হরিক সৃজন করিলেক নিরঞ্জন
কেলিকলারস ভুঞ্জিবারে বৃন্দাবন।

আল্লাহ প্রথমে ছিলেন নিরূপ আকার, তথা 'আপনাতে আপনার না ছিল প্রচার।' এই অচৈতন্যের মধ্যে লুকিয়ে ছিল চৈতন্যরূপ জ্ঞান—'পুষ্পেত আছিল যেন গন্ধ ছাপাইয়া।' চৈতন্য লাভ করে তিনি নার্সিসাসের মতো নিজের রূপ দর্শনে নিজের প্রেমে হলেন অভিভূত, এই প্রণয়-দৃষ্টি থেকে উদ্ভব হল ঘর্ম ঃ

সেই ঘর্মে পরম আত্তমা হৈল যথ
সেই ঘর্মে জন্মিল জীবত্তমা তথ।
সেই ঘর্মে মহামন্ত্র যথেক জন্মিল
আনল বরুণ বারি মৃত্তিকা সৃজিল।
চন্দ্র সূর্য আকাশ এসব জন্মিল।
এবং যার ঘর্মে এসব সৃজিল নৈরাকার
নুর মুহম্মদ নাম থুইল তাহার।

পৃথিবীতে সৃষ্টিপত্তন শুরু হয় অগ্নিসঞ্জাত মারীচ-দম্পতিকে দিয়ে। সুরাসুর তাঁদের সন্তান। কাম ও ক্ষুধা, লোভ ও অসূয়া গোড়া থেকেই পার্থিক প্রাণীকে অভিভূত করে। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই। সুরাসুরে, পাপে ও দ্বন্দ্বে বিরক্ত আল্লাহ পৃথিবীর ফরিয়াদক্রমে ধ্বংস করলেন সুরাসুর, সৃষ্টি করলেন, মাটির মানুষ। অসুরের মধ্যে কালনেমি, শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ড, মুণ্ড, হিরণ্যকশিপু, বলি, সুরের মধ্যে শিব, যোগী, পার্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কামুকশিব, কূর্ম, বরাহ,

নরসিংহ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। তারপর রয়েছে রাম, পরশুরাম, বালি, সুগ্রীব, সীতা প্রভৃতির বৃত্তান্ত।

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবীতে অসুর ও সুর ছিল 'বৎসর চল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার', তারপর ফিরিস্তারা ছিল 'অষ্টদশ লাখ হাজার বিংশতি' বৎসর। তারপরে তৃতীয়যুগে এক প্রকার নর ছিল 'বার লাখ অব্দ আর বিংশতি হাজার' বছর। এবং 'পঞ্চশত আদম গঞ্জিল তার মধ্যে। চতুর্থ কালেত হৈল (পক্ষযুক্ত) অশ্ব অধিপতি। এরা ছিল 'অষ্ট লাখ বৎসর যে পঁচিশ হাজার', এরপরেই 'নয় হাজার ছিয়াশী' বছর আগে আমাদের যুগের 'তবে আদম সফি ক্ষিতিত প্রবেশ।'

'এহি সব পরস্তাব কোরানে আছিল
দেশী ভাষা করি তারে পঞ্চালি রচিল।
শুনিলে এসব কথা হরে সব পাপ
জানিবা শাস্ত্রের মূল খণ্ডিব সন্তাপ।

আদম স্বর্গ সুখেই ছিলেন, কিন্তু নিঃসঙ্গতার এক অস্ফুট অব্যক্ত বেদনা যেন ছিল তাঁর মনে। আল্লাহ তাঁর অভাব ঘোচালেন। একদিন আদম ঃ

নিদ্রা যাএ মহামতি স্বপন দেখিয়া তথি
বাম অস্থি হোন্তে এক তান।
নিকলিল এক নারী নানা অলঙ্কার পরি
রহিয়াছে তান বিদ্যমান।

আদমের অবচেতন জীবন-স্বপ্ন সফল হল। দাম্পত্যেই যে মানবজীবনের পূর্ণতা, এবং জীবন যে কাম ও ক্ষুধা নিয়ন্ত্রিত, সে তত্ত্ব স্বীকৃতি পেল। কামচর্চার অসংযম এবং ক্ষুধানিবৃত্তিতে লোভের প্রশ্রয়ই পাপ–এ অসংযম ও লোভই হচ্ছে শয়তান–প্রমূর্ত ইব্লিস। তাই নিয়ম-সংযমের, রীতি-রেওয়াজের অনুগত থাকাই আল্লাহ আনুগত্যের নামান্তর এবং রিপু চালিত হওয়াই হচ্ছে শয়তানী। পার্থিব জীবনে মানুষ রিপুর ও সংযমের দ্বন্দ্বে সদা পিষ্ট। মানুষের সব দুঃখ-যন্ত্রণার মূলে রয়েছে ঐ অসংযমরূপী ইব্লিস। এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে সদাচারী থাকাই হচ্ছে মানব জীবনের লক্ষ্য। নবীবংশ এই সংযম-সদাচার ও রিপুতাড়িত মানুষের অসংযম-অসদাচরণের ইতিকথা। ভাল-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের, কল্যাণ-অকল্যাণের এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে আল্লাহর প্রতিনিধি হচ্ছেন বাণীবাহক নবী আর শয়তানের প্রমূর্ত প্রতীক হচ্ছে মনোজ রিপু। প্রলোভন প্রবল হলেই মানুষ পাপ করে—পড়ে শয়তানের খপ্পরে। হাওয়া ও আদমই ইব্লিসের প্রথম শিকার। গন্দুম খাওয়ার আশুফল হচ্ছে যৌনচেতনা, তারই সূচনা দৈহিক লজ্জায় 'নাভীতলে দুই কর করি আরোপণ। বৃক্ষপত্র পরিবারে করিলা গমন।' সাপ কাম-বিষের প্রতীক। মর্ত্যে আদম-হাওয়া হলেন সন্তানপ্রসূ। অনুশোচনায় সন্তপ্ত আদম-হাওয়া। কবি বলছেন—'জন্মিতে কারণ আহ্মি সব/তুহ্মি দুই (আদম-হাওয়া) হৈলা বিবসন।'

খ্রীস্টান মতে এ পাপ থেকেই মনুষ্যজন্ম। তাই পাপ স্খলনই মনুষ্যব্রত। তৌরাত মতে আদম-হাওয়ার প্রতি আল্লাহর প্রথম আদেশ–'মর্ত্যে যাও এবং সন্তান বৃদ্ধি কর।'

আদম-হাওয়া মর্ত্যে হর-পার্বতীর মতো ঘরকন্না শুরু করলেন। আদম কৃষিজীবী। আদম-হাওয়ার ও কাবিল-আকিমার রতিসম্ভোগচিত্রে রসজ্ঞান ও নৈপুণ্য প্রকট।

বিপুল বিস্তৃত ভুবনে ফল-মূল-মৃগয়াজীবী স্বল্পসংখ্যক মানুষের খাদ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না, তাই কামনার কামিনী নারী নিয়েই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ঈর্ষা-অসূয়ার ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। তাই রূপকথা, মহাকাব্য প্রভৃতি নারীকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট। সুন্দরী বোন আকিমাকে নিয়েই দুই ভাই হাবিল-কাবিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম শুরু। আকিমার বিলাপ চৌতিশায় বর্ণিত।

আদমের পর নবী হন তাঁর পুত্র শিশ্। কাবিলবংশীয়রা শয়তানের প্রভাবে হল কাফের। তাই নবীর উম্মতদের সঙ্গে শুরু হল তাদের আপোসহীন বিরামহীন দীর্ঘকালীন সংগ্রাম। প্রাচীন পদ্ধতির যুদ্ধে প্রাচীন কাব্যে সুলভ সব অস্ত্রই ব্যবহৃত হয়েছে।

শিশের পরে সমাজপতি ও লোকশিক্ষক নবী হলেন ময়াইল। তাঁর পরে সমাইল এবং তাঁর পরে বারদ। এই বারদপুত্র নবী আখলাক ওর্ফে ইদ্রিস ছিলেন সাক্ষর ও সুপণ্ডিত। ইনিই প্রথম সেলাই করা জামা চালু করেন এবং ইনিই বেহেস্তে যান জীবন্ত অবস্থায়।

ইদ্রিসের পরে নবী হলেন নুহ। একদিন খোস-পাঁচড়ার দুর্গন্ধযুক্ত কুৎসিত এক কুকুর দেখে নুহ বললেন—'দেখিতে কুশ্চিত রূপ বিকৃত আকার। প্রভু কিসকে সৃজিলা।' এতে আল্লাহ রুষ্ট হলেন,—অন্তরীক্ষবাণী শুনলেন নুহ—

পারনি এমত এক সৃজন করিতে
প্রভুর সৃজন তুহ্মি লাগিলা দূষিতে
নিন্দিবারে তারে তুহ্মি উচিত না হয়।'

অনুতপ্ত নুহ অপরাধের জন্যে শতেক বছর কাঁদলেন। তাই নাম হল তাঁর নুহ [কান্না]।

'যদি সে রোদনা নবী কৈলা অবিশ্রাম।
তেকারণে 'নুহ' হেন হৈল তান নাম।

অন্যত্র আছে—পুত্র না দেখিয়া মাত্র কান্দিতে লাগিলা
তেকারণে 'নুহ' নাম তাহার হৈল।

নবীদের প্রাণের দুশমন থাকে। নুহর ছিল দানিয়াল, ইব্রাহিমের ছিল নমরুদ, মুসার ছিল ফেরাউন, কৃষ্ণের ছিল কংস, দাউদের ছিল আনসারী, ঈসার ছিল তউসা এবং মুহম্মদের দুশমন ছিল আবু জেহেল।

কাবিল বংশের দানিয়াল ছিলেন মূর্তিপূজক নৃপতি। পূজা-পার্বণ কালে ঃ

সভান সহিতে রাজা মূরতি পূজএ।
পুষ্ট অজা আনিয়া দেঅন্ত বলিদান
কাঁস করতাল বাহে করি সুরাপান।
কেহ সভা মধ্যে নারী করএ শৃঙ্গার
লাজ ভএ এক নাহি পশুব্যবহার।

'মূর্তি ভাবি মুক্তিপদ তুহ্মি না পাইবা'—নুহ প্রতিবাদ করায় তাঁর উপর রাজকীয় নির্যাতন শুরু হয়। কেননা—

অন্ধ করি যাহারে রাখিয়াছে করতারে।
তাহারে দিবারে চক্ষু কার শক্তি পারে।

অবশেষে প্লাবন সৃষ্টি করে আল্লাহ ধ্বংস করলেন তাঁর বিপথগামী সৃষ্টিকে। তবু নুহর বংশে আবার নুহর পৌত্র আদম হল অনাচারী। এই আদমের বংশে জন্ম হল আর এক দুরাত্মার, নাম তার নমরুদ। তার 'পরমাই হাজার বৎসর সপ্তশত।' সে ভূপ্রোথিত সম্পদ পেয়ে ঃ

আত্মবলে পৃথিন্বিত হৈল অধিপতি।
সামদেশ মারিলা মারিলা তূর্কস্থান
হিন্দুস্থান মারি পাপী হইয়া প্রধান।
পশ্চিম পূর্বের লোক সকল মিলিল
দক্ষিণ উত্তর লোক কর যোগাইল।

ধনগর্বিত ও ক্ষমতামত্ত এই সম্রাট নিজেকে আকাশের আল্লাহর চেয়ে শক্তিমান বলে ঘোষণা করল।

নমরুদের—
গৃহ সব রত্তন মণ্ডিত শোভাকার
মাণিক্য জড়িত সেই গৃহের খাম্বার।
খাম্বাত দর্পণ সব মণ্ডিত আছএ
বিবিধ প্রকারে সব দর্পণ দেখএ।
নগরের অন্ত নাহি প্রাকার বেষ্টিত
বিবিধ অমূল্য দ্রব্য তথাত শোভিত।

নগরে—
পসারে বসিয়া সব দিব্য নারীগণ
কৌতুক সানন্দ মনে পসার দেঅন।
কর্পূর তাম্বুল সবে খাঅন্ত সদাএ
চর্তুদিকে অঙ্গের সুগন্ধি বহি যাএ।

কংস, ফেরাউন ও আবু জেহেলের মতো নমরুদও ইব্রাহিমের জন্ম নিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ইব্রাহিমের প্রশ্নের উত্তরে পিতা আজর মূর্তি ও চন্দ্র-সূর্য পূজার কারণ বলেছেন ঃ

পৃথিবীতে যথ কিছু হএ উতপন
চন্দ্রের সূর্যের তেজে হএত সৃজন।
তেকারণে চন্দ্র সূর্য সেবে নরপতি
তত্ত্বে প্রভু মনে জানি করএ প্রণতি।'

'ইব্রাহিমের উপাস্য সন্ধান' আরোহ ন্যায়ের উৎকৃষ্ট নমুনা। 'নমরুদ-ইব্রাহিম' বৃত্তান্ত নবীবংশ কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট ও প্রধান বৃত্তান্ত। এখানে ওথেলো-ডেস্‌ডিমোনার মতোই সারা-ইব্রাহিমের প্রেম। ইব্রাহিমের মূর্তিভাঙা, ইব্রাহিমের নির্যাতন, নমরুদের দণ্ড, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত ইব্রাহিম, বিবিধ প্রচণ্ড আঘাতেও অক্ষত ইব্রাহিম এবং সারা-হাজরার স্বামী ইব্রাহিম, প্রভৃতি বৃত্তান্ত মহাকাব্য ও মহানাটকের উপকরণ। ইব্রাহিম এখানে উন্নতশির বিজয়ী, ধীরোদাত্ত মহানায়ক। এক কথায় তত্ত্বে তথ্যে আদর্শচেতনায় সত্যনিষ্ঠায় লোভে দম্ভে দ্বন্দ্বে ঘৃণার প্রেমে পীড়নে নির্যাতনে সংকল্পে মনুষ্যত্বে ত্যাগে ক্ষমায় তিতিক্ষায় ইব্রাহিমের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত। ইব্রাহিমের জীবনবৃত্ত ও বিপুল কলেবর কাব্যের মধ্যমণি। ইব্রাহিম ও নমরুদ যথাক্রমে সত্যের ও মিথ্যার, পুণ্যের ও পাপের, ন্যায়ের ও অন্যায়ের, ভালোর ও মন্দের, সাফল্যের ও বিফলতার, জয়ের ও পরাজয়ের, ঘৃণার ও প্রেমের, সুজনের ও দুর্জনের প্রতীক। এ অধ্যায়ে বাস্তবজীবনের ও সমাজের নানা লঘু-গুরু অনুভব ও চেতনা, সম্পদ ও সমস্যা আনন্দ ও যন্ত্রণা অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণিত রয়েছে।

সে-যুগেরও রাজ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ সহজ ছিল না, শুল্কও দিতে হত। দেহ এবং মালপত্রও পরীক্ষা করা এবং বস্তুর মূল্যায়ন ও শুল্ক ধার্য করা হত। চোরা কারবার আর পণ্যপাচারও সুপ্রাচীন, তাই ঘুষও ছিল চালু।

ইব্রাহিম মিসর থেকে সামদেশে যাবার পথে মিসর সীমান্ত হামস গাঁয়ে—

ঘাট চৌকি থরে থরে দিচ্ছে দুরাচারে (নৃপতি)
ঘাটী না বোলাই সামদেশে যাইতে নারে।
বস্তুজাত লই তথা গেলে সাধুগণ
অবিচারে দান লএ লুটে সর্বধন।

এই রাজার আরো বর্বর স্বভাব রয়েছে ঃ

নারী যদি সঙ্গে আনে সাধু সদাগরে
সুচরিতা নারী পাইলে লই যাএ কাড়িয়া।

শুধু তা-ই নয়—নর সবে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী
নৃপতি সাক্ষাতে লই যাএ অকুমারী
নৃপতি শৃঙ্গার করে সে নারীক ধরি।

ইব্রাহিম-পত্নী সারাও এ বিপদে পড়েন। পরে অবশ্য সতীর আকুল আবেদনে আল্লাহ্ রাজাকে অন্ধ ও চলৎ-শক্তি রহিত করলে তিনি উদ্ধার পান। এই রাজা থেকেই রূপসী হাজরাকে 'ডালি' হিসেবে পান ইব্রাহিম এবং ফিলিস্তিনে বায়তুল মুকাদ্দেস নির্মাণ করে তথায় বাস করেন।

এর পর নমরুদকে দমন করার জন্য ইব্রাহিম বাবুল দেশের 'ছোখা' গাঁয়ে সপরিজন বাস করতে থাকেন। নমরুদের সঙ্গে দীর্ঘ দ্বন্দ্বের ও আপোস-চেষ্টার পরিণামে আল্লাহপ্রেরিত 'মশা'র নমরুদের নাসারন্ধ্রে অনুপ্রবেশের ফলে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর প্রবল প্রতাপ নমরুদের মৃত্যু হল চরম যন্ত্রণার মধ্যে।

মশা 'রক্তপান করি মজ্জা লাগিল খাইতে

সারার আগেই হাজরা হলেন গর্ভবতী। সাপত্নীক ঈর্ষা বশে হাজরাকে বক্কায় (মক্কায়) নির্বাসিন দেয়ার জন্যে প্ররোচিত করলেন প্রথম ও প্রধান পত্নী রাজকন্যা সারা। 'সপত্নীর সম্পদ দেখিতে না পারিমু' সেই নির্জন স্থানে সারা-অভিপ্রেত মৃত্যু হল না হাজরার—বরং গড়ে উঠলো জমজম কূপ ও মক্কাশহর।

কবি সারাপুত্র নবী ইসহাককে কিংবা হাজরাপুত্র নবী ইসমাইলকে কুরবানী দেয়ার এমন রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করেননি বাহুল্যবোধে, হয়তো সবার জানা বলেই। কবির যুক্তি—

ইসহাক ইসমাইল নবীর যে সূত
সে দোহান পরস্তাব আছেএ বহুত।
সেসব লিখিলে হএ পুস্তক বিশেষ
তেকারণে না লিখিলুঁ যে আছিল শেষ।

এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নবী হৈছে।
একে একে সভানের পরস্তাব রৈছে
এক পুস্তকেত এথ লেখিবারে নারি।

তাছাড়া, সব নবীর বাণী মূলত একই–

মূরতি পূজিতে নিষেধিবারে কারণ
একে একে সৃজন হইল নবীগণ।

আল্লাহ কাবিল বংশে এক নবী নাজেল করলেন সে-বংশের লোককে অপকর্ম থেকে বিরত করার জন্যে। ওরা যে শুধু মূর্তি পূজা করে তা নয়—

দারি চুরি অকর্ম করন্ত সর্বজন
পরহিংসা পরমন্দ করে অনুক্ষণ।

এই নবীর নাম হরি (কৃষ্ণ)। শয়তানের প্ররোচনায় মাতুল রাজা কংস এঁকে গর্ভে ও পরে শৈশবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হয়। এসব বৃত্তান্ত পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। এবার ইব্লিস নবী হরিকে বিভ্রান্ত ও ব্রতভ্রষ্ট করবার জন্যে মুনিবেশে আসরে অবতীর্ণ। সে বলছে—

ক্রুদ্ধ হৈব যে-সব বচনে নিরঞ্জন
হরিকে কহএ পাপী পরমাত্মা করি....
তুহ্মি হরি জনার্দন ভুবনের সার
তোহ্মাকে স্মরণে পাপী হইবে নিস্তার।
মৎস্য রূপ ধরি তুহ্মি ভুবন পালিলা
বরাহের রূপে ক্ষিতি দন্তে আচ্ছাদিলা।

নরসিংহ রূপ ধরি মারিলা অসুর—
কূর্ম রূপে ছিলা তুহ্মি পাতাল ভুবনে।
বামনের রূপ ধরি বলিক ছলিলা
রাম রূপ ধরি তুমি রাবণ মারিলা।
এখনে হৈছ তুহ্মি কৃষ্ণ অবতার।

এরপর রাখালরূপে, কালীয়নাগহন্তারূপে, গোপীবল্লভ সম্ভোগপ্রিয় কৃষ্ণরূপে এবং অর্জুনসখা কৃষ্ণরূপে হরির কবিত্বময় বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একবার অন্তরীক্ষবাণী হরিকে তাঁর ব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। অনুতপ্ত হরি নারীদের থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে আত্মগোপন করলেন, তখন ওরা তাঁর পিতলের মূর্তি গড়ে রাখল ঘরে ঘরে। অর্জুনকে অনুতপ্ত হরি বললেন—

সমুদ্রের বিম্ব হই না হই সাগর।
সূর্যের কিরণ হই নহি দিবাকর।
সৃজন হইছি নহি সৃজনিহার (স্রষ্টা)

আহ্মি পরমাত্মা নহি জানিঅ নিশ্চএ
সভান উপরে প্রভু নিরঞ্জন হএ।
কথ কথ গুণ মোরে 'ধিক দিয়া আছে
নর সবে মোর বাক্য মানিবারে পাছে।

ব্যর্থকাম হরি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। বাহন হল গরুড়। এক জায়গায় হরির বৃন্দাবনলীলার অসারতা ও জন্মান্তরবাদের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যাত হয়েছে—

পুনি পুনি একেরে কিসকে পাঠাইব ?
পাপ পুণ্য ফল যদি ভুঞ্জিব এথাত
তবে কেন প্রভু স্বর্গ নরক সৃজিল ?

অর্জুনসহ হরি ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রম করে আর একবার দেশের লোকদের বোঝাতে চাইলেন—

অর্জুন সহিতে হরি সভান গোচর
কহিলা নিয়ম কথা জুড়ি দুই কর।

তুহ্মি যেই মত নর সেই মত আহ্মি
নর হই নর সেব কি কারণে তুহ্মি।

কিন্তু ইব্লিসের খপ্পরে পড়া মানুষের কাছে হরির আবেদন ব্যর্থ হল। আদসামুদ গোত্রের মতো 'এই পাপে হইল যদুবংশের সংহার' এবং 'বিশুদ্ধ বেদপুরাণে নাহি সে সব আচার!' ইব্লিস বেদ-পুরাণ বিকৃত করে 'সে আচার করিল প্রচার'।

নবীবংশের আর একটি প্রধান ও দীর্ঘতর অংশ হচ্ছে মুসা-ফেরাউনের কিস্‌সা। অলিদ নামে অজ্ঞাত পরিচয় এক ধূর্তলোক ছলচাতুরী-ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ফিকির প্রয়োগে হলেন মিসরের প্রবল-প্রতাপ সম্রাট। বনি ইসরাইলের নবী ইউসুফের আমলে দুর্ভিক্ষপীড়িত কেনানবাসীরা এসে বাস করে মিসরে—দাসরূপী এই শাসিত-শোষিত-পীড়িত বিদেশীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভয় পায় ফিরোয়ান ও শাসকগোষ্ঠীর 'কিব্বি'রা। 'মুসার জ্ঞাতিরে বল কিব্বিএ করিল।' পাছে ওরা শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়—এই আশঙ্কায় ফিরোয়ান ওদের পুত্র সন্তানদের জন্ম মুহূর্তেই হত্যার নির্দেশ দেয়। দৈবজ্ঞ-গণকের পরামর্শে বিশেষ লগ্নে ইসরাইলদের দাম্পত্যমিলন হল নিষিদ্ধ। দৈবজ্ঞের নির্দেশে মুসাহত্যার ষড়যন্ত্র চললো। মুসার জন্ম বৃত্তান্ত ইব্রাহিমের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ। কিন্তু বিধি বাম, তাই এম্রানপুত্র মুসা বেঁচে গেলেন এবং ফেরাউন-পত্নী আয়েশার কোলেই হলেন লালিত। প্রসঙ্গক্রমে কবি এক স্থানে ধনমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন :

ভিক্ষুক নৃপতি হৈল ধনের কারণ।
ধন হোন্তে পৃথিম্বিত নরে মান্য পাএ
ধন হোন্তে যথ দোষ মহত্ত্ব লুকাএ।

ধন হোন্তে অকুলীন হঅন্ত কুলীন
বিনি ধনে হএ যথ কুলীন মলিন
ধন হোন্তে কার্য যথ পারে করিবার
ধন হোন্তে যাইতে পারে স্বর্গের মাঝার।

ফিরোয়ান সিংহাসনে বসে গাঁয়ে গাঁয়ে তরুলতা জন্মিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করান। চমক পাথরের আকর্ষণ সৃষ্টি করে 'আলগ আসনে পাপী শূন্যেত রহিল।' এভাবে সে প্রজার পালনে প্রতাপ-প্রভাব বৃদ্ধি করছিল। নিজে যাদুকরের মতো আয়ত্ত করল নানা কৌশল। এবং নিজেকেই দাবি করলো উপাস্য বলে। অনেকের আস্থাও লাভ করল। মুসার এক ইসরাইলী জ্ঞাতি সামরিকে বেগার খাটাচ্ছিল এক কিব্বি শাসকগোষ্ঠীর লোক। মুসা লোকটাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কিব্বিকে অনুরোধ করলেন। কিব্বি অসম্মত হলে মুসা ক্রোধবশে কিব্বিকে আঘাত করলে সে মারা যায়। ফিরোয়ান রুষ্ট হয়ে মুসাকে হত্যার আদেশ দেয়। ফলে মুসা মিসর থেকে পালিয়ে যান এবং মদাইলে 'সাহেব' নবীর ঘরে আশ্রিত হন এবং তাঁর কন্যা সফুরাকে বিয়ে করে সাত বছর সেখানেই বাস করেন। এই সাহেব নবী থেকেই মুসা আদমের 'আষা' পেয়েছিলেন। এই আষা 'স্বর্গের বৃক্ষের ডাল সর্বগুণধর।' সাত বছর পরে ছাগলের পাল ও গর্ভবতী স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে মুসা মিসর যাত্রা করলেন। পথে লাভ করেন তিনি জমজ কন্যা সন্তান। এবং পথেই অগ্নি প্রতীকে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ থেকেই তিনি 'কলিমুল্লাহ'। মুসা নবুয়ত অভিজ্ঞান স্বরূপ এখানেই বাহুতে শ্বেত চিহ্ন লাভ করেন। মুসা ছিলেন তোতলা, তাঁর অনুরোধে তাঁর বাকপটু বলবন্ত ভাই হারুণকেও করা হল, সহকারী নবী এবং মুসাকেও স্পষ্টবাক হবার এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অনুমতি দেয়া হল। কিব্বি ফিরোয়ানকে দমন করার নির্দেশ নিয়ে মিসরে গেলেন মুসা। স্ত্রী-কন্যা আল্লাহর হুকুমে সাহেব নবীর কাছে রেখে এলেই মুসা মিসরে ফিরোয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন—

'চল্লিশ বৎসর মুসা স্ত্রী-কন্যা এড়ি
যুদ্ধ আরম্ভিল নবী প্রভু আজ্ঞা ধরি।

ফিরোয়ান অন্তরে আল্লাহকে মানত, কিন্তু প্রকাশ্যে নিজেকেই দাবি করত উপাস্য বলে। তাই মুসা তাকে প্রথমে আপোসের প্রস্তাব দেন যদি প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে—

১. ফিরোয়ানের চারশ' বছরের আয়ু আটশ বছরের করা হবে। ২. বার্ধক্য ঘুচিয়ে তারুণ্য দেয়া হবে। ৩. আগের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। অন্যথায় তাঁর সংহার অনিবার্য। আপাতত মুসার

অস্ত্র হচ্ছে আষাসঞ্জাত সর্পকুল। তাই মুসাকে সবাই যাদুকর বলেই জানল—নবী বলে মানল না। যাদুকর এনে ফিরোয়ানও যাদুসর্প তৈরি করাল, কিন্তু মুসার সাপেব কাছে যাদু সাপ টিকল না। রাজপত্নী আয়েশাও নবী বলে মেনে নিলেন মুসাকে। ক্রুদ্ধ ফিরোয়ান পত্নী আয়শাকে করলেন হত্যা। ফিরোয়ান ও তার প্রজাদের সদ্বুদ্ধি জাগ্রত করাবার জন্যে আল্লাহ পতঙ্গ ও মশা সৃষ্টি করে দুর্বহ করে তুললেন মিসরবাসীদের জীবন। ফিরোয়ান কথা দিয়ে কথা রাখে না। তাই মুসা ফিরোয়ানের যুদ্ধও হল অনিবার্য। মুসাকেও সইতে হচ্ছিল দুঃখ লাঞ্ছনা অনেক। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে ইসরাইলদের নিয়ে মুসা সামদেশে পালালেন এক শুক্রবারে। অশ্ব-গজ সৈন্য নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল ফিরোয়ান রবিবারে। কিন্তু যাত্রা-লগ্ন ছিল অশুভ–

রবিবারে যাত্রা করি চলিলেন দুর্মতি — এহি বাবে গেলে দুঃখ হয় সে বহুল।
শুক্র রবি পশ্চিমেত হয় দীপ মূল তাই-– — ফিরোয়ান পাপিষ্ঠের ঘনাইল যম।

ফিরোয়ানের সৈন্যদের পোশাক ছিল নীলবর্ণের, অশ্ব ছিল মেঘবর্ণের ; মুসার আষার স্পর্শে নীলসাগরে জাগল রাস্তা। বনি ইসরাইল 'সিন্ধু মধ্যে পথ দিয়া তরিলা সাগর।' ফিরোয়ান সসৈন্য ডুবে মরল। মিসরে মুসার ও ইসরাইলের অধিকার হল প্রতিষ্ঠিত।

এবার মুসার সংগ্রাম শুরু হল ইব্লিসের সঙ্গে। মুসা কুহ তুরে আল্লাহব সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ইব্লিস এক কপিল গাভীর উদরে থেকে সবাক গাভী পূজায় প্রবোচিত করল ইসরাইলদের 'তবে দশভাগ নরে পূজিলেন্ত গাভী। রহিলেন্ত দুই ভাগ নিরঞ্জন সেবি।'

এক নিঃসন্তান বৃদ্ধ সাধুর ভাইপো সম্পত্তি আশুলাভের জন্যে পিতৃব্যকে নিয়ে দুই গাঁয়ের প্রান্তসীমায় গোপনে হত্যা করে। মুসা বললেন—এ কপিল গাভী হত্যা করে মৃতের শরীরে রক্ত-মাংস নিয়ে ফেললে সাধু প্রাণ পাবে এবং তার হন্তার নাম বলবে। অন্যেরা জীবহত্যা পাপ বলায় মুসা বললেন—

মৃত্তিকা আনল বাবি যথ আদি করি — পশু পক্ষী মৎস্য আদি খাইতে নরগণ
সদাএ করিতে আছে পরের চাকরি। — সৃজন করিয়া দিছে প্রভু নিরঞ্জন।

অতএব, সঙ্গত কারণে জীব বধে দোষ নেই। কৌশলে মুসা পূজ্য কপিল গাভী হত্যা করালেন, সাধু চিহ্নিত করল হন্তাকে। মুসানবীর প্রতি আরো দৃঢ় হল জনগণের আস্থা। তারপরে আছে দৈত্যপ্রায় ওজের বৃত্তান্ত। তারপরে রয়েছে সাধক বলরাম বাউর কিস্‌সা ও তিহারাজ আকিব ও মুসার অভিযান কাহিনী। মুসার অজ্ঞতা-ও অহঙ্কার বিনাশী তত্ত্বকথা রয়েছে মুসা ও খিজিরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অংশে। খিজিরের কাছে মুসার জিজ্ঞাসা—

কি কাজে পরের নৌকা ভাঙ্গিয়া আইলা — পরের দালান কেনে কৈলা সমসর
কি কাজে পরের শিশু ধরিয়া কাটিলা। — স্বরূপ করিয়া কহ আহ্মার গোচর।

খিজিরের উত্তর এই—নৌকা ফুটো করে না দিলে গরীরের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নৌকাটি রাজার লোকেরা নিয়ে যেত, ধার্মিক মা-বাপের কাফের ছেলে মা-বাপের দুর্ভোগের কারণ হত, দালান ভেঙে গেলে এতিমের জন্যে প্রোথিত ধন লুট হয়ে যেত। মুসার বৃত্তান্ত দীর্ঘ ও সমস্যাবহুল বটে, কিন্তু রোমাঞ্চকর কিংবা ব্যক্তিত্বের প্রভাব যুক্ত নয়।

এরপর পাই দাউদ-সমাইল কিস্‌সা। ইসহাক-ইয়াকুব-ইউসুফ-মুসা-দাউদ-সোলায়মান ইবাহিম-সারার বংশোভূত আর ইব্রাহিম-হাজরার বংশে কেবল ইসমাইল এবং মুহম্মদই নবী। ইসরাইলরা বারবার আল্লাহর হুকুম অমান্য করে বারবার নানা দুর্দশা-দুর্ভোগের শিকার হয়। জালুত নামে এক দুরাত্মা রাজা ইসরাইলদের 'স্ত্রীপুত্র দাস দাসী সব হরি নিল।' আর 'অশ্ব উট নিল জানি পূর্ব বৈরী।'

তারা আসমাইল নবীর কাছে তাদের রক্ষার জন্যে এক প্রবল প্রতাপ রাজা প্রার্থনা করল। আল্লাহ ইউসুফের ভাই ইবন আমীন [বেনজামিন] বংশীয় তালুতকে তাদের রাজা করে দিলেন। তালুত দুরাত্মা জালুতকে দাউদের সাহসে ও কৌশলে পরাজিত করলেন। জালুত রণে প্রবর্তনা

দেয়ার জন্যে দাউদকে নিজের কন্যা ও রাজ্যের অর্ধেক দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু 'অর্ধরাজ্য না দিয়া দুহিতা বিহা দিলা' এবং কৌশলে দাউদকে হত্যার চেষ্টা করেন। দাউদ স্ত্রীসূত্রে টের পেয়ে বহুদিন বনে আত্মগোপন করে রইলেন। তালুতের মৃত্যুর পর দাউদ হলেন রাজা। পয়গাম্বর হিসেবে তিনি চারদিনে চার নীতি চালু করেন—এবাদত, জবুর কেতাব পাঠ, ন্যায় বিচার ও রাজ্য রক্ষার্থ সদা সৈন্য মোতায়েন।

এই দাউদই তাঁর লস্কর-পত্নী রূপসী বতসাকে পাবার জন্যে বতসার স্বামী উরিয়ার সুকৌশলে মৃত্যু ঘটান—'বারে বারে উরিয়ারে রণে পাঠাইলেন।' কাহিনীটি মেহেরুন্নেসা-সেলিমের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য অনুতপ্ত দাউদ এজন্যে 'অনুক্রমে রুদিলেপ্ত এ দশ বছর'।

দাউদ-পুত্র সোলায়মানের কাহিনী রোমাঞ্চকর। দুনিয়ার তাবৎ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের ভাষা জানতেন তিনি। সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধিতে এবং ন্যায়বিচারেও তিনি অতুল্য। অলৌকিক অঙ্গুরীয় বলে ও চাবুকের শক্তিতে তাঁর প্রভাব ও তাঁর গতি সর্বত্র অবাধ ও দ্রুত। এবং দেও-পরী-জ্বীন সবাই ছিল তাঁর অনুগত। তাঁর ছিল উড়ন্ত তক্‌ত। সোলায়মান ছিলেন আদর্শ মানুষ ও নৃপতি। তিনি কিছুদিন নিজের তৈরি ঝুড়ি বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতেন এবং ফকিরের সঙ্গে ফকিররূপে, রাজার সঙ্গে রাজারূপে এবং ভিখারীর সঙ্গে ভিখারীরূপে বাস করতে ছিলেন অভ্যস্ত। এমন সোলায়মানের সাধ জাগল দুনিয়ার সব প্রাণীকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাবার। অথচ রিজিকের মালিক রাজ্জাক।—'জীব সকলের মুঞি আহারের কর্তা। মুঞি বিনে জীব কেহ নারে পালিবার'। কাজেই আল্লাহ নবীর এ বাসনাকে অহঙ্কারীর ঔদ্ধত্য বলে জানালেন। যদিও সোলায়মান বললেন—

মুঞি যে ভোজন ভুইঞ্জাইমু এ সবেরে
সকল তোহ্মার যথ দিয়াছ আহ্মারে।

তবু আল্লাহ্‌র বিরূপতায় সোলায়মানের অপরিমেয় বিপুল আয়োজন একমৎস্যের এক গ্রাসও হল না। লজ্জা পেলেন সোলায়মান। পক্ষান্তরে পিপীলিকারাজ মঞ্জুর আল্লাহর আনুকূল্যে সোলায়মানের অগণ্য অনুচর ও সৈন্যদলকে সামান্য খাদ্যেই তুষ্ট করতে পারল—

'অল্প বস্তু অনেক করিতে পারে।'

এরপর বর্ণিত হয়েছে 'সারা' রাজ্যের মালেকা রূপসী বিলকিস ও সোলায়মানের কিস্‌সা। পরিচয়ে, আলাপে এবং প্রেমে ও পরিণয়ে এর সমাপ্তি। সোলায়মান তাঁর 'সপ্তশত অনুচরী তিনশত নারী'র উপরে বিলকিসকে পাটেশ্বরী করে ছিলেন

এবং এ সকল নারী সঙ্গে করি নবপতি
প্রতি দেশ ভ্রমন্ত হৈয়া বাউর গতি।

তারপরে রয়েছে অক্ষুব্রত রাজকন্যার বৃত্তান্ত। তাঁর পিতৃহন্তা সোলায়মানকে বিয়ে করতে রাজী ছিল না সে। সোলায়মানকে জব্দ করবার জন্যে ইব্লিসের পরামর্শে রাজকন্যা নবী সোলায়মানকে বিয়ের শর্ত আরোপ করল—

আজ্ঞা দেঅ বাপের মূরতি আহ্মি গড়ি
অনুদিন চাহিয়া বাপের সেবা করি।

রূপবতী রাজকন্যা 'দেখে জ্ঞান নাই কামে অচেতন কলেবর' সোলায়মান সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

কামুক সোলায়মান অক্ষুব্রত রাজকন্যার আবদারক্রমে সোলায়মানের সৈন্যস্বরূপ পতঙ্গকুলকে রাজকন্যার আহার্য করলেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করেই সোলায়মান সন্তান কামনায় 'একে একে যথ নারী সকল রমিল' তবু এক নারীই মাত্র 'প্রসাবিল এক শিশু অর্ধ কলেবর' এবং তিনি আল্লাহকে স্মরণ না করে 'সমর্পিলা নিজ সুত পালিতে পবনে'।

আবার—

'একদিন ধীবরের নন্দিনী যাইতে
দেখিয়া কুৎসিত রূপ লাগিলা নিন্দিতে।

উক্ত—'সব অকর্ম যদি কৈলা সোলেমানে
ইচ্ছিলেন্ত দুঃখ দিতে প্রভু নিরঞ্জনে।'

ইস্তিরাখ দৈত্য কর্তৃক অঙ্গুরীয় হরণের ফলে বিকৃত অবয়ব ক্ষমতাচ্যুত সোলায়মান ঐ ধীবরের চাকরি করে ধীবরকন্যা বিয়ে করে নানা দুর্ভোগ ভুগে পরে আবার আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেন। সোলায়মান সম্ভোগপ্রিয় মানুষ—মহৎমানুষ নন।

এরূপরে হারুত-মারুতের প্রিয় ও পরিচিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জোহরা চরিত্রে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে।

তারপরে শুরু হয়েছে জাকারিয়া নবী ও ঈসা নবীর কিস্‌সা। জাকারিয়া সরল ও সাধারণ। ঈসার মহিমার ভিত্তি অলৌকিক শক্তি। এ অংশে মরিয়মই প্রধান চরিত্র—তাঁর মানসিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, লোকলজ্জা ও নিন্দাভীতি সবিস্তার বর্ণিত।

শেষ স্বর্গে 'ভালমন্দ উদ্ভব তত্ত্ব' শেষ নসিয়ত হিসেবে বর্ণন করে কবি সৈয়দ সুলতান নবীবংশ প্রথম পর্ব শেষ করেছেন।

এবে শুন যেরূপে জন্মিব মুহম্মদ
শুনিলে সে সব কথা খণ্ডিব আপদ।

কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর সমকালীন য়ুরোপীয়দের দেখে যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাও শয়তানের শিক্ষা বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

গ্রামী যথ ডাকিয়া কহিলা দুরাচার
লাগিলেন্ত একে একে শাস্ত্র শিখাইবার।
বুলিলা তোহ্মারা সব বহির্দেশ গেলে
মার্গ আপনার তোরা না পাখালহ জলে।

তোরা সবে যেই খাও অনুক্ষণ
সে জলে পাখাল মার্গ কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া প্রস্রাব করিবা নিশ্চএ।

বলেছি নবীবংশে সব নাম-জানা নবীরও কাহিনী নেই। মুখ্যত সৃষ্টিপত্তন, আদমের মর্ত্যজীবন, ইব্লিসের প্রথম পার্থিব দুষ্কর্ম হিসেবে কামপীড়িত কাবিল কাহিনী, ইব্রাহিম, নুহ ও মুসার কুফরীবিরোধী সংগ্রাম এবং সোলায়মানের অলৌকিক অঙ্গুরীর রোমাঞ্চকর অথচ তত্ত্বসম্বলিত বৃত্তান্তই এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সর্বত্র আল্লাহ ও ইব্লিস, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, লিপ্সা ও সংযম প্রভৃতির দ্বান্দ্বিক অবস্থান সঞ্জাত মানবিক তথা নৈতিক-সামাজিক সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে কবি ছিলেন সদাসচেতন ও সতর্ক। এ কাব্যের মূল সার্থকতা মুখ্যত এখানেই। আবার মধ্যযুগীয় কাব্যে যে-সব রস ও গুণ থাকে, তাও এ কাব্যে সর্বত্র সুলভ।

কবি মহৎ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মানুষকে সৎ-জীবনে প্রবর্তনা দানের জন্যে শ্রমসাধ্য জ্ঞানপুষ্ট এ সুবৃহৎ কলেবর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রীয় জ্ঞান ছাড়াও, তিনি সমকালীন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আপ্তবাক্য, নীতি-আদর্শ, রীতি-রেওয়াজ, তথ্য, তত্ত্ব প্রভৃতি সজ্ঞানে ও সযত্নে আহরণ ও প্রয়োগ করেছেন। এক কথায় আদর্শ লোকশিক্ষকের ভূমিকা তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন। তবে দেশান্তরে ও কালান্তরে জীবন-জীবিকা পদ্ধতির পরিবর্তিত পরিবেশে যেহেতু জ্ঞান- প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব উপযোগ হারায়, সেহেতু এ গ্রন্থেও স্বীকৃত অনেক তত্ত্ব-তথ্য ও নিয়ম-নীতি শুধু মূল্যহীন নয়, পরিহার্য বলেই মনে হবে। তাতেও অবশ্য এ কাব্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞালব্ধ চিরন্তন মূল্যের অভাব হবে না।

'রসুলচরিত কাব্য পরিচিতি'

সৈয়দ সুলতান রচিত নবীবংশ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হচ্ছে রসুল মুহম্মদ চরিত। এ খণ্ডে আছে তিনটে পর্ব—উন্মেষ পর্ব, মে'রাজ পর্ব ও ওফাত পর্ব।

সৈয়দ সুলতানবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে দৈশিক প্রভাব প্রকট। তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈত তত্ত্ব অঙ্গীকার করেছেন সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায়

আছিল অখণ্ড প্রভু 'খণ্ডন' সহিত
সর্বরূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠাম
যথেক আকার ছিল নৈরাকার লীন।

'ঘর্ম' থেকেই যে সৃষ্টির শুরু, তা'ও তিনি স্বীকার করেন। আহাদ থেকেই 'আহমদ' (হযরত মুহম্মদের)-এর উৎপত্তি 'আহাদ দুই এক কলেবর'।

তারপর —
আহাদে পাইল যদি আহমদ দরশন
হইয়া ভাবক রূপ কৈলা নিরীক্ষণ।
এবং—
আহমদ রূপে আপনা দেখা পাই
সাধক হইয়া রূপ রহিলা ধেয়াই।

ফলে—
অন্যে অন্যে দৃষ্টি রসে ঘর্ম হৈল তবে
সেই ঘর্মে মহামন্ত্র যথেক জন্মিল
সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড আদি সব উপজিল।
সেই ঘর্মে অষ্টাদশ হাজার আলম
সৃজন করিল প্রভু অতি অনুপম।

জীব-উদ্ভিদ প্রভৃতি সবকিছু সৃষ্ট হল এভাবে। সৃষ্ট হল সর্গে রব্বানুর, সিদ্রাতুল মনতাহা ও তুবা বৃক্ষ। হিন্দুর কল্পতরু ও অসিপত্র স্মর্তব্য।

দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানুষের চিন্তা-চেতনা কখনো নিরবলম্ব হতে পারে না। আরবের নবী-রসুল কাহিনী হলেও এ গ্রন্থে তাই দেশী বাস্তব জীবনের নানা বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ প্রতিফলিত হয়েছে কবির বর্ণনায়।

আবদুল্লাহর ও মুহম্মদের রূপ বর্ণনায় তাই সব দেশী অলঙ্কারই ব্যবহৃত। আবদুল্লাহ-আমিনার বিবাহও ছিল এক প্রকার গান্ধর্ব মিলন। সখীরা 'জোলুয়া দিলেন্ত সব করি হুলাহুলি।' কৃষ্ণের জন্ম মূহূর্তে কংসের কৃষ্ণহত্যার ষড়যন্ত্রের আদলে আবু জেহেলও গর্ভস্থ মুহম্মদকে হত্যার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শিশু বদলাদি সব বৃত্তান্তই ভাগবতের মতোই। দৈবজ্ঞগণের নাম ইউসুফ কাহন ও বুর্জুস মেহের।

খদিজা-মুহম্মদের বিবাহ প্রস্তাবে পারিবারিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সম্মতি, যৌতুক, ভোজ ও ভোজ্য সামগ্রী প্রভৃতির বর্ণনায় আমাদের ঘরোয়া ও বাস্তব জীবনের চিত্র মেলে।

সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ
হীরা জরি চান্দোয়া যে মাণিক্য পেখম।
খাসী বকরী দুম্বা আর উষ্ট্র যে প্রধান
মেজোয়ানী করিলেন্ত এবাজ সমান।
চিনি আদি শর্করা আঙ্গুর খোরমান
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ অমৃত সমান।

সেকালে বরের যৌতুক এবং দুষ্কর কর্মের পুরস্কার ছিল–সোনা, রূপা, রত্ন, পশু, দাস-দাসী, সুন্দরী যুবতী প্রভৃতি। উমরকে রসুল-হত্যায় প্ররোচিত করবার জন্যে যে-সব পুরস্কার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়, সেগুলো এই–

যে তারে মারিতে পারে দিমু বহু ধন
একশত উষ্ট্র দিমু বহুল রতন।
রূপবতী দাসী দিমু প্রথম যৌবন
সুবর্ণ রজত দিমু দশ 'হামী' আনি।
রুমী দশ দাসী দিমু হাবসী দশজন

মুহম্মদের নবুয়ত অবিশ্বাসীদের কাছে 'টোনা' 'বলে ছিল নিন্দিত ঃ

আম্মি জানি মুহম্মদে টোনা বহু জানে
টোনা করি ভোলাইল সে সবের মন।
শুন পুত্র মুহম্মদ টোনা কৈল তোরে।

মুহম্মদ হত্যায় ব্যর্থ উমরকে পিতা খত্তাব তিরস্কার করলে সদ্য মুসলিম উমর

ক্রুদ্ধ হই উমরে হানিল খর্গাঘাত
কাটিল বাপের মুণ্ড সবার সাক্ষাত।

পিতৃহত্যা করে উমর দেখালেন নীতি, আর্দশ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিতার সঙ্গেও আপোস চলে না।

মুনাফেক চরিত্র সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। মুনাফেকের লক্ষণ হচ্ছে ঃ

মুনাফেক সবের মনেত দুইভাব ঃ
মনুষ্যের সমুখে করএ এক রীত
গোপ্তে আন কর্ম করে আচার কুশ্চিত।
মুর্খে বোলে কবতার হৃদে কিছু নাই
কথা কএ সদাএ আল্লাব দিব্য খাই।

রসুলের স্ত্রীদের নাম—খোএলদ-কন্যা ও উমর কান্দিলেব বিধবা খদিজা, আবু বকর-কন্যা আয়েশা, যয়দ-কন্যা সদা (সউদা), উমর-কন্যা হাফসা, সায়াদ-কন্যা মায়মুনা, মরিয়ম, জয়নব, উম্মিয়া-কন্যা সলিমা, সুফিয়ান-কন্যা হাবীবা, হোয়াই-কন্যা সফেরা, মিসরের কিবতী গোত্রীর মরিয়াম (মারিয়া), বনু মুস্তাহ গোত্রীয় কন্যা জোবরিয়া।

পুত্র-কন্যাদের নাম—রোকেয়া (প্রথম স্বামী ওতবা), উমর সলিমা (প্রথম স্বামী সএবা এবং উভয়ের পরপর দ্বিতীয় স্বামী উসমান), ফাতেমা (স্বামী আলী) জয়নব (স্বামী আবু আস)। খদিজার গর্ভে চার কন্যা ও তিন পুত্র ঃ কাসিম, তৈয়ব, তাহেব, রোকেয়া, জয়নব, উমর সলিমা ও ফাতেমা।

আবু তালিব মুহম্মদকে রসুল এবং তাঁর বাণী সত্য বলে জেনেও জ্ঞাতিদের উপহাসের ভয়ে ইসলাম বরণ করেন নি। তাঁর নিজের উক্তি এরূপ ঃ

মুহম্মদ যে আচার করিবারে বোলে
কর বা না কর শুদ্ধ জানিঅ সকলে।
তবে কি করিতে নারি আহ্মি সে আচার
লোকে সব শুনি মোরে পারে হাসিবার।—
'বাপের আচার আবু তালিবে এড়িয়া
মৃত্যু হৈল ছাওয়ালের আচার করিয়া।'

মৃত্যুর পূর্বে আবু তালিব মুহম্মদকে জানালেন—

তবে কি জ্ঞাতি ভএ লজ্জা বাসি মন
তবু— নরকেতে না দহিতে খুড়ার শরীর
কৃতজ্ঞ মুহম্মদ চাটিলা খুড়ার অঙ্গ জিহ্বাএ নবীর।

আবু জেহেলের গৃহদেবতার দেহস্থ কীটের সাক্ষ্য, হাবল দেবতা বৃত্তান্ত, রসুলের পদরেণুর স্পর্শে অন্ধের দৃষ্টিলাভ, মৃগীর বাক্‌শক্তি, চন্দ্রদ্বিখণ্ডীকরণ, মলয়া নৃপতি, মে'রাজে আস্থাহীন আরবের রূপান্তর, হিযরতকালীন ঘটনা প্রভৃতি রসুলী মোজেজার প্রমাণ।

মে'রাজকালে রসুল প্রথম আকাশে আদমকে, দ্বিতীয় আকাশে সময়ঘোষক কুক্কুটকে, তৃতীয় আসমানে মুসাকে, চতুর্থ আসমানে আজরাইলকে, ষষ্ঠগগনে নরক রক্ষককে এবং সপ্তম গগনে বায়তুল মুকাদ্দেস, মিকাইল, সিদ্রাতুল মনতাহা বৃক্ষ, ভিহিস্ত, নবগ্রহ প্রভৃতি দেখলেন।

ভিহিস্ত বর্ণনে মানুষের কাম্যসুখ ও ঐশ্বর্য-চেতনার পার্থিবতা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়।

মে'রাজে আল্লাহর ও রসুলের মধ্যে নব্বই হাজার বিষয়ে আলাপ হয়েছিল—

নব্বই হাজার কথা শুনিয়া রসুল
হৃদএ তরঙ্গ হৈল সমুদ্রের তুল।
তিরিশ হাজার কথা শাস্ত্রে যথ আছে
তিরিশ হাজার ব্রহ্মজ্ঞান রাখিয়াছে।
তৃতীয় তিরিশ যথ বেকত গোপত
করিতে উচিত নহে সে সব বেকত।

রসুল মুহম্মদের বাণী ঃ

মুহম্মদ বোল এ সেবিতে করতার
এক ছাড়ি দুই হেন না জানিঅ আর।
পরদার না করিব মিছা না কহিব
দারিচুরি সুরাপান সত্বরে তেজিব।
পরহিংসা পরনিন্দা কভু না চর্চিব
বিনিদোষে মনুষ্যের প্রাণ বধ কৈলে
মজ্জিবেক সেই দোষে নরক কুণ্ডলে।
মনুষ্যেরে মধুর বচনে বোলাইব
নিষেধন্ত মূরতি সেবিতে সভানরে
দণ্ডবৎ না করিতে মূরতি গোচরে।
কার সনে অশিষ্ট বচন না কহিব।
ওজু করি সদাএ রহিব পবিত্তর।
লণ্ডভণ্ড না কহিব সভার গোচর।
মাতাপিতা গুরু সেবিব সর্বক্ষণ
না কহিব সে সবেরে কঠোর বচন।

বোরাকের আকৃতি–

সেই তুরঙ্গের নাম বোরাক আছিল।
বোরাকের মুখমুণ্ড নরের আকার
চিকুর লম্বিত অতি নারীর বেভার।
বোরাকের দুই কর্ণ উটের চরিত
নরের বচন কহে অতি সুললিত।
অশ্বের আকার পৃষ্ঠ চলন গম্ভীর
চলিলে বিজুলি যেন রহিতে সুধীর।
নীলা কষা জমরুদের বরণ তাহার
দেখিতে সুন্দর অতি বড় শোভাকার।

ইব্লিস অভিশপ্ত হয় কেবল অহঙ্কারের কারণেই। অহঙ্কার উদ্ধত করে, বিনয় ভোলায় ও শ্রেয়োবোধ ভ্রষ্ট করে ঃ

বড়াই করিল দেখি পাইল এই ফল
আপনাক প্রসংসিয়া হৈল রসাতল।

ইহুদী পণ্ডিত আবদুল্লাহ সালামও রসুলের নবুয়ত পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলো ছিল ঃ

১. প্রথমে কি খাইব লোকে ভিহিস্তে যাই ?
২. প্রলয় হতে হইব কেমন আকৃতি ?
৩. পুছিলা তৃতীয় কথা যথ নরগণ
মায়ের বাপের বর্ণ হএ কি কারণ ?

এবং রসুলের উত্তর শুনে আবদুল্লাহ সালাম হৈল হরষিত মন।

তবে আর সহস্র সংকেত কথা আনি
রসুলক জিজ্ঞাসিলা যথ মন জানি।

আরবি বেনামে দেশী অশুভ লক্ষণ—

অকুশল দেখি ভাল নহে কদাচন।
দিবসেত উল্কাপাত হএ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন।
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে আহ্মি দেখিছি বিশাল।

বীরের শপথ— যদি মুহম্মদ না মারিয়া ঘরে যাম
তবে লাত মনাত উজার মাথা খাম।

রসুল চরিত পর্বে বদর, ওহুদ, তায়েফ, তাবুক ও খয়বরের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। প্রসাধন দ্রব্যের নামও মেলে ঃ

আগর চন্দন গুরু কাফুর কেশর
লোবান সিপস্থ আবীর আতর।
সুর্মা কাজল দোহ নয়নেত দিলা।

গৃহস্থমানুষ কবি সৈয়দ সুলতানের শাহ-সামন্তের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল না। তাই তাঁর কাছে 'দুগ্ধ দধি অন্ন মধুই নরভোগ্য শ্রেষ্ঠ খাদ্য। আঙ্গুর খোর্মাই শ্রেষ্ঠ ফল।' আর বড়লোকের বাড়ীর বর্ণনাও নিম্নরূপ ঃ

চতুর্দিকে শিলা বেষ্টি মধ্যে চারি পুরী
এক এক পুরী মধ্যে ভিন্ন চারি ঘর
পাষাণের গৃহ সব পরম সুন্দর।

ফাতেমার বিয়েতে চট্টগ্রামে চালু নারীদের বিবাহমঙ্গল নাচগান 'সহেলা'রও আয়োজন ছিল। উৎসব-উপকরণ মারুয়া, কিমিজর তাঁবু, মজামির দীপ, চামর, চান্দোয়া, সিপস্থি (ফানুস), হাউই, লোবান, আগর, চন্দন, ধূপ, হলুদ, তেল, তেলোয়াই গন্তফিরানো, জোলুয়া প্রভৃতির উল্লেখ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুন্দুভি, কন্নাল, ভেউল, কবিলাস, পিনাক, মৃদঙ্গ, দুছড়ি, বাঁশি, ঢাক, ঢোল, দারি, কাঁসি, দোহরি মোহরি, ঝাঁঝরি, দব প্রভৃতি বাদ্যেব ব্যবস্থা।

যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীসঙ্গের যৌক্তিকতা এরূপ ঃ

পুরুষের শোভা নারী পুরুষের হিত
বিনি নারী পুরুষ রহিতে অনুচিত।
আল্লাএ সৃজিছে নারী অনেক যতনে।
অনুদিনে রহিত আপনা পতি সনে।
যে সব পুরুষ নারী না করিয়া থাকে
ইব্লিসেতু এড়াইতে নারে কোন পাকে।

প্রবাসী রসুলের দেশপ্রীতি ঃ

জন্মভূমি পুণ্যদেশ দেখিবারে শ্রদ্ধা বেশ
স্মরণে হৃদয় ফাটি যায়।

তাঁর জ্ঞাতি প্রীতি ঃ

হইলে কোন্দল অতি রণেত পড়িব জ্ঞাতি
শোকে প্রাণি দহিব আহ্মার।

রসুলের কন্যাস্নেহ ঃ (ফাতেমা)

১. মোহোর যে প্রাণের প্রাণ তুহ্মি বিনে
নাহি আর
তুহ্মি মোর আঁখির পুতলি
মোর চিত্ত-বৃক্ষ ফল তুহ্মি গন্ধ সুশীতল
হৃদয়লতার তুহ্মি কলি।

২. জীবের জীবন তুহ্মি আঁখির অঞ্জন
হৃদয়-বৃক্ষের ফল গায়েব চন্দন।
খাদিজার নন্দিনী মোর প্রিয়সুতা
আত্তমার সুগন্ধি সৌরভ সুচরিতা।

রসুলের শেষ উপদেশ ঃ মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

তোহ্মরা সমাজ হোন্তে যাইতে আছি আহ্মি
কেহ কার অপচয় না করিবা তুহ্মি।
বিধবা সবেরে তুহ্মি করিবা আদর
পড়শীরে না বুলিবা কঠোর উত্তর।
পিতাহীন শিশুরে গৌরব অতি করি
পালন করিঅ সবে মনে মায়া ধরি।
বাপের মায়ের বোল না কর লঙ্ঘন
দোজাহানের পরিচর্যা করিবা সঘন।
পরচর্চা পরনিন্দা মিথ্যা না কহিঅ
পরধন পরনারী কভু না হেরিঅ।
রতি ভুঞ্জি গোসল করিঅ সেইক্ষণ
মালের জাকাত দিতে না হইঅ বিমন।
পঞ্চওক্ত তুহ্মি সবে নামাজ গুজারি
আল্লার সেবাত মন দিবা যত্ন করি।
কলেমা কহিঅ নিত্য রোজা একমাস
দঢ়াইছে জিব্রিলে আসি মোর পাশ।[১]

বাঙলা কাসাসুল আম্বিয়া, রসুলচরিত ও রসুলবিজয়

১. বারোশ' সাতষট্টি বাঙলা সনে তথা ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বটতলা থেকে একটি কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক কাজী সফিউদ্দীনের প্রবর্তনায় হুগলীর শায়ের রেজাউল্লাহ হিন্দি

১. *বিস্তৃত আলোচনা আমার 'সৈয়দ সুলতান-তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' গ্রন্থে এবং নবীবংশ কাব্যে দ্রষ্টব্য।*

(উর্দু) থেকে এ গ্রন্থ তর্জমা করতে শুরু করেন। তাঁর উক্তিতে প্রকাশ—'কাসাসুল আম্বিয়া ফারসি থাকিয়া যেই হৈয়াছে হিন্দিতে।' তিনি হিন্দি থেকে 'এছলামি বাংলা ভাষে রচনা করলেন লোক হিতার্থে।' নুহ নবীর কাহিনী কিছুটা লেখার পর রেজাউল্লাহর মৃত্যু হয়। তখন সফিউদ্দীনের আগ্রহে কোলকাতার কড়েয়াবাসী আমীরউদ্দীন এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ষষ্ঠ বালাম [আবুতালেবের সঙ্গে হযরত মুহম্মদের সামদেশে বাণিজ্য যাত্রা] অবধি আমীরউদ্দীনের ভণিতা মেলে। অবশিষ্টাংশ রচনা করেছেন কড়েয়াবাসী অপর কবি আশরাফ। এ বিপুল গ্রন্থের অর্ধেক আমীরউদ্দীনের রচনা। 'কিতাব দেখিয়া' তাঁরা লিখেছেন বটে, কিন্তু কোথাও হিন্দি মতুর্জমের তর্জমার কিংবা মূল ফারসি গ্রন্থের বা লেখকের নামোল্লেখ করেননি। কাব্যটি দশ বালামে রচিত।

সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ থেকে এ গ্রন্থ কলেবরে অনেক বড়। সৈয়দ সুলতানের কাব্যে সব নবীর কাহিনী নেই। কাসাসুল আম্বিয়ায় এমন অনেক নবীর বিস্তৃত বিবরণ মেলে, যাঁরা নবীবংশে আলোচিত হননি। যথা হুদ, (এবং সাদ্দাদ) সালেহ, সিকান্দর (এয়াজুজ মাজুজ), ইসমাইলের কোরবানী, ইয়াকুব, ইউসুফ, ফালতু, সাকুস, শোয়েব (আসহাবে কাহাফ), হারাকিল, নেসা, জেল, কোফেল, খানজেলা, আজির, জরজিস প্রভৃতি এবং চার খলিফার বর্ণনায় [আলির ওফাত অবধি] কাব্য সমাপ্ত। আর নবীবংশে ওফাত-ই-রসুল-এর বিবরণেই শেষ।

কাসাসুল আম্বিয়ায় ও নবীবংশে বর্ণিত কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন দুটো গ্রন্থই সৃষ্টিপত্তন দিয়ে শুরু। মুহম্মদই যে আদি সৃষ্টি, তা দুটো কাব্যেই স্বীকৃত। কিন্তু সৈয়দ সুলতানের মতে পৃথিবীর আদি বাসিন্দা হচ্ছে নররূপী ফিরিস্তা, সুরা-সুর (বৈদিক নবী ও মানুষেরা) আর কাসাসুল আম্বিয়া মতে আগুনে তৈরি জ্বীনেরা। কাহিনীর অনৈক্যের একটি নমুনা দিচ্ছি ঃ

নবীবংশে দেখি একদিন হযরত আয়েশার ঘরে তৈলাভাবে বাতি জ্বলেনি, সন্ধ্যার স্বল্পালোকে তিনি তাঁর গায়ের কাপড় সেলাই করছিলেন, অন্ধকার ঘন হলে তিনি সুঁই হারিয়ে ফেলেন। তখন রসুল আয়েশার ঘরে উপস্থিত হন। মৃদু হাসবার সময়ে তাঁর দাঁতের প্রভা বিচ্ছুরিত হয়, তাতে গোটা ঘর প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সুঁইও কাপড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল। এতে বিস্মিতা আয়েশাকে রসুল সগর্ব বললেন, 'এ দাঁতের জ্যোতিতে ভুবন আলো করতে পারি।' এই অহঙ্কৃত বচনের শাস্তি পেলেন তিনি ওহুদের যুদ্ধে দাঁত হারিয়ে। আবার, এক ইট আগুনে পুড়িয়ে তপ্ত করে একদিন তাঁর পায়ের তলার ক্ষতের চিকিৎসা করেছিলেন, দহনজ্বালা প্রাপ্ত ইট আল্লাহর কাছে রসুলের বিরুদ্ধে গোহারী করেছিল। ওহুদের যুদ্ধে সেই ইটই রসুল-দন্ত উৎপাটন করে প্রতিশোধ নিল। এ কাহিনী কাসাসুল আম্বিয়ায় নেই। তার বদলে পাই শত্রুর নিক্ষিপ্ত পাথরে রসুলের দাঁত ভেঙে গেল। তারপর ঃ

টপকিতে ছিল খুন দান্দান হইতে
এয়াকুত সেরজান পয়দা হইল তাহাতে।

নবীবংশ কাহিনীর উৎস কোরআন বলেই দাবি করেছেন সৈয়দ সুলতান। কাসাসুল আম্বিয়ায় রওয়াইত ছাড়াও স্থানে স্থানে আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

২. জনাব আলী

জনাব আলী শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার রচিত তাজকিরাতুল ওলির এবং শেখ নুরুদ্দীন হানাফিয়া রচিত ফারসি তাজকিরার মোল্লা হোসেন আলি কৃত উর্দু তর্জমা অবলম্বনে কিসসাসুল আম্বিয়া রচনা করেন। উনিশ শতকে দোভাষী শায়েব মুহম্মদ খাতেরও দোভাষীরীতিতে তাজকিরাতুল আউলিয়া রচনা করেন। জনাব আলীর গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদেক, রাবিয়া বসোরী, ফজিল আয়াজ, ইব্রাহিম আদহাম, বায়েজিদ বিস্তামী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ হাম্বল, বলশর হাফী, জুনায়েদ বাগদাদী প্রমুখ তেতাল্লিশ জন ওলি দরবেশ ও ইমাম প্রভৃতি শাস্ত্রবিদের জীবনকথা ও কৃতি-কীর্তি বর্ণিত রয়েছে।

এ সূত্রে বটতলায় প্রকাশিত দোভাষী পীরপাঁচালীগুলোও চরিতকথা রূপে স্মর্তব্য, যদিও ইসমাইল গাজী, জাফর খান গাজী, পীর সফিউদ্দীন, খান জাহাঁ আলি খান, গোরাচাঁদ প্রমুখ অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, সেনানীশাসক ও ইসলাম প্রচারক, তবু লোকমুখে এবং পীরপাঁচালীতে এঁরা রূপকথার নায়ক ও উপদেবতা রূপে কীর্তিত ও চিত্রিত। তাই এ অধ্যায়ে এঁদের সম্বন্ধে রচিত কাব্য আলোচনা করা হল না। অবশ্য আমরা জানি ভক্তের বা নিন্দুকের রচিত জীবনচরিত সাধারণভাবে অতিকথনদুষ্ট। সত্য অতিরঞ্জিত হলে মিথ্যা হয়, আর অতিরঞ্জিত মিথ্যাই রূপকথা।

৩. মুহম্মদ খাতের

মে'রাজ-নামা ও কাসাসুল আম্বিয়া লিখেছিলেন আর এক দোভাষী শায়ের মুহম্মদ খাতের। ইনি উনিশ শতকের মধ্যভাগের লোক। তাঁর কাসাসুল আম্বিয়ার মূল জানা যায়। ইসহাক আল নিসাপুরী রচিত কাসাসুল আম্বিয়ার উর্দু তর্জমা করেন গোলাম নবী ইবনে ইনায়েতুল্লাহ। সেই উর্দু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন মুহম্মদ খাতের। প্রকাশক তাজুদ্দীন মুহম্মদও প্রকাশকালে ভণিতায় নিজ নাম যুক্ত করে কবিকৃতির দাবীদার হন। মনে হয় রেজাউল্লাহ এবং আমীরউদ্দীনের গ্রন্থও গোলাম নবী কৃত উর্দু গ্রন্থের তর্জমা। অন্তত স্থানে স্থানে বক্তব্য অভিন্ন, কেবল ভাষা ভেদ ঃ

আসহাবে কাহাফ ঃ খাতের ঃ

তাহারা কহিল ভাই আমা সবাকার
খানাপিনার কিছু গরজ নাহি আর।
গরজ নাহিক আর দুনিয়া মোকাম
আমাদের ভরসা খালি এলাহির নাম।
এই বলিয়া শুইল ফের খন্দকের নীচে
আজ তক আছে শুয়ে কিতাবে লেখিছে।
কেয়ামত তক তারা সেই হালে রবে।

আসহাবে কাহাফ ঃ আমীরুদ্দীন ঃ

বলিতে লাগিল তবে তাহার লাগিয়া।
খানাপিনা আমরা যে নাহি খাব আর
দেলেতে না রাখি কিছু হছরত দুনিয়ার।
আমাদের কাম আছে এলাহির সাথে
থাকিব জেন্দেগি ভর তারি এবাদতে।
বলিয়া এছাহি বাত শুইলেন সবে
তাহার খবর লেখা আছেত কেতাবে।
আজ তক শুইয়ে আছেন সেইখানে
উঠিবেন একেবারে হাসর ময়দানে।

রেজাউল্লাহর রচনায় পাই ঃ

প্রথম আসমান হৈল পানির টুকরাতে
দ্বিতীয় আসমান তাম্বা টুকরা হইতে।

এভাবে তৃতীয় আসমান হৈল টুকরাতে লোহার, চতুর্থ আসমান হয় রূপার টুকরার, পঞ্চম আসমান সোনার টুকরায়, ষষ্ঠ আসমান মরত্তারিদ টুকরা। আর সপ্তম আসমান এয়াকুতে তৈরি।

তুলনীয় ঃ সৈয়দ সুলতানের মতে মুক্তায় হীরায় মাণিক্যে সুবর্ণে এয়াকুতে রজতে ও জমরুদে যথাক্রমে সপ্ত আকাশ গঠিত।

খাতেরের কাসাসুল আম্বিয়ায়ও নূর ও বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনা আছে। এ বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলত সৈয়দ সুলতানের, শেখ চান্দের, রেজাউল্লাহর ও খাতেরের বক্তব্য অভিন্ন। বলা বাহুল্য এ সৃষ্টিতত্ত্ব কোরআনানুগ নয়—সূফীতত্ত্বানুগ। সম্ভবত সূফীতত্ত্বের উদ্ভবের ও প্রসারের ফলেই এই তত্ত্ব ইসলামে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভ করেছে।

খাতের মে'রাজ-নামাও রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য। আমরা সংগ্রহ করিতে পারিনি। সেজন্যে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

৪. শেখ চান্দ

শেখ চান্দের পরিচিতি 'সূফীসাহিত্য' পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে[১] শেখ এ.টি. এম. রুহুল আমিন কবি শেখ চান্দ ছোটফেণী-নদীর তীরবর্তী শেখচাঁদপুরের (কবির স্মারক নাম) অধিবাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে নাকি কবির ধনী-মানী বংশধররা আজো বিদ্যমান।

শেখ চান্দের (সতেরো শতক) রসুল-নামা বা রসুলবিজয় নবীবংশের আদলে রচিত। অবশ্য এটি কেবল হযরত মুহম্মদেরই চরিতগ্রন্থ। এতে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের মতোই সৃষ্টিপত্তন বর্ণিত হয়েছে। আদি সৃষ্টি মুহম্মদ হচ্ছেন নুর-ই-ইলাহি। পুষ্পরূপে তিনি স্বর্গে বিরাজমান ছিলেন। জিব্রাইল সে-ফুল নিয়ে আবদুল্লাহর হাতে দিলে তিনি ঘ্রাণ নিলেন, এরূপে মুহম্মদ আবদুল্লাহকে আশ্রয় করলেন। আবদুল্লাহর অঙ্গ হল সুরভিত, ললাটে তাঁর চাঁদের বিভা, নফলঙ্গ রাজকন্যা তাঁকে দেখে হলেন আসক্তা। তাঁদের গোপন-বিয়ে পড়িয়ে দিলেন ফিরিস্তারা। মুহম্মদের জন্মের পূর্বের ও পরের ঘটনা কৃষ্ণ-বৃত্তান্তের অনুরূপ। এখানে কংসের ভূমিকায় পাই আবুজেহেলকে। কন্যার স্থলে পাই ধাত্রী শিশুকে। হালিমায়-যশোদায়ও তফাৎ সামান্য। শেখ চান্দের গ্রন্থে কেয়ামত অবধি বর্ণিত। এ গ্রন্থে সিরাত ও মাগাজী অর্থাৎ রসুলের জীবনী ও রসুলের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত। গ্রন্থটি আকারেও বিপুল। সৈয়দ সুলতানের গোটা নবীবংশের চেয়েও বিপুলতর।

সৈয়দ সুলতান যেমন বাঙলার মানস-ও বহিঃ-পরিবেশে নবীদেরকে বিশেষ করে হযরত মুহম্মদকে হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপাদন করে ইসলামের উপযোগ প্রমাণের জন্যে নায়ক রূপে দাঁড় করিয়েছেন, শেখচান্দও তা-ই করেছেন। শেখ চান্দের কাছেও 'কাফের' বাঙালী হিন্দুর প্রতিশব্দ মাত্র। উভয় কবির কাছে হিন্দু যেন কাফেরেরই পরিভাষা। তবু শেখ চান্দে বাঙালীয়ানা একটু বেশি। তাঁর তুলিকায় মুহম্মদ বাঙালী আলিম বা পীর ফকির ঃ

নবী মুহম্মদ

শিরেতে দস্তার বান্ধে জুব্বা ছিল পাএ
ডাইন হাতে তসবি জপে আষা হাতে বাঁএ।
ইজার পিন্ধিল নবী পিরহান পরি....
পাএত পরিল নবী খড়ম এক জোড়া
দেখিতে তাহান বেশ যেন মত বুড়া।
তসবি জপিয়া নবী যাএ ধীরে ধীরে
রসুলেরে দেখি হাসে যথেক কাফেরে।

রসুলের ইসলাম প্রচারও চলছে যেন বাংলাদেশেই ঃ

ধুতি উতারিয়া তারে ইজার পরাইল
গিলাফ কাড়িয়া তারে পরাইল নিমা
টিকি মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল।

তারপর—

মুসলমান কৈল তারে পড়াই কলিমা।
পুরাণ করিয়া রদ কোরান লইল।
এবং এহি মতে তিন দ্বিজ মুসলমান হৈল
মূর্তিপূজা রদ করি নামাজ পড়ি নিতি
হরির নাম রদ করি কলিমা করে স্থিতি।
টিকি মুড়াইযা শিরে টুপি দিল ছদ।
কৃষ্ণনাম রদ করি বোলে মোহাম্মদ

তিন দ্বিজ মুসলমান হয়ে তাদের জ্ঞাতিদেরও সত্যধর্মে আহবান জানায়। বাজি রেখে তারা—

কোরান পুরাণ কৈল আতসে স্থাপন
কোরান বড় বুলি মানিয়া লৈল।
পুরাণ পুড়িয়া গেল কোরান বাহুড়িল।

---

১. *সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৯০ সাল, বাঙলা বিভাগ 'বাঙলার দুজন সুফীসাধক কবি।' [শেখ চান্দ ও সৈয়দ নূরউদ্দীন]*

অতএব সৈয়দ সুলতানের রসুলচরিত অংশের সঙ্গে শেখ চান্দের রসুলবিজয়ের মিলই বেশি। কবিত্ব সম্পদেও শেখ চান্দ সৈয়দ সুলতানের সমকক্ষ। মুহম্মদ ছমি নামে এক দোভাষী শায়েরও রসুলচরিত রচনা করেছিলেন বলে শুনেছি। (পুঁথি পরিচিতি, পৃঃ ৬৬৬)। সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদে কিংবা উনিশ শতকে উত্তরবঙ্গের কবি গোলাম রসুল ও বুরহানউল্লাহ রসুলরচিত রচনা করেন।

৫. শেখ মনোহর

নোয়াখালি জেলার ফেণী অঞ্চলে সতেরো শতকের শেষভাগে শমশের গাজী নামের এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর দৌরাত্ম্যে ও প্রতিপত্তিতে ত্রিপুরা রাজসরকার ও চট্টগ্রামের নবাবপ্রতিনিধি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। এই শক্তিমান পুরুষের কীর্তি-কাহিনী অবলম্বন করে কবি শেখ মনোহর আঠারো শতকের শেষপাদে 'শমশের গাজীনামা' রচনা করেন। শেখ মনোহরের পীর-ছিলেন ঃ

'ধীর স্থির মীর পীর সৈয়দ হাসান পীর
সৈয়দ মেন্দী পদ শিরে ধরি।
গাজরি পঞ্চালী গাথা পদ্ক্ষরে তথ্য কথা
মনুহরে ভণন্ত লাচাড়ি।'

শেখ মনোহর তাঁর কাব্য-কাহিনী সংগ্রহ করেন তাঁর পিতামহের কাছ থেকে ঃ

শেখ মনুহর কহে পঞ্চালি রচিয়া।
পিতামহ মুখে কাব্য সকল শুনিয়া॥

এ কাব্যটি একসময়ে ছাপা হয়েছিল। এখন তা দুষ্প্রাপ্য। শমশের গাজীর বংশধরগণ এখনো ফেণীর রওশনাবাদ পরগনার বল্লভপুর গ্রামে বসবাস করছেন।

পীর শমশের গাজীকে একটি ঘোড়া ও একখানি তরবারি দিয়ে অনুগ্রহ করেন। আরাকানরাজ সৈয়দ সুলতানকে একটি ঘোড়া ও একখানি তরবারি দিয়েছিলেন শমশের গাজীকে প্রদত্ত তরবারিটি সেইটি আর (ঘোড়াটিও আরাকানরাজ প্রদত্ত ঘোড়ারই বংশধর)। পীরের এক অনুচর শমশের গাজীর কাছে গিয়ে বললো ঃ

গদাহোসেন খোন্দকার পাঠাইছে মোরে
তাহান গোচরে আজু নিবারে তোমারে।....
নম্রশির হই পীর ভজিলেক গাজী
প্রশংসিল পীর মীর আল্লাহ হৈল রাজি।
তবে তালিব কৈল ভেদাই মঞ্জিল
মারফত ভেদ কহে সকল শিখিল।
দিলেক হাজার তঙ্কা পীর মীর পায়।
পীরও-হাজার তঙ্কা মূল্যের ঘোড়া অস্ত্রবর
গাজীকে খেলাত দিলা কৃপার সাগর।
পীর বোলে শুন কহি পিরুবান সুত
এহি ঘোড়া খড়গ জান কিম্মত বহুত।
রোসাঙ্গে মগধ রাজা ধার্মিক আছিল
সৈদ সুলতান প্রতি এহি দ্রব্য দিল।
সুলতানে বকসাইল আপনা বেটারে
পর্যাক্রমে আসিয়া ঠেকিল মোর করে।
তাহান বংশের আমি ক্ষুদ্র এক বিন্দু
তপন ভুবন মাঝে সাগরেত ইন্দু।
নাসির যাইব মারা পাইবা জমিদারী
রাজবংশ ভঙ্গে দেশ হইবা অধিকারী।
এহি খড়গ অশ্ব তোমা দিনু মত কারণ
যুদ্ধে বিজয় হৈব জানিও আপন।
গাজীএ বুলিলা পীর কথেক বৎসর
পীর বোলে পঞ্চ বিংশ জানিও সত্বর।
এ বুলিয়া পীর মীর চলি গেলা দেশ।

তপন ভুবন মাঝে সাগরেত ইন্দু। ইন্দু-১ সাগর-৭ তপন-১২, ভুবন-১৪ থেকে ১৭০০+১২+১৪=১৭২৬ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। তপন-১, এবং ভুবন-৩ ধরলে ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দ

হবে। এই ১৭২৬/৩১ খ্রীস্টাব্দে নাসিরের মৃত্যু হলে শমশের জমিদারী পাবেন বলে পীর মীর গদাহোসেন ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কাজেই শমশের উক্ত সনেই জমিদার হয়েছিলেন। অতএব ১৭২৬/৩১ খ্রীস্টাব্দের পঁচিশ বছর আগেই শমশের গাজীর সঙ্গে গদাহোসেনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কবি শেখ মনোহরের পিতামহ তাহির উকিল ছিলেন শমশের গাজীর অনুচর এবং ঢাকার নওয়াব দরবারে গাজীর উকিল বা প্রতিনিধি। লোকশ্রুতি মতে শমশের গাজীর অভ্যুত্থানের সময়ে তাহির ঢাকার মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনিই শমশেরকে সনাক্ত করে নওয়াব সরকার থেকে সনদ পাইয়ে দেন। কবি শেখ মনোহর শমশের গাজীকে দেখেননি। তবে দীর্ঘজীবী পিতামহ তাহির উকিলের মুখে শোনা কাহিনীই তিনি গাজীনামায় বর্ণনা করেছেন। শেখ মনোহর ইংরেজ আমলের লোক। তাই খ্রীস্টাব্দ দিয়েছেন। শমশের গাজী ত্রিপুরারাজের পরগনা রওশনাবাদ প্রভৃতি এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাবিস্তারেও প্রয়াসী হন। কিন্তু পরে নওয়াব বাহিনীর কাছে পরাজিত ও ধৃত হয়ে ঢাকায় নীত হন এবং বন্দীর জীবনযাপন করেন।

৬. মুহম্মদ উজির আলি

কবি মুহম্মদ উজির আলি রচিত ১-৫৪১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত বিপুলকায় পাণ্ডুলিপির নাম 'নসলে উসমান ইসলামাবাদ বা শাহনামা'। মুসলিমদের তৃতীয় খলিফা ও হযরত মুহম্মদের জামাতা উম্মাইয়া বংশীয় হযরত উসমানের বংশপরম্পরার পরিচায়ক এ গ্রন্থ। কবি নিজেও উসমানী, তাই কল্পনাসাধ্য এ গ্রন্থ রচনায় কবি অনুপ্রাণিত। ইসলামাবাদে তথা চট্টগ্রামে উসমানীদের আগমন, বসবাস ও সমৃদ্ধির ইতিকথা বর্ণনই কবির মূল উদ্দেশ্য।

যদিও কবি বলছেন যে ১. 'তওয়ারিখ ওসমানী যেই আরবী জবান [১৭১৩-১৯ খ্রীঃ]
গদ্য হন্তে পদ্য কৈল নসলি ওসামান'।
২. ওসমান নসল হৈতে পুস্তক রচিল।

তবু কবির ইতিহাসনিষ্ঠায় আস্থা রাখা প্রায় অসম্ভব।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাহজাদা নাজির আলির অনুমতি নিয়েই কবি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন 'ভ্রাতা অনুমতি শিরে রচিল পয়ার।'

গ্রন্থরচনার আরম্ভকাল ও সমাপ্তিকালও দেয়া আছে ঃ

১. রাম চন্দ্র যুগ বাণ চলিত হিজরী সন
মাহিনা কুমারী পঞ্চদশ
স্মরণ করিয়া গুরু পুস্তক হইল শুরু
গাহে কবি পয়ার সুরস।

রাম-১, চন্দ্র-১, যুগ-২, বাণ-৫=১১২৫ হিঃ বা ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে, ১৫ই কার্তিক তারিখে রচনার শুরু। আর শেষ হয় ঃ

২. সহস্রেক শত রামচন্দ্র হিজরীতে
গ্রন্থ হৈল শেষ মকর 'দধিতে।

সহস্র ১০০০, শত-১০০, রাম-৩, চন্দ্র-১ ১১৩১ হিঃ বা ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে ৭ই মাঘ তারিখে।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের জ্যেষ্ঠপুত্র বদরউদ্দীন আউলীয়া। তাঁরই বংশধর হচ্ছেন লেখক উজির আলি।

খেলাফত পাএ যবে হজরত ওসমান.... ভেজিল কুমার গনি বাগদাদ শহর
তাহান কুমার জ্যেষ্ঠ হজরত বদর হইল বদরউদ্দীনবদরি ঈশ্বর।.....
বড় নেকবক্ত মর্দ মহাধনুর্ধর কিঞ্চিৎ কহিব শুন সে সব বারতা।

এরপর এমন সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে সেসব বিষয়-অরণ্যে পাঠক দিশেহারা হয়ে পথ হারায়।

সত্যের, মিথ্যার ও কল্পনার সংমিশ্রণে সাধু ও দোভাষী শৈলীতে এ বিপুলকায় গ্রন্থ রচিত। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত চারিয়া' গাঁয়ে; কবি নিজবংশকে রাজবংশ বানিয়ে স্বয়ং শাহাজাদা হয়ে পিতা বসির মুহম্মদকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাজির আলিকে শাহ বা রাজা বলে বর্ণনা করেছেন আর চারিয়া গাঁকে বানিয়েছেন রাজধানী চারিয়া নগর। সম্ভবত কবি পীরবংশীয় ছিলেন এবং পীরালি গদীকেই রাজসিংহাসন বলে দাবি করেছেন।

বর্ণিত বিষয় সূচীতে মিলবে কবির বিকৃত চিন্তার ও চেতনার সাক্ষ্য ঃ

১. ইসলামাবাদের বয়ান ২. শাহজাদা নৃপ নাজিরের সুকৃতি বর্ণনা ৩. তওয়ারিখ কেতাবের খোলাসা বিবরণ ৪. তওয়ারিখ ওসমানী নসলের নাম ৫. মুহম্মদী খেলাফতনামা কেতাবের বিবরণ ৬. বাগদাদ শহরের তারিখ ও ভূপতির সুকৃতি ৭. এক বাঁদীর নসিয়তে শাহবদরউদ্দীনের তপ আরম্ভ ৮. বদর আউলিয়ার তপঃ সিদ্ধির কথা ৯. ইসলামখান পীর পরীস্তান আবাদ করে যোগী হওয়ার কথা ১০. হাসন বসরীর বাদশাহ হবার বিবরণ ১১. হযরত আবু বাদশাহ হয়ে ইসলামাবাদ ভ্রমণ করার বয়ান ১২. গোপীচন্দ্রের রায়বারের শাহর কাছে কর দাবি করার বয়ান ১৩. গোপীচাঁদের ইসলামাবাদ আক্রমণ ১৪. দুই রাজার যুদ্ধ ১৫. শাহর পরাজয় গোপীচাঁদের বিজয় ১৬. গোপীচাঁদ তাঁর এক সন্তানকে ইসলামাবাদে পাটে বসাবার বয়ান ১৭. সুলতান আস্‌কারীর ইসলামাবাদে রায়বার পাঠাবার বয়ান ১৮. শাহপুত্রকে রাজ্য দিয়ে ইসলামাবাদে যুদ্ধ করতে যান এবং ঢাকাতে পৌঁছার বয়ান ১৯. হরিচন্দ্রের নিকট সুলতানের পত্র লিখবার বয়ান ২০. দুই নৃপের যুদ্ধ ২১. ইসলামাবাদে নসরত জঙ্গের নায়েবী করবার বয়ান ২২. নসরত জঙ্গকে দিল্লীশ্বর বধ করবার বয়ান ২৩. ফিরিঙ্গিরা ছলনা করে শাহ থেকে জমি ভিক্ষা করার বয়ান ২৪. ফেরব করে ফিরিঙ্গিরা দিল্লীশ্বরকে কয়েদ করবার বয়ান ২৫. মানরাজার যুদ্ধ ইত্যাদি।

এ যদি উসমান বংশীয়দের পীর-প্রচারক হিসেবে চট্টগ্রামে আগমন, বসবাস ও যুদ্ধ প্রভৃতির ইতিহাস হয়, মুরিদের বসতি অঞ্চলই রাজ্য হয় এবং কাফের ও ভিন্ন মতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিতর্করূপ যুদ্ধ এবং পরে পর্তুগীজ মিশনারীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকের বিতর্করূপ যুদ্ধ ও পর্তুগীজদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কাহিনীও হয়, তা হলেও একে ইতিহাসের মর্যাদা দেয়া যাবে না। এটি কথায় ও কলেবরে এমন ভীতিপ্রদ যে, 'থাকুক লেখিবে কেহ পড়িতে লাগে ডর।' তবু আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের একজন লেখকের সম্মান রাখার জন্যে আমরা এখানে চট্টগ্রামের কবিবর্ণিত শাসকপরম্পরার বিবরণ উদ্ধৃত করছি ঃ

হামিদুল্লা নাম এক বড়া জাঁহাবাজ
বগদাদের মহীপাল জনক মিরাজ।
মহাম্মদ লতিফ যে দরবেশ খোদার
ইসলাম আবাদ স্বামী কৈল করতার।
তাহান কুমার তিন মহা ধনুর্ধর
মহাম্মদ সাদক এক, দ্বিতীয় লস্কর।
তৃতীয় কুমার নাম লেখে দুইমত
'আশরাফ' লেখে আর 'সিরাজ দৌলত'।
নামেতে হাইদরাবাদ হয় যেই দেশ
সিরাজ দৌলত তথা ছিলেন নরেশ।
মহাম্মদ লতিফ শাহা তপ আরম্ভিতে
হাঙ্কারি আনিল সুতা সিরাজ দৌলতে।
ইসলাম আবাদ তক্ত কুমারে সঁপিল
সিরাজ দৌলত তথা মহীপাল হৈল।
ঢাকা ও মক্‌সুদাবাদ ইসলাম আবাদ
কুমিল্লাশহর আদি হাইদরাবাদ।
এইসব অধিকার সিরাজ দৌলত
এলাহি বকশিল তানে মহিমার হদ।

কবির বংশ-পরিচিতি এরূপ ঃ

সাহসিক সোনাগাজী চাএরি (চারিয়া) ঈশ্বর
শাহার কুমার চারি জিনি পুরন্দর।
নছল বর্জিত তিন কৈল বেনেয়াজ।
মহাম্মদ জাফর সাহা হৈল জাঁহাগীর

মহাম্মদ জাফর আর মহাম্মদ বছির
মহাম্মদ ওয়াছ আর মহাম্মদ আমীর।
এই চারি সাহাজাদা বড় নামদার
মহিম করিল ফতে কানন বেহার।
বিপিন আবাদ করি বসাএ শহর
অধিকার হৈল চারি রাজ্যের উপর।
বছির আমীর আর মহাম্মদ ওয়াছ
ছাএরিনগর আর আবাদ আমীর।
মুজাফফর সাহ সুত মহাম্মদ বছির
এলাহি করিল তানে মহা জাহাঁগীর।
বছির সাহার হএ যুগল কুমার।
মহাম্মদ নাজির এক মহাজাহাঁদর।
আর এক সাহাজাদ মহাম্মদ উজির
ভ্রাতা যার মহীপাল করিল কাদির।

ভণিতার নমুনা ঃ

১. শ্রীযুত সাহাজাদা ভূপতি নাজির
রূপগুণ বুদ্ধিমন্ত ভাগ্যবন্ত ধীর।
তাহান অনুজ হীন সাহার কুমার
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ অনুমতি চালে রত্নহার।
অধীন উজির কহে পয়ার মধুর
আশীর্বাদ কর শুনি যতেক ঠাকুর।

২. শ্রীযুত নাজির আলী সাহার কুমার
সুগন্ধি লহরীসমা অমৃতলহর।
যাহার জনক সাহা মহাম্মদ বছির
অনুজ কুমার সাহা সায়ের উজীর।

৭. আব্দুল করিম খোন্দকার

তমিম আনসারী (অপ্রাপ্ত), হাজার মসায়েল ও দুল্লামজলিস [দূররে মজলিস] রচয়িতা আবদুল করিম খোন্দকার তাঁর দুল্লামজলিসে সুদীর্ঘ আত্মকথা রেখে গেছেন। রোসাঙ্গ শহরে আছে বন্দর নামে গ্রাম বা অঞ্চল বা নদীঘাট। সে-গ্রামে বাস করে কাজী মুফতি, তালিবুল এলম, ফকির-দরবেশ আর বড় বড় মুসলমান। এরা 'নৃপ সঙ্গে কহে কথা করি পরিহাস।' সে-গাঁয়ের শ্রেষ্ঠপুরুষ আতিবর গাঁয়ে মসজিদ নির্মাণ করিয়ে

বহুজন আলিম আনিয়া একত্তর
কাহাকে খতিব করে কাহাকে ইমাম
কাহাকে মুসল্লি করি করএ প্রণাম।

শেখ উমরপুত্র আতিবর ছিলেন 'শ্যামলসুন্দর তনু'র সুপুরুষ। তিনি ছিলেন সম্ভবত বিদেশী বণিকদের থেকে বাণিজ্যকর বা শুল্ক আদায়ের কর্তা। এটি বড় চাকরি। আতিবর রোজ ঘোড়ায় চড়ে রাজদরবারে যেতেন. তিনি টাকশালেরও কর্তা ছিলেন ঃ

শ্যামল সুন্দর তনু অশ্বে আরোহণ
প্রতিদিন চলি যায় নৃপের সদন।

তিনি ছিলেন 'নৃপ মন্ত্রী আদি যথ সবের দুর্লভ (ভাজন)'।

আতিবরের রোসাঙ্গরাজ প্রদত্ত উপাধি ছিল 'সাদিউক নানা'। 'নানা' শব্দের অর্থ 'শ্যামসুন্দর তনু।'

ভাল নাম পাইয়াছে প্রসাদে রাজার
'সাদিউঁক নানা' বুলি প্রশংসা যাহার
মঘীভাষে 'নানা' নাম ধরএ যাহারে
শ্যামল সুন্দর তনু দেখিয়া তাহারে।
শ্যামল সুন্দর আতিবব নাম
সাদিউঁক বোলে যারে বণিক উপর
শ্রেষ্ঠ হই পাইলেন্ত তঙ্কাশাল ঘর।
'নানা' নাম থুইলেন্ত মরউঙ্গ
(ম্রোহঙ্গ) রাএ।
যত মরউঙ্গ আইসে করএ গৌরব।
থুইছে নিজ বাপ মাএ

আর এই আতিবরের টাকশাল কর্মে সহায় বা সহকারী ছিলেন মোহর আলি নামের এক ব্যক্তি।

এই আতিবরই দুল্লামজলিস রচনায় প্রবর্তনা দিয়েছিলেন কবিকে। কবির অবলম্বন ছিল সাঈফ আল-জাফর বাহারী রচিত ফারসি কিতাব ঃ

একদিন আমাকে ডাকিয়া সেইজন
পড়াইযা শুনিলেন্ত কিতাব কথন।
দুল্লামজলিস নামে কিতাব প্রধান
হরষিত হৈল মন শুনিয়া তাহান।
বুলিলা ফারসি ভাষা না বুঝে সকলে
কেহ বুঝে কেহ লোকে শুনিয়া বিকলে।
মনে ভাবোঁ মরিলে না মরে সেইজন
যাহার কীরিতি যশ থাকএ ভুবন।
আর ভাবোঁ পুণ্য আছে পন্থ জানাইলে
আশীর্বাদ করিবেন্ত পড়িলে শুনিলে।
তাতে মহাজন আজ্ঞা না যাএ লঙ্ঘন
অঙ্গীকার কৈলুঁ তান মানিলুঁ বচন।

এটি কবির তৃতীয় রচনা। কবি বলেছেন তিনি আগে হাজার মসায়েল ও তমিম আনসারী নামে দু'খানা কাব্য রচনা করেছেন, সম্ভবত ফারসি কিতাব অবলম্বনেই ঃ

আগে দুই লেখিয়াছি কিতাবেত হেরি
হাজার মসায়েল আর তমিম আনসারী।
তার পাছে এ পুস্তক করিব রচন।

কবি নিজের বংশ-পরিচয়ও দিয়েছেন ঃ

তবে কিছু কহিমু বংশের পরিচয়
যেই বংশে উৎপন্ন আমার নিশ্চয়।
রমসুল মিয়া নামে প্রপিতা আমার
বিষয়পদবী পাইল প্রসাদে রাজার
ডিঙ্গার হাসিল যত তাহার কারণ
লইয়া ভেটএ সব নৃপের চরণ।
তানপুত্র মছন আলি ডিঙ্গার দোভাষী
দিব্যবস্তু হৈলে নৃপস্থানে দেঅ আসি।
রোসাঙ্গেত যত সদাগর আইসে যাএ
নৃপের সমুখে নিয়া বচন ফিরাএ।
তানপুত্র আলি আকাব্বর ধরে নাম
শুদ্ধমতি মহাজন সর্বগুণধাম।
আমি তানপুত্র আবদুল করিম খোন্দকার
আশা কৈলুঁ এ কিতাব রচিতে পয়ার।

অতএব কবির পিতামহ রমসুল মিয়া ছিলেন বাণিজ্যডিঙ্গার রাজা-নিযুক্ত হাসিল বা কর আদায়কারী। তাঁর পুত্র মোহসিন আলি ছিলেন দোভাষী [ইন্টারপ্রেটর] ...রাজা ও বিদেশী বণিকের কথোপকথনের অনুবাদক। মোহসিন আলির পুত্র আলি আকবরই কবি আবদুল করিম খোন্দকারের পিতা। গ্রন্থে রচনাকালও রয়েছে, কিন্তু তা কিছু বিভ্রান্তিকর ঃ

১. এবে শুন মুসলমানি সঙ্কেত কথন
এক সহস্র দুইশত আরব্যহ সন।
২. সহস্রেক সাইট শতেক সাইত অব্দ আর
অনুমতি বিশুদ্ধ পাঠ—সহস্রেক শতেক সাথে সাত অব্দ আর
সহস্রেক শতেক সাথে সাত অব্দ আর
মঘীসন এ লিখন শুন পুনর্বার।

১২০০হিজরী আর ১১৬৭ বা ১১০৭ মঘী সন অভিন্ন নয়। ১২০০ হিজরীতে ১৭৮ -৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দ, ১১৬৭ মঘীতে ১৮০৫ এবং ১১০৭ মগী ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দ হয়।

১২০০ হিজরী শুরু হয় ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে আরাকানরাজ্য তথা রোসাঙ্গ বর্মারাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। এ জন্যে মনে হয় হিজরী সনটি ভুল। কারণ কবির উক্তির সাক্ষ্যে বলা চলে রোসাঙ্গবিজিত হবার পূর্বেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। ১১৯৯ হিজরী হলেও হিজরী সনটি শুদ্ধ বলা যেত। তাই আমাদের মনে হয় ১১০৭ মঘীই শুদ্ধ পাঠ। এতে ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়, তখন আরাকানরাজ্য স্বাধীন ছিল। কবি বর্ণিত প্রতিবেশও এ রচনাকাল সমর্থন করে।

আর কবির পীর ছিলেন হামিদুল্লাহ। একটি ভণিতা–

হামিদুল্লা পীর পদে করিয়া ভকতি
সাদিউকঁ আতিবর উমর নন্দন

আতিবর মহাজন লইয়া আরতি।
মুই হীন আবদুল করিম খোন্দকার
করিলুঁ বাঙ্গালাভাষে রচিয়া পয়ার।
সাদিউকঁ আরতি লইয়া পুর্নবার
আবদুল করিমে কহে রচিয়া পয়ার।

এই মতে মহানিধি পাউক আপন।
নৃপের প্রসাদ হৌক তানে প্রতিনিত
মোহর আলি বরুল্লা এ করৌক পিরীত
তাহান আদেশ মানি করিলুঁ রচন।

দুল্লামজলিস তেত্রিশবাবে (দ্বাবে) বা অধ্যায়ে বিভক্ত। হযরত আদম, ইব্রাহিম, লুত, শোয়েব, আয়ুব, মুসা, সোলায়মান প্রভৃতি নবী এবং হাসান বাসোরী, হাসান কোরাইশী ও আবু সৈয়দ প্রভৃতি সাধকদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করে. নীতিশাস্ত্র ও ধর্মবিষয়ক এ উপদেশাত্মক এ্যানেকডোট জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কবি। এ ছাড়া এ গ্রন্থে রোজা ও বেহেস্তের বৃত্তান্তও বিবৃত হয়েছে। আদম-কথা বলতে গিয়ে কবি সৈয়দ সুলতান রচিত নবীবংশ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন :

'বিশেষ না কহি আমি আদমের কথা
নবীবংশ পুস্তকেত আছএ ব্যবস্থা।'

সতেরো শতকের কবি রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিমও একই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 'দুররে মজলিস' নামে। আবদুল করিম খোন্দকার রচিত 'নুরনামা' বা নুরফরামিসনামা এবং রজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিম (১৬ শতক) রচিত 'নুরনামা' আদিসৃষ্টি নুররূপী হযরত মুহম্মদ সৃষ্টি বিষয়ক। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুটোর বিষয় নবীবংশে বিবৃত হযরত মুহম্মদদের সৃজন কিংবা শেখ চান্দ বর্ণিত নুররূপী মুহম্মদ সৃষ্টিকথা থেকে মূলত ভিন্ন নয়। পার্থক্য কেবল ভাষার। বিভিন্ন কবির স্ব স্ব ভঙ্গিতে বিবৃত। 'নুবনামা' রচয়িতা একজন দোভাষী শায়েরের কথাও শোনা যায়। তাঁর নাম মুহম্মদ খান।

৮. নুরুল্লাহ

নুরুল্লাহ রচিত সিফৎনামা কসিদাশ্রেণীর গ্রন্থ। কয়েকজন ধনী মানী ব্যক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত, প্রখ্যাত ও চিরস্মরণীয় করবার জন্যেই তাঁদের গুণ-মান-মাহাত্ম্য প্রচারের এ প্রয়াস এবং তা নিঃস্বার্থ প্রয়াস ছিল না। যেমন ফতেহ আলি চৌধুরী কবিকে বললেন ঃ

'মোহোর জামাতা হেতু করহ পয়ার
হেম তঙ্কা ভুমি দানে তুষিব তোমার।
তার সঙ্গে রচ মোর দুহিতার কথা
রূপরেখ যত ইতি সুকৃতি বারতা।'

এভাবে প্রলুব্ধ হয়ে কবি স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি জুমন, হাড়িচান্দ, সফর আলি, সোনাগাজী, আশরফ, মুহম্মদ ওলি প্রভৃতি তারিফ বর্ণনা করেছেন। কসিদা লেখাকে পেশা হিসেবে কবির ছোটভাই কবি আজমতুল্লাহও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'সুফী সানাউল্লাহর সিফৎনামা'।

কবি নুরুল্লাহ ও তাঁর ভাই আজমতুল্লাহর নিবাস ছিল দৌলতপুর গাঁয়ে। এ দৌলতপুর এখন নোয়াখালি জেলার ফেনী মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭০ সনে নোয়াখালি জেলা গঠিত হওয়ার পূর্বে ফেনী এলাকার অধিকাংশ ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত। উল্লেখ্য যে ফেনীর অপর কবি সৈয়দ নুরউদ্দীনও তাই নিজেকে চট্টগ্রামবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।

তাই কবি বলেছেন হীনাতি নুরুল্লা ভণে চাটিগ্রাম স্থল....

দৌলতপুর রাজ্যে মোর এ ক্ষুদ্র উয়ারি। তাতে আশরাফ নামে আছে নরপতি।
কিংবা চাটিগ্রামে আছে রাজ্য সিলোনিয়া খ্যাতি।

কবি নুরুল্লাহর পীর ছিলেন সৈয়দ আবু। 'পীর সৈয়দ আবু পদে সহস্র প্রণাম।' সামন্তযুগের অবসানের ও বুর্জোয়া উন্মেষের সন্ধিক্ষণে নতুন ধনীমানী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সেই ভুঁইফোড় শ্রেণীর মনে সামন্তসুলভ আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার এবং প্রখ্যাত হবার। তেমন মানুষরাই নুরুল্লাহকে পয়সা দিয়ে নিজেদের সত্য-মিথ্যা প্রশংসা গাইয়ে নিয়েছে। এ গ্রন্থ স্থানীয় ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে মূল্যবান।

৯. আজমতুল্লাহ

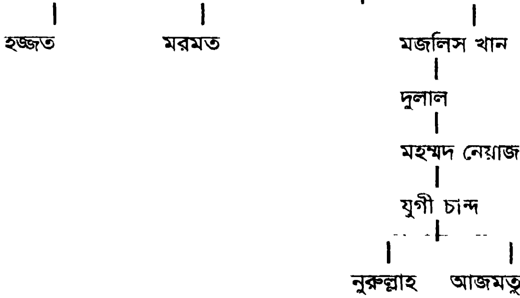
আজমতুল্লাহ নুরুল্লাহরই ছোটভাই এবং 'সূফী সানাউল্লাহর সিফৎনামা' রচয়িতা।

আজমতুল্লাহর আদর্শ কবি নুরুল্লাহ ঃ

শ্রীযুত নুরুল্লাহপদ দর্পন করিয়া
চলিলুম সঙ্কটপথে আল্লাকে স্মরিয়া।
শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃ আজ্ঞা চক্ষে অঞ্জন করিয়া
রচিমু পুস্তক মুঞি মনে বিমর্সিয়া।

কবি তাঁর বংশলতা দিয়েছেনঃ

গানাই মুনদার(মজুমদার)



ইমামনগরবাসী শেখ মুহম্মদ রাজার পুত্র সূফী সানাউল্লাহর পরিচিতি এরূপ ঃ

শেখ মহম্মদ রাজা সর্বগুণধাম
তান সুত সানাউল্লা হইল উপাম।
দানেত হাতিম বলে ভাগ্যবন্ত অতি
ইমামনগরে তান আছএ বসতি।

সূফী সানাউল্লাহর গুণ-মান-মাহাত্ম্য বর্ণনায় শতোর্ধ্ব পত্রের এ পাণ্ডুলিপি শেষ হয়নি, তার সঙ্গে হাদিস ও আরবি রীতি-নীতি শাস্ত্রও বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি গ্রন্থোক্ত তথ্য ও তত্ত্ব কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে তাও বলেছেন—

আবদুল্লা দরবেশ যে ভুবন বিখ্যাত
তানপুত্র গরীবুল্লা আলিম পণ্ডিত।
তানপুত্র বশিরুল্লা আলিম প্রধান
তাহান মুখেত শুনি কিতাব বয়ান।

আর আদেষ্টা ও প্রতিপোষক হলেন সূফী সানাউল্লাহ।

সূফী সানাউল্লা মোকে আজ্ঞা কৈল দান
রচিলুম বাঙ্গালাভাষে হাদিস বয়ান।
তান হস্তে পাই নিত্য বস্ত্র ভৈক্ষ্যন মান।

মনে হয় কবি উনিশ শতকের গোড়ার দিকের লোক।

দশম অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল

১. চণ্ডী পরিচিতি

ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয় অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে গঠিত ধর্ম নয়। বহুযুগের বহু মানুষের স্বাধীন মন-মননের ফসল হচ্ছে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থগুলো। ফলে এতে আদি কাল থেকে আজ অবধি কাল-পরিসরে হিন্দু ধর্মের তথা ব্রাহ্মণ্যমতের ও শাস্ত্রের যে বিচিত্র রূপান্তর, বিবর্তন, বিকাশ ও বিকৃতি ঘটেছে, তা অনুধাবন করা আজো সম্ভব হয় নি। শাস্ত্রগ্রন্থগুলো ভারতবাসীর চিন্তা চেতনার, সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্রমবিকাশধারার রূপ যেমন ধারণ করে, তেমনি বহু যুগের বহুমানবগোষ্ঠীর নানা স্থানিক, সম্মিলিত ও অসমন্বিত প্রয়াসের সাক্ষ্যও বহন করে। এ জন্যে মানব সভ্যতাব ভারতীয় উন্মেষ-বিকাশের ইতিহাসের উপকরণ এখানে যেমন মেলে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন মেলে না।

আমরা আগেই জেনেছি, বাঙলাদেশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচার আচরণ যদিও বাহ্যত উত্তর ভারতীয় কিন্তু বাঙালীর চেতনার গভীবে রয়েছে অস্ট্রিক-মোঙ্গলের, সাংখ্যের, যোগের ও তন্ত্রের প্রভাব। তাই তার ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনা সর্বভারতীয় আদলে বিকাশ বিবর্তন পায়নি, স্বতন্ত্র পথে হয়েছে বিবর্তিত। একদিকে যেমন কায়াসাধন প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পার্থিব জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা লক্ষ্যে অরি ও মিত্র দেবতার তোয়াজ-স্তুতিই হয়েছে মুখ্য। এটি অবশ্য বাঙালীব ঐতিহ্য-ও জীবন-প্রীতিরই প্রমাণ, তাই অস্ট্রিক-মোঙ্গল বাঙালী অনেক দেবতা সৃষ্টি করেছে ঐহিক জীবনের প্রয়োজনে। মনসা, চণ্ডী, বাসুলী, ধর্ম, যক্ষ, শীতলা, ওলা, শনি, পীর-নারায়ণ সত্য প্রভৃতি অনেক দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার তোয়াজ স্তুতি করেই আত্মপ্রত্যয়হীন বাঙালী সংসার সমুদ্রে জীবনের ভেলা ভাসিয়ে রাখে। চণ্ডী এমনি এক আদি সৃষ্ট শক্তিদেবতা–কোল-মুণ্ডা-ওরাঁও সমাজে ইনি চাণ্ডী, প্রচণ্ডশক্তি পূজাঅধিকারী এই নারীর স্বামীর নামও চণ্ড। নামগুলো যেমন অনার্য, তেমনি দেবকল্পনাও স্থূল। চণ্ড-চণ্ডীর গায়ের রঙ শ্যামলা। উভয়েই দৈত্য-দানব হন্তা প্রলয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শক্তির আধার। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় এই রক্ত-খেকো দানবদলনী নৃমুণ্ডমালিনী দেবী দশমহাবিদ্যার প্রতীকে দশরূপ লাভ করে ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও কমলা নামে পরিচিতা হন। বাঙালীর মন, মনন ও রুচির উৎকর্ষের অনুপাতে রক্ত-খেকো নৃমুণ্ডমালিনী কালিকা আর স্থানিক চণ্ডী ও উমা, শিবানী, পার্বতী, দুর্গা, অন্নদা-রূপে কেবল গৌরী নন, তাঁর গুণের রূপান্তরও ঘটেছে। এক সময়ে তিনি সৃষ্টির উৎস পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিরূপে মহিমান্বিতা হন। চণ্ডী কালো বলে কালী, কালিকা ও শ্যামা—এ আদুরে নামও লাভ করেন। বৌদ্ধ বজ্রতারার, নীলতারার, শ্যামতারার প্রভাবে তাঁর নাম হলো তারা। সন্তানবৎসলা বলে অথবা বিশালাক্ষী বলে অথবা বাগীশ্বরীরূপে তাঁকে বাসুলীর (বৎসলার) সঙ্গে অভিন্ন করেও কল্পনা করা হয়। দুর্গারূপে শরৎকালে পূজিতা হন বলে তাঁর এক নাম সারদাও। আবার তান্ত্রিক প্রভাবে তিনি বাগীশ্বরী সরস্বতীর সঙ্গেও অভিন্না, এমনকি হয়তো বৌদ্ধপ্রভাবে কামাখ্যা আর বাসলীও দশমহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হয়তো বৌদ্ধপ্রভাবেই তার স্থূল উগ্র বুনো ভয়ঙ্করী রূপ কমলা করুণাময়ীরূপে বিবর্তন পায়, তখন তিনি অন্নপূর্ণারূপে গৃহস্থবধূ শিবানী। শিবানী দুর্গা-উমারূপে বাঙলাদেশে পূজিতা হতে থাকেন। দুর্গারূপে দশদিক রক্ষার প্রতীক দশপ্রহরণ ধারিণীরূপে দুর্গামূর্তি পরিকল্পিত হয় সম্ভবত চৌদ্দশতক থেকে। বৈষ্ণবপ্রভাবে রক্তখেকো কালীই আবার ভক্তবৎসলা জগজ্জননীরূপে প্রতিষ্ঠা পান বাঙলাদেশে সতেরো-আঠারো শতকে। এভাবে চণ্ডী মাহাত্ম্যজ্ঞাপক চণ্ডীমঙ্গল, দানবদলনী গৌরীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক

গৌরীমঙ্গল ও সারদামঙ্গলা কালিকা মহিমাজ্ঞাপক কালিকামঙ্গল এবং মাতৃরূপিণী শ্যামারস্তুতিব জন্যে শ্যামা সঙ্গীত রচিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কালীমাতা কেবলই ক্ষমাশীলা ও কল্যাণময়ী শক্তি।

সুতরাং আদি চণ্ডী শতেক নামে শতরূপে স্থানিক ও কালিক বিবর্তন লাভ কবেছেন। আগেই বলেছি দেবী কল্পনাটাও এক মনের সৃষ্টি নয় বলে চণ্ডী থেকে শ্যামা মায়ে রূপান্তর কোন সরল পথে বা ঋজু তত্ত্বে সম্পন্ন হয় নি। নানা জনের কল্পনাপ্রসূত বলেই বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন সম্পর্কে ও তাৎপর্যে বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনীর নায়িকারূপে চণ্ডীর রূপ, গুণ ও সম্পর্ক জটাজটিল ও অসমন্বিত রূপ ধারণ করেছে। লেখকের অজ্ঞতা অথবা প্রয়োজনবুদ্ধিই এর জন্যে দায়ী। সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের মতে চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর মধ্যে উমা, লক্ষ্মী, মহিষমর্দিনী চণ্ডী ও সবস্বতীর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই মঙ্গলচণ্ডী নামের কারণ স্বরূপ দ্বিজমাধব ও রামদেব, ভবানী দাস প্রমুখ কবি মঙ্গল নামের অপৌরাণিক দৈত্যও সৃষ্টি করেছেন, অর্বাচীন বৃহর্দ্ধম, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে আর হরিবংশে চণ্ডীর কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মঙ্গল শব্দটি বেদেও পাওয়া যায়, আমরা এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা কবেছি, কল্যাণ কামনায় ঘট বসানো, গান গাওয়া, অনুষ্ঠান করা প্রভৃতি মঙ্গলজনক যাবতীয় আচার আচরণ-নির্দেশক শব্দ এই মঙ্গল। তাৎপর্য চেতনাভ্রষ্ট অজ্ঞলোক তা' মঙ্গলদৈত্যে, মঙ্গলবারে ও অন্য অনেক রকমে মঙ্গল-এর উৎস খোঁজেন। (যথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য উদ্ধৃত শ্লোক পৃঃ ৪৩২,-৫ম সং)

চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যান দুটোও অপৌরাণিক কিন্তু প্রাচীন। ভক্তের মঙ্গল কামনায় তাঁকে পূজা করা হয় বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শনও রয়েছে, শুধু তারা, বাসুলী নামে নয়, দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে বল্লুকাবন, বল্লুকানদীতটের কথাও রয়েছে, শিব বল্লুকাতটে বিচরণ করেন, আরো রয়েছে ডাকিনীর কথা। তেমনি রয়েছে চণ্ডীরূপিনী ডাকিনী পূজার কথাও। সবচেয়ে গুরুতর তথ্য এই যে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্মগোসাঞির নামে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ আদ্যাই চণ্ডী। অতএব ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের ধারণাই যথার্থ বলে মানতে হয়। তিনি বলেন, 'বাংলার লৌকিক শক্তিদেবতাদিগের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা জটিল। ইহার কারণ বিভিন্ন সময়ের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা হইতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। পুরাণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, সকল শক্তিদেবতাই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ কবিলেও ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল।' (বা. ম. কা. ই, ৫ম সং পৃঃ ৪১৬)। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'দ্বিজমাধবরচিত মঙ্গলচণ্ডীব গীত'-এর ভূমিকায় মঙ্গলচণ্ডীকে মিশ্রদেবতা বলেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন (পৃঃ।,/. -২।।./.) স্বতন্ত্রভাবে চণ্ডীর স্থানিক ও কালিক উদ্ভব ঘটেছিল বলেই নামে ও গুণে চণ্ডীর পার্থক্য কোথাও কখনো ঘোচে নি। কয়েকটি নাম ঃ নাটাইচণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, শুভচণ্ডী (সুবচনী) খাড়াচণ্ডী, রথাইচণ্ডী, রণচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বসনচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ককাইচণ্ডী, ঢোলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, নিত্যমঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। (বা. ম. কা. ই. পৃঃ ৪১৬-১৭)-নামেই প্রকাশ। এঁরা জীবন-জীবিকার বিভিন্নদিকের বিবিধ বিপদ-তাড়ন দেবতা। সে কারণেই এঁরা কালিক স্থানিক লৌকিক ও ঐহিক প্রয়োজনের দেবতা। উল্লেখ্য যে চণ্ডী মুখ্যত বরেন্দ্র-রাঢ়-সুহ্ম (উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের) অঞ্চলের দেবতা। চণ্ডী, চণ্ডীতলা ও চণ্ডীমণ্ডপ এখানেই সুলভ। চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে এসব নেই। অবশ্য এগারো-বারো শতকে যে পৌরাণিক চণ্ডীর মাহাত্ম্যকথা আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্ম, মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও আরো পরে হরিবংশে পাচ্ছি, সে-চণ্ডীর স্তব বাঙলার সর্বত্র চালু রয়েছে। এবং তিনি উমা গৌরী দুর্গা চামুণ্ডা পার্বতী সারদা মাহেশ্বরী প্রভৃতি রূপে মহিষমর্দিনী, অসুরদলনী (মধুকৈটভ, মহিষ, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি মর্দিনী) রূপে পাঁচালীতে পরিকীর্তিতা হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, যেহেতু মঙ্গল পাঁচালীর লৌকিকদেবতারা ঐহিকজীবনের লাভক্ষতির দেবতা, সেহেতু এখানে দেবতায় ও মানুষে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। সবাই এখানে প্রবৃত্তি পরবশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার ও বাঙালীর ধর্মজীবনের ইতিহাস হচ্ছে ঃ এই পার্থিবজীবনে সুখ ও নিরাপত্তাকামী আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল মানুষের অরি ও মিত্র, উপ-ও অপ-দেবতা সৃষ্টির ও পূজার কাহিনী। এর ভেতরে কোন অপার্থিব সুমহৎ আদর্শ বা লক্ষ্য নেই, আছে এ মাটিকে, এ ঐহিক জীবনকে আর্কড়ে থাকার ও ভালোবাসার সাক্ষ্য। তাই দেবলীলার আবরণে বর্ণিত হয়েছে সমকালীন বাঙলার ও বাঙালীর জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিকথা। খুল্লনা-ফুল্লরা-লহনা-বেহুলা-রঞ্জাবতী-লখাই-গৌরী কিংবা দুর্বলা-হীরা-মনসা-চণ্ডী-দুর্গা-পার্বতী-শিব-ধর্ম-চাঁদ-ধনপতি-শ্রীমন্ত-কালকেতু-লাউসেন-কর্ণসেন-কালুডোম-ইছাই ঘোষ-মহামদ-মুরারিশীল-ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি সব দেব-মানবই ভালয় মন্দয় দোষে গুণে নামভেদে আমাদেরই চিরকালীন প্রতিবেশী, আমাদেরই ঘরের লোক বা আমরাই। তাই মঙ্গলপাঁচালীতে দেবকথার আবরণে আমরা বাঙলাকে ও বাঙালীকেই দেখি।

চণ্ডীমঙ্গলের 'চণ্ডীই' ক্রমে দুর্গামঙ্গলে দুর্গা, গৌরীমঙ্গলে গৌরী, সারদামঙ্গলে সারদা, কালিকামঙ্গলে কালী, অন্নদামঙ্গলে অন্নপূর্ণা, এমনকি বাসুলীমঙ্গলে বাসুলী হয়েছেন। এবং সে-সঙ্গে বক্তব্য আর কাহিনীও পরিবর্তিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যান দুটোর সারাংশ ঃ

। আখেটিক খণ্ড। কালকেতুর উপাখ্যান

কলিঙ্গদেশের এক দরিদ্র ব্যাধ। নাম তার কালকেতু। সে শক্তিতে ও সাহসে অতুল্য। ফুল্লরা তার স্ত্রী। পশু-পাখি শিকার করেই সে সংসার চালায়। বনে পশু-পাখির নিরাপত্তার দেবতা হলেন চণ্ডী। তাঁর মনে বাসনা জাগল তিনি মানুষেরও পূজনীয়া হবেন।

কালকেতুকেই তিনি নিম্নবর্ণের সমাজে তাঁর পূজা করানোর ও মাহাত্ম্য প্রচারের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বেছে নিলেন। চণ্ডী ছলনা করে পর পর কয়দিন অরণ্যের সব শিকার অদৃশ্য করে রাখলেন, ফলে নিঃস্ব কালকেতু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। আর উপোস করে দিন কাটায় স্বামী-স্ত্রী। বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ কালকেতু একদিন শিকারে যাবার পথে দেখল অলক্ষণে গোধিকা। রিক্তহস্তে বাড়ি ফেরার পথে হতাশ কালকেতু গোসাপকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে বাড়ী নিয়ে এল খাবে বলেই। কালকেতু হাতমুখ ধোবার জন্যে গেল ঘাটে। ঐ গোসাপ তখন পরমাসুন্দরী নারী রূপ নিয়ে ঘর আলো করে বসে, ফুল্লরা ঘবের দুয়ারে তাকে দেখে ঈর্ষায় ও আশঙ্কায় বিচলিত। তার স্বামীই এ সুন্দরীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে শুনে অধৈর্য হয়ে ঘাটে গেল সে কালকেতুর সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে। ফুল্লরাকে দেখে কালকেতু বলে

শাশুড়ী ননন্দ নাহি নাহি তোর সতা
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।

তারপর স্বামী-স্ত্রী ফিরে এল ঘরে। কালকেতু রূপসীরূপিণী অভয়াকে দেখে বিস্মিত। কালকেতু সচ্চরিত্র ও আদর্শস্বামী : সে সুন্দরীকে চলে যেতে বলল, কিন্তু সুন্দরী নড়তে রাজি হয় না দেখে তার প্রতি তীর ছুঁড়তে উদ্যত হলে মা চণ্ডী স্বমূর্তি ধরে তাকে সাতঘড়া টাকা ও একটি মহামূল্য অঙ্গুরী দিলেন। আর জঙ্গল কেটে গুজরাটনগর পত্তন করার পরামর্শ দিলেন। কালকেতু জঙ্গল আবাদ করে প্রজা বসিয়ে গড়ে তুলল গুজরাটরাজ্য। ভাঁড়ুদত্ত নামে এক ধূর্তলোক ছিল, সে হতে চাইল কালকেতুর মন্ত্রী। কিন্তু এমন ফন্দিবাজ লোক কালকেতুর পছন্দ নয়। তাই তাকে তাড়িয়ে দিল। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ ভাঁড়ুদত্ত কালকেতু রাজ্য আক্রমণে প্ররোচিত করল প্রতিবেশী কলিঙ্গরাজকে। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হল কালুকেতু। কারাগারে কালকেতু চণ্ডীর বন্দনা করল। ভক্তবৎসলা কলিঙ্গরাজাকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন কালকেতুকে মুক্তি দিতে আর রাজ্য ফিরিয়ে দিতে। কলিঙ্গরাজ তা-ই করল। কালকেতু ও ফুল্লরা সুখে রাজত্ব করে যথাসময়ে স্বর্গে গেল। এভাবে মর্ত্যে মানুষের মধ্যে চণ্ডীর গুণ-মান-মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারিত হল। বলাবাহুল্য, কালকেতু ও ফুল্লরা ছিল স্বর্গের নীলাম্বর ও ছায়া। চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্যেই ছলনার শিকাব হয়ে তাদের মর্ত্যে মানবজীবনধারণ।

বণিক খণ্ড : ধনপতি সদাগরের কাহিনী :

উজানীনগরে ছিল ধনপতি সদাগরের বাস। তার প্রথমা স্ত্রীর নাম লহনা, সে বন্ধ্যা। তাই ধনপতি আবার বিয়ে করল, স্ত্রীর নাম খুল্লনা। লহনার সপত্নীবিদ্বেষ তীব্র। তাই ধনপতি বাণিজ্যযাত্রা করলে লহনা খুল্লনাকে নানা কাজে অকাজে খাটিয়ে নানাভাবে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিত।

খুল্লনা বনে ছাগল চরাত। বনে একদিন অন্য মেয়েদেরকে চণ্ডীদেবীর পূজা করতে দেখে খুল্লনাও বাড়ীতে ঘট বসিয়ে চণ্ডীর পূজা করছিল। ধনপতি চণ্ডীপূজা পছন্দ করেনি, সে বিরক্ত হল স্ত্রীর উপর এবং পায়ে ঠেলে ফেলে দিল চণ্ডীপূজার ঘট। তাতেও খুল্লনার চণ্ডীভক্তি অটুট রইল। কিছুকাল পরে ধনপতি আবার বাণিজ্যে বের হল, সিংহলে যাবাব পথে অকূল সমুদ্র মধ্যে দেখল 'কমলে কাহিনী' অর্থাৎ পদ্মবাহিকা এক পরমাসুন্দরীকে। এ ছিল চণ্ডীর ছলনা। সিংহলে পৌছে রাজার কাছে ধনপতি এ গল্প করলে রাজা এ অলৌকিক দৃশ্য দেখতে চাইল। ধনপতি তা দেখাতে পারল না, কারণ মহামায়া চণ্ডী তখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ফলে মিথ্যাবাদী ধনপতি নিক্ষিপ্ত হল রাজকারাগারে। এদিকে খুল্লনার একটি সন্তান হল, নাম থুইল তার শ্রীমন্ত শ্রীপতি। সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে পিতার সন্ধানে বাণিজ্যে গেল সিংহলে। সেও দেখল কমলে কামিনীর অদ্ভুত দৃশ্য। সেও রাজাদেশে নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে এবং তার হল শূলে মৃত্যুদণ্ড। এদিকে খুল্লনা স্বামী-পুত্রের কল্যাণে চণ্ডীপূজা করায় তুষ্টা চণ্ডী তাঁর ভূতপ্রেত পিশাচ নিয়ে সিংহলে পৌছলেন শ্রীমন্তকে শূলে চড়ানোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। চণ্ডীর চেলার অতর্কিত ও অদ্ভুত আক্রমণে সিংহলরাজার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। সিংহলরাজ দেবীর নির্দেশে শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যা সুশীলার বিয়ে দিল। দেবীর কৃপায় রাজা কমলে কামিনী দেখলে ধনপতিও মুক্ত হল। পিতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ছয়ডিঙ্গা পণ্য নিয়ে সানন্দে ফিরল উজানীনগরে। এমনকি উজানীর রাজাকেও কমলে কামিনী দেখাল শ্রীমন্ত, রাজা তুষ্ট হয়ে নিজকন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিল। মর্ত্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সমাজে অরণ্যের পশু-পাখির দেবতা চণ্ডী এভাবেই পূজনীয়া হলেন। শ্রীমন্তরাও স্বর্গভ্রষ্ট দেবসন্তান।

বিভিন্ন চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে উপাখ্যান দুটোর মূল কাঠামো অভিন্ন হলেও দেব-খণ্ডে সামান্য সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। যেমন মাধব ও রামদেবের পাঁচালীর মঙ্গলদৈত্যের বৃত্তান্ত। কিংবা মানিক দত্তের পাঁচালীর ধুম্রলোচন আখ্যান।

২. মানিক দত্ত

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পূর্বসূরী বন্দনায় এক মানিক দত্তকে চণ্ডীগীতির আদি বা পূর্ববর্তী কবি বলে বন্দনা করেছেন ঃ

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলু মুনি ব্যাস- ।[১]
মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়[২]
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।

-এ চরণ সাহিত্য পরিষৎ পুথিতে আছে পৃঃ সং ৩৩২-

বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ-[৩]
প্রণাম করিয়া মাতাপিতার চরণ।

---

১. *পাঠান্তর ঃ কৃত্তিবাস—কলি সং*

২. *পাঠান্তর ঃ দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ–সা. প. পুথি*
বঙ্গবাসী সংস্করণেও এ চরণ মেলে।

৩. *বিনয় করিয়া কবিকঙ্কণের চরণ– সা. প. পুথি*

রচনার ধরন ও কবির নামবিন্যাস দেখে মনে হয় এটি কোন গায়েনের রচনা। যদি মুকুন্দরামের রচনা হয়, তা হলে এব ব্যাখ্যা দু'রকম হতে পারে ঃ হয় মানিক দত্ত নামের কোন সঙ্গীতজ্ঞের প্রবর্তনায় শ্রীকবিকঙ্কণ নামের কোন সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে মুকুন্দরাম সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, অথবা সঙ্গীতশিক্ষক মানিক দত্তের শিষ্য গায়েন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে গেয় চণ্ডীগীতের রচয়িতা বলেই গুরু স্বীকার করে বন্দনা করছেন। আজ অবধি এ মানিক দত্ত চণ্ডীগীতিব আদি রচক হিসেবে বিদ্বানদের স্বীকৃতি পাচ্ছেন, যদিও এঁর কোন পুথি আবিষ্কৃত হয় নি এবং উক্ত শ্রীকবিকঙ্কণ হচ্ছেন, মেদিনীপুব এলাকার কবি বলরাম। পরবর্তীকালে মানিকদত্ত রচিত চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গেছে। লিপিকাল সম্ভবত ১১৯১ বঙ্গাব্দ তথা ১৭৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দ। এ কবিও অবশ্য ষোল শতকের শেষার্ধের বা সতেরো-আঠারো শতকের লোক হতে পারেন। এঁর কাব্যে কালকেতুর গুজরাটনগরে তাই ফিবিঙ্গিরও ঠাঁই হয়েছে—'আইল ফিরিঙ্গিসব বসিল একত্তরে'। এটি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তা হলে এ পাঁচালীর রচনার উর্ধ্বসীমা ষোল শতকের শেষার্ধ। মানিক দত্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই, তন্ত্রবিভূতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতির মতো ধর্ম নিরঞ্জনের বন্দনা করেছেন। রাঢ় অঞ্চলের বৌদ্ধজ হিন্দুরা ধর্মঠাকুরের ও শূন্যবাদের বা নির্বাণবাদীদের প্রভাব এড়াতে পারে নি বলেই তাঁদের রচনায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতের প্রভাব প্রকট। শূন্যপুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব মানিক দত্তও গ্রহণ করেছেন। মানিক দত্তের পাঁচালীতে কেবল কাহিনীনিষ্ঠ বর্ণনাই রয়েছে, কবিত্ব দুর্লক্ষ্য। একটি চিত্র ঃ ঝগড়াটে লহনার রূপ ঃ

খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া।
চুলেতে ধরিয়া গালেতে দিল চড়
চাপিয়া বসিল খুল্লনার বুকের উপর।

কবি মালদহ অঞ্চলের লোক।

৩. দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ

দ্বিজ মাধব তাঁর ভণিতায় সারদামঙ্গল, সারদাচরিত, সারদাচরণ প্রভৃতি বেশি ব্যবহার করেছেন। কাজেই পাঁচালীর নাম সারদামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতের সব পুথিই চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-নোয়াখালি, থেকে সংগৃহীত। ভাষায় স্থানিক প্রভাব পড়েছে বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ করা যায় নি। পূর্ববঙ্গের কেউ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী রচনা করেন নি। লৌকিক চণ্ডী, চণ্ডীতলা, চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলে আজো অজ্ঞাত। আমাদের ধারণা দ্বিজ মাধবানন্দ কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মতো পশ্চিমবঙ্গের লোক। চাকরী উপলক্ষে চট্টগ্রামে বাস করেন এবং পাঁচালী রচনা করেন। কবির বন্দনা ও আত্মকথা থেকে বোঝা যায় কবি রাঢ় অঞ্চলের নদীয়ার লোক।

বন্দনায়--

প্রথমে বন্দম গুরু ধর্ম নিরঞ্জন........
ডাকিনী-যোগিনী বন্দো ধর্মের সভাএ।

আত্মকথা—

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার।
প্রতাপে তপন রাজা বুদ্ধি বৃহস্পতি
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি।
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার
ত্রিবেণী যে গঙ্গা যথা বহিছে ত্রিধার।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে নদীয়া যে মহাস্থান
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অনেক প্রধান।
পরাশর সুত জান মাধব যে নাম
কলিকালে হৈল জগত অনুপাম।

শেষ চার চরণের পাঠান্তর ঃ

সেই মহানদীতটবাসী পরাশর
যাগযজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
মর্যাদায়ে মহোদধি দানে কল্পতরু
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু।
তাঁহার অনুজ [আত্মজ?] আমি মাধব-আচার্য
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবী মাহাত্ম্য।

এতে বোঝা যায় কবির নিবাস ছিল নদীয়ায় (পিতা [বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা] পরাশর) এবং দ্বিজ মাধবের সময়েও রাঢ় অঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা ধর্মনিরঞ্জনের প্রভাব লোকসংস্কারে ও গণস্মৃতিতে অবিমোচ্য রয়েছে। আদিনাথই যে শিব তাও স্মৃতিতে ভাস্বর। প্রমাণ শিবের বল্লুকাতটে ও বল্লুকাবনে বিচরণ। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও আমরা ডাকিনী-যোগিনী দেখেছি। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলেও রয়েছেন ধর্মনিরঞ্জন। কাজেই অন্তত ষোল শতক অবধি বৌদ্ধসংস্কার ও বৌদ্ধস্মৃতি লোকায়ত জীবনে প্রচ্ছন্নভাবে চালু ছিল বলে মানতে হবে। এ কারণেই সতেরো-আঠারো শতকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ হাড়ি-ডোম-বাগদীপূজ্য দেবতা ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণদের পূজনীয় হয়ে উঠতে পারলেন। সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের মতে দ্বিজ মাধবের কাব্যে পুরাণ অপেক্ষা তন্ত্রের প্রভাব অধিক লক্ষিত হয় (পৃঃ ৩./), প্রমাণস্বরূপ তিনি নীলাম্বরের 'মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান' শিক্ষা গ্রহণসূত্রে দ্বিজ মাধবের যোগতান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধীয় উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি..... সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে
শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে।
আপনা শরীর চিন্ত হইতে অমর। (পৃঃ ১১১)

আর বলেছেন ঃ তান্ত্রিক নিয়মে দ্বিজ মাধব সূর্যাদি সর্বদেবদেবীর বন্দনা করেছেন। মাধবের পুথিতে যেসব বিষ্ণুবিষয় পদ রয়েছে, সেগুলো চণ্ডীমঙ্গলের অংশ নয়, কথকতার প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট বলে মনে হয়। কেননা ওগুলো চৈতন্যমত প্রভাবিত পদ নয়—সাধারণ গান। মাধবের গীত চৌদ্দ পালায় সমাপ্ত। প্রচলিত নিয়মে এটিও অষ্টবাসরীয় পালা এবং এক মঙ্গলবারে শুরু করে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত করাই বিধেয়।

রচনাকাল ঃ

'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শত নিয়োজিত। দ্বিজ মাধব গাএ সারদাচরিত।' এর থেকে রচনাকাল ১৫০১ শক বা ১৫৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দ মেলে। কাব্যে অর্জুনসম আকবর বাদশাহর নামও আছে। ১৫৭৫ সনে মুঘল বিজয় ঘটে। অতএব দ্বিজ মাধব হয়তো চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি, মানিক দত্ত সম্ভবত প্রথম কবি। এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দের কাব্য ১৬০৪ সনের পরে রচিত হলে ঐটি হবে তৃতীয় কাব্য।

গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ মাধব অভিন্ন ব্যক্তি। এ দুই গ্রন্থে কবির মাধবানন্দ নাম মেলে না বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে প্রাপ্ত ঃ

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।

—এ ভণিতা অভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য। তবে ভণিতা প্রক্ষিপ্ত হলে এ অনুমান বৃথা হবে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্ণিত কিশোরগঞ্জ নিবাসী (পৃঃ ৪৬৫-৬৬) দ্বিজ মাধবের পরিচিতিও বংশপরম্পরা ভিন্ন কোন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবের বলে মনে হয়। মাধবকবির কবিত্ব কম, কল্পনায়ও আকাশচারিতা নেই, তাই বর্ণনা বাস্তবঘেঁষা। এ গুণের জন্যে মুকুন্দরাম প্রখ্যাত। এতে মাধবেরও দাবি আছে। উভয়ের পুথিতে চিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিজমাধবের কাছে মুকুন্দরাম বহুলাংশে ঋণী বলে মনে করেছিলেন। মনে হয় দ্বিজ মাধব সপ্তগ্রামের বালাণ্ডানিবাসী ও মহাভারত প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মতো চাকরী বা অন্য কর্মসূত্রে চট্টগ্রামে প্রবাসী ছিলেন। তাই তাঁর গঙ্গামঙ্গল[১] ও চণ্ডীমঙ্গল চট্টগ্রামে সুলভ, সপ্তগ্রামাঞ্চলে দুর্লভ।

৪. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মুকুন্দরাম মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। ষোল-সতেরো শতকের সন্ধিলগ্নের মুকুন্দরাম, সতেরো শতকের তৃতীয়পাদের আলাউল এবং আঠারো শতকের মধ্যকালের ভারতচন্দ্র এ যুগের পাঠকের প্রিয়।

---

১. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩২৩ সন।

মুকুন্দরাম—পরিচিতি এতকাল সরল ও সংক্ষিপ্ত ছিল। সাম্প্রত পূর্বকালে তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকালে 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' বলে স্বীকৃত হত। অর্থাৎ ১৪৬৬ শকাব্দে তথা ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে কিংবা মানসিংহের সুবাদারীকালে এই চণ্ডীমঙ্গল রচিত বলে মেনে নেয়া হত। আর মাহমুদ শরীফ নামের ডিহিদারের উৎপীড়নের ফলে কবির বাস্তুত্যাগ ও তখনকার উড়িষ্যার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমির শাসনকেন্দ্র আরড়ায় সামন্ত বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় নেয়া এবং সামন্ত পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক হওয়া কিংবা অন্য শিশুদের পাঠশালার পণ্ডিতপদ লাভ এবং রঘুনাথ রায়ের শিক্ষা বা দীক্ষা গুরু হওয়া আর সে-সময়ে কাব্য রচনা করা, চার সন্তানের পিতা হওয়া প্রভৃতি বর্ণনায় তাঁর জীবনবৃত্তান্ত শেষ হত।

ইদানীং বিদ্বানদের গবেষণালব্ধ বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য মুকুন্দরাম পরিচিতি ও তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা সংশয় জাগিয়েছে এবং সেসব সংশয়ের নিরসন প্রায় দুঃসাধ্য করে তুলেছে। আমাদের হাতে কোন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব নেই। কাজেই সাম্প্রতকালের তিনজন বিদ্বানের—ডক্টর সুকুমার সেনের, ডক্টর ক্ষুদিরাম দাসের ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যুক্তিবুদ্ধি অনুসারে আমরা কবির বুদ্ধিনির্ভর যুক্তিগ্রাহ্য চরিতকথা নির্মাণ করছি।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শহর সোলায়মানাবাদ ওর্ফে সেলিমাবাদে গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর তালুকে তাঁর প্রজারূপে বর্ধমানে দামিন্য (দামুন্যা) গ্রামবাসী ছিলেন। মুকুন্দরাম যে-সময় বাস্তু ত্যাগ করে তখনকার উড়িষ্যার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমির আরড়ার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রিত হন, তখন রাজা মানসিংহ গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ (বা অধিপ ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রী) এবং রাজা মানসিংহের কালে সত্যই 'ডিহিদার (ছিল) মামুদ শরীপ।' এবং মাহমুদ শরীফের অধীনে তখন উজীর ছিলেন কোন এক প্রখ্যাত রায়ের বা রায়রায়ানের সন্তান রায়জাদা(স্থানীয় ভাবে বহুল পরিচিত)। তিনি অবশ্য পূর্বেকার রায়রায়ান রাজপুত পত্রদাসের পুত্র কিসুদাস হতে পারেন। কেননা ইতিহাসসূত্রে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে কিসুদাসকে উজীরপদে অধিষ্ঠিত দেখা যায়।

মুকুন্দরাম বর্ণিত

ক. মাপে কোণে দিয়া দড়া/পনের কাঠার কুড়া
খ. সরকার খিল ভুমি লিখে লাল/বিনে উপকারে খায় ধুতি
গ. পোতদার হৈল যম/টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিনপ্রতি
ঘ. প্রভু গোপীনাথ নন্দী/বিপাকে হইল বন্দী
কোন (সেই) হেতু নাঞি পরিত্রাণ
ঙ. জানদার প্রতি নাছে (সভার আছে)/প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার ছাপিয়ে দিল (দেয়) থানা।—প্রভৃতি সম্বন্ধে

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস অনুমিত ও ব্যাখ্যাত তথ্য-প্রমাণগুলো এই ঃ ইতিহাস সমর্থিত কারণ ছাড়া আকস্মিকভাবে শত শত প্রজার জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটতে পারে না। দেশে একেবারে অরাজকতা না চললে সব সরকারী কর্মচারী দলবদ্ধ হয়ে একস্থানে এমন প্রকাশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তিস্বার্থে পীড়ন চালাতেও পারে না, বিশেষ করে আকবরের রাজত্বে সুবাদার মানসিংহের আমলে। আমরা জানি আকবরই প্রথম তোড়ল মলের নেতৃত্বে ভুমি জরিপের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করান। উদ্ধৃতাংশ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে তখন নতুন করে অঞ্চলব্যাপী জমির জরিপ চলছিল এবং ভুমি পরিমাপের নতুন কাঠি নির্ধারিত হয়েছিল। আর সে-সঙ্গে জমির প্রকৃত মালিকের সন্ধান নেয়া হচ্ছিল অকৃত্রিম দলিল দস্তাবেজের সাক্ষ্যে। নিয়োগী গোপীনাথ নন্দী বন্দী হয়েছিল নিশ্চয়ই রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছিল বলে অথবা বিনা দলিলে পরস্ব জবর দখল করে ভোগ করার অপরাধে। তাই তার মুক্তির কিংবা তালুক ফিরে পাবার কোন কারণ বা আশা ছিল না। বহুকাল ভূমিজরিপ ও

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার না হওয়ায় কৃষক প্রজাদের মধ্যেও হয়তো কবি মুকুন্দরামের মতো এমন পরজমিভোগী বা জবরদখলকারী অনেকে ছিল। এখন জবিপ কালে ধরা পড়লে জমিতো যাবেই, তার উপর জেল-জরিমানা হবে জেনে তেমন প্রজারা সপবিবাব পালাচ্ছিল এবং এসব লোক যাতে না পালাতে না পারে সে-জন্যে জানদার (watcher বা informer) নিয়োগ করা হয়, এমনকি পালাবে তেমন পরিবারের ঘরের দরজায়ও প্রহরী বসানো হল। সুরদের ও কররানীদের আমলে হয়তো রৌপ্য মুদ্রা ওজনে কম ছিল। সর্বভারতীয় মানের বা সাম্রাজ্যে সর্বত্র একই মানের ও ওজনের মুদ্রা চালু হওয়ার ফলে পুরোনো মুদ্রাকে রূপার মাপে ওজন করে টাকায় দশ পয়সা করে ঘাটতি আদায় করছিল। পুরোনো মুদ্রা জমা দেয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল মুদ্রাার লেনদেন সুষ্ঠু করার প্রয়োজনেই এবং গুরুত্ব সচেতন করবার লক্ষ্যে বিলম্বের জন্যে দিনে এক পাই করে জরিমানার ব্যবস্থাও ছিল। রায়জাদা যে 'বেণে খেদাও' নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হৈল অরি'—তার কারণ এ শ্রেণীর লোকই সেকালে নিষ্কর বা লাখরাজ জমি ভোগ করত বেশি এবং এদেরই উৎখাত করা হচ্ছিল বা জমির উপর রাজস্ব ধার্য করা হচ্ছিল। জেলজরিমানার আশঙ্কাকাতর হৃতভূম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সরকারী ব্যবস্থাব ও সরকারী কর্মচারীর উপর দোষ চাপিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থে নিজেকে নির্দোষ মজলুম বলে ছাপাই গেয়েছেন আত্মসম্মান রক্ষার মনুষ্যসুলভ গরজেই। তবু আসল সত্য ঢাকা পড়েনি। দেশের সব তালুকদার বন্দী হয় নি, তাঁর হিতকামী শ্রীমন্ত খাঁ কিংবা (গ্রামভারি বা মোড়ল) গম্ভীর খাঁরাও পালায় নি, পালায় নি মুকুন্দরামের ভাই কবিচন্দ্র কিংবা জ্ঞাতিরা। খিড়কী দোরেও (নাছে) চর বসানো থাকলেও মুকুন্দরাম (জ্ঞাতি) ভাই রমানাথকে পথের সাথী করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পালালেন। পথে আবার পাথেয় কেড়ে নিল রূপরায় নামের দস্যু। পথে তেলী যদুকুণ্ডু, নিবারণ ও গঙ্গাদাস সাহায্য করল অন্ন ও আশ্রয় দিয়ে।

ভাইলা, মুড়াই নদী, তেউট্যা, দারুকেশ্বর, পাতুলী, নারায়ণ নদ, পরাশর নদ, আমোদর নদ, গোচড্যা ও শিলাই হয়ে কবি অবশেষে সপরিবারে আরড়া পৌছলেন। গোচড্যায় কবি একেবারে নিঃস্ব, তখন 'শিশু কান্দে ওদনের তরে'। এবং পুকুরের পাড়ে বসে 'নৈবেদ্য শালুকনাড়া' দিয়ে কবি 'পূজা কৈল কুমুদপ্রসূনে'। এমনি ক্ষুধার্ত ও পথশ্রান্ত কবি পুকুরপাড়ে যখন নিদ্রিত, তখন 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে' এবং 'আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত'।

মুকুন্দরাম আগে থেকেই কাব্য চর্চা করতেন। হয়তো কবি ছিলেন বলেই আরড়ায় বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্মণ জমিদারের প্রতিপোষণ প্রত্যাশায় কবি ৭০।৮০ মাইল দূরে অবস্থিত আরড়ার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেন। কবির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছিল। কারণ রাজবাড়িতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকুড়া রায় ঃ

পড়িয়া কবিত্ববাণী/সম্ভাষিল নৃপমণি/ রাজা দিল দশ আড়া ধান।

এবং 'সুত [শিশু] পাঠে কৈল নিয়োজিত।' আর মাধবের পুত্র বাঁকুড়া রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রৌঢ় 'ধন্য রাজা রঘুনাথ/রূপে গুণে অবদাত' মুকুন্দরামকে 'গুরু বলি করিল পূজিত'। পণ্ডিতকবিকে প্রৌঢ় রঘুনাথ দর্শন বা স্মৃতি পাঠে শিক্ষাগুরু কিংবা দীক্ষগুরু রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৫৯৬ সনে রঘুনাথ রায় অতিক্রান্ত যৌবনের না হলে ১৬০৪-০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর যুবকপুত্র মন্দির নির্মাতা চক্রধরকে পাওয়া যেত না। আর রঘুনাথের রাজত্বকালেই এবং তাঁর আগ্রহেই মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। এবং সম্ভবত রঘুনাথ রায়ই তাঁকে কঙ্কণ ভূষিত করে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দান করেন। কারণ কবি স্বয়ং বলেছেন 'রঘুনাথ নরপতি গায়েনেরে দিলেন ভূষণ'। গায়েনকে ভূষণ দেয়ার আগে কবিকে ভূষিত করাই ছিল স্বাভাবিক। এ গায়েন ছিল বিক্রমদেবের পুত্র বিনয়সুন্দর। 'ধন্যরাজা রঘুনাথ/প্রকাশিল নুতন মঙ্গল/তাহান আদেশ পান/শ্রী কবিকঙ্কণ গান'—গায়েনের যোজনা বা প্রক্ষিপ্ত না হলে কবির এ উক্তির ভিত্তিতে বলা যায় পিতা বাঁকুড়া রায়ের(১৫৭৩-১৬০২ খ্রীঃ) মৃত্যুর পরে রঘুনাথ রাজা হয়ে (১৬০৩খ্রীঃ) মুকুন্দরামকে অভয়ার পাঁচালী রচনায় প্রবর্তনা দেন। এবং রঘুনাথ ১৬২২-২৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি বেঁচে ছিলেন, তারপরে জমিদার হলেন তাঁর পুত্র শ্রীধর।

কেশিয়াড়ী গ্রামে সর্বমঙ্গলা মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রৌঢ় রঘুনাথের পুত্র যুবক চক্রধর শর্মার ১৫২৬ শকের বা ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দের শিলালিপিসূত্রে এবং আরড়া সন্নিহিত সেনাপত গ্রামের জয়চণ্ডীর মন্দিরে প্রাপ্ত আরড়ার তথা ব্রাহ্মণভূমির [দ্বিজাবনীশ-এর] অধিপতি শ্রীধরের ১৫৪৫ শকের বা ১৬২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দের শিলালিপির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে রঘুনাথ ১৬০৩ থেকে ২২-২৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি জমিদারীর মালিক ছিলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রপ্রপিতামহ তপন ওঝা, প্রপিতামহ উমাপতি, পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র ওর্ফে গুণরাজমিশ্র, ভাইয়ের নাম কবিচন্দ্র, গোত্র সাবর্ণ। দামিন্যার চক্রাদিত্য শিবের ধামাধিকরণী ছিলেন পিতামহ জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধব ওঝা।

মুকুন্দরামের সন্তানসংখ্যা চার—শিবরাম, চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশ—দুইপুত্র দুইকন্যা। জ্যেষ্ঠ শিবরাম ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দের আগেই দামিন্যায় ফিরে আসেন, কারণ সেলিমাবাদের শাসক বারাখানের আমলে ১০৪৭ বঙ্গাব্দে তথা ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে কুতুব খাঁ ষোলবিঘা নিষ্কর জমি দান করেন শিবরামকে। আমাদের ধারণা মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে সুবাদার হয়ে এলেও ১৫৯৫ সনে কিসুদাস উজির হওয়ার পরেই ভূমিজরীপ ও মুদ্রাসংস্কার শুরু করেন। কিন্তু জরীপ কাজ সময়-সাক্ষেপ, কাজেই দামিন্যাগ্রামে জরীপ ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে শুরু হলে মুকুন্দরাম সপরিবার ঐ বছরেই পালিয়ে যান, এবং রঘুনাথ রায় (১৬০৩-২৩ খ্রীঃ) পিতৃবিয়োগের পরে কর্তা হলে তাঁরই আগ্রহে মুকুন্দরাম কাব্যরচনা শুরু করেন। কাজেই কাব্যরচনার শুরু ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের আগে নয় এবং সমাপ্তিও নিশ্চয়ই ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দের অনেক আগেই হয়েছিল। তাই অনুমান করি এ বৃহৎ কাব্যের দু'খণ্ড ১৬১০-১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা। অতএব, মুকুন্দরাম সতেরো শতকের প্রথম দশকের কবি।

শ্রীকবিকঙ্কণ, কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী, মুকুন্দ বা মুকন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণই কেবল ভণিতায় মেলে, পুরো মুকুন্দরাম কোথাও নেই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ যখন আরড়ায় যান, তখন তিনি সন্তানের পিতা। আমাদের অনুমান মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল রচনাকালেই উক্ত চার সন্তানের অন্তত একজন শিবরাম বিবাহিত। তাই ভণিতায় 'রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান'—এ প্রার্থনা পাই। এটি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তা হলে কবির কনিষ্ঠপুত্র মহেশ কিংবা শিবরামের পুত্রই ছিল সে-শিশু, যে কেঁদেছিল 'ওদনের তরে।' আর ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে দামিন্যায় ফিরে-আসা শিবরামের বয়স অন্তত ষাট হওয়ার কথা। এভাবে অনুমান করলে সে-বাল্যবিবাহের যুগে মুকুন্দরামের জন্ম ১৫৫৫ সনে হলে এবং তাঁর প্রথমপুত্র শিবরামের জন্ম ১৫৭৫ সনে হলে ১৫৯৬ সনের মধ্যে কবির পৌত্র জন্মাতে পারে।

বাঙালী পাঠক-সমালোচকরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কবিকঙ্কণের অনন্যতা তাঁর বাস্তব জীবন-ও প্রতিবেশ চেতনায়, ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বাস্তবনিষ্ঠ বাকচিত্রাঙ্কণে, গৃহগতজীবনে নারীর সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-অসূয়া, কাম-প্রেম প্রভৃতির সূক্ষ্ম রূপায়ণে, নিম্নবর্ণের ও মধ্যবিত্তের মানুষের জীবিকার গরজে অবলম্বিত ছল-চাতুরীর ও ধূর্ততার বিচিত্র রূপ অঙ্কনে। সবাই বলে মুকুন্দরাম সেকালের ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ একালে জন্মালে তিনি উঁচুমানের ঔপন্যাসিক হতেন—এ ধরনের প্রশংসার অনেকটাই আবেগতাড়িত। যেমন কবিকঙ্কণের আত্মকথায় এঁরা সমকালীন প্রশাসনিক দুর্নীতির বাস্তব ও সত্য চিত্র খুঁজে পান। অথচ এ-কালের গবেষণায় প্রকাশ, এ বর্ণনায় কবির আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াসই প্রকট। তা ছাড়া এমনি আত্মকথায় সমকালীন প্রতিবেশ বিবৃত হয়েছে আরো কোন কোন কবির—যেমন কৃত্তিবাসের, আলাউলের-আত্মকথায়, অন্নদামঙ্গলেও রয়েছে এমন অনেক ঐতিহাসিক বাস্তবচিত্র। কাজেই মুকুন্দরাম এ ক্ষেত্রে তখন আর একক নন। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সতেরো শতকেও উঁচুমানের ছিল না বলেই মুকুন্দরাম যখন চণ্ডীমঙ্গল লিখে অর্থাৎ ফুল্লরার দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করে, কালকেতুর অবয়ব, শক্তি ও সাহস বর্ণনা করে, মুরারিশীলের কাপট্য ও অসততা এবং ভাঁড়ুদত্তের খলতা ও ধূর্ততা দেখিয়ে আর খুল্লনার সারল্য ও বিদ্বিষ্ট সপত্নীর পীড়নচিত্র দিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করছেন, ইংলণ্ডে তখন শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকগুলো রচনা করে চলেছেন।

কালকেতুর ও ধনপতির উপাখ্যানও মুকুন্দরামের তৈরি নয়। তাছাড়া মুকুন্দরামের কালে সাহিত্যে বাস্তবজীবননিষ্ঠার কোন গুরুত্ব ছিল না। কবিদের লক্ষ্য ছিল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে অবাধে সম্ভব-অসম্ভবের, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের বেড়া-বাধা অস্বীকার করে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো রোমান্টিক কল্পনার আকাশে সানন্দে ও সোৎসাহে ঘটনা ও চরিত্র সন্ধান করে বেড়ানো। দেশ-কালের সে-কাব্য-রীতির ব্যতিক্রম কি তাঁর সচেতন প্রয়াসের, নতুন জীবন-দৃষ্টির ও জগৎ ভাবনার প্রসূন কিংবা কল্পনার আকাশে পক্ষবিস্তারের অসামর্থ্যের সাক্ষ্য? অর্থাৎ মোরগপাখি উড়তে পারে না বলেই ঘরের চার পাশে বেড়ায়, মুকুন্দরামও কি কল্পনারাজ্যে বিহারের অসামর্থ্যের দরুন তাঁর দামিন্যা-আরড়ায় দেখা মানুষ ও প্রতিবেশ অঙ্কিত করেছেন? উনিশ শতকের ইংরেজি রোমান্স-ও উপন্যাস পড়ুয়া কোলকাতার বিদ্বানেরাই প্রথম মুকুন্দরামের মধ্যে জীবনের ও প্রতিবেশের উপন্যাস-সুলভ বাস্তব দু'চারটে উক্তি ও খণ্ডচিত্র পেয়ে মুকুন্দরামকে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দেন। সেই থেকে অধ্যাপক-সমালোচকরা কেবল তারিফই করছেন আবেগচালিত হয়ে। অবশ্য মুকুন্দরাম কবি মাধবের কাছে যে নানাভাবে ঋণী, তা রমেশচন্দ্র দত্ত তথ্যপ্রমাণযোগে জানিয়ে ছিলেন।

কোন প্রশংসাই মুকুন্দরামের প্রাপ্য নয়—এমন কথা কেউ বলবে না। তবে মুকুন্দরাম যে চরম দারিদ্র্য, পরম সুখ, তীব্রতম দুঃখ প্রভৃতির আদর্শায়িত বা আত্যন্তিকতাদুষ্ট চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা সুখপাঠ্য হলেও বাস্তব নয়। সব বড় কবির ও ভালো কবির মধ্যেই আপ্তবাক্য, সুভাষিতবুলি, মন্ত্রের মতো মহৎ ও সত্য কথা কমবেশি থাকে। মুকুন্দরামের মধ্যেও তা রয়েছে এবং সব কবিই দেশ, কাল ও প্রতিবেশ প্রভাবিত। সব কবিরই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই পুঁজি। কাজেই 'নিয়োগী চৌধুরী নহি না করি তালুক, শিশু কান্দে ওদনের তরে, রায়জাদা ব্যাপারী-বৈশ্যের খেদা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হৈল অরি, মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া, খিলভূমি লিখে লাল, বিনি উপকারে খায় ধুতি, টাকায় আড়াই আনা কম, টাকাকের দ্রব্য দশ আনা, ডিহিদার নাহি দিব দেশে, সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গাপিতল।' প্রভৃতি তাঁর প্রতিভার বা সমাজবোধের অসামান্যতার সাক্ষ্য নয়।

সব মঙ্গল কাব্যাংশে দেবখণ্ড অর্থাৎ হর-গৌরীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্যচিত্র এবং মনসা চণ্ডী শীতলা বাসুলী কিংবা দক্ষিণরায় সত্যপীর চরিত্র মানবসুলভ। কাজেই এসব তাঁর কবিত্বের ও পাণ্ডিত্যের শেষকথাও নয়,।

মুকুন্দরামের আখেটিক খণ্ডই শ্রেষ্ঠ এবং সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, প্রশাসন প্রজার দায়িত্ব অধিকার ও অবস্থা, বুদ্ধিজীবীর কর, বেনেদের শুল্ক, চাষাবাদ ও খাজনা, নগরপত্তন ও বিন্যাস এবং কাছারী কর্মচারী সৈন্য যুদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনা আবিশ্যিক হয়েছে ব্যাধ কালকেতুর রাজা হওয়া প্রসঙ্গে। এটি আখ্যানের প্রয়োজনে এসেছে কবির সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবিকা সচেতনতার ফলে নয়। তবু এসব রয়েছে বলেই মুকুন্দরাম বাস্তবতার তথা সমকালীন সমাজের সমস্যার ও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা প্রভৃতির ভাষ্যকার কবি বলে চিহ্নিত ও প্রশংসিত। যদিও এ সব তাঁর সচেতন লক্ষ্যের ও উদ্দেশ্যের অন্তর্গত ছিল বলে বিশ্বাস করা কালের হিসেবে সঙ্গত নয়। কবি মুকুন্দরাম নিজেও নিয়োগী চৌধুরী রাজা মন্ত্রী পাত্র মহাপাত্র কিংবা বেনে মহাজন বিরোধী নন, তাঁর কালকেতু সদয় সুবিবেচক শাসক মাত্র। ধনপতি, শ্রীমন্ত কিংবা সিংহলের রাজা প্রভৃতি বিত্তবানদের প্রতি তাঁর কোন সচেতন বিদ্বেষ নেই, তিনি সমাজনীতি কিংবা পীড়নমুক্ত প্রজা সমন্বিত সমাজও কল্পনা করেন না, কালকেতু গরজে পড়েই প্রজা-আকৃষ্ট করবার মতলবেই সদ্য আবাদ-করা জঙ্গলে কৃষকদের নানা সুবিধে দিচ্ছে—এতে বড়জোর ব্যক্তিগত সাময়িক সহৃদয়তা, উদারতা কিংবা সহানুভূতি লক্ষ্য করা সম্ভব—কিন্তু নীতি-আদর্শগত কিছু নয়। সতেরো শতকের কবি মুহম্মদ খান রচিত রূপককাব্য 'সত্যকলিবিবাদসম্বাদে' সমকালীন সমাজের, জীবনের ও রীতিনীতির চিত্র এবং বাঞ্ছিত আদর্শের রূপরেখা আরো স্পষ্টভাবে রয়েছে। কবির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই কাব্যে অভিব্যক্তি পায়। যে-সব সুবিধা প্রজাদের দেবে বলে কালকেতু বুলন মণ্ডলকে জানাচ্ছে—তাঁর সমকালে তার বিপরীত ব্যবস্থাই যে চালু ছিল অর্থাৎ নানা অজুহাতে অর্থ আদায় করা, তাও পরোক্ষে প্রকট হচ্ছে, এজন্যে

এ অংশটুকুতে ষোল-সতেরো শতকের জমিদাব-প্রজার তথা শাসক-শোষকের ও শাসিত-শোষিতেব সম্পর্কের এবং সে-সূত্রে গ্রামীণ সমাজের আর্থিক জীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র পাই ঃ

আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাষ চষ্য
তিন সন বহি দিহ কর।
হালে হালে একতঙ্কা কাহারে না কর‍্য শঙ্কা
পাট্টায় নিশানী মোব ধর
নাহি লব বাউড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি,
ডিহিদার নাহি দিব দেশে

সালামি বাঁশ গাড়ি নানা বাবে যত কড়ি
নাহি লব তো সবার পাশে।
পাবনী পঞ্চক যত গুড়া লোন সানাউত
ধান্য কাটি কমসে কসুরে
যত বেচ চাউল ধান তার নাহি লব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।

মুকুন্দ-অঙ্কিত মুরারিশীল, ভাঁড়ু দত্ত, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা এবং চণ্ডীচরিত্রই প্রমাণ করে যে কবি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকের কর্ম ও আচরণ প্রত্যক্ষ করতেন। এ অভিজ্ঞতা ছিল বলে চরিত্রগুলো তাঁর স্বদৃষ্ট ও স্বসৃষ্ট হয়েই বিশিষ্ট ও জীবন্ত হয়েছে।

তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য রয়েছে সমাজ, ব্যক্তি, প্রকৃতি, ঘটনা, চরিত্র বর্ণনের প্রাঞ্জলতায় ও স্পষ্টতায়। স্বল্পকথায় বাকপ্রতিমা নির্মাণ এবং উদ্দিষ্ট বক্তব্যের অভিব্যক্তিই শক্তির পরিচায়ক। যেমন ঃ কালকেতু শিকারে ব্যর্থ হয়ে শূন্যহাতে ফিরবার পথে 'যাইতে মহাবীর খায় বনফুল'।

১. মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল
দুঃখিনী ফুল্লরা আছে মোর প্রতিআশে।
২. কি লাগিয়া বীর পাপে দিলা মন
আজি হৈতে হৈলে তুমি লঙ্কার রাবণ।

৩. শিয়রে কলিঙ্গরায় বড় দুরাচাব
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার।
৪. মুরারি ধনের পাইয়া বাস
আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেগে খিড়কীর পথে।
৫. ঘরেতে নাহি পোতদার
কালি দিব মাংসের উধার।
কাষ্ঠ আন্য একভার
একত্র শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর।
৬. ধর্মকেতু দাদা সনে কৈলুঁ লেনাদেনা
তাহা হৈতে ভাইপো হৈয়াছ সেয়ানা।
ভাঁড়ুর পরামর্শ ঃ
৭. যখন পাকিবে খন্দ
পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধানে দিবে লাগা।
৮. খুড়া তিন গোটা শর ছিল
একখান বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাঁস।
ভাঁড়ুর প্রতিজ্ঞা ঃ
৯. হরিদত্তের বেটা হঙ জয়দত্তের নাতি
হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাতী।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।

ভাঁড়ুর মায়াকান্না ঃ
১০. খুড়া তুমি হৈলে বন্দী
অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার (ভাঁড়ুপত্নী) নাহি খায় ভাত।
১১. সতীন কোন্দল করে
দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
১২. (কালকেতু) গ্রাসগুলি তোলে
যেন তে-আঁটিয়া তাল।
১৩. সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ
নাহি মানে
অবশেষে ওই তোরে বধিবে পরাণে।
১৪. একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
১৫. কোপেতে উন্মত্ত হয়্যা
বলা অনুচিত।
১৬. (গৌরী) ক্রোধে কম্পমান
তনু বলেন তখন
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান।
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা
আজি হৈতে তোমার দুয়ারে
দিনু কাঁটা।

৫. দ্বিজ রামদেব

আমাদের ধারণা দ্বিজ রামদেব কোন স্বতন্ত্র কবি নন। কবিযশ লোভে দ্বিজ মাধবের কাব্যের এখানে সেখানে সামান্য পরিবর্তন বা সংযোজন করে ভণিতায় স্বনাম বসিয়েছেন তিনি।

ইনি 'কবি বিধসুত'। কবিচন্দ্রের পুত্র অর্থে গ্রহণ করলেও কোন কিনারা মেলে না। কবি বিধু বা কবিচন্দ্র কোন গ্রন্থ রচয়িতা তা বলা হয় নি, কবিচন্দ্র নামের একাধিক কবির সন্ধান মেলে। তাঁদের মধ্যে এক কবিচন্দ্রমিশ্র ১৪৯৭ খ্রীস্টব্দে হোসেন শাহর সময়ে তাঁর গৌরীমঙ্গল রচনা করেন। দ্বিজ রামদেব তাঁর সন্তান হতে পারেন না, কারণ তাঁর গ্রন্থ রচনাকাল 'ইন্দু বাণ ঋষি বাণ' অর্থাৎ ১৫৭৫ শকাব্দ বা ১৬৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ। পিতা-পুত্রের জীবৎকালে দেড়শত বছরের ব্যবধান থাকতে পারে না। দ্বিজ রামদেব কালকেতুর গুজরাটনগরে কবির নিজের সমকালের 'ফেরাঙ্গি, মঘ, তেলঙ্গ, ত্রিপুর' প্রভৃতির জন্যেও ঠাঁই করে দিয়েছেন।

৬. রামানন্দ যতি

আঠারো শতকের শেষার্ধে গোটা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে নীতি, আদর্শ ও রুচির ক্ষেত্রে এক অনন্য দ্রোহীর আবির্ভাব ঘটে। মধ্যযুগে মুদ্রণ-যন্ত্রের অভাবে সাহিত্য সমালোচনা ছিল অভাবিত। তা ছাড়া পাঠক শ্রোতার পক্ষে মৌখিক নিন্দা বাক্য উচ্চারণেও ছিল সংস্কারের বাধা। কারণ কবিগণ ছিলেন সাধারণভাবে দেবতা-অবতারের স্বপ্নাদিষ্ট—কেউ তাঁদের পাচাঁলীর নিন্দা করলে কিংবা ক্রটি ধরলে তাকে সবংশ নিধন বা বিনাশ করার আশ্বাস দিতেন কবিকে স্বয়ং আদেষ্টা দেবতা।

এমনি অবস্থায় এক সংস্কারমুক্ত সাহসী রামায়েৎ সন্ন্যাসী মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের দোষক্রটি উল্লেখ করেও মুখ্যত মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের অনুসরণে ও অনুকরণে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন, 'চণ্ডীর আদেশ প্যায়া রামানন্দ কয়'। তা হলে রামানন্দ যতিও পুরো বিদ্রোহী নন বরং প্রতিবাদী কবি। 'গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।' অতএব তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৮৮ শক বা ১৭৬৬- ৬৭ খ্রীস্টাব্দ। রামানন্দ যতির প্রতিবাদের বা দ্রোহের কারণগুলো এরূপ ঃ

১. পাঁচালিতে আদিরসের আধিক্য ঃ

আদিরস প্রকাশে মূঢ়ের মন মজে
তেঞি কবি সকলে সেই রস ভজে।

২. মুকুন্দরামের কাব্যের ক্রটির ফিরিস্তি দিয়ে কবি বলছেন ঃ

বুঝ্যা দেখ মুকুন্দের মতে দোষ যত
প্রত্যেকে লিখিয়া আমি বুঝাইব কত।
যে যে ঠায় লিখিলাম তার বিপরীত
যতি বলে বিবেচনা করিবা পণ্ডিত।

৩. রামানন্দ করে খেদ... নাহি দেখি বিজ্ঞ লোক
মূর্খের হাতেতে যাবে প্রাণ।

৪. ছন্দজ্ঞান থাকে যার। থাকে মিত্র অক্ষরের জ্ঞান' কেবল
'সেই করো বিবেচনা' আর 'মূর্খ হৈতে হৈয় সাবধান'।

৫. এবার যতি-উক্ত মুকুন্দরামের ক্রটির নমুনা দিচ্ছি ঃ

১. মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কাঁটাবন
সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কন্টকে তাকে
দংশিয়া তাকে করিল ব্যাকুল।

২. কলিঙ্গেতে গুজরাট তাহে বাঙ্গালীর হাট
বসিল ছাপ্পান্ন গাঞি রাঢ়ী।

না জানে কলিঙ্গরায় বন কাটাইয়া তায়
কালকেতু করিলেক বাড়ী।

৩. কালীদহ পুরে কালী মাকে দেয় এত গালি
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবর।

৪. চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।

এমনি অনেক অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অসঙ্গতির সাক্ষ্য রয়েছে মুকুন্দরামের কাব্যে

তাই--- এতদোষ উদ্ধারিতে লোকেরে চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।

এবং যতি--- লোকহিত হেতু করে ভাষাগীত।[১]

৭. কৃষ্ণরাম দাস[২]

বহু পাঁচালীপ্রণেতা কৃষ্ণরাম দাস মুখ্যত রায়মঙ্গলের কবি হিসেবেই প্রখ্যাত। তাঁর অন্যান্য কাব্য হচ্ছে কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। নামেই প্রকাশ এক এক পাঁচালীতে তিনি এক একজন লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণন করেছেন। কৃষ্ণরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর পূরো পুথি আজো সংগৃহীত হয়নি, কেবল কমলেকামিনী ও অষ্টমঙ্গলার সামান্য অংশ পাওয়া গেছে। একটি ভণিতা এরূপ ঃ

নাম ভগবতীদাস নিমিতা গ্রামেতে বাস
কায়েস্থ কুলেত উৎপত্তি
হইয়া ত একচিত রচিলা চণ্ডীর গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।

অন্যান্য কাব্যরচনার ইঙ্গিতও রয়েছে প্রাপ্ত পুথিতে ঃ

কালীর পাঁচালী আদি রচিনু সকল
অধিক যতনে এই চণ্ডীর মঙ্গল।

১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কালিকামঙ্গল রচিত। অতএব চণ্ডীমঙ্গল সতেরো শতকের শেষপাদে রচিত বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়, প্রাপ্ত অংশেও কিছু আপ্তবাক্য মেলে ঃ

না থাকিলে নয়ন মুকুরে করে কি ?
গায়েনের গুণ কি বুঝিতে পারে কালা ?
খোজার না হয় সুখ সুরত প্রসঙ্গে।
সুজনের দৃঢ় বাক যে পাষাণেব আঁকা।

৮. মুক্তারাম সেন[১]

মুক্তারাম সেনের চণ্ডীপাঁচালীর কবিপ্রদত্ত নাম 'সারদামঙ্গল'। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার দেবগ্রামে ছিল কবির নিবাস। তার গ্রন্থ রচনাকালে চট্টগ্রামের প্রশাসক ছিলেন দেওয়ান মহাসিংহ---'মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ-অধিকারী'। এসময়কার সেনানী ছিলেন 'তেন মত

---

১ *রামানন্দ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'--- অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে।*

২. *কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী ঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৮ সনে কলি. বিশ্ব. প্রকাশিত।*

১ *সারদামঙ্গল ঃ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩২৪ সন।*

প্রতিসৈন্য লারানন্দরাম'। তাঁর গ্রাম ঃ 'বন্দহুঁ জনমভূমি দেবগ্রাম নাম।' কবির গোত্র—'আদ্য গোত্র-আদ্য সেন ভেষজ বিশ্রাম।' কবির প্রপিতামহ জয়দেব, পিতামহ নিধিরাম ছিলেন রাঢ়বাসী। রাঢ়বাসী পিতা মধুরামই 'তিন, পুত্র লৈয়া কৈল দেয়াঙ্গ (দেবগ্রাম) বসতি'। 'সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম'। [কবির ভ্রাতৃ বংশধরদের রক্ষিত বংশপত্রিকা সূত্রে পূর্বপুরুষ যাদব রায় ও মাধব রায়ের কথা রয়েছে] পিতার সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় থেকে আগত বলেই দ্বিজমাধব বা রামদেবের মতো চট্টগ্রামে সদ্য নিবসিত মুক্তারাম সেন চণ্ডীমঙ্গল রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। পুরুষানুক্রমে পূর্ববঙ্গে বা চট্টগ্রামে বাস এমন কেউ 'চণ্ডীমঙ্গল' তথা কালকেতু-ধনপতি আখ্যান দুটো রচনা করেননি। সারদামঙ্গলে রচনাকালও রয়েছে ঃ

গ্রহ ঋতু কাল শশী শুভ জানি
মুক্তারাম সেনে ভাণ ভাবিয়া ভবানী।

(গ্রহ-৯, ঋতু-৬, কাল ৬ (শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য শশী—১। অতএব ১৬৬৯ শক বা ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে সারদামঙ্গল রচিত। কবিত্ব সুলভ নয়, তবে কবি মিতবাক।

৯. দ্বিজ হরিরাম

ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ প্রভাবিত একজন কবি। সতেরো শতকের শেষপাদে (১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে) শোভাসিংহের (মৃত্যু ১৬৯৬ খ্রীঃ) প্রতিপোষণে দ্বিজ হরিরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। প্রাপ্তপুথির লিপিকাল নাকি ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দ। রচনা গতানুগতিক ও বৈশিষ্ট্যহীন। শোভাসিংহের মতো কবিও হয় তো মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের লোক।

১০. জয়নারায়ণ সেন

যশোহর থেকে এসে ঢাকার বিক্রমপুরে বাসকারী এক সেনবংশের সন্তান জয়নারায়ণ সেন হরিলীলা রচনা করেন ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে (১৬৯৪ শকে)। হরিলীলায় বিস্তৃত বংশপরিচিতি ও তাঁর সাহিত্যকৃতির বর্ণনা রয়েছে। তাঁর হরিলীলার সূত্রে জানা যায় কবি একখানি চণ্ডীর পাঁচালীও রচনা করেছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল বৈশিষ্ট্যহীন, তবে এ চণ্ডীমঙ্গলে সংযোজিত মাধব-সুলোচনা উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। জয়নারায়ণের চণ্ডীমঙ্গল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ১৭৬০-এর দশকে রচিত বলে অনুমান করা চলে।

১১. ভবানীশঙ্কর দাস

ভবানীশঙ্কর দাসের গীতিরচনার কাল এই—
'ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে।

(ধাতা—১ বিন্দু-০ সাগর—৭ ইন্দু—১) =১৭০১ শকে বা ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর মঙ্গলচণ্ডীর পঞ্চালিকা চণ্ডীমঙ্গলগীত বা জাগরণ নামেও নাকি পরিচিত। কবি বর্ণে কায়স্থ। চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলীর মোহনাস্থ বটতলী গ্রামে পূর্বপুরুষ নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দই বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতামহ মধুসূদন বটতলী থেকে এসে বর্তমান পটিয়া থানার নিকটবর্তী ছনহরা গাঁয়ে বাস করেন। কবির জন্ম এখানেই। তাঁর কাব্যটি কলেবরে বৃহৎ এবং কবি যে সংস্কৃত ব্যাকরণনিষ্ঠ ও পাণ্ডিত্যপ্রিয় ছিলেন, তার সাক্ষ্য কাব্যের সর্বত্র সুলভ।

১২. কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী

কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী নামের এক কবির ও কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে (সং ৬, পৃ : ৫৭৩-৮১)।

ভণিতা এরূপ ঃ চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন।

'চণ্ডিকাদেবীর আদেশে' মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল এলাকার বরদাগ্রামবাসী কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী বর্ধমানের মহারাজা জগৎ রায়ের পুত্র কীর্তিচন্দ্রের বংশধর রাজা তিলকচন্দ্রের পুত্র তেজশ্চন্দ্রের সময়ে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। এই তেজশ্চন্দ্র ১৭৭০-১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ অবধি মহারাজা বা জমিদার ছিলেন। অতএব আঠাবো-উনিশ শতকের সন্ধিকালে অথবা উনিশ শতকের প্রথমপাদে এ কাব্য রচিত। সেকারণেই অর্থাৎ অতিক্রান্তকালের অকাল প্রসূন এ কাব্যের আলোচনা নিরর্থক। কবির তিনপুত্র রামদুলাল, রামচন্দ্র ও শিবানন্দ। কবীন্দ্র অকিঞ্চনের ভাঁড়ু আরো দুর্দান্ত ঃ

হাটঘাট হৈল ভাঁড়ুর আজ্ঞাকারী
কাপড্যার কাপড় কিনিয়া আনে ছলে
কড়ি নাঞি দেয় তারে কলমের বলে।
ধূর্ত বুদ্ধ্যে ধান কিনে ধার নাহি শুধে
মাগিলে মালের টাকা মার‍্যা প্রাণ বধে।

১৩. দ্বিজ জনার্দন

দ্বিজ জনার্দন সম্ভবত আঠারো শতকের কবি। তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর ও ধনপতির উপাখ্যান দুটো সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্য বর্জিত। এ জন্যে তাঁকে কোন কোন বিদ্বান প্রাচীনতর কবি বলে মনে করেন। কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি।

একাদশ অধ্যায়

মনসামঙ্গল

প্রথমখণ্ডে মনসামঙ্গলের তিনজন আদি কবির পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা চাঁদবেহুলা কাহিনীর অনন্যতার আলোচনা করেছি। মনসামঙ্গলের কাহিনী কর্তৃত্বকামী পরাক্রান্ত দেবতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়ী স্বাধীনচেতা মানুষের দ্রোহের ও সংগ্রামের ইতিকথা। দেব-মানবের সেই সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে মানবিকতার মর্যাদা, মহিমান্বিত হয়েছে মনুষ্যত্ব। একেশ্বরবাদী আত্মপ্রত্যয়ী পরাক্রান্ত তুর্কীদের সঙ্গে পরিচয় মুহূর্তের প্রথম অভিঘাতে শাসক-শাসিতের মানসদ্বন্দ্বের ও মিলনের সন্ধিক্ষণে ক্ষণপ্রভার মতো দেশী লোকের মানসে আত্মশক্তির ও আত্মমর্যাদার যে-চেতনা জাগে, চাঁদ-বেহুলার বিদ্রোহে ও দৃঢ়সংকল্পে তা-ই বিস্ময়কর ঋজুতায়, দৃঢ়তায় ও উজ্জ্বলতায় অভিব্যক্ত। তারপরে যখন বিদেশী বিভাষী বিধর্মী শাসকের ও শাসিতের পরিচয় ও সম্পর্ক কালক্রমে প্রাত্যহিকতায় ম্লান ও স্বাভাবিক হয়ে এল, তখনো বহুকবির পরিচর্যায় মনসার ও মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু ওই দ্রোহ হারায় তাৎপর্য এবং ওই সংগ্রাম হারায় গুরুত্ব। ততদিনে মনসাভক্তি চাঁদ-বেহুলাকে তথা কবিদেরকেও দুর্বল আর অভিভূত করে ফেলেছে। যদিও বর্ণিত উপাখ্যান বাহ্যত অভিন্নই রইল। তবু পুচ্ছগ্রাহিতায় ও গতানুগতিকতায় অবসিত হওয়ার আগে কবি নারায়ণদেবের ও দ্বিজ বংশীদাসের পাঁচালী দুটো কিছু বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

১. নারায়ণদেব

নারায়ণদেবের জন্ম হয় রাঢ়ে অথবা বর্তমান কিশোরগঞ্জ মহকুমার তাড়াইল থানার অন্তর্গত বোরগ্রামে। তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কবির জন্ম হয় কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোরগ্রামে। পূর্বপুরুষ উদ্ধারণ রাঢ় থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। ভৌগোলিক কারণেই তাঁর কাব্য আসামে চালু ও জনপ্রিয় হয়েছিল, আসামীরা তাঁকে আসামী কবি রূপেই জানে ও মানে। যে-অর্থে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি, সে-তাৎপর্যেই নারায়ণদেব আসামী ভাষার কবি। বাঙলা-আসামে পরিব্যাপ্তকাব্যের কবি সম্ভবত ষোল শতকের ঊষাকালেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, যখন আসামী তথা অহমিয়াবুলি বাঙলাভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সত্তায় আত্মপ্রকাশে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। নারায়ণদেব রচনাকাল উল্লেখ না করলেও সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে ঃ

নারায়ণদেব কয় জন্ম মগধ (মূর্খ অর্থে)
মিশ্রপণ্ডিত নহে ভট্ট বিশাবদ।
অতিশুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর
মৌদগোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর।
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিনী মোর মাতা।
পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি
রাঢ় তেজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি।

বিভিন্ন পুথির সাহায্যে ডক্টর সুকুমার সেন কর্তৃক পুনর্গঠিত পাঠ ঃ

নারায়ণ দেবে কহে জন্ম মগধ
মিশ্রপণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ।
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থ ঘর
মৌদগল্য গোত্র মোর গাঞি গুণাকর।
নরহরি তনয় হয় নরসিংহ পিতা
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিনী মোর মাতা।
বৃদ্ধপিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ
রাঢ়দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন।
পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি
রাঢ় ছাড়িয়া বোরগ্রামেতে বসতি।

[১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ ২২৩ সং ৩।]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বোরগ্রামে নারায়ণদেবের আঠারোতম প্রজন্মের বংশধরের সন্ধান পেয়েছেন। বংশলতিকা[১] যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তা হলে নারায়ণদেবের জন্ম পনেরো শতকের শেষপাদে এবং গ্রন্থরচনা ষোল শতকের প্রথম দশকে বলে অনুমান করা চলে। এ অনুমানের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে কবির গোপ-কৃষ্ণভক্তিতে। ভাগবত ষোলশতকেই বাঙলায় জনপ্রিয় হয়। কাব্যরচনায় স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

বার বৎসরকালে দেখিলাম স্বপন
মহাপরিশ্রম [?] মনে হইল দরশন।।
শিশুকালে গোপরূপে হাতে লৈয়া বাঁশী
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি।
তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন
কবিত্বের আশা মোর সেহি ত কারণ।

নারায়ণদেবের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। এটি তিনভাগে বিভক্ত এবং কাহিনীর তেমন কোন বন্ধনসূত্র নেই। প্রথম ভাগে রয়েছে কবির আত্মকথা ও দেবতাস্তুতি এবং দ্বিতীয়ভাগ পৌরাণিক আখ্যানসমষ্টি, এটিই এ পাঁচালীর প্রধান অংশ। আর তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে চাঁদ-বেহুলার উপাখ্যান। এ কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবি মনসা-কাহিনীকে পুরাণের মর্যাদায় ও গুরুত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু গ্রন্থির অভাবে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যাবর্তনের স্বল্প কাল পরে পুনর্জীবিত স্বামীসহ বেহুলার মর্ত্যজীবনের অবসান বা স্বর্গারোহণ এবং মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্রোহী চাঁদ এক বালিকার কৃচ্ছ্রসাধনার ও সিদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে— মনসার কাছে নয়, তাই অনিচ্ছায় বেহুলার খাতিরে মনসাকে বাম হাতে প্রণাম করেছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে 'পিছ দিয়া বামহাতে তোমাকে পূজিব।' উন্নতশির বিদ্রোহী চাঁদকে এ মর্যাদা গৌরব আর কোন কবি দেন নি।

অন্য অনেকের জনপ্রিয় পাঁচালীর মতো নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণেও নানা কবির কাব্যাংশ ও ভণিতা সংযোজিত হয়েছে। গায়েন-কথক-লিপিকরই কথক-তাকে রসাল করার প্রয়োজনে নানা কবির উৎকৃষ্টাংশ সংকলন করে ষটকবির কিংবা বাইশকবির মনসামঙ্গলও তৈরি করেছিল পরবর্তীকালে। কাজেই বিভিন্ন কবির একই বিষয়ক পাঁচালীর বিভিন্নাংশের মিশ্রণ গায়েন-কথকদের প্রয়োজনে রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। গায়েন-কথকরাও রচন-বর্জন-সংযোজনের অধিকার রাখত। তাই নারায়ণদেবের পুথিতে বংশীদাস, জগন্নাথ, জানকীনাথ, যদুনাথ, ষষ্ঠীবর, বিদ্যাধর, রামদাস, মনোহর, শিবানন্দ প্রভৃতি অনেকের ভণিতা মেলে।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ পূর্ববঙ্গে ও আসামে প্রায় সমভাবে চলছে। করুণরসের আধিক্য এবং ব্যঙ্গরসের ভিয়ান ও কাব্যকে সুখপাঠ্য করেছে। আর জনপ্রিয়তাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক হয়, তা হলে নারায়ণদেবকে একজন শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতেই হবে।

২. গঙ্গাদাস সেন

কবি ষষ্ঠীবর সেনের পুত্র গঙ্গাদাস সেন একখানি অশ্বমেধপর্বও রচনা করেছিলেন। তাতে রচনাকাল রয়েছে—

শর মুনি বেদ শশী শক গণিত
যেইমতে অশ্বমেধ রচিল কবিত্ব।
কুলপতি সেনসুত কবি ষষ্ঠীবর
সর্বলোকে জানে তান দিনিদ্বীপে ঘর।

১৪৭৫ শকে বা ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে যদি অশ্বমেধপর্ব রচিত হয়, এবং তার কিছু পূর্বে বা পরে মনসার ভাসান রচনা করেছিলেন বলে যদি অনুমান করি, তা হলে ষোল শতকের মধ্যকালে মনসামঙ্গল রচিত হয় বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে। অতএব গঙ্গাদাস সেন ষোল শতকের মধ্যকালের কবি। ঢাকা জেলার আধুনিক জিনারদিই কবির জন্মস্থান দিনিদ্বীপ। কবির মনসা পাঁচালীর সম্পূর্ণ পুথি আজো পাওয়া যায় নি।

---

১. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ ঃ ৩২২, সং-৬*

৩. দ্বিজ বংশীদাস

ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গাঁয়ে দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম। রামায়ণগাথা রচয়িত্রী প্রখ্যাত কবি ও চন্দ্রাবতী গীতিকার নায়িকা চন্দ্রাবতী এই দ্বিজ বংশীদাসেরই কন্যা। বংশীদাসের মুদ্রিত কাব্যে—

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।

—এই রচনাকাল দেয়া রয়েছে। এ থেকে ১৪৯৭ শক বা ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ মেলে। কিন্তু বংশীদাসের অন্য উক্তিতে এর সমর্থন নেই। বংশীদাস বলছেন তাঁর পূর্ব-পুরুষ ঃ

রাঢ় হৈতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ
হাজরাদি পাতুয়ারী গ্রামেতে নিবাস।

কোচরাজ লক্ষ্মণ হাজরাকে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যাংশ নিয়ে ঈসা খান এ হাজরাদি পরগনা গঠন করেন। অন্যত্র কবি মঘ ফিরিঙ্গির উল্লেখও করেছেন।

মঘ ফিরিঙ্গি যত। বন্দুক পলিতা হাত। একেবারে দশগুলি ছুটে
শিলই হাউই দবা। স্থানে স্থানে করে শোভা। গণ্ডগোল কাল ক্রিয়া ঠাটে।

কাজেই হাজরাদি পরগনার পাতুয়ারীনিবাসী দ্বিজ বংশীদাস সতেরো শতকের প্রথমার্ধের কবি। দ্বিজ বংশীদাস তাঁর গোত্রপরিচয় দিয়েছেন ঃ

বন্দ্যঘটি গাঁই গোত্র রাঢ়ীর প্রধান
শাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান।
গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর
দাস উদ্ধব ধারা সামবেদ পর।
বংশবীজ পূর্বে গোঁসাই চক্রপাণি
ভূত ভবিষ্যৎ আদি ত্রিকাল যে জ্ঞানী।

কন্যা চন্দ্রাবতীও বংশপরিচয় দিয়ে নিবাসনির্দেশ করে দারিদ্র্যের দুঃখ বর্ণনা করেছে ঃ

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরনী
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।

কবি বংশীদাস ভট্টাচার্যের পিতা যাদবানন্দ ভট্টাচার্যও মনসার ভাসান গেয়ে জীবিকা অর্জন করতেন। কবিও সে-পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, কেনারাম দস্যু গাথাসূত্রে আমরা সে-খবর জানি এবং ওই গাথাই বংশীদাসের কাব্যের এবং গায়েন হিসেবে কবির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। বংশীদাসের চাঁদসদাগর চণ্ডী-পূজক। মনসার পূজায় তার আপত্তি ছিল না। চণ্ডী অসূয়াবশে শিবকন্যা মনসার পূজা করতে নিষেধ করেন ভক্ত চাঁদকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে। তাই চাঁদ মনসাবিদ্বেষী। এ কাব্যে সংকল্পে দৃঢ় নির্ভীক চাঁদ দৃপ্ত পৌরুষের প্রমূর্ত প্রতীক। ছয়পুত্র সর্পদংশনে মরল, চাঁদ অবিচল এবং দৃপ্তকণ্ঠে বলে 'কানীর উচ্ছিষ্টপুত্র শীঘ্র কর পার'। শুধু তাই নয়, চৌদ্দ ডিঙ্গার মৃত মাঝি-মাল্লার আত্মীয়-পরিজনকে কাঁদতে দেয়নি চাঁদ এই বলে যে 'কাতর হইলুঁ জানি হাসিবেক লঘু কানী / সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ।' বংশীদাসের কাব্যে পৌরাণিক আখ্যানের নিষ্ঠ ও সুদীর্ঘ অনুসৃতি রয়েছে।

৪. সম্প্রতি রায়বিনোদ নামের বা উপাধিধারী এক কবির মনসার ভাসান অভিসন্দর্ভরূপে সম্পাদনা করে প্রকাশিত করেছেন ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। এ কবি টাঙ্গাইল অঞ্চলের এবং একে সতেরো শতকের কবি বলে অনুমান করা হয়েছে। ইনি তাঁর বিপুল কলেবর কাব্যে গল্পের কোথাও কোথাও বয়ানের প্রসার ঘটিয়েছেন। তবে কবিত্ব এ কাব্যে সুলভ নয়।

৫. কালিদাস

মনসাপূজা ও মনসামঙ্গল মুখ্যত পূর্ববঙ্গের দান ও সম্পদ। তবু পশ্চিমবঙ্গেও কেউ কেউ সতেরো শতক থেকে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ রচনা করতে থাকেন। সতেরো শতকের অন্তিমলগ্নের কবি কালিদাস যদিও বলেছেন ঃ 'কহে কবি কালিদাস/গৌড়দেশে যার বাস/ বিরচিল মনসামঙ্গল।' তবু তার কাব্যের স্থানসম্পর্কিত সাক্ষ্যে মনে হয় তিনি বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের লোক। কালিদাসের কাব্য রচিত হয় ১৬১৯ শকে বা ১৬৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে।

অঙ্ক [ক্ষ] মৃগাঙ্ক রস মৃগাঙ্ক শকে (অঙ্ক-৯ মৃগাঙ্ক-১ রস -৬) বা 'গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা (গ্রন্থ-৯ বিধু-১ ঋতু-৬, শশী-১= ১৬১৯ শক) এই শাকে এই কাব্য করিলুঁ রচনা।'

কার্তিক নামের এক ব্রাহ্মণের আগ্রহে এ পাঁচালী রচিত এবং বহু ভণিতায় গোলকনাথের চরণবন্দনা রয়েছে ঃ

গোলোকনাথের পদপঙ্কজ স্মরণে,
মনসামঙ্গল কবি কালিদাস ভণে।

এ কাব্যে উল্লেখযোগ্য কোন বিশিষ্টতা নেই।

৬. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

রাঢ়ের বর্ধমানের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল মনসাবিষয়ক প্রথম মুদ্রিত (১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে) গ্রন্থ হওয়ার ফলে কবি প্রখ্যাত হন এবং কাব্যটি জনপ্রিয় হয়। তা ছাড়া ক্ষেমানন্দই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে রচিত মনসামঙ্গলের প্রথম কবি। এ কারণেই তাঁর পাঁচালী কোলকাতায় প্রথম মুদ্রিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে।

ক্ষেমানন্দ কাব্যক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অনুকারক অনুসারক ছিলেন। তাঁর আত্মপরিচিতি অংশটি মুকুন্দরামের আত্মকথার আদলে রচিত। ক্ষেমানন্দ বর্ণে বা জাতে কায়স্থ ছিলেন ---তা দেবীর কাছে তাঁর প্রার্থনা থেকে জানা যায় ঃ 'কেতকার বাণী। রক্ষ ঠাকুরাণী। কায়স্থ যতেক আছে।' প্রথমে মুচিনীর বেশে কেতকা [কেয়া পাতে জন্ম হৈল (তাই) কেতকাসুন্দরী] তথা মনসা কবিকে দর্শন দান করেন এবং পরে ভুজঙ্গভূষিতা, ব্রাহ্মণীরূপে দেখা দিয়ে আদেশ করলেন 'ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ, আমার মঙ্গল গায়্যা বুল'। কেতকাভক্ত কবি কেতকাদাসরূপে পরিচিত হতে চেয়েছেন। তাই ভণিতায় তিনি কেতকাদাস বা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কবিপ্রদত্ত আত্মবিবরণী থেকে কবির আবির্ভাব কাল অনুমান করা সহজ ঃ

শুন ভাই আদ্য কথা দেবী হৈলা বরদাতা
সহায়পূর্বক বিষহরি।
বলভদ্র মহাশয় চন্দ্রহাসের তনয়
তাহার তালুকে ঘর করি।
তাহার রাজত্যি শেষ চলি গেল স্বর্গদেশ
তিন পুত্রে দিয়ে অধিকার
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায় পুণ্যের অবধি তায়
রণে বনে বিজয় সংসার (তাহার)
তিনপুত্র অল্প বয়ঃ প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লিখাপড়া
তাহার কলমবশে প্রজা নাহি চাষ চষে
শমননগর হৈল কাঁথড়া।
রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ
যুক্তি করি জননীজনক
দিনকতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই
দেয়ানে হইল বড় ঠক।
শ্রীযুত আস্কর্ণ রায় অনুমতি দিল তায়
যুক্তি দিল পালাবার তরে
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে।
প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইবা মাত্র
পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল
প্রসাদ হরিষ হয়্যা যুক্তি দিল আশ্বাসিয়া
ধান্য কিছু না দিলা সম্বল।
নিজগ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথ পুর পাই
প্রাতঃকাল নিশি অবসান

তথায়েত নীলাম্বব (তথা তেলী লম্বোদর)
উত্তরিতে দিল ঘর
হাঁড়ি চাল সিদা গুয়া পান।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই
নাম তার রায় ভরামল (ভারামল্ল)
তিহোঁ দিলেন ফুল (গুয়া) পান আর
গ্রাম তিন খান
লিখাপড়া বসতির স্থল।

বারা খান দক্ষিণ রাঢ়ের সেলিমাবাদের প্রশাসক ছিলেন। ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে বারা খান কবি মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে বিশ বিঘা জমি দান করে যে দানপত্র দিয়েছিলেন তা পাওয়া গেছে। এর পরে কোন সময়ে বারা খান নিহত হন। এবং বিষ্ণুদাস আর ভারামলও সতেরো শতকের মধ্যভাগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বৈষ্ণব প্রভাবিত কবি। অতএব ক্ষেমানন্দ সতেরো শতকের শেষার্ধের বা শেষ পাদের কবি। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের বিভিন্ন পালা বহনযোগ্য স্বতন্ত্র পুথিরূপে চালু ছিল। আগেই বলেছি ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল চাঁদ-বেহুলাব প্রথম মুদ্রিত উপাখ্যান বলেই কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ উনিশ শতকে সর্ববঙ্গীয় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে কাহিনীবিন্যাসে কিংবা চরিত্রচিত্রণে অথবা কাব্যরসে তেমন কোন নতুনত্ব বা উৎকর্ষ দেখা যায় না। বরং তিনি যে অনুকারক কবি তার নমুনা গ্রন্থের অনেক স্থলেই সুলভ। যথা, মুকুন্দরাম যেমন বাঙ্গাল মাঝিমাল্লার বিলাপের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন (কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই) প্রায় অবিকল তেমনি বর্ণনা মেলে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যেও

বাঙাল কান্দে হুডুর বাফৈ বাফৈ
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙাল
সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙাল...
ধূলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙাল বলে
সাত গাট্যা টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে।
আর বাঙাল বলে ভাই ঐ তাপে মরি.
আর বাঙাল বলে গেল ছেঁড়া কাঁথাখানি বিদেশে হারানু প্রাণ চাঁদ বান্যার পাকে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের চাঁদ যদিও বলে

যে হাতে পূজিনু মুই সোনার গন্ধেশ্বরী
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি।

কিংবা লখাইর মৃত্যুতে চাঁদ যদিও নাচে এবং বলে

নাচে হেঁতালের বাড়ি লৈয়া...
নির্ভয় হৈনু মনে চেঙ্গমুড়ী কানী সনে
এতদিনে বিবাদ ঘুচিল।

তবু ক্ষেমানন্দের চাঁদ নিতান্ত সাধারণ দুর্বলচিত্ত লোভী মানুষ—

'গলায় কাপড় দিয়া সদাগর দাণ্ডাইয়া
মনসারে বলে স্তুতিবাণী...
হারা-মরা পাইনু তোমার আশীর্বাদ
পূজিব তোমার পদ বড় মোর সাধ।

বিদ্রোহী চাঁদের কৃতজ্ঞ চাঁদে পরিণতি আমাদের হতাশ করে।

৭. ক্ষেমানন্দ

অপর এক ক্ষেমানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত বেহুলার পাঁচালী পাওয়া গেছে। এটি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদে বাঙলা-বিহারের সীমান্ত এলাকার কোন কবিযশপ্রার্থী ক্ষেমানন্দের রচনা। তাই প্রাপ্ত পুথির হরফ দেবনাগরী এবং প্রাপ্তিস্থান মানভূম জেলার লাড়াপাবড়াগ্রাম। সংগ্রাহক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় এ কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে (১৩১৬ সালে)।

৮. বিষ্ণুপাল

বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের অপর এক কবি বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল সম্ভবত আঠারো শতকের শেষে রচিত। বাঙলা-বিহার সীমান্ত এলাকার ছাপ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি স্থানিক প্রভাবে ধর্মঠাকুরপন্থেরও চিহ্ন দুর্লক্ষ্য নয়। কাব্যের ভাষা গ্রাম্যতাদুষ্ট। জনশ্রুতি অনুসারে কবির নিবাস ছিল রানীগঞ্জের নিকটবর্তী সেরগড় পরগনায়। কবি বর্ণে বা জাতে ছিলেন কুমার।

৯. দ্বিজ রসিকমিশ্র

আঠারো-উনিশ শতকের এ কবির নিবাস ছিল সেনভুম ও মল্লভূমের মধ্যবর্তী আখড়াশাল। কবির উপাধি ছিল কবিকঙ্কণ ও কবিবল্লভ। কবির পিতার নাম শিবপ্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গের অন্য অনেক কবির মতো ইনিও ধর্মঠাকুরপন্থ প্রভাবিত কবি। এঁর মনসাপাঁচালীর নাম জগতীমঙ্গল।

১০. দ্বিজ কবিচন্দ্র

ইনিও মনসার আদেশে এক জগতীমঙ্গল রচনা করেন। এক শাহাজাদা রাঢ়ের সেনভূম এলাকায় পানাগড় দুর্গাপুর অঞ্চলে রাঢ়েশ্বর শিবমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকশ্রুতি আছে, সম্ভবত কবি সেই শাহাজাদাকে তাঁর পুর্বপুরুষ বলে দাবি করছেন ঃ

সাজাদা রাএর বংশে কবিচন্দ্র গায়
মোর সুত রঘুবীরে হইবে সদয়।

কবির বাস ছিল শ্যামদাসপুরে—'শ্যামদাসপুরে আছে যাহার বসতি'।

সাজাদার অপর এক বংশধর চিন্তিতপুব নিবাসী ক্ষেমানন্দও মনসামঙ্গলের কবি বা গায়েন ছিলেন।

১১. সীতারাম দাস

ধর্মমঙ্গল পাঁচালী রচয়িতা সীতারাম দাসও একখানি 'মনসামঙ্গল' 'রচনা করেছিলেন। রচনাকাল শশী বিন্দু চন্দ্র বেদ- -তথা ১০১৪ মল্লাব্দ বা ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দ। সীতারাম দাসের কাব্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যের অনুকৃতি রয়েছে। এ কাব্যের ধর্মঠাকুর অধিদেবতা হিসেবে স্বীকৃত 'ধর্ম পূজে বিষহরি'।

১২. দ্বিজ বানেশ্বর রায়

এঁর কাব্যে রচনাকাল এরূপ ঃ

'মনসামঙ্গলভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে /শকাব্দা ষোলশ' একচল্লিশে'। অতএব ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত। কবির বংশলতা বর্ণিত রয়েছে। কবির পিতার নাম হরিনারায়ণ। কবির কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম সদাশিব এবং নিবাস 'চম্পকপুরী অকুরাইপুরে' এবং (জন্ম রায়পুরে)। বিধবা হয়ে অন্যের নিন্দারপাত্রী ও পরিবারেব গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে শ্বশুরের গালি-খাওয়া বেহুলা 'লইয়া প্রাণের নাথ জলে ঝাঁপ' দেয়াই শ্রেয় মনে করল। কাজেই বেহুলার কোন সংকল্প বা মহৎ প্রেরণা নেই।

১৩. তন্ত্রবিভূতি

পশ্চিমবঙ্গে সতেরো শতক থেকেই চৈতন্যপ্রভাব ম্লান ও শিথিল হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গীয় আদলে মনসামঙ্গল রচিত হতে থাকে। উত্তরবঙ্গেও এ সময় থেকেই মনসামঙ্গল রচিত হতে দেখি। উত্তরবঙ্গের মালদহের কালিয়াচকাদি অঞ্চলে তন্ত্রবিভূতি নামের কবির মনসাপুরাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি সম্ভবত তাঁতী বলেই কিংবা তান্ত্রিক মতাবলম্বী বলেই নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' যোগ করেছেন। দ্বিজ ও দ্বিজসুত বলেও কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। নাথ যোগীদের তথা তাঁতীর ব্রাহ্মণ অর্থেই 'এ দ্বিজ' ব্যবহৃত কি-না বলা যাবে না। তন্ত্রবিভূতি ধর্মঠাকুরেরও বন্দনা করেছেন ঃ

প্রথমে বন্দিয়া গাইব ধর্ম নৈরাকার
যাহার সৃজন হৈল জগৎ সংসার।

এঁর কাব্যে শিবও ধর্মঠাকুরের পূজারী।

ধর্মঠাকুরকে এমনিভাবে স্মরণ করেছেন বিপ্রদাস পিপিলাই, বিষ্ণুপাল, দ্বিজ রসিক, ক্ষেমানন্দ, জগৎজীবন ঘোষাল, সীতারাম দাস প্রমুখ কবিগণও। কাব্যও স্বপ্নাদেশের ফল ঃ

পদ্মার আদেশে গীত পাইল স্বপনে
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসার চরণে।

তন্ত্রবিভূতির কাব্য করুণরস প্রধান। দুঃখ-যন্ত্রণা বর্ণনায় কবির আগ্রহ অধিক। তাঁর কাব্যে বেহুলাচরিত্র ম্লান। অতি সাধারণ নারীর মতো তার অভিযোগ ঃ

শ্বশুরের কারণে নাথ প্রাণ হারাইল
এমত শুনি নাই বড় অসম্ভব
মনুষ্য হইয়া করে দেব সঙ্গে বাদ।

কাহিনী নির্মাণের ও বিন্যাসের দিক দিয়ে তন্ত্রবিভূতির কাব্য বিশিষ্টতার দাবিদার। বস্তুত উত্তরবঙ্গে পরবর্তী দুই কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবকৃষ্ণ মৈত্র তন্ত্রবিভূতির কাব্যের স্বাধীন অনুকারকমাত্র।

১৪. জগজ্জীবন ঘোষাল

সতেরো শতকের শেষপাদে [প্রাপ্ত প্রতিলিপির লিপিকাল ১১০২ সাল] কিংবা শেষার্ধে রচিত হয় জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল। জগজ্জীবন তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবির পিতামহ রূপ রায় চৌধুরী, পিতা জয়ানন্দ, মাতা রেবতী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঘনশ্যাম, পত্নী পদ্মমুখী এবং নিবাস (বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার) কুচিয়ামোড়া গ্রাম, জমিদার প্রাণনাথ ও গোত্র ঘোষাল, 'ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচিয়া-মোড়াত বাড়ী। [কোচ আমোরাত] প্রাণনাথ নরপতি দেশে।' জগজ্জীবনও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন। জগজ্জীবনের গ্রন্থেও ধর্মরাজই হচ্ছেন জগৎস্রষ্টা। শূন্যপুরাণানুগ সৃষ্টিতত্ত্বও বর্ণিত রয়েছে।

১৫. জীবকৃষ্ণ মৈত্র

নাটোরের রানী ভবানীর আমলে 'মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া'—সনে তথা ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে এঁর গ্রন্থ রচিত। জীবনকৃষ্ণের পিতার নাম অনন্ত, মাতার নাম স্বর্গবালা, পত্নী ব্রজেশ্বরী, নিবাস ছিল বগুড়ার করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গাঁয়ে। কবির উপাধি ছিল 'কবিভূষণ'।

কবিভূষণ নাম বাস লাহিড়ীপাড়াগ্রাম।
জীবন মৈত্র চতুর্থের (ভ্রাতার) কনিষ্ঠ।

রানী ভবানীর পুত্র 'রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর তাহার রাজ্যেত বাস। ভিক্ষা করি খাই'—এ উক্তি সত্য হলে রানী ভবানীর মৃত্যুর পরে রামকৃষ্ণ রায়ের আমলে এ গ্রন্থ রচিত। তা হলে রচনাকাল ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দ হতে পারে না। 'রাজ্যেশ্বর' অর্থে যদি বগুড়া অঞ্চলের মহালের দায়িত্বে নিযুক্ত বোঝায়, তা হলে রামকৃষ্ণ তথায় মায়ের প্রতিনিধি ছিলেন।

১৬. ষষ্ঠীবর দত্ত

ষষ্ঠীবর দত্ত সম্ভবত সিলেটের গয়গড়বাসী ছিলেন। এ গাঁয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত উমা-মহেশ্বর মন্দির এখনো বিদ্যমান এবং প্রতিবছর এখানে নাকি ষষ্ঠীবর দত্তের স্মৃতিদিবস পালিত হয়।

ষষ্ঠীবরের কাব্যের ভাষা স্থানিক বুলিদুষ্ট। ষষ্ঠীবর সিলেটের একজন জনপ্রিয় কবি ছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাইশ কবির মনসামঙ্গলে কবির একটি ভণিতায় স্বগ্রামের ও স্বকুলের উল্লেখ রয়েছে ঃ

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা
তার গর্ভে জনমিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্তি প্রকাশিলা।

এ ভণিতার অকৃত্রিমতা বিদ্বানরা স্বীকার করেন না। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য[১] ষষ্ঠীবর দত্ত সম্বন্ধে নানা উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবু কবির কোন নিঃসংশয় পরিচয় মেলে নি। মনে হয় ষষ্ঠীবর আঠারো শতকের শেষপাদের কিংবা মধ্যভাগের কবি।

১৭. রামজীবন বিদ্যাভূষণ

রামজীবন বিদ্যাভূষণ সূর্যমঙ্গল বা আদিত্যচরিত [১৬৩১ শকে রচিত ঃ ইন্দু রাম ঋতুবিধু] রচয়িতা রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণের প্রথম গ্রন্থ 'মনসামঙ্গল'। এটি 'শর কর ঋতু বিধু শাক' তথা ১৬২৫ শকে বা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত। রামজীবনের নিবাস ছিল চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানার বাণীগ্রামে। এঁর পিতার নাম গঙ্গারাম, পিতৃব্যের নাম নারায়ণ।

আঠারো শতকের ক্রান্তিকালে ও উনিশ শতকে আর যাঁরা মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, তাঁরা হলেন যশোরের দ্বিজ কালীপ্রসন্ন (১৮৬০) সিলেটের রাধানাথ রায়, কোচবিহারের বৈদ্যনাথ, সুসঙ্গের রাজা উনিশ শতকের রাজসিংহ, পূর্ববঙ্গের জগমোহন মিত্র (১৮৪৪), বৈদ্য হরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, জানকীনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ, কবিকর্ণপুর, রামবিনোদ, রামকান্ত, রমাকান্ত, সীতাপতি, কমললোচন, জয়দেবদাস, দ্বিজ বনমালী, বিপ্রদাস, সুখদাস, সুদাম, নন্দলাল, জয়রাম, রথীদেবসেন, মধুসূদন, বর্ধমানদাস, আদিত্যদাস, রাধাকৃষ্ণ, যদুনাথ, বলরাম, রঘুনাথ, বল্লভ ঘোষ, কমল নয়ন, হরিদাস, অনুপ ভট্ট, গোপীচন্দ্র, হৃদয়– শেষোক্ত তেরো জন বাইশ কবির মনসামঙ্গল 'বাইশা'র অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমখণ্ডে মনসামঙ্গলের কাহিনীর অনন্যতার অনুমিত কারণ বর্ণনা করেছি। চাঁদ-বেহুলার বিদ্রোহে ও সংগ্রামে যে একেশ্বরবাদী বিজেতার শাস্ত্রিক, সামাজিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল, তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার তথা বহুদেবতার কাছে বিনাপ্রশ্নে নিঃসঙ্কোচে যারা চিরকাল মাথা নত করেছে, বিপদে সম্পদে অরি ও মিত্র দেবতার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যে নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন হতে চেয়েছে, সে-মানুষ কেন বলবে—আমি একক দেবতার পুরুষ দেবতার পূজারী—অন্য দেবতার-নারী দেবতার পূজো আমি করব না।

এ দ্রোহ কেবল বাঙলাদেশে চাঁদের মধ্যে নয়, ওই একেশ্বরবাদী বিজেতার সংস্পর্শে এসে দক্ষিণাপথের ও উত্তরাপথের মানুষও মনে-মননে বিচলিত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তারই ফলে শঙ্কর নিম্বার্ক রামানুজ মধ্ব ভাস্কর বল্লভ রামানন্দ কবির দাদু নানক একলব্য রামদাস রজব বাঙলায় চৈতন্যদেব দেবধর্ম তথা দেবদ্বিজবেদ ত্যাগ করেন। প্রতীচ্যপ্রভাবে উনিশ শতকের রামমোহন প্রমুখ অনেকের মধ্যে এমনি বিচলন, বিদ্রোহ ও নবচেতনা প্রত্যক্ষ করি।

সাহিত্যেও এ বিচলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখি। দাক্ষিণাত্যের অম্ববরু উপাখ্যানেও নারীদেবতা পূজায় অস্বীকৃতি এবং একলিঙ্গ শিব পূজায় আগ্রহ দেখি। চাঁদসদাগর নয় শুধু, ধনপতি সদাগরও নারীদেবতাদ্বেষী। এমনকি শীতলামঙ্গলের চন্দ্রকেতুরও শীতলাদেবীর প্রতি অবজ্ঞা দেখা যায়। কাজেই দাক্ষিণাত্যে আরব-বিজয় এবং উত্তর ভারতে তুর্কী বিজয়ই এ নতুন চেতনার ও দ্রোহের কারণ। একেশ্বর বা একক দেবতা ও পুরুষকারই হল তাদের কাম্য। সাহিত্যক্ষেত্রে চাঁদ-বেহুলার

১. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৩৮৭-৪০৫।*

মধ্যে গোড়ার দিকে এ দ্রোহ, এ সংগ্রামশীলতা ও অনমনীয়তা, দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সাহস যেভাবে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল, অবশ্য চণ্ডীমঙ্গলে কিংবা শীতলামঙ্গলে অথবা অন্য মঙ্গল পাঁচালীতে সেভাবে দেখা যায়নি। দ্রোহ না থাকলেও দৃঢ়তা ছিল আর একটি চরিত্রে, তিনি গোবক্ষনাথ। আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন 'বেহুলা দুঃখ সহনশীলতায় সীতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তিতে সে সাবিত্রী।' মনসামঙ্গলের কাহিনীকে—মনসাকে বিদেশী বিজাতি শক্তির প্রতীক এবং চাঁদকে নিপীড়িত শাসিত হিন্দুসমাজের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে কোন কোন বিদ্বান আগ্রহী, এমনকি রবীন্দ্রনাথও লৌকিক দেবতার উদ্ভব সম্বন্ধে এমনি মত পোষণ করতেন। তাঁদের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব যথার্থ হলে হাসান-হোসেন পালা ও বেহুলার সাধনা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কালিকামঙ্গল

প্রচণ্ডশক্তির আধার চণ্ডী, তাঁর পুংশক্তি হচ্ছে চণ্ড রুদ্রশিব। এ চণ্ডী বর্ণে কালো, এবং অঙ্গে অবয়বে ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা-প্রতীক হয়ে দশরূপে প্রমূর্ত। এ রক্ত-খেকো দানবদলনী নৃমুণ্ডমালিনী চণ্ডী কালপ্রভাবে মানুষের মন-মননের সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা গুণে-রূপে-মাহাত্ম্যে মণ্ডিত হয়ে অঙ্গে ও অন্তরে বিবর্তন পেয়েছেন। এই অসুরমর্দিনী রক্তপিপাসু নৃমুণ্ডমালিনী বুনো বর্বর মানুষের দেবতাই কালিক ও তাত্ত্বিক পরিবর্তনে গৌরী, পার্বতী, উমা, শঙ্করী, শিবানী, ভবানী, তারা, কালী, দুর্গা, অন্নদা, ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি অষ্টোত্তর শতনামে পূজনীয়া ও স্মরণীয়া হয়েছেন এবং নানা পুরাণে ও পাঁচালীতে তাঁর নানা গুণ, বিচিত্র কর্ম ও অনুপম মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডী ও উমা দুটোই অনার্যভাষার শব্দ। কালো বলেই তাঁর ভক্তের দেয়া আদুরে নাম কালিকা বা কালী, রুচিবান ভক্তের দেয়া নাম শ্যামা। কিন্তু চণ্ডী, কালী এবং শ্যামা নামে তাঁর দেহবর্ণ কালো হলেও আর্যদের স্বীকৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সতী, গৌরী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কেবল তাই নয়, আদি প্রকৃতি আদ্যাশক্তি রূপে তিনি সৃষ্টির উৎস। এ আদি চণ্ডীই অঙ্গে ও অন্তরে কালিক ও তাত্ত্বিক বিবর্তন পেয়ে চৈতন্যোত্তর যুগে মধুররসের রাধার প্রভাবে সন্তানবৎসলা জগজ্জননীরূপে, রামকৃষ্ণের হাতে সেবা ও প্রীতিপ্রতীক বিশ্বমাতা রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কালীরূপে তিনি ভক্তবৎসলা, বন্ধ্যা দম্পতির সন্তানদাত্রী কালিকা বা কালীরূপেই তিনি বিদ্যাসুন্দর প্রণয়োপাখ্যানে আবরণ দেবতা। হিন্দুদের মধ্যে বাঙলায় প্রণয়োপাখ্যান রচনার রেওয়াজ ছিল না বলেই কালিকার বরে রাজরানীর পুত্রসন্তান লাভ, এবং কালিকার উপস্থিতিতে সেই বিপন্ন সন্তানের প্রাণরক্ষা—আদ্যে ও অন্তে এ দুটো তথ্য জুড়ে দিয়েই একটি আদি রসাত্মক কামপ্রেম কথাকে কালিকামঙ্গল নামের আবরণে দেবকথার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যদান করা হয়েছে হয়তো শাস্ত্রী-সমাজপতিদের আপত্তি এড়াবার কৌশল হিসেবেই। কাজেই কালিকামঙ্গল কেবল নামে মঙ্গলপাঁচালী, স্বরূপে প্রণয়োপাখ্যান। চণ্ডীমঙ্গলের মনসামঙ্গলের কিংবা ধর্মমঙ্গলের মতো এ মঙ্গল পাঁচালীতে দেবতার পূজাপ্রচার লক্ষ্য নয়। চণ্ডীর গৌরীতে অন্নদায় তারায় এবং বৈষ্ণব প্রভাবে জগজ্জননীতে রূপান্তর ঘটেছে। কবিওয়ালাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসায় হর-পার্বতী ছিলেন রাধাকৃষ্ণের মতোই অবলম্বন। প্রতীচ্য প্রভাবে চণ্ডীর রামকৃষ্ণের সেবাপ্রতীক বিশ্বমাতায় পরিণতি বাঙালী সংস্কৃতি-সভ্যতার মন-মননের পরিবর্তন ধারারই সাক্ষ্য। এদিক দিয়ে সমাজতত্ত্বের ও সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ যোগাতে পারে চণ্ডী-কালী-সতী-উমা-গৌরী-দুর্গা-তারা প্রভৃতি গুণনামের এ দেবতা সম্বন্ধীয় নানা পুরাণকাহিনী ও মঙ্গলপাঁচালী।

প্রণয়োপাখ্যান অধ্যায়ে শাহ্ বারিদ খান প্রসঙ্গে আমরা কালিকামঙ্গলের প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের পরিচয় দিয়েছি। উল্লেখ্য যে বাঙলায় এ প্রণয়োপাখ্যান হোসেন শাহর পৌত্র সৈয়দ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর আগ্রহেই প্রথম রচিত হয়, দ্বিতীয় কবি শাহ্ বারিদ খান। তারপরে কালিকামঙ্গল নামের আবরণে শৃঙ্গার রসের এ উপাখ্যান রচনা করেছেন অনেক কবি। বস্তুত ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, সত্যনারায়ণ এবং কালিকামঙ্গল পাঁচালী রচনাতেই মধ্যযুগের বেশি সংখ্যক কবি উৎসাহ বোধ করেছেন। আজ অবধি কালিকামঙ্গল তথা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচয়িতা সতেরো জন কবির কাব্য পাওয়া গেছে। এঁরা হচ্ছেন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, শাহ্ বারিদ খান, কঙ্ক, গোবিন্দ দাস, বলরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, রামপ্রসাদ সেন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, নিধিরাম আচার্য, দ্বিজ রাধাকান্ত, কবীন্দ্র, মদন দত্ত, মধুসূদন চক্রবর্তী, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর, কবিচন্দ্র।

১. কঙ্ক

বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় কবি সম্ভবত ময়মনসিংহের কবি কঙ্ক। ইনি সত্যানারায়ণ মাহাত্ম্যকথা প্রচার প্রসঙ্গেই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছেন। কাজেই এটি কালিকামঙ্গল নয়। কবি কঙ্কের অদ্ভুত চরিতকথা কঙ্ক ও লীলা নামের ময়মনসিংহ গীতিকায় বিধৃত রয়েছে। গীতিকায় বর্ণিত সব কথা হয়তো সত্য নয়, তবে তাঁর দারিদ্র্য, প্রভু ব্রাহ্মণের কন্যা লীলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়, বর্ণভেদের বাধা এড়ানোর জন্যে তাঁর ইসলাম বরণ ও লীলার রুষ্ট পিতা গর্গ কর্তৃক কঙ্ক-হত্যার চেষ্টা বাস্তব ঘটনা বলেই মনে হয়। কঙ্ক সম্ভবত ষোল শতকের শেষপাদের বা সতেরো শতকের প্রথমপাদের কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যে চৈতন্যবন্দনা রয়েছে, এ বন্দনা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। ষোল শতকের চৈতন্যভক্ত সত্যনারায়ণভক্ত এবং আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর রচক না হবারই কথা। রাজেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রামে কঙ্কের জন্ম, তাঁর পিতার নাম গুণরাজ, মাতার নাম বসুমতী, কাব্যের নাম পীরের পাঁচালী 'গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী'।

২. গোবিন্দদাস

আবদুল করিম সাহিত্যেবিশারদ আবিষ্কৃত চট্টগ্রামের দেবগ্রাম (দেয়াঙ) নিবাসী কবি গোবিন্দ দাসের কাব্যে রচনাকাল দেয়া রয়েছে ঃ

মুনি অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত
এইকালে রচিত কালিকাচণ্ডীর গীত।

মুনি-৭, অক্ষর-১, বাণ-৫, শশী-১ ধরে ১৫১৭ শক বা ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে অক্ষর-৫০ হবে, তাঁর সংশোধিত পাঠ 'জান অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত' অনুসারে ১৫৫০ শক বা ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দ হয়।[১] এঁর কাব্যে গুণসাব গৌড়ের কাঞ্চননগরের রাজা এবং বিদ্যার পিতা বীরসিংহ রত্নপুরের রাজা, মালিনীর নাম রম্ভা। উপাখ্যান নয়, কালীর মাহাত্ম্য প্রচারই এ কাব্যে মুখ্য।

৩. কৃষ্ণরাম দাস

রাঢ় অঞ্চলের আঠারো শতকের শেষপাদের কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী কোলকাতার নিমতাবাসী ও রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কমলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল প্রণেতা কৃষ্ণরাম দাসকে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আদি কবি বলেই জানতেন। যথা ঃ

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস।
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।

কৃষ্ণরাম তাঁর কাব্যে রচনাকাল দিয়েছেন ঃ

সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে
বিধুর মধুর নাম রচনান্তে কহিলাম
বুঝ শক (সকল) বিচারিয়া সভে।

---

১. বাংলা সাহিত্যের কথা [মধ্যযুগ], পৃঃ ৪৩৫।

কাব্যরচনাকালে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন আরং শাহা তথা আওরঙজেব এবং বাঙলার সুবাদার ছিলেন শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮ খ্রী ঃ) ঃ

আরং সাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে
নবাব শায়েস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে।

উক্ত হেঁয়ালি থেকে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পেয়েছেন ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দ। এবং ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য পেয়েছেন ১৫৮৬ শক বা ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ।[১] কবি বিশ বছর বয়সে সারদা ভগবতীব স্বপ্নাদেশে তাঁর এই প্রথম কাব্য রচনা করেন।

৪. প্রাণরাম চক্রবর্তী

রাঢ়ের কবি প্রাণরাম তাঁর কাব্যে কৃষ্ণরাম দাস প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেন রচিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। অতএব তাঁর কাব্যে প্রাপ্ত রচনাকাল নিশ্চয়ই প্রমাদদুষ্ট ঃ

বসুদ্বয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন।

বসুদ্বয়-৮৮, বাণ-৫, চন্দ্র-১=১৫৮৮ শকাব্দ, অথবা বসুদ্বয়-৮+৮ বাণ-৫ চন্দ্র-১ (অঙ্কস্যবামাগতি প্রযোজ্য নয় ধরলে) ১৬৫১ শকাব্দ হয়। কিন্তু কোনটাই ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থরচনাকালের (১৭৫৩ খ্রীঃ) পরবর্তী নয়। প্রাণরাম চক্রবর্তীর উপাধি কবিবল্লভ।

৫. বলরাম চক্রবর্তী

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী সতেরো শতকের শেষ পাদের কবি। তাঁর কাব্যে সুন্দরের পিতাগুণসার দক্ষিণ দেশের মাণিক্যনগরের রাজা এবং সুন্দরের মাতার নাম গুণবতী। বিদ্যার পিতা বর্ধমানরাজ বীর সিংহ। রামপ্রসাদের এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বিদ্যার পিতা বর্ধমানের রাজা। কবির পিতামহের নাম চৈতন্য, পিতার নাম দেবীদাস আচার্য এবং মাতার নাম কাঞ্চন।

৬. রামপ্রসাদ সেন

কালীসাধক ভক্ত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সন্তানবৎসলা জগজ্জননীরূপা শ্যামার সাধন-ভজন ও কীর্তনসঙ্গীত রচয়িতা রূপেই সর্বজনপ্রিয় ও প্রখ্যাত। তাঁর রচিত কালিকামঙ্গলে বা বিদ্যাসুন্দরে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের অনুসৃতি রয়েছে। তাঁর পাঁচালী কাব্যগুণে উজ্জ্বল নয়, অন্তত ভারতচন্দ্রের কাব্যের তুলনায় ম্লান। তবে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৭২০ খ্রস্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের জন্ম চব্বিশপরগনার অন্তর্গত হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট বা কুমারহাটি গ্রামে। রামপ্রসাদ সেন জমিদারী সেরেস্তায় হিসাবরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজার বৃত্তিভোগী কবিও ছিলেন তিনি। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম সেন।

৭. নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত এ কবি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যরচনার কাল ঃ

শকাব্দ ষোড়শ শত জলনিধি বসু
দৈববিৎ বিরচিল নিধিরাম শিশু।

---

১. *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, কালিকামঙ্গল অধ্যায়।*

দৈবজ্ঞ বা গণক জ্যোতিষী আচার্য ব্রাহ্মণবংশে নিধিরামের জন্ম। ১৬৭৮ শকাব্দে বা ১৭৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাব্য রচিত। এ কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণিসার বা গুণসার, মাতা কলাবতী, রাজধানী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী, মাতার নাম চন্দ্ররেখা এবং রাজধানী উজ্জয়িনী।

৮. রাধাকান্ত মিশ্র

শ্যামামঙ্গল বা শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজ রাধাকান্ত কোলকাতার লোক। 'শ্যামার সঙ্গীত দ্বিজ রাধাকান্ত গায়'।

তিনি 'শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গগনে' কালে অর্থাৎ ১৬৮৯ শকে বা ১৭৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। এ কাব্যেও বিদ্যার পিতা বীরসিংহ বর্ধমানের রাজা। অতএব বলরাম, রাধাকান্ত, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র–এ চার কবির কাব্যে বিদ্যার পিতা বর্ধমানের রাজা। এ কাব্যে মালিনীর নাম বিমলা।

৯. কবীন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তী

কবীন্দ্র ও মধুসূদন চক্রবর্তীকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য দুই পৃথক কবি বলে মনে করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কবীন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তীর উপাধি বলেই বিশ্বাস করেছেন। এঁর বিদ্যাসুন্দর ব্রতকথার আকারে রচিত—পাঁচালীর আঙ্গিক বা কলেবর পায় নি।

১০. কবীন্দ্র

এঁর পিতার নাম ঘটক চক্রবর্তী (ঘটক চক্রবর্তীসুত) এবং কবি ছিলেন (কৃষ্ণচন্দ্রপদে রত) কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারী। এঁর কাব্যে মধুসূদনের একটি ভণিতা মেলে 'কহে মধূসূদন রহ ধনি দুইদিন' এতেই বিদ্বানরা বিভ্রান্ত। কবীন্দ্র ও মধুসূদন অভিন্ন ব্যক্তি কি-না নির্ণয় করা গবেষণাসাপেক্ষ।

১১. মদন দত্ত

এঁর কাব্যের নাম মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী। এ কাব্যে বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী এবং পিতৃরাজ্য উজানি।

বিদ্যাসুন্দরের কবি বলে **ক্ষেমানন্দের ও বিশ্বেশ্বরের** নাম জানা গেছে, কিন্তু কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মৈথিল ভাষায় ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে রচিত কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ নাটকে সুন্দর রত্নপুররাজ গুণসাগরের ও রানী কলাবতীর পুত্র আর বিদ্যা হচ্ছে উজ্জয়িনীর রাজা বীরসিংহের ও রানী শিলাবতীর কন্যা, মালিনীর নাম সুগন্ধী এবং ভাট মাধব। বিদ্যা ও সুন্দরের এ পরিচিতিই প্রাচীন।

১২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

ভূরিশিটের রাজ্যচ্যুত ভূপতি নরেন্দ্ররায়ের পুত্র 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং পুরাণ-আগম-পারসি-নাগরী বেত্তা' কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ ভারতচন্দ্রও একখানি কালিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত কালিকামঙ্গল অঙ্গে ও অন্তরে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বলে এর কবিপ্রদত্ত নাম 'অন্নদামঙ্গল'। আদ্যে দেবীখণ্ড এবং অন্তে মানসিংহ খণ্ড একে পুচ্ছগ্রাহিতাদোষ থেকে মুক্ত রেখেছে, মৌলিক কাহিনীর মর্যাদা দিয়েছে এবং কাহিনীকারের অনন্য প্রতিভার দলিলরূপেও এটি স্মরেণ্য হয়েছে। গোটা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ছয়শ' বছরের পরিসরে কবি ভারতচন্দ্র নানা কারণে অনন্য এবং তাঁর অন্নদামঙ্গল একক

ও অতুল্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ ভারতচন্দ্র রায় ফুলিয়ার মুখটী নৃসিংহের বংশধর। উল্লেখ্য যে কৃত্তিবাসও ওই বংশীয় এবং একই বংশের দুজনই বাঙলার অতুল্য কীর্তিমান কবি।

আমরা পীরপাঁচালী প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের রাজনীতিক পরাধীনতাজাত আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ধারার কথা আলোচনা করেছি। সেই অবক্ষয়ের শিকার ছিলেন পরিবেশ-সচেতন মনীষী ভারতচন্দ্রও—তাঁর ব্যক্তিক, পারিবারিক ও দৈশিক—সাংস্কৃতিক জীবনে।

বর্ধমানের বৃহৎ জমিদারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে ভারতচন্দ্রের ক্ষুদ্র জমিদার-পিতা ভুরিশিটের ভূপতি নরেন্দ্র রায় হৃতসর্বস্ব হন। ফলে শৈশবে বাল্যে কৈশোরে ভারতচন্দ্রও দারিদ্র্য দুঃখের কবলে পড়েন আর গৃহত্যাগ করে সুদূরে ঘরজামাই হয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার লড়াই, শাসন শৈথিল্য, বিদেশীবেনের অবাধ বাণিজ্য, দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয় প্রভৃতির ফলে বাঙলাদেশে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রায় চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। ফলে জনজীবনে ও জীবিকায় ছিল অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব। প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও আর্থিক অনিশ্চয়তা ব্যক্তির সামাজিক জীবন করে বিপন্ন ও বিশৃঙ্খল, এবং সাংস্কৃতিক জীবন করে বন্ধ্যা ও বিকৃত। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙলার এমনি দুর্দিনে—দুর্যোগকালে।

আবাল্য দুঃখের আগুনে পোড়খাওয়া ভারতচন্দ্র দেশ-কাল-সমাজ-রাজ্যের হাব-ভাব-হালহকিকত জানতেন ও বুঝতেন। কারণ বোঝার দুর্লভ শক্তিও ছিল তাঁর। শাসকের মন-মেজাজের আর শাসনের রীতি-পদ্ধতির উপরই যে-জনমানবের শান্তি-স্বস্তি-সুখ-সম্পদ নির্ভর করে, তাও তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি মুর্শিদাবাদের সমকালীন রাজনীতির ও শাসকের পরিচয় দিয়েই শুরু করেছিলেন তাঁর কাব্যরচনা। এর থেকে এক অশান্ত অস্থির প্রশাসনিক অবস্থার এবং গণমানবের আর্থসামাজিক জীবনে বিপন্নতার আভাস পাওয়া যায় ঃ

সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ,
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ।
ছিল আলিবর্দি নবাব পাটনায়
কটকে মুশিদকুলি খাঁ (?) নবাব ছিল
তারে গিয়া আলিবর্দি খেদাইয়া দিল...
ভাইপো সৌলৎজঙ্গে দিলেন দখল
মুরাদবাখর তাবে ফেলিল ফাটকে

আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়।
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব
'মহব্বতজঙ্গ' দিল পাতসা খেতাব।
লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ি তোক
শুনি মহব্বতজঙ্গ চলে পেয়ে শোক।...
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাঘর...

এবং মহব্বতজঙ্গ—উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া।

তারপর নানা সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের সৈনাপত্যে মারাঠা বর্গীরা ১৬৬৪ শক বা ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে (শকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষ)

'লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।
কাটিল বিস্তরলোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি
লুঠিয়া লৈল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল...
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন[১]
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন।

[১-সুজন নামের এক অর্থগৃধ্নু সাজোয়াল বা তহশীলদার]

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের সমকালীন বাঙলা ও বাঙালীই তাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে ঃ

একি ভূতগত দেশে রে
না জানি কি হবে শেষে রে।
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্মলেশে রে।

দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধু বেশে রে
যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুল্য মূল্য গজ মেষেরে।

'দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা' আর 'চোর ফিরে সাধু বেশেরে'—ভারতচন্দ্রের সমকালে আক্ষরিকভাবে বাস্তবও সত্য হয়ে উঠেছিল। আমরা জানি সমাজে স্বার্থবাজ, মতলববাজ, দুর্নীতিবাজ, খল, শঠ, মিথ্যুক, হিংসুটে, নিন্দুক, চোর, ডাকাত, খুনীর অভাব ছিল না কখনো কোথাও। তবে সমাজে ভালো-মন্দের সংখ্যাল্পতা ও সংখ্যাগুরুতাই শান্তি-সুখ-স্বস্তির স্থিতির বা বিঘ্নের কারণ হয়। সমাজে শিষ্টের ও দুষ্টের ভারসাম্য নষ্ট হলেই, দুষ্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই ঘটে প্রশাসনিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও বিকৃতি। ভারতচন্দ্রের কালে যে তা-ই ঘটেছিল—বিশেষ করে মানুষ যে অর্থাভাবে তথা অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কবি স্বয়ং ছিলেন দারিদ্র্যক্লিষ্ট– অন্নাভাবগ্রস্ত। তা-ই তাঁর ইষ্টদেবতা কালী গৌরী তারা দুর্গা চণ্ডী নন—অন্নদায়িনী অন্নদা অন্নপূর্ণা। এ কারণেই কালিকামঙ্গল তাঁর হাতে হলো 'অন্নদামঙ্গল'। শিব-পরিবার নয় শুধু, ব্যাসও ভিক্ষাজীবী, অন্নদাপূজা তাঁদেরও করতে হয় অন্ন পাওয়ার আশায়। এখানেই শেষ নয়, বিষ্ণুহোড় দম্পতিও হাভাতে। বিষ্ণুহোড় পত্নীর—

তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি গায়
লতাবান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।
অন্নবিনা কলেবরে অস্থি চর্মসার....
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি।

গরীবের অন্নচিন্তায় ও অন্নসংগ্রহ কাজে দিন যায়, কন্দল করবার তাদের সময় কোথায়। ধন-মান-যশের সাধক ঘৃণা-লজ্জা-ভয় কবলিত উচ্চবিত্তের ও পরশ্রমজীবী উচ্চবর্ণের মানুষই কেবল দ্বেষ-দ্বন্দ্বে ও পরচর্চায় অবসরযাপন করে। অভিজ্ঞতা থেকেই তাই ঈশ্বরীপাটনী জানে যেখানে কুলীনজাতি সেখানে কন্দল। সেযুগে অন্নাভাব এতো তীব্র ছিল যে অন্নচিন্তা ছাড়া আর কোন ভোগ-উপভোগ চিন্তা বা আশা আকাঙ্ক্ষা দরিদ্র মানুষের চেতনায় ঠাঁই পায়নি, তাই দেবীর পায়ের ছোঁয়ায় 'সেঁউতী হইল সোনা' দেখে ঈশ্বরীপাটনী যদিও বুঝলো 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়', তবু দেবতার কাছে আলাদীনের মতো ধন-মান-মহল-মহাল কিছুই চাইতে জানল না, সামান্য আশ্বাস পেলেই সে হয় আশ্বস্ত, নিশ্চিন্ত ও খুশী—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'। এর থেকে বেশি কিছু চাওয়ার-পাওয়ার থাকে না চিরদুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কাঙালের হাভাতের। সেদিন বাঙলা দেশে তেমন দারিদ্র্য ছিল। তাই ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরে বাঙলার দুই-তৃতীয়াংশ লোকের অন্নাভাবে অপমৃত্যু ঘটা সম্ভব ও সহজ হয়েছিল।

নওয়াবের ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বৈতশাসনে ও শোষণে এবং শাসন-শৈথিল্যে ও কোম্পানী-চাকুরের নির্লক্ষ্য নির্বিচার লুণ্ঠতরাজের ফলেই বাঙালীর আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন আরো নীতিভ্রষ্ট, পীড়নদুষ্ট, দুর্নীতিবহুল ও পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল, গ্রামীণ পণ্য-বিনিময়ভিত্তিক আর্থিক জীবন মুদ্রাবিনিময় বহুল হয়ে ওঠায় এবং জীবনযাত্রায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পণ্য প্রভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ায় নতুন-পুরাতনের অসঙ্গত অসমঞ্জস টানা-পোড়েনে বাঙালীর গার্হস্থ্য ও আর্থিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। তারই ফলে বন্দরনগরী কোলকাতার হিন্দুসমাজে কবিওয়ালার এবং মুসলিম সমাজে শায়েরের উদ্ভব ঘটে। তখন গণমানবের দুর্দিন-দুর্ভোগের চরম অবস্থা—পুরোনো জীবনচেতনা ও মূল্যবোধ অপসৃত, নতুন মূল্যচেতনা অজাত–যুগসন্ধির লগ্নে বন্ধ্যা মন-মননের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর হয়ে রইল কবিগান ও দোভাষী পুথি। আমাদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয়ের পাথুরে প্রমাণ হয়ে রইল এসব দলিল।

ভাষা ও ছন্দের সংহত ও সমন্বিত অবয়বে তাঁর কাব্যদেহ নিখুঁত লাবণ্যে অপরূপ। মধ্যযুগে অনন্য রসিক ছান্দসিক কবি মনীষী ভারতচন্দ্র ছিলেন 'কবিতা কমলে রবি মহাশয়া' মধ্যযুগের বাঙলার 'নরলোকে [তাঁর] সম নাহি' স্বীকার করতেই হবে। কাব্য ক্ষেত্রে মধ্যযুগের অতুল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যকে তাই রাজকণ্ঠের মণিমালার সঙ্গে তুলিত করেছেন তার ঔজ্জ্বল্যের ও কারুকার্যের জন্যে। তাঁর দেবখণ্ড বা হরপার্বতীর চরিতকথা নামান্তরে বাঙলার গ্রামীণ ক্ষেত-মজুরের বা প্রান্তিক চাষীর গার্হস্থ্য জীবনের সংবৎসরের

বাস্তব আলেখ্য। হরগৌরী নারদ ব্যাস প্রমুখ সবাই সর্বগুণ-বিধ্বংসী দারিদ্র কবলিত চরিত্র। তাঁরা মহৎ ও বৃহৎ আদর্শভ্রষ্ট অসুস্থ ও অস্বস্থ মানুষ। বিদ্যাসুন্দর সযত্নসৃষ্ট ঘন আদিরসের মনোরম আধার বিশেষ। আর ইতিহাসের দূরাগত ধ্বনি শোনা গেলেও মানসিংহ খণ্ড হচ্ছে আগাগোড়াই আবিল-অনাবিল হাস্য-পরিহাসের ভাণ্ডার। এর ভাষা মিশ্র ও লঘু, এর কাহিনী তুচ্ছ ও নির্লক্ষ্য, এর ভঙ্গি অশ্লীল ও বিদ্রূপাত্মক, এর রস ইতরজনভোগ্য। কাব্যের প্রায় সর্বত্রই যেন তিনি বাঁদর আর বাঁদরামি দেখাতেই ছিলেন উৎসুক। কবিওয়ালাদের হাতে রাধা-কৃষ্ণ কিংবা হর-গৌরী যে ভাঁড়ের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন, তারও শুরু ভারতচন্দ্রে। যে-শিল্পী তাজমহল গড়ার দুর্লভ ক্ষমতা রাখতেন, তিনি এভাবে চকবাজারের জলসাঘর নির্মাণ করেই রইলেন তুষ্ট। কৃতী ভাঁড় বা ভাঁড়ামির কবিরূপে যুগন্ধর হয়ে রইলেন তিনি, যুগস্রষ্টার গৌরব থেকে রইলেন বঞ্চিত। দেশের অবক্ষয়কালের শিকাব হলেন এক অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ ভারতচন্দ্র। জাতি বঞ্চিত রইল এক সম্ভাব্য মহৎ কাব্য থেকে। তবু অন্নদামঙ্গল এক হিসেবে আগাগোড়া মৌলিক রচনা ঃ হর-গৌরীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য, ব্যাস ও গৌরী আখ্যান, হরিহোড় আখ্যান, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, ভবানন্দ কাহিনী, প্রতাপাদিত্য-মানসিংহের ঐতিহাসিক যুদ্ধ কাহিনী প্রভৃতি অনেক মৌলিক উপাখ্যানের সমষ্টি।

ভাবতচন্দ্রের প্রথম রচনাও কালপ্রভাবেই সত্যপীরকথা নামের ব্রতকথা। খণ্ড কবিতাও রচনা করেছিলেন তিনি, যেমন বসন্ত, বর্ষা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধার উক্তি, হাওয়া, বাসনা, ধেড়ে ও ভেড়ের সমান রূপ বর্ণন, বলি রাজার উক্তি, বৃন্দাবলীর উক্তি, চণ্ডীনাটক (নটীর উক্তি, সূত্রধারের উক্তি, মহিষাসুরের উক্তি, প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি) পত্র প্রভৃতি ছাড়াও তিনি হিন্দিতে ভাটের ও রাজার সংলাপ, আর সংস্কৃতে নাগাষ্টক (১৭৫১ খ্রীঃ) রচনা করেন এবং মৈথিল কবি ভানুদত্তের শৃঙ্গার শাস্ত্রগ্রন্থের তিনটে শ্লোকের, রসমঞ্জরীর (ভাবানুবাদ) ও চৌরপঞ্চাশতের বঙ্গানুবাদ করেন। সংস্কৃত বাঙলা ফারসি এবং হিন্দিভাষার মিশ্রপ্রয়োগে কবিতা রচনা করেও বহু ভাষাবিৎ এ কবি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তির স্বাক্ষর রাখেন ঃ

শ্যামহিত প্রাণেশ্বর বায়দকে গোয়দ রুবর,
কাতর দেখে আদর কর কাহ মর রো রোয়কে।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা, চুঁ লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, মেত্তিমে কাহে শোয়কে।
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দরজানে মন আয়ৎ খোশি
আমার হৃদয়ে বসি প্রেম করে খোস্ হোয়কে।

বৈষ্ণব পদ নয়, ছড়া নয়, গানও নয়, বর্ণনামূলক গাথাও নয়, গীতাত্মক খণ্ড কবিতা রচনার শুরুও এক হিসেবে ভারতচন্দ্রেব হাতেই। তা ছাড়া ভারতচন্দ্রের গোটা অন্নদামঙ্গলে কিংবা রসমঞ্জরীতে স্থানে স্থানে স্তবকে স্তবকে নিখুঁত গীতিকবিতা সুলভ। এ অংশগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত হলে ভারতচন্দ্রকে আধুনিক গীতিকবিতারও জনক বলে স্বীকার করতে হবে। যেমন বন্দনাংশে বৈষ্ণবপদাবলীর আদলে ললিত মধুর ত্রিপদীতে রয়েছে নানা দেবতার রূপ-গুণের বর্ণনা, কৈলাস বর্ণন, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ, বিদ্যার বিরহ, অথবা—

ক. আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো
খ. আমারে ছাড়িও না ভবানী
গ. কেবা এমন ঘরে থাকিবে
ঘ. আমারে শঙ্কর দয়া কর হে,
ঙ. ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে
চ. কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল
ছ. আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে
জ. কারে কব লো যে দুঃখ আমার
ঝ. মোর পরাণ পুতলী রাধা
প্রভৃতি নানা অংশ স্মর্তব্য।

বলেছি অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিদ্যাসুন্দর অংশ ব্যতীত সবটাই এক অর্থে মৌলিক রচনা। দেবতাখণ্ডটিও নামে মঙ্গলকাব্য বটে, কিন্তু অন্য মঙ্গলকাব্যের মতো এ অংশের লক্ষ্য মর্ত্যে পূজা প্রচাব নয়, এ অংশে তাই কোন মর্ত্যমানবের সম্পর্ক নেই, আছে দেবলোকের হরগৌরীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য কথা। কাজেই দেবখণ্ডটি এদিক দিয়ে অভিনব ও অনন্য। অন্নদা যে শিবেরও পূজ্য, এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় এর প্রথমাংশ সমাপ্ত। দ্বিতীয়াংশে রয়েছে ব্যাস-কাশীর বৃত্তান্ত। এটিও হরগৌরীর বিরোধ, ব্যাসের দ্রোহ, লাঞ্ছনা এবং পরাভবের কাহিনী। এটিও সাধারণ মর্ত্য মানবসম্পর্কহীন। তারপরে বর্ণিত বিষয় মর্ত্যে পূজা প্রচার লক্ষ্যে স্বর্গের বসুন্ধরকে হরিহোড় রূপে মর্ত্যে প্রেরণ ও হরিহোড়ের পূজার মাধ্যমে অন্নদাদেবীর মর্ত্যমানবসমাজে প্রতিষ্ঠা। এ অংশে কন্দল ও দুষ্টভাব যে অন্নদার অপ্রিয়, তা-ই প্রতিপাদ্য হয়েছে 'যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে'। আবার নলকুবরকে ভবানন্দরূপে মর্ত্যে প্রেরণ এবং তাঁর মাধ্যমে দেবীব দিল্লীর বাদশাহ থেকেও স্বীকৃতিলাভ, অন্নদাভক্ত ভবানন্দের ধনে-মানে যশে-সুখে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির বর্ণনায় উপাখ্যান সমাপ্ত। —এ চারটে কাহিনীই ভারতচন্দ্রের তৈরী, যদিও আদল ও উপকরণ মিলেছে নানা পুরাণ ও লোকশ্রুতি থেকে। মানসিংহ খণ্ডটি রচিত হয়েছে অন্নদাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা রূপে তাঁরই অনুক্ত অভিপ্রায়ক্রমে। ভবানন্দ মজুমদারের নায়ক হবার মতো যোগ্যতা ছিল না—তাই ভারতচন্দ্র রাজপুরুষ রাজা মানসিংহকেই নায়ক বানিয়েছেন এবং ইতিবৃত্ত-ইতিহাস বিরল সেকালে ভারতচন্দ্রের শোনা ছিল মাত্র মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং প্রতাপাদিত্যের পরাজয়সংবাদ। কাহিনী-বিরল কাব্যরচনা সহজ নয়, অথচ অন্নদাতাকে তুষ্ট করতে হবে,—তাই বাঙালী হিন্দুসামন্তের সর্বনাশকারী বিভীষণ-প্রায় ভবানন্দকেও লোকগ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব রূপে দাঁড় করানোর দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়েছে। বুদ্ধিমান ভারতচন্দ্র মিশ্র ভাষায় তুচ্ছ কথায় জাল বুনে ভাঁড়ামির ভিয়ান দিয়ে কৌতুক, পরিহাস ও বিদ্রূপের আভরণে সজ্জিত করে দেবতা ও মানবকে কালী ও কৃষ্ণচন্দ্রকে সুকৌশলে তুষ্ট করেছেন। অঢেল হাসির খোরাক পেয়ে খুশী হয়েছে সরল সাধারণ পাঠকও। এবার সুভাষিতবুলির আপ্তবাক্যেরও বাক-প্রতিমার কিছু নমুনা দিচ্ছি, এগুলো ভারতচন্দ্রের অসামান্য বুদ্ধি জ্ঞান প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ ঃ

১. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

২. নারী যার স্বতন্তরা
সে জন জীয়ন্তে মরা।
তাহার উচিত বনবাস।

৩. বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।
তাহার অর্ধেক চাষ।
রাজসেবা কত খচমচ

৪. বাপে না জিজ্ঞসে।
মায়ে না সম্ভাষে।
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।

৫. হাভাতে যদ্যপি চায়।
সাগর শুকায়ে যায়।

৬. ঘরে অন্ন নাহি যার।
মরণ মঙ্গল তার।
তার কেন বিলাসের সাধ।

৭. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

৮. জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া
মার কাছে পুত্র যায়
বাটে দিলে তাড়া।

৯. মাতঙ্গ পড়িল দরে।
পতঙ্গ প্রহার করে।
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

১০. দৈব রুষ্ট যার। বুদ্ধি নাশে তার।

১১. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

১২. দুর্দৈব যখন ধরে
ভাল কর্ম মন্দ করে।

১৩. বুড়া বয়সের ধর্ম অল্পে হয় রোষ
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ।

১৪. জ্ঞানের সন্ধানে কর অজ্ঞানে কি ফল

১৫. অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।

১৬. কর্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার
কর্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার।

১৭. গৃহিনীর পাপপুণ্যে ঘর থাকে মজে।

১৮. পর দুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে

১৯. খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।
২০. যত্ন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
২১. নীচ যদি উচ্চভাষে
সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।
২২. বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
২৩. বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
২৪. বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।
২৫. যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে।
২৬. গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।
২৭. বড় পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
২৮. যাহার লাগিয়া। চুরি করে গিয়া।
সেই জন কহে চোর।
২৯. মানিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ।
৩০. পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে
হীরার ধার।
৩১. ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
৩২. মৃগ হয়ে দিবে কি
সিংহের ঘরে হানা।
৩৩. কার ঘাড়ে দুটো মাথা
এ কর্ম করিবে।
৩৪. সে কহে বিস্তর মিছা
যে কহে বিস্তর।
৩৫. শিলা জলে ভাসি যায়
বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।
৩৬. যার কর্ম তার সাজে।
অন্য লোকে লাঠি বাজে।
৩৭. ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
৩৮. যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।
৩৯. ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়
হায় বিধি পাকা আম
দাঁড় কাকে খায়।
৪০. ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ
পদ্মে মধু খায়।
৪১. মিছাকথা সিচা জল কতক্ষণ রয়।
৪২. সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটনী সে বা।
৪৩. না ধরিলে রাজা বধে,
ধরিলে ভুজঙ্গ।
৪৪. বিপত্তি পড়িলে বুঝি
বুদ্ধি শুদ্ধি যায়।
৪৫. লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যা
পশুপক্ষী সাপমাছ কে কোথা এড়ায়
৪৬. হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।
৪৭. সহসা করিতে কর্ম ধর্ম শাস্ত্রে মানা
৪৮. জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।
৪৯. বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
৫০. অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।

৫১. অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে
সুর মাথে।
৫২. দুইনারী বিনা নাহি পতির আদর।
৫৩. দু'সতীনা ঘরে দাসী অনর্থের মূল,
৫৪. সুয়া যদি নিম দেয় সে হয় চিনি
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি।

বাক প্রতিমার বা জীবন্ত চিত্রের ও বাকপটুতার দৃষ্টান্ত :

১. মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।

২. মেনকা :
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়
হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়।
ওরে বুড়া আটকুড়া নারদ অল্পেয়ে
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।

৩. মেনকা :
নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা
কোচনীর বাড়ি তবে কেমনে যাইবা।

৪. শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়িটির বোল
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল...।
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক...।
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি।
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্নবস্ত্র দিয়া
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া...
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ? ...
ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যে পান ঠাকুর

তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর।...
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন গুয়া পান
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভূয়া।
দেবীর ছলনা :
ঝাঁকর মাকড় চুল নাহি আদি সাঁদি
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।
ভেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি
কোটি কোটি কান কোটারির কিলিকিলি।
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে।..
শতগাটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।...
ফেলিয়া ঝুপরি লড়ী আহা উহু করে...
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল।

৬. প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড়হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

৭. ঠক্‌ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি
চাকুরীর মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি।

৮. ঘরে গিয়া আর কি দেখিবে ছার
মিছার সংসার, ভাতার জরা
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী—
ননদী নাগিনী বিষের ভরা।

৯. কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।
গাল ভরা গুয়া পান পাকিমালা গলে
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে।
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।...
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়।

১০. তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ
মানিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ।

আলাউল, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি দু'চারজন কবি সংস্কৃত ছন্দের বাঙলায় প্রয়োগ করবার চেষ্টা আগেও করেছেন এবং সফলও হয়েছেন, তবে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দের ললিত মধুর বহুল প্রয়োগে বাঙলা ছন্দের দিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন—এ সত্য মানতেই হবে। এ কালে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও নজরুল ইসলামই বাঙলা ছন্দে বৈচিত্র্য দান করেছেন।

১. ভুজঙ্গপ্রয়াত : লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।
ফণাফন ফণাফন ফণীফণ্ন গাজে
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।

২. তূণকছন্দ ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
প্রেতভাগ সানুবাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে।

৩. ছড়ার ছন্দ উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শণের লুড়া
ছারকপালে ছাইকপালে দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।

৪. ছড়ার ছন্দ গর গর গর গরজে ফণী। দপদপ দপ দীপয়ে মণি
ধক্ ধক্ ভালে অনল। তর তর তর চাঁদমণ্ডল।

৫. মাত্রিকছন্দ · কলাকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিয়া অন্নপূর্ণা মণিদেউলে
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ডল ঢল উছলে কূলে।

৬. তোটক ছন্দ : নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া
পবিধান ধুতি পড়িতেছে খসিয়া।
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল।

ভাতরচন্দ্রেব কাব্যে আরো কিছু নতুন ছন্দ :

৭. কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে
ধবি বাণ খরশান হান হান হাঁকে
চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি হয়
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়।

৮. মালিনী কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া।

৯. হায়রে বিধাতা নিদারুণ
কোন দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুঃখ মধ্যে দিন কত সুখ,
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ।।

১০. কেহ লহ পড়া পঞ্জর শুয়া
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া,
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া
কেহ লহ পাখা জলের ঝারী।

ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষপরম্পরা এরূপ : রাজা কৃষ্ণ রায়-মহেন্দ্র রায়-গোপী রায়-ভূপতি রায়-সদাশিব-নরেন্দ্রনারায়ণ-ভারতচন্দ্র রায়।

রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র উভয়েই ফুলিয়ার সুপ্রাচীন ও সুখ্যাত মুখটি বংশের সন্তান। বর্তমান বর্ধমান জেলার ভুরসুট (ভুরিশিট, ভূরীশ্রেষ্ঠ) পরগণার পাণ্ডুয়ায় [পেঁড়োয়] এক ছোট জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়। ১১১৩ বঙ্গাব্দে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের পেঁড়োয় তথা রাধানগরে জন্ম হয়। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের বিরূপতায় [রাজবল্লভের কার্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য] নরেন্দ্রনারায়ণ হৃতসম্পদ হয়ে চরম দারিদ্র্যে পতিত হন। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট এলাকার নওয়াপাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে থেকে তাজপুর গ্রামের টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পড়তে থাকেন। এবং অল্প বয়সেই মামার বাড়িতে থাকাকালেই সারদাগ্রামের কেশবকুণি আচার্য পরিবারে বিয়ে করে নিজের পরিবারের বিরাগভাজন হন; কিছুকাল পরে হুগলীর দেবানন্দপুরে প্রথমে হীরারাম রায়ের আশ্রয়ে এবং পরে রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে থেকে ফারসি ভাষা আয়ত্ত করেন। এখানেই দুই আশ্রয়দাতার আগ্রহে দুটো সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্যকথা রচনা করেন তিনি। রামচন্দ্র মুন্সীর আগ্রহে রচিত সত্যনারায়ণ ব্রতকথা 'সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা' অর্থাৎ ১৭৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এর পরে কবি বাড়ি ফিরে এসে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কাজে বর্ধমান রাজদরবারে

পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হলে কোন কারণে বর্ধমানরাজ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে বের হয়ে তিনি উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। উড়িষ্যার মারাঠা প্রশাসক শিবভট্টের অনুগ্রহে শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে বৈষ্ণব বৈরাগী হয়ে সদলে বৃন্দাবনে যাবার পথে হুগলীর খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্যালিকাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়। তারপরে ফরাসডাঙ্গায় ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সুপারিশে মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি পেয়ে কৃষ্ণনগরের জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি হলেন ভারতচন্দ্র। এবং বার্ষিক ছয়শ' টাকা রাজস্ব স্থির করে কবি মূলাজোড় গ্রামটি ইজারা নিলেন। মূলাজোড়েই কবি স্থায়ীনিবাস নির্মাণ করেন। শেষাবধি তিনি কৃষ্ণচন্দ্র থেকে মূলাজোড়ে ষোল বিঘা এবং পার্শ্ববর্তী গুস্তেগ্রামে একশ' পাঁচ বিঘা জমি লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর রূপে পেয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণচন্দ্র থেকে মূলাজোড় পত্তনি নিলে বর্ধমানরাজের গোমস্তা রামদেব নাগ খাজনা আদায় সূত্রে প্রজাদের পীড়ন করতো। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত দ্ব্যর্থবোধক কবিতা নাগাষ্টক লিখে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এর অত্যাচারের কথা জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। নাগাষ্টক ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে রচিত। এ সময়ে ভারতচন্দ্রের বয়স ছিল চল্লিশোত্তর। মনে হয় এর পরেই 'রায়গুণাকর' উপাধি পেয়ে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন তিনি। 'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।' অন্নদামঙ্গলে কবিপ্রদত্ত এ সন হচ্ছে বেদ-৪, ঋষি-৭, রস-৬, ব্রহ্ম-১ = ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দ। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বহুমূত্ররোগে তিপ্পান্ন বছর বয়সে প্রৌঢ় ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্রের একপত্নীর তিনপুত্র—পরীক্ষিৎ, রামতনু ও ভগবান। ভগবানের বংশধরেরা মূলাজোড়ে আজো বর্তমান।

ভারতচন্দ্র ছিলেন বিদ্বান ও চোখ-কানখোলা পরিবেশ-সচেতন সতর্ক মানুষ। তাঁর মধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা সুসংহত ও সমন্বিত হয়েছিল। সমকালীন জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়মনীতির ভ্রষ্টতা এবং এর কারণ ও অনিবার্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই জীবনে সমাজে প্রশাসনে কোথাও বৃহৎ ও মহৎ কোন আদর্শ বা প্রেরণা জিইয়ে রাখা অসম্ভব বলেই মেনে ছিলেন। শেষপ্রান্তে না ঠেকা পর্যন্ত যে পতন রোধ করা যাবে না, তাও তিনি বুঝেছিলেন। অনর্থক বলেই তাঁর এতোবড়ো প্রতিভা কোন মহৎ সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়নি বরং বলা চলে কেবল ইয়ার্কিতেই অবসিত হয়েছে। মানুষ ভবিষ্যৎ সুদিনের আশা-ভরসা নিয়েই বাঁচে। হতাশ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বেপরওয়া বাচালতায় আর অশ্লীল রসিকতায় ভরা। তাঁর কাব্যে দেব-মানব সমভাবে কৌতুকের পরিহাসের ও বিদ্রূপের পাত্র। দেবতারও গুরুগম্ভীর ভাব-কর্ম-আচরণ উপহাসের বিষয়। সবটাই তিনি বর্ণনা করেন লঘুভাবে ও হালকা চালে। তীক্ষ্ণধী মনীষী কবির জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা তবু গুহায়িত থাকেনি, প্রবাদ প্রবচন সুভাষণ আপ্তবাক্য ছাড়াও অলঙ্কারের অবয়বে অসংখ্য বাকপ্রতিমা মণি-মুক্তোর মতো স্থিরবিজুলির মতো ঝিকিমিকি করছে তাঁর কাব্যের সর্বাঙ্গে। সাহিত্য জগতের সর্বকালের অনন্য পুরুষ শেক্সপীয়ার ছিলেন অসামান্য বাকপটু ও অতুল্য লোকচরিত্রবিৎ—এ আমরা জানি। সীমিতক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রও আমাদের গোটা মধ্যযুগের সাহিত্যাঙ্গণে ছিলেন তেমন বাকপটু ও ভাষাশিল্পী। ভাষা ছিল তাঁর হাতে কুমোরের কাদার মতো। কাব্যদেহ নির্মাণে তাঁর ভাষা, ছন্দোবোধ ও শিল্পরুচি ছিল অতুল্য আর বিন্যাসে নৈপুণ্যও ছিল কুমোরের নিপুণ হাতের ও নিখুঁত চাকের মতোই।

বিবিধ অপ্রধান দেবদেবীর পাঁচালী

ক. শীতলা

প্রদাহযুক্ত বসন্তরোগের প্রমূর্ত দেবতার সুভাষিত বিপরীত নাম শীতলাদেবী। উল্লেখ্য যে শীতলা, ষষ্ঠী, ওলা, শনি, দুষ্টা সরস্বতী প্রভৃতি লৌকিক অপদেবতাদের স্থান অর্বাচীন পুরাণেও রয়েছে। প্রাচীন পুরাণেও প্রক্ষিপ্তভাবে ঠাঁই হয়েছে তাঁদের। এসব অরিদেবতা বৌদ্ধ যুগেও পূজিত হয়েছেন এমনকি সম্ভবত এঁরা যাদুবিশ্বাসের যুগেও কোন না কোন নামে ও শক্তিস্বরূপে বিদ্যমান

ছিলেন। কেননা এসব অদৃশ্য অরিশক্তি অসহায় রোগভীরু ক্ষতিভীরু ও মৃত্যুভীরু মানুষের শঙ্কা-ত্রাসের কারণ ছিলেন। বিশেষত কোন কোন রোগ যেমন ওলাওঠা ও বসন্ত প্রতিকারহীন মহামারী আকারে দেখা দিয়ে ঘর-গাঁ-গঞ্জ উজার করে দিত। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী শীতলার উদ্ভব সম্বন্ধে বলেছেন যে রাজা নহুষের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শেষে

যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল।.....
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।

ব্রহ্মা বলেন ঃ যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।

উপাখ্যানের মাধ্যমে শীতলামাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে পাঁচালীতে। শীতলামঙ্গলও মুখ্যত রাঢ় অঞ্চলের সৃষ্টি।

১. **নিত্যানন্দ চক্রবর্তী**ই সম্ভবত শীতলামঙ্গলের আদি কবি। ইনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। কবির ভাষায় ঃ

কাশী জোড়া সৃষ্টি পাড়া অতি বিচক্ষণ
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ
শীতলামঙ্গল রচে পান সুধামত।

রাজনারায়ণের সভায় নানা পুরাণ অনুলিখিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১৬৯৯ শকাব্দে এবং ১৭০৫ শকাব্দে বৃহন্নারদীয় পুরাণ অনুলিখিত হয়। অতএব নিত্যানন্দ এসময়ে অর্থাৎ ১৭৭৭-৮৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর শীতলামঙ্গল রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তাঁর পিতৃপুরুষের পরম্পরা এরূপ ঃ ভবানীমিশ্র-মনোহরমিশ্র-চিরঞ্জীব-মহামিশ্র-চৈতন্য ও নিত্যানন্দ-'গাহে ভেবে শীতলাচরণ'।

২. **বল্লভ**—আঠারো শতকের প্রথমার্ধের কবি বল্লভের আত্মপরিচয় এরূপ ঃ পুরুষোত্তম-চৈতন্য-শ্যাম-গোপাল-শ্রীবল্লভ (কবি)। পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল যথাক্রমে হস্তিনানগরে, মান্দারণে এবং পরে বৈদ্যপুরে। এখানেই কবির জন্ম ও নিবাস। ভণিতা ঃ 'শ্রীকবি বল্লভ রস গায়। শ্রীকবি বল্লভ গায় মধুর সঙ্গীত।' ইনি চৌষটি প্রকার বসন্ত রোগেব বর্ণনা দিয়েছেন।

৩. **কৃষ্ণরাম দাস**—রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কমলামঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালী রচয়িতা নিমতানিবাসী কৃষ্ণরামদাসও একখানি শীতলামঙ্গল রচনা করেছিলেন, তাঁর পরিচয় রায়মঙ্গল ও কালিকামঙ্গল সূত্রে পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

৪. **মানিকরাম গাঙ্গুলী**—ধর্মমঙ্গল প্রণেতা মানিকরামও একখানি শীতলামঙ্গল রচনা করেছিলেন। মানিকরামের পরিচয় ধর্মমঙ্গল অধ্যায়ে রয়েছে। মানিকরামও দুকুড়্যা কাঁঠাল্যা প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার বসন্তের জ্বালা-যন্ত্রণা বর্ণনা করেছেন।

৫-৬ **শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও চন্দ্রচূড়**—শীতলামঙ্গলেব কবি শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর বর্ধমান রাজ্যে তেজশ্চন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭৭০-১৮৩২ খ্রীঃ) বর্তমান ছিলেন। এঁর পুথি মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলেই পাওয়া গেছে। কবি সম্ভবত ওই অঞ্চলনিবাসী ছিলেন। এঁর পুথিতে অপর এক কবির ভণিতাও রয়েছে। যেমন 'বিরচিল চন্দ্রচূড় শীতলার' বরে।

৭. **শঙ্কর**—মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালের অপর কবির নাম শঙ্কর। তাঁর একটি ভণিতায় তাঁর মা মাধবীর নাম মেলে :

মাধবী জঠরে জন্ম সদাচেষ্টা গান কর্ম
বিরচিলা শীতলামঙ্গল।

কবির নিবাস জানা যায় এবং রচনাকালও পাওয়া যায়। নিবাস কলাইকুণ্ড চেতুয়া পরগনা এবং রচনা সমাপ্ত হয় 'সন এগার চুয়াল্লিশ সালে শুক্রবার সন্ধ্যাকালে শুক্লপক্ষ আঠাশে আশ্বিন', সেদিন ছিল 'কাতর শঙ্কর বলে। ঝড় বৃষ্টি মহীতলে। শীতলা সদয় সেদিনে।' অতএব ১১৪৪ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে এ কাব্য রচিত। এঁরা ছাড়াও দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, গঙ্গারাম দত্ত, ঘনরাম, কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, রঘুনাথ দত্ত নামের কবিগণও শীতলামঙ্গল রচয়িতা বলে জানা যায়।

খ. ষষ্ঠীমঙ্গল

ষষ্ঠী শিশু সংহারক অরি দেবতা। শীতলা প্রভৃতির মতো তাঁকেও তোয়াজ-স্তুতিতে তুষ্ট রেখে পূজো দিয়ে অর্ঘ্য খাইয়ে শিশুজীবনে নিরাপত্তা দানই ষষ্ঠী পূজার ও পর্বের লক্ষ্য। আগেই বলেছি সব লৌকিক দেবতাই কালক্রমে পুরাণে ঠাঁই পেয়েছেন এবং তাঁদের মাহাত্ম্য প্রমাণক উপাখ্যানও বানানো হয়েছে ষষ্ঠীমঙ্গলেও কাহিনী রয়েছে। গাঁয়ে গাঁয়ে ষষ্ঠীদেবীর ষষ্ঠীতলা থাকে। মুসলমানরাও শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পরব করে বা করত এবং আমপাতা পুড়িয়ে শিশুর নাম থুইত এদিনে। ষষ্ঠীও মুখ্যত রাঢ়ে সুহ্মে জনপ্রিয় দেবতা। তাই ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যও রচিত হযেছে পশ্চিমবঙ্গেই।

১. **কৃষ্ণরাম দাস**–রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল প্রভৃতি রচয়িতা নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠীমঙ্গলও রচনা করেছিলেন। তাঁর পরিচয় রায়মঙ্গল প্রসঙ্গে দেয়া হয়েছে। ষষ্ঠীমঙ্গল রচনার কাল 'কবি কৃষ্ণরাম বলে ষষ্ঠীর মঙ্গল। মহী শূন্য ঋতু চন্দ্র শক সংবৎসর।' এতে ১৬০৭ শক বা ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দ হয়।

২. **রুদ্ররাম চক্রবর্তী**–কবি সম্ভবত দক্ষিণ বঙ্গের বা খুলনা জেলার। কবির পিতার নাম গঙ্গারাম বিদ্যাভূষণ। ষষ্ঠীদেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি এ পাঁচালী রচনা করেন। তাঁর কাব্যে রয়েছে তেরোটি পালা এবং তিনটে আখ্যান। ইনি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদের কবি।

৩. **শঙ্কর**–মেদিনীপুরের ঘাঁটাল অঞ্চলের অধিবাসী শীতলামঙ্গল প্রণেতা কবি শঙ্কর একখানি ষষ্ঠীমঙ্গলও রচনা করেছিলেন। কবির পিতার নাম সীতারাম। জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম গোবর্ধন, নিবাস রানীবাজারে। 'ষষ্ঠীর আদেশে পাই। শ্রীকবি, শঙ্করে রস গান।' তাঁর ষষ্ঠীমঙ্গলে রচনাকাল রয়েছে 'আদ্য বসু চন্দ্রকলা।' এ হেঁয়ালিতে আদ্য–১, বসু–৮, চন্দ্রকলা–১৬ ধরলে ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ হবে রচনাকাল। শঙ্কর বর্ণিত ষষ্ঠীর নাম জলষষ্ঠী।

জলষষ্ঠী নাম মোর জগতে খ্যাতি
প্রথমে করিল পূজা শ্রীহরি-পার্বতী।

ভাষায় ও বর্ণনায় শঙ্কর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অনুকারক। কবিচন্দ্র ও গুণরাজ নামে ষষ্ঠীমঙ্গল রচয়িতা অপর দু'জন কবির নাম জানা গেছে। পরিচয় পাওয়া যায় নি। পীলানিবাসী রামধন নামে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এক কবিও ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করেন।

গ. সারদামঙ্গল

১. **দয়ারাম দাস**—সারদামঙ্গলের কবি দয়ারামের নিবাস ছিল মেদিনীপুরের কাশীজোড়াগ্রামে। অপর কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এ গ্রামের সামন্ত রাজা রাজনারায়ণের সভাসদরূপে শীতলামঙ্গল রচনা করেছিলেন। দয়ারামের প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ, পিতামহ পরীক্ষিৎ, এবং পিতা জগন্নাথ।

২. **বীরেশ্বর** নামে আর এক কবি সারদা বা সরস্বতীমঙ্গল রচনা করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।

৩. **রাজা রাজসিংহ**—ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ ভারতীমঙ্গল রচনা করেন আঠারো শতকের শেষার্ধে।

এমনি করে দুর্গামহিমা জ্ঞাপক দুর্গামঙ্গল সূর্যমাহাত্ম্যজ্ঞাপক সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সুবচনীমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, বরদামঙ্গল প্রভৃতি স্থানীয়ভাবে রচিত হয়েছে, এগুলোর পাঠক সংখ্যা কম। তাই প্রচারও অঞ্চলে সীমিত।

১. সূর্যমঙ্গল বা আদিমঙ্গলের কবি রামজীবন 'ইন্দু রাম ঋতু বিধু শকে বা ১৬৩১ শকে তথা ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পাঁচালী রচনা করেন। এ রামজীবন মনসামঙ্গল প্রণেতাও। মনসামঙ্গল প্রসঙ্গে এঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে।

২. সূর্যকেই 'অষ্টলোকপাল রূপে গ্রহণ করে' 'অষ্টলোকপাল কথা' রচনা করেছিলেন এক মালাধর বসু। অপর দুই সূর্যমঙ্গল রচয়িতার নাম দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ লক্ষ্মণ।

গঙ্গামঙ্গল রচনা করেছিলেন ষোল শতকের চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাধবাচার্য বা মাধবানন্দ, চণ্ডীমঙ্গলের অপর কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী এবং আঠারো শতকের কবি দ্বিজ গৌরাঙ্গ, জয়রাম, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের কালনা-অম্বিকাপুর নিবাসী কবি বংশী ঘোষের পুত্র প্রাণবল্লভ। এঁর পাঁচালীর নাম জাহ্নবীমঙ্গল। এটি বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের সমসময়ে রচিত।

শুভামঙ্গল বা সুবচনীমঙ্গল রচনা করেছিলেন হয়তো অনেক কবিই। একটি গর্তে জল রেখে একুশটি হাঁস মূর্তি জলে ছেড়ে দিয়ে সুবচনী দেবীর পূজা করা হয় গৃহের ও গৃহস্থের শুভকামনায়। দ্বিজ মাধবও সুবচনীমঙ্গল রচনা করেছিলেন—

সুবচনীর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ
রচিল মাধবদ্বিজ অপূর্ব কথন।

অন্যপুথির পাঠ— রচিল মাধব দাস অপূর্ব কথন।

আমাদের ধারণা চণ্ডীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল রচক চট্টগ্রামে কর্মোপলক্ষে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মতো প্রবাসী ষোল শতকের পশ্চিমবঙ্গ সম্ভূত কবি দ্বিজ মাধবই সুবচনীমঙ্গল রচয়িতা। এজন্যেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম থেকেই দ্বিজ মাধবের সব পুথি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। সুবচনীপূজা বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত লৌকিক দেবতা পূজা। এ দেবতা পূর্ববঙ্গে অজ্ঞাত।

সুবচনী বা শুভদামঙ্গলের অপর জ্ঞাত কবির নাম রামজীবন। এঁর নিবাস ছিল হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমা এলাকার আরাণ্ডী গ্রামে। শুভদামঙ্গল বা সুবচনীমঙ্গল ক্ষুদ্রাকার পাঁচালী। একখানি তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত 'তীর্থমঙ্গল' নামে রচিত। রচয়িতার নাম বিজয়রাম সেন। নিবাস ছিল তাঁর চব্বিশপরগনা জেলার ভাজনঘাট গ্রামে। বৈদ্যবংশীয় এ কবির সম্ভবত চিকিৎসাবিদ্যায় উপাধি ছিল বিশারদ। কবি বিজয়রাম সেন খিদিরপুরের ধনীব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সহযাত্রী রূপে উত্তরভারতের যে-সব তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন, সেগুলোর বিবরণ রয়েছে তীর্থমঙ্গলে। ১১৭৭ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ঘরে ফেরেন। অতএব ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে এ গ্রন্থ রচিত। কবির ভাষায় :

সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদমাসে
বিশারদে কহে পুঁথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে।
শিবনিবাসসন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম।

শৈব কবি বলেন : তীর্থমঙ্গল গানে মনোযোগে যে শুনে
তাহাকে সদয় হন শিব।

এক কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচনা করেছিলেন বাসুলীমঙ্গল। গ্রন্থোক্ত রচনাকাল 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে, বাসুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হৈতে।' এতে ১৪৬৬ বা ১৪৯৯ শকাব্দ তথা ১৫৪৪ বা ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। পাঠে প্রমাদ না থাকলে বলতে হবে রাঢ়ের বাসুলীমঙ্গল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেরও পূর্বে রচিত। কবিচন্দ্র মুকুন্দের পিতামহ দেবরাজ, পিতা বিকর্তন মিশ্র এবং মাতা হীরাবতী।

মঙ্গল নামে আরো কিছু বৈশিষ্ট্যবিহীন দেবতামাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী উনিশ শতক অবধি রচিত হয়েছে। রায়মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরামদাসও লক্ষ্মীমঙ্গল রচনা করেছিলেন। এভাবে শিবানন্দ কর রচনা করেন অনুবাদমূলক লক্ষ্মীমঙ্গল। কুমিল্লার শ্রীকাইল গ্রামবাসী ত্রিপুরার এক কবি নন্দকিশোর রচনা করেছিলেন বরদেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্যকথা বরদামঙ্গল। রচনাকাল ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ।

এমনি আরো রচনা রয়েছে যেমন কপিলামঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, কামাখ্যামঙ্গল প্রভৃতি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিবমঙ্গল

১. সর্বভারতীয় দেবতা শিব

শিব সর্বভারতীয় ও সর্বজনীন প্রাচীনতম স্থানিক দেবতা। তিনি তাই আদি ও অধিদেবতা দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ম্ভু। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের দেবতা তিনি। তাঁর ত্রিশূল এ ত্রিশক্তিরই প্রতীক। সৃষ্টির ও প্রজননের দেবতা হিসেবে তাঁর প্রতীক লিঙ্গ, তাঁর বাহন বৃষ এবং তাঁর ভূষণ সর্প। সৃষ্টির দেবতা হিসেবে তিনি নারীর স্বামী-বর দাতা নন কেবল, শস্য-উৎপাদনের সহায় রোদ-বৃষ্টির দেবতাও। সে সূত্রেই তিনি সূর্য ও বৃষ্টিদাতা। বৃষ্টিবাঞ্ছায় তাই শিবলিঙ্গে স্নানান্তে জলবর্ষণ করা হয়, স্নানকালে করা হয় সূর্যস্তব। শিব ও সূর্য অভিন্ন বলেই শিব কুষ্ঠরোগের নিরাময় দেবতা। এ সূত্রে ওরাঁও ঐতিহ্যের ধর্মেশসূর্য, বুনো উড়েদের ধরমদেবতা এবং ধর্মঠাকুর স্মর্তব্য। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভেড্ডিড ধারায় সৃষ্টির উৎস পুংলিঙ্গ নয়—নারী যোনি। তাই শাকাম্ভরী দেবীই সৃষ্টিসম্ভবা। ময়েনজোদারোতে শিব-শাকাম্ভরী—দু-ই মেলে অর্থাৎ সৃষ্টির উৎস হিসেবে উভয়েই সেখানে আগেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরে এঁরাই চণ্ড-চণ্ডী, শিব-উমা, হর-গৌরী, ভব-ভবানী, বৌদ্ধ প্রজ্ঞা-উপায়, বজ্র-তারা, আদিনাথ-আদ্যা প্রভৃতি নানা গুণনামে পরিচিত হন। উল্লেখ্য যে শিব-উমা, চণ্ড-চণ্ডী প্রভৃতি অনার্যভাষার শব্দ।

কালান্তরে স্থানান্তরে এবং শাস্ত্রান্তরে মহাদেবতা শিব-শিবানীর গুণগ্রামের নানা বিস্তার, বিকৃতি ও বৈচিত্র্য ঘটেছে। ফলে শিব হয়েছেন যোগী, তান্ত্রিক, ত্রিগুণাতীত ত্রিকালজ্ঞ অসুরত্রাস কৈলাসবাসী এবং পরমাপ্রকৃতি উমা, গৌরী প্রভৃতি রূপিণী আদ্যাশক্তি হয়েছেন তাঁর পত্নী ও সৃষ্টি-সহায়। সর্বভারতীয় ও সর্বগোত্রীয় দেবতা বলেই নানা গোত্রের কল্পিত গুণ-ও শক্তি প্রতীক শিবে নানা বিরুদ্ধ ও বিপরীত গুণের সমাবেশ ঘটেছে। একাধারে রুদ্রত্ব [উগ্রতা] শিবত্ব [কল্যাণ] ব্রহ্মচর্য ও বামাচার, যোগ ও ভোগ, ক্ষমা ও ক্রোধ, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, মুক্তি ও বন্ধন, সৃষ্টি ও সংহার, রোগ ও নিদান প্রভৃতি তাঁর গুণ ও শক্তি রূপে পরিকল্পিত।

আমরা জানি, অস্ট্রিক-মঙ্গোল-নেগ্রিটো প্রভাবে আদিকাল থেকে ভারতে নারী, পশু, পাখি, বৃক্ষ প্রভৃতি দেবতারূপে পূজ্য হয়, ক্রমে লিঙ্গ ও যোনিপূজা, জন্মান্তরবাদ, মূর্তিপূজা, মন্দির উপাসনা, ধ্যান প্রভৃতি সুস্পষ্ট তাৎপর্যে ও লক্ষ্যে সর্বজনীন স্বীকৃতির ভিত্তিতে মনে-মননে, শাস্ত্রে-আচারে এবং সমাজে-সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা পায়। বেদে পুরাণে ও কাব্যে বহুল চর্চার ফলে এ সবের তাৎপর্য মহিমা মাহাত্ম্য এবং জীবনে প্রয়োগ প্রয়োজন বহুধা, বিচিত্র, দ্বান্দ্বিক ও জটিল হয়ে ওঠে। আদিম ধারণার ও পুরোনোর রেশ ও লেশ থেকে গেছে আর কালে কালে স্থানে স্থানে হয়েছে নতুন চিন্তা-চেতনা জাত তাৎপর্যের ও রূপগুণের বৃদ্ধি আর বিবর্তন। মানুষের ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ প্রয়োজনের প্রসূন বটে, কিন্তু মানুষের সৌন্দর্যবুদ্ধি তাকে কল্পনায় অনুভবে অন্তরে রূপ ও লাবণ্যমণ্ডিত করে, অঙ্গে অবয়বে দেয় শোভা। এ কারণেই আপাত ও প্রত্যক্ষ অপ্রয়োজনটাই মন-মানসের গভীরতর প্রয়োজন মেটায়। কালক্রমে অন্নদানে পালনের দায়িত্ব শিবপত্নী উমাই গ্রহণ করেন। সন্তান গর্ভে ধারণ, স্তন্য দান এবং লালন যেমন নারীর কাজ, সে সাদৃশ্যে তেমনি বীজধারণ, অঙ্কুরিত করণ এবং ফল উৎপাদনও বসুমাতা পৃথিবীর কাজ বলে বুঝে নেয়া আদি মানুষের পক্ষে কঠিন ছিল না। তাই উমা এক সময়ে অন্নস্বরূপ ব্রহ্মের স্থলে অন্নপূর্ণা অন্নদারূপে প্রতিষ্ঠা পান। অন্নদা দুর্গা এখানে শাকাম্ভরীর বিবর্তিত রূপ—দুর্গাপূজাকালীন কলাবধূ পূজা এ সূত্রে

স্মর্তব্য। এদিকে শিবের গুণনাম ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ধন্বন্তরী বৈদ্যনাথ ঈশান ত্র্যম্বক ভুতনাথ ভুজঙ্গধর নীলকণ্ঠ গিরিশ, তারকেশ্বর ভৈরব ধূর্জটী ব্যোমকেশ চন্দ্রশেখর ত্রিলোচন প্রমথেশ স্বয়ম্ভু ধানুকী পশুপতি শঙ্কর দিকপাল শম্ভু ত্রিনয়ন গঙ্গাধর রুদ্র প্রভৃতি নানা গুণনামে ও মাহাত্ম্যে বিচিত্র হয়ে ওঠেন শিব।

এভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিবতত্ত্বের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে।

২. বাঙলার শিব ঃ লৌকিক ও পৌরাণিক

আমাদের বাঙলায় শিবের দুইরূপ ঃ লৌকিক ও পৌরাণিক। আমাদের বাঙালী শিবের পরিবারে রয়েছে পত্নী শিবানী কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পুত্র কার্তিক ও গণেশ এবং পরিজনের মধ্যে রয়েছে জয়া-বিজয়া এবং নন্দী-ভৃঙ্গী। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে বাঙলাদেশ ভৌগোলিক, শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল। সব কিছু যথাসময়ে প্রান্তসীমায় পৌছে না, প্রান্তিক মানুষের উপর প্রভাবও তাই সাধারণভাবে থাকে অগভীর ও অস্পষ্ট। ফলে বাঙলাদেশ হাভাতে দুস্থ বাঙালী পরিবারের কর্মকুণ্ঠ কামুক নিরুপায় বিমূঢ় গৃহপতির মতো করেই গৃহস্থ শিব পরিকল্পিত। এ শিবকে ভারতের অন্যত্র পাওয়া যায় না। আমরা জানি ঐতিহাসিক যুগে আর্যবর্জিত বাঙলাদেশ ও অবজ্ঞেয় বাঙালী ছিল বিদেশী বিজাতি ও বিভাষী শাসিত-শোষিত তথা মৌর্য-সুঙ্গ-কণ্ব, গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কি-মুঘল-ইংরেজ শাসিত। ব্যবসায়ে, বড়পদে, অর্থকর বিভিন্ন পেশায়—এককথায় আত্মবিকাশে তাদের কখনো অবাধ অধিকার ছিল না। তাই শিবের কিংবা অন্যান্য দেবতার গুণ-মান-মাহাত্ম্য কল্পনায়, তাঁদের সঙ্কট সম্পদের ধারণায়, প্রতিবেশ চেতনায় এবং নিজেদের সংকীর্ণ মনের ও সীমিত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কাঙাল মানুষের কাঙাল মানসের পরিচয় সুপ্রকট। শিব যেহেতু দেবাদিদেব মহাদেব, সেহেতু তাঁকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তাঁকে অন্য দেবতার প্রতিপক্ষ করা। আবার শিব যেহেতু ভোলানাথ আশুতোষ আনমনা উদার উদাসীন, সেহেতু শিবকে ভয় করার কারণ থাকে নি বরং তিনি হয়েছেন ভালো লাগার ও ভালোবাসার পাত্র। দেব-মানবের অভয় শরণ এ সরল সদয় দেবতা বুঝে না-বুঝে কত মতলববাজ দেব-মানবকে বর দেন, আর সেই শিববরে ত্রিভুবন জিনে কেউ অনর্থ ঘটায় অন্যান্য দেব-মানবের জীবনে ও সমাজে। যোগে-তন্ত্রে-তত্ত্বে-পুরাণে-কাব্যে তাই শিব-উমাচরিত্ত বর্ণন হয়েছে আবশ্যিক ও অপবিহার্য। বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পরে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ ধর্মঠাকুর পূজারীরা নাথযোগীরা তাদের আদ্যশক্তি আদিনাথ চন্দ্রনাথ কাশীনাথ ভোলানাথকে শিব নামের আবরণে ধরে রেখেছে [ওঁ নিরঞ্জনং নিবাকারং মহাদেবং মহেশ্বরং] আত্মবিস্মৃত বৌদ্ধজ হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধ আদিনাথ চন্দ্রনাথ ভোলানাথ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে শিবই। আর মূলে বজ্রসহজযানী প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ তথা বৈষ্ণবসহজিয়ারা ও বাউলরা তেমনি প্রজ্ঞ-উপায় বা বজ্র-তারা প্রভৃতিকে রাধা-কৃষ্ণ আলি-ফাতেমা প্রভৃতি নামের আড়ালে স্মরণ করে। সর্বত্রই আদি 'শিব-শক্তি' তত্ত্বের প্রভাব লঘু-গুরুভাবে রয়েই গেছে। তাই শক্তির প্রভাবেই শিব শক্তিমান। আদ্যাশক্তিই শিব-শক্তির উৎস। ফলে শিব প্রায়ই উমা-গৌরী-চণ্ডীর অনুগত থাকেন। এবং নানা কাব্যে পুরাণে জগৎ-কারণ কখনো শক্তি আবার কখনো বা শিব। সৃষ্টির উৎস পুংলিঙ্গ কিংবা নারী যোনি সেই বিতর্কিত বিশ্বাসের প্রভাবেই এমন অনিশ্চিত ধারণার উদ্ভব ও পবস্পর বিপরীত অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। বাঙলা দেবমঙ্গল পাঁচালীগুলোতে শিব ক্বচিৎ প্রকৃতিস্থ, শক্তিমান, দায়িত্বসচেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চণ্ডী উমা কালী গৌরী শিবানী নামেব তাঁর পত্নীই সর্বত্র নিয়ন্ত্রী শক্তি। নির্গুণ শিব অবহেলিত, আর তাণ্ডবনৃত্যের সগুণ ক্রুদ্ধ শিব, অসুর সংহারক দক্ষ-যক্ষ বিনাশক শিবই কেবল অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মঙ্গলকাব্যেরও কোথাও কোথাও শিব পরমারাধ্য—যেমন মনসামঙ্গলে চাঁদের কিংবা চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের। আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিব দেবতা তো ননই, এমনকি নিরীহ গৃহস্থ মানুষও নন—কখনো মাথাপাগলা বুড়ো, অবিবেচক স্বামী ও পিতা, কখনো অস্থিরচিত্ত ভিখিরী বিদূষক, কখনো বা গাঁজারু কামুক। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নেও শিব গুণহীন দরিদ্র গৃহস্থ।

লিঙ্গরূপী কিংবা শিলারূপী শিব ক্রমে ত্রিশূলধারী প্রমূর্ত শিবরূপে মন্দিরস্থ হন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় শিবের আঙ্গিকরূপ ও সজ্জা এরূপ :

গলে দোলে মুণ্ডমালা পরিধানে বাঘ ছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়।
অতিদীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত
ফণীবালা ফণীহার ফণীময় অলঙ্কার
শিরে ফণী, ফণী উপবীত।

বৈরাগ্য-প্রবণ শিব আশুতোষ নির্লোভ। বিয়ের সময়ে ধনী শ্বশুর হিমালয় ধনরত্ন হাতীঘোড়া যৌতুক স্বরূপ দিতে চাইলে শিব অসংকোচে বলেন ঃ

কেবল ভিক্ষার অন্ন ঘরে নাহি কড়া
কিমতে পুষিব আমি এই হস্তীঘোড়া।

হিমালয় জামাতাকে জমি দিলেন, তখনো 'শিব মিছে কাজে ফিরে, নাহি চাষবাস।' এমন জামাতাকে শাশুড়ী আর কতকাল 'অন্নবস্ত্র যোগাইবে বারমাস'। এ কর্মকুণ্ঠ নেশাখোর দায়িত্বহীন পুরুষ যৌতুক প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁর আসক্তি ভাঙধুতুরায়। তাই তিনি শ্বশুরকে বলেন, 'ভাঙ্গ থুইয়া খাইবারে দেও একঝুলি'।

তোলা কত বিষ দেও জটা ভাঙ্গের গুড়া।
যারে খাই যুবা হএ আদ্য কালে বুড়া।

যে-বিরুদ্ধ পরিবেশে পর্যুদস্ত পরাভূত মানুষ আশা-ভরসাচ্যুত হয়ে জীবনের মূল্য-মর্যাদা হারিয়ে নিঃসম্বল নির্বিকার জীবনে আপাতত নির্বেদ স্বস্তি উপভোগ করে, আত্মসম্মানবোধ থাকে না বলেই তখন সে-পরিবেশেই তার ভিক্ষায় চুরিতে ও মিথ্যাভাষণে আগ্রহ জাগে। নির্জিত চির-শোষিত পীড়িত বাঙালীর মানসসন্তান এবং জাতীয় প্রতীক ও প্রতিভূ দেবতা শিবঠাকুরও অঙ্গে অন্তরে তেমনি নিঃস্ব নির্লক্ষ্য জীবনের প্রতিম রূপে চিত্রিত। তাই এ শিব বলেন 'ভিক্ষাদুখে সুখে আছি অকিঞ্চন পণে। চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।'

তাছাড়া অন্য আশঙ্কাও রয়েছে 'বাব করে সকলি বেচিয়া লয় রাজা।'

কন্যা সমর্পণের সময়ে শ্বশুর হিমালয় জামাতার হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন—'কুলিনের পো, তোমায় কি বলব আর—আমার কন্যাকে—হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট পূরে ভাত।'—শিব সে অনুরোধ রাখবার চেষ্টা কোনদিনই করেন নি। গয়নার আবদার করে স্ত্রী যখন বলেন—'লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই। হাতনাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই'—পাছে নিরাভরণ হাত অন্যের চোখে পড়ে এ ভয়ে, তখন অপদার্থ স্বামী লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে রুষ্ট হয়ে আস্ফালন করে বলেন—'ভিখিরীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ? বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে।' (রামেশ্বর) শিব কেবল ভাঙ-ধুতুরাসেবী নন, কামুক শিব বাগদিনী-ডোম্‌নী-কোচনী নারীর প্রতিও আসক্ত। এ দুই নেশার প্রভাবে তাঁর কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান বিনষ্ট। তাই স্ত্রীর কিংবা হিতৈষীর ভালো পরামর্শও তাঁর কানে মনে পশে না ঃ

পূর্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হলে এবে
আর নাকি ভিক মাগা শোভা করে শিবে।
তখন ছিলে দুই প্রাণী অখন পাঁচ সাত
আর নাঞি আটে গোসাঞি ভিক্ষার ভাত।
চাষ চষ মহাপ্রভু সুখে অন্ন খাব।

উদাসীন শিব ঘরও ছাড়েন না, গৃহীও হন না। চাষ শুরু করেন, যত্নে শেষ করেন না। পরিবার পোষণের জন্যে ভিক্ষায় যান বটে, কিন্তু ভিক্ষার চাল সংগ্রহে তেমন গা করেন না। খেতে বসে কিন্তু শিব ঘরে ভাত-ব্যঞ্জন আছে কি নেই তা বিবেচনা করেন না। এ অবিবেচক স্বামী ও পিতা পেট পুরে খেতে চান। 'বাপবেটা তিনজনে বারো মুখে পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই

হাঁড়ী পানে চায়।' গরীবের তৃপ্তি তুষ্টি নেই—কেবল পাই পাই খাই খাই ভাব। তাই 'আবো অন্ন আন, অন্ন আন বলে হাঁক' দেন। কেবল তা-ই নয়, কন্যাদের কান-ফোঁড় উৎসবের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথাসময়ে সংগ্রহ করবেন কথা দিয়েও নিজে নিষ্ক্রিয় নির্বিকার থেকে পত্নী পার্বতীকে সমাজে বিপন্না ও লজ্জিত করতে এ স্বামীর বাধে না, বলেন 'তেল সিন্দূর পান গুয়া পায়েস' লাগবে না, কান ফোঁড় কাজ শেষ হওয়ার আভাস পেলেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের সুমুখে 'আমি দাঁড়াব লেংটা হয়ে'–তখন সব পালাবে। এ পরপ্রবঞ্চনায় কত বড়ো আত্মপ্রবঞ্চনা রয়েছে, রয়েছে কত গভীর দারিদ্র্যের অসহায়তার ও করুণ অসামর্থ্যের স্বাক্ষর, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। এমনি করে মেয়েকে বারোমাস দুঃখে রাখেন বলেই শাশুড়ী মেনকা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন–'লোকে মন্দ বলে বলুক, এবার জামাই এলে মায়ে ঝিয়ে করবে ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।'

চিরকাল বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিজিত শাসিত শোষিত ও পীড়িত বলেই নিঃস্ব নিরন্ন আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধহীন বাঙালী কৃষক নিঃসংকোচে পারে ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করতে, নির্দ্বিধায় প্রতারণা প্রবঞ্চনা করতে, চুরির হাত পাকাতে আর কৌশল হিসেবে মিথ্যাভাষণকেই আশ্রয় করতে। বাঙালীর এসব দোষ প্রায় আবহমান কালের। বাঙালী মনীষার প্রসূন এ শিব কল্পনায় বাঙালীর চরিত্রের ও মানসের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

মূলে সৃষ্টির উৎস 'লিঙ্গ' রূপে কল্পিত শিবের কামুক শিবে রূপান্তর আসলে আদি ধারণাই অবচেতন অনুসৃতিজাত। বলেছি সব মঙ্গলকাব্যের উপক্রমে হর-পার্বতীর বন্দনা ও কিছু পরিচিতি রয়েছে। শিবায়ন ছাড়াও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের দেবীখণ্ডে হর-গৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। অভাবক্লিষ্ট প্রান্তিক চাষীর বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের বাস্তবানুগ আলেখ্য রয়েছে দেবীখণ্ডে। নিত্য-অভাবদুষ্ট পরিবারের মানুষের মন থাকে ক্ষুব্ধ, মেজাজ হয় খিটখিটে, কথায় কথায় বাধে ঝগড়া, মুখে মুখে থাকে খোঁটা, কণ্ঠে থাকে বিষ, ঠোঁটে থাকে গালি। হর-গৌরীর সংসারেও ছিল তা-ই। ভারতচন্দ্রের দেবীখণ্ড কিংবা রামেশ্বরের শিবায়ন আধুনিক গদ্যে রূপায়িত হলে আজকের গ্রামীণ দরিদ্র ঘরের ও সমাজের একটা বাস্তবচিত্র সম্বলিত উপন্যাস হয়ে উঠবে বলেই আমাদের ধারণা।

বাঙলার ও বাঙালীর এ লৌকিক শিব নামে দেবতা, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমান বাঙালী, তাঁর দাম্পত্যে, তাঁর বৈষয়িক জীবনে, তাঁর সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, লাভ-ক্ষতিতে তিনি অভাবক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন ভ্রষ্টচরিত্র বাঙালী গৃহস্থ। তাই দেবতা থাকেন নি তিনি, নিত্যদেখা, নিত্যজানা আত্মীয় বন্ধু পরিজন তিনি, সেজন্যেই তিনি এতো আপন, এতো প্রিয়। তাঁর সঙ্গে গ্রামীন গৃহী বাঙালীর ধন-মান ও শ্রেণীগত কোন ব্যবধান নেই।

মঙ্গলকাব্যে যে আমরা দেবকথার আবরণে আবহমান কালের বাঙলাকে ও বাঙালীকে পাই, তার কারণ বাঙালীর দেবতা বাঙালীরই আশা-আকাঙ্ক্ষার, মনন-চিন্তনের, চাওয়া-পাওয়ার প্রমূর্ত প্রতীক ও প্রতিভূ। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিবচরিত্রে 'বীরত্ব, মহত্ত্ব অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর আত্মত্যাগের আদর্শ নাই।' এজন্যেই শিব মাটির মানুষ, দরিদ্র ও কর্মকুণ্ঠ সুখসন্ধানী গৃহী। বাস্তবে নিঃস্ব মানুষের সুখ হচ্ছে মরীচিকা—তাই কামে ভাঙে গাঁজায় সিদ্ধিতে আত্মভোলা হয়ে থাকা।

শিবের ছড়া, শিবের গীত, শিবের গাজন, শিবের গম্ভীরাগান ক্রমবিকাশের ধারায় পরিণামে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন নামে পূর্ণাঙ্গ পাঁচালী আকারে রচিত হয়েছে সতেরো শতক থেকে। অধিকাংশ কবি অবশ্য আঠারো শতকেরই।

চট্টগ্রামে পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্য প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন অন্তত দুজন কবি চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারে আসার পরে, একজন রতিদেব অপর জন রামরাজা। এঁদের গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'মৃগলুব্ধ' ও 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ'।

শিবের গীত গেয়ে শৈব ভিখিরীরা ভিক্ষা করত। ষোল শতকের বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে এর সাক্ষ্য রয়েছে ঃ

'একদিন আসি এক শিবের গায়ন
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর (চৈতন্যের) মন্দিরে
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে।

রংপুব জেলার নাথযোগীদেব মধ্যে যে শিবের ছড়া বা শিবগীতি চালু রয়েছে, তাতে শিবপত্নী চণ্ডীর গয়নাহীনতার ক্ষোভ ও লজ্জার কথা বর্ণিত ঃ

চার ছেইলার মাও হৈলাম তোর ঘরে
দয়া করি চার খানা শাখা নাই পিন্ধাইস মোরে।
ভাশুর আইসে শ্বশুর আইসে অন্নরান্ধি দাওঁ তারে
আমার হাত মুড়া, গোসাঁই তা লজ্জা রাগে তোরে।

শূন্যপুরাণে পাই চাষী শিবের বর্ণনা। শিবানী বলছেন ঃ

আম্মার বচনে গোসাঞি তুমি চষ চাষ
ঘরে অন্ন থাকিবেক পরভু সুখে অন্ন খাব
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়
কত না পরিব গোসাঁই কেওদা বাঘের ছড়।

বাঙালীর ভাত-কাপড়ের চির অভাবের কথাই এখানে পরিব্যক্ত।

বিভিন্ন শাখার মঙ্গলপাঁচালীতেও দক্ষযজ্ঞ বর্ণিত রয়েছে। শিবমঙ্গলও দক্ষ-যক্ষ দিয়ে শুরু। সতীব দেহত্যাগ, হিমালয়ের ঘরে গৌরীরূপে তাঁর জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ, দাম্পত্য, শিবের ভাঙ-গাঁজা-সিদ্ধি-ধুতুরায় আসক্তি, কামুক শিবের দারিদ্র্য, শিবের কৃষিকর্ম, কামুক শিবের কোচনী-ডোমনী-বাগদিনী প্রীতি, কৃষিকর্মে মশা মাছি জোঁক প্রভৃতির উপদ্রব, বাগদিনীবেশে গৌরীর ছলনা, দাম্পত্য কলহ, অভিমানী গৌরীর স্বামীগৃহ ত্যাগ, নারদের মধ্যস্থতা, পিতৃগৃহে গৌরী, শাঁখারীরূপে শিবের শ্বশুরবাড়ি গমন, পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে মানভাঙানো এবং পুনর্মিলন প্রভৃতিই শিবমঙ্গলে বর্ণিত বিষয়। এগুলো বলতে গেলে খণ্ডচিত্রের অগ্রথিত সমষ্টি।

৩. কবিগণ

১. রামকৃষ্ণ রায়

শিবমঙ্গলের জ্ঞাত আদি কবি হচ্ছেন রামকৃষ্ণ রায়। এঁর কাব্যে কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, স্কন্দপুবাণ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণোক্ত শিবকাহিনী সংকলিত হয়েছে। 'শিবের পরম আজ্ঞা মস্তকে বন্দিয়া' কাব্য রচনার শুরু হলেও সরস্বতীই তাঁকে স্বপ্নে কবিত্বশক্তি ও কাহিনী যুগিয়েছেন ঃ

'ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজশক্তি/স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ।' বন্দনাংশে কবির আত্মপরিচিতি সূত্রে জানা যায় ঃ তাঁর পিতামহ ও পিতামহীর নাম যশশ্চন্দ্র ও নারায়ণী এবং নারায়ণীর সতীনের নাম সরস্বতী। মাতামহের নাম সূর্যমিত্র। পিতা কৃষ্ণদাস এবং মাতা রাধাদাসী। এবং 'কায়স্থ দক্ষিণ-বাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি, তিন গোত্র কশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি। আর মিরাস বন্দিনু বাস্তু রসপুর দেশ।' ভণিতা—

রামচন্দ্র দাস গায় শিবায়ন। কবিচন্দ্র ভণে শিব হৈল সাক্ষাৎ। দ্বিজগণে রামকৃষ্ণ করে নিবেদন।
রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল। শূদ্রের রচনা বলিয়া না করিবে ভ্রম।

কথিত আছে যে ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে নব্বই বছর বয়সে কবি দেহত্যাগ করেন। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম কবির রসপুরের বাস্তু দখল করে কবিকে বাস্তুচ্যুত করার পরই কবির মৃত্যু হয়। রামকৃষ্ণের শিবমঙ্গল সতেরো শতকের প্রথম পাদের ক্রান্তিকালেই রচিত বলেই বিদ্বানদের ধারণা। মোট ছাব্বিশটি পালায় বিভক্ত শিবায়নের বা শিবমঙ্গলের শেষের দিকে মনসার সমুদ্রমন্থনের, বলিরাজার, অগস্ত্যের ও সগর রাজার, গঙ্গার, ত্রিপুর ও তারক অসুরের, অন্ধকের, পরশুরামের,

রাবণের ও বাণরাজের উপাখ্যানগুলো বর্ণিত হয়েছে। পাঁচালীর মধ্যে কয়েক স্থলে গদ্যবাক্যে কাহিনীর নির্দেশ রয়েছে। যেমন 'পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এতে সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ। মহিষ পর্বত গিয়া পূর্বকল্পের কথা ক্রোঞ্চকে কহিতেছেন অবধান করহ'।[১] কবির উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ১৩৪৮ শকে অনুলিপীকৃত পুথির পুষ্পিকায় 'শ্রীকবিচন্দ্র বিরচিতা শিবসঙ্গীত পুস্তক সমাপ্তা' পাওয়া যায়।

২. কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অনুবাদক শীতলামঙ্গল প্রণেতা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী একখানা শিবায়নও রচনা করেছিলেন। তাঁর ভণিতার ধরণ এরূপ ঃ

১. শ্রীকবিশঙ্কর গায় হরপদ আশে।
২. শিবের চরণ আশে শ্রীকবিচন্দ্র ভাষে।
৩. সুকবি শঙ্কব গান ভাবি ত্রিলোচন।
৪. হরপদ আশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।

কবি মল্লভূমের সামন্ত 'বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহতেজা'র সময়ে বিষ্ণুপুর এলাকার পানুয়া গ্রামে বসে ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাঁর এ পাঁচালী রচনা করেন বলে অনুমান করা হয়। কবির জন্ম হয় পানুয়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।

৩. রামেশ্বর ভট্টাচার্য

আঠারো শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য মুদ্রিত পাঁচালীর মাধ্যমে লৌকিক শিবের সার্থক রূপকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান ও জনপ্রিয়। তাঁর পাঁচালীর নাম শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন। কবির বংশ পরিচিতি এরূপ ঃ ভট্টনারায়ণ মুনির বংশজ যতি নারায়ণ চক্রবর্তী—গোবর্ধন চক্রবর্তী, পত্নী রূপবতী—রামেশ্বর ও ভাই শম্ভুরাম। রামেশ্বরের দুই স্ত্রী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী, নিবাস অযোধ্যানগরী এবং পূর্ববাস

'পূর্বাবাস বিষ্ণুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙে ঘরে
রাজারাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।

অতএব ঘাটালের যদুপুর গাঁ থেকে বর্ধমানের সামন্ত শোভাসিংহের ভাই হেমৎসিংহ উৎখাত করলে কবি রামসিংহের অনুগ্রহে কৌশিকী তীরে অযোধ্যানগরীতে নিবশিত হয়ে রামসিংহের আগ্রহেই পাঁচালী রচনা করেন। মনে হয় শিবায়ন রচনার শুরু রামসিংহের আমলে এবং সমাপ্তি ঘটে তাঁর পুত্র রাজা যশোবন্ত সিংহের আমলে। মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজা রঘুসিংহের পুত্র রাজা রামসিংহ, তাঁর পুত্র যশোবন্ত সিংহ–'তস্যাপোষ্য (যশোবন্তের) রামেশ্বর তদাশ্রয়ে কর্‌য়া ঘর। বিরচিল শিব-সংকীর্তন'। শিবসংকীর্তনে প্রাপ্ত রচনাকালটি লিপিকর প্রমাদদুষ্ট ঃ

'শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে
বাম হৈল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হৈল সারা।

১৬৫৬ শকে বা ১৭৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে যশোবন্ত সিংহ ঢাকায় দিওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' 'গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেনও ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত শিবায়ন পুথি প্রাপ্তির কথা বলেছেন। ১৭৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেও যশোবন্তসিংহ মুর্শিদকুলি খানের (১৭১২-২৭ খ্রীঃ) অধীনে কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। যশোবন্তসিংহ কর্ণগড়ে বসেই কবিকে প্রতিপোষণ দেবেন

---

১. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২১৮।*

এমন কোন কথা নেই। অতএব যশোবন্ত সিংহের পিতৃ বিয়োগের কিছুকাল পরেই এ কাব্য সমাপ্ত হয়। শকে হল্য চন্দ্রকলা বাম করতলে'-এর থকে চন্দ্রকলা-১৬ কর-২ তলে (পরে অর্থে) রাম-৩ ধরলে ১৬২৩ শকে বা ১৭০১-০২ খ্রীস্টাব্দে শিবসংকীর্তন রচিত বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

দুটো ভণিতা ১. ভব ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর

২. যশোবন্তসিংহে দয়া কর হরবধূ

রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু।

৪. দ্বিজ কালিদাস

দ্বিজ কালিদাস' 'কালিকাবিলাস' নামে এক শিবচরিত রচনা করেন। সংস্কৃতপুরাণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুসৃতি রয়েছে এঁর পাঁচালীতে। এ পাঁচালীতে আগমনী আর বিজয়াগানও রয়েছে। এতে গুরুত্ব দিয়েই হয়তো কবি 'কালিকাবিলাস' নাম রেখেছেন তাঁর কাব্যের। কবি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদের লোক।

৫. দ্বিজ মণিরাম

দ্বিজ হরিহরপুত্র দ্বিজ মণিরাম ওরফে দ্বিজ সুন্দর বা সুন্দর রায় বৈদ্যনাথমঙ্গল প্রণেতা। কবি সম্ভবত সিলেটবাসী ছিলেন। দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবই বৈদ্যনাথমঙ্গলে বর্ণিত বিষয়। এই বৈদ্যনাথ কুষ্ঠ অন্ধত্ব প্রভৃতি রোগের নিরাময় দাতা ঃ

অন্ধ রোগী জরা ব্যাধি কুষ্ঠেত বিখ্যাত

দরশন মাত্রে মুক্ত করে জগন্নাথ।

স্থানিকপ্রভাবে এ দেবতা সূর্য ও ধর্মঠাকুরের প্রতিরূপ।

৬. লক্ষ্মণ বা বিনয় লক্ষ্মণ

ইনি 'শিবের গীত' নামের পাঁচালী রচয়িতা। এটি অঙ্গে ও অন্তরে গীতিকা। কাহিনীও অভিনব। গৌরীর রূপমুগ্ধ চার দৈত্যের মুখে গৌরীর রূপলাবণ্যের কথা শুনে শিব ভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্পোদ্যানের অশোকতরু মূলে এসে পার্বতীকে পেয়ে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। গোপন বিয়ের কথা মুনিদের জানা ছিল না বলে তাঁরা গৌরীর সতীত্বে সন্দিহান হন, ফলে পার্বতীকে সীতার মতোই সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তারপর শিবের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হলো। উপদেশাত্মক ও গীতিকার কবি আঠারো শতকের শেষের দিকে কিংবা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়। আঠারো ও উনিশ শতকের **দ্বিজ ভগীরথ, রাজা পৃথ্বিচন্দ্র, হরিচরণ আচার্য, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, দ্বিজ রামচন্দ্র, প্রাণচন্দ্র, দ্বিজ সৃষ্টিধর** প্রভৃতিও হরচরিত্র রচনা করেন।

৪. পৌরাণিক শিব ঃ মৃগলুব্ধ ও মৃগলুব্ধ সম্বাদ

গল্পসার—হস্তিনার রাজা শৈব মুচুকুন্দকে শিব চতুর্দশীতে ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর রানী এ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শিবপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ প্রভৃতিতে শৈব মুচুকুন্দ রাজার প্রসঙ্গ রয়েছে।

ইন্দ্রের শাপে বিদ্যাধর চিত্রসেন মর্ত্যে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে। একই বনে নিত্য শিকারের ফলে অরণ্য পশুবিরল হয়ে উঠেছে। একদিন তাই এক মৃগের পিছু ধাওয়া করতে করতে রাত্রি হয়ে গেল। ফলে চিত্রসেন শ্বাপদ ভয়ে এক বেলগাছে আশ্রয় নিল। তন্দ্রায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় জেগে থাকার জন্যেই চিত্রসেন বেলপাতা ফেলছিল ছিঁড়ে ছিঁড়ে। গাছের পাদমূলে ছিল শিবলিঙ্গ। ভক্তবৎসল আশুতোষ শিব তাতেই মৃগয়ায় সাফল্যের বর দিলেন চিত্রসেনকে। বরপুষ্ট চিত্রসেন

এবার তাঁর শাপমুক্তির কারণ স্বরূপ মৃগ-মৃগীরূপী শাপগ্রস্ত ভদ্রসেন ও রত্নাবলীর সাক্ষাৎ পেল আর তাদের তিনজনেরই শাপমুক্তি হলো।

চট্টগ্রামেই শিবচতুর্দশীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনী সম্বলিত মৃগলুব্ধ নামের পাঁচালী রচিত হয়।

১. রাম রাজা

মৃগলুব্ধ রচয়িতা রামরাজা সম্ভবত সতেরো শতকের প্রথমার্ধের লোক। এঁর মৃগলুব্ধ বিভিন্ন পালায় নয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ভণিতা সূত্রেই রয়েছে অধ্যায়ের উল্লেখ। যেমন ঃ

১. শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যাএ।

২. শঙ্কর কিঙ্কর রামরাজ ভণে
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে। ইত্যাদি

২. দ্বিজ রতিদেব

দ্বিজরতিদেব 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ' প্রণেতা। তিনি গ্রন্থে বন্দনাংশে আত্মপরিচয় দিয়েছেন পিতা গোপনীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী (বা মধুমতী) ধরণী লুটাইয়া বন্দম যত গুরুজন।

জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শ্বশুর
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর।

এই কবি প্রাচীন আরাকানী শাসনকেন্দ্র চক্রশালা চাকলার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এ গ্রাম এখন পটিয়া মহকুমার শাসনকেন্দ্র পটিয়া-সংলগ্ন গ্রাম। এ গ্রাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ও বর্তমান লেখকের জন্মস্থল।

শিবচতুর্দশী মাহাত্ম্যধারার কাব্য আর রচিত হয়নি। লৌকিক শিব কাহিনী কালক্রমে পুরাণ প্রভাবিত হযে সারল্য, বাস্তবতা ও মানবিক রূপগুণ হারিয়েছে অঙ্গে ও অন্তরে। এমনটি ঘটেছে সব মঙ্গলকাব্যধারায়। যতই দিন গেছে, বৌদ্ধ প্রভাব হয়েছে ম্লান ও ক্ষীণ আর স্মৃতির ও পুরাণের প্রভাব হয়েছে প্রবল, কাহিনীও বিভিন্ন কবির হাতে অল্প-বিস্তর বিকৃত বিশিষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে নানাভাবে। ভাষাও হয়েছে সংস্কৃত শব্দবহুল ও পরিবর্তিত। এটাকে মধ্যযুগীয় নিয়মে ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ ও অগ্রগতি বলেই মানতে হবে।

অন্যবিষয় নিয়ে একখানা পঞ্চাননমঙ্গল রচিত হয়েছিল। কার্তিকের হাতে পরাজিত তারকবীরের উদ্ধারের জন্যে দেবতাদের অনুরোধে শিব পঞ্চমুখে গান ধরলেন। এ বিগলিত সঙ্গীতলহরী থেকে জন্ম হল ব্যাধির দেবতা পঞ্চাননের। তারপর মনসার মতোই পঞ্চানন মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে অবন্তীরাজকে দিয়ে অবশেষে তাঁর পূজা প্রচার করালেন। মণিময় ও মালতী হল এই পাঁচালীর মুখ্য চরিত্র। পঞ্চাননমঙ্গলের কবি দ্বিজ রঘুনন্দন সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদে এ পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কবির গৌরাঙ্গ ভক্তি দেখে মনে হয় তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। এ পাঁচালীতে একটা বারমাসীও রয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

আপোসমুখী সাহিত্য ঃ পীর-পাঁচালী

১. শাস্ত্র ও সমাজের বিবর্তনধারা

জীবন-জীবিকাব ক্ষেত্রে যখন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে কিংবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা জেগেছে, তখনই মানুষ বুঝে না-বুঝে প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তি-বুদ্ধি চালিত হয়েই বেঁচে বর্তে থাকবার জন্যে প্রয়াসী হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাস তার সাক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনের প্রবৃত্তি যৌথ জীবনেও প্রকটিত হয়ে সামাজিক চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-আচরণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এখনকার বাঙলা নামের ভৌগোলিক এলাকার দু'হাজার বছরের মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত চিন্তা-চেতনার ও কর্ম-আচরণের বাহ্য ও স্থূল রূপ আর স্বরূপ অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব এ অঞ্চলের মানুষও নানা সমস্যার ও যন্ত্রণার মুখে বাঁচার গরজেই সাধ্যমতো একটা উপায় বের করেছে। প্রবলতর শক্তির মোকাবেলায় এ মানুষ কখনো কখনো অরণ্যাশ্রিত হয়েছে, কখনো বা নিজেরা প্রবল হয়ে সমতলে নেমেছে—হয়েছে কৃষিজীবী। মঙ্গোলরা কিরাতীয় জীবন পরিহার করে এবং অস্ট্রিক-ভেড্ডিডরা নিষাধ নাম ঘুচিয়ে হয়েছে কৃষিজীবী ও পশুপালক। অরণ্যচারী মানুষ হয়েছে প্রান্তরবাসী। ক্রমে গড়ে উঠেছে গ্রাম ও নগর। অবসিত হয়েছে গোত্রসর্দারতন্ত্র। শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির ও প্রশাসনের রূপও হয়েছে বারে বারে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত।

জৈন-বৌদ্ধ যুগে নন্দরা মৌর্যরা কণ্বরা সুঙ্গরা পুণ্ড্রে নিয়ে এলেন আর্যভাষা ও জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম আর মগধের ন্যায়নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা। তারপরে গুপ্তরা রাঢ়ে পুণ্ড্রে বঙ্গে নিয়ে এলেন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংহিতা নিয়ম-নীতি উৎসব-পার্বণ। তৃতীয় তরঙ্গে এলেন পুণ্ড্রের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সম্ভূত পালেরা মগধ থেকে আবার বৌদ্ধ শাস্ত্র ও আচার-সংস্কার নিয়ে।

এঁদের ভয়ে যারা বনে-জঙ্গলে আশ্রিত হল, তারা তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের শাস্ত্র-সংস্কৃতিব, আচার-আচরণের এবং জীবিকাপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করল। অন্যেরা বিজাতির শাসনে থেকে শাসকের ভাষা-শাস্ত্র-সংস্কৃতি বরণ করে স্বাতন্ত্র্য হারাল। কিন্তু তবু যে-বিশ্বাস-সংস্কারের জন্ম তাদের মনে ও মর্মে, তা নির্মূল হল না, ভিন্ন নামে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধসমাজে রয়ে গেল—তারা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল, জাঙ্গুলী, বৎসলা, আদিনাথ, ধর্মনিরঞ্জন প্রভৃতি নানা নামে ও গুণ-মান-মাহাত্ম্য প্রতীকে। আবার মূলে কর্ণাটদেশীয় দ্রাবিড় সেনেরা যখন হলেন বাঙলার মালিক, তখন তাঁদের ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র সংস্কৃতির পূজা-পার্বণের ও নিয়ম-নীতির আক্ষরিক রূপায়ণবাঞ্ছা স্বধর্মত্যাগী বৌদ্ধ দিয়ে নব গঠিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগের প্রেরণা যোগায়। ফলে সেন আমলে আইনের জোরে মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের অভিব্যক্তি ও রূপায়ন বন্ধ করে দেয়া হয়।

বিদেশী-বিধর্মী তুর্কির শাসকরূপে আবির্ভাবমুহূর্ত থেকেই ক্ষুব্ধ রুষ্ট জনগণ স্ব স্ব বিশ্বাসানুগ ও প্রয়োজন-প্রতীক দেবতার পূজায় ও মাহাত্ম্যকীর্তনে মেতে উঠল—ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণের সমাজের প্রভাবে ঈষৎ ভিন্ন নামে লৌকিক অরি ও মিত্র দেবতারা আবার স্ব স্ব মহিমায় ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আদিনাথ-চন্দ্রনাথ শিবরূপে, প্রজ্ঞা-উপায় হরগৌরীরূপে, অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুরূপে, জাঙ্গুলী বিষালাক্ষী মনসারূপে, আদ্যাশক্তির কালী দুর্গারূপে বন্দিত হলেন। পৌরাণিক মর্যাদায় তেরো শতকের ঊষাকালে এসব দেবতার মাহাত্ম্য কথার মৌখিক উদ্ভব এবং পনেরো শতক থেকে (অর্থাৎ বাঙলায় লেখা সাহিত্যের উন্মেষকালে) লেখ্য বাঙলায় তা লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

নানা প্রসঙ্গে এসব তত্ত্ব ও তথ্য আমরা প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত করেছি।

২. শাস্ত্র ও সমাজ বিপ্লব

কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি তথা চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-আচরণ পূর্বোক্ত নিয়মে কালিক ও স্থানিক বিবর্তন লাভ করে। এমনি করে মানবপ্রগতি থাকে অব্যাহত। এমনি লক্ষণীয় গুরুতর বিবর্তন বা পরিবর্তনকেই উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যুগান্তকারী বিপ্লব নামে অভিহিত করতে চাই। বিবর্তন বা পরিবর্তন স্থানিক ও কালিক প্রতিবেশে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার তাগিদে জরুরী হলেও তা যে সবসময়ে কল্যাণকর বা উৎকর্ষসূচক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা গত দু'হাজার বছরের মধ্যে এরূপ কালান্তর ঘটানো বিপ্লব দেখেছি ঃ প্রথমটির অবসান ঘটে পুণ্ড্রে মগধসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গেই। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে গুপ্তরাজদের আমলে রাঢ়ে-পুণ্ড্রে ও বঙ্গে। তৃতীয় বিপ্লব ঘটে মগধে বৌদ্ধ পালদের চারশ' বছরের রাজত্বকালে। চতুর্থ বিপ্লব হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য বিপ্লব, তা ঘটে সেনরাজত্বে। পঞ্চম বিপ্লব দেখি তুর্কি আমলে লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠায় ও লোকধর্মের জনপ্রিয়তায় আর ষষ্ঠবিপ্লব ঘটে চৈতন্যমতবাদের প্রভাবে, সপ্তম বিপ্লব ঘটে ষোল শতকের শেষপাদে মুঘল বিজয়ের ফলে—পীর-নারায়ণ সত্যের উদ্ভবে। এরপরে উনিশ শতকের প্রতীচ্যবিদ্যা প্রভাবে বিপ্লব ঘটে কোলকাতার শিক্ষিত মানুষের মনে-মননে। তাই পীর-নারায়ণ সত্যই হচ্ছেন বাঙালী সৃষ্ট শেষ দেবতা।

আমরা এ অধ্যায়ে কেবল সপ্তম বিপ্লবের কারণ-করণ আলোচনা কবব।

৩. শ্রেণী দ্বন্দ্ব

আমরা জানি এবং মানি যে জীবনই মানুষের ভাব-চিন্তার ও কর্ম-আচরণের উৎস। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অন্ন এবং মনের পুষ্টির জন্যে আনন্দ—জীবনে এ দুটোর প্রয়োজন মানুষের তো বটেই, হয়তো প্রাণীমাত্রেরই রয়েছে। আমরা এ-ও জানি অন্ন ও আনন্দ, জীবিকাসম্পৃক্ত। হাতিয়ারের, যন্ত্রের ও কৌশলের বিবর্তনে জীবিকাপদ্ধতি বদলায়, সে-সঙ্গে বদলায় পরিবার ও সমাজসম্পর্কিত নিয়মনীতি, রীতি-পদ্ধতি আর আচার-আচরণ। ফলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যগত সম্বন্ধও হয় ভিন্নতর। খাদ্যের ও অন্যান্য চাহিদার উৎপাদনের ও উপভোগের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ও শক্তির খেলায় হার-জিতের ফলে দাসযুগ, সামন্তযুগ, বুর্জোয়াযুগ, সমাজবাদীর যুগ কালিক ও স্থানিক ধারায় আবর্তিত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও এখনো হচ্ছে।

আজো সমাজে আর্থিক, শৈক্ষিক, বৃত্তিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক অবস্থান ভেদে মানুষ নানা প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীতে বিভক্ত, তাই শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অহরহ চলছেই। এর সাধারণ নাম অর্থ-সম্পদের অধিকার নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম।

আজকের জগতে সর্বপ্রকার সম্পদ মুদ্রা-প্রতীকে পরিমেয়, তাই দুনিয়াব্যাপী চলছে কাগুজে নোটের আর মুদ্রারই বিচিত্র লীলা—সে-নিষ্ঠুর লীলায় কারো হয় পৌষমাস আর কারো সর্বনাশ।

আবার রাষ্ট্রসীমার মধ্যেকার আসমানের ও জমিনের নীচের সব সম্পদই জাতীয় সম্পদ (ন্যাশন্যাল ওয়েল্থ)-এ সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ীই একটা রাষ্ট্র ধনী বা দরিদ্র বলে চিহ্নিত হয়।

আমাদের উক্ত সপ্তম বিপ্লবের কারণ ও গুরুত্ব বুঝবার জন্যেই উপর্যুক্ত বিষয়গুলো স্মরণ করা প্রয়োজন এবং এখানেই শেষ নয়, ইতিহাসের অনুসরণে আরো ঘটনার রোমন্থন করে দীর্ঘ কালপ্রবাহ অতিক্রম করার প্রয়োজন হবে।

৪. ষোলশতক থেকে আর্থসামাজিক অবক্ষয়ধারা

১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি বিদেশী তুর্কি শাসকরা এ দেশবাসীর হয়ে স্বাধীনভাবে এদেশ শাসন করেছেন, ইতিহাসে এ দু'শবছর 'স্বাধীন সুলতানী আমল' নামে পরিচিত। এ সময়ে দেশের সম্পদ তথা জাতীয় সম্পদ রাজ্যসীমার মধ্যেই হাত বদল হয়েও নিবদ্ধ থাকত, বিদেশে পাচার হত না। কৃচিৎ কিছু অর্থ বিদেশী চাকুরেরা তাদের অর্জিত মুদ্রাহিসেবে রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেত। কাজেই ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও, সম্পদ হস্তান্তর

হলেও, বাণিজ্য মুখ্যত পণ্যবিনিময় নির্ভর ছিল বলে জাতীয় সম্পদ প্রায় অটুট থাকত। এজন্যে স্বাধীন সুলতানী আমল ছিল বাঙলার ও বাঙালীর দেশ ও জাতি অর্থে সমৃদ্ধির কাল সামগ্রিক ও সামষ্টিক হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যের ও সাচ্ছল্যের যুগ। ইলিয়াসশাহী, গণেশশাহী, নাসিরশাহী (২য় ইলিয়াসশাহী) ও হোসেনশাহী রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার ও বাঙালীর সুদিনেরও অবসান ঘটল পরবর্তী চারশ' দশ বছরের জন্যে। স্বাধীন সুলতানী আমলে দেশের সম্পদ দেশে থাকতো, তাই গাঁ-গঞ্জের মানুষেরও আর্থিক সাচ্ছল্য ছিল, ইংরেজদের মতোই নগণ্য সংখ্যক শাসক তুর্কিরা বাস করত শাসনকেন্দ্রে, আর দেশের সর্বত্র অধিবাসীরা ছিল গোড়ার দিকে সবাই হিন্দু, সম্পদ ও শাসন-প্রশাসন ছিল হিন্দুর হাতে, এসময়ে নতুন মানুষ শাসকদের সংস্পর্শে আসার ফলে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে শাসিত মনে যে নতুন তত্ত্বের তরঙ্গ সৃষ্টি হল, তার ফলেই বাঙলার মনীষার বিচিত্র বিকাশ ও প্রকাশ ঘটেছিল স্বাধীন সুলতানী আমলে—উনিশ শতকে যেমনটি হয়েছিল প্রতীচ্যবিদ্যার প্রভাবে। এ তত্ত্ব উপলব্ধি করেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে পাঠান আমলে বাঙালী স্বাধীন ছিল, সাম্রাজ্যবাদী মুঘল বিজয়েই অর্থাৎ আকবরের সময় থেকেই বাঙালীর পরাধীনতার শুরু।[১]

কিন্তু বাঙালীর দুর্দিনের দারিদ্র্যের শুরু আরো আগে থেকে। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুনের গৌড় অধিকার, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই শের শাহর বঙ্গবিজয় ও বঙ্গের দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্তি, ১৫৫৪-৬০ খ্রীস্টাব্দে শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজীর রাজ্যচ্যুতি ও তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহর পিতৃসিংহাসন উদ্ধার এবং তাঁর পুত্র গিয়াসসুদ্দীন জালাল শাহর রাজত্ব এবং তারপরে অপর সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা করে ১৫৬০ সনে তাজখান কররানীর ও সোলায়মান কররানীর সিংহাসন অধিকার, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘলবাহিনীর বঙ্গবিজয় প্রভৃতি ১৫৩৮-৭৫ খ্রীস্টাব্দে সাঁইত্রিশ বছরের পরিসর রাজ্যে প্রশাসনিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার কাল।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘলদের বিজয় ঘটলেও এবং দাউদ খান কররানী প্রাণ নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে নিহত হলেও গোটা বাংলাদেশ মুঘল অধিকারে আসে আরো বিয়াল্লিশ বছর পরে ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের আমলে। ওই বিয়াল্লিশ বছর [হিসেবে দেড়পুরুষ কাল] বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ নৈরাজ্যের কাল। লোকশ্রুতির বারভূঁইয়ারা তখনো মুঘল আনুগত্য স্বীকার করেন নি। উসমান খান ছাড়াও ভূষণার মুকুন্দ, যশোরের প্রতাপাদিত্য, ফতেহাবাদের মজলিস কুতুব, শ্রীপুরের চাঁদ-কেদার, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ প্রমুখ প্রায় সব সামন্ত জমিদার-জায়গীরদার তখন মুঘলবিরোধী ও স্বাধীন। তখন সব শক্তিরই প্রজাপীড়নের ও প্রজাশোষণের কাল, কেননা তখন মুঘলশাসক ও স্থানীয় ভূঁইয়ারা শাসনের ও শোষণের অধিকার দাবি করেছেন, পালন-পোষণের দায়িত্ব স্বীকার করেন নি। এ সময়ে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার কোন নিরাপত্তা ছিল না। অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে শঙ্কিত এবং ত্রস্ত জীবন কাটাতে হয়েছে প্রায় অর্ধ শতক ধরে। ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে সব সামন্ত ভূঁইয়া দিল্লী সরকারের অনুগত হলেন বটে, কিন্তু ততদিনে অন্য উপসর্গও গুরুতর হয়ে উঠেছে, এখন থেকে ভূমিরাজস্ব, বাণিজ্যশুল্ক, আবগারীকর এবং সৈন্যবাহিনীর বেতন প্রভৃতি রূপে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাঙলার বাইরে চালান হচ্ছিল আর পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেরা বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্য তো করতই, তার উপর পর্তুগীজ দস্যুরা বঙ্গোপসাগরের উপকূলাঞ্চলে তো বটেই, ভাগীরথী পদ্মা মেঘনা শীতলক্ষা প্রভৃতি নদীর তীরাঞ্চলেও বহুদূর ব্যাপী লুটপাট করত, মানুষও ছিল সে লুটের মালের অন্তর্ভুক্ত। পরে পর্তুগীজ হার্মাদদের সঙ্গে জুটে যায় আরাকানী জলদস্যুরাও। ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি চলে এ অবাধ লুটতরাজ। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের সুবাদার-ফৌজদার এদের বিতাড়নেব তেমন কোন কার্যকর চেষ্টাই করেন নি। শাহজাহানের আমলে হুগলীর প্রশাসক দেশের স্বার্থে ইংরেজ কোম্পানীকে বাণিজ্যের অধিকার-বঞ্চিত করতে চাইলেন, কিন্তু উচ্চমূল্যের উপঢৌকন নিয়ে স্বয়ং সম্রাট তাদের অনুমতি দেন।

---

১. *'বাঙ্গালার ইতিহাস' এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।*

১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের নেতৃত্বে বাহিনী পাঠিয়ে আরাকানরাজ থেকে উত্তর চট্টগ্রাম জয় করে ছিনিয়ে নিয়ে শায়েস্তা খান শেষবারের মতো মঘ-হার্মাদ দস্যুর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করেন। এ যুদ্ধের এবং পূর্বের ও পরের সাম্রাজ্যের বিস্তারমূলক আসাম অভিযান প্রভৃতি নানা যুদ্ধে ব্যয়ও বহন করেছে দুস্থ সুবেবাঙ্গালা। সুবাদার শায়েস্তা খান, আজিমুশশান-ফররুখশিয়র এখানে নুন-শুপারীব একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে বাঙালীর অপরিমেয় অর্থ লুট করেছেন, বঞ্চিত করেছেন দেশী ব্যবসায়ীদের। পুরো সতেরো শতক ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধ ছিল য়ুরোপীয় বেনেদের বাঙলাদেশ লুটেপুটে খাওয়ার ও নেওয়ার কাল।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙজেবের মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে দুঃশাসন এবং দেশী-বিদেশীর পীড়ন শোষণ বাড়ল। চারবছরী ছকে বিন্যস্ত সুবাদারী মুর্শিদকুলি খান দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে পরিণত করলেন বংশানুক্রমিক নওয়াবীতে। সুজাউদ্দীনের আত্মীয় ও অনুগৃহীত হাজি আহমদের ও আলিবর্দীর ষড়যন্ত্রের শিকার সুজাপুত্র সরফরাজ খানকে গিরিয়ার যুদ্ধাভিনয়ে পরাজিত ও নিহত করে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে নওয়ার হলেন আলিবর্দী। তাঁকে সতেরো বছরের মধ্যে বারোটা ব্যয়বহুল যুদ্ধ করতে হয়েছে। উড়িষ্যার চৌথ ছাড়াও বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা তুলে দিতে হত মারাঠাদের হাতে। বর্গীর হত্যার ও লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে রাঢ় অঞ্চল, তারপরে যেন চলচ্চিত্রের প্রবাহ ঃ সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র তেরো মাসের নওয়াবী ও তিনখানা মারাত্মক যুদ্ধ এবং ঘরে বাইরে ষড়যন্ত্রের পর মীর জাফর আলী খাঁর নওয়াবী, ইংরেজ কর্তাদের ঘুষ দিয়ে জামাতা মীর কাসিম আলীর নওয়াবী লাভ, অর্থের জন্যে জমিদার-মহাজন পীড়ন, যুদ্ধ, পরাজয় ও পলায়ন আর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানীর ও নওয়াবীর দ্বৈতশাসনরূপ চাপের শুরু, ১১৭৬ বঙ্গাব্দের [১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দের] মন্বন্তর, খাদ্যাভাবে উত্তর ও পশ্চিম বাঙলার তিনভাগের দু' ভাগ অধিবাসীর মৃত্যু।

শাসন করবে কি কেবল শোষণ করবে মনস্থির করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঁচিশ বছর লেগে গিয়েছিল। অবশেষে কোম্পানী স্থির করল তারা শাসন-শোষণ-লুণ্ঠন এক সঙ্গেই চালাবে। এর ফলেই ভূমিরাজস্ব বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। মুঘল শাসনযন্ত্রের আদলে চার-বছুরে ছকে গভর্নর-জেনারেলরা সে-থেকেই আসেন-যান গা-বাঁচিয়ে সু-কৌশলে শোষণের শাসনের পণ-পদ্ধতি পাকাপোক্ত করেন। প্রায় শত বছর ব্যাপী কোম্পানীআমল এভাবেই চলছিল। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলবিজয়ে বিদেশী যে শোষণের শুরু তা অবসিত হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। মুঘল আমলেও সাম্রাজ্যের এ প্রত্যন্ত অঞ্চল শাসন-শোষণে শানকগোষ্ঠীর আগ্রহ যত প্রবল ছিল, তত উৎসাহ ছিল না প্রজার পালনে পোষণে দুঃখবিমোচনে। তাই মুঘল আমলেও বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি তিন-চার বছর অন্তর ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি-খরার দরুন দুর্ভিক্ষ হত, লোক মরত খাদ্যাভাবে। তবু মুঘলআমলে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূমিরাজস্ব বাণিজ্যশুল্ক কিংবা আবগারীকরের কিছু কিছু বাঙালীর চাকরি ও ব্যবসায় রূপ ফাঁকে ফুকুরে বাঙলায় থেকে যেত, হাত বদল হয়ে ফিরেও আসত। যদিও দিল্লী তখন সাত সাগরের না হোক তেরো নদীর ওপারের তো বটেই।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বরাবরই বিদেশী বিভাষী বিজাতি ও বিধর্মীই রয়ে গেল। বাঙলার তথা ভারতের সম্পদ লুট করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য—অর্থোপার্জনের জন্যেই এ সুদূরদেশে তাদের আগমন। যে-পয়সা বিলেতে গেছে তা আর কখনো ভারতে ফিরে আসার কারণ ছিল না। তাই কোম্পানীশাসকদের ধ্যান-ধারণা মন-মত পথ-পদ্ধতি ছিল একান্তই লুঠেরার। এ লুঠ নির্মমভাবে অমানবিকভাবে চলছিল সিপাহিবিপ্লবের পূর্বক্ষণ অবধি। তাদের এ অমানুষিক ও বিচিত্র লুণ্ঠনপদ্ধতি আজ আর কারো অজানা নেই। এর ফলে যে কেবল তিন-চার বছর অন্তর প্রকৃতির বিরূপতাজাত খাদ্যাভাবে হাজার হাজার মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছে তা নয়, শোষিত লুণ্ঠিত মানুষ অসহ্য যন্ত্রণায় মরিয়া হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে প্রিয় পরিবার পরিজনদের বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় বিদ্রোহী হয়েছে গাঁয়ে-গঞ্জে, প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার চাষী-মজুর।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পরে শিক্ষিত জনতা কিছুটা সচেতন হচ্ছিল, তাই ভিক্টোরিয়া শাসনে শোষণের কৌশল ও পদ্ধতি বদলাতে হল। আগেকার বর্বর নির্মম ও স্থূল রূপ আর রইল না। আর বিশ শতকের গোড়া থেকেই নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্কে শোষণ করার পথ ক্রমেই সংকীর্ণ ও সীমিত হচ্ছিল জাগ্রত জনতার উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদের ফলে।

৫. জীবন ও ঐহিকতা

আর একটি কথা, মানুষ মুখে যতই আত্মায়, পরলোকে, জন্মান্তরে ও পাপপুণ্যে আস্থা প্রকাশ করুক না কেন, অমৃতে মোক্ষে ও স্বর্গসুখে যতই আগ্রহ দেখাক না কেন, আসলে তাদের অন্তরে ওসবের কোন অস্তিত্ব নেই। ওসব কেবল সামাজিকভাবে স্বীকৃত আত্মপ্রবোধমূলক বুলিমাত্র, ওগুলো বুকের সত্যও নয়, বাস্তব তথ্যও নয়। মানুষ এ জীবনকেই সত্য বলে জানে, এ মাটিকেই বাস্তব বলে মানে। তাই মানুষ এ মাটির উপরই বাঁচতে চায়। এ কারণেই স্বর্গের পথে পা বাড়াতে পরম ধার্মিকও ভয় পায়। বিরক্ত মানুষ মৌহূর্তিক উত্তেজনায় আত্মহত্যা করে জীবনে ইতি ঘটানোর জন্যে—আত্মাকে চিরজীবী করার জন্যে নয়।

মনে আব কোন প্রত্যাশা নেই বলেই এ প্রাণ এতো প্রিয়, এ মাটি অপরিত্যজ্য, এ ভুবন এতো সুন্দর, এ জীবন অতুল্য। তাই নিঃস্ব মানুষ রুগ্ন মানুষ জরাজীর্ণ মানুষও পরম মমতায় এ মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায়, দুঃখ-যন্ত্রণায়ও স্থিরচিত্তে মৃত্যু কামনা করে না—আত্মহত্যাও কবে না শ্রেয়োচেতনাবশে। বাঁচা বাঁচা বাঁচা, সুখে বাঁচা, নিরাপদে বাঁচা, সুন্দর হয়ে বাঁচা, দর্পে দাপটে বাঁচা, গুণে মানে মাহাত্ম্যে বাঁচা, ভয় দেখিয়ে বাঁচা, ভালোবেসে বাঁচা—আবহমান কাল ধরে ব্যক্তি-মানুষের জীবনের এ-ই সচেতন অবচেতন লক্ষ্য। মানুষের সব আশা প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না তবু আশা নিয়েই বাঁচতে হয়, স্বপ্নের জাল জড়িয়ে জীবন-পথে চলতে হয়।

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ইতিহাস হচ্ছে এই আশা, প্রত্যাশা ও স্বপ্নচালিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাফল্যের ও বিফলতার ইতিকথা। এই মানুষের স্থানিক ও সামাজিক জীবনে জীবিকায় যখন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন অসহায় অজ্ঞ মানুষ বাঁচবার তাগিদেই অলৌকিক শক্তির শবণ সন্ধান করে। এ শক্তিকে মানুষ স্মরণ ও শরণ করে দেবতা-প্রতীকে। সে-দেবতা অপ-কিংবা উপ-দেবতা হতে পারেন, পারেন অরি কিংবা মিত্র দেবতা হতে। এ ছাড়াও রয়েছে দেও জ্বীন পরী কিংবা দেবতা ও মানুষ বশ করার মন্ত্র ঝাড়-ফুক, তুক-তাক, দারু-টোনা, বাণ-উচাটণ, তাবিজ-কবচ, তাগা-মাদুলী-প্রভৃতি।

জীবন-জীবিকার সঙ্কটকালে বিচলিত ত্রস্ত মানুষ প্রচলিত শাস্ত্রে আদর্শে ও জীবতত্ত্বে ভবসা পায় না, আশু মুক্তি ও নিরাপত্তার গরজে নতুন পথ-পদ্ধতি খোঁজে, নতুন উপায় উদ্ভাবনে হয় উদ্যোগী, নতুন কোন শক্তিতে আস্থা রেখে অন্তত মানসিকভাবে চায় আশ্বস্ত হতে, এমনি সামষ্টিক সঙ্কটলগ্নে জন্ম হয় নতুন তত্ত্বের ও নতুন দেবতার। তাই বিদেশী বিধর্মী গুপ্তশাসনে ও শোষণে দুস্থ মন্ত্রযানী-মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধদের দেখি জীবন-জীবিকার সঙ্কট ও নিরাপত্তা প্রতীক নানা অরি ও মিত্র দেবতা সৃষ্টি করতে। এরূপে যক্ষ ক্ষেত্রপাল বৎসলা শ্যামতারা বজ্রতারা অবলোকিতেশ্বর আদিনাথ আদ্যাশক্তি প্রভৃতি অনেক দেবতায় হল বৌদ্ধ-চৈত্য আকীর্ণ। বিদেশী (মাগধী) পাল-শাসনে পর্যুদস্ত বাঙালী বৌদ্ধকে যোগে তন্ত্রে বৈরাগ্যেই তাই জীবনের স্বস্তি সন্ধানী দেখি। চর্যাগীতিতে ও নাথসাহিত্যে বর্ণিত তত্ত্ব এবং ডাকিনীযোগিনী ঐতিহ্যই এর সাক্ষ্য। আবার সেনশাসনে রুদ্ধবাক এবং বিদেশী তুর্কি শাসনে অসহায় নির্জিত মানুষ জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে স্বস্তি ও নিরাপত্তা লক্ষ্যে নানা অরি ও ইষ্ট দেবতা সৃষ্টি করে নিশ্চিত হতে চেয়েছে–চণ্ডী গৌরী কালী দুর্গা যক্ষ বিষহরী ওলা শীতলা শনি ষষ্ঠী গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি পূজ্য ও জনপ্রিয় একারণেই। লক্ষণীয় যে 'এসব দেবতা কিংবা মন্ত্র কেবল পার্থিক জীবনেরই সহায়, ভয়-ভরসার আধার। পারত্রিক মোক্ষ দান এসব দেবতার ও মন্ত্র-তন্ত্রের সাধ্যাতীত। এভাবেই আদিকাল থেকে দেখা যাচ্ছে কোন বহিরাগত ধর্মমত বা জীবনাদর্শ বাঙলাদেশে টেকে নি। বাঙালীরা সবসময়ে নিজেদের গরজমতো ধর্মমত, ইষ্টদেবতা এবং জীবনাদর্শ তৈবি করে নিয়েছে।

৬. পীর-নারায়ণ সত্য-এর উদ্ভবতত্ত্ব

সপ্তম বিপ্লবের উন্মেষ ষোল শতকের শেষপাদে এবং বিকাশ সতেরো শতকে আর পূর্ণতা আঠারো শতকে।

১৫৩৮ সনে শেরশাহর বঙ্গবিজয়, সম্রাট ইসলাম সুরের মৃত্যুতে বাঙলায় প্রশাসনিক কোন্দল ও বিশৃঙ্খলা, ১৫৫৪ থেকে ১৫৭৫ সন অবধি ঘন ঘন শাসকবদল ও যুদ্ধবিগ্রহ, মুঘলবিজয়ের পরে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটের দ্বান্দ্বিক অবস্থান ও তজ্জাত নৈরাজ্য আর য়ুরোপীয় বেনেদের নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রভাব, মঘ-হার্মাদের নদীপথে লুটতরাজ এবং মুঘলদের সাম্রাজ্যিক শোষণ প্রভৃতি জনজীবন দুর্বহ করে তুলেছিল। গাঁয়ে গঞ্জে ব্যক্তিজীবনে সমাজের কিংবা সরকারের উপর ভরসা করবার কিছু ছিল না, জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা ছিল না বলেই মানুষকে সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন শঙ্কিত থাকতে হত। এমনি অবস্থায় গীতায়-কোরআনে ভরসা, মহৎ তত্ত্বে ও আদর্শে আস্থা কিংবা মন্দিরে-মসজিদে বিশ্বাস রাখা সম্ভব হয় না। আশু বিপন্মুক্তির জন্যে বিপন্ন মানুষ জরুরী নিদান ও দ্রুত ফলপ্রাপ্তি কামনা করে। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ পুরোনো শাস্ত্রে ও নীতিআদর্শে আস্থা হারিয়ে বিশ্বাসের নতুন বন্দরে নোঙর ফেলে আশ্বস্ত হতে চায়, এ মনোভাব থেকেই ষোল শতকের শেষ পাদের ও সতেরো শতকের শোষিত পীড়িত উদ্বিগ্ন মানুষ উদ্ভাবন করে নির্জিত দুস্থ মানুষের এক মিলনমন্ত্র—সে মন্ত্র হচ্ছে 'সত্য'। যেন শাস্ত্র-সমাজ- সংসার, পুরোনো নিয়মনীতি সব জটাজটিল মায়াজাল-সব মিথ্যে। অনির্বাণ সত্য ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই—যে বা যা দুঃখ-যন্ত্রণা-বিপদ থেকে দীন দুর্বল অসহায় মানুষকে রক্ষা করতে পারে। সত্য নির্ভেজাল অকৃত্রিম। তাই সত্য কাউকে কখনো প্রতারণা করে না। হিন্দুরা বহুদেবতার পুজারী। তাই সত্য হিন্দুর কাছে সহজেই ইষ্টদেবতার প্রতিভূ-প্রতীক নারায়ণ। মুসলিম মনে ছিল নিরাকার একেশ্বর তত্ত্বের প্রবল ধারণা, তাই সত্য তাদের কাছে 'পীর'। রাজ্যেশ্বর তখন মুসলমান, তাঁর সম্মানে তাই সত্যও উর্দুভাষী আর জন্মসূত্রে মুসলমান এবং শিরনীভোজী। ইলাহি ধর্মপ্রবর্তক আকবরের ও জাহাঙ্গীরের উদারতার প্রশ্রয়ও এ পীর-নারায়ণ 'সত্য' মতবাদ প্রচারের সাহস যুগিয়েছে পরোক্ষে। নইলে জান-মাল-গর্দান হারাত কোন না কোন প্রচারক। মনে হয় রাজকীয় সহযোগিতা ছিল না বলেই শাস্ত্রপতিরা ও সমাজসর্দারেরা সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে। বুদ্ধিমানেরা চিরকালই সবকিছু বোঝে। তাই তারা বলে 'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর। দুই কুলে সেবা লয় হৈয়া জাহির।' শুনেছি বন্যার তোড়তাড়িত সাপও মানুষের সঙ্গে নিঃশঙ্কে বাস করে ভেলায়। একদিন স্বস্তিতে ভাতে কাপড়ে বাঁচবার আগ্রহে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত নির্জিত বিপন্ন দীন দুঃখী হিন্দু-মুসলিম বাঙালী 'সত্য' নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল, সেদিন ভিন্ন অবয়বের শাস্ত্রের ও মানবসত্যের অভিন্নতা অবলীলায় স্বীকৃত হয়েছিল—সেদিন নবী-কৃষ্ণও অভিন্ন আত্মা নন কেবল, অভিন্ন কায়ও ছিলেন ঃ

মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।
ফকির হয়ে ভ্রমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।

নবী-কৃষ্ণের সমন্বিত রূপ ঃ

অর্ধেক মাথা কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে (রায়মঙ্গল ঃ কৃষ্ণরাম দাস)

সত্যনারায়ণ পাঁচালীতেও স্বীকার করা হয়েছে যে 'বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়'।

জীবন-জীবিকার পার্থিব দেবতা 'সত্য'ই আশা-ভরসার ও প্রত্যাশা পূরণের ইষ্টদেবতা বা পীর। তিনি একা কয়দিক সামলাবেন, তাই চেলা দেবতা বা পীর পরিকল্পিত হল। হিন্দুমুসলমানের সুবিধার্থে চেলাদেবতারাও যুগ্মনামে অভিহিত হলেন। কেবল ব্যতিক্রম দেখি বাঘ-প্রতীক দেবতার

ক্ষেত্রে। সেখানে দক্ষিণরায় ও বড়খান গাজী দুই ভিন্ন পীর ও দেবতা। অন্যত্র কুমীর পীর-দেবতা হচ্ছেন কালুগাজী-কালুরায়, এমনি নানা গুণ ও শক্তি প্রতীক দেবতা হচ্ছেন বনদেবী (বনদুর্গা) বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, বাস্তুদেবী-বাস্তুবিবি, উদ্ধারদেবী-উদ্ধারবিবি, শীতলাদেবী-শীতলা বিবি, ষষ্ঠীদেবী-যষ্ঠীবিবি, আর ডাকিনী-যোগিনী এবং কামরূপ-কামাখ্যা অভিন্ন নামে সবার প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। জীবনের প্রয়োজনে কল্পিত বলেই এখানে জাতিভেদ কিংবা অস্পৃশ্যতা নেই। তাই মোল্লা শিরনী তৈরি করে আর বামুনও তা হাতের তালুচেটে খায় এবং মাথায় হাত মোছে। এ পীর-নারায়ণ সত্যই ষোল শতকের শেষপাদ থেকে বিশেষ করে সতেরো শতক থেকে উনিশ শতক অবধি রাঢ়-বরেন্দ্রের এবং নিম্নবঙ্গের বা দক্ষিণবঙ্গের খুলনা-যশোহর অঞ্চলে ঐহিক মন-মানস নিয়ন্ত্রণ করেছেন। পূর্ববঙ্গে পীর-নারায়ণ সত্যের প্রভাব ছিল পরোক্ষ ও সামান্য। কঙ্কের সত্যনারায়ণ পাঁচালীর মতো কিছু কিছু রচনা ও ক্ষুদ্রগীত অবশ্য পাওয়া যায় এখানেও। তবে উনিশ শতক অবধি ভারতচন্দ্র সহ রাঢ়ের ও দক্ষিণবঙ্গের জ্ঞাত-অজ্ঞাত প্রায় শতেক কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেছেন।

দেশের চরম আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি-দুঃশাসনের ও দুরবস্থার সময়েই ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর শৈশবে বাল্যেই ঘটে তাঁর পারিবারিক আর্থিক সামাজিক বিপর্যয়। তাই ভারতচন্দ্র আস্থা হারিয়েছিলেন নীতিতে আদর্শে মানুষের সততায় ও মহত্ত্বে। এ জন্যেই তাঁর কাব্যে দেবতা দিয়ে বানরনাচের আসর বসিয়েছেন, তাই তাঁর কাব্যে শ্রেয়োচেতনা বিরল, নিম্নমানের বেপরওয়া অশ্লীল বাচালতা বেশি। তাঁর কালের রূপ তাঁর ভাষায়—

একি ভূতাগত দেশেরে	দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
না জানি কি হবে শেষে রে।	চোর ফিরে সাধু বেশে রে।
উত্তম অধম না হয় নিয়ম	যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
কারো নাহি ধর্মলেশ রে	তুল্যমূল্য গজ মেষে রে।

জীবনে জীবিকায় বাঞ্ছাসিদ্ধির দেবতা হিসেবে পীর-নারায়ণ সত্যের প্রায় সার্বত্রিক জনপ্রিয়তা ও পূজা সত্যনারায়ণকে পৌরাণিক দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণে সত্যনারায়ণ সম্ভবত সতেরো শতকের শেষপাদের দিকে ঠাঁই করে নেন। এভাবে কোরআন-হাদিস মানা মুসলিম এবং গীতা-স্মৃতি অনুসারী হিন্দু আশুপ্রয়োজন ও আপাতপ্রাপ্তি লোভে কাল্পনিক পীর-নারায়ণ 'সত্য'-এর অনুগত হয়। এমনিভাবে দুঃখ-দৈন্যের দিনে নিরুপায় হিন্দু-মুসলিম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করার উপায় বের করেছিল। এ মিলনসূত্র—এ মিলনময়দান চিরস্থায়ী হলে বাঙালীর শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতিসম্পৃক্ত গুরুতর দ্বন্দ্ব সমস্যা মিটে যেত। তবু সেদিনকার বাঙলার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে 'সত্য'-তত্ত্ব হিতকর বিপ্লব ঘটিয়েছিল। 'সত্য' বাঙালী-সৃষ্ট শেষ লৌকিক দেবতা।

৭. সত্যপীরের জন্মবৃত্তান্ত

সত্যপীরের শক্তি ও গুণ-মান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যেমন, তেমনি তাঁর জন্ম সম্বন্ধেও বিভিন্ন বানানো কাহিনী চালু রয়েছে।

শঙ্কর আচার্যের সত্যনারায়ণ পাঁচালী বর্ণিত বৃত্তান্ত এই ঃ আলা (আলাউদ্দিন হোসেন শাহ) বাদশাহর কুমারী কন্যা একটি ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করলে গর্ভবতী হয় এবং সত্যপীরের জন্ম হয়।

তাহির মাহমুদের পাঁচালীতে রয়েছে ঃ স্বর্গবাসিনী চাঁদবিবি মর্ত্যে মালঞ্চরাজ ময়দানব বা মইদুলব-এর কন্যা সন্ধ্যাবতী রূপে প্রেরিত হয় সত্যপীরের জননী হবার জন্যেই। কারো কারো মতে সত্যপীর সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯) রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা রাঢ়ের ধর্মঠাকুরই ক্রমে পীর-নারায়ণ সত্যে রূপান্তরিত হয়েছেন [১ম খণ্ড অপরার্ধ ৩সং পৃঃ ৪৫০] ডক্টর সুকুমার সেন চৈতন্যধর্মে গুরুবাদও পীরবাদ প্রভাবিত বলে মনে করেন [ঐ পৃঃ ৪৪৮।] তাঁর মতে হিন্দুর পীরভক্তির উন্মেষ-বিস্তারও ঘটে এ পথেই [ঐ পৃঃ ৪৪৮]।

বাঙলা আর্যা-সম্বলিত বাঙলার প্রথম পীরকাব্য হচ্ছে শেখ শুভোদয়া। পীর-নারায়ণ সত্যের প্রথম পাঁচালীকার ষোল শতকের গোরক্ষবিজয় রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ (দোভাষী শায়ের ফৈজুল্লা নন)। সত্যপীর প্রশস্তিকার হচ্ছেন বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা কঙ্ক, ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী এবং রায়মঙ্গল রচক কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি সতেরো শতকের কবি। সত্যনারায়ণের প্রশস্তি বা পাঁচালী আর যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের রচনার সন্ধান মিলেছে, তাঁরা হলেন ১. ভৈরব ঘটক ২. ধর্ম মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, ৩. রামেশ্বর চক্রবর্তী ৪. অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় ৫. ফকিররাম দাস কবিভূষণ ৬. বিকল চট্টোপাধ্যায় ৭. দ্বিজ গিরিধর ৮. মৌজিরাম ঘোষাল ৯. কৃষ্ণকান্ত ১০. তাহির মাহমুদ (কৃষ্ণ হরিদাস এঁর কাব্যের লিপিকর ও গায়েন) ১১. রামশঙ্কর সেন ১২. শিবচরণ ১৩. দ্বিজ কৃপারাম ১৪. কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম ১৫. দ্বিজ রামধন ১৬. দ্বিজ নন্দরাম ১৭. অযোধ্যারাম রায় ওর্ফে কবিচন্দ্র (?) ১৮. দ্বিজ রামভদ্র ১৯. দ্বিজ বিশ্বেশ্বর ১৯. দ্বিজ অমর সিংহ ২০. দ্বিজ জনার্দন ২১. দ্বিজ রামচন্দ্র ২২. দুর্গাপ্রসাদ ঘটক ২৩. ঈশান গোস্বামী ২৪. নরহরি ২৫. মধুসূদন ২৬. দ্বিজ কালিদাস ২৭. দ্বিজ বিশ্বনাথ ২৮. গোবিন্দ ভাগবত ২৯. শিবচন্দ্র সেন ৩০. বিপ্রনাথ সেন ৩১. দ্বিজ রামকিশোর ৩২. লালা জয়নারায়ণ সেন ৩৩. দ্বিজ রামানন্দ ৩৪. দোভাষীশায়ের ফকির গরীবুল্লাহ ৩৫. আরিফ ৩৬. দ্বিজ রঘুনাথ ৩৭. শ্রীকবিবল্লভ ৩৮. দ্বিজ রামকৃষ্ণ ৩৯. দ্বিজ দীনরাম ৪০. নয়নানন্দ ৪১. দ্বিজ রঘুরাম ৪২. দ্বিজ হরিদাস ৪৩. বিজয় ঠাকুর ৪৪. শিবরাম রাজা ৪৫. দেবকীনন্দন ৪৬. গঙ্গারাম ৪৭. শিবনারায়ণ ৪৮. কুমুদানন্দ দত্ত ৪৯. মুক্তারাম দাস ৫০. বিদ্যাপতি ৫১. কিঙ্কর ৫২. ফকিররাম ৫৩. কৃষ্ণবিহারী ৫৪. দ্বিজ গুণনিধি ৫৫. লালমোহন ৫৬. দয়াল ৫৭. শঙ্কর আচার্য ৫৮. জয়নাথ বিশী ৫৯. ফৈজুল্লা (১৯ শতক) ৬০. দ্বিজ রঘুনাথ চক্রবর্তী ৬১ ওয়াজেদ আলি (ফকির গরীবুল্লাহর অনুকারক) ৬২. লেংটাফকির ৬৩. শেখ তনু ৬৪. শেরবাজ চৌধুরী ৬৫. খোকনরাম দাস, ৬৬. দ্বিজ রামপ্রসাদ ৬৭. হরেকৃষ্ণ চক্রবতী ৬৮. তারিণীশঙ্কর ঘোষ ৬৯. নন্দরাম মিত্র ৭০. দ্বিজ শুকদেব ৭১. বেচারাম ৭২. কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৭৩. কালাচাঁদ ৭৪. জৈমিনী ৭৫. কালীচরণ ৭৬. মথুরেশ ৭৭. নায়েক ময়াজগাজী ৭৮. রামানন্দ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কারো কারো নাম নিশ্চিত জ্ঞানের অভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ বিশেষ আলোচনার যোগ্য এবং কারো কারো কাব্য সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিতও হয়েছে।

১. শেখ ফয়জুল্লাহ

এঁর রচিত তিনখানি পাঁচালী হচ্ছে গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয় (ইসমাইল গাজী চরিত প্রাপ্ত) এবং সত্যপীরবিজয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বারাসতে অসংগৃহীত সত্যপীরের পুথিতে এ অংশটুকু পেয়েছিলেন ঃ

গোর্খবিজয় আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।

খোঁটা দূরের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হৈল রাজি।
মুনি রস বেদ শশী শাকে রহে সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভাণ ভাবি দেখ মন।

(মুনি–৭, রস–৯ বেদ–৪ শশী–১ = ১৪৯৭ শকে–১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে সত্যপীরবিজয় রচিত। এটি তাই পীর-নারায়ণ সত্যের মাহাত্ম্যকথার প্রথম পাঁচালী। শেখ ফয়জুল্লাহ, মীর ফয়জুল্লাহ ও দোভাষী শায়ের ফৈজুল্লা সম্বন্ধে আলোচনা গোরক্ষবিজয় ও জয়নবের চৌতিশা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।.

পীর-নারায়ণ সত্য মুখ্যত অর্থ-সম্পদের দেবতা। পাঁচালী ছাড়াও সত্যনারায়ণের ব্রতকথাও রয়েছে।

একটি উপাখ্যানের কাঠামো এরূপ ঃ নারায়ণ এক দীন বামুনের কাছে ফকির বেশে উপস্থিত হয়ে তাকে দারিদ্র্য-মুক্তির জন্যে সত্যনারায়ণের শিরনী দেয়ার পরামর্শ দেন। শিরনী দিয়ে ব্রাহ্মণ ধনী হল।

আর একটি উপাখ্যান চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের ধনপতি-খুল্লনার আখ্যানের আদলে নির্মিত। সদানন্দ নামের এক সওদাগর সত্যনারায়ণের শিরনী করে এক কন্যাসন্তান লাভ করে। কন্যার নাম চন্দ্রকলা। লক্ষপতি ধনীর কন্যার সঙ্গে হল তার বিয়ে। তারপর শ্বশুর-জামাতা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে এক রাজ্যের বন্দবে পৌছল। সত্যনারায়ণের পূজো না করে বা শিরনী না দিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করায় সত্যপীর ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই রাজ্যের রাজকোষের ধন দেখা গেল তার নৌকায় সত্যের কেরামতির ফলে। চোরাই মাল ধরা পড়ল। সকালে কোটাল শ্বশুর-জামাইকে বেঁধে নিয়ে গেল রাজসভায় এবং দুজনেই হলো কারারুদ্ধ। এদিকে চন্দ্রকলা একদিন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা শুনে পিতার ও স্বামীর শিগগির বাড়ি ফেরার কামনায় শিরনী মানত করল। আনন্দিত সত্য তখন শ্বশুড়-জামাইকে সেই সকালেই মুক্তি দেয়ার জন্যে রাজাকে স্বপ্নে হুমকি ও হুকুম দিলেন।

শ্বশুর-জামাইয়ের নৌকা ভিড়ল বাড়ির ঘাটে। চন্দ্রকলা সত্যের শিরনীর আয়োজন করল বটে, কিন্তু স্বামীদর্শনের জন্যে ব্যাকুল মা-মেয়ে শিরনীর সশ্রদ্ধ ভোজন ও বিলি-বন্টনের আগেই ঘাটের দিকে ছুটল। তাতে সত্যপীর রুষ্ট হয়ে ঘাটেই ঘটালেন ভরাডুবি। স্বামী ডুবে মরল। চন্দ্রকলার মা-বাপের আব মেয়ের কান্নায় ও মুর্ছায় বিচলিত সত্যনারায়ণ বৃদ্ধব্রাহ্মণ জ্যোতিষী বেশে দেখা দিয়ে বলেন শিরনী এঁটো করে ফেলে আসার দরুনই এ ক্ষতি ও বৈধব্য ঘটল চন্দ্রকলার। জ্যোতিষীব উপদেশে এঁটো শিরনী খেল মা ও মেয়ে আর ভেসে উঠল জীবন্ত স্বামীসহ ভিঙ্গা। পুরোপুরি উপলব্ধ হল সত্যের শক্তি ও মহিমা। সদানন্দ সত্য নারায়ণের শিরনী দিল। দেখাদেখি সব মানুষই শুরু করল সত্যের শিরনী দেয়া। অপর একটি উপাখ্যান এরূপ ঃ

দিল্লীর দক্ষিণে মথুরেশপুর শহরে বাস করত এক অতি দরিদ্র কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণদম্পতি। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বের হয়ে ভিক্ষা তো পেলই না, অধিকন্তু নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়ে বিকেল বেলা বাড়ি ফিরবার পথে এক বটতলায় বসে তার ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণীর মুখ স্মরণ করল—বেচারী তার পথ চেয়ে বসে আছে, খালি হাতে কি বলে দাঁড়াবে তার সমুখে। ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করাই স্থির কবল ব্রাহ্মণ। এমনি সময়ে ঈশ্বর ভিখিরীর বেশে আবির্ভূত হলেন। তাঁর মাথায় পাগড়ী, গায়ে কড়ি-বোনা জামা, গলায় ঝিনুকের মালা, কোমরে শিকল হাতে ছাগলের চামড়া, ও থালা আর কাঁধে ঝোলা, অন্য হাতে একটি লাঠি, তিনি শূন্যঝুলি ব্রাহ্মণকে বললেন ঃ

মৈঁ ভূখা ফকির হুঁ খিলাও কুছ মুঝে।
তামাম দুনিয়া দেখা সবহি ইমাম ঝুটা
কাঁহা কই খয়রাত না করে এক মুঠা।

আত্মহননের জন্যে তৈরি ব্রাহ্মণ বলল, আমি নিজেই ক্ষুধার্ত ও শূন্যহস্ত। আমার মৃত্যু আসন্ন, কাজেই আমাব কাপড়ে প্রয়োজন নেই, আপনি আমার কাপড় নিয়ে যান, বিক্রি করে আহার্য ক্রয় করুন। তখন ভিখিরীবেশী ফকির তাকে সত্যপীরের নামে শিরনী দিয়ে দারিদ্র্যদুঃখ ঘোচানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণের আপত্তি, কেননা সত্যপীর মুসলমান, শিরনী দিলে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হবে। ভিখিরীবেশী তখন বললেন, রাম ও রহিম নাম ভেদের আড়ালে অভিন্ন। হঠাৎ এ ভিখিরীকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী বিষ্ণুরূপে প্রত্যক্ষ করল ব্রাহ্মণ। ভিখিরী ব্রাহ্মণকে জানালেন যে তিনিই মক্কায় রহিম অযোধ্যায় রাম এবং কলিতে সত্যনারায়ণ। সত্যপীর তাকে দুধ-গুড়-আটা-কলার মিশ্রণে শিরনী তৈরি করতে উপদেশ দিয়ে ব্রাহ্মণীর পিতার বেশে বস্ত্রাদি সংসারের নানা সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে ব্রাহ্মণীকেও সত্য পূজা কবার পরামর্শ দিয়ে অদৃশ্য হলেন।

শিরনী তৈরি হলে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের ধর্মহানির ভয়ে তা গ্রহণে আপত্তি ছিল। সত্যপীরের কেরামতির বলে ব্রাহ্মণের কুঁড়ে ঘরের স্থলে মুহূর্তে পাকাবাড়ি তৈরি হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা শিরনী খেল নিঃসংশয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং সত্যপীরের পূজো করতে লাগল। ব্রাহ্মণদম্পতি হল অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। দেশবাসীরা হল সত্যপীরের পূজারী।

আরো দুটো উপাখ্যান 'মদন-কামদেব পালা' এবং 'লালমন-এর কিসসা' আমরা পরে আলোচনা করব।

সত্যনারায়ণের সব পাঁচালীকারের পরিচয় আমাদের জানা নেই।

ভৈরবচন্দ্র ঘটকের সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনাকাল ১৬২২শক বা ১৭০০-০১ খ্রীস্টাব্দে–'ষোলশত বাইশ শকে করিল রচন।' শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত 'সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম'। রামেশ্বব কর্ণগড়ের জমিদার রামসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোবন্তসিংহের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। শিবায়ন রচিত হয় ১৭১০-১১ খ্রীস্টাব্দে (১৬৩২ শকে), কাজেই সত্যপীরের পাঁচালী পরে কোন সময়ে রচিত। ঘনরাম চক্রবর্তীব ধর্মমঙ্গল ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে রচিত। কাজেই তাঁর 'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু' এর আগে বা পরে কোন সময়ে রচিত। বীরভূম অঞ্চলনিবাসী বিকল (চট্টোপাধ্যায়) তাঁর সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন–১৬৩৪ শকে বা ১৭১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে।

–বেদ পূর্বে নেত্র দিই ভাষাব পূর্বে রস
তারপূর্বে চন্দ্র আলা কৈল দিক দশ।

(বেদ-৪ নেত্র-৩ রস-৬, চন্দ্র-৬, ১৬৩৪ শক ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে)

বর্ধমান জেলার শাহবাদ পরগনার ভারুহাগ্রামবাসী দ্বিজ গিরিধর ১০৭০ মল্লাব্দে তথা ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে সত্যনারায়ণ কাব্য রচনা করেন।

দেবগ্রামবাসী দ্বিজ কৃপারাম বর্ধমানরাজ তেজেশ্চন্দ্রের আমলে (১৭৭৯-১৮৩২) তাঁব 'ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি' নামের গ্রন্থে সত্যনারায়ণ প্রসঙ্গ রচনা করেন। বর্ধমান জিলার নাসিগ্রামবাসী কবি কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম তাঁর পাঁচালী রচনা করেন ১৮১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দে [অন্তরীক্ষ বেদ অব্দি নিশাকর-অন্তরীক্ষ-০বেদ-৪ অব্দি-৭ নিশাকর-১= ১৭৪০ শকে বা ১৮১৮ খ্রীঃ]। বর্ধমান অঞ্চলের কবি দ্বিজ রামধন সত্যের পাঁচালী রচনা করেন ১৭৪৭ শকে, ১২৩২ বঙ্গাব্দে তথা ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। বর্ধমান জিলার অন্যান্য কবি হলেন মৌজিরাম ঘোষাল, কৃষ্ণকান্ত, শিবচবণ, শাহাপুরাননিবাসী রামশঙ্কর সেন ও দ্বিজ নন্দরাম।

সম্ভবত চব্বিশ পরগনার টাকী অঞ্চলের কবি আযোধ্যারাম রায়ের উপাখ্যানে সওদাগর সদানন্দ নয়–রত্নাকর, কন্যার নাম চন্দ্রকলা নয়-সুশীলা এবং জামাতা হলো কাটোয়াবাসী সদানন্দ রায়।

টাকী অঞ্চলের অপর কবি রামভদ্রের পাঁচালীর নাম 'সত্যদেব সংহিতা'। তাঁর কাব্যে সওদাগর ধনেশ্বর এবং জামাতা চন্দ্রকেতু।

রাজশাহী অঞ্চলের কবি বিশ্বেশ্বরের পাঁচালীতে সদাগরের নাম শঙ্খপতি, কন্যা কলাবতী এবং জামাতা লক্ষপতি আসামের গোয়ালপাড়া এলাকার কবি মুক্তারাম দাসের সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে সত্যানন্দই সত্যের পূজা প্রচারক এবং সত্যানন্দের বাড়ি ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্তী কাশীপুর। এই ক্যব্যের রচনাকাল ঃ

চন্দ্রাক্ষরে মুনি দিয়া পুষ্প দিবে তায়
শেষে পক্ষাক্ষর দিয়া হৈল যায়।

চন্দ্রাক্ষর-১ মুনি-৭, পুষ্প-০ পক্ষাক্ষর-২ = ১৭০২ শক বা ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে। এবং

রুদ্রাক্ষের পৃষ্ঠে বসু লিখিবে যতনে
পরেতে সমুদ্র লিখি সন হৈল সায়।

[রুদ্রাক্ষ ১১-বসু-৮ সমুদ্র-৭ = ১১৮৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ]

রাঢ়ের কবি বিদ্যাপতির সত্যনারায়ণের এক প্রতিলিপির লিপিকাল ১০৯৯ মল্লাব্দ তথা ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই কবি নিঃসন্দেহে আঠারো শতকের। এঁর গ্রন্থে বড় খাঁ গাজী, জাফর খাঁ, ইসমাইল গাজী, সফীউদ্দীন খাঁ প্রভৃতি পীরের উল্লেখ রয়েছে।

কৃষ্ণ হরিদাসের নামে যে সত্যপীর পাঁচালী চলে, তা আসলে তাঁর গুরু তাহির মাহমুদের রচনা। কৃষ্ণ হরিদাস গায়েন ও লিপিকর মাত্র। প্রমাণ পুথিতে প্রাপ্ত[১] ভণিতা ঃ

১. তাহের মামুদে ভণে লেখে কৃষ্ণহরি
একবার বল আল্লা নবীর নাম স্মরি।

২. তাহের মামুদে কহে লেখে কৃষ্ণহরী
শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাকেশ্বরী

৩. ছাড়িল মায়ের পুরী হইল বাহির
রচিল নূতন গান মহাম্মদ (মাহমুদ) তাহির

৪. তাহির মামুদ গুরু শমস নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।

তাহির মাহমুদ রংপুরের ঘোড়াঘাট অঞ্চলের কবি। কবির পিতার শামস (উদ্দীন)।

শ্রীকবিবল্লভের সত্যনারায়ণ পুথি ১৩২২ বঙ্গাব্দে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত বটে, কিন্তু কবি রাঢ়ের বা দক্ষিণ বঙ্গের লোক বলে মনে হয়। কারণ চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র ব্রতকথাই মৌখিকভাবে চালু ছিল, এবং সত্যনারায়ণ বা পীর-নারায়ণ সত্য পূর্ববঙ্গে বা চট্টগ্রামে কখনো সর্বজনীন পীর-নারায়ণ রূপে পরিচিতি বা প্রতিষ্ঠা পান নি। সম্ভবত এঁরই অপর গ্রন্থ শীতলার পাঁচালী। বল্লভের মদন সুন্দর উপাখ্যানে সদানন্দ ও বিনোদ দুই ভাই সমুদ্রে কমলে কামিনীর আদলে কল্পিত এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল–

প্যথরের গোর এক ভাস এ দরিয়া এ এবং মৃগছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া নৃত্য করে নর্তকী কিন্নরে গীত গাএ। চারি ফকির নমাজ করে পশ্চিম মুখ হৈয়া।

সদাগররা এ দৃশ্য রাজাকে দেখাতে না পেরে কারারুদ্ধ হল। ডাকিনী-যোগিনী-সিদ্ধার কথা আছে এ উপাখ্যানে। ফকির গরীবুল্লাহর মতো শ্রীকবিবল্লভও হাওড়া অঞ্চলের লোক বলে মনে হয়।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় কৈশোরে সত্যপীর ব্রতকথা ও সত্যনারায়ণ-মাহাত্ম্যকথা নামে দুটো ক্ষুদ্র পুথি রচনা করেছিলেন। একটির রচনাকাল রুদ্র চৌগুণা রুদ্র-১১ চৌগুণা- ৪× ১১=৪৪ (চৌ-৪গুণা-৩) ১১৪৪ বা-৪৩ বঙ্গাব্দ। সত্যপীর ব্রতকথায় কবি বলেছেন—দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র/কলি যুগে ক্রমে ক্ষুদ্র যবনে করিতে বলবান।

ব্রতকথায় আদেষ্টা হীরারাম রায় এবং পাঁচালীর আদেষ্টা রামচন্দ্র মুন্সী। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্মৃত আলোচনা কালিকামঙ্গল অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ও পীর সত্য সত্য। ধুয়া

সত্যপীরের জন্ম জাগা (জায়গা) সাফল্য বন্দর।
সত্যপীরের বানা নামিল জগতের উপর
সত্যপীরের বানারে যেবা করে হেলা।
হস্ত পদে গোঁজ নিকলে চক্ষে হর ঢেলা।।
ঢেলার ধমকেরে গায় হৈল জ্বর।
আমি ত না জানি বাপু পীরের খবর।।
মুই যদি জানিতুম বাপু তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দুগ্ধকলা পাছে দিতাম শির।
সত্যপীর আর মাণিকপীর এয়ালিল্লার সুত
কেহ খায় সাদা সিন্নি কেহ কলা দুধ।
কান্দেরে শ্রীমন্ত গোপাল হাতে লৈয়া দড়ি
না বেচিবে দধি দুগ্ধ গণিব কড়ি।।
গলায় বসন বান্দি পীরের তোয়ায়।
অঘোর কানন মাঝে পীরের লাগত পায়।
পীররে দেখিয়া গোপাল করিল ছালাম।।
আছিল আউলিয়া জাত মুখে চাপ দাড়ি।
উপস্থিত হৈল গিয়া গোপালের বাড়ী
আছিল গোপালের নারী বড় রে সেয়ান।
প্রত্যুষ বেহানে করে দুধব পরমাণ।
গোপাল নগর যাইয়া পীর মাগে দুধ কলা।।
গোপালে বলে আছ রে, গোপালনী বোলে নাই।
ঘরে পৈল গোপালনী বাথানত পৈল গাই।
শতে শতে বাছুর পৈল লেখা জোখা নাই।
কান্দেরে শ্রীমন্ত গোপাল হাতে লৈয়া বেনা
ঘরে আছিল যত ধেনু মুখে এড়ে ফেনা।।
সত্যভাবে কৈলা দোয়া পড়িয়া কালাম।
মুই যদি জানিতাম বাপু তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাচ্ছে, দিতাম শির।।

১. অধ্যাপক আবু তালিব আবিষ্কৃত ঃ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,-শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৯ সন।

এ গাথায় সত্যপীর মুখ্যত গোপজাতির পূজনীয় গো-সম্পদের দেবতা। চট্টগ্রামে এক লেংটা ফকিরের সত্যপীর গীতি চালু ছিল। আর ছিল পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচিয়া গ্রামবাসী কবি ফকিরচাঁদের 'সত্যপীর পাঁচালী'।

২. ফকির গরীবউল্লাহর মদন-কামদেব পালা

ওয়াজেদ আলির নামে প্রচলিত সত্যপীর পুথি তথা মদনকামদেব পালা ফকির গরীবউল্লাহরই রচনা। বটতলার বদৌলতে উড়ে এসে ওয়াজেদ আলী পুথির নামপৃষ্ঠায় জুড়ে বসেছে। পুথির সর্বত্র গরীব ফকিরের ভণিতা রক্ষিত হয়েছে। শুধু পুথির শেষপাদে ওয়াজেদ আলীর ভণিতা রয়েছে ঃ

হীন ওয়াজেদ আলি কহে সবাকে ছালাম।
এই তক হইল ভাই কবিতা তামাম।

গরীবউল্লাহ্‌র কয়েকটি ভণিতার নিদর্শন দিচ্ছি ঃ

১. হুকুম সত্যের যে অধীন গরীব গায়।
২. প্রত্যেক কদমে যে হীন ফকির গায়।
৩. অধীন গরীব কহে সত্যপীরের পায়।
৪. অধীন গরীব বলে সত্যপীর সখা
৫. অধীন গরীব গায় গীত সত্যপীরে।

শ্রীকবিবল্লভের মদনসুন্দর পালা আর মদন-কামদেব পালা একই গল্প। ঘটনাসংস্থানও প্রায়-অবিকল। দু' এক জায়গায় সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়, যেমন শ্রীকবিবল্লভের পুথিতে আছে শুকপক্ষীর মুখে শিরনী দেখা মাত্র সে মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হয়। এর আগে বধূ বিমলা জানত না যে শুকপক্ষীই সুন্দব। গরীবউল্লাহর পুথিতে সত্যপীর স্বপ্নে বিমলাকে শুকরূপে সুন্দরের কথা জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন শুকের মাথায় যে শিকড় বাঁধা রয়েছে, তা ফেলে দিলেই শুক মনুষ্যরূপ পাবে। গরীবের পুথিতে কুমতি সুন্দরকে 'লুচ্চা' অপবাদ দিয়েছে এবং ডাকিনী বধূ বিমলার নিঃশ্বাসে সুন্দর পাখী হযে উড়ে গেছে বলেছে। শ্রীকবিবল্লভের পুথিতে সুমতি-কুমতি ভ্রাতৃদ্বয়কে কুরু-পাণ্ডবের শত্রুতার দোহাই দিয়ে বলতে চেয়েছে যে সম্পত্তির শরীক ভাই সুন্দরের মৃত্যুতে 'জঞ্জাল' দূর হয়েছে। গরীবের পুথিতে সুন্দর কয়েক বারই নিহত হয়, কিন্তু শ্রীকবিবল্লভের পুথিতে সেরূপ নয়।

সৈয়দ হামজার মধুমালতীর মতো মদনকামদেব পুথিও প্রায় বিশুদ্ধ বাঙলায় রচিত। আমরা গল্পটি বর্ণনা করছি ঃ

বাণিয়া কুলেতে জন্ম নাম জয়ধর।
সাকিন হুগলীতে বাড়ী চন্দননগর।।
জয়ধর সওদাগর মরিবার কালে
মদন কামদেবে সাধু ডেকে কিছু বলে...
সুন্দরে শুপিয়া যাই তোমা দুইজনে।...
তারপর সুন্দরে ডাকিয়া কিছু কহে সওদাগর।...
তোমারে পাইনু সত্যপীর ধেয়াইয়া।
সত্যপীর স্মরণ কর বিপদের কালে।

মদনকামদেব ভ্রাতৃদ্বয় ছোট ভাই সুন্দরকে আদরে যত্নে পালন করতে থাকে। একবার বাণিজ্যে যাবার সময় সুন্দরকে তারা বলল...

'বাণিজ্য করিতে যাব ভাই দুইজন।
ভাউজ দোহারে তুমি করিবে পালন।
সুমতি কুমতি দোহে ঘরে রেখে যাই।'
হুসিয়ার হইয়া তুমি ধরে থেক তাই।।
অবোধ নারী জাতি বুদ্ধি ভাল নয়।
বারবার সওদাগর এই কথা কয়।।
এইরূপে—
সুন্দরে সপিয়া দিল ঘর আর বাড়ী
যেখানে যা ছিল তার ধন আর কড়ি।

ভাইদের যাত্রার সময়—
সুন্দর কহেন দাদা নিবেদন চরণে।

বধূদ্বয়ও

এক সোয়া পক্ষী এন আমার কারণে।। সুমতি কুমতি কহে রূপের কামিনী।
সোনার আনিও কোটা রূপার চিরুণী।।

এরপর মদন ও কামদেব–

সাতডিঙ্গা সাজাইয়া দাগিল কামান।
খুলিল ডিঙ্গার কাছি খেচিল বাদওান।।
রাখিয়া হুগলীর ঘাট দক্ষিণে বাহিল।
বাওভরে সাত ডিঙ্গা বাহিয়া চলিল।।
লাগমোড়া এড়াইয়া কহিল তখন।
সুমুখেতে তাড়া দেহ ষোল জোড়ার বন।
হিজলির দক্ষিণ দিয়া যায় সওদাগর।
দিলা মারেব ঘাট সাধু পশ্চাতে করিয়া।
সফরের ঘাটে ডিঙ্গা পৌছিল যাইয়া।।
উপনীত হইল গিয়া গঙ্গা সাগর।
ডাহিনেতে হিরাপুর বাবুর মোকাম।
ভক্তি করিয়া সাধু করিল সালাম।।
বাবুর মোকাম সাধু ডাহিনে রাখিয়া।
কালাপানি এড়াইয়া চলিল বাহিয়া।
পশ্চাতে করিয়া সাধু ওপিচিন্নপুরী।
দক্ষিণ মুখেতে সাধু ভাসাইল তরী।।
ছয় মাস বাহিয়া সাধু পাইল সহর।
জাহাজি হুকুম পাইয়া করিল লঙ্গর।।

এদিকে মদনের স্ত্রী সুমতি এবং ক   র স্ত্রী কুমতি 'ছিল দোহে কাউরের (কামরূপের) ডাকিনী' ঃ

'গাছ চেলে যায় তারা বিষম গেয়ানি।
যখন গাছেতে চড়ে মন্তর পড়িয়া।
বাও ভরে চলে গাছ পবন হইয়া।
দিবসে থাকেন দোহে আপনার ঘরে।
নিশা ভাগে রাত্রে যায় কাউর সহরে।।

রাত্রিকালে সুমতি-কুমতি কাউরে চলে গেছে। সত্যপীর এসে সুন্দরকে স্বপ্নে জানিয়ে দিলেন—তার 'ভাউজ' ঘরে নেই। সুন্দর—

'ভয়যুক্ত হৈয়া উঠে চাহে চারি পানে।
দেখিতে না পায় যবে ভাউজ দুজনে।।
এমন সুরূপ নারী বয়সে যুবতী।
দুই জন কোন খানে গেল এত রাতি।

সুমতি-কুমতি ফিরে আসলে সুন্দর বলে—

'তোমার দোহাকার রীত দেখি পরমাদ।'
হেথা বুঝি নাহি রাখ জীবনের সাধ।।

স্বামী বাড়ী ফিরলে নিশ্চিত বিপদ জেনে দু'জায়ে পরামর্শ করে সুন্দরকে মেরে ফেলবার সিদ্ধান্ত করল ঃ 'মারিয়া ফেলিব চল সাধুর নন্দনে
তারপর তারা- 'সুন্দরের উপরে মারিল বক্তবাণ।
পালঙ্গেতে আছে পড়ে বিষেতে কাতর।
উঠিয়া দেখিল দোহে মরিল সুন্দর।।
ফলে—'রূপেব মুরারি সাধু রূপের নাই সীমা।
বিধাতা গড়েছে যেন সোনার প্রতিমা।।
তারপর উভয়ে 'সুন্দরে লইয়া ফেলে গহনের বনে।'

সত্যপীর সুন্দরকে বাঁচাবার জন্যে বনে গেলেন—
'অনাথের নাথ পীর ভারিয়া গোদায়।
বেহেস্তের পানি দিলে সুন্দরের গায়।।
মোরদার শরীরে সাধু পাইল জীউ দান।
প্রাণ দান পাইয়া সুন্দর ঘরে যায়।
আবে জমজমার পানি দিলেন দেওয়ান।

সুমতি-কুমতি তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলে-'মরিয়া না মরে কেন সাধুর নন্দন।' আবার সুন্দরকে কেটে দু'টুকরো করে তারা—

মহানন্দে ভরে তারে কলসী ভিতরে।
বনেতে খুদিয়া গাড়া গাড়িল তাহারে।

সত্যপীর এবারও সুন্দরকে প্রাণদান করলেন। সুন্দব ভয়ে আর বাড়ি ফিরে যেতে চায় না দেখে সত্যপীর তাকে ভরসা দিয়ে বললেন—

আমি তোমার আছি সখা কোন বাতে নাহি ধোকা
মারিলে জেলাব বারবার।
লিয়ে কাউর দেশেতে বাজার
বেটীর সাথে
বিভা আমি দেলাব তোমার।।

সুন্দর এবার ঘরে ফিরলে ভ্রাতৃবধুদ্বয় তাকে---

'কুচি কুচি করে কেটে সাতখান করে
সাতখান সাত ঠাই গাড়িলে যে বনে।।

সত্যপীর আবার তাকে জীবনদান করলেন। এবার সত্যপীর পরামর্শে সুন্দর গোপনে সুমতি-কুমতির 'চেলাগাছে চড়ে কামরূপে পৌছিল।' সেখানে---

সত্যপীর সুন্দরেরে সাথে করে লিয়া।
কাউরের রাজবাটি পৌছিল আসিযা।।'

সেখানে রাজকন্যা বিমলার স্বয়ম্বরসভা বসেছে। কাউরের (কামরূপ) রাজার নাম গিরিধর। রানীর নাম অমলা। সত্যপীর রাজকন্যার ইষ্টদেবী চণ্ডীর রূপ ধারণ করে সুন্দরকে বরমাল্য দেবার জন্যে উপদেশ দিলেন রাজকন্যাকে। সুন্দরের সঙ্গে বিমলার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সুমতি-কুমতির চেলগাছে করে ফিরতে না পারলে আর স্বদেশে ফিরে যাবার উপায় থাকবে না—স্বপ্নে সত্যপীর থেকে এ নির্দেশ পেয়ে বিয়ের রাত্রেই ঘুমন্ত রাজকন্যার আঁচলে চিঠি লিখে সুন্দর চলে গেল—

'সুন্দর আমার নাম লিখি যে তোমারে।
হুগলী সহরে ঘর চন্দননগরে।।
মাতা দিনবতী মোর পিতা জয়ধর।
মদন কামদেব হয় দুই সহোদর।।

সকাল বেলায় রাজকন্যা বিমলা স্বামীকে না দেখে কাঁদতে লাগল ঃ

-কন্যার চক্ষের জলে বদন ভিজিয়া চলে
আঁচলেতে দেখিল লিখন।'

তারপর ঠিকানা ধরে কন্যা স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করল। এদিকে সুমতি-কুমতি সুন্দরকে এবার 'পক্ষী করে উড়াইল।' আর---

'সত্যপীর দিয়া পক্ষী চলিল সফর।
মদনকামদেব যেথা সেই দেশপানে।।

সুন্দরের স্ত্রী রাজকন্যা বিমলা এসে সুমতি-কুমতির সঙ্গে দুঃখে দিন কাটাতে থাকে। তখন সত্যপীর 'শ্বেত মাছি রূপে আসি কন্যার কান্ধেতে বসি' বললেন ঃ

রাজার নন্দিনী শুন অকারণে কাঁদ কেন
পাবে পতি থাক এইখানে।
সুন্দর পাইবে তুমি তাহারে আনিব আমি
মোর নাম বটে সত্যপীর।
সিন্নি মান সত্যপীরে ঘরে বসে পাবে তারে
কদাচিত না হবে দেলগির।।

এদিকে সতীপীরের মায়ায়–

'সোনার বরণ সোয়া [শুয়া] পড়িল যে ধরা।
সুন্দর হইল বন্দ আখটিয়ার কলে।।

মদন-কামদেব সুন্দরের জন্যে সেই শুকপক্ষী হাজার টাকা দিয়ে কিনে বাড়ি ফিরল। সুন্দরের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে কুমতি বলল ঃ

'সুন্দরের রীত সাধু কি জিজ্ঞাস মোরে।
লুচ্চা পানা করে সেই ফেরে ঘরে ঘরে ॥
না জানি রাক্ষসী সেহ কহি তোমার পাশে।
সুন্দর উড়িয়া গেল তাহার নিশ্বাসে ॥

মানা যদি কবি সাধু নাহি শুনে মানা।
কোথা হৈতে আনিল কামিনী একজনা ॥
তখন–এতেক শুনিয়া সাধু করে হায় হায়
জমিনে পড়িয়া দোহে গড়াগড়ি যায় ॥

সুন্দরের জন্য শুক পক্ষী এনেছিল তারা। সুমতি বলল ঃ

'সুন্দরের রমণী ঘরে আছে শশী মুখী
তারে নিয়া দেহ সাধু এই সোয়াপক্ষী'।

মদন বধূকে শুকপক্ষী দিয়ে বলল ঃ

সোয়াপক্ষী আনিবারে কহিল সুন্দর
ইহাকে দেখিয়া শোক কর নিবারণ।

একদিন সত্যপীর এসে বিমলাকে স্বপ্নে বলে গেলেন ঃ

পিঞ্জিরায় খসম তেরা সাধুর নন্দন।
সোয়াপক্ষী হইয়াছে শুন বিবরণ ॥
মস্তকে শিকড় বান্ধা আছে একখানি।
বেহানে খুলিয়া লেহ রাজার নন্দিনী.....
এলাহি আলামিন আল্লা আপনি খোদায়
ইহার খাতিরে মুঝে ভেজিল দুনিয়ায়।
নিয়ত কাঁদিবে যেবা আমার দরগায়।
নিয়াত হাসিল হবে হুকুমে খোদায় ॥

সত্যপীরের নির্দেশমত বিমলা 'ঔষধ খুলিতে সাধু মানুষ হইল।' বিমলা কৌতুক করে—

তিন ঠাঁই থরে থরে অন্ন পসারিল
বিমলা ভাওর [ভাশুর] দোহে
ডাকিতে লাগিল।
বিমলা কহেন ভাওর তোমরা দুইজন
কোথা তোমার ছোট ভাই ডাক না এখন।
এতেক শুনিয়া কাঁদে ভাই দুইজন
আছাড় খাইয়া পড়ে সাধুর নন্দন।
তুমি বহু আসিয়া আমায় শোক দিলে
নেভানো আগুন কেন ফের জ্বালাইলে।

বিমলা স্বামীকে নিয়ে এল, তিন ভাইয়ে মিলন হল। সুমতি-কুমতিকে 'খন্দক' করে জীবন্ত কবর দেয়া হলো। সত্যপীরের শিরনীও করা হল—

মোল্লাজি আসিয়া ফাতেহা করিল তামাম।
সিরনি বাটিয়া দিল হিন্দু ও ব্রাহ্মণে।।

আরিফ রচিত লালমনের কিস্‌সা

লালমনের কিস্‌সা নামের সত্যপীর পাঁচালী রচয়িতা আরিফ আঠারো শতকের শেষভাগে অথবা উনিশ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা চলে। আমাদের যে তিন খানা প্রতিলিপি রয়েছে, তাদের লিপিকাল ১২৭৬ বাঙলা সন, ১২২০ মঘী ও ১২১৯ মঘী। পুথিগুলো চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে সত্যপীর মাহাত্ম্যও কাহিনীর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। লালমনের কিসসার সংক্ষিপ্ত সার এই ঃ

কোরব সহরে ঘর হাসেম বাদসার।
হোচন সা বলিআ নাম বেটা ছিল তার।।
আর– সৈদ জামাল নামে ছিল সেই সহরে।
লালমন বোলে বেটী পয়দা তার ঘরে।

যথা সময়ে লালমন আরবি-ফারসি পড়া শেষ করল।

তারপর—

এক রোজ লালমন হইআ খোসালিত।
গোছল করিতে বিবি চলিল তুরিত।।
গোছল করিয়া বিবি আইল মোহলে।
উলঙ্গ হইল বিবি কোম্বর হইতে।
হোসেন সা বাদসা তাহা পাইল দেখিতে।।
দেখিয়া বাদশার বেটা বোলে হাএ হাএ।

বাল শুখাইতে গেল বালাখানা 'পরে।
পাছু পানে ঝারে কেশ হেলাইয়া।
হৃদয় কাচলি তার পবিল খসিয়া।।
খানাপিনা নাই খায় সেই দিন জাএ।।

তারপর উভয়ের মধ্যে প্রেম বিনিময় চলতে থাকে। কিন্তু ভয় হোসেনের পিতা বাদশাকে তিনি এ বিয়েতে রাজি হবেন না।

তাই উভয়ে বিয়ে করল গোপনে।

'তোমাতে আমাতে কথা আর কেহ নাই।
ইহাতে রহিল সাক্ষি সত্যপীর সাঁই।।
ধরিয়া বাদশাব হাত দিল আপন ছেরে।
আপনার তন বাদশা সুপিনু তোমারে।।
হাসি পরিহাস কথা কহে দুই জনে।
এদিকে– 'মায়া করি সত্যপীর গেল সেইখানে।।
পীর বোলে লাল সাক্ষি করিছে আমাএ।
দোয়া করে আসি যাই হাত দিয়া গাএ।।

সত্যপীর বলেন ঃ
এসেছি তোমার বাটি ভিক্ষার লাগিয়া।
কিন্তু বাদশার বেটা হইল গরম।
সত্যপীরে ফেকে মারে হাতের কলম।...
এথেক শুনিয়া কহে সত্যপীর সাঞি।
আমারে যে গালি দিলে লালে পাবে নাই।
শাপ দিল সত্যপীর দেলে গোস্বা হইআ।
পাইবে বহুত দুঃখ লালের লাগিআ।

কয়েকদিন অতিবাহিত হল। 'পাপকর্ম ছাপা নাই প্রকাশ হইল।' তাই বাদশাজাদা বলেঃ

চল মোরা রাজ্য ছাড়ি পলাইআ যাই।
মরদানী বেশ করি বান্ধহ কোমর।
রাহার খরচ লহ সোনার মোহর।।
শিরেতে বান্ধিল পাগ মুগলিয়া করি।
দোছরা পোসাক লিল লাল সে সুন্দরী।...

কিন্তু পথ ভুল করে তারা পড়ে ফাঁসিয়াড়ার হাতে।

'তামাম ফেসেড়া গেছে শিকারের তরে।
এক বুড়ি বসি আছে দরওাজা উপরে।।

লালমন বাদশাজাদাকে পরামর্শ দিল—পালাবার জন্যে

পুরুষ পরশমনি যেইখানে যাবে...
আমা চেয়ে পাবে কতো সোনার কামিনী
কাজেই না কর বিলম্ব বাদশা ঘোড়া হেকে যাও।

কিন্তু বাদশাজাদা গেল না, বলে :

'দিআছি দস্ত পিরীত লাগিয়া
কেমনে থাকিব লাল তোমাকে ছাড়িয়া।

সত্যপীরের শাপ ব্যর্থ হবার নয়। কাজেই একদিন–

ফেসেড়া নন্দন তলওাড় হাতে করি নিল।
মারিয়া সমসের তার শির জুদা কৈল।।

তখন লালমন গোসল করতে গিয়েছিল।

'গোছল করিয়া তবে আইলে লালমোন।
তাহাকে ডাকিয়া কহে ফেসেরা মোদন।।
কেটেছি তোমার পতি দেখেগো নজরে।
চলোগো আমার সাথে লিয়া খাবো ঘরে।।
এথেক শুনিয়া লাল করে হাএ হাএ।
আচমান টুটিয়া যেন পড়িল মাথাএ।।..
সংসারের মাঝে মোর আর কেবা আছে।
প্রাণনাথ বিনে দাণ্ডাইব কার কাছে।।

চারদিন ধরে নিহত স্বামীর দেহ কোলে করে লালমন বিলাপ করেছে। লালমনের শোকে সত্যপীর অস্থির হয়ে উঠলেন ঃ

আসা 'লিল হাতে যে খরোম দোন পাএ।
মায়া করে সেইখানে গেল সত্যপীর।
লাল উদ্ধারিতে যান আপে সত্যপীরে।

লালের মুখে সব কথা শুনে সত্যপীর বললেন ঃ

মরেছে বাদশার বেটা সত্যপীরের হটে।
এক মোন করে ধড়ে লাগাইবে শির।
একদা করিয়া সিন্নি সত্যপীরে দিবে।
বাঁচিবে বাদশার বেটা সখা সত্যপীর।

লালমন শিরনী মানল।

এরূপে—প্রাণ-দান পায় বাদসা বসিল উঠিএ।

কিন্তু লালমন ও বাদশাজাদা ....

'বান্ধিয়া ঘোড়ার জিন দোহেতে চলিল।
মানিল সিরনী তাহা বিস্মরিয়া গেল।
রঙ্গ রসে ভুলে গেল নাহি মানে পীরে।
পীর বলে দুঃখ আমি দিবগো লালেরে।।
গোস্বা হইআ শাপ দেন আপে সত্যপীরে।
ছয়মাস থাক তুমি বন্দখানা ঘরে।।

সত্যপীরের শাপ বিফল হবার নয়। কাজেই আর একটি বিপদ ঘটে গেল। পথে মৃগাল শহরে লালমন ও বাদশাজাদা এক মালিনীর ঘরে আশ্রয় নিল। দৈবক্রমে সে-শহরের বাদশা সৈয়দ নেহারের ঘোড়া চুরি গেল রাত্রিবেলায়। সেই ঘোড়া ছিল অবিকল লালমনের ঘোড়ার মতো। রাজা সকালে কৌটালকে হুকুম দিলেন—

তাকিদ করিয়া ঘোড়া এনে দেঅ মোর।
বিলম্ব হইলে কাটা যাবে শির তোর।।

বাদশাজাদা বাজারে গিয়েছিল। তাই ঘোড়া চুরির অপরাধে পুরুষবেশী লালমন বন্দী হল। বাদশাজাদাকে মেড়া করে বন্দী করে রাখল মালিনী। ছয়মাস পরে সত্যপীর লালমনের প্রতি সদয় হলেন—

'পীর বলে উদ্ধার করিব যে লালেরে।
পীর বলে স্থির হও না কান্দ যুবতী।।

সত্যপীরের মায়ায় এক গণ্ডার এসে শহরে অত্যাচার শুরু করল. কেউ তাকে বধ করতে পারে না—পঁলাইয়া যায় লোক ছাড়িয়া শহর'। অবশেষে রাজা ঘোষণা করলেন—

বাদশা ডাকি বোলে ফের গণ্ডার যে করে জের।
জামাতা করিব তারে বেটি বেহা দিব ফের।।

লাল কোটালকে বশ করে বন্দীখানা থেকে বের হয়ে হত্যা করল গণ্ডার এবং বিয়ে করল বাদশাজাদীকে। তিন দিন পরে লালমনকে রাজকন্যা মেহতাব বলে ঃ

'কন্যা বলে প্রাণনাথ কান্দ কি কারণে
হাস্য পরিহাস কথা নাহি কহ কেনে।।
রোদন করিয়া কিছু লালমনে বলে।
কি বলিব প্রাণনাথ প্রাণ যে বিকল।।
মাসেক দেঅরে ক্ষেমা খাও মোর কথা।
পশ্চাতে কহিব কন্যা যথ আছে কথা।।
এইরূপে সেইদিন গুজরিয়া গেল।
সত্যপীর বলে লাল এআদ হইল।।

সত্যের মসজিদ তৈরি করে দিল লালমন। বাদশাজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করল নগরবাসীদের জন্য। মালিনীর 'মেড়া' রূপী বাদশাজাদাও এল। বাদশাজাদা লালমনকে

চিনতে পেরে মালিনীর অজ্ঞাতে মসজিদের দেওয়ালে নিজের দুঃখের কাহিনী লিখে গেল। লালমন সে লেখা দেখে শহরের সব মেড়া হাজির করাল। তারপর মালিনীকে মার দেওয়ায় 'সে অবশেষে সেই মেড়া মনুষ্য করে দিল।' লালমন সত্যপীরের শিরনী করল। রাজকন্যা মেহতাকে বাদশাজাদা হোসেন বিয়ে করল। মৃগাল শহরের অপুত্রক বাদশা সৈয়দ নেহারের রাজত্বও পেল হোসেন। ডক্টর সুকুমার সেন-উদ্ধৃত[১] লালমনের কেচ্ছার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য পুথির পাঠভেদ প্রচুর। তাই সম্পূর্ণ গল্পটি বিবৃত হল।

কবির কোন বিশেষ পরিচয় গ্রন্থে নেই। ভণিতা এরূপ ঃ

১. পীরের চরণ সেবি রচিলো আরিফ কবি
সঙবিয়া সত্যর চরণ।

২. সত্যের কউসে যে আরিফ কবি গায়।
লাএকে [নায়কে] নেয়াজ গাজী ধরি তোমা পায়।।

৩. দেশড়া দক্ষিণ ঘর তাজপুর মোকাম। (ডঃ সুকুমার সেন)

এতে মনে হয় নেওয়াজ গাজী কবির পীর ছিলেন বা কোন দরবেশ ছিলেন।

কবি দেশড়া অঞ্চলের তাজপুর গ্রামবাসী ছিলেন। কবির ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ। কবি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি এই যে আরিফের রচনায় গরীবউল্লাহ ও হামজার প্রভাব নেই।

৩. ফৈজুল্লাহ

এবার উনিশ শতকের সত্যপীর পাঁচালী দোভাষী শায়ের ফৈজুল্লাহর কাব্যের বন্দনাংশ উদ্ধৃত করেই পীরনারায়ণ সত্যের পাঁচালীর আলোচনা শেষ করছি। এঁর বর্ণিত উপাখ্যান রামেশ্বর ভট্টাচার্য বর্ণিত উপ্যাখ্যানের অনুরূপ। এঁর বন্দনাংশে হিন্দু-মুসলিমের উদ্দিষ্ট সত্যপীরকেন্দ্রী মিলন-ময়দান পূর্ণস্বরূপে প্রত্যেক্ষ হয়ে উঠেছে ঃ

সেলাম করিব আগে পীর নিরঞ্জন
মহাম্মদ মোস্তফা বন্দো আর পঞ্জাতন।
সের আলি ফাতেমা বন্দো একিদা করিয়া
হাসন হোসেন পয়দা হৈল যাহার লাগিয়া।
রসুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারিদেহ ইমামের নাম লব কত।
ইব্রাহিম খলিলের পাযে করি নিবেদন
বেটার কোরবানী দিল দীনের কারণ।
কোরবানী করিয়া দিল ইসমাইল করিয়া
সেই হৈতে নিকা বিভা হৈল দুনিয়া।
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পলোয়ান দুইজনে
ইসমাইল গাজী বন্দো গড়মান্দারনে।
বন্দিব (দরদস্তা) পীর কামাএর কুনি
বড়খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার (পাণ্ডুয়ার) সফী খাঁয়ে করি নিবেদন
অবশেষে মন্দির সত্যপীরের চরণ।
সীতা ঠাকুরানী বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিণী বন্দো শচীঠাকুরানী
সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত
এক লাখ আশী হাজার পীরের নাম
লব কত
সম্বল পীরিনী বন্দো বিবিগণ যত
বিবি ফাতেমার কদমে বন্দিব শত শত।
হিন্দুর ঠাকুরগণ করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
নামেত বন্দিয়া গাইব ধর্ম নিরঞ্জন
যার ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন
কৃষ্ণবলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞি
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোঁসাঞি
কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলে আপনি।—
গাইল ফৈজুল্লা কবি সত্য পদে মন।

১. *ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য দ্রষ্টব্য।*

এ বন্দনায় কবির অজ্ঞতার ছাপ আছে, কিন্তু আন্তরিকতায় ও বিশ্বাসে খাদ নেই। সত্যনারায়ণ পুথির আর এক কবি বিদ্যাপতি ও ইসমাইলগাজী, বড়খাঁ গাজী প্রভৃতির প্রশস্তি গেয়েছেন।

সত্যপীর পূজার আদি প্রচারক ঃ

ব্রহ্মপুত্র কূলে গ্রাম নামে কালীপুর। সেই গ্রামে সত্যানন্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বসতি প্রচুর।। প্রথম প্রকাশ তাতে সত্যনারায়ণ।

[ডঃ সুকুমার সেন-উদ্ধৃত]

উল্লেখ্য যে পীর-নারায়ণ সত্য উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতেও একেবারে অজ্ঞাত ছিলেন না।

৩। পীর-নারায়ণ সত্যের পাঁচালীর ভাষা

পূর্বেই বলেছি, সত্যনারায়ণকে মুসলিম বলেই বিশ্বাস করা হয় এবং শাসক কিংবা পীর-দরবেশ মুসলমান মাত্রই সাধারণত বিদেশাগত। কাজেই তাঁরা বাঙলা ভাষী নন—তাঁদের ভাষা হিন্দুস্তানীই হয়। এটিই ষোল–সতেরো শতকের বাঙালীর অভিজ্ঞতাজাত ধারণা। এ ধারণাবশেই মুসলিম সত্যনারায়ণের মুখে কবিগণ ফারসিমিশ্রিত হিন্দি তথা হিন্দুস্তানী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে মাত্র উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই প্রতীচ্য শিক্ষায় সচেতন স্বধর্মীর জাতীয়তায় আস্থাবান হিন্দুরা দেবনাগরী অক্ষরে লিখে ও সংস্কৃতশব্দের বহুল ব্যবহার যোগে 'হিন্দি' এবং ফারসি হরফে লিখে আর ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে মুসলিমরা 'উর্দু' নামে একই ভাষা দুই নামে দুই বর্ণমালায় চালু রাখে।

পরে এ ধরনের রচনায় মুসলিম চরিত্রগুলোর মুখে বাঙলা-হিন্দুস্তানী মিশ্র ভাষা পুরে দেয়া রেওয়াজে পরিণত হয়, ভারতচন্দ্রের মানসিংহখণ্ড, কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গলের বড়খাঁ গাজী কিংবা প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

দোভাষী সাহিত্যের পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। এখানে কেবল পীরপাঁচালীর কবিদের ভাষার নমুনাই বিবেচ্য।

পূর্বেই বলেছি যে-সব হিন্দুকবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেছেন, তাঁরা পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের শহর-বন্দর এলাকায় তথা কোলকাতা-মুর্শিদাবাদের রাজশক্তি প্রভাবিত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। জয়ে পরাজয়ে জাতির ভাগ্য যেমন রাজধানী থেকেই বিবর্তিত নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি নূতন ভাব-চিন্তা, উত্থান-পতন, ভাল-মন্দ সবকিছুই রাজধানীকেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়। পীরপূজা এবং পীরপাঁচালীও তাই এখানেই উদ্ভূত।

একেতো এসব অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই দরবারী ভাষা ফারসির অমিত প্রভাব পড়ে, (এখনকার যুগে যেমন শহরাঞ্চলের লোকের উপর ইংরেজির প্রভাব রয়েছে) তাতে আবার উর্দু-ফারসির মাধ্যমে পীরের ও ইসলামের কথা জানাতে হয়েছে বলে অনুবাদের সুবিধার জন্যে উর্দু-ফারসি শব্দ রক্ষিত হয়েছে। তাই এই প্রথম আমরা হিন্দু কবির মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহারের প্রবণতা দেখতে পাই। কৃষ্ণরামদাস, ভারতচন্দ্র এবং সত্যনারায়ণ পাঁচালীকার মিশ্ররীতি অনুসরণ করেছেন বিদ্যাপতি, শ্রীকবিবল্লভ, তাহির মাহমুদ প্রভৃতি কবি এ ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। এ সূত্রে অন্যতম সত্যনারায়ণ পাঁচালীকার রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মানসিংহখণ্ডও স্মরণীয়। তখন থেকেই হিন্দুস্তানী-বাঙলা মিশ্ররীতির বা দোভাষী পুঁথির শুরু। আঠারো শতকের শেষার্ধে ফকির গরীবউল্লাহ (রচনাকাল ১৭৬০-৯০ খ্রীঃ) এঁদেরই অনুসরণ করেছিলেন। ইনিও সত্যপীর-পাঁচালী (মদনকামদেব পালা।) রচয়িতা।

আমরা এখানে বিদ্যাপতি এবং শ্রীকবিবল্লভের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা তুলে দিচ্ছি ঃ

রায়মঙ্গলে কৃষ্ণরাম দাসের হিন্দির নমুনা ঃ

'শোনতে হো দক্ষিণরায় এছা দাগাবাজী। কালানলশেরকু তোড়নে কহে কান।
বাঁধকে লে আনছে তবে হাম গাজী।। সিতাব দেখনে চাই কেছাই সয়তান।।

ভারতচন্দ্র এঁর অনুকরণেই মানসিংহ অধ্যায়ে মিশ্রভাষা ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য, ভাবতচন্দ্র দক্ষিণ রাঢ়ের বসন্তপুরনিবাসী ছিলেন।

বিদ্যাপতিব বন্দনাংশ ঃ

'হইয়া বান্দার বান্দা নুঙাইয়া শিব।
বন্দিব বড় খাঁ গাজী পীর দস্তগীর।
এক দিলে বন্দিব দরদস্তা পীর।
বন্দিব পেঁড়োর কাছে পীর সুফী খান।
পাণ্ডুআর বিচে যা রহেত মোকাম।।
শাহা ইসমাইল গাজী হড় মান্দাবণে।।
যাব নাম জাহিব তামাম লোক জানে।।
বন্দিব দফর খাঁ গাজী ত্রিবেণীর ঘাটে।
মিঞা মেরু বন্দিব খরমপুর পাটে।
বন্দিব সকরগঞ্জ ত্রিবেণীর পার।
একে একে বন্দো যত পীর দুনিয়ার।
বড় খাঁ গাজী যেই করিল জাহির।।
আজমীর শহরে বন্দিব আজমেরী।
মাইতলায় বিধি বন্দো সৈয়দের নাবী।
নাম লইয়া এ-সভার জাহানে যেই যায়।
চোরঘাঁটি দক্ষি-দান৷ দেখিয়া পলায়।।
হিন্দুব দেবতা বিচে বন্দিলাম শিব।
একে একে বন্দিব জাহানে যত জীব।।
বন্দিনু সাহেব সত্যপীরের চরণ।
যাহার হুকুমে করি পাঁচালী রচন।।
হিন্দু-হয়্যা পীরের মহিমা কিবা জানি।
হুকুম হৈল যেমন বচিব তেমনি।।

(ডঃ সুকুমার সেন উদ্ধৃত)

শুনহ বেইমান রাজা বাত কহু তোরে।
রাখ্যাছ গোলাম মেরা কিসের খাতিরে
সাত হাজারের মার্তা লইয়াছে ভ্যাড়্যা।
মহল ভিতরে নাচে সাত শত নাড়্যা ॥
হান হান কাট কাট করিয়া ফুকুরে।
রুধিরের নদী বহে মহল ভিতরে ॥
তামাম শহরে আগ লাগাইয়া দিল।
জরু জাতি মাল মার্তা জ্বলিতে লাগিল ॥

[আবদুল কবিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত পুথি পৃঃ ৪২]

জঙ্গনামা রচয়িতা রাধাচরণ গোপও ভাষায় মিশ্ররীতি অনুসরণ করেছেন। (পুঁথির লিপিকাল ১৮২৭ সাল)। ইনিও সত্যপীরের ভক্ত ছিলেন।

বন্দিখানায় যত ছিল হইল খালাস।
সত্যপীরের পাত্র ভনে রাধাচরণ গোপ।
ইলাহি কহেন জীবরীল কর আর কি।
আছমান জমিন ডুবাইছেন রছুলের ঝি ॥
সিতাব করিয়া এখন দুনিয়াকে যাও।
বিবি ফাতেমাকে তুমি যাইঞা সমজাও ॥
কহিও আমার কথা বিবি ফাতেমায়।
ইমামের দাদ নিজে দিবেন খোদায় ॥

খ. কাল্পনিক ঐতিহাসিক এবং দরবেশ পীরপাঁচালী

১. পূর্ব কথা

অনার্য অস্ট্রিক-ভেডিডড মঙ্গোল রক্ত-সঙ্কর বাঙালীর সংস্কার-প্রবণতার কথা নানা প্রসঙ্গে অনেক বার বলেছি। বাঙালী জনসাধারণ তাদের উপর আরোপিত বিদেশী-ধর্মের বন্ধন যখনই শ্লথ দেখেছে, তখনই তাদের আদিম সুপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার ও তাদের অকৃত্রিম স্বকীয় মননধারা স্বরূপে প্রকাশিত করেছে। আর্য-অনার্য উপাদানে সৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম বাঙলায় বেশী দিন অবিকৃত থাকেনি, ব্রাহ্মণ্যধর্মকেও অচিরে অনার্য সংস্কারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে৺লৌকিক দেবতাদেব ঠাঁই করে দিয়ে। নিরাকাব একেশ্বরবাদী মুসলমানও শেষ পর্যন্ত শুধু আল্লাহর উপর ভবসা করে চলতে পারে নি, বহু পীর-দরবেশ জ্বীন-ভূত প্রভৃতির সহায়তা তার প্রয়োজন হয়েছে। অবিকশিতচিত্ত আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল অনার্য বাঙালীর মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বিকৃত হয়ে তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, ধর্মোপাসক, নাথপন্থী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় গড়ে তোলে। মূল উৎস জৈন-বৌদ্ধের

নৈরাত্ম্য-নিরীশ্বর-শূন্য ও নির্বাণবাদ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদিম অস্ট্রিক-মঙ্গোল সংস্কার। বাঙলায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের আদি পীঠ অনার্য অধ্যুষিত পুণ্ড্রবর্ধন বা আধুনিক উত্তর বঙ্গ। জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের আদি বিকৃতিও এখান থেকেই শুরু। উত্তরবঙ্গে নাথসাহিত্যের খুব প্রসার এবং যোগ-তন্ত্রের বহুল অনুশীলন হয়েছিল। আধুনিক কালেও উত্তরবঙ্গে বাউল-দেহবাদীর প্রভাব প্রতুল। উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকলেও এসব বিকৃত জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও আদিম বিশ্বাস প্রভাবিত ধর্মমতাবলম্বীরা মঙ্গোল অধ্যুষিত আসাম অঞ্চলে অর্থাৎ কামরূপ-কমাখ্যায় প্রবল থাকে এবং অনেকে সেখানে আশ্রিত হয়; এবং সেখানে নতুন করে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতোই বৃদ্ধি পায় যে সেখানকার ডাকিনী-যোগিনী ও দারু-তুক টোনার কথা গোটা বাঙলাদেশে রূপকথার মতো ভয়ঙ্কর, চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর হয়ে প্রচারিত হয়। উত্তর রাঢ় অঞ্চলও অস্ট্রিক ভেডিডড অধ্যুষিত এবং জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম পীঠ। এখানেও বৌদ্ধ-হিন্দু ও অস্ট্রিক উপাদানে সৃষ্ট ধর্মদেবতার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। বাঙালীর উপর ধর্মঠাকুরের প্রভাবও কম ছিল না। বিপ্রদাস পিপিলাই, কবি মুকুন্দরাম, দুর্লভ মল্লিক, তন্ত্রবিভূতি প্রমুখ অনেক কবির পাঁচালীতে ধর্মঠাকুর অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে বন্দিত হয়েছেন।

বাঙালী জনসাধারণ চিরকাল আত্মপ্রত্যয়হীন, দুর্বল ও ভাবপ্রবণ পরনির্ভরশীল শক্তি-উপাসক। এই মনোবৃত্তির ফলেই এরা অলৌকিক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন আশ্রয়দাতা দেবতার সন্ধান ও পূজা করেছে। অপ্রত্যক্ষ দেবতার চেয়ে একারণেই অলৌকিক শক্তিধর প্রত্যক্ষ মানবকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। ঐতিহাসিক যুগে এ মানুষপূজার আরম্ভ জৈন-বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষু সাধু পূজায় এবং সমাপ্তি যোগী-সন্ন্যাসী-পীর-দরবেশ পূজায়। ধারাটি এরূপ ঃ শ্রাবক-শ্রমণ-যোগী-সিদ্ধা-সন্ন্যাসী-পীর-দরবেশ। অপরদিকে দেবতাদের মধ্যে শিব-চণ্ডী-মনসা-শীতলা-ধর্মঠাকুর-দক্ষিণরায়-কালুরায় প্রভৃতি এই দু'ধারা এসে অবশেষে মিলিত হয়েছে সত্য-নারায়ণে।

তেরো শতকের প্রারম্ভে যখন প্রসিদ্ধ সূফী দরবেশ জালালউদ্দীন তাবরেজী বাঙলাদেশে আসেন, তখনও তাঁর অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং রাজা লক্ষ্মণসেন ও সভাসদ হলায়ুধ মিশ্র পর্যন্ত তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। ইতোপূর্বেও এদেশে সূফী-ফকিরেরা আর্ত-দুস্থের সেবা করেও কেরামতী প্রদর্শন করে করেই ইসলামের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা জাগিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ। স্থানীয় সামন্তের সঙ্গে প্রচারক দরবেশপীরদের দ্বন্দ্ব, অবশেষে সামন্তদের পরাজয়, ইসলামের প্রসার এবং হিন্দু-মুসলিমের সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানই হয়েছে বর্ণিত বিষয়।

ষোল শতক থেকে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে পীরগণ দেবকল্প বা দেবতারূপে পরিকল্পিত হতে থাকেন পূর্বে বর্ণিত বাস্তব কারণেই, সতেরো শতকে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ পীরকে ইষ্টদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। তখন এ পীর কোন ব্যক্তিবিশেষ রইলেন না, সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে ইনি সর্বজনীন দেবরূপ প্রাপ্ত হলেন। এ সময়ে দক্ষিণ রায়, কালুরায়, বনদেবী (বনদুর্গা) বা বনবিবি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দেবতাও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন। এদিকে জাফরখান গাজী সফীউদ্দীন, ইসমাইলগাজী, খান জাহান আলী খান প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের শক্তি-সামর্থ্যে মুগ্ধ জনগণ তাঁদেরকেও কাল্পনিক পীর বড় খান গাজী, মানিক পীর, গাজী কালু আর মসলন্দী পীর প্রভৃতির সমাসন দান করল।

ষোলশতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহর গাজীবিজয় ও সত্যপীরবিজয়, সতেরো শতকের কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলা মঙ্গল ও কমলামঙ্গল এবং রূপরামের ধর্মমঙ্গল থেকে আমরা নিঃসন্দেহে ধারণা করতে পারি যে সতেরো শতক থেকেই বৈষ্ণবপ্রভাবের মন্দার দিনে বাঙালী হিন্দুরা পীরের বিশেষভক্ত হয়ে ওঠে। পীরের তথা দরবেশের চরিত্রশক্তির ও কেরামতীর মধ্যে তারা দেবতার স্বরূপ দেখতে পায়, আর সাধারণ সুফী-ফকিরের মধ্যে দেখে আদর্শ সাধক। তাই কবি রূপরাম ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা বলতে গিয়ে ধর্মকে করেছেন আদর্শ পীর, নিজে হয়েছেন ফকির। হিন্দুদের ফকিরচাঁদ, ফকিরদাস, ফকিররাম প্রভৃতি নাম থেকেও পীর-ফকিরে ভক্তির আভাস পাওয়া যায়।

সত্যপীরপাঁচালী রচয়িতা হলেন ষোল শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ এবং সতেরো শতকে কৃষ্ণরামদাস, ও বর্ধমান জেলার শাহবাদ পরগনাবাসী দ্বিজ গিরিধর (১৬৬০ খ্রীঃ) আর উত্তরবঙ্গের কবি শামস-নন্দন তাহের মাহমুদ। এঁদের পরে আমরা আঠারো শতকের প্রায় পঁয়তাল্লিশজন পীরপাঁচালী রচকের সন্ধান পাচ্ছি। সত্যপীর দক্ষিণবায় কালুরায়, বড় খাঁ গাজী, বনবিবি প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান দেবতাগণের পারস্পরিক বিরোধ ও মিলনের মধ্যে দিয়ে শাসিত হিন্দুগণ শাসক মুসলমানের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের রফা খুঁজেছে। 'বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।' 'মক্কার রহিম অযোধ্যার রাম অভিন্ন।' তাই এ জাতীয় সাহিত্য হিন্দুদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে বেশি। তবে আঠারো-উনিশ-বিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গীয় কয়েকজন মুসলমান কবিও কয়েকটি পীরপাঁচালী রচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে তুর্কি আমলে যে প্রয়োজনে ও লক্ষ্যে দেবতামঙ্গল পাঁচালী রচিত হয়েছে, মুঘলযুগে সত্যকেন্দ্রী পীর ও উপদেবতা পাঁচালী সেই একই প্রয়োজনে ও উদ্দেশ্য রচিত। এবার কালান্তরে দেশজ মুসলিমও যোগ দিয়েছে একই লক্ষ্যে। এ সাহিত্য বাঙালীর পতনযুগের সাক্ষ্য বহন করছে। এ পুথিগুলোও রচিত হয়েছে কোলকাতা-মুর্শিদাবাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, উচ্চনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ ধারণ করবার মতো মন বুদ্ধি বিবেচনাশক্তি রহিত হয়, তখন সে একান্তভাবে ভয়-বিহ্বল হয়ে দৈবনির্ভর ও শক্তিপূজক হয়ে ওঠে।

সতেরো-আঠারো শতকের কোলকাতা-মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালীর চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মন্দার দিনে সত্যনারায়ণ ও ধর্মঠাকুর দুর্বল অজ্ঞ অসহায় জনসাধারণের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের সহায়রূপে পূজিত হচ্ছিলেন। নওয়াবীর গৌরব-ও প্রসাদ বঞ্চিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাঙলার দেশজ মুসলমান জনসাধারণও চতুর্বর্গ ফল লাভের সহজ উপায়স্বরূপ হিন্দুদের অনুসরণে ব্যাপকভাবে পীর-পূজা আরম্ভ করে। তারই ফলস্বরূপ আমরা- উনিশ-বিশ শতকে তাদের হাতে কয়েকটি পীরপাঁচালী পেয়েছি।

পালদের পতনযুগে আমরা বৌদ্ধ বজ্রযান সহজযান তন্ত্রযোগ প্রভৃতি পেয়েছি, সেনরাজাদের দুর্দিনে পেয়েছি একদিকে চণ্ডী মনসা প্রভৃতি, অপরদিকে শেখ শুভোদয়া গীতগোবিন্দ প্রভৃতি। রাধাকৃষ্ণলীলার এই পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হল উত্তরকালের বৈষ্ণবমত। তুর্কি-আফগান পরাজয়ে পেলাম ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড়খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী প্রভৃতি। আর মুঘলশক্তির পতনে পেলাম বিদ্যা-সুন্দর, কবিগান, দোভাষীসাহিত্য। এ হচ্ছে স্রোতে ভেসে-যাওয়া লোকের তৃণ ধরে বাঁচবার প্রয়াস।

২. পীরদের উৎস

সৃষ্টির ও স্রষ্টার দ্বৈততত্ত্বই ইসলামের ভিত্তি। সৃষ্টির ও স্রষ্টার সত্তা পৃথক। তাই আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে আবদ্ ও রব-এর তথা বান্দা ও মনিবের। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।' এ জন্যেই আল্লাহর অনুগত থাকাতেই অর্থাৎ কোরআন নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মেনে চলাতেই মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমিত। বিধি-নিষেধ মানা না-মানার উপরই নির্ভর করছে পুরস্কারের বেহেস্তী শান্তি ও তিরস্কারের দোজখী শাস্তি।

মুসলিম সমাজে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের উপ্ত হয় উম্মিয়া শাসনকালে। যখন ইসলাম আরব বহির্ভূত অঞ্চলেও বিস্তৃত, তখন ইহুদী-খ্রীস্টান শাস্ত্র এবং তত্ত্ব ছাড়াও মিশরে সিরিয়ায় ইরাকে ও ইরানে গ্রীক, জোরাষ্ট্রীয়, মানী, মজদকী, জিনদিকী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য নানা তত্ত্বের ও দর্শনের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিমদের ঐতিহ্যসূত্রে পরিচয় ছিল গভীর এবং তাদের উপর ঐ সব মতবাদের সংস্কারগত প্রভাব অচিরে প্রবল হতে থাকে। ফলে অল্পকালের মধ্যে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় দ্বিমতের সৃষ্টি হয় ঃ শিয়া ও সুন্নীমত। এ ব্যাপারে সুপ্রাচীন সভ্যতার ও মননের ধারক ও বাহক ইরাকী-ইরানিরাই ছিল অগ্রণী। এ প্রেরণার উৎস গ্রীকদর্শন আর উপকরণ মিলেছে, খ্রীস্টীয়, বৌদ্ধ, জোরাষ্ট্রীয় মানীয় দর্শন থেকে। এমনি করে ক্রমে শাস্ত্রতত্ত্ব দর্শন-জিজ্ঞাসার স্তরে উন্নীত হল।

আব্বাসীয় যুগে হাসান বসোরীর শিষ্য ওয়াসিল ইবন আতা যুক্তিবাদী মুতাযিলা মত প্রবর্তন করেন। অন্য একদল হল সংশয়বাদী। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আল আশআরী (জন্ম-৮৭৩ খ্রী) প্রচার করলেন এক নতুন মত। প্রবর্তকের নামে এ মত 'আশআরী মত' নামে পরিচিত আর এ সব কিছু ছাপিয়ে সর্বগ্রাসীরূপ নিয়ে আবির্ভূত হল মরমীবাদ বা সুফীবাদ। সুফীবাদে বান্দা-মনিবের শরিয়ৎতত্ত্ব হল গৌণ, মুখ্য হল প্রেমিক-প্রেমাস্পদতত্ত্ব. মানুষের ও আল্লাহর সম্পর্ক হল আশিক-মাশুকের। হাসান বসোরী (মৃঃ ৭২৮খ্রী) রাবেয়া বসোরী (মৃঃ ৭৫৩) ইব্রাহিম অদহম (মৃঃ ৭৭৭খ্রী) আবু হাশিম (মৃঃ ৭৭৭খ্রী) দাযুদ তৃয়রী (৭৮১খ্রী) মারুফ করখী (৮১৫ খ্রীঃ) প্রমুখ আদি মরমী বলে স্বীকৃত। এঁরা সবাই ছিলেন সিরীয় ও ইরাকি এবং এঁদের মতবাদ কোন শিষ্যগোষ্ঠী বা মতবাদী সম্প্রদায় তৈরি করেনি। জুননুন মিশরীই (৮৬০ খ্রী) প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বদর্শন ও সাধনমার্গ হিসেবে সূফীমতকে গ্রন্থ মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিন্যস্ত করেন। এরপর থেকেই ইরানে সূফীমতের দ্রুত বিকাশ ও প্রসার ঘটে এবং এক-এক সূফীর শিষ্যগোষ্ঠী পরম্পরায় মতবাদী খান্দান সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তাই সুফীমত বলতে কোন একটি সুনির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট মতকে নির্দেশ করে না। জনান্তরে কালান্তরে ও স্থানান্তরে সূফী মত ও চর্যা বহু ও বিচিত্র অবয়ব লাভ করেছে। সূফীবাদ গড়ে উঠেছে পূর্ববর্তী সব ধর্মের তত্ত্বচিন্তার নির্যাস নিয়ে; এর আগে এমনি এক সমন্বিত চিন্তাধারার আভাস ছিল শিয়াদের ইসমাইলী শাখার মতবাদে। কাজেই সূফীমত প্রসারের পরিবেশ ছিল অনুকূল।

ভারতবর্ষের সূফীবাদ যেমন বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্ব প্রভাবিত, তেমনি বৌদ্ধ শূন্য বা নির্ধাণতত্ত্বও হয়েছে এর অবলম্বন আর যোগমাধ্যমে কায়াসাধনই হয়েছে সূফী চর্যার স্বীকৃত পন্থা। তাই ফানা ও বাকা দুটোই সাধ্য। এ গুহ্যসাধনা গুরুনির্ভর। গুরুবাদ বৌদ্ধদেরই দান। পীর ও স্থবির সমার্থক শব্দ। ভারতবর্ষের মরমী মাত্রই তাই গুরুবাদী। এ প্রভাবে পড়েই গৃহীরাও পীর-গুরু ছাড়া ধর্মজীবন কল্পনাও করতে পারে না। মুসলিমদের দরগাহপ্রীতিও বৌদ্ধ স্তূপপূজার প্রভাবজ ও ঐতিহ্যবাহী।

এ সূত্রে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় পাঞ্জ বা পাঁচ পীরতত্ত্বও স্মর্তব্য। এটিও উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিমের পীরপূজার ভিত্তি ও উৎস। এ পাঁচপীর ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, কোন কোন অঞ্চলে কাল্পনিক, আবার কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তিত্বের মিশ্রণে গঠিত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ও সম্প্রদায়ে পূজা-শিরনীর পদ্ধতিও আলাদা। ভারতবর্ষের এ পাঁচপীর অর্থাৎ পাঁচ সংখ্যক পীরতত্ত্বের উদ্ভবের মূলে রয়েছে শিয়াদের 'পাকপাঞ্জতন' তত্ত্বের অবচেতন প্রভাব। 'রসুল, আলি, ফাতেমা, হাসান ও হোসেন'—পাকপাঞ্জতন শিয়াদের ভক্তিভাজন এবং কালক্রমে রোগের শোকের মহামারীর ও আপদ-বিপদের সময়ে স্মরণ্য ও শরেণ্য শক্তিরূপে কল্পিত ও স্বীকৃত। ভারতবর্ষে মুখ্যত পার্থিব জীবনে জীবিকায় নিরাপত্তায় ও সুখ-সৌভাগ্যের সহায়ক ও মহামারী নিবারক দরবেশপীর বা দৈবশক্তি হিসেবেই পাঁচপীর পূজ্য, স্মরণ্যে ও শরেণ্য শক্তিরূপে কল্পিত ও স্বীকৃত। পঞ্চ বা পাঁচ সংখ্যার তাত্ত্বিক তাৎপর্য, পবিত্রতা, শক্তি ও মহিমা প্রাচ্যে—আরবে ইরানে ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপ্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। পঞ্চানন, পঞ্চবান, পঞ্চতন্ত্র, পঞ্চমকার, পঞ্চভূত, পঞ্চতীর্থ, পঞ্চদেবতা, পঞ্চায়েত, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চলক্ষণ, পঞ্চামৃত, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চসতী, ইরানে পাঞ্জতন, আরবে পাঁচ কলেমা, ইমানের পঞ্চাঙ্গ, পাঁচওয়াক্ত নামাজ প্রভৃতি স্মর্তব্য।

সাধারণ মানুষের আশা-প্রত্যাশা অশন-বসন-নিবাস-নিদান পেয়ে মাটি আঁকড়ে বেঁচে বর্তে থাকার মধ্যেই সীমিত। কাজেই তারা তত্ত্ব বোঝে না, কিন্তু তাত্ত্বিক চেনে, নিজেরা সাধনা করে না, কিন্তু সাধকের সান্নিধ্যে আশ্বস্ত থাকে, তারা নিজেদের সিদ্ধিও কামনা করে না, কিন্তু সিদ্ধ সাধকের কেরামতির বা অলৌকিক শক্তির ফল ভোগ করতে উৎসুক। তাই তারা ফকির দরবেশ সাধু সন্ন্যাসী ভিক্ষু শ্রমণ শ্রাবক যোগী খুঁজে বেড়ায়। পার্থিব তথা ঘরোয়া জীবনের রোগ দুঃখ বিপদ সঙ্কট সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যে তাঁদের অনুগ্রহ আশীর্বাদ তাবিজ কবচ তাগা মাদুলী প্রার্থনা করে।

৪. কাল্পনিক পীর

কালু-গাজী চম্পাবতী উপাখ্যান—বনবিবি মানিকপীর প্রভৃতির চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং বৈষয়িক-জীবন সমাজ, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান হচ্ছে কালু-গাজী-চম্পাবতী। এ উপাখ্যানের রচয়িতা হলেন উনিশ শতকের শায়েব আবদুল গফুর, আবদুর রহিম এবং বিশ শতকের সৈয়দ হালু মিয়া 'বড়ে গাজীর কেরামতি' রচনা করেন। আবদুর রহিমের রচিত কাব্যই শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়। উপাখ্যানের সংক্ষিপ্তসার এই ঃ বিরাটনগররাজ শাহ সিকান্দরের পুত্র জুলহাস পাতাল-পুরীর রাজকন্যা পাঁচতুলাকে বিয়ে করে সেখানেই রয়ে গেল। সিকান্দরের রানী বালরাজকন্যা অজুপা ভেলায় ভেসে আসা একশিশুকে অপত্যস্নেহে পালন করতে থাকে। এ শিশুর নাম কালু। কিছুকাল পরে রানীর একটি ছেলে হল। নাম থুইল তার বড়খাঁ গাজী। কালু-গাজী একসঙ্গেই মানুষ হতে লাগল। দুজনের মধ্যে খুব ভাব। এবং দুজনই ধর্মপ্রাণ। দশবছর যখন গাজীর বয়েস, তখন বাদশাহ সিকান্দর তাকে রাজকার্য দেখতে বা শিখতে বললে গাজী রাজত্বে অনীহা প্রকাশ করল। তাই, রাজা কর্তব্যবোধে কঠোরশাসনে রাখল গাজীকে। তাতে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না বরং খওয়াজা খিজিরের ও গঙ্গা-দুর্গা-শিবের স্নেহপ্রাপ্ত গাজী অলৌকিকশক্তির অধিকারী হয়েছে দেখে রাজা গাজীকে শাসন করা বৃথা বলেই মানল। একদিন কালুকে নিয়ে ঘর ছাড়ল গাজী। ততদিনে গাজী বাঘ-কুমীর-জীন-পরীর মান্য হয়ে গেছে। কাজেই কেরামতির ফলে সহজেই এসে গেল সুন্দরবনে। কিন্তু 'ফকিরের রীত নহে থাকা এক ঠাই।' তাই চলতে চলতে ক্ষুধার্ত হয়ে দু-ভাই রাজবাড়িতে গেল খাদ্য পাবার আশায় কিন্তু হিন্দু রাজা বা প্রজা কেউ মুসলমানকে আহার্য দিতে রাজি হল না—দু'ভাই বিতাড়িত হয়ে ফিরে এল বনে। অপমানিত কালুর মনে জাগল প্রতিশোধবাঞ্ছা।

অগ্নি যদি লাগি যায় এ রাজার ঘরে
আর যেন লিয়া যায় রানীরে যে ধরে।
এ রাজার লোক সব জাতি যদি দিত
মনের মানস মোর তবে পূর্ণ হৈত।

আল্লাহও বাঞ্ছা পূরণে রাজি। কাজেই রাজার বাড়ি পুড়ল, রানীকে জীন হরণ করে বন্দী রাখল মসজিদে। পরাজিত রাজা সপ্রজা ইসলাম গ্রহণ করেই রানী ও রাজ্য ফিরে পেল 'পাত্রমিত্র যত তার রামনাম ছাড়ি নবীর কলেমা পাড়িল।'

তারপর একজায়গায় সাতভাই কাঠুরে কালু-গাজীর সেবা করে তাদের দোয়ায় ধনী হয়ে উঠল। সর্পদেবী পদ্মা (মনসা) হল বনবাসী গাজীর ভগ্নী। সোনাপুর হল গাজীর মোকাম।

এবার গাজী-চম্পাবতীর প্রেম ও পরিণয় বৃত্তান্ত। মনোহর-মধুমালতীর আদল আছে কাহিনীতে দক্ষিণ রায়ের ভক্ত দক্ষিণরাজ্যের রাজা মটুরায় বা মুকুটরায়, তার রানীর নাম নীলাবতী, কন্যার নাম চম্পাবতী। একরাত্রে পরীরা চম্পাবতীর মহলে নিয়ে গেল ঘুমন্ত গাজীকে। রাত্রে উভয়েরই ভাঙল ঘুম, হল পরিচয়। গাজীকে মুসলমান জেনে চম্পাবতী ক্রুদ্ধ হল বটে, কিন্তু ভাগ্যকে মেনে নিয়ে উভয়েই অঙ্গুরী বিনিময় করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। পরীরা শেষরাতে ঘুমন্ত গাজীকে রেখে গেল সোনাপুর। সকালে চম্পা মাকে জানিয়ে রাখল রাতের ঘটনা। শিবের কৃপায় চম্পাবতী সর্বক্ষণ গাজীকে প্রত্যক্ষ করছিল, শেষে এমন হল যে চম্পাবতী স্বয়ং 'গাজীর রূপেতে তখন গাজী হৈয়া গেল'। এদিকে বিরহব্যাকুল গাজীও অধৈর্য হয়ে কালুকে নিয়ে গেল রাজধানী ব্রাহ্মণনগরে। কান্তিপুরে কদমতলায় আস্তানা গেড়ে গাজী কালুকে ঘটক করে পাঠাল রাজসভায়। কালু বরের গুণের কথা বলল ঃ

বুজুরগী দেখিয়া তার কতই ব্রাহ্মণ
পৈতা ছিড়িঁয়া তারা হইল যবন।

তা' ছাড়া রাজকন্যার সঙ্গে গাজীর প্রেমও রয়েছে। 'এ কথা শুনিয়া লজ্জায় রাজা নাহি তোলে মাথা', তবু রুষ্টরাজা ঘটক কালুকে বন্দী করলে কন্যাও পিতার রোষানল এড়িয়ে পালিয়ে রইল।

বাঘের পীর বড়খাঁ গাজী তখন ভেড়াব অবয়বে সুন্দরবনের বাঘবাহিনী এনে লেলিয়ে দিল ব্রাহ্মণনগরে। স্বমূতি ধরে বাঘ রাজবাড়িতেও নগরে ত্রাস সৃষ্টি করলে রাজা মুকুটরায় ইষ্টদেবতা দক্ষিণরায়কে স্মরণ করে। ফলে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর ভীষণ যুদ্ধ হয়, সে-যুদ্ধ হানিফা-সোনাভানের যুদ্ধের মতো। বিপন্ন দক্ষিণরায় গঙ্গায় অনুগত কুমীরবাহিনীর সাহায্য চাইলেও গঙ্গা গাজীর বিরুদ্ধে সাহায্য দিতে প্রকাশ্যে সাহস পেল না। তবে 'এই কথা কোনমতে গাজী নাহি শুনে' অঙ্গীকার করিয়ে দক্ষিণ রায়ের সাহায্যে কুমীরবাহিনী পাঠাল।

এবপর যুদ্ধের ধরণ গেল বদলে, কুমীরের দাপটে বাঘ হটতে লাগল। তখন গাজী প্রচণ্ড রোদ কামনা করল, রোদের অসহ্য তাপে বিব্রত কুমীর ডুবল জলে। গৌরীর বরে দক্ষিণ রায়ের পক্ষে এল এবাব ভূতপ্রেত পিশাচ। এদের ভয়ে আবার ভাগল বাঘ। গাজী আগুনের সাহায্য নিল, আগুনের বেড়া বিস্তৃত হতে দেখে ভূতপ্রেত পিশাচ পালাল। এরপরে রায়-গাজী বাধল যুদ্ধ, সে-যুদ্ধে এক পক্ষ ছোঁড়ে গদা, অন্যপক্ষ ছোঁড়ে আষা, কারো হাতে খড়ম, কারো হাতে ছুরি। অবশেষে পরাজিত রায় মাফ চেয়ে বাঁচলেন। ইষ্টদেবতা হার মানলে রাজা মুকুটরায় স্বযং নামল যুদ্ধে। রাজপুরীতে ছিল জীয়ককুণ্ড। শত্রুর বাঘসৈন্যের হাতে নিহত সৈন্যকে জীয়ককুণ্ডের জল ছিটিয়ে জীবিত করা চলত। কিন্তু বাঘেরা বুদ্ধি করে সে-কুণ্ডে গোমাংস ফেলে অপবিত্র করে দিল। ফলে কুণ্ডের জীবনদানেব শক্তি রইল না আর। নিরুপায় রাজা পরাজয় মানল, চম্পাবতীর সঙ্গে বিয়ে হল গাজীব। তারপর গাজী তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জুলহাসকে ও তার পত্নী পাঁচতুলাকে পাতালপুরী থেকে নিয়ে এসে চম্পাবতী ও কালু সমেত পিতামাতার বিরাটনগরে গিয়ে সুখে বাস করতে থাকে।

বড়খাঁ গাজী সুন্দরবনের বাঘের পীর, ইসলাম প্রচারক ও বীর মুজাহিদ। হিন্দুর দেবতার চেয়ে মুসলিম পীরের শক্তি ও মাহাত্ম্য যে বেশি এবং তার ফলেই যে হিন্দুর দেশে হিন্দুসমাজে ইসলাম প্রসাব লাভ করেছে এবং মুসলিম যে এ শ্রেষ্ঠত্বের গুণেই হিন্দুর দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রমাণ করাই এ ধরণের উপাখ্যান সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। তা ছাড়া তুর্কিবিজয়ের পরে হিন্দুসামন্তদের সঙ্গে ইসলাম প্রচারক সূফী দরবেশদেব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরোক্ষ সাক্ষ্যও বহন করে এসব উপাখ্যান। বাস্তব সাক্ষ্য রয়েছে বল্লাল চরিতে বাবা আদম কাহিনীতে, সিলেটে গৌরগোবিন্দের ও শাহজালাল শিষ্যদের বৃত্তান্তে, আর শাহ সুলতান বলখীর কিংবদন্তী প্রভৃতিতে।

হিন্দুরচিত পাঁচালীতে দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজী

বড়দেহের বেনে পুষ্পদত্তের নির্দেশে রতাই বাউল্যা তার ছয়ভাই ও একপুত্র নিয়ে সুন্দরবনে গেল ডিঙ্গা তৈবির কাঠ সংগ্রহের জন্যে। বনে দক্ষিণ রাযের আশ্রয় এক বিপুলকায় বৃক্ষ কেটে রতাই দক্ষিণ রায়ের কোপে পড়ে। রায়ের নির্দেশে তার চেলা বাঘেরা রতাই ও তার পুত্রকে বাদ দিয়ে রতাইয়ের ছয় ভাইকে বধ করল, শোকে দুঃখে আত্মহত্যা করতে চাইল রতাই। এমন সময়ে দক্ষিণ রায়ের অন্তরীক্ষবাণী শোনা গেল ঃ যদি তুমি তোমার পুত্রকে বলি দাও, তাহলে তুমি তোমার ছয়ভাইকে ফিরে পাবে। রতাই পুত্রকে বলি দিল। তুষ্ট দেবতা দক্ষিণ রায় রতাইয়ের ভাইদের ও পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। রতাইরা কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরল।

বেনে পুষ্পদত্ত ডিঙ্গা নির্মাণ করিয়ে যথাসময়ে বাণিজ্যযাত্রা করল। পুত্রের কল্যাণে তার মা সুশীলা দক্ষিণ রায়ের পূজা দিল, দক্ষিণ রায় বিপদে পুষ্পদত্তকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। পুষ্পদত্তের বাণিজ্যযাত্রা ও ফিরে আসার কাহিনীটি ধনপতি শ্রীমন্তসদাগর উপাখ্যানের অনুকৃত রূপমাত্র। বেনে পুষ্পদত্তের পিতাও সদাগর এবং বিদেশে নিখোঁজ রয়েছে, তার মা সুশীলা স্বামী-বিরহে কাতর। পুষ্পদত্তও পিতার সন্ধানে তৎপর মধ্যসমুদ্রে পুষ্পদত্ত দেখল কমলেকামিনীর মতো এক মায়াপুরী। তুরঙ্গ নগরের বাজা সুরথকে সেও দেখাতে পারল না সে-পুরী। ফলে মিথ্যা বলার অপরাধে পুষ্পদত্তের প্রাণনাশের হুকুম হল। কারাগারে পুষ্পদত্ত দক্ষিণ রায়ের স্তব করে। ফলে বলি দেয়ার জন্যে যখন তাকে মশানে নেয়া হল, তখন দক্ষিণ রায়ের বাঘবাহিনী এসে আক্রমণ করল তুরঙ্গনগর। দক্ষিণ রায় স্বয়ং আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলেন পুষ্পদত্তকে এবং রাজাকে করলেন

হত্যা। রানী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে দক্ষিণ বায় বললেন ঃ যদি পুষ্পদন্তের সঙ্গে তোমার কন্যা রত্নাবতীব বিয়ে দাও এবং আমার প্রতিমা (মৃন্ময়মুণ্ড) পড়ে পূজো দাও, তা হলে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেব। রানী রাজি হল, বিয়ে হল পুষ্পদন্তের সঙ্গে রত্নাবতীর, পুষ্পদন্তের পিতা দেবদত্ত ছাড়া পেল কাবাগাব থেকে। সবাই সানন্দে ফিরে গেল বাড়ি। দক্ষিণ রায়ের গুণ-মান-মাহাত্ম্য দেখে দেশের সবাই দক্ষিণরায়ের পূজো করতে লাগল।

এ উপাখ্যানে দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। একবার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় দক্ষিণ রায়ের ও গাজীর মধ্যে। সে-যুদ্ধ কেউ কারে 'নাহি জিনে সমানে সমান'। দীর্ঘযুদ্ধের ফলে পৃথিবী রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন ঈশ্বর অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধেক পয়গম্বর রূপে আবির্ভূত হয়ে রায় ও গাজীর মধ্যে আপোস রফা করিয়ে দিলেন ঃ

এখন দক্ষিণবায়   সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুরায় থানা
সর্বত্রে সাহেব পীর   সবে নোয়াইবে শিব
কেহ তারে না করিবে মানা।

এ রফার শর্তানুসারে ভাটি অঞ্চল থাকবে দক্ষিণ রায়েব অধিকারে, কালুরায় হবে হিজলীর অধীশ্বর এবং বড়খাঁ গাজী জীবিতাবস্থায় পীররূপে সবার মান্য থাকবেন এবং তাঁব সমাধি স্তূপ বা বেদী [বৌদ্ধপ্রভাবজ] ও মৃন্ময় নৃমুণ্ড প্রতীকে দক্ষিণরায় একই সঙ্গে পূজা পাবেন। শাসক-শাসিত হিন্দু-মুসলিম গোড়ার দিককার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরে এমনিভাবে বাঙলাদেশে শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও জীবিকা ক্ষেত্রে আপোস রফায় শান্তিতে সৎ প্রতিবেশীরূপে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের সুব্যবস্থা করেছিল মধ্যযুগে।

স্বপ্নাদিষ্ট কবি কৃষ্ণবাম দাসের রায়মঙ্গল 'বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র শকেব বৎসর' অর্থাৎ ১৬০৮ শকে বা ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত। এর আগে মাধব আচার্যও একটি রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। অপব রায়মঙ্গল রচক রুদ্রদেবের পাঁচালী তিনটে পৃথক পালায় বিভক্ত ঃ বায়-গাজীযুদ্ধ, রতা-বউল্যা এবং বেনে পুষ্পদত্ত পালা। ফলে উপাখ্যানও একটু পল্লবিত হয়েছে। এটি আঠারো বা উনিশ শতকের কোন সময়ে রচিত বলে মনে হয়।

চম্পাবতীকন্যার পালাগানও এখনো মুখে মুখে চালু রয়েছে যশোব-খুলনায়, গায়েনরা এখনো আসরে এ পালা গেয়ে থাকে।

আঠারো শতকের মধ্যকালের কবি ফকির গরীবুল্লাহ বড়খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন 'ভাটির সুলতান গাজী বড়খান পীর' বাতুনে (গোপনে) দেখা দিয়ে ছিলেন বলে দাবি করেছেন : 'বাতুনে দেখা দিল যারে বড়খাঁ গাজী।' গরীবুল্লাহরচিত সব্যগ্রন্থের বক্তা বড় খাঁ গাজী এবং শ্রোতা পীর বদর।

বনবিবি

অরণ্যদেবতা চণ্ডীই কালান্তরে ও স্থানান্তরে হয়েছেন বনদুর্গা বা বনদেবী। এবং ইনিই পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের মুসলিম সমাজে বনবিবি নামে শ্রদ্ধা ও শিরনী পেয়ে থাকেন। রাঢ়অঞ্চলে গাঁয়ের ঝোপজঙ্গলে লোকমান্য 'বনবিবিতল'ও রয়েছে।

উনিশ শতকের দোভাষী শায়ের খাতেরের উক্তি থেকে বোঝা যায় পূর্বদেশ বাদাবন অঞ্চলে মুসলিম সমাজেই ছিল বনবিবির বিশেষ প্রতিষ্ঠা।

উপাখ্যানটির রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ

১. মক্কার বিরহিম-ফুলবিবি দম্পতি ছিল নিঃসন্তান। তারা আল্লাহ-রসুলের কাছে সন্তান প্রার্থনা করে। অবশেষে নবী গায়েবী আওয়াজ দিলেন—ফুলবিবির কোন সন্তান হবে না, বিবহিম অন্য স্ত্রী গ্রহণ করলে জমজ সন্তান লাভ করবে।

ফুলবিবি পরে প্রকাশ্য এক শর্তে বিরহিমকে বিয়ের অনুমতি দিল। দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে ঘরে এল গোলালবিবি। যথাসময়ে সে হল অন্তঃসত্ত্বা। এবার অসূয়াদুষ্ট ফুলবিবি তার আরোপিত শর্তানুসারে চাইল গর্ভবতী গোলালবিবির বিজন বনে নির্বাসন।

এ উপাখ্যান হযরত ইব্রাহিম-হাজরা-ইসমাইলের কাহিনীর আদলে কল্পিত।, কাজেই বিজন বনে গোলালবিবি যথাসময়ে 'বনবিবি' নামের কন্যা এবং 'জঙ্গলী' নামের পুত্র প্রসব করেন। বলা বাহুল্য মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের মতো এরাও স্বর্গভ্রষ্ট। গোলাল দুটো শিশু-পালন দুঃসাধ্য মনে করে মেয়েটিকে ফেলে ছেলেটিকে নিয়ে স্থানান্তরে গেল। পরিত্যক্তা মেয়েটিকে বনহরিণী পালন করতে লাগল।

সাত বছর পরে বিরহিমের সঙ্গে প্রথমা স্ত্রী ফুলবিবির বিবাদ ঘটলে বিরহিম গোলালের খোঁজ নিতে এল বনে। অনুযোগ-অভিযোগের পরে গোলাল রাজি হল স্বামীর সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে। পুত্র শাহ-জঙ্গলীকে তখন বোন বনবিবি বলেন ঃ

হেঁকে বলে কোথা যাও শা-জঙ্গলী ভাই
মা-বাপের তরে আর প্রয়োজন নাই।
এক সঙ্গে ছিনু মোরা ভাই বহিনেতে
আমাদের জহুরা হবে আঠারো ভাটিতে।

তাই ভাই-বোন বনে বাদারে রয়ে গেলেন। এবং মক্কায় গিয়ে 'হাসানের আওলাদ হইতে মুরিদ হইয়া' ফাতেমার গোরে জেয়ারত করতে গেলে গায়েবী আওয়াজ উচ্চারিত হল ঃ আঠারো হাজার আলম তাহা সবাকার দর্দ

মা বলে যে ডাকিবে তোমারে
দয়াবান হয়ে তুমি উদ্ধারিবে তারে।

তারপরে রসুলের কবরে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন তাঁরা :

'ফকিরের গুরু তুমি খেলাফত দিয়া
বিদায় করহ আমা দোঁহার লাগিয়া
শুনে নবী দরগাতে আরজ করিল
সেই ঘড়ি খেলকা টুপি আসিয়া পৌছিল।

ভাইবোন আঠারো ভাটিতে ফিরে গেলেন।

এ আঠারো ভাটির বর্ণনায় 'নুন মোম মধু' সমৃদ্ধ সুন্দরবনের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে ঃ

এখানে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর।
নুন মোম খাড়ি জড়ি বহুত এয়ছাই
হাট মধু বসায়েছে কত ঠাই ঠাই।

তারপর রয়েছে নতুন দেবতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। একে গোড়ার দিকে হিন্দু-মুসলিমের—শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বৃত্তান্তরূপে এবং সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে আপোস-প্রতীক কাহিনী হিসেবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নুন-মধু-মোম-এর অধিকার প্রাপ্তিলক্ষ্যে ঃ

পহেলা যাইয়া তুড়ে ডাল এ সকল
তবে মাগো ভাটি-দেশ হইতে দখল;
রায়মঙ্গল চাঁদখালি শিবাদহে গিয়া
আগে এ সকল ঠাই আমল করিয়া।
তা বাদে জুড়িবে গিয়া করিবে আসন
সেথা হৈতে আগে না বাড়িবে কদাচন।
এবং আঁধারমানিক তক্ তাহার
(দক্ষিণারায়ের) আমল
না যাইবে সেখানেতে করিতে দখল।

জুড়িতে গিয়ে শা-জঙ্গলী আজান দিল, নামাজের জন্যে এ আজান সন্ধিসূত্রে মিত্র বড় খাঁ গাজীর বলে দক্ষিণ রায়ের মনে হল না। দক্ষিণ রায় সনাতনকে পাঠালেন আজান কার জানতে। সে গিয়ে দেখল ঃ

এক মর্দ এক মেয়ে বৈসে দোহে
উর্ধ্ব মুখে হাত তুলে আল্লা আল্লা করে।

শুনে ক্ষুদ্ধ ও রুষ্ট দক্ষিণ রায় তখনই এদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে যুদ্ধযাত্রা করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মা নারায়ণী বললেন—নারীর সঙ্গে নারীর যুদ্ধই সমীচীন, কাজেই তাঁর দেও-দানা নিয়ে নারায়ণীই যুদ্ধ করলেন বনবিবির সঙ্গে। শা-জঙ্গলী আজান হাঁকলে নারায়ণীর কাফের ভূত প্রেত দেও দানা পালাল আর বনবিবির ইসমের জালে আটকা-পড়া ডাকিনী বাহিনীও অবশেষে ভাগল। তারপরে নারায়ণী-বনবিবির হাতাহাতি যুদ্ধ চলল সারাদিন। বনবিবি কাহিল হয়ে পড়ে বরকতকে শরণ করলেন। বরকত বনবিবির দেহে জোর বৃদ্ধি করল, ফলে নারায়ণী পরাজিত হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন চিরসখীত্বের [দাসী হয়ে রহিব তোমার] অঙ্গীকার করে।

এবং আঠারোভাটির বিচে অধিকার যে যে আছে
সবশুদ্ধ হৈল তাবেদার।

তারপর বনবিবি জহুরা করতে নতুন নতুন স্থান দখলে আনতে লাগলেন ঃ

ছাটি বাদা বসাইতে চলে গাঁয়ে গাঁয়
জঙ্গলী মোকেদ হয় পিছে পিছে ধাএ।
দক্ষিণেতে এড়োজোল সবহদ্দ করিয়া

ক্রমে ভবানীপুর, বেতাখাল, রাজপুর, বিরাড়ি, মাখালগাছা, আসড়ি, ময়নাডাঙ্গা, হাসনাবাদ, পাঠালিগ্রাম, কাটাখালি হদ্দ এভাবে 'ছাটি বাদা বসাইয়া করিলা সরহদ্দ' এবং আবার মুডাই নদীর ধারে ভুরকুণ্ডে এসে বনবিবি মোকাম করে বাস করতে থাকেন। আর তাঁর বাদা অঞ্চলে 'মোম মধু বনে পয়দা হইতে লাগিল'।

বিবির উদারতাও রয়েছে ঃ

কেঁদোখালি দিল বিবি দক্ষিণ রায়েরে নাহি যায় সেখানে দখল করিবারে।

২. এবার বর্ণিত হয়েছে অন্য প্রসঙ্গ। এটি ঘুষ দিয়ে লৌকিক দেবতার পূজা আদায়ের বৃত্তান্ত। বরিজ হাটিতে মধুসংগ্রাহক (মউল্যা) ধনাই-মনাই-এর বাস। ধনাই আশ্রিত রাখাল দুখিয়া বা দুখেকে নিয়ে নৌকাযোগে মধু সংগ্রাহের জন্যে যাত্রা করল দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রসঙ্কুল অধিকারে। ধনাই দক্ষিণ রায়ের পূজো না দিয়েই ঢুকল গড়খালি বনে। ক্ষুদ্ধ ও রুষ্ট দক্ষিণ রায় কালকেতু উপাখ্যানের চণ্ডীর মতোই স্থির করলেন 'ছাপাইব মোম-মধু যেন নাহি পায়'। তিনদিন ধরে বৃথা মধুসন্ধানে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ধনাই যখন নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ল, তখন দক্ষিণ রায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন– আমি দণ্ডবক্ষ মুনির সন্তান দক্ষিণরায় ঃ

যদি তুমি নরবলি-পূজা পার দিতে
সাত ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে।

এবং দুখিয়া বা দুখেকেই দিতে হবে বলি। কেঁদোখালিতে তাকে বলি দিলেই সাতডিঙ্গা বোঝাই মধু নিতে পারবে সেখান থেকে।

ধনাই-দক্ষিণ রায়ের এ সম্বাদ শুনে দুখে কেঁদে কেঁদে স্মরণ ও শরণ করল মা বনবিবিকে। বনবিবি আবির্ভূতা হয়ে দুখেকে অভয় দিলেন–বলি দেয়ার জন্যে তোমাকে যখন দক্ষিণ রায়ের হাতে সঁপে দেবে, তখনি তুমি আমাকে ডাকবে আর আমি এসে 'রায়মণির হাত হতে লিব উদ্ধারিয়া'। দক্ষিণ রায়ের পরামর্শে ধনাই বেশিমূল্যের মোমে ভর্তি করল ডিঙ্গা, মধু যা সংগ্রহ করেছিল তা ফেলে দিল নদীতে।

সেদিন থেকেই আজ তক সে গাঙ্গের পানি মধু পানা
চার তরফেতে আর পানি সব লোনা।

তাই নদীর নাম হল 'মধুখালি'।

কাঠসংগ্রহের নামে দুখেকে বনে নামিয়ে দিয়ে ধনাই বাড়ি ফিরল। এদিকে দক্ষিণায়

'হইয়া রাক্ষস বেটা বাঘের আকার
চলিল দুখের তরে করিতে আহার।

ভয়ে দুখে 'মা' বলে ডেকে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। সেই ডাকে বনবিবি ও শাজঙ্গলী ছুটে এলেন এবং রুষ্টা বনবিবি ভাইকে বলেন দুখের বদলে

ধরিয়া গরুর গোস্ত খাওয়াও উহায় (দক্ষিণরায়কে)

জলে-স্থলে ভীষণ যুদ্ধ হল শা-জঙ্গলীর ও দক্ষিণ রায়ের মধ্যে। এও আসলে শাসক-শাসিত হিন্দু-মুসলিমেরই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের রূপক। শাসক মুসলিমের ধর্মের ও শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংগ্রামও বটে এসব।

অবশেষে ভীত-ত্রস্ত রায় 'হাজির হইল গাজীর নিকটে'। সন্ধিসূত্রে বড়গাজী আগে থেকেই দক্ষিণরায়ের মিত্র ও সৎপ্রতিবেশী। সব শুনে গাজী বললেন ঃ রায়, কাজটাকে ভালো করনি. বনবিবি শা-জঙ্গলী হল আল্লাহর পেয়ারা এবং 'বড় নেক তন' ধার্মিক।

শা-জঙ্গলী রায়ের পিছু নিয়ে গাজীর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে গাজীকে ধমকে বলে মুসলিম হয়ে তুমি 'কাফেরের সাথে দুস্তি বৈস এক সাথে'? গাজী উত্তরে জানান 'এই যে বামুন ইনি বন্ধু মোর হয়'। জঙ্গলী রায়কে বলল 'বনবিবি ডাকিয়াছে চলহ ত্বরায়'। গাজীও গেলেন ভীত রায়ের সঙ্গে। গাজী বনবিবিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে নারায়ণীকে তাঁর 'সই' রূপে গ্রহণ করেছিলেন যুদ্ধের পরে। কাজেই নাবায়ণীর পুত্র

'রায়মণি সই বেটা হইল তোমার।'

তারপরে মাতৃস্বরূপা বনবিবির স্বীকৃত পুত্র হিসেবে দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী ও দুখে (দুখিয়া) একে অপরের ভাই রূপে তিন জনেই কোলাকুলি করে। এবং দুখে ভাইকে মা বনবিবির প্রস্তাবক্রমে গাজী বলে ঃ 'সাত জাড়ি ধন আমি দিব যে উহারে'।

আর দক্ষিণ বায় দুখেকে দিলেন আঠারো ভাটির মধ্যে মোম-মধু আহরণের অধিকার। এদিকে ধনাই একা বাড়ি ফিরে রটিয়ে দিল যে দুখে কাঠকুঁড়োতে গিয়ে বাঘের খাদ্য হয়েছে।

বনবিবির অনুগ্রহপুষ্ট দুখেকে বনবিবি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন কুমীরের পিঠে বসিয়ে। বিদায়ের সময়ে বলে দিলেন—ধনাই বনে এসেছিল বলেই দুখে সৌভাগ্যের অধিকারী, কাজেই ধনাইয়ের সঙ্গে বিবাদে কাজ নেই বরং ধনাইয়ের কন্যা বিয়ে করেই যেন সে সুখী হয়। আর বিপদে পড়লেই যেন বনবিবিকে স্মরণ করে। পুত্রকে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞ মা পুত্রকে বলে ঃ

বুড়ি বলে বাছা তুমি যাহার কৃপাতে
প্রাণ দান পেয়ে বেঁচে আইলে ঘরেতে।
গলায় কুড়ালি বেঙ্কে মেঙে সাত গাঁয়
হাজত খয়রাত তার করহ ত্বরায়।

বনবিবির স্বপ্নাদেশ পেয়ে ধনাই তার কন্যা চম্পার সঙ্গে দুখের বিয়ে দিল। দুখের ধনসম্পদ কাজকর্ম দেখবার জন্যে বনবিবির পরামর্শে দুখে যদুরায়কে করল দেওয়ান। দেশের চৌধুরী দুখের এখন সুখের অন্ত নেই। তবু বনবিবির স্মরণে 'রহে দুখে দস্ত জোড়া হাজির খেদমতে'।

এভাবে নায়ক দুখের মাধ্যমে বনবিবি হলেন জহুরা ও প্রতিষ্ঠিতা এবং জনপ্রিয় বনদেবী। ইনিও বনের ধনের এবং জান-মালের নিরাপত্তার দেবতা। হিন্দু-মুসলিমের জীবন-জীবিকার মন-মতের ও শাস্ত্র-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরোধ-মিলনের চিত্র পীরপাঁচালীতে নয় শুধু, হামজা-হানিফার কথা জৈগুন-সোনাভানের কিসসাতেও রয়েছে। মোহাম্মদ খাতের ও বয়নুদ্দীন বনবিবির সম্বন্ধে দুটো পুথি রচনা করেছেন। উনিশ শতকের মধ্যকালে খাতের আরো কয়েকটি কাব্য রচনা করেছেন। বয়নুদ্দীন উনিশ শতকের শেষে কিংবা বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'বনবিবি জহুরনামা' রচনা করেছেন।

মানিক পীর

আঠারো শতকের বলে অনুমিত কবি ফকির মুহম্মদের পাঁচালী অবলম্বনে মানিক পীর উপাখ্যান বর্ণনা করছি ঃ

পীর মানিক দেবকল্প কাল্পনিক পীর। ইনি সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধির পীর। দুধ ও মোরগ হাজত দিয়ে এঁর সেবা করা হয়। আল্লাহ রোগ সৃষ্টি করার পর ফেরেস্তার জগতে ব্যাধিগুলো উপদ্রব শুরু করল, তখন আল্লাহ বাতেন থেকে মানিক পীরকে আহ্বান করে তাঁর হাতে সব ব্যাধি সমর্পণ করলেন ঃ

আর মানিক পীর 'ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহা বা কহিব কত
যান দেওয়ান দুনিয়া উপরে।

মানিক পীর দুনিয়ায় মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মানিক পীরের সজ্জা ও আকৃতি তখন নিম্নরূপ ঃ

কালিয়া দস্তান পীর বান্ধিল মাথায়
নিঘৃণ ফকির মর্দ ছিড়া কাঁথা গায়।
ঘন ঘন মাছিগুলো উড়ে হাতে পায়।
আর্বল আষা হাতে নিল উঠাইয়া
দম দম মাদার বলে যাএ নেকালিয়া।

আষা ও সোনার খড়ম রেখে মানিকপীর পথে নামাজ পড়ছিলেন। রাখাল দুখিয়া খড়ম চুরি করে নিয়ে বেনের কাছে বিক্রি করে নতুন খাট কিনেছে, খেয়েছে ভাল খাবার। ফকির মানিক খড়ম ফিরে পাবার জন্যে দুখিয়ার বাড়ি গেলেন। দুখিয়ার মা বলে—দুখিয়া সাতদিন ধরে বাড়ি নেই এবং সে কোন খড়ম চুবি করেনি বলে মানিককে বিদায় দিতে চাইল। কিন্তু পীরের তো কিছু অজানা নেই। দুখিয়া অবশেষে অপরাধ স্বীকার করল, বলল 'নিঃস্ব বলে আমার বউ জোটে না'। তাই খড়ম বেচে বিয়ে করার মতলবেই সে চুরি করেছে। মানিক পীর বললেন—তুমি আমার খড়ম ফেরত দাও আমি বীরসিংহ রাজার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব। দুখিয়া রাজি হয় না, বলে—

বাগদীর ছেলে আমি শুন শাহজী
বাগদীর মায়্যা বিভা করি মাছে ভাতে খাব
রাজকন্যা বিভা করি পরাণ হারাব।

অবশেষে দুখিয়াই রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করার জন্যে অনুরোধ করল ফকিরকে। ফকির মানিকও এবার ঃ

গলায় পৈতে দিল কপালেতে ফোঁটা
হাথে নিল পাঁজিপুথি মাথা ভরা জটা।

—ব্রাহ্মণের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে ধমকে বললেন, বারো বছর বয়সের আইবুড়ো কন্যা রয়েছে তোমার ঘরে

'তোকে ছুএ্যে পাজি রাজা জল খায় কে ?

বিয়ের প্রস্তাব উচ্চারণকালে ব্রাহ্মণবেশী ঘটক মানিক অসংকোচে দুখিয়ার পরিচয় দিলেন এভাবে—গঙ্গারাজার পুত্র এসেছে শিকার করতে—

'দুর্গতনন্দন তার নাম শুন মোর ঠাঁঞি
অমন কুলীন রাজা আর পাবে নাঞি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুদূর রাজসভায় গিয়ে বিয়ে স্থির করে দুখিয়ার কাছে ফিরে আসতে দেখে—

'দুখ্যা কয় ভাল নয় নাড়িয়া ফকির
পথ হৈতে ফিরে আইলে করিয়া ফিকির।

যদি সত্যই বিয়ে ঠিক করে থাক, তা হলে 'বাগদীর রীতি অনুসারে—

'হলদি-তেল-ক্ষীর-পিঠা মাঙাইয়া আন'

মানিক পীর দুখিয়ার আবদার মতো তেল-ক্ষীর-পিঠা যোগাড় করলেন। দুখিয়ার দাঁতও রাঙালেন, বাজির আর বাজনারও ব্যবস্থা করলেন, আর বরযাত্রী হল মশালধারী বাঘবাহিনী।

রাজা বাঘবাহিনী দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রাহ্মণবেশী ঘটক মানিককে বললেন—জামাই আর তুমি আসিবে, বৈরাতে (লোকে) কাজ কি ? তাই বাঘদের বিদায় করা হল। এখন রাখালের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ের সময়ে নিরক্ষর রাখাল মন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারলে বিপদ ঘটবে আশঙ্কা করে চতুর ঘটক বলেন ঃ

'অমন ব্যবস্থা দেখ আমা সবার নাঞিঃ।' আমাদের তথা বরের প্রথানুযায়ীই হবে বিয়ে—

হাস্যা খেল্যা বিহা হবে বাঁধাবাঁধি কি—
মাগু কোলে কর্যা বর ঘরে শুবে গিয়া।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাতেই রাজি। বাসর ঘরে হতভম্ব ও ভীত দুখিয়া বধূর—

'ইন্দ্রের কামিনী জিনি দেখি তনু বেশ
মুটিতে কাঁকালি লুকায় পিঠে ভাঙ্গে কেশ।'

—দেখে বধূকে 'চণ্ডীমাতা' বলে সম্বোধন করে প্রাণ ভিক্ষা চাইল।

রাজকন্যা বুঝল 'খসম আমার নিশ্চয় পাগল'। ভীত দুখিয়া মেঝে শুইয়ে রাত কাটাল। রাজকন্যা সকালে মাকে সব বৃত্তান্ত জানাল, মা জানাল রাজাকে। রাজা ঘটককে বলেন এসব কি শুনছি? চতুর ঘটক নানা অজুহাত দেখিয়ে জামাইয়ের আচরণের যৌক্তিকতা দেখালেন, দুখিয়ার জবানেও ভর করলেন মানিক ঃ

যেই কথা কওয়ান পীর সেই কথা কয়,

কাজেই এখন দুখিয়া নির্ভয়ে যে-কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল। বধূ নিয়ে বাড়ি ফেরার আগেই মানিক দুখিয়ার বাড়িঘর ও রাস্তা সোনার করে দিলেন আর তাঁর অনুগত ব্যাধিদের করে দিলেন দুখিয়ার বাড়ির পাইকর-পেয়াদা-দাস-দাসী। আর দুখিয়ার আদি নিবাস কুড়েঘরটি হল মানিক পীরের আস্তানা এবং

'সেই তালপাতার ঘরে সিদ্ধি ঘুটে খায়'।

রাজা বীরসিংহ এলেন জামাই দুখিযার বাড়ি। আদরে আপ্যায়নে এবং জামাইয়ের ঐশ্বর্য দর্শনে তুষ্ট রাজা জামাইকে অর্ধেক পরগনা যৌতুক দিলেন। ক্রমে দুখিয়ার 'বাইশ লক্ষ পরগনার হৈল রাজত্বি।'

মানিকপীর গেলেন মক্কায় হজ করতে। পীরের নামে শিরনী দিল দুখ্যা। এ উপাখ্যান মানিক পীর অসম্ভবকে সম্ভব করার কেরামতি বা অলৌকিক শক্তিধর পীর। দরিদ্রকে ধনী করেন, কাজেই তিনি ধনেব দেবতা। এমনকি তিনি স্বভাবে শিবও। চব্বিশ পরগনার যাদবপুরে মানিক পীরের বার্ষিক মেলা বসে। মেলায় মুসলিমরা মোরগ হাজত বা উৎসর্গ করে রান্না করে খায়। জয়নুদ্দীন রচিত মানিক পীরের জহুরানামায় মানিকপীর দুধবিবির কানীনপুত্র বলে বর্ণিত। হেয়াত মাহমুদের আম্বিয়াবাণীর বন্দনাংশেও মানিক পীরের কেরামতীর কথা রয়েছে—'মানিক পীর শাহপীর বন্দো দুই ভাই। মারিয়া গোঠের গাভী দিয়াছে জিয়াই।' বিশ শতকেই রচিত নসর শহীদের 'মানিক পীরের গান' এবং পিরিজউদ্দীনও রচনা করেছেন মানিক পীরের গান।

মছলন্দ বা মছলন্দী পীর

বিদ্বানদের মতে বৌদ্ধ নাথসাহিত্যের নায়ক মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথই বৌদ্ধজ মুসলিমদের শ্রুতিস্মৃতিতে মছলন্দ বা মছলন্দীপীর বা মোচরা পীর নামে এবং লৌকিক পীররূপে সেবা পাচ্ছেন। মেদিনীপুর জেলার হিজলীর শাসক তাজখান মসনদ-ই-আলা জয়নুদ্দীন রচিত 'মছলন্দীর গীতি'র নায়ক।

৫. সেনানীশাসক পীর-পাঁচালী

আগেই বলেছি গড়মান্দারণ ও কাঁটাদুয়ার খ্যাত ইসমাইল গাজী ত্রিবেণীর শাসক জাফর খাঁ গাজী, ছোট পাণ্ডুয়ার শাহ সফীউদ্দীন সুলতান, খান জাঁহা আলী খান প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জনসমাজে অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধসাধক পীররূপে মান্য হয়ে রয়েছেন। এঁদের দরগাহও রয়েছে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক ও সূক্ষ্মবুদ্ধি কূটনীতিক সম্রাট আওরঙজেব আলমগীরও সতেরো শতকে তাঁর শাস্ত্রনিষ্ঠার জন্যে জিন্দাপীর রূপে জনসমাজে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

১. ইসমাইল গাজী

এঁর চরিত ও মাহাত্ম্যকথা রচনা করেছিলেন শেখ ফয়জুল্লাহ ষোল শতকেই (১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে)। ইসমাইল গাজী ইতিহাসে খ্যাত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন গৌড়সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক (১৪৫৯–৭৬ খ্রী) শাহর সেনাপতি। ঘোড়াঘাটের রাজা ভান্দসীরায় তাঁর বিরুদ্ধে কামরূপরাজের সঙ্গে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অপবাদ দিলে রুকনউদ্দীন বারবক শাহর হুকুমে তাঁর শিরশ্ছেদ হয় (১৪৭৪ খ্রী)। তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয় হুগলীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গড়মান্দারণে। এবং তার খণ্ডিতশির সমাহিত হয় রংপুরের কাঁটাদুয়ারে (খোঁটা দূরে)। ইসমাইল গাজী কোরেশবংশীর ও মক্কার আরব ছিলেন। রুকনউদ্দীনের সেনাপতি রূপে তিনি উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে এবং কামরূপের রাজা কামেশ্বরকে পরাজিত করে গৌড়ের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। মুহম্মদ সাত্তারী রচিত ফারসি রিসালৎ-উস-শুহদায় (১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত) ইসমাইল গাজীর বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ইসমাইলগাজীও পীররূপে মান্য হয়ে রয়েছেন। নানা স্থানে রয়েছে তাঁর দরগাহও। বহু হিন্দু-মুসলিম কবি ও গায়েন বন্দনাংশে ইসমাইল গাজীকে বন্দনা করেন। যেমন সতেরো শতকের ধর্মমঙ্গলের ও মনসামঙ্গলের কবি সীতারাম দাস বলেন 'বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দরণে'। সতেরো শতকের অন্য এক ধর্মমঙ্গল রচয়িতাও বলেন 'মান্দারণ গঢ়েতে বন্দিব পীর ইসমালি'। সত্যপীর রচয়িতা উনিশ শতকের ফৈজুল্লাহও বলেন 'এসমাইল গাজী বন্দো গড় মান্দারণে'।

২. জাফর খান গাজী বা দাফর বা দরাফ খান

ইনিও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তেরো শতকের শেষার্ধে দিল্লীর সুলতান রুকনউদ্দীন কাইকউসের (১২৯১-১৩০১খ্রীঃ) সময়ে ইনি ত্রিবেণীতে আসেন এবং স্থানীয় সামন্ত রাজা ভূদেবকে পরাজিত করে 'গাজী' উপাধি লাভ করেন। এঁর পুত্র বারা খাঁ বা বরখাঁও ছিলেন ত্রিবেণীর প্রখ্যাত ব্যক্তি। জাফরখাঁ গাজী গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। জাফর খানের মাহাত্ম্যকথা কেউ লিপিবদ্ধ করেনি বটে, তবে বন্দনাংশে পশ্চিমবঙ্গের কবি-গায়েনরা এখনো তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

রূপরাম— ত্রিবেণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।

শা-সফী সুলতান পুথিতে—

জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে
গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।

জঙ্গনামায়— ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান
গঙ্গা যার ওজুর পানি করিত যোগান।

জাফর খাঁ ত্রিবেণীতে একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। শান্তিপুরের কবি মুজাম্মেল হকের (১৮৫৯-১৯৩২খ্রীঃ) 'দরাফ খান গাজী' নামে কিংবদন্তী নির্ভর একখানি পুস্তিকা আছে।

৩. শাহ্ সফীউদ্দীন সুলতান

কথিক আছে যে শাহ সফীউদ্দীন সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়ে ছোট পাণ্ডুয়ায় সেনানী শাসক ছিলেন। স্থানীয় সামন্ত পাণ্ডুরাজাকে তিনি পরাজিত করে 'গাজী' হয়েছিলেন। নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসী মহিউদ্দীন ওস্তাগার হিন্দিভাষায় 'শাহ সফীউদ্দীন সুলতান চরিত' রচনা করেছিলেন, তাঁর সে গ্রন্থের দোভাষীরীতিতে অনুবাদ হয়েছিল 'পাণ্ডুয়ার কিসসা বা শা সফি সুলতান' নামে। 'হিন্দি জবানেতে সেই কিতাব আছিল/পড়িয়া সকল ভেদ মালুম হৈল। কবির উক্তি অনুসারে

কুতুব জেন্দা রহিল বড় পেঁড়োধামে (নুর কুতবে আলম গৌড়পাণ্ডুয়ায়)

জাফর খাঁ গাজী রহিলা ত্রিবেণী স্থানে
আল্লার পেয়ারী পীর শা সফী সুলতান
পাঁড়োয়া মকান মাঝে করেন মকান.....
শিরনী খতম হয় শাহ সফী নামে।

ছোট পাণ্ডুয়াতে শাহ সফীউদ্দীন গাজীর দরগাহ রয়েছে।

মনে হয় সেনানী শাসকগণ ইসলাম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন বলেই পীররূপে কৃতজ্ঞ মুসলিমদের কাছে শ্রদ্ধেয় ও মান্য হয়েছিলেন। সফীউদ্দীনের হাতে পাণ্ডুরাজা পরাজিত হওয়ার আগে সংখ্যালঘু (মাত্র পাঁচ ঘর) মুসলাম পীড়ন পেত ঃ

কাফেরের কাছেতে মোমীন মুসলমান
বাঘের নিকটে রইত বকরীর সমান।
এসলামের কারবার করিতে নারিত
করিলে পাণ্ডব রাজা সাজা দেলাইত।

অতএব মুসলিমদের পীড়ন-মুক্ত করার জন্যেই 'গাজী' সফী সুলতান জেহাদ করেন। গল্পাংশটি এরূপ ঃ

একদিন এক মুসলিমপ্রজা পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোবধ করে। পাড়ার ক্ষুব্ধ হিন্দুরা তাই ছেলেটিকেই মেরে ফেলে। শোকগ্রস্ত অসহায় পিতা পাণ্ডুরাজার কাছে নালিশ করতে গেল। রাজা বিচার করলেন না, অবশেষে নিহত ছেলের পিতা দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করল। সম্রাট তাঁর ভাইপো শাহ সফী সুলতানকে পাঠালেন এর প্রতিবিধান করার জন্যে। শফী এসে বালুহাটায় তাঁবু গেড়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু পাণ্ডুরাজার বাড়িতে ছিল জীয়তকুণ্ড। মরাসৈন্যের গায়ে কুণ্ডের পানি ছিটালে সে বেঁচে ওঠে। কাজেই যুদ্ধে শাহ্ সফী পেরে উঠছিলেন না, নগরঘোষ নামে এক গোয়ালের মুখে জীয়তকুণ্ড রহস্য জেনে তাতে গোমাংস ফেলে জলের গুণ নষ্ট করে দিলেন শাহ সফী। পাণ্ডুরাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সপরিবার গঙ্গায় ডুবে মরল। বহু মুসলিম পেল আয়মা সম্পত্তি ঃ

এনাম জয়গীর পেয়ে শাহ-সফী শাহার
আজ তক্ করে ভোগ পাঁড়োয়া মাঝার।

৪. দরবেশপীর

১. বদরপীর—বহু কিংবদন্তীর নায়ক পীর বদরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং আরব থেকে আগত দরবেশ। সতেরো শতকের কবি মুহম্মদ খানের বংশ-পরিচিতি অংশে (অন্যত্র উদ্ধৃত) পীর বদর আলমের কথা রয়েছে, বাহরাম খানের 'লাইলী মজনু' কাব্যেও রয়েছে পীর বদরের উল্লেখ। কক্সবাজার-আরাকান ব্যাপী বঙ্গোপসাগরের কূলের নানা স্থানে রয়েছে বদরমোকাম। এ সূত্রেই তিনি মাঝিমাল্লার রক্ষাকর্তা দরিয়াপীর বদর হয়েছেন। চট্টগ্রামশহরে জামাল খাঁ রোডের মুখে রয়েছে চেরাগ-ই-বদর, বখশীবাজারের কাছে রয়েছে বদরপাতি নামের দরগাহ । দিনাজপুরের হেমতাবাদে, বর্ধমানের কালনায়, বিহারে বদরউদ্দীন-বদর-ই-আলম 'দরবেশের দরগাহ রয়েছে। চট্টগ্রামের বদর তেরো শতকের লোক। মনে হয় একাধিক বদর শাহ ছিলেন।

২. শাহ বদীউদ্দীন মাদার[১]—বদিউদ্দীন মাদারের জন্ম সিরিয়ায় ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে। জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর সময়ে ইনি কানপুরের কাছে মাকনপুরে বাস করতেন। বাঙলাদেশে ইনি না আসলেও তাঁর শিষ্যরা পনেরো শতকের দিকে বাঙলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ছিল, ফলে মাদারী ফকিরদের আড্ডা বা আস্তানা ছিল বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে। মাদারীপুর, মাদারবাড়ি, মাদারশাহ প্রভৃতি স্থাননাম মাদারীদের স্মৃতি বহন করছে। মাদারী দরবেশেরা হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবীর অলৌকিক শক্তির প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভূতপ্রেত-দেও-দানাকে এঁরা মন্ত্রবলে মৎস্যে কূর্মে রূপান্তরিত করে জলাশয়ে বন্দী রাখতেন,—এ বিশ্বাস বশেই বহু দরগাহর ও আস্তানার সংলগ্ন পুকুরে আজো গজারী-মাদারী মাছ-কচ্ছপ পোষা হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্তরবঙ্গে 'মাদারের বাঁশ তোলার' বার্ষিক উৎসব হয় এবং তাতে মাদারের গানের আসরও বসে। উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে মুসলিমরা অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে মাদারের শিরনী করে খায়। মাদারী ফকিরেরা 'দমমাদার' বলে (নিরঞ্জনের রুষ্মায় দম্পাদার বা দম্বদার) হুঙ্কার ছাড়ে। কোন কোন বিদ্বান মাদারীদের শিয়া-সূফী বলে অনুমান করেন। শায়ের আবদুর রহিম রচনা করেছিলেন 'শাহ মাদারের নিকট শাহ মালেকের সওয়াল' নামের পুথি। এটি প্রশ্নোত্তরে তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা।

৩. শাহ সুলতান বল্‌খী

নামেই প্রকাশ শাহ সুলতান মাহমুদ মাহী আসোয়ারের জন্ম বল্‌খেই। মহাস্থানগড়ের নিকটে এঁর দরগাহ রয়েছে। ইসলাম প্রচারের জন্যে তিনি উত্তরবঙ্গে আসেন এবং বগুড়ার স্থানীয় সামন্তরাজা পরশুরাম পালের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও নিহত হন, আর তাঁর ভগ্নী শীলাদেবী করতোয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এখন এ স্থান শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। শাহ সুলতান বলখীর দরগাহর জন্যে সম্রাট আওরঙজেব লাখরাজ জমি দান করেন। করতোয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শাহ সুলতান বলখী অন্যতম ইসলামপ্রচারক। আবদুল মজিদ খান শাহ সুলতান বলখীর কেরামতিবহুল চরিতকথা রচনা করেছিলেন।

৪. পীর গোরাচাঁদ

এঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী। গৌরবর্ণের সুপুরুষ পীরকে হিন্দুরাই আদরে গোরাচাঁদ নামে অভিহিত করে। চব্বিশপরগনার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গাঁয়ে এঁর দরগাহ রয়েছে। প্রতিবছর ১২ই ফাল্গুনে হাড়োয়ার গোরাচাঁদের মেলা বসে। ওইদিন হিন্দু গোয়ালারা বারো মণ দুধ দিয়ে পীরের পাকা কবর ধুইয়ে দেয়। হাড়োয়ায় ও পেয়ারাগাঁয়ে মুসলিম খাদেমরা বাস করেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও ছিলেন এ পীরের পেয়ারা গাঁয়ের খাদেম বংশজ। শেখ লাল

---

১. ক. *Social History of the Muslims in Bengal-Dr, A, Karim, PP113-14*
খ. *Husain Shahi Bengal-Dr. M. R. Tarafder P 166.*
গ. *বঙ্গে সূফী প্রভাব—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক পৃঃ ১৩২-৩৩।*
ঘ. *বাংলা সাহিত্যের কথা-(মধ্যযুগ)—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পৃঃ ৫০২-০৬।*

ও শেখ জয়েনউদ্দি রচিত 'গোরাচাঁদ পুঁথি' ছাড়াও পেয়ারাগাঁয়ের খাদেম বংশজ মুনশী মুহম্মদ এবাদুল্লাহও ফারসি চরিতকথা অবলম্বনে গোরাচাঁদ চরিত রচনা করেন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। 'গোরচাঁদ পীরের কেচ্ছা' রচনা করেন মুনশী মুহম্মদ খোদা নেওয়াজ। মক্কায় সৈয়দ আব্বাস আলী ওর্ফে গোরাচাঁদের জন্ম। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ করিমুল্লাহ। তাঁর কেরামতির অনেক বৃত্তান্ত বশিরহাট অঞ্চলে চালু রয়েছে। গোরাচাঁদ সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক।

৫. পেয়ার শাহ

বারাসত-বশিরহাট রাজপথের শাখা হাড়োয়ামুখী রাস্তার ধারে হাড়োয়ার কাছে [প্রাচীন বালাণ্ডা অঞ্চলে] রয়েছে পেয়ার শাহর বিপুলকার দীঘি। দীঘি-সংলগ্ন গ্রামের নামও পেয়ারা, এ নাম পেয়ার শাহরই স্মৃতিবাহী। দু' শ' বছর আগে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পূর্বপুরুষ শেখ লাল রচিত পেয়ার শাহর চরিতকথায় পেয়ার শাহকে সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর (১৪৯৩- ১৫১৯ খ্রীঃ) সমকালীন ও প্রিয় অনুচর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হোসেন শাহ পেয়ার শাহকে সুহাই অঞ্চলের [চব্বিশ পরগনার বেলেঘাটা এলাকায়] শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। স্থানীয় সামন্ত ডিম শাহ পেয়ার শাহর আনুগত্য স্বীকার করেন। বিক্রমপুরের বল্লালসেন-বাবা আদমের বৃত্তান্তের মতো এখানেও পেয়ার শাহর এবং চন্দ্রকেতুর দ্বন্দ্ব, আকস্মিকভাবে পায়রা হস্তচ্যুত হওয়া, রানী কমলার সপরিজন দহে ডুবে আত্মহত্যা প্রভৃতি বর্ণিত রয়েছে। রাম হাজরা বলে একব্যক্তি হোসেন শাহর কাছে পেয়ার শাহর নামে মিথ্যা অপবাদ জানায়, ফলে বাদশার রোষানলে পড়ে পেয়ার শাহ সপরিবার দীঘির জলে আত্মহত্যা করেন।

৬. মোবারক

পুথির প্রারম্ভে কবি ফকির মুহম্মদ বলেছেন ঃ

শুন ভাই এবে সব কহিয়া জানাই — এক্ষণে গাজীর কেচ্ছা পাওয়া অতিভার।
মবারক্ষ গাজীর কেচ্ছা কেহ করে নাই।। — ছাপা কি কলমি কেচ্ছা ছয় নাহি তার।

কবির এ উক্তি পুরো সত্য নয়। চব্বিশ পরগনা-হুগলী-হাওড়া অঞ্চলে গাথা হিসেবে গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে কিছুকাল আগে পর্যন্ত মোবারক গাজীর কাহিনী চালু ছিল। এখন দুষ্প্রাপ্য হলেও একেবারে অপ্রাপ্য নয়।

মোবারক গাজীর গাথায় অনেক ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে বলে আমরা কাহিনীটি উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করছি ঃ

'দিল্লীতে বসতি ছিল চন্দন শাহার।' — রাজ্যে বর্গীর উৎপাত হচ্ছিল তাঁর সময়ে।
তাই, ভক্ত 'পরে বসে বাদশা করিল হুকুম। — তারপরে কহে বাদশা শুনহে দেওয়ান।
আমার প্রজার 'পরে এমন জুলুম॥ — বর্গী মারিতে আমি করি যে ফরমান॥

দেওয়ান (উজির) লোক-লস্কর নিয়ে বর্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু পথে এক বুড়া ফকিরের সঙ্গে উজিরের সাক্ষাৎ হল।

বুড়ো ফকির বললেন ঃ

'তারপরে কহি আমি শুনহ.উজির। — দিল্লীর শহরে হবে দোসরা বাদসাই।
আমাকে জানিবে তুমি আল্লার ফকির॥ — চন্দন শাহা না পারিবে মারিতে বর্গীর।
আমি যাহা কহি তাহা হইবে নিশ্চয়ই — দিল্লীর শহরে হবে দোসরা জাহাঙ্গীর॥'

উজির ফিরে গিয়ে ফকিরের ভবিষ্যৎ বাণী জানালেন বাদশা চন্দন শাহকে, শক্তিমদমত্ত বাদশা এতে রুষ্ট হয়ে নিজেই করলেন যুদ্ধ-যাত্রা। যুদ্ধে তাঁর হার হল। তিনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

ঢাকার নবাবের অধীন জায়গীর গ্রহণ করে বাদশা চন্দন শাহ সপরিবারে সুখে কিছুকাল বসবাস করার পর আল্লাহ-প্রেরিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক পীরের হুকুমে ফকির হয়ে 'বনেতে যাইয়া কুণ্ড বানাইয়া, শাহা রহে সেইখানে।' উক্ত পীরের সঙ্গে পরামর্শ করে আল্লাহ্ বেহেস্তবাসী এক ওলিকে বললেন ঃ

বেহেস্তের মাঝে আছে অলি একজন। কেতাবে খবর আছে বাইশ আউলিয়া।
আল্লা কহে শুন গাজি কহি যে তোমারে এই কথা শুনিয়া গাজী খোসাল হইল
আমার হুকুমে যাহ চন্দনের ঘরে। এল্লেল্লা বলিয়া যে মুরসিদে ডাকিল।
তখন, 'পাক দেলে কহে গাজী শোন মোক্তারণ মুরশিদ আসিয়া খাড়া সামনে হইল।
যদি আল্লা যাব আমি চন্দনের ঘরে পীরের হুজুরে গাজী আরজ করিল।
অলি আর না পাঠাইবে দুনিয়ার 'পরে। আরজ শুনিয়া পীর কহিল গাজীরে
আল্লা বলে গাজি ওলি শোন মন দিয়া বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিবে আমারে।

তারপরে পীরকে ডেকে আল্লাহ্ 'খোসাল হইয়া দিল এক ফুল।

সে-ফুল চন্দন শাহ দেওয়ানের বিবি শুঁকলে তাঁর গর্ভে মোবারক গাজীর জন্ম হয়।

এবং তিনি বয়োপ্রাপ্ত হলে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিনি পিতৃশোকে যখন ব্যাকুল, তখন 'কান্দনা শুনিয়া পীর হইল হাজির' এবং বললেন ঃ

দেওয়ানা ফকির হও এলাহি ভাবিয়া। এ কথা শুনিয়া গাজী হাত বাড়াইল।
মুরিদ হও তুমি হইয়া তালকিন। হাত ধরিয়া পীর তালকিন করিল ৷৷'
এরূপে—'জিকির করিয়া গাজী দেওয়ানা হইল।

এভাবে দিন যায়। কিছুকাল পরে—

'কতদিন পরে গাজী বড় দুঃখ পায়। দেখিতে দেখিতে কাগজ নিরখিয়া আঁখি।
বেলের সিকদার হৈল মন্দিরায়। তিনসনের খাজানা চন্দসার বাকি ৷৷
লোক জন সঙ্গে করে হৈল রাহাদার। মন্দি রায় বলে কাবিল এই কথা শুন।
ঘোলার কাছারিতে মন্দি রায় বসিল ৷৷ বেলের চন্দন সায় কাছারিতে আন৷৷
প্রথমে বেলের কাগজ দেখিতে চাহিল ৷৷

কর্মচারী কাবিল বলে ঃ

ছিল এক চন্দন শাহা সে গিয়াছে মরে। একপুত্র আছে তার পাগলের প্রায়।

মন্দি রায় বলে–সেই পাগলেরে তুমি এই খানে আন।

কাবিল পেয়াদা গিয়ে বন্দী করে নিয়ে এল গাজীকে।

গাজী বলে আজ আমি কাছারিত যাব। মন্দি রায়ের ছালাম নাহি দিব।

কাছারীতে পৌছলে— মন্দিরায় বলে গাজি কহি তোমার ঠাঁই।
ছালাম মজুরা তুমি আমাকে দিলে নাই ৷৷

জবাবে গাজী বলেন ঃ 'ছালাম মজুরা আমি না দিব তোমায়।

বাবাজি করিত কাছারি এইখানে বসে। সকলে ছালাম দিত মিঞাজিকে এসে ৷৷

গাজীর ঔদ্ধত্যের জন্যে মন্দি রায় হুকুম দিল ঃ

এই অঙ্গে বেড়ি দেহ মোবারকের পায়। যতদিন গাজির খাজানা না পাই।
গাজীকে কয়েদ কর কারাগারে লিয়া। ততদিন গাজীকে ছাড়িয়া দিব নাই ৷৷
জঙ্গম পাথর ওর বুকেতে তুলিয়া ৷৷

অন্ধকার কারাগারে নতুন প্রদীপে তেলের বদলে নিজের মূত্র দিয়ে গাজী চেরাগ জ্বালালেন—

'মোবারক চেরাগেতে পেসাব করে দিল।
আল্লার হুকুমে চেরাগ জ্বলিতে লাগিল ॥

কারাগাবে গাজী আল্লাহ ও পীরকে স্মরণ করতে থাকেন। কিছুদিন পরে পীর ময়নুদ্দিন এসে গাজীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেন। পীর ময়নুদ্দিন গাজীকে দুটো চিতাবাঘ উপহার দিয়ে বললেন—'বেলের বনেতে যাও, সেইখানে গিয়া রও, দুটি বাঘ সঙ্গেতে করিয়া।' তারপর গাজী বাঘ দুটোকে সঙ্গে নিয়ে বেলের বনে গেলেন এবং সিদ্ধ পুরুষ হলেন।

এখন অনুতপ্ত মন্দি রায় কাবিলের পরামর্শে—

কুড়ল মণ্ডা গলায় বেঁধে কিয়া জোড়া।
গাজির ছামনে রায় হৈল গিয়া খাড়া।।
মন্দি রায় ধরে এসে গাজীর যে পায়।
অপরাধ ক্ষমা কর গাজী দয়াময়॥

তাবপর গাজীর ভাই দুঃখীর নামে মন্দি রায় লাখরাজ জমি লিখে দিল—

ওই পাট্টা মোবারক হাতে করে নিল।

তখন মন্দি রায় বলে—বল দেখি বাবা আমার কি হবে উপায়।

গাজী বলে তোমাদের ভাল হইবে না।
গজালের মাঠে মারা যাবে তিন জনা।
হাতীর পায়ের দাবে মরিবে নিশ্চয়ই
খোদার কলম ইহা রদ হবে নাই।

এ সময়ে গায়েবী আওয়াজ হল—'শুন গাজি কহি তুঝে যাও হেথা হৈতে'।

তখন মা-ভাইদের ছেড়ে 'মক্কায় আসিয়া গাজী নামাজ পড়িল'। তারপর সেখান থেকে অপোড়া পৃথিবী মেদনমল্ল পরগনাতে গিয়ে গাজী কৃপণ হেলা খাঁ চৌধুরীর বাড়ীতে দুধভাত চেয়ে খেলেন। হেলা খাঁ চৌধুরীকে বললেন—'করিতেছ জমিদারী পশ্চাতে হবে কাজী।' সেখান থেকে বিদ্যাধরী নদীর খেয়াঘাটে গিয়ে মটুক পাটনীকে পার করে দেয়ার জন্যে বলাতে সে বলল-নদীতে ঝড়ে উত্তাল-তরঙ্গ উঠেছে, এখন খেয়া দেয়া সম্ভব হবে না। তখন গাজী বদরকে স্মরণ করলেন বদর বললেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহ বলে হাতের আষা নদীতে নাবাও। আষার স্পর্শে—

'আড়াই বাঁক নদীর পানি শুকাইয়া গেল।
খড়ম পায় দিয়া গাজী নদী পার হৈল॥
তারপর,
'গাজি কহে বদর এই আরজ মোর লও।
হাঁসাজোড়া কুম্ভীর আমাকে দিয়া যাও।
আর এক কথা কহি শুন সমাচার।
ডাকিলে দিদার যেন পাই যে তোমার॥

পাটনী কাছে এসে এ সময়ে বলে ঃ
ওগো শাহা দয়াময় ঘাট ত আমার নয়
কড়ি কিছু দিতে যে হইল।

গাজীর কড়ি নেই। গাজী পাগড়ী রেখে গেলেন। বললেন—ভাই দুঃখীর দেখা পেলে তার থেকে কড়ি নিয়ে যেন মটুক তাঁর পাগড়ী ফেরত দেয়। তারপর সেওড়াতলায় রাত কাটিয়ে প্রভাতে দেখলেন—'মহেশচন্দ্র ঠাকুর/সঙ্গেতে করিয়া কুকুর/নারায়ণী পূজা দিতে যায়।' ব্রাহ্মণ অকারণে চটে গাজীকে অন্যত্র চলে যাবার জন্যে নির্দেশ দিল। এতে জেন্দাপীর বদর রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী নাইসার দীঘিতে জল আনতে গেলে 'অষ্ট অলঙ্কার দিয়া। কক্ষে স্বর্ণকুম্ভ দিয়া ব্রাহ্মণীকে জলেতে রাখিল।' সারাদিন সন্ধান করে ব্রাহ্মণীকে না পেয়ে রাত্রে ব্রাহ্মণ যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন—

'নারায়ণ স্বপনে বলে ফকিরের পদতলে ফকির বলিয়া দিবে ব্রাহ্মণী বাটী আসিবে

ব্রাহ্মণীর কথা জানাইবে।
এই কথা নিশ্চয় জানিবে।

ব্রাহ্মণ খাসী না নিয়ে পাঁঠী নিয়ে গাজীর কাছে যাওয়ায় গাজী রুষ্ট হলেন। ফলে ব্রাহ্মণীকে ফিরে পাওয়া গেল না। গাজী এরূপে স্থানে স্থানে কেরামতী প্রদর্শন করে চললেন।

এমনি করে 'মোবারক গাজীর দিনে দিনে বাড়ে জাহির।'

এদিকে 'একরোজ ঢাকার নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ কহে শুনহে উজীর।
যাহাদের খাজানা বাকি কর না হাজির।।

ফলে অন্যান্য জমিদারের সঙ্গে বারুইপুরের চৌধুরী জমিদার মদন মল্লেরও দরবারে ডাক পড়ল। দরবারে নীত হবার পূর্বে দেওয়ান ফরিদ লস্করের পরামর্শে পেয়াদাদের ঘুষ দিয়ে সময় নিয়ে মদন রায় গাজীর কাছে গেলেন এবং তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করলেন।—'দওন জোড়া খাসী আমি দিব যে তোমায়।'

গাজী ভরসা দিলেন— 'আল্লার হুকুমে তেরা বদি নাহি রয়।
সোনার ভ্রমর হয়ে আমি তেরা সঙ্গে যাঁব।

এদিকে গাজীর মায়ায় মদনরায়ের বাকি খাজনা খাতায় উসুল পড়ে গেল। উজীর দেখল মদনরায়ের খাজনা বাকী নেই তার ভুল হয়ে গেছে। নবাবকে একথা জানালে নবাব উজীরকে ধমক দিয়ে বললেন 'মদনেরে আন গিয়া আশু বাড়াইয়া।' রায় সমাদরে দরবারে অভ্যর্থিত হলেন। তিনি খাজনার দায়ে বন্দী জমিদারদের পরার্মশ দিলেন—

'রায় কহে গাজী বাবার স্মরণ কর।
এবিনে করিয়া তোমরা পূজা মান ভাই।।

তা হইলে তোমরা উদ্ধার পাইতে পার।'

মদনের নির্দেশমত কারাগারে জমিদারগণ গাজীকে স্মরণ করলে গাজী এসে অভয় দিলেন—

প্রভাত কালে তোমরা পাইবে নিস্তার।
তোমাদের বাকি কিছুমাত্র না রহিবে।

এদের খাজনা আশ্চর্যভাবে উসুল পড়ে গেল খাতায়। উজির পড়ল বিপদে। নবাবের কাছে সে কি জবাব দেবে ? গাজীর কৃপায় উজিরও রক্ষা পেল। মদনরায়ের নেতৃত্বে জমিদারগণ গাজীর পূজা করেন।

গাজী মদনরায়কে বললেন—

'পুস্করিনি কাটিতে হবে চল মেরা সাত।
তখন শুনিয়া রায় কোদাল হস্তে লইল।
তিন চাপড়া মাটি কাটিতে পানি যে উঠিল।
রায় কহে গাজী বাবা মাটি কাটিতে না পারি।
'গাজী কহে তোমার তিন পুরুষ জমিদারি।

এরূপে—
জমিদারি করে রায় আনন্দে বসিয়া।
সোলসত ছাপান্ন বিঘা নাখেরাজ গাজী পায়
সতেরই শ্রাবণ অবধি পানি না হইল।
পুস্করিনির পানি সব শুকাইয়া গেল।

গায়েবী আওয়াজ হল— 'শুন শুন গাজী মিয়া কহি তোমার বাবে।
ঘুটুরি গেলে তুমি বহুত পানি পাবে।

কবির পরিচয় ও রচনাকাল কবির ভাষায় দেয়া হল ঃ

'ফকির মহম্মদ নাম জানিবে আমার।
মুনসি জামালউদ্দিন নাম আমার পিতার।
আল্লা দিয়াছেন তিনটি পুত্র এখন।
প্রধান পুত্রের নাম তোছদ্দক হোছেন।

পরগনে মদনমল্ল সবাকে জানাই॥
বসতি করিতেছি রামনগরেতে।
থানা যে জানিবে ভাই বারুইপুরেতে॥
সন ১৩০৯ সাল বাঙ্গালার।

মেজলার নাম হয় আমির হোছেন॥
তাহার ছোটার নাম রফাকাত হোছেন।
জেলা ২৪ পরগনা জান সবে ভাই।
১৪ই কার্তিক রোজ জুম্মাবার।
তামাম হইল কেচ্ছা উক্ত তারিখেতে॥
অতএব রচনাকাল ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে।

'মদন পালা' নামে আর একখানা গীতি রয়েছে। এতেও বকেয়া খাজনার দায়গ্রস্ত জমিদার মদনরায়ের মোবারকগাজীর সহায়তায় শায়েস্তা খানের পীড়ন থেকে মুক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত। মদন রায় ছিলেন চব্বিশ পরগনার রাজপুরের জমিদার।

১৩৩৫ সালের প্রথমসংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু 'সিতাঙ্গগুনিবাসী কলেমদ্দী গায়েন থেকে 'গাজী সাহেবের গান' বা মোবারক গাজীর উপাখ্যান সংগ্রহ করে প্রকাশিত করেছিলেন। মদনরায়-গাজী সাহেবের কাহিনী তাতে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। আমাদের পুথিতে তা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু ঘটনাবস্তুতে পার্থক্য নেই। শুধু ঢাকার 'শায়েস্তা খাঁর স্থলে আমাদের আলোচ্য পুথিতে মুরসিদ কুলি খাঁ পাচ্ছি। ঢাকায় নবাব ছিলেন–শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলি নন। আমাদের পুথিকার ফকির মুহম্মদ ভুল করেছেন।

'হরপার্বতী মঙ্গল' রচয়িতা কবি রামচন্দ্র মুখুটি মদনরায়ের এরূপ পরিচয় দিয়েছেন :

'জাহ্নবীর পূর্বাভাগ মেদনমল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বনমাঝে দেখা দিলা তায়।
সঙ্গেতে সহায় হয়ে নবাবে স্বপন কয়ে
শিরোপা পাইল জমিদারী।
দত্তকুল সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব
কায়স্থকুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ।
সহায় আনন্দময়ী সর্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী 'শ্রীমতী' যার রানী
করিয়া সমাজ স্থান কতভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী
তস্যপুত্র গুণধাম শ্রীকালীশঙ্কর নাম
অল্পকালে হৈল লোকান্তর।
তস্যপুত্র মহাশয় শ্রীরাজবল্লভ হয়
চৌধুরী বিখ্যাত সর্বত্তর।
শৌর্য বীর্য ধৈর্য ধরা অবিবাদে পালে ধরা
গাম্ভীর্যেতে রঘুপতি রাম।

বারুইপুরে এখনো মদনরায়ের বংশধরগণ বাস করছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন–'২৪ পরগণায় প্রায় সকল জনবহুল মুসলমান পল্লীতে গাজী সাহেবের আস্তানা আছে, বিশেষত বারুইপুরের চৌধুরী জমিদারগণের (মদনরায়ের বংশধর) যেখানে যেখানে জমিদারী আছে, সেখানে গাজী সাহেবের আস্তানা ও তাঁহার সম্মানার্থে হাজত দিবার ব্যবস্থা আছে। বারুইপুরের জমিদার ও স্থানীয় প্রজাসাধারণের বিশ্বাস, মোবারক গাজীর কৃপায় রায়চৌধুরী বংশের জমিদারী এখনও বজায় আছে।' এর থেকেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে কাহিনী যতই পল্লবিত ও বিকৃত হোক মদনরায় গাজী সাহেবের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন—কোন বড় বিপদ থেকে তাঁর সাহায্যে উদ্ধার পেয়েছিলেন—এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য।

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—'হন্টার সাহেব (স্টাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল ভল্যুম ১, পৃ. ১৯৯) বিদ্যাধরী নদী তীরস্থ হাসাড়া গ্রামের বিবরণ উপলক্ষে মোবারক গাজীর কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি রেভেনিউ সার্ভেয়ার্স রিপোর্ট হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন ... তাহা কল্পনাপ্রসূত। গাজী সাহেবের গানে প্রকৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বাঁশড়ার জঙ্গলে যেখানে মোবারক গাজী মোকাম করিয়াছিলেন সেইস্থান 'ঘুটিয়ারী শরীফ' নামে প্রসিদ্ধ, ই, বি, রেলওয়ের দক্ষিণ শাখার ক্যানিং যাইবার পথে একটি ষ্টেশন, শিয়ালদহ হইতে ১৯$\frac{১}{২}$ মাইল দূরে অবস্থিত, গাজীর উদ্দেশ্যে মানত করিয়া হিন্দুমুসলমান বহুযাত্রী সর্বদাই এখানে আসিয়া থাকে। মেলার সময় গাজী সাহেবের

গান হয় এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে।... রাজা মদনরায়ের অষ্টম অধস্তন পুরুষ স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর সময়ে রাজা মদনরায় ঢাকায় গিয়াছিলেন।"

নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় সুবাদার ছিলেন। এবং মোবারক গাজী এ সময়ে অর্থাৎ সতেরো শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

৭. একদীল শাহ

চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার আনওয়ারপুরের কাজীপাড়ায় একদীল শাহর দরগাহ রয়েছে। প্রতিবছর পৌষ-সংক্রান্তিতে একদীল শাহর স্মরণে এখানে সাতদিন স্থায়ী মেলা বসে। লোকশ্রুতি অনুসারে একদীল শাহ সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে এখানে আসেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর খাদেমদের তিনশ বিঘা পীরোত্তর লাখরাজ জমি দান করেন। এ জমি খাদেম ছুটিমিয়ার বংশধরেরা আজো ভোগ করেন। আশেক মুহম্মদ রচিত একদীল শাহ পুথি ছাড়াও চব্বিশ পরগনা জেলার গেজেটিয়ারেও একদীল শাহর কেরামতির নানা বৃত্তান্ত রয়েছে। আর একটি একদীল শাহ নামের বৃহৎ পালাগান রচনা করেছিলেন শাহ শরফউদ্দীন। প্রাপ্ত পুথির লিপিকাল ১১৯৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ। অতএব পুথি আঠারো শতকে রচিত। কবি রঙপুরের ভণিতা এরূপ ঃ

১. রচে শাহ শরফদ্দীন একদীল পাএ ২. মাগিয়া একদীল পাএ শাহ শরফদ্দী কএ।

বাঙলাদেশে কখনো আসেননি তেমন কয়জন মুসলিমজগতে বিখ্যাত দরবেশের কাল্পনিক আস্তানা ও কবর তৈরি হয়েছে চট্টগ্রামে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী, হযরত বায়েজিদ বিস্তামী ও শেখ ফরিদ। এঁদের সম্বন্ধেও বিশ শতকে পদ্যে ও গদ্যে চরিতকথা রচিত হয়েছে। শায়ের আবদুর রহিমও শেখ ফরিদের পুথি রচয়িতা।

তাছাড়া তাজকিরাতুল আউলিয়ার অনুবাদ রয়েছে বাঙলায়। অনুবাদ করেছিলেন উনিশ শতকের শেষার্ধের শায়ের জনাব আলি। তিনি করেছিলেন শেখ নূরউদ্দীন হানিফের ফারসি গ্রন্থের মোল্লা হোসেন আলীকৃত উর্দু তর্জমার বাঙলা অনুবাদ। এ ছাড়া বিভিন্ন দরবেশচরিত রয়েছে মনসুর হল্লাজ (শেখ আমীরউদ্দিন রচিত) শাহকলন্দর (শাহ মুহম্মদ খোন্দকার রচিত)। দরগাহ্‌র সঙ্গে অলৌকিক শক্তিধর পীরকাহিনীও যেমন আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বলচিত্ত কর্মকুণ্ঠ মানুষের মানসক্ষুধা পূর্তির অবলম্বনরূপে জনপ্রিয় হয়েছে। তেমনি অসম্ভবের দেয়াল ডিঙানো আলেফলায়লার গল্পও হয়েছিল তাদের অতি প্রিয়। তাই উনিশ-বিশ শতকের অনেক শায়েরই আলেফলায়লার বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করে জনগণের চাহিদা মিটিয়েছেন। শেখ আয়জুদ্দিন, রওশন আলী, সৈয়দ নাসির আলী, হাবিবুল হোসেন ও মফিজুদ্দিন আলেফলায়লার অনুবাদক। এমনি কেরামতি প্রিয় পাঠক-শ্রোতার কাছে কাসাসুল আম্বিয়া বা নবী কাহিনীও ছিল প্রিয়। একারণে কাসাসুল আম্বিয়াও কম রচিত হয়নি উনিশ-বিশ শতকে—আমীরউদ্দীন, আশরাফ, রেজাউল্লাহ ও তাজউদ্দিন তর্জমা করেন কাসাসুল আম্বিয়ার বিভিন্ন অংশ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবক্ষয়যুগ ঃ যুগসন্ধির কাল

দোভাষী পুথির ভাষা

ছাপাখানা প্রবর্তিত হবার পূর্বেকার হাতে-লেখা গ্রন্থ মাত্রেই 'পুথি' নামে পরিচিত ছিল। পুথি শব্দ সংস্কৃত পুস্তিকা শব্দজাত। কাজেই 'পুথি' বলতে প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থাবলীকেই বোঝানো উচিত। কিন্তু অধুনা কেউ কেউ আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের বাঙলা-হিন্দুস্তানী মিশ্রিত ভাষায় রচিত দোভাষী (দ্বিভাষী) কাব্যগুলোকেই বিশেষ অর্থে 'পুথি' নামে অভিহিত করেন। সেজন্যে আমরাও 'পুথিসাহিত্য' অর্থে এখানে দোভাষী পুথিই বুঝবো।

দোভাষী পুথির ভাষা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। আর্য-পূর্ব যুগে বাঙলাদেশে বিভিন্ন গোত্রের যে-সব লোক বাস করতো, তাদের স্ব স্ব ভাষা ছিল বা সর্বজনীন একটি মিশ্রভাষায় (অষ্টিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোল ও অন্যান্য অনার্য ভাষার মিশ্রণজাত) তারা কথা বলত–এটা আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ খ্রীস্টীয় আট শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামের সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে 'আসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড় পুণ্ড্রোদভবা সদা।'–অসুরেরা গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধন জাত ভাষা ব্যবহার করে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নিয়ে যখন ধর্মপ্রচারক ও শাসক হিসেবে মুখ্যত আর্য সংস্কৃতিবাহী ও আর্যভাষা প্রাকৃতভাষী একদল লোক বাঙলাদেশে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করলেন, তখন এদেশীয় প্রাচীন অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত উন্নত আর্যভাষীর ধর্ম, দর্শন, ভাষা ও সংস্কৃতি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নিল,—এও আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ, সবল ও উন্নত শাসকজাতির কাছে দুর্বল, বিজিত ও শাসিত জাতির ও শাসিতের সংস্কৃতির পরাজয়, বশ্যতা ও মিশ্রণ চিরকালীন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।

বাঙলাদেশে যে-আর্যভাষা প্রথম প্রবেশ করেছিল তা বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বাণীবাহক পালি বা প্রাকৃত। ভারতের নানা স্থানে য়ুরোপীয়দের হাতে দীক্ষিত ভারতীয়গণ যেমন ইংরেজিকে তাদের নিজেদের ভাষা রূপে গ্রহণ করে ; বাঙালীরাও তেমনি পালি-প্রাকৃতকে মাতৃভাষারূপে বরণ করে। কারণ, তাদের নিজেদের কোন লিখিত ভাষা ও সাহিত্য ছিল বলে কোন প্রমাণ মেলে না। এখনো কোল, মুণ্ডা, কুকী ও নাগাদের কোন বর্ণমালা বা লিখিত ভাষা নেই। কাজেই বাঙালীরা পালিপ্রাকৃতকেই গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করা চলে। সংস্কৃতের সঙ্গে তাদের পরিচয় হতে পারেনি।

উক্ত পালি-প্রাকৃত ভাষায় তাদের নিজেদের ভাষার যে-সব শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায়নি, অথবা পালি-প্রাকৃতের যে-সব শব্দ তাদের কাছে শ্রুতিসুখকর বা প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনাঋদ্ধ বলে মনে হয়নি, সে-সব ক্ষেত্রে নিজেদের শব্দ-সম্পদ বর্জন করেনি তারা। ফলে ভাষায় আমরা বহু দেশী তথা অ-প্রাকৃত শব্দ পাচ্ছি। কালক্রমে যে আবো বহু শব্দ লুপ্ত হয়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর বিদেশী মৌর্য ও গুপ্ত শাসনকালে এবং পালরাজাদের আমলে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ আমদানি হয়ে বাঙালীর ভাষায় স্থায়ী ভাবে ঠাঁই পেল। এরপব ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজাদের আমলে এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ধুম পড়ে গেলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বাঙালীর উপর, এবং এভাবে বাঙালীর ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সংস্কৃত শব্দসম্পদে।

এর পরে আসেন ইসলাম প্রচারকরা ও তুর্কীশাসকরা। এসময়ে অনিবার্য কারণে ফারসির মাধ্যমে বহু ফারসি, তুর্কি ও আরবি শব্দ স্থায়ী আসন লাভ করে বাঙলা ভাষায়।

এ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চলেছে পদ্যে। পদ্য ও গদ্য ভাষায় পার্থক্য বিস্তর। পদ্যে অল্পকথায় স্বল্প শব্দে ও অস্পষ্ট অন্বয়ে কাজ চলে। কিন্তু গদ্যের বাঁধন শ্লথ হলে চলে না। এ জন্যে আমরা তুর্কী-মুঘল আমলের দলিল-দস্তাবিজে চিঠিপত্রে আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত বাঙলা গদ্যের সাক্ষাৎ পাই। কারণ তখনো গদ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালু না হওয়ায় গদ্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস কেউ করেনি। আর একথা কে না স্বীকার করবে যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া কোন ভাষাই মার্জিত ও শালীন হয়ে উঠতে পারে না! কেননা, মুখের বুলি চিরকাল অপূর্ণ ক্রটিবহুল, তাকে লিপিবদ্ধ করতে হলে অনেক কিছু যোগ করতে হয়—প্রয়োজন হয় অনেক পরিশোধনের। কারণ, শিক্ষিত ও ভাবুক লোকের ভাব-চিন্তা প্রকাশের জন্যে অনেক বেশি শব্দের প্রয়োজন যা মননহীন অশিক্ষিত লোকের ঘরোয়া বা ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না। এজন্যেই ভাবুক, পণ্ডিত আর মূর্খ-লোকের ভাষায় পার্থক্য থাকে, একটা ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ, অপরটা বাক্যার্থ-সর্বস্ব। এ কারণেই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পরেও আমরা প্রয়োজনের তাগিদে বহু সংস্কৃত শব্দ অবচেতন ভাবে বাঙলা-ভাষায় ব্যবহার করেছি। চর্যাপদের পর থেকে ভারতচন্দ্রের বা তাঁর পরবর্তীকাল পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ধারার বাঙলাসাহিত্য সর্বাঙ্গে বহন করছে তার প্রমাণ।

এ পর্যন্ত ক্বচিৎ সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় কাব্য রচনা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বাঙালী চিরকাল গদ্য ভাষায় কথা বললেও গদ্য রচনা করতে গিয়ে দেখে শব্দ সম্পদের অভাব রয়েছে অপূরণীয়। আরো রয়েছে শব্দের পারস্পরিক অন্বয়সাধক প্রত্যয় ও বিভক্তির অপ্রতুলতা। তাই য়ুরোপীয় মিশনারী ও বাঙালী পণ্ডিতগণ যখন ধর্মপ্রচারে, শাসনকার্যে ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাঙলা গদ্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন, তখন এ দুটো সমস্যা তাঁদের কাছে দেখা দেয় তীব্র ভাবে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, দুনিয়ার কোন লিখিতভাষা তথা সাহিত্যের ভাষা অকৃত্রিম নয়। বাঙলা পদ্যের ভাষাও অকৃত্রিম ছিল না ; অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় তথা লিখিত ভাষায় কোন কালে, কোন দেশে কেউ ঘরোয়া কথা বলেনি।

আমাদের যে-চলতিভাষায় বা কথ্যভাষায় সাহিত্য রচিত হয় তাও কি অকৃত্রিম! নিতান্ত প্রয়োজনে বাঙলায় কৃত্রিম গদ্য সৃষ্টি হল 'সাধুভাষা' নামে।

বাঙলা গদ্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ আরবি-ফারসি বা ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেবে তা ভাবা অস্বাভাবিক নিশ্চয়ই। তাই কেরী-রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন প্রমুখ সংস্কৃতের আশ্রয় নিলেন। প্রাকৃতজাত বাঙলাকে জ্ঞাতিত্ব সূত্রে তার প্র-প্র-প্রমাতামহী সংস্কৃতের উত্তরাধিকারিণী দাঁড় করিয়ে সংস্কৃতানুগ করে তুললেন বাঙলা ব্যাকরণকে ও শব্দসম্পদকে। এ ছাড়া ব্যবসাদারী ও অনভিজ্ঞ নতুন লেখকদের উপায়ই বা কি ছিল! বরং এরূপ না করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করলে অস্বাভাবিক হত। বস্তুত সে-যুগে সে-অবস্থায় সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে বাঙলা গদ্যকে একটা সুষ্ঠু ও শালীন রূপ দান করা ছিল অসম্ভব। সে-যুগের কথাই বা বলি কেন, এযুগে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত 'চলতি ভাষায়'ও কি সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে? এব্যাপারে আমরা হিন্দি উড়িয়া ও আসামী ভাষার দিকে লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারব, সংস্কৃত শব্দ আমদানি কেরী-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগরের স্বেচ্ছাচারিতার ফল নয়। ভাষাকে সাবলীল করার জন্যে অপরিহার্য ছিল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য। অনাত্মীয় আরবি-ফারসি-ইংরেজির চেয়ে রক্ত-সম্পর্কিত সংস্কৃতের সম্পদ আত্মস্থ করা যে সহজ ও শোভন হয়েছে, তা কে অস্বীকার করতে পারে? এখানে স্মরণীয় যে, বাঙলা ভাষার আদিকাল থেকেই আমাদের পদ্য রচনায় প্রয়োজন মতো সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে। আজকের দিনে ইংরেজি শব্দের পরিভাষাও সংগৃহীত হচ্ছে সংস্কৃত থেকেই।

কিন্তু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আর সংস্কৃত রীতির আমদানি যে এক কথা নয়, তা' প্রথম দিককার লেখকগণ সহজে বুঝে উঠতে পারেননি। 'আমি ডে'লি মর্নিং ও'অক করি।' এতে অধিকাংশ শব্দ ইংরেজি হলেও বাঙলা ; ডে'লি হি ও'অক্স ইন দা প্রভাত।'—বাঙলা মিশ্রিত হলেও যে ইংরেজি তা কোন শিক্ষিত লোককে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

তাই ইংরেজদের প্রয়োজনে ফরমায়েসী গদ্য রচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে শব্দ বের করে সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ যে-গদ্য সৃষ্টি করলেন তা সেকালের বাঙালী জনসাধারণও গ্রহণ করতে পারেনি হৃষ্টচিত্তে। কারণ "গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) প্রবোধচন্দ্রিকা নামে যে গ্রন্থ রচিতে ছিলেন" তাঁর ভাষা এবং সংস্কৃত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিম্নরূপ ঃ

'অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরী রূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতি শীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্বধোভাবান্বিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধনক্রিয়া মত এতদ্‌রূপে প্রবর্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষি ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তম ইহা নিশ্চয়।"

কিন্তু আশ্চর্য যে এমন ওকালতির পরেও স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় এ ভাষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তার প্রমাণ পাচ্ছি তাঁর অন্য রচনায় ঃ

"মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলে-পিলাগুলিন পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়ি ধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাকপাতা শামুকগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি।—এ দুঃখেও দূরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়াগণ্ডাক্রান্তিবটধূল ছাড়ে না। এক আধ দিন আগে পিছে সহেনা, যদ্যাপিস্যাৎ কখন হয়, তবে তার সুদ দাম বুঝিয়া লয়, কড়াকপর্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার ক্ষেতে না হয়, তবে সোনা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমীদারেরা পাইকপেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোঁয়াল ফাল হালিয়াবলদ দামড়াগরু বাছুর-বকরা কাঁথা পাথর চুপড়ী কুলা ধুচুনী পর্যন্ত বেচিয়া গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না। কত বা সাধ্য সাধনা করি—হাতে ধরি পায়ে পড়ি, হাত জুড়ি, দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লিখিস। তোর কি ভাতের পাতে আমরা ছাই দিয়াছি?"

শুধু বিদ্যালঙ্কারই নন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালিপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সবাই বাঙলা গদ্যকে স্বাভাবিক ও শালীন করে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

রাজা রামমোহন রায় যথার্থই বুঝেছিলেন—"প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপারের নির্বাহযোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের (সেন্টেন্স) গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।" (বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠান প্রকরণ)।

"ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।" (বাঙ্গালা ব্যাকরণ)।

অতএব রামমোহন 'এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়' অর্থে সংস্কৃত অভিধানের অধীনতার কথা বলেছেন, ব্যাকরণের নয়। সুতরাং তিনি স্বীকার করেছিলেন বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য। তাঁর ব্যাকরণের অপর দুটো উদ্ধৃতি থেকেই আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে।—১. "সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।" ২. এরূপ (দীর্ঘ সমাসবদ্ধ) পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য মতে ব্যবহারে আসে না।"

এমন কি, অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারকেও সংস্কৃত রীতির অনুসরণ বলে আখ্যাত করা চলে না। কারণ সংস্কৃত ভাষায় শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় না, পদ্যে ও গদ্যে ব্যবহৃত হয় সন্ধি ও

দীর্ঘ সমাসবদ্ধ হয়েই। বাঙলায় দুয়ের অধিক শব্দে সন্ধি বা সমাস সাধারণত হয় না। সুতরাং বাঙলাকে সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত করা চলে বটে, তবে সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুগত করা অসম্ভব।

এসব দেখে-শুনেই রামমোহন তাঁর রচনাবলীতে, মৃত্যুঞ্জয় তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকার কোন কোন কুসুমে, কালীপ্রসন্নসিংহ 'হুতোম প্যাচার নকসা'য়, বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে, প্যারীচাঁদ 'আলারের ঘরের দুলালে', বঙ্কিমচন্দ্র লোকরহস্যে কমলাকান্তের দপ্তরে ও সীতারামে বাঙলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট রূপদানের প্রয়াস পেয়েছেন।

ইতিপূর্বেও সহজিয়াদের 'জ্ঞানাদি সাধনা', গোলকশর্মার 'হিতোপদেশ', কেরীর 'ইতিহাসমালা', গৌরীকান্তের 'কামিনী কুমার', রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত', প্রমথনাথ শর্মার ওরফে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' ও নববিবিবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়', বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাপ্ত 'রূপকথা', (ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-আবিষ্কৃত), রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত', তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈসপের গল্পাবলী', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস, হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' রামকিশোর তর্কালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মার্সম্যান, জোন্স ভরস্টার উইলকিন্স প্রমুখ ইংরেজদের ভাষায় সংস্কৃতানুগত্যের নিদর্শন দুর্লক্ষ্য। ইতিপূর্বেকার চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবিজের ভাষায় ব্যতীত এসময়কার সাহিত্যিক রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্যও দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু 'প্রতাপাদিত্যচরিতে' মাত্রাতিরিক্ত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কেরী প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের জন্যে ও রাষ্ট্রীয় কারণে জনসাধারণের সহজ-বোধ্য রীতির যে পক্ষপাতী ছিলেন, সেযুগের ইতিহাস তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে। অতএব সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতদের সৃষ্ট ভাষা বাঙলাদেশে স্থায়ী হয়নি।

এ পর্যন্ত যা বললাম তাতে বোঝা যাবে, বাঙলাভাষায় গদ্যে ও পদ্যে একটা নিজস্ব রীতি বা শৈলী ছিল। তাতে মাত্র দু'বার বিপর্যয় আসে—একবার দোভাষী রীতির প্রচলনে, আর একবার সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ গদ্য রচনার ফলে। এবং কোনটাই টেকেনি।

প্রাগুক্ত গ্রন্থসমূহের ভাষায় গ্রাম্যতাদুষ্ট (Slang) শব্দ আর কিছু আরবি-ফারসি শব্দও রয়েছে কিন্তু সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নেই। অপরিহার্য রূপে কয়েক হাজার আরবি-ফারসি শব্দ বাঙলাভাষায় চালু আছে। আরো দু'দশটা শব্দ হয়তো আসবে। কিন্তু তা' প্রয়োজনের তাগিদে স্বাভাবিক ভাবেই আসবে, জোর করে চালু করলে চলবে না।

বিদেশাগত তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী ঘরে তুর্কী, দপ্তরে ফারসি, মসজিদে আরবি এবং সামাজিক ব্যবহারে তুর্কি-ফারসি-আরবি মিশ্রিত হিন্দুস্তানী ভাষা ব্যবহার করতেন। তাই মধ্যযুগে যেমন ব্যবহারিক ও দরবারী জীবনের আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ ঘরোয়া ও পোষাকী কথায় প্রতিশব্দের বা পরিভাষার অভাবে অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজ আমলেও তেমনি আমাদের কথাবার্তায় অসংখ্য ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে পরিভাষা সৃষ্টি করে ও সংস্কৃত থেকে শব্দ সংগ্রহ করে আমরা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার সংকুচিত করেছি, অন্তত সাহিত্যের ভাষায় আমরা পারত পক্ষে ইংরেজি ব্যবহার করিনে। হাসপাতালে Admission নেওয়া, স্কুলে কলেজে পড়া, Examine দেওয়া, পাশকরা, Refer করা, Report বা Return দেওয়া; Graduate হওয়া, point বলা, Suggestion নেওয়া প্রভৃতি আজো শিক্ষিত বাঙালীর ঘরোয়া কথাবার্তার ও চিঠিপত্রের ভাষার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সাহিত্যে এগুলোর যে-পরিভাষা গ্রহণ করেছি, তার একটাও বাঙলা বা দেশী শব্দ নয়, সবগুলোই সংস্কৃত। যেমন ভর্তি, পরীক্ষা, স্নাতক, প্রবেশিকা, উত্তীর্ণ, বিশ্লেষণ, সমীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি। এমনকি আরবি-ফারসি ভাষার ঐতিহ্যবাহী মুসলমানদের পরিভাষাও আরবি-ফারসি নয়, বরং সংস্কৃত। এখন যেমন অসাহিত্যিক বাঙালী জনসাধারণ কথাবার্তায় ও চিঠিপত্রে প্রায় প্রতি বাক্যে দুএকটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে, তেমনি পূর্বে এরূপক্ষেত্রে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করা হত। এখনকার যুগের জনসাধারণের কথাবার্তায় বা চিঠিপত্রের ভাষা যেমন সাহিত্যে স্থান পায়নি, তেমনি তখনকার যুগের মিশ্রভাষাও

সাহিত্য স্থান করে নিতে পারেনি, তার প্রমাণ আমাদের সেকালীন পদ্যসাহিত্য। যে-সব আরবি-ফারসি বা ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ বাঙলা-সংস্কৃতে পাওয়া যায়নি অথবা পরিভাষা সৃষ্টি সম্ভব হয়নি, সেগুলো এখনো আমাদের সাহিত্যের ভাষায় চালু রয়েছে এবং খুব সম্ভব থাকবেও।

সুতরাং চিঠিপত্র বা দলিল-দস্তাবিজের অসাহিত্যিক ভাষার প্রমাণে কোন ভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যাওয়া অসমীচীন। অতএব-কেরীয়-বিদ্যাসাগরীয় প্রচেষ্টার পূর্বে বাঙলাসাহিত্যের ভাষা আরবি-ফারসি মিশ্রিত হবার প্রবণতা লাভ করেছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা তথ্য-ভিত্তিক নয়। এযুগে যদি কেউ বলে যে বাঙলাভাষা ইংরেজি শব্দের দ্বারা পুষ্ট ও সুষ্ঠু হবার প্রবণতা দেখাচ্ছে তা যেমন ভুল, পূর্ব ধারণায়ও রয়েছে তেমনি ধরনের অসঙ্গতি। বস্তুত বিদেশী বিভাষার শব্দ গ্রহণ যে-কোন ভাষার দীনতারই পরিচায়ক। সগোত্রীয় সংস্কৃতের ঋণ স্বীকার করে বাঙলা সে-দীনতা ঘুচিয়েছে ; কাজেই বিদেশী শব্দে তাঁর প্রয়োজন সামান্য।

।।২।।

এবার আঠারো শতকের শেষার্ধে আমাদের জাতীয় অধ:পতন যুগে উর্দু-বাঙলা মিশ্র শৈলীতে রচিত দোভাষীপুথি সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানলব্ধ ধারণা পেশ করে আমাদের আলোচনা শেষ করব।

নওয়াব সরফরাজ খান রাজ্য শাসনে উদাসীন ছিলেন। তাঁর শাসনশৈথিল্যের সুযোগে রাজ্যের প্রধানগণ উচ্ছৃঙ্খল, লোভী ও আত্মপরায়ণ হয়ে ওঠে। খলশ্রেষ্ঠ জগৎ শেঠের নেতৃত্বে স্বার্থপর অমাত্যগণ বিহারের নায়েব-সুবাদার আলিবর্দী খাঁকে বসালেন বাঙলার মসনদে। এঁদের সহায়তার নওয়াবী লাভ হ'ল বলে তিনি এঁদের মন যুগিয়ে চলতেন। ফলে এসব স্বার্থপর, উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী সামন্তগণই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা। তার উপর বর্গীর উৎপাত তো ছিলই। শাসক যেখানে দুর্বল, শাসিত সেখানে যথেচ্ছাচারী হবেই। সিরাজুদ্দৌল্লাহ্ আমীরদের মন ও মান রক্ষা করে চলতে জানলেন না বা পারলেন না। তাই পলাশীতে ঘটলো অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়।

মানুষ চিরকাল আদর্শপ্রবণ ও পরানুকারী। ধনে-জনে-মানে যারা প্রধান, জনজীবনে তাদেব আচার-আচবণই হয় অনুকৃত। ফলে এ সময়ে দেশব্যাপী স্বার্থপরতার, নীতিহীনতার এবং ভোগের ও নগ্ন লালসার স্রোত বয়ে চলেছিল। ও কদর্যতার স্রোত অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রবেশ করেছিল সাহিত্যেও। এজন্যেই তারল্য, কৃত্রিমতা, বর্ণনায় নির্জীবতা—অলঙ্কারের ঘটা ও ছন্দের বহু বিচিত্র সম্ভার সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের রচনাকে করেছে কলঙ্কিত। ভারতচন্দ্রের পরে বাঙলার রাষ্ট্রিক, নৈতিক এ সামাজিক অবস্থা আরো খারাপ-আরো ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিল, সে-প্রমাণ শুধু ইতিহাসে নয়, রয়েছে সাহিত্যে ও আঠারো শতকের এই প্রশাসনিক শৈথিল্যের, রাষ্ট্রিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের এবং নীতিনিষ্ঠাহীন বাঙালীর অবনতি-প্রবণ সমাজের বিকৃতির অভিব্যক্তি স্বরূপ আমরা হিন্দুরচিত 'কবিগান', 'পীরপাঁচালী' এবং মুসলিমরচিত 'দোভাষীপুথি'গুলো পাচ্ছি। হিন্দু কবিরচিত পীরপাঁচালীর অনেকগুলোই দোভাষীপুথির অন্তর্গত। নিবীর্য বাঙালীর সামাজিক রুচিবিকৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিনে মানসিক বিপর্যয়ের ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সুযোগে নতুন বন্দর কোলকাতাকে এবং পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানের গড়ে ওঠে যথাক্রমে উক্ত দু-ধারার সাহিত্য। হিন্দুদের যেমন ধর্মসম্পৃক্ত কবিগান, সত্যনারায়ণপাঁচালী, মুসলমানদেরও তেমনি হামজা-হোসেন-হানিফা প্রভৃতির জেহাদ কাহিনী ও পীরদরবেশের উপকথা নিয়ে গড়ে ওঠে এ সাহিত্য। তখন রাজশক্তির লীলাভূমি কোলকাতা-মুর্শিদাবাদের ও এদের সন্নিহিত অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের আধ্যাত্মিক দেউলেভাবও প্রকট হয়ে ওঠে। মানুষ যখন উচ্চ নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ হারিয়ে ফেলে, তখন আত্মবিশ্বাস রক্ষা করে আত্মনির্ভর হতে পারে না। তখন সে হয়ে পড়ে একান্তভাবে দৈবনির্ভর, ভীরু এবং শক্তি-পূজক। এজন্যে এ সময়ে এখানকার হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সত্যনারায়ণ, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও ধর্মঠাকুরের পূজা। মুসলমানদের মধ্যে মানব ভাগ্য-নিয়ন্তা বলে শ্রদ্ধা-শিরনী পেতে থাকেন

সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী, মোবারক গাজী, বনবিবি প্রভৃতি। রাজধানীর অধিবাসীরাই সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দু'টোই সমভাবে ভোগ করে। বাঙলার কলঙ্কিত দুর্দিনের সাক্ষ্যও রেখে গেছে এরাই। এসব আমরা অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলাচনা করেছি।

ইতিপূর্বেও আমরা পালদের পতন যুগে পেয়েছি বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান (তন্ত্র ও যোগ) প্রভৃতি। সেন রাজাদের দুর্দিনে পেয়েছি একদিকে চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি অপরদিকে শেখশুভোদয়া, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি। (রাধাকৃষ্ণলীলারূপ পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হল বৈষ্ণবমত)। তুর্কি-আফগান পরাজয়ে পেলাম ধর্মঠাকুর, সত্যপীর, দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড় খাঁ গাজী প্রভৃতি আর মুঘলশক্তির পতনে পেলাম বিদ্যাসুন্দর, কবিগান, পুথিসাহিত্য। এ হচ্ছে স্রোতে ভেসে-যাওয়া লোকের তৃণ ধরে বাঁচবার প্রয়াস।

নওয়াবী আমলে চট্টগ্রামের, ঢাকার, মুর্শিদাবাদের ও কোলকাতার শহরে শহরতলীতে ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে সিপাহী রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং আরো নানা পেশার অবাঙালী লোক-লস্কর এসে বসবাস করেছে। উর্দু-হিন্দি তথা হিন্দুস্তানীই ছিল তাদের মাতৃভাষা। স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে ও দেশীলোকের প্রভাবে বিকৃত হয়ে গেল তাদের বুলি। ওই ভাষা এদেশে অবজ্ঞার্থে খ্যাত হল 'খোট্টাভাষা' নামে। এখন খোট্টাভাষী বিদেশীরা প্রাত্যহিক জীবনের গরজে এদেশীয় লোকের ভাষাও আয়ত্ত করল অপটুভাবে। ফলে যে-কারণে (অর্থাৎ প্রয়োজনানুরূপ শব্দসম্পদ আয়ত্ত করতে না পারাব ফলে) ফারসি-হিন্দির মিশ্রণে সৃষ্টি হল উর্দুভাষার, অনুরূপ কারণে উৎপত্তি হল খোট্টাদেরও একটি বাঙলাভাষার। এর বিশেষত্ব হচ্ছে বাঙলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ এবং অপরিমেয় হিন্দুস্তানী শব্দের ব্যবহার ও বাক্‌-ভঙ্গির প্রয়োগ। এ ভাষা এখনো চালু রয়েছে উক্ত শহরগুলোতে। হিন্দুস্তানী ও বিদেশাগতদের পারস্পারিক অক্ষমতার ফলে ফারসি-হিন্দি মিশ্রিত যে ভাষা চালু হল 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' হিসেবে, তা ফারসি অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে নতুন নামে আলাহিদা ভাষারূপে দাঁড়িয়ে গেল। উর্দুর (তাঁবু) ভাষা পরিণামে ঘরোয়া বুলিতে পরিণত হল কয়েক কোটি লোকের। কালে সাহিত্যের বাহন হবার গৌরবও অর্জন করেছে উর্দু।

এ ভাবে এর আগেই দক্ষিণ ভারতেও সৃষ্টি হয়েছে দাখিনী উর্দু। খোট্টা বাঙালীরাও হয়তো ফারসি হরফে তাদের মিশ্রবাঙলা লিপিবদ্ধ করে উর্দুর মতো পৃথক একটা ভাষা তৈরি করতে পারতো; কিন্তু বাঙলা দেশে বিদেশাগত হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাল্পতার দরুন এবং বাঙলা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি কিংবা এর জন্য নওয়াবী আমল দীর্ঘায়িত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে আরবি হরফে অনুলিখিত যে-কয়টি বাঙলা পুথি আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলো দোভাষীপুথি নয়, সুতরাং 'একে উর্দুর মতো আলাহিদা ভাষা' সৃষ্টির প্রয়াস বলে মনে করবার হেতু নেই। আরবি হরফে বাঙলা লিখবার জন্য স্থানীয় ও পারিবেশিক কারণ ছিল। এগুলো বাঙলাবর্ণজ্ঞানহীন মাদ্রাসা-শিক্ষিত মৌলবীদের জন্যেই প্রতিবর্ণীকৃত। সে-আলোচনা এখানে অবান্তর।

সুতরাং খোট্টা বাঙালীর শহুরে বাঙলায় যে-সাহিত্য পলাশীর যুদ্ধের পাঁচসাত বছর পর থেকে কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রচিত হতে থাকে, তার সঙ্গে খাঁটি বাঙালীর কোন যোগ ছিল না। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে 'দোভাষী বাঙালা; কোন শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে। [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান ১৩২৫ সাল, আল্‌ এসলাম, ষষ্ঠ সংখ্যা, পাঁচটাকা পৃ ঃ ৩১৭] চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকে বিশুদ্ধ বাঙলায় যে-সাহিত্য রচিত হচ্ছিল, বাঙালীরা সে-ভাষাশৈলীই সাম্প্রত কাল পর্যন্ত অনুসরণ করে করে চলেছে। দোভাষী পুথির কোনপ্রভাব যে পল্লীবাসী মুসলিমদের উপর পড়েনি, তার প্রমাণ এদের রচিত পুরোনো বা নতুন গানে, গাথায়, ছড়ায়, রূপকথায়, কাহিনী-কাব্যে সে-ভাষার কোনো নিদর্শন নেই। আমাদের উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে 'হারামণি'তে, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায়, প্রবাদ-সংগ্রহে, ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া-গম্ভীরা-ঝুমুর প্রভৃতি গ্রাম্য গানে এবং পাঁচালীগুলোতে।

পল্লী অঞ্চলে দোভাষী পুথি বহুল পঠিত হতো বলে বিশ্বাস করবারও কারণ নেই। চকবাজারে ও শহরে বস্তিতে এর উদ্ভব ও প্রচার সীমাবদ্ধ বললে সত্যের বিশেষ অপলাপ হবে না। উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী উপাখ্যানগুলো কারা, কাদের আদেশে কোন্ প্রেরণায় রচনা করেছেন ও করছেন তার উল্লেখ অনেক পুথির সমাপ্তি ভাগে রয়েছে—বটতলার প্রকাশকের আদেশ, আর্থিক প্রেরণা এবং খোট্টা পাঠকদের চাহিদাই রয়েছে এগুলোর রচনার মূলে। অতএব এ-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর আন্তর বা বাহ্য যোগ কোথায়? অবশ্য বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত ছাপা পুথির অভাবে গাঁয়ের লোকেরাও দোভাষী পুথি পড়েছে-শুনেছে বাধ্য হয়ে কিন্তু সে-ভাষা অনুকরণ করেনি। কাজেই দোভাষী পুথিসাহিত্যের ঐতিহ্যে-উত্তরাধিকারের প্রশ্নই অবান্তর। কল্যাণকর ইসলামী আবেশ বা মুসলিম ঐতিহ্যের আবহ পুথিতে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। দোভাষী পুথির আদি রচয়িতা ফকির গরীবউল্লাহ স্বয়ং ছিলেন পীরপূজারী। দেবগুণাধিকারী কাল্পনিক পীর বড় খান গাজী ছিলেন তাঁর জীবননিয়ন্তা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুঘল আমলে আগত ধনিক ও বণিক অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা আজো উর্দু, এবং বাঙালী মুসলমানদের রাজনীতিক নেতা ও মুখপাত্র হয়ে তাঁরাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রচার করেছিলেন যে বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু।

সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর রায়মঙ্গলে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে সংলাপে বাস্তবরূপ দান করবার বাসনায় সত্যপীরের মুখে দিয়েছিলেন হিন্দুস্তানী ভাষা। ভারতচন্দ্র 'রায়মঙ্গলে'র সে-দৃষ্টান্ত স্মরণ করেই লিখেছেন ঃ

মানসিং পাদসায় হইল যে বাণী। কিন্তু সে-সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
উচিত যে আরবি ফারসি হিন্দুস্তানী।। না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।

কৃষ্ণরামদাস-ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ ছাড়া বিদ্যাপতি, শ্রীকবিবল্লভ, প্রভৃতি সত্যনারায়ণ পুথি রচয়িতারা এবং 'জঙ্গনামা' রচয়িতা রাধাচরণ গোপ তাঁদের পাঁচালীতে মিশ্রভাষা প্রয়োগ করেছেন। বলা বাহুল্য, এঁরাও কোলকাতাসন্নিহিত অঞ্চলের লোক। সত্যনারায়ণ প্রসঙ্গে এ ভাষার নমুনা দেয়া হয়েছে।

সম্ভবত এঁদেরই অনুকরণে ফকির গরীবউল্লাহ্ ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেন।

দ্বিতীয় কবি সৈয়দ হামজা ১৭৮৯–১৮০৫-৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থগুলো। আঠারো শতকের শেষার্ধে গরীবউল্লাহ-সৈয়দ হামজা—মাত্র এই দু'জন দোভাষী পুথিলেখকের আবির্ভাব হয়েছে। উনিশ শতকে ও বিশ শতকে প্রায় শতাধিক কবি বটতলার প্রকাশকদের অনুরোধে অর্থের বিনিময়ে নানা বিষয়ক পুথি রচনা করে দিয়েছেন। এঁদের অনেকেই পেশাদার লেখক। তাই পুথিগুলো প্রায় সবদিক দিয়েই বিশেষত্ব বর্জিত। পদ্যে কোন রকমে কাহিনী বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে মাত্র। বহুগ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে এঁদের মধ্যে উড়িষ্যার আবদুল মজিদ খান ভূঁইয়া, জনাব আলী, মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আবদুর রহিম, মুহম্মদ মুনশী, শেখ আয়েজুদ্দিন, মনিরুদ্দিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এবং এঁদের অনেকেরই নিবাস দক্ষিণরাঢ়ে তথা হাওড়ায়, হুগলীতে ও চব্বিশ পরগনাঞ্চলে।

এসব দোভাষীপুথি কাদের জন্যে লিখিত হয়, তার আভাষ পাওয়া যাবে কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে।—কবি মালে মুহম্মদ তাঁর 'সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল' পুথি রচনার [১৮২৮খ্রীঃ] কারণ স্বরূপ বলেছেন ঃ

এই পুথি সায়ের ছিল আগু যমানায়। তেকারণে অধীন করে চালিত বাঙ্গালা।
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হৈল তৈয়ার।। রসিক লোকের দেখে বহুত কাগতি।
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কাছেল্লা। বারশও পঁয়ত্রিশ সালে লেখি এই পুথি।।

বারশ' পঁচাত্তর বাঙলা সনে [১৮৬৮ খ্রীঃ] হুগলীর সন্তোষপুরনিবাসী কবি বেলায়েতকে তাঁর 'ফেসানায়ে আজায়েব আঞ্জুমান আরা জানে আলম' রচনা কালে তাঁর বন্ধু সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এরূপ ঃ

বোলচাল সব তুমি লেখ আমাদের। শক্ত শক্ত লভ্‌জো কিছু না লেখ আপনি।।
সকলে বুঝিতে পারে কি কহিব ফের।। এমত না হয় যেমন আমা সবাকায়।
রঙ্গিন করিতে তুমি এই যে কাহিনী। মানে পুছে ফিরি মোরা পণ্ডিত সবায়।।

কোলকাতা শহরের কড়েয়া নিবাসী কবি শেখ আমীরুদ্দিন 'মনসুর হাল্লাজ' পুথির প্রারম্ভে লিখেছেন ঃ

মাসাএখ মনসুরের কেচ্ছা ফার্ছিতে। লিখিতে এরাদা হইল খাহেস আমায়।।
লিখিয়াছিলেন কোন ফাজেল লোকেতে। বাঙ্গালা লোকের কেচ্ছা শুনিতে বাসনা।
সেই তো রেছেলা ফের এছলামি বাঙ্গালায়। তেকারণে বাঙ্গালাতে করিনু রচনা।।

এতেই বোঝা যাবে এঁরা কোন্ বাঙালীর জন্যে কোন্ বাঙলায় পুথি রচনা করেছেন। আজ পর্যন্ত যাঁরা দোভাষীপুথি রচনা করে চলেছেন, যারা এ-পুথির প্রকাশক আর যাঁরা পাঠক, তাঁদের সঙ্গে যে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও ভাবগত কোনপ্রকার সম্পর্ক নেই, তা কে না স্বীকার করবেন।

এসব পুথি দেখেই সম্ভবত উনিশ শতকের কোলকাতার হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমান লেখকের রচনার সমলোচনা প্রসঙ্গে—'মুসলমান হইয়া এমন বিশুদ্ধ বাঙলা লিখিয়াছেন' ইত্যাদি উক্তি করতেন। অবশ্য দোভাষী পুথির অধিকাংশ উর্দু সাহিত্যের অনুবাদ। বাঙলা তর্জমায় উর্দু ভাষার প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গি রক্ষা করার ফলে কবিদের পক্ষে অনুবাদ কার্য সহজ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পুথিকারদের কেউ কেউ উর্দু-হিন্দি শব্দ এতই বেশি প্রয়োগ করেছেন যে, তাঁদের রচনার কোন কোন অংশ বিকৃত হিন্দুস্তানী বলে ভ্রম হয়।

এখানে আমরা 'ব্রজবুলি' নামের কৃত্রিম ভাষার কথা স্মরণ করতে পারি। মৈথিল ভাষার অনুকরণে বৈষ্ণব যুগে (১৬-১৭ শতকে) ব্রজবুলি (বাঙলা-মৈথিল মিশ্রিত) ভাষায় পদ রচনার রীতি দেখা দেয়, কিন্তু কৃত্রিম বলে তা বাঙলা সাহিত্যে টিকতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন সময়েই বাঙলাদেশে এর বহুল প্রচলন হয়নি। কেবল গোবিন্দদাসই মনেপ্রাণে সাধনা করেছিলেন ব্রজবুলির। ফলে তাঁর রচনা (পদাবলী) হৃদয়াবেগহীন বাক্‌সর্বস্ব বাক্‌-চাতুর্যে পর্যবসিত হয়েছে—ভাষার ঐশ্বর্য ঘুচাতে পারেনি ভাবের দীনতা। ভাষার যাদুকর হয়েও তাই তিনি আন্তরিকতার অভাবে কবিপ্রাণতায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের সমকক্ষ হতে পারেন নি। অথচ মৈথিলভাষা (তথা ব্রজবুলি) ছিল বাঙলা ভাষার বৈপিত্রেয় বোন-সহোদরা। এযুগে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীও অনুকৃত হয়নি এজন্যেই। কৃত্রিম ভাষায় হালকা রচনার বিলাস করা চলে, কিন্তু সারবান মহিমময় সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। অক্ষম লোকের কৃত্রিম ভাষার প্রয়োগের ফলে পুথিসাহিত্য সৌন্দর্য ও শালীনতা হারিয়ে ফেলেছে, গাম্ভীর্যের কথাতো ওঠেই না। বাঙালীর 'ব্রজবুলি' চর্চার পরিণতি থেকে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। ইতিহাসের ইঙ্গিত অবহেলার ফল কখনো শুভ হয় না।

বৈষ্ণব আমলের কৃত্রিম 'ব্রজবুলি' টেকেনি, পুথির কৃত্রিম মিশ্ররীতিও কোথাও স্বীকৃতি পায়নি।

এখানে ভাষা সম্বন্ধে দু'টো কথা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোন ভাষায় বিদেশী শব্দ আসে দু'প্রকারে। প্রথমত, নতুন বস্তু নির্দেশক হয়ে, দ্বিতীয়ত নতুন ভাব-প্রকাশক রূপে। বাঙলা দেশে যে-বস্তু ছিল না বা নেই, সে-বস্তু যদি আসে, তবে তার নামবাচক বিদেশী বিভাষার শব্দ গ্রহণ করতে বাধ্য হই আমরা, দ্বিতীয়ত বাঙালীর মন-মননে যে-চিন্তা বা ভাব পূর্বে জাগেনি—যা

ব্যক্ত হয়নি, সে-সব ভাব-চিন্তা ব্যঞ্জক শব্দও বিদেশী ভাষা থেকে ধার না করে উপায় নেই আমাদের। অকারণে মূল না-জানা ঐতিহ্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন কতগুলো বোবা শব্দ এনে নিজের মুখের বুলিকে—সাহিত্যের ভাষাকে জড় করে তুলে লাভ কি! বিশেষত যখন ঋণ মাত্রেই দৈন্যের পরিচায়ক!

তবে রসবৈচিত্র্য দান করবার জন্যে বা বাস্তবতা দানের জন্যে এক-আধটা চরিত্র-মুখে মিশ্রভাষা বা প্রাদেশিক 'বুলি' বলানো সমর্থন করা যায়। এ রীতিও চালু আছে-যেমন নাটকে গল্পে ও উপন্যাসে বুলিজ সংলাপ দেখা যায়। এতে অবশ্য গভীর ও গুরুতর ভাব প্রকাশ করা চলে না। চরিত্রকে কেবল স্বাভাবিক কিংবা হাস্যাস্পদ করে তোলাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিদেশী কাহিনী বর্ণনার জন্যে বিদেশী ভাষাও আমদানি করলে স্বদেশী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের দোভাষী পুথিও তাই শালীন ভাষায় শালীনসাহিত্য বলে শিক্ষিত সাধারণের স্বীকৃতি পায়নি। যারা বাঙলাকে সংস্কৃতানুরূপ কিংবা ফারসিঘেঁষা করতে চান, তাঁরা বাঙলাভাষাকে রেহাই দিয়ে সহজেই যথাক্রমে হিন্দি বা উর্দুকে বরণ করে নিতে পারেন, তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। অবশ্য যে পটভূমিকায় কাহিনী বিবৃত হবে তার স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বস্তুবাচক বা ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। য়ুরোপীয় কথা বর্ণনায় পদ্ম, চকোর, খঞ্জন আঁখি, মেঘবরণ কেশ, আলতা-রাঙা পা, কাজল-কালো চোখ প্রভৃতি কেউ আশা করে না। তেমনি ইরানি কাহিনীতে সবাই গোলাপ, বুলবুলি, সুর্মা, দ্রাক্ষা প্রভৃতিরই প্রত্যাশা করে। এতে ভাষা-বিকৃতির আশঙ্কা কেউ করে না।[১]

দোভাষী পুথির ইতিকথা

পুস্তিক'ার বিকৃতিতে 'পুথি শব্দের উদ্ভব। নাসিক্য উচ্চারণে হয় 'পুঁথি'। ছাপাখানা প্রবর্তিত হবার আগে গ্রন্থমাত্রই চিহ্নিত হত 'পুঁথি' অভিধায়। বেদ উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারত অথবা জ্যোতিষ-বৈদ্যিক-গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ কিংবা পদ্মাবতী-সতীময়না-সয়ফুলমুলুক প্রভৃতি সর্বপ্রকারের গ্রন্থেরই সাধারণ নাম ছিল 'পুথি'। অতএব পুথি ছিল সেকালের গ্রন্থের বা একালের 'বই'-এর প্রতিশব্দ।

ছাপাখানার বহুল ব্যবহার এবং প্রসারের ফলে এদেশে ছাপা বই 'গ্রন্থ', 'পুস্তক কিংবা 'বহি' নামে অভিহিত হতে থাকে, আর হাতে-লেখা পুরোনো গ্রন্থগুলো 'পুথি' অভিধায় নতুন তাৎপর্য লাভ করে। যেমন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছাপাকপি হল পুস্তক, গ্রন্থ কিংবা বহি এবং এর হাতে-লেখা পুরোনো প্রতিলিপি অভিহিত হল 'পুথি' নামে। এমনি করে পুথি হয়ে উঠল ইংরেজি ম্যানুসক্রিপ্টের বাঙলা পরিভাষা। হিন্দু সমাজে নতুন-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিধা নিরূপণ পর্ব এখানেই শেষ হল। যদিও সাধারণ অর্থে ম্যানুসক্রিপ্ট বা স্ক্রিপ্ট নামে যে-কোন আধুনিক রচনার পাণ্ডুলিপি নির্দেশ করাও অবিহিত নয়।

কিন্তু মুসলিম সমাজে নাম-নিরূপণের জের চলে ১৯৪০ সাল অবধি। তার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত ১৮৫০-এর পবে বটতলার মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন বহু মুসলমান। মুসলমান সমাজে তখনো ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি বলে, আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কাজেই স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের চাহিদা মেটানোর জন্যে তারা মধ্যযুগের সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় রসে ও আঙ্গিকে রচিত ফরমায়েসী গ্রন্থ ছেপে বাজারে ছাড়তে থাকেন। আবার একই গ্রন্থ শায়েরের নাম পালটে তথা ভণিতা বদল করে ছাপানো অর্থলোভী প্রতিযোগী প্রকাশকদের পেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে ছাপাগ্রন্থেও 'ছহি বড়....পুঁথি' কথাগুলো মুদ্রিত থাকতো। তাই এই ছাপা পুথি আর হাতে লেখা পুরোনো প্রতিলিপি বা

১. *ইরানী ভাষায় ইসলামের মৌল শব্দেরও অনুবাদ হয়েছিল—যেমন ঃ আল্লাহ-খোদা, সালাত-নামাজ, সিয়াম-রোজা, জান্নাত-বেহেস্ত, জাহান্নাম-দোজখ, মলক-ফিরিস্তা ইত্যাদি। ইরানের মাধ্যমে এগুলো এদেশেও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইমানের ভিত্তি নষ্ট হল বলে কেউ ভাবেনি। মুসলিম তমদ্দুনও এতে খর্ব হয়েছে বলে কেউ প্রশ্ন তোলেনি।*

পাণ্ডুলিপির পার্থক্য নির্দেশক শব্দ নির্মাণের কিংবা চয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে ছাপাপুথি অর্থে 'পুথি' আর হাতে-লেখা পুথি বলতে 'কলমীপুথি' নাম চালু হল। আবার 'বটতলার পুথি' বলতে মধ্যযুগের এবং মধ্যযুগীয় ধারার যাবতীয় ছাপা গ্রন্থকেই নির্দেশ করে।

তা ছাড়া, অবিমিশ্র বাঙলায় রচিত পুথি এবং মিশ্রভাষারীতিতে লিখিত পুথির পার্থক্য বোঝানোর জন্যে শেষোক্তরীতির পুথিগুলোকে 'দোভাষী পুথি' নাম দেয়া হয়। এই নাম কবে থেকে চালু হল, তা' নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না—তবে মুনশী রিয়াজউদ্দীন আহমদকে ও মীর মোশাররফ হোসেনকে 'দোভাষী পুথি' কথাটি যেভাবে ব্যবহার করতে দেখি, তাতে মনে হয়, উনিশ শতকের শেষদশকেও তা' নিত্য উচ্চারিত নাম। অবশ্য পাদ্রী লঙ এর নাম দিয়েছিলেন, মুসলমানী বাঙলা—মাঝি-মাল্লার ভাষা।' ব্লুমহার্ট, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ মৃত ও জীবিত অমুসলমান বিদ্বানেরা এই নামেই এই রীতির উল্লেখ করেছেন, আজো করেন।

॥ ২ ॥

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে কাজী দৌলত, আলাউল, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর, আবদুল হাকিম, হায়াত মাহমুদ প্রভৃতির অবিমিশ্র বাঙলায় রচিত কাব্যগুলো পুনর্মুদ্রণের আগ্রহ দোভাষীরীতি-প্রিয় প্রকাশকদের কমে যায়, সম্ভবত পাঠক-শ্রোতা মহলেও এগুলো জনপ্রিয়তা হারায়। এর অনুমিত কারণ দুটো। এক, এসব কাব্যের কলেবর স্থূল, ভাষা পরিস্রুত ও সংস্কৃতঘেঁষা, ভাব ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহ, এবং অলঙ্কার বৈদগ্ধ্যাঙ্কিত। দুই, দোভাষীরীতি-প্রিয় প্রকাশকরা-তর্জমা নয় উর্দু রোমান্সগুলোর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পদ্যায়ন প্রকাশ করে ছাড়লেন বাজারে। পাঠক-শ্রোতারা বিকল্প পাঠ্য-উপকরণের অভাবেই হয়তো নতুন রীতির পুথিগুলো কিনতে বাধ্য হল, কিংবা দোভাষী পুথির আদর বেড়ে গিয়েছিল তাদের কাছে। কেননা, এগুলো অবসরের এক বৈঠকেই শেষ করা সম্ভব, ভাবের দুর্বোধ্যতাও ছিল না, ছিল না শব্দের দুরূহতা। [কারণ শতেক হিন্দুস্তানী শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগেই এসব পুথি রচিত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রয়োগের আনুমানিক হার শতকরা ৩২টি]। তারপর এই আদলে নানা বিষয়ে আড়াইশ'/তিনশ' গ্রন্থ রচিত হয়েছে গত দেড়শ বছরের মধ্যে. আলাউল প্রভৃতির কাব্যগুলোকে বাজারছাড়া করে এগুলোই।

গণচাহিদা মেটানোর জন্যে রচিত প্রাকৃত-জনের ওই সাহিত্য যখন নগর-গ্রামের সর্বত্র চালু, তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে আধুনিক জীবন-চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে বাঙালী মুসলিম সমাজে। এই শতকের চতুর্থ দশকেই তার শুরু। মুসলিম সমাজের দারিদ্র্য, মহাজনী জমিদারী ও চাকরীর ক্ষেত্রে হিন্দু-সমাজের একাধিপত্য এবং সুদে-ঘুষে হিন্দু সাধারণের সাচ্ছল্য মুসলমানদের ক্ষোভ, ঈর্ষা ও দারিদ্র্যদুঃখ বৃদ্ধি করে।

অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে এই অসম প্রতিযোগিতা হৃতসর্বস্ব পরাভূত মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক চেতনা করে তীক্ষ্ণ আর সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়ে ওঠে তীব্র। তখন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য-ও ঐতিহ্যসূত্র আবিষ্কারের প্রেরণাবশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে এবং 'আজাদ' পত্রিকা-অফিসে গড়ে ওঠে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। এখানেই শুরু হয় পুথির চর্চা। তাঁরাই মুসলিমরচিত আধুনিক সাহিত্য থেকে দোভাষী পুথির পার্থক্য জ্ঞাপক 'পুথিসাহিত্য' নামটি চালু করেন। তখন এর প্রয়োজন ছিল। কেননা এ ভাষাকেই বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা তথা ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা বলে প্রচার করলেন তাঁরা। কাজেই 'দোভাষীপুথি' বলার আর উপায় ছিল না তাঁদের, সেক্ষেত্রে তাঁদের আন্দোলন ও উদ্দেশ্য দু-ই হত ব্যর্থ!

সে-সময় থেকে গত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে 'পুথি সাহিত্য' বলতে মুসলমানেরা দোভাষী পুথিকেই নির্দেশ করে। অভিধার দিক দিয়ে 'পুথি সাহিত্য' কথাটি অর্থহীন। কেননা, 'বই সাহিত্য' যেমন হয় না, 'পুথি সাহিত্য'ও হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এটি এখন একটি যোগরূঢ় বিশেষ নাম।

সেজন্যে আর আপত্তি করা চলবে না। আজ 'পুথি সাহিত্য' আর 'দোভাষী পুথি' সমার্থক এবং একটি অপরটিব প্রতিশব্দ।

ইদানীং 'দোভাষী পুথি'-নামটার ব্যবহার বেড়ে গেছে। কেননা যে প্রযোজনে এ নামটি পরিবর্তিত বা লোপ করবার প্রয়াস ছিল, তা এখন অনুপস্থিত। কিন্তু এ রীতিকে 'দোভাষীরীতি বলতে কোন কোন বিদ্বানের আপত্তি আছে। তাঁদের মতে তথাকথিত দোভাষীরীতিতে মিশ্রণ ঘটেছে আসলে আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দুস্তানী ও বাঙলা শব্দের, অতএব দ্বিভাষা নয়, অন্তত পঞ্চভাষার মিশ্রণ রয়েছে। কাজেই একে 'মিশ্ররীতি' আখ্যাত করাই যৌক্তিক।

কিন্তু তাঁদের ধারণা যথার্থ নয়। কেননা, একথা আজকাল কেউ অস্বীকার করে না যে ভারতীয় ভাষায় কোন আরবি শব্দই সোজাসুজি আসেনি, এসেছে ফারসির মাধ্যমে। ফারসি ও তুর্কি এদেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে শাসকদের প্রয়োগে ও প্রভাবে। ফারসি (কিছু তুর্কি) শব্দের আধিক্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু ভাষা, আর এর বিপুল প্রভাব রয়েছে হিন্দিভাষায়। এ দুটোর আদি সাধারণ নাম ছিল হিন্দুস্তানী এবং মুসলিম আমল থেকেই দিল্লীসাম্রাজ্যে লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা হিসেবে চালু ছিল এ ভাষা। এই হিন্দুস্তানী তথা উর্দুর সঙ্গে বাঙলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দোভাষীরীতি। অতএব 'দোভাষীরীতি'ই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যদি বলি : There stands a rickshaw in front of Gulsitan restaurant in the Jinnah Avenue—এ বাক্যে জাপানি, ফরাসি, গুজরাটি, ফারসি ও ল্যাটিন শব্দ থাকা সত্ত্বেও একে ইংরেজি বলে জানি ও মানি। শব্দের জাতিনির্ণয় কিংবা ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করা বক্তা কিংবা শ্রোতার সাধের ও সাধ্যের অন্তর্গত নয়। অপর ভাষার শব্দ আত্মস্থ করেনি, তেমন ভাষা জগতে নেই। কিন্তু তাতেই কোনো ভাষা মিশ্রভাষা হয় না। দোভাষীরীতিতে মিশ্রণ ঘটেছে বাঙলা ও হিন্দুস্তানীর। আর হিন্দুস্তানীতে আগেই মিশেছিল প্রচুর আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ ফারসির মাধ্যমে। এখন বিদ্বানের বিশ্লেষণে যদি দোভাষীরীতির ভাষা থেকে অলক্ষ্যেপ্রবিষ্ট আরবি-ফারসি ও তুর্কি শব্দ বের হয়, তাতে এ রীতির নাম পালটানোর কারণ ঘটে না। রচনায় আরবি-ফারসি তথা বিদেশী শব্দের বাহুল্যই রচনাশৈলীকে 'দোভাষী' করে না, যদি তা-ই হত, তা হলে সতেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমুখ সবাই 'দোভাষী শায়ের' বলে পরিচিত হতেন। অতএব দোভাষীরীতির বৈশিষ্ট্য অন্যবিধ। একে 'মুসলমানি বা ইসলামি বাঙলা কিংবা খিচুড়ী বাঙলা' বলাও ওই একই কারণে অসঙ্গত।

॥ ৩ ॥

অন্যত্রও বলেছি, এখানেও বলছি সত্যনারায়ণ এ দেশের লৌকিক দেবতা। মুসলিম প্রভাবেই এ দেবতার উদ্ভব। শাসিত হিন্দু শাসক মুসলমানের প্রীতি ও প্রসন্নদৃষ্টি লাভের বাঞ্ছাবশে এ দেবতা সৃষ্টি করেছে। দেশজ মুসলমানেরা এঁকে পীরের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেনি। আসলে প্রমূর্ত 'সত্যই' (Truth) সত্যনারায়ণ তথা সত্যপীর। সত্যপীরের পূজা-শিরনী উপলক্ষে এদেশের দুঃখী জনগণ এক মিলন-ময়দানে একত্রিত হতে চেয়েছে, খুঁজেছে দুর্যোগে-দুর্ভোগে যন্ত্রণায় নির্যাতনে নিশ্চিত আশ্রয়—জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা। সত্যনারায়ণ মূলত মুসলমান পীর, সে-কারণে অবাঙালী,—এ ধারণা ছিল হিন্দুর মনে বদ্ধমূল। তাই সতেরো শতকে কবি কৃষ্ণরামদাস যখন রায়মঙ্গল (১৬৮৭) রচনা করেন, তখন দক্ষিণরায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বড় খাঁ গাজী এবং উভয়ের মান্যজন সত্যনারায়ণের উক্তিতে ভাঙ্গা হিন্দুস্তানি ও বিকৃত বাঙলা ব্যবহার করেন তিনি। পাত্রপাত্রীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী সংলাপের ভাষা প্রয়োগ নাটকের বিশেষ আঙ্গিক। কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গলে এ রীতির অনুসরণ ছিল। তাঁর প্রদর্শিত রীতি প্রায় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন সত্যনারায়ণ পাঁচালীর পরবর্তী রচয়িতারা। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যেও মাধবভাটের জবানিতে এমনি ভাষা প্রয়োগ করেছেন, যখন মাধবভাট বিদ্যার পণের কথা ঘোষণা করছে উত্তরভারতীয় রাজদরবারগুলোতে। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ'খণ্ডেও মানসিংহ-জাহাঙ্গীরাদির

সংলাপের ভাষা এমনি মিশ্র করে তৈরি। এখানে উল্লেখ্য যে কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বিদ্যাপতি, রাধাচরণ গোপ প্রভৃতি হুগলী বর্ধমান, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার লোক তথা বন্দর এলাকার অধিবাসী।

এভাবে দোভাষীরীতি হিন্দুকবিদের লেখনীপ্রসূত হলেও এর বহুল প্রচলনও জনপ্রিয়তার জন্যে ফকির গরীবুল্লাহর (১৭৬০-৮০) প্রতিভা ও পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল। তিনিই প্রথম দোভাষীরীতি প্রয়োগে তাঁর প্রায় সব-কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন একেতো তাঁর নিজের বুলি ছিল এ রীতির পরিপোষক, তার উপর ব্রজবুলির মাধুর্য আর উপযোগও হয়তো তাঁর অবচেতন প্রেরণার উৎস ছিল। তাঁকে প্রথম অনুসরণ করেন সৈয়দ হামজা (১৭৭৭-১৮০৫-৮)। তারপর মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আরিফ, জনাব আলী, আবদুর রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মহম্মদ মুনশী, তাজউদ্দিন, দানিশ, রেজাউল্লাহ, সা'দ আলী, আবদুল ওহাব প্রভৃতি প্রায় শতাধিক শায়ের আজ অবধি আড়াইশ'-তিনশ' কাব্য রচনা করেছেন এ ভাষাশৈলীর প্রয়োগে।

॥ ৪ ॥

হ্যালহেড ১৭৭৮ সনে রচিত তাঁর বাঙলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন, বাঙলা ক্রিয়াপদযোগে আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাক্য ব্যবহারই ছিল তাঁর সমকালে [শহুরে লোকের] সংস্কৃতিবানতার পরিচায়ক।

আবার ১৮৫৫ সনে পাদ্রী লঙ তাঁর গ্রন্থ-তালিকার (Descriptive Catalogue of Bengali Books) লিখেছেন, আরবি-ফারসিবহুল ভাষা [ভাগীরথী-হুগলী নদীর] মাঝিমাল্লাদের মধ্যেই প্রচলিত এবং এটি 'মুসলমানি বাঙলা,' আর এ ভাষায় রচিত সাহিত্য 'মুসলমানি বাঙলা সাহিত্য।'

সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে দুটো তথ্যই নির্ভুল বলে মানা যাবে। ১৭৭৮ সনেও দেশে মুসলিম প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল, তাই সে-যুগের শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ফারসি মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতে গৌরব বোধ করত, আর তা দরবারী ভাষার বহুল চর্চার স্বাভাবিকও হয়ে উঠেছিল, যেমনটি একালে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি মিশানো বাঙলা বলে ঃ 'ডাক্তার blood examine করে report দিয়েছেন, একটা medicine-ও prescribe করেছেন। কিন্তু তবু মনে হয় exact diagonosis হয়নি। আজকাল হাসপাতালে admission না নিলে ভাল treatment আর regular ও নিখুঁত nursing-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। উনিশ শতকের রাজনারায়ণ বসুদের মতো রুচিবান রক্ষণশীলদের নিন্দা সত্ত্বেও আজো শিক্ষিত লোকমাত্রই ঘরে-বাইরে এমনি মিশ্রভাষাতেই কথা বলে। ১৮৩৫ সনে ফারসি নিঃশেষে হারায় দরবারী ভাষার মর্যাদা ও অধিকার। আর ১৮৫৫ সনে কোলকাতা শহরে নগণ্য ছিল না ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা। তার উপর সুন্দর গদ্যশৈলী সচেতন ও সুপরিকল্পিত সাধনা বাঙলাকে কেবল সংস্কৃত ঘেঁষা নয়,—করে তুলেছিল প্রায় সংস্কৃত-সম। কাজেই নগরের মুসলমান ও গঙ্গাভাগীরথীর মাঝিমাল্লাদের মুখেই যে এককালে নগর-বন্দরের বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় ভাষা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, তাতে বিস্ময়ের নেই কিছু।

॥ ৫ ॥

দোভাষীরীতির উদ্ভবের একটি অনুমিত ইতিহাস আছে। যে-কারণে এবং যে-ভাবে উর্দুভাষা অবয়ব পেয়েছে, এও গড়ে উঠেছে অনেকটা সে-ভাবেই।

তুর্কি বিজয়ের পর থেকেই ধীরে ধীরে মুসলিম সংস্কৃতির ও ধর্মের প্রভাব পড়তে থাকে এদেশে। তেরো-চৌদ্দশতক থেকেই ফারসি দরবারীভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। ফলে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের বুলিতেও নতুন ভাব ও বস্তু নির্দেশক কিছু সংখ্যক ফারসি তুর্কি এবং সেগুলোর মাধ্যমে আরবি শব্দ মিশে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্যিক ভাষাতেও আমরা পাচ্ছি গোটা বারো ফারসি-তুর্কি শব্দ। এদেশে ফারসির চর্চা বৃদ্ধি পায় মুঘলশাসনকালে; শিক্ষিতমাত্রই একালের ইংরেজি জানা লোকের মতোই জানত ফারসি। তার উপর প্রশাসক ও পদস্থ চাকুরেরা

ছিল সাধারণত উত্তর ভারতীয় ও ইরানি। এদিকে হিন্দুস্তানী ভাষায় বিপুল হয়ে ওঠে ফারসিপ্রভাব এবং কথ্য উর্দু চালু হয় সতেরো শতকের শেষার্ধ থেকেই। পনেরো ষোল শতকে দক্ষিণ ভারতে দাখিনী উর্দুর উদ্ভবও ঘটে এভাবে।

আবার, গৌড়, পাণ্ডুয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নতুন-পুরোনো শাসনকেন্দ্রের মতো নতুন-জাগা বন্দর হাওড়া-হুগলী-কোলকাতায়ও ঘটে বিদেশী লোকের সংখ্যাধিক্য। স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে যায় এদের অনেকেই। ফারসি-উর্দুভাষী বিদেশীর প্রভাবে স্থানীয় জনগণের মাতৃভাষাও হতে থাকে বিকৃত। আজো সেই বিকৃত বাঙলা ও বিকৃত হিন্দুস্তানী ভাষা চালু রয়েছে উক্ত সব অঞ্চলে, বিশেষ করে মুসলিম সমাজে। বড়র অনুকরণ করা মানুষের স্বভাব। এ জন্যে বন্দর এলাকার লোক একদা পর্তুগীজ ভাষাও শিখেছিল আত্যন্তিক আগ্রহে। হুগলীতে নাকি ইরানি ব্যবসায়ী শিয়াদের আড্ডা ও বসতি শুরু হয় মুর্শিদাবাদেরও আগে। এবং ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হুগলীর খ্যাতি ছিল দূর-বিস্তৃত। উল্লেখ্য যে দোভাষীরীতির আদি কবি ফকির গরীবউল্লাহও ছিলেন হুগলীর বালিয়া হাফিজপুরের লোক।

ইরানি ভাষার ও সংস্কৃতির প্রভাব সর্বগ্রাসী ও সর্বাত্মক হয় আঠারো শতকে, যখন উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ডের মতো বাঙলার শাসনভার পেলেন শিয়া মুর্শিদাকুলি খান। বংশানুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয় তাঁর সুবাদারী। ইরানে শিয়া সাফাভী বংশীয় রাজত্বের অবসান ঘটে সতেরো শতকে। ফলে কৃপাবঞ্চিত ও পীড়ন-ভীত বহু শিয়া তখন দেশত্যাগ করে। শিয়া মুরশিদকুলি খানের অনুগ্রহকামী বহু বহু ইরানি শিয়া আশ্রয় নেয় বাঙলাদেশে। এ সময়ে শহর অঞ্চলে তথা মুর্শিদাবাদে ও হাওড়া-হুগলী বন্দর এলাকায় ফারসি–উর্দুর ও শিয়া-সংস্কৃতিব প্রভাব হয় গভীর ও ব্যাপক। এই প্রভাবেরই সাক্ষ্য রয়েছে হ্যালহেডের উক্তিতে, চিঠিপত্রের ভাষায়, সত্যনারায়ণ পাঁচালীর ও মর্সিয়ার জনপ্রিয়তায় এবং পাঞ্জতন পাঁচপীর প্রভৃতির সংস্কারে, মহররমের তাজিয়া-উৎসবের পার্বণিক প্রতিষ্ঠায় আর কোলকাতা-হুগলীর মুসলিম সমাজে ফকির গরীবুল্লাহ প্রবর্তিত দোভাষীরীতির অনুবর্তনে। উত্তরভারতীয় আদলে যখন একটি স্থানিক মুসলিম সংস্কৃতি প্রকাশমান এবং উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা সৃজ্যমান, তখন হঠাৎ নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল পলাশীর প্রান্তর। পালে লাগল সেই দিগন্তমুখী বাতাস। পরিণামদর্শী স্বস্থ হিন্দুরা বরণ করে নিল নতুনকে; দ্বিধাগ্রস্ত বিদেশাগত উর্দুভাষী সেনানী প্রশাসক অভিজাত মুসলমান আকর্ষণ হারাল পুরাতনে, কিন্তু আগ্রহও জাগল না তাদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে অসামরিক ফড়ে-বেনে-দালাল-দেওয়ান-গোমস্তার চাকরীর প্রতি, কিংবা নতুন চিন্তা-চেতনায়। তাই অর্ধ শতাব্দী ধরে তারা রইল নিঃস্ব ও বিমূঢ়। তখন তারা মনেও কাঙাল, ধনেও কাঙাল। যে-নওয়াবীর প্রচ্ছায় একদা শহর-বন্দরে বিদেশাগত শিক্ষিত মুসলমানরা নতুন জীবন-স্বপ্ন রচনা করছিল, তা অলক্ষ্যে লাটগিরিতে পরিণত হওয়ায় এভাবে ব্যর্থ হল তাদের স্বপ্ন। স্বপ্ন উবে গেল, কিন্তু ঘোর কাটল না অনেকদিন। যদিও সম্ভাবনাটা উদ্ভাসিত হয়েছিল উত্তরভারতীয় আদলেই, কিন্তু সৌভাগ্যটা আর মিলল না। কেননা রূপায়ণের আর সাফল্যের সব আয়োজন যখন সমাপ্ত তখন আকাশে দেখা দিয়েছে নতুন সূর্য। নতুন দিনে পুরোনো রচনা অতীতের ঘটনা। পলাশীর প্রান্তরে সূচিত হল মধ্যযুগের অবসান, আর উপ্ত হল আধুনিক যুগের বীজ।

উল্লেখ্য যে শিক্ষাব ঐতিহ্য-বিরহী বাঙলাভাষী দেশজ মুসলিম কোলকাতায় সারা উনিশ শতকেও ছিল মাত্র পাঁচ-দশ হাজার। হিন্দুর তুলনায় নগণ্য হলেও অন্য মুসলিমরা ছিল উর্দুভাষী। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতায় হিন্দু ছিল দেড়লক্ষাধিক, উর্দুভাষী মুসলিম ছিল সতেরো হাজার আর বাঙলাভাষী মুসলিম ছিল চার হাজার।

অতএব দোভাষীরীতির উদ্ভব, পরিচর্যা ও বিকাশক্ষেত্র হচ্ছে কোলকাতার, হাওড়ার ও হুগলীর বন্দর এলাকা। এখানকার এটিই ছিল চলতি বাঙলা। রেজা উল্লাহ (১৮৬১) সালে মুহম্মদ. বেলায়েত ও দানিশ তাই দোভাষী রীতিকে বলেছেন 'এছলামি বাঙলা,' কেউ অভিহিত করেছেন 'চলিত বাঙলা' বলে। এর বিকাশ-ও বিস্তার কাল হল ইংরেজ আমল। যা' উচ্চবর্গের অভিজাতের

পরিচর্যার অপেক্ষা রাখত, তা-ই নিম্নবিত্তের স্বল্প-শিক্ষিত লোকের অনুশীলনে টিকে রইল শহরের সঙ্কীর্ণ-সীমায়। এ যেন দুধের প্রত্যাশায় ঘোলের সাধনা অথবা দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। কেননা এ সাধনায় যাঁরা ব্রতী রইলেন, তাঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অপরিস্রুত শিল্পরুচি যোগ্য ছিল না কোন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার। সামর্থ্য ছিল না তাঁদের লক্ষ্য-চেতনা মনে জাগিয়ে রেখে এগিয়ে যাবার। এ ভাবে ব্যর্থ হল স্বধর্মীর একটি জাতীয় স্বপ্ন, একটি ঈপ্সিত সম্ভাবনা শাসকদের সংস্কৃতি সম্পৃক্ত একটি মহৎ প্রয়াস।

উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই কেবল কোলকাতা, হাওড়া ও হুগলী অঞ্চলের বাইরের লোক বটতলার প্রকাশকদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ফরমায়েসী রচনায় দোভাষী রীতি প্রয়োগ করতে থাকেন। এ রীতি কয়েক বছর আগেও অভিসন্ধি বশে অনুসৃত হয়েছে প্রাকৃত মুসলমানদের জন্যে সৃষ্ট বটতলা সাহিত্যে,—এমনকি মাওলানা আকরম খানের 'পাকিস্তান নামা'য় কিংবা কাজী আবুল হোসেনের 'জিন্নানামায়' এবং আবুল মনসুর আহমদের 'আসমানিপর্দা'য়ও।

গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হাওড়া, হুগলী, কোলকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শাসনকেন্দ্রের ও বন্দর এলাকা ছাড়া, অন্যান্য অঞ্চলের দেশজ মুসলমানের কথ্য ভাষা তো বটেই, লেখ্যভাষাও চিরকাল অবিমিশ্র বাঙলা।

॥ ৬ ॥

বিদেশী শব্দের বহুল প্রয়োগ নয়,—হিন্দুস্তানী বাক্-ভঙ্গির অনুকৃতিই এ রীতিকে দোভাষী করেছে ঃ

সর্বনাম—তেরা, মেরা, তুঝে, মুঝে ইত্যাদি।

বিশেষণ—এয়ছা, যেয়ছা, তেয়ছা, কেয়ছা, কব, কাহে, এত্তা, কেত্তা, খোড়া, ভি, আভি।

সংখ্যাবাচক—পয়লা, দোছরা, তেছরা প্রভৃতি।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়—বিচে, খাতেরে, হুজুরে ইত্যাদি।

হিন্দুস্তানি ক্রিয়াপদ—তোড়, ডাল, ছোড়, নিকাল, গির, উতার, ভেজ, কিয়া, পাকড়, ঘুম ইত্যাদি।

ফারসি নামধাতু—খোসালিত, নেওয়াজিয়া, গোজারিয়া ইত্যাদি।

আরবি-ফারসি বহুবচন—বেরাদরান, এজিদান, শহীদান, মোমেনিন, চাকরান।

পুলিঙ্গে স্ত্রী লিঙ্গের প্রত্যয় প্রয়োগ—বালা, প্রিয়া, উদাসিনী।

পুরো হিন্দুস্তানি বাক্যের প্রয়োগ ঃ

তেরা মেরা শাদী হোগা আয়েন্দা জুমারাত।
কাদের রহিম আল্লা রহমানের রহিম,
আলমের পালনে ওয়ালা হক্কের হাকিম।
নেক কামে রাজি সেহ বদি কামে দেক।

পহেলা দাওত ভেজে রসুল খাতেরে।
থানা বেগর দো ইমাম বড়া পেরেসান।
সেতাবি এ মোছাফেরে লেহ পাকড়িয়া।

সুন্দর করে বলা কথাই কাব্য তথা সাহিত্য। শায়েরদের রচনায় সে-সৌন্দর্যেরই অভাব। কে না জানে, ধ্বনি-মাধুর্য সৃষ্টি হয় সূচিত শব্দের সুবিন্যাসেই। এ চেতনা স্বল্পশিক্ষিত পুথি শায়েরদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য। তাই অনবরত শব্দের নির্লক্ষ্য বিশৃঙ্খল প্রয়োগে বক্তব্যের অনর্গল প্রকাশই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ফলে অমার্জিত স্থূল রুচির প্রলেপে ওই ভাষায় এবং ভঙ্গিতে একটা সামগ্রিক অশ্লীলতা যেন প্রকাশমান। অবশ্য এ হচ্ছে বিরূপ শিক্ষিত মনের কথা। কিন্তু যাঁরা এ সাহিত্যের লেখক আর যাঁদের জন্যে লেখা তাঁদের মধ্যে এসব ব্যাপারে কোনো বিচলন হয়তো নেই। বহুকালের অনুশীলনে এটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বীকৃত ও সমাদৃত রীতি। বিশেষত, বিকল্প রীতি যখন অনুপস্থিত। এবং পাঠকেরও শিক্ষার আর রুচির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি।

মিশ্রভাষায় হালকা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনারীতির ঐতিহ্য এদেশে সুপ্রাচীন। আমীর খুসরু (ফারসি-হিন্দি), ভারতচন্দ্র (বাঙলা-ফারসি-হিন্দুস্তানি), দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন (বাঙলা-ইংরেজি), আহসান হাবীব (দোভাষীরীতিঃ ফরমান, হকনাম ভরসা, জঙ্গনামা) আবুল মনসুর আহমদ (দোভাষী রীতি ঃ আসমানী পর্দা) প্রমুখ কবির রচনা তার সাক্ষ্য।

আবার ইরানি কবি নিজামীর সিকান্দরনামা এবং বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবির বহু উৎকৃষ্ট কবিতা বিদেশী শব্দবহুল।

অতএব, শব্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্য বা কুশলতার উপরই কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে এবং ব্যবহারযোগ্যতাই ঔচিত্য ও উপযোগের নিয়ামক পরিমাপক।

দোভাষী শায়েরা প্রাকৃতজনের কবি। তাই পরিশীলিত মানসের শিল্পরুচি সুন্দর ও মহৎ জীবনের মাহাত্ম্যচেতনা কিংবা জীবনজিজ্ঞাসা তাঁদের রচনায় অনুপস্থিত।

দোভাষী সাহিত্য পাঁচটি ধারায় বিভক্ত

ক. প্রণয়োপাখ্যান—সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, ইউসুফ-জোলেখা, চন্দ্রভান, চন্দ্রাবতী, গুল-হরমুজ, গুল-সনোবর, গুলে-বকাওলি, মধুমালতী, মৃগাবতী-যামিনীভান, লায়লী-মজনু, আলেফ-লায়লা প্রভৃতি। এগুলো উর্দু গ্রন্থের—কৃচিৎ ফারসি ও হিন্দি-আওধী কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ তথা কাহিনীর স্বাধীন অনুসৃতিমূলক। এগুলোর মধ্যে রূপকথা শ্রেণীর গল্পকথন প্রয়াস আছে, বাস্তব জীবনবোধের কোনো পরিচয় বা জীবনের কোনো তাত্ত্বিক চেতনার বা রূপের উদ্ভাস নেই। বাঙালী রচিত বা অনূদিত এ সাহিত্যে বাঙলার প্রকৃতি বা সমাজ, বাঙালী জীবনের সমস্যা কিংবা যন্ত্রণা বা উল্লাসের কোনো ছাপ নেই আছে কেবল আঙ্গিকের ও রসের গতানুগতিকতা এবং ব্যক্তিমনের স্পর্শনিরপেক্ষ যান্ত্রিক পরিচর্যা।

খ. যুদ্ধ কাব্য—জঙ্গে খয়বর, জঙ্গে ওহুদ, জঙ্গে বদর, শাহনামা, আমির হামজা, সোনাভান, জৈগুন, কারবালা যুদ্ধ, কাসাসুল আম্বিয়া প্রভৃতি কাব্যে রসুল, আলি, হামজা, হানিফা, হোসেন প্রমুখ ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরদের কাফেরদলন এবং ইসলাম প্রচার কাহিনী বিবৃত। এসব যুদ্ধকাব্যে রোমান্সের তথা প্রণয় রসের অবতারণা থাকলেও এগুলো মূলত জেহাদী প্রেরণার কাব্য। কোনো স্বার্থবুদ্ধি নয়—ইসলাম প্রচার-প্রীতিই প্রেরণার উৎস। তাঁদের এক হাতে কোরআন আর এক হাতে তরবারি, মুখে রয়েছে বেদীনের প্রতি তাঁদের আহ্বান—'হয় কোরআন বরণ কর, নয়তো তরবারীর মোকাবেলা কর।' তাঁরা কাফেরপূজ্য দেবতাদের বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী। এসব কাব্যে স্বধর্মের ও স্বজাতির অতীত গৌরব স্মরণে উল্লাসবোধের আভাস আছে অবশ্য, কিন্তু সে-উল্লাস হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়হীন নিঃস্ব দুর্বলের আত্মীয়-গৌরবে আত্মপ্রসাদলাভের বাঞ্ছাজাত এবং এতে রয়েছে বর্তমান আর্তনাদকে অতীত আস্ফালনে ঢাকা দেয়ার প্রয়াস—দুর্দিনে আত্মপ্রবোধ ও স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা।

গ. পীর পাঁচালী—পীর-পাঁচালীগুলো শায়েরদের মৌলিক সৃষ্টি, যে-অর্থে মঙ্গলকাব্যগুলো মৌলিক সে-অর্থেই অবশ্য। কেননা, এখানেও রয়েছে পুচ্ছগ্রাহীর অনুসৃতি। পীর পাঁচালী দুই শ্রেণীর ঃ ১. ঐতিহাসিক ব্যক্তিনির্ভর ও ২. কাল্পনিক।

১. মোবারক, গোরাচাঁদ, ইসমাইল গাজী, খাঞ্জা খাঁ গাজী (খান-ই জাঁহা খান), সফি খাঁ গাজী [শাহ শফিউদ্দীন (খাঁ ?)] ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁরা হিন্দুর লৌকিক দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী কাফের-মর্দন ও ইসলামপ্রচারক পীররূপে কল্পিত। অতএব এঁরা মঙ্গলকাব্যের দেবতার আদলে সৃষ্ট এবং এঁদের ভূমিকাও অভিন্ন।

২. শাসক-শাসিতের তথা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-সমন্বয়ের, সদ্ভাবের ও প্রীতির ভিত্তিতে এসব মৌলিক তথা কাল্পনিক পীর সৃষ্ট। জীবন ও জীবিকার এবং পীড়ন ও নিরাপত্তার অভিন্নতাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও মিলন প্রয়াসের জন্ম। তাই এসব পীর হিন্দুদেবতারই প্রতিরূপ ঃ

সত্যনারায়ণ-সত্যপীর, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, মছন্দর-মছলন্দি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, দক্ষিণরায়-বড় খাঁ গাজী, উদ্ধারদেবী-উদ্ধারবিবি, বাস্তুদেবী-বাস্তবিবি। এঁদের মধ্যে সত্যপীরই আদি ও প্রধান ঐক্যদূত। তাঁকে কেন্দ্র করেই তৈরি হলো মিলনসেতু। মিলন-ময়দানের তিনিই ইমাম।

ঘ. ধর্মশাস্ত্রীয় রচনা—শরীয়ত ও মারফত বিষয়ক বহু গ্রন্থও রচনা করেছেন এঁরা : মোহাম্মদী বেদতত্ত্ব, ফকির বিলাস, নসিয়তনামা, মুর্শিদনামা, তম্বিয়াতুন্নেসা, আহকামূল জুমা, সেরাতুল মুমেনীন, একশত বত্রিশ ফরজ, নামাজ মাহাত্ম্য, হাজার মসায়েল, তরিকতে হক্কানি, হকিকতে সিতারা প্রভৃতি এ শ্রেণীর গ্রন্থ।

ঙ. বিবিধ—তাজকিরাতুল আউলিয়া, আবুসামা, ইব্লিসনামা, যুগীকাচ, ফালনামা, গান, কিয়ামতনামা প্রভৃতি।

প্রণয়োপাখ্যান ছাড়া অন্য শ্রেণীর রচনাগুলো কম-বেশি ধর্মসম্পৃক্ত। এবং প্রাকৃত জনের এ ইসলাম হচ্ছে লৌকিক ইসলাম। অর্থাৎ স্থানকালের প্রভাবজ এবং দেশী মুসলমানের মানসপ্রসূত এ ইসলাম নতুন অবয়বে প্রকাশমান। এই তথ্য মনে রেখে বলা যাবে, দোভাষী সাহিত্য স্বধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্যগর্বী এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক কবির রচনা। এঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দরুন নীতিবোধ ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি পাই এঁদের রচনায়। দেশ, জাতি ও ধর্মের ইতিকথা, এবং সমাজ-সংস্কৃতির একটি অতি স্থূলবোধ ও রূপ এ সাহিত্যে প্রতিফলিত।

অতএব, আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগরবন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ। এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি শতকরা নিরানব্বইজন অনক্ষর অশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয় তা হলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ' বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিমেয়। এ ভাষাও দাখিনী উর্দু ও উত্তর ভারতীয় উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারত—এ উল্লাস বোধ, কিন্তু হল না—এ ক্ষোভই দোভাষী রীতি চিরকাল জাগিয়ে রাখবে স্বধর্মী-স্বজাতির সংস্কৃতিপ্রিয় মুসলিম ঐতিহাসিকের মনে।

শায়ের পরিচিতি

দু'শ-আড়াইশ দোভাষী-পুথির কিংবা শতোর্ধ্ব শায়েরের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই কোন সার্থকতা নেই বলেই। আমরা এখানে যথেচ্ছ নমুনা জরিপ স্বরূপ অনেক পুথির ও পুথিকারের পরিচয় দিলাম। তাই কালক্রমিক কিংবা বিষয়গত ধারা রক্ষিত হল না।

১. ফকির গরীবউল্লাহ

দোভাষীপুথির আদি লেখক ফকির গরীবউল্লাহ। সৈয়দ হামজা, বলেন : 'পীর শাহা গরীবুল্লাহ কবিতার গুরু/আলমে উজালা যার কবিতার শুরু।' অবশ্য দোভাষীরীতির প্রয়োগের প্রবণতা প্রথম দেখা দেয় সতেরো শতকের শেষপাদে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সত্যপীর পাঁচালীকার পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু কবিদের মধ্যে। সত্যপীর পুথির পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

শাহ গরীবউল্লাহর জন্ম হাওড়ার বালিয়ার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামে। তিনি পিতা শাহ দুন্দীর পহেলা ফরজন্দ। গরীবউল্লাহ ১. হোসেন মঙ্গল (জঙ্গনামার প্রথমাংশ) ২. আমীর হামজা (প্রথমাংশ) ৩. ইউসুফ-জোলেখা ৪. মদনকামদেবপালা (সত্যপীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক) ও ৫. সোনাভান পুথির রচয়িতা।

ফকির গরীবউল্লাহ বড় খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন। সৈয়দ হামজার কথায় প্রকাশ—

'আল্লার মকবুল শাহ গরীবুল্লা নাম। আছিল রওশনদীল শায়েরী জবান।
বলিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥ যাহাকে মদদ গাজী শাহ বড়ে খান॥'

গরীব ফকিরের 'আমীর হামজা ; ইউসুফ-জোলেখা, হোসেনমঙ্গল, বা জঙ্গনামা এবং মদন-কামদেব কাহিনীর বক্তা পীর বদর আর শ্রোতা বড় খাঁ গাজী। 'বড় খাঁ গাজী কবিকে বাতেনে দর্শন দান করে সম্ভবত কাব্য-রচনায় প্রণোদিত করেছেন ঃ

'গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত।
বাতুনে বড় খাঁ যারে দিল মোলাকাত॥
বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাই।
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই॥"

তারপর ঃ

আল্লার দরগায় বদর নোঙাইয়া মাথা।
কহিতে লাগিল ইউসুফ-জোলেখার কথা।

ইউসুফ-জোলেখার সমাপ্তিভাগের দুটি শ্লোক দৃষ্টে মনে হয় কবি নবাবী আমলে অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। যেমন—

১. 'আল্লাতালা সালামৎ রাখিবে বাদশারে।
সহি সালামৎ রাখ বাদশার উজিরে।

২. গরীব কহেন শাহা নেজামের পায়।
কেতাব মাফিক এত্তা দূর হৈল সায়।।

এতে প্রমাণিত হয় গরীবউল্লাহ নবাব মীর জাফরের পুত্র নাজিমুদ্দৌলার সময়ে (১৭৬৫-৭২ খ্রীঃ) ইউসুফ-জোলেখা রচনা করেছেন।

গরীবউল্লাহ মদনকামদেবপালা (সত্যপীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক) এখন ওয়াজেদ আলীর নামে চলে, যদিও ভণিতায় সর্বত্র গরীবুউল্লাহর নাম রক্ষিত হয়েছে। গরীবউল্লাহর হেসেনমঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে এক মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর ভণিতাও যুক্ত রয়েছে এবং আমীর হামজার শেষাংশ সৈয়দ হামজা ১৭৯২-৯৪ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেছিলেন।

গরীবউল্লাহর সোনাভান ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে সৈয়দ হামজা ও ফকীর মোহাম্মদের নামেও চলে। তাঁর ইউসুফ-জোলেখায়ও ফকীর মোহাম্মদের ভণিতা যুক্ত হয়ে বাজারে চালু হয়েছে।

গরীবুউল্লাহ সম্ভবত ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত থেকে তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেছিলেন। আমীর হামজা থেকে তাঁর রচনার একটু নিদর্শন দিচ্ছি ঃ

বাদশা নওশেরওঁয়ার কন্যা মেহেরনাগারের রূপবর্ণনা—

মাথায় চাচর কেশ হুরপরী জিনে বেশ
মুখে শোভা চান্দের সমান।
চাহনি মদনবাণ দেখিলে হারায় প্রাণ
ভুরু দুটি যেমন কামান॥
গলায় সোনার হার কাঙ্গনের শোভা তার
আগু পিছু শোভা করে মাপা
হেন নথ নাক মাঝে গজমতি তাহে সাজে
ছেরে শোভা কনকের চাঁপা॥

কপালে মানিক পটি গাঁথিয়া বাঁধেন চুটী
যেন শোভা আকাশের তারা।
তিলক কপাল পরে চান্দা যেন শোভা করে
বন্দ বান্ধে রূপা সোনার ডোরা॥
পায়েতে নুপুর দিল আঁধার উজালা হৈল
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি।
ছিরি তার উঠে ভাল আন্ধারেতে হৈল ভাল
বিজলি সমান ঝিলিমিলি॥

ভাষারীতি অন্যত্র দোভাষী। রচনায় নৈপুণ্য নিতান্ত বিরল, কবিত্ব দুর্লভ। চরিত্র চিত্রণের কোন প্রয়াস নেই। আমীর হামজার পুথিতে ইরানের বাদশা নওশেরওয়াঁর সঙ্গে হামজার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। সে-সঙ্গে হামজার বাদশাজাদী মেহেরনাগার লাভের প্রয়াস কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ। 'ফকির গরীব কহে কেতাব দেখিয়া।' কাজেই কাব্যটি মূলের স্বাধীন অনুসৃতি।

হানিফা ও ব্রাহ্মণকন্যা সোনাভানের স্বপ্নে মিলন—

'একদিন স্বপন দেখে বিছওান শুইয়া॥
হানিফার গায় হস্ত আহাস্তে ফেরায়॥
হানিফা খোওাবে কহে তুমি কোন্ জন।
টুঙ্গির সহরে থাকি বুলিল স্বপন॥
সোনাভান নাম মোর ছিনু আরামেতে।
তোমার ছুরত আমি শুনিনু কাসেতে।
সেই হৈতি দিল মেরা আছে বেকারার।
থাকিতে না পারি আইলুম দেখিতে দিদার॥
কাম আনলেতে পুড়ে হইলুম ছারখার।
সর্বাঙ্গ জুড়াও মোর করিয়া বেভার॥
নহেতো মরিব পুড়ি আসক আগুনে।
হানিফা করিল তওবা হাত দিয়া কানে॥
তবে যদি নেকা বিহা হয় তেরা সাথে
তবে তোর মনের আগ পারি নেভাইতে।

আত্মসংবরণ করা মুস্কিল, তাই জেগে ওঠে হানিফা সংকল্প করল—

টুঙ্গির সহরে যাব যে করে খোদায়।

শহীদ হোসেন শোকে ঃ
এমামের লোহু গেল আসমান উপরে।
সিঁদুরিয়া মেঘ হয়ে আচমানে রহিল।
আরস কোরস লোহ্ কলম সহিতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁপিতে।
আচমান জমিন আদি পাহাড় বাগান
কাঁপিয়া অস্থির কৈল কারবালা ময়দান।
আফতাব-মাহতাব আদি কালা হৈয়া গেল
আজি তক্ সেই মেঘ উঠে আচমানে।..
যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে
ছের জুদা কৈল যদি এমামের ধড়ে।
জানোয়ার হরিণ পাখী কাঁদিতে লাগিল॥
বাঘ ভাল্লুক কাঁদে আর মহিষ গণ্ডার।
বাচ্চারে না দেয় দুধ কাঁদে জার জার॥
মৌমাছি ভোমর কাঁদে মুখে নাহি মউ॥
কাঁখে কুম্ভ করি কাঁদে গৃহস্থের বৌ॥

২. এয়াকুব আলী

সম্ভবত ১০৭১ বাঙলা সনে অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তগর্ত জিরিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় বালিয়ায় অতিবাহিত করেন তিনি। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি গরীবউল্লাহ্‌র জঙ্গনামার দ্বিতীয়ার্ধে ভণিতায় তাঁর নাম বসিয়ে শায়ের খ্যাতি লাভে প্রয়াসী ছিলেন।

ডক্টর সুকুমার সেন এয়াকুব আলীকে পুঁথির রচয়িতা বলে স্বীকার করেননি। ডক্টর সেন বলেন—'ইয়াকুব আলী আসলে হইতেছেন গরীবউল্লাহর জঙ্গনামার পুথির লেখকমাত্র। মৌলবী আব্দুল গফুর সিদ্দিকী এবং তাঁহার অনুসারীরা যদি ইয়াকুব আলীর পরিচয় ও গরীবুল্লার পরিচয় মিলাইয়া দেখিতেন, তবে ইয়াকুব আলীকে জঙ্গনামার প্রাচীন কবি বলিয়া ভুল করিতেন না।' আমাদের হাতে হস্তলিখিত দুখানি জঙ্গনামা রয়েছে। তাতে কিন্তু গরীব ফকিরের সঙ্গে এয়াকুব আলীরও ভর্ণিতা পাওয়া যাচ্ছে। আবার এয়াকুব আলীর নামে ছাপা পুথিতে গরীবউল্লাহর বহু ভণিতা রয়েছে। জালিয়াতির নমুনা বটতলায় সুলভ। গরীবউল্লাহ্‌র সোনাভান সৈয়দ হামজার নামেও চলে, এই সোনাভানে আবার ফকির মোহাম্মদের নামও যুক্ত হয়েছে, গরীবউল্লাহর ইউসুফ-জোলেখার ভণিতা বদল করে উক্ত ফকির মোহাম্মদ ইউসুফ-জোলেখার রচয়িতাও বনে গেছেন। ফকির মোহাম্মদ ইমাম চুরির পুথিরও রচয়িতা বলে পরিচিত।

অবশ্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ২৫৫ সংখ্যক পুথিতে গরীব ও এয়াকুবের ভণিতা পাওয়া যায়, প্রথম দিকে গরীবের, শেষের দিকে এয়াকুবের। পুথিটি আরবি হরফে লেখা। লিপিকাল ১২৩৩ মঘী বা ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ। মনে হয় এটি মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতিলিপি।

গরীব ফকিরের ভণিতা ঃ

১. অধীন ফকির কহে কেতাব দেখিয়া
বাপ নাম শাহা দুন্দি আল্লার ফকির।
ভাটীর সুলতান গাজী বড় খান পীর।।

২.　　　　বড় খান ভাবিয়া দেলে　　　অধীনে ফকির বোলে
শাহদুন্দির পয়লা ফরজন্দ।

এয়াকুবের ভণিতা–　　রসুলের পাও তলে ভরসা কেবল।
অধম এয়াকুবে কহে হোছাইন মঙ্গল॥

সাহিত্যবিশারদের ২৫৬ সংখ্যক ছাপা 'মুক্তুল হোসেন' গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠায় সায়ের মোহাম্মদ এয়াকুব আলী রয়েছে।

পুথির অভ্যন্তরে ফকির গরীবউল্লাহর যেসব ভণিতা আছে, তাদের দুটো তুলে দিচ্ছি ঃ–

১.　　অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত।
বড় খান গাজী যারে দিল মোলাকাত।

২.　　বড়খান গাজী পায়　　　অধীন ফকির কয়
বড়খাঁ হুকুম দিলে　　　অধীন ফকির বলে
কেতাবে বয়ান সবায়॥

এয়াকুবের (?) বন্দনাংশ–

চৌদা খান্দান আর বন্দিনু চারিপীর।
ছাতিপরে হাত দিয়া নওয়াইয়া ছির॥
সাহা সরফদ্দিন পীর বন্দি আলাচিত।
হামেসা বান্দেন ছিন বাঘের পিঠেতে॥
ত্রিবেণী ঘাটেতে বন্দিনু দফার খান।
গঙ্গা যার ওজুর পানী করিতে যোগান॥
পেড়ুয়ার সাহা সুফী দুনিয়ার বিহিত।
উত্তরে মসজিদে মিনারা বিরচিত॥
পশ্চিমে তালাব যার বিরাজে চারিঘাট।
গোছল হামেসা তাতে তাতে মোমিনের ঠাঁট
মক্কা হৈতে আনিয়া ভরিল তার পানি।
দেশে দেশে হৈতে লোক আসে এহা শুনি॥
ছোট পেড়ুয়ার নাম বড় পুণ্য স্থান।
হাজতি সিরিনী সদা আছেত যোগান।

এয়াকুবের ভণিতা—　　রছুলের পদ আশে সহদ লালচে।
পাঁচালীতে অধম এয়াকুব রস রচে॥

লিপিকাল ১৮৭১ এবং মুদ্রণকাল ১৮৭৪ সন হলেও মোহাম্মদ ইয়াকুব সম্ভবত একজন কবিযশকামী লিপিকর বা প্রকাশক মাত্র। এ জালিয়াতি পেশা চালু ছিল সেকালের বটতলায়।

৩. সৈয়দ হামজা

দ্বিতীয় দোভাষী পুথিকার সৈয়দ হামজা আঠারো শতকের শেষ দশকে তাঁর কাব্যগুলো রচনা করে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। হুগলী জেলার ভুরসুট পরগনার অদুনা বা উদ্না গ্রামে তাঁর জন্ম। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কবির ১১৩৯ বাঙলা সালে বা ১৭৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে জন্ম এবং ১২১৩ সালে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু হয়। অতএব কবি পরিণত বয়সেই পরলোক গমন করেন। কবির পিতার নাম হেদায়তুল্লাহ। পিতামহ আবদুল কাদের। কবির দুই পুত্র—কলিমুদ্দিন ও কুতবুদ্দিন।

আমরা কবি মুহম্মদ কবীরের প্রসঙ্গে সৈয়দ হামজার প্রথম রচনা মধুমালতীর উল্লেখ করেছি। এ কাব্যখানা প্রায় বিশুদ্ধ বাঙলায় ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে (বাঙলা ১১৯৫ সালে) রচিত হয়েছিল। কবি বোধ হয় বিশুদ্ধ বাঙলায় কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জনে ব্যর্থ হয়ে খোট্টাভাষী শহুরে স্বজনের মধ্যে জনপ্রিয় আদি দোভাষী পুথিকার ফকির গরীবউল্লাহর অনুসরণ করেছিলেন। গরীবউল্লাহ সৈয়দ হামজার বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন। অধিকন্তু উভয়েই ছিলেন নতুন শহর কোলকাতার অদূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। ভাষায় দোভাষীরীতির যথার্থ প্রবর্তক ফকির গরীবউল্লাহর রচনাদর্শ গ্রহণ করে সৈয়দ হামজা অভীষ্ট ফল লাভ করেছিলেন, তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি

তাঁর অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই আমীরহামজা পুথির শেষের দিকে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছেন--

কবিতা তামাম হৈল ত্রিপদী না লেখা গেল
সারাপুথি হইল পয়ার।
সবাকে হইল ধন্দ কবিতা ত্রিপদী ছন্দ
যুগ্যতা না আছিল হামজার।।
কবির জেওর দিতে খুব ভাতে সাজাইতে
জেন্দিগি না হয় এতবার।।
চাকর পরেব ঠাঁই লিখিতে ফোরসত নাই
এ খাতেরে পয়ারে রচিত।
কোনরূপ বাঙ্গালায় জঙ্গনামা বোঝা যায়
তবে যার যেমন উচিত।।

অবশ্য তিনি ত্রিপদী অন্যান্য পুথিতে রচনা করেছেন।

মধুমালতী যে হামজার প্রথম রচনা তার আভাস পাচ্ছি নিচের কথাগুলোতে ঃ

কবিতার বাত কহি দেলেতে বুঝিবে সহি
যতেক রসিক বন্ধুগণ
আছিনু বসন্তপুরে মাইনদ্দি মোল্লা ডেরে
সেইখানে করিনু যতন।।
কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুন পুথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খাহেস পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে।।

সৈয়দ হামজা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ফকির গরীবউল্লাহর অসমাপ্ত 'আমীর হামজা' পুথির দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় আত্মনিয়োগ করেন ঃ

বোরহানার মাতারি যে আরব্বের বিচে।
ওতারিয়া ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে।।
সেই হদ্দ শায়েরি হয়েছিল আগে।
তারপর--এগার শও নিরানই সাল মাহা মাঘে।।
না ছিল ওরক দুই কেতাব আখেরি।
এ খাতেরে আখেরি লিখিতে হৈল দেরি।।
বার শও এক শাল বাঙ্গালার শেষে।
কেতাব মিলিল বুঝে বহুত কোশেশে।।
করিনু শায়েরি পুথি আখেরী কেচ্ছার।
লেখা গেল সাহাদত আমীর হামজার।।
বারশও এক সাল আখেরী হিসাবে।
বার দিন ছয়মাস হিসাবেতে হবে।।

সুতরাং আমীর হামজা পুথি ১১৯৯ সালে আরম্ভ হয়ে ১২০১ সালে তথা ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই কাব্যে হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার অলৌকিক বীরত্বের উপকথা বর্ণিত হয়েছে। এর পরে আরো দুখানি কাব্য রচনা করেন তিনি। ১২০৪ সালে (১৭৯৭ খ্রীঃ) তিনি জৈগুন বিবির কেচ্ছা (যয়তুন বিবি) রচনা করেন। এতে হানিফা ও জৈগুন বিবির যুদ্ধ এবং তার পর হানিফার কাছে জৈগুন বিবির আত্মসমর্পণ ও বিবাহ বর্ণিত হয়েছে।

আরবের বনি হনুফা বংশীয় বীর মুহম্মদ হনুফাই পুথির রাজ্যে হজরত আলীর অন্যতম পুত্ররূপে কল্পিত হয়ে মুসলমানি উপকথা-রোমান্সের প্রায় একচ্ছত্র নায়ক হয়ে কীর্তিত হয়েছেন। হানিফার কাহিনী শোনেনি বা নাম জানে না এমন বাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুসলমান পাক-ভারত-বাঙলাদেশে নেই, সম্ভবত দুনিয়াতেও নেই। মুহম্মদ হানিফার সম্ভবত ৭৮ হিজরীতে জন্ম এবং তিনি খলিফা আবদুল মালিকের সময়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। অলৌকিক শক্তিধর হানিফা উপকথারাজ্যের জৈগুন-সোনাভান-কায়রাপরী-শাহপরী-সূর্যউজাল (সুরতজামাল)-মল্লিকা-পবনকুমারী-সমর্তভান প্রভৃতি পরী-গন্ধর্ব ও মনুষ্যরাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এ জন্যে তাঁকে দেব-দৈত্যের সঙ্গে রণে, শ্বাপদসঙ্কুল বন-জঙ্গল উত্তরণে ও নগনদীনগরীর বাধা উল্লঙ্ঘনে সাফল্য অর্জন করতে হয়েছে।

হাতেম তাই কাব্য ঃ

মিএগ শাহা এর্জতুল্লা কহিলেন আমায়
হাতেম তাইর কেচ্ছা লেখ বাঙ্গালায়।

সৈয়দ হামজার শেষগ্রন্থ হাতেম তাই। জগদ্বিখ্যাত দাতা 'হাতেমতাই'-এর জীবনের অলৌকিক-অসাধারণ কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। 'হাতেমতাই'–একশও একুশ লিখি তার পাশে শূন্য' [তথা ১২১০] সনের ঠিকানা পাবে তায়'। কাজেই কাব্যের রচনাকাল ১২১০ সাল বা ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দ। একটু নমুনা--

বিবি বলে ছাড় তুমি আসেক খেয়াল।
সাদীর করার মেরা বহুত জঞ্জাল।
সাত ছওয়ালের যে জওয়াব দিবে আনি
করার কবুল যদি থাকে জিন্দেগানি।।

জৈগুনের পুথিতে সৈয়দ হামজা নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি ঃ

ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তারিখ বন্দ
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে।
বার শও চারি সালে জুম্মার নামাজ কালে
বাকি সে মাসের সাত দিনে।।
ভুরসুট পরগনা বিচে উদনা বাগের নীচে
বসবাস কাদিমি মোকাম।
আবদুল কাদের দাদা তার বড় দেলসাদা
বাপ মেরা হেদায়তুল্লা নাম।।
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে পাঙ ছাড়া
পরগণা বায়েড়া রাণাঘাটে।
হানিফার পাঙতলে সৈয়দ হামজা বলে
কলিমদ্দি বড় বেটা কুতুবদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাসুম আমার।
রসুলের পাও তলে সৈয়দ হামজা বলে
ঘর ছিল ভুরসুট অদুনা।
সন নিরানই সালে আমার কপাল ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা।।
চাষবাস যত ছিল বাড়িঘর সব গেল
ভরাডুবি হৈল মাঝে মাঠে।
ভুরসুট পরগণনা জান ঘর।
উদনায় পয় বাড়িল বানেতে খাব হইল
তিনহাত বাড়িল উপর।।

জৈগুনের কিস্‌সার কাঠামো—

জৈগুন নামে বাদশাজাদী এরেম সহরে।
কারার করেছে বিবি বাপের হুজুরে।।
মহিমে যে কেহ মোরে পাছাড়িবে জোরে।
সাদী বেহা কবুল করিব আমি তারে।।
আমার মহিমে যদি হারে পাহালওয়ান।
করিবে খেদমতগারি হইয়া গোলাম।।

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হয়ে হানিফা জৈগুনকে লাভ করেন।

১২০৪ সালে তথা ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে জৈগুনের কিস্‌সা রচিত।

৪. আবদুল মজিদ ভুঁইয়া

কবি সৈয়দ হামজার এক কাব্য-শিষ্য বালেশ্বরবাসী আবদুল মজিদ ভূঁইয়া 'রঙ্গ বাহার' নামের একটি রোমান্স রচনা করেন। তিনি গুরু সৈয়দ হামজাকে চাক্ষুস করেননি। হামজার হাতেমতাই কাব্য পড়ে আবদুল মজিদ এতই মুগ্ধ হন যে তাঁকে কাব্য-গুরু বলে হৃদয়ে স্থান দান করে তাঁরই রচনাদর্শ অনুসরণ করেন ঃ

'বন্দি আমি ওস্তাদের পায়
ভুরসুট পরগণা বিচে উদনা বসতি আছে
তার মাঝে সৈয়দ হামজায়॥
কবিতা করিনু গুরু সেই যে আমার গুরু
মোলাকাত নাহি মেরা সাথে।
তার ধ্যান মনে রাখি কেতাব ছেফত দেখি
হাতেমতাইর কেচ্ছা হৈতে।।
আল্লা তালা তার তরে বেহেস্ত নসিব করে
ওফাত হইয়াছে বহুকাল।
এয়সা কেহু বাঙ্গালার শায়ের না করে আর
যবতক দুনিয়া বাহাল।।
তার দেশ বাঙ্গালাতে মেরা ঘর উড়িষ্যাতে
বালেশ্বর কটক জেলায়।
বস্তা থানার পাশ কদিমি মোকাম বাস
গড়পদ্দা পরগণা বলায়।।

কাব্যটি সম্ভবত ১৮৬১-৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত। দিলরুবা-চারচমন রচয়িতা আবদুল মজিদ খান বা আবদুল মজিদ ভুঁইয়া সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। এ গ্রন্থটি ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে হবিবি প্রেসে মুদ্রিত হয়। দিলরুবা-চারচমন একটি উপাখ্যান গ্রন্থ। বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই।

৫. গরীবউল্লাহ বেপারী

গরীবউল্লাহ নামের কবি 'দিলারাম' উপাখ্যান এবং 'নেকবিবির বয়ান' নামে নারীদের প্রতি ধর্মোপদেশমূলক পুস্তিকার রচয়িতা।

নেকবিবি বয়ানে রয়েছে—

অধীনে গরিবে কহে ভাবিয়া খোদায়।
রহমতগঞ্জ ঘর সহর ঢাকায়।।
এইখানে হৈল ভাই কিতাব তামাম।
বড় ছোট সভা পরে আমার ছালাম।।

(জয়নুল আবেদিনের নাম ছাপা পুথিতেও এ অংশ রয়েছে)

লিপিকার বলেছেন—

'গরীবউল্লা বিপারী যে আমার মিতাজী।
হাজীরাবাগে ঘর বাপ কালু মাঝি।।
তানার মেহের করি কিতাব তৈয়ার।
তা সভার ভালা করে প্রভু করতার।।

এ হাজারীবাগ ঢাকা শহরের নওয়াবগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত।

'দিলা রামে' আছে—

'কহে হীন গরীবউল্লা বাপ মেরা রফিক মোল্লা
আখরাতে ভালা তার করিও খোদায়
আর এক ভাই মোর নাম জঙ্গু খণ্ডিগর
লালবাগে ঘর তার বাদশার কেল্লায়।

অন্যত্র—কহে গরীবুল্লা/ওস্তাদ নেয়ামতুল্লা/সবুরী সকলের ভালা।

অতএব, কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—গরীবুল্লাহ ঢাকা শহরের রহমতগঞ্জবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রফিক মোল্লা,। ভাই জঙ্গু কারিগর। নিবাস ঢাকা শহরের লালবাগ কেল্লায়। কবির 'বেপারী' উপাধিতে প্রকাশ—তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। পুথিরচনার সময় বোধ হয় 'মা' বেঁচে ছিলেন না, তাই তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। কবির ওস্তাদের নাম নেয়ামতউল্লাহ।

গরীবুল্লাহ বেপারী রচিত দিলারাম কাব্যের নমুনা ঃ

এই মতে সাহাজাদা কান্দে জারেজার।
মুখেতে কহেন আল্লা করহে নিস্তার।।
দরিয়ার মওজার টানে খেচে লিয়া যায়।
বদনে না মিলে জোর করে হায় হায়।—
হেনকাল কিছু যেন ঠেকিলেক হাতে
আখি খুলে চেয়ে দেখে করিয়া নজর।
দেখিল কুম্ভীর এক তক্তা বরাবর।।

'দিলারাম' সম্বন্ধে কবির উক্তি—

'হিন্দি কিতাবেতে ছিল কেচ্ছা দেলারাম।
তাহাতে লিখিয়াছিল এই মত কালাম।।
হিন্দুস্তান দেশে এক আছিল হালওাই।
শুন তার কথা বাঙ্গালায় লিখে যাই।।

রচনা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব বর্জিত। নেকবিবির বয়ান থেকে কিছু নমুনা দিচ্ছি ঃ

চারজন ধার্মিক রমণীর কাহিনী গল্পচ্ছলে বর্ণনা করে কবি বলেছেন—

চারি নেক বিবি দেখ এছাই আছিল।
দেল রোসন হৈল আর নেকনামি রৈল।।
তাহার বয়ান আমি সভাকে শুনাই।
পড়িয়া বিবির তরে শুনাইবে ভাই।।
গরীবুল্লা বোলে আমি কি কহিব আর।
কলিকালের আওরাতের লেখি কিছু আর।।
ফিরিবারে পায় যদি পড়শীর ঘরে।
খছমের গীবত যত করে সভার তরে।
দুই চারি আওয়াত বসিয়া এক সাথ।
ফুসাফুসি করি তারা কহে এহি বাত।।
কেহ বোলে খছম মোর জেওর দেএ নাই।
কামাইর মধ্যে তাই পড়িলেক ছাই।।

কবির সতর্কবাণী—

আর এক কথা কহি শুন সব ভাই। যদি ভাই মনের কথা কবিলারে কবে।
মনের কথা না কহিবা কবিলার ঠাঁই। পশ্চাতে আফছোছ করি ভাবিয়া মরিবে।

গরীবল্লাহ সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন।

'ইবলিসনামা' রচয়িতা মুনশী গরীবুল্লাহ বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি। ইবলিসনামা ১২৬৪ সালে বা ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬. মালে মোহাম্মদ

কবি মালে মোহাম্মদ তিনখানা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল নামের রোমান্সের রচয়িতা। ইনিও দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী। তাঁর গ্রন্থ তিনটের নাম ১. তম্বিয়াতুন নেছা (তানবিহুন নেসা) প্রকাশকাল ১২৭৩ বাং বা ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ ২. আহকামুলজুমা রচনাকাল ১২৬৩ বাং বা ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে এবং ৩. সেরাতুল মুমেনীন প্রকাশকাল ১২৯৬ বাং বা ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং কবি উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে শেষপাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তম্বিয়তুন্নেসায় নারীব কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে কবির উক্তি--

'আমি অতি মুরুক্ষমতি কি জানি সায়রি। এ লাগি কহিত আছি বাঙ্গালা বয়ানী।।
কিভাব ভাঙ্গিয়া বঙ্গে করিতে তৈয়ারী।। মালে মোহাম্মদ আমি অধীন ফকির।
দেখিলুঁ বাঙ্গালা দেশে বড়হি ফছাদ। আহাম্মদ নাদান আমি কিজানি সাইর।।
আওরত মরদে নিতি করএ বিবাদ।। দেখিএ বাঙ্গালা দেশ বড় গোলমাল।
আল্লার হুকুমে নারী করে নাফরমানী। বেপরদা আওরত লোক চলে বদ চাল।।
দীনের খাতেরে দিলু করিয়া তৈয়ারী।।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামালের শুরু—

এই পুথি সায়ের ছিল আগু জামানার। তেকারণে অধিন করে চলিছ বাঙ্গালা।।
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হৈল তৈয়ার।। রসিক লোকের দেখে বহুত কাগতি।
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কছেল্লা। বার শত পয়ত্রিশ সালে লেখি এই পুথি

দেওনীর নাচ—'একথা কহিয়া দেওনী লাগিল নাচিতে

বড় বড় হাতীর মাথা গলে দিল গাইথে।। ঠাটী বিজলী যেমন সাজ মেঘ মাজে।।
বানাইয়া পাঠের ছালা পিন্দেয়া সে সাড়ি হাতী মাথার ঢুসাঢুসি ঠন ঠন বাজে।
নাচিতে লাগিল দেওনী উভে ফাল পাড়ি।। তারপরে গীত গায় রসের দেওয়ানী।
হাতীর চিকড়ি যেন এমন চেচানী।।

বদিউজ্জামালের বারমাসী—

বৈশাখ মাসেতে ফুল ফুটে নানা রাশি ভোমরায় খায় মধু ফুল মাঝে বসি।।
ভোমরার গুনগুনে দগদে পরাণ আমার ফুলের মধু কে করিবে পান।।
শ্রাবণ মাসেতে পানি উথলে সাগরে খাল নালা চলাচল জোয়ারের তোরে।।
অভাগীর যৌবন জোয়ার হৈল কেমন পতি বিনে সে জোয়ার না হবে বাড়ন।।

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল কাহিনী প্রণয়োপাখ্যান অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৭. আবদুল মজিদ খোন্দকার।

আবদুল মজিদ খোন্দকার ১২৮৮ সালে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীঃ প্রসিদ্ধ দরবেশ 'সুলতান বলখী'র কাহিনী রচনা করেন। এটা আমীর খসরুর উক্ত নামধেয় ফারসিগ্রন্থের উর্দু অনুবাদের স্বাধীন বঙ্গানুবাদ। কবি বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। সে পরিচয় যেমনি দীর্ঘ তেমনি কাল্পনিক। অতি বিখ্যাত চিশতিয়া পীর খান্দানে কবির জন্ম। তাঁর আরো পাঁচটি ভাই ছিল। কবির নিবাস সাহজাদপুর। গ্রন্থোপত্তি এইরূপ ঃ

ফারসি জোবানে ছিল এই যে রেছালা। আমাকে কহেন তিনি শুন চাচা জান।
ফারসি ভাঙ্গিয়া আমি করিনু বাঙ্গালা।। সোলতানের পুথি আপে করেন বয়ান।।
আমার দামান্দ এক আহম্মদ নাম। বহুত খাহেস লোগে পুথির করিবে।
তাহার খায়েসে পুথি করিনু আঞ্জাম।। ইয়াদগারি পুথি খান হামেসা রহিবে।।

পুথিখানির প্রকাশক আবদুল গফুর সিদ্দিকীর পিতা গোলাম মওলা। সুলতান বলখী উচুঁদরের সূফী সাধক ছিলেন। কবি আবদুল মজিদের হাতে তিনি অলৌকিক শক্তিধর কাফের-ত্রাস দিগ্বিজয়ী বীররূপে চিত্রিত হয়েছেন। রচনার নমুনা—

'ফুলের শয্যাতে শাহা করেন শয়ন। ছাতিতে তুলিয়া পাঙ দাবে কুতুহলে।
স্তনেতে পায়ের তালু দাবে নারীগণ। সেই যে লোমের খাও লাগে পদতলে।।
আল্লার করুনি এক নারীর শরীরে। পায়েতে পাইয়া দুখ হইল পীড়িত।
একগাছি চুল ছিল স্তনের উপরে।। নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে আচম্বিত।।

তারপর 'ক্রোধে অগ্নিবরাবর' হয়ে অপরাধী দাসীর 'তলওয়ার মারিয়া স্তন কাটিয়া ডালিল।' এতে দাসী কান্নার পরিবর্তে হেসে উঠল। বিস্মিত বাদশা কারণ জিজ্ঞাসা করলে দাসী বলে—

কাকতি করিলাম কত চরণে তোমার। যে জন আরাম এত করে হামেসায়।।
অপরাধ ক্ষমা নাহি করিলা আমার।। তাঁহার কপালে কিবা করেন এলাহি।
এই জন্য হাসি আমি শোন মহাশয়।

দাসীর কথায় চৈতন্যোদয় হল সুলতানের। তিনি মুর্শিদের নির্দেশে রাজ্য ছেড়ে বারো বছর কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তারপর বিবাগী হয়ে দেশে দেশে ইসলাম প্রচারে হন রত। এ ব্যাপারে তাঁকে দেও-দানু-জীন ও মনুষ্য-রাজার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে জয়ী হতে হয়। পীরের আদেশে তিনি হিন্দুস্তানে যান ঃ

হিস্বা সন্দীপ তারে কহে তো হিন্দুতে। বেহেস্ত সোমান জাগা সেহি ত সহর॥
মুকুতা মানিক সেথা জন্মে নানা মতে॥ সারি সারি বৃক্ষ আছে ফুল মধু ভরা।
আগর চন্দন আর পুষ্প মনোহর। কুকিল সুনাদ করে গুঞ্জরে ভ্রমরা॥
মউরে পেখোম ধরে নাচে তো সুন্দর।
সুস্বরে মধুর গীত গায় তো কিন্নর॥

এখানে বহু রাজাকে পরাস্ত করে বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করার পর হিন্দুস্তানের অপর শক্তিধর রাজা পৌষরামের (পরশুরামের) সঙ্গে তাঁর ভীষণ লড়াই বাধে। এ যুদ্ধে সুলতানের নিত্যসঙ্গী ছিলেন বদর। অবশেষে—

'দেউল দেহারা তুড়ে কৈলো ছারখার। ঠাঞি ঠাঞি মছজেদ কতো করিলা নির্মাণ॥
না রাখিল আমূল হিন্দুর দেবতার॥ ঘরে ঘরে ঠাঞি ঠাঞি নামাজের কাম।
দেবালয়ে ভাঙ্গি সব বলখী সুলতান। ওলিফা পড়েন আর পড়েন কালাম।

এটিও রসুল-হানিফা-হামজার দিগ্বিজয় ও ইসলামপ্রচার শ্রেণীর গ্রন্থ। এসব কাহিনী রচয়িতাদের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছিল তুর্কি-মুঘলের বঙ্গ তথা ভারতবিজয় ও ইসলামের প্রসার কাহিনী।

৮. মুহম্মদ মতীন

বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে গোদাগ্রামবাসী মুহম্মদ মতীন (বা আবদুল মতীন) একটি অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পুথির লিপিকাল ১২৪৪ সাল। গ্রন্থটির নাম 'ইসলাম নবী কেচ্ছা'। এতে কর্ণ ইসলামরূপে এবং বিষ্ণু নবীরূপে কবিওয়ালাদের মতো তর্কে বিতর্কে তত্ত্ব কথা ব্যক্ত করেছেন। মনে হয় কাব্যটি উনিশ শতকের প্রথম পাদে রচিত হয়েছিল। উক্ত পুথির সঙ্গে শরীয়তের বিধিনিষেধমূলক অপর একটি পুস্তিকাও রয়েছে। রচনার নিদর্শন—

'কাঙ্গালের আরজ মালুম যে তোমাএ।
রুটি যে তৈয়ার হল ছাহেবের দোওাএ॥
করিলেন গমন নবী রাহের উপরে॥
মতীনে রচিল কেচ্ছা আশা নবীর পাএ।
চড়িনু সবুরের নাএ কাণ্ডারী খোদাএ॥
সঙ্গেতে লইলেন নবী জোমেরা নফরে।
একে শুনিলেন যখন ইসলামের বাণী।
না করেন বিলম্ব ছাহেব চলেন আপনি॥
আষা বাড়ি হাতে নিলেন খড়ম দেন পাএ।
কেরামতের জুব্বা নিলেন দিস্তার মাথাএ॥

(ডঃ সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি)।

৯. মুহম্মদ দানেশ

হাতেমতাই, চাহার দরবেশ (১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত), গোল-ব সানুয়ার বা গুল ও সনোবর (মুদ্রণকাল ১৮৫৭ খ্রীঃ) এবং নুর-উল-ইমান (মুদ্রণকাল ১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ) রচয়িতা মুহম্মদ দানেশ হাওড়ার শিবপুরবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রফিক মোল্লা।

'শিবপুর ঘর মেরা শুন হোসমন্দ।
রফি মোল্লার আমি প্রথম ফরজন্দ॥

মুহম্মদ দানেশ বটতলার অন্যতম জনপ্রিয় শায়ের। তাঁর চাহার দরবেশ প্রখ্যাত পুথি। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ফারসি অনুবাদের বঙ্গানুবাদক মুহম্মদ দানিশ ভিন্ন ব্যক্তি, তাঁর নিবাস চট্টগ্রামে। গ্রন্থের নাম 'জ্ঞানবসন্তবাণী'। কবির রচনায় আলাওলের প্রভাব আছে। তিনি আঠারো শতকের লোক। তাঁর সম্বন্ধে অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। রাগমালা ও পদাবলী রচয়িতা এবং মুকিমের গুলেবকাউলীতে উল্লেখিত চট্টগ্রামের দানিশ কাজী আর মুহম্মদ দানিশ দুই ব্যক্তি।

১০. জনাব আলী

বহুগ্রন্থ প্রণেতা কবি জনাব আলী পশ্চিমবঙ্গের লোক। হুগলীর ধ্বসা গ্রামে ছিল তাঁর নিবাস, ধর্মোপদেশে পূর্ণ এ গ্রন্থ। নামাজ-রোজার কথাই বেশি বিবৃত হয়েছে। নাম বোধ হয় নামাজনামা বা নামাজের কথা। কবি ভণিতায় প্রায় সর্বত্র স্বগ্রামের নামও যুক্ত করেছেন। যথা :

১. কহে হীন জোনাব আলী ভাবিয়া গফফার। ধসা গেরামের মাঝে বসতি আমার॥
২. কহে হীন জোনাব আলী ভারিয়া সোবহান। ধসা গেরামের বিচে যাহার মোকাম॥

রচনার নমুনা—

তেরোতে মুস্কিলের সময় পড়িলে।
দোসরার মদদ না চাবে কোন কালে॥
বিপদের কালে নিকটে দোসরার।
মদত চাহিলে ফের হইবে কাফের॥

কবির অপর রচনা জঙ্গনামার প্রকাশকাল ১২৬৮ বাঙলা সন বা ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর জঙ্গনামায় কারবালা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জঙ্গে খয়বর—প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। জঙ্গে খয়বরে বর্ণিত হয়েছে রসুলের উক্ত নামীয় যুদ্ধবৃত্তান্ত। উক্ত দু'খানি ছাড়া কবির অপরাপর গ্রন্থ হচ্ছে তাজকেরাতুল আওলিয়া, মজমুয়ে ফতুহ্শাম, ফজলিয়তে দরূদ এবং জিয়ারতে কবর। তাজকেরাতুল আওলিয়া থেকে একটু নমুনা দিচ্ছি ঃ

আজকাল দাগাবাজ ফকিরেরা ঢের।
মারফত পাইবে কিসে শরীয়ত ছাড়িলে।

ঠাঞি ঠাঞি যথা তথা হতেছে জাহের॥
শরীয়তের বরখেলাফ করিয়া বেড়ায়।
মারফতী ফকির আমি বলি সে সবায়॥
কেতাব কোরানে যাহা না আছে দলীলে॥
ওয়াকিব হইয়া হাল আওলিয়া লোকের।
লাঠি মার মাথে দাগাবাজ ফকিরের॥

১১. মুহম্মদ খাতের

হাওড়া জেলার বালিয়া পরগনার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে কবি মুহম্মদ খাতেরের জন্ম ১২৪৬ সালে (১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে) এবং ১২৯৬ সালে (১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বারোখানি গ্রন্থ প্রণেতা। যথা ১. শাহনামা ১২৮২ সাল ২. একশতত্রিশ ফরজ ১২৮৬ সাল ৩. লাইলীমজনু ১২৭১ সাল ৪. মৃগাবতী যামিনীভান ৫. বনবিবি-জহুরানামা এবং ৬. কাসাসুল আম্বিয়া ৭. তুতি নামা ৮. আখবারুল জুমা ৯. গুল ও হরমুজ ১০. সওয়াল ও জওয়াব ১১. মেরাজ নামা। ১২. জঙ্গে সোহরাব।

এগুলোর মধ্যে—একশত ত্রিশ ফরজ—নিত্য পালনীয় শরীয়ত কথা। লাইলীমজনু, মৃগাবতী-যামিনীভান, গুল ও হরমুজ এবং শাহনামা উপাখ্যানকাব্য, কাসাসুল আম্বিয়া, আওলিয়া কাহিনী, বনবিবি-জহুরানামা হচ্ছে পীরমাহাত্ম্য জ্ঞাপক পাঁচালী। পীরনারায়ণ সত্য, দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর লীলা সম্পৃক্ত কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। রচনার নমুনা—
কাসাসুল আম্বিয়া—'পাহাড়েতে আছহাব কাহাফের তরে।

ফেরেস্তা রাখিল আল্লা মোকরর করে॥
তাদিগে শোয়াবে তারা করট করিয়া।,
হামেশা ডাহিনে বামে দিবে ফিরাইয়া॥
বেহেস্তের পাংখা হতে হাওয়া বহে গায়।
গর্মি আর সর্দি সেথা না লাগে কাহায়॥
আল্লার কুদ্রত হতে সেই মকানের।
রৌদ্র না উপরে আসে কেতাবে জেকের॥

সোহ্‌রাব নিধনে রুস্তমের বাপের শোক ঃ
শুনিয়া এয়াছাই বাত পাহওয়ান
হায় বলে গিরে গেল হইয়া বেহাল।
কেমন ছোহারাব নাহি দেখিনু নয়নে
এই দুঃখ রহিবে হাসর তক মনে।

রুস্তমের মায়ের শোক ঃ
'হায় বলে জারি করে ছেরে মারে যা।
গড়াগড়ি যায় বিবি করিয়া রোদন।
এই কি আছিল লেখা কপালে আমার
দেখিতে হইল চক্ষে মওত পোতার॥

এদিকে সোহ্‌রাবের মা ঃ
গোস্বা ভরে চলে বিবি হইয়া সওয়ার॥
কহে আমি নিজে গিয়া করিব লড়াই।
লইব বেটার দাদ রুস্তমের ঠাই॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঃ
'তাহমিনা রোস্তমে দোহতে মিলিয়া।
খুসিতে গোজরান করে হইয়া কারার॥
এবং—ছুরাত জামাল এক বেটা ফের হৈল
এবং ফারামর্জ বলিয়া রাখিল তার নাম।

কবি বলেছেন—
'রোস্তমের পুরা জঙ্গ যে চাহ শুনিতে।
বড় শাহানামা লেহ পাইবে দেখিতে।

১২. আবদুল গণি

কবি আবদুল গণি রচিত 'ফকির বিলাস' ১৩৫৬ সালে মুদ্রিত। কবির কোন আত্মপরিচয় পুথিতে নেই। স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধে গূঢ় ও গভীর আলোচনা রয়েছে এ পুথিতে। নমুনা ঃ
পীর মুরিদের এবে সত্তাল জওাব।
আবদুল গনি লিখে মাফিক কেতাব।
প্রশ্ন—'মুরিদ কহেন পীর বুঝাইয়া বল।
নদীতে নাহি ছিল যবে পানি সে মুক্তাতে
গাছ যবে নাহি ছিল ফলকে যে তার।।
গায়েবেতে রেখেছিল অপে করতার।

ফুল কে হইল গুরু বিচি কে হইল। সংসার না ছিল যবে নাম ওজিফাতে।।
ফুল যবে নাহি ছিল বাস কোথা ছিল। ধেয়ান করিয়া বাবা বুঝহ দেলেতে।।
দরিয়া না ছিল যবে কোথা ছিল পানি। গরু যবে নাহি ছিল দুর্বায় দুধ ছিল।
উত্তর—ফুল যবে না ছিল গন্ধ আছিল বিচেতে। দেহ নাহি ছিল শব্দ শূন্যেত আছিল।

১৩. বুরহানউল্লাহ

রংপুরের কবি বুরহানউল্লাহ সম্ভবত আঠারো শতকে 'কেয়ামত নামা' রচনা করেন, তাঁর পুথির লিপিকাল ১১৫৪ সাল [১৭৪৭ খ্রীঃ]।

কবির পীর ছিলেন ঃ

মহাগুণবান শেখ দিদার মামুদ। কহে কবি ব্রানউল্যা শুন ধনিগণ।
তাহাব কৃপায় পাই পবম সম্পদ।। মন্দ কর্ম্মেতে ধন নষ্ট না কর কদাচন।।

ভণিতায় কবির নাম—ব্রানাউল্লা বা ব্রানউল্যা ব্যবহৃত হয়েছে—

এঁর আরো দু'তিনটে গ্রন্থ রয়েছে। এর কাব্য 'অবধূতরাজার জঙ্গ' ১৩০০ বঙ্গাব্দে বা ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত। কেয়ামতনামাও সম্ভবত এর রচনা।

১৪. মুহম্মদ ইসমাইল

জনমুরিদ-চওদা উজির—কয়েকটি উপদেশমূলক গল্প একটি কাহিনী সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। 'এমন' দেশের বাদশাজাদা চারি বেদ চৌদা শাস্ত্র তামাম শিখে এবং 'সতরঞ্জ গঞ্জিকা চৌপড় পঁচিসা' খেলা ছেড়ে যখন কৈশোরে পদার্পণ করল,

তখন ওস্তাদ দেখে পুথি বিচারিয়া। সাহাজাদার রাশি গুণে নক্ষত্র দেখিয়া
দেখে ভারি কুছায়েত কুমার উপর। প্রাণে বাঁচা দায় তার চৌদা দিন ভিতর।।

তাই ওস্তাদ বললেন—

শুন কহি তত্ত্বতার ওগো রাজনন্দন। গলে ছুড়ি চলে যদি তবু না বলিবা।।
চৌদা দিন কারো সঙ্গে কথা না কহিবা। মম বাক্য না শুনিয়া যদি কথা কহ।
নিশ্চয় মরিবে তুমি শুনাই বারতা।।

গুরুজন বা হিতাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ না শুনলে কি ক্ষতি হয়, তার প্রমাণ স্বরূপ হাঁসের বন্ধু কচ্ছপের উড়বার বয়ান এবং বাঁদরের নিধন হবার নকল (কেচ্ছা) বর্ণিত হল। রাজকুমারের বিপদ এসেছিল মহল থেকেই। বাদশার পিয়ারা বাঁদী জরনেগার—

'চাঁদের মতন/রূপ, যেমন সূর্যের ধূপ/জওয়ানি বাহার অতি তার।
মৃগের নয়ন হেন/ভুরু যেমন কামান/মনবান্ধা আছিল সাহার।।

এই জরনেগার সাহজাদার পিতাকে ছেড়ে সাহাজাদাকেই ভালোবেসেছে।

কহি শুন সাহাজাদা তোমার কারণ। হরদম খেদমতে তেরা থাকিব দাসী হইয়া
দুধের বালক তুমি আছিলে যখন।। সাহেবকে (রাজাকে) মারিব শেষে বিষ পেলাইয়া।
সেই হইতে হৈনু আমি আসক তোমার।
প্রেমাগুণে পুড়ি আমি হইনু কাবাব। তক্তভাজ যত কিছু সব তেরা হবে।
জানন ঠাণ্ডা কর মোর মিলিয়া সেতাব।। অঙ্গের বস্ত্র ও ইজার বন্দ খুলিয়া।
কুমারের কোলে রাড় বসিল যাইয়া।।

বিমাতা সদৃশ জরনেগারের প্রস্তাবে শাহাজাদা রাজি হতে পারেনি। প্রত্যাখ্যাত রুষ্টা জেরনেগার তার বিরুদ্ধে রাজার কাছে মিথ্যা নালিশ করে। স্বয়ং বাদশা ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত

করলে এক এক করে চৌদ্দদিনে চৌদ্দজন উজির চৌদ্দটি গল্প বলেছেন। ওস্তাদের পূর্বোক্ত দুটো শুদ্ধ মোট ষোলটি গল্প। অবশেষে জরনেগারের ছলনা ধরা পড়ল, হত্যা করা হল তাকে। কবির শক্তি-সামর্থ্যের কোন পরিচয় নেই বইতে। কবির পরিচয় এইমাত্র আছে—

কেচ্ছা জনমুরিদের শোনাই সবের খাতের — বসবাস সিবদাহ ধাম।
দোত্তা দিবে খাতেরে আমার। — ষ্টেশনের উত্তরে গ্যাস ঘরের দক্ষিণ ধারে
হীন এসমাইল ভণে সেবি গুরুর চরণে — আছে মেরা কদ্দিমি মোকাম।

পুথির রচনা কাল উল্লেখ নেই। বিশ শতকের প্রথমপাদে রচিত হওয়াই সম্ভব।

১৫. মুনসী আশরাফ খাঁ ও আবেদ আলী খাঁ

'ছহি বড় মউতনামা ও আজাবল কবর' প্রথমাংশের রচয়িতা মুনশী আশরাফ আলী খাঁ এবং শেষাংশের কবি মুনশী আবেদ আলী খাঁ। মৃত্যুর এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের ও পরের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রদর্শিত হয়েছে মুমীনের মৃত্যু, পাপীর মৃত্যু, কাফেরের মৃত্যুকালীন অবস্থাভেদও। প্রথম খণ্ড আজাবল কবর রচয়িতা আশরাফ খানের কোন পরিচয় পুথিতে নেই। রচনা তারিখও নেই। রচনার মূলে রয়েছে ঃ

'মৌলবী নাজের যেই নামে বড়া নামি। — সাহাদত আঙ্গুল মেরা বচনে তাহার।
কড়ায়া বিচেতে যার মোকাম কাদিমি।। — ধরিল কলম জান কাগজ উপর।।
কোরান হাদিছ হইতে চুনিয়া চুনিয়া। — নাপাক আশরফ বলে যে হবে মমিন।
তরজমা করিয়া দিল মেহের করিয়া।। — হাদিছের মানে শুনে করিবে একিন।।

দ্বিতীয় খণ্ড—'মওতনামা' আবেদ আলীর রচনা। শেষে দুটো স্বরচিত (?) বাউল গান দিয়েছেন। একটার দুটো পংক্তি এই—

মন জাগলে মনের মানুষ থাকবে তোর মনে
প্রেমসাগরে খুঁজে তারে লে ধনি চিনে।

এঁরও কোন পরিচয় পুথিতে নেই।

তেরশও পনর সাল চলে বাঙ্গালার। — আবেদের আল্লা নবী বিনে নাহি গতি।
২রা আশ্বিন মাহা রোজ জুম্মাবার। — এই তক হল লেখা করিলাম ইতি।।

অতএব রচনাকাল ১৩১৫ বাঙলা সাল তথা ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ।

১৬. মুনসী আজিমউদ্দীন

'আসকনামা' নামের এই পুথিতে একটি খাঁটি এবং দুটো ঝুটা ভালবাসার গল্প দিয়ে কবি মানুষকে মিথ্যা মায়া মোহ লোভ থেকে সাবধান থাকবার জন্যে তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন। কবির মনে কবিত্বের স্পর্শ আছে। ত্রিশ পৃষ্ঠার বই হিন্দি থেকে কবি বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং তাঁর মুরশিদের নাম শাহ কেরামত আলী। এছাড়া কবির কোন পরিচয় গ্রন্থে নেই। রচনাকালও জানা গেল না।

এস্কনামা কেতাব যা আছিল হিন্দিতে। — সাহা কেরামত আলি মুরসিদ যাহার।
খাহেস হইল মেরা বাঙ্গালা করিতে। — মাকড়ার জালে যেয়ছা মাক্ষি হয় বন্দ।
আমি অতি মুর্খ মতি না জানি সায়ের। — এস্কের জালেতে যেয়ছা তেয়ছা সবে আছে বন্দ
এড়াইতে না পারিয়া খাহেস লোকের। — পায়রার নর খুসি মাদিকে পাইলে।
চলিত বাঙ্গালা ভাষায় করিনু জাহির। — মউর হাজার কুসি মউরি মিলিলে
ভুলচুক মাফ মেরা করিবে তক্‌দীর। — আসকের বড় খুসি পাইলে মাসুক।
কহে হীন আজিমদ্দিন ভাবিয়া গফ্যার।

তারপর কবি যথার্থ মাশুকের একটি গল্প বর্ণনা করেছেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে মৌলবীর ছেলের প্রেম হল, মিলনে রয়েছে সামাজিক বাধা, মৃত্যু ছাড়া ব্যবধান ঘুচবার নয়, তা-ই হল। জসীমউদ্দিনের দুলী-সোজনবাদিয়ার মতোই আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃত প্রেমিক-প্রেমিকাকে নদীতে ভাসমান দেখা গেল।

হিন্দুস্তানে ছিল এক ব্রাহ্মণের বেটী।
নবীন বয়সরূপ অতি পরিপাটি॥
ছুরাত আছিল কাচা সোনার বরণ।
আন্দার ঘরেতে যেন চেরাগ রওশন॥
আওরত মরদ যেয়ছা মিলনের কালে।
ছুরতের হদ্দ তার লিখিতে না পারি।
সরমে মরিত, রৈলে জোলেখা সুন্দরী।
রূপ এয়ছা দিয়া ছিল জোলেখা সুন্দরী।
দেখিলে ইউসুফ নবি হইত দেওনা॥
তেয়ছাই মিলিয়া ছিল ডুবে তারা জলে॥

দ্বিতীয় গল্পটি এরূপ ঃ আরবের এক বাদশা। তিনি 'হেম্মতে হাতেমতাই জোরেতে রোস্তম।' আর 'বেটি এক ছিল তার রূপে মনুহার।' এর প্রেমে পড়ল এক ছাত্র।

তালেবেলেম ছিল এক মোক্তব খানেতে।
সেই ওক্তে সেহ গিয়া ছিল বাগেতে॥
ফুলের বাহারি দেখে খোসাল অন্তর।
নজর পরিল তার বিবির উপর।
ছুরতের নদীতে আসিয়া ছিল বান।
তাহাতে ডুবিল আসকের দেলজান॥
বিবিকে দেখিয়া মর্দ আসকে অস্থির।
তথায় গিরিল সেই হইয়া বেহোস॥
বিবি বলে দেখ দাসী নজর করিয়া।
পুরুষ পড়িল মারা আমার লাগিয়া॥

হুঁস হওয়ার পরে বাদশাজাদী প্রেমিক ছাত্রটিকে বলল---

শুন মিয়া তালবেলেম তোমাকে বুঝাই।
গরীব বেচারা তুমি দুনিয়াতে ভাই॥
এক অক্তে নিয়ামত যাহা খাই আমি।
জেন্দেগি ভরিয়া তাহা না দেখেছ তুমি॥
চাটির বিছওনা পরে তুমি থাক ভাই।
ফুলের শয্যাতে আমি শুয়ে নিন্দ যাই॥
মোন জোগাইতে মেরা না পারিবে তুমি।
'কাহেকো আমারে লিয়ে হবে পেরেসানি।

তবে---

এক লাখ দিই তুঝে সোনার মোহর।
ঘরে গিয়া সাদী তুমি কর বেরাদর॥
একথা শুনিয়া মর্দ হইয়া খোসাল।
দেলে থেকে উঠাইল বিবির খিয়াল॥
অমনি রাজকন্যা বলল—
নাদান তোমার মতো কভু দেখি নাই।
আমার সঙ্গেতে যদি রাখিতে মহব্বত।
খুসিতে বাদশাই তুমি করিতে আলবাত।
দৌলতের লোভে তুমি ভুলিলে মাশুক।
বড়ই বেকুফ তুই নাদান আসক॥

শাহাজাদি বলে তেরা আক্কেলেতে ছাই।

লাখ টাকা তো মিললই না, অধিকন্তু রাজকন্যার হুকুমে গাধার পিঠে চড়ে লাঞ্ছিত হল।
কাজেই- কহে হীন আজিমদ্দি এলাহি ভাবিয়া। আসক ছাদেকে মন রাখ মজাইয়া॥

আল্লাহকে প্রেম করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই কবি মানুষকে আল্লাহর প্রেমিক হবার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন। সম্ভবত পুথিখানি বিশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল। এঁর আর দুখানা গ্রন্থের নাম মজমুয়ে ফতুহশাম ও শরীয়তুল আইয়াম।

১৭. মোকাম্মেল খাঁ

মালু খাঁ ও রসন্নেসা পরস্পরকে ভালবাসে। বাড়ি ছেড়ে রসন্নেসা পালিয়ে আসে মালু খাঁর সঙ্গে এবং উভয়ের বিয়ে হয়। সত্যঘটনা নিয়ে এ পুথি লিখিত। ঘটনাস্থল বরিশাল, মালু খাঁ মুন্সী-মোল্লা শ্রেণীর লোক। গ্রাম্য পণ্ডিতদের মতো কূট প্রশ্নে ও প্রহেলিকা আলাপে আমোদ পায়

রসন্নেসার সঙ্গে। তার কূট প্রশ্ন ও প্রহেলিকা সম্বাদের মাধ্যমেই আলাপ ও প্রেম। পরস্পরের বিদ্যাবুদ্ধি যাচাই করবার জন্যে কৌতুকচ্ছলে উভয়ের মধ্যে যে সব উদ্ভট বিষয়ের সওয়াল জওয়াব সেগুলো এ পুথিতে বিধৃত হয়েছে। যেমন—

১. আজব এক মছলা আমি করি জিজ্ঞাসন।
কবুতরের পাও রাঙ্গা কিসের কারণ॥
২. আর এক ছওাল আমি করি যে তোমায়।
নারীলোকের মুখে কেন দাড়ি নাহি হয়।
৩. পুরুষের স্তনে কেন দুধ নাহি হয়।
৪. কত নুক্তামদ কোরানেতে হয়।

মালু খাঁর পুথি পূর্বেও ছিল। তাই কবি বলেছেন–
মালু খাঁর পুথিখানি/অতি রস মধুবাণী/মকাম্মেল লেখে পুনর্বার।

কবির আত্মপরিচয় ঃ

আমি হীন মোকাম্মেল অধীন লাচার
সৈলদা গ্রাম বিচে বসতি আমার।
মহকুমা পিরোজ জিলা বরিশালে
থানা মেরা নাজিরপুর আছে কালে কালে।
রাজ হংস বাবু মোর আছে কলিকাতায়
সবার হুজুরে এই মোকাম্মেল কয়।
ছোহ খাতা যত মেরা আছে পুস্তকেতে
দোষ ধরে মাফ দিবে খোদার ওয়াস্তে।
সন ১৩৩২ সাল ২০শে অগ্রহায়ণ
ছাপিয়া করিলাম সায় জানহ মমিন।

অন্যত্র—মোকামেল নাম মেরা বড় গোনাগার। কবিরাজি পেশা কিছু দিয়াছেন পরওার॥

১৮. আবু জদ জহিরুল হক

'মজনুর পাক রুহ প্রভু সখা ছিল।
বেহেস্তে যাইয়া লায়লীর সাথেতে মিলিল॥
এস্কে ছাদেক ছিল দুইজনার মন।
ছাদেক এস্কেতে সখা ছিল নিরঞ্জন।
আল্লার স্কেতে মন যে জন রাখিবে।
এইভাবে ভব-নদী পার হয়ে যাবে॥
লায়লী-মজনু তার প্রেমে রেখেছিল মন।
বেহেস্ত চলিয়া গেল তাহার কারণ॥

লায়লী-মজনুর প্রণয় কাহিনী বর্ণনা শেষে এই তত্ত্ব কথা শুনিয়েছেন কবি ইরানি সূফীরা বহু আগে থেকেই লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখা প্রভৃতি প্রণয়কাহিনীর আধ্যাত্মিক রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। আমাদেব কবি জহিরুল হক সেরূপ একটি ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। কবির পরিচয়—

'অধীন জহির কহে হুজুরের সবার।
সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বসতি আমার।
সাহাজাদপুর থানা নুকালি মোকাম।
খোন্দকার আইনদ্দিন মোর পিতার নাম।
গাঁথিলাম প্রেমমালা আমি বিনা সূতে।
লইয়া পড়িবে যত প্রেমিক গলেতে॥
তেরশত ত্রিশ সালে পহেলা আষাঢ়ে।
সমাপ্ত হইল পুথি রোজ শনিবারে॥

কবি নিতান্ত শক্তিহীন নন। ভাষায় তাঁর দখল আছে, পুথির কোথাও আড়ষ্টতার চিহ্ন নেই। পুথিখানি প্রায় বিশুদ্ধ বাঙলায় রচিত। এরূপ আরো অনেক পুথি রয়েছে যাতে দেখা যায় কবি উর্দু জানেন না, অথচ বটতলার রীতিতে পুথি লিখতে গিয়ে প্রথা রক্ষার খাতিরে কয়েকটা শব্দ বারবার প্রয়োগ করেছেন। রচনা কাল ১৩৩০ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।

১৯. শাহ আবদুর রহিম

এর রচিত মোহাম্মদী বেদতত্ত্ব—বিজ্ঞাপনে এর বিষয়বস্তুর ও গুণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া রয়েছে ঃ

মারফৎ হকীকত তরীকত আর
বাতুনের শরীয়ত আশক আল্লার।
আর যত ভেদ বাত আছে ফকারেতে॥
বহুত হয়েছে লিখা এহি কেতাবেতে॥
এস্কের মোজহাবে ইহা বড়ই মাকুল।
দলিলে কোরাণ আছে হাদীছ বছুল।
বহুত নজীর আছে আশকী কালাম।
মাসনবী দিওয়ানে যাহা আছেত মদাম।
পয়ার ত্রিপদী আর বাঙ্গালা গজল।
হইয়াছে এবারত রঙ্গিন সকল।
মোশাহেদা মোবারেকা মঞ্জিল মোকাম।
এবাদত্বন্দেগীর ভেদের কালাম।
আশেকী নামাজ রোজা হজ আর জাকাত।
ভেদের কলেমা খুব পশীদার বাত॥
কিচ্ছা ও কাহানী আদি মেছাল খাতিরে।
দোছরা জেলেদে আছে কেতাব আখিরে।
যে ছুরাতে পাওয়া যায় খোদার দিদার।
এহী কেতাবেতে মেলে সব সমাচার।

শাহ আবদুর রহিম রচিত এ মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থখানির নাম মোহাম্মদী বেদতত্ত্ব। 'বেদ' নামকরণেব পশ্চাতে দুর্বলতার আভাস আছে। দুই খণ্ডে বা জেলেদে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। দ্বিতীয় জেলেদে-(প্রথম জেলেদে বর্ণিত তত্ত্ব কথার উদাহরণ স্বরূপ ঃ

কিচ্ছা কাহানী আদি মেছাল খাতিরে।
দোছারা জেলেদে আছে কেতাব আখিরে॥

গ্রন্থে ফারসি দিওয়ান, রুবাই ও গজল এবং দোয়া, দরুদ ও সূরা বা আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। বটতলার প্রভাবে দোভাষীরীতি অনুসরণ করলেও রহিম সত্যই শক্তিমান লেখক। ধর্মবিষয়ক এই রচনায়ও তাঁর ভাষা প্রাঞ্জলতা এবং ছন্দের লালিত্য হারায়নি। একটু নমুনা—

মওছমে বাহার পেয়েছি দিদার আলির বাগান ভবে।
পাপারি রহিতে খামোশ থাকিতে ডাকিব কোকিল রবে।
কোন কোকিলারে কেহ না বাহারে খামোশ দেখিতে পায়।
আমি অতি হীন মওছমে অধীন ডাকিব দলের রায়॥
কোকিল সবার দলের হুরদার ডাকিয়াছে বহু তার।
আওয়াজেতে তেজ সিরাজী হাফেজ দেওয়ানাতে রয় যার॥
তিনিও বাহারে নীরব না ধরে ডাক ডাকিয়াছে।
এস্কের জোশেতে ডাকেন যেমতে দেখ হেথা আসিয়াছে॥

কবি নিজেও বলেন ঃ

'লিখিলাম কেচ্ছা যত এহি কেতাবেতে।
সবকথা লিখি নাই শুনি যে ছুরাতে॥
এবারত রঙ্গিনেতে বেশী লিখিয়াছি।
বেরঙ্গে বেমিল কথা কম করিয়াছি॥
দোছরা জেলকদ আজি আরব্বীমাহার
তেরশত দুই হিজরী রোজ জুম্মাবার॥
তামাম হইল লিখা খুতবার সময়।

১৩০২ হিজরীতে তথা ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রচনা সমাপ্ত হয়।

কবির কোন আত্মপরিচয় গ্রন্থে পাওয়া গেল না।

মুনশী আবদুর রহিম ও শাহ আবদুর রহিম একই ব্যক্তি হলে ইনিও এগারোখানা পুথি প্রণেতা ঃ দীলদেওয়ানা, রূপরাজচন্দ্রাবতী, সখাওয়াতনামা, গাজীর পুথি, বিলালনামা, নসিয়তুল খুবী, এস্কেসাদেক, গুলরওশন বিবির পুথি, মল্লিকা আকারবিবির পুথি, এবং শেখ ফরিদের পুথি।

২০. মুনশী আয়েজউদ্দীন আহমদ

গোল আন্দাম বা বায়ান্ন ছাপার নাচ একটি রোমান্স, বিশেষত্ব কিছুই নেই। নর্তকী ও নৃত্যের বর্ণনা আছে বলে পুথিতে কয়েকটি সংগীত সংযোজিত হয়েছে। হিন্দি গানও আছে।

ইরানের বাদশা আয়ুব। আর তাঁর উজির আজাহার। উভয়েই নিঃসন্তান। পরে বহু সাধ্যসাধনায় উভয়েই পুত্ররত্ন লাভ করলেন। বাদশাজাদার নাম ইউনুস আর উজিরজাদার নাম মাহজিবী। বাদশাজাদা যৌবনে প্রেমে পড়ল পরীজাদী গুল আন্দামের। পরী কি সহজে মেলে। রাজপুত্র দিওয়ানা হয়ে দেশ ছাড়ল, বন্ধু মাহজিবীকেও যেতে হল। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের নর্তকী লালপরী। তাকে ভালবাসল শাহজাদা। ইন্দ্রপরী রোকাম সহর শিরাজনগর প্রভৃতিতে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে বাদশাজাদা লালপরী ও গুল আন্দামকে লাভ করল। উজিরজাদাও ব্যর্থ হল না। সেও সুখী হল গোলফাম পরীকে পেয়ে। উভয়ে দেশে এসে উত্তরাধিকার সূত্রে সুখে বাদশাহী ও ওজারতী করতে থাকে। কিছুকাল পরে গোলামের সাঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের অপরাধে গুল আন্দাম বাদশা ইউনুসের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাগানবাড়িতেও একাকী জীবন কাটাতে লাগল।

কবি আয়েজুদ্দিন আহমদের রচনা বিশেষত্বহীন। একটু নমুনা দিচ্ছি। গুল আন্দামের রূপ—চৌদ্দ পনের সাল বিবির বয়েস।

পাও 'পরে গিরিয়াছে মস্তকের কেশ।।
এয়ছা বাহারের কেশ না হয় বয়ান।
ছলেতে বান্দিয়া লেয় আশেকের জান।।
যখন বান্দেন খোপা কেশ বিনাইয়া।
ভ্রমর ভ্রমরি বসে আমোদিত হইয়া
জমিন আছমানে যেয়ছা রওশন চাঁদের।
তেয়ছাই চটক আর আছিল মুখের।
সে মুখ দেখিলে মুনি হাত মারে ছেরে।
জপমালা ছাড়িয়া বিবির পায়ে গেরে।
একে মধুভরা ঠোঁট তাহে মিঠা কথা।
শুনিলে দেলেতে হয় আশেকের ব্যথা।।

একটি গানের কিয়দংশ—

ও সে মন রঞ্জণী
কটাক্ষেতে বধেপ্রাণ, প্রাণ সজনী।
সে মৃগ আঁখির ছলে প্রেমাশে ভুবন ভুলে
দেয় প্রাণে অগ্নি জ্বেলে চিত্তহারিণী।

কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকাল—

'শয়তানি দাগাতে পড়ে খোদাকে ভুলিয়া।
কেচ্ছাকে লিখিনু আমি মসগুল হইয়া।।
আখেরাতে কি হইবে না জানি খবর।
দাগাতে পড়িয়া গোনা করিনু বিস্তর।।
বার শও নব্বাই সাল কার্ত্তিক মাসেতে।
পাঁচই তারিখ বুধবার দিবসেতে।
সহর হুগলি জেলা হরিপালা খানা।
তাহার নিকটে আছে বালিগড় পরগনা।।
তাহার মধ্যেতে গ্রাম নামে তালপুর।
সেখানে আজিজখানা জানিবে হুজুর।
নামেতে গোরাই শেখ দাদাজির নাম।
বুজরগের বুজরগ তিনি বড় নেকনাম।।
শেখ কিনু বাবাজির এছমে শরীফ।
চাচাজির নাম মেরা ছিল শেখ তারিফ।
মুনশী তাজদ্দিন মহাম্মদ মরহুমের
সবদেশে নাম তার আছেত জাহের।
তেনার ভাতিজা মুনশী মনিরুদ্দিন নাম
খাহেস তাহার লিখি কেচ্ছা গোলান্দাম।।

অতএব, ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশক মুনশী মনিরুদ্দীনের আগ্রহে এ গ্রন্থ রচিত।

আয়েজউদ্দিনও বহুগ্রন্থ প্রণেতা, তাঁর রচিত পুথিগুলোর নাম ঃ সেকান্দরনামা, পরীবানু শাহজাদী, আলেফলায়লা (অংশ), সতীবিবির কিসসা, মালঞ্চকন্যা ও মুর্শিদনামা।

২১. মুহম্মদ আকবর আলী

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রচিত 'অতুলা সুন্দরী' একটি ক্ষুদ্র রোমান্স। মেরছিপুর শহরের বাদশা আর উজির উভয়েই একই দিনে পুত্ররত্ন লাভ করেন। বাদশাজাদার আর উজিরজাদার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। উভয়েই রূপবান—

'ছুরাত চান্দের মত ঝিকিমিকি করে। লাগিল এস্কের তীর আসিয়া বুকেতে।
নগরিয়া নারীগণ দেখিয়া দোহারে।। আসকে অবশ হৈয়া গিরে জমিনেতে।।

শাহজাদার যখন বিয়ের বয়েস হল ইসপাহানের রাজকন্যা অতুলা সুন্দরীর সঙ্গে হল তার বিয়ে। শাহজাদা নওয়াদর তার শ্বশুর ইস্পাহানের বাদশা থেকে মানুষকে 'কাকে' পরিণত করবার বিদ্যা শিখে নেয়। তারপর অতুলাসুন্দরীকে নিয়ে দেশে আসে। মন্ত্রীপুত্র অতুলাসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্যে উপায় সন্ধান করে। সে কৌশলে বাদশাজাদা নওয়াদর থেকে কাকবিদ্যা (কাকচোর খেলা) শিক্ষা করে বাদশাজাদাকেই কাক করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু রাজবধু সতী অতুলাকে কোন প্রকারেই সে বশ করতে পারল না। অতুলা একদিন স্নান করতে গিয়ে কাকরূপী স্বামীর সাক্ষাৎ পেয়ে বহুকষ্টে তাকে আবার মনুষ্য রূপ দান করে উজিরজাদা গিঠিকে রাখল পাঁঠা করে। আর—

রোজ রোজ মজরেতে সেই যে পাঠাঁরে।
দশটি পয়জার গুণে মারে তার ছেরে।।

রচনার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কবি রাজদরবারে কাকরূপী নওয়াদরের মুখে হরিশ্চন্দ্র রাজার কেচ্ছা বয়ান করিয়েছেন। কবির আত্মপরিচয়---

ময়মনসিংহ জিলা বিচে:/সদর মহকুমা আছে/থানা কোতওালি এলাকার।
বিজয়নগর গ্রাম বিচে/একটু ঠিকানা আছে/অধিনের বসতি সেখানে।
তেরশত চৌত্রিশ সালে/চান্দ জমাদিল আউয়ালে/পুথির তারিখ দিনু লিখে।
কেচ্ছা তামাম হইল/রোজ শনিবার ছিল/কার্ত্তিকের বারই তারিখে।।
আল্লা নবী ভেবে দেলে/আকবর আলী বলে তরাইয়া লিবে পাক সাঁই।

২২. কাজী আমিনুল হক

পাকিস্তানের পুথি রচয়িতা কাজী আমিনুল হক। কবি বলেন ঃ

'মৌলানা ইমামুদ্দিন মোর বাবাজানে।
চরণেতে চুম্বি শত মির্জাপুর সাকিনে।।
মাননীয় বিদ্যাবত্ত গোলাম আজম
লিখিবারে এই পুথি তাহার হুকুম।
জিন্নালীগ পাকিস্তানের বয়ান করিয়া।
তাই তারাতারি দেই কেতাব লিখিয়া।।
ইহাতে হয় লীগ যদি সামান্য প্রচার।
হামিদিয়া কুতুবখানা ঢাকা সহরেতে।
সত্বাধিকারী যিনি আছেন তাহাতে
পাকিস্তানের আন্দোলনে কিছু উপকার।।
পুথি শ্রোতা আর পাঠক ইহাতে
লীগ ও পাকিস্তানের অর্থ পারে বুঝিতে
হবে আনন্দিত দীনের অন্তর শতেক।

এতে সূচনা, জিন্নার পরিচয় মুসলিম লীগের বয়ান, পাকিস্তানের বয়ান ও শেষকথা--এ কয়টি সর্গ রয়েছে। এগুলো পল্লীর নিরক্ষর মানুষের কাছে রাজনীতিক প্রচারণার জন্যে রচিত রাজনীতিক সাহিত্য।

সমাপ্তি এরূপ ঃ পাকিস্তানে--

মিলিমিশি রহিবেন হিন্দু মুসলমানে।।
ভাতৃভাব হয়ে যাবে দেশের মাঝার।
দুঃখে সুখে সাথী হবে সকলে সবার
বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাকিস্তানে হবে।
সরকারী খরচেতে সকলে পড়িবে।
শাসন চলিবে আর গণতন্ত্র মতে।
যাহা কিছু হইবার হবে জন মতে।
স্বার্থবাদী ডিক্টেটার তথা না থাকিবে
সাম্য ন্যায় গণতন্ত্র গঠিত হইবে।
কাজি কহে পাকিস্তানের বিচেতে নিশ্চিত
সবার স্বার্থ ন্যায়ভাবে হইবে রক্ষিত
সমাপ্ত

আহকার কাজী মৌলবী আমিনুল হক সাং মির্জ্জাপুর জিলা চট্টগ্রাম ৪ঠা আষাঢ় ১৩৫৪ বাংলা।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খানও প্রচারণার্থ পাকিস্তাননামা পুথি বের করেছিলেন।

আমিনুল হক চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে দোভাষী রীতি অনুসরণ করতে পারেন নি। চেষ্টা সত্ত্বেও ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ বাঙলা রয়ে গেছে।

২৩. মোয়াজ্জম আলী

আমীর সদাগর ও ভেলুয়াসুন্দরী—তৈলঙ্গানগরে ভেলুয়ার নিবাস, পিতা মনুহর, মাতা ময়না। ভেলুয়ার সাত ভাই। ভেলুয়া সবার আদরের ধন। আমীর সদাগর বাণিজ্যে এসেছে তৈলঙ্গানগরে। শিকারে বের হয়ে সদাগর ভেলুয়ার পোষা কবুতরকে তীরবিদ্ধ করে। আহত কবুতরের জন্যে ভেলুয়া কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠল। অনুসন্ধানে জানা গেল আমীর সদাগরের তীরেই কবুতর আহত হয়েছে। সাতভাই গেল আমীর সদাগরকে শাস্তি দিতে। উভয় পক্ষ কথা কাটাকাটির পরে শুরু করে দিল যুদ্ধ।

ভেলুয়ার মা আমীরের পরিচয় নিয়ে জানল, সে তার ভগ্নীপুত্র। বোনের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিল উভয়ে হবে বৈবাহিকা। এখন সেকথা মনে পড়ল। ওয়াদা রক্ষার খাতিরে যোগ্য বর আমীরের হাতে সমর্পণ করল কন্যা ভেলুয়াসুন্দরীকে। ভোলা নামের এক দুর্বৃত্ত ভেলুয়াকে হরণ করে নিয়ে যায়। ভেলুয়াকে 'দুষ্ট ভোলায় হরি নিল কাউলি নগর'। আমীর তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ভেলুয়াকে উদ্ধার করে এবং সীতার ও খুল্লনার মতো ভেলুয়ার সতীত্বের পরীক্ষা হয়। সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীর সঙ্গে সুখে জীবনযাপন করতে থাকে ভেলুয়া।

কবির ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ বাঙলা, কিন্তু রুচি মার্জিত নয়। গ্রন্থের শেষ ভাগে কয়েকটি গান ও চাণক্য শ্লোক সংযোজিত হয়েছে। কবির বর্ণনাভঙ্গিও সুন্দর নয়। কবির ছন্দজ্ঞানও নেই।

২৪. সাহ সের আলী

কবির ও কাব্যের নাম অভিন্ন। ছহি সের আলী—পুথির এমন অদ্ভুত নামকরণ হল কেন বুঝলাম না। গ্রন্থখানা ইসলামি অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক। শরীয়ত-তরিকত-হকিকত-মারফত, আসক, মোকামমঞ্জিল, লতিফা প্রভৃতির তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিবৃত হয়েছে কোন কোন নবীর কাহিনীও। লেখকের রচনার একটু নমুনা—

যদি কেহ মোলাকাত চাহেত খোদার।
বিনে আশকেতে নাহি পাইবে দিদার।।
আশক মাশুক ভাই বলে কার তরে।
আশক সকল বান্দা মাশুক পরওাবে।
সে হবে ফকির তাবে এই মত চাই।
এস্কেব পেয়ালা পিয়ে ভুলিবে দুনিযাই।

পুথিতে কবি কোন আত্মপরিচয় দেননি। রচনাকাল জানা গেল না, বিশ শতকের তৃতীয় দশকের রচনা হওয়া সম্ভব।

২৫. এরাদৎ আলী

এঁর রচিত সূর্য উজাল বিবির আরম্ভ এরূপ ঃ

আল্লা আল্লা বল ভাই যত মুমিনগণ।
সূর্যউজাল বিবির কথা শুন দিয়া মন।।
সূর্য উজাল বিবি যদি সূর্য পানে চায়।
দেখিয়া আসমানের সূর্য সেই লজ্জা পায়।
সূর্য উজাল বিবির এয়ছাই অঙ্গ লাল।
আসমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লা হাল।।

একদিন হানিফা তার পঞ্চবিবির সাথে খেতে বসে কথা প্রসঙ্গে অন্যতম বিবি জৈগুনের মুখে সূর্যউজাল বিবির [সূর্যের মতো উজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত] রূপের কথা শুনে ফকিরের বেশে গৃহত্যাগ করেন তার উদ্দেশে। 'বারকোটেতে আছে বিবি সূর্যউজাল। হানিফা সেদেশে গেল এবং বীরত্ব ও পৌরুষ দেখিয়ে সূর্যউজালকে পত্নী রূপে লাভ করলেন। এভাবে তিনি আগেও পাঁচটি সুন্দরী লাভ করেছিলেন----

পহেলা করেছে সাদি মল্লিকা আকার। তারপরে করে সাদি বিবি সোনাভান।
তারপরে করে সাদি জৈগুন সুন্দর।। পবনকুমারী বিভা করে আপনার জোরে।
সমর্তবানে করে সাদি জোরে পাহালওয়ান। এই পঞ্চ বিবি দেখ হানিফার ঘরে।।

পুথিতে রচনাকাল বা কবির পরিচয় নেই। ভণিতা এরূপ ঃ

তামাম হইল পুথি উপরে হানিফার। এরাদত বলেন নাম লেহ না আল্লাহ।।

একুশ পৃষ্ঠার এ পুথিটি শুধু 'পয়ারে' রচিত।

ভণিতা বদল হয়ে এ পুথিটি মুনসী মোহাম্মদ বক্তার খাঁর নামেও বাজারে চালু রয়েছে। তবু মনে হয় রচয়িতা এরাদৎ আলী। কারণ এরাদৎ আলীর আরো পুথি রয়েছে বক্তার খাঁ ভুয়া পুথিকার। বক্তার খানের ভণিতাযুক্ত পুথি হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা ঢাকা থেকে ৩১-১০-৪০ ইং তাং মুদ্রিত। প্রকাশক আবদুল লতিফ আবদুল হামিদ চকবাজার কেতাবপট্টি, ঢাকা।

২৬. মনিরুদ্দিন

'সুলতান সুফিয়ান সাহে এমরান চন্দ্রবান' একটি প্রণয়োপাখ্যান। কবি নামপৃষ্ঠায় লিখেছেন— "প্রকাশ থাকে যে মুন্সী কমরুদ্দিন সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন,এই পুথিখানা আমি রচনা করিয়া তাঁহাকে ছাপিতে দিয়াছিলাম তিনি আমার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজের নামে ছাপিয়াছেন।" একথাগুলো পুথির শেষে পদ্যেও লিখিত রয়েছে। এরূপ প্রতারণা ও লেখাচুরি বটতলায় হর-হামেশাই ঘটেছে।

'লখব সহরে ছিল বাদশা সুফিয়ান।' আল্লার কাছে প্রার্থনা করে তিনি একটি পুত্ররত্ন পেলেন। জন্মের পর গণক বললো ঃ

গুণি বলে শুন সাহা এই বিবরণ। তোমা হতে ভাগ্য যশ হইবেক অতি।
হইবে আপনা পুত্র অতি বিচক্ষণ।। কিন্তু এক কষ্ট দেখি শুন নৃপবর।
পৃথিবীতে যত শাস্ত্র সাধিবে কুমার। বার বছরের যবে হইবে উস্বর।
চারি কুটে হইবেক বাদসাই মাদার। স্বর্গ অপসরি এক নয়ানে দেখিয়া।
চারিকন্যা বিবাহ করিবে মহামতি। দেওয়ানা হইয়া যাবে রাজ্য তেয়াগিয়া।।

রাজপুত্রের নাম এমরান। একপরী ভোজরাজকন্যা চন্দ্রবানের বেশ ধরে কুমারকে স্বপ্নে দর্শন দান করে। ফলে এমরান দিওয়ানা হয়ে গৃহত্যাগ করে। অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু সবকয়বারই অসাধ্য সাধন করে জয়ী হয় এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করে চার চার স্ত্রী নিয়ে পিতৃরাজ্যে সুখে রাজত্ব করতে থাকে। তার চার স্ত্রীর নাম নুরবানু, চন্দ্রবান, মাণিক্যকেশরী, ফুলমতী। রচনার নমুনা—

কন্যাদের সাজ ঃ

সুবর্ণ জড়িত চাঁদ মাণিক্যের খোপা। কানেতে পিপলপাত সুবর্ণের বালি
রতন গুথিয়া দিয়া সাজাইল খোপা।। লহরে ঝমকা শোনে কণ্ঠে চাপাকলি।
সিতায় সিন্দুর সিতি পাটি মল মল। বাহু যোগে বাজুবন্দ করেতে কাঙ্গণ।
কপালে তিলক ফোটা নয়ানে কাজল কমরে ছিকল শোভে ভুবন মোহন।
হাসলি হাসরা গলে রক্ত মুক্তাহার। চরণে নেপুর খাড়া মুকতা প্রবল।
নাসিকাতে গজমতি মদন ঝঙ্কার। পরনে সোনালিসাড়ি অঙ্গে ঝলমল।।

২. মনীর-মাহারুসুন্দরী—মুনসী মনিরুদ্দিন আলোচ্য মনীর-মাহারুসুন্দরী নামের প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা বলে দাবী কবছেন। তিনি নিজেই কমরুদ্দিন মুন্সীর বিরুদ্ধে পাঠক সমাজে জালিয়াতির অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু এ পুথির সর্বত্র অধীন বা অধীন গরীবের ভণিতা

পাচ্ছি। এ গরীবুল্লাহ সম্ভবত 'দিলারাম' ও 'নেকবিবির বয়ান' রচয়িতা ঢাকাশহর নিবাসী গরীবুল্লাহ বেপারী। কবি মনিরুদ্দিন বিনয়বশে অধীন ও অধীনগরীব বলে আত্ম পরিচয় দিলেন কিংবা গরীবুল্লাহর পুথিই স্বনামে চালালেন, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না।

২৭. মুহম্মদ মুন্‌শী

আলী ও দেলবাহারের কেচ্ছা এ প্রণয়কাহিনীটি একটি রূপক ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আজমশহরে সুলতান আজম নামে এক বাদশা ছিলেন। তাঁর দুটো বেগম। উভয়েই নিঃসন্তান। আল্লাহর হুকুমে মাদার গাজী ফকিরের কাছ থেকে বাদশাহ এক মন্ত্রপূত ফল পেলেন। ছোট বেগমকে না দিয়ে বড় বেগম গোটাফলটি নিজেই খেয়ে ফেলে। হিংসা করার কারণে সে গর্ভবতী হল না, অথচ উক্ত ফলের ছাল খেয়ে ছোট বেগম গর্ভবতী হল। ফলে তার আলি ও দেলবাহার নামে দুটো সন্তান হয়।

বয়োপ্রাপ্ত হয়ে শাহজাদাদ্বয় দেশান্তরে চলে যায়। সেখানে নানা বিপদাপদ উত্তীর্ণ হয়ে নানা দুঃসাহসিক কার্য ও অসাধ্যসাধন করে, রাজকন্যা বিয়ে করে দেশে ফিরে আসে এবং বিমাতার 'গর্দান মেরে' মাতার প্রতি জুলুমের প্রতিশোধ নেয়। নিতান্ত বাজে রচনা। পুথির ভাষাকে বিকৃত উর্দু বলা চলে। পুথিতে দু'চারটি গানও আছে। একটি ভণিতা–

মহাম্মদ মুন্সী কহে পয়ারে রচিয়া :

২. উম্বর উম্মিয়ার নকল ও ভোজের বাজী–এটি মোহাম্মদ মুন্সীর দ্বিতীয় কেচ্ছার পুথি।

'নৌসেরোঙা মদিনাতে করেন বাদসাই। সাত মুল্লুকের বিচে ফেরেন দোহাই।

এই বাদশা নওশেরঙাকে কেন্দ্র করেই নায়ক উমর উম্মিয়া ও আমীর হামজার কতগুলো অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা এই পুথিতে বর্ণিত হয়েছে। আরব্য উপন্যাসের হারুন অর রসিদ আর ভারতের ভোজরাজ ও উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এশিয়ার উপকথার উৎসস্বরূপ।

এই পুথির প্রারম্ভে কবি পূর্বসূরী শাহ গরীবউল্লাহ ও সৈয়দ হামজা রচিত দস্তানে আমীর হামজার উল্লেখ করেছেন :

ছৈয়েদ হামজা আর সাহা গরিবুল্লা
এদোনো শায়ের ছিল আলম উজালা।
যতদূর গেছে ভাই কবিতার হার
গাথিল কবি তাহার আমির হামজার।
না হবে না হইয়া তেয়ছাই রচনা
যে যাহা করিল তার না হবে তুলনা।
উর্দু বিচে চার জেলেদ কেচ্ছা আমিরের
তার বিচে দুই জেলেদ করিল জাহের।
আখেরির কেচ্ছা নাহি মিলিল তেনার।
তারপরে লিখি কিছু শোন বেরাদর।
আরজ করিয়া কহি জনাবে সবার।
উমরের কেচ্ছা মুঝে খাহেস আছিল॥
মনোমতে আল্লা তালা মেলাইয়া দিল
মহাম্মদ মুন্সী বলে ভরসা আল্লার॥
জবানে ইয়ারি দেহ কেচ্ছা লিখিবার॥

এ ছাড়া কবির পরিচয় বা রচনাকাল পুথির কোথাও পাওয়া গেল না। একটি ভণিতায় কবির মুরশিদের মোকাম জানা গেল 'মহাম্মদ মুনশী মোরসেদের পা তলে কানপুরে মোকাম যাহার।'

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'আমীর হামজার দাদ' ও 'বদিউজ্জামার লড়াই' (প্রথম ও দ্বিতীয় বালাম)। কবির ভাষায় ১ম ও ২য় বালামের বর্ণিত বিষয়—(এস্তেহার)

যে হইতে বদিওজ্জামা গায়েব হইল।
তেনার আহওাল যত এতে লেখা গেল॥
বাপের নৈল দাদ কেমন ছুড়াতে।
লড়াই করিয়া কারে কয়েদ করিল

জোলমাতে কি হইল বদিওজ্জামার। জোরেতে ধরিয়া কারে মুছলমান কৈল॥
তামাম বয়ান এতে হইল প্রচার॥ মহাম্মদ মুন্সী বলে সবাকে সালাম।
ওম্মর উম্মিয়ার এতে বহুত নকল। এইবারে লেখা যায় দোছরা বালাম॥
শুনিলে রসিক লোক হইবে পাগল জোরে জোওওার সেই মত আমীরের।
বদিওজ্জামাল মর্দ জোলমাত হইতে। তুড়িল রাক্ষস দেও ধরিয়া জোরেতে।

৩. মুহম্মদ মুনশীর শামনুরিমানের জঙ্গ কাহিনীও 'শাহনামা' থেকেই গৃহীত হয়েছে। জগদ্বিখ্যাত বীর রোস্তমের পিতামহ শামনুরীমানের অলৌকিক বীরত্ব ও অভিযানাদির কাহিনীই পুথির বর্ণিত বিষয়। বীর শামনুরীমানের পুত্র বীর জাল তার পুত্র রুস্তম তার পুত্র প্রসিদ্ধ বীর সোহরাব। এঁদের নিয়ে বহু রূপকথা উপকথা সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো মুসলিম জগতের সর্বত্র আজো ঘরে ঘরে অসংখ্য বাল যুবা বৃদ্ধ বনিতার আর রোমান্স-পিপাসু সরল চিত্ত মানুষের রস-পিপাসা চরিতার্থ করছে। এ নাতিবৃহৎ গ্রন্থে শামনুরীমানের নর-দানব-জীন-পরী-রাক্ষসের সাথে রণ, প্রণয়, দিগ্বিজয় প্রভৃতি রোমাঞ্চকর-বিস্ময়কর দুঃসাহসিক অলৌকিক ও অসাধারণ সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এককথায় এটি আমীর হামজা বা মোহাম্মদ হানিফা শ্রেণীর রোমান্স গ্রন্থ। পুথিটি মন্দ নয়। বর্ণনাভঙ্গী চলনসই। তবে কবিত্ব-মাধুর্যরহিত। পুথির নায়ক শামনুরীমান নায়িকা পীরদক্ত। উপনায়িকা আছে আরো কয়েকটি। কবির আত্মপরিচয় পুথিতে নেই।

রচনাকাল—'কেচ্ছা তামাম হইল, আল্লা নবী সবে বল
দোওা সবে দিবেন অধীনে।
বারশত নব্বই সালে রবিবার ফজর কালে
উনত্রিসা কার্ত্তিক মাহা দিনে।' অতএব ১২৯০ বঙ্গাব্দে
বা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত।

মুনশী মুহম্মদ পেশাদার পুথি লিখিয়ে। তাই জোড়াতালি দিয়েই তিনি বিভিন্ন পুথি রচনা করেছেন। নীচে উদ্ধৃত মহল ও নগরকন্যা অংশ অবিকৃতভাবে তাঁর কাঞ্চনমালার কেচ্ছায়ও স্থান পেয়েছে। রূপবর্ণনার কিয়দংশ পরীদক্তের বিয়ের সাজ :

কোমরেতে চন্দ্রহার/আহাকি বাহার তার/চান্দ যেন চমকে আছমানেতে।
পায়েতে পায়জেব দিল/আন্দারে উজালা কৈল/বাজে তাহে চরণ হেলাতে।
মেহেদি পায়ের বিচে/কিবাহার তাহে দিছে/কি কহিব রূপের তুলনা
সে চরণ বামন পেলে/পূজে তারে কুতুহলে/নাহি পুজে দেবতা আপনা।
কি কব তাহার ছাদ/যেন পূর্ণিমার চাঁদ/দপদপ জ্বলেন আন্ধারে।
রূপের ছুওয়ার যেন/সাগর উথলে হেন/এয়ছা রূপ বকশিল তাহারে॥

৪. কাঞ্চনমালার কেচ্ছা

'আপ্তাব সহবে একছিল সওদাগর। আপ্তাব বলিয়া নাম আছিল তাহার॥

তার সাতপুত্র। সর্বকনিষ্ঠপুত্র রূপচাঁদ অবিবাহিত রেখে তার তত্ত্বাবধানের ভার ছয় পুত্র ও পুত্রবধুকে দিয়ে সওদাগর প্রাণত্যাগ করল। পিতার মৃত্যুর পর ছয় ভাই দীর্ঘ ছয়বছর বিদেশে বাণিজ্য করে বাড়ি ফিরে এসে ভাই রূপচাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করল। কালু ঘটক তৈমুসরাজার কন্যার সঙ্গে রূপচাঁদের বিয়ে স্থির করল। তৈমুসরাজার সাতকন্যা। এই সপ্তকন্যাই শাপভ্রষ্টা পরী।

এদিকে রূপচাঁদের ষড় ভ্রাতৃজায়া খেদ করে—
'হায়রে রূপচাঁদ যদি সাদি বেহা করে। ছয় জায় এই মত বলা কহা করে।
আমাদের পানে কভু না চাহিবে ফিরে॥ রূপচাঁদের জুদাইতে যাব মোরা মরে॥

তারা ভেবেচিন্তে রূপচাঁদকে বলল—

'এই কথা কহ তেরা ভায়েদের তরে।
কুচবর্ণ কন্যা আর চুল মেঘ বরণ।
না হইলে সাদি না করিব কদাচন।

তাদের উদ্দেশ্যে—

এ রূপের কন্যা নাহি মিলিবে কখন।
বিভাওভি নাহিক হইবে রূপচাঁদের॥

কালুঘটক তৈমুসরাজকন্যা কাঞ্চনমালার ছবি নিয়ে সওদাগর-বাড়ি এল। ছবি পড়ল রূপচাঁদের ভাজদের হাতে। তারা রূপসী কন্যার ছবিটিকে ঈর্ষাবশে চুনকালির সাহায্যে বিকৃত করে দিয়ে রূপচাঁদকে দেখাল এবং আর একটি মারাত্মক উদ্দেশ্যে রূপচাঁদকে তারা পরামর্শ দিল—

তোমার ভাবী শ্বশুর—

'দেবপুরে ঘর তার বড় যাদু জানে।
যাদুতে ভুলায়ে রাখে শত শত জনে॥

কাজেই—

'তোমার যে ভাইদিগ করে বিবরিয়া।
দুই চক্ষুতে সাত পুরু কাপড় বান্ধিয়া।
লিয়া যাবে মোর তরে সাদী দেলাইতে।'

'গোণক এক এনে মোরা, গোনাইয়া হাল তেরা, মালুম হইল প্রকারে,
ছয়মাস দুজনাতে, দেখা শোনা কোনমতে, করিবারে নাহিক পাড়িবে।
যদি দেখা শুনা হয়, এর মধ্যে দুজনায়, একজন, মরিয়া যাইবে।

রূপচাঁদ চোখে পট্টি বেঁধে বিয়ে করেছে। বৌকে দেখেনি, ভাজদের কথা মত সে ধরে নিল যে তার পরিণীতা কুৎসিত তো বটেই, তার উপর–একচক্ষু কানা তার একপদ খোড়া ফের তাতে। কাজেই এ রূপহীন স্বামীর থেকে উপেক্ষা পেতে ও জা'দের হাতে নির্মম ভাবে লাঞ্ছিত হতে থাকে। অবশেষে যখন সব কথা ফাঁস হয়ে গেল, তখন রূপচাঁদের ভাইরা ছয়বধূকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করল। তারপরে তারাও তৈমুস রাজার অপর ছয়কন্যাকে বিয়ে করে সুখী হল।

২৮. সাদ ও ওহাব

'সহিদে কারবালা' চার দপ্তর বা খতে বিভক্ত। যুগ্ম রচয়িতা হচ্ছেন সাদ আলী ও আবদুল ওহাব। হজরত মুহম্মদের ওফাত থেকে হানিফা-এজিদ নিধন অবধি এ পুথিতে বর্ণিত হয়েছে। পৃথক পৃথক ভণিতা থাকা সত্ত্বেও এ যৌথ রচনায় কার কৃতিত্ব বেশি বলা যায় না। আবদুল ওহাবের ভণিতাই বেশি। সম্ভবত 'রাগমালা সতীময়না' রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী (মিরেরসরাই) আবদুল ওহাব এবং আলোচ্য পুথির রচয়িতা একই ব্যক্তি। সাদ আলীরও অন্য রচনা আছে। এখানে আমরা সাদ আলী ও ওহাবের রচনার কিছু নমুনা দিচ্ছি ঃ

হোসেনের পুত্র আবদুল্লাহর শাহাদৎ

হোসেন বলেন বাবা শুন দিয়া মন
পানির বিহনে সবে যাইতেছি মারা
আবদুল্লা শুনিয়া এয়ছা চাচার মুখেতে
আরবার লড়িবারে যান ময়দানেতে।
লড়িতে লড়িতে শাহা বেতাব হইল
কুফিরা তলওয়ার মেরে সহিদ করিল॥
আবদুল্লা পৌছেন গিয়া বেহেস্তখানায়।
কহে হীন সাদ আলি ভাবিয়া খোদায়॥

কাসেমের শাহাদাৎ

বেদেল হইয়া যত কাফের বেপীর
তীরের চোটেতে অঙ্গ করিল চৌচির॥
ঝাকে ঝাকে তীর এয়ছা কাফের মারিল
কাসেম পেয়াদা পাও দেখিয়া উম্মর॥
নেজা ঘোমাইয়া মারে ছাতির উপর,
এয়ছাই কুওতে গিধি নেজা মেরে ছিল

ঘোড়ার ওজুদ ছারা ঝাঞ্জারা হইল॥
জখমি হইয়া ঘোড়া গেরে জমি 'পরে।
লাচার হইয়া সাহা নিচেত ওতরে॥
ছিনা ছেদে পিঠে নেজা বাহির হইল।
কাসেম চলিয়া গেল বেহেস্ত মাঝার
আবদুল ওহাব রচে কেতাব ওতার॥

কবিত্বলেশহীন একঘেঁয়ে রচনা। কারবালা কাহিনীর গুরুত্বানুরূপ করুণরস সৃষ্টিতে কবিদ্বয় ব্যর্থ হয়েছেন।

২৯. শেখ ওমরউদ্দীন ও শেখ কমরউদ্দীন

'খয়রল হাসর' নামের পাঁচালী ভণিতা বদল হয়ে দুজনের নামে চলে। একজন সায়ের শেখ কমরদ্দীন, অপরজন শেখ ওমরদ্দিন। এ দুয়ের মধ্যে কে প্রকৃত রচয়িতা তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। ইতোপূর্বে আমরা কবি মনিরুদ্দিনের মুখে আমাদের আলোচ্য কবি শেখ কমরুদ্দিনের (পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা) বিরুদ্ধে জালিয়াতির নালিশ শুনেছি। এটিও তেমনি পন্থায় নিজের নামে চালিয়েছেন হয়তো।

শেখ কমরদ্দিন এবং শেখ ওমরদ্দিন সমমাত্রার ও সমাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, তাই ভণিতায় নাম বদল করাতে ছন্দপতন হয়নি।

দু'পুথির কোথাও কবির আত্মপরিচয় নেই। শেখ ওমরদ্দিন ভণিতাযুক্ত পুথির সাঁইত্রিশ সংস্করণ চলছে ; কমরদ্দিনের পুথিতে কোন সংস্করণ উল্লেখ নেই।

রচনার সামান্য নমুনা দিচ্ছি।
হাবিলের ধড় লিয়া বালাতে বান্ধিয়া।
বনে বনে ফেরে কাবিল কান্দিয়া॥
পাগলের মত যেন হেসে হারাইল।
ভায়ের দেরেগ শোক কলেজা বিন্ধিল।
আহারে প্রাণের ভাই নয়নের তারা।
আপনার দোষে আমি হইনু যে হারা

হাবিলের জন্যে কাবিলের শোক ঃ
জানের দোসর ভাই আজ হারাইনু।
বনে বনে ফিরি আমি ভায়ের লাগিয়া।
মরা ভাই আপনার গলেতে বান্ধিয়া॥
হীন খাকছার কহে কমরুদ্দীন নাম
(হীন খাকছার কহে ওমরদ্দীন নাম)।

এ পুথিতে আদমসৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামি ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ বা শাহনামা ধরনে রচিত। রচনাকাল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কিছু পাওয়া গেল না।

৩০. মুহম্মদ সেকেন্দর আলী বেপারী

গহুর বাদশা ও বানেছা পরীর পুথি—একটি রোমান্স। এতে মানুষ পরী ও দৈত্যের সমবায়ে দারু-টোনা-যাদু-মন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে আলেফলায়লার মতো কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। পশ্চিম দেশের বিশ্বিং বাদশার পুত্র গহুর বাদশা কাহিনীর নায়ক। বাদশা প্রথমে শহরবানু নাম্নী এক সওদাগরকন্যা বিয়ে করে। দ্বিতীয় পত্নী কলাবতী। এরপর একদিন শিকারে গেলে বিশ্বিং দৈত্য তাকে অপহরণ করে।

এদিকে কালাউজির সুযোগ পেয়ে সিংহাসন অধিকার করে রানী সহবরানুকে বিয়ে করে এবং গহুর বাদশার ছোটভাই সোনাতনকে কয়েদ করে। গহুর বাদশার ছোটরানী কলাবতীকেও কালাউজির প্রেম নিবেদন করে এবং সতীকলাবতী তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় তাকে বনে তাড়িয়ে দেয়।

ওদিকে গহুরবাদশার সঙ্গে বানেছাপরীর প্রণয় জন্মে, মুংলা দৈত্য গহুরকে পরীস্থানে নিয়ে যায়, বানেছা কয়েদ হয়, গহুরকে জখা (যক্ষ) দৈত্য সাগরে নিক্ষেপ করে, সেখান থেকে উদ্ধার পেয়ে অসত্যনগরে যায়, সেখানে গহুর কোতওয়াল-বধূর নাক কাটে, এক সাওদাগরকন্যা 'তুক' করে গহুরকে প্রথমে বিড়ালে পরে পাখিতে পরিণত করে। সে পাখিকে বন্দী করে চপলাকন্যা, আবার ছাড়া পেয়ে শিকারীর হাতে পড়ে, লালপরী গহুরকে আবার মনুষ্যরূপ দান করে। এসব বহু

বিঘ্ন জয় করে গহুর বাদশা বানেছা পরী, পত্নীদ্বয় ও সন্তানাদি নিয়ে স্বদেশে ফিরে এল। উজির ও সহরবানুকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হল। পুথিতে কবির পরিচয় নেই, নাম পৃষ্ঠা থেকে প্রকাশ কবির নিবাস পীরপুর : অন্যসূত্রে জানা গেল পীরপুর ঢাকা জেলার খিদিরপুর পোস্টাফিস অধীনস্থ একটি গ্রাম। পুথিখানি-৯-৪-৪১ ইং তাং মুদ্রিত। কবি সেকান্দর আলীর সৌন্দর্যবোধ আছে, কবিত্বের স্পর্শ থেকেও তিনি বঞ্চিত নন। মধ্যে মধ্যে কবিত্বের নিদর্শন আছে। রচনার নমুনা—

কলসী ভরিয়া কন্যা রহে দাড়াইয়া
সাহাজাদার রূপ দেখে নয়ন ভরিয়া।
সাহাজাদা কন্যাপানে না চায় আখি মেলি।
জল ভরি গৃহে কন্যা গেলেন তবে চলি।
ঘড়া হাড়ি পাতিল্ল যত গৃহে কিছু ছিল
জল দিয়া পূর্ণ করি সকলি ভরিল।
তাড়াতাড়ি সরোবরে আসে আর যায়।
সাহাজাদা দিগে ধনি আড়ে আড়ে চায়।
কোথা হতে আস নাগর এই বৃক্ষ তলে
কামিনী পাগল করি বাড়ি বসাও জলে॥
মনে প্রাণে দু-নয়নে যার করি আশা
ফুলের মধু নাথ রাং যেন শিশা॥
যৌবন ফুরাল মোর না বসিল অলি।
কে করিব মধুপান কারে দিব জালি।

৩১. মনওয়ার আলী

আলমাস ও গোলরায়হান—নামেই প্রকাশ এটি একটি আখ্যায়িকা, তবু কবি বলেন—

'তাওারিখ বিচে জান লিখিল এছাই।
তাহার তরজমা এহি সবাকে শুনাই॥
বাদসাদের হকিকত লেখা জাতে থাকে।
আরব্বিতে তাওারিখ কহেন তাহাকে।

তারপর বলেছেন—

'পার্শী ভাষাতে পূর্বে ছিল এ কেতাব
আত্তাম ছমজ হৈতে আছিল হেজাব
তাহা বাদে হিন্দি বিচে তরজমা হইল।

চজিতারামপুরের ফজর আলী ভূঁইয়ার পুত্র কবির বন্ধু মুনশী মনসুরের আগ্রহে কবি এ কিসসা বাঙলায় তর্জমা করেন। কবির পিতামহের নাম পিতাগাজী ভূঁইয়া, পিতার নাম নকড়ি ভূঁইয়া, কবির নিবাস ত্রিপুরা [বর্তমান কুমিল্লা] জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে।

পুথির রচনা কাল—আলমাছ গোলের কেচ্ছা হইল তামাম।

বারশত নব্বই সালেতে বাঙ্গালার।
নবমেতে বাণে বাণ গুণে মঙ্গলার।
তেরশত এক সাল হিজরীর সন।
নেত্র চন্দ্র রিতু চন্দ্রজোগেতে গনন॥

গল্পের কাঠামো এই ঃ 'বোগদাদের বাদশা ফিরোজ মিরজান ছয়টি স্ত্রী গ্রহণ করলেন, তবু পুত্র লাভ করলেন না। অবশেষে এক পীর 'মর্দ' স্বপ্নে বাদশাকে বলে দিলেন মিসর রাজকুমারীকে বিয়ে করলে তার গর্ভে সন্তান লাভ হবে।

বাদশা মিসররাজকুমারীকে বিয়ে করলেন। এবং যথাসময়ে পুত্র আলমাসের জন্ম হল। এই আলমাস হচ্ছে আখ্যায়িকার নায়ক। গণকের মুখেই তার জীবনবৃত্তান্তের আভাস পাওয়া যাবে—

যখন শিশুর হবে যৌবন বাহর।
এক নিশি শয্যা 'পরে শয়ন করিবে।
গন্ধর্ব কুমারী এক স্বপনে দেখিবে।
এ স্বপন দেখিয়া সাহা উম্মাদ হইবে॥
অবশেষে যাবে শাহা মুল্লুক তেজিয়া
জহরে হালাক হবে পন্থেতে খাইয়া। ...
একশত আষ্ট সাল ওমর মাজেরা।
দ্বাদশ বয়সের শিশু পরদেশে যাবে॥
কভু দুঃখ সুখ আষ্ট দশ যাবে।
একুনে ত্রিশ যবে বয়েস হইবে॥
পঞ্চরূপ রামা লই ফিরিয়া আসিবে।

পরীরাজ্য অমরাবতী গন্ধর্বলোক দৈত্যালয় প্রভৃতি নানাস্থানে বিপদাপদ অতিক্রম করে সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চসুন্দরী জমিলাবানু, সোনাতন, চন্দ্রবান, চন্দ্রআরা এবং গোল রায়হানকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এল। কাহিনী গতানুগতিক।

এ কাব্যে গোলরায়হান পরীর বারমাসী রয়েছে। নমুনা ঃ

প্রথমে বৈশাখ মাস নতুন বৎসর।
রমণী সবার হৈল উল্লাস বিস্তর।
বঞ্চিত প্রিয়ার সঙ্গে মন কৌতুহলে।
সদায় শীতল অঙ্গ মীন যেছা জলে।
আমি অভাগির ক্রমে আছিল এছাই
বিরহ অনলে সদা জ্বলি হইনু ছাই।

৩২. বেলায়েত হোসেন

ফেছানায়ে আজায়েব বা জানেআলম আঞ্জুমন্‌আরা—ফাছানা-ই আজায়েবের ভূমিকায় কবি বলছেন—

'বারশ' পাঁচাত্তর সাল ছিল বাঙ্গালার
বারই শ্রাবণ মাস রোজ রবিবার। কিন্তু
তামাম হইল কেতাব ফজলে খোদার।
সবার কদমে মোর ছালাম হাজার।
–'বারশত উনাশীসাল বাঙ্গলার আখের
কেতাব প্রকাশ হল হুকুমে কাদের।

'ফাসানা-ই-আজায়েব' নামের ফারসি কাব্য অবলম্বনে এ রোমান্সটি রচিত হয়েছে। ফারসি কাব্যটি পনেরো শতকের রচনা। সূফীরা আধ্যাত্মিক রূপক হিসেবে কাব্য-কাহিনীর ব্যাখ্যা করতেন, যেমন তাঁরা লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি প্রণয়োপাখ্যানে অধ্যাত্মরূপক আরোপ করেছেন। কাহিনীটি সংক্ষিপ্তসার ঃ

'যোতন ছরহদ্দে এক আচিল সহর'। সে-শহরের বাদশা ফিরোজ বক্ত। শাহজাদা জানে আলম। ইনিই কাব্যের নায়ক। শাহজাদা বয়োপ্রাপ্ত হলে তার সঙ্গে মাহেতেলাত' কুমারীর শাদী হয়, একদিন জানে আলম শিকারে গিয়ে এক 'তোতা' পাখি ক্রয় করে, সে-তোতার মুখে শাহজাদী আঞ্জুমন আরার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা শুনে তোতা পাখিকে পদপ্রদর্শকরূপে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। পথ ভুল করে কিন্তু বিপদগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়বার যাত্রা কালে 'মালেকা মেহের নাগারের সঙ্গে তার প্রণয় জন্মে। জানে আলম তার এ ভ্রমণকালে পীর মর্দের সাহায্য ও সদিচ্ছা লাভ করেন। যাদু টোনা লড়াই প্রভৃতি পথের বিপদ পীরের সাহায্যে উত্তীর্ণ হয়ে মেহেরনাগারকে ও আঞ্জুমনআরাকে লাভ করে শাহজাদা জানে আলম স্বদেশে ফিরে এল এবং তিন বেগম নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে থাকে।

কবির ভাষা মার্জিত নয়। কবিত্বলেশহীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থ অনুবাদকালে বন্ধু কবিকে পরামর্শ দেন ঃ

মূলগ্রন্থে—

বোল চাল তাতে হয় ইছলামি তামাম।
বোল চাল সব তুমি লেখ আমাদের।
সকলে বুঝিতে পারে কি কহিব ফের॥
রঙ্গিন করিতে তুমি এই যে কাহিনী।
শক্ত শক্ত লফজো কিছু না লেখ আপনি।
এমত না হয় যেন আমা সবাকায়,
মানে পুছে ফিরি মোরা পণ্ডিত সবায়॥
দিনেতে মেহনত করি ফোরছত না পাই।
রাত্রেতে লিখিব আমি এই যে কেচ্ছায়॥

'বোল চাল সব তুমি লেখ আমাদের'-এর সহজ অর্থ এই যে বন্ধু কবিকে খোট্টা বাঙলায় কাব্য রচনা করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। কারণ কবি এবং কবির বন্ধু হাওড়া-হুগলীবাসী।

কবির আত্মপরিচয়—কবির প্রপিতামহের নাম এমাম বকশ জমাদার, পিতামহের নাম মুনশী কফিলউদ্দীন। নিবাস ছিল ধনেখালির নিকটস্থ পিখা গ্রামে। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল হুগলীজেলার সন্তোষপুরে।

৩৩. মোহাম্মদ রওশন আলী

দেলবাহার গোলে গোলজার—একটি প্রণয়োপাখ্যান। কাহিনী গতানুগতিক, কোন বৈচিত্র্য নেই। ভাষাও মার্জিত নয়। বর্ণনশৈলীও প্রশংসনীয় নয়।

চীনদেশের বাদশা বহু-সাধনা করে পুত্ররত্ন লাভ করলেন।

সবারকার হইলেক দেলের আরাম। রাখির আরামদেল নাম ফরজন্দের॥
তাই, বাদশা নামদার খোশাল খাতের।

বয়োপ্রাপ্ত হয়ে সাহজাদা পারছের (পারস্য) শাহজাদী মালকা হোসেনবানুর তসবীর দেখে প্রণয়াসক্ত হয়ে পারস্য যাত্রা করেন। পথ থেকে লাল ও সবুজ পরী আরামদেলকে দারাব বাদশার মুলুকে নিয়ে যায়। সেখানে বাদশাজাদী রূপসী সনুবরের সঙ্গে দেলআরামের সাদী হয়। কিছুকাল পরে আরামদেলের সঙ্গে ছিমতনপরীর সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের প্রণয় পরিণয়ে সমাপ্তি লাভ করে। আবার পারছের দিকে যাত্রা করল আরামদেল। পথে তেলেসমাতের খপ্পরে পড়ে ময়ূর হয়ে থাকতে হল তাকে। বন্ধু মাহসুদ পারশ্যে পৌছে শাহজাদী হোসেন আপরোজকে আরামদেলের তসবীর দেখিয়ে আরামের প্রতি তাঁর হৃদয়ে প্রেম জন্মাল। পারস্যের শাহজাদীর আগ্রহে পারস্যরাজের চেষ্টায় ময়ূররূপী আরামদেল আবার মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হয়। এবং কিছুকাল পরে আরামদেল ও হোসেন আফরোজের বিয়ে হয়। তিন বেগম নিয়ে বাদশা আরামদেল আরামে জীবনোপভোগ করতে থাকে। এ তিন রূপসী লাভ করতে তাকে দৈত্য ও মানুষের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করতে হয়। পুথিতে কবির আত্মপরিচয় বা রচনা কাল দেওয়া হয়নি।

৩৪. শেখ আমিরউদ্দীন

মনসুর হাল্লাজ ও শমস তবরেজীর কেচ্ছা—ভুবন বিখ্যাত দু'জন সূফীসাধকের অলৌকিক ও অর্ধ ঐতিহাসিক জীবনবৃত্ত ও সাধনার কথা এ নাতিক্ষুদ্র পুথিতে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণের বিশ্বাস মনসুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এবং শমস তবরেজী বিখ্যাত সূফীকবি মসনবী রচয়িতা মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর পীর ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বর্ণনা—

মাসা এখ মনুছুরের কেচ্ছা ফারসিতে। আবদুল খালেক নামে মৌলবী ছাহেব।
লিখিয়া ছিলেন কোন ফাজেল লোকেতে। লিখিয়াছিলেন নজমেতে বেআয়েব॥
সেইতো রেছালা পের উর্দু জবানেতে সেই তো রেছেলা ফের এছলামি বাঙ্গালায়
হইল তরজমা কলিকাতা সহরেতে। লিখিতে এরাদা হইল খাহেস আমায়।

কবির আত্মপরিচয়—

হীন আমীরুদ্দিন আমার নাম ভাই। ফকির খানার এই জানিবে ঠেকানা।
কলিকাতা শাহরেতে বসতি সদাই॥ ওয়ালদের নাম মেরা শুন দিনদার॥
কড়েয়া সাকিন, জেলা চব্বিশপরগনা। মরহুম মোহাম্মদ দুঃখি সবাকার।

প্রকাশক কবির পুথিখানি—

দেখিলেন শেখ জমরুদ্দি পড়িয়া। বাড়ি তার বন্দিপুরে হুগলী জেলার।
শেখ জিয়াউদ্দিন বাপের নাম তার। হরিপাল থানার নাম জানিবেন ভাই।
সুরু করিলেন লিয়া ছাপিবার তরে তেকারণে বাঙ্গালাতে করিনু রচনা॥
বাঙ্গালা লোকের কেচ্ছা শুনিতে বাসনা।

৩৫. কাজী রায়হানউদ্দীন

গোলে আরজান—একটি রোমান্স। নামপৃষ্ঠায় কাজী রায়হানউদ্দীনের সঙ্গে মুনশী সাদুল্লা সরকারের নামও রচয়িতা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু পুথির কোথাও সাদুল্লার ভণিতা পাওয়া গেল। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস আদ্যন্ত রায়হানেরই রচনা। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত কাঠামো ঃ

'পশ্চিম তরফে দেশ নামেতে রোখান। ফিরোজ আছিল নাম সেই ত শাহার॥

তার চার বেগম। কারো সন্তানাদি নেই। পীর-প্রদত্ত আম পুত্রার্থে চার বেগম মিলে খাওয়ার কথা। কিন্তু তিন বেগম মিলে সর্ব কনিষ্ঠাকে বঞ্চিত করল, যে-শিলায় ওরা আম পিষে খেয়েছিল, সে-শিলা ধোয়া পানি খেয়ে সর্ব কনিষ্ঠা অন্তঃসত্ত্বা হল। যথাসময়ে সে পুত্র প্রসব করল। সে-পুত্রের নাম রাখা হল জালাল আহমদ। এ-ই কাহিনীর নায়ক।

জমশেদ বাদশার বেটি আরজান তার কর্ণফুল হারিয়ে ফেলে। সে-কর্ণফুল পেল সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে শাহজাদা জালাল। কর্ণফুল দেখেই কর্ণফুলের অধিকারিণীর প্রতি জালাল আসক্ত হয়ে ওঠে। তারপর নানা বিপদ-টোনা-তেলেসমাত থেকে উদ্ধার পেয়ে এবং কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়ে জালাল রাজকন্যা আরজানকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এল, তার সাহায্যকারী মকবুলও জোবেদাকে বিয়ে করে হল সুখী। কবির আত্মকথা–

'এই তক কেচ্ছা মেরা হইল বয়ান।...
খেয়াল না রহে মেরা কেচ্ছা লিখিবারে
কেচ্ছা লিখিবারে মুঝে না ছিল তাকত।
কিরূপে থাকিবে দেশে ঘটিল আপত॥
আম্মাজান খত মেরা লেখে এ প্রকার।
হাকিমের জুলুমেতে দেশে থাকা ভার॥
যে প্রকারে পার কিছু টাকা পাঠাইতে।
কাছে নদী দামুদর কি বলিব আর
হর সাল বান আসি করে ছারখার।

অবশেষে শুকুর মুহম্মদের আগ্রহে কিসসা লেখা শেষ করেন কবি। ভণিতা ঃ

রায়হান অধীন কহে ভাবিয়া রাব্বানা
বালিপুর সাকিনেতে যাহার ঠিকানা।

কবির এই সাময়িক কলম ত্যাগের কথা শুনে বোধ হয় সাদুল্লাও রায়হানের রচনায় ভাগ বসাতে চেয়েছিল।

রচনাকাল ঃ

একুশে ফাল্গুনে কেচ্ছা শুরু করলাম।
এগারই আষাঢ়েতে হইল তামাম।
আগে পিছে জান দুই জোমেরাত ছিল।
বড়নেক ছায়েতেতে তামাম হইল।
বার-শ বিরাশী সাল ছিল বাঙ্গালার।

কবির ভাষা মার্জিত ললিত নয়। বর্ণনশৈলীও প্রশংসনীয় নয়। রচনার নমুনা ঃ কালন্দর শাহার বেটি জোবেদার রূপ ঃ

যৌবন জোয়ারে তার আসিয়াছে বাণ।
ছুরত দেখিলে তার যোগী ভুলে যায়
আশক জনার তরে ফাঁসীর আন্দার।
নর গাছ আপনি তার চমক দেখিয়া
শরমেন্দা হইয়া থাকে ছের ঝুকাইয়া।
যোগ ছেড়ে দিয়া সেহ করে হায় হায়।
কালা নাগ এয়ছা বাল ছেরেতে তাহার
আখি তার দেখে মৃগ সরমেন্দা হইল
লজ্জিত হইয়া মনে বনে পলাইল।

৩৬. আবদুল গফফার

নুরবক্ত নওরাহার—একটি নাতিদীর্ঘ রোমান্স। গ্রন্থে কবি দীর্ঘ আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অংশটি তুলে দিচ্ছি ঃ

হাবড়া জেলার বিচে আমতার থানা আছে জানিবে যে সরহদ্দে তার।
চন্দ্রপুর নামে গ্রাম তাহার মাঝেতে ধাম আমার পয়দাস সেই ঠাই।
গোলাম রসুল পিতা অতি দয়াশীল দাতা পুন্নিকর্মে ছিলেন সদাই।
স্মরণ করি নিরাকার নুরবক্ত নওবাহার আরম্ভ করিনু রচিবারে।

কবির উস্তাদ মুনশী সাদতউল্লাহর আগ্রহে কবি এ কিসসা রচনা করেন। পুথির রচনা-তারিখ জানবার উপায় না থাকলেও নিম্নোদ্ধৃতাংশ থেকে রচনাকাল অনুমান করা সম্ভব।

আবদুল গফ্যার বলে ভাবি করতার সমাপ্ত হইল নুরবক্ত নওবাহার।
আগে একবার ছেপেছিলাম এই পুথি॥ বিক্রেয় করিনু আমি আপনা ইচ্ছায়॥
এক্ষনেতে মহাম্মদ খাতের যে নাম। ইতি সন ১২৮৮ বার শও অষ্ট আশি সালে।
পুস্তকের সে কারবার করেন মোদাম॥ দিলাম ২০ বিশে অগ্রহায়ণে খুশী হালে॥
এই পুস্তকের কাপি রাইট যে তায়।

কবি তাঁর কাব্যখানা বিশুদ্ধ বাঙলায় রচনা করবার চেষ্টা করেছেন।

কাহিনী এই ঃ আদম দেশের রাজা আলম হোরেমান এক বাগান তৈরি করেন। পরীরা এসে বাগান থেকে ফুলচুরি করে নিয়ে যেত। কেউ ফুলচোর ধরতে পারে না। অবশেষে রাজপুত্র নুরবক্ত পরীদের সাক্ষাৎ পেল। রাজপুত্র নুরবক্ত প্রণয়িনী নওবাহারকে নিয়ে পরীরাজ্যের ইন্দ্রপুরীতে নানাভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে অবশেষে নওবাহার ও তার ভগ্নীদের বিয়ে করে ফিরবার পথে বছরার (বসোরা) রাজকন্যা গোলচেহারাকে শাদি করে স্বদেশে ফিরে এল। এসে ভাইদেরও ক্ষমা করে সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

এ উপাখ্যানে ইউসুফ-জোলেখা কাহিনীর আংশিক ছায়া পড়েছে। এঁর অপর দুখানা গ্রন্থ হচ্ছে কালুগাজী-চম্পাবতী ও শাহবীরবল-চন্দ্রভান।

৩৭. দায়েমউল্লাহ

গোলে দেওগান্দা—এটি প্রণয়োপাখ্যান।

সোভাবাজারের বিচে চৌহারার কোনে।
শুনো যতো বেরাদর আরোজ আমার। ঠেকানা জানিবে মেরা কাপড়ের দোকানে
তরজমা করিয়া কেচ্ছা ফিরোজ সাহার॥ খেদমতে খাদেম সেখ ছাএমল্লা নাম।
গোলে দেওগান্দ বলে রাখিলাম নাম। পরগানে বালিয়া অক্রি মৌজাতে মকাম॥

সন ১২৬০। তাং ১৭ আষাঢ়।

গ্রন্থশেষে, কবি পিতৃপুরুষ ও বাসভূমির পরিচয় দিয়ে অবশেষে লিখেছেন—

কহে হীন দাএমল্লা দেলে হএ সাদ। গোলে দেও গান্দা নাম বেতারের দিনু॥
কেচ্ছা ময়দান মেরা হইল আবাদ॥ বার সো সাইট সাল মাহে রমজান।
আরজুর দেলেতে আমি তরজমা কিরিনু। চাঁদের তারিখে পুথি হইলো তামাম॥

৩৮. আবদুল ওহাব

চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার অন্তর্গত ওয়াহেদপুর গ্রামবাসী তাজুদ্দিন সারং-এর পুত্র আবদুল ওহাব (১২ই শ্রাবণ ১২৫৫ মঘীতে রচিত) তাঁর রাগমালা নামের গ্রন্থের শেষে রাগনামা প্রণেতা রঘুনাথ-ভবানন্দ-দানিশ কাজীকে স্মরণ করেছেন ঃ

প্রথমেতে দ্বিজ রঘুনাথ কবিবর। মধ্যে মধ্যে রচনা করিছে কত গান॥
মধ্যে মধ্যে ভবানন্দে গাহিছে সুন্দর॥ নিয়ম করিয়া দিদ সময় কাটনি
তার পাছে দানিচ কাজি অতি জ্ঞানবান। কোনসমে কোন রাগে গাহিব রাগিনী॥

সম্ভবত ইনিই শহীদে কারবালার যুগ্মলেখকের একজন।

৩৯. মুহম্মদ মীরন

এনায়েতুল্লাহর ফারসি কেতাব 'বাহার দানেশে'র অনুবাদ করেন কবি মুহম্মদ মীরন। এ গ্রন্থ রচনায় ইনি অনেক লোক থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন। গ্রন্থে আলাউলের সপ্তপয়করের মতো সাতটি গল্প আছে। এক শাহজাদা একটি তোতাপাখীর মুখে রাজকন্যা বহরওরবানুর রূপলাবণ্যের কথা শুনে দিওয়ানা হয়ে যায়। তাকে রাজকন্যার মোহ ছাড়িয়ে সুস্থ করবার জন্যে উপদেশচ্ছলে বাদশার আদেশে সাতজন সাতটি কিসসা বলেছেন। মুহম্মদ দানিশের জ্ঞানবসন্তবাণীও এরূপ গল্পগ্রন্থ।

ভাষা সরল, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। গ্রন্থ রচনার তারিখ—

'সমাপ্ত হইল পুথি মিথুনের বাণে। চন্দ্রে দিবাকর অঙ্গে বেদ বেদ রয়।
ভাস্কব তনয় ভনে বেলা অবসানে॥ সংক্ষেপে রহিল এই সনের নির্ণয়॥

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে রচনাকাল ১২৪৪ সাল বা ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ।

৪০. আবদুর রহমান

কবি আবদুর রহমান 'সুরুজ্জামাল' উপাখ্যানটির রচয়িতা। ইনি ফরিদপুরবাসী ছিলেন—
অধীন রহমান কহে সবাকে ছালাম। জেলা ফরিদপুর বিচে আমার মোকাম॥

কাহিনী কাঠামো এরূপ—সুলতানেব শাহজাদা সুরুজ্জামাল একপরীজাদীর প্রেমে পড়ে তাকে গোপনে বিয়ে করে। এদিকে তার পিতামাতা রাজা ও রানী দেখে শুনে দুদমেহের নাম্নী পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সাথে সুরুজ্জামালের বিয়ে দেন। সপত্নী বিদ্বেষবশে পীরজাদী বিয়ের রাতেই স্বামীর প্রাণহবণ করে। পতিব্রতা দুদমেহের তারপর বেহুলার মতো মৃতকে বাঁচাবার সাধনা করতে থাকে। বেহুলা যেমন স্বর্গে শিবকে নৃত্যে তুষ্ট করে লখীন্দরের জীবন ফিরে পেয়েছিল, দুদমেহেরও তেমনি এক তোতাপাখীর সাহায্যে শাহ-পরীর (পরীরাজ্যের রানী) কাছে গিয়ে নালিশ জানাল এবং মিনতিতে শাহপরীর চিত্ত জয় করে স্বামীর জীবন ফিরে পেল। বেহুলা-লখীন্দরের অনুকরণে রচিত কাহিনীতে বিশেষত্ব নেই কিছু। তবু কবি বলেন—

'আবদুর রহমান বাণী পুষ্প মনোহর। গাঁথিয়া গলেতে পর যতো আছ নর॥
ইনি গ্রন্থে কয়েকটি গানও পরিবেশন করেছেন।

'পিরীতি-রতনে রাখিবে যতনে পিরীতি গলার হার।
পিরীতি করিয়ে যেইজন মরে সফল জীবন তার॥

কাব্যখানি উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত হয়। কবির অপর রচনা হচ্ছে 'হাসেম কাজির পুথি'। কবির উপর দোভাষী পুথির প্রভাব পড়েনি। তিনি বিশুদ্ধ বাঙলায় কাব্য রচনা করেছেন।

৪১. ফকির মুহম্মদ

কবি ফকির মুহম্মদের ভণিতায় গরীবউল্লাহর ইউসুফ-জোলেখা ও সোনাভান বাজারে চালু রয়েছে বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি। এঁর নিজের রচিত তিনখানি গ্রন্থও পাওয়া যায় ঃ একটি ইমামচুরি, অপরদুটি মোবারকগাজীর পুথি ও মানিক পীরের গীত। শেষোক্ত পুথি দুটো 'পীর পাঁচালী' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে ইমামচুরির পরিচয় দিচ্ছি। পূতনা রাক্ষসী কর্তৃক শিশু কৃষ্ণকে হত্যার চেষ্টার অনুকরণে চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতিতে চোর কর্তৃক বালক নিমাইকে হরণ করবার চমকপ্রদ কাহিনী যোজিত হয়েছে। কৃষ্ণ-ও চৈতন্য হরণকাহিনীর অনুকরণে মুসলমান লেখকগণের কেউ কেউ 'ইমামচুরি' কিসসা রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত ঘটনা এরূপ—একবার হজরত মুহম্মদ কন্যা ফাতেমার বাড়ি বেড়াতে যান। আসার সময়ে হাসান ও হোসেনকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন। তাঁর বাড়ি থেকে একদিন বালকদ্বয় নিকটস্থ বাজারে বেড়াতে যায়। সেখানে থেকে নদীঘাটে যায়। বালকদ্বয়ের নয়নাভিরাম দেহ কান্তি দর্শন কবে এক বিদেশী সওদাগর তাদের ভুলিয়ে জাহাজে তুলে নিয়ে পলায়ন কবে, কিন্তু পরিণামে ধরা পড়ে। সদাগরের উদ্দেশ্য—

মহম্মদ বাদসা আছে লেব্ব সহরে।
ভেট দিব বালক আমি লইয়া তাহারে॥'

বালকেরা জাহাজ দেখে উল্লাসিত হয়ে ওঠে—

'জাহাজ দেখিয়া হাসেন এমাম দুই ভাই।
এয়ছাই তামাসা মোরা কভু দেখি নাই॥
পানির উপরে জাহাজ আজগৈবী ভাসে।
গলাগলি হৈয়া তারা দুই ভাই হাসে॥
তখন, 'ইসারা করিল সাধু নায়ের লোকেরে।
বাহানা করিয়া আন জাহাজ উপরে॥
খালাসি ইরাজে সাধু করিল ইসারা।
সেই ঘড়ি সাধুর জাহাজ আইল কেনারা॥
অবগত দুইভাই এত কিবা জানে।
জাহাজে উপরে তখন হাসে মনে মনে॥

ফকির মুহম্মদের গ্রন্থ দুটো ১২৬৪ সালের তথা (১৮৫৭ খ্রীঃ) মুদ্রিত হয়।

৪২. জয়নাল আবেদিন

জয়নুল আবেদিনের 'আবু সামার পুথি' ১২৬৪ সাল বা ১৮৬৭ সালে মুদ্রিত হয়। আমাদের হাতে একটি 'কলমি পুথি' রয়েছে। এটাকে সম্বল করেই আলোচনা শুরু করছি। এটা তত্ত্বের স্পর্শদুষ্ট একটি গল্পগ্রন্থ। আকারে বড় নয়। বর্ণিতবিষয় খোলেফায়ে রাশেদীনের আমলে কাজীর বিচারবিধি। কাজী তখন হযরত উমর। জয়নুল আবেদিনেব রচনা বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কবি পশ্চিমবঙ্গবাসী।

সদাচারও ধার্মিকতার জন্যে শেষ পর্যন্ত নায়ক আবুসামা ঃ

বেহেস্তের মাঝে আবু যাইয়া বসিল।
ভণিছেন জয়নল আবেদিন মুরসিদের পায়।
নেকি জনার বদি যেন না করে খোদায়॥
আবু সামার পুথি এই হইল তামাম।
যত মোমিন বল ভাই আল্লা নবির নাম॥

ইতি সন ১২৬২ সাল। তারিখ ২৭ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার। সম্ভবত এটা লিপিকাল। ঢাকাবাসী মুন্সী গরীবুল্লাহর [বেপারীর] নেকবিবির কেচ্ছার নাম পৃষ্ঠায় সায়ের হিসেবে জয়নুল আবেদিনের নাম বসানো হয়েছে, কিন্তু বইতে সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে মুন্সী গরীবুল্লার ভণিতা।

অধম ফকির বা আদম ফকির কিংবা জয়নুল আবেদিন 'আবুসামার' পুথির কে প্রকৃত প্রণেতা নিঃসন্দেহে তা বলা যাবে না।

৪৩. আদম ফকির

'আদম ফকিরের কহে এলাহির পায়।
আল্লানবী ভাব দিন রোজ বোয়ে জায়॥

আদম ফকিরের অপর একখানি পুথি আমাদের কাছে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই কবি 'জোহরার সওয়াল' নামে ইসলাম ধর্ম সম্পৃক্ত এক রূপকথা এক দরবেশের ও জোহরাবিবির কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহর বা মালিকার হাজার সওয়াল, মুসার সওয়াল প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা—'আরবার কহিল বিবি মনেতে ভাবিয়া।

মোর পবনের মকাম দেও বাতাইয়া॥
ফকির বোলেন বিবি সকলি অসার।
পলষের মধ্যে দুনিএগ্রা হৈব ছারখার॥
মনের বসতি-রুহ- পবনের বসতি তোন।

তোনের এসতি খাঁকি শোনহ দিয়া মোন ॥ ইত্যাদি

কবি সম্ভবত উনিশ শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

৪৪. হাবিবুল হোসেন

ছহি বড় জঙ্গে সোহরাব রচয়িতা মুনসী হাবিবুল হোসেন সম্ভবত বিশ শতকের প্রথমদিকে তাঁর পুথিখানি রচনা করেন। প্রকশকের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বোঝা যায় ১৩২৩ সালের পূর্বেও এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়েছিল। সোহরাব-রুস্তমের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। রচনার নমুনা ঃ

রোস্তম বলেন বাদশা কি কহিব আর।
ছোহরাব পাহলওান দেখি বড় জোরওয়ার॥
লোহা হৈতে শক্ত বেশী অজুদ তাহার।
নেজা গোর্জ তেগ তীর উপরে তাহার॥
কিছুনা আছর তারে করে আলম্পনা।
তেকারণে দেলে মেরা বহুত ভাবনা॥

সোহরাব নিহত হবার পর কবি যা বলেছেন, কবি খাতেরের ভণিতায় তা মেলে ঃ

'অধীন হাবিব কহে এলাহি ভাবিয়া।
সোহরাবের হাল সব বয়ান করিয়া॥
কি তক্ লিখিব আর দেলে দর্দ পায়।
খেদেতে কলমে মেরা কালি না যোগায়।

৪৫. মনিরউদ্দিন

এক খাবনামার রচয়িতা মনিরউদ্দিন।

বাঙ্গালার লোক সবে তাহা নাহি জানে
খোয়াব দেখিয়া থাকে দেল পেরেশানে।
এ কারণে আমি হিন্দি কেতাব হইতে।
বাঙ্গালা করিয়া দিনু সকলে বুঝিতে।
কহে হীন মনিরুদ্দিন অধম লাচার
ঢাকা জেলার বিচে বসতি যাহার।

কবি আবার 'মুন্সী তাজউদ্দীনের ভাতিজা অধম'। বইতে বিভিন্ন রকমের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিশ শতকে রচিত।

৪৬. খোন্দকার আজমতুল্লাহ

'ফাতেমার জহুরানামা বিবিকলসুমের মেজামান' গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় হচ্ছে হযরত মুহম্মদের অলৌকিক ক্রিয়া বা মো'জেজা প্রভৃতি। ফাতেমার জহুরানামা নাম অসার্থক, কারণ ফাতেমার কথা খুব কমই আছে। রচনাকাল ১৩০০ সাল। কবি বলেন ঃ

কলম ঘোড়ার বাগ জোরেতে ধরিয়া।
খাহেসের মাঠে আমি দিনু চালাইয়া॥
লিখিতে খাহেস ছেফাত নবী মোস্তফার।
কলম আমাকে মানা করে বারবার॥
কাঁদিয়া কলম মেরা হৈল জারেজার।
রছুলের ছেফত লেখে হেন শক্তি কার॥

তবু কবির সাহস আছে। তিনি চেষ্টা করেছেন। কবির দীর্ঘ আত্মপরিচয়ের প্রয়োজনীয়াংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

'আমার বাপের নাম/শুন যত গুণধাম/শাহা আতাউল্লা খোন্দকার।
আমি আজমতুল্লা হীন/বিদ্যাশূন্য তনু ক্ষীণ/কেবল ভরসা পরওার॥
আমার ঠিকানা ভাই/তাহারি লিখিয়া যাই/জেলা বগুড়া মসহুর।
থানা তাতে শিবগঞ্জ/কোন বাতে নাহি রঞ্জ/গ্রাম খাড়াদান কৃষ্ণপুর।
কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘর/শুন ওহে বেরাদর/এই পুথি করিনু রচনা।

রচনা কাল—'বাঙ্গালা তেরশও সাল কার্ত্তিক মাসেতে
খাতেমা হইল কেতাব জুম্মার রোজেতে।

৪৭. দোস্ত মুহম্মদ

জঙ্গনামা রচয়িতা শেখ দোস্ত মুহম্মদ সম্বন্ধে কালীকান্ত বিশ্বাস লিখেছিলেন—'শেখ দোস্ত মুহম্মদ আপন গ্রন্থের কোনও স্থানে আত্মপরিচয় দেন নাই, আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে কবির বাসস্থান এই রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাগদুয়ার গ্রামে ছিল। কবি একজন পারশ্য ভাষায় সুপণ্ডিত মৌলবী ছিলেন। সেখানে এখনও তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা বসবাস করিতেছে।... গ্রন্থখানি চলিতাদহের ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মীর সাফাতালীর নিকটে পাইয়াছিলাম। ইহার পিতার নিকটে গ্রন্থকর্তা কবির পরিচয় জানিতে পারিয়াছি।' (প্রাঃ পুঃ বিঃ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ, পত্রিকা ১৩১৫ সাল ২য় সংখ্যা)। ভণিতা দৃষ্টে মনে হয় কবি গায়েনও ছিলেন ঃ

দেখিতে দেখিতে বাত্র গোজরিয়া যায়। দোস্ত মহম্মদ পুথি বিরচিয়া গায়॥

আবার 'কেতাব দেখিয়া দোস্ত মহম্মদ বলে'। কবি সম্ভবত আটারো শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন।

৪৮. হানিফউদ্দিন মুহম্মদ

নছিহত বা সদুপন্যাস—বগুড়া জেলার জয়ভোগ নিবাসী হানিফউদ্দিন মুহম্মদ বিরচিত। ১২৯৫ সালে মুদ্রিত। বিভিন্ন বিষয়ের খণ্ড কবিতার বই। লেখকের একখানা গদ্য রচনার নাম 'সারকথা বা তত্ত্বকথা'। এটা অধ্যাত্মরসপুষ্ট পুস্তিকা।

আরো অনেক কবির নামের তারিকা দিলাম এখানে ঃ

১. রংপুর জেলার মটুকপুর নিবাসী আমীরুদ্দিন বাগুনিয়া উনিশ শতকের প্রথম দশকে আমপারার পদ্যানুবাদ বের করেন। সম্ভবত এটিই প্রথম অনুবাদ।

২. রংপুরের পলাশবাড়ি এখনকার গাইবান্ধা জেলার একটি থানা। এর নিকটবর্তী বালাবামুনিয়া গ্রামের কবি রহিম বক্স 'গোলামিজান আপতাব দস্তান' নামে একখানি কেচ্ছার পুথি ১২৮৭ সালে মুদ্রিত করেন। কবি দোভাষীরীতি অনুসরণ করেছেন।

৩. দোভাষী পুথি 'ইমামসাগর' রচয়িতা বনিজ মুহম্মদ রংপুর জেলার কাকিনা সন্নিহিত গোপালরায় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

৪. জাকাত রহমান (জাকাত বিষয়ক) ও 'বাবু মিঞার আলাপ' নামের প্রহসন রচয়িতা কাজী ফজলর রহমান উনিশ শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। ইনি কাকিনার জমিদারের ফারসি শিক্ষক ছিলেন।

৫. মোনাইযাত্রা রচয়িতা নাজির মাসুদ সরকার। আদি রচয়িতা তেলেঙ্গা সাহা ফকির। এটি যাত্রাগান জাতীয় রচনা। রংপুর-বগুড়ায় বিশেষ প্রচলিত ছিল।

বগুড়ার কতগুলো দোভাষী পুস্তকের ও রচয়িতার নাম ঃ [রঙ্গপুর সাহিত্য পত্রিকা ৬ষ্ঠ ভাগ ১৩১৫ সাল থেকে]

৬. ছেকেন্দরছানি—আনারউদ্দীন খোন্দকার, বনভেটি,

৭. যোখোদেপাযোগেরেগা'—ফতে মণ্ডল, যামিনীপাড়া, শিবগঞ্জ

৮. বাহারে আফছোছ—নিয়ামত আলি খাঁ, বানিয়া দীঘি, দুপচাঁচিয়া

৯. মফিদুল ইসলাম—হানিফুদ্দিন মিয়া, মালতীনগর

১০. রসুলে বেদাতল }
১১. নাছিহাতুল ইসলাম } কেরামত আলী, রামচন্দ্রপুর, শিবগঞ্জ

১২. ধোকাভঞ্জন—রইসউদ্দিন আহমদ, সরিয়াকান্দি,

১৩. কোছনায়ে সোরে কেয়ামত—মোহাম্মদ ইব্রাহিম, শিকারপুর

১৪. ইসলামের চারুশিক্ষা—ফকির মোহাম্মদ, মাটিডালি

১৫. নছিয়তনামা—আব্বাস আলী মিয়া, চকনিতন দুপচাঁচিয়া

১৬. দেল মনছব—মলঙ্গা সরকার, হাসনাবাদ, সেরপুর

১৭. নছিয়তে রঙ্গরস বা কেচ্ছায়েজানবকস—আবদুর রউফ, তেবাড়িয়া নহাটা।

সম্ভবত বহুগ্রন্থ প্রণেতা হায়াত মাহমুদের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে রঙপুরে দিনাজপুরে আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকে দোভাষী কাব্যের আদলে অনেকেই নানা বিষয়ে বড় ছোট মাঝারি কাব্য রচনা করেছেন। এরূপ কয়েকজন কবি ও কাব্য ঃ

১৮. মীর শাহ মনোহর ঃ জখিমার জঙ্গনামা, সকিনার চৌতিশা [১৮ শতক]

১৯. ফকির চাঁদ ঃ রসুল বিজয় [সৈয়দ সুলতানের অনুকারক]

২০. হাদী মুহম্মদ ঃ তুরানশাহাজাদার কিস্‌সা [১৯ শতক]

২১. শাহ আশেক মাহমুদ ঃ আশেক মতলবের কিস্‌সা [১৯ শতক]

২২. শেখ আসমতউল্লাহ ঃ ফুলমতিবিবির কিস্‌সা [১৯ শতক]

২৩. গোলাম রসুল ঃ ওফাতনামা ১১৯৭ বঙ্গাব্দ [১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে রচিত]

২৪. হায়দরউল্লাহ ঃ হাদিসবয়ান, কাজীনামা, সদাগরের কিস্‌সা [১৯ শতকের শেষপাদে]

২৫. খায়েরউদ্দীন ঃ আম্বিয়ানামা [১৯ শতক]

২৬. মুহম্মদ রফিক ঃ ইসলামভেদ [ঐ]

২৭. আব্দুল সোবহান ঃ দরবেশ ওয়ায়েজ ও জোবেদা খাতুন [১৯ শতক]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত আহমদ শরীফ সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাবিভাগ প্রকাশিত পুথিপরিচিতি গ্রন্থের পরিশিষ্টে উনিশ-বিশ শতক অবধি মধ্যযুগের কবিদের ও শায়েরদের এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের তালিকা রয়েছে।

খ. কবিওয়ালা ও কবিগান

কথকতার মাধ্যমে ধর্মকথা ও রসবার্তা প্রচারের রেওয়াজ সুপ্রাচীন। শ্রুতিস্মৃতির সহায়ক হিসেবে এবং মাধুর্যসৃষ্টির লক্ষ্যে পদ্যে কথা বলার রীতিও প্রাচীন। হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে কথকরা রামপাঁচালী, ভারতপাঁচালী, রাধা-কৃষ্ণ, হর-গৌরী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতির পরিচায়ক ধামালী গান করত। ক্রমে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় গোপীচাঁদ ময়নামতী লাউসেন ধনপতি শ্রীমন্ত চাঁদ বেহুলা লখীন্দর প্রভৃতির কাহিনী। এসব ছাড়াও নানা সাময়িক ও সমকালীন প্রাকৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং ঘরোয়া দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ও প্রণয়-বিরহ নিয়ে নানা গান-গাথা মুখে মুখে রচনা করেছেন গায়েন ও কথকরা। সে-ধারায় চাঞ্চল্যকর সাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত লোককবির কবিতাও। পনেরো শতক থেকে যখন উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে পাঁচালী লিখিত হচ্ছিল, তখনো কথকতার কিংবা গায়েনের আসরেব জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। [কেননা পাঁচালীগুলোও নৃত্যযোগে গীত হত]।

তখন মুসলমানরাও ইব্রাহিমনবীর কুরবানী, আইয়ুবনবীর দুর্ভাগ্য, মুসা-নবীর সওয়াল,মরিয়মবিবির কিসসা, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-খুসরু, কারবালা, হাতেমতাই, আমীরহামজা, গাজী প্রভৃতি বিষয়ক কথকতার আসর বসাত। সেকালে কবিমাত্রেই ছিলেন কথক ও গায়ক। তার লেশ ও রেশ রয়েছে উর্দু মোশায়েরায়।

সওয়াল-জওয়াব বা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে কথকতার রেওয়াজ আগেও ছিল। সওয়ালকে বা প্রশ্নকে বলে চাপান আর জওয়াবকে বা উত্তরকে বলে 'উতোর'। লোকরুচির অনুগত করে গাওয়া হতো বলে কথকতায় বা পাঁচালীতে আদিরস ও অশ্লীলতা কমবেশী চিরকালই ছিল। তাই কৃষ্ণধামালী আর শুক্লাধামালীর ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন।

সেকালের দেশ-দুনিয়া আজকের মতো ছিল না। তখন রেডিয়ো-টিভি ও সংবাদপত্র ছিল না। ছিল না ছাপাখানা। অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা ছিল ব্যাপক। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার অভাবে সুব্যবস্থা ছিল না যানবাহনের। কাজেই দেশ-দুনিয়া আজকের মতো তখনো অখণ্ড ও সংহত হয়ে ওঠেনি। তখন এই কথকরা এবং গায়েনেরাই ধর্মের কথা, ভাবের কথা, তত্ত্বের কথা, সাময়িক ঘটনার ও সমস্যার কথা, জগৎ-জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কথা লোকসমাজে প্রচার করত। এদের মাধ্যমেই হত জনসংযোগ। জনশিক্ষার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব ছিল এদেরই। সতেরো শতক অবধি দেশের লোকজীবনে ও জনসমাজে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীত চর্চার মাধ্যম ছিল এই কথকতার ও গানের আসর। কবি, কথক ও গায়েন ছিলেন লোক-শিক্ষক। ধর্ম, সমাজ, নীতি ও বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানদানই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সেই নিরক্ষরতার তামসযুগে শিক্ষার ও জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁরাই। বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তিপ্রয়োগে সত্যের উদঘাটন ছিল তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। গাঁয়ের অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের মনে সমাজ-চেতনা, ধর্মবোধ, সংস্কৃতিবাঞ্ছা, কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান জাগিয়ে জিইয়ে রাখতেন তাঁরাই। কাজেই লোকজীবনে তাঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

এমনি ধারায় আঠারো শতকের প্রথম পাদ অবধি চলছিল। কিন্তু বিদেশী বেনেদের দৌরাত্ম্যে মুঘলশাসনের শৈথিল্যে বাঙালীর আর্থিক সামাজিক ও প্রশাসনিক জীবনে বিপর্যয় শুরু হয় আঠারো শতকের গোড়া থেকেই। এর ফলে লোকজীবনে কিংবা সামন্তসমাজে সুখ-স্বস্তি বা শান্তি-শৃঙ্খলা আর রইল না। জীবনের ও জীবিকার নিরাপত্তা হলো দুর্লভ। মুদ্রামাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সামন্ত-সমাজের বিলুপ্তি ঘটিয়ে নিস্তরঙ্গ নিয়মবদ্ধ জীবনে নিয়ে এল নতুন রীতি-পদ্ধতিব অভিঘাত, তখন থেকেই নগর-বন্দর এলাকার জনজীবনে এল হতাশা বিকৃতি ও বিপর্যয়। এ সময়ে শহর-বন্দরের বেনে-ফড়ে-গোমস্তা-দালাল-দেওয়ান-আড়তদার প্রভৃতি পেশাজীবীরাই প্রভাব-প্রতাপের নতুন মধ্যশ্রেণী। তখন কাঁচা টাকার চমকলাগানো চোখধাঁধানো ভেলকিবাজির নতুন খেলার শুরু। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজ শাসনে তা প্রকটিত হলো চরম আকারে। পুরোনো সামন্তসমাজ গেল ভেঙে। শাহ-সামন্তের আশ্রয়ে ও প্রতিপোষণে যে-সব বিদ্যালয় ও যে-সকল কবি-পণ্ডিত লালিত হতেন, তাঁরা হয়ে পড়লেন নিরবলম্ব। শিক্ষা-সংস্কৃতি-কবিত্ব-পাণ্ডিত্য তখন বিপর্যয়ের ও বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তবু বিপর্যস্ত জীবনেও দেহ-মনের জৈবিক চাহিদাও মেটাতে হয়। তাই এই বিপর্যয়কালে নগরে বন্দরে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিকৃতমানস প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ভাঙা হাটে তখন আসর জমিয়েছে স্বল্পশিক্ষিত বিকৃতরুচির অকবির দল। কোলকাতার চুঁচুড়ার চন্দননগরের নগুরে শিল্পীরা তখন তাঁদের কুরুচি ও অক্ষমতা নিয়ে আসর দখল করেছেন। এই কবিরাই তুচ্ছার্থে কবিতাওয়ালাও নয়—কবিওয়ালা নামে অভিহিত হয়েছেন। সংস্কৃতিবান শিক্ষিতদের অবজ্ঞায় স্বাক্ষর রয়েছে ঐ নামের মধ্যেই। তাঁদের তর্কের আসরে ধর্মকথা হোক আর প্রণয়কথা হোক—নির্বিচারে অশ্লীল ও আদিরসের বন্যা বইয়ে দিতেন তাঁরা। এই কুরুচির পঙ্কসৃষ্টির জন্যে শহর-বন্দরের শ্রোতারাও ছিল দায়ী। এভাবে চলল প্রায় শতেক বছর, মোটামুটি-ভাবে বলতে গেলে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ অবধি। এর মধ্যে সৃষ্টি হল অশ্লীল খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা, প্রণয়সঙ্গীত, ভজন, পাঁচালী প্রভৃতি। এ শত বছরের কবিগান আমাদের দুর্যোগের দুঃস্বপ্নের দুর্দিনের ও দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। তখন কবিওয়ালার ও কবিগানের সমজদার ছিল স্বল্পবিদ্যার ও স্থূলরুচির নতুন ধনী বেনে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ান।

তারপরেও কবিগান মরেনি। হিন্দু-মুসলমানের পরিচর্যায় ও পরিশীলনে তা আজো ঈষৎ ভিন্নভাবে বেঁচে বর্তে রয়েছে। প্রতীচ্য শিক্ষার বিস্তারের ফলে এদেশের জনজীবনেও সুরুচি ও সুমতি ফিরে আসে। তখন থেকে কবিওয়ালারা তথা কবিয়ালেরাও আবার লোকশিক্ষকের গৌরবময় ভূমিকা পালন করছেন।

তাঁদের সর্ববিষয়ক জ্ঞান তথা সর্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি, তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁদের ন্যায়-প্রয়োগ পটুতা, তাঁদের তর্কনিষ্ঠা, বাক্‌পটুতা, বাকপ্রতিমা নির্মাণের আশ্চর্য কৌশল এবং পদ্য

রচনার বিস্ময়কর দ্রুততা আমাদের অভিভূত করে। দুই প্রতিপক্ষের বিতর্কে ও যোটকে সত্য উদ্ভাসনের আশ্চর্য কুশলতা আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। যদিও রেডিও সিনেমা ও সংবাদপত্র জনপ্রিয় হয়েছে, তবু কবিয়াল ও কবিগানের উপযোগ আমাদের দেশে আজো কম নয়। তাঁরা কেবল ঘরের ও ঘাটের কথাই জানান না, শুধু জীবনের সমাজের ও ধর্মের কথাই বলেন না, বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের—যথা শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতি বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতির সমস্যাও—আলোচনা করেন। জগতের হেন বিষয় কমই আছে, যাতে তাঁদের বলার অধিকার নেই। এই নিরক্ষরের দেশে কবিয়ালরা তাই আজো লোক-শিক্ষক, জনজীবনের চারণ কবি।

আঠারো-উনিশ শতকের বন্দর-নগরের কবিওয়ালা

কোলকাতার মুসলিমসমাজে দোভাষী শায়েরের উদ্ভবপ্রসঙ্গে আমরা দেশ-কালগত কারণ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। ব্রিটিশ কোম্পানীর নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থার ও মুদ্রানির্ভর বাণিজ্যনীতির আকস্মিক প্রয়োগে পুরোনো গ্রামীণ পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা ও সামন্তসমাজনীতি দ্রুত ভাঙছিল। এর জন্যে গণমানুষের যে-মানস ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল, তা তারা গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে নষ্ট হল সামন্তব্যবস্থার স্থিতি ও স্বস্তি, কিন্তু নতুন কোন স্পষ্ট ব্যবস্থায় স্থিতি পাওয়ার ও স্বস্থ হওয়ার আশ্বাসও ছিল অনুপস্থিত। পুরোনো অপসৃয়মান আর নতুন তখনো অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত।

নতুন পুরাতনের সেই গোধূলি লগ্নে সাধারণ মানুষের অবস্থানের, চিন্তা-চেতনার ও কর্ম-আচরণের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে দিবা-রাত্রির মিলন ক্ষণের উড়ন্ত পতঙ্গের সঙ্গে তুলিত করে।

সৃষ্টিশীল গাইয়েরা বাজিয়েরা শায়েরেরা কবিওয়ালারা সামন্ত-প্রতিপোষণের আশা হারিয়েছে, আভিজাত্যকামী নতুন সদাগর-ঠিকেদার-বেনে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ানের আশ্রয়প্রার্থীরা প্রতিপোষণবাঞ্ছায় পুরোনো বন্দরনগর ও নতুন রাজধানী শহর কোলকাতায় এসে ভীড় জমাল। মান-যশকামী নতুন কর্তারাও রসিক হয়ে উঠল বটে, কিন্তু ঐতিহ্যের অভাবে রস উপভোগের চালু কায়দা জানা ছিল না তাদের, জানা থাকলেও স্থানভেদে ও শহুরে জীবনযাত্রার পদ্ধতিভেদে সম্ভব হয়নি পুরোনো রাগ-তাল-মান চালু রাখা। কাজেই কালান্তরের গোধূলি লগ্নে কোলকাতা শহরের উপকণ্ঠবাসী গাইয়ে-বাজিয়েরা হাঁটাপথে জীবিকা-সন্ধানে কোলকাতায় এসে ধনীরসিকের পার্বণিক ও মৌসুমী রসপিপাসা চরিতার্থ করার কাজে লেগে গেল। শায়েরদের ও কবিওয়ালাদের পুরোনো রীতির শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল অবহেলা অর্থকর নয় বলে। নতুন শিক্ষা সংস্কৃতিও চালু হয়নি। তাই নতুন অস্পষ্ট পরিবেশে তাঁরা ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফলে তাঁদের অবস্থা তখন না ঘরকা না ঘাটকা—ঘরেও নয় ঘাটেও নয়—অনিশ্চিত মাঝখানে। তাই এসব রচনা ভাব-ভাষার ও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে তুচ্ছ। এগুলো আমাদের দুর্দিনের দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য–প্রমাণরূপে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবেই কেবল মূল্যবান। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ অবধি কোম্পানীর দৌরাত্ম্যের এ সময়-পরিসর ছিল বাঙলার ও বাঙালীর কালরাত্রি।

রবীন্দ্রনাথও কবিওয়ালা ও কবিগানের মূল্যায়নে অপ্রিয়সত্য উচ্চারণ করেছেন : "কিন্তু ইংরাজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যের রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল ? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া দুইদণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

আর কবিওয়ালারাও "পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণ জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি সংযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল... তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক

ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝনঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠকঠক শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে।" রচনা শিল্পোত্তীর্ণ না হবার কারণ 'এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিতমত রচিত।'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামবসুর হরুঠাকুরের ও নিতাইদাসের কোন কোন গীতের তারিফ করেও বলেছেন : "কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই"। ঈশ্বরগুপ্ত ব্যতীত উনিশ শতকের কোলকাতার আর কেউ কবিগানে গুরুত্ব দেননি, কবিওয়ালার প্রতি শ্রদ্ধারভাব পোষণ করেননি। প্রায় সবাই জঘন্য রুচির ও রসের নিন্দা করেছেন। ইংরেজি শিক্ষিতদের ঘৃণা এবং ক্ষোভ ছিল তীব্র। কবিকে কবিতাওয়ালাও নয়, কবিওয়ালা আখ্যাত করার মধ্যেই এ তীব্র ঘৃণা ক্ষোভ অবজ্ঞা সুপ্রকট।

তবু মানুষের কোন আন্তরিক প্রয়াস, কোন প্রাণের অকৃত্রিম প্রকাশ, কোন হৃদয়ের নিঃসঙ্কোচ অভিব্যক্তি কখনো বৃথা বা ব্যর্থ হয় না, সত্যের ও অনুভবের অকৃত্রিমতার জোরেই তা অপরের মর্মগ্রাহ্য হৃদয়বেদ্য হয়। কবিওয়ালাদের কারো কারো কিছু রচনাও তাই সাহিত্যপদবাচ্য এবং শিল্পোত্তীর্ণ।

কবিগানের বিষয়বস্তু ধর্ম ও শাস্ত্র সম্পৃক্ত। হরগৌরী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্বকথা ও জীবনকথা এবং লীলারস বিতর্ক-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোনানো ও প্রচার করাই ছিল লক্ষ্য। কাজেই এতেও সুপ্ত রয়েছে লোকগীতির মাধ্যমে লোকশিক্ষা দানের বাঞ্ছা। তবে স্বল্পশিক্ষিত রুচিহীন লোকের মনোরঞ্জন মানসে নিম্নরুচির কবিওয়ালা-রচিত এ সব গান বা কথা ব্যজস্তুতি হয়ে উঠেছে প্রায় তাঁদের অজ্ঞাতেই। প্রতিপক্ষকে জব্দ করাই যেখানে বিতর্কের আপাতলক্ষ্য ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সেখানে স্বল্পযুক্তি অঢেল কুকথাযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কথার তোড়ে রসের তরঙ্গে রঙ চড়ানোর তাগিদে দেবকথাও ক্রমে ইতর রঙ্গরসকথার রূপ নিয়েছে। ফলে কবিগান, সখীসম্বাদ, বিরহাকৃতি ক্রমে খেউরে, হাফ আখড়াইতে, আখড়াইতে ভাঁড়ামিতে, টপ্পাতে,রাগবিলাসে অবসিত হয়েছে। অবশ্য গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, হরিবংশ প্রভৃতিতে এবং গ্রামাঞ্চলের ধামালী-ঝুমুর-গম্ভীরা প্রভৃতিতে আদিরসের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। কাজেই এ শহুরে কবিগানের অশ্লীলতা কিংবা রুচিবিকৃতি এদেশে নতুন ছিল না। কাজেই কবিগান প্রায় উন্মোষকাল থেকেই প্রশস্তি [গুরু-দেবগীত..], সখীসম্বাদ, বিরহ ও খেউর দিয়ে শুরু।

গোঁজলা গুঁই, ভবানীবণিক, রাসু-নৃসিংহ, হরুঠাকুর, কেষ্টামুচি, নিতাই বৈরাগী, রামবসু, যজ্ঞেশ্বরী, ভোলাময়রা, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি, নিধুবাবু (রামনিধিগুপ্ত), মোহনচাঁদ, শ্রীধরকথক, রূপচাঁদ পক্ষী, দাশুরায় প্রমুখ কবিওয়ালা কবিগানের ক্ষেত্রে নানা গুণে দানে যশে অমর হয়ে রয়েছেন।

আঠারো শতকেব দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে কবিওয়ালা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল গোঁজলা ও তাঁর তিন শিষ্যের–রামজীদাস, লালুনন্দলাল, রঘুনাথ দাস—নাম আমাদের কাল অবধি অবিলুপ্ত রয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধেও কবি গান ছিল কি-না জানা নেই। ছিল অনুমান করলে তা পাঁচালী-কথকতার কিংবা যাত্রার অঙ্গীভূত ছিল বলে অনুমান করতে হবে।

গোঁজলা গুঁইর পরেই পাই কয়েকজন প্রখ্যাত কবিকে, এঁরা হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রামবসু, ভোলাময়রা ও আণ্টনী ফিরিঙ্গি। উনিশ শতকের আর যাঁরা খ্যাত প্রখ্যাত ছিলেন রাসু–নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, নিধুবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (কেষ্টামুচি) নীলমণি পাটনী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নীলুঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ, মোহন সরকার, পরাণচন্দ্র সিংহ, ভীমদাস মালাকার, ভবানী বেনে, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, নীলকমল, চিন্তামণি ময়রা, রামজীদাস, মাধব ময়রা, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির নাম নানাসূত্রে মেলে। পরিচিতি হারিয়ে গেছে অনেকেরই। কোন কোন কবিওয়ালা গান রচক ছিলেন। অন্যেরা অপরের বাঁধা গান গাইতেন মাত্র। অবশ্য একালের সিনেমার গান লেখকের মতো ফরমায়েসী গান বাঁধার পেশাধারী লোকও ছিলেন। গান লেখার

তেমন লোক ছিলেন কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, রামবসু, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, রামসুন্দর রায় প্রভৃতি। প্রখ্যাত হরুঠাকুর ছিলেন কথাকার, সুরকার এবং গায়ক। তাঁর বিখ্যাত চেলার নাম নীলুঠাকুর। ঈশ্বরগুপ্ত আর তাঁর শিষ্য মনোমোহন বসুও গান বাঁধতেন, তাঁরা সুরকার এবং গায়কও ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে বর্তমান ছিলেন রাসু, হরুঠাকুর, নিতাই (নিত্যানন্দ) বৈরাগী ও রামবসু। এ সময়টা ছিল কবিগানের স্বর্ণযুগ।

গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য রামজীর শিষ্য ছিলেন ভবানী বেনে আর ভবানী বেনের শিষ্য ছিলেন রামবসু। রঘুনাথদাসের শিষ্য ছিলেন রাসু ও নৃসিংহ দুইভাই এবং হরুঠাকুর [হরেকৃষ্ণ] আর হরুঠাকুরের শিষ্য ছিলেন নীলুঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও ভোলা ময়রা, লালুনন্দলালের শিষ্য ছিলেন প্রখ্যাত নিতাই বৈরাগী ওর্ফে নিত্যানন্দ দাস[১]।

অধিকাংশ কবিওয়ালা তাঁতী, শুঁড়ি, মুচি, হাঁড়ি, ময়রা প্রভৃতি বর্ণের ও বৃত্তির হলেও ব্রাহ্মণও ছিলেন অনেক, বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষার্ধে। ব্যতিক্রম কেবল অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি।

১. গোঁজলা গুঁই বিস্মৃতনাম আদি কবিওয়ালাদের একজন। ইনি আঠারো শতকের প্রথমার্ধের লোক। তাঁর তিন শিষ্য রঘুনাথ দাস, রামজীদাস ও লালুনন্দলাল। লালুনন্দলাল আসলে নাকি দুই ব্যক্তি।

২. লালুনন্দলাল ১৭৭৪ সনেও নাকি জীবিত ছিলেন, তাঁর শিষ্য নিতাই বৈরাগী ওর্ফে নিত্যানন্দদাস (১৭৫১–১৮১১)।

৩. রামজীদাস রচিত গান গাইতেন ভবানী বেনে। ভবানীবণিকের জন্ম বর্ধমানের অম্বিকা-কালনা চাকলায় গন্ধবণিক বংশে। কলকাতায় নিবাস ছিল বরাহনগরে।

৩ক. রঘুনাথদাস 'দাঁড়া' কবিপদ্ধতির প্রবর্তক বলে পরিকীর্তিত।

৪. রাসু ও নৃসিংহ এই দুইভাইয়ের জন্ম চন্দননগরের গোন্দলপাড়া গাঁয়ে এবং কায়স্থ পরিবারে। এঁদের পিতা আনন্দনাথ ফরাসী সামরিক বিভাগে মুহুরী ছিলেন। এঁদের মাতামহের বাড়ি ছিল চুঁচড়ায়। এঁদের উস্তাদ ছিলেন রঘুনাথদাস। ১৮০৭ সনে রাসুর এবং তাঁর কিছুকাল পরে নৃসিংহের মৃত্যু হয়।

৫. হরুঠাকুর ওর্ফে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গীর ১১৪৫ বঙ্গাব্দে বা ১৭৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতার সিমলায় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র। তিনি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড় ও লহর বিষয়ক গান রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

৬. কেষ্টামুচি ওর্ফে কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার আঠারো শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। ইনি যে-সব গান বাঁধতেন, সেগুলো অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গাইতেন। শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছিলেন।

৭. নিতাই বৈরাগী ওর্ফে নিত্যানন্দদাস বৈরাগীর ১১৫৮ বঙ্গাব্দে তথা ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে চন্দননগরে বৈষ্ণবের ঘরে জন্ম। পিতার নাম কুঞ্জদাস। ১৮২১খ্রীস্টাব্দে (১২২৮ বঙ্গাব্দে) সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর তিনপুত্রও ছিলেন কবিওয়ালা। ভক্ত বৈষ্ণব নিতাই অর্জিত অর্থে চুঁচড়ায় আখড়া এবং চন্দননগরে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

---

১ *কবিওয়ালা সম্বন্দে বিস্তৃত আলোচনা ও নানা তথ্য পাওয়া যাবে .*

ক. *ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবিজীবনী : ডক্টর ভবতোষ দত্ত।*

খ. *কবিওয়ালা : নরহরি কবিরাজ।*

গ. *প্রাচীন কবিসংগ্রহ : গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. গুপ্তরত্নোদ্ধার : কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ. বাঙলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৪র্থ খণ্ড : ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।*

চ. *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century : Dr. S. K. De.*

ছ. *প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান ঃ মনুলাল মিশ্র।*

জ. *প্রাচীন কবিওয়ালার গান ঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল প্রভৃতি গ্রন্থে।*

৮. রামবসু ওর্ফে রামমোহন বসুর ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাতীরে শালিখা গাঁয়ে কায়স্থ বংশে জন্ম এবং ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে অপরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার নাম রামলোচন বসু। রামবসু সামান্য ইংরেজি জানতেন এবং সওদাগরী অফিসে চাকরী করতেন। গানরচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। তাঁর বাঁধা গান গাইতেন ভবানী বেনে, নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি অনেক কবিওয়ালা।

রামবসু আসরে উত্তর-চাপানোর (প্রশ্নোত্তরের বা উত্তর প্রত্যুত্তরের) মাধ্যমে কবিগানের, যোটকের, কবিলড়াইয়ের প্রবর্তক বলে কথিত। আর মোহনচাঁদ বসু ছিলেন হাফ আখড়াই গানের স্রষ্টা। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা, ত্বরিত জবাব দেয়ার মতো যোগ্যতা প্রয়োজন হত এই উত্তর-চাপান পদ্ধতির লড়াইয়ে বা প্রতিযোগিতায়। ঈশ্বরগুপ্ত এঁর ১৪৮টি গান সংগ্রহ করেছিলেন। এ গানগুলো ছিল সখীসংবাদ, বিরহ, খেউর, লহর, সপ্তমী, শ্যামা ও টপ্পা।

৯. যজ্ঞেশ্বরী ও নীলমণি পাটনী...যজ্ঞেশ্বরী ছিলেন প্রথমে নীলু ঠাকুরের দলের গানলেখিকা, পরে তিনিও হন কবিওয়ালা। তিনি ও নীলমণি পাটনী ছিলেন মহিলা, সে-যুগের সমাজে এ ক্ষেত্রে তাঁরা অতুল্যা। নীলমণি পাটনীও গান বাঁধতেন।

১০. রামপ্রসাদ ও নীলুঠাকুর–এঁরা ভোলা ময়রার সমসাময়িক। রামবসুর সঙ্গে রামপ্রসাদের কবিলড়াই খুব জমত। রামপ্রসাদের ভাই নীলুঠাকুরও ছিলেন প্রখ্যাত কবিওয়ালা। নীলুঠাকুর প্রথমে হরুঠাকুরের চেলা ছিলেন, পরে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে এবং নীলুঠাকুর নতুন দল গঠন করেন।

১১. সাতুরায়—ইনি শান্তিপুরে জমিদারী দপ্তরে কাজ করতেন এবং ইনি ছিলেন জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায়ের কবিদলের গীতিকার। স্বয়ং ভোলা ময়রাও ছিলেন এঁর গানের সমজদার ও গ্রাহক।

১২. ভোলা ময়রা—এঁর এক গানে এঁর আত্মপরিচয় রয়েছে ঃ

আমি ভোলা ময়রা... ...	তবে যদি কবি পাই/হঠে কভু নাহি যাই
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে কবি বাস	ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ।
	হোক বেটা যতই মন্দ
পূজো এলে পুরিমিঠাই ভাজি।	জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও যাহাতে
	মিলাইয়া দাও

অতএব ভোলা ময়রার কোলকাতায় নিবাস এবং তাঁর মিষ্টির দোকানও ছিল। কবির লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ থাকতেন বলাই সরকার, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ও হোসেন খাঁ। অশিষ্ট ও অশ্লীল কথায় ও গানে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তাঁর দ্বিধা সংকোচ ছিল না। ভোলা ময়রার প্রায় সত্তরোর্ধ্ব বয়সে মৃত্যু হয়।

১৩. হোসেন খাঁর নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদে। তাঁকেই আমরা তখনকার একমাত্র মুসলিম কবিওয়ালরূপে পাই, যেমন পাই খ্রীস্টান ও বিদেশী অ্যান্টনী ফিরিঙ্গীকে।

১৪. অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী ওর্ফে Hensman Anthony। ইনি ছিলেন পর্তুগীজ খ্রীস্টান। পিতা ফরাসী ফরাসডাঙ্গায় ব্যবসাসূত্রে বাস করতেন। অ্যান্টনীর এক ভাইও ছিল, নাম কেলি বা কালু সাহেব। অ্যান্টনীর ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে পরিণত বয়সে মৃত্যু হয়। অ্যান্টনী এক ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেন, সে- সূত্রেই বাঙলার ও বাঙালীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তাঁর উক্তি 'এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।' ইনি হিন্দুপুরাণ অধিগত করেছিলেন এবং কবিওয়ালা হিসেবে পরতেন ধুতি-চাদর। কবি লড়াইতে তাঁর সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতেন ভোলা ময়রা, ঠাকুরসিংহ, রামবসু প্রভৃতি।

১৫. নিধুবাবু ওর্ফে রামনিধি গুপ্ত ছিলেন প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় টপ্পালেখক ও গায়ক। তাঁর কবিত্ব খ্যাতিও ছিল দেশব্যাপী। 'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশীর ভাষা, পূরে কি

আশা'–এ তাঁরই প্রখ্যাত উক্তি। নিধুবাবুর রচিত সঙ্গীতসংকলন গ্রন্থের নাম গীতরত্ন। নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত ১২৬৩ বঙ্গাব্দে গীতরত্নের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তিনি পিতা সম্বন্ধে সে-সূত্রে নানা তথ্যও পরিবেশন করেছিলেন। ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে নিধুবাবু হুগলী জেলার ত্রিবেণী অঞ্চলের চাঁপ্‌তা গ্রামে মাতামহগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত, তিনি কলকাতায় কুমারটুলিতে চিকিৎসক তথা কবিরাজ ছিলেন। কুমারটুলিতেই ছিল নিধুবাবুর নিবাস। তিনি সেকালের মাপে বিদ্বান ছিলেন। ফারসী, ইংরেজী ও হিন্দি জানতেন তিনি। খেয়াল ও টপ্পা ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গীত। বাঙলা সঙ্গীতে তাঁর উস্তাদ ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেবের সভাসদ কুলুই চন্দ্র সেন। পরপর দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে নিধুবাবু তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সন্তানের জনক হন। তিনি প্রথমবয়সে বিহারের ছাপরায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী ছিলেন. ঘুষ গ্রহণের দায়ে তাঁর চাকরী যায়। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আটানব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৬. কালী মীর্জা–এঁর রচিত সঙ্গীতগুলো 'গীতিলহরী' নামের গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। ইনিও টপ্পা সঙ্গীতের জন্যেই প্রখ্যাত। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে কালী মীর্জা ওর্ফে কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের গুপ্তিপাড়ায় জন্ম। এঁর ভাইয়ের নাম রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। কাশীতে, লক্ষ্ণৌয়ে ও দিল্লীতে বাসকালে তিনি শাস্ত্র ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে এবং মুসলিম উস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে বর্ধমানরাজ প্রতাপচন্দ্রের সভায় ছিলেন কিছুকাল। পরে কোলতাকায় জমিদার গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিপোষণ পান। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের অল্পকিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মুঘলাই আচার-আচরণ ও আদব-লেহাজ অনুসরণ করতেন বলেই নাকি তিনি লোকমুখে 'মীর্জা' নামে খ্যাত হন।

১৭. শ্রীধর কথকও ছিলেন প্রেম ও ভক্তিমূলক টপ্পাকার। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে হুগলী বাঁশবেড়িয়া গাঁয়ে পণ্ডিত ও কথক বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণি স্ব-অঞ্চলে পাণ্ডিত্যের জন্যে প্রখ্যাত ছিলেন। পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণও ছিলেন প্রসিদ্ধ কথক। বিখ্যাত—ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে সখি, আমায় ধর ধর, ওই যায় যায়, চায় ফিরে সজল নয়নে প্রভৃতি গান নাকি নিধুবাবুর নামে চললেও আসলে শ্রীধর কথকেরই রচনা।

১৮. রূপচাঁদ দাস পক্ষী—রূপচাঁদ দাস ছিলেন উড়ে। তাঁর পিতার নাম গৌরহরিদাস মহাপাত্র, নিবাস ছিল উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকটে। রূপচাঁদের জন্ম ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। পাঁচালীতে, হাফআখড়াইয়ে ও ঘেঁটুগানে ছিল তাঁর আবাল্য আকর্ষণ। যৌবনে তিনি ছিলেন বাগবাজারের পাঁচালী–দলের মালিক। এ দল পক্ষীরদল নামে ছিল প্রখ্যাত। রূপচাঁদের নানা-বিষয়ক ২১১টি গান সঙ্গীতরসকল্লোলে সংকলিত রয়েছে। এঁর গানের ভাষায়, ভঙ্গিতে ও বিষয়ে ছিল সমকালীনতা। পাঁচালী, হাফআখড়াই, যাত্রা, ঢপ, গাজনের সঙ প্রভৃতি সর্বপ্রকার গানই রচনা করেছিলেন তিনি। কৌতুক রঙ্গ পরিহাস ও ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে ছিল তাঁর আগ্রহ।

১৯. মধুকান ওর্ফে মধুসূদন কিন্নর ছিলেন দেশনন্দিত ঢপকীর্তনকার। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময়ে ছাতুবাবু (আশুতোষদেব), শিবচন্দ্র সরকার, দয়ালচাঁদ মিত্র, জগন্নাথ, প্রসাদবসুমিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিমোহন রায়, যদুনাথ ঘোষ প্রমুখ অনেকেই বাঙলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে কোলকাতা শহরে খ্যাতিমান ছিলেন।

২০. দাশরথিরায় ওর্ফে দাশুরায়– কবিগানে যেমন গোঁজলা গুঁই ও রামবসু, যাত্রায় যেমন গোবিন্দ অধিকারী, হাফ আখড়াইয়ে যেমন মোহনচাঁদ বসু, টপ্পায় যেমন নিধুবাবু, পাঁচালীতে তেমনি দাশুরায় অতুল্য। তাঁর আত্মপরিচয় রয়েছে তাঁর রচনায়। তা থেকে জানা যায় বর্ধমানের অধীন বাঁধমূড়া গাঁয়ে তাঁর নিবাস। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায় (শর্মা)। অগ্রদ্বীপের নিকটে পীলা গ্রামে ছিল তাঁর মাতুলালয়। মাতুলের নাম রামজীবন

চক্রবর্তী। ১২১২ বঙ্গাব্দে তথা ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে কাটোয়া অঞ্চলের বাঁদমূড়াগাঁয়ে জন্ম এবং ১২৬৬ বঙ্গাব্দে তথা ১৮৫৯ খ্রীস্টব্দে দাশরথি রায়ের মৃত্যু হয়। দাশরথি রায়ের গান গাঁয়ে গঞ্জে ও শহরে নারী পুরুষ নির্বিশেষের প্রিয় ছিল। দাশুরায়ের পাঁচালীতে সমকালের সমশ্রেণীর মানুষের জীবন চেতনার ও জগৎ-ভাবনার, রুচির ও আকাঙ্ক্ষার কিছু প্রতিবিম্বিত রূপ মেলে। ব্রজমোহন রায়, কৃষ্ণধন দে, নন্দলাল, মনোমোহন বসু প্রমুখ পাঁচালীর ক্ষেত্রে দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য ও উত্তরসাধক।

বৈষ্ণব পদাবলীর দেশে ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্য রচিত হওয়ার পরে কবিগান সাহিত্যকর্ম হিসেবে নিন্দা ছাড়া প্রশংসা পেতে পারে না। এ হচ্ছে জাতীয় দুর্যোগের দুর্দিনের ও দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য—গৌরব-গর্বের নয়। দেশের মানুষের রাষ্ট্রিক আর্থিক শাস্ত্রিক নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় কালে রচিত বলেই প্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্যচেতনায়, আঙ্গিকে, ভাষায়, ভঙ্গিতে, আদর্শে ও রুচিতে এ অপকর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

ষোড়শ অধ্যায়
বিবিধ রচনা

ইতিহাসের উপকরণ ঃ বাস্তব ঘটনানির্ভর রচনা

ক. মানুষমাত্রই দেশ, কাল ও প্রতিবেশের সৃষ্টি। সামাজিক পরিবেশ, নৈতিক চেতনা, শৈক্ষিক মান, আর্থিক অবস্থান, পারিবারিক ঐতিহ্য, ঘরোয়া আচরণ, শাস্ত্রিক নিয়মনীতি, দৈশিক রীতিরেওয়াজ একজন মানুষের মনমেজাজ ও চাওয়া-পাওয়া নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। জীবিকার ক্ষেত্র এবং জীবনপ্রতিবেশই মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা সঙ্কীর্ণ খাতে কিংবা বিস্তৃত পরিসরে প্রবাহিত করায়।

এ কারণে মানুষের চিন্তায় চেতনায় মনে মেজাজে কর্মে আচরণে দেশ-কাল-অবস্থান নিরপেক্ষতা নেই। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ, মন-মেজাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্থানিক কালিক ও ব্যক্তিক প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত বা চাহিদায় নিয়ন্ত্রিত। এজন্যে মানুষ যখন এক মানস-চাহিদা পূরণের জন্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো দিগন্তহীন দেশ-কাল-ব্যক্তি নিরপেক্ষ কল্পনার আকাশে বিচরণ করে, তখনো সে মাটি ও মানুষের ছোঁয়া একেবারে এড়িয়ে চলতে পারে না। কারণ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁর এ বিহারের পুঁজি, তাঁর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যটনের পাথেয়, দেও-দানব-জীন-পরী-ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষের জগৎসৃষ্টির সহায়, তা পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বাস্তবে মাটি ও মানুষ থেকে পাওয়া সম্পদ। তাই দেব-দৈত্যের ও জীন-পরীর জগতে এবং জীবনেও মাটির মানুষের সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার আশা-নিরাশার ভয়-ভরসার ছায়াও গভীর আর ব্যাপকভাবেই থাকে। যে বিষয়েই, যার নামেই, যেখানেই, যার কথাই বলা হোক, তা পরোক্ষে দেশ-কালগত মানুষের কথাই হয়ে ওঠে। কারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনার ভিত্তি ও উৎসই হচ্ছে জীবন। জীবন জীবিকা-নির্ভর, সমাজ-শাস্ত্র-সরকার নিয়ন্ত্রিত, আর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, ভয়-ভরসা ও আশা-নিরাশা ঘেরা। এ কারণেই মানুষের কর্ম-আচরণ হচ্ছে মানুষের অন্তরের চাওয়া-পাওয়ারই—অনুভব-অভিপ্রায়েরই বিম্বিত দর্পণ।

তাই মানুষ যখন রূপকথা বলে, যখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে, যখন পথে হাঁটে, যখন খেলায় মাতে, যখন নাচে মজে, তখনো সে আনমনে নিজেকেই বয়ে চলে, আত্মবিস্মৃতি ঘটে না কখনো।

এ জন্যেই মানুষ প্রতিবেশকে ভুলে থাকতে পারে না। রূপকথা বা পরের কথা বলতে গিয়েও প্রাসঙ্গিক বা আকস্মিক উচ্চারণে সে নিজের কথাও কখনো কখনো বলে ফেলে। তাতেই মানুষের রচনায় চিরকাল আপাত আকস্মিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে স্বকাল, স্বদেশ ও স্বজন ছায়া ফেলে,—নিজের বা পরের জীবনের বাস্তব ঘটনাও রচনায় বিন্যস্ত হয়ে যায়।

তাই আদিকাল থেকেই আমরা সাহিত্যেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ঘটনা ও ব্যক্তি সম্বন্ধে ছড়িয়ে থাকা বা ছিটকে পড়া কিছু তথ্য পেয়ে যাই। সেগুলো ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানের ও সত্য নিরূপণের সূত্র হিসেবে কাজ করে। কম হলেও ঐতিহাসিক তথ্যের তেমন সূত্র বা উপাদান রচনাতেও মেলে।

শেখ শুভোদয়ায়, গীতগাবিন্দে, আর্যাসপ্তশতীতে, বল্লালচরিতে কিংবা লক্ষ্মণ সেনের অন্যান্য অমাত্যদের রচনায়, সন্ধ্যাকর নন্দী প্রমুখ কবির রচনায় যেমন নানা ঐতিহাসিক ঘটনার ও ব্যক্তির উল্লেখ ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি বাঙলা রচনায়ও তার অভাব নেই। তবে প্রকৃত ও সুস্পষ্ট সত্য ও তথ্য উদ্ধার করা শ্রম বুদ্ধি আর সহযোগী উপদানের প্রাপ্তি সাপেক্ষ।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের ইতিহাসচেতনা ছিল না। সেজন্যে সমকালীন কোন প্রাকৃতিক, সামাজিক, সামরিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ সাধারণত কারো মধ্যে দেখা যায়নি। শ্রুতি-স্মৃতিতে যতদিন টিকল তো টিকলই, নইলে বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেল। তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধির কিছুই অনুভব করেনি কেউ। এমন কি এ দেশে দরবারী ইতিহাসের সংখ্যাও বেশি নয়। সাধারণ ভাবে ইতিহাসের গুরুত্বচেতনা ছিল বিরল ব্যাপার। যে-কয়খানা দরবারী ইতিহাস মেলে, তাও প্রায় দিল্লীর, সামন্ত-সভায় এ প্রয়াস প্রায় দুর্লক্ষ্য এ কারণে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। কালপ্রবাহে হারিয়ে যাওয়া জীবনধারার ছিটেফোঁটা হয়তো আজো এখানে সেখানে গুহাশ্রয়ী হয়ে রয়েছে। কিন্তু পুরোনো মৃতের ছেঁড়া ভাঙা কঙ্কালে অবয়বের বর্ণ ও রূপ আর কখনো মিলবে না।

তবু কোন দুর্লভ মুহূর্তে অনুভবের স্বর্ণকৌটায় কেউ কেউ কোন কোন ঘটনা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। এবং আবেগ-বিহ্বলতায় তা বর্ণনাও করেছেন। এভাবে আমরা ময়মনসিংহ গীতিকায় কিংবা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় কয়েকটি ঐতিহাসিক চিত্র পাচ্ছি। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ কিংবা সিরাজুদ্দৌলার মীরকাশিমের গাথাও এ ধরনের রচনা। এগুলো ছাড়া আরো কিছু কিছু এমনি গান গাথা ইতিহাস ও কিংবদন্তী ছড়িয়ে রয়েছে লোক-সাহিত্যে ও লোক-মুখে।

কিন্তু এসব সৃজনশীল রসিক লোকের রচনা। কথকতার মাধ্যমে পল্লবিত কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলে শ্রোতার মন জয় করাই ছিল এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা জানি 'সে কহে বিস্তার মিছা যে কহে বিস্তার।' কাজেই বাক্‌জাল বিস্তার করে শ্রোতাকে অভিভূত করাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে তিলকে তাল সত্যকে সুন্দর এবং রূপকে রঞ্জিত করতে হয়। এবং সত্য যেমন অতিরঞ্জিত হয়ে মিথ্যার আকার নেয়, তেমনি মিথ্যাও বাক্‌পটুতায় ও পৌনঃপুনিকতায় সত্য হয়ে ওঠে। কাজেই সৃজনশীল সাহিত্যিকদের রচনায় ইতিহাসের ছায়া মেলে, কায়া থাকে অলক্ষ্যে।

'কবিগণে রচি যদি কহে মিথ্যা কথা / সর্বলোকে সত্য হেন জানএ সর্বথা'।

তবু ইতিহাস-বিরল দেশে এরও মূল্য আছে বলে আজ এমনি ঐতিহাসিক কাব্যের পরিচয় তুলে ধরতে চাই।

আমাদের গীতিকায়, ধর্মমঙ্গলে, গৌরাঙ্গবিজয়ে কিংবা কৃত্তিবাসের মুকুন্দরামের কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের, শ্রীকর নন্দীর, দৌলতউজির বাহরাম খানের, মুহম্মদ খানের, শাবারিদ খানের, আলাউলের, নওয়াজিস খানের, নসরুল্লাহ খোন্দকারের আত্মকথায়, বৈষ্ণবচরিত গ্রন্থে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, পীরপাঁচালীতে, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায়, শমশেরগাজীনামায়, মহারাষ্ট্রপুরাণে, বিদ্রোহী ফকির কাহিনীতে এবং নানা স্থানিক ও সাময়িক ঘটনা নিয়ে রচিত ছড়া, গান, কবিতা ও গাথায় ইতিহাসের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে এবং ইতিহাস রচনায় ও গবেষণা কর্মে সে-সব সূত্র ও তথ্য ব্যবহৃতও হয়েছে।

লিখিতভাবে হোক কিংবা মুখে মুখে হোক গান চিরকালই রচিত হয়েছে, রচিত হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্রও। অন্য ধরনের সাময়িক ঘটনা নিয়ে হয়তো আগেও পদবন্ধ রচিত হত। কালে সেগুলো লোপ পেয়েছে, আমাদের হাতে এসেছে কেবল আঠারো শতকের শেষার্ধের এবং উনিশ শতকের দুচারটে ছড়া, গান ও পদবন্ধ। কালিক নৈকট্যের ফলেই এগুলো চালু ছিল শ্রুতিস্মৃতিরূপে সীমিত অঞ্চলে অথবা লিখিত কাগজে ছিল বিনষ্টির অপেক্ষায়।

অথবা কালপ্রভাবে এ ধরনের ব্যক্তির ও ঘটনার গুরুত্বচেতনাপ্রসূত সাময়িক রচনার রেওয়াজ আঠারো শতকের শেষার্ধেই চালু হতে থাকে কোলকাতায় যখন কবিওয়ালাদের আসর জমজমাট এবং কবিওয়ালাদের প্রভাবেই রচিত হতে থাকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিভিন্ন স্থানীয় বিষয় নিয়ে পদবন্ধ। এ সূত্রে সাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত শিক্ষাদান লক্ষ্যে শাস্তিদানমূলক রচনা গাজন-গম্ভীরার কথাও স্মর্তব্য। এ পদবন্ধগুলোর বিষয় সাধারণত ব্যক্তি প্রশস্তি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তথ্য ও পরিণাম বর্ণন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুন প্রেম প্রভৃতি। রাজার হাতবদলের, জাতবদলের, দেশ বদলের ও ধর্মবদলের ফলে যে নীতি রীতির বদল হল, তাতে ১৭৭২-৮২ সনের মধ্যেই যে কয়েকটি

জমিদার-রায়ত বিদ্রোহ ঘটে গেল, তাও গণচেতনার উদ্ভবের, দ্রুত বিকাশের ও মন-মননে যুগান্তরের কারণ হতে পারে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি রচিত এরূপ ছড়ার, গানের, গাথার, পাঁচালীর বা পদবন্ধের মূল্য রয়েছে ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে। তারপরে যখন আধুনিক জীবনচেতনা ও জীবনযাত্রা প্রায় পরিপূর্ণ ভাবে শহরে শহরে শুরু হয়ে গেছে, ছাপাখানার বদৌলতে বইপত্রেই সব খবর লিপিবদ্ধ হচ্ছে, তখনকার রচনা সমকালীনতার অভাবপ্রসূত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অভিব্যক্তি বলে মানতে হবে। সেকারণেই সে-সব রচনাকে প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা হিসেবে কদর করা হয় না, যদিও রচয়িতারা ছিলেন শতকরা পঁচানব্বই জনেরই প্রতিনিধি।

ক. **মহারাষ্ট্রপুরাণ বা ভাস্কর পরাভব**—কবি গঙ্গারাম হয়তো সব কয়টি বর্গী আক্রমণের বিবরণ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন, ভাস্কর- পরাভব অংশ সমাপ্ত হওয়ার পরে কোন কারণে বা আয়ুর অভাবে আর অগ্রসর হতে পারেননি। অথবা কেবল ভাস্করনিধন অবধি রচনাই তাঁর লক্ষ্য ছিল, পছন্দসই দুটো নামের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি বলেই দ্বিধাগ্রস্ত কবি দুটো নামই ব্যবহার করেছেন। বিশেষত পুরাণের ও মঙ্গল কাব্যের আদলে ও আবরণে পৃথিবী ব্রহ্মা, শিব ও নন্দীকে জড়িয়ে যে কাহিনীর শুরু তার নাম মহারাষ্ট্রপুরাণ রাখাই কবি সমীচীন মনে করেছেন, আবার মূল বক্তব্যও সুনির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তাই এ 'ভাস্করপরাভব' নাম। গঙ্গারাম [দেব] কায়স্থ বংশীয়। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের 'ধারীশ্বর' গ্রামে তাঁর জন্ম। ওই গাঁয়ে তাঁর জ্ঞাতিরা আজো বাস করে। তিনি জঙ্গলবাড়ির ঈসাখান-বংশীয় জমিদারের কর্মচারী ছিলেন, বিদ্বানদের অনুমান সে সুত্রেই তিনি মুর্শিদাবাদের নওয়াব দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে নানা কাজে যাতায়াত করতেন। এবং বর্গীর হাঙ্গামা তিনি হয়তো প্রত্যক্ষও করেছেন অথবা বর্গীর নারী ধর্ষণ নরহত্যা লুটতরাজের চিহ্ন অগ্নিদগ্ধ ঘর বাড়ি তরুলতা গ্রাম নগর স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই তাঁর বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের মতো বাস্তব ও বিশ্বাস্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথির পুষ্পিকা এরূপ ঃ

'ইতি মহারাষ্ট্রপুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব শকাব্দা
১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল। তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার।'

এ পুষ্পিকা যদি লিপিকর প্রদত্ত হয়, তা হলে একাধিক প্রশ্ন জাগে ; ১. গ্রন্থে আরো কাণ্ড ছিল, লিপিকর কেবল প্রথম কাণ্ডেরই প্রতিলিপি তৈরি করেছেন। ২. লিপিকর পুথির নাম মহারাষ্ট্রপুরাণ এবং সমাপ্তি অংশে ভাস্করপরাভব দেখে এটিকে বড় কাব্যের প্রথম কাণ্ড বলে ভেবে নিয়েছিলেন। ৩. পুষ্পিকার ভাষা বিন্যাস ও সন তারিখ বিন্যাস দেখে মনে হয়, এটি কবিরচিত পুষ্পিকা নয়। ৪. কাজেই লিপিকাল মূলগ্রন্থ রচিত হবার অব্যবহিত পরের না হোক দু' চার বছরের মধ্যেকার বলে মানতে হবে, কারণ ১৭৪১-৪৪ খ্রীস্টাব্দের ঘটনাই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে এ পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। যেভাবেই হোক ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে বা তার আগেই 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচিত হয়েছে। ময়মনসিংহ-এর ইতিহাসের লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারাম বচিত 'শুক-সম্বাদ' ও 'লবকুশ চরিত্র' নামের দুটো পুথিও কবির জ্ঞাতি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

বর্গী যদি 'বর্গীর' শব্দজ হয়, তা হলে এর অর্থ অশ্বারোহী দস্যু আর 'বর্গা' শব্দজ হলে এর অর্থ হবে ভাগী বা ভাগদার—ফসলের বা রাজস্বের ভাগী বা ভাগদার। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি আট বছর ধরে নওয়াব আলিবর্দীর আমলে মারাঠী বর্গীরা প্রায় প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ও উড়িষ্যায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলা প্রেরিত বর্গীসর্দার ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ সনে ৩১শে মার্চ তারিখে আলিবর্দীর ছলনায় ও কৌশলে নিহত হন। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—"বর্গীর হাঙ্গামা একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ধনে প্রাণে সর্বনাশ করিয়াছিল। সেই ব্যাপক ক্ষতি ও অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন বাঙালী কোন দিনই ভুলিতে পারে নাই। —বর্গী এলো দেশে এই ছড়া গাহিয়া মায়েরা শিশুদের শান্ত করিত। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সবদিক দিয়াই বর্গীর অভিযান বাঙালীর মনে তীব্র ঘৃণা বিতৃষ্ণা ও

প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। —বাঙলায় মারাঠা লুঠেরা বর্গী অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া—হত্যা ধর্ষণ ইত্যাদি নারকীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছিল।" এখানেই শেষ নয়, বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা কর এবং উড়িষ্যার চৌথ পাওয়ার শর্তেই এ ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হনন ও দহন বন্ধ করেন নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা। প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারামের বর্ণিত বর্গীর অত্যাচারের রূপ ঃ

১. মাঘে ঘেরিয়া বর্গী তবে দেয় সাড়া	তবে মাঠে লুটিয়া বর্গী গ্রামে সাঁধাএ
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া।	বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ।—
কারু হাত কাটে কারু নাক কান	কাহুকে বাঁধে বর্গী দিয়া পিঠমোড়া
একি চোটে কারু বধএ পরাণ।	চিৎ কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত যত ধইরা লৈয়া যাএ	রুপি দেহ রুপি দেহ বলে বারে বারে।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বেঁধে দেয় তার গলাএ।	রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।
একজনে ছাড়ে তারে অন্য জনা ধরে	কাহুকে ধইরা বর্গী পুকুরে ডুবাএ
রমণের ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে।	ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যাএ।—
এই মতে বর্গী কত পাপ কর্ম কইরা	এমনি—ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল
সেই সব স্ত্রীলোক যত দেয় সব ছাইড়া।	গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল।
২. মুদা বাণিয়া যত বার হৈতে নারে	গন্ধ-বণিক পলাএ দোকান লৈয়া যত
লুটে কাটে মারে ছামুত্তে পাএ যারে।	তাম্মাপিতল লৈয়া কাসারি পলাএ কত।
বর্গীর তরাসে কেহ বাহির না হএ।—	ভাল মানুষের স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে
তবে সব বর্গী গ্রাম লুটিতে লাগিল	বর্গীর পলানে পটারি লইল মাথে।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল। -	সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল
ব্রাহ্মণ পলাএ পুথির ভার লইয়া	বর্গীর নাম শুইনা সব পলাইল।—
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি	সিকদার পাটআরি যত গ্রামে ছিল
লৈয়া	বর্গীর নাম শুইনা সব পালাইল।

গঙ্গারামের কাব্য নামে পুরাণ হলেও স্বরূপে কবির স্বকালের স্বদেশের রাজনীতি সম্পৃক্ত এক টুকরো ইতিহাস এবং অমানবিক অত্যাচারের একটি বীভৎস চিত্র, একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আর একটি মূলবান দলিল। চট্টগ্রামে বহুল প্রচলিত'মালেকাবানু-মনু মিয়ার' সওলা নামের গাথাও দুই জমিদার পরিবারের মধ্যে বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে রচিত আর শাবিরিদ খানের পদবন্ধও [উপাখ্যান অধ্যায়ে উদ্ধৃত] এ সূত্রে স্মর্তব্য।

খ. পাঠান প্রশংসা—পাঠান প্রশংসা[১] —গুলেবকাউলি উপাখ্যান রচয়িতা নওয়াজিস খানের (মৃঃ ১৭৬৭ খ্রীঃ) পরিচিতি উপাখ্যান অধ্যায়ে রয়েছে, তিনি পাঠান প্রশংসা, জোরওয়াসিংহ স্তুতি এবং গীতাবলীও রচনা করেছিলেন।

১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর পুত্র বুর্জগ উমেদ খানের সৈনাপত্যে শঙ্খনদ অবধি উত্তর ও মধ্য চট্টগ্রাম জয় করেন। তখন শঙ্খনদের তীরে দু'জন এক হাজারী মনসবদারকে সীমান্তরক্ষী সেনানী নিযুক্ত রাখেন। এদের থানা বা শিবির স্থলটি দোহাজারী নামে খ্যাত হয়। এদের একজন রোহিলাখণ্ডের নওয়াব বাহাদুর খানের পুত্র আধুখান অপরজন লক্ষ্মণ সিংহ বা লছমন সিংহ। এদের বংশধরেরা দোহাজারীতেই স্থানীয়ভাবে বাস করতেন। কবি নওয়াজিস খানের নিবাস শঙ্খনদের অদূরে সাতকানিয়ার সুখছড়ি গাঁয়ে। বৈষয়িক অর্থাৎ জমিজমা বিষয়ক সুবিধাপ্রাপ্তির জন্যেই কবি আধুখানের পুত্র শেরজামাল খানের এবং লছমন সিংহের পুত্র জোরওয়ারসিংহের ক্ষুদ্র কসিদা বা প্রশস্তি রচনা করেছেন।

---

১. পুথি পরিচিতি, পৃ ৩৫৭-০৮, ৩০৮-০৯।

পাঠানপ্রশংসায় জমিদারকে কবির কোন পুস্তকের আদেষ্টা হবার জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন কবি ঃ

শ্রীমুখে আজ্ঞা যদি করে রচিবার
পুস্তক পূর্ণিতা হেন করিমু সত্বর।—
মহাজনে নাম হেতু করে প্রাণপণ
কি করিব রাজপাট কি করিব ধন।—
না রহে ভাণ্ডারধন রত্ন লক্ষাবধি

কবির কবিতা রহে প্রলয় অবধি।
কবিগনে রচি যদি কহে মিথ্যা কথা
সর্বলোকে সত্য হেন জানএ সর্বথা।
এই লাগি মহাজনে কবি সন্তোষএ
কবি হোন্তে আপনা প্রশংসা নাম রহে।

পৃথক পত্রে[২] 'স-'কে আদ্যবর্ণ করে রচিত আরো একটি পদবন্ধ আছে, ভণিতা নেই। তবে অনুমান করি, এটিও নওয়াজিস খানের রচিত। এ পদবন্ধে উল্লেখিত একজন হচ্ছেন আঠারো শতকের জমিদার দেয়াঙবাসী হোসেন খান, তিনি বেলচূড়ার প্রসিদ্ধ কালাবিবি চৌধুরীর পূর্বপুরুষ এবং দ্বিতীয় জন হোসেনপুত্র
রহমত খান—

সুভস্থান সু-দিয়াঙ্গ সেদেশের নাম—
সুনাম শ্রীযুত যে হোসেন নাম—
সুপুত্র জন্মিল এক (অতুল) বাখান

সুরঙ্গে হোসেন নৃপ গেল স্বর্গ স্থান।
সুভপূর্ণ শ্রীযুত রহমত খান।—

অন্য এক পত্রে আধু খান হাজারীর পুত্র শের জামাল খানের বিবাহের উল্লেখ রয়েছে[১]

তবে আধুখাঁএ মনে চিন্তিতে লাগিল
পুত্রে বিবাহ করাইতে মনে ত ইচ্ছিল।

শের জামাল খান বিয়ে করেন আমানত খানের ভগ্নীকে ঃ

শ্রীযুত আমানত খান গুণনিধি
তান ভগ্নী সত্যবতী ছিল একজন

শেরজমা খাঁ নৃপতির হৈল রমণী।—
আধু খাঁ নৃপতি তবে স্বর্গে চলি গেল।

এ সঙ্গে রয়েছে মঙ্গদনগরের (?) জমিদার 'শ্রীযুত গোলাম আলী সিকদারের তারিফ। এটিও মসজিদের জন্যে ভূমিদান চাওয়ার আবেদনমূলক রচনা ঃ

নাম তোমা শ্রীযুত গোলামালী সিকদার
চৌদিকে প্রশংসা পূর্ণ মহিমা তোমার।
আপনার স্থানেত কিঞ্চিত মাগি ভূমি

প্রভুর গৃহের হেতু যদি দেও ভূমি।
'দাতাধন্য' লোক দেখি কহি বারেবার
ভূমিদান করি কর মহিমা প্রচার।

গ. এবার জোরওয়ারসিংহ প্রশস্তি।[২] কবি বলছেন ঃ

মুই হীন প্রতিদিনে মাগি প্রভু স্থান
শ্রীযুত জোরওয়ার সিংহ হৈতে কল্যাণ।

এ প্রার্থনা নিঃস্বার্থ নয়। জোরওয়ার সিংহ থেকে জমি চান কবি ঃ

তোমা পিতৃ দান দিচ্ছে সুফলিথ ভূমি
উচ্চ গিরি বন দান মোকে দেও তুমি।

জোরওয়ার সিঙ্গ নৃপ কৃতি শতগুণ
পদবন্ধ রচি কহে নওয়াজিস খান।

লক্ষণীয় আঠারো শতকের প্রথমার্ধের কবি নওয়াজিস খান প্রশস্তির আকারে নানা বৈষয়িক প্রয়োজনে ঘন ঘন খণ্ড কবিতা রচনা করেছেন, এটি দেশ-কাল বিরুদ্ধ প্রায় নতুন রীতি। আরবি-ফারসিতে কৃসিদা বহুল রচিত হয়েছে, স্তুতি-প্রশস্তি বাঙালীরও অজ্ঞাত নয়, তবে এরূপ কাব্যিক প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন রচনা বিরল।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরবর্তীকালের এমনি ব্যক্তিপ্রশস্তিমূলক পদবন্ধও সংগ্রহ করেছিলেন।[৩] যেমন রাধামোহন সেরেস্তাদারের কীর্তি, বখশ আলী ফৌজদারের কীর্তিগাথা। এ

---

২. *পুথি পরিচিতি, পৃ ৩৫৭-০৮, ৩০৮-০৯।*
১-৩. পুথি পবিচিতি, পৃঃ ১৭২-৭৩, পৃ ৩৬৮-৬৯ ; ৫. প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম সংখ্যা।

দুটোর রচয়িতা চট্টগ্রামের দেয়াঙ বা দেব-গ্রামবাসী রামতনু আচার্য। রচনাকাল যথাক্রমে 'চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু বা ১২৪১ বঙ্গাব্দ বা ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ এবং নিধি বসু ধাতা ইন্দু বা ১১৮৮ মঘীসন বা ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ। এরূপ রচনা হচ্ছে গঙ্গাদাস রচিত 'রাজকুমার বাবুর পবিণাম', দ্বিজ রামচন্দ্র রচিত 'নিত্যানন্দ বৈদ্য'। গুলবানুর বারমাসীতে তার স্বামী আশরাফ মুনশীর খুনের কথা রয়েছে ঃ চৈত্রমাসে আশরাফ মুন্সী ঘরেতে হৈল খুন।[১] আবার জলোচ্ছ্বাস, তুফান, ভূকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধেও রচিত হয়েছে পদবন্ধ, এমন কি যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতির বর্ণনাও বিরল নয়।

ঘ. এতিম কাসেম বিরচিত দ্য বারোজ প্রশস্তি—একখানি ক্ষুদ্র খণ্ডিত পুথি। ৭´´ × ৬´´ পরিমিত কাগজের বই। ১-২২ পত্র বিদ্যমান। পাঠ দেখে মনে হয়, বেশিরভাগই আছে। শেষের দু'চার পাতামাত্র হারিয়ে গেছে।

ঈসাপুর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার একটি গণ্ডগ্রাম। সে-গ্রামের জমিদার গিন্নী বিধবা আওরা দ্য বারোজ; তাঁর কাছে জমি যাচ্ঞা করেছেন কবি এতিম কাসেম। সে-সূত্রে কবি এ পুথিতে স্বার্থোদ্ধারের জন্যে জমিদার গিন্নী ও তাঁর কর্মচারীদের মন গলানো স্তুতি রচনা করেছেন। তাঁর যাচ্ঞার যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে তিনি ঈসাপুর গ্রামের পুরাকাহিনী শুনিয়েছেন। এ কাহিনীর উপর গুরুত্ব দিয়েই পুথির সংগ্রাহক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'ঈসাপুবের ইতিহাস'। কিন্তু পুথিখানিব নাম 'ঈসাপুরের ইতিহাস' রাখার কোন সার্থকতা নেই।

কিঞ্চিৎ কহিতে এক নৃপের পয়ার। লিখিবারে শ্রদ্ধা হৈল মনান্তরে গুণি।
নৃপতির যথ কথা পশ্চাতে কহিমু। যথেক কিরীতি তান (নৃপতির) কহিমু সকল
পয়ার সঞ্চার বাক্য আগে প্রচারিমু।। মনোসূত্রে গুস্থি সব করি একত্তর
চোখে না দেখি যারে (নৃপতি) কানেমাত্র শুনি। যাচকের রূপে দিমু নৃপতি গোচর।

উদ্ধৃত উক্তিগুলোর ইঙ্গিতের অনুসরণে আমরা পুথির নাম দিলাম 'আওরা-দ্য বারোজ প্রশস্তি।' বলা বাহুল্য, জমিদারই কবির তোয়াজের ভাষায় 'নৃপতি' হয়ে উঠেছিলেন। এক্ষেত্রে আবার নারীই নৃপতি। আওরা দ্য বারোজ পর্তুগীজ জমিদার।

এ প্রশস্তির রচয়িতা এতিম কাসেম। সম্ভবত কবির নাম কাসেম। আর 'এতিম' মাতাপিতাহীন দুঃস্থ অবস্থাসূচক বা বিনয়জ্ঞাপক বিশেষণ ঃ

এতিমের কথা শুন এ দুই শ্রবণ। দান দিয়া শান্ত কর এতিমের মন।

এ চরণ দুটির এবং মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুমান অসঙ্গত নয়। অবশ্য 'এতিম আলম' নামে অপর এক কবির পরিচয় আমরা পেয়েছি।

ঈসাপুর গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চট্টগ্রামে একটি কিংবদন্তী আছে। জনশ্রুতি এই যে ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা কোন মুঘল সেনাপতি খান-ই-জাহান হোসেন কুলী বেগের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৫৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন, যে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ঘেঁষা জায়গাটিতে তিনি দু'বছর অজ্ঞাতবাস করেন, তা ঈসাপুর নামে পরিচিত হয়। কবি মুহম্মদ খান মক্তুল হোসেন কাব্যের উপক্রমে পীর প্রশস্তি অংশে বলেছেন ঈসা খান চট্টগ্রামের শাহ আবদুল ওহাব ওর্ফে শাহ ভিখারী সদর-ই-জাহাঁর ভক্ত বা শিষ্য ঃ

বার বাঙ্গলার রাজা ঈসা খান বীর। স্নেহভাবে যাহাকে পূজন্ত প্রতিনিতি। দক্ষিণ কূলের রাজা আদম সুধীর।।

কাজেই অনুমান করা যায়, ঈসা খাঁ কোন সময়ে পালিয়ে বা পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে চট্টগ্রামে গিয়ে যে-স্থানে শিবির স্থাপন করে সানুচর বাস করছিলেন, সে স্থানটি পরবর্তীকালে 'ঈসাপুর' নামে খ্যাত হয়।

সে-কালের য়ুরোপীয় বিশেষত পর্তুগীজ বণিকদের কেউ কেউ এদেশে জমি কিনে ব্যবসার জন্যে আড়তাদি স্থাপন করতেন, চাষাবাদ করাতেন, প্রজাও বসাতেন। হয়তো সে সূত্রে জমিদারও হয়ে উঠতেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে তেমন একজন জমিদারকে স্তোকবাক্যে খুশী করে কবি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের উপায় খুঁজেছিলেন। কবির পিতার মুৎসুদ্দি (জমিদার তত্ত্বাবধায়ক) বার্ষিক ১১৪ টাকা আয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

বহুকাল পরে, এবং প্রশস্তি রচনার তিন বছর আগে কবি আবার পূর্বপুরুষের গাঁয়ে ফিরে আসেন—তিন অব্দ ঈসাপুরে মোর স্থানস্থিতি।' কবি বলেছেন ঃ

বলবুদ্ধিহীন হৈলুঁ নাহি মোর লক। অতএব, দান দিয়া শান্ত কর এতিমের মন।
পৃথিবীতে নাহি মোর করিতে পালক।।

এর পরে 'ঈসাপুর আবাদ কাহিনী' বর্ণিত হয়েছে।

কবি এতিম কাসেম তাঁর জমিদার প্রশস্তি যে ওয়ারেন হেস্টিংসের (১৭৭২-৮৫ খ্রীস্টাব্দ) আমলে রচনা করেছিলেন তা 'কুম্পানী সরকারের পরিচয়' শীর্ষক পর্বের বিবৃতি থেকে প্রমাণিত হয়, বিশেষত লর্ড নর্থের 'রেগুলেটিঙ এ্যাক্ট' (১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ) কার্যকর হওয়ার (অক্টোবর ২৬, ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ) পরে যে রচিত হয়েছিল সে আভাসও পাওয়া যায়। কবির বিবৃতিতে কিছু কিছু ভুল রয়েছে অবশ্য, তবে কবি নয়া শাসন-সংস্থার মোটামুটি খবর রাখেন। কবি উনিশ শতকের উষাকালেরও হতে পারেন।

দিল্লীর শহরে দ্বীন ডঙ্কা হইলেক ধীর। অষ্ট কৌসিল নাম রাখিল কুম্পানী।।
কুম্পানী প্রবল হৈল গিরিসম স্থির।। কুম্পানী যাহারে বোলে তার মর্ম কহি।
আল্লার হুকুম হৈল কুম্পানী প্রবল হৈল অষ্টজন মিলি কুম করিলেক সহি।।
ভাটি আদি হৈল অধিকারী। এহি অষ্ট জন মিলি করিলেক কুম।
ভাটি আদি হিন্দুস্থান সর্বদেশ জিনি। কুম্পানী তাহারে বুলি একই হুকুম।।

সেকালের সুপ্রীম কোর্টের আওতায় সদ্য প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থারও উল্লেখ রয়েছে ঃ

সদর চাকুরী আছে কর্ম মুসলমানি।। 'ফরাজ ফতবা' দিতে নিয়ম করিছে।।
'ফাজিল আলিম' সব আনিয়া রাখিছে। কেতাবে যেমত আছে করএ ইনসাফ।

কবি এ সুযোগে জমিদারকেও তোয়াজ করে নিয়েছেন ঃ

ইঙ্গরেজ যদি হৈল এথা অধিপতি। কেননা, ইঙ্গরেজ সকল সঙ্গে বহু হৈল মিল।
তোমার সুকৃতি হৈল দেখি সম জাতি।।

আঠারো শতকের শেষপাদের ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের চট্টগ্রামের বহু জমিদারের নামোল্লেখ রয়েছে এ প্রশস্তিতে। এঁদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার বিত্তে ও আভিজাত্যে আজো খ্যাতিমান। বিবৃতির আলোকে খোঁজ করলে যে উপাদান মিলবে, তাতে চট্টগ্রামের ইতিহাসের এক অজ্ঞাত ও লুপ্ত অধ্যায় লেখা হতে পারবে।[১]

ঙ. **খণ্ডলে কুকির হামলার ইতিকথা**—আমার আলোচ্য পুঁথিটি মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি (১৬ই মাঘ) সরস্বতী পূজার দিন পার্বত্য কুকিরা বর্তমান ফেনী মহকুমার ছাগলনাইয়া-পরশুরাম অঞ্চলে হানা দিয়ে রক্তে আগুনে এবং ধন জন লুটে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে। তারই রোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে এ পুঁথিতে। সরকারী প্রতিবেদনেও এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মেলে।

---

১. *মৎ-সম্পাদিত পুঁথিটি বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা ভাদ্র-চৈত্র/ ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত। বিস্তৃত আলোচনা সে-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।*

কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রাজমালায় 'কুকিজাতির বিবরণ' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ এ বিষয়ে রাধামোহন নামের এক লোক কবির রচিত গীতিকার তিনটি অংশের তেইশটি চরণ তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। রাধামোহনের গীতিকা সংগৃহীত হয়নি। উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যায়, মাঘ মাসের শনিবারে শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে তিপ্রা কুকিরা 'দাও শেল হাতে বন্ধুক কান্ধে' রণে প্রবেশ করে এবং 'যারে পায় কাটি ফেলায়' আর 'ঘর জিনিস লুট করি চালে দেয় আগুন।' শুধু তাই নয়ঃ

তারা খন্তা নিল, কুড়াল নিল, আর নিল দাও কাচি
সিন্দুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাছি।

পরদিন রবিবারে এসে আবার শুরু করলো লুটতরাজ। সেদিন যখন কোলা পাড়া গাঁ আক্রমণ করবার জন্যে কুকিরা এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন 'বাউলালী' নদীর গুণাগাজী নামে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্ধুক ও সিপাই নিয়ে তাদের বাধা দিলেন। তিপ্রা কুকিরা ভয়ে পালাল। এবার গুল বখ্‌শের অনুসরণে ঘটনাটি বর্ণনা করছি ঃ

কুকি সঙ্গে শর্ত করি যথেক রিয়াঙ্গ   নারাচ-নালিকা আর ব্রহ্ম অস্ত্র ছাঙ্গ।

—নিয়ে খণ্ডলে নেমে এল রক্তে আগুনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে ধনজন লুট করবার জন্যে। সেদিন ছিল শ্রীপঞ্চমী। ত্রিপুরারাজ্যের সীমান্ত মুন্সীরখীলে ছিলেন ত্রিপুরার ফৌজদার ভৈরব। পূজোর উদ্যোগে তিনি ছিলেন ব্যস্ত। কুকি রিয়াঙের অতর্কিত আক্রমণের সংবাদে তিনি প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করেই প্রাণ নিয়ে পালালেন। নির্বিঘ্নে কুকি রিয়াঙেরা মুন্সীরখীলে বেপরওয়া হত্যাকাণ্ড চালাতে লাগল ঃ

চৌদিকে ঘিরিয়া বাটে   হস্তে খড়গ ধরি কাটে   কেহ কেহ মারে ছেল ঘাতে
কার কার কাটে শির   কারে কারে হানে তীর   শির কাটি ফেলায় ভূমিতে।
কাহার বিন্ধিল জানু   কাহার ছেদিল তনু   কার আঁখি করিয়া আন্ধল
ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি মারে   মুখে নাহি শব্দ করে   বলহীন হইল সকল।

তারপর মুন্সীরঘীল থেকে ডাকুরা বখশগঞ্জবাজারে গিয়ে বন্দুকের গুলি ছুড়তে লাগল। ফলে, মৃগপত্তি দেখি যেন মাতঙ্গ পালায়/তেনমতে নরসব প্রাণ লই ধায়।

সবাই কিন্তু পালিয়ে বাঁচতে পারল না ঃ

পুত্র কন্যা লই ধায় কন্টকের বলে   এবং,   নারীসব ধরি ধরি করিল বন্ধন
বন্দুক মারিয়া পাপী রাখে সেই খানে।   গৃহের অন্তরে যাই লুটিলেক ধন।

তারপর বাজারে অগ্নিসংযোগ করে বসন্তপুরে পোদ্দার বাড়ি লুট করবার জন্যে গেল তারা। কমল বণিক ছিল সে অঞ্চলের নামকরা ধনী। ডাকুরা তার বাড়ী ঘেরাও করে কমল পোদ্দারকে হত্যা করে এবং

'অন্তস্পুরে প্রবেশিয়া লুটিলেন্ত ধন' 'তাহার রমণী ধরি করিল বন্ধন।'

এ হামলায় লুণ্ঠিত হয় পনেরোটি গ্রাম, নিহিত হয় ১৮৫ জন আর ধৃত হয় একশ জন বাঙালী।

এখানে ক্লাসিক্যাল রীতিতে কমল পোদ্দারের স্ত্রীর রূপ বর্ণনা করেছেন কবি ঃ

শ্রীখণ্ড কপাল দেখি চান্দে পাই লাজ   খঞ্জনে দেখিয়া আঁখি বনে দিল লুক
ক্ষীণ হই কলঙ্ক ইচ্ছিল দ্বিজরাজ।   মধুবাণী শুনি পিক ধিক লাজে মূক।
মুখ দেখি পদ্ম মজে জলের মাঝার   দশন দেখিয়া মুক্তা ডুবে জল মাঝে
কে দেখি চামরী রহিল বন মাঝে।   কণ্ঠরেখা দেখি কম্বু জলে মজি যায়।
কনক কলস কুচ তাল কুল'ধিক।

এরপর কুকিরিয়াঙেরা যখন কোলাপাড়া গাঁয়ে হানা দিল, তখন সে গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি গুণাগাজী বন্দুক ও সিপাহী নিয়ে

স্মরিয়া আল্লার নাম চড়ি এক তাজি
মহাযুদ্ধে প্রবেশ করিল গুণাগাজী।
মার মার শব্দ হৈল নগর ভরিয়া
সেপাই বন্দুক হস্তে লইলে তুলিয়া।
বীর্যহীন যে সকল ধাবন্ত পলায়
পাকাড়িয়া সর্বজন আনিল সিপাই।

এমনি সময়ে 'পঞ্চশত সৈন্য সঙ্গে করি মহাবল' জকিমল এগিয়ে এল কুকি রিয়াঙের সাহায্যার্থে, এতেও

মৃত্যু প্রতি ভয় কিছু না করিয়া মন
মহাযুদ্ধে প্রবেশিল ইসুফ-নন্দন গুণাগাজী।

'মকর পশিল যেন সমুদ্রের জলে' কিংবা 'ঘোটকের মধ্যে যেন খেলায় কেশরী' তেমনি করে অরি-ত্রাস গুণাগাজী শত্রু বধ করতে লাগল। এভাবে 'মৃত্তিকা উপরে হৈল রক্তের বিছানা'। অবশিষ্ট ডাকুরা প্রাণ নিয়ে পালাল।

যে গুণাগাজী প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে কুকি রিয়াঙদের সঙ্গে লড়াই করল, লোকের ধন প্রাণ রক্ষা করল, তাকেই লোকে দায়ী করল কুকি-রিয়াঙদের আহ্বানকারী বলে। ভাগ্যের এই পরিহাসের একটি কারণ ছিল। কুকি রিয়াঙেরা হানা দিয়েছিল সোমবারে। তার আগের বৃহস্পতিবারে গুণাগাজী কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে তার এলাকার লোকদের হুমকি দিয়েছিল যে সে কুকি রিয়াঙদের ডেকে এনে তাদের শায়েস্তা করবে। তার মুখের কথা অমোঘ হয়ে ফলবে, তা কি সে জানত। কাজেই সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীরা সাহেবকে জানাল ঃ

গুণাগাজী আরাধি আনিল রিয়াঙেরে
গুণাগাজী এহি বাক্য সত্বরে কহিল
সূরগুরুবারে গুণাগাজী কহিল ডাকিয়া
চন্দ্রবারে আমি সব নিধন হইল।
কাটিবে সকল লোক কুকি আরাধিয়া।

সাহেব গুণাগাজীকে গেরেফতার করিয়ে আনালেন। এভাবে 'গুণাগাজী বন্ধনে রহিল কতদিন'।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালী গ্যাজেটিয়ারে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। বর্তমান কুমিল্লা জেলার কোন ইতিহাস নেই। নোয়াখালীর ইতিহাসও দুষ্পাপ্র্য। তাই এ সব সূত্রে কোন তথ্য মেলেনি। কেবল কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালাতে এর বিবরণ পাচ্ছি।

'রাজমালা'য়[১] ত্রিপুরারাজ্যের ফৌজদারের নাম ধরণীসিংহ, রাধামোহনের মতে ধুরন্ধর আর গুলবখশের কাব্যে পাচ্ছি ভৈরব। কুকি-রিয়াঙ ডাকুদের সরদারের নাম রাজমালায় নেই। গুলবখশের পুথিতে সরদারের নাম জকিমল। গুণাগাজীর কৃতিত্বের প্রশংসা তিন সূত্রেই মেলে।

এই ভীষণ উপদ্রবের যে কারণ সরকারী তদন্তে নিরূপিত হয়েছে, তা কৈলাসচন্দ্র সিংহ উদ্ধৃত করেছেন।

কিন্তু কৈলাসচন্দ্র সিংহ এ হত্যাকাণ্ডের অন্য কারণও বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে 'ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের রিয়াং নামক এক সম্প্রদায় আছে, ইহারা কুকিদিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতির না হইলেও নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে। রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙালী মহাজনগণ হইতে সর্বদা টাকা কর্জ করিত। পার্বত্য অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রায় দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা দাঁড়াইল। মহাজনেরা সর্বদা রিয়াংদিগকে টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে দুখাং ও অন্যান্য কুকিদের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই কার্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি রাজবংশীয় কয়েকজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিখ্যাত কুকি সরদার রতন পুইয়া ইহাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

১. *রাজমালা, পৃঃ ৩৯১, ৩৬১-৬৭, ৩৫০-৮৫।*

কুকিদিগের অত্যাচারে যে সকল খণ্ডলবাসী সর্বস্বান্ত হইয়াছিল গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে ১৩০০৭ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন, ইহার অর্ধাংশ ত্রিপুরেশ্বর হইতে গৃহীত হয়।

আমাদের মনে হয়, কৈলাসচন্দ্র সিংহ সংগৃহীত এ তথ্যই নির্ভরযোগ্য। এই অসভ্য কুকিরা রাজকীয় প্রশ্রয়ে ও রাজবংশীয়দের ষড়যন্ত্রের হাতিয়াররূপে ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের ভেতরে ও রাজ্যসীমা অতিক্রম করে চট্টগ্রাম, সিলেট, কাছাড়, মণিপুর ও ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলে মাঝে মাঝে উপদ্রব সৃষ্টি করত ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি ব্রিটিশ সরকারকে বিরূপ করার মতলবে। উপদ্রব ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ অবধি মাঝে মাঝে সংঘটিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার নানা কৌশলে কুকিদের এই দুষ্প্রবৃত্তি দমন করেছিল। এজন্যে ব্রিটিশ সরকারেরও প্রায় ত্রিশ বছর সময় লেগেছে।[১]

চ. **আরো কয়েকটি প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা**—১. চট্টগ্রামে ভূমিকম্প গ্রহন্তি[২] রচনা করেছেন জগদীশ সিংহ। তিনি বলেন—

এই বাক্য কতদিন স্মরণকারণ/জগদীশ সিংহে কহে তাহার বচন।
ভূকম্প হয়েছিল ঃ নেত্র বসু সাত পুরিয়া সন্ধান/ শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ।
নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে এক স্থান/মঘীসন আছিলেক এই পরিমাণ।

অতএব ১৭৮৩ শকে বা ১২২৩ মঘীতে তথা ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে চৈত্র শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে শুক্রবারে বেলা চার দণ্ড কালে এ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

রণী ধরিতে লোক স্থির হৈতে নারে   স্থানে স্থানে মেদিনী ফাটিয়া উঠে পানি
পুস্করিণী হৈতে জল নিকলে বাহিরে।   কত কত স্থানে লোকে হারাইল প্রাণি।

২. ১২৩৮ মঘীতে বা ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড মীরেরসরাই থানা অঞ্চলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ও ঝড়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, ওয়াজুদ্দীন চৌধুরী 'গরকীর বচন' নামের [গরকী—জলোচ্ছ্বাস] পদবন্ধে[১] তা লিপিবদ্ধ করেছেন তিন বছর পরে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে ঃ

ভাস্কর দক্ষিণ পানে নেত্র বসাইয়া   তার ডাইনে বসু রাখি যত্তন করিয়া,
(ভাস্কর-১২ নেত্র ৩, বসু ৮= ১২৩৮ মঘী)

ঋতু বসু দিন বৃশ্চিক মাসের ১৪ই অগ্রহায়ণ লিখন সমাপ্ত। রোজ গুরু-অসুরের তথা শুক্রবার ঝড়ের দিন—

শওয়ালের তের রোজ পূর্ণিমার দিনে   প্রথমে যুদ্ধেতে আইল হনুমানের পিতা (পবন)
বারশ আটত্রিশ মঘী কার্তিক পুনি খেণে।   গৃহ আদি উখারি ভাঙ্গিল বৃক্ষশাখা।
এলাহি গজব ভেজে বাঙ্গালা জমিনে   জলস্রোত আসি সব ভাসাইয়া নিল।
রোজ মঙ্গলবার ছিল জ্ঞান সবজনে।

৩. ১১৯৯ (১৮৩৭ খ্রীঃ) মঘীসনে[২] চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে মারাত্মক ঝড় বয়ে যায়, সে ঝড়ে প্রায় সব পরিবারই ধনে প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমুদ্র মাঝারে ঢেউ হইল বিস্তর   তুফান হইল অতি খরতর।

ঝড়ে-তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত লোকে খাজনা দিতে না পারায় 'নিলাম করাই কত বেচাইল জমিদারী। ভণিতা নেই। দুটো ঝড়ের কোনটি এ পদবন্ধে বর্ণিত বোঝা গেল না। ডক্টর সুকুমার সেন ও দ্বিজ দামোদর রচিত, অনিরুদ্ধ গুপ্ত রচিত ও দ্বিজ নফর রচিত বন্যার, এবং ১১৩৭ ও ১২৩০ বঙ্গাব্দের পশ্চিমবঙ্গের বন্যার কবিতার উল্লেখ করেছেন। এবং দ্বিজ দ্বারকানাথের রচনার সামান্য নমুনাও দিয়েছেন।

---

১. *বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎ সম্পাদিত পুথিটি ইতিহাস পত্রিকা, ২য় বার্ষিক সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল দ্রষ্টব্য।* ২. *প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা পৃঃ ৮।*

১-২. *পুথি পরিচিতি ঃ পৃ ১১৭, ৩৬৮।*

মাঠেত ধান ছিল পেয়ে বান আথালি পাথালি,
ছিল ইক্ষু অতি দীর্ঘ চেপে গেল বালি।
রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া,
স্থানান্তরে কেহু গেল দুঃখিত হইয়া।

ডক্টর সুকুমার সেনও[৩] পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে চালু বিভিন্ন গাথার ও ছড়ার উল্লেখ করেছেন। একটি ছড়ায় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যুতে বিলাপ রয়েছে ঃ

জমিদারেরা ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরথরি।
বর্গী ভয় হতে আমাদের রাখলে যতনেতে
শহরের লোক কান্দে করে হায় হায়।

ডক্টর সুকুমার সেনোক্ত[১] অনুপচন্দ্র দত্তের প্রতাপচন্দ্রলীলারসঙ্গীত দেওয়ান মানুল্লা মণ্ডল রচিত 'কান্তনামা', কোচবিহারের রাণী রচিত বেহারোদন্ত কীর্তিচন্দ্র সিদ্ধান্ত রচিত 'জাল প্রতাপচন্দ্র' গাথা প্রভৃতি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত।

১১৯০ বঙ্গাব্দের বা ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের জমিদার সীতারাম রায়ের দেওয়ান রামবল্লভ রায়ের চাকরী সংক্রান্ত পদবন্ধে। এটির বিশিষ্টতা এই যে, এ প্রথম প্রজার দাবিতে সরকারের টনক নড়েছিল এবং প্রজার দাবি মেনে আপোস করতে হয়েছিল সরকারকে।[২] নয়আনার জমিদার পক্ষের কবি মহীপুরবাসী কৃষ্ণহরি দাস 'চন্দ্রপৃষ্ঠে লিখে গ্রন্থ পৃষ্ঠে শূন্য' সনে অর্থাৎ ১১৯০ বঙ্গাব্দে বা ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রঙপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ডের নির্দেশে বর্ধনকুঠীর নয়আনা সম্পত্তির শরিক জমিদার সীতারাম রামবল্লভকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। দেওয়ান গোপনে জমিদারী নিলাম করিয়ে নিজে জমিদার হবার মতলবে ছিলেন, জমিদার যথাসময়ে টের পেয়ে প্রজাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। প্রজারা সরকারের কাছে দেওয়ান রামবল্লভকে পদচ্যুত করার দাবি জানায়। সরকার এ দাবি মেনে নিয়ে প্রজাদের তুষ্ট করেন।

একটি দুইটি করিয়া রায়ত ধরল সারি
কাচারি বেড়িয়া রায়ত হল হাজার চারি।

এ হচ্ছে সেকালের জনগণের 'ঘেরাও' আন্দোলন। সাহেব দেখল গতিক ভালো নয় ঃ

সাহেব বলে শুন শুন রামবল্লভ রায়
রায়তে না ছাড়ে পিছু কি করি উপায়।
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালি
যত দেখ সোনার বালা রায়তের কড়ি।
দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছড়ে মারে।
সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হল।

নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ 'চৌধুরীর লড়াই' ও ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দেওয়ান ফিরোজ খান, চন্দ্রাবতী, কেনারাম, দেওয়ানা মদিনা, শাহসুজা প্রভৃতির মতো ইতিহাসের উপকরণ ও সূত্র ধারণ করে।

৬. উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের উজির দুর্গামণি ঠাকুর সংস্কৃতে রচিত রাজমালা বাঙলা পদ্যে অনুবাদ করেন, এটিই রাজবংশের রাজ্যের রাজনীতির যুদ্ধ বিগ্রহের সন্ধি ষড়যন্ত্রের বিবরণ সম্বলিত প্রথম বাঙলা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। পারিবারিক বিবাদ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রমূলক গ্রন্থ 'চম্পক বিজয়'ও এ সূত্রে স্মর্তব্য। এর আগে আমরা ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের উপক্রমে মুর্শিদাবাদে মসনদে নওয়াব বদলের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী পেয়েছি। সে সঙ্গে পেয়েছি একটা অস্থির অবস্থার ইঙ্গিতও। বর্গীর লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হনন, দহন, ইংরেজের উপস্থিতি, গিরিয়ার ও পলাশীর যুদ্ধ, নওয়াব বদল, কোম্পানী শাসন প্রভৃতি বিষয়ক ছড়া-গান পদবন্ধ, পরবর্তীকালের ফকির-সন্ন্যাসী দ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন প্রভৃতি নানা রাজনৈতিক সামাজিক ছড়া গান গাথা পাঁচালীর কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরছি। আলোচনা বা বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়। কেননা এ সব বিষয়ে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক নানা গ্রন্থ আগেই রচিত হয়েছে।

---

৩. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপার্ধ, পৃঃ ৫১০-১৬।*

১-২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১০-১৬, ৫১২-১৬।*

৭. মদন পালায়[১] ঃ সুবাদার শায়েস্তা খানের প্রজা-পীড়ন চিত্র ঃ

'কারে কারে ইটের উপর করে রেখেছে খাড়া
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া।
তামাক খেয়ে গুল কারু ছাপ ধচ্ছে গায়।
লঙ্কা মরিচের ধোয়া কারু নাকে দেয়।---

৮. গিরিয়ার প্রান্তরে মুর্শিদকুলি খানের দৌহিত্র তরুণ নওয়াব সরফরাজ খানের সঙ্গে মসনদলোভী বিশ্বাসঘাতক নায়েব নাজিম আলিবর্দীর যুদ্ধ ঃ

মারামরি লেগে গেল গিরিয়ার ময়দানে
কান্দে বাঙ্গালার সুবাদার হাপুস নয়নে।
পূর্বেত করিল মানা জাফর খাঁ নানা
ভালমন্দ হলে নবাব শহর ছেড় না।
পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণীর স্থানে
আলিবর্দীর তাম্বু পড়ে গিরিয়ার ময়দানে।

৯. পলাশীর আমবাগানে আলিবর্দীর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার প্রতি সেনাপতি ও আত্মীয় মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ঃ

কি হলরে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীর মদন সাহেব কত নিবে সয়ে।
ছোট ছোট ভেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীর মদনের গায়।
মীর জাফরের দাগাবাজীতে গেল নবাবের প্রাণ
ফুলবাগে মলো নবাব খোশবাগে মাটি।

১০. রামপ্রসাদ মৈত্রের রচনায় ব্রিটিশস্তুতি ও বিদ্রূপ ঃ

অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে বিলাতে হৈলা সাহেবরূপী
ছাড়িয়া আহ্নিক পূজা পরিধানে কুর্তি মোজা হাতে বেত শিরে দিলা টুপি
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে কৈলকাতা পুরান কুটি আদি
গতামল সুবেদারী শুভ সন বাহাত্তরি আংরেজ আমল তদবধি।
এবং শুন সভে এক এক মজা বাঙ্গালার যতেক প্রজা ছিল সুবেদারীতে প্রধান
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কলিকাতা সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান।
শিরে টুপি মুজা পায় হাতে বেত কুর্তি গায় এক বর্ণ দেখ সভাকার।

১১. মীর জাফরের জামাতাও মসনদলোভে শ্বশুরের বিরুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী এবং বাঙলার নওয়াব মীর কাসিম আলির সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ ঃ

সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্তি লালে লাল–
নবাব লুটিল কুঠী শহর কলকাতা
সামনে গুলকী গেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মামুদ তকীর ঘোড়া
ফিরিল মামুদ তকী তাহা দেখি দাঁতে কাটে ঘাস।

১২. হেস্টিংসের শত্রুতার শিকার মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ঃ

আজগবী এক আইন হয়েছে
কৌন্সলিদের সাথে হেস্টিন ঝগড়া বাধিয়েছে।
হায় রে হায় একি হল, বামুনের ফাঁসি হল
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।

১৩. বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্যসিংহের সঙ্গে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে হেস্টিংসের দ্বন্দ্ব ঃ

ফেলা এ লাগল মাঠে পালায় ছুটে যত চাষীগণ
বেগার ধরিতে আইল কতশত জন—
যেদিকে যাকে পায় হাতে বেঁধে গোপ্তা মেরে রাস্তাতে খাটায়।

—এ হাপুগানের রচয়িতা মেদিনীপুরের মদনমোহন।

---

১. *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথি সং ৯৩৪, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত, বাঃ সাঃ ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২১৯।*

১৪. ১২৬২ বঙ্গাব্দে বা ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহের রাইকৃষ্ণ দাস রচিত পদবন্ধ ঃ

শুভবাবুর (নেতা) হুকুম পেয়ে সাঁওতাল বুঝেছে
বেটারা কোক ছড়িল জড় হইল হাজার হাজার
কখন এসে কখন লুটে থাকা হল ভার।—
রাখতে মুলুক সলা সুলুক ভাবতেছে কোম্পানী
বেটাদের শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীরে

জিনিস ছেড়ে পালাও না ভাই সবাই থাক ঘরে।

১৫. রতিরাম দাসের 'জাগগানে' দেবীসিংহ, ইজারাদার প্রভৃতির অত্যাচার-কাহিনী বর্ণিত রয়েছে ঃ

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিংহ
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈব বার টিং।
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল
মানীর সম্মান নাই, মানী জমিদাব
ছোট বড় নাহি, সবে করে হাহাকার।
শিবচন্দ্রে র হুকুমেত সব প্রজা ক্ষ্যাপে
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে
দেবী করে সিংহ পলাইল দিয়া গাও-ঢাকা
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ, কেউ বলে ঢাকা।

আঠারো শতকের শেষ পাদের বলেই এ প্রজাবিদ্রোহ গণপ্রতিরোধ প্রয়াসের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

ইজারাদার শোষিত প্রজাদের অবস্থা ঃ

রায়ত প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া
হাত জুড়ি চক্ষুজলে বুক ভাসাইয়া।
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরনে নাই বাস
চামে ঢাকা হাড় কয়খানা করি উপবাস।

১৬. বাঙলার পল্টনের পদচ্যুত সিপাহীনেতা উত্তরপ্রদেশ-(কানপুর) বাসী মজনুশাহ ও ভবানী পাঠক ফকির-সন্ন্যাসীর বেশে সানুচর এসে উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে বার্ষিক লুণ্ঠন চালাতেন। এর শুরু ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে এবং শেষ ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে (১২২০ বঙ্গাব্দ) মজনু–বিদ্বেষী পঞ্চানন দাস-রচিত 'মজনুর কবিতা' নামের পদবন্ধে মজনুশাহকে নিষ্ঠুর হিন্দু–পীড়ক দস্যুরূপে চিত্রিত করেছেন ঃ [রঙপুর সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩১৭ সন, ৫ম ভাগ]

মজনু শাহ 'সাহেব সুবার মত চলন সুঠাম
আগে যায় ঝাণ্ডা বানা ঝাউল নিশান।
উট গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি
যোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি।
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজীর 'পর যেন মরদ গাজী।—
শুনে সবে এক ভাবে নৌতুন রচনা
বাঙ্গলা নাশের হেতু মজনু বারনা।
কালান্তক সম বেটাকে কে বলে ফকির
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।
যেদিন যেখানে যাত্রা করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া।
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া—
আগামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া—
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়
গাছুরী বেপারী পলায় পাছে ছাড়্যা গুড়।
নারীলোক না বন্ধে চুল না পড়ে কাপড়
সর্বস্ব ঘরে থুইয়া পাথারে দেয় নড়।
ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পলায়
লুঠেরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়।
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন
যুবতী কাকুতি করি কি বলে বচন।
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক।

১৭. ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের নেতাদের সম্বন্ধেও পদবন্ধ, ছড়া ও কবিতা রচিত হয়েছে গোটা শতক ধরে।

হিন্দুর চোখে তীতুমীর ঃ তীতুমীর শুধু শাস্ত্র-সংস্কারক ছিলেন না, প্রজার হয়ে জমিদারের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়িয়েও ছিলেন, তবু চাষী-মজুর হিন্দুও তাঁর পক্ষে ছিল না।

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেল বেড়ে — তাতে হাজাব দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো ওরে বুড়ি আজ গাঁয়ের হাট — কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট।
তীতুমীর বলে আল্লা বানাইলাম বাঁশের কেল্লা — তাতে আমার নেই হেল্লা
যেমন মাঠে ধান ছিল তেমনই হল মাঠ — কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট।

প্রতিহিংসাপরায়ণদের ভয়ে তীতুর অনুচরদের দাড়ি কাটার বিদ্রূপাত্মক ছড়া এটি।

খ. ঘেরলে রে নারকেল বেড়ে যত ত্যালেঙ্গায়
এবার হেঁদু বলে দাড়ি ফেলে যদি রক্ষা পাই।
গ. তীতুমীর বাদশা হল হুকুম দিল উজিরের তরে
মৈজুদ্দিন উজির হয়ে হুকুম জারি করে।

হানাফী মুসলিমও তীতুমীরের উপর বিরূপ ছিল ঃ

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তীতুমীর
শরা শরীয়ত তিনি করিলেন জাহির।
পীর পয়গাম্বর কুতুব ওলি কিছুই তিনি মানিতেন না
এবার সারলে ইংরেজ মামু, জানে রাখলে না।

১৮. ওয়াহাবী নেতা মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ ঃ

আগু জামানার বিচে নওয়াবী আমলে
ইঙ্গরাজ আমল না ছিল যেই কালে।
সেই কালে বাজে লোক বাঙ্গালাদেশের
ইসলামি তারিকা না ছিল তাদের।
শরা শরীয়ত জারি ঠিক না আছিল
দেখাদেখি লোকে সব করিতে আছিল।
না জানিত দীন আর ইসলামি ইমান
মুখে খালি ফলাইত সুন্নী মুসলমান।
খাতনা করান আর গরুর গোস্ত খেয়ে
মুসলমান হবে এহা বুঝেছিল দেলে।
হিন্দুদের দেখে শুনে করিত সে কাম
শেরেক বেদাতে ছিল ভরিয়া তামাম।
হেন কালে আল্লাপাক দয়াল খোদায়
মোজাদ্দেদ পাঠাইয়া দিল বাঙ্গালায়।
সৈয়দ আহমদ শাহে মোজাদ্দেদ করি
মিটাইল বাঙ্গালার শেরেক কুফরী।
[জনাব আলী ঃ শহীদ-এ কারবালা]

১৯. সংস্কারক মুজাদ্দিদ কেরামত আলির ও দুদু মিয়ার মতানৈক্য ঃ

ক. মওলানা দুদু মিয়া পৃথিবী তেজিল
এতকাল মুসলমান একমতে ছিল।
বারশ' পাঁচচল্লিশ সালে হিন্দুস্তানী
মওলানা কেরামত আলি আসে বঙ্গে শুনি।
তিনি আসি জুমা ঈদ আদেশিয়া ছিল
ভবিষ্যতে দু'একজন সেদিকে ঝুঁকিল।
এইমাত্র কেরামত আলির রায় হইল নাম
পূর্বেতে দুদু মিয়ার রায় আছিল তামাম।
অধম উজির বলে বঙ্গের এই রীতি
মোসলেম বিচে দলাদলি এইমাত্র ভিত্তি।
মোসলেম রত্নহার ঃ উজির আলি আহমদ]
খ. ও ভাই আল্লা বলরে রসুলের ভাবনা
ফরাজীদের নামাজ পড়া হল এবার মানা।

২০. খ্রীস্টান মিশনারীর বিরুদ্ধে আপোসহীন বিরামহীন সংগ্রামী মুনশী মেহেরুল্লাহ ও প্রাক্তন পাদরী জমিরুদ্দীন ঃ

মুনশী মেহেরুল্লা' নাম যশোর মোকাম — অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া।

জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার
হেদায়েতে হাদী জান দীনের হাতিয়ার।
মুলুকে মুলুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া
হিন্দু-খ্রীস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া।
মুসলমান হৈল সবে কলমা পড়িয়া
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেক্কার
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার।
সে দোন জাহেদ মর্দ ফজলে খোদার
তেরশত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার।
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে
এসেছিল নোয়াখালি শহর বিচেতে।

[মেহের চরিত]

২১. মহররম ঃ মর্সিয়া ঃ

মহরমের বুনিয়াদ শিয়ালোক হতে
বাঙ্গালাব মুসলমান ভাবিত সেইমতে।
জারি ও মর্সিয়া যত গাহিত সকলে
সে-কথা না পাওয়া যায় হাদিসে দলিলে।
সেই মর্সিয়ার ভাবে কোন শায়েরেতে
মক্তুল হোসেন লিখে দিলেন ফারসিতে।
বাঙ্গালার জঙ্গনামা তর্জমা তাহার
দেশে দেশে জারি খুব আছে সেই প্রকার।
তাহার বিচেত যত বে-দলিল বাত
নাহি মিলে সাঁচা কিছু দীনের হালাত।

[জনাব আলি]

২২. মারফতী ফকির ঃ

আজকাল দাগাবাজ ফকিরেরা ফের
ঠাই ঠাই যথা তথা হতেছে জাহের।
শরীয়তের বরখেলাফ করিয়া বেড়ায়
ওয়াকিফ হইয়া হাল আওলিয়া লোকের
লাঠি মার মাথে দাগাবাজ ফকিরের
মারফতী ফকির আমি বলি সে-সবায়।
মারফত পাইবে কিসে শরীয়ত ছাড়িলে
কেতাব কোরানে যাহা না আছে দলিলে।

[তাজকিরাতুল আউলিয়া—জনাব আলি]

২৩. পীর-পূজার উদ্ভবতত্ত্ব ঃ

হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর
দুই কুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।

২৪. দোভাষী রীতি ঃ

ক. এই পুথি শায়ের ছিল আগু জমানার
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার।
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কসেল্লা
এ কারণে অধীন রচে চরিত বাঙ্গালা।
রসিক লোকের দেখে বহুত কাকুতি
বারশত পঁত্রিশ সালে লেখি এই পুথি।

এখানে সাধুরীতিতে রচিত আলাউলের বা দোনাগাজীর গ্রন্থ নির্দেশিত।

[সয়ফলমুলুক-বদিউজ্জামাল ঃ মালে মুহম্মদ, ১২৩৫ সন ১৮২৮ খ্রীঃ]

খ. চলতি বাঙ্গালায় কেচ্ছা করিনু তৈয়ার
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার।
আসল বাঙ্গালা সবে বুঝিতে না পারএ
এ খাতেরে না লিখিলাম শোন বেরাদরে।

[চাহার দরবেশ ঃ মুহম্মদ দানিশ]

গ. জরুরী করিয়া তিনি কহিল আমায়
আম্বিয়া লোকের কেচ্ছা কর বাঙ্গালায়।
এছলামি বাঙ্গালায় কেচ্ছা রচনা হইলে
ইহার নাফাতে লোক পঁউছিবে সকলে।

[কাসাসুল আম্বিয়া ঃ রেজাউল্লাহ,]

ছ. গোপীদাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল'

গোপীদাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর পুথিখানি ছিল বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত গুণরাজখান মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রামের এক বৃদ্ধার অধিকারে। পুথিখানি ১-৯৮১ পৃষ্ঠায়

সমাপ্ত এবং মুখবন্ধ রয়েছে ১-১৫ আনাসংখ্যক পৃষ্ঠাব্যাপী। অতএব পুথিখানি কলেবরে বিপুল। পুথির নাম চৈতন্যমঙ্গল এবং রচয়িতার নাম মোহন্ত ব্রাহ্মণ গোপীদাস এবং এই গোপীদাস নাকি চৈতন্য-সহচর এবং তাঁর তীর্থপর্যটনকালের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। বর্ণিত বিষয় অন্যান্য জীবনচরিতের মতোই ঃ চৈতন্যদেবের জন্ম, বাল্যলীলা, বিদ্যার্জন, পাণ্ডিত্য, তর্কযুদ্ধে বিজয়ী তার্কিক চৈতন্য, সন্ন্যাস, দেশভ্রমণ, প্রেমধর্মপ্রচার ইত্যাদি। বর্তমানে পুথিখানি নাকি কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সম্পত্তি। এই চৈতন্যমঙ্গলের আরম্ভের ও সমাপ্তির কাল এই ঃ

১. অঙ্গ বাণ শ্রুতি ইন্দুশক পরিমিতে
আরম্ভ করিনু আমি গ্রন্থ বিরচিতে।

২. শূন্য রস বেদ যন্ত্রে হৈল সমাপন
পড়িবে শুনিবে যত ধার্মিক সুজন।

অতএব রচনা আরম্ভ হয় [অঙ্গ–৮ বা ৬, বাণ-৫, শ্রুতি–৪, ইন্দু-১] ১৪৫৬–৫৮ শকাব্দে তথা ১৫৩৪–৩৬ খ্রীস্টাব্দে এবং সমাপ্ত হয় (শূন্য –০, রস–৬, বেদ–৪, যন্ত্র–১) ১৪৬০ শকাব্দে বা ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে। একটি ভণিতা—

চৈতন্যমঙ্গল রচে দ্বিজ গোপীদাস। গৌরপদে রহে মতি ইহ মনো আশ।

এ পুথির মুখবন্ধে ১–১৫ আনা পৃষ্ঠার মধ্যে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর প্রশস্তিমূলক পরিচিতি রয়েছে। যদিও কাব্যরচনাকালে তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহই (১৫৩২–৩৮) ছিলেন গৌড়ের সুলতান এবং তাঁর প্রশস্তি থাকাই ছিল স্বাভাবিক। এতে মনে হয় কোন লিপিকর চৈতন্যমঙ্গলের পুরোভাগে যুক্ত করেছেন হোসেন শাহর পরিচিতি। কাজেই এ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলেই মানতে হবে। 'বেদ সিন্ধু নেত্র ইন্দু শকে অর্থাৎ ১৩৭৪ শকাব্দে তথা ১৪৫২ খ্রীস্টাব্দে হোসেন শাহর জন্ম এবং 'শশী শ্রুতি বেদ ইন্দু' শকে তথা ১৪৪১ শকে বা ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। মনে হয় কোন লোকশ্রুতি অবলম্বনে পরবর্তীকালের কেউ কোন অভিসন্ধিবশে এ রাজপ্রশস্তি রচনা করেছিলেন।

এমনও হতে পারে যে কবি গোপীদাস আসলে আঠারো শতকেই একাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু চৈতন্যচরিতের আদি রচয়িতার গৌরব পাবার জন্যেই নিজেকে চৈতন্যসহচর বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং হোসেন শাহর পুত্র গিয়াসউদ্দীন সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় কিংবা প্রখ্যাত বলেই চৈতন্যতিরোভাবের পরের বছরেই রচনা আরম্ভের (১৫৩৪ খ্রীঃ) দাবিদার কবি হোসেন-প্রশস্তি রচনা করেছেন। গোপীদাস–গোপীনাথ পণ্ডিত নন বা গোপীনাথ সিংহ নন—যদি চৈতন্যসহচর ও চৈতন্য–চরিতকার হতেন, তা হলে তাঁর নাম শুধু চরিতগ্রন্থগুলোতে নয়, বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থেও পাওয়া যেত এবং তিনি লোকশ্রুতি সূত্রেও চিরপ্রখ্যাত থাকতেন। বৈষ্ণব–বন্দনায় ও ব্রজমোহন দাসের চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে তাঁর নাম নেই। কাজেই মনে হয় এ গ্রন্থও জাল, হোসেন প্রশস্তিও বানানো। আমরা পুথি পড়তে পাইনি। বৈষ্ণব সহজিয়ামত চৈতন্যদেবে আরোপ করে তাকে দৃঢ়-ভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য করার অভিসন্ধি বশে এ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল কি-না পাঠ পরীক্ষা না করে বলা যাবে না। তবে গোপীদাস নামে সহজিয়া গন্ধ রয়েছে। হোসেন শাহ পরিচিতি এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

সৈঅদ আস্রাফল মক্কাধামে ঘর।
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত মহাবিদ্যাধর॥
বেদ সিন্ধু নেত্র ইন্দু শক পরিমিতে।
জন্মে সুত তান গৃহে শুক্লা দশমিতে॥
জন্ম অন্তে সেই জাতক হৈল মাতৃহীন।
পিতৃক্রোড়ে চন্দ্রকলা বাড়ে দিন দিন॥
বিধিমত হৈল নাম সৈঅদ হুসন।
ভাবী কালে হৈলা তেঁহ জগৎ ভূষণ॥
শিশুপুত্র লৈআ সাথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
দয়াবতী পত্নী তান আরো সমাদরে॥
পুত্র সম স্নেহভরে করিলা পালন।
বিস্মরিলা পিতৃশোক বালক হুসন॥
জ্ঞানার্জ্জনে একনিষ্ঠ রহি সর্ব্বক্ষণ।
ভক্তিভরে গুরুপদে করে অধ্যয়ন॥
কতদিন কাজি গৃহে করিআ যাপন।
বাল হৈতে যৌবনেতে করে পদার্পণ॥
শ্রেষ্ঠকুল সমুৎপন্ন হুসন গুণধরে।
দুহিতা সঁপিলা কাজি হরষ অন্তরে॥

উপনীত হৈলা য়াসি রাঢ়ের পল্লীতে॥
বঙ্গভূমে চাঁদপাড়া চন্দ্রসম খ্যাত।
বসুধায় সুবিদিত সর্ব্বজন জ্ঞাত॥
হর্ষে তথা কৈলা স্থিতি হুসন জনক।
সুধীজন হাস্যানন প্রকাশে পুলক॥
কতদিন হয় লীন আনন্দ কৌতুকে।
সহসা বিঁধিল শেল হুসেনের বুকে॥
তেয়াগিআ জন্মদাতা যান স্বর্গধাম।
পিতৃহারা হৈয়া শিশু কাঁদে অবিরাম॥
বয়ক্রম অষ্টবর্ষ সবে মাত্র হয়।
পাথারে ভাসিল শিশু হৈলা নিরাশ্রয়॥
সেহ স্থানে গুণনিধি পাতসার কাজি।
কি কহিব এক মুখে তান গুণ রাজি॥
সদাচারী ন্যায়বান দয়ার সাগর।
ইষ্টনাম জপে সদা উদার অন্তর॥
নাহি কেহ হুসেনের ইহ চরাচরে।
হেরি ইহা ব্যথা পান আপন অন্তরে ॥
ঠাঁই দিলা সেহ কাজি লৈআ নিজ ঘরে।
অতপর যায় হুসন গৌড় নগরে।
ধীর নম্র সুচরিত সবে সমাদরে॥
পাতসার সৈন্যদলে করে যোগদান।
সৈন্যপত্য লভে পরে হুসেন ধীমান॥
তারপরে মন্ত্রী হৈলা মন্ত্রী হৈতে ভূপ।
বুদ্ধিবলে ভাগ্য তার প্রকটে স্বরূপ॥
নৃপতি হুসেনশাহ হন মহামতি।
পঞ্চ গৌড়েতে ঘোষে পরম সুখ্যাতি॥
পুত্রসম প্রজাগণে করেন পালন।
চোর দস্যু রাজ্যে তান না হেরি কখন॥
স্বর্ণ পাত্রে ভক্ষে অন্ন নাগরিক গণ।
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি জগৎ ভূষণ॥
শশী শ্রুতি বেদ ইন্দু পরিমিত শক।
সৈঅদ হোসেন সাহ নৃপতি-তিলক
দেহ ত্যাগী আত্মা তান স্বর্গধামে যায়।
; নরগণ কাঁদে হায় হায়॥
। রচে দ্বিজ গোপীদাস
গৌর পদে রহে মতি ইহ মনো আশ ॥[1]

জ. ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ

ব্রজমোহন দাস বিরচিত 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ' গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপিই অবশিষ্ট রয়েছে। এ দুর্লভ একক পুথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার একটি অনন্য সম্পদ। কেননা বৈষ্ণব মহাজনদের গুরু কিংবা শিষ্য-পরম্পরা নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে যে-সব বিতর্ক রয়েছে, তার কিছু কিছু সমাধান মিলবে এ গ্রন্থে। ভাঁজ করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। পঞ্চাশ পত্রে সমাপ্ত। লিপিকাল ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ। লিপিকর কৃষ্ণবল্লভ শর্মা, পুষ্পিকা এরূপ ঃ

ইতি শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপে সঙ্গোপাঙ্গ গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মণ স্বাক্ষরমিদং স্বীকীঞ্চ।
শুভমস্তু শকাব্দ ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাল্গুন।
শ্রীকৃষ্ণ শরণং।

গ্রন্থোৎপত্তি ও রচনাকাল ঃ

প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণ
দীক্ষ শিক্ষা প্রকাশ কবেহ হইল।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ সংক্ষেপেতে
সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে।

৩৩৪ [১৩৪] অব্দে শুঢ়াবতারহিক শ্রীচৈতন্যসমুক নিত্যানন্দ সহানেত পাত্রদান ভক্তসঙ্গ কাল।

অতএব, ব্রজমোহন দাস চৈতন্যদেবের শিক্ষা, দীক্ষা ও লীলার প্রকাশকাল বর্ণনার জন্যেই গ্রন্থরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ'। প্রমাণিত এবং সপ্রমাণ তথ্যই পরিবেশনের অঙ্গীকারে তিনি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। এতে বোঝা যায়—এ গ্রন্থে তিনি তাঁর সমকালে চালু অনেক তথ্যের ভুল নিরসনের জন্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। একশ' বছরের মধ্যে

১. *সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদোসী লিখিত প্রবন্ধ ঃ লেখক সমাবেশ পত্রিকা, কলিকাতা, ৩য় বর্ষ-১২তম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৩ সন দ্রষ্টব্য।*

শিষ্য-পরম্পরা ও শাখা নির্ণয় নিয়ে ভুল ধারণা বা বিতর্ক শুরু হয়েছিল। উল্লেখিত অব্দটা স্পষ্টত ভুল। এটি ১৩৪ চৈতন্যাব্দ হওয়ার কথা। তা হলে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি এ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। প্রাপ্ত পুথির লিপিকালই হচ্ছে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ, কাজেই কবি নিঃসন্দেহে সতেরো শতকের লোক।

ব্রজমোহন দাস তাঁর অনুসৃত ও আদর্শ দুটো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। একটা মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিত' অপরটি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। যথা ঃ

চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে কৈল বর্ণন।
আদি খণ্ডে মধ্য খণ্ডে শেষ খণ্ডে আর
তার সূত্রে সংক্ষেপেতে করিব বিস্তার।
আদি খণ্ডে বিদ্যার বিলাস প্রাধান্যতে

মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য চরিত
তাহাতে দেখিয়া সূত্র লেখিয়ে কিঞ্চিত।
মধ্যখণ্ডে সংকীর্তন প্রকাশ জগতে।
শেষ খণ্ডে ন্যাসীরূপে স্থিতি নীলাচলে
নিত্যানন্দে সমর্পিয়া গৌড় মণ্ডলে।

এ অংশ থেকে রচনাকাল অনুমান করা সম্ভব। মুরারি গুপ্তের কড়চাই চৈতন্যদেবের আদি চরিতগ্রন্থ এবং চৈতন্যদেবের জীবৎকালে রচিত। এটি সংস্কৃতে রচিত এবং শ্লোকাকারে গ্রথিত। এখানে সে শ্লোক-সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। ইনি চৈতন্য-জীবনের আদিকাণ্ড তথা সন্ন্যাস জীবন অবধি (গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন অবধি) বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তিমকাল অবধি জীবনকথা বৃন্দাবন দাসের ভাগবত থেকেই নেয়া। বৃন্দাবন দাসই চৈতন্যদেবের প্রথম বাঙলাজীবনী রচয়িতা।

ব্রজমোহন দাস তাঁর গ্রন্থের গোড়ায় বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লেখ করেছেন, গ্রন্থের শেষের দিকে আবার 'ভাগবত' রূপে বর্ণনা করেছেন।

অতএব ব্রজমোহন দাস সংস্কৃতে ও বাঙলায় রচিত দুটো আদি গ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন তাঁর বক্তব্যের প্রমাণক হিসেবে। সংস্কৃতটি চৈতন্যর জীবৎকালে রচিত। নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবন দাস প্রধান প্রধান চৈতন্য পার্ষদের থেকেই বাঙলাটির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এবং চৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ থেকে ২২ বছরের মধ্যেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রমাণ ও সমর্থন সন্ধান করেছেন তিনি পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি থেকে। তাই মনে হয় 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ' রচনাকালে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাঁর হাতে এসে পৌঁছেনি অথবা তাঁর গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পূর্বে রচিত। তা ছাড়া এ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শিষ্য–উপশিষ্য পরম্পরার যে শাখা–প্রশাখা– উপশাখা বর্ণিত, তাও দীর্ঘ বা দূর বিস্তৃত নয়, চার পুরুষের অধিক নয় কোনটাই। এ সব তথ্যে গুরুত্ব দিয়ে আমরা চৈতন্যতত্ত্ব–প্রদীপ ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে অনুমান করি। পদকার বংশীবদন কবির সমকালীন বলে মনে হয়—"করি শুদ্ধ মন শ্রীবংশীবদন। বন্দহোঁ লোটি ধরণী। যাহার সঙ্গীত রসে এ জগত। মোহিল সকল পুনি" (বন্দনা)।

১. এই গ্রন্থে চৈতন্য পার্ষদদের নাম ও নিবাস ২. বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রাচীনতার ও উদ্ভবের ইতিকথা ৩. শিষ্য-পরম্পরা ৪. চৈতন্যের আবির্ভাব, শৈশব–বাল্য–সন্ন্যাস ও লীলা– প্রকাশ বর্ণিত রয়েছে।

চৈতন্য পার্ষদের নাম-নিবাস এবং বিভিন্ন গুরুর শিষ্য-পরম্পরার ও শাখা-প্রশাখার বর্ণনা সম্বলিত বলেই এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয় এবং সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো সত্য পরিচয় উদঘাটিত হলে মিথ্যা পরিচয় প্রসূত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হবে আশঙ্কায় এমন একটি গ্রন্থের প্রচার ও খ্যাতি বৈষ্ণব গুরুরা সযত্নে পরিহার ও লোপ করতে চেয়েছেন। অথবা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরোধী বলে এ গ্রন্থ বর্জিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটিতে রাগাত্মিকা সাধনার প্রবণতার আভাস আছে। হয়তো এটি সহজিয়াদের আদি গ্রন্থ। অথবা কবি গৌরপারম্যবাদী বা 'গৌরনাগরভাবপন্থী'। চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপের প্রথমেই রয়েছে দীর্ঘবন্দনা। বন্দনার প্রথম ও ক্ষুদ্রাংশে

রয়েছেন মাত্র ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, সীতাদেবী ও অদ্বৈতাচার্য—এ চারজন। তাতে আবার নিত্যানন্দকে বলরাম ও চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বন্দনার প্রথমাংশে 'দোয়া-পরে দুই ভাই রাম ও কানাই। কলি অবতারে নাম চৈতন্যনিতাই'। দীর্ঘবন্দনার দ্বিতীয়াংশে রয়েছেন, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শচীদেবী, জগন্নাথ, বিশ্বরূপ, কমলা (চৈতন্য পত্নী) বিষ্ণুপ্রিয়া (পত্নী), নিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়ই পণ্ডিত, জাহ্নবা (নিত্যানন্দ স্ত্রী), বীরভদ্র, বীরভদ্রপুত্র, অদ্বৈত-পত্নী সীতা, অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈত পুত্র) যবন হরিদাস, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, মালিনী, নারায়ণী, মুরারি গুপ্ত, গদাধর দাস, মুকুন্দ, রাজা সদানন্দ, (বৈদ্য) নরহরি, মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন, তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর, বামানন্দ রায়, বক্রেশ্বর মিশ্র, রামানন্দ মিশ্র, কাশীশ্বর, বিষ্ণুপুরী, গোবিন্দ গোঁসাই, বড় কৃষ্ণদাস, সার্বভৌম ভট্ট, পরমানন্দপুরী, পণ্ডিত দামোদর, কুলুব মাধব-পুরী, গোপীনাথ পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর, নারায়ণ, পীতাম্বর, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, হরিহর পণ্ডিত, জগন্নাথ আচার্য, নারায়ণ আচার্য, শঙ্কর আচার্য, পীতাম্বর আচার্য, শ্রীরাম পণ্ডিত, নীলাম্বর চক্রবর্তী, গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি, সদাশিব আচার্য, শ্রীগর্ভ আচার্য, শুক্লাম্বর আচার্য, শ্রীনিধি আচার্য, শ্রীধর পণ্ডিত, কবীন্দ্র আচার্য, দ্বিজ রামদাস, বনমালী, হলায়ুধ, বিজয়নন্দন আচার্য, ঈশান আচার্য, গরুড়ধ্বজ আচার্য, গঙ্গাদাস আচার্য সাধুবর্ষ, আচার্য বল্লভ, বনমালী, কাশীনাথ, দুর্লভ আচার্য, কেশব ভারতী, দামোদর পুরী, কুলুব রাঘবপুরী, পরমানন্দ অবধূত, রামচন্দ্রপুরী, নরসিংহতীর্থ, নৃসিংহানন্দ, সদানন্দ ভারতী, সুখানন্দ, ব্রহ্মানন্দপুরী (যাদব), গোবিন্দপুরী, কেশবপুরী, বিশ্বেশ্বরপুরী, চিদানন্দ, অনুভবানন্দ, প্রবোধানন্দ, কৃষ্ণানন্দপুরী, কাশী মিশ্র, পুরন্দর, জগদানন্দ আচার্য, নীলাম্বর পণ্ডিত, সনাতন পণ্ডিত, গঙ্গাদাস ভদ্র, বাসুদেব ভদ্র, রামভদ্র, মুকুন্দ ভদ্র, সদাশিব কবিরাজ, বনমালী কবিরাজ, শিবানন্দ সেন, মৌলি সেন, রামতীর্থ, কাঙাল হরি (কবির সমকালীন), রায় চক্রবর্তী (বঙ্গে হএ যার ঘর), (উড়িষ্যার) প্রতাপরুদ্র, রায়পট্টক, শ্রীরামদাস, শ্রীসুন্দরানন্দ, পুরুষোত্তম দাস, গৌরিদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, কমলাকর পিপিলাই, উদ্ধরণ দত্ত, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, বড় বলরাম দাস (পদকার), বড়গাছাবাসী কৃষ্ণ দাস (ওর্ফে বিহারী), পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, শ্রীনাথ, জগন্নাথ সূর্যদাস কৃষ্ণদাস গৌরদাস (তিনভাই), গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেব ঘোষ (তিন ভাই) বৃন্দাবন দাস (চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা) গোপাল বসু, সারঙ্গ ঠাকুর, নৃসিংহ (চৈতন্য দাস), শ্রীবংশীবদন (পদকর্তা), পরমানন্দ অবধূত, কৃষ্ণতীর্থ, অনন্তপুরী, বলরাম দাস(বঙ্গেতে যাহার ঘর) গোকুলানন্দ, রূপ সনাতন গোসাঞি, শ্রীজীব গোস্বামী (রূপ সনাতনের ভাইপো), কবিচন্দ্র ঠাকুর, নাগর যুবাই (সমকালীন) কামদেব, শ্রীল নারায়ণ চক্রবর্তী (কামদেব পুত্র) সাধুবর্ষ ভাগবতাচার্য, শ্রীমৎ গোসাঞি, আচার্য চক্রপাণি ও তৎপুত্র কেশব ও কমলাকান্ত, বিষ্ণুদাস আচার্য, শ্যামদাস আচার্য (ওর্ফে জঙ্গলি)--এঁদের মধ্যে কবির সমকালীনও আছেন অনেকে। কবি নাম শুনেও অনেক অপরিচিত জনেব বন্দনা করেছেন। তাই বলেছেন ঃ

অক্ষরানুরোধে আপনার বোধে করিল এ গ্রন্থন (বন্দনাংশ)।
বুঝিতে হো নারি অনুভব করি ছোট বড় কোন্ জন।
অতএব দোষ আক্ষার অশেষ ক্ষেমিবে মাধব জন (কৃষ্ণভক্ত)
অগ্রে বা পশ্চাতে গ্রন্থন ইহাতে না বুঝি কৈল যেমন।

বাঙলায় রচিত দৈবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণববন্দনা (২১৪জন) এবং এক বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণববন্দনা আর সংস্কৃতে রচিত জীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণববন্দনা' (২০৩জন) ছাড়াও সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধানে ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণববন্দনায় চৈতন্য পার্ষদ পরিকরদের নাম মেলে। ব্রজমোহনের বন্দনায় (১৬২জন) বিবৃত নাম ও পরিচয় সেগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। বন্দনার পরেই রয়েছে পার্ষদদের নাম ও নিবাস।

ব্রজমোহন দাস সম্ভবত 'কানাইগ্রামে; বসে 'জন্ম পাট নিরূপণ' অধ্যায় "দেখিয়া প্রাচীন খত সংক্ষেপে রচনা" করেছেন।

ক. চৈতন্য পার্ষদদের নাম ও নিবাস নিম্নরূপ ঃ

১. অদ্বৈত গোসাঞি (আচার্য, চৈতন্য নিত্যানন্দের অগ্রজ, জন্ম দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসেতে।) শান্তিপুর ২. নিত্যানন্দ, একচাকা-খণ্ডপুর। (মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়ো পণ্ডিত, জন্ম মাঘে শুক্ল ত্রয়োদশী ভূমিসূত বারে। বিশবছর ধরে তীর্থ ভ্রমণ। মথুরায় বিশ্রাম। নদীয়ায় আগমন ও নন্দন আচার্যের ঘরে বাস, পরে শ্রীনিবাসের ঘরে বাস) ৩. গদাধর পণ্ডিত। শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীনিবাস, চন্দ্রশেখর, মুরারি গুপ্ত, শ্রীহট্ট। ৪. পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত, চাটিগ্রাম। ৫. হরিদাস ঠাকুর, বুড়ণ। ৬. পরমানন্দ, শ্রীবিষ্ণু পুরীর তীরে। ৭. গদাধর দাস, আজুনিয়া দহ। ৮. শিবানন্দ সেন কাচোড়া। ৯, নরহরিদাস, রঘুনন্দন, খণ্ড। ১০. রামানন্দ রায়, দ্রাবিড়দেশ। ১১. অভিরাম ঠাকুর, অজ্ঞাত। ১২. সুন্দর হরিদাস, মহিষপুর। ১৩. সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম দাস, বোধখানা। ১৪. জগদীশ পণ্ডিত, ভেকলিয়া ১৫. সনাতন দত্ত, উদ্ধব দাস, পরমেশ্বর দাস, খড়দহ। ১৬. বলরাম দাস, দোগাছা। ১৭. বদনানন্দ, বাগনপাড়া। ১৮. সনাতন, রূপ, জীব, ফতিয়ারাজ্য (ফতেয়াবাদ পরগনা)। ১৯. পরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, থাণ্ডনিয়া। ২০. ধনঞ্জয় পণ্ডিত, বেনডা।

খ. নদীয়ায় জাত মহাজনগণ

১. চারভাই—জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরদাস, কৃষ্ণদাস এবং সার্বভোম ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ।

২. নারায়ণী ও তাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস, আলবাটি। (আল্‌রাঢ়ি) নবদ্বীপ।

৩. রত্নেশ্বর আচার্য। গোপীনাথ পণ্ডিত। দামোদর। শঙ্কর পণ্ডিত। নীলাম্বর চক্রবর্তী। নারায়ণ মিশ্র। শ্রীমান পণ্ডিত। সুদর্শন মিশ্র। সদাশিব আচার্য। শ্রীগর্ভ। নকুল আচার্য। কবিচন্দ্র চক্রবর্তী। খোলাবেচা শ্রীধর (কৃপা করি প্রভু খোলাবেচা দুর কৈল)। শ্রীনিধি আচার্য। গঙ্গাদাস পণ্ডিত। বিদ্যাবিদ আচার্য। বল্লভাচার্য। হলায়ুধ আচার্য। সনাতন। (সর্ববিদ্যাবুধ) পুরন্দর আচার্য। কাশীনাথ মিশ্র। শ্রীচন্দ্র আচার্য। দেবানন্দ। লক্ষ্মণ আচার্য। শিবানন্দ চক্রবর্তী। মিশ্র কবিরাজ।পুরুষোত্তম। জগন্নাথ সেন। বৈদ্য বনমালী দাস। মুরারি। চৈতন্য। এবা নবদ্বীপবাসী।

গ. অন্যান্য অঞ্চলের মহাজন

১. কমলাকর পিপিলাই এবং গোবিন্দ ঘোষ , মাধবানন্দ বাসুদেব ও রাজীব ঘোষ—এই চারভাইয়ের জন্মস্থান চাকদহ। ২. পুরন্দর/রাঘব পণ্ডিত/কাশীশ্বর মিশ্র, পানিহাট। ৩. বাসুদেব/ভাগ দত্ত/ পরমানন্দ গুপ্ত/ঈশান দাস, বানিয়া, চৌড়লিয়া । ৪. রাঘব ভট্ট/ রাঘব গোসাঞি/ কাশীশ্বর/ হরিভট্ট, দ্রাবিড়দেশ। ৫. কৃষ্ণদাস ওর্ফে কানু, আকাইহাট। ৬. কৃষ্ণদাস, বড়গাছিগ্রাম। ৭. কালিয়া ওর্ফে কৃষ্ণদাস / শ্রীনাথ ওর্ফে মুকুন্দ, মুদাবাজ/ ৮. সুবুদ্ধি খান/অনন্ত আচার্য/ রঘুনাথ / কাশীনাথ/ মধুপণ্ডিত/তুলসী মিশ্র/মণি হোড়, গুপ্তপাড়া। ৯. জগদানন্দ/ভগবতাচার্য পরমানন্দ, বসুধা। ১০. নারায়ণ গুপ্ত/বৈশ্য গঙ্গাদাস/বুদ্ধিমন্ত খান/ রঘুনাথ দাস / জগদীশ দাস, পানিনালা। ১১. গরুড় আচার্য / কাশীশ্বর / বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীকলা। ১২. রামমুকুন্দ/উদ্ধব দত্ত / কৃষ্ণানন্দ পাহাড়পুর। ১৩. সারঙ্গঠাকুর, বুড়ণ। ১৪. সুগ্রীব মিশ্র/গোবিন্দানন্দ/ শিবানন্দ পণ্ডিত/কাশীশ্বর/ শিবজীব পণ্ডিত / তপন আচার্য, ফুলিয়াগ্রাম। ১৫. পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী/ শ্রীকর/মধুপণ্ডিত, কংসারি সেন / বল্লভ সেন, কাটিশালী। ১৬. মুকুন্দ কবিরাজ, শ্রীখন্ড। ১৭. গোকুলানন্দ/বলরাম সেন, ঘোড়াঘাট। ১৮. রাম চক্রবর্তী, যশদলগ্রাম প্রকাশ বেতড়ী। ১৯. রামানন্দ বসু/ গোপাল বসু কুলীনগ্রাম। ২০. শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী/সঞ্জয়/শ্রীমান পণ্ডিত, কুমারভট্ট (হট্ট ?)!

ঘ. উৎকলবাসী মহাজন

উড়িয়া বলরাম দাস/জগন্নাথ দাস/ বিপ্রচন্দ্র শেখর /ভট্টনায়ক/বানীনাথ/ নরসিংহ দাস /হরিদাস/ বলরাম হাতী/শিশু কৃষ্ণদাস/দ্বিজ রামচন্দ্র/মাধব নায়ক ভট্ট।

ঙ. 'পুরী' শাখার সন্ন্যাসী

রামচন্দ্র পুরী/দামোদর পুরী/সুখানন্দ পুরী/ পরমানন্দ পুরী / ঈশ্বর পুরী / ব্রহ্মানন্দ পুরী গোবিন্দ ওর্ফে নৃসিংহানন্দ পুরী/কৃষ্ণানন্দ পুরী/রঘুনাথ পুরী/বিশ্বেশ্বর পুরী/রাঘব পুরী / পুরুষোত্তম পুরী/ অনন্ত পুরী / হরিহরানন্দ পুরী/ বিজনানন্দ পুরী।

সরখণ্ডে রয়েছে উপেন্দ্র আশ্রম, শুদ্ধেশ্বর আশ্রম ও সরস্বতী আশ্রম।

চ. অন্যান্য শাখার সন্ন্যাসী

অনুভবানন্দ। বিদ্যানন্দ সরস্বতী। শ্রীরাম তীর্থ/কেশব ভারতী। সত্যানন্দ ভারতী, জগন্নাথ তীর্থ। নরসিংহ। বাসুদেব তীর্থ । গরুড় অবধূত। পরমানন্দ অবধূত। এরা 'প্রভুর পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রমে"। এদের জন্মস্থান অজ্ঞাত। 'ইতি সর্বপাট নির্ণয়।'

ব্রজমোহন দাস তাঁর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য, তত্ত্ব ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ

তত্ত্বসাগর, ভবিষ্যপুরাণ,ভগবদগীতা, ভাগবৎ, মীতসেনের ব্রহ্মসম্বাদ, নারায়ণ, আদি পুরাণ, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ, কবিকর্ণপুর, প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'চৈতন্যতত্ত্বামৃত', জয়কৃষ্ণদাস রচিত 'বিচার সুধার্ণব, নরহরি দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্য' সহস্র নাম, প্রবোধানন্দ সরস্বতী বচন, জীব গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' জয়দেব বচন, বিষ্ণুপুরাণ, বৈষ্ণবতন্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা তন্ত্র, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, বৃহৎবামন, রসামৃতসিন্ধু, জয়গোপাল দাসের ভক্তিভাবপ্রদীপ, স্বতন্ত্র্যাভিধান, ক্রমদীপিকা, সনাতন রচিত 'ভগবতামৃত', ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, আদি সংহিতা, বিষ্ণুধর্মোত্তর, গৌতমীয়তন্ত্র কৃষ্ণোপনিষদ, নারদপঞ্চরাত্র, কার্তিক মাহাত্ম্য, নারদসঙ্গীতসার সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, হরিবংশ, বৃন্দাবন দাস রচিত "চৈতন্যমঙ্গল পদ্মপুরাণ মনবুদ্ধিসম্বাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বচন, শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য, রূপ গোস্বামীর বচন ও শ্রীদশম (বৈষ্ণবতোষিণী), সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন প্রভৃতি। [পুথির ২১ক-খ ও ২২ খ পৃষ্ঠায় চৈতন্যতত্ত্বামৃত স্থলে লিপিকর প্রমাদে চৈতন্যচরিতামৃত হয়েছে বলে মনে করি।]

উক্ত সবগ্রন্থ থেকে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন কবি। বলা বাহুল্য, ব্রজমোহন দাস রাগাত্মিকা প্রেম-স্বরূপের সমর্থক। রতিরমণ, পরকীয়া প্রভৃতি সহজিয়াতত্ত্ব এখানে আলোচিত। কবি স্পষ্টত সহজিয়া বৈষ্ণব বা গৌরনাগরবাদী।

নয়াঙ্গ গোপাল গোপী রাগাঙ্গ স্বভাব অন্তরে কান্তের স্নেহ নিত্য গোপীকার
কেহ কারো নাহি তথি সাপত্নীক ভাব। প্রকটেত পরকিয়া হেন ব্যবহার।

এ তত্ত্বের গুরুত্ব ও মহিমা প্রদর্শনের জন্যে এর প্রাচীনত্বের এবং সর্বজনীন স্বীকৃতির সাক্ষ্য স্বরূপ উপর্যুক্ত বিবিধ শাস্ত্র ও তত্ত্বগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্যে বঙ্গানুবাদ দেয়া হয়েছে। এ সঙ্গে সখ্য বাৎসল্যাদি অন্য রসের সুফলও বর্ণিত রয়েছে। বন্দনা, জন্মপাট ও সর্বপাট নির্ণয়ের পরেই রয়েছে উক্ত 'তত্ত্ব বর্ণনা', তার পরে রয়েছে চৈতন্য পার্ষদদের শিষ্য পরম্পরার বর্ণনা। শেষে রয়েছে চৈতন্যদেবের শৈশব, বাল্য ও সন্ন্যাস জীবনের কিছু পরিচয়। চৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার, তা প্রমাণের জন্যেই চরিতাংশের অবতারণা।

ভক্তিকল্পবীজের অঙ্কুর মাধবেন্দ্রপুরীতে, অঙ্কুরপুষ্টি ঈশ্বরপুরীতে এবং ক্রমে তা পল্লবিত তরুতে পরিণত। এবং পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দপুরী—এই নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষমূলরূপ। চৈতন্যদেব এই বৃক্ষের আদি স্কন্ধ—'আপনেই মহাপ্রভু হইলা আদি স্কন্ধ।' এবং তার 'দুই দিকে দুই স্কন্ধ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।' এর থেকে 'অসংখ্য শাখা' শিষ্য-উপশিষ্যের বিস্তার। [তুল ঃ চৈতন্যচরিতামৃত ৯ম পরিচ্ছেদ (পৃ ৮৫) মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, চৈতন্য, ব্রহ্মানন্দপুরী, কেশবভারতী, নৃসিংহতীর্থ, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, সুখানন্দপুরী।]

চৈতন্য পারিষদ

ক. দুই ভাই শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম—দুই ভাইয়ের দুই শাখা। খ. শ্রীপতি ও শ্রীনিধি—দুই সহোদরের 'চারি ভাইর দাসদাসী পরিজন দুই শাখার উপশাখা স্বরূপ। গ. 'যার গৃহে কীর্তন প্রভুর দিবস রজনী' সেই আচার্য রতনের এক শাখা এবং তার শিষ্যপরিকরের উপশাখা। ঘ. আচার্যরত্ন ওর্ফে শ্রীচন্দ্রশেখর। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গদাধর পণ্ডিতের শাখা আর শিষ্য-উপশিষ্যের উপশাখা, ঙ. বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শাখা। চ. পণ্ডিত জগানন্দ। রাঘব পণ্ডিতের শাখা, উপশাখা–মকরধ্বজকর ও তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী—প্রভুর প্রিয়দাসী। তাঁর ভোগ সামগ্রী যোগান বারমাসী। ছ. গঙ্গাদাস পণ্ডিত। শ্রীআচার্য পুরন্দর শাখা। জ. দামোদর পণ্ডিত ও তাঁর অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত শাখা। ঝ. সদাশিব পণ্ডিত (ওর্ফে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী)। নারায়ণ পণ্ডিত শাখা। ঞ. শ্রীমান পণ্ডিত। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। নন্দন আচার্য শাখা। ট. মুকুন্দ দত্ত শাখা। ঠ. বাসুদেব দত্ত শাখা। ড. হরিদাস ঠাকুরের শাখা, উপশাখা—কুলীন গ্রামবাসীরা। ঢ. শ্রীরাম (মান) সেন। মুরারি গুপ্ত শাখা। ণ. গদাধর দাস শাখা। ত. শিবানন্দ সেন—তাঁর তিন পুত্রের চৈতন্যদাস-রামদাসের উপশাখা। এর উপশাখা—বল্লভ সেন। শ্রীকান্ত সেন শাখা। থ. গোবিন্দানন্দ। নন্দন ব্রহ্মচারী। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শাখা।

১. চৈতন্য কীর্তনিয়া—গোবিন্দ দত্ত, আখরিয়া বিজয় দাস, চৈতন্যসেবক খোলাবেচা শ্রীধর।

২. চৈতন্য স্নেহভাজন—ভগবান পণ্ডিত/জগদীশ পণ্ডিত/হিরণ্য।

৩. পাঠক–পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়।

৪. বনমালী পণ্ডিত। বুদ্ধিমন্ত খান/ গরুড় পণ্ডিত। গোপীনাথ সিংহ। শ্রীমুকুন্দ / নরহরি/শ্রীরঘুনন্দন/চিরঞ্জীব/সুলোচন/সত্যরাজ রামচন্দ্র/যদুনাথ/পুরুষোত্তম/ শঙ্কর/ বিদ্যানন্দ/ বাণীনাথ বসু (চৈতন্যর প্রিয় দাস) এদের কুলীনগ্রামে বাস।

৫. 'শ্রীরূপ-সনাতন দুই মহাশাখা / অনুপম জীব আদি উপশাখা লেখা।'

৬. রঘুনাথ/স্বরূপ/শঙ্করারণ্যাচার্য—বড় শাখা এবং মুকুন্দ/কাশীনাথ/গরুড়– উপশাখা।

৭. শ্রীনাথ পণ্ডিত। জগন্নাথ আচার্য। শ্রীনিধি। গোপীকান্ত মিশ্র। ভগবান। সুবুদ্ধি মিশ্র। হৃদয়ানন্দ। কমলনয়ান। মহেশ পণ্ডিত। শ্রীকর। শ্রীমধুসুদন। জগন্নাথ দাস গালিম। শ্রীপুরুষোত্তম। শ্রীচন্দ্রশেখর। দ্বিজ হরিদাস। রামচন্দ্র। ভাগবতাচার্য। শ্রীগোপাল দাস। সারঙ্গ দাস আর্য।

৮. জগন্নাথ তীর্থ। বিপ্র জগন্নাথ। গোপাল আচার্য। বাণীনাথ। গোবিন্দ,মাধব ও বাসুদেব (ভাই তিন জনে)–চৈতন্যে নাচায় সংকীর্তনে।

৯. রামদাস ও অভিরাম নিত্যানন্দের সঙ্গীরূপে —'গৌড়ে আইলা'

১০. রামদাস। মাধব। বাসুদেব ঘোষ। গোবিন্দ—প্রভুর সঙ্গে রহিলা হরিষে।

১১ কমলাকান্ত। যদুনন্দ। মাধব আচার্য আর 'কৃপাপাত্র জগাই-মাধাই দুই আর্য। নবদ্বীপে ভক্তর কৈল সংক্ষেপে গণন/অসংখ্য চৈতন্যভক্ত নহেত লিখন।

নীলাচলে যাঁরা গেলেন ঃ

১. সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য। কাশী মিশ্র। প্রদ্যুম্ন। ভবানন্দ–ভবানন্দের পাঁচপুত্র—রামানন্দ রায় ; বাণীনাথ পট্ট-নায়ক, কলানিধি, সুধানিধি, গোপীনাথ নায়ক এবং রামানন্দ।

২. রাজা প্রতাপরুদ্র, কৃষ্ণদাস, উড়িয়া ভগবানাচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মহাতি, মুরারি মহাতি–চৈতন্য সেবাকারী।

৩. শিখি মহাতির ভগ্নী মাধবী দেবী, ঈশ্বরপুরী, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ—চৈতন্য অনুচর।

৪. কৃষ্ণদাস নামের কুলীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যর সঙ্গে দক্ষিণে (উড়িষ্যায়) আসেন।

৫. বলভদ্রাচার্য, বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, রাম ভদ্রাচার্য, সিংহেশ্বর উড়িয়া, তপনমিশ্র, রঘুনাথ, নীলাম্বর সিহাভট্ট, কমোভট্ট, শিবানন্দ দস্তুর ও কমলাকান্ত (ইনি পূর্বে গৌড়ে চৈতন্যভৃত্য ছিলেন)।

৬. অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করতেন।
৭. নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস নীলাচলে চৈতন্যের সঙ্গে বাস করতেন।
৮. বারাণসীবাসী ভক্ত চন্দ্রশেখর, রঘুনাথের পুত্র তপন মিশ্র, রঘুনাথ মিশ্র (ভট্টাচার্য উপাধি) বাল্যে চৈতন্যের সেবা করেছিলেন। এরা চৈতন্যের সঙ্গে কিছুকাল নীলাচলে বাস করেন, পরে চৈতন্যনির্দেশে বৃন্দাবনে বাস করেন।
অসংখ্য চৈতন্যভক্ত নহেত গণন। বাল্য যুবতী মূঢ় অন্ধক অবধি! দেখিয়া প্রাচীনমত মহাপ্রভুর শাখা সংক্ষেপে কহিল ইথে নাম মাত্র লেখা।

নিত্যানন্দ শাখা

বৃক্ষে গুরুতর শাখা নিত্যানন্দ রায় শ্রীবীরভদ্র নিত্যানন্দ সম শাখা
জন্মিল অনেক শাখা প্রশাখা তাহার। যাহার করণ সব নাহি যাএ লিখা।

১. চৈতন্যভক্ত রামদাস ও গদাধরদাস নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে এলেন— রামদাস সখ্যভাবে ও গদাধরদাস গোপীভাবে সাধনা করতেন।
২. গৌড়দেশে নিত্যানন্দের দানলীলা যাঁর ঘরে সংঘটিত হয়, তাঁর সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে 'বিবরিয়া লিখিল এই সব বিবরণ'।
৩. নিত্যানন্দ, বলরাম ও সদানন্দে ছিল সখ্যভাব। রামদাস, গদাধর, মাধব, বাসুদেব— নিত্যানন্দের কীর্তন-নর্তন সহচর।
৪. মাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনিয়া—'যার গানে নিত্যানন্দ নাচয়ে হরিষে।'
৫. 'বাসুদেব করে প্রভুর গীত বর্ণন।'
৬. মুরারি 'চৈতন্য দাস শিঙ্গা-বেণু বাদক।'
৭. রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ী—'যাহার দর্শনমাত্র প্রেমভক্তি পাই।'
৮. সুন্দরানন্দ– 'যার সনে ব্রজনর্ম কৈল নিত্যানন্দ।'
৯. 'অলোকচরিত কমলাকর পিপিলাই।' কৃষ্ণদাসের ভাই সূর্যদাস সরখেল। গৌরীদাস পণ্ডিত। পুরন্দর পণ্ডিত। পরমেশ্বর দাস। জগদীশ পণ্ডিত। ধনঞ্জয় পণ্ডিত। মহেশ পণ্ডিত। পুরুষোত্তম পণ্ডিত। বলবাম দাস। যদুনাথ কবিচন্দ্র—এঁরা নিত্যানন্দ শিষ্য-শাখা প্রবর্তক।
১০. দ্বিজ কৃষ্ণদাস। কালা কৃষ্ণদাস। সদাশিব কবিরাজ। তাঁর পুত্র পুরুষোত্তম দাস। তৎপুত্র কাণ্হি ঠাকুর। মহাভাগবত উদ্ধরণ দত্ত। মহাভক্ত আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (–পূর্ব নাম রঘুনাথ)—এঁরা নিত্যানন্দ-ভক্ত।
১১. 'বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই। পূর্বে যাহার গৃহে আছিলা নিতাই।'
১২. পরমানন্দ উপাধ্যায়। জীব পণ্ডিত কৃষ্ণগর্তাচত্ত পরমানন্দ গুপ্ত। নারায়ণ। কৃষ্ণদাস। মনোহর। দেবানন্দ– 'এ চারি নিত্যানন্দের কিঙ্কর।'
১৩. নকড়ি। মুকুন্দ। সূর্য। মাধব। শ্রীধর। পরমানন্দ-পুত্র জগন্নাথ-মহীধর-শ্রীমন্ত গোকুল দাস। হরিহরানন্দ। শিবানন্দ। মুকুন্দাই। পরমানন্দ (অবধূত) গোপাল। সনাতন। বসন্ত। লাবণী। বিষ্ণাই হাজরা। কৃষ্ণানন্দ। সুলোচন। কংসারি সেন। রামমোহন সেন। রামচন্দ্র কবিরাজ। গোবিন্দ। শ্রীলঙ্গ পীতাম্বর। মাধবাচার্য। দামোদর। শঙ্কর। মুকুন্দ শীল। মনোহর দাস। নর্তক গোপাল। রামভদ্র। গৌরাঙ্গ দাস। নৃসিংহ। চৈতন্য দাস। মীনকেতন। নারায়ণীপুত্র বৃন্দাবন দাস (যিনি চৈতন্যলীলার যেহেন কলিব্যাস।) এঁরা নিত্যানন্দ-শিষ্যশাখার প্রবর্তক শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির উপশাখা এবং 'নিত্যানন্দের উপশাখা অসংখ্য অগণন।'
১৪. ভক্তিকল্প বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ–অদ্বৈত (আচার্য), অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিত্র। অদ্বৈতের অন্য দুই পুত্র গোপাল ও বলরাম। রূপ। জগদীশ। এঁদের 'চৈতন্যে বিশ্বাস গৌণ, স্বতন্ত্রাভিমানী। এতেকে অদ্বৈত গোশাবী দুইগণ গণি'।

১৫. অদ্বৈত শিষ্য যদুনন্দাচার্য—তাঁর শাখা-উপশাখা অনেক। যথা– ভাগবতাচার্য। বিষ্ণুদাসাচার্য। চক্রপাণি আচার্য। অনন্তবিপ্র নন্দিনী। কামদেব চৈতন্যদাস। দুর্লভ বিশ্বাস। বনমালী দাস।

১৬. 'জগন্নাথকর-ভবনাথকর শাখা—হৃদয়ানন্দ সেন। দাস ভোলানাথ. 'লেখা' যাদব দাস। বিজয় দাস। দাস জনার্দন। অনন্ত দাস। কানু পণ্ডিত। নারায়ণ দাস। শ্রীবৎস পণ্ডিত। হরিদাস ব্রহ্মচারী। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী। হরিদাস। পুরুষোত্তম পণ্ডিত। রঘুনাথ। বনমালী। কবিচন্দ্র বৈদ্যনাথ। লোকনাথ পণ্ডিত। মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ। মাধব পণ্ডিত। বিজয় পণ্ডিত। শ্রীরাম পণ্ডিত।

চৈতন্যদেবের জন্ম ক্ষণ ও তারিখ হচ্ছে ঃ

শকে চৌদ্দশত আর সপ্তবৎসর
বিষ্ণু বিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা বিসুত জান
ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান।

চৈতন্যদেব বহু পাপী-তাপী দুরাচারীকে 'কৃপা' করেছিলেন এবং ধন্যও করেছিলেন অনেককে। যেমন ঃ

১. শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণীকে ঃ

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা ভ্রাতার/নারায়ণী নাম তার চারি বৎসরের।
মহাভাবময় প্রভু দেখিয়া সম্মুখে/চর্বিত তাম্বুল প্রভু দিল তার মুখে।
'আল রাঢ়ি' বুলি তেঞি কহে তাহারে/ বৃন্দাবন দাস জন্ম যাহার উদরে।

চার বছর বয়স্কা নারায়ণীকে 'আল রাঢ়ি' বলে সম্বোধন করে ধন্যা করেছিলেন।

২. নদীয়ার কাজীদেরকেও 'উদ্ধার' করেছিলেন ঃ 'কাজী সব নদীয়ায় ছিল দুরবার। তারে জ্ঞান দিয়া প্রভু করিল উদ্ধার।'

৩. জগাই-মাধাই ব্রাহ্মণ হয়েও মদ-মাংস খায়, ব্রহ্ম-গো-স্ত্রী হত্যা করে। তাদেরও কৃপা করেন তিনি।

৪. ষড় গোস্বামীর প্রধান দুই গোস্বামী বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রণেতা রূপ ও সনাতন দুই ভাইকে উক্ত নামে অভিহিত করেছিলেন চৈতন্যদেবই ঃ
দবীর খাসেরে প্রভু পরিচয় দিলা/প্রভু চিনি দুই ভাই কৃতার্থ হৈলা।
রূপ-সনাতন নাম থুইল দোঁহার/ভক্তিগ্রন্থ দোঁহে বহু করিল প্রচার।

৫. উড়িষ্যারাজ প্রতাপাদিত্য চৈতন্যদেবের কৃপা (শিষ্যত্ব) পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

৬. গৌড়মণ্ডলে চৈতন্য-প্রতিনিধি নিত্যানন্দ দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতেন এবং পত্নী জাহ্নবী ও পুত্র বীরভদ্র লীলা প্রকাশ করতে থাকেন।
গৌড়দেশে আসি তবে নিত্যানন্দ রায়। বাসু [–ধ] জাহ্নবী বিভা করিল তথাএ।
বীরভদ্র গঙ্গাদেবী প্রকাশ লীলাএ।

গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে কবি ব্রজমোহন দাসের বক্তব্য ঃ

তিন খণ্ড সূত্র এই সংক্ষেপে কহিল/দিগ্ দরশন মাত্র লোকে জানাইল।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ সংক্ষেপেতে/কহিল শাস্ত্র সংগ্রহ দেখি সাধুমতে।...
বন্দিয়া চৈতন্য চাঁদের চরণ মাধুরী/এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূর্ণ করি।[১]

•

ঋ. রহিমুননিসা রচিত বিলাপ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল গাঁয়ের স্থানীয়ভাবে প্রখ্যাত জান আলি চৌধুরীর পুত্র আহমদ আলি চৌধুরীর পত্নী যুগ-দুর্লভ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। এবং সে-যুগের

---

১ *বিস্তৃত বিবরণের জন্যে মৎসম্পাদিত চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৮৫ সাল, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) দ্রষ্টব্য।*

নারীতে বিরল কবিপ্রতিভাও ছিল তাঁর। কবির দাদা শ্বশুরের নাম গোলাম হোসেন, শ্বশুরের নাম জান আলি এবং স্বামী ছিলেন আহমদ আলি। রহিমুননিসার লিপীকৃত পদ্মাবতীর এবং লায়লী-মজনুর পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে তাঁর 'ভ্রাতৃবিলাপ' ও 'দোরদানা বিলাপ' নামের রচনা। এতেই মিলেছে তাঁর পিতৃপরিবারেরও পরিচয়। এঁর পিতামহ বিহারের মুঙ্গের থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মীর কাসিমের (১৭৬১-৬৫ খ্রী) যুদ্ধে পরাজয় ও পলায়নকালেই সর্বস্বান্ত হয়ে চট্টগ্রামে এসে বাস করতে থাকেন এবং চট্টগ্রামে জঙলী শাহ– এ ছদ্মনামে পীরালী করে জীবিকা অর্জন করতেন। জঙ্গী শাহর পুত্র আবদুল কাদের শাহ-ই রহিমুননিসাব পিতা। রহিমুননিসার তিন সহোদরের নাম ঃ আবদুল জব্বার, আবদুল সাত্তার ও আবদুল গফুর এবং তাঁর কোন বোন ছিল না। রহিমুননিসার শৈশবেই পিতৃপ্রয়াণ ঘটে, তাঁর বিদুষী মা আলিমুননিসা তাঁকে লেখাপড়া শেখান, পরে আবুল হোসেন নামের শিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। রহিমুননিসার পিতামহ চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন ১৭৬৪ সনের মধ্যেই ইংরেজেব সঙ্গে মীর কাসিমের যুদ্ধের ও পরাজয়ের কালে। অতএব রহিমুননিসার পিতাকে আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং রহিমুননিসাকে উনিশ-শতকের তৃতীয়পাদের গোড়ার দিকে প্রাপ্তবয়স্কা ও কবি রূপে পাই। ১৯১৫ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি 'রূপজালালের' কবি নওয়াব ফয়জুননিসার বয়োজ্যেষ্ঠা। কালের দিক দিয়ে না হলেও মহিলাকবির রচনা বলেই তাঁর প্রণীত কবিতাব ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। তাই আমরা স্থায়িত্ব দেয়ার অভিপ্রায়ে তাঁর কবিতাগুলো সংকলন করে রাখলাম।

প্রণমিএ নিরঞ্জন মনে স্মরি গুরুজন বর্ণিতেছি দুক্ষের বাসর
নিবেদিত গুণিপাদ কর মোরে আশীর্বাদ দোভাব না হোক মন।
হীন মতি নেচাবর রহিমন্নিচা নাম মোর শুন গুণী হই এক মন
মোর'পরে করতার যত দিছে দুক্ষভার সে সকল না যাএ কহন।
ফিরিল ভাগ্যের নিধি বিমন হৈল বিধি আচম্বিতে শিরে বজ্রাঘাত
পূর্বজন্মে কৈলুপাপ সেদোষে ফলিল তাপ আশাভ্রষ্ট হৈলুম অনাথ।
মিত্রের প্রাণের প্রাণ ভ্রাতৃ মোর রূপবান নাম জান আবদুল ছত্তার
তান'পরে জগপতি গৌরব হইয়া অতি পাপ হন্তে করিল নিস্তার।
আহা ভাই গুণসিন্ধু রসিকজনের বন্ধু জ্ঞানের গুরু প্রেমের ওখার
তোমার কৃতির সীমা কি কহিমু সে উপমা ধীর স্থির সত্যবন্ত সার।
মিত্রের প্রাণের প্রাণ ভ্রাতৃ মোর রূপবান নাম তার আবদুল গফুর

বারমাসী ঃ অগ্রাণের পক্ষ [পঞ্চ] দিন শুক্রবার শুভ চিন ভ্রাতৃমোর গেল স্বর্গপুর।

ফেলি মাও ভাই বোন ভ্রাতা মোর সুখ মন স্বর্গপুরে গেলা মনোরঙ্গ
ভুরুযুগ অতি টান নয়ান কটাক্ষ সান স্বরগের হুর মনোভঙ্গ।'
ভাবে মগ্ন হই মতি প্রভু হন্তে মাগি গতি ভ্রাতৃ মোর লই গেল বরিয়া
পুষল মাসেতে দুখ কহিতে বিদরে বুক তোমা শোকে ফাটি যাএ হিয়া।
পূরিলে নিবন্ধ আয়ু বন্ধন না হএ বায়ু সেই ছিদ্রে যমে দিল কোল
দিবানিশি অভিপ্রায় কান্দএ অভাগী মাএ না শুনিয়া তোমা সুধা বোল।
মাঘল মাসেতে আল্লা মোরে নিদারুণ হৈলা ভাই রত্ন করিলা বঞ্চিত
আছিলাম জোড়াভাই বেজোড়ে করিলা ছাই হেন ছিল দৈব নিয়োজিত।
ফাগুনে ফিরিল ঋত অস্থির মোহর চিত ভাই বিনে জগ আন্ধিয়ারি
দুঃখের জননী তোর সমর্পিলা কার 'পর উদাসিনী হৈলা তোমা স্মরি।
চৈতেতে চাতকী ঘন তৃষিত হইয়া মন নীর দান মাগে প্রভুস্থান
অনুজ অনুজা তেজি কার ভাবে গেলা মজি কেবা তোমা করে আশ্রাদান

বৈশাখ মাসেতে সার ভাগ্যহীন নাই আর মোর সম হেন ত্রিভুবন
শিশুকালে মৈল বাপ চিত্তে জ্বলে সেই তাপ কাটা ঘায়ে যেহেন লবণ।
জ্যৈষ্ঠল মাসেতে মন দুনা হৈল উচাটন সুসম্পদ লাগএ কর্কশ
আহা প্রাণাধিক ভাই কোথায় লুকিয়া যাই কেবা তোমা করিল বিরস।
আষাঢ় যে পরবেশ শরীর বিস্কিল কেশ তোমা শোকে বিদরএ প্রাণি
মনে দুক্ষ পাইলে ভাই কাহাত কহিবা যাই এহ লোকে তোমার জননী।
শ্রাবণে দাদুরী রব ময়ূর ডাহুকী সব নিজস্থানে সদা সুখ মন
বিহরিতে ভ্রাতৃসনে না দিলেক কোন জনে নিবান্ধবী হৈলু তেকারণ।
ভাদ্রেত সম্পূর্ণ জল করে মহী টলমল কোথা মোর ভাই গুণমণি
না দেখিএ চন্দ্রমুখ টুকটুক হৈল বুক তোমা খেদে স্থির নহে প্রাণি।
না পূরিতে কলানিধি কেনে ক্ষয় হএ বিধি কদাপি না মিটে কর্মভোগ
না কৈলা সংসার সুখ প্রভু তোমা করাউক স্বর্গপুরী হুরের সম্ভোগ।
আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচয় 'ভাই বলি কান্দি উভরাএ
আমার কান্দনি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিনী জলে মাছ কান্দিয়া লুকাএ।
কার্তিকেত বুদ্ধিছন্ন বনচর হৈল পূর্ণ মুই সম নাই ভাগ্যহীনী
হেন দৈবে ঘটে কার অঙ্কুরেতে এ অঙ্গার নিআশা হইলুঁ কলঙ্কিনী।

মধ্যযুগে অনেকেই খণ্ড কবিতা হিসেবেও বারমাসী লিখেছেন। রহিমুননিসার বিলাপটিও বারমাসী আঙ্গিকের খণ্ড কবিতা। শাহ-বারিদ খান রচিত বারমাসী যৌবনবতী নারী ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট খণ্ড কবিতা।[১]

রহিমুননিসার আত্মকথা

পদ্মাবতীর লিপিকর হিসেবে পুষ্পিকায় কবি নিজের স্বামী-কুলের ও পিতৃপরিবারের পরিচয় দিয়েছেন। এরও রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ

শুন গুণিগণ হই এক মন লেখিকার নিবেদন
অক্ষর পড়িলে টুটা পদ হৈলে সুধিঅ সর্বজন।
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট পুঁথি সতী পদ্মাবতী
আলাওল মণি বুদ্ধি বলে গুণী বিরচিল এ ভারতী।
পদের উকতি বুঝি কি শকতি মুই হীন তিরি জাতি
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ সাহস করিলুঁ গাঁথি।
সে পদ হিমল মন মোর উঝল ধীরবন্ত শুদ্ধ পতি
নাম আর গ্রাম শুন অনুপাম বর্ণিমু কিঞ্চিত কৃতি।
মেখল দিব্য স্থান অতি শোভমান মোহন্ত গুণী বসতি
নিত্য সুখ রস নহে পাপ বশ সদা সুআচার অতি।
মোহন্ত প্রধান রূপে পঞ্চবাণ গোলাম হোচন বীর
সর্বগুণধারী মহাদানকারী ধৈর্যে জিনি যুধিষ্ঠির।
প্রভুর ভাবক কাঙ্গালীপালক কুলশীল শুদ্ধ জান
না গুণি সংশয় সানন্দ হৃদয় কাটিলেক কাল তান।
তাহান তনয় অতি গুণালয় সাহসিক বুধশালী
জ্ঞানবন্ত গুরু মানে জিনি কুরু ছিরীযুত জান আলি

১. *মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।*

পিতৃ হন্তে অতি তাহান যে কৃতি প্রচারিল ক্ষিতি মাঝ।
তার ঔরসের আমদ আলিবর মোর পতি রসরাজ।
রসিক সমাজ ব্রতধর্ম কাজ উপেক্ষা না করে চিত
মোহর যে গুরু মহা কল্পতরু অখণ্ডিত উপনীত।
সত্যবন্ত স্থির জ্ঞানবন্ত ধীর নাম আবুল হোচন
তান কৃপা দান নহে মোর স্থান কিবা যোগ্য বিরচন।
গুণীনের পদ করিএ ভকত কর মোরে আশীর্বাদ
স্বামীর সঙ্গতি থাকিতে পিরীতি না হৌক যে বিসম্বাদ।
প্রভু করতারে মুই অভাগীরে করুণা রহৌক সতত
আন ভাব মতি নৌক আন পতি না করৌক লজ্জাগত।
নিজ গোত্র নাম স্থান আর গ্রাম কহিএ সব বাখানি
যবে পাও দোষ না হইঅ রোষ খেম যত বুধমণি।

রহিমুননিসার পিতৃকুল পরিচিতি

নাম গোত্র বিরচিয়া করিমু বর্ণন
কর্ণগত শুন মন দিয়া কবিগণ।
জংলি সাহা নাম করি গুণে অনুপাম
আহালে কোরেশ বংশে উৎপত্তি তাহান।
তথা বাগদাদ হন্তে আর কত মুঙ্গেরে আসিল
সে মুলুক নৃপ সঙ্গে বহু যুদ্ধ হৈল।
অগ্রগামী হৈয়া ইংরাজে যুদ্ধ দিল
দৈবদশা ফিরিঙ্গির বিজয় হইল।
মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্ন ধন
লুটিয়া করিল ক্ষয় যত পাপিগণ।
অনেক লাঘবে নিজ জন্মভূমি ছাড়ি
চট্টগ্রামে আসিয়া রহিলা বাস করি।
পীর হই শিষ্য কৈল কত কত গ্রাম
প্রকাশ হইল তান যশ কৃত্তিনাম।...
তাহান ঔরসে মোর পিতা গুণালয়
আবদুল কাদের সাহা নাম সুনিশ্চিত।
গুণজ্ঞাত শুদ্ধমতি আওল ফকির
ছুফী খান্দানেতে পীর আছিল সুধীর।...
অবোধকালেতে মোর পিতা স্বর্গে বাস.।
সেকারণে শাস্ত্র জ্ঞাতা না হৈলুম অতি।
কিঞ্চিত দর্শাইল পুঁথি মাতৃগুণবতী।
প্রভুভক্তা সতীত্ববতী জননী অনুপাম
শ্রীমতি আলিমন্নিচা জান তার নাম।
তিনভ্রাতা এক নাম আবদুল জব্বার—
আবদুল ছত্তার আর অতি জ্ঞানমান
পাপক্রোধ লোভহীন রূপে পঞ্চবাণ
বিংশ বৎসরেতে তান কাল উপস্থিত
স্বর্গপুরে যাই দেহ করিলা লুকিত।
ভ্রাতৃ অনুশোচে হৃদে নাহি পরিত্রাণ
জানিবে এ দুক্ষ মোর যেবা বুধমান।
মোহর কনিষ্ঠ আব্দুল গফুর অজ্ঞান।.
গুনীনের পদে আর এই সে আরতি
পতিভক্তি সতীত্ব রাখিতে একমতি।...
অনাথিনী এতিমের নাম শুন গুণী
শ্রীমতি রহিমন্নিচা দুষ্ট কলঙ্কিনী।
পদের অক্ষর ক্ষয় হৈলে কদাচন
দোরসিও তাকে গুণী হই তুষ্ট মন।
পিতাহীন সুতা জানি গৌরব করিবা
দুক্ষিণীর পদ এই শুধরিয়া দিবা।
মহতে ঢাকিয়া রাখে হীন অপরাধ
নিগুণীএ না বুঝিয়া বাড়ায় বিবাদ।
এই পুথি বিকি যদি করি কদাচিত
নিজ হস্তে দস্তখত দিমু যে নিশ্চিত।
ফেরেব রূপেতে কেহ মালিকি লিখিবা
তার মাতৃতিরি' পরে তেলাক জানিবা।

স্বামী আহমদ আলীর আগ্রহে রহিমুননিসা 'দোরদানা বিলাপ' নামে অপর একটি বিলাপ-কবিতা রচনা করেছিলেন। আদ্যে খণ্ডিত শত চরণের এ বিলাপে স্বামীর হাতে নিহত কন্যার জন্যে মা-বাপের ভাই-বোনের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

মোর কন্যা তোর হস্তে শহীদ হইল।
আপনা তিরী বলি না কৈলা বিচার
নিদোষীরে দোষী করি মর্ম বিদারিল।
তোমা অঙ্গ রক্ত ভাটি উজান ধরিল।
পয়গাম্বরী মুসিবতে আমারে পাড়িল।
পতিঙ্গাতে লহুর নহর বহি যাএ

বনান্তরে থাকি আলি পুষ্পমধু খায়
বৃক্ষমূলে থাকি ভেকে পরিচয় না পায়।
সুজনের সঙ্গে প্রেম মেঘ বৃষ্টি প্রায়
ভাঙ্গিলে সোহাগ পুনি অচিরে জোড়ায়।
কুজনের সঙ্গে প্রেম মাটিয়া কলসী
ভাঙ্গিলে না লয় জোড়া হয় বিদ্যানাশী।

এবিলাপে সুন্দর কথা অনেক রয়েছে-ঃ গোময়ের কীটে কি জানিবে প্রেমশুদ্ধি।

আঁখির পোতলি কন্যা প্রাণের দোসর।
কোন মেঘে আচ্ছাদিল পূর্ণ শশধর।
জহুরীএ জানে ভাল সুবর্ণের মূল
হীরা মুক্তা নাহি চেনে লোহারের কুল।

বেজোড়া করিলি কার জোড়ের কৈতর
মোর পুষ্প বৃন্দাবনে কেবা অগ্নি দিল
মোর পুষ্প কাঁচা ডাল কেবা রে ভাঙ্গিল।

ভণিতা ঃ

ছিরী আহমদ আলি জ্ঞানবন্ত ধীর
মানে মহামন্ত অতি দানে কর্ণ বীর।

স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লেখি এ ভারতী
রহিমন্নিচা নাম জান আদ্যে ছিরীমতি।[১]

মনে হয় ইসলামের উন্মেষ যুগের নারী এ দোরদানা। আমরা জানি, কবির স্বহস্তে লিখিত পুথি [অটোগ্রাফ] সুদুর্লভ। রহিমুননিসার স্বহস্তে লিখিত বলেও প্রাপ্তরচনার রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।

ঞ. তামাকুপুরাণ

রেওয়াজ ছিল না বলেই মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে খণ্ড কবিতা দুর্লভ। আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসাত্মক ছড়া-বচন চালু থাকলেও ওই ধরনের খণ্ড কবিতা সুদুর্লভ। তেমন এক বিরল রচনা আলোচ্য তামাকুপুরাণ, প্রণেতা শান্তিদাস। রচনাটি পরিহাসাত্মক, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-বাণও রয়েছে এতে। কিন্তু বাহ্যত একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণ রক্ষিত হয়েছে। এমনি আর দুটো রচনা হচ্ছে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত 'হুক্কা পুরাণ' ও 'তামাকুচরিত্র।' রচয়িতা যথাক্রমে সিতকর্মকার ও সীতারাম। অন্য একটি হচ্ছে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত-সংগৃহীত 'তামাকু মাহাত্ম্য', প্রণেতা রামপ্রসাদ।

বিদ্রূপ আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন তামাকুর জন্ম বৃত্তান্তে পৌরাণিক মর্যাদা ও মহিমা আরোপিত হয়, দেবগণের সমুদ্রমন্থনকালে রত্ন-আদি নানা বস্তুর সঙ্গে 'মহাবস্তু' তামাকুর বিচিও উত্থিত হল। স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু তা লুকিয়ে পৃথিবীর উপর ছিটিয়ে দিলেন। এমনি করে স্বর্গ-মর্ত্যের পরিসরে দেবানুগ্রহে মানবকল্যাণে তামাকু ও হুক্কার উদ্ভব। তাই পুরাণ নামটি সুপ্রযুক্ত ও সার্থক। আদিতে শব্দটি 'তাম্বাকু' ছিল, 'তামাকু'ই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে, একালে আমরা বলি তামাক। টোবাকো-ও ওকারন্ত।

এ পুরাণের প্রবক্তা মুনি শুক এবং শ্রোতা স্বয়ং রাজা পরীক্ষিৎ। অন্য পুরাণের মতো এ পুরাণেও

যেবা লেখে যেবা শুনে পঠে যেই জনে বিশেষ পবিত্র হএ ইতিন ভুবনে।
কবি শান্তিদাসের কামনা—'জন্মে জন্মে থাকে যেন তামাকুতে মতি।'
কেননা, ভারতে আসিয়া যেবা তামাকু না খাএ
প্রাণ গেলে (মরার পরে) সেই জন মহাদুঃখ পাএ।

---

১. *বিস্তৃত পরিচিতি ও পাঠ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মনীষামঞ্জুষায় [১ম খণ্ড] এবং মৎসম্পাদিত 'লায়লীমজনুর' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।*

আরো ভয়ের কথা, তামাক সেবন অভ্যাস না করে যে মরে, সে

'পশু হৈয়া জন্মে গিয়া শৃগালি উদর'/'হুক্কা হুক্কা' বলি ডাক ছাড়ে নিরন্তর।'

'মক হিরোইক' কবিতার মতো বলা চলে এটিও একটি মক রিলিজিয়াস কবিতা। এখানেই এর অনন্যতা।

ভাঙ-চণ্ডু চরস-গাঁজা-রস-ধেনো প্রভৃতি নানা নেশায় এ দেশের মানুষ আবহমান কাল থেকে অভ্যস্ত হলেও তা' ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু। এবং সেগুলো কখনো তেমন ঘৃণ্য বা নিন্দনীয় ছিল না। বরং দেবভোগ্য বলে অনুকরণীয় ছিল। এক রকম সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল। কিন্তু তামাক তেমন নেশাকর নয়, মনও তেমন মাতিয়ে তোলে না, সম্বিৎ হারাবার তো আশঙ্কাই থাকে না। মধ্যযুগেই এই নতুন ঔষধির এ দেশে আমদানি। সম্ভবত এও পতুর্গীজদের দান। শোনা যায় রাজা-বাদশাহর মধ্যে সম্রাট জাহাঁগীরই প্রথম তামাকসেবক। এতেই বোঝা যায়, তামাকে নেশা না থাকলেও আড়ম্বর ছিল, এ ছিল পুরোপুরিই বিলাস-ব্যসন প্রকাশের অন্যতম বাস্তব অবলম্বন। আভিজাত্যের, ধনের ও মানের বড়াই, পদাধিকারের দর্প ও দাপট এবং মজলিসে সামাজিক আড়ম্বর প্রকাশের প্রতীক রূপে সুদীর্ঘ সুন্দর জরি-জড়ানো নল ও কারুময় রৌপ্যখচিত সুগোল কলিকাযুক্ত দামী বৃহৎ ধাতব হুক্কায় ধূমপান বা সুগন্ধ তামাক সেবন একটি আনুষ্ঠানিক রীতির মর্যাদা পায়। ফলে অধিকারীভেদ স্বতোই স্বীকৃত হয়। তাই অন্যান্য নেশা-সেবনের ক্ষেত্রে আদব-কায়দার প্রশ্ন কখনো গুরুতর ছিল না বটে, কিন্তু তামাক সেবনের মতো নির্দোষ বিলাসের বেলায় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধি–নিষেধ ও নিয়ম-নীতি কঠোর ভাবে মেনে চলা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এতে গুরুজনের, মান্যজনেরই একচেটিয়া সামাজিক ও মজলিসি অধিকার।

সস্তা, সহজলভ্য, সুসেব্য ও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কাবিহীন হওয়ায় তামাক সেবন শিগগিরই গণ-অভ্যাসে পরিণতি পেল। বলতে গেলে এমন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নিরপেক্ষ গণসেব্য বস্তু বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই। গণ-ব্যবহারে তামাক ও হুক্কা দু-ই মূল্য ও মর্যাদা হারিয়ে সাধারণ ও সামান্য হয়ে ওঠে। তখন তালের গুড়-মাখা তামাক বাঁশ, মৃৎপাত্র ও নারিকেল খোল কিংবা কেবল কলিকা আশ্রিত হয়ে গণ-দাবি মেটাতে থাকে। তবু কিন্তু গুরুজনের মান্যজনের সামনে সেবনের নৈতিক বাধা অপসৃত হল না। আজকের বিড়ি-সিগার-সিগারেটের যুগেও সে-বাধা জগদ্দল হয়েই রয়েছে। আরো অনেক ব্যাপারের মতো তাৎপর্য হারিয়েও মধ্যযুগ এক্ষেত্রেও অনড় হয়ে অবিচল মহিমায় বিরাজ করছে। কাজেই সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তামাক সেবনের অধিকার-অনধিকার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও পদাধিকার ভেদের পরিমাপক। বয়স, সম্পর্ক, যোগ্যতা ও পদবীভেদে এ অধিকারভেদ সর্বস্তরের মানুষের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কথায় বলে 'মানলে পর্বতের চূড়া না মানলে ভাঙা নায়ের গুড়া', কিংবা 'মানেতো উচ্চ, না মানেতো তুচ্ছ।' আমরা মানি বলেই তামাকসেবনও নীতি-সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ, শিষ্টাচারের মাপকাঠি এবং স্থান-কাল-পাত্রের আপেক্ষিকতা-নির্ভর। ঘরে-সংসারে-সমাজে সর্বত্রই অশনে-বসনে আসনে এই অধিকারভেদ আজো গুরুত্ব পায়।

হুক্কার উদ্ভবেও রয়েছে দেবলীলা ও দৈব দান।

হুক্কা বানাইতে ব্রহ্মা দিল কমণ্ডুল
শিবে দিল লিঙ্গ আর ধুতুরার ফুল।

তাতেই হল খোল-নৈচা-কলকে। তারপর জাহ্নবী হলেন জল, কৃষ্ণ দিলেন বাঁশী, বাসুকী স্বয়ং হলেন নল। আর 'রহিল নরিচা যেন ব্রহ্ম সমসর।' রূপ-ও মূল্য ভেদে হুক্কার নাম হল আলবোলা, ফর্সি, গুড়গুড়ি, গড়গড়া, ডাবা প্রভৃতি।

হুক্কা টানে টানে বাদ্যের মতো যে ধ্বনি তোলে, তারও মহিমা-মাহাত্ম্য অশেষ। এক হুক্কার ধ্বনি হরিসংকীর্তনের, দুটোর ধ্বনি গঙ্গাস্নানের পুণ্য বিলায় ; এমনি করে হুক্কার সংখ্যাবৃদ্ধিতে কাশী-বারানসী-গয়া-প্রয়াগ দর্শনের পুণ্য মেলে। ছয়ে মেলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য। আটহুক্কার ধ্বনিতে স্বর্গ আসে হাতে, আর 'নব হুক্কা হৈলে বিষ্ণু' প্রত্যক্ষ হন।

উৎসবে-পার্বণে-ভোজে সব উপকরণ থাকলেও 'তামাকু রহিত হৈলে কার্য না জুয়াএ।' তামাকুর প্রধান গুণ 'বারেক তামাকু খাইলে শ্রম শান্তি হএ।' ক্ষুধা তৃষ্ণা-তাপের দুঃখও 'বারেক তামাকু খাইলে সকল পাসরে।' তামাকুর শ্রেষ্ঠ দান –সাম্যভাব। এতো বড়ো সাম্য সংস্থাপক আর কোন বস্তু নেই। তামাক-খোরের

শুচি অশুচি নাহি স্নান অস্নান
রাত্রি দিবা ভেদ নাহি, নাহি কুলজ্ঞান।...
জগন্নাথ দ্বারে নাহি জাতির বিচার
একজনে আনএ শতেক জনের আহার।
হুক্কার জানিঅ ভাই সেই অভিপ্রায়
এক হুক্কার জলেতে শতেক জনে খায়।

তামাক যে কেবল জাত-বর্ণ-ধর্মের ভেদ ঘুচায়, তা নয়, লজ্জা-সঙ্কোচ-শরম আর সংযমও ঘুচিয়ে দেয়ঃ

তামাকু খাইতে লজ্জা নাহি কদাচিত।
বাপে খাএ তামাকু পুত্রে বলে দেও
একটান খাই আমি পাছে তুমি নেও।
বাপের হুক্কা পুত্রে নেয় ভাইর হুক্কা ভাই
তামাকুর লজ্জা জান গুরু-শিষ্যে নাই।

এমন শরম-সংকোচ-সংযম-ভাঙা বলেই 'গোবিন্দ নাম ভুলানো' তামাকের উদ্ভবে 'এহি ভুবন পবিত্র হয়েছে, হয়েছে ধন্য আর তামাকু খাইয়া সুখী হইল সর্ব লোক।'

ক. কবি শান্তিদাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত শান্তিদাসের তামাকুপুরাণের লিপিকাল ১২৪১ সন তথা ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ। প্রাপ্তিস্থান—গ্রাম আড়াই হাজার, জিলা ঢাকা। মালিক বা সংগ্রাহক বসন্ত কুমার চক্রবর্তী। সুতরাং পুথি ঢাকার ওই অঞ্চলের হওয়ারই সম্ভাবনা। রচয়িতাও সম্ভবত ওই অঞ্চলের লোক। ভাষা ও ভঙ্গি দৃষ্টে মনে হয়, তামাকুপুরাণ আঠারো শতকের শেষে কিংবা উনিশ শতকের প্রথম পাদে রচিত। অতএব রচয়িতা শান্তিদাসেরও জীবৎকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ ও উনিশ শতকের প্রথম ছিল বলে অনুমান করা চলে।

খ. আফজল আলি

আঠারো শতকের চট্টগ্রামবাসী কবি আফজল আলি (আনুঃ ১৭৩৮-১৮১১ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর নসিয়তনামায় গাঁজা-তামাকুর ধুমপানের পাপ ও তামাকুসেবনের পরিণাম বর্ণনা করেছেন। এটি সমাজপতির ও শাস্ত্রবিদের পাঁতি-ফতোয়া-নীতি বা শিক্ষামূলক গম্ভীর রচনা।

মুসলমান হিন্দু আর যত জাতি আর
সকলে করএ ভক্ষণ না করে বিচার।
সংসারেত যে সকলে তামাকু পিয়এ
অন্তরে কালির বর্ণ হইয়া আছএ।
তামাকুর পায়রবি করিয়া পঞ্চজন
মুচি হস্তে কতল করিব নিরঞ্জন।
তামাকু যে ক্ষতি করে, যেবা মাখি দিছে,
যে জনে ভরিল হুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে।
আর যে সকল ভক্ষে—এই পঞ্চজন
হিসাবেতে 'ছেহা' বর্ণ হইব বদন।
কিবা ভাল কিবা মন্দ নাহি বিচারএ
এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ।
শ্বশুরে জামাতা বন্ধু এক নলে খাএ
সেই নলে মাগ খাএ জান সর্বথাএ।
জ্ঞানবন্ত মুসলমান যে সকল হএ
তবে কেন হেন চিজ ভক্ষণ করএ।
তামাকু যে সবে পিএ রুহু 'ছেহা' তার
সে-দোষে না পাইব দেখ রসুল আল্লার।
কোরান হাদিসে চাহ করিয়া বিচার।
আর স্বপ্ন দেখিলেন্ত গাঁজা যে পিয়ন
সে সবের সর্ব অঙ্গ ইব্লিস বাহন।
সে সবের সঙ্গতি যে মেলা করিবার
নিষেধ করিছে নবী হাদিস মাঝার।

গ. শেখ সাদী

আঠারো শতকের কবি শেখ সাদী তাঁর 'গদা-মালিকা' নামের তত্ত্বজিজ্ঞাসা গ্রন্থে তামাক সেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন ঃ

গদাএ কহে যেইক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকের কবিব আবেশ।
অন্য হতে জানিবে তামাকু বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে
হাঁটিয়া যাইতে লোক পিব পথে পথে।
পিতায় তামাকু পিতে পুত্র করে আশ
তামাকুথু করিবেক ভুবন বিনাশ।
তা ছাড়া
খাইতে না ভরে পেট মিছা ফাঁক ফুক।

'লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে।'—এটাই সম্ভবত কলিকালের মুখ্য লক্ষণ।

ঘ. দ্বিজ রামানন্দ

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 'পুথি পরিচয়'–এর ১ম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় 'গাঁজা ও তামাকুর' একটি গান সংকলিত হয়েছে। গানটির রচয়িতা দ্বিজ (ন্যাড়া) রামানন্দ। 'পল্লীকবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত রচনা কৌতুক রসের কবিতার ভালো ও পুরানো উদাহরণ বলিয়া রচনাটি সবিশেষ মুল্যবান।' পঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ৬৯। তামাকু ঃ

মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই। ধুয়া কুশ পট্যো টেন্যা ফেলা
উঠি অতি নিশি ভোরে হুঁকাটি লইয়া করে কোঁচর তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই।
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই। দ্বিজ রামানন্দে ভনে স্থান দিয়া শ্রীচরণে
কয়্যা জাব তনয়েরে মৈলে জখন শ্রাদ্ধ করে জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা জাই।

বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবনে অভাব-বঞ্চনা-পীড়নক্লিষ্ট মনে তামাক সেবনের মুহূর্তগুলো শান্তি-সুখের প্রলেপ বুলায়। আর স্বস্থ ও সুস্থ ধনী-মানীকে ধূমপান দেয় স্নিগ্ধ প্রশান্তি। গাঁজা ঃ

মনের গৌরবেতে চিন্‌লি না রে অরে গাঁজাখোর। ধুয়া।
গাঁজার পাতা জলে ভাসে দেখি ভাঙ্গি হাঁসে
আর এক ভাঙ্গি ওর্যে জাহাদ এইল মোর।
ভাঙ্গা ঘরে সুএ্যা থাকে গগনেতে তারা দেখে
আর এক ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোর।
রামানন্দ নাড়ায় বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে চক্ষে হয় ঘোর।

যদিও 'গাঁজা কারণ বারি'র মতোই পবিত্র ও সাধন-সহায়। কেননা গাঁজা মহাদেব-সেব্য। তামাকের অর্বাচীন উদ্ভব তাকে দেবভোগ্য হবার সৌভাগ্য ও সম্মান থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও একখানা 'হুক্কাপুরাণ' সংগ্রহ করেছিলেন। এই পুরাণ রচয়িতা সিত কর্মকার। ১-৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। লিপিকাল "ইতি সন ১২২১ মঘি, তারিখ ২৯ ভাদ্র।" অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর।

শান্তি দাসের ও সিত কর্মকারের রচনায় সাদৃশ্য অনেক। এতে বোঝা যায় গাঁজা-তামাকের দেশ-প্রচলিত নিন্দা-বিদ্রূপকেই তাঁরা ভাষা দিয়েছেন, এ তাঁদের চিন্তাপ্রসূত নয়। তাই স্বকীয়তার দাবিদার হতে পারেন না তাঁরা। এ লৌকিক রসবোধের গৌরব কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়—লোকসমাজের। তবে শান্তিদাসের চেয়ে সিত কর্মকারের ভাষা ও ভঙ্গির উৎকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য। তা ছাড়া রচনা কলেবরেও সামান্য বড়ো। সিত কর্মকারের রচনাও উনিশ শতকের গোড়ার দিককার বলেই মনে হয়।

'সমুদ্র মথনে যবে গেল দেবগণ' তখন 'পঞ্চম মথনে জন্মে তামাকুর বিচি।' এখানে কেবল গদাধর নন, তামাকুর বিচি 'দেবগণে হরিলেক যার যেই রুচি।' যদিও অবশ্য

"নেশাখোরে নেশা খাইয়া হএ হতজ্ঞান এবং বাপে তামাকু খাএ পুত্রে বোলে দেঅ আপনার স্ত্রীকে দেখে মাএর সামান। আর জামাতা তামাকু খাএ চাহেন শ্বশুরে।

মাকে গালি পাড়ে আর বাপকে বলে শালা।।"

সিত কর্মকারও হুক্কা-তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তা' শান্তিদাসের দেয়া বিবরণের মতোই। উপসংহারে কবি বলেন ঃ

ভারতে জন্মিয়া যেবা তামাকু না খাএ, পরলোকে জন্ম হএ শৃগাল উদরে
অন্তকালে সেই পাপী স্বর্গেত না যাএ। 'হুক্কা হুক্কা বলি ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে।

তবে তামাকু সেবন না করেও স্বর্গের প্রত্যাশা করা যায়, যদি 'তামাকুপুরাণ এই শুনে কোন জনে' এবং 'এক মনে শুনিলে সে স্বর্গপুরে যাএ।'

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সীতারাম রচিত 'তামাকু চরিত' নামের পুথিরও আবিষ্কর্তা [প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ২য় সংখ্যা, পৃ ঃ ৮..]

আর অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এক কবি রামপ্রসাদ রচিত 'তামাকু মাহাত্ম্য' -এর পরিচিতি দিয়েছেন, এর চরণ সংখ্যা ১২০ এবং লিপিকাল ১২০৮ সাল-১৮০১ খ্রীস্টাব্দ। অতএব রচনাকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ। এঁর রচনায় 'তামাকুর বীজ শিব জটা হৈতে' স্খলিত। আর এক হুক্কা যথায় সেহি সালগ্রাম হয়ে দুই হুক্কা লক্ষ্মীনারায়ণ
তিন হুক্কা যেবা দেখে সেহি যায়ে স্বর্গলোকে কি কহিব তার পুণ্যফল চারি হুক্কা যথা বসি সেহি গঙ্গা বারানসী সেহি বৃন্দাবন নীলাচল।

তামাকুকে অবজ্ঞা করে সীতা, হরিশ্চন্দ্র রাজা, বলিরাজা, রাবণ, দুর্যোধন প্রভৃতি হতসর্বস্ব।

ট. মুহম্মদ দানিশ

'গুলেবকাউলি' রচয়িতা উনিশ শতকের কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবি 'প্রণামে' দু'জন দানিশ-এর উল্লেখ করেছেন। উভয়েই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। তবে দু'জনের নামে সামান্য পার্থক্য আছে। একজন মুহম্মদ দানিশ ঃ

শহর উত্তরে 'সুলুব বহর' মধ্যান। গুণবন্ত মহাধীর প্রায় আলাওল॥...
মহাগুণবন্ত এক আছে সেই স্থান ।। অন্যে অন্যে প্রীতিবাসি আমি তথা যাই।
মোহাম্মদ দানিশ নামে বুদ্ধি পরবল। নানা পরস্তাব পড়ি বঞ্চি এক ঠাঁই ।।

অপরজন কাজী দানিশ ঃ

অখনের পণ্ডিত আছএ যথাতথা। মুনসী নাম মোহাম্মদ মুকিমে বন্দিয়া।
সেসব প্রণাম করি কহিলাম গাথা।। শ্রীযুত দানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া।।

কাযী দানিশ পদাবলী ও রাগমালা রচনা করেন। মুহম্মদ দানিশ রচনা করেন 'জ্ঞানবসন্ত-বাণী'। মুকিমের উক্তিতে প্রকাশ দানিশ ধার্মিক ও আলাউলের সমকক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। মুকিমের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং মুকিম সে-সূত্রে মুহম্মদ দানিশের বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে কাব্যালোচনা করতেন। 'সুলুবু-বহর' চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠস্থ গ্রাম। এখানেই মুহম্মদ দানিশের নিবাস ছিল। দানিশের পিতার নাম আরব (আলী)।

জ্ঞানবৃদ্ধি পুস্তকের বাণী সুধাময়। রচএ দানিশ হীন আরব তনয়।।

দানিশের পীরে নাম সয়্যিদ সিরাজউদ্দীন ঃ

পীর সৈদ সিরাজদ্দিন যুগপদে হই লীন রচএ দানিশ সুপয়ার। দানিশের উক্তি থেকে জানা যায়, তিনি আরবি বা ফারসি কোন কেতাব অবলম্বন করে তাঁর কাব্যখানি রচনা করেছিলেন ঃ

এবে সে সমাপ্ত হৈল শশি শূন্য বাব। কহিব 'রুদ্রক' বাব হেরিয়া কিতাব।।

এ' কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করে ছিলেন। এই একটি মাত্র পাণ্ডুলিপিও খণ্ডিত। ২৫-১৫৭ পত্র বিদ্যমান থাকলেও মধ্যে মধ্যে অনেকগুলো পত্র নেই। পুথির কোন নাম পাওয়া যায়নি। ভণিতার অনুসরণে সাহিত্যবিশারদ কাব্যটির নাম দিয়েছেন 'জ্ঞানবসন্ত-বাণী'। ভণিতা এরূপ ঃ

৩. জ্ঞান-বসন্ত-বাণী কস্তুরীর বাস।
রচএ দানিশ শিশু পঞ্চালির ভাষ।

২. প্রেম পরস্তাব হীন দানিশে ভণএ।

৩. জ্ঞান-বৃদ্ধি পুস্তকের বাণী সুধাসম।
রচএ দানিশ শিশু অপার উত্তম।।

অতএব, পুস্তকের নাম 'জ্ঞান-বৃদ্ধি-বাণী' কিংবা 'জ্ঞান-বসন্ত-বাণী' হওয়াই সম্ভব।

কাব্যখানি বিভিন্ন 'বাবে' তথা অধ্যায়ে বিভক্ত। ২য়. থেকে ১৩শ 'বাব' অবধি আছে। এটি উপদেশাত্মক পঞ্চতন্ত্র শ্রেণীর কাব্য।

এক রাজপুত্র অজ্ঞাতনামা রাজকুমারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলে তার চিত্ত উপশমের জন্যে তার হিতৈষীরা নারীজাতির চারিত্রিক দোষ ও নারীপ্রেমের বিকার ও অসারতা দেখবার জন্যে একটার পর একটা গল্প বলেছে। গল্পগুলো সুন্দর ও নীতি–গর্ভ। পড়তে পড়তে 'আলেফলায়লা', 'পঞ্চতন্ত্র', 'পুরুষপরীক্ষা 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি', বত্রিশসিংহাসন' এবং শেখ সা'দীর 'গুলিস্তাঁ-বুঁস্তার কথা মনে পড়ে।

দানিশ পণ্ডিত-কবি। কাব্যাদর্শে তিনি ছিলেন মুহম্মদ খান ও আলাউলের অনুসারী। তাই তাঁর রচনায় এঁদের কাব্যকলার অনুরণন শুনতে পাই। কবি 'লগ্নিকা ছন্দে' নায়িকার রূপ-ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

বিমল ললাট বাল্য শশী
হেরি বলিহার দেবীশচী।
নিষ্কলঙ্ক মুখ পূর্ণিমা চান্দ
ভাবক বান্ধিতে জোলফ ফান্দ।
বক্রতা যুগল ভ্রূ বিষম
রতিপতি চাপ না হয় সম।
পূর্ণ দেবাসন সুলোচনা

লাজে বনে গেল শশি-বাহনা।...
দন্ত মুক্তাপাঁতি তড়িত হাস
সুধামুখী সুধা বলিয়ে ভাষ।
কমল অধর কুসুম দল
তাম্বুল বিহীনে 'ধিক ধবল।...
উরু সুগঠ কদলিকা ফুল
চম্পক কলিকা বিংশ অঙ্গুল।

তাঁর এ-ধরনের বর্ণনায় আলাউলের প্রভাব সুস্পষ্ট। আলাউলের 'সিকান্দরনামা'র ভণিতা-রীতির অনুকরণ দেখা যায় মুহম্মদ দানিশের ভণিতায় ঃ

আইস গুরুমণি দেঅ সুরা
'জীন' বধ বাণী রচি পুরা।

হীনাত্তি দানিশে সিঞ্চে অমৃত
রসিকে পান করে জানি হিত।

'সিরাজ-সবিল' রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরও ইত্যাকার অনুভূতির উদ্দীপনসূচক ভণিতা দিয়েছেন।

দানিশের এরূপ কবিত্বের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তিনি আর কোন কাব্য রচনা করেছিলেন কি-না, জানা যায়নি। মুকিমের উল্লেখ থেকে নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে দানিশ উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি। উনিশ শতকের কবি হলেও তাঁর ভাষায় পুরোনো কালের রূপ বিধৃত হয়েছে, যেমন তাক, নারীক, পতিক এবং বসিছোঁ, বহিছোঁ, গাহন্তি প্রভৃতি।

কবি মুহম্মদ দানিশের 'জ্ঞান বসন্ত-বাণী'তে যে-সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো এ যুগেও সুখপাঠ্য। কবি যে তাঁর রচনাকে 'জ্ঞানবৃদ্ধি বাণীর পুস্তক' বলে উল্লেখ করেছেন, তাতেও অত্যুক্তি নেই।

ঠ. নিকাহমঙ্গল

আদিম কৌম সমাজে মাতৃ বা ক্ষেত্র প্রাধান্যের অবসানে গড়ে ওঠে পিতৃ বা বীজ প্রধান সমাজ। ক্ষেত্র ও বীজ অবশ্যই কৃষিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত। বিবাহরীতি প্রবর্তনের ফলেই যে ম্যাট্রিয়ার্ক্যাল তথা মাতৃ-প্রধান সমাজের বিলুপ্তি ঘটেছে—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। কেননা, বিবাহ-রীতি এক বিশেষ সমাজ-চিন্তার প্রসূন। এই চিন্তার সহজে উন্মেষ হয়নি। এও এক বিশেষ সমস্যার মুখে মানবিক বোধ-বুদ্ধির ও রুচি-সংস্কৃতির অবদান।

আদিম মানুষ যতদিন প্রাণীবিশেষই ছিল, ততদিন কাম ছিল নির্ভেজাল দৈহিক। আর মানবিক বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে রঙ ধরে—তার মধ্য জাগে রূপতৃষ্ণা। এর পর কেবল বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হলেই তার চলে না, সঙ্গে আকর্ষণীয় রূপ এবং যৌবনও চাই। শক্তিমান পুরুষ রূপসী ও যৌবনবতী ধর্ষণে হল প্রয়াসী। জরু নিয়ে পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের এভাবেই হয় শুরু। তার অনেক পরে আসে জমি ও জেবর নিয়ে মারামারি-হানাহানির পালা—তা অবশ্য জীবিকা-বিরল জনবহুল সভ্য সমাজের ব্যাপার।

এই প্রাণধ্বংসী দ্বন্দ-কোন্দল-সংঘাত থেকে পারস্পরিক নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে মানুষ যে বিবাহ-রীতি চালু করেছে—নিঃসংশয়ে তেমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। তখনো প্রবর্তিত ধর্মের যুগ আসেনি। কাজেই এ হচ্ছে এক প্রকার সামাজিক চুক্তি যার নাম দেওয়া যায় Policy of non-interference, কারো সঙ্গে কেউ জুটে গেলে সেই যুগলের জীবন নির্বিঘ্ন রাখা, তাদের উপর থেকে অন্যদের আকর্ষণ ও দাবি পরিহার করা এবং তাদের পাস্পরিক সম্ভোগে সামাজিক স্বীকৃতি দান প্রভৃতি সেই নিরাপত্তানীতির অন্তর্নিহিত শর্ত। কোন্দল-হনন এড়ানোর এই আশ্চর্য বুদ্ধি থেকেই সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ ও কল্যাণচিন্তা প্রভৃতির জন্ম।

সর্বপ্রাণবাদী যাদুবিশ্বাসী মানুষ সেদিনও নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তির দোহাই মেনেছে, শপথ নিয়েছে কোন শক্তির নাম উচ্চারণ করে এবং কোন ট্যাবুও হয়েছে সর্বজনমান্য।

যেহেতু মানুষের কোন বিশ্বাস-সংস্কারের মৃত্যু নেই এবং যুক্তিবুদ্ধি কোন ভীরুতাকেই অতিক্রম করতে পারে না, সেহেতু পরবর্তীকালের প্রবর্তিত ধর্মের আশ্রয়ে, সৌন্দর্যপ্রিয় মনের প্রশ্রয়ে, এবং বিকশিত সমাজের প্রচ্ছায় সেই আদিম মিলনলগ্নের নানা আকৃতি আজো রূপান্তরে ও সূক্ষ্মতায় পরিবর্তিত তাৎপর্যে ও নতুন লাবণ্যে আমাদের সমাজে দৃশ্যমান হয়ে সংস্থিত।

সভ্যতর সমাজে স্বয়ম্বর প্রথা সেই আদিম নীতির পরিস্রুত রূপায়ণ মাত্র। যতই দিন গেছে স্থূল সম্ভোগ-বাঞ্ছা রুচির ও লজ্জার প্রলেপেও পেলবতায় মধুর ও উন্নততর জীবনবোধের ও সমাজসংস্থার ভিত হিসেবে সূক্ষ্ম ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে আত্মীয় সমাজ গোত্রীয়চেতনা ও কৌমজীবন। এই রক্তের বন্ধনে পবিত্রতা ও আনুগত্য আরোপিত হয়ে তা ঐহিকপারত্রিক জীবনের অন্যতম নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে দাম্পত্য সুখ, বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য, ঘরোয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারিবারিক বন্ধন, সন্তান উৎপাদন, ধর্ম সাধনা, সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার প্রভৃতি নানা নীতি ও কৃতি সম্পৃক্ত হয়ে বিবাহপ্রথা আজকের জীবনযাত্রীর একান্ত অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

জমি ও জরু চিরকালই বীরভোগ্য। বাহুবল, আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও ভোগবাঞ্ছা যার আছে, সে-ই বীর। নারীরাও তেমন বীরেই হয় আকৃষ্ট। এককালে বীরেরা নারী হরণ করত, কায়িক শক্তি প্রয়োগেই প্রতিষ্ঠা করত নিজের অধিকার। তাই বিয়েতে দোর-আগলে বরকে বাধা দেয়ার রেওয়াজে সেই কৃতি ও স্মৃতি আজো আচারিক মর্যাদায় রক্ষিত।

উৎসব-পার্বণ কালে মেলায় জীবন-সাথী বেছে নেয়ার রেওয়াজও সুপ্রাচীন। সাধারণের স্বয়ম্বরসভা ওই মেলাই। জলক্রীড়া, রাখীবন্ধন, মাল্যদান, পাণিগ্রহণ, হোলি প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হত, তেমনি অবিচ্ছেদ্যতার শপথ নেয়া হত-চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, ফুল, পশু, পাখি প্রভৃতি সাক্ষী রেখে। আবার রজ্জু কর্তন করে, মৃৎ-পাত্র ভেঙে কিংবা গাট-ছড়া বেঁধে এই বন্ধনের অমোঘতার ও স্থায়িত্বের প্রতীকী অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করা হত। তা ছাড়া দীর্ঘ আয়ু, স্থায়ী প্রীতি,

প্রতুল খাদ্য, অমিত প্রজনন, অম্লান যৌবন, অবারিত বৃদ্ধি, বাঞ্ছাপূর্তি প্রভৃতির প্রতীক হয়েছে দূর্বা, ধান, মাছ, আমপাতা, কলাগাছ, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি। শুভ কামনায়,নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং আনন্দের আয়োজনে মানুষ প্রতীকের ও অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক অনেক বাড়িয়েছে।

বিবাহোৎসবে এ আগ্রহের মূল কারণ হয়তো মনস্তাত্বিক। শৃঙ্গার রসে বঞ্চিত ও কৃতার্থ—সবাই সমভাবে উৎসাহী। এ ক্ষেত্রে তৃপ্তি-অতৃপ্তি দু-ই সমভাবে বেদনা-মধুর এবং চির নতুন ও সার্বক্ষণিক। তাই বিয়ে মাত্রই কেবল বর-কনের পক্ষে নয়, পরিচিত পরিজন সবার পক্ষেই আনন্দের। সেজন্য সম্পদগত সামর্থ্যানুসারে বিবাহোপলক্ষে আনন্দের আয়োজন বিবাহপ্রথারই সমকালীন। তারই ফলে বিবাহোৎসব আচারের ও অনুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যে, বিভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যে সামাজিক মহোৎসবের রূপ পেয়েছে। নাচ-গান-পান-ভোজন ছাড়াও এর আচারিক ও আনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতি ধর্মের ও বিশ্বাসের অন্তর্ভূত হয়ে অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে উন্নীত হয়েছে। তাই বিবাহের পূর্বে দীর্ঘ দিন ধরে এ উৎসব চলত এবং আজো চলে। আজ কাল অবশ্য নানা কারণে বিবাহোৎসবে উৎসব হয়ে গেছে ঋজু ও স্বল্পস্থায়ী।

আলোচ্য 'পদবন্ধ'গুলোতে দু'শ বছর আগেকার বিবাহোৎসবের একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। মুসলিম ঘরেই ছিল তা জনপ্রিয়। 'শাহ-নজর' কালে অর্থাৎ বর কনের মিলন লগ্নে এ সব ক্রীড়ার মাধ্যমে অপরিচয়ের শরম ও সংকোচ পরিহার করা সহজ হত। সখা-সখী ও ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে হাস্য পরিহাসের মাধ্যমে বাসরের মধু মিলনের প্রস্তুতি পর্ব এভাবে হত অতিবাহিত।

বর কনের শুভ সাক্ষাতের জন্যে তৈরি হত সুসজ্জিত মঞ্চ। উপরে থাকত চাঁদোয়া। এই মঞ্চগৃহের নাম 'মারোয়া'। আর এই শুভ সাক্ষাৎ বা শাহ নজরের নাম 'জোলুয়া'। এ সময় বর-কনেকে অভিনন্দিত করে যে-গান সমবেত কণ্ঠে গীত হত, তার নাম জোলুয়াগীতি। সখা সখীর উপস্থিতিতে বর-কনে তখন পুষ্প স্তবক নিক্ষেপ করে পরস্পরের প্রতি। গেড়ুয়া [গেণ্ডুয়া] মানে স্তবক। [তুল ঃ ফুলের গেড়ুয়া সঘনে লুফএ–বৈষ্ণব পদ] পুষ্প লোফালুফিতেও অবশ্য হারজিৎ ছিল, এ অনেকটা এযুগের 'ভলিবল' খেলার মতো। এর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের রাস ও হোলির প্রভাবও ছিল। তারপর বর-কনে উভয়ে খেলত পাশা। তাতেও হত বরের যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ। তা ছাড়া বর ঠকানো ধাঁধা হেঁয়ালির এবং বরকে জব্দ করার নানা ফন্দি ফিকিরের ব্যবস্থাও থাকত।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর এক প্রবন্ধে আফসোস করে বলেছেন, 'পূর্বকালে মুসলমানের বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে পাশা খেলা ও গেরোয়া খেলা অনুষ্ঠিত হইত। ..... এইসব অনুষ্ঠান বড় আমোদজনক, আমার ছোটকালে পাশা খেলা দেখিয়াছি—মনে পড়ে, কিন্তু গেরুয়া খেলা দেখি নাই...সেকালে এক একটা বিবাহে দীর্ঘদিন ধরিয়া কত রকমের কত আনন্দ উৎসব হইত। অধুনা তাহা কল্পনার বস্তু হইয়াছে।......এখন এ দুইটি খেলার একটারও প্রচলন নাই। দৈত্যের (ইংরেজের) আগমনে অধুনা সকল রকম আনন্দ উৎসব দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। কি সুখের দিন দৈত্যেরা আমাদের নষ্ট করিয়াছে। এ জীবনে টাকার ছয় আড়ি [৯৬ সের] ধান্য ও তিন আড়ি (৪৮ সের) চাউল দেখিয়াছি আর আজ দেখিতেছি টাকায় পাঁচ সের ধান্য [মণ আট টাকা...... ও সওয়া সের চাউল।" [কাফেলা' কাজী নজমুল হক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩৫৮ সনে প্রকাশিত 'গেরোয়া খেলা' প্রবন্ধ]

সংস্কার প্রত্যয়ে উন্নীত হলে তা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও বাসরের পূর্ব ক্ষণে কলেমা তমজিদ, সুরা ফাতেহা,কদর ও এখলাস এবং আস্তগাফার পড়তে হবে এবং এই.....

"পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানাতে যাএ   পুত্র কন্যা যথ জন্মে তথ পাপ হএ।

মুসলিম দাম্পত্যের আদর্শ হচ্ছেন—আলি ও ফাতেমা। তাই দম্পতিকে হিতাকাঙ্ক্ষীরা আশীর্বাদ করেঃ

"আলি-ফাতেমার যেহেন আছিল পিরীতি,   তেন মত রহি যাউক দোহান আকৃতি।"

মধ্যে ও শেষে দুটো ভণিতায় আইনুদ্দীনের নাম মেলে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে কারো নাম নেই। অবশ্য আইনুদ্দীনকেও পদবন্ধের রচয়িতা বলার কোন সার্থকতা নেই। আসলে লোক প্রচলিত প্রাচীন পদবন্ধ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। এক সৈয়দ আইনউদ্দীন পদাবলী রচনা করেছেন। সম্ভবত এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন।

জোলুয়া গাহন ঃ

এবে কহি শুন সবে রসিক সুজন
দামাদ কন্যার প্রতি জুলুয়া গাহন।
গেরোয়া খেলহ শাহা আনন্দিত হৈয়া
'শোকরানা' কহ শাহা এই কন্যা পাইয়া।
প্রথমে কনক পদ্মে গেরোয়া খেলাও
এ রস কৌতুকে শাহা গেরোয়া ফিরাও।
দ্বিতীএ গেরোয়া খেল রঙ্গিন বান্ধুলি
যুবতী ফিরাও পুনি নিজ কান্ত বুলি।
তৃতীএ গেরোয়া খেল মারুয়া গোলাল
যুবতী ফিরাএ পুনি যেন লাগে ভাল।
চতুর্থ গেরোয়া খেল সতী কনকের জুতি
ফিরাইয়া খেলা সতী পুরাউক আরতি।
পঞ্চমে গেরোয়া খেল চম্পা নাগরাজ—
ষষ্ঠ গেরোয়া খেল মালতী নবযুথি
সপ্তমে গেরোয়া খেল পুষ্প বিরাজিত
অষ্টমে গেরোয়া খেল মন কুতুহলে
মণিমুক্তা রত্নহার দেঅ কন্যার গলে।
এ শ্রী অঙ্গুরী যদি কন্যারে কর দান
লোকে যেন ধন্য ধন্য করুক বাখান।
গেরোয়াল দূরে করি পতিপত্নী মিলিয়া
'সরবত' 'তাম্বুল' খাও পাটেত বসিয়া।

পাশা ঃ

তক্তেতে বসিয়া শাহা খেল পাশা শাইর
কেহ হারাএ কেহ পাত্র সুবর্ণ কটোর।
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা দেখ পরতেক।
দ্বিতীএ পাশার ডাল পড়িয়া গেল ধুয়া
দামাদ কণ্যাএ খেলে পাশা পিঞ্জরের শুয়া।
তৃতীএ পাশার ডাল শাহা পড়িয়া গেল তিন
চতুর্থে পাশার ডাল পড়িয়া গেল চারি
পঞ্চমে পাশার ডাল পড়ি গেল পাঁচ
ষষ্ঠমে পাশার ডাল পড়ি গেল ছয়
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা যেন লাগে খোশ
দামাদে গেরুয়া মারে সর্বলোকে দেখে
প্রথমে গেরুয়া বুলি হিসাবেতে লেখে।
ফুলের যে মাঝে আছে ফুলের পঞ্চ ভাই
কন্যাএ হাঁরিলে দিব ততেক বেভার
প্রথমে পাশার ডাল শাহা পড়িয়া গেল এক
গেড়ুয়া খেলেরে শাহা চান্দোয়া জামাই।
তাহান পুষ্পের গেরোয়া পাইয়া তুলি লইল
ফিরিইয়া দেয় কন্যা দামাদের হাতে।
বেল ফল কদম্ব আর চম্পা নাগেশ্বর
দামাদে গেরুয়া খেলে দেখিতে সুন্দর।
চারি গাছ রামকলা আমের হরতি
ফিরাইয়া গেরুয়া খেলে পুরাউক আরতি।
শাহা দামাদ 'দামাদ বুলিরে তোহ্মারে
গেরুয়া ভুষণ শাহা দেউরে কন্যারে।
তোমার শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যাএ পাএ
মা-বাপ ছাড়িয়া কন্যা শাহার সঙ্গে যাএ।[১]

ঙ. একটি প্রখ্যাত বৈষ্ণব পদরহস্য

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত একটি তথাকথিত বৈষ্ণবপদের প্রসঙ্গবিচ্যুত শেষাংশ একটি পরমতত্ত্বের আধাররূপে অতিমহৎ তাৎপর্যে শিক্ষিত এবং মরমী বাঙালীর মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। আবেগতাড়িত তত্ত্বপ্রবণ বাঙালী লিখিয়েরাও সুযোগ সুবিধে মতো তা উদ্ধৃত করেন। বহুশ্রুত পদাংশটি এই "শুনহ মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই।" পূর্ণ পদটির সন্ধান খুব কম বিদ্বানই রাখেন, এবং তাঁরাও বাঙালীর মধুর ও মহৎ মোহ ভাঙাবার মতো নিষ্ঠুর হতে চান না।

১. *বিস্তৃত আলোচনা ও পাঠ মৎ-সম্পাদিত 'সওয়াল সাহিত্য' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।*

'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত হলেই 'বৈষ্ণবপদ' হয় না। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদমাত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনে-ভজনে-কীর্তনে ব্যবহারযোগ্য নয়।

আমাদের আলোচ্য দুর্লভ পুরো পদটি এরূপ ঃ

স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে কার্যসিদ্ধি কেমনে সাধকে কয়।।
কেবা অনুগত কাহার সহিত জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত মঞ্জরী সহিত ভাবিয়া দেখহ মনে।।
দুই চারি করি আটটা আঁখর[১] তিনের[২] জনম তায়।
এগার আঁখরে[৩] মুলবস্তু[৪] জানিলে একটি আঁখর[৫] হয়।।
[১.অষ্টসখী,২. পিরীতি,৩. দশ ইন্দ্রিয় ও মন,৪.সেবা. ৫. কৃ=কৃষ্ণ]
চণ্ডীদাস কহে শুন মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

পদটি আদি-অন্তে বিন্যাসগত অসঙ্গতি লক্ষণীয়। ৬।৬।৮ অক্ষরের পদবিন্যাস শেষ তিন চরণে রক্ষিত হয়নি। ছয় অক্ষরের 'চণ্ডীদাস কহে' এর পাশে ছয় অক্ষরের অন্য একটি পদ থাকার কথা। সেটি বাদ পড়েছে। ফলে আট অক্ষরের পরবর্তী চরণকে 'শুনহ মানুষ ভাই' পূর্ব চরণের শেষাংশ রূপে বসানো হয়েছে। ফলে কবিতাটির ছন্দোগত সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি শেষ তিনটি চরণে। তা ছাড়া বক্তব্যগত আকস্মিকতা এবং অসামঞ্জস্যও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'এগার অক্ষরে। মূলবস্তু জানিলে। একটি আখর হয়।' অর্থাৎ দেহস্থ চৈতন্যদ্বার (ইন্দ্রিয়) ও চৈতন্যের (মন) উৎস হচ্ছে কৃ তথা কৃষ্ণ। এরপরে আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনুষ্যতত্ত্ব উচ্চারিত হয়েছে। ছয় অক্ষরের বিলুপ্ত চরণাংশটি থাকলে হয়তো অর্থগত ও ছন্দোগত এ ত্রুটি থাকতো না। বিলুপ্ত পদাংশটি অনুমানে পূরণ করলে এরূপ দাঁড়াবেঃ

চণ্ডীদাস কহে (দেহে কৃষ্ণ রহে)
শুনহ মানুষ ভাই।
তাই সবার উপরে মানুষই সত্য
তাহার উপরে নাই।।

অথবা শেষের তিনচরণ প্রক্ষিপ্ত!

দেহাত্মতত্ত্বের এ পদটি আমাদের ধারণায় এবং বিশেষজ্ঞদের[১] মতে কোন সহজিয়া কবির রচিত।[২]

ঢ. সঙ্গীত শাস্ত্র

ইসলাম-পূর্বযুগে অন্য মানুষের মতো আরবেরাও ছিল সঙ্গীতপ্রিয়। আরবি ভাষায় গিনা, মুসিকী এবং সামা এই—তিনটে শব্দ সঙ্গীত বাচক। আরবে পেশাদার গায়িকারা অভিহিত হত কইনাৎ কিংবা কিয়ান নামে। দেশী গায়িকা ছাড়াও আবিসিনিয়া থেকেও আসত অনেক গাইয়ে মেয়ে। ইসলাম-পূর্বযুগের সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্যে আমরা মিযহার, মি যাফা, কুসাবা, মিযমার এবং

---

১. *আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী আমাকে ১.২.৮১ তারিখে লিখিত তাঁর এক পত্রে জানিয়েছেন, "খগেন্দ্রনাথ [মিত্র] হরেকৃষ্ণ [মুখোপাধ্যায়] ও বিমানবিহারীর [মজুমদার] হালের সংকরণগুলিতে পদটি এঁরা ধরেন নি। এঁরা বিশেষজ্ঞ, প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার পদটি নিয়ে আলাপ হয়েছে। পদটি প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের বলে এঁরা বিশ্বাস করেন নি। ....তবে বর্তমান পদটি সম্পর্কে আমার নিজস্ব সংশয়ের কারণ ঘটেছে।...... বর্তমান পদটিতে একালের মানবিকতাগন্ধী নাস্তিক্যের আভাস"।*

২. *বিস্তৃত আলোচনা ১৯৮১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার জুন সংখ্যায় মৎ-লিখিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।*

ডাক,সুর, নাকাড়া, তবলা (অতবল) সঞ্জ, জলাজিল প্রভৃতির নাম পাই। মক্কার উকায়-এ যে বার্ষিক মেলা হত, তাতে গোটা আরবের গোত্রগুলো জড়ো হত নিজেদের শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে। মুয়াল্লাকাগুলো এখানেই হত গীত বা আবৃত্ত। তখনকার আরবে যাদুকর গণকরাও তাদের পেশা চালাত গানের মাধ্যমেই। হজ উদযাপনের সময়েও গান চলত, তার রেশ রয়েছে তাহলিল ও তালরিয়ায়। 'আসবিক সবির কয়মা নুম্বির' এ আয়াত এখানো সুর করেই পড়া হয় মীনার ইফাদা করবার সময়। আযানও ইসলাম পূর্বযুগের প্রথার অনুসরণ। নারীর জন্য পর্দা প্রথা চালু না থাকায় রসুলের আমলেও নারীরা উৎসবে পার্বণে যুদ্ধে গানে বাজনায় অংশ গ্রহণ করত। ওহুদের যুদ্ধেও নাকি রণগীতি গেয়েছিল নারীরাই।

দেবতা ও উপদেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্যেও গায়িকার গানই কার্যকর বলে মনে করা হত। এ জন্যে তাদের অপর নাম ছিল দজিনা বা মদজিনা। তাই ইসলাম পূর্বযুগের আরবের নারীর প্রভাব সম্বন্ধে আর, এ. নিকল্‌সন বলেছেন (Wise Women inspired the poets to Sing and Warriors to Fight' কাফেলায় কিংবা সরাইখানাতেও গায়িকা পোষা হত। আবুল ফারাজ ইসফাহনীর কিতাবুল আগানি, ইবন আবদুর বিবহির (মৃত্যুঃ ৯৪০ খ্রী) ইকদুল ফরিদ, ভৌগোলিক আল মাসুদীর 'কিতাবুৎ আতরিহ ওয়াল ইশরাফ' প্রভৃতি পুরোনো গ্রন্থে এবং কোরআনে হাদিসে নানা প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত গায়কের নাম আমরা জানতে পাই ঃ নাদির বিন হারিস, মালিক বিন ধোবায়ের, হরায়রা খুলায়দা, বিলাল হাবসী, শিরিন, সারা, করায়না, কুরিল্যা, আমর হামজা প্রভৃতি।

আমরা ইসলাম পূর্বযুগের আরবে উৎসবে পার্বণে হজে অনাবৃষ্টিতে অজন্মায় দুর্ভিক্ষে দেবতার আবাহনে, যুদ্ধে, যাদুতে ও ভাগ্যগণনায় গানের প্রয়োগ দেখেছি। তা' ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের উপকরণ হিসেবে শুঁড়ীখানায়, সরাইতে ও কাফেলায় পেশাদার গায়িকা পোষার রীতিও ছিল অবাধ। এসব গায়িকার সবাই আরব ছিল না, আবিসিনিয়া, গ্রীস ও ইরান থেকেও আসত। এমন কি রসুলের আমলের যুদ্ধে ড্রামবাদক ছিলেন একজন ভারতীয়, তাঁর নাম বাবা Sawandik।

এতে বোঝা যায়, আরবেরা সঙ্গীতপ্রিয় জাতি। কাজেই ইসলামোত্তর যুগে সঙ্গীতবিমুখ হওয়া তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য কিছু সাধনার মতোই দুষ্কর ঠেকেছিল। ফলে প্রবৃত্তির প্রতিকূল সংগ্রামে তারাও বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারেনি। অবশ্যম্ভাবী রূপে শুরু হল খোঁজাখুঁজি ও ব্যাখ্যা নিরীক্ষা কোরআন হাদিসের সমর্থন লাভের আশায় এবং অভীষ্ট ফল লাভে দেরী হল না। কোরআন থেকেই সমর্থন করা হল সঙ্গীতে নানা আয়াতের অনুমোদনের আভাষ-ইঙ্গিত ঃ

ক. নিশ্চয় গাধার ডাকই সবচেয়ে ঘৃণ্য স্বর।

খ. তিনি ইচ্ছেমতো তাঁর সৃষ্টিতে বৃদ্ধি করেন সুন্দর স্বর।

গ. এবং কোরআন আকর্ষণীয় করে পড়।

এমনি আরো অনেক আয়াত থেকে পরোক্ষ ইঙ্গিত সংগ্রহ করে সঙ্গীতের সমর্থনে ভাষ্য তৈরি হয়েছে। আবার একই পদ্ধতিতে সঙ্গীতবিরোধী তথ্যও উদ্ধার করেছে সঙ্গীতবিমুখ গোঁড়ারা।

২.

সুফীরা প্রেমধর্মে বিশ্বাসী। কিতাব উল লুম্বায় আবু নসর সারাজ এবং 'এহিয়া উল উলুম' ও 'কিমিয়া-ই-সাদত' গ্রন্থ দুটোতে ইমাম গাজ্জালী সঙ্গীতের তাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। আচারবাদীদের কাছে যা গর্হিত, মরমীদের কাছে তা-ই কাম্য। এখানেই যাহের ও বাতেনের পার্থক্য। ফাসেকী ও সাদেকী তত্ত্বের উদ্ভব। অতএব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সঙ্গীতে যে মানবমনের একটি মহত্তর প্রকাশ ঘটে, তা স্বীকৃত হয়।

গাজ্জালীর মতে (কিমিয়া) সঙ্গীত হচ্ছে পাষাণে নিহিত সুপ্ত আগুনের মতো। ঘর্ষণে শিলা থেকে যেমন আগুন বের হয়, এবং তা গোটা অরণ্য দগ্ধ করে, তেমনি সঙ্গীতের স্পর্শে আত্মার আগুন জ্বলে ওঠে। সোনা যেমন আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ ও রূপবান হয়, তেমনি হৃদয়কে সঙ্গীতের

আগুন মুকুরে পরিণত করে যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় জগতের সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্যের রূপভেদে তাত্ত্বিক নাম জমাল, হুসেন ও তনাসুব। সঙ্গীত সৌন্দর্যচেনাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়।

যদিও হযরত আয়েশা প্রমুখের দোহাই ও নজির দিয়ে ঈদে বিবাহোৎসবে সঙ্গীতকে বৈধ বলার চেয়ে অবৈধ বলার পক্ষে যে তথ্য ও প্রমাণ বেশি তা কেউ সহজে অস্বীকার করে না।

অবশ্য পাপ বলে জেনেও যেমন মানুষ লোভের বশে আর দশটা অপকর্ম করে, মুসলমানরাও তেমনি মানুষ হিসেবে ফাসেকী জেনেও সঙ্গীতকে পরিহার করতে পারেনি। তাই তুর্কীশাসনের গোড়া থেকেই ভারতবর্ষেও সঙ্গীত মুসলিম সমাজে প্রশ্রয় পায়।

ইসলামের উদ্ভবের মাত্র কয়েক বছর পরেই উম্মাইয়াদের আমলে মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়। অবশ্য ইসলামেও স্বর-মাধুর্যে মর্যাদা অরোপিত হয়েছে। নামাজে শিরিন সুরে কেরাত পড়ার সামর্থ্য ইমামের অন্যতম যোগ্যতা বলে স্বীকৃত। কিন্তু তবু গোঁড়া শরীয়তপন্থী কোনকালেই সঙ্গীতকে সুনজরে দেখেনি। তা সত্ত্বেও এর সর্বগ্রাসী মায়াবী প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষেই। হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (১১৪২-১২৩৮ খ্রী) ও তাঁর শিষ্যরাই মনে প্রাণে সঙ্গীতকে সাধনের ভজনের ও আত্মবোধনের মাধ্যম করেছিলেন। আর আমীর খুসরুই আরবি ইরানি ও তুর্কি সুরের ও সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতিক সঙ্গীতের মিশ্রধারার আদি স্রষ্টা।

৩. বাঙলাভাষায় সঙ্গীতশাস্ত্র

সুরের ও ছন্দের সঙ্গে মানবমনের নিত্যকালের যোগ। সুরের ও ছন্দের সাধনায় মানুষের মনুষ্যত্বের একতম বিকাশ; র‍্যাশন্যালিটির স্ফুরণ, কারণ সুর ও ছন্দ সৃষ্টির মূলে রয়েছে সৌন্দর্য স্পৃহা যার অপর নাম দেয়া যায় সংস্কৃতিপরায়ণতা। তাই মানুষের ক্রিয়ামাত্রেই একটা ছাঁদ গড়ে ওঠে, একটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, একটা সুর বেজে ওঠে। আমরা বিশেষ ছাঁদে হাঁটি, বিশেষ সুরে কাঁদি, বিশেষ ঢঙে ভ্যাংচি কাটি, বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলি, বিশেষ স্বরে বিনয় করি। আমাদের সুর করে বিলাপ, সুর করে গান, সুর করে পড়া, সুর করে এবাদত। আমাদের ছাঁদে আলাপ, তালে কাজ। এই সুর ও ছাঁদ ছাড়া কি জীবনসাধনা বা জীবনোপভোগ চলতে পারে! তাই মানুষের অন্যতম সাধনা সুর ও ছাঁদ সৃষ্টির সাধনা। এটারই অন্য নাম সংস্কৃতিসাধনা।

আনন্দের অবলম্বন বা উপকরণ হচ্ছে সৌন্দর্য। তাই মানুষের দেহে-মনে-আত্মায় স্বভাবে ব্যবহারে, সমাজে সংস্কারে, আচারে বিশ্বাসে, ঘরে বাইরে, ধর্মে রাষ্ট্রে রয়েছে সৌন্দর্য-প্রীতি। যা কিছু ভাবতে বলতে শুনতে করতে রিপুর প্রণোদনা থাকে, তা-ই ক্ষতিকর, তা-ই অসুন্দর, তা-ই পরিহার্য। আর সৌন্দর্য-সৃষ্টি করাই হচ্ছে মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে সংগীতের সুর। গান কানে কানে মধু বর্ষণ করে, প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনি তোলে, মনে মনে মোহ জাগায়, আত্মায় আত্মায় প্রেম যোগায়। এর প্রভাব আশু, প্রত্যক্ষ ও অসাধারণ বিস্ময়কর, মনোহর ও ভয়ঙ্কর। মন-মাতানো, ভাব-জাগানো, ভয়-ভাঙানো প্রীতি-বহানো আর বিদ্বেষ-ভোলানো গান। মানুষের মনে থাকা চাই সুর, কাজে থাকা চাই শোভা। সংগীতের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানব-ভোগ্য কোন বস্তু দুনিয়াতে আছে কি ? বস্তুত, প্রকৃতির সৃষ্ট ফুল আর মানব সৃষ্ট সুরের প্রতি কোন মানুষেরই স্বাভাবিক বিরূপতা নেই।

তাই শাস্ত্রের কঠোর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুসলমানেরা সংগীতচর্চায় বিরত থাকেনি বা থাকতে পারেনি। মানুষের সহজ জীবনবোধ ও সহজাত বৃত্তিই মানুষকে সংগীতের দিকে আকৃষ্ট করে। অবশ্য রক্ষণশীল শরীয়তপন্থী মুসলমানেরা সংগীত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল মুখ্যত সুফীদের দ্বারা, তাঁরা কখনো সংগীত পরিহার করেননি। মুসলমানরা সংগীত চর্চায় উৎসাহও পেয়েছিলেন প্রধানত এ সুফীদের কাছ থেকেই।

ভারতবর্ষে মুসলিমদের সঙ্গীত মাধ্যমে এ সাধনপদ্ধতির আদি প্রবর্তক সম্ভবত হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (১১৪২–১২৩৮ খ্রীঃ) যাঁর তাঁর পীর হযরত উসমান হারুনী। হযরত চিশতী ১১৬৫ বা ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তিনি এবং তাঁর

শিষ্যেরা "সামা" গান গেয়ে গেয়ে স্রষ্টা-প্রেমে তন্ময় ও অজ্ঞান হয়ে পড়তেন বলে শোনা যায়। হযরত চিশতীর অনুকরণেই হয়তো মওলানা জালালউদ্দিন রুমী (১২০৭-৭০ খ্রীঃ) ও তাঁর শিষ্যবর্গ নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আল্লাহর যিকর-দা'রা বা হালকা করতেন বলে কথিত হয়। ভারতে পরবর্তীকালে মাধবেন্দ্র পুরী এবং চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গ এরূপ নামসংকীর্তনকালে নাচগান করতেন এবং ভাবাতিশয্যে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। এটি স্পষ্টত চিশ্তী তুরীকা প্রবর্তিত পদ্ধতির অনুকরণ। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মুসলিমরা কোনো যুগেই সংগীত চর্চা থেকে বিরত হয়নি।

মানস-প্রয়োজনে ও জৈব-ধর্মের তাগিদে নৃত্য ও সংগীত মানবসমাজে স্বতঃ উদ্ভূত। সে কারণেই কৌমসমাজে আর্ট ও রিসুয়াল অভিন্ন। আদি সমাজে গান ছিল কর্মেরই অঙ্গ-মুখে গান হাতে কাজ—আজো ছাদ পেটানকালে গান অপরিহার্য। এভাবে জীবনকে কলার অনুগত করে, কিংবা কলাকে জীবনানুগ করে সাধনার শুরু হয়েছে কবে থেকে তা কেউ বলতে পারে না। তবে জানা অতীতের গোড়ার দিকের কুয়াশার প্রলেপেও যা ঢাকা পড়েনি, তা হচ্ছে এই কলাশিল্পের ও অধ্যাত্মজীবনবোধের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্য ও গীতি এমন কি স্থাপত্যও একই উৎসের ইঙ্গিত দেয়। সংগীতের সঙ্গে জীবনের এমনি গভীর যোগ রয়েছে বলেই ইসলামের সুকঠোর নির্দেশ আরবেরা বেশিদিন মেনে চালতে পারেনি।

তাই গোঁড়া মুসলিম সুলতান সিকান্দর লোদী কিংবা নিষ্ঠাবান গোঁড়া শরীয়তপন্থী সম্রাট আওরঙযীবও প্রথম জীবনে সংগীত বিমুখ হতে পারেন নি। পরে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে শা'ফী মুযাহাবে দীক্ষিত হয়ে আওরঙযীব সংগীতবিরোধী হন।

৪.

মধ্যযুগের ভারতবর্ষেই সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎকর্ষ ঘটে। যেহেতু বাঙলাদেশেও সব ভারতীয় সঙ্গীতের ও সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চা হয়েছে, এবং তা অনুকৃতও হয়েছে, সেহেতু এখানে এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মধ্যযুগের ভারতিক সংগীতকলার উন্নয়ন ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহর প্রতিপোষণের পরোক্ষ দান অসামান্য। এঁদের মধ্যে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬), গোয়ালিয়ারের রাজা মানসিংহ তনবার (১৪৮৬-১৫১৭) কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন (১৪১৬-১৫৬৭), গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ (১৫২-৩৭) জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী (১৪৫৭-১৫০০) সুলতান সিকান্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭) মালোয়ারের সুলতান বাজ বাহাদুর ও রানী রূপমতী (১৫৫৪-৬২), বাবুর (১৫২৬-৩২), ইসলাম শাহ সুর, আদিল খান সুর, আকবর (১৫৫৬-১৬০৩) জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, প্রথম বাহাদুর শাহ (শাহ-ই-বেখবর) জাহান্দর শাহ, মুহম্মদ শাহ (সদারঙিলা), অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ প্রমুখের দান অপরিমেয়। আবার এঁদের মধ্যে মানসিংহ তনবার, হোসেন শাহ শর্কী, বাজবাহাদুর ও মুহম্মদ শাহ—এ চারজনের দান তুলনাহীন। শেষোক্ত তিনজন প্রখ্যাত গায়ক এবং কথা ও সুরস্রষ্টা ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "ভারতীয় সংগীতকলায় মুসলমান সাধকদের দানের তুলনা হয় না। তাঁহারা দারুণ দুর্দিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সংগীতবিদ্যাকে শুধু বাঁচাইয়া রাখেন নাই, দিন দিন ইহাকে নানা ঐশ্বর্যে মহান করিয়াও তুলিয়াছেন। আলাউদ্দিন খিলজী, আকবর, জৌনপুরের সুলতান শর্কী, মুহম্মদ শাহ রঙিলা, নবাব কলবে আলি, নবাব বাজিদ আলী (অযোধ্যার নবাব) প্রভৃতি বাদশা-নবাবদের উৎসাহের তুলনা হয় না। গোয়ালিয়রের রাজা মান তোমর (মানসিংহ তনবর বা তনোয়ার) ও রেওয়ার রাজা রাজারামের কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয়।"[১]

গীতিকার গায়ক ও সুরস্রষ্টাদের মধ্যে আমীর খুসরুর দান অবিস্মরণীয়। ইনি যে কেবল আরবি ইরানী ও তুর্কি সংগীতের সঙ্গে ভারতিক সংগীতের সমন্বয় সাধনা করেন তা নয়, নিজেও নানা রাগরাগিণী, বিভিন্ন তাল এবং কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র (সেতার তবলা রবাব ও ঢোলক) সৃষ্টির গৌরব

১. *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা, পৃঃ ১০৬-৭।*

অর্জন করেছেন। তাঁর সমসাময়িক তেলিঙ্গানাবাসী প্রখ্যাত গায়ক নায়ক গোপালও অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন, জৌনপুররাজ হোসেন শাহ শর্কী খেয়াল গানের স্রষ্টারূপে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর পিতামহ ইব্রাহিম শাহ শর্কীর (১৪০১-৪০) প্রবর্তনায় বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ "সংগীত শিরোমণি" সংকলিত হয়। এ ছাড়া তিনি আরো রাগরাগিণী প্রবর্তন করেন। নায়ক পাণ্ডে, নায়ক লোহাঙ্গ, নায়ক মাহমুদ, নায়ক করন, নায়ক গোপাল, নায়ক বখশু, নায়ক ভানু, নায়ক ধুন্দে, মুবারিজ খান, মহাপাত্র নরহরি, বাবা রামদাস, স্বামী হরিদাস, নায়ক বৈজু, তানসেন, লালখান গুণসমুদ্র, নাদ আলী খান, রঙ খান, শেখ বাহাউদ্দীন, শেখ মুহম্মদ, মিয়া দলু, গুণসেন, হামীর সেন, খুরম-মখু, মিশ্রি খান ধারী, গুনখান, রওজা কাওয়াল, দীরঙ্গ খান, পরভেজ, জাহাঙ্গীর দাদ, কবীর কাওয়াল, মুহীব খান, সওয়াদ খান, ওলি, রহিম দাদ, গোপচোপ, রাজা ইদ সিং রাজা রামশাহ, সুরদাস, বিলাস খান, তানতরঙ, নায়খ সূর্য (চারজু), প্রবীন খান, সোবহান খান, বিচিত্র খান, চাঁদ খান, মিয়া চাঁদ, বীরমণ্ডল, সিহাব খান, নিয়াজি কাওয়াল, লালা বাঙালী, নিয়ামত খান সদারঙ, শেখ মঈনুদ্দীন, ফিরোজ খান, মুহম্মদ আলী খাঁ হররঙ, টপ্পা গানের প্রবর্তক গোলাম নবী প্রমুখ অনেকেই তেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি সংগীতকলাকে তাঁদের অবদানে ঋদ্ধ করে গেছেন।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কাশ্মীর, গুজরাট, আগ্রা, দিল্লী, রামপুর, জৌনপুর ও লক্ষ্ণৌই ছিল সংগীত-কলা চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। আর মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সংগীতকলার উৎকর্ষের মূলে রয়েছে প্রথমত ও মুখ্যত মুসলমানেরই দান। তাঁরা নানা রাগতাল সৃষ্টি তো করেইছেন বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করেছেন অনেকে। যেমন ঘিচক, তম্বুরা কানুন উদ, নই, ঢফ, নাকাড়া, ঢোল, সেতার, রবাব, চঙ, নহবত, সরোদ (সরহদ) তবলা (অতবল–আরব্য যন্ত্র) প্রভৃতি। সানাই, নাকাড়া ও নহবতের গৎ বা তালও এ সময়ে উৎকর্ষ লাভ করে।

সংগীতের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োজনেও হিন্দুরা যা করতে পারেনি, আনন্দের আয়োজনে মুসলমানেরা তার শতগুণ করেছে। উঠতি আর পড়তির পার্থক্য এখানেই। স্বাধীনতার মহিমা আর পরাধীনতার অভিশাপ এখানে স্পষ্ট। শাসকের প্রাণ-প্রাচুর্য নব নব উন্মেষশালিনী হবে আর শাসিতের লক্ষ্যহীন জীবন বন্ধ্যা থাকবে; এইতো ইতিহাসের সাক্ষ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এমনি ব্যাপার আমরা ইংরেজ আমলেও প্রত্যক্ষ করেছি।

অবশ্য ভজন-কীর্তনের মাধ্যম হয়েও সংগীতকলার বিকাশ হয়েছে, গড়ের হাটি, মনোহরশাহী, রেনেটী ঢঙের কীর্তনে কিংবা মীরাবাই, স্বামী হরিদাস, বাবা রামদাস ও তাঁর ছেলে সুরদাস প্রমুখের ভজনে সুর তালের বিকাশ লক্ষণীয়।

৪.

মুসলিমরা ভারতীয় সংগীততত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থও ফারসি, হিন্দুস্তানি ও বাঙলায় রচনা করেছেন কিংবা করিয়েছেন। এগুলোতে তাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবন, ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও বিশ্লেষণ থাকলেও মূলত সংস্কৃত সংগীততত্ত্ব এবং সংস্কৃত গ্রন্থই ছিল তাঁদের অবলম্বন। এমনি কয়েকটি গ্রন্থের নাম করছি এখানে। সঙ্গীত গ্রন্থ 'কাঞ্জল তুহফ' রচিত হয় ১৩৫৫ খ্রীস্টাব্দে। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর (১৪০১-৪০ খ্রীঃ) প্রবর্তনায় সংকলিত হয় 'সংগীত শিরোমণি', কাশ্মীররাজ জয়নুল আবেদীনের (১৪১৬-৬৭) আগ্রহে 'মণক বা গণক' নামের সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন সুদীভট্ট। হাম্মাদ ওর্ফে এহিয়া কাবুলি সুলতান সিকান্দর লোদীর আমলে (১৪৮৯-১৫১৭)রচনা করেন 'লহজত-ই-সিকান্দরী'। গোয়ালিয়ররাজ মানসিং তনবারের (১৪৮৬-১৫১৭) নির্দেশে 'মান কৌতুহল'-এর অংশবিশেষ সংস্কৃতে রচনা করেন নায়ক মাহমুদ। ১৫১৮ সনে রচিত হয় 'রাগা-ই হিন্দ', কবি আলমের 'মাধবানল কাম কন্দলা' আকবরের আমলে রচিত। ইব্রাহিম আদিল সুরের 'নব রস' রচিত হয় ১৬০৮ সনে। ১৫৬০ সনে রচিত হয় তানসেনের 'সংগীতসার ও রাগকলা।' শাহজাহানের আমলে 'সহসরস' (১৬২৮-৫৮) আর 'মিফতাউস সরুর' (১৬৭৩) রচিত হয়

আওরঙযীবের আমলে। 'রাগদর্পণ' (১৬৫৮ বা ১৬৬১) ও 'মান কৌতূহল' ফারসিতে তর্জমা করেন মির্জা ফকীরুল্লাহ (১৬৬১-৬৪)। 'নযমাতুল আসরার' (১৬৮৮-১৬৭১ ?) রচনা করেন মীর আহমদ; 'মীরাতুল খিয়াল' (১৬৫৮-১৭০৭)রচক হচ্ছেন শের মুহম্মদ খান। 'তুহফতুল হিন্দ' (১৬৫৮) রচনা করেন সিরাজ খান ইবনে ফখরুদ্দীন আহমদ। এ ছাড়াও রয়েছে নিশাত আরা ও শাহনওয়াজ খান রচিত 'মিরাত-ই-আফতাবনামা', মুহম্মদ লাল খান বরনীর 'মউজ-ই-মুসিকি', মুরাদ আলী আওরঙ-বাদীর 'আইয়াজ-ই-খুস-রুবী', রাজা নওয়াব আলীর 'মুয়ারিক-উল-নাঘমাত' (উনিশ শতক) মহম্মদ রাজা খানের 'নাঘমাতুল আসিফী' (১৮১৩), অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর 'নজো', আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী (তৃতীয় খণ্ড সংগীত বিষয়ক) প্রভৃতি। মির্জা রওশন জামী ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে 'সংগীত পারিজাত' তর্জমা করেন ফারসিতে। ১৮৩৪ সালে হাকিম সালাওয়াত আলী খাঁর সংগীত গ্রন্থ রচিত হয়। 'রিসালা-ই-মুসিকি' 'রিসালা-দর ইল্লত-ই-মুসিকি' নামে আরো দুখানা সংগীত গ্রন্থ আছে। আর রাগদর্পণ, মানকৌতূহল ও তুহফতুল হিন্দ এগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বলেন 'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাধনাগত যোগ বহুকালের। ভগবৎ প্রেমে, ভক্তিতে, চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যশিল্পে, জ্যোতিষ চিকিৎসাদিশাস্ত্রে, কাব্য সাহিত্যে, সামাজিক উৎসবাদিতে কোথায় সেই যুগ দেখা যায় নাই ? আর সব ক্ষেত্র বাদ দিয়া শুধু সংগীতের ক্ষেত্রে দেখিলেও দেখা যায়, উভয়ের সাধনাগত যোগ বিস্ময়কর।... ভারতীয় সংস্কৃতি কোন বিশেষ একটি মাত্র দলের সাধনার ফলে গড়িয়া উঠে নাই। এই সংস্কৃতির মধ্যে আর্য-আর্যেতর বৈদিক-অবৈদিক কাহার সাধনা নাই ? তারও পরেকার শক-হুন যবনাদির (গ্রীক) সাধনাও ইহাতে প্রভূত পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে।'[১]

আরবি, ইরানি ও ভারতিক সংগীতে হেলেনীয় প্রভাবের কথা আজকাল অস্বীকৃত নয়। এই সূত্রে হয়তো এ তিন দেশের সংগীতে কিছু কিছু মৌলিক মিল ছিল, তাই মুসলমানেরা তুর্কিবিজয়ের অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতিক সংগীত আত্মস্থ করতে পেরেছিল, তার প্রমাণ পাচ্ছি শার্ঙ্গদেবের (১২১০-৪৭) গ্রন্থ 'সংগীত রত্নাকর' তুরস্কতোড়ি ও তুরস্কগৌড় রাগের উল্লেখে এবং আমীর খুসরু কর্তৃক দেশী-বিদেশী রাগতালের সহজ ও নিপুণ সমন্বয় সাধনে। তিনি ঘনম, খরা, ফরমনা, মুজির, মুয়াযিক, সনম, সাজগরি, উশশাক, ইমন, জঙ্গুলা, যিলফ, সাহানা, সুহিল, কওয়াল, কৌল, তরানা, প্রভৃতির স্রষ্টা বলে খ্যাত। তালের মধ্যে খামাসা, সওয়ারি ফিরোদস্ত, সরফরদা, জাট পস্তআরা, চৌতালা, সুলফক্‌তা, ঝুমরা প্রভৃতি তাঁর কীর্তি বলে কথিত। আর যন্ত্রের মধ্যে সেতার, তবলা, রবাব ঢোলক তাঁর উদ্ভাবন বলে পরিচিত। ইমন থেকে কল্যাণ, পুরিয়া, ভুপালি, বেলা-বলী, বেহাগ, ঝিঁঝিট ও ইমনী এবং বাহার, আমাইয়া, অড়ানা, সোহিনী, সুহি, সুঘরই, মারু, গুজরাটের বাহাদুর শাহর টোড়ী, হোসেন শাহ শর্কীর জৌনপুরী টোড়ী, খেয়াল, হোসেনী কানড়া, হিজেজ, কাফিটোড়ী, গোলাম নবীর টপ্পা, তানসেনের মিয়া সারঙ্গ, মিয়ামল্লার, পিলু এবং ঝিঁঝেট, এমনি করে সাত সারঙ্গ, নও নট বারো মল্লার, তেরো টোড়ী, আঠারো কানহড়া ক্রমে গড়ে ওঠে মুসলমানদের হাতে। তানসেন সম্বন্ধে বলা হয়—আকবর বাদশাহ যেমন নরপতি, তেমনি তানসেন হলেন তানপতি। খয়রাবাদের লোকগীত থেকেই নাকি জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী 'খেয়াল' সৃষ্টি করেন, তেমনি পাঞ্জাবের ঝাঙ্গ অঞ্চলের উষ্ট্রচালকের সংগীত থেকেই গোলাম নবী টপ্পা (শোরী) প্রবর্তন করেন। এভাবে আমীর খুসরু থেকে যা শুরু হয়েছে, তা আজো শেষ হয়নি। আজো বিখ্যাত সংগীতবিদ ও উস্তাদ বলতে প্রায় সবাই মুসলমান। তাঁদের অনেকেই তানসেন বংশীয় বা তাঁদের শিষ্যগোষ্ঠীয়। রাগরাগিণীর সৃষ্টিতে, বাদ্য-যন্ত্রের উদ্ভাবনে ও সংগীত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় আজো পাক-ভারতের মুসলমান প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

---

১. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৬।*

৫.

আগেই বলেছি, ভারতিক সংগীতে বিদেশী প্রভাব যতই পড়ুক, আর তাতে তার অবয়ব যতই রূপান্তর লাভ করুক, তার আত্মাটি দেশীই ছিল, কেননা সুর কখনো ভাষা ও ধ্বনি নিরপেক্ষ হতে পারে না। সেজন্যেই বিদেশী রাগ-রাগিণী দেশী ভাষা ও তার ধ্বনির আধারে ধরা না দিয়ে পারেনি। এ অনিবার্য কারণে সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থগুলোই ছিল সবার আদর্শ। কিন্তু সর্বসম্মত স্বরলিপি সম্বলিত না হওয়ায় তা কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের সহায়ক হয়নি। ফলে শ্রেণীবিন্যাসে, ব্যাখ্যায় ও ধ্যানে বিস্তর মতানৈক্য দেখা যায়, সংস্কৃতে প্রায় দু'শোর মতো (১৭০ খানার মতো আবিষ্কৃত হয়েছে) সংগীত গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থারণ্য থেকে সর্বসম্মত ধ্যান ও ব্যাখ্যা উদ্ধার করে সংগীত-তত্ত্বের একখানা বৈজ্ঞানিক আলোচনা গ্রন্থ রচনা করা অতিবড় পণ্ডিতের পক্ষেও দুরূহ। অবশ্য মান কৌতুহল, সংগীত শিরোমণি, মউজ-ই মুসিকি, কিংবা আইন-ই-আকবরী (তৃতীয় খণ্ড) প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে সে-চেষ্টা বারবার হয়েছে। তবু কেবল জটিলতাই বেড়েছে। এর কারণ সংগীততত্ত্ববিদের মনন যত গভীর ও সূক্ষ্ম ছিল, বিজ্ঞানবুদ্ধি তত প্রবল ছিল না, তার উপর স্বরলিপির মাধ্যমে প্রায়োগিক জ্ঞানদানের পদ্ধতি কখনো গৃহীত হয়নি বলে তাত্ত্বিক সংজ্ঞা ও ভাষ্য কেবল বিভ্রান্তই করেছে। কোন রাগরাগিণীর স্বরূপকে সুনির্দিষ্ট না করে অনির্দেশ্যই করে তুলেছে। সংগীতশাস্ত্র কোনদিনই সংগীতশিক্ষার সহায়ক হয়নি। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অনুশীলনই শিক্ষার একমাত্র বাস্তব প্রণালী ছিল।

এর ফলে গুরু যা স্বেচ্ছায় দিয়েছেন বা দিতে পেরেছেন, সেটুকুতেই শিষ্যকে তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সেজন্যে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগ্যতাই ছিল শিক্ষা দানের ও গ্রহণের নিয়ামক ও পরিমাপক। সে-ক্ষেত্রে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোগে সুফল ফলেছে, বিশেষ রাগরাগিণীতে বিশেষজ্ঞ পাওয়া গেছে, কোন নির্দিষ্ট সুরে কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতে বিশিষ্ট গায়ক বা বাদক মিলেছে। কিন্তু সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কিংবা সর্বসুরজ্ঞ শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে কম। শিখতে সময়ের অপব্যয় হয়েছে অপরিমেয় এবং প্রতিভাবান ছাড়া সংগীত সাধারণের ছিল অনায়ত্তে। এ যুগে অল্প আয়াসেও চলনসই সংগীতশিক্ষা যে কোন ছেলেমেয়ের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে। অথচ সে যুগে অর্ধ জীবনের নিবিষ্ট সাধনার প্রয়োজন ছিল। একালে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতিতে এবং রাজা নওয়াব আলী তাঁর 'মুয়ারিফুল নাঘমাত'-এ আমাদের সংগীতশাস্ত্রকে সংগীত বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছেন। আগের সংগীতশাস্ত্র কিরূপ জটিল, বহুধা বিভক্ত, অবিন্যস্ত ও বিচিত্র ছিল, তার প্রমাণ মেলে মানকৌতুহলে আশী হাজার রাগরাগিণীর অস্তিত্বের স্বীকৃতিতে। এর একটা বিবরণ পাই লাল খান বরনীর 'মওজ-ই-মুসিকি গ্রন্থে।[১]

৬.

মধ্যযুগে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী যখন সংগীতচর্চার বান ডেকেছে, তখন বাঙলার অবস্থা কী ? বাঙলাদেশের কোন অবদানের কথা তো শুনতে পাইনে। একমাত্র 'লালা বাঙলী' ছাড়া কোন বাঙালীর নামও মেলে না। এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আমাদের অনুমিত কারণগুলো এই ঃ এক, ফারসির পরেই উত্তর ভারতীয় ভাষাই দরবারী মর্যাদা ও লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা হবার সুযোগ পেয়েছে। সে-জন্যে সে-ভাষাতেই সংগীতকলার অনুশীলন হয়েছে। সে-ভাষায় অনধিকারী প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালীর পক্ষে যানবাহন বিরল সে-যুগে নতুন সংগীতকলা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। দুই, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সংগীতের অনুশীলনের ও উৎকর্ষের মূলে রয়েছে বিভিন্ন দরবারের প্রতিপোষণ। কিন্তু বাঙলাদেশে বাঙালী বাদশাহ ছিলেন না কখনো, কাজেই বাঙলাভাষায় সংগীত সাধনার অনুকূল পরিবেশ কখনো গৌড় সুলতানের দরবারে সৃষ্ট হয়নি। এবং সামন্তদের অধিকাংশও ছিল অবাঙালী। তিন, বাঙলাভাষা লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বিকশিত হবার মুখেই বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন শুরু হয়, ফলে তাঁদের সাধনের ভজনের ও কীর্তনের জন্যে বিশেষ ধরনের গান রচিত হতে থাকে। সে-স্রোতে অবৈষ্ণবও গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। নইলে গানের দেশ বাঙলায় কালোয়াত জন্মাবে না

১. *হিসট্রি অব ইণ্ডো-পাক ম্যুজিক ঃ ডক্টর আবদুল হালিম, পৃঃ ২১-২৩।*

কেন। তবু যে দেশের লোকের ঘটে ঘটে সতেজ প্রাণ এবং গোলায় গোলায় ধান না থাকলেও গলায় গান রয়েছে, যে দেশে সহজিয়া, কীর্তন, বাউল,ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, ঝুমুর প্রভৃতি সংগীতের প্লাবন বয়ে গেছে, সে দেশে কেন যে উচ্চাঙ্গের সংগীত, বড় বড় কালোয়াত, সংগীত শাস্ত্রকার এবং রাগ, তাল ও বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবকের আবির্ভাব ঘটেনি, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

তাই বলে বাঙালী সংগীতবিমুখ ছিল না। দেশী বাদশাহবিহীন ও সামন্ত বিরল হয়েও তারা সাধ্যমত এক্ষেত্রে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। বাঙলার হিন্দুরা সংস্কৃতে সংগীত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, বাঙলায়ও কিছু কিছু করেছেন। মুসলমানেরা এ বিষয়ে সংস্কৃতে ও ফারসিতে কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কি-না সে সন্ধান কেউ করেন নি, কিন্তু তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে বাঙলায় বহু রাগ তালের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে মধ্যযুগে যে নতুন জিজ্ঞাসা ঔৎসুক্য ও রসতৃষ্ণা উত্তর ভারতে সুরের অন্বেষায় রসিকদের আকুল ও একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন করেছিল, সে-রেনেসাঁস বাঙালীর হৃদয়কে উদ্বেল করেনি। বাঙালীর প্রাণের ঐশ্বর্য তখন বৈষ্ণব ও সুফী আন্দোলনের মাধ্যমে ভাগবত উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি সাধনে ছিল নিরত, এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। পার্থিব সম্পদে বঞ্চিত হয়ে অপার্থিব ধনে ধনী হওয়ার মানস প্রয়াস না করলে চলত না, জীবনে তো একটা অবলম্বন চাই ! কাজেই আমাদের সংগীতকলা নতুনের স্পর্শ বিশেষ পায় নি, প্রায় গতানুগতিক ধারাতেই চলছিল। তারই প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে রাগতালের নানা গ্রন্থে। তবু সূর্য উদয় হলে যেমন তার রশ্মি ছিদ্রপথেও প্রবেশ করে, তেমনি আমাদের সংগীতকলায়ও সৃষ্টির অঙ্কুর মাঝে মধ্যে দেখা গেছে, তার প্রমাণ পাচ্ছি কিছু কিছু মিশ্র রাগরাগিণীর প্রয়োগে, যা ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর অতিরিক্ত। যেমন ধানসী বেগরা, ধানসী দীপিকা, ধানসী কেদার, ধানসী দ্রৌপদী, তিবরিয়া ধানসী, দিগর ধানসী, ধানসী বেরুনী, মালসী বেরুনী, দিগর মালসী, দিগর রামক্রিয়া, দিগর আশাবরী, বেরুনী সিন্দুরা, গৌড় সিন্দুরা, দিগর গৌড় সিন্দুরা, করুণা ভাটিয়াল, নাগোধা ভাটিয়াল, আকুমারী ভাটিয়াল, রাগজলালী, দৈওগিরি রাগ, কল্যাণ-জালালী, তুড়ি, গুঞ্জরী-কেদার, কামোদ ভাটিয়াল, পরছ কামোদ, রাগ পরছ, কহু-ভূপালি, পঞ্চম সিন্দুরা, তুড়িপরছ, তুড়ি কেদার, তুড়িগুঞ্জরী কেদার, তুড়ি গৌড়ী, আসোয়ারী, রাগ সারাঙ্গ, সূহি সারাঙ্গ, সূহি সিন্দুরা, সুহি বেলোয়ার, বেউর পুরী ভাটিয়াল, ভাক্কা কানড়া, মাটিয়াল বৈরাগী, নট গান্ধার, শ্রীগান্ধার, গান্ধার পঞ্চম ইত্যাদি এবং আরো কয়েকটি রাগ-উপরাগের বাঙলা গানে প্রয়োগে।

৭.

বলেছি, সুফী সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে সংগীতকলার চর্চা প্রতিষ্ঠা পায়, আর সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রই তাঁদের আদর্শ ছিল। সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রে সংগীতের পৌরাণিক উদ্ভব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। সংগীতও শিবপ্রোক্ত, তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা নারদ ইন্দ্রসভা কঞ্চঝপাখি, বানর প্রভৃতি হয়ে মর্ত্য মানুষের কাছে এসেছে নারদ, ব্যাস, কর্ণ, মতঙ্গ, সোমেশ্বর, কল্পিনাথ, ভরত, দত্তিল প্রমুখ ঋষি-রসিকের আগ্রহে ও অনুশীলনে। এঁদেরকে জড়িয়ে সংগীতকলার উদ্ভব সম্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী গড়ে উঠেছে। মুসলমান সংগীততাত্ত্বিকরা এ কথা অরণ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তো বটেই, তাতে আবার জাত্যভিমানের অপবুদ্ধি বশে সংগীতকলার ইসলামী উদ্ভব কল্পনা করতে যেয়ে এক হাস্যকর খিচুড়ি তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। যেমন আলী রজা বলেন ঃ

(শঙ্কর) গোপ্ত ব্যক্ত মহামন্ত্র রসুলের হোতে। ভাবিনী ভাবক হই শঙ্কর সাক্ষাতে।।
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র করিলা জগতে।। তারপর শঙ্কর প্রণামি নবী মর্ত্যেত আসিল।
বহু কথকাল সেই আছিল গোপেতে।। বেকত সকল কথা সভাত কহিল।।

কিন্তু একদিন আলীর অনুরোধে নবী গুপ্ততত্ত্ব ও মন্ত্র আলীকে জানিয়ে দিলেন, আলী সে-মহামন্ত্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে নবীর পরামর্শে সে-মন্ত্র রেখে এলেন গভীর অরণ্যে।

এদিকে 'মন্ত্র শুনি কম্পি গিরি বহে জলধার। লম্ফিবারে লাগিলেন্ত বৃক্ষেত উঠিয়া।
মহাজলাকার হৈল জঙ্গল ভিতরে। লাফাইতে বৃক্ষ ঘাতে যথ হনুমান

সে জল খাইল যথ বনের বানরে। উদর ছিঁড়িয়া কথ তেজিল পরাণ।
জলপানে হনুমানে মহামত্ত হইয়া

কিন্তু 'গাছে বানরের 'রগ' (শিরা, নাড়ী) সব রহে টানা দিয়া।' এবং যখন বসন্ত ঋতু এল, আর—

সে রগে লাগিল যদি মলয়া বাও
কহিতে লাগিল তালযন্ত্র রাও।
বসন্ত সমীর সেই রগেতে লাগিল
ঋতু রাগ তাল নানা যন্ত্র নিঃসরিল।
দগর নাগর (নাকাড়া) ঢোল যথ বাদ্যধ্বনি
রবাব, দোতারা বংশী, সানাই বেগুনি।
তারপর, আর দিন নবী কহে মর্তুজার ঠাঁই
মন্ত্র যথা ছাড়ি দিছ দেখ তুমি যাই।
নবীর আদেশে আলি সেই বনে গেল
ঋত রাগ যন্ত্র তথা বাজিতে দেখিল।
নানা রাগ যন্ত্র দেখি মহানন্দ আলি
সকল শিখিল শাহা হৃদয়ে আকলি।
ভেউর কন্নাল যথ রস বাদ্য রঙ্গ
পিণাক ডম্বুর বেণু কর্তাল মৃদঙ্গ।
নহবত ঝঞ্ঝরি বাদ্য যথেক সংসারে
ব্যক্ত কৈল হনুমান হোন্তে করতারে।
রাগতাল গোপতে আছিল হর পাশ
হনুমান হোন্তে হৈল সংসারে প্রকাশ।
সারিন্দা করিল মৃত কপি অঙ্গ আনি
বানরের চর্মে দিল সারিন্দার ছানি।
বানরের রগ দিয়া রবাব সাজায়—
সারিন্দার মন্ত্র শাহা প্রথমে শিখিল
পাছে রাগ তাল সব অভ্যাস করিল।

বিবৃত অংশে দেখা যাচ্ছে আল্লাহই শঙ্কর বা' শিব। তিনি হযরত মুহম্মদকে বেদাদি চতুর্দশ গুপ্ত-ব্যক্ত শাস্ত্রে ও মন্ত্রে জ্ঞান দান করেন। হযরত আলী এ জ্ঞানের উত্তরাধিকার পান এবং তাঁর অক্ষমতায় ও হনুমানদের আত্মদানে রাগতাল বসন্ত সমীর সহযোগে পৃথিবীতে প্রচারিত হয় এবং নর মধ্যে আলীই আবার আদি সংগীতজ্ঞ। সংগীত যে ভাগবত উৎকণ্ঠার তথা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা নিবৃত্তির ও সাধনার বাহন, তাও আলী রজা স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ

আলি হোন্তে সে সকল সন্ন্যাসী ফকিরে
শিখিল সকল যন্ত্র রহিল সংসারে।
ভাবের বিরহে সব শান্ত হৈতে মন।
রাগতাল কৈল প্রভু সংসারে সৃজন।
গীততন্ত্র শুনি মহামুনি ভ্রম যাএ
সর্ব দুঃখ দূর হয় গীত যন্ত্র রাএ
গীতযন্ত্র মহামন্ত্র বৈরাগীর কাম
রাগমন্ত্র মহাযন্ত্র প্রভুর নিজ নাম।
জীববন্ত যথ আছে ভুবন ভিতর
সর্বঘটে যন্ত্র বাজে গীতের সুস্বর।
ঘটে গোপ্ত যন্ত্রগীত যোগিগণ বুঝে
তে কারণে সর্ব জীবে সে সবারে পূজে।
গীতযন্ত্র সুস্বর বাজায় যে সকলে
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তার মেলে।
শুদ্ধভাবে ড্রাব নৃত্য করে যেই জনে
গীতরসে মজি প্রভু থাকে তার সনে।

অপর একজনও বলেন ঃ

কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার ছয় ঋতু তার সঙ্গে চলে প্রতিনিতি।

রাগযন্ত্র নাদ সব ঘটে আপনার।
অষ্টাঙ্গ তন মধ্যে আছএ যে মিলি
তনান্তরে মন বেশী করে নানা কেলি।
মোকামে মোকামে তার আছএ যে স্থিতি
রাগ-ঋত অন্ত যদি পারে চিনিবার
জীবন মরণ ভেদ পারে কহিবার।
কিবা রঙ্গ কিবা রাগ কিবা তার রূপ
ধ্যানেতে বসিয়া দেখে ঘটে সর্বরূপ।

মুসলিম সমাজে সংগীতচর্চা যে সুফীপ্রভাবেরই ফল, আমাদের সে-অনুমান উক্ত চরণ কয়টি দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হল।

রাগের বই 'রাগনামা' বা 'রাগমালা' তালসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম 'তালনামা' বা 'তালমালা' এবং রাগ ও তালের মিশ্রগ্রন্থের নাম 'রাগতালনামা বা মালা'। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথির মধ্যে উনিশখানি 'রাগনামা' বা 'রাগমালা' তেরো খানি 'রাগতালনামা' রয়েছে। এগুলো ছাড়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছেও 'বাঙলা একাডেমী'তে রয়েছে কয়েকখানি রাগ ও তালের পুথি। এসব গ্রন্থের রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ও মুসলমান। মধ্যযুগে চট্টগ্রামে সংগীতের অনুশীলন হয়েছিল এবং বহু মুসলমান সংগীতচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এসব মুসলমান সাধারণ্যে 'পণ্ডিত' নামে পরিচিত হতেন, তাঁরাই দেশের স্ব স্ব মণ্ডলীতে সংগীতবিদ্যা শেখাতেন। চট্টগ্রামে নমঃশূদ্র শ্রেণীর হাড়িরা ও ডোমেরাই সাধারণত বাদ্যকরের পেশা নিয়ে থাকে। উক্ত 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী মুসলমান সংগীত বিশারদেরাই এসব হাড়ি ডোমকে গানবাজনা শেখাতেন। চট্টগ্রামে এরূপ বহু পণ্ডিতের নাম আজো লোপ পায়নি ঃ চম্পাগাজী পণ্ডিত, কমর আলী পণ্ডিত, বখশ আলী পণ্ডিত, হারি (স) পণ্ডিত, গুলবখশ পণ্ডিত, কাদের বখশ পণ্ডিত, ওয়ারিশ পণ্ডিত, পরান পণ্ডিত, ফাজিল নাসির মুহম্মদ পণ্ডিত প্রমুখ আজো লোকস্মৃতিতে বিদ্যমান রয়েছেন। এদের কেউ কেউ সংগীতগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

রাগতালনামাগুলো প্রায়ই সংকলন গ্রন্থ। এক এক রাগরাগিণীর দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সব পদ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলো নানা জনের রচনা থেকে উৎকলিত। তবে ফাজিল নাসির মুহম্মদের 'রাগমালা' (১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত) এবং আলি রজার (১৭৫৯-১৮৩৭ খ্রীঃ) 'ধ্যানমালা' এ সবের ব্যতিক্রম। এরা ধ্যানের ভাষ্য রচনায় আর কারো সাহায্য নেননি, তবে দৃষ্টান্তস্থলে পদ বা গান উদ্ধৃত করেছেন নানা কবির।

'রাগমালা'গুলোতে প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর পরিচয় প্রসঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকে ধ্যান ও পরে বাঙলা পয়ারে তার তর্জমা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন্ সংস্কৃত সংগীতগ্রন্থটি আদর্শরূপে চালু ছিল, তা জানবার উপায় নেই। তবে উত্তর ভারতের কোন সংগীত গ্রন্থই যে আদর্শ হয়েছিল তাতে সংশয় নেই। তাই আমাদের রাগমালাগুলোর ধ্যান 'সংগীতরত্নাকর', 'সংগীতপারিজাত' প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতিক গ্রন্থে পাওয়া যায় নি।

আর একটি কথা রাগমালায় (কোনো কোনো তালনামায়ও) নানা রাগরাগিণীর উদাহরণ রূপ বিধৃতপদের বা গানগুলোর রচয়িতাদের কেউ কেউ সম্ভবত আঠারো শতকের পরের লোক নন। প্রায় সব পদই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। 'কানুছাড়া গীত নাই' এর দেশে এবং যুগে এ-ই ছিল স্বাভাবিক। এসব রাগতালনামাতে উদ্ধৃত হয়েছে বলেই আমরা চট্টগ্রামের অনেক মুসলিম ও হিন্দু পদকারের পদ পাচ্ছি। নইলে সব বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেত। এসব পদে অধ্যাত্মবাদী মরমীদের মর্মকথা অভিব্যক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের বেনামে।

আজ অবধি আবিষ্কৃত রাগমালাগুলোতে যে-কয়জন সংগীত শাস্ত্রকারের নাম এবং রচনাংশ পাওয়া গেছে, তাঁরা হচ্ছেন ষোল শতকের মীর ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের আলাউল , আঠারো শতকের ফাজিল নাসির মুহম্মদ, কাজী দানিশ, আলী রজা, চম্পাগাজী, বখশ আলী, মুজফফর, তাহির মাহমুদ, দ্বিজ রঘুনাথ, পঞ্চানন্দ, ভবানন্দ তনু, দ্বিজ রামতনু বা রাম গোপাল, মুহম্মদ পরাণ, চামারু, গুল মুহম্মদ খলিফা এবং আকবর শাহ পণ্ডিত। এবং সম্ভবত উনিশ শতকের দেবান আলি, মণ্ডু খাঁ, মুহম্মদ আজিম, জীবন আলী, মুহম্মদ নকী, সাগর আলী, আমজাদ কাজী, মুহম্মদ শাহ ফকির এবং বিশ শতকের আবদুল ওহাব সংগীতশাস্ত্র সংকলন করেন। তাঁর ছাপ গ্রন্থের নাম 'সৃষ্টি পত্তন রাগনামা সতীময়না' সতীময়না ও রত্নামালিনীর উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্বলিত 'বারমাসী' নানা রাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাস্ত্রের আদি (চট্টগ্রামী) রচয়িতা—

প্রথমতে দ্বিজ রঘুনাথ কবিবর
মধ্যে মধ্যে ভবানন্দ গাহিছে সুন্দর।
তার পাছে দানিশ কাজী অতি জ্ঞানবান,
নিয়ম করিয়া দিল সময় কাটান
কোন্ সমে কোন্ রাগ গাহিব রাগিণী।

না বল্‌লেও চলে যে এই ভাষণ ঐতিহাসিক তথ্য বহন করে না।

ওহাবের পরিচয় ঃ

পিতা মম তমিজদ্দিন প্রকাশ সারাং নিবাসী ওয়াহেদপুর থানা মিরেরসরাই।

দেবান আলী ঃ

মহাধীর আলাওল রসগুণ দধি দেবান আলি কহে তান পদ বন্দী।

দ্বিজ রামতনু ঃ

দ্বিজ রামতনু কহে পণ্ডিতের গোচর দৈবকীপ্রসাদ সুত, রামতনু কহে।

ভবানন্দ তনু ঃ ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদ সুত।

উপর্যুক্ত কারো কারো পরিচিতি অন্যরচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র রয়েছে। কারো কারো সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে ফাজিল নাসির মুহম্মদ ছিলেন চট্টগ্রামের রাউজানের সুলতানপুর গাঁয়ের লোক। তিনি স্থানীয় জমিদার সুলতান পূরবাসী ওয়াহেদ মুহম্মদের আদেশে ১০৮৯ মঘীতে বা ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ রাগনামা বা ধ্যানমালা রচনা করেন। তাঁর সঙ্গীতগুরুর নাম জান মুহম্মদ।

শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকরে' রাগের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাই উদ্ধৃত করে আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

স্বরবর্ণ বিশিষ্টেন ধ্বনিভেদেন বা জন ঃ
রজ্যতে যেন কথিতঃ স রাগ সম্মতঃ সতাম্।।
অথবা যোসৌ ধ্বনি বিশেষস্তুস্বরবর্ণ বিভুরষিতঃ।
রঞ্জকো জন চিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ।।

সন্ধিৎসু পাঠক আমার 'মধ্যযুগের রাগতালনামা' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা ও ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থাবলীর তালিকা পাবেন।

ণ. ফালনামা

দুর্বল মানুষ মাত্রই অদৃষ্টবাদী। আত্মপ্রত্যয়হীন দুঃখী ও হতাশ মানুষ অদৃষ্টবাদী ও ভাগ্যনির্ভর না হয়ে পারে না। হিন্দুসমাজে জ্যোতিষগণনা সামুদ্রিক গণনা, রাশি গণনা এবং হস্তরেখা গণনা প্রভৃতিকে বিজ্ঞান বলেই মানা হয়। জন্ম মুহূর্তেই জাতকের ভাবী জীবনের সবকিছু জানার বোঝার কৌতূহল হিন্দুদের জন্মপঞ্জিকা বা কোষ্ঠী নির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছে। এ শ্রেণীর জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ গ্রহবিপ্র বা যোষী বা আচার্য নামে অভিহিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলোর কাহিনী নির্মাণে ও নিয়ন্ত্রণে জ্যোতিষগণনা লব্ধ নিয়তিকে শিল্পসুন্দর করে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বাঙলাদেশে মুসলিমসমাজ মাস দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র লগ্ন হিন্দুপ্রভাবে হিন্দুদের মতোই মানে। আগেকার দিনে ধনীঘরের মুসলিমরাও ব্রাহ্মণ ডেকে নবজাতকের ভাগ্য গণাত এবং কোষ্ঠী করাত। পৃথিবীর সর্বত্র গণক এবং ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলে দাবিদার লোক চিরকাল ছিল এবং এখনো রয়েছে। নিয়তির অমোঘতা ব্যর্থ করার মন্ত্র ও উপায় তাদের জানা আছে বলে তারা দাবি করে, এর ফলেই আসন্ন বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বিপদ এড়ানোর জন্যে তাবিজ কবচ, তুক তাক, ঝাড় ফুক, খতম, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থাও করে এসব গণক জ্যোতিষ ভবিষ্যদ্বক্তারা। এ জন্যে অবশ্য গুণীন, বেদে সম্প্রদায়, তিব্বতী গুণীন, মোল্লা পুরুতও রয়েছে। এটিই এক সময়ে তাদের জীবিকা ও পেশা ছিল।

ফালনামা হচ্ছে নিতান্ত ভাগ্যপরীক্ষা, অনেকটা লটারির মতোই। ভাগ্যগণনা পদ্ধতি ও দুর্ভাগ্য এড়ানোর উপায় ফালনামায় বর্ণিত, বাঙলা ফালনামা ফারসি উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ বলে দাবি করা হয়।

যেমন আবদুল গনি বলেন ঃ

কিতাবেতে দেখি ফালনামা বিবরণ
করিলুঁ বাঙ্গালা ভাষা পয়ার বন্ধন।

কোকিল, শুক, সাচন প্রভৃতি, পক্ষীর ভূমিকা, মাস দিন, তিথি ক্ষণের প্রভাব এবং বিভিন্ন কাজ আরম্ভ কালের শুভাশুভ প্রভৃতি এ সব গ্রন্থে বর্ণিত।

১. আবদুল গনি ফালনামা রচয়িতা আবদুল গনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

তিনি রোসাঙ্গ অঞ্চলের লোক। আবদুল গনির পিতা উমরদরাজ ও পিতামহ আলিমবর।

রোসাঙ্গ দেশেত জান 'মংছ' দিব্য ঠাম
নানাজাতি বৈসে তথা অতি অনুগাম।
বন্নিক গ্রামেত ছিল শেখ মহাজন
হাসান খলিফা নাম জানে সর্বজন
তান সুত গুণযুত আলিমবর নাম
তান পুত্র উমরদরাজ গুণধাম।
তাহান নন্দন মুঞি হীন জ্ঞান জান
হীন আবদুল গনি নাম কর অবদান।

উমর, মুহম্মদ রফি, সৈয়দ সুলতান(?) প্রভৃতিও ফালনামা রচয়িতা।

১. উমরের রচনার নমুনা ঃ
নহস আকবর কথা কর অবধান।
চান্দের তিথি অষ্টমীতে ত্রিশে
অষ্টদশে ত্রয়োবিংশে আর অষ্টবিংশে।
ভণিতা কিতাবে দেখিয়া গৃহ দহনের বাণী
শিশু যে উমরে কহে এ সব কাহিনী

২. মুহম্মদ রফিঃ এই ঘরে উঠিলে ফাল সিদ্ধি নহে কাম
মুহম্মদ রফি এ কহে সহস্র সালাম।

২. হোসেন ফকির ঃ হোসেন ফকির ভারতীয় রাশি-গণনার বিবরণই রচনা করেছেন, কিন্তু তাতে মুসলিম রঙ লাগানোর চেষ্টাও রয়েছে ঃ

আর এক কথা কহি শুন নরগণ
বার রাশি নবগ্রহ করি এ লিখন।
একদিন নিরঞ্জন ভাবি নিজ মনে
জিব্রাইল স্থানে তবে কহিল আপনে।
নিরঞ্জন বাক্য শুনি জিব্রিল চলিলা
নবী সোলেমানের যে নিকটে আসিলা।

নবী সোলেমান তাঁর অনুগত দেও ডেকে বললেন—'যে সব দুষ্ট দেও মানুষের ক্ষতি করে, তাদেরকে আমার কাছে হাজির কর।'

'দেও সবে আনি দিল নবীর চরণ দুষ্ট দেওরা—সেই দিনে শুণি সবে ভাবি নিজমন
সেই দেও স্থানে নবী বুলিলা বচন।
বাররাশি নবগ্রহ করিলা লিখন।

শনিবারে জন্ম হলে কুম্ভরাশি, রবিবারের জাতক তুলারাশি, সোমবারের কুম্ভরাশি, মংগলবারে জন্ম হলে সিংহরাশি, বুধবারের ধনুরাশি, গুরুবারের কর্কট রাশি, এবং শুক্রবারে জন্মালে বৃষরাশি। কবি আলি রজার পুত্র ও পদকার সরাফতউল্লাহ এ পুথির লিপিকার, লিপিকাল ১২১৬ মঘী বা ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ।

রচনার নমুনা ঃ মেষরাশি ঃ

প্রথমে কহিব মেষরাশির লক্ষণ
যেইমত কিতাবেত আছএ লিখন।
শুন এই রাশি যদি নরসব হএ
তাহার নির্ণয় বাণী কহিব নিশ্চএ।
সুন্দর বদন হএ জানিঅ তাহার
সদাএ বয়ানে তার বচন সুসার।
পবন আলস্য তার বহুল নিশ্চিত
তাহার আকৃতি হএ অগ্নির চরিত।
এ রাশির অঙ্গে নিত্য তাবিজ থুইব
তবে সে তাহার অঙ্গ কুশলে থাকিব।
এবে কহি ফাড়া তার শুন গুণিগণ
এক মাস অব্দ আর দ্বাদশ পূরণ।
আর ফাড়া বিংশ অব্দ আর বিংশ তিন
একাশী বৎসর তার রাশি মধ্যে চিন।
একাশী বৎসর যদি পূর্ণ হৈল তার
মরণ হৈব তার তেজিব সংসার।

ক্রোধেত চঞ্চল হএ ক্ষেমাতে পাথর
ধর্ম কর্ম কৈলে কিছু মনের অন্তর।
তাহরে দিবারে দুঃখ দেয় সব ফিরে
তাবিজ লিখিয়া যত্নে রাখ অঙ্গ 'পরে।
আরবীভাষে এক তাবিজ দেখিলুং
তেকারণে বাঙ্গলা অন্ততে না লিখিলুং।

এ রাশি পুরুষ নারী হএ একমান।
তেকারণে দুইবার না কৈল লিখন।
ভণিতা ঃ
হোসেন ফকিরে বোলে কিতাব হেরিয়া
সিংহ রাশি যেইমত কহিব রচিয়া।

৩. লোকসাহিত্য

বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিক জীবনে সংঘটিত আকস্মিক ঘটনার তাৎক্ষণিকপ্রভাবে সংবেদনশীল মানুষের কণ্ঠে জেগে ওঠে ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে আনন্দের কিংবা বেদনার গান। লোকসাহিত্যের উদ্ভব এমনি আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতজাত আন্তরিক অনুভূতির অভিব্যক্তিতেই। তাই সে-সাহিত্যে জীবনের আনন্দ উল্লাস ও বেদনা-বিলাপ পরিব্যক্ত। হতাশা-প্রত্যাশাও তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে ছড়ায় গানে গাথায় উপকথায় রূপকথায় ব্রতকথায় ইতিকথায় আর প্রবাদে প্রবচনে ও কিংবদন্তীতে।

প্রাকৃতজনের মৌখিক রচনাকে বলে লোকসাহিত্য। 'লোক'-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Folk' বলেই মানি। 'লোক' এর বাঙলা অভিধা প্রাকৃতজন, অর্থাৎ যে মানুষ কোন কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি অর্জন করেনি—জন্মসূত্রে যে প্রকৃতি ঘরোয়া পরিবেশে ও সামাজিক প্রতিবেশ থেকে ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ অনুকরণ করেছে সে-ই 'লোক' অবজ্ঞার্থে অপরিশীলিত অজ্ঞ অনক্ষর মানুষ।

লোকসাহিত্যও ব্যক্তিবিশেষের রচনা। তবে তা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে কানে কানে শ্রুত হয়ে শ্রুতিস্মৃতি রূপে চালু থাকে বলেই মূল রচয়িতার ভাব-ভাষা ও ভঙ্গি অবিকৃত থাকে না, জনান্তরে স্থানান্তরে ও কালান্তরে কেবল রূপান্তর লাভ করে অঙ্গে ও অন্তরে। তাই এগুলোতে মূল রচয়িতার নাম রচনা কিংবা সমাজ সৃষ্টি বলে অভিহিত করা হয়।

ছড়া গান গাথা রূপকথা উপকথা ইতিকথা রহস্যকথা কিংবদন্তী প্রবাদ প্রবচন ধাঁধা তত্ত্বকথা, ভূত-প্রেত-দেও-দানু-যক্ষ-রক্ষ-পক্ষী সম্বন্ধে উপাখ্যান, দেবতাবিষয়ক কল্পিত আখ্যায়িকা প্রভৃতি লোকসাহিত্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এক হিসেবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লিখিত সাহিত্যের উপাদান উপকরণও যুগিয়েছে এ মৌখিক লোকসাহিত্যই। এ তাৎপর্যে রামায়ণ মহাভারত শাহনামা আলেফলায়লা ইলিয়াড প্রভৃতির উপকরণ ছিল মৌখিক রচনাই, লোকস্মৃতি-শ্রুতি থেকে গৃহীত। অন্যপ্রাণীদের মতো যেহেতু মানুষও প্রাণিজগতের এক শ্রেণীর প্রাণী, সেহেতু স্থান, কাল বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি অভিন্ন। তবে দুটো হাতের বদৌলত মানুষকে যেহেতু প্রকৃতি-নির্ভর থাকতে হয়নি, কৃত্রিম উপায়ে জীবিকা অর্জন ও জীবনযাপন তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, সেহেতু আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে বুদ্ধিযোগে অনুশীলন-পরিশীলন মাধ্যমে প্রসারিত আকাঙ্ক্ষাবশে হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধন করে জীবন ও জীবিকাপদ্ধতি বিস্তারে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছে, যদিও সবাই সমভাবে বিকাশ বিস্তার লাভ করতে পারেনি ভৌগোলিক প্রতিবেশ ও ঔপকরণিক প্রতিকূলতার কারণে। আজকের এ মুহূর্তেও পৃথিবীর এক অঞ্চলে, রাষ্ট্রে বা দেশেও বিভিন্ন গোত্রের বর্ণের ধর্মের শিক্ষার ও আর্থিক অবস্থানের মানুষ সভ্যতা সংস্কৃতির উচুঁনিচু বিভিন্ন স্তরে রয়ে গেছে। কিন্তু মানবিক মৌল বৃত্তি-প্রবৃত্তি শিক্ষার, সভ্যতার সংস্কৃতির প্রভাবে নির্মূল হয় না, সুপ্তভাবে কিংবা গুপ্তভাবে থেকেই যায়, কখনো লুপ্ত হয় না। তা-ই প্রলোভন প্রবল হলে, সঙ্কট আসন্ন হলে, প্রাণ বিপন্ন হলে মানুষের সহজাত রিপু কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ মদ মাৎসর্য প্রকট হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থায় দেশ-কাল-পাত্র ভেদ নেই। বা দুনিয়ার মানুষের এ ক্ষেত্রে প্রজাতিক ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ অভিন্ন। তা-ই লোকসাহিত্য আলোচনায় আজকাল 'মটিফ' বিন্যাস ও বিশ্লেষণ জরুরী বলে মনে করেন বিদ্বানরা ও সমাজবিজ্ঞানীরা। আমরা এ গ্রন্থে লোকসাহিত্য আলোচনা করব না, কেবল গাথার তথা পূর্ববঙ্গে সংগৃহীত গীতিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব—ভিন্ন প্রয়োজনে।

লোকসাহিত্যের জন্মের মতো মৃত্যুও রয়েছে। যা' লোকের চিন্তা-চেতনার ও অভিজ্ঞতার অনুগত নয়, তা সৃষ্টি হলেও টিকে থাকে না। এককথায় জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত, গভীর অনুভবসঞ্জাত কিংবা নিবিড় অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রবচন, আপ্তবাক্য, ধাঁধা, প্রবাদ, তত্ত্বকথা, বিশ্বাস-সংস্কার, ভয়-ভরসাই কেবল চিরায়ু বা দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকে। তবে কালে কালে জনে জনে ভাষা বদলায়, এমনকি ভাবেরও প্রসার কিংবা সংকোচন ঘটে। এ ক্ষেত্রে ডাকের ও খনার বচনের ভাষা ও ভাব পরিবর্তন কিংবা মৈথিলকবি বিদ্যাপতির বাঙলায় চালু পদাবলী স্মর্তব্য।

লোকরচনা বা লোকসাহিত্য মাত্রই আঞ্চলিক। কেননা অশিক্ষিত মানুষের ভাষা আঞ্চলিক বুলি-নির্ভর। তা অন্য অঞ্চলের মানুষের পক্ষে অবোধ্য দুর্বোধ্য বা অননুকরণীয় বলেই তার রূপ-রস-মাধুর্য অন্যদের আকৃষ্ট করে না। কাজেই লোকসাহিত্য চিরকালই অঞ্চলের সীমায় থাকে নিবদ্ধ। ময়মনসিংহগীতিকা কিংবা পূর্ববঙ্গগীতিকা সুসংস্কৃত ও পরিমার্জিত হয়ে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত না হলে বাঙলাদেশের সর্বজনীন ও উপভোগ্য সাহিত্য রূপে গৃহীত হত না এ লোকগাথাগুলো। বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাহিত্য হচ্ছে এ গাথাগীতিকাগুলো। কাম-প্রেম দুটোই শাস্ত্র ও সমাজ দ্রোহী বৃত্তি-প্রবৃত্তি। কাজেই এ হচ্ছে দ্রোহীমানুষের কাহিনী। এই গাথাগীতিকাগুলো আমাদের লোকমানসের ও লোকসমাজের অনন্য অতুল্য সৃষ্ট। প্রচলিত শাস্ত্র ও সমাজ নিয়ম ও নীতি, রীতি ও রেওয়াজ বহির্ভূত জীবন-জিজ্ঞাসার এবং প্রাণধর্মের প্রসূন এ সব ঘটনা ও চেতনা। শাস্ত্রচেতনা, সমাজভীতি ও প্রয়োজনবুদ্ধি উপেক্ষা করে সবকিছুর উপরে হৃদয়বৃত্তিকে—প্রাণের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া, হৃদয়ের মূল্য-মর্যাদাকে শাস্ত্রের ও সমাজের উপরে ঠাঁই দেয়া, পারত্রিক জীবনের গুরুত্ব অস্বীকার করে ঐহিক বাস্তবজীবনে ও প্রয়োজনে মূল্য ও মহিমা আরোপ, জীবনে মাটির ও মানুষের, কামের ও প্রেমের, নীতিবোধের ও আদর্শ চেতনার, ক্ষমার ও ত্যাগের, লোভের ও রিরংসার, দ্বেষের ও দ্বন্দ্বের, ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব ও বাস্তবতা এই লোকগাথাতেই প্রথম অসংকোচ অভিব্যক্তি পায়। সংস্কৃত কিংবা বাঙলা লিখিত সাহিত্যে এমনটি দেখা যায় না। সমাজ-শাস্ত্রকে তুচ্ছ জেনে এ গণমানবেরা উচ্চ করে তুলে ধরেছিল হৃদয়বৃত্তিকে। হৃদয়ানুভূতির উপর পীড়নই হচ্ছে নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। সে-নির্যাতনের ইতিকথাই হচ্ছে গীতিকাগুলো। লোকে বলে নারীরা রূপে কামে প্রেমে বিভ্রান্ত পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে, কিন্তু গীতিকায় দেখি পুরুষের হাতে নানাভাবে নির্যাতিতা ও বিড়ম্বিতা নারীর সারি।

এখানে নিস্তরঙ্গ ঘরোয়াজীবনে দেশ প্রচলিত পূর্বলব্ধ বা প্রিকনসিবড ধারণাবশে জীবনের করুণতম ট্র্যাজেডী ঘটে যায়—বাইরের কোন আলোড়ন বা সংঘাত ছাড়াই যেমনটি ঘটেছে দেওয়ান-মদিনায়। এখানে সৎ-সন্তান সম্বন্ধে বিমাতার শোনা আশঙ্কা আর দুলালের আকস্মিক আভিজাত্যচেতনাই ঘটাল জীবনে বিপর্যয়।

মহুয়া-নদেরচাঁদের জীবনের ট্র্যাজেডীর মূলে রয়েছে বর্ণ ও পেশা চেতনা আর রিরংসা। সর্বত্যাগী হয়েও সর্বশর্তে রাজি থেকেও প্রেমিক নদেরচাঁদের প্রেম ও প্রাণ মৃত্যুতে অবসিত। এমনি হৃদয়ঘটিত কাম-প্রেমের শিকার হয়ে কেউ হয়েছে বিবাগী, কেউ হারিয়েছে প্রাণ, কেউ হারিয়েছে সতীত্ব, কেউ পেয়েছে কেবলই দাহ, কেউ পেয়েছে অকারণ কলঙ্কের ডালি। সুখ পায়নি তেমন কেউ। সুখের ও সম্ভাবনার স্মৃতি-সম্বল জীবনে দহনজ্বালা ও যন্ত্রণাই হয়েছে সার। তাই আমরা লীলা-কাজলরেখা-চন্দ্রাবতী-আয়নাবিবি-মহুয়া-মলুয়া-ভেলুয়া-সখিনা-সোনাই প্রভৃতির কথা ভুলতে পারিনে।

সুখ-সাফল্যের চিত্র নয়, দুঃখ-যন্ত্রণা-ব্যর্থতার কথাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। একারণেই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ শিল্প, শ্রেষ্ঠ কাব্য ও শ্রেষ্ঠ নাটক ট্র্যাজেডী বা বেদনাজ্ঞাপক কিংবা বিয়োগান্ত—এ জন্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়ে শুনে মনে হয় শেষ হয়েও হল না শেষ, রেশ গুঞ্জন তোলে মনে মননে।

বহুমনের পরিচর্যায়, নানা রুচির মানুষের কালিক পরিমার্জনায় গাথাগুলোর ভাব-ভাষা-ভাষা-ভঙ্গির আর উপমাদি অলঙ্কারের উৎকর্ষ গাথাগুলোকে শিল্পসুন্দর সাহিত্য স্তরে উন্নীত করেছে।

এগুলো যেহেতু অকৃত্রিম ও আন্তরিক অনুভূতির ঋজু বাহিপ্রকাশ, সেহেতু এগুলোর আবেদন সংবেদনশীল মনের গভীরে ঠাঁই করে নেয়। প্রাত্যহিক জীবনেও যে-কোন মানুষের অকৃত্রিম অনুভূতি---কেবল মুখের ভাষায় নয়---চোখে-মুখেও অভিব্যক্তি পায় এবং তা শ্রোতার হৃদয়বেদ্য ও মর্মভেদী হয়। অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি-গায়ক-কথকদের এসব মৌখিক রচনাও অকৃত্রিম অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার প্রসূন বলেই তিন-চারশ' বছর ধরে লোকপ্রিয় হয়ে লোকচর্চায় টিকে থেকেছে। শাহ সুজা, দেওয়ান ফিরোজ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি যে সতেরো শতকের রচনা, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সমকালে না হলে ইতিহাস-বিরল সে-যুগে স্মৃতিমন্থন করে কেউ এ সব গাথা রচনা করতে পারত না। প্রত্যক্ষ জীবন ও প্রতিবেশ থেকে গৃহীত বলেই গাথায় ব্যবহৃত বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প এমন সুপ্রযুক্ত ও চমকপ্রদ, যা অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যেও দুর্লভ। যাদের কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ নেই, তারাও এসব বিশিষ্ট বাক্‌প্রতিমার প্রতি অবশ্যই আকৃষ্ট হবে এবং কবির শক্তি-সামর্থ্যে বিস্ময় মানবে। সাধারণ পাঠকের তো কথাই নেই, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গীতিকার তারিফ রোমাঁরোলাঁ থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি সবাই উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-উচ্চারিত প্রশংসা এরূপ ঃ 'মৈমনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে বেজে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সুর। মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে, তবুও তা বিশ্বেরই ফসল–তা ধানের মঞ্জরী।'---লোকসাহিত্য হয়েও এ বিশ্বজনের চিরমানবের সাহিত্য, চিরমানবের সম্পদ। কারণ মানুষের হৃদয়ের চিরকালের আর্তি এতে অভিব্যক্ত। গাথাগুলো একাধারে নারী-নির্যাতনের ও নারী-মহিমার প্রচারকাব্যও। উনিশ শতকের আগে নারীর প্রতি এত শ্রদ্ধা বা মমতা সুলভ ছিল না জীবনে কিংবা শাস্ত্রে ও সমাজে। এবার আমরা কিছু বাক্‌প্রতিমা কবিত্বময় সুভাষণ উদ্ধৃত করছি ঃ

পদ্ম ফুলেব মাঝে রে যেমন রসিক ভ্রমর/ আঁখির উপরে কন্যাররে খেচিছে কামান।/ সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি/ আন্ধাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা/ মুখেতে ফুইট্টা উঠে কনক চাঁপার ফুল। / লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর/ গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুইব্যা মর। /কোথা পাব কলসী কন্যা কোথা পাব দড়ি/ তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি।/ বিনা সূতে গাঁথ মালা আমার লাগিয়া/ সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।/ নদেরচাঁদ ও মহুয়া ঃ চান্দ সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।/ আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে/ তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জুনি যেমন জ্বলে।/ কৈতর কৈতরীর মত তারা দোনজন/ যৌবন জোয়ারের জল আইল দরিয়ায়।/সাপে চিনে মণি আর, বেঙে বাইরার পানি।/ কাউয়ার বাসাৎ কুকিলের ছান মানিল পোষ।/ যার সনে মজে মন বাদ বিচার নাই/ কোন জনে সুখ পায় দুধ বেচি মদ খাই।/ পানির সঙ্গে তেল মিশে না, চিনির সাথে নুন।/ জাঁউরা সাপের মত করে ফোঁস ফোঁস। খাজুরিয়া মাথার চুল দাঁড়ি মোচ লাম্বা/ হাত পা যেমন তার জারুল গাছের খাম্বা।/ বাঘের মতন থাবা যে তার সিংহের মতন গলা/ মৈষের মতন দৃষ্টি যে তার হাতীর মতন চলা।/ মায়ে কান্দে বুক কুটি চুল ফেলায় ছিড়ি।/ নাকের রক্তে ভাসে বৌয়ের বুকের কাঁচুলি। / মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল/ তার তাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল।/ তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ/ তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।/ তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন/ সকল থাক্যা বেশি মিঠা বিরহে মিলন।/ পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে।/ পুত্র আমার বাঁইচ্যা থাক লোহার কাঠি হৈয়া।/ ঋণচিন্তা রোগচিন্তা সংসারচিন্তা দড়/ যৈবন কালের পিরীত চিন্তা সকল চিন্তার বড়। /জলের যৈবন লৈয়া আষাঢ় মাস আইল।/ সাক্ষী হইও চান্দ সুরুজ দিবস রজনী/ গাঙের পাড়ের হিজল গাছ শুন আমার কথা/ গাঙের পাড়ের কেওয়া ফুল ফুইট্যা রইছ ডালে/ সাক্ষী

হইও নদীনালা আর পশুপাখী/ অভাগী সোনাইয়ে দিল কালবিধাতা ফাঁকি।/ সত্য কথার বায়ু সাক্ষী আর ত সাক্ষী নাই।/ দেখিতে যুবতীকন্যা পূর্ণিমার চান্দ।/ রূপেতে জিন্যািছে দেওয়ান রতির মদন।/ চান্দ যেন ভাস্যা যায় কংস নদীর পাকে। / কৈতরা কৈতরী যেমন মুখে মুখ দিয়া।/ বড় সুখ পাইল কন্যা কাননে আসিয়া। / মস্তক না রইল যদি কিবা কাম চুলে / বন্ধু যদি না মিলিল কি করিব কুলে।/ চিড়িং মাছের সালুন আর গিরিং চাইলের ভাত। /প্রথম যৈবন রূপ বাতাসে খেলায়।/ অন্নাভাবে কেহ বেচে স্ত্রী-পুত্র কেহ বেচে মাইয়া/ নিজের অন্তরের দুঃখ পরকে বুঝান দায়।/ মনের মধ্যে নানান কথা নানানভাবে উঠে/ সরা চাপা দিলেরে ভাত যে করে ফুটে।/ দেব পূজার ফুল তুমি/ তুমি গঙ্গার পানি/ আমি যদি ছুঁই কন্যা হৈবা পাতকিনী।/ স্নান কইরা মালিনী ফিরে চলে ঘরে/ ভিজা কাপড়ে সোনার যৈবন বাইয়া বাইয়া পড়ে।/ যে বৃক্ষের তলে যাই ছায়া পওনের আশে/ পত্র ছেদ্যা রৌদ্র লাগে দেখ কপাল দোষে।/ আশা গেল বাসা গেল আর কিসের লাগ্যা বাঁচিরে। শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি/ অঙ্গে নাহি ধরে রূপ চম্পকবরণী।/ সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্মফুল/ হাঁটিয়া যাইতে লীলার মাটিতে পড়ে চুল।/ চাচার চিকণ কেশ লীলার বাতাসেত উড়ে/ বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে।/ হাঁটিয়া যাইতে কন্যার যৌবন পড়ে ঢলি।/ ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে।/ সাধিলে না থাকে যৈবন যত্নে নাহি আইসে।/ সঙ্গীতে বনের পশু সে-ও বশ থাকে/ ভাটিয়াল গানেতে ঝরএ বৃক্ষের পাতা।/ তোমার লাইগা ছিকায় তোলা গামছাবান্ধা দৈ/ গামছা বান্ধা দৈ রে বন্ধু শালিধানের চিড়া/ তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থ্যাক্যা খাড়া।/ মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল।/ দুগ্ধ দিয়া কালসাপে করিনু পোষণ।/ বিষম চিন্তার কীট পশিল অন্তরে।/ তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া/ তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া।/ মুনির হইল মতিভ্রম হাতীর খসে পা/ ঘাটে আস্যা বিনা ঝড়ে ডুবে সাধুর না।/ বিনামেঘে হৈল যেন শিরে বজ্রঘাত।/ অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। গাথাগুলোতে চন্দ্রনাথ দে'ব ও দীনেশচন্দ্র সেনের পরিমার্জনার ছাপ পড়েছে, ওগুলো আর অকৃত্রিম লোকসাহিত্য নেই প্রভৃতি মত ও মন্তব্যের প্রতিবাদস্বরূপ সুন্দর কথাগুলো উদ্ধৃত হল। এসব গ্রামের কবি-কথক-গায়কের অনুভব ও অভিজ্ঞতার বাণীরূপ বলেই আমাদের ধারণা। এই গীতিগুলোর আর এক বৈশিষ্ট্য এগুলো হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র রচনা, এবং বিষয়ে ভাষায় ভঙ্গিতে শব্দপ্রয়োগে এবং একই ভাবে বিভিন্ন গাথায় প্রায় একই ভাষায় অভিব্যক্তির পৌণপুনিকতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে হৃদয়ের কথায় জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের ব্যবধান ঘুচে যায়। আর এমনি অবিকল অনুকৃতিও লোকসাহিত্যের লক্ষণ।

এ গাথাগীতিকাগুলো যে লোকরচনা-কোন কোন গাথায় রচয়িতার ভণিতা থাকাসত্ত্বেও তার প্রমাণ 'কঙ্ক ও লীলা' গাথাটি। এখানে চারজন কবি-কথক-গায়কের ভণিতা মেলে, এ চারজন হলেন নয়ানচাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বানিয়া, রঘুসুত ও দামোদর দাস। একটি গাথা চারজন রচনা করতেই পারেন না, কাজেই এঁরা গায়েন-কথক। লিপীকৃত গাথায় শ্রুতিধর লিপিকর আসবে যেমনটি শুনেছে, তেমনটি লিপিবদ্ধ করেছে অথবা গায়েন-কথকদের ব্যবহৃত পাতড়া থেকেই চন্দ্রকুমার দে ভণিতাসহ গাথার বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করেছিলেন। এ অনুমান সঙ্গত ও সত্য হলে মনসুর বয়াতি, নয়ানচাঁদ ঘোষ, দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি বিভিন্ন গাথারচয়িতা বলে স্বীকৃত হলেও আসলে তাঁরাও গায়ক-কথক। তাঁদের জনপ্রিয়তার দরুন আর স্বনামে ভণিতা প্রয়োগজাত বিভ্রান্তির ফলে কালক্রমে লোকে এ সব গাথা তাঁদের রচনা বলেই মনে রেখেছে।

আর একটি কথা, লোকসাহিত্য আমাদের ঐতিহ্য,—সম্পদ নয়। লোকসাহিত্য নিয়ে সগর্ব আস্ফালনেরও কোন যৌক্তিকতা নেই। আর আজকের এ মুহূর্ত অবধি লোকসাহিত্য সৃষ্টি করার ও চালু রাখার কৃত্রিম শহুরে প্রয়াস অনর্থক ও নিন্দনীয় বলেই পরিহার্য।

প্রথমত, 'লোক' অভিধাটি হচ্ছে অবজ্ঞাজ্ঞাপক। লোক মানে অশিক্ষিত, অমার্জিত অজ্ঞ, গ্রাম্য প্রাকৃত জন, মনুষ্যসুলভ কোন কৃত্রিম অনুশীলনে পরিশীলনে যার কোন মানস-উৎকর্ষ ঘটেনি,

প্রাণীর মতোই প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিক প্রতিবেশভিত্তিক যার জীবন। কাজেই 'ফোকলোর' মানে এই প্রাকৃত মানুষের প্রবৃত্তিচালিত এবং প্রায় অবচেতন জৈবপ্রেরণায় অর্জিত ব্যবহার, হাতিয়ার ও জীবিকা পদ্ধতির সামূহিক সম্বল ও সম্পদ, বিশ্বাস ও আচরণ, রীতি ও রেওয়াজ, নীতি ও নিয়ম। কাজেই 'ফোক, ফোকলোর, ফোকলিটারেচার—লোক, লোকঐতিহ্য, লোকসাহিত্য, লোকজীবন প্রভৃতি কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা রয়েইছে। এ অনেকটা অস্পৃশ্যদেরকে গান্ধীর হরিজন নাম দেয়ার মতো, এতে পূর্ণমানুষ হিসেবে অস্পৃশ্যরা স্বীকৃত নয়, নারায়ণের জীব হিসেবে অনুকম্পা যোগ্যমাত্র।

লোকজীবন, লোক-সংস্কার, লোক-মন, লোকমনন, লোকসৃষ্ট ও ব্যবহৃত ব্যবহারিক সামগ্রী, লোকমানসপ্রসূন সাহিত্য ও শিল্প সবকিছুই অশিক্ষিতপটুত্বের ও অসামর্থ্যের সাক্ষ্য। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সভ্যতায় অগ্রসর য়ুরোপে লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতি আজ অবসিত। আমাদের দেশ দারিদ্র্যদুষ্ট ও অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলে আজো আমাদের শতকরা আশিজন মানুষ লোকজীবন অতিক্রমণে অক্ষম। এটি মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন যে-কোন শহুরে শিক্ষিত মানুষের পক্ষে লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয়, কেননা এটি জাতীয় দৈন্যের ও জাতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার নিম্নমানের ও অপকর্ষের পরিচায়ক। আমাদের কাম্য হবে আরো রবীন্দ্রনাথ—আরো লালন সাঁই নয়।

লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক সবকিছুরই অবশ্য ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে সমাজ-বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদের কাছে। অতীত য়ুগের মানুষের জীবনযাত্রার রূপরেখার ও জীবন-জিজ্ঞাসার এবং সমাজ-বিবর্তনের ধারার সন্ধান পেতে হলে তথাকথিত লোকসমাজের বাহ্যবস্তুর ও মানসসম্পদের আলোচনা আবশ্যিক। কালিক ও স্থানিক বিচারে গোত্রগত বা জাতিগত উৎকর্ষ-অপকর্ষের তুলনামূলক বিশ্লেষণও বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আজকের দিনে শিক্ষিত শহুরে ধনী-মানীরা নিজেদের জন্যে গাড়ি বাড়ি ফোন ফ্যান ফ্রিজ ও হরেক রকম তার-বেতার যন্ত্র কামনা করছে যখন, এবং নিজেদের পরিচিত অতীত গোপন করতে আর য়ুরোপীয় আদলে জীবন রচনায় ও যাপনে যখন ব্যগ্র, তখন তার প্রতিবেশীর জন্যে চিরস্থির মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা কামনা করা—যাতে তারা শন-নাড়া-বেড়ার ঘরে বাস করে চিরকাল অজ্ঞ অনক্ষর থেকে জেলেনৃত্যে কৃষাণনৃত্যে সাপুড়েনৃত্যে হাপুতে গাজনে গম্ভীরায়-ঝুমুরে-ছইয়ে তুষ্ট থাকে এবং শহুরে লোকদেরকে উৎসবে পার্বণে যাতে অবজ্ঞার হাসি হাসাতে পারে—এক অমানবিক চেতনা বই কিছুই নয়। কাজেই লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি আজো যাদের কাম্য তারা মাটির ও মানুষের মিত্র নয়, দেশ-জাত-মানুষের প্রতি প্রীতিহীন এমন ব্যক্তি সুরুচির বা ভব্য মনের বিবেকবান মানুষও নয়।

বলেছি, আমাদের কাম্য আরো রবীন্দ্রনাথ, আরো লালন ফকির নয়। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে কোন দেশের ও কোন সমাজের মানুষের শ্রেয়োচেতনাপ্রসূত পরিস্রুত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভিব্যক্ত রূপই তার সংস্কৃতি, তার শ্রেষ্ঠ গুণের ও কর্মের প্রকাশই তার সংস্কৃতি। যেমন দারুকারুচারুশিল্প, সাহিত্য, চিত্রশিল্প, নৃত্য সংগীত প্রভৃতি সুকুমার-ললিতাদি চৌষট্টিকলায় এবং মনুষ্যপ্রীতি, সংযম ও সৌজন্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনা, ন্যায় ও শ্রেয়োবোধ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানস-সম্পদে অধিকারই হল সংস্কৃতি। ভব্যসমাজের সংস্কৃতি সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষের ব্যক্তিগত সাধনার ফল ও মনীষার অভিব্যক্তি বা প্রসূন। কিন্তু লোকসংস্কৃতি এ সংজ্ঞাভুক্ত নয়। কোন দেশের, কালের ও সমাজের প্রাকৃতজনের অর্জিত আচরণে, কৌশলে, নৈপুণ্যে এবং কর্মে ও আচরণে, বিশ্বাসে ও সংস্কারে প্রকাশিত প্রাত্যহিক জীবযাত্রাপদ্ধতির সামগ্রিক, সামুহিক ও সামষ্টিক রূপই বা জীবনাচারই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। এ তাৎপর্যে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে অনুকৃত ও অনুসৃত রীতিনিয়মের আবর্তিত গণরূপ।

লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি নয়—এ যুগের কাম্যসাহিত্য হচ্ছে গণসাহিত্য, এ যুগের কাম্যসঙ্গীত গণসঙ্গীত, এ যুগের কাম্য সংস্কৃতি হচ্ছে গণসংস্কৃতি আর এ যুগের কল্যাণতত্ত্ব হচ্ছে গণকল্যাণ। তাই এ যুগের রাজনীতিও হচ্ছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে গণআন্দোলন—গণবিপ্লব। লক্ষ্য হচ্ছে অবিশেষ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আর আত্মার স্বাধীন বিকাশ।

আরো একটি কথা, মধ্যযুগের লিখিত বাঙলাসাহিত্য, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব সত্ত্বেও উচুঁমানের ছিল না। মৌখিক লোকসাহিত্যে এবং ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কারখচিত শিল্পসম্মত লিখিত সাহিত্যে পার্থক্য ছিল সামান্য। সে-ব্যবধান মুখ্যত ছিল ভাষাগত, নইলে রসগত রুচিগত বুদ্ধিগত চিন্তাগত আদর্শগত ও লক্ষ্যগত তফাৎটা দুস্তর ছিল না, তাই মধ্যযুগের লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িকতার সুস্পষ্ট ছাপ থাকা সত্ত্বেও ছিল জনসাহিত্য— জনতার সাহিত্য অর্থাৎ সাক্ষর-নিরক্ষর কিংবা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে জনগণবোধগম্য ও বোধগত সাহিত্য। কাজেই উপভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হত না কেউ। এ তাৎপর্যে লোকসাহিত্য ছিল শিল্পসম্মত লিখিত সাহিত্যেরই অংশ। তখন সবটাই ছিল বাঙলার ও বাঙালীর সাহিত্য।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে কিংবা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য চর্চা থেকে অথবা সংবাদপত্র প্রচারকাল থেকেই নতুন শহুরে জীবন-চেতনা বাঙালীকে বৈত্তিক ও বৈষয়িক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো—সাহিত্যক্ষেত্রেও দ্বিধাবিভক্ত করে দিল—মানুষকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গ্রাম্য ও শহুরে, নতুন ও পুরোনো, ইংরেজি শিক্ষিত ও আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শিক্ষিত—দুই শ্রেণীতে চিহ্নিত করেনি শুধু, মধ্যখানে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর, অপরিচয়ের ব্যবধান ও অনাত্মীয়তার বাধাও করেছে চিরস্থায়ী। শিক্ষিত বাঙালীর আধুনিক সাহিত্যের শিল্পের সংস্কৃতির ও মননের বিচিত্র বিকাশ, প্রকাশ ও উৎকর্ষ কোটি কোটি স্বল্পশিক্ষিত ও অনক্ষর বাঙালীর কোন কাজে লাগেনি, করেনি তাদের কোন কল্যাণ, দেয়নি তাদের কোন আনন্দ, ছড়ায়নি তাদের মানসে কোন চিন্তার বীজ, মুক্ত করেনি তাদের চেতনার কোন দিগন্ত। অতএব শিক্ষিত বাঙালীর যা কিছু চিন্তা ও চেতনা, অভীষ্ট ও অন্বিষ্ট, কৃতি ও কীর্তি সবটাই শিক্ষিতশ্রেণীর প্রয়োজন ও স্বার্থ সম্পৃক্ত—গণমানবের অস্তিত্বই সেখানে অস্বীকৃত।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা

১. দুনিয়ার যে-কোন সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান রূপের আড়ালে রয়েছে প্রাণী হিসেবে আদি ও আদিম স্তরের বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-সংস্কারবিরহী মানুষেরা বেঁচে থাকার গরজে প্রায় অবচেতন প্রেরণায় আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের যে প্রয়াস চালাত তার লেশ ও রেশ, তাতে অবশ্যই ছিল না আত্মপ্রত্যয় কিংবা সাহস। তাই তারা তাদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার বাঞ্ছাবশে কল্পনা করত মিত্র ও অরি শক্তির অস্তিত্ব। তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতা। তাই মানুষের প্রাত্যহিক স্থূল জীবনের ক্বচিৎ মানস-চেতনার অবলম্বন হয়েছে জন্মের, মৃত্যুর, রোগের, শিকারের, শস্যের নিয়ন্তারূপ প্রাকৃতশক্তি তথা মিত্র ও অরি দেবতা। যেহেতু তোয়াজে-তোষামোদে শত্রু-মিত্র দেবতাকে বশে রেখেই বাঁচার সাধনা করেছে মানুষ, সেহেতু জীবন ও জীবিকা এবং জন্ম-মৃত্যু-রোগ সম্বন্ধীর যাবতীয় বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে পৃথিবীব্যাপী ভব্যবর্বর আরণ্য-শহুরে মানুষে মৌলিক মিল রয়েছে আজো। ভারত-মিশর-মেক্সিকো বা এশিয়া-য়ুরোপ-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকা কিংবা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, রেড ইণ্ডিয়ান, আর্য-অনার্য, প্রভৃতি দেশে বা মানুষে মিল রয়েছে দেব কল্পনার, পূজা-পার্বণের ও উদ্দেশের ক্ষেত্রে। যেমন শস্যদেবতা সবদেশেই ছিল বা আছে, তেমনি রোগের ও মৃত্যুর দেবতা, অরণ্যে আছে মৃগয়াদির বনদেবতা, বৃদ্ধির দেবতা ছিলই, আর ছিল সৃষ্টির দেবতা নানা নামে সূর্য, এবং টোটেম ট্যাবু যাদু ও সর্বপ্রাণবাদও এ সূত্রে স্মর্তব্য। সে-সবের লেশ ও রেশ কোন-না কোন আকারে বা আচারে রয়ে গেছে সভ্যতম সমাজেও। আমাদের একালের বাঙালীর ঘরোয়া ও সামাজিক নানা বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে ওঁরাও-মুণ্ডা-হো-সাঁওতাল-মঙ্গোল-ভেড্ডিড্-দ্রাবিড়ের অনুকৃতি, অনুসৃতি ও সাধারণ প্রভাব আজো দুর্লক্ষ্য নয়।

কিন্তু এখানে নৃতাত্ত্বিকের বা লোক-বিজ্ঞানীর কিংবা সমাজবিজ্ঞানীর মতো সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারার স্বরূপ বিশ্লেষণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্যে ও অন্যান্য সূত্রে পাওয়া তথ্যগুলো বিবৃত করাই আমাদের লক্ষ্য।

২. সেকালে সাধারণের কাছে ভবনের বাইরের ভুবন চিল অজ্ঞাত। স্বল্পচাহিদার অজ্ঞ মানুষের গ্রামীন জীবন ছিল স্বনির্ভরতার প্রতীক। কূয়োর মাছের মতো সংকীর্ণ পরিসরে তাদের ব্যবহারিক জীবন হত আবর্তিত। কল্পভ্রমণে মিটিয়ে নিত বিশাল পৃথিবীকে জানার কৌতূহল। তাই অলৌকিক অস্বাভাবিক ভৌতিক দৈবিক চেতনাই ছিল তাদের সম্বল। জীন-পরী-দেও-দৈত্য-রাক্ষস-পক্ষী-ভূত-প্রেত প্রভৃতি ছিল তাদের মানসজীবনের প্রতিবেশী। যাদু ও দৈবশক্তি ছিল তাদের ভয়-ভরসার হেতু ও অবলম্বন। শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার নিয়ন্ত্রিত জীবন ছিল নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। তাই চিন্তা-চেতনা ছিল স্থিতিশীল তথা গতিহীন ও অপরিবর্তিত। একারণেই কালিক ব্যবধানেও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের পার্থক্য ছিল প্রায় দুর্লক্ষ্য।

যাতায়াতের সুবিধে ছিল না বলে একই দেশে অভিন্ন শাস্ত্রীয় সমাজের মধ্যেও অঞ্চলভেদে সামাজিক সাংস্কারিক আচারিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকত প্রকট। তাই অভিন্নরূপে কোন দেশ-কাল প্রত্যক্ষ করা সহজে সম্ভব হত না। কাজেই প্রাচীন ও মধ্য যুগে সর্ববঙ্গীয় সামাজিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মনীতি ও রীতি-রেওয়াজ নিতান্ত শাস্ত্রীয় না হলে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যেত। এমনকি কোন কোন দেবতাও ছিলেন নিতান্ত আঞ্চলিক এবং সাম্প্রদায়িক। ধর্মঠাকুর বাসুলী চণ্ডী যক্ষ ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি স্মর্তব্য।

কাজেই আমাদের সংগৃহীত ও বিন্যস্ত সংস্কৃতিচিত্রও সার্বত্রিক ও সার্বজনিক নয়। তা ছাড়া শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক ও আর্থিক অবস্থান ভেদে জাত-বর্ণ ভেদ, আচার-আচরণ ভেদ তো ছিলই। তবু

জানবার বুঝবার সুবিধের জন্যে সামান্যীকরণেরও সাদৃশ সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছি—বিজ্ঞানসম্মত তথা যৌক্তিক না হলেও মানসসম্পদ হিসেবে এ চিত্রও বৃথা বা ব্যর্থ হবে না।

আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিশ্বের কোথাও বহুধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত কোন দেশেই অভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, নিয়মনীতি, রীতি-পদ্ধতি, খাদ্যসামগ্রী, এমন কি একইরূপ পোশাকও থাকে না সব সম্প্রদায়ের। মাস-বার-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন প্রভৃতির শুভাশুভ চেতনাও অভিন্ন নয় সবার। কাজেই বাঙলাদেশেও হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, নিয়মনীতি, রীতিপদ্ধতি, জীবনযাত্রার রূপ প্রভৃতির মধ্যে লঘুগুরু পার্থক্য রয়েইছে, তবু আমরা সামান্য লক্ষণ ধরেই আলোচনা করছি। কেননা আকাশ ও মাটি, ঝড় ও বৃষ্টি, রৌদ্র ও শৈত্য তো অভিন্ন, হাট-বাট-মাঠ-ঘাট তো অভিন্ন। তাই আমাদের উদ্দিষ্ট হচ্ছে প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত জীবনচিত্র।

৩. বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী ও বিভাষী শাসক মুসলিমের সামাজিক সাম্য ও মানুষের জীবনের আর কৃতির মূল্যবোধ নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুমনে যে-জীবনচেতনা এবং কর্মের ক্ষেত্রে যে-প্রসারিত দিগন্তের সম্ভাবনা জাগিয়ে দিল, তার ফলে হিন্দুসমাজে ভাঙন ধরে। এর প্রতিকার প্রয়াসে ভারতের দিকে দিকে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী উচ্চারিত হ'তে থাকে। রামানন্দ, কবীর, নানক, রামদাস, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব প্রমুখের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয়।

বাহ্যত ধর্মশাস্ত্রে ও ধর্মাচরণে অধিকার প্রাপ্তি, সামাজিক জীবনে মর্যাদা লাভ, এবং পেশার ক্ষেত্র প্রসারের প্রয়াসে এ ধর্মান্দোলন শুরু হলেও আসলে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ রক্ষার এবং ইসলামের প্রসার রোধের অবচেতন চেষ্টাই ছিল এর মূলে। অনতিকাল পরে দণ্ডধর মুসলিমশক্তির প্রসারে বাধা দানের কিংবা সম্ভব হ'লে মুসলিম বিতাড়নেব সচেতন প্রয়াস হিসেবেও এ প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব আন্দোলনে এ মনোভাবের আভাস আছে, আর শিখ সম্প্রদায়ে তা সক্রিয় প্রয়াসে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এসব ইতিহাসবেত্তা বিদ্বানের বিশ্লেষণ ও ভাষ্য। গণ-দৃষ্টিতে নতুন পরিবেশে অজ্ঞ মানুষের হৃদ-অরণ্যে যে-মূক জিজ্ঞাসা ও বোবা বেদনা গুমরে উঠেছিল, তা এসব সন্তদের বাণীর মাধ্যমেই দিশা পেল—পেল ভাষা। এ ক্ষেত্রে কবীর (১৩৮০–১৪৪০) ও নানকের (১৪৬৯–১৫৩৯) দানই সবচেয়ে বেশি। কবীরের বাণীতে ছিল দুই ধর্মের তাত্ত্বিক সমন্বয় ও দুই জাতির মানস ঐক্য বিধানেব ইঙ্গিত। এদিক দিয়ে গণ-মানবের 'দিল-কা বাত' যথার্থই অনুধাবন করেছেন তিনি এবং অভিব্যক্তি দিয়েছেন তাদের বদ্ধ বাসনার। দুই হৃদয়-সাগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মজমু-অল বাহরাইন ঘটানোর মহৎ কৃতিত্ব তাঁরই। এভাবে কবীর হৃদয়ক্ষেত্রে সমঝোতার, সহিষ্ণুতার ও মিলনের যে-বীজ বপণ করলেন, তা-ই পরবর্তীকালে সাধক নানকের সমাজসমন্বয় প্রয়াসে বিশেষ ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়। কবীর হৃদয়-অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করলেন, আর নানক সমাজ-জীবনে সমন্বয় ও ঐক্য সাধনের জন্যে যে-মিলন-ময়দান রচনা করলেন, তা শাসক-শাসিতের দ্বান্দ্বিক জীবনে অনেকখানি মাধুর্য ও লাবণ্য দান করেছিল। আর এসব সন্তের বাণীর, কৃতির ও আচরণের প্রভাব সর্বাত্মক এবং সর্বব্যাপী যে হয়েছিল, তার সাক্ষ্য পরবর্তী কালের ইতিহাস সগৌরবে বহন করছে। ষোল শতকে গোটা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাই এক অপরূপ স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রলেপে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়।

এসব নানা কারণে ষোলশতক ভারত-ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ শতক ভারতমনীষার পরিণতি ও পরিণামের কাল এবং সে-কারণেই অনন্য ও অসামান্য গৌরবের যুগ। য়ুরোপীয় বণিকেরা এ শতকেই এ দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। শাসক-শাসিতের মানস ও সাংস্কৃতির সম্পর্কও এই শতকেই ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়ভিত্তিক হয়। এ শতককে তাই রেনেসাঁসের যুগও বলা চলে। শতকের শেষার্ধ আকবরের শাসনকাল। তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি, ধর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে এক জাতি গড়ে তোলার ভিত রচনায় তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর শিক্ষাসংস্কার, তীর্থ ও জিজিয়া কর পরিহার, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমাজ-সম্মত বৈবাহিক সম্পর্ক প্রবর্তনে উৎসাহ দান, কৃষির উন্নতি ও কৃষকের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা, সতীদাহ নিবারণ প্রয়াসে কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি দেশে ও সমাজে নতুন

জীবনের ও জীবনবোধের সৃষ্টি করল। আকবরের অধিকার সারা ভারতব্যাপী ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁর উদারনীতি ও প্রবুদ্ধ জীবনের প্রভাব পড়েছিল ভারতের সর্বত্রই।

ধর্ম ও আচার সমন্বয় প্রয়াসে আকবর নিজে example is better than precept নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাজপুত-কন্যা বিয়ে করেছিলেন। তিনি সূর্য ও অগ্নি স্তব করতেন। শাবান চাঁদের পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাখিবন্ধন উৎসবের প্রবর্তনও করেন তিনি।[১] ইলাহি ধর্মের প্রবর্তকও তিনি। তাঁর পুত্র জাহাঁগীর দীপালি ও শিবরাত্রি উৎসব পালন করতেন। তিনি পিতৃশ্রাদ্ধও করেন সিকান্দ্রায়।[২]

ভারতে পৌত্তলিকতার প্রভাবে দেশজ মুসলিমসমাজে নানা বে-ইসলামী বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণ থেকে গিয়েছিল, তা বিদেশাগত সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারেও সংক্রমিত হয়। বিশেষ করে হিন্দুকন্যা বধূরূপে পরিবারে গৃহীত হ'লে বধূদের মাধ্যমে হিন্দুয়ানী আচার-সংস্কার মুসলিমঘরে প্রবিষ্ট হয়। মুঘলহেরেমও এর ব্যতিক্রম ছিল না। একারণে জাহাঁগীরের আমলে ভারতের কোথাও কোথাও মুসলিম সমাজেও সতীদাহ প্রথা চালু ছিল।[৩] দারাশিকোহও মজমু-অল-বাহরাইন রচনা করে সমন্বয়ের উপায় খুঁজেছেন। আকবর নারীশিক্ষায়ও ছিলেন উৎসাহী। ফতেপুর সিক্রীর মহলে তিনি একটি নারী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪] সতীদাহ নিবারণে আকবরের প্রয়াসের কথা আকবরনামায় পাই ঃ "But since the country had come under the rule of his Gracious Majesty (Akbar) ; inspectors had been appointed in every city and district, who were to watch carefully over these two cases : To discriminate between them and to prevent any women being forcibly burnt." বার্নিয়ারের চিঠিতেও এর উল্লেখ রয়েছে।[৫]

৪. এবার বাঙলা দেশের কথা বলি। বিজয়ী বিজাতি, বিধর্মী ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এদেশের হিন্দুসমাজেও নানা পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্বানেরা বলেন দাক্ষিণাত্যের শঙ্কর, ভাস্কর, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ এবং উত্তর ভারতের রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, রামদাস, চৈতন্য প্রমুখের বৈষম্যবিহীন মানবতাবোধ ও ধর্মতত্ত্ব ইসলামের প্রভাবপ্রসূত।[৬]

মুসলিম সংস্পর্শে আসার পর উত্তরভারতের মতো বাঙলার হিন্দুসমাজেও ভাঙন ধরে। মুসলিম সমাজের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা এবং কর্মসূত্রে ভাগ্য পরিবর্তনের অবাধ সুযোগ (এসব বৌদ্ধসমাজেও কিছুটা ছিল, কিন্তু তা তখনও বিস্মৃত অতীতের কল্পচিত্র মাত্র) প্রভৃতি দেখে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমন বিচলিত হয়ে ওঠে। বাঙলায় ও বিহারে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামের প্রচ্ছায় জীবনের নতুন দিগন্ত দেখতে পেল। ধর্মান্তর যখন ব্যাপকহারে শুরু হল, তখন স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, শূলপাণি, বৃহস্পতি প্রমুখ শাস্ত্রবিদ হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের সংস্কার সাধন করে হিন্দুসমাজকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করতে প্রয়াস পেলেন। নুলু পঞ্চানন 'গোষ্ঠী কথা' রচনা করে বর্ণবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ়ভিত্তিক করার প্রয়াসী হলেন। জাতিমালা কাছারী নামে এক পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেও জনগণকে সমাজশাসনে রাখবার চেষ্টা করা হয়।[৭]

এতো করেও যখন ভাঙন রোধ করা সম্ভব হল না, তখন বিশ্বম্ভর মিশ্র উত্তর ভারতিক সন্তধর্মের অনুসরণে এবং সূফীমতের অনুকরণে রাধা-কৃষ্ণ রূপকে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। এতে ইসলামের প্রসার রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। যে-সব সুযোগ-সুবিধার লোভে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ জেগেছিল, সেগুলোর সব কয়টিই চৈতন্যপ্রবর্তিত সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবেই স্বীকৃতি পেল।

সামা [কীর্তন] যিকর [নামজপ], হাল [দশা] দারিদ্র্য, বিনয়, আর্তের সেবা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা বর্ণহীন সমাজ, তালাক, নারীর পুনর্বিবাহ প্রভৃতি বাহ্য আচার-আচরণেও সুফী বৈষ্ণবে মিল অনেক। তাছাড়া গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, মদ্যপান, নর ও পশু বলি, সতীদাহ প্রভৃতি সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্যপ্রথা আর সংস্কারও মুসলিম প্রভাবেই বর্জিত হয়।[৮]

চৈতন্যচরিতামৃতে[৯] পীর ও কাজীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের শাস্ত্রীয় বিতর্কের বিবরণ রয়েছে এবং তাঁর শিক্ষাষ্টক মন্ত্রেও রয়েছে সূফীপ্রভাব। এতে মনে হয় ইসলাম তথা সূফীতত্ত্বে চৈতন্যদেবের অধিকার ছিল। এভাবে হিন্দুর ধর্মজীবনে, দৃঢ়মূল হয় মুসলিম প্রভাব।

আবার, এক জায়গায় প্রভাব পারস্পরিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সাধারণের তো কথাই নেই, এমনকি বাঙলার নওয়াবও হিন্দুয়ানীপ্রভাব এড়াতে পারেননি। নওয়াব আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহমতজঙ্গ ও সৌলতজঙ্গ মোতিঝিলে, সিরাজদ্দৌলা মনসুরগঞ্জে এবং মীরজাফর গঙ্গাতীরে হোলি-উৎসব পালন করতেন।[১০] মীরজাফর মৃত্যুশয্যায় কিরীটেশ্বরীর পাদোদকও পান করেছিলেন।[১১]

সাহিত্যে মুসলমানেরা রামায়ণ-মহাভারতের ও মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে হিন্দু পুরাণের বহুল ব্যবহার করেছেন—কাহিনী নির্মাণে ও উপমাদি প্রয়োগে। আর বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্রের ও বেদান্তের প্রভাব পড়েছে সূফী বাউলের সাধনায়।[১২]

সত্যপীর, বড়খাঁগাজী, কালুগাজী, বনবিবি, ওলাবিবি, উদ্ধারবিবি প্রভৃতি লৌকিক পীর দেবতার প্রভাবও পড়েছে নিম্নবঙ্গের মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বেশি। আবদুল গফুরের গাজীনামায় গঙ্গা, দুর্গা, পদ্মা, শিব প্রভৃতি গাজীর আত্মীয় বলে বর্ণিত।[১৩] De Tassy-র মতে হিন্দুর দেবপূজায় আর মুসলানের পীর ও দরগাহ পূজায় কোনো পার্থক্য নেই।[১৪] সম্ভবত দেবপূজার সংস্কারবশেই পীরপূজাকে অবলম্বন করে পার্থিব জীবনের স্বস্তি খুঁজেছেন মুসলিমরা।[১৫]

যবনসম্পর্কদোষে হিন্দুসমাজে লোক একেবারে পতিত হত না। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে পাই এক পাঁতি ঃ বল করি জাতি লএত যবনে/ছয়গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে/প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে।' দেবীবর ঘটক প্রভৃতিও যবনস্পর্শদুষ্ট হিন্দুকে স্বসমাজে রাখার জন্যে নানা ব্যবস্থা রেখেছেন।

আর একথা না বললেও চলে যে, কারো সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র থাকে না। কেননা ধর্ম কেবল মানস-জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির উপকরণ নয়, ব্যবহারিক বিধিও তথা জীবনের আচার-আচরণ বিধিও। ধর্ম যদি বিদেশী হয়, তা হলে ধর্মসূত্রে পাওয়া সংস্কৃতিও বিদেশী। আবার শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব থেকেও নিষ্কৃতি নেই। শাসক যদি বিদেশী ও বিজাতি হয়, তা হলে বিদেশী-বিজাতি সংস্কৃতিরও মিশ্রণ ঘটে। তা ছাড়া যেখানেই নতুন ভাব-ভাবনা, কিংবা প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য বা বিলাসে প্রয়োজন তেমন কোনো সামগ্রী আবিষ্কৃত কিংবা তৈরি হয়, তাও গ্রহণ না করে পারা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানিক সংস্কৃতি লুপ্ত হয় না, কেবল জটিলতা ও রূপান্তর লাভ করে মাত্র। স্থানিক আবহাওয়া, খাদ্যবস্তু, প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় উপকরণাদির প্রাচুর্য ও বিরলতা, উপযোগ প্রভৃতিই স্থানিক সংস্কৃতি বর্জন বা বিস্মৃতির বড় বাধা। যেমন বাঙালী ভাত, মাছ, শাক, পিঠা, গুড়, বাঁশ, বেত ত্যাগ করতে পারে না। যেখানে বছরে নয়মাস ভূমি জলসিক্ত থাকে, সেখানে লুঙ্গি, ধুতি, শাড়ি পরিহার করা অসম্ভব। গ্রীষ্মে দেহ যে-দেশে ঘর্মাক্ত হয়, সেখানে জামা গায়ে রাখা দুঃসাধ্য।

বৃত্তিগত শ্রেনীবিদ্যাস

যন্ত্রযুগের আগে সমাজে ব্যবহারিক দ্রব্য ও বিলাস-সামগ্রী তৈরি হত মানুষের হাতে। তখন এক এক প্রকার বস্তু তৈরির জন্যে এক এক শ্রেণীর লোক থাকত, তারা গোত্রীয় পেশা হিসেবে পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি ধরে থাকত। ফলে সমাজে কৃষিকার্য থেকে কারু-দারু ও চারু শিল্প অবধি সব কাজের জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী ছিল। কামার, কুমার, ছুতার, নাপিত, তাঁতী, ধোপা, মোল্লা, পুরুত প্রভৃতি সবাইকে নিয়েই দেশ ও সমাজ। এ-ব্যাপারে ভারতবর্ষে কালিক বা স্থানিক পার্থক্য বিশেষ ছিল না। তা হিন্দুসমাজে ধন ও বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল আর অন্য সমাজে করেছে কেবল ধন ও মান বৈষম্য। হিন্দু সমাজের বৃত্তিজীবীদের পেশা বদলালেও সমাজকাঠামো বর্ণবৈষম্যের দরুন অবিকৃতই আছে। মুকুন্দরাম দেশজ মুসলমান বৃত্তিজীবী সমাজের একটি বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা
তাঁসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি
পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারী।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারী
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
বানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকার
জীবন উপায় তার পাইয়া তাঁতি ঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগবে
তীবকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।
কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি
বসন রাঙ্গাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম,
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।

এমনি লবণনির্মাতা মুলুঙ্গি, পান উৎপাদক বারুই, পালকী-বাহক কাহার। অবশ্য কাঞ্চনে কৌলিন্য অর্জনের সুযোগ সবসমাজেই সবসময়েই ছিল। অতএব সমাজে আসল বৈষম্য ছিল ধনী-নির্ধনে, আতরাফে-আশরাফে বা অভিজাত-অনভিজাতে এবং সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৃত্তি ও বংশভেদে কেউ ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়, কেউবা শ্রদ্ধেয় ও মান্য ছিল। মুকুন্দরাম ইজারপরা বিদেশাগত মুসলিমসমাজের একটি স্থূল অথচ আদর্শায়িত চিত্রও দিয়েছেন ঃ

ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটি পাঁচ বেরি করএ নামাজ
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগাম্বরে পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে অনুদিন কিতাব কোরান
সাঁজে ঢালা দেই হাটে পীরের শিরনী বাঁটে সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।
বড়ই দানিশমন্দ কাহাকে না করে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি
ধরএ কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে ইজার পরএ দড় করি
যার দেখে খালি মাথা তা মনে না কহে কথা সারিয়া চেলার মার বাড়ি।

ক. ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন বিনি ধনে হয় যথ কুলীন মলিন।
খ. নির্ধন হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে, ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক।
গ. কৃতী ও কীর্তিমান পুরুষ সে-ই, যে 'দোলাঘোড়া চড়ে, আর দশবিশ জন যার আগেপাছে নড়ে।'

আসলে সমাজে বেনামাজী, চোর, ডাকু, লম্পট, মিথ্যাবাদী, জুয়ারী প্রভৃতি সবই ছিল। সৈয়দ সুলতানের শিষ্য কবি মুহম্মদ খান তাঁর 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদে', পাপমতি মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন, সৈয়দ সুলতান ইব্লিসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পাপকর্মাদি দেখিয়েছেন, আলাউল 'তোহফা'য় পাপকর্মের কথা বলেছেন। সমাজে তাঁদের বর্ণিত পাপকর্ম ও খল চরিত্র বিরল ছিল না, নইলে নসিহাতের প্রয়োজন থাকত না।

হিন্দু সমাজে বৃত্তিনির্ভর শ্রেণীর নাম আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় নিম্নরূপ ঃ

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখ বেদ অধ্যয়ন
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন।
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘন্টারব
শিব পূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ।
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারী।
গোয়ালা তাম্বুলী তিলি তাঁতি মালাকার
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক
যুগী চাষা ধোপা চাষী কৈবর্ত অনেক।
সেকরা ছুতার সুরী ধোপা জেলে গুড়ী

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তেয়র
কেলি কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী।
বাইজী পটুয়া 'কান কসবী যতেক
ভাবক ভক্তিরা ভাঁড় নর্তক অনেক।

[বিদ্যাসুন্দর(অন্নদামঙ্গল) পুরবর্ণন]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মান

১. শিক্ষা

মনে রাখতে হবে শিক্ষায় দাস শ্রেণীর এবং নিম্নবর্ণের বৃত্তিজীবীর অধিকারই ছিল না। এদের শিক্ষায় অধিকারজাত ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি বলেই পরে মুঘল আমলে ও ইংরেজ আমলে অধিকার ও সুযোগ পেয়েও তারা ঐতিহ্যের অভাবে লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়নি।

বিদ্যাচর্চা সভ্যতার ভিত্তি এবং সভ্য সমাজের মৌল কর্তব্যের একটি। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী দেশজয়ের পরেই লখণোতীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। N.N.Law তাঁর 'Promotion of Learning during Muhammadan Rule' গ্রন্থে বলেছেন ঃ The Muhammadan invasions of India marked the beginnings of momentous changes not only in the social and political spheres but also in the domain of education and learning (p, xiv). সুফী-দরবেশ ও আলীমের খানকা, মসজিদ, এতিমখানা, লঙ্গরখানা প্রভৃতির সঙ্গে মক্তব মাদ্রাসাও স্থাপন করতেন, ব্রাহ্মণদেরও সন্তানদের শাস্ত্র শেখানো পেশার জন্যে অপরিহার্য ছিল। তাই টোলে ও মক্তব মাদ্রাসাতে সাধারণত শাস্ত্রশিক্ষায় নজর ছিল বেশি। কায়স্থবৃত্তির জন্যে অবশ্য দরবারী ভাষা, গণিত তথা Knowledge of three R's—ও অবহেলা পায়নি। আকবরের শিক্ষাসংস্কারে দেখতে পাই 'His Majesty orders that every schoolboy should first learn to write the letters of the alphabet and also to trace there several forms. He ought to learn the shape and name of each letter, which may be done in two days. when the boy should proceed to write the joint letters. The boys should learn some prose and poetry by heart—Care is to be taken that he learns to understand everything himeslf, but the teacher may assist him a little.....The teacher ought especially to look after five things: knowledge of the letter, meaning of words, the hemistich, the verse, the former lesson.... Every boy ought to read books on morals, arithmetic,the notation peculiar to arithmetic, agriculture, mensuration. geometry, astronomy, physiognomy, household matters, the rules of Government, medicine, logic, the Tabii, riyazi, itahi sciences and history, all of which may be gradually acquired. এই পদ্ধতি shed a new light on schools and cast a bright lustre over Madrasahs,"

আবার, হিন্দুদেরও শাস্ত্র আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা। তা যখন তুর্কি বিজয়ের পর ভেঙে গেল, তখন নবদ্বীপই হলো ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার এবং বিদ্যার্জনের কেন্দ্র। নব্যন্যায়, স্মৃতির নতুন ভাষ্য ও গৌড়ীয় নববৈষ্ণবমত এখানেই সৃষ্টি হয়। নবদ্বীপের বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা হিন্দুজাতির রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের স্বপ্নও দেখতেন। তারই অভিব্যক্তি পাই 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে' উক্তিতে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার এবং পড়ুয়ার আধিক্যের কথা শুনি ঃ

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে ....
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।.....
সভে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব ধরে
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।

বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে। চট্টগ্রাম নিবাসীও[১৬] অনেক তথায়
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় পঢ়েন বৈষ্ণব সব রহেন তথায়।[১৭]

এর আগে বৌদ্ধযুগে বাঙালীর বিদ্যার্চ্চার কেন্দ্র ছিল নালন্দা, উডিডয়ানা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি। কাজেই বাঙলার সংস্কৃতির উৎস ও আদর্শ উত্তর ভারতই। দেশে- দেশান্তরে পণ্ডিতরা তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপে সম্মানিত ও প্রখ্যাত হতেন। আর ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশে শ্রুতিস্মৃতির মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। উপকথা ইতিকথা কিংবদন্তী রূপকথা ছাড়াও ডাক-খনার বচন, আপ্তবাক্য, চাণক্যশ্লোক, সাদীর বয়েত, প্রবাদ, প্রবচন এবং কথকতা, গায়েনের আসর ও মৌলবীর ওয়াজ প্রভৃতি ছিল লোকশিক্ষার বাহন বা মাধ্যম।

বর্ণে-বিন্যস্ত হিন্দু সমাজে শাস্ত্রীয় আচার পালনের জন্যেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যার বিভিন্ন শাখার ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত না থেকেই পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তিই হচ্ছে যজন-যাজন। কাজেই পেশার খাতিরেই তাদের বিদ্যার্জনের প্রয়োজন ছিল, তাই বলে ব্রাহ্মণমাত্রই শিক্ষিত ছিল না, আবার শূদ্রাদির শাস্ত্রেও শিক্ষায় (কেননা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য অস্পৃশ্যকে পাঠদানে সম্মত ছিলেন না) অধিকার ছিল না বলে সমাজের বহু লোক পুরুষানুক্রমে অশিক্ষিত থাকত। বর্ণহিন্দুদেরও শাস্ত্রশিক্ষায় অবাধ অধিকার ছিল না।

কাজেই তাদের কাছারীতে কাজ পাবার মতো সাধারণ বিদ্যা অর্জনের (কাঠাকালি বিঘাকালি সুদ ও মণ কষা পর্ণাকিয়া প্রভৃতি) দিকেই লক্ষ্য থাকার কথা। তুর্কীবিজয়ের পরে ব্রাহ্মণ-ভীতিমুক্ত হাড়ি ডোম বাগদী কৈবর্ত প্রভৃতি অস্পৃশ্য বর্ণের লোকদেরও কেউ কেউ কিছু কিছু লেখাপড়া শেখে। দেশী মুসলিমরাও সংস্কৃত শিখত। বিশেষ করে কবিদের পক্ষে এভাবেই সম্ভব হয়েছে মুসলিম রচিত বাঙলাসাহিত্যে উপমাদি অলঙ্কার হিন্দুর রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদি থেকে নেয়া। বৌদ্ধদের মধ্যে কিছু ভিক্ষু বিশেষ করে শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে আগ্রহ রাখতেন চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম পড়ুয়ার পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন।[১৮] দেশের বিভিন্ন স্থানে টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল মাদ্রাসা ছিল উচ্চবিত্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং মসজিদে মসজিদে ছিল মক্তব। বখতিয়ার খিলজী দেশজয়ের পরেই লখনোতীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৯] সে আদর্শ অনুসৃত কিংবা সে-প্রচেষ্টা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অনুকৃত হবে এ-ই স্বাভাবিক। পরোক্ষসূত্রে বাঙলাদেশের মুসলিম শিক্ষাসম্পর্কিত যে চিত্র পাই, তাতে এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। বিপ্রদাস পিপিলাই বলেন—মুসলমানেরা 'শিখাএ নামাজ ওজু সদাই মক্তব রুজু', মুকুন্দরাম বলেন 'যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান মখদুম পড়াএ পঠন।'

আঠারো শতকের 'শমসের গাজীনামা'য় আছে শমসের গাজী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আরবি, ফারসি ও বাঙলা পড়ানো হতো।[২০] দয়াময়ের 'সারদামঙ্গলে' পাই ঃ

চারি শাস্ত্রে সমুদয় পড়াবে সকল, নাগরি ফারসি কিম্বা বাঙ্গালা উৎকল।

সেকালে বাঙলা বিহার উড়িষ্যা নিয়েই গঠিত ছিল সুবাহ বাঙলা। তাই চাকরী পাবার জন্যে বাঙলা, উড়িয়া, নাগরী (হিন্দুস্তানী) ফারসি-এ চার ভাষা জানতে হত। ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসুর (১৭১৪খ্রী) পিতামহী তাঁকে 'বাঙ্গালা পারসী, উড়্যা পড়াল্যা নাগরী।' অপর কবি প্রভুরাম (১৭৪২-৩৩ খ্রীঃ) বলেন ঃ

কাছেতে কায়স্থ কত করে লেখাপড়া বাঙ্গালা পড়ায়ে উড়্যা নাগরি সুন্দর
বাঙ্গালা সভার শোভে কাগজের গড়া। লেখায় উত্তম সব যার যে দপ্তর।

চীনা দুতের দোভাষী মাহুয়ান (১৫ শতক), বলেছেনঃ The language of the people is Bengli, Persian is also spoken here[২১] সৈয়দ সুলতানের 'লস্করের পুরখানি আলিম বসতি' উক্তিতে শাসনকেন্দ্রে বিদ্যার বহুল চর্চার আভাস মেলে। দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে পুত্রের শিক্ষা ব্যাপারে আধুনিক পিতার উদ্বেগই লক্ষ্য করি ঃ

সদায় অনেক শ্রধা জনক মনএ ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈতে তনএ। বিদ্যা সে গলের হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার।

চোয়াড়িতে লায়লী-মজনু প্রভৃতি বালক-বালিকার বিদ্যাভ্যসের বর্ণনায় গাঁয়ের অধিকাংশের ছেলেমেয়ে যে পাঠশালায় পড়তো, তার আভাস আছে। মনোহর রচিত শমশেরগাজীনামায় দেখি ঃ

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজিপালে সে সকল অন্নবস্ত্র দিয়া।
সুন্দিপের অন্ধ এক হাফেজ আনিয়া
কোরান পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলবি আনিল
আরবি এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
জুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী।
ঢাকা হৈতে মুনসী আনি পারসি পড়ায়
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখায়।
দিন মধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি দুভাবে পড়িতে
ভোর রাত্রি চারিদণ্ড আগাজে প্রহর।
পাঠের সময় করি দিল গাজিবর।

এতে আঠারো শতকে শিক্ষকের তথা শিক্ষিত লোকের দুর্লভতার সাক্ষ্যও রয়েছে।

আলাউলের তোহফায় 'এলম' এর মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষাদান সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশের প্রতিধ্বনি শুনি ঃ

গুরুএ শিশুরে যদি বিসমিল্লাহ পড়াএ
গুরু মাতাপিতা শিশু বিহিস্তেত যাএ।
হাজার আবিদ নহে আলিম সমান.....
কহিছে পয়গম্বরে হাদিসে খবর
সপ্তদিন আলিমের সেবে যেই নর।
করিলে প্রভুর সেবা হাজার বৎসর
হাজার শহীদ পুণ্য পায় সেই নর।

কাজেই হিন্দুটোল, বৌদ্ধবিহার এবং মাদ্রাসা কম থাকার কথা নয়। তবে সে যুগে লেখাপড়ার বহুল চর্চা কোথাও ছিল না। বিদ্যালয়েও ছাত্রমাত্রেরই বিদ্যা অর্জিত হয় না। আর মক্তব টোল থাকলেই সবাই সন্তানকে শিক্ষা দানে আগ্রহী হয়, তাও নয়। কোনো রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা না থাকলে লেখাপড়ার মূল্য ও মর্ম বুঝে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না সবাই। আজকের দিনেও তা দুর্লভ। পণ্ডিতের ও পাণ্ডিত্যের কদর ছিল রাজদরবারে। বিদ্বানেরা রাজদরবারে ঠাঁই পেতেন, পেতেন খেতাব ও খেলাত।

নারীশিক্ষাও সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। সম্রাট আকবর তাঁর ফতেপুরসিক্রীর মহলে নারীশিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[২২] মালোয়া-রাজ গিয়াসুদ্দীনের ১৫,০০০ হেরেমবাসিনীর মধ্যে শিক্ষিকাও ছিল।[২৩] মুঘল শাহজাদীদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। এদেশে মেয়েদের শিক্ষাদানের প্রথা সুপ্রাচীন।[২৪] লীলাবতী প্রভৃতির নাম এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। বাঙলাদেশেও মহিলা কবিদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মক্তবে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও প্রাথমিক শিক্ষাদানের (অন্তত কোরআন পাঠ শিক্ষা) প্রথা ইসলামের সমকালীন। নারীশিক্ষা যে ছিল তার প্রমাণ কবি চন্দ্রাবতী, কবি রহিমুন্নিসা ও হীরামনি বা হরিবরের ঝি প্রভৃতি।[২৫] এঁরা সাধারণ পরিবারের মহিলা। সৈয়দ সুলতানের নবীবংশে পাই বিদুষী ষোশী কন্যার কথা ঃ সে নারী পণ্ডিত ছিল যথ মর্ম বুঝি পাইল।

বিদুষী ষোশীকন্যার বর্ণনা রয়েছে দোনাগাজীর সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল কাব্যেও। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখি লহনার খুল্লনার ও লীলাবতীর পত্রলেখার মতো বিদ্যা ছিল। বাস্তবেও কবি চন্দ্রাবতীকে হরিবরের ঝিকে আঠারো শতকের রানী ভবানীকে প্রিয়ম্বদাদেবীকে আনন্দদেবীকে বৈজয়ন্তীদেবীকে এবং হটু (রূপমঞ্জরী) বিদ্যালঙ্কারকে সংস্কৃতজ্ঞ বিদুষীরূপে পাই। গোবিন্দচন্দ্রের গানে ময়নামতীর মুখে শুনি ঃ 'পাঠশালে পড়ি আমি যাই নিকেতন'।

শিক্ষা বলতে সে যুগে ধর্ম শিক্ষা দানই মুখ্য ছিল বলে[২৬] ব্রাহ্মণের ও অব্রাহ্মণের, হিন্দুর ও মুসলমানের বিদ্যালয় পৃথক ছিল। সাধারণত পণ্ডিতের ঘরে টোল, আলিমের ঘরে বা মসজিদে মক্তব থাকত।[২৭] পাড়ার ছেলেমেয়েরা পণ্ডিত আলিমের বাড়ী গিয়ে গিয়ে পড়ত।[২৮] শিক্ষার্থীরা সামান্য দক্ষিণা বা নজরানা দিত। তাও অনেকে সময়ে কড়িতে নয়, ফসল তোলার মৌসুমে শস্যের

বার্ষিক বরাদ্দে। আবার কোনো কোনো মসজিদেও সকালে মক্তব বসত।[২৯] কোথাও কোথাও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ধনী বা জমিদার গুরুকে, উস্তাদকে বা পণ্ডিতকে, মৌলবীকে সামান্য বৃত্তিদান করতেন। ভূমিদান রীতিও চালু ছিল।[৩০]

যারা টোলে মাদ্রাসায় শাস্ত্রীয় শিক্ষা গ্রহণ করত না, তাদের জন্যে আলাদা পাঠশালা বা চতুষ্পাঠী ছিল। এরূপ বিদ্যালয়ে সাধারণত ব্রাহ্মণেতর বর্ণহিন্দু সন্তানই পড়ত। এগুলোও পণ্ডিত বা উস্তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হত। তবে গাঁয়ের লোক সহযোগিতা করত। কোথাও কোথাও বিত্তবান লোকের অর্থসাহায্যে উচ্চ শিক্ষার টোল ও মাদ্রাসা স্থাপিত হত। সে-সব বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষক থাকতেন।

তবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ই ছিল বেশি।[৩১] আমরা চৈতন্যভাগবতে দেখতে পাই, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা নিজেদের ঘরে ঘরেই টোল খুলেছিলেন। মুসলিম ঐতিহ্য-সূত্রে শুনি, শেখ, আলিম, খোন্দকার ও সূফীরা নিজেদের ঘরে বসেই পাঁচ দশজন ছাত্র পড়াতেন। তাঁরা একাধারে ছাত্রের পোষক, উস্তাদ এবং পীর মুর্শীদ ছিলেন।[৩২]

শিক্ষকের মর্যাদা

সেকালে ধর্মীয় বিধিসূত্রেই গুরু-উস্তাদের অতুলনীয় মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তার রেশ আজো অনুভূত হয় স্কুলে-কলেজে। পণ্ডিত মৌলবী মুন্‌শী উস্তাদ মোল্লা খোন্দকার গাঁয়ের উৎসবে-পার্বণে ও বিবাহে শাস্ত্রীয় অংশ সম্পন্ন করতেন। মুরগী জবেহ, ফাতেহা পাঠ, জানাজার ইমামতি, মসজিদে মুয়াজ্জিনের ও ইমামের কাজ করতেন। তাঁদের ভূমিকা কবির ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

মোল্লা পড়ায়া নিকা	দান পায় শিকা শিকা	দোয়া করে কলেমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরি	কুকুড়া জবাই করি	দশগণ্ডা দান পায় কড়ি
বকরি জবাই যথা	মোল্লারে দেই মাথা	দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।[৩৩]

হিন্দু পণ্ডিতও পৌরোহিত্য, পাঁতিদান, কোষ্ঠীতৈরি, ভাগ্যগণনা ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় অংশ সম্পন্ন করতেন।

ছাত্র-শাসন পদ্ধতি

সে-যুগে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বালক-কিশোর শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। ছাত্ররা শিক্ষকের চোখে ছিল গরু-গাধারও অধম। শিক্ষাদানের জন্যে লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ তাঁরা অপরিহার্য মনে করতেন। সে-শাস্তি ছিল প্রায় অমানুষিক। তার জের বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ছিল। শাস্তির নামও বিচিত্র ঃ নাড়ুগোপাল (হাত-পা জড়ো করে রাখা, অনেকটা Kneeldown-এর মতো), কপাল চিড়া (ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল কেটে বা ফুটো করে রক্ত ঝরানো), সূর্যমুখ (প্রখর সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা) প্রভৃতি। আবার বিছুটি পিঁপড়ে প্রভৃতি গায়ে লাগিয়ে দেয়া হত।[৩৪] দয়াময়ের 'সারদামঙ্গলে' আছে ঃ

শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে	কভু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।	উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয়।[৩৫]

লেখাপড়ার উপকরণ

ক. কলম

সেকালে বালক-বালিকার লেখনী ছিল কঞ্চির তৈরি। আর বয়স্কদের কলম হত হাঁসের, শকুনের ও ময়ূরের পালকের। পালকের কলমেও শিল্পসৌন্দর্য কম থাকত না।

খ. কালি কালি তৈরির কয়েকটি পদ্ধতি ও উপকরণ ঃ

ক. কাজল গোমূত্র রায়ের জল ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল
পীত কাষ্ঠ দিয়ে রসি তোটে পত্র না তোটে মসি।

খ. লোধ লাহা লোহার গুড়ি আর্কাঙ্গার যবার কুড়ি
গাবের ফল হরিতকী ভৃঙ্গার্জুন আমলকী
বাবলা ছাল জাঁটির রস ডালিম ছেছে করিবে কষ
ভেলায় কর‍্যা ঋক আলি চারি যুগ না উঠবে কালি।[৩৬]

গ. তিন ত্রিফলা শিমুল ছার ছাগ দুগ্ধে দিয়া তেলা
লোহা দিয়া লোহায় ঘসি মসি বলে অকাট বসি।[৩৭]

বালক-বালিকারা লিখত কলাপাতায় (ধূলায় খড়ি ও কুটা দিয়েও লেখানো হতো)। আর অন্যেরা লিখতো তালপত্রে, ভূর্জপত্রে, বাকলে, পশুচর্মে, তেরট ও তুলোট কাগজে। মাহুয়ান বাঙলাদেশে মসৃণ তুলোট কাগজের বহুল ব্যবহার দেখেছিলেন।[৩৮] গোবিন্দচন্দ্রের গানেও আছে কাগজের উল্লেখ।[৩৯]

ছাত্র ও শিক্ষকেরা বসতেন চাটাই, পাটি, ফরাস, কুশাসন প্রভৃতির উপর। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, চীনাদের আবিষ্কৃত ছাপা কল য়ূরোপে ব্যবহৃত হল, আমাদের দেশের লোক এই কলে গুরুত্ব দিল না। গ্রন্থগুলো পাণ্ডুলিপির আকারে চালু ছিল, প্রতিলিপি তৈরি করবার জন্যে পেশাধারী লিপিকর থাকতো। আঠারো শতকের গোড়ার দিক অবধি পাণ্ডুলিপি অগ্রথিত কাগজে লিখিত হত। তখন পাতার মধ্যস্থলে ডোর দিয়ে বাঁধবার জন্যে ফাঁকা স্থান থাকতো। আঠারো শতক থেকে মুসলিম সমাজে গ্রন্থ আধুনিক পুস্তকের আকারে বাঁধাই হ'তে থাকে। মুসলমানেরা ডানদিক থেকেই লিখত। হিন্দুরা চিরকাল অগ্রথিত পাণ্ডুলিপি তৈরি করত। মধ্যখানে সূত্র বা ডোররূপ গ্রন্থি দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা ছিল বলেই পাণ্ডুলিপির নাম গ্রন্থ। যেমন পুস্ত তথা চামড়ায় লিখিত হতো বলে পাণ্ডুলিপির অপর নাম ছিল পুস্তক বা পুস্তিকা। এর থেকেই পুথি ও পোথা নামের উৎপত্তি।

পাণ্ডুলিপিতে পাঠ নির্দেশের জন্যে পড়ুয়ারা ময়ুরপুচ্ছ প্রভৃতির নিশানা ব্যবহার করত। মুসলিম আমলে বিদ্যাচর্চার বহুল প্রচলন হয়, আর জিজ্ঞাসুকে জ্ঞান দানের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। হিন্দুসমাজে জ্ঞান ও বিদ্যাঅর্জনে অধিকার ভেদ স্বীকৃতি হত। ফলে জ্ঞান-ও মন্ত্র গুপ্তি একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাই যদুনাথ সরকার বলেন, "We owe to the Muhammadan influence the practice of diffusing knowledge by the copying and circulation of books, while the early Hindu writers, as a general rule, loved to make a secret of their production"[৪০]

আলাউল, মাগনঠাকুর প্রভৃতির পরিচিতি থেকে জানা যায়, শাস্ত্রচর্চা ছাড়াও ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষা এবং যৌনশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার সঙ্গীত প্রভৃতি শাস্ত্র ও কলা উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর বাঙলায় সাংখ্য যোগ, তন্ত্র, নব্যন্যায়, ব্যাকরণ, স্মৃতির ভাষ্য প্রভৃতি সাগ্রহে পঠিত হতো হিন্দু সমাজে।

২. চিকিৎসাবিদ্যা

ধর্মশাস্ত্র, এবং বিষয়কর্মে ও রাজকার্যে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ছাড়া আর যা বৃত্তি হিসেবে শিখতে হ'ত, তা চিকিৎসাবিদ্যা। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণী হিসেবে বৈদ্যেরাই আয়ুর্বেদ তথা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। মুসলমানেরা ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা তথা তিব্বিয়াশাস্ত্র শিক্ষা করে হেকিম বা তবিব হত। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা মঘা তথা বর্মী চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ত্ত করে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাত। শিশু চিকিৎসাবিদ্যা ও নারীচিকিৎসক চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনের শ্রেষ্ঠ দান।

এ যুগের মতো সেকালে ঔষধের দোকান ছিল না। কাজেই চিকিৎসকেরা ঔষধও তৈরি করতেন, কবিরাজী তথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাই বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামে শিশুরোগে মহিলা চিকিৎসকের মঘাশাস্ত্রই বিশেষ কার্যকর বলে মনে করা হত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে এখন মঘা-শিশুচিকিৎসারীতি লোপ পাচ্ছে।

এছাড়া সেকালে কুসংস্কারের আধিক্যবশত মুসলিম ঝাড়-ফুক ও দারু, মঘা, দারু-টোনা-তুকতাক-উচাটন, হিন্দুয়ানি মন্ত্র ও ঝাড়, তাবিজ-কবচ, তাগা-মাদুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। জ্বর থেকে মস্তিকবিকৃতি অবধি সর্বপ্রকার রোগেই এসব ঝাড়-ফুক-তুক-তাক প্রযুক্ত হত। দেও-তাড়নেরও ছিল মন্ত্রপুত দারু এবং রোগেও বার-তিথি-ক্ষণের প্রভাব স্বীকৃত হত।[৪২]

তাই চিকিৎসকরা ছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসী-যোগী-পীর-ফকিরেরাও নানা আধি-ব্যাধির চিকিৎসা করত : মোল্লার বচন এখন কাজির মনে লয়

তাবিজ লিখিয়া তখন সকলেই লয়।[৪৩] ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা (নবীবংশ)

কলেরা-বসন্ত প্রভৃতির জন্যে হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে অপদেবতার পূজা শিরনী দিত, এখনো দেয়। ষষ্ঠী, শীতলা, ওলা ও মা মঘিনীর সংস্কার আজো প্রবল।

ক. কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত
কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত [চণ্ডীমঙ্গল]

খ. কাঁকড়ার বাম পাও. ইন্দুরের পিত্ত
পেঁচার বাম চক্ষেরে ক'র কাজল রঞ্জিত [দ্বিজবংশীদাস]

এছাড়া তুকতাক, দারু-টোনা-উচাটন, বাণ-তাবিজ-কবচ তাগা-মাদুলি প্রভৃতি বশীকরণে ও শত্রু নিপাতে বৌদ্ধ ডাকিনী-যোগিনী ধারায় আজো জনপ্রিয়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ও নেপালের আসামের বৌদ্ধরা আজো এসব গুহ্যবিদ্যায় সিদ্ধ বলে লোকের বিশ্বাস। দারু-টোনার আর বিষের ও রোগের মন্ত্রের পুঁথি বাঙলাদেশের সর্বত্র মেলে।[৪৪] এগুলো সুপ্রাচীন। যদিও অজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে বিকৃতিও ঘটেছে অনেক।

আর আমাদের দেশে সেকালের লোক-বিশ্বাসে অধিকাংশ রোগেরই উৎপত্তি ছিল ভূত, জ্বীন, পরী দেও ও কুনজর থেকেই। সত্যকলিবিবাদসম্বাদের গার্হস্থ্যবিধি নামের অধ্যায়ে এমনি নানা রোগের চিকিৎসাবিধি বর্ণিত রয়েছে।[৪৫] গোয়ালেরা এখনো গাঁয়ে পশু-চিকিৎসক আর নাপিতেরা ছিল অস্ত্র-চিকিৎসক।

৩. খাদ্য

হিন্দু-মুসলমান খাদ্য ব্যাপারে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতো। বৌদ্ধ ও নমঃশূদ্রদের আহার্য ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা ছিল। তারা শূকর, গরু, মোরগ ও নানা পাখীর মাংস খেত। বিশ শতকে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবে পড়ে তারা শূকর, গরু ও মোরগাদি খাওয়া ছেড়েছে। ডাল, মাছ. শাক তরকারী ও ভাতই বাঙালীর প্রাত্যহিক খাদ্য। এরই বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে হয় বত্রিশ ব্যঞ্জন।[৪৬] চণ্ডীমঙ্গলে ও অন্য কয়েকটি কাব্যে রান্নার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।[৪৭] কাঁজি বা আমানি ছিল গরীবের হালকা নেশাযুক্ত পানীয়।[৪৮] নিম্নস্তরের লোকেরা হয়তো ইঁদুর, গোসাপ, শূকরাদি জীব-মাংস ভক্ষণ করত। কোন কোন বৌদ্ধ সিদ্ধা কেবল কচু শাক খেতেন। কাঁকড়া ও কচ্ছপ আজো বর্ণহিন্দুর প্রিয় খাদ্য। আহারের সময়ে 'আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্ট দ্রব্য খাএ'– (তোহফা)।

বাঙালীর পিঠা প্রধানত চালের গুড়ো, তালের ইক্ষুর ও খেজুরের গুড়, রস শর্করা, তেল, ক্বচিৎ ঘি, তাল, কলা, দুধ প্রভৃতির যে-কোনো দুটো-তিনটের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। এছাড়া চালভাজা মুড়ি মোয়া চিড়া বাতাসা প্রভৃতিও সুপ্রাচীন। এগুলোর মধ্যে স্বাদ-বৈচিত্র্য থাকলেও নৈপুণ্য বা উন্নত রুচির পরিচয় দুর্লক্ষ্য। বাঙালীর কৃতিত্ব (বিশেষ করে হিন্দুর) রয়েছে দুধের রূপান্তর ঘৃত, দধি, মাখন, ঘোল, সন্দেশ, পায়েস, রসগোল্লাদি নানামিষ্টান্ন তৈরিতে।[৫০] 'ওদন পায়েস পিঠা। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা। অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা।'

কুল, আম, আমলকী প্রভৃতির আচার (সালাদ) তৈরির পদ্ধতি মুসলমানদের নিজস্ব।[৫১] কিন্তু হিন্দুরা কাসুন্দি, আমসি প্রভৃতি নানা জাতীয় টক করত।[৫২] গরীবের ডাল ভাত, গরীব বিদেশী মুসলমানের ডাল-খোসকাই ছিল প্রাত্যহিক খাদ্য। আবার গরীবের খিচুড়ি আর নিরামিষভোজীর[৫৩] খিচুড়িতে পার্থক্য ছিল, যদিও সব শ্রেণীর লোকেই পছন্দ করত খিচুড়ি।[৫৪] আবুল ফজল বলেছেন বাঙালী মাছ ভাত খায়,[৫৫] যদিও মুসলমানেরা মাংসপ্রিয় ছিল।[৫৬]

আর তুর্কী ও মুঘলাই মাংস-রুটি, বিরিয়ানী, খিচুড়ি, কোর্মা-পোলাও কালিয়া কবাব, কোপ্তা ও মদ্য প্রভৃতি উচ্চবিত্তের লোকের পার্বণিক খাদ্য হিসেবে চালু ছিল, সে-সঙ্গে নানা মশলার ব্যবহারও।[৫৭] দরিদ্রের খাদ্য ঃ খুদ, জাউ, মুসুরী-সুপমিশ্রিত লাউ, আলু, ওল-পোড়া, কচু করঞ্জা আমড়া ইত্যাদি। (কবিকঙ্কণ ঃ কালকেতুর খাদ্য) ম্যানরিক বলেছেন, গরীবেরা ভাত নুন ও শাক এবং সামান্য কিছু তরকারীর ঝোল খেত, কুচিৎ কদাচিৎ দই মিষ্টি পেত। মাছ মাংস তাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল। পান্তা ভাতের আমানিই ছিল তাদের সুলভ পানীয়।

ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, আখ, পরে পেঁপে, আনারস প্রভৃতি ছিল সুলভ। দুধজাত ননী ঘোল মাখন সন্দেশ প্রভৃতি ছাড়াও—পিঠার মধ্যে খাজা মোয়া, (মাদক), নাড়ু, খাঁড়, পুলি, ছানাবড়া, ফেনি (বাতাসা) লাফরা, কদম, দুধশাকর (পায়েস), ক্ষীরসা, শিখারিনী (ঘি-দই গুড় আদা দিয়ে তৈরি—সুকুমার সেন) পাটিসাপটা, চিতল, ধুঁয়াপিঠা, জলাপিঠা, পাকোয়ান, চালের রুটি, চিড়া, মুড়ি, শিরনী, তালপিঠা, বড়া, পিয়াজু প্রভৃতি নানা খাদ্যবস্তু চালু ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও নানা অঞ্চলের লোকের মধ্যে। উৎসবে পার্বণে হিন্দুরা কেয়াপত্র, কলার খোলা, ডোঙ্গা প্রভৃতিই পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত। নিরামিষ ভোজনে ঃ দশপ্রকার শাক নিম্ব শুকুতার ঝোল/মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী ঘোল/ মোচাঘণ্ট মোচাভাজা/ এবং ফলবড়ী ফলমূলে বিবিধপ্রকার–ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা থাকত। [চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৫তম পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্য ১০ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

৪. পোশাক

আবুল ফজল বাঙালীর আটপৌরে পোশাক সম্বন্ধে বলেছেন Naked wearing only a cloth about the loins[৫৮] ম্যানরিকের বর্ণনায় পাই, গরীবেরা হাঁটুর 'পরে খাটো সাদা কাপড় পরত, মাথায় বড় পাগড়ী ও পায়ে জুতা থাকত।[৫৯]

বাঙালী হিন্দুরাও সেকালে পাগড়ী পরত; তবে সাধারণ গ্রাম্য লোকেরা কৌপীন বা গামছা পরত, খালি গায়ে থাকত, হাটে বাজারে উৎসব-পার্বণ কালে ধুতি চাদর পরত। হিন্দু ধনীদের পোশাক 'কেবল ধীরের কাম/বস্ত্র বড় অনুপাম/প্রাণশক্তি টানিলে না ছিড়ে /রাজার যোগ্য বসন/ না পায়ে সামান্য জন/ অনেক শক্তি ইহা কিনি/ বড়ই দুর্লভ চটের ভূনি/ এবং একখানা কাছিয়া পিন্ধে/ আর খানা মাথায় বান্ধে। আর খানা দিল সর্বগায়। [বিজয়গুপ্ত]

হিন্দুর পোশাক হচ্ছে ধুতি, উত্তরীয় বা চাদর। গরীবের ছিল গামছার মতো খাটো কাপড়, কৌপীন, নারীর শাড়ি। মাথা নগ্ন রাখা এবং খালি পায়ে চলাই এদের রীতি। কেবল সম্ভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক কাঠের পাদুকা পরতেন।

সাধারণ মুসলিম তহবন, কুর্তা টুপী বা পাগড়ী পরত, পরে আরাকানী প্রভাবে লুঙ্গী ধরেছিল, চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ও মুসলিম নারীরা আরাকানী প্রভাবে থামী পরত এবং উত্তরীয়ের মতো গামছা গায়ে দিত, আজো দেয়, আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হ'লে জুতা-মোজাও পরত। বর্ণ হিন্দুর কাঠের পাদুকা সুপ্রাচীন। গরীব বৌদ্ধও মুসলিম মেয়েরা পাতলা কাঁথাও থামীর মতো পরে পরে লজ্জা নিবারণ করত। অরণ্য ও পর্বতবাসী নারীরা বুক থেকে ঝোলানো একটি কাপড়ই পরে।

পূর্ববঙ্গগীতিকায় (পৃঃ ১৪) আছে ঃ

১. পরনেতে তহমান কালা কুর্তা গায় মাথার উঅর (উপর) টুপি (টুপি)।

২. পাজামা নিমা টুপী পরি কটিবন্দ। [দ্বিজবংশীদাস]

৩. কৌশা মোজা পর যদি জরদ পরিও। অঙ্গুরী নিদানে প্রাপ্তি রাখ নিজ করে। (তোহফা)

শিক্ষিত উচ্চবিত্তের এবং সরকারী চাকুরে মুসলমান ইজার (পাজামা) কাবাই চাপকান, পাগড়ী, শামলা, নাগরা জুতা ও মোজা পরতেন। বার্বোসার বর্ণনায় সম্ভ্রান্ত শাসকগোষ্ঠীর মুসলমানের গায়ে পাতলা সূতি আলহখাল্লা, কাপড়ের দোয়াল, গলাবন্দ, হাতে (খাপে ঢাকা) ছোড়া, মাথায় পাগড়ী, আঙুলে রত্নখচিত অঙ্গুরীয় থাকতো। তারা আরামপ্রিয় 'অমিতব্যয়ী ভোজনবিলাসী বহুপত্নীক, মদ্যপায়ী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। তারা হামাম বা হাউজে স্নান করত।[৫৯]

চীনাসূত্রে জানা যায়, মুসলমানেরা (নিশ্চয়ই বিদেশগত শিক্ষিত ও ধনীরা) মাথায় সাদা সূতি পাগড়ী, গায়ে লম্বা সূতির সাদা আলখেল্লা এবং পায়ে ভেড়ার চামড়ার উপর সোনালী জরির কাজ করা জুতো পরত। নারীরা পরত কামিজ ও সূতি কিংবা সিল্কের ওড়না। তারা এমনিতেই গৌরবর্ণা। সেজন্যে প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করত না। তাদের কানে মণিখচিত আঙটা, গলায় হার এবং মাথায় খোপা থাকত। হাতে নানা প্রকার খারু চুড়ি বালা কঙ্কণ প্রভৃতি এবং হাতের ও পায়ের আঙুলে অঙ্গুরীয় পরত।[৬০] এ বর্ণনা অবশ্য বাঙালী মেয়ের নয়, গৌড়ের তুর্কি হেরমের।

দরবেশরা পরত কালো আলখাল্লা। 'সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর কালবস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর।[৬১]

তাঁদের পাগড়ীও ছিল, মোল্লা-মৌলবীরা ইজার ও পাগড়ী পরতেন।[৬২] তাঁরা সাদা পোশাকই পছন্দ করতেন। জালালউদ্দীন তাবরেজীও কালো আলখাল্লা পরতেন বলে শেখশুভোদয়ায় উল্লেখ আছে। সাধারণ বাঙালী হিন্দুর মাথায় কোন আবরণ ছিল না।

ধার্মিক মুসলমানেরা চুল চেঁছে ফেলতো।[৬৩] আগে নেড়া মাথাওয়ালা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অবজ্ঞা করে বলত নেড়ে। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পর নেড়া মাথার সূফীরা এবং পরে সে-সূত্রে অবজ্ঞায় মুসলমানেরা নেড়ে নামে অভিহিত হয়। চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব বৈরাগী আর সহজিয়ারাও পরিচিত হয় নেড়ানেড়ী নামে।[৬৪]

হিন্দুর চটক ধুতি এবং গরদের ধুতি, মেয়েদের ময়ূরপেখম, আগুন পাট, কালপাট, আসমানতারা, হীরামন, নীলাম্বরী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঞা নেত, মঞ্জাফুল, অগ্নিফুল, মেঘডুম্বুর, মেঘনাল, গঙ্গাজলি প্রভৃতি শাড়ি। বেলনপাটের শাড়ি, নেতের শাড়ি প্রভৃতি বহুমূল্য পার্বণিক পোশাক। মেয়েরা কাঁচুলি এবং অন্তর্বাস বা ছায়া পরতো।[৬৫] আরো ছিল মুক্তামণি, কনকলতা, আনন্দাই, ধূপছায়া, পবনবাহার, লক্ষ্মীবিলাস, বসন্তবাহার, উদয়তারা, বালুচরী শাড়ী।

নারীর প্রসাধন সামগ্রী হচ্ছে কস্তুরী, চন্দন, অগুরু, কুমকুম, সুর্মা, কাজল, আতর, মেহদী, সিন্দুর (হিন্দুর নারায়ণতৈল, বিষ্ণুতৈল কেশের গোড়ে দিয়া প্রভৃতি।[৬৬] স্নানের সামগ্রী ছিল হলুদ, কুসুম, চুল ধোয়ার জন্যে আমলকীর গুড়া ধূপ দিয়ে চুল শুকানো, চন্দন দিয়ে দেহ লেপন প্রভৃতিও ধনী ঘরের নারীর মধ্যে চালু ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের আদর্শ সজ্জাই হিন্দুর সজ্জা। নতুন কাপড় পরা ও পুরানো কাপড় ছাড়ার ব্যাপারে নানা কুসংস্কারও ছিল। এক্ষেত্রেও বার-তিথি-ক্ষণের প্রভাবে বিশ্বাস ছিল গভীর।[৬৭]

সতেরো শতকের কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুসলিম যোদ্ধার পোশাকের এরূপ বর্ণনা পাই ঃ

পরিল ইজার খাসা নামা মেঘমালা
কাবাই পরিল দশদিক করে আলা।
পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোমরবন্দ...

কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভার মাথে
রামের ধনুক শর সভাকার হাথে।
সকল বচনে তারা সঙরে খোদায়
একবুটি পাইলে হাজার মি খায়।

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান অভিজাত চট্টগ্রামবাসী জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ঘরোয়া জীবনচিত্র থেকে ষোল শতকের উচ্চবিত্ত লোকের জীবন ধারণের মান সম্বন্ধে আভাস মেলে ঃ

দিব্যখট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে
দিব্যচন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে
তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে
পট্ট নেত বালিস শোভএ চারি পাশে।
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত।
পনোরো-ষোল শতকে তাকে কৃতিপুরুষ

দিব্য আলবাটি দুই শোভে পাশে
পান খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে।
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে কত
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে।
কি কহিব যে বা কেশভারের সংস্কার
দিব্যগন্ধ আমলক বহি নাহি আর।
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা।[৬৮]

মনে করা হত ঃ যে দোলা ঘোড়া চড়ে দশ বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে।[৬৯]

যোগীর কানে কুণ্ডল, গায়ে বিভূতি, কটিতে কৌপীন, কাঁধে কাঁথা ও ঝুলি থাকত। নাথ ও বৌদ্ধ যোগীরা মাথা নেড়া করত আর শৈব যোগীদের মাথায় থাকত জটা।[৭০]

সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিত্তের হিন্দুরা রাজ-সরকারে চাকরী নিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে কিংবা দেশের শাসক-সমাজের সংস্কৃতির অনুকরণে মুসলমানি পোশাক, আদব-কায়দা প্রভৃতি গ্রহণ করে কবি, জয়ানন্দ হিন্দুর (ব্রাহ্মণের) দাড়ি রাখা, মসনবী পড়া, জুতামোজা পরা, বিধরা ও ব্রাহ্মণের মৎস্যপ্রীতি, জগাই-মাধাইর গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতির জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দুরাজার পোশাক এবং রাজপ্রাসাদের মুসলিম সাংস্কৃতিক আবহের বর্ণনা দিয়েছেন।[৭১]

৫. অলঙ্কার

মেয়েরা মাথায সিঁথিপাট, টিকলি, কণ্ঠে হাঁসুলি, টাকার ছড়া, তাবিজের ছড়া, হার হাতে কঙ্কণ, বালা, তাড়, চুড়ি, খাড়ু, পৈঁচি, অঙ্গদ, নাকে কোর, চাঁদবোলাক, ডালবোলাক, নাকমাছি, কানে কানফুল, করমফুল, ঝুমকা, কুণ্ডল, কানবালা, বালি, পায়ে পাজব, পাঁসুলি, নূপুর, ঘুংঘুর, হাত-পায়ের আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়, মল, উনচট[৭২] বাহুতে তাড়, বাজু, কেয়ূর, জসম, গ্রীবায় গ্রীবাপত্র, হাতের পাতার উপর আঙুল সংলগ্ন রতনচূড়, কটিতে নীবিবন্ধ, কিঙ্কিনী, চন্দ্রহার প্রভৃতি ধারণ করত।[৭৩]

আঙ্গুলে নালিকা গোলাপ নুপূর সুছন্দ
কটিতে কিঙ্কিনী হস্তে বাহু বাজুবন্দ।
গলে দোলে রত্ন চন্দ্রহার চন্দ্রজ্যোতি
নাসায় বেশর চক্র শোভে গজমোতি হার
যুগল শ্রবণে দোলে রতন কুণ্ডল
সবিতার রশ্মিকা মধ্যে খরিকা উঝল।

ললাটে টিকলি বিন্দু শোভে মনোহর
খোপায় বেলন পুষ্প জাদ মুক্তাছড়
পৈঢ়ন বেলন শাড়ি বহুমূল্য ধরে
ঢাকন ঘোঁঘট লক্ষে কাঁচুলি উপরে।[৭৪]

হার ছিল ত্রিছড়ি, সপ্তছড়ি। মল্লতোড়র, রাকপাতা, মল, মকরখাড়ু, বঙ্করাজ[৭৫] প্রভৃতি পায়ে শোভা পেত। শেখ শুভোদয়ায় তালপাতার কুণ্ডল বা কানফুলের উল্লেখ আছে। শঙ্খ ও সিন্দুর হিন্দু এয়োর প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

ধনী ঘরের মেয়েরা মণি-মুক্তা খচিত, নানা কারুকার্য সমন্বিত বহুবিচিত্র আকৃতির অলঙ্কার পরত। আর গরীবেরা সাধ্যানুসারে রূপার ও পিতলের জেরে হত সজ্জিত। বাঙলাকাব্যে নারীর রূপ বর্ণনসূত্রে নানা অলঙ্কারের বর্ণনা রয়েছে। খোপারও ছিল বিচিত্র গড়ন, নাম ছিল চিত্রল, কানড়ী, বেহারী, দেবমহলী প্রভৃতি। কর্ণাট দেশীয় ছাঁদে (কানড়া) বাঁধা খোপার সৌন্দর্যের কথাও সর্বত্র উল্লেখিত হয়েছে। খোপায় মণিমুক্তা ছাড়াও ফুল জড়ানো হতো। নারীর শাড়িরও ছিল বিচিত্র সব নাম। কাঁচুলির বৈচিত্র্যের আর সৌন্দর্যের উল্লেখও রয়েছে সর্বত্র।

কবি মুহম্মদ কবীর (১৫৮৮ খ্রীঃ) সুন্দরীর চিত্রল ছাঁদের খোপা, অলকে মণির খোপা, শীর্ষে সিন্দুর, চোখে কাজল, কানে কানড়দেশীয় কুণ্ডল, নাকে সোনার বেশর, গলায় সপ্তছড়ি মুক্তাহার, বুকে বিচিত্র কাঞ্চুলি, করে কঙ্কণ, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, পায়ে নূপুর, পরনে হেমরি শাড়ি এবং জরি পাড়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

সুরঙ্গ অঙ্গে জরি পাড় ঝরি পড়ে, ঝরি ঝরি পড়ে রূপ পালঙ্ক ভাসি যায়। [৭৬]

পুরুষরাও বাহুতে কবচ ও বাজু এবং বাহুতে, গলায় ও কটিতে তাবিজ, কানে কুণ্ডল, হাতে বলয় ও গলায় একছড়ি হার পরত।[৭৭] সাধারণত লোক গলায় কালো তাগা রাখত, আর ধার্মিক মুসলমানরা খিলালের প্রয়োজনে (সুন্নত হিসেবেও) লোহার বা পিতলের খিলালশলাকা গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

৬. নারী

বর্ণ হিন্দুরাও মুসলিম প্রভাবে পর্দা করত। বারবোসা সম্ভ্রান্ত ও সকল সচ্ছল মুসলমান নারীর পর্দা ও অবরুদ্ধ জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এরা স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে আর সাধ্যমতো সোনা-রূপার অলঙ্কার ও সিল্কের পোশাক পরায়। বারবোসার মতে প্রত্যেকেরই তিন-চারটে অথবা সাধ্যানুসারে আরো বেশি স্ত্রী থাকত।[৭৮]

মুসলমানরা হিন্দুর মেয়ে ও বিধবা বিয়ে করত।[৭৯] জোলা, বেদে প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর যে-সব মুসলিম মেয়েরা পর্দা মানত না, তারা পুরুষের সঙ্গে গোত্রীয় পেশায় যোগ দিত। জোলা বিধবারা পূর্ব সংস্কার বশে নিরামিষ খেত।[৮০] সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীর উপর শারীরিক পীড়ন ও তালাক দান বহুল প্রচলিত ছিল।[৮১] শ্বশুর বাড়িতে বধূদের অধিকার বাঁদী-গোলামের চেয়ে বেশি ছিল না। শাশুড়ী-ননদের মন যুগিয়ে চলতে না পারলে স্বামীর ঘর করা সব সময় সম্ভব হত না। অবশ্য স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে বধূরা ধর্মীয় সংস্কার বশে মেনে চলত। হিন্দুসমাজের প্রভাবে মুসলমান মেয়েরা স্বামী এবং গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করত না। বাইরে যেতে ভদ্র ঘরের মেয়েরা বোরখা এবং অন্যেরা ব্যবহার করত ছাতা।

হিন্দুসমাজে গৌরীদান অর্থাৎ অনূর্ধ্ব আট বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। বারো বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতেই হত, অন্যথায় সামাজিক নিন্দা, পাপ ও অকল্যাণের ভয় ছিল। তবু কুলীন ঘরে বয়স্কা অনূঢ়া মেয়ে দেখা যেত। হিন্দুপ্রভাবে মুসলিমসমাজেও বাল্যবিবাহ বিশেষভাবে চালু হয়। ম্যানরিক-এর মতে হিন্দুর সমাজে এক পত্নী গ্রহণই সাধারণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালেও বহুপত্নীক লোকের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। বিশেষ করে কুলীনেরা বহু পত্নী গ্রহণ করত।[৮২] সতীদাহ প্রথা খুব প্রবল না হলেও[৮৩] চালু ছিল।

প্রাত্যহিক জীবনে কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না বলেই মেয়েদের বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুর বাড়ি থাকত, কিন্তু নিজের বাড়ি কখনো হ'ত না। বৃদ্ধা নারীর মুখেও তাই বাপের বাড়ি কিংবা শ্বশুরের ভিটের কথাই শোনা যেত।

৭. বিবাহ

সতীত্ব যে অস্পৃষ্ট দেহ, অনাসক্ত মন নয়—এ ধারণা বশে হিন্দু ও মুসলিম গৌরীদান প্রথার প্রভাবে অল্প বয়সেই ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিত। র‍্যালফ্ ফিচ্ বলেছেন, আট-দশ বছরের বালকের সঙ্গে পাঁচ-ছয় বছরের বালিকার বিয়ে চালু ছিল।[৮৪] দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের বিদ্যাসুন্দরকাব্যে দেখি—বিদ্যাকে আট বছর বয়সে বিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এমনি শিশুদেরও সখের বিয়ে দেবার রীতি চালু ছিল।[৮৫] সব সমাজেই বিয়েতে যৌতুক ও পণ প্রথা চালু ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেই পাই ঃ

পণের নির্ণয় কৈলা দ্বাদশ কাহন	এহা দিলে আর কিছু না কহিবা ফের।
ঘটকালি পাবে ওরা তুমি চার পণ।	অথবা, আমি যে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই।
পাঁচ গণ্ডা ওরা গড় পাঁচ সের	কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।[৮৬]

এ হচ্ছে গরীবের বিয়ে। ধনীর বিয়ের প্রস্তাবে আছে ঃ

বহুমূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন	পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ।[৮৭]
প্রদীপ সমান দাস রূমী একশত	ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।[৮৮]
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ	মোল্লাও পড়্যায়া নিকা/দান পায় শিকাশিকা
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ	দোয়া করে কলমা পড়িয়া (মুকুন্দরাম)।

মুসলিম সমাজে কন্যাপণ এবং হিন্দু সমাজে বরপণ বিশেষভাবে চালু ছিল। সেকালে পণ ও অলঙ্কারের ব্যাপারে বর ও কনে পক্ষ পরস্পরকে প্রতারণা করতে চাইত (সম্ভবত দারিদ্র্যবশত, অবশ্য অভাবে করতে করতে তা স্বভাবে ও রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল)। তাই বিবাহসভায়

ঝগড়া-বিবাদ, এমনকি মারামারি অবধি হ'ত। হিন্দুর বিবাহে নানা আচার[৮৯] আছে বলে বিবাহোৎসবের রেশ কয়েকদিন ধরেই থাকে। লখীন্দর-বেহুলা কাহিনী তৈরি হওয়ার পর থেকে এর প্রভাবে প্রথম রজনীকে হিন্দুরা কালরাত্রি বলে ভয় করে। মুসলিমদের বিয়েতেও কয়েকটা ভোজনোৎসবের অবকাশ ছিল। ঘরবাড়ি দেখা, বর দেখা, কনে দেখা, গায়ে হলুদ, তেলোয়াই, বিবাহবাসর, ওয়ালিমা, [বউ-ভাত] মেহদী লাগানো, বাজি পোড়ানো, মেয়েলি নাচগান, পুতুল নাচ, বাজিগরের খেলা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।[৯০] ভোজনোৎসব করার সাধ্য থাকত না বলে দরিদ্ররা খই, কলা, পায়েস, ফিরনী, শিরনী, পান-সুপারী, তেল-সিন্দুর দিয়েই অতিথিদের আপ্যায়িত করত, চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের বিবাহের পূর্বাপর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এতে সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের বিবাহচিত্র মেলে, তেমনি চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় বিবাহে মেলে ধনীঘরের বিবাহোসথবের বর্ণনা।

এমনি করে বিবাহোৎসবে গৃহস্থের সাধ্যমতো খানাপিনারও ব্যবস্থা থাকত। ঘড়াকাঁজি বা আমানি তথা হালকা হাড়িয়া মদও উৎসবে খাওয়া হ'ত। রঙের অভাবে কাদা ছোড়াছুঁড়ি করে আনন্দিত উত্তেজনার অভিব্যক্তি দেয়া হ'ত। বিবাহের জন্যে কলাগাছ পোঁতা হত মঙ্গলঘট বা কলসের মুখে আম্রসার বসানো হত, মঞ্চ তৈরি হত, মঞ্চের নাম ছিল মারোয়া, মারোয়ামঞ্চেই হত শুভদৃষ্টি বিনিময়। মঞ্চের উপরে চাঁদোয়া বা ছত্র থাকত, মেঝে আঁকা থাকত আলপনা। দুইপক্ষের সখী-বন্ধু-আত্মীয়রা ঠাট্টায় মস্করায় ও নানা রঙ্গরসে আসরও বাসর আনন্দে উল্লাসে মাতিয়ে তুলত। এর নাম ছিল জোলুয়া বা জুলুয়া 'জুলুয়া দিলেন্ত দীয়া (দীপ) করি হুড়াহুড়ি।' বর-কনের মধ্যে পাশাদি ক্রীড়া হত, গেণ্ডুয়া বা গেড়ুয়া (কাঠের বল বা ফুলের স্তবক লোফালুফি) খেলাও হত– বর-কনের সংকোচ শরম ভাঙার জন্যেই ছিল এ-ব্যবস্থা। মুসলিম বর-কনের অন্যবাড়িতে অভ্যর্থনার বা সংবর্ধনার ব্যবস্থাও হত, এর নাম 'গস্তফিরানো।' কালো অস্ত্রিকরা গায়ে হলুদ মেখে স্নান করে গাত্র-বর্ণ উজ্জ্বল করে। আলপনা-আঁকা কুলায় বা ডালায় খাদ্য প্রতীক ধান চাউল, প্রাণের প্রতীক দূর্বা, আশার প্রতীক দীপ, শক্তির প্রতীক ঘটমুখে আম্রসার, বৃদ্ধির প্রতীক কলাগাছ প্রভৃতি, এবং কনের বাড়িতে প্রজনন প্রতীক দই-মাছ প্রেরণ ও বরের যাত্রার সময়ে বরের কোলে শিশুবসানো প্রভৃতি বিবাহ সম্বন্ধীয় আদিম যাদু-সংস্কার। বারবোসা বাঙালীদের বহুপত্নীক ও উপপত্নীক বলে জানতেন। পর্দাপ্রথাও কঠোর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘরে-সংসারে বধূর কার্যত কোনো মর্যাদা ও অধিকার ছিল না বলে কনের মা-বাপকে চিরকাল জামাতাপক্ষের মন যুগিয়ে চলতে হত। 'যদি মারে ঝাঁটা তবু না ছাড়ে ঝিয়ের ঘাটা।'— ইত্যাকার ছড়া-প্রবচনে এর আভাস রয়েছে। কন্যার পিতা হিসেবে রাজার আর ভিখারীর একই অসহায় অবস্থা। জামাই বিদায়ের কালে শ্বশুরের মিনতি ঃ

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা কর্য়ো তুমি।
আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত

অথবাঃ
নারীজাতি অপরাধী পায় পায় দোষ
অপরাধ না লইবে না করিবে রোষ।

প্রীতি কর্য় যেহেন জানকী রঘুনাথ।[৯১] কন্যাদায় আজকের মতো সেদিনও বড় দায় হিসেবেই গণ্য ছিল ঃ যোগ্য যার ঘরে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি তারে, নিরবধি মনে মনস্তাপ।[৯৩] চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজে ও তার প্রভাব মুসলিম সমাজে নারীরাও বরযাত্রী হত।

আজকের মতোই হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সবাই কুলায় ধান, দুর্বা হরিদ্রা রেখে আম্রকিশলয় দিয়ে মঙ্গলঘট বসাত, জ্বালত মঙ্গলদীপ। বহির্দ্বারে কলাগাছ পুতে পাশে রাখত মঙ্গলকলস। এ ছিল অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার মাঙ্গলিক। এ ছাড়া হিন্দুদের পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি মঙ্গলাচার তো ছিলই।

পর্তুগীজ সমাজেও বিবাহিতা নারীরা পর্দা করত, বাইরে যেত আচ্ছাদিত পালকীতে করে। কোর্টশিপের বা বিবাহপূর্ব মেলামেশারও রেওয়াজ ছিল না। নারীরা মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার পরত। একাকী বদ্ধ ঘরে থাকতে হত বলে তারা গান বাজনা ও সাজ-সজ্জা প্রিয় ছিল এবং প্রায়ই গোলামচাকরের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করত।[৯৪] ধনীরা উপপত্নী রাখত ও বারাঙ্গনা পুষত।

তার জের উনিশ শতক অবধি ছিল।[৯৫] মুসলমানদের ক্রীতদাসী সম্ভোগে কোন শাস্ত্রীয় বাধা নেই। তাই ধনী জমিদারের থাকত নজরী ও নজরীজাত সন্তান। এটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাই এতে লজ্জার বা লুকোবার ছিল না কিছুই। এদের পত্নীদেরও এসব সহ্য ও স্বীকার করবার মানসিক প্রস্তুতি থাকত। সেজন্য দাম্পত্যে ও পারিবারিক জীবনে হয়তো বিশেষ কোনো অশান্তি বা বিপর্যয় ঘটত না। তাই বোধ হয় তোহফার মতো শরীয়ৎ শাস্ত্রের গ্রন্থেও অসঙ্কোচে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোনজন
ত্বরামাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন।
উদর পবিত্র আগে বুঝিয়া মরম
তাব সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম।

বেচিলে বেচিব দাসী পবিত্র উদরে
মাসিক অবধি লও চরিত্র বুঝিবারে।
আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঙাইলে ভাল।

রূপকথায় আখ্যায়িকায় উপাখ্যানে গীতিকায় প্রেম অভিপ্রেত ও প্রশংসিত বিষয় হলেও সমাজে প্রেম নিষিদ্ধ গর্হিত ও নিন্দরীয় ছিল। সামাজিক ও শাস্ত্রিক বাধা না থাকায় মুসলিমরা অমুসলিম নারী ভালো লাগলেই ভালোবাসত এবং আপোসে বা জোরে অমুসলিম নারী বিয়ে করত কোন কোন শক্তিমান ও বিত্তবান ব্যক্তি। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে সে ব্যবস্থা না থাকায় জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে কেউ অহিন্দু নয় শুধু, অসবর্ণের নারীও বিয়ে করত না সহজে। প্রবৃত্তি ও প্রলোভন প্রবল হলে অবশ্য কেউ কেউ স্বধর্মত্যাগ করে মুসলিম নারী বিয়ে করেছে, তেমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি হচ্ছেন ঈসা খানের পিতা কালিদাস গাজদানী ওর্ফে রাজা সোলায়মান।

৮. আদব কায়দা

আদব-লেহাজ-তবিয়তে সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। আলাউলের তোহফায় মজলিসে আচরণবিধির উল্লেখ আছে। এছাড়া অন্য কোথাও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে গুরুজনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা, গুরুজনের চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, জুতো পায়ে গুরুজনের কক্ষে প্রবেশ না করা, গুরুজনের কাছ থেকে চলে আসতে হলে পিছু হটে আসা, গুরুজন ও মান্য জনের সামনে তামাক না খাওয়া, বাম হাতে কিছু দেয়া-নেয়া না করা, মজলিসে মান্যজনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ও উচ্চ শিরে কোনো কথা না বলা, মজলিসে এক সঙ্গে খাওয়া শুরু করা এবং এক সঙ্গে শেষ করা, মান্যজনের আগে আগে না চলা, গুরুজন বা মান্যজনের দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেদের নাম ধরে না ডেকে অমুকের মা-বাপ বলা, খাবার সময়ে ছোট গ্রাস ধরা, ঠোঁট বন্ধ রেখে চিবানো, বাসনে অল্প করে ভাত তরকারী নেয়া এবং গুছিয়ে রাখা, পা দেখিয়ে বা ছড়িয়ে না বসা প্রভৃতি সামাজিক আদব-কায়দার অন্তর্গত ছিল।[৯৬] হিন্দুরাও এসব রীতি পদ্ধতি মেনে চলত। মুসলমান সমাজেও কদমবুসি পদধূলি গ্রহণ প্রথা চালু ছিল।[৯৭]

ভদ্রলোকেরা পারিবারিক জীবনেও এসব বিশেষ গুরুত্ব সহকারে যত্নের সঙ্গে মেনে চলত। অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উৎসবে পার্বণে মজলিসে এসব রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করত। উচ্চবর্গের মুসলমানের আদব-লেহাজের কথা বলেছেন এক বিদেশী পর্যটক ঃ মজলিসে তাঁরা কথা বলতেন in every low voice,with much order, moderation, gravity and sweetness, often they speak into each other's ear and they put the end of their shoulder-sash or their right hand in front of their mouth for fear of inconveniencing each other with their breath.[৯৮]

বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা ভাল ছিল না। De Laet বলেছেন তারা Subtle but depraved character এবং চুরি ডাকাতির জন্যে কুখ্যাত। তাদের নারীরাও অপকর্মাসক্তা ও দুর্বিনীতা। Schouten-এর মতে Lechery and foul commerce are ordinary things in the whole of India.But in Bengal and some other countries, in this respect,

things are even worse than elsewhere. Manrique-এর চোখে বাঙালীরা a languid race and pusillanimous meon spirited and cowardly[৯৯] তারা শক্তের ভক্ত নরমের যম, তাদের কাছে যে মারে সে ঠাকুর, যে না মারে সে কুকুর।

ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ব্যবহারে আর কর্মক্ষেত্রে ও রাজদরবারে যে সব নীতি, কর্ম, রোগ, নিদ্রা, দান, জনসেবা, জীবিকা, আচরণ এবং আদব-কায়দা আদর্শ ও বাঞ্ছিত বলে বিবেচিত, যেমন অনহঙ্কার, নম্রতা, কুলধর্ম ও কুলাচার, প্রজার দায়িত্ব ও কর্তব্য, সৈন্যের প্রতি রাজব্যবহার-নৃপহস্তে সৈন্য যদি মন দুঃখ পায়। রামবুদ্ধি হয় সব রাত্রিতম প্রায়) প্রজার সতর্কতা (যেই বস্তু উপরে রাজার যায় মন। সে বস্তু আপনে না রাখিব কদাচন) প্রভৃতি বহু বিষয়ে উপদেশ রয়েছে কবি মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদসম্বাদ' কাব্যে, আলাউলের 'তোহফা'য় আর নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'শরীয়ৎনামা'য়।

৯. লোকচরিত্র

মদে ও মাগে উচ্চবিত্তের লোকের সীমাহীন আসক্তিও ছিল।[১০০] তাদের মর্যাদা বোধশূন্যতা এবং বীর্যহীনতা তথা ভীরুতাও Manrique-এর (১৬২৮-২৯) দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বলেছেন তারা easily acustom themselves to captivity and slavery. Bowrey (১৬৬৯-৭৯ খ্রী) বাঙালী ব্রাহ্মণের মনীষার তারিফ করেছিলেন।[১০১] জোয়ানেস দ্য লায়েট (Joanes de Laet) ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে বলেছেন যে বাঙালীরা চালাকচতুর কিন্তু তাদের স্বভাব মন্দ, তারা চুরি ডাকাতিতে আসক্ত এবং তাদের নারীরা লজ্জাহীন ও অসতী। সতেরো শতকে শুটেন (Gauticr Schouter) বলেছেন ঃ বাঙালীরা অধিক লাম্পট্য ও দুর্নীতিপ্রবণ। ইবনে বতুতা কামরূপের মানুষের শ্রমসাধ্যকাজের শক্তির, যাদুতে অনুরাগের ও ভোজবাজীতে দক্ষতার খ্যাতির কথা উল্লেখ করেছেন। পর্যটক ওয়াং তা য়ুয়ান বাঙালীদের পরিশ্রমী, কৃষিজীবী সৎ ও সম্পদশালী এবং আচরণে ও প্রথাপদ্ধতিতে ধার্মিক বলে জেনেছিলেন। মাহুয়ান (বা কও ছুংলঙ) রচিত গ্রন্থে বাঙলার মানুষ, পোশাক ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে ভুল তথ্য ও অতিশয়োক্তি রয়েছে। বারবোসা বাঙালী ধনীদের বহুপত্নীক বা উপপত্নীক বলে জানতেন এবং তিনি বলেছেন নারীদের তারা দামী পোশাকে ও গয়নায় সাজিয়ে রাখে বটে, তবে ঘরের বের হতে দেয় না। তোমে পিরেস (১৫১২-১৯ খ্রীঃ) বাঙালীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্বাধীনতাচেতা, কিন্তু, অসাধু বড় ব্যবসায়ী বলে জানতেন। তিনি আরো বলেন তারা ঘন ঘন রাজা হত্যা করে নতুন রাজা বানায়। সুমাত্রায় (পার্সে) ও মালাক্কায় ধূর্ত অসাধু ও বিশ্বাসঘাতক বাঙালীরা এত ঘৃণ্য যে কোন লোককে অপমান করতে তারা তাকে 'বাঙালী' বলে অভিহিত করে। মাল্লাক্কার অধিকাংশ বাঙালী জেলে ও দর্জি। তাদের কেউ কেউ নানা গর্হিত কাজ করে'। সম্রাট বাবর বাঙালীদের ব্যক্তির নয়, সিংহাসনের অনুগত বলেই জানতেন। একজন বাঙালী ইতিহাসবেত্তা বিদ্বানের ধারণায় প্রাচীন বাঙালী চরিত্র এরূপ ঃ 'শাস্ত্রচর্চায় ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য.........আবর্তন ও বিপ্লব দুঃসাহসী সমন্বয় স্বাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙ্গালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্য ধারায়......বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী, যে আদর্শ যে ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংলাদেশে তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্যবোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া, নিজের ভাব ও রূপ দেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙ্গালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।[১০২] বাঙালীর বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেয়ার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধ যান, যোগ, দেহতত্ত্ব, কায়াসাধন ও পার্থিব জীবনের মিত্র ও অরিদেবতার পূজা প্রবণতার কারণও এই ঃ

"প্রাচীন বাঙ্গালীর হৃদয়াবেগ ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে এবং দেব-দেবীর রূপ কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।.....সিদ্ধারা বলতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নেই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই।......অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙ্গালী চিত্তে স্বল্প ও শিথিল।.....বাঙালীর বুদ্ধি, একটা শাণিত দীপ্তিও লাভ করিয়াছিল....বাঙ্গালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত করে নাই। ......তখন (মুসলিমবিজয়কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে শিল্পে,সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার'। ১০২

আমাদের ধারণায় বাঙালী স্বভাবে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ রয়েছে, ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠ ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তার হাসিকান্নাক্রোধ সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত ও সাময়িক। তার গীতিপ্রবণতার উৎস এখানেই। সে কালোপিঁপঁড়ের মতোই স্বাতন্ত্র্যে, ধূর্ততায় ও অস্থিরতায় আস্থা রাখে। তাই সে ধূর্তামি যত জানে বুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না। ফলে আত্মরক্ষার ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কলুষিত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। আত্মরতি তার এতই প্রবল যে স্বতন্ত্র জীবন-প্রচেষ্টায় সে সদা উন্মুখ, তাই তার সঙ্ঘশক্তি নেই। ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে সে একতার ও বুদ্ধির অবদান গ্রহণে অসমর্থ।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালী মুখে তথা তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্য ধর্মী, কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে একান্তই অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় 'বস্তুবাদী', গণ-কথায় 'জীবনবাদী', আর নীতিবিদের চোখে 'ভোগবাদী'। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে বাঙালী ভোগী এবং ভোগমোক্ষবাদী। এজন্যে বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোগবাদ অধ্যাত্মচিন্তার উপর বারবার জয়ী হয়েছে। তাই নৈরাত্ম্য নিরীশ্বরবাদী নির্বাণকামী বাঙালী বৌদ্ধ যোগ- তান্ত্রিক দেহসাধনায় অমর হতে চেয়েছে। জীবনকে জগৎকে সে ভালবেসেছে। এ মর্ত্যপ্রীতিই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে বৌদ্ধ চৈত্যকে দেবদেবীর আখড়া বানাতে এবং নির্বাণের নয়, জীবনের ও জীবিকার, আরামের ও বিলাসের বরদাতা দেবতারূপে তাঁদের পূজা করতে।

বাঙালী ভোগলিপ্সু বটে, কিন্তু সে কর্মকুণ্ঠ, তাই পৌরুষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার বা জীবনোপভোগের প্রয়াস তার ছিল না। মহাজ্ঞান, তুক-তাক, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা খিড়কী দোর দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তার কর্মাদর্শ তথা জীবনের লক্ষ্য ছিল। পাল আমল এমনি করে কাটল।

আবার সেনআমলে উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্যবাদ দৃঢ়মূল করার প্রয়াস হল, তখনো একই কারণে মায়াবাদ তথা জ্ঞানবাদ, পরব্রহ্মপ্রীতি কিংবা জীবাত্মারহস্য প্রভৃতিতে সে কোনো উৎসাহ বোধ করেনি। পরলোকে প্রসারিত জীবনে বস্তুত পরমাত্মায় তার কোনো আস্থাই ছিল না। তাই সে চণ্ডী (অন্নদা বা দুর্গা) মনসা, শীতলা,ষষ্ঠী, শনি, সরস্বতী প্রভৃতি মিত্র ও অরি দেবতা সৃষ্টি করে তাঁদের পূজা দিয়ে জীবিকার ব্যাপারে স্বস্তি খোঁজে।

আবার একই উদ্দেশ্যে ইসলামোত্তর যুগে বিশেষ করে মুঘল আমলে হিন্দুর পুরোনো ধর্মের জীর্ণতায় এবং ইসলামের নির্দেশের প্রতি অবহেলায় গণমানসে সত্যপীর- সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড়খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি, শীতলাদেবী, বাস্তুবিবি-বাস্তুদেবী প্রভৃতি জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা সহায়ক দেবতা প্রতিষ্ঠা পান। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এ একই মানসিকতার ফল। অতএব কোন বৃহতের ও মহতের সাধনা বাঙালীর কোনো কালেই ছিল না। চৈতন্যাদি মহাপুরুষের আবির্ভাব তাই ব্যতিক্রম এবং আকস্মিক। চৈতন্যের ও রামকৃষ্ণের মতের প্রচার ও প্রসারক্ষেত্র তাই বাঙলাদেশ নয়। বলেছি বাঙালী একান্তভাবে জীবনসেবী ও ভোগবাদী। এজন্যে সে তুচ্ছ জেনেছে আত্মা-পরমাত্মাকে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা।

যেখানেই সে ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানেই তার লুব্ধ চিত্ত কাঙাল হয়েছে। পৌরুষ তার ছিল না। ভীরুতা ও কর্মকুণ্ঠা তার মজ্জাগত। তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে দেব-নির্ভর অথবা অপ্রাকৃত শক্তি ও উপায় সন্ধান ছিল তার লক্ষ্য। তবে লোভের তীব্রতায় এবং ত্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের জন্যে মরীয়া হয়ে বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু জৈবধর্মের প্রতিকূল নিছক অধ্যাত্মচিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করেনি, তবু তার প্রাণপ্রাচুর্যের ও স্বাধীন মননের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার স্বধর্মে ও স্বভাবে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোন মতাদর্শই সে কোনোদিন মনে প্রাণে বরণ করেনি। এ স্বাতন্ত্র্য ও অনমনীয়তা একালে দেশে-বিদেশে তার মর্যাদা অবশ্যই বাড়িয়েছে।

১০ নেশা

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তামাক সেবন করত। রসিক কবিরা 'তামাকুপুরাণ' এবং হুক্কাপুরাণ[১০৩] রচনা করেছেন। 'চৌদ্দশত দরবেশ চলে আরবোলা হাতে।[১০৪]

আঠারো শতকের কবি শেখসাদীর 'গদা-মালিকা' কাব্যে তামাক সেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলা হয়েছে ঃ

গদাএ বলে যেই ক্ষণে কলি করিল প্রবেশ/তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ। অন্য হতে জানিব তামাক বড় ধন/তামাক বৃদ্ধের বালকের রাখিব জীবন। লজ্জা হারাইব লোকে তামাকের হাতে/হাঁটয়া যাইতে লোকে পিব পথে পথে খাইতে না ভরে পেট মিছা ফাঁকফুক।

এ ছাড়া গাঁজা মাংস ও মদ (করণবারি)[১০৫] শৈব-শাক্ত সমাজে ধর্মীয় বিধির অজুহাতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। 'মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।' গাঁজার চলই ছিল বেশি। পান-গুপারী ভক্ষণ ছিল মুখশুদ্ধির উপায় এবং জনগণের অন্যতম বিলাস। পান-গুপারী দিয়েই আগন্তুককে আপ্যায়ন করা হত।[১০৬] আমানি, ধেনো, তালো, ও খেজুর মদ লোকপ্রিয় ছিল। গাঁজা ছাড়াও অনেকে চরসে ও চুণ্ডুতে ছিল আসক্ত।

১১ গান বাজনা

গান-বাজনাও হিন্দু-মুসলিম সমাজে সমান লোকপ্রিয় ছিল। চট্টগ্রামে হিন্দু ও মুসলিম রচিত রাগতালের ও গানের বহু গ্রন্থ মিলেছে। বিশেষ করে কলন্দরিয়া, চিশতিয়া কাদিরিয়া খান্দানের সুফীদের আগ্রহে গান-বাজনার বহুল চর্চা হয় মুসলিম সমাজে। প্রায় সব মুসলিম কবিই গান রচনা করেছেন, রাগ-তালের গ্রন্থও রচনা করেছেন অনেকেই।[১০৭] এক সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর জন্যেও চারটি সুর তৈরি হয়—গড়েনহাটি, রেনিটি, মনোহরশাহী এবং মান্দারনী।

মন্দিরা মৃদঙ্গ কাড়া শিঙ্গা ঢাক দোতারা শঙ্গ সানাই কর্ণাল ফুকরে।

মধুবেলি চঙ্কবাঁশি নানা বাদ্য রাশি রাশি যথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে।

এছাড়া ডম্বরু, শঙ্খ, সানাই, বীণা, বেণু, সিঙ্গা, পিনাক, পাখোরাজ, দোহরা মোহরা, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরা, করতাল,তবলা, মুরলী, রবাব, সেতার, বেহালা, ভেউল, কাঁসা, তাম্বুরা, কবিলাস, মন্দিরা, ভাঙ্গরি, ভুষঙ্গ, প্রভৃতি তো ছিলই উচ্চবিত্তের ঘরে। আলাউল তো প্রথমজীবনে সঙ্গীত শিক্ষকই ছিলেন। তিনি কথা, সুর, এবং তালও যোজনা করতে পারতেন, গাইয়ে তো ছিলেনই। কাব্য তথা পাঁচালী মাত্রই গীত হত। পাঁচালী গানই সর্বত্র চালু ছিল এবং জনপ্রিয় ছিল।

বেশ্যা, পেশাধারী নর্তকী ছাড়াও মেয়েরা মেয়েদের মেয়েলী (সহেলা) গান গেয়ে নাচত।[১০৮] অন্য লোকেরা সঙ্গীত ও নৃত্যে একেবারে অজ্ঞ ছিল না। হাড়ি হোম বাগদীরাও ছিল গাইয়ে বাজিয়েঃ

কেহো নাচে কেহো গায় কেহো হাসি যন্ত্র বায় রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।

—মুহম্মদ কবীর

চীন সূত্রে বাঙালীদের সম্বন্ধে জানা যায়—

The Bengalees are good singers and dancers to enleven drinking and feasting[১০৯]

১২. খেলাধূলা

পাশাখেলা সর্বস্তরের লোকের মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে চালু ছিল। অনেকটা এ যুগের তাসখেলার মতোই, সর্বত্র জনপ্রিয়ও ছিল। ধনপতি সদাগর রাজার সঙ্গে 'রাত্রিদিন খেলে পাশা।' গেড়ুয়া (গেণ্ডুয়া) খেলাও [কাঠের বল বা ফুলের স্তবক লোফালুফি] চালু ছিল। পর্তুগীজরা আসার পরে তাসখেলাও চালু হয়। চোগা বা পলো খেলা চালু ছিল দরবারের ওমরাহ-সামন্তদের মধ্যে। কুস্তী বা মল্লক্রীড়া (দোসর যমের দুত/বৈসে যত রাজপুত/ মল্ল বিদ্যা শিখে অবিরত) আর চাঁচরী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনোক্ত) খেলাও ছিল। হা ডু ডু, কানামাছি, বুড়ীছোঁয়া, দাড়িয়াবান্দা, খেলাতো ছিলই। তাছাড়া দেহগঠন ও ব্যায়ামচর্চাও ছিল, আরো ছিল শক্তিচর্চার অবলম্বন লোহার বল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙা, সরিষার থেকে মুঠি দিয়ে তেল বের করা, মুঠির আঘাতে নারিকেল ভাঙা প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে আর সাপের নাচ, বানরের নাচ, খঞ্জনের নাচ, বুলবুলির বা পায়রার লড়াই, আর মোরগের মোষের ও ষাঁড়ের লড়াইতো দেখানো হতই।

যাদুকর বহুরূপী কসরৎশিল্পী প্রভৃতিও ছিল, দীর্ঘ বাঁশ হাতে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা প্রভৃতি এবং পোষা বাঘ-ভালুক নিয়ে নানা লোমহর্ষক খেলা দেখানো হত। এ সব খেলায় শিঙ্গা শঙ্খ ঘন্টা ডম্ফ ডুগডুগি, ডম্বরু বিষাণ মৃদঙ্গ প্রভৃতিও বাজানো হত।

১৩ দাসপ্রথা

দেশে দাস প্রথা চালু ছিল। মানুষ বেচা-কেনা হত। অনেক সময় দলিল[১১০] করেই বেচাকেনা হত তাছাড়া, গরু-ছাগলের মতো বাজারেও বিক্রয় হতো। বিগত শতকেও ভাগলপুরের বাজারে মানুষ বেচা-কেনা হতো বলে শুনেছি। সমাজে বাঁদী-গোলামের সংখ্যাধিক্যেই আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যেব পরিমাপ হতো।[১১১] বেচা-কেনা বন্ধ হলেও ১৯৩০ সন অবধি ভদ্রলোকদের গোলাম ছিল।

১৪ ঘরবাড়ী

সামন্তযুগে এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিকেও সামন্ত-জমিদারদের চোখে প্রজারা ছিল দাসের মতোই। তাদের বিনা অনুমতিতে নিজের ভিটেতে ঘর-বাঁধা, গাছকাটা পর্যন্ত চলত না। আর্থিক সাচ্ছল্য থাকলেও ইচ্ছে মতো জুতো-পোশাক পরা চলত না। পাকা ইটের ঘরও নির্মাণের অধিকার ছিল না। তাই গাঁয়ে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের ইট-পাথরের ঘরবাড়ি ছিল না, শাহ-সামন্ত-জমিদার-সদাগর নির্মিত পাকা মন্দির-মসজিদ ছিল কৃচিৎ কোথাও।

রাজধানীতে ইট-পাথরের দালান কোঠা অবশ্যই ছিল। জমিদার-সামন্ত বাড়িও ছিল পাকা। কিন্তু সাধারণের বাড়ি ছিল মাটির ও বাঁশের তৈরি। কুড়েঘর ও পাতার বা পর্ণগৃহের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। কক্সবাজার অঞ্চলে কাঠের সুলভতার ফলে এবং আরাকানের ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাবে কাঠের বাড়ি ছিল। আধুনিক সীতাকুণ্ড এলাকার কাঠগড়ে আরাকানীদের কাষ্ঠনির্মিত দুর্গ ছিল।[১১২]

সন্দ্বীপে ফতেখান ও আবু তোরাব চৌধুরী বাঁশের দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। গত শতকের তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা প্রখ্যাত। আবুল ফজল বলেন ঃ Their houses are made of bamboos, some of which are so constructed that the cost of single one will be five thousand rupees.[১১৩] মীর্জা নাথান শুপারীগাছ দিয়ে যশোরে ত্রিতল গৃহ নির্মাণ করেছিলেন।[১১৪] বাঁশের ঘর দোচালা ও চৌচালা হতে পারে। দোচালা ঘরের চাল হাতীর পিঠের

আদলে তৈরি হত (ধনী লোকের আট চালা হত)। জলের মাঝখানে জলটুঙ্গী নামে বিলাসগৃহ এবং এ যুগের প্যাভিলিয়নের মতো হাওয়াখানাও তৈরি করত বিলাসী ধনীরা। ঘরের সমুখের কক্ষকে হাতিনা, মধ্যের কক্ষকে পিড়া (চৈতন্য ভাগবতেও পিড়া inner apartment অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) এবং পেছনের কামরাকে আওলা বলে। এই আওলা অনেক সময়ে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৈঠকখানাকে দেউরী বা কাছারী চট্টগ্রামে ছাড়া অন্যত্র হিন্দুসমাজে চণ্ডীমণ্ডপ বলা হয়।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল সূত্রে জানা যায়, চৌচালা ও বাঙ্গালো (Bunglow) ঘর জনপ্রিয় ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার বারমাসীতে গরীবের ঘরদোরের বদহাল প্রত্যক্ষ করেছি। Tavernier ঢাকার সূত্রধরদের ঘরবাড়ি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেনঃ 'properly speaking only miserable huts of bamboo and mud' সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে ঃ

'চলৎ কাষ্ঠং গলৎ কুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।

বাতুপদার্থিমণ্ডুকাকাকীর্ণ জীর্ণং গৃহং মম'—এমনি দরিদ্র গৃহের চিত্র পাই। দুর্ভিক্ষ, ভিখারী, চোর প্রভৃতি শব্দ যখন যে-কোন ভাষায় সুপ্রাচীন, তখন দারিদ্র্য থেকে মানুষের কোন কালে ও দেশে মুক্তি ছিল না। কেবল অনুপাতের তারতম্য ছিল। ম্যানরিক বলেছেন, এ দেশের গরীবের চারটির বেশি মাটির হাড়ি সরা সানকিও ছিল না।[১১৫] 'প্রাচীন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' এবং 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেন বাঙালীর দারিদ্র্যের তথ্যনির্ভর প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। গৃহনির্মাণে ও গৃহপ্রবেশে বার-তিথি-ক্ষণের প্রভাব স্বীকৃত হত।[১১৬] সচ্ছল গৃহস্থ ঘরে ও ধনী ঘরে কারুশিল্পজাত আসবাবপত্র ছিল। তেমনি ছিল সোনা রূপা-পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র। অন্যদের থাকত মাটির হাড়ি সরা সানকি পাতিল খোলা ও কাঁসা-পিতলের থালাবাটি।

১৫. মুদ্রা ও বিনিময়

বাঙলাদেশ চিরকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। পৃথিবীর নানা দেশের বাণিজ্য তরী ভিড় জমাত চট্টগ্রাম তমলুক সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে। কাজেই বিনিময় ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন। দ্রব্যের মুদ্রামান দুটোই চালু ছিল, যদিও পাল-সেন আমলের মুদ্রা মেলেনি। কাজেই ভিন্ন রাজ্যের মুদ্রাও চলেছে, কড়িও চলত।[১১৭] কড়ির চল উনিশ শতকে এবং বিশ শতকেরও প্রথম দশকে ছিল এবং বুড়ি-গণ্ডা-পণ ও কাহনের হিসাবে মূল্যমান নির্ধারিত হত।

১৬. কৃষি শিল্পদ্রব্য

বাঙলাদেশে ধানই প্রধান সম্পদ। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে তুলার চাষ হত এবং কাঠ মিলত। লঙ্কা, ইক্ষু, সুপারী প্রভৃতি জনগণের প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হত। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে গুড় চিনি বস্ত্র লবণই উল্লেখ্য। নৌকা ও জাহাজ[১১৮] নির্মাণও তারা করত। পার্বত্য সেগুন, জারুল, গর্জন কাঠ তাদের রপ্তানি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৭. ব্যবসায় বাণিজ্য

চট্টগ্রামবাসীর নৌ-বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য ও খ্যাতি ছিল।[১১৯] গোটা বাঙলার ও কামরূপের (আসামের) উত্তরভারতের নেপালের ও তিব্বতের পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হত তমলুক, সাতগাঁও, বাঙালাবন্দর, হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর দিয়ে। কামরূপের চন্দন, উত্তরভারতের গম, যব, সুতি ও সিল্কের কাপড়, মসলিন, কাঠ, চামড়া, চাউল প্রভৃতি এসব বন্দর দিয়েই হ'ত রপ্তানি। সেযুগের বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীরা স্ব স্ব পেশা নিয়েই থাকত, কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য উচ্চবিত্তের লোকদেরই পেশা ছিল। আর কৃষক ও পেশাজীবীরা স্থানীয় বাজারেই তাদের উৎপন্ন বা শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে সন্তুষ্ট থাকত। উক্ত সব বন্দরের ব্যবসায়ীরা কেবল বাঙালী ছিল না, ছিল মধ্য এশিয়ার, ইরানের, ইরাকের, আরবের, উত্তরভারতের। এবং ষোল শতক থেকে য়ুরোপীয়রাই ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক ছিল। আমদানির দ্রব্যের একটি আদর্শায়িত চিত্র ঃ

১. সদাগরে বোলে শুন দাঁড়ি-মাঝি ভাই
দ্রব্য সব নৌকায় তোল দেশে চলি যাই।
চাঁদের চামর তোলে তার নাই ওর
মুক্তা শর্করা তোলে মনে মনে হাসি।
আর যথ দ্রব্য তোলে তার নাই সীমা
লবঙ্গ জাতি ফল তোলে কি কহিমু মহিমা।
পশুবস্ত্র আদি তোলে তশরের জোর।
শঙ্খ চন্দন তোলে মুক্তা রাশি রাশি
তামা পিতল তোলে নানা জাতি ফল......
নানা জাতি বস্ত্র তোলে নানা উপকার
সুবাসিত জল তোলে করিতে আহার।[১২০]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে বিনিময় পণ্যের একটা তালিকা এরূপ ঃ
ফরঙ্গ বদলে তুরঙ্গপাব নারিকেল বদলে শঙ্খ/বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুণ্ঠের বদলে টঙ্ক। /তুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া/গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া।/সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুয়ার বদলে পলা/পাট শণ বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীলা।/লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা/আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে হরিতাল বদলে হীরা। / চঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া / সুক্তার বলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

আরো আছে মাষ মুসারি তণ্ডুল বদরি বরবটি বাটুলা চিনা গোধুম মাড়য়্যা তিল ছোলা ইত্যাদি। তালিকায় অতিশয়োক্তি রয়েছে নিশ্চয়ই, তবে এর প্রত্যেকটিই যে আমদানি বা রপ্তানি পণ্য তাতে সন্দেহ নেই।

সে–যুগে একালের মতো বিরাট বিপুল বুর্জোয়া সমাজ বা মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠেনি, সামন্তসমাজে গোমস্তা বেনেরাই ছিল তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও মধ্যশ্রেণী আর সবাই ছিল প্রান্তিকচাষী, ক্ষেতমজুর ও দাসশ্রেণীর লোক এবং আরো ছিল কামার কুমার তাঁতী নাপিত ধোপা হাড়ি ডোম বাগদী কৈবর্ত প্রভৃতি বৃত্তিজীবী যাদের পক্ষে ধনসম্পদে ঋদ্ধ হওয়া কখনো সম্ভব ছিল না। এ কারণেই মঙ্গলকাব্যে, কিংবা ইবনে বতুতার চৌদ্দশতকে প্রদত্ত দ্রব্যমূল্য বা ইতিহাসে (১৭২৯ খ্রীঃ) বিধৃত দ্রব্যমূল্য নিতান্ত নগন্য। টাকায় উৎকৃষ্ট সরু চাল ১মণ ১০সের, মোটা চাল মিলতো ৭ মণ ২০সের, তেল মিলতো ২১-২৪সের,ঘি ১০-১১ সের (১৭২৯ খ্রীঃ)।

বারবোসা (১৫১৪খ্রীঃ) সম্ভবত সোনারগাঁকেই 'বাঙ্গালা শহর' বলে অভিহিত করেছিলেন, কেননা র‍্যালফ ফিচ ও তোম পিরেস বর্ণিত সোনারগাঁর সঙ্গে বারবোসা বর্ণিত সিটি অব বাঙ্গালার মিল আছে।[১২১] রাজধানীর নামে রোমসাম্রাজ্য বা দিল্লী সাম্রাজ্য যেমন অভিহিত হত, তেমনি হয়তো বাঙালা শহর (সিটি অব বাঙ্গালা) নামে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী বা বাণিজ্যবন্দরকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ শহর হয় চট্টগ্রাম নয়তো সোনারগাঁও অথবা সন্দীপ বন্দর হওয়ার কথা। তোম পিরেস উড়িষ্যারাজ্যের বন্দরের নামে উড়িষ্যা বলে উল্লেখ করেছেন (সুখময়, বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)

তোম পিরেসের চোখে বাঙালীরা বড় বেনে জাত আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির এবং স্বাধীন প্রকৃতির বটে, তবে সব বাঙালী বেনেই অসাধু ব্যবসায়ী এবং বাঙলাদেশ অতিশয় সমৃদ্ধ।

বারবোসা বলেন,"All of these are great merchants and they possess great ships after the fashion of Mica, others there are from China which they call Juncos which are of great size and carry great cargoes. With these they sail to Choramandel, Malaca, Camatra, Pegu, Cambaya and Ceilon and deal in goods of many sorts with this county and many other.[১২২]

Ralph Fitch বলেন "Sinnergaon (Sonargaon) is a town six leagues from serrcepore (Sreepur, Dacca) where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India..... great store of cotton cloth goeth from hence and much rice where-with they serve all India, Ceilon, Pegu, Malaca, Sumatra and many other places.[১২৩]

অতএব, উভয়েই বলেছেন, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা, কাম্বে, করমণ্ডল ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল প্রভৃতি নানাস্থান থেকে বাণিজ্য তরী বাঙ্গালাশহর বা সোনারগাঁয় আসত। বারবোসা বলেছেন চীনা বাণিজ্যতরীর নাম ছিল জাঙ্কো এবং অন্য বিদেশী বণিকদের তরীগুলো ছিল আরবি জাহাজের আদলে তৈরি।

সোনারগাঁয়ে চট্টগ্রাম হয়েই যেতে হত। কেননা গঙ্গামুখ তখন চট্টগ্রামের অদূরেই ছিল[১২৪]। কাজেই ষোল শতকে চট্টগ্রাম বন্দরের রূপও এমনি ছিল। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত কিংবা মুকুন্দরাম বাঙালার বহির্বাণিজ্যের ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে অতিশয়োক্তি কম। Ralph Fitch যখন চট্টগ্রামে যান (১৫৮৫সন) চট্টগ্রাম তখন আরাকান অধিকারে এবং একটি সমৃদ্ধ বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দরের তুলা, চন্দন, (মুসাব্বর-ঘৃতকুমারী-aloe)চাউল প্রভৃতি আবিসিনিয়ায়, গ্রীসে, আরবে, ইরানে এবং পূর্ব ভারতিক দ্বীপপুঞ্জে ও চীনে রপ্তানি হ'ত। এক কথায়, সে-যুগের পৃথিবীর বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। পেরিপ্লাস, আরব ভৌগোলিক সোলেমান, মাসুদী খোর্দাদবেহ প্রমুখ দ্য বারোজ, বার্থেমা, ফিচ, ইবন বতুতা, মার্কোপলো, মাহুয়ান প্রভৃতির এবং বিভিন্ন চীনা বাণিজ্যমিশনের বর্ণনার মধ্যে এ বন্দরের আন্তর্জাতিকতার ও সমৃদ্ধির প্রমাণ মেলে। ষোলশতকে পর্তুগীজেরা এদেশের সঙ্গে আরব-ইরানি বাণিজ্য গায়ের জোরে তথা লুটতরাজের মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়।[১২৫]

বারবোসা এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের নামও করেছেন ঃ তুলা, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, লেবু, শুষ্কফল প্রভৃতি এবং প্রাণীর মধ্যে ঘোড়া, গরু, মেষ প্রভৃতি বহু পশু পাখির সুলভতার কথা বলেছেন।

শিল্পদ্রব্যের তালিকায় আছে ঃ মিহি ও রঙিন বস্ত্র, সারবান্ত (শিরবন্দ ?), মামোলা, দোগায়জা (দোগজী ?), চৌতার (চাদর), বিতিলহা প্রভৃতি বস্ত্র এবং চিনি প্রভৃতি। মাহুয়ানের বর্ণনায়ও বিচিত্র সুতি কাপড়ের কথা আছে : চি চিহ, মানচে-তি, শ-না-কিচ, হিন-চি তুঙ-তালি।[১২৬] ইবন বতুতা কাপড়ের এবং মার্কোপলো চিনির কথা বলেছেন। বারবোসা খোজা (Eunuch) করা সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ হিন্দুর সন্তান ক্রয় করে ব্যবসায়ীরা খোজা করত খোজারা অন্দরে চাকর, সৈনিক এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত হত।[১২৭]

১৮. যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র

ভেতো ভীতু বাঙালীর নিন্দা সুপ্রাচীন। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি নীতির অনুসরণে ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেগে যাওয়াই তাদের নীতি। মধ্যযুগ থেকে উনিশ বিশ শতক অবধি প্রাচীন ধারার পাঁচালীতে বা প্রণয়োপাখ্যানে কিংবা দোভাষী পুথিতে যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র রামায়ণ-মহাভারতের আদলেই বর্ণিত। এ ক্ষেত্রে সব কবিই ধ্রুপদী রীতি-নিয়ম মেনে চলেছিলেন। যদিও তাঁদের তীরধনুক বর্শাবল্লম শাল ও তীর নিক্ষেপযন্ত্র আরদা, মঞ্ছালিক, কামান, বন্দুক, কিরিচ, ছোরা, তরবারী প্রভৃতির ব্যবহার মুঘল যুগে তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। চতুরঙ্গ বাহিনী থাকত বটে। তবু দ্বন্দ্বযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, দ্বৈরথযুদ্ধ, বাণযুদ্ধই হয়েছে বর্ণিত। কাজেই যুদ্ধ বর্ণনায় কবিমাত্রই ছিলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অনুকারক ও অনুসারক। অস্ত্রও ছিল সেকালের সুতরাং যুদ্ধবর্ণনা ছিল একান্তই কাল্পনিক। অস্ত্র ছিল খড়গ বর্শা নারাচ নালিকা গদা, শল্য, শূল, মুষল, মুদগর, ভূষণ্ডী তোমর, পাশ, চক্র, টঙ্কার, অসি, খঞ্জর, বাণ। বাণ ছিল, বহুপ্রকারের অগ্নিবাণ চন্দ্রবাণ অর্ধচন্দ্রবাণ, সিংহবাণ, সর্পবাণ, দিব্যবাণ, গজ বাণ, বরুণবাণ, মেঘবাণ প্রভৃতি।'

যোদ্ধার পোশাকের কিছু কিছু বর্ণনাও মেলে লোহার জিরাই কাবাই পাগড়ী শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্দ ইজার টুপি ঢাল বর্ম ইত্যাদি। রাঢ়ের আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম—অগ্রগামী ডোমসৈন্য পার্শ্বচর ডোমসৈন্য ও অশ্বারোহী ডোমসৈন্যের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এদের হাতে বালা, কানে সোনা, কোমরে ঘাঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধনুক, পিঠে তূণে বাণ।

পরিলা ইজার খাসা নাম মেঘমালা কাবাই পবিলা দশদিক করে আলা

পাসরি পটিকা দিয়ে বান্ধে কোমরবন্দ এবং মুঘল সৈন্যদের কাল ধল রাঙ্গাটুপি সবাকার মাথে আর তাদের পায়ে মোজা।—যুদ্ধবাদ্যের নাম ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া দামামা ভেউর বিউগল।

১৯. লোকাচার ও কুসংস্কার

মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদসম্বাদ'-এ (পৃঃ২১৮-২৪) এবং মুজম্মিলের 'সায়াৎ নামায়' লোকাচার ও নানা কুসংস্কারের বর্ণনা এবং আচারিক ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্যাদির নির্দেশ রয়েছে। যেমন গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ, স্নান, নতুন বসন পরিধান, রোগ, ভূত-জীন দেও তাড়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের শুভাশুভ, ঝাড়ন-ফুক-মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি, ঋতু, মাস দিনক্ষণ তিথি-নক্ষত্রের শুভাশুভ, প্রভৃতির বর্ণনা আছে।[১২৮] এগুলো চট্টগ্রামবাসীদের তথা বাঙালীর প্রাত্যাহিক জীবনের আচার-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দু'একটি নমুনা দিই ঃ

গৃহনির্মাণ ঃ	বৈশাখে উত্তম বড়	যদি কেহ নির্মে ঘর ধনে জনে রাখে অনুক্ষণ
	জ্যৈষ্ঠ মন্দখতিশয়	মিত্র সব শত্রু হয় আষাঢ়ে না রহে চতুষ্পদ।
স্নান ঃ	সোমে-গুরু ধন বারে	মঙ্গলে যে স্নান করে আউ টুটি চিন্তা উপজয়।
রোগ ঃ	রবিবারে রোগ হয়	সপ্তদিন মহা ভয় কিবা পঞ্চ দিবস সংশয়।
	কৃষ্ণ কুরক্কুটী দিব	দানে বিঘ্ন খণ্ডাইব বুধবারে রোগ হয় যার।
ভূতদৃষ্টি ঃ	ভূতদৃষ্টে হয় জান	অজা-বৃষ দিব দান।[১২৯]

ঘোড়ার কপালে লোমের ধূয়াঁ, কালো মুরগী, ময়ূরপুচ্ছ, হিঙ্গুল, কস্তুরী, শস্যধূম, জুতর গুড়ো কালোমাটি, গাভীর হাড়, মাছের পিত্ত, হলুদ, চিলের মাংস, প্যাঁচার নখ, কালো বিড়াল, কালো মোরগের বিষ্ঠা, গন্ধক প্রভৃতিও দারুটোনার ও বিভিন্ন ভৌতিক রোগের চিকিৎসার উপকরণ।

বসন পরিধান ঃ	নববস্ত্র শুক্রবারে	পিন্ধিলে উত্তমবারে চিন্তাহোন্ত্রে পরিত্রাণ মনে
	নববস্ত্র ফাড়ি যবে	এহি রবিবারে তবে ফাড়িব শাস্ত্রের পরমাণে।

এ ছাড়া বৌদ্ধ (মঘা) ও হিন্দু গণক, আচার্য জ্যোতিষের কোষ্ঠী, রাশি ও হস্তরেখা গণনা এবং মুসলিম নজুমের ফালনামা তথা ভাগ্যগণনার প্রতি মানুষেরা আস্থা ছিল। বর্ষশেষে ও নববর্ষে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে আচার্যব্রাহ্মণরা গ্রহবিপ্ররা ও গণকেরা ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের সবারই ভাগ্য গণনা করত আর ধান-চাল ও অর্থ উপার্জন করত। মুসলমানেরা ফালনামা তথা অদৃষ্ট গণনার পুথি রচনা করেছেন। সেকালের অজ্ঞ মানুষের সত্যপ্রীতি কুসংস্কারভিত্তিক ছিল। তারা সত্য নির্ণয়ে পানিপড়া, চালপড়া, নলচালা, বাটিচালা প্রভৃতি মন্ত্রচালিত পদ্ধতির অনুরাগী ছিল। এগুলোতে আদিকালের অগ্নি আসন অঙ্গুরী সর্প, লৌহ তুলা এবং ধর্মাধর্ম পরীক্ষা এ অষ্টপরীক্ষাব রেশ ও ঐতিহ্য রয়েছে।[১৩০] ডাকিনী-যোগিনী ঝাড়ফুক তুক-তাক বাণ-উচ্চাটন তাবিজ-কবচ-তাগা-মাদুলী দারু-টোনা বশীকরণ প্রভৃতিতে বাঙালীর বিশ্বাস সুপ্রাচীন এবং এগুলো মঙ্গোলীয় ঐতিহ্যের স্মারক। ভূতের ও জীনের আসরে প্রেতদৃষ্টি প্রভৃতিতে বিশ্বাস আজো প্রায় অটুট। কায়াসিদ্ধি ভূতসিদ্ধি খেচরসিদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বও সুপ্রাচীন।

এখানে উল্লেখ্য যে দেশজ-মুসলমানদের মধ্যে বৌদ্ধ হিন্দু পিতৃপুরুষের আচার-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, তত্ত্বচেতনা ও মনন-ধারা থেকে গিয়েছিল যেমন অবিমোচ্য হয়ে বৌদ্ধজ হিন্দু সমাজে রয়ে গেছে বৌদ্ধ বিশ্বাস, সংস্কার, আচার ও দেবতা। নিরক্ষর নির্জ্ঞান মানুষের শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না—আচারিক সম্পর্কই তাদের ধর্মতৃষ্ণা মেটায়। সাংখ্য-যোগ তন্ত্র চেতনা ছিল সুপ্রাচীন বাঙালীর মর্মমূলে। তা-ই বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধপ্রভাব স্বীকার করে এবং ব্রাহ্মণযুগে ব্রাহ্মণ্য আবরণ গ্রহণ করে আর দেশজ মুসলিমসমাজেও চালু ছিল ইসলামি আবরণ নিয়ে এবং এখনো রয়েছে। এ জন্যেই নাথগীতিকা, গোরক্ষবিজয় ও যোগতত্ত্ব বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার

প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। তাই সহজিয়া-বাউলমতই বাঙালী মাত্রেরই আদি মতের আধুনিক রূপ। এ জন্যে বৌধ-হিন্দু যোগতন্ত্রের এবং দেশজ মুসলিম সূফীতত্ত্বের লক্ষ্যে ও সাধনপদ্ধতিতে মৌল সাদৃশ্য বিদ্যমান।

আঠারো শতকের উষাকালের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার তাঁর রচিত 'শরীয়ৎনামা' গ্রন্থে দেশজ মুসলিমের ঘরোয়া, সামাজিক ও শাস্ত্রিক জীবনে বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন সংক্ষেপে। যেমন মুসলিম কন্যা বা বধূ প্রথম রজস্বলা হলে বাজনা বাজিয়ে সহেলার ও নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করা হত। রজস্বলা নারীকে ছুঁইলে অন্যদের স্নান করে পবিত্র হতে হত। রজস্বলা হিন্দু নারীর মতো মুসলিম নারীরও ৫/৭ দিন পরে নাপিত দিয়ে নখ কাটিয়ে পরিধেয় বস্ত্র ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে গোবরজলে ঘর লেপন করে শুদ্ধির ব্যবস্থা করা হত। প্রসূতি ও আঁতুড় ঘর সম্বন্ধে হিন্দুর মতোই অপবিত্রতার ধারণা ছিল তাদের। মাথায় করা ডালায় বা কুলার ধান দূর্বা ঘট আম্রসার নিয়ে গাঁয়ের বউ-ঝিরা শিরনীর জন্যে ভিক্ষা চেয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরত। মৃতদেহও অপবিত্র মনে করা হত। মৃতের পরিবারের লোকেরা নাপিত ডেকে চুল-দাড়ি খেউর করাত, নারীরাও কাটাত নখ। শিশুর কল্যাণে ষষ্ঠীর বদলে নিমরিয়া পীর-এর উদ্দেশে মোরগ বলি দিত। সূর্যমুখী কলার নৈবেদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণের দ্বারা পুষা (পুষ্কর) দেবতার পূজা দিত, মহালক্ষ্মীর নামে বলি দিত হাঁস। হাঁসের রক্ত ছিটিয়ে দিত ধানের গোলায়। আবার 'কেহ কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস।' কদলী-তণ্ডুল আটা কাঁচা দুধ দিয়ে তৈরি অপক্ব শিরনী ফাতেহা দিয়ে গলায় তৃণ বেঁধে সে-শিরনী খেত ওরা। বৌদ্ধদেবতা (আরাকানী) মঘিনীকে ছাগল উৎসর্গ করত, পুকুর বা রাস্তা নির্মাণকালেও মঘদের মতো 'বিষুর ভিতরে অকূপ করএ। বিষুব-সংক্রান্তির দিনে মুসলিমরা গৃহপালিত গরু ছাগলকে গলায় ও শিঙে ফুলের মালা দিয়ে সাজাত এদিন কেউ কেউ অঙ্গে হলুদ ও চন্দন মাখত। মঘদের (চট্টগ্রামবাসী ও আরাকানী বৌদ্ধদের) মতো মুসলিম বরও মাথায় 'কুসুমের বন' নামের সোলার টুপি পরত আর 'ধূপ-ধান্য-পিঠা-কলা-শিলাপূর্ণ বরণডালা রাখা হত বর-কনের সুমুখে। বিয়ের সময়ে মারোয়া বাঁধত, জুলুয়া দিত আর গেড়ুয়া (গেণ্ডুয়া কাঠের বল) খেলত, পাশা খেলত / সেকালের মুসলিম চাষীরা 'হাল পালন', ব্রত পালন করত। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বসুমতীকে রজঃস্বলা মনে করত বলে প্রথম সাতদিন 'হল' কর্ষণ থেকে বিরত থাকত। চাষীরা যাদু প্রতীক ডিম কিংবা জামগাছের ডাল জমির কেন্দ্রস্থলে পুঁতে প্রথম চাষ আরম্ভ করত। আর শব-ই-বরাতের রাতে মৃত পূর্বপুরুষের কল্যাণ লক্ষ্যে এক এক জনের নামে এক এক জড়া ভাত বা এক এক জোড়া রুটি কলাপাতায় রেখে উৎসর্গ করত 'পূজা-যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাৎ।'

তুর্কি আমলে রাজকীয় সমর্থন হারিয়ে হিন্দুর শাস্ত্রী ও সমাজপতি অসহায় হয়ে পড়েছিল। ফলে সমাজে নিয়ম-নীতি রীতি-রেওয়াজ ও শাসন-শৃঙ্খলা মানা লোকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। তাই বিক্ষুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলে ঃ

বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছজাতি
দেবতা ব্রাহ্মণ হিংসা করে ম্লেচ্ছ জাতি
মৎস্যে মাংসে এক হৈলে বিধবা যুবতী।
ক্ষেত্রীযুদ্ধে শক্তিহীন নাহি যতি সতী।
রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার
গো-পোষণ বলি যজ্ঞ ছাড়িলা বিশ্বদেবা
দুই তিন চারি বর্ণে হৈল একাকার।
শূদ্রসব ছাড়িলেক ব্রাহ্মণের সেবা।

২০ জনগণের আর্থিক অবস্থা

প্রাচীনকালে নয় শুধু, মধ্যযুগেও এমনকি উনিশ শতকেও সাধারণ বাঙালীর জীবনযাত্রা ছিল নিম্নমানের। জীবনে তঙ্কার ব্যবহার করেনি বা তঙ্কা হাতে পায়নি কর্শপণা-কড়ি-কপর্দকই চিরসম্বল তেমন দরিদ্রলোকই ছিল দেশে ও সমাজে সংখ্যাগুরু। সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিত রত্নকোষ, আর্যাসপ্তশতী, শেখ শুভোদয়া, চর্যাগীতি, বৃত্তরত্নাকর, বাসনামঞ্জরী, সুভাষিতাবলী, প্রাকৃতপৈঙ্গল ও মধ্যযুগের সাহিত্য প্রভৃতি সূত্রে তা আমরা জানতে পাই। পর্যটক টমাস বাউরী (১৬৬৯-৭৯) এদেশে এক টাকার মূল্য ৩২০০ কড়ি দেখেছিলেন। বক্তৃতার সময়ে ছিল ১০৫২০ কড়ি। অন্যান্য পর্যটক সূত্রেও মানুষের দারিদ্র্যের খবর মেলে.।

সে-যুগে হিন্দুসমাজে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ অলঙ্ঘ্য ছিল। দেশজ মুসলিম সমাজের মধ্যেও পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ প্রায়ই ছিল ঃ জোলা, বেদে, বারুই, হাজাম, নিকেরী, কুমার প্রভৃতি। কাজেই চামার, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, মোল্লা, পুরুত, শঙ্খ-বণিক, গন্ধবণিক, হাড়ি, ডোম, জেলে, পালকী-বাহক 'কাহার', তাঁতী প্রভৃতির বংশানুক্রমিক আর্থিক অবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে হওয়ার কারণ ছিল না। সেকালে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন প্রণালী ছিল ঋজু। অনাড়ম্বর জীবনে ভাত-কাপড় ছাড়া চাহিদা ছিল সামান্য। তারা বছরের অধিকাংশ সময় খালি গায়ে থাকত, চিরকাল নগ্নপায়ে জীবন কাটাত। সোনার অলংকার ধারণে কিংবা ইট-পাথরের ঘর নির্মাণে না-সহার কুসংস্কারজাত ভীতি ছিল, তা ছাড়া সামন্ত-জমিদাররাও উচ্চবর্ণের লোকেরা তথাকথিত ছোটলোকদের এ সব অধিকারে বঞ্চিত রাখত। অভিজাতরাও তাদের উন্নত জীবনযাপনের ঔদ্ধত্য সহ্য করত না। এক কথায় এরা ছোট ঘরে ছোট মন নিয়ে থাকত, জন্মসূত্রেই কর্মজীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হত তাদের। পুরুষের কৌপীন ও গামছাই ছিল আটপৌরে পরিধেয়, হাটে-বাজারে কিংবা কুটুম্ববাড়ি যেতে হলেই কেবল ধুতি-তহবন, চাদর-কুর্তা, ছাতা লাঠির প্রয়োজন হ'ত। তাও অনেক সময় পরিজন-প্রতিবেশী থেকে ধারে পাওয়া যেত। জমিদারদের শাসন ক্ষমতা ছিল বলেই দাপট ছিল অপরিমেয়। রায়তের জমিতে অধিকারও দৃঢ় ছিল না। ফলে জনগণ জমিদারের অর্ধ-দাসের মতোই ছিল। হুজুরের কাজেকর্মে এদের বেগার খাটতে হত, আর অন্যত্রও হুজুর-মজুরের-সম্পর্ক বান্দা-মনিবের সম্পর্কের চাইতে উন্নত ছিল না।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং রোগ, মহামারী প্রভৃতি প্রাণনাশকর বিপদ আপদে এরা প্রায়ই নিঃস্ব হয়ে পড়ত। ফলে এদের আর্থিক জীবনে চিরকালই অনিশ্চয়তা ছিল। কাজেই দেশের অধিকাংশ লোক গরীব ছিল। রোগে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে তারা মারা পড়ত। এজন্যে সেকালে একালের মতো জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেত না। তাদের সর্বোচ্চ কামনা ছিল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' কেননা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনো উপায় ছিল না সমাজ-ব্যবস্থায়। এজন্যেই সম্ভবত দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। রাহাজানি হত। এমনকি জমিদার ও ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত চুরি ডাকাতি করত। পরের যুগের দেবীসিংহ শোভাসিংহ প্রভৃতির কাহিনী সবাই জানে। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস ব্রাহ্মণসন্তানের চুরি-ডাকাতি পেশার উল্লেখ করেছেন। আর ভিখিরী ও ভেকধারী তো ছিলই। বৌদ্ধভিক্ষু, বৈষ্ণব, শৈব এবং কলন্দর ভেকধারী ভিখিরী সম্মানিত ভিক্ষুক ছিল। মুসলমানেরাও ভিখিরীকে বলে ফকির।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন — আইল, করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন — গাইয়া শিবের গীত বেরি নৃত্য করে।

তখনো উচ্চবর্ণের লোকদের ধনী বা দরিদ্র হবার পথ খোলাই ছিল। রাজ-সরকারেও বিভাগে চাকুরী গ্রহণ, বিভিন্ন ব্যবসা চালানো, দালালী ও উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানাভাবে ধনোপার্জন সম্ভব ছিল। আবার লাম্পট্য, জুয়া, বিলাসিতা প্রভৃতির মাধ্যমে গরীব হওয়াও ছিল সহজ। বস্তুত অশিক্ষিত কৃষিজীবী গৃহস্থরা ডাল-ভাত ও শাক-তরকারীতে তুষ্ট থাকত বলে এবং পোশাক পরিচ্ছদাদির প্রয়োজনবোধ করত না বলেই[১৩১] সমাজে সচ্ছল জীবনযাপন করত। এরাই ছিল এ যুগের ভাষায় মধ্যবিত্ত। আর চাকুরে ও বেনেরা মুৎসুদ্দিরা ও জমিদারেরা ছিল উচ্চমধ্যবিত্ত বা সেকালের মধ্যশ্রেণী। কেননা বড় চাকরী ও জায়গীর পেত সামন্ত-শাসকগোষ্ঠীর অবাঙালীরাই। ফলে বাঙালীর ধর্মীয় ও আর্থিক সমাজ-কাঠামো প্রায় অপরিবর্তিত ও সমাজ অবিচল ছিল। মুকুন্দরাম অঙ্কিত ফুল্লরার ও মোল্লার[১৩২] জীবন-জীবিকার চিত্র, বিজয়গুপ্ত প্রদত্ত জোলা-সঞ্চিত চার পণ কড়ির বর্ণনা[১৩৩] এবং ইবন বতুতা বর্ণিত বাজারদর[১৩৪] থেকে বোঝা যায় দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র ছিল। এ সূত্রে মনে রাখতে হবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বা সোনারগাঁও ঢাকা শহরের ঋদ্ধির প্রতীক বা পরিমাপক হলেও জনগণের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

গুপ্ত আমলের মুদ্রা অনেক মিলেছে, কিন্তু পাল ও সেন আমলের কোন মুদ্রা আজো আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ আমদানি না হোক রপ্তানি বাণিজ্য তাদের অবশ্যই চালু রাখতে হয়েছিল। এরা

হয়তো বহির্বাণিজ্যে পণ্যকে বা রূপার কিংবা সোনার কাঠিকেই বিনিময় মাধ্যম করেছিলেন, আর বাজারে চালু রেখেছিলেন কড়ি অথবা নিম্নমানের কোন ধাতুর মুদ্রা। একালের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর মতো বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙলার কোন প্রভাব ছিল না বলে কিংবা এ দেশে সোনা-রূপার খনি ছিল না বলে মুদ্রা তৈরি না করে পাল-সেনেরা নিতান্ত মিশ্রধাতুর মুদ্রা চালু করেছিলেন হয়তো এবং কালে লোকের ঔদাসীন্যে বিলুপ্ত হয়েছে সেগুলো। তুর্কি আমল থেকে নিয়মমতো ও নিয়মিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তৈরি হত, সব স্বাধীন সুলতান-বাদশাহ-ই স্বনামে মুদ্রা তৈরি করাতেন, কারণ এ ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক।

মসলিন রেশম লবণ সুপারি গুড় চিনি মরিচ কার্পাস প্রভৃতি কয়েকটি পণ্য বাঙলাদেশেরই ছিল বটে, কিন্তু প্রায় গোটা উত্তরভারতের নেপালের তিব্বতের আসামের পণ্যসামগ্রীও তমলুক, সপ্তগ্রাম, বাঙ্গালাশহর, চট্টগ্রাম, হুগলী ও কোলকাতা বন্দর দিয়ে বিভিন্ন কালে বিদেশে রপ্তানি হত। বাঙালী নির্মিত নৌকা-জাহাজও বিদেশে চালান যেত।

এ ক্ষেত্রে একালে সেকালে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। উৎপাদক-শিল্পী-শ্রমিকরা ছিল চিরদরিদ্র ও বঞ্চিত। মালিক-বণিক-ফড়ে দালালরাই বেচাকেনার মজা লুঠতো। কাজেই মসলিন নির্মাতা, তাঁতী রেশম কর্মী কিংবা জাহাজনির্মাতা একালের চা-শ্রমিক বা খনি-মজুরের মতোই ছিল দীন দুঃখী। কাজেই ব্যবসায়ীর ঐশ্বর্য কিংবা বন্দরের অঢেল অজস্র চালু মুদ্রা জনসাধারণকে ধনী করেনি। জমি যার ধান তার। কাজেই ধানাদি শস্যও চাষী-মজুরকে দুর্ভিক্ষের কবল মুক্ত করেনি কখনো। সেকালে ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যার ফলে ৩/৪ বছর অন্তর আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই স্বল্পচাহিদার খালি গা-পায়ের মানুষের খাদ্যের অভাব ঘোচেনি কখনো।

চৌদ্দ শতকের (১৩৪৫-৪৬ খ্রীঃ) ইবন বতুতা দ্রব্যমূল্য এখানে অত্যন্ত কম বলে উল্লেখ করেছেন, টাকায় আট মণ ত্রিশ সের চাল কেনা যেত এবং এটাই বাঙালী ক্রেতার চোখে চড়া দাম। তিন টাকায় দুগ্ধবতী গাভী মিলত, এক টাকায় আটি মোরগ, টাকায় পনেরোটি পায়রা, চার টাকায় চৌদ্দ সের চিনি বা চৌদ্দ সের ঘি পাওয়া যেত ; আর দুই টাকায় পাওয়া যেত ত্রিশ হাত কাপড়। অতএব বাঙালীরা দরিদ্র ছিল। টাকা ছিল দুর্লভ। চীনা পর্যটক ওয়াং তা য়ুয়ান বলেছেন বাঙালীরা কৃষিজীবী, বছরে তিনটে ফসল ফলায়। তারা পরিশ্রমী। বাঙলাদেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম–সস্তা। টাকা নয়, কড়িই ছিল বেচা-কেনার মাধ্যম। এক টাকার সমান ছিল ১০৫২০টা কড়ি। টমাস বাউরীর সময়ে [১৬৬৯-৯৭ খ্রীঃ] ছিল ৩২০০ কড়ি। অতএব টাকা ছিল দুর্লভ। মাহুয়ানের (কও ছুঙ লিঙ) গ্রন্থে বাঙালীর জাহাজের ও জাহাজনির্মাণ ব্যবসার কথা রয়েছে আর আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখ। রূপার টাকা থাকলেও কড়িই মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল। উৎপন্ন দ্রব্য ছিল—গম, তিল, ডাল, জোয়ার, আদা, সরিষা, পিঁয়াজ, ভোঙ, কোয়াস, কলা, আম, কাঁঠাল, আখ, বেগুন, নারকেল, ধান প্রভৃতি, তালের ও খেজুরের রস থেকে তৈরি হত মদ। ছয় রকমের উৎকৃষ্ট সূতী কাপড়ও এরা বুনতো, গাছের ছাল দিয়ে কাগজ তৈরি করত গুটিপোকা পুষে রেশমের চাষও করত। এ ছাড়াও মানুষ পোশাক ও আচার সম্বন্ধে এ গ্রন্থে কিছু অতিশয়োক্তি ও ভুল তথ্য রয়েছে। চীনাদূত ফেই শিন বলেন বাঙলাদেশের (গৌড়ের) লোকেরা যেমন সম্পদশালী তেমনি সৌজন্যেও সুন্দর, তাদের চরিত্রও মহৎ। দেশের লোকেরা ব্যবসায় করে, দেশের মাটি উর্বর, বছরে দুবার ধান পাকে। নারীপুরুষ ক্ষেতে কাজ করে এবং কাপড় বুনে। এরা টাকার বদলে কড়ি ব্যবহার করে। এরা কাপড়, চিনি, ঘি রপ্তানি করে (অন্যান্য রপ্তানিদ্রব্য বাঙলার নয় বলে বাদ দিলাম), বারবোসার বাঙলাশহর যদি চট্টগ্রাম বন্দর কিংবা সন্দ্বীপ বন্দর হয়, তা হলেই বলতে হবে·এখানে বড় বড় জাহাজ নির্মিত হত এবং এ বন্দরে সেদিন পৃথিবীর নানাদেশের ব্যবসায়ী–ভারতীয় য়ুরোপীয় চীনা হাবসি ইরানি আরবি প্রভৃতি আসত। বারবোসা বাঙলার সাদা চিনি ও কাপড়ের তারিফ করেছেন। বাঙলার আদা, কমলালেবু, লেবু, আর বড় মোরগ ও মোরব্বার উল্লেখও করেছেন তিনি। তিনি এ-ও বলেছেন যে খোজা বানিয়ে দাসব্যবসাও করে বাঙলার সদাগরেরা।

গ্রাম্যসমাজ

গ্রামের অশিক্ষিত লোক সমাজ, ধর্ম ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার মেনে চলায় অভ্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে বিদ্রোহ করার কথা তাদের মনেও জাগত না। গাঁয়ে সর্দার তথা মাতব্বর ছিল। গোষ্ঠীপতির নির্দেশে ও পরামর্শে এক এক গোষ্ঠীর লোক পরিচালিত হত। আবার গোটা পাড়ার বা গাঁয়ের একজন বা একাধিক সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বর থাকত। তাদের নির্দেশে ঝগড়া–বিবাদের মীমাংসা হ'ত। কিংবা তারাই বিচার কবে শাস্তি বা খালাস দিত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা জিয়াফত প্রভৃতি অনুষ্ঠানও তাদের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে সম্পাদিত হ'ত। বিদ্রোহী কিংবা অপরাধীকে, (কায়িক শাস্তি দান অসম্ভব হলে) নাপিত ধোপা ও মোল্লা-পুরুত বন্ধ করে, সমাজে পতিত তথা একঘরে করে রাখা হ'ত। এটি অত্যন্ত অপমানজনক চরম শাস্তি। পতিত বা একঘরে লোকের সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করত না। ধোপা, বাদ্যকর, কামার, স্বর্ণকার প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিম সমাজের যোগসূত্র স্বরূপ ছিল। এদের মধ্যে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু বিচিত্র। মুসলিম সন্তানের জন্ম থেকে বিয়ে অবধি সব অনুষ্ঠানে সে ছিল অপরিহার্য। সর্বদেশে নাপিতেরা বাচাল বলে চিরকালীন কুখ্যাতি আছে। নাপিত যথার্থ অর্থে নরসুন্দর, সে পরিবারের সুখ-দুঃখের সাথী সে অনেক রোগের চিকিৎসক, নানা খবরের ভাণ্ডারী। নাপিতকে ধোপাকে (সাদা কাপড়ের ব্যবহার বেশি ছিল বলে) আর মোল্লাকে ও (হিন্দুর) পুরুতকে বার্ষিক ধান্য দানের বিনিময়ে সবাইকে অবশ্যই নিযুক্ত রাখতে হ'ত। ধনীরা ভূমিদানের বিনিময়ে এদের সেবা পুরুষানুক্রমে করত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানপার্বণ এবং সামাজিক-বৈবাহিক উৎসবাদি অবশ্য করণীয় ছিল। অন্যথায় নিন্দায়, স্থায়ী কলঙ্কের লজ্জায় এবং সমাজপতির শাসনে জীবন হয়ে উঠত দুর্বহ।

উপসংহার

মধ্যযুগের সাহিত্যে যথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ বাস্তব সমকালীন সমাজচিত্র মেলে না,। সাহিত্যে আদর্শায়িত বা অতিকথনদুষ্ট কল্পনাপুষ্ট চিত্রই মেলে। তা ছাড়া মূল বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হলে শাস্ত্র সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিষয়ের কিংবা বিশ্বাস-সংস্কারের নীতি-নিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হয়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে অযত্নে বলা কথা থেকেই আমরা যুক্তি-বুদ্ধি খাটিয়ে একটা সামগ্রিক মানস কিংবা বাস্তবচিত্র কল্পনা করে নিতে চাই। ফলে সে–কল্পচিত্র কখনো কায়ারূপে কখনো কঙ্কাল আকারে কখনো বা মায়া রূপেই আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়।

তা ছাড়া সে-যুগের সাহিত্য ছিল দেব-দৈত্য-নর বা রাজা-বাদশা-সামন্ত-সর্দার নিয়ে স্বর্গমর্ত্যপাতালের পরিসরে বাস্তব-অবাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে লৌকিক-অলৌকিকের বাধা অতিক্রম করে মনোময় কল্পলোক রচনার লক্ষ্যে নিয়োজিত। একালের গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধের মতো সমকালের ও স্বস্থানের জগৎ-জীবন-জীবিকা নিয়ে কিংবা শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে কিংবা বাস্তব জীবনের সমস্যা-সম্পদ বা আনন্দ-যন্ত্রণা নিয়ে রচিত নয় বলে এ সাহিত্যে বাস্তব জীবনপ্রতিবেশ কিংবা জীবনচিত্র দুর্লক্ষ্য। কৃচিৎ কখনো কবির অনবধানতায় অজ্ঞতায় কল্পনারদৈন্যে সমকালীন প্রতিবেশ ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়েছে মাত্র। তাই আমাদের লোকায়ত জীবনে, লোকাচারে, লোকসংস্কারে, লোকবিশ্বাসে লোকপ্রচলিত প্রথায়পদ্ধতিতে ও অনুষ্ঠানে যে আদিম যাদুবিশ্বাস ও সংস্কার, আচার ও রীতিনিয়ম অবিকৃতভাবে কিংবা ঈষৎ রূপান্তরে রয়ে গেছে, সে-তথ্য আমরা লিখিত সাহিত্যে পাইনে, পাই লোক-সাহিত্যে, লোক-আচারে, গ্রামীণ উৎসবে, পার্বণে, অনুষ্ঠানে, নানা আচারে ও রীতি-পদ্ধতিতে। আলপনায়, লোকনৃত্যে, উলুধ্বনিতে, গাজনের মতো পার্বণিক লোক-সঙ্গীতে, গম্ভীরায়, ঝুমুরে, গাজীরগানে, আর একতারা দোতারা শিঙ্গা ঝাঁপি ভেঁপু মন্দিরা খঞ্জনী, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি লোকবাদ্যে, আঁতুড় ঘরের আচারে, ষষ্ঠীপূজায়, সাধভক্ষণে, গায়েহলুদে, পানিভরণে কিংবা কলাগাছে, আগ্রসার মুখে জলপূর্ণ ঘটে, ধানে দূর্বায় হলুদে, দীপে, ধূপে ধূনায় তেলে সিন্দুরে, ফিরনী-পায়েসে, পান-সুপারিতে মারোয়ায় জুলুয়ায়, গেণ্ডুয়া-পাশাখেলায়, দুধমাছ তত্ত্বে এবং তুকতাকে দারুটোনায় বাণে যাদুতে উচ্চাটনে বশীকরণে, বসুমতীপূজায়, কুমারীর বীজবপনে, পানিমাগনে, বনের দেবী-বিবি পূজায়, মহামারীর দেবতাপূজায় আমাদের অষ্ট্রিক-মঙ্গোল পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের ঐতিহ্যের স্বাক্ষর ও সাক্ষাৎ মেলে।

নানা প্রসঙ্গে আগেও বলেছি, এখানেও বলি দুর্গোৎসবে ষষ্ঠীর কলা-বৌ নব-পত্রিকা পূজা, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং কুলায় বা ডালায় খাদ্যের সাচ্ছল্যের প্রাণের ও সৃষ্টির বা বংশবৃদ্ধির প্রতীক দূর্বা হলুদ ধান চাউল কলা নারিকেল পান সুপারি তৈল সিন্দুর, হিন্দুদের উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, আলপনা, গোময়, পঞ্চগব্য, অরন্ধন, অম্বুবাচী, দধিমঙ্গল, খইছিটানো প্রভৃতি বাঙালী আচার। লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্নানযাত্রা ঝুলনযাত্রা রথযাত্রা বাঙালীর পার্বণ আর ধর্মঠাকুর মনসা চণ্ডী ওলা শীতলা বাসুলী জাঙ্গুলী ক্ষেত্রপাল যক্ষ পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলাদেবতা প্রভৃতি বাঙালীর সৃষ্টি।

পাদটীকা

১. Ain-I-Akbari II. Tran : Jarret, edited by J. N. Sarkar p. 184.

২ The Muhammadan of Eastern Bengal : JASB, vol. LXIII pt. III 1894, p. 34.

৩ ক. History of India etc : Elliot and Dawson. vol. VI.
খ. Waqiat-I-Jahangiri, p. 375.
গ. Brtish Policy and Mualim Education in Bengal, A. R. Mallick, p. 7.

৪. Promotion of learning during Muhammadan Rule : N.N. Law, p 201.

৫. Bernier's letter to M. Chapelain, dated Oct. 4, 1667 A. D.

৬. ক. Influence of Islam on Indian culture : Dr. Tarachand.
খ. ভারতীয় দর্শন : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
গ. বাঙলাব নব জাগৃতি : বিনয় ঘোষ।

৭. বাঙ্গালাব জাতীয় ইতিহাস : নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৪।

৮. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব
খ. পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম } ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
গ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : আহমদ শরীফ

৯. আদি ও মধ্যলীলা।

১০. ক. British Policy etc, A. R. Mallick, p. 5.
খ. Seir : vol. I, pp. 94-95.

১১. ক. History of the Bengal Subah : K. K. Datta : vol. I, pp. 94-95
খ. Seir, vol, II, p. 258.

১২. গ. Bengali Literature : J. C. Ghose, p.82.

১৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ পৃ : ৯২৫।

১৪ On Certain Peculiarities in the Mohammadanism of India. Asiatique Journal, vol. VI. 1831, p. 353.

১৫. The Muhammadans of Eastern Bengal . James Wise : JASB. vol. LXIII, pt IIIx 1894, p. 24.

১৭. চণ্ডীমঙ্গল .
পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝায় শাস্ত্রের তত্ত্ব-পঞ্জিকা টীকা, ন্যায়কোষ, সন্ধি উজ্জ্বল বৃত্তি, বামনদণ্ডী, পিঙ্গল, ভারবী ও মাঘের কাব্য, ভট্টি, অভিধান, জৈমিনীভারত, মেঘদূত, নৈষধচরিত, কুমারসম্ভব, রামায়ণ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি। এবং দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল, (ধন্বন্তরীওঝা) বঙ্গ সাহিত্যপরিচয় পৃ : ২১৭। হরিরামের চণ্ডীকাব্য পৃ : ৩১৫। ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার আদি সাধ্যসাধন সাধক (অন্নদামঙ্গল)।

১৮. Minhaj, p. 151. History of Bengal, D. U. vol. II, p. 14. Social History of the Muslims of Bengal : Dr. A. Karim p. 42.

১৯. বঙ্গসাহিত্যপরিচয় : দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫৪।

২০. Coins and Chronology of the Independent Sultans of Bengal : N. K. Bhattasali, p. 170.

২১. Promotion of Learning during Muhammadan Rule : N.N. Law, p.202

২২. idid, p. 201.

২৩ গোবিন্দচন্দ্রের গান . পাঠশালে পড়ি আমি যাই নিকেতন
ষোলশত যোগী লইয়া গোবক্ষ গমন। [ময়নামতীর উক্তি]

২৪. তোহ্ফা ঃ যাব 'এলম'।

২৫. পূর্বে উদ্ধৃত ঃ মুকুন্দরাম, বিপ্রদাস পিপিলাই, বৃন্দাবন দাস।

২৬. চৈতন্যভাগবত . পৃঃ ১০, ৩৫, ৪৯।

২৭. Social History of the Muslims of Bengal Dr. A. Karim, p. 44-45.

২৮. idid, p 45

২৯ idid, pp 66-67, 72 82.

৩০. মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ ঃ মরদন, পৃঃ ১৫৮।

৩১. চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ বঙ্গবাসী সং পৃ ঃ ৮৬।

৩২. ক Adam's Education Report : 1835
খ. Aspects of Bengali Society from old Bengali Literature :
Dr. Tamonash Chandra Dasgupta, p. 172.

৩৩. বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ঃ দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৩৮৪-৮৫।

৩৪. ক. খ–পুঁথিব পরিচয় ঃ পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১, ২য় খণ্ড।

৩৫ প্রাচীন পুঁথির বিববণ ঃ আবদুল কবিম, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০৫।

৩৬. Coins and Chronology etc · N. K. Bhattasali : p. 171.
Aspects of Bengali Society . T N. Dasgupta : Chapter : Education.

৩৭. বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১।

৩৮. India through the Ages : p 52.

৩৯ ক. Bengal under Akbar and Jahangir : Dr. Tapan Kumar Roy
Chowhury, pp. 146-48
খ. পদ্মাবতী [মাগন প্রশস্তি]।

৪০. সত্যকলিবিবাদসম্বাদ ঃ পৃঃ ২১৯, ২২০-২১।

৪১. পদ্মাপুরাণ ঃ বিজয় গুপ্ত ঃ বসন্তকুমাব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৬১।

৪২ পুঁথি পরিচয় (১ম ও ২য় খণ্ড) ঃ পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী।

৪৩. ক. সত্যকলিবিবাদসম্বাদ ঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃঃ ২১৯–২৪।
খ. চণ্ডীমঙ্গল।

৪৪–৪৫, চণ্ডীমঙ্গল, পৃঃ ৫১০-১৬. মনসামঙ্গল ঃ নারায়ণ দেব পৃঃ ৪৮, বিজয় গুপ্ত পৃঃ ৯৬–৭ চৈতন্য ভাগবত পৃঃ ১৫৮, ১৭৮, ১৮২।

৪৬. শূন্যপুরাণ ঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪৭. গোবক্ষ বিজয় ঃ ভূমিকা, পঞ্চানন মণ্ডল।

৪৮. সৈয়দ সুলতান ঃ ১০-ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সত্যকলিবিবাদ ঃ পৃঃ ১৭৯।

৪৯. Manrique : Quoted in Social and Cultural Hist of Bengal : Dr. A. Rahim pp. 290, 359.

৫০. গোবিন্দদাসের পদাবলী ঃ তাঁহাব যুগ ঃ পৃঃ ৪৮৬।

৫১. Ralph Fitch : Purchas-His pillgrims x, pp. 174-75.

৫২. বিজয়গুপ্ত ঃ পৃঃ ১৩৩। Op cit-Dr. A. Rahim, p. 291.

৫৩. Ain : vol. II. J. N. Sarkar, p. 132.

৫৪. Manrique : op. cit, Dr. A. Rahim, p. 190 Visva Bharati Annals vol. I. 1945, pp. 96-134. মুকুন্দবাম ঃ পৃ ঃ ৩৪৫

৫৫. ক. Bengal under Akbar and Jahangir : Tapan Kumar Roy Chowdhury p. 193-94.
খ. Visya Bharati Annals. vol. I 1945, Dr. P. C. Bagchi, pp. 96 134.
গ. মুকুন্দরাম ঃ পৃঃ ৩৪৫।

৫৬ Ain-I-Akbari : vol p. 134.

৫৭. Manrique I. p. 62-64.
৫৮. কৌশা মোজা পর যদি জরদ পরিও
অঙ্গুরী নিদানে প্রাপ্তি রাখ নিজ করে। –তোহফা : বাব ৪০।
পাজামা নিমা টুপী পরি কটিবন্দ–দ্বিজবংশী দাস : বঙ্গসাহিত্য পরিচয় পৃঃ ২১৬।
৫৯. Book of Duarte Barbosa. II. pp. 147-48. তোহফা (বাব, ৪০)।
৬০. Visva Bharati Annals vol. I. 1945, p. 122.
৬১. চৈতন্যচরিতামৃত।
৬২. ক. দস্তার জুব্বা পরি আষা করি হাতে... তসবী আঙ্গুলেতে-শেখচান্দ : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩, পৃঃ ১০৪। Bengal under Akbar and Jahangir p. 20
খ. মনসাবিজয় : বিজয়গুপ্ত।
৬৩. ক. মুকুন্দরাম ঃ ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাঁড়ি। – পৃঃ ৩৮৮।
খ. Visya Bharati Annals · 1945, vol. I. pp. 96-134. (Chinese Account).
গ. Coins and Chronology etc : N. K. Bhattasali, p. 170
৬৪. বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
৬৫. সুক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র ধনি ভিতরে পরিল। তাহার উপরে নীল বসন ধরিল (রাধা)। –যদুনন্দন দাস, শাড়ির নাম : ঠাকুরমার ঝুলি— দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। নওয়াজিস খান— মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ পৃ : ১৯৭। আলাউল, কাজলরেখা, চণ্ডীমঙ্গল, মানিকচন্দ্র রাজার গান— চটক, মটক। জগজ্জীবন ঘোষাল– মনসামঙ্গল। Aspects of Bengali Society : pp. 270-88.
৬৬ ক. নারায়ণ তৈল বিষ্ণু তৈল কেশের গোড়ে দিয়া— মনসামঙ্গল : জগজ্জীবন ঘোষাল।
খ. কুঙ্কুম চন্দন গন্ধ কাপড়েতে কয়।
গ. সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন— কৃত্তিবাস।
ঘ. সৈয়দ সুলতান ঃ ১০-ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য : ফাতেমার বিবাহে কনে সজ্জা।
ঙ. শাবারিদ খান ঃ রসুল বিজয়ঃ কস্তুরী চন্দন করে বিলেপন হরিষে কুমারী অঙ্গে।
শিশ্বৈত সিন্দুর.... গ্রন্থাবলী–পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৮২।
চ শাহ মুহম্মদ সগীর ঃ কস্তুরী কুমকুম বিন্দ কপালে তিলকচন্দ
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ কেশর সুগন্ধি সঙ্গ।
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩, পৃ ঃ ১৫৩।
৬৭. ক. সত্যকলি বিবাদসম্বাদ–বসন (পৃঃ ২২০)
খ. নীতিশাস্ত্রবার্তা বা সায়াৎনামা ঃ মুজাম্মিল, পুথি পরিচিতি পৃঃ ১৪৩।
৬৮. চৈতন্যভাগবত ঃ পৃঃ ১২৭।
৬৯. মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী ঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫১।
৭০. ক. গোবিন্দচন্দ্রের গান।
খ. দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ।
গ. সৈয়দ সুলতান ঃ শিবের যোগীবেশ ঃ ১০-ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৭১. ক. মধুমালতী-ভূমিকা।
খ. চৈতন্যমঙ্গল।
৭২. উনচট উঝাটিকা পায়ের উপরে রত্ন উঝাটিকা দিল— যদুনন্দন দাস।
৭৩ ক. Aspects of Bengali Society, Introduction p. XXVIII, chapters II & IV.
খ. Bengal under Akbar and Jahangir : pp. 194-95.
৭৪. নওয়াজিস খান ঃ গুলেবকাউলি ঃ মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ পৃঃ ১৯৭।
৭৫. ছোট ছোট বালকের মকরখাড়ু পায়— বিজয়গুপ্ত। রাতুলচরণে মল্লতোড়ল ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ চণ্ডীদাস। চরণে শোভএ মণিময় বক্করাজ– শেখচান্দ।
বাঁক পাতা মল পায়– দ্বিজপশুপতি, চন্দ্রাবলী। হিয়ার উপরে পরে বক্করাজ পাতা-বংশী বদনের পদ।
৭৬. মধুমালতী পৃ ঃ ৮। কাব্যে সুন্দরীর রূপ বর্ণন প্রসঙ্গেই অলঙ্কারের (ও শাড়ীর) নাম মেলে। সৈয়দ সুলতান আকিমা-সারা-ফাতেমা প্রভৃতির রূপ বর্ণন প্রসঙ্গে (১০-ক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছেন। শেখচান্দ তাঁর রসুলবিজয়ে আমিনার রূপ বর্ণনায় (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩ সন পৃঃ ১০৩) তিলক ও চন্দনের বিন্দু, মণিরত্ন হার, মণিময় বক্করাজ, মুক্তাখচিত কেশর, মণিময় কুণ্ডল, কেয়ূর, কঙ্কণ, কনক নূপুরের উল্লেখ করেছেন। শাহ মুহম্মদ সগীর জোলেখা প্রসঙ্গে (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩

সন পৃঃ ১৫৩) হার, কঙ্কণ, তাড়, অঙ্গুরী; কিঙ্কিনী ও নূপুরের বর্ণনা দিয়েছেন। দৌলত উজির লায়লীর রূপ বর্ণনায় (পৃঃ ২৩) রত্নমণিখচিত বেণী, চন্দন তিলক ও সিন্দুরশোভিত ললাট, মণিখচিত সোনার বেশরযুক্ত নাসা, কাজলে উজ্জ্বল নয়ন, মেহেদীরঞ্জিত নখ এবং সপ্তছড়ি হার, কনক কিঙ্কিনী, বাজুবন্দ, কঙ্কণ অঙ্গুরী ও 'আভরণ বিবিধ ধাতব'– এর উল্লেখ করেছেন। দোনাগাজী, মুহম্মদ খান, শাহ্ বারিদ খান প্রমুখ সব কবির কাব্যেই এমনি বর্ণনা মেলে।

৭৭. ক. Aspects of Bengali Society. op. cit: PXXVIII chapters, II and IV.
খ. Bengal under Akbar and Jahangir, pp. 164-95
গ. মুকুন্দরাম ঃ কালকেতু।

৭৮. Book of Duarte Barbosa pp. 147-48.

৭৯. বিপ্রদাস, মুহম্মদ খান, বিজয়গুপ্ত।

৮০. মনসা বিজয় ঃ বিজয়গুপ্ত পৃঃ ৫৯-৬০। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

৮১. বিপ্রদাস, 'ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ডাতার'।--ভারতচন্দ্র।

৮২ Manrique-II. অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতির দুই স্ত্রী ছিল।

৮৩ ক. ময়নামতী, চৈতন্যমাতা শচীদেবী ও বেহুলা স্মর্তব্য।
খ Bernier, Bengal in the 16th Century . J. N Dasgupta C. U. 1914, pp. 44-45, footnote.

গ. 'শিশুযুবা অবলা যাহার পতি মরে
বিধবা হইয়া সে থাকয় নিজ ঘরে'। মনসামঙ্গল ঃ ক্ষেমানন্দ, কলিঃ বিঃ ১৯৪৯, পৃঃ ২৬১।

৮৪ England's Pioneers in India : edited by J. Horton, Lyley, pp. 95-96.

৮৫ কাঞ্চনমালা, রূপভান প্রভৃতি রূপকথা স্মর্তব্য।

৮৬. চৈতন্যভাগবত ঃ পৃঃ ৬০

৮৭. লায়লী-মজনু ঃ দৌলতউজির পৃঃ ৬৮।

৮৮। চৈতন্যভাগবত ঃ পৃঃ ১১।

৮৯। অধিবাস, বৃদ্ধি, ষোড়শমাতৃকা প্রভৃতি।

৯০. ক. সৈয়দ সুলতান ঃ ফাতেমার বিবাহ।
খ. শাবারিদ খান। রসুল বিজয়।

৯১. শিবায়ন ঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

৯২. মনোহর-মধুমালতী ঃ সৈয়দ হামজা, এবং সিকান্দর নামা ঃ আলাউল। সিকান্দরের হাতে রোকসানাকে তুলে দিতে গিয়ে এমনি অনুনয় করেছিলেন দারা মহিষী।

৯৩. ঐ—সৈয়দ হামজা।

৯৪. Bengal under Akbar and Jahangir p. 225.

৯৫. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী।

৯৬. ইজার না পিন্দ উঠা, পাগড়ী না বান্দ বৈঠা
না হাঁটিব বৃদ্ধ আগে না বসিব উর্ধ্বভাগে
নারীর নাম ধরি না বোলাএ (বার ৪৯-তোহফা)
মজলিসে গেলে মৌন ধরিয়া বসিব
বিনি জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিব।
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে ঃ (বাব-২২) তোহফা।

৯৭. সৈয়দ সুলতান (পরিচ্ছেদ ১০-ক), মুসলমান কবিদের ভণিতায় পীরের চরণ বন্দনা স্মর্তব্য।

৯৮. Quoted from Bengal under Akbar and Jahangir : p. 202.
ক. De Laet   গ. Bowrey   ঙ. Schouten
খ. Manrique   ঘ. Shihabuddin Talish.

১০০. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, বিমানবিহারী মজুমদার। পৃঃ ৪৪৮-৪৯।

১০১. Bengal under Akbar and Jahangir.

১০২. বাঙ্গালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব পৃঃ ৮৫২-৫৬।

১০৩. তামাকুপুরাণ ঃ এ গ্রন্থের ১৭তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০৪. মনসামঙ্গল ঃ দ্বিজ ষষ্ঠীবর ঃ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ঃ পৃঃ ২৫৪।

১০৫. ধনীরা এবং সৈন্যেরা খুব মদ পান করত—সুফিয়ানের বাহিনী (সৈয়দ সুলতান), প্রতাপাদিত্য। History of Bengal, D. U. II, p. 221.

১০৬. ক. Social & Cultural History of Bengal: Dr. A. Rahim p 297. চৈতন্যমঙ্গল।
খ মদ ছিল চার প্রকারের ধেনো, নারকেলী, (জলজ গুল্মের) তালের ও ফলবীজের।
Visva Bharati Annals. Vol. 1. 1945. pp. 96-134.
১০৭. মুসলিম কবির পদসাহিত্য ও রাগতালনামা।
১০৮. ক. সৈয়দ সুলতান (১০-ক পরিচ্ছেদ)।
খ. শাবারিদ খান ঃ রসুল বিজয় ঃ পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৮২।
গ. মঙ্গল চাঁদ ঃ শাহজালাল মধুমালা। মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ ঃ পৃঃ ১৯২-৯৪।
১০৯. Visva Bharati Annals, vol. pp. 96-104.
১১০. একখানা দলিল আমার নিকট আছে–লেখক।.
১১১. ক. Barbosa. p. 147. খ. বিজয়গুপ্ত ঃ বসন্তকুমার সম্পাদিত পৃঃ ৬১।
খ. Coins & Chronology etc. Bhattasali. p. 136
গ Ibn Battutah IV p. 212.
১১২. Baharistan Ghyabi. Vol II.
১১৩ Ain-I-Akbari Vol. II p. 134-J. N. Sarkar
Manrique : I. p. 128
বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) পৃঃ ৫৫০।
১১৪. Baharistan Ghyabi—I. p. 138-39.
১১৫. ক. Bengal under Akbar and Jahangir . p. 197.
খ. Manrique I. p. 64.
১১৬. ক. মুজাম্মিল ঃ সায়াৎনামা ঃ পুথি-পরিচিত ঃ ১৪৩-৪৫।
১১৭. ক. Mahuan's Account of Bengal : JRAS, 1895, p 530.
খ. Visva Bharati Annals 1945, vol, I. pp. 117, 123, 125
১১৮ ক. Mahuan's Account of Bengal. JRAS, 1895, p. 530.
১১৯. History of Burma, p. 141.
১২০. আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত সত্যপীর পাঁচালী, সংখ্যা ১৬৩/৯ পৃঃ ৬৮
'বাংলা পুঁথির তালিকা' বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম।
১২১. ক. বার্বোসার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ঃ ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ডক্টর মমতাজুর রহমান
খ. New Values : Vol. X No. I, 1959 pp. 20-23.
১২২. ক. ইতিহাস ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা ঃ ১৩৬৩ সন, পৃঃ ২৩০।
খ. The Book of Duarte Barbosa II, Footnote, pp. 135—47.
১২৩. ইতিহাস ঃ পৃঃ ইতিহাস ঃ ২৩১। Ralph Fitch : Purchas · His Pilgrims × 1905 p. 185 (Glasgow)
১২৪. Ain-I-Akbari : Jarret : edited by J N. Sarkar.
১২৫. Portuguese in Bengal : A. J. Campos. pp. 328-38
১২৬. ক বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৭৯।
খ JRAS 1895. PP. 531-32.
১২৭ Book of Duarte Barbosa, II, p. 147.
১২৮. সায়াৎনামা [নীতিশাস্ত্রবার্তা] ঃ পুথি পরিচিতি ঃ পৃঃ ১৪৩-৪৬। সত্যকলিবিবাদসম্বাদ ঃ পৃঃ ২১৭-২০।
১২৯. মন্ত্রপূত হিঙ্গুল, কস্তুরী, শস্যধূম, জতুরগুড়া, গাভীরহাড়, কালোমাটি, মাছের পিত্ত, হরিদ্রা, গন্ধক এবং কালো বিড়াল, কুক্কুটি প্রভৃতির বিষ্ঠা ভূত ও দেও-র ঔষধ। সত্যকলিবিবাদসম্বাদ পৃঃ ২২০-২৪।
১৩০. ক. Aspects of Society etc : T. N. Dasgupta.
খ. মন্ত্রের পুথি ঃ পুথি পরিচয় (বিশ্বভারতী), বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ঃ আবদুল করিম।
১৩১. মাটির হাড়ি, সরা, বেলুন, পাতিল, খোড়া, খদ্দা, বচি, সানকি, কণ্ডি, ঘড়া, ঝিনুক ও নারকেলের মালাই ছিল তৈজসপত্র। আসবাবের মধ্যে সচ্ছল গৃহস্থের একটি সিন্ধুক থাকত মাত্র।
১৩২. চণ্ডীমঙ্গল ঃ বঙ্গবাসী সং পৃঃ ৮৬।
১৩৩. বিজয়গুপ্ত ঃ বসন্তকুমার সম্পাদিত পৃঃ ৬১।
১৩৪ History of Bengal, D. U. Vol II. pp. 101-2.

পরিশিষ্ট-১

বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন চট্টগ্রামী কবির
আবির্ভাবকাল নিরূপণের সহায়ক একটি মামলার রায়।
[সংগ্রাহক চট্টগ্রামের সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা গবেষক আবদুল হক চৌধুরী]

চট্টগ্রামের রাউজান গ্রামের একটি মসজিদের ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত একটি জটিল মামলায় রায় এ দলিলটি। এ মামলায় জড়িত অনেক লোকের মধ্যে মুহম্মদ জাফর চৌধুরী, আকবর চৌধুরী, শাহবিবি, সাদত চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর 'গুলে বকাউলি' নামের অনুবাদিত উপাখ্যানে। কবি স্বয়ং আকবর চৌধুরীর জমিদারী শেরেস্তায় কর্মচারী ছিলেন। এ কবি কাব্যে বিস্তৃতভাবে তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছেন চট্টগ্রামে আবির্ভূত এবং তাঁর জ্ঞাত পূর্ববর্তী ও সমকালীন সব মুসলিম কবির নাম সবিশেষণ উল্লেখ করেছেন। এমনকি কবি আলাউল সম্বন্ধেও বলেছেন 'গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।'

আবদুল করিম সাহিত্যিবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করতেন মুহম্মদ মুকিম আঠারো শতকের কবি। তাই মুকিম বর্ণিত তাঁর সমকালের কবিদেরও তাঁরা আঠারো শতকের কবি বলে জানতেন ও মানতেন। এ দলিলটি কবি মুহম্মদ মুকিমের প্রশংসিত আকবর চৌধুরীর মসজিদ সংক্রান্ত মামলার রায়। এ মামলা ১৮৪৭ থেকে ১৮৪৯ সন অবধি চলে। এ সময়ে কবি মুহম্মদ মুকিম সম্ভবত জীবিত ছিলেন না, তাই অনুমানে বলা চলে মুকিমের নয়াপাড়া গাঁয়ে জন্ম হয় আঠারো শতকের শেষপাদে আর মৃত্যু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের কোন সময়ে, যখন আকবর চৌধুরী পাঁচ সন্তানের মধ্যে মাত্র তিন সন্তানের পিতা, এ তিন সন্তানের নাম তিনি তাঁর কাব্যে অঙ্কিত করে রেখেছেন। কবি যে উনিশ শতকেই যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তাঁর 'ইংরেজ নৃপতি কে ফিরিঙ্গির জাত। চিরদিন ইংরেজ এথা মহিপাল'–উক্তি থেকেও প্রমাণিত হয়। কবি তাঁর শিক্ষকের পীরের কাব্যে প্রণোদনাদাতা হিতৈষীদের এবং চট্টগ্রামের দরবেশদেরও নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর পূর্ববতী কবিরা হচ্ছেন সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, কাজী দৌলত, আলাউল, আবদুন নবী, গিয়াস, মুজাম্মিল, হারুন্ত রোয়াজা [সম্ভবত কক্সবাজার এলাকার কোন রোসাঙ্গীবংশীয় বাঙলাভাষার কবি] শেখ পরাণ, পরাগল, ফাজির নাসির মুহম্মদ, তাহির, মুহম্মদ আলী ও চামু আর কবি মুহম্মদ মুকিমের সামসময়িক জীবিত কবি তথা উনিশ শতকেব প্রথমার্ধের জীবিত কবিরা হচ্ছেন আলি রজা [১৭৫৯-১৮৩৭], হারি, আলি মিয়া, মুনশী মুহম্মদ মুকিম [ফয়দুল মুকতদী রচক ১৭৯১ খ্রীঃ] কাজী দানেশ, মুহম্মদ তকী ও মুহম্মদ দানিশ। শেষোক্ত জনেরা যে আঠারো শতকের শেষ পাদ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি কালের মধ্যেই জীবিত ছিলেন এবং কাব্য রচনা করেছিলেন তা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা চলে।

এবার এ দলিলে প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করছি। এতে কবি 'আলাউলে'র জীবনীসংক্রান্ত ভ্রান্তি চিরকালের মতো নিঃসংশয়ে নিরসন হবে।

১. শাহবিবি কবি আলাউলের কন্যা ছিলেন না, শাহবিবি ছিলেন রাউজানের জমিদার আমীর মুহম্মদ চৌধুরীর পত্নী, তাঁদের পুত্রের নাম এ দলিলে উক্ত মুহম্মদ জাফর চৌধুরী, চট্টগ্রামে বহুল প্রচলিত 'মালেকাবানু মনুমিয়া' নামের সঁওলা বা লোকগীতির নায়িকা মালেকা বানু এঁদের কন্যা নন।

২. 'গুলে বকাউলি' উপাখ্যান প্রণেতা কবি মুহম্মদ মুকিম উনিশ শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। অতএব, তিনি তাঁর কাব্যে 'অখনের' [এখনকার] কবি বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সবাই উনিশ শতকের মধ্যযুগের সাহিত্যধারার কবি। এ রায় আবিষ্কারের আগে যাঁদের আঠারো শতকের কবি বলে উল্লেখ করা হত।

পরিশিষ্ট–২

অনেককাল থেকেই ইসলাম পছন্দ কিছু রাজনীতিসচেতন বিদ্বান, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাস লেখক প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে একসময়ে আরবী বা ফারসী উর্দু হরফে বাঙলা লেখা হত। প্রমাণ প্রায় ত্রিশটা আরবী হরফে শিল্পীকৃত পুথি আবদুর করিম সাহিত্য বিশারদের ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সংগ্রহে রয়েছে। এ পুথিগুলোর সাক্ষ্য-প্রমাণে তাঁরা আস্থা রেখে তাঁরা নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আরবী হরফে বাঙলা লেখা মুসলিম সমাজে অন্তত বহুল প্রচলিত ছিল। এ মতে, মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে কোন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য নিহিত নেই।

আসলে সবাই জানেন যে প্রায় ১৯৩০ সন অবধি মদ্রাসায় বাঙলা ভাষার কোন স্থান ছিল না। কেননা ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থগুলো আরবীতে লিখিত, টীকা-ভাষ্য লেখা থাকত সতেরো শতক অবধি কেবল ফারসীতে এবং তারপর থেকে আজ অবধি ফারসীতে এবং উর্দুতেও যুগপৎ টীকা-ভাষ্য মুদ্রিত হয়। কিন্তু পাঠদান করেন একালের শিক্ষকরা উর্দু ভাষার মাধ্যমে, একারণেই বাঙালী গৃহস্থ ঘরের শিক্ষার্থীরাও বাঙলা বর্ণমালার সঙ্গেও পরিচিতি হতে পারত না।

মাদ্রাসা শিক্ষান্তে স্বল্পশিক্ষিত মোল্লারা-খোন্দকারেরা কিংবা উচ্চ শিক্ষিত মৌলভী-আলেম ফাজিল-কামিল পাশ কোন কোন সাহিত্যরসিক জিজ্ঞাসুপাঠক বাঙলায় লিখিত প্রণয়োপাখ্যান ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হয়ে বাঙলা ও আরবী-ফারসী হরফ জানা লিপিকর নিয়োগ করে বাঙলাকাব্যের লিপ্যন্তর করাতেন। এই হল আরবী হরফে বাঙলা লেখা চালু হওয়ার ইতিবৃত্তান্ত। বহুল প্রচলন ছিলই না, নিতান্ত বিরল প্রয়াসে এই প্রমাণ এগুলো কেননা আজ অবধি নানাজনের সংগৃহীত হাজার দুয়েক মুসলিম রচিত পুথির পাণ্ডুলিপির মধ্যে মাত্র ত্রিশটার মতো খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তা ছাড়া বাস্তব প্রমাণও মিলেছে। মূল কাব্য বাঙলা হরফে রচিত, আদেষ্টার নির্দেশে অর্থের বিনিময়ে বাঙলা পুথির লিপ্যন্তর হচ্ছে আরবীতে।

১. চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ জান আরবী হরফে বাঙলা লেখা চরম পাপকর্ম বলে মনে করেছেন। ১২১৪ মঘীতে বা ১৮৫২ লিপীকৃত এর 'নামাজ মাহাত্ম্য' বয়ানের পুথিতে তিনি বলেছেন 'আরবী আঙুলে যদি বাঙলা লিখন/সত্তর নবীর বধ তাহার উপর'।

[মৎ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঃ পৃঃ ৪৫৬]

২. নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'শরীয়তনামা'র লিপিকর বলেছেন ঃ

কন্ [কোন্] হরফে কন্ [কোন্] 'লফজ' ন বুঝি অর্থ
বাঙলা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত। [লিপিকর ঃ আলি জান]

৩. ইীন আফতাব উদ্দীন কহে আল্লা নবী
পূর্বের বাঙ্গালা অক্ষর আমি করিলাম আরবী।
ছেহাই [কালি] খারাপ ছিল কাগজ পাতল [পাতলা]
তেকারণে অক্ষর যে না হৈল উজ্জ্বল।

[মৎ সম্পাদিত সৈয়দ সুলতান রচিত 'রসুল চরিত' ঃ পৃঃ ৭০০]

বলা বাহুল্য আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকে বাঙলা ভাষাচর্চা বটতলায় বেড়ে গেলে সুদূর অজ পাড়াগাঁয়েও জিজ্ঞাসু সাহিত্য বা পুস্তকপাঠক মোল্লা-মৌলভী মাতৃভাষায় লিখিত কাব্যের প্রতি কৌতূহলী হয়ে বাঙলা বর্ণজ্ঞানহীন বলে আরবীতে তথা ফারসী হরফে লিপ্যন্তর করান। কারণ এ পুথিগুলোর লিপিকাল সাধারণভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধ। [পুথি পরিচিতি দ্রষ্টব্য]

পরিশিষ্ট-৩

আঠারো শতকের চট্টগ্রামে
মুসলিমদের দেশজ আচার-সংস্কার

হযরত আলীর 'জঙ্গনামা' ও 'মুসার সওয়াল' রচয়িতা কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার 'শরীয়তনামা'ও রচনা করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলার জলদী গাঁয়ে। তাঁর 'শরীয়তনামা' রচিত হয় ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর। কবির নিজের ভাষায় ঃ

চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস
সমুদ্র দিবস আদি হৈল ছয়মাস।...........
শরীয়তনামাবাণী লেখা সাঙ্গ ভেল
সন তারিখ লেখিবারে শ্রদ্ধা বাড়ি গেল।
চতুর্বিংশ অঘ্রাণের জোহর সময়
বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয়।
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত মুসার।

অতএব, চন্দ্র-১, ঋতু-৬, সিন্ধু-৭, গগন [সাত আসমান]-৭=১৬৭৭ শকের ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবারে রচনা সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে সে-বছর রোজা হয়েছিল উনত্রিশটা, ঈদ হয়েছিল সোমবারে। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের বিস্তৃত পরিচিতি রয়েছে ডক্টর আবদুল করিম সম্পাদিত 'শরীয়তনামা'র ভূমিকায়[১] আর আমার 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য'[২] গ্রন্থে।

'শরীয়তনামা' আপাতদৃষ্টে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ বিষয়ক গ্রন্থ বটে, তবে এর গুরুত্ব রয়েছে অন্য কারণে। কবি প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলিমদের ঘরে-সংসার-সমাজে চালু লৌকিক ও স্থানিক লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার ও লোকাচারের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। তা থেকে আঠারো শতকের মধ্যক্যালের দেশজ মুসলিমদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির-জীবনাচারের একটা জীবন্ত চিত্র মেলে। এরূপ আলেখ্য অন্য কোন গ্রন্থে এমন প্রত্যক্ষভাবে নেই। পরোক্ষ চিত্রও সুলভ নয়, ক্বচিৎ কোথাও আভাসিত হয়েছে মাত্র।

এবার এখানে মুসলিম ঘরের ও সমাজের অমুসলিম আচার-সংস্কারগুলোর পরিচয় কবির অনুসরণে কবির ভাষায় তুলে ধরছি।

১. সেকালে মুসলমানরাও গোবর-জলে ঘরের মেজে ও বেড়া লেপন করত হিন্দুদের মতোই। এতে তাদের কোন অপবিত্রতাবোধ জাগত না। এ সম্বন্ধে কবির নসিহত বাক্য এরূপ ঃ

গোবরে লেপন্ত ঘর কাফের আকার
গোবর না-পাক জান শাস্ত্র মাঝার।......
গোমল মনিষ্যের বিষ্ঠার সমান।
এ থেকে না লিপ ঘর যেবা মুসলমান।

২. বেদীনদের মতো মুসলিমরা আরো এক কুৎসিত কর্ম করে। কুমারী যখন প্রথম রজস্বলা হয়, তখন তাকে অপবিত্র মনে করা হয় এবং তাকে ছুঁইলেই স্নান করতে হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, স্পর্শ করার পাপ স্খলনের জন্যে উপোস করতে হয়। কয়েক সন্ধ্যা :

কুমারীক কেহ যদি ছোঁএ পুষ্পকালে
কত সন্ধ্যা উপাস রাখএ তিরি কুলে।
কুমারীক কেহ যদি ছোঁএ পুষ্পকালে

সেনান করিতে দুষ্ট সকলেরে বলে ।.....

নিশ্চয় জানিঅ এহি হিন্দুর আচার ।

রজস্বলা কুমারী সপ্তাহান্তে স্নান করলেই পবিত্র হয় না। ধোপা-নাপিত ডাকতে হয়, স্নান করাতে হয় পার্বণিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সহেলা তথা গান-বাজনার আসর বসিয়ে কুমারীর রজস্বলা হওয়ার সুসংবাদও প্রচার করতে হয় :

পঞ্চ কিবা সপ্তদিনে 'দুই' খেলাওন্ত

ধোপা নাপিতারে আনি শুদ্ধ করাওন্ত।

শুদ্ধ করাই নিয়া জলে করে সেনান

সহেলা গাওন্ত অনাদীনের সমান।

ঢোল বাজাই যুবক সবারে জানাওন্ত

আমার কুমারী বধূপুষ্প দেখিছন্ত।

ইসলামে রজস্বলা নারী অপবিত্র নয়, তবে–'মাত্র রজঃস্থল অপবিত্র জান তারে', সেজন্যেই এ সময়ে 'নামাজ-রোজা' হারাম।

৩. এমন কি গর্ভবতী নারী শিশু প্রসব করার পরে প্রসূতির হাত-পা'র নখ নাপিত দিয়ে কাটিয়ে তবে তাকে পবিত্র হল বলে গ্রহণ করে। :

গর্ভবতী নারী যদি শিশু প্রত্তন্ত

বেদীনি নাপিতা আনি নউখ খুঁটাওন্ত।

৪. খরা-মহামারী প্রভৃতি বিপদ এড়ানোর জন্যে ঘরে ঘরে চাল ভিক্ষা করে বারোয়ারী শিরনী অপদেবতার নামে অর্ঘ্য দেয়ার রেওয়াজ সেকালের মুসলিম সমাজেও ছিল। বউ-ঝিরাই দ্বারে দ্বারে ডালা-কুলায় ধান-দূর্বা ও আম্রসরা সমেত ঘট রেখে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত,—এও ছিল একপ্রকার পার্বণিক-মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি ঃ

কত কত তিরিগণে ডালা শিরে দিয়া

ইব্লিসের পূজা জানি ধান্য তথা দিয়া।

চূতডাল ঘট রাখি শিরেত লওন্ত

নানামতে বাস পিন্দি দেখিতে মহন্ত ।...

শাস্ত্রে বলএ তারে পাপিষ্ঠ অধর্ম ।...

নারীর উচিত রহিবারে গুপ্ত স্থান।

৫. সেকালেও সৈনিকরা নারীবর্জিত প্রবাসে কর্মজীবনে দেহ-মনের অপ্রতিরোধ্য ক্ষুধার তাড়নায় বারাঙ্গনার অভাবে সময়-সুযোগ-সুবিধে মতো নারী-ধর্ষণ করত। কবি সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন :

একদিন দোহাজারী শহরেতে রঙ্গে

বসিছিলাম কতজন অশ্ববার সঙ্গে ।...

হেন কালে এক নারী মৈচ্ছ্য লই আইল ।...

এক আসোয়ার তাকে বোলে হাসি হাসি

গুপ্তস্থল নাম লই কহন্থ প্রকাশি ।...

দান কর আএ নারী ভূঞ্জিতে সুরতি

তোর সোয়ামী হন্তে আমি বলবন্ত অতি। ইত্যাদি

দই কেনার ছলে সৈনিক গোয়ালিনী ধর্ষণ করে ঃ

হস্ত ক্ষেপি ধরিলেক গোপালিনীর হাত

মুখ 'পরে হস্ত বাড়াইল কর মাথে।

সেবক ডাকিয়া তবে কৈল সমর্পণ
অন্তঃপুরে দিতে বোলে করিয়া যতন
অন্তঃপুরে নিল যদি আপনে চলিল
শিলার মন্দির স্থানে না জানি কি কৈল্য।

সৈনিকের যুক্তি ঃ

আমরা সকল নিতি দেশে দেশে ফিরি
নিজ গৃহ নারী ছাড়ি হই দেশান্তরী
আপনা নারী রাখিবারে শক্তি নাই
তেকারণে রতি ভুঞ্জি যার নারী পাই।

৬. যেখানে শবকে স্নান করানো হয়, সে-স্থানকে চল্লিশ দিন যাবৎ বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয় এবং সেখানে একভাণ্ড পানি রাখা হয়। এ কাজও শরীয়ত বিরোধী। কবি বলেন–

গোসলের স্থানে যদি বেড়া দি' থাকএ
ভাণ্ড ভরি জল রাখি চান্দোয়া টাঙএ।
মুরুক্ষ সকলে তারে 'লহদ' বোলএ
'লহদ' ন হএ সেই ন জানি কহএ।....
এই দোষে মৃত 'পরে হইব লাঞ্ছন।

আসলে 'লহদ' হচ্ছে ঃ গোরের পশ্চিমে খুদি রাখে মওতারে
আরবের ভাষে বোলে লহদ তাহারে।

–এ এক আরব-প্রথা, মৃত্যুর পরে কবরে মৃতদেহের পরিবর্তন দেখার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যেই ছিল এ ব্যবস্থা।

৭. যে কক্ষে কারো মৃত্যু হয়, সে কক্ষকেও মুসলিমরা কাফেরদের মতো অপবিত্র মনে করে এবং যারা মৃতের বাড়ি যায়, শব দেখে, তারা সবাই নিজেদের অপবিত্র মনে করে এবং স্নান করেই স্ব স্ব বাড়িতে প্রবেশ করে ঃ

মৃত্যু লক্ষ্যে পার হইবা সংসারের সিন্ধু
এহেন মরারে কেনে অশুদ্ধ বোলন্ত।
মৃতের গৃহেরে বুলে যত ইষ্টজন
অপবিত্র হএ বোলে কাফের ধরন।

৮.তা ছাড়া কাফেরদের মতো তারাও যমের ভয়ে থাকে অস্থির ও শঙ্কিত। তাই মৃতের আত্মীয়-স্বজন পরিজনেরা তিক্ত সব্‌জী মুখে দিয়েই আহার্য গ্রহণ করে আর যমের গতিরোধ করার জন্যে দ্বারে পুতে লৌহখণ্ড বা পেরেক:

তার [মৃতের] ঘরে কেহ বোল তিতা বা দেওন্ত।
তিতা অন্ন খাইলে বোলে কেহ ন মরিব
তিতা বলে মৃত্যু বোলে কাছে ন আসিব।...
শুনিয়াছি কাফের মুখে কেহ যদি মরে
তাহারে দহিয়া যদি ফিরি আইসে ঘরে।
তিতা ভক্ষি লোহা দেওন্ত ভাণ্ডে করি সেনান
যুগপদতলে যত্নে রাখন্ত পাষাণ।

৯. হিন্দুদের মতো ঘরে জন্ম-মৃত্যু সময়ে-মুসলমানরাও কিছু রীতি-নিয়ম মেনে চলে। হিন্দুরা 'মরা বিয়ালা'য়–

ইষ্টজন মরে কিবা শিশু প্রসবএ

রান্ধনের ভাণ্ড সব নিকালি ফেলাএ।
নিরামিষ খাএ কর্ম [শ্রাদ্ধ] করন্ত যাবত
মৃত-কর্ম করিত করাই হাজামত।

এমনিভাবে মুসলিমরাও শুধু চুল-দাড়ি-নখ ক্ষৌরী করিয়েই তুষ্ট থাকে না। নবজাতকেরও মৃতের খবর নাপিতের মাধ্যমে আত্মীয়-কুটুমের বাড়ীও পাঠায়, না পাঠালে আত্মীয়-স্বজন বরং অপমানিত-অবহেলিত বোধ করে, অসন্তুষ্ট হয় :

তৃতীয় দিবস যদি হইল মরার
নাপিত আনিয়া বোলে খেউর করিবার
আপনে করিয়া খেউব ইষ্ট ঘরে ঘরে
খেউর হেতু যত্নে পাঠাওন্ত নাপিতারে।
ইষ্ট কুটুম্বের ঘরে নাপিত না দিলে
অতি অসন্তোষ হএ সবে তারে বোলে।
মরা-বিয়ালা-নখ কাটানের ইষ্ট গেল
তেকাজে আমার ঘরে নাপিত না দিল।
কুটুম্ব হইত যদি নাপিত পাঠাইত
কন মুখে যাই তার ঘরে অন্ন খাইত।

১০. লাশ বইবার জন্যে খাট তৈরীর ও কবরের উপরকার ছাদ নির্মাণের জন্যে বাঁশের ব্যবহার বিষয়েও ছিল অদ্ভুত লৌকিক সংস্কার। যেমন :

কেহ বোলে মওতার খাট বাঁধাইতে
বাঁশ কিবা গাছ নারে আগা-গোড়া দিতে
এক মুখী দিলে আর কেহ ন মরিব
আগা-গোড়া দিলে বোলে সকল মরিব।

১১. নবজাতকের জন্যে নিমরিয়া পীরের [মৃত্যুহীন পীর] নামে কুক্কুট গোপনে বলিদান করা হত :

বালক জন্মিলে এক কুক্কুট রাখএ
নিমরিয়া পীর নামে ফাতেহা করাএ।
সেই কুক্কুটার মাংস রান্ধে এক মতে
গৃহের বাহিরে বলে নারে নিকালিতে।
নানান প্রকারে বলে না পারে রান্ধিতে
অভ্যাগত ভিক্ষুকেরে না পারএ দিতে।
যাহারে ভক্ষ্যায় ভক্ষ্যায়ন্ত গৃহান্তরে।

১২. সেকালে মুসলিম ঘরে ব্রাহ্মণেরও আবশ্যিক ডাক পড়ত নানা কাজে। জন্ম পঞ্জিকা, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি ছাড়াও পুষাকর্মাদিতেও ব্রাহ্মণের সহায়তার প্রয়োজন হত। একদিন লোক এসে কবিকে বলে ঃ

মোহোর সাক্ষাতে আসি বোলে হাসি হাসি
সুর্যকদলীর [সুর্যমুখী] কথা কহন্ত প্রকাশি,
ব্রাহ্মণেরে নিয়া দিব পূজার কারণ
পূজা কৈলে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণ।...
পুষাকর্মে ব্রাহ্মণেরে দিই আমরাএ।

১৩ কেউ কেউ কলা, চালের গুঁড়ো ও কাঁচা দুধ দিয়ে আবাঁধা শিরনী তৈরী করে এবং শিরনী ফাতেহা করার সময়ে তৃণ গলে বেঁধে রাখে। এসব কাফেরদেরই রীতি। কত কত মুসলমান ঃ

১

কদলী তণ্ডুল আটা কাঁচা দুধ আনি
এসব একত্র করি ফাতেহা করন্ত
সহবিষে লোক সবে তাহাকে খাওন্ত।...
ফাতেহা করিতে শিরনী কত কত মূর্খে
তৃণ এক গলে বান্ধে বহুল আতঙ্কে।

২

কেউ বলে —
যত আউশ ধান্য আছে সংসার মাঝাব
ফাতেহাতে ন লাগএ ন পারে দিবার।...
যেই খাইতে পারে সেই ফাতেহা দিতে পারে
আউশ কিবা শাইল তাত কি বিচাবে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে গোলায় ধান তুলবার মুহূর্তে মুসলমানও মহালক্ষ্মীর কাছে হাঁস বলি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দেয় গোলার ভেতরে :

আর এক পাপকর্ম কেহ কেহ করে
মহালক্ষ্মী হাঁস রক্ত দেওন্ত গোলাঘরে।

এমনকি কেউ কেউ শূকর চণ্ডীর নামেও হাঁস বলি দেয় :

কেহ কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস।

১৪. এখানেই শেষ নয়। মঘিনী [আরাকানী বংশোদ্ভূত চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধ নারী-পুরুষ মাত্রই মঘ] ও কাফের দিয়ে এরা বিভিন্ন উপলক্ষে পূজাও করায় :

আর কত মুসলমানে অকর্ম করন্ত
অন্য জাতি হস্তে যতে পূজা করাওন্ত
মঘিনীরে ছাগল দেওন্ত কিবা জানি
জাগবান দেওন্ত অন্য জাতি হস্তে আনি।

১৫. বিষুর কালে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে মুসলিম নারীরা শিবের গাজনের অনুকরণে এবং বিবাহোৎসবে নাচে-গায় ঃ

১

আর বহু মোহন্ত জনের তিরি কুলে
নটীর সদৃশ নটী বেটি বিবা কালে।
সেসবের সোয়ামী সব ভূত কিবা পশু
নিজ নারী খেলিতে দেওন্ত আইলে বিষু।

২

আপনার তিরি কন্যা সভাত পাঠাওনত
ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে খেলিতে দেওন্ত।
বিষুর দিবসে কিবা বিবাহের কালে
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনন্দ কুতুহলে।
সিফত [ধেনোবা কাঁজিমদ] ভৈক্ষ্যন্ত কিবা হবিষ অন্তর
নারী বা পুরুষ সব হই একত্তর।
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মঘধ ধরান

হাসন্ত গাহন্ত নটী নটকের গণ।
পুরুষ নারী আর নারী পুরুষ সঙ্গে
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙ্গে।

১৬. নয় শতক থেকে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম সাধারণভাবে ছিল আরাকান রাজ্যভুক্ত বা রোসাঙ্গরাজ্যন্তর্গত। তাই সমর-শাসন ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরাকানীরা চট্টগ্রামে এসেছে, এবং তাদের অনেকেই এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করেছে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা ওই আরাকানীদেরই বংশধর এবং 'মঘ' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। চট্টগ্রামী মুসলমানের আচারে-আচরণে ও খাদ্য তৈরীতে তাই কিছু আরাকানী প্রভাব ছিল। এরূপ দুটো সংস্কারের প্রভাবের কথা কবি এখানে উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে অন্যের বাড়ীতে কোন কুমারী আকস্মিকভাবে প্রথম রজস্বলা হলে সে-বাড়ী অপবিত্র হল বলে মনে করা হত। সে পাপের জন্যে গৃহস্থ সম্পদচ্যুত হয়ে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত :

আর নব বধূ কিবা কাহার কুমারী
কুসুম্ব [রজঃফুল] দেখএ যদি পড়শীর বাড়ি।
গৃহ নষ্ট হৈল বলে গৃহের ঈশ্বরী।
'তার হেতু মোহোর সম্পদ নিব হরি।'
গোধনের রজঃ ফেক সিক্ত সেই জল
আনি দিলে গৃহ হৈব পবিত্র নির্মল।

১৭. রাস্তা ও পুকুর খননেও ছিল বছর-তিথি-লগ্নের সংস্কার। যেমন :

পুষ্করিণী খোদাএ কিবা জাঙ্গাল দেওন্ত
বিষুর ভিতরে কেনে অকূপ করন্ত।
সম্পূর্ণ খোদান যেবা কিবা নহি হএ...
যুগল বছর হৈলে বলে বহু দোষ।

১৮. মুসলমানেরাও বিষুর দিনে করত স্নান—পবিত্র ও পাপমুক্ত হওয়ার বাঞ্ছায়। আর সেদিন গরু-ছাগলের শিঙে ও গলায় পরাত ফুলের মালা, গায়ে মাখত চন্দন ও হলুদ। মঘদের মতো নতুন বছর বরণের ও পুরোনো বছরের দুঃখ-গ্লানি-অবসাদ মুছে ফেলার জন্যে এমনি সব পার্বণিক অনুষ্ঠান ছিল জনপ্রিয় :

আর এক অপকর্ম হিন্দুর ধরান
বিষুর দিবসে লোকে করন্ত সেনান।
বৃষের অজার শিরে গলে দেওন্ত ফুল
পশুর সমান কর্ম করন্ত বহুল।
কেহ কেহ হলদি চন্দন লাগাওন্ত
বিন্দু বিন্দু নানামতে অঙ্গেতে দেওন্ত।...

এ সব কর্মে— বহু পুণ্য মঘদের শাস্ত্রের মাঝার।
গৃহের যাবর সব একত্র করিয়া
বিষুর প্রভাতে অগ্নি দেওন্ত জ্বালিয়া।
স্নান করি তিতা ভক্ষি খেলাওন্ত রঙ্গে
একত্রে যুবক রঙ্গে যুবতীর সঙ্গে।
এ সকল কর্ম জান হিন্দুর ধরান
বছর হইলে শেষ বছর দহন।
সে শব মরিলে যেন অগ্নিতে দহন্ত
বছরেরে দহি তিতা ভক্ষণ করন্ত।

১৯. হিন্দুদের মতো মুসলমানেরাও বিয়েতে ও খৎনাদি উৎসবে ঢোলাদি বাজনার ব্যবস্থা করেঃ

প্রথমে আনিয়া ঢুলি ঢোল বাজাওন্ত
আকাশ পাতাল আদিসব কাঁপাওন্ত।
শাস্ত্রে মানা ঢোল বাহি বিবাহ করিতে।....
ঢোলের আওয়াজ বোলে যতদূর যাএ
দেও পরী ভূত প্রেত প্রাণ লইয়া যাএ।

২০. এখানেই শেষ নয়, বিয়ের প্রাক্কালে বরকে গায়ে হলুদ মেখে স্নান করানো প্রভৃতি কর্মে ও অনুষ্ঠানে রয়েছে নারীরই অবিসম্বাদিত অধিকার। এও হচ্ছে বেদীনের প্রভাবজাত আচার :

দামাদকে গোসল করাএ তিরিগণে
হলুদ দেওন্ত কেনে মূর্খের বচনে।
হলদি অঙ্গেতে দিলে শাস্ত্রে বহু দোষ।

তাছাড়া বর-সাজেও রয়েছে মঘী-প্রভাব ও আচার। পত্রে-পুষ্পে আচ্ছাদিত শোলার টোপ পরায় বরের মাথায়, তাতে মুখও পড়ে ঢাকা। এবং ধান-দূর্বা-ধূপ-কলা-পিঠা-শিলা সমেত বর-বধূর-বরণ-ডালাও রাখে :

মঘদের কর্ম নহে শাস্ত্রের অন্তরে
নিমিষ্টা (?) শোলার নির্মে মাত্র এক বন
অধিক নিকুঞ্জবন যেহেন কানন।
কুসুম্ব বলিয়া তারে শিরেতে দেওন্ত
সুগন্ধি সৌরভ পুষ্প তারে ন দেওন্ত।
আর এক ডালা ভরি ভূত পূজাখানি
ধূপ ধান্য পিঠা কলা শিলা ভরি আনি।
দামাদ-কন্যার আগে আনিয়া রাখন্ত
যুগ-করে ধূপ দিয়া অধিক পূজন্ত।

এবং বর-বধূর প্রথম সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে পুরনারীরা বেপর্দা হয়ে নানা ধরনের ঠাট্টা-মস্করায়, রঙ্গ-রসে ও নাচে-গানে মেতে ওঠে :

১

চতুর্দিকে বেড়ি যত কামিনীর গণ
উচ্চস্বরে সহেলা গাওন্ত রঙ্গমন।
কেহ কেহ মহা ঠারে মুখ কুটি হাসন্ত
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ নিজে দেখাওন্ত।
নটীগণ হন্তে শ্রেষ্ঠ সে সবের গীত
ভিন্ন পুরুষের মন হএ উছলিত।
এ জন্যেই— তিরিলোকে সহেলা গাহিলে বহু পাপ!

২

এক ঢোল বাজাওন্ত সিফত ভৈক্ষন্ত
আর পুনি তিরিগণে সহেলা গাহন্ত।....
বেনামাজী শরাবী সিফতী মত্ত ভাঙী
এ সবের ঘরে ন খাইবা কিবা ঢঙ্গী।

২১. বিয়ের সময়ে 'মারোয়া' নামের মঞ্চ তৈরী করে, তাকে সাত নাল সূতো দিয়ে বেষ্টন করে রাখে এবং মাচাব নিচে জল ভরা কলসী রাখে। এটিও কুফরী কর্ম :

আর পত্রধারী বহু কাঁচা বাঁশ আনি
মারওয়া নির্মান্ত ইব্লিসের বাসাখানি।
চতুর্দিকে সপ্তনল সূতায় বেড়িয়া
ঠামে ঠামে মু ছহি [?] বহু দেওন্ত ঢুলাইয়া।
মারওয়ার বার্তা নাহি শাস্ত্র মাঝার
মুসলমান কর্ম নহে কাফের সবার।
সত্বর করি কলসী ভরিয়া আনি জল
অতি মান্য করি রাখে মারওয়ার তল।
চারি পাশে ভ্রমি ভ্রমি গাহন্ত সুস্বরে
কলসী 'মানাই' শুনাওন্ত ইব্লিসরে।

এক কলসীর জলে—ঘটজলে কনে দামাদকে একত্রে স্নান করায়....

ঘটজলে দামাদকে সেনান করাইবার
আর দু হানরে একত্র নারীকুলে।
স্নান করাএ কেনে কলসীর জলে।
কলসির বার্তা নাহি শাস্ত্রের মাঝার

আবার— যদি সে কন্যার ঘরে শাহ্ [বর] চলি যাএ।

নাপিত দিয়ে— মুণ্ডকেশ কাটাইয়া আঙ্গুল খুটাএ।

তারপর সেখানে আবার গেড়ুয়া বা গেণ্ডুয়া তথা ফুলের স্তবক বা অন্য কিছুর গোলক নিয়ে বর-কনের মাথার উপর দিয়ে লোফালুফি খেলা করে যুবক-যুবতীরা ঃ

আর যত নবীন যৌবন তিরিগণ
সমান বয়সী কত যুবকের সন।
কুমার কুমারী দুহ মুখামুখি করি
গেড়ুয়া ধরন্ত দোহানকে উয়া [ঋজু-দাঁড় করিয়ে] করি
উচ্চস্বরে মহা ঠারে গেড়ুয়া ধরন্ত।

আর, জুলুয়ার ছেলে ভিন্ন নারীর বদন—
হাসি হাসি রতিভাবে করে নিরীক্ষণ
ভিন্ন পুরুষের মুখ দেখি নারীগণ।
এক লক্ষে পাইল যেন স্বর্গের দরশন।
মুক কুটি হাসিয়া চক্ষু ভাঙ্গা বাঁশ তুলি
মনপুরী হরে নিতি রতিরসে ভুলি।

আর সেকালে নতুন বর-কনে পাশা ও গেড়ুয়া খেলার মাধ্যমেই অপরিচয়ের ও নবপরিচয়ের-শরম মুক্ত হত :

বর-কনে দোহানেরে মুখোমুখি বসাইয়া
পাশা খেলাওন্ত কুপুরুষে যুক্তি দিয়া।
ভিন্ন নারী পুরুষ হৈয়া একত্তর
খেলা ছলে হাসলাস করন্ত বিস্তর।

২২. হিন্দু-প্রভাবে মুসলিম সমাজেও আশরাফ-আতরাফ চেতনা প্রবল ছিল. তাই :

১

কত কত মৌলানায় ফতোয়া দেওন্ত
ধীবরেব ঘরে খাইতে নিষেধ করন্ত।...
আরো বোলে শাস্ত্র মাঝে মৎস্য ন বেচিবার
যেবা বেচে তার ঘরে নারে খাইবার।

২

কেহ বোলে তেলী কিবা হাজামের ঘরে
কিবা মৎস্য বেচে কিবা যেবা মৎস্য মারে।
সে সবের ঘবে বোলে খাইতে ন পারে।

আরো ছিল বিধর্মীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঃ

একহি হুক্কাতে কিবা একহি টেমিতে
মঘদের সঙ্গতি লইছ ধূম্র নিতে
নিজ জাতি সম অন্য জাতিরে জানন্ত।....
মঘদের সঙ্গতি যদি ধূম্র নিতে পারে
কিসকে ভক্ষণ নাহি পারে ভক্ষিবারে
সে সবের কন্যা কেনে বিভা ন করন্ত
আপন দুহিতা সেসবে ন দেওন্ত।

তাছাড়া ধূম্রপানও গর্হিত অভ্যাস :

হুক্কা একে এড়ে আর জনে লয়।

২৩. মহরমের সময়েও মুসলিমরা প্রায় পৌত্তলিক হয়ে যায় :

হাসান হোসেন মূর্তি নির্মান্ত যত্তনে
পড়শী সবেরে আনি পূজা করাওন্ত
নাচি গাহি তিরি সকলেরে শুনাওন্ত।

২৪. চাষাবাদ-বিষয়ে দেশজ মুসলিম সমাজে কতগুলো আদিম ও আদি যাদু বিশ্বাস সংস্কার ও রীতি-রেওয়াজ থেকে গিয়েছিল। যেমন আষাঢ়ের সপ্তম দিনে পৃথিবীর রজস্বলা হয়, রজস্বলা অবস্থায় রমণ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি হলকর্ষণও অবাঞ্ছিত :

আষাঢ়ের সপ্তদিনে রজঃ পৃথিম্বীতে
উদরথু ভগস্থলী নিকালে বাহিরে।
তেকারণে সপ্তদিনে হাল ন জুড়িব।
রজস্বলা হৈলে নারী পারেনি রমিতে
রজস্বলা কালে ভূমি চষিব কেমতে।...

মুসলমানেরা— হিন্দু সব দেখাদেখি পালন্ত সকল।

মুসলমানেরাও বছরের প্রথম হল কর্ষণ মুহূর্তে একটা 'ডিম' জমির মাঝখানে রেখে চারদিকে চষতে থাকে। আবার কেউ কেউ কালোজামের ডাল জমির মধ্যখানে বসিয়ে চাষ শুরু করে। এবং ওইদিন গৃহস্থ কোন প্রতিবেশীকে কোন দ্রব্য দান বা ধার স্বরূপ দেয় না :

কত কত মুসলমানে হাল নামাইতে
ডিম্ব এক মধ্যে রাখি চষে চারিভিতে।
কেহ কেহ জাম ডাল কুপি মধ্যভাগে
চারিপাশে হাল জুড়ে যেন চক্র লাগে।...

যেদিন লামান্ত হাল কিবা জলা চলে
কিবা গুছি লয় কিবা ধান্য আগা লৈলে
কেহ দ্রব্য খুঁজিলে সেদিনে ন দেওন্ত।

২৫. মৃত আত্মীয়দের কল্যাণে ফাতেহা দেয়ার মধ্যেও রয়েছে নানা কুসংস্কার। যেমন এক একজন আত্মীয়ের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই :

মৃত্তিকার কুজা এক সমুখে রাখিব
এক নামে এক জোড়া রুটি তুলি দিব।...
আর কেহ অন্ন যদি ফাতেহা করান
এক পত্র বিছাইব পবিত্র স্থান।
অল্প অল্প ঠাঁই ঠাঁই অন্ন রাখি তাতে
পূজা যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাতে।

এভাবে-নামে নামে শতে শতে ফাতেহা দেওন্ত।

নসরুল্লাহ খোন্দকার আঠারো শতকের চট্টগ্রামের মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তাদের দেশজ ঐতিহ্যের, বিশ্বাসের, সংস্কারের ও আচারের যে-সব আদি ও আদিম রূপ রয়ে গেছে, সে-সবের সাক্ষাৎ বর্ণনা দিয়েছেন। এতে রয়েছে গোময়ের পবিত্রতার সংস্কার, রজস্বলা সম্বন্ধে একাধারে অপবিত্রতার সংস্কার এবং কুমারীর প্রথম যৌবন-সূচনার রজস্রাবে-সানন্দে সামাজিক অনুষ্ঠান মাধ্যমে উৎসব করার রেওয়াজ, মৃতের সৎকার-সম্বন্ধীয় নানা আচার, মৃত্যুভীতিজাত অপবিত্রতার সংস্কার ও যম-প্রতিরোধ প্রয়াসে তিক্ত সবজি ভক্ষণ ও দ্বারে লৌহ স্থাপন, মুসলিমদের বিষুব-সংক্রান্তি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন, বিদায়ী বছরের গ্লানি-দুঃখ-ক্ষতি ভুলবার জন্যে এবং নতুন বছরকে সানন্দে স্বাগত জানানোর জন্যে মানস ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি, ষষ্ঠীর বিকল্প নিমরিয়া পীরের শিরনী, মঘিনীদেবীর ও মহালক্ষ্মীর বলি, পুষাকর্মে ও অন্য কয়েক পার্বণে মুসলিম ঘরে ব্রাহ্মণের ভূমিকা প্রভৃতির এবং সর্বোপরি মুসলিম ঘরে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের নিখুঁত ও সামগ্রিক বিবরণ দিয়েছেন কবি। বর-কনের গায়ে হলুদে, নারীর বিশেষ ভূমিকার, বর-বধূর প্রথম সাক্ষাতে মিলনে ও বাসরে নারীদের পার্বণিক ও আনুষ্ঠানিক ভূমিকার এবং মারোয়া বাঁধা, গেড়ুয়া খেলা, বর-বধূর পাশা খেলা, জোলুয়া দেয়া [বর-কনের মিলন ঘটানো] প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র মেলে এ গ্রন্থে। চাষাবাদে চাষীর অবশ্য পালনীয় রীতি নিয়মের বর্ণনাও আছে। তাছাড়া রয়েছে উৎসবে-পার্বণে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার রীতিরেওয়াজের, 'সিফত' নামের ভাতজাত তরল কাঁজি মদ-পানে নারী-পুরুষের সমাজসম্মত নির্দোষ অধিকারের, নাচে-গানে গৃহস্থদের 'বউ-ঝি'র স্বীকৃত অধিকারের ও অংশগ্রহণের বর্ণনা।

এ সঙ্গে পাই পেশাভেদে সমাজে আশরাফ-আতরাফের স্থিতি। তেলী-হাজাম-ধীবর ছিল ঘৃণ্য পেশাজীবী।

এসব কেবল লৌকিক ও লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারের ও আচার-আচরণের বাস্তব বিবরণ হিসেবে নয়, শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপেও অত্যন্ত মূল্যবান।

তুকতাক-দারু-টোনা-বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলী, রোগ, শুভকর্মের, গৃহ-নির্মাণের ও বস্ত্র পরিধানের তিথিলগ্ন, দেওতাড়ন মন্ত্র, বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান এবং এরূপ আরো কিছু আদিম-আদি যাদু-টোটেম বিশ্বাসসম্পৃক্ত আচার-সংস্কারের বর্ণনা মেলে আরো দুটো গ্রন্থে— মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে'[৩] এবং মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা'য়। অন্যান্য গ্রন্থেও প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় এমনি বিশ্বাস-সংস্কারের ও আচারের ছিটে-ফোঁটা তথ্য মেলে।

এসব লৌকিক আচার-সংস্কার যে কেবল চট্টগ্রামে ছিল তা নয়, গোটা বাঙলাদেশের দেশজ মুসলিম সমাজে এমনি স্থানিক প্রভাবজ আচার-বিশ্বাস চালু ছিল। উনিশ শতকের শেষপাদে রচিত ইসলাম সম্বন্ধীয় অনেক দোভাষী পুথিতেই মুসলিম সমাজে চালু নানা আচার-সংস্কারের বর্ণনা

রয়েছে। আব্দুল আজিজ রচিত 'তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া' (১২৮৩ সন) এবং সমীরউদ্দীন লিখিত 'বেদার-আল-গাফিলিন' (১২৭৫ সন) পুঁথিদুটো এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন কালেও :

"হজরত মাওলানা কেরামত আলী মরহুম মগফুরের আগমনের পূর্বে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান পৌত্তলিকতামূলক কুসংস্কারের সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।... মুসলমানগণ নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মকর্ম ছাড়িয়া দিয়া, নানা প্রকার হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনসাপূজা, শীতলাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, সত্যপীরের পূজা, কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ এসমস্ত কার্য মুসলমান জনসাধারণ মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ব্যতীত পীরপূজা, দরগাপূজা, দরগাঘরে নানারূপ বেদাতীকার্য, মহরমেব সময় তাজিয়াদারী, জারিগান, গাজীর গীত ইত্যাদি শত শত প্রকার ধর্মবিগর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ, খৎনা ও স্ত্রীলোকের প্রথম রজস্বলা উপলক্ষে জঘন্য আমোদ-প্রমোদ-বাদ্য বাজনা প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত।"[৪]

একালে য়ুরোপীয় জ্ঞানেব, বিজ্ঞানের, যন্ত্রের, কৃৎকৌশলের প্রসারে ও প্রসাদে মানুষ শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কারের ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে উদার ও উদাসীন হয়েছে। ফলে শাস্ত্রনিষ্ঠার ক্ষেত্রে শৈথিল্য আসায় লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারেও এসেছে অবহেলা ও অনাস্থা, তবু ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের দান এ ক্ষেত্রে অবশ্য স্বীকার্য। ১২৮৩ সালে [১৮৭৬ সনে] আবদুল আজিজ রচিত 'তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া'য় ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে–

'ঘরে ঘরে দীন জারি/করে লোকে লেখাপড়ি।

এবং– 'মসজিদ নামাজ রোজা
গাঁয়ে গাঁয়ে হৈল তাজা'—বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে সমকালের মানুষ দেখে মনে হয়, আসলে আস্তিক মানুষ বিশ্বাসের যুগ ও জগৎ শত চেষ্টায়ও পুরো অতিক্রম করে যুক্তির যুগে ও জগতে কখনো মানসস্থিতি পায় না। কারণ আস্তিক মানুষের ভাব-চিন্তা ও কর্ম-আচরণ বিশ্বাস ও আস্থা [Belief and Faith] নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান আস্তিক মানুষ তাই দ্বৈধসত্তায় কিংবা নানাক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। কেননা বিজ্ঞানের ও যুক্তির জগতে তার মানস-প্রবাস ঘটে ঘন ঘন। তবু কূর্মের বর্মের মতো তার নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত স্থিতি বিশ্বাসেরও আস্থার ইমারতে আর কূর্মের মতোই যুক্তির ও বিজ্ঞানের আঙিনায় তার চোখ-মুখ-মন-মাথার অনুপ্রবেশ ঘটে কেবল ক্ষণিকের জন্যেই, তবে তাতে তার বিশ্বাসের দুর্গ ভাঙ্গে না বটে, কিন্তু চিড় খায়, আস্থাও টুটে না বটে,তবে নড়বড়ে হয়—নিবিড় বা গাঢ়-গভীর থাকে না। একালের শিক্ষিত মানুষ তাই, গোঁজামিলে মধ্যপন্থী-ঘরেরও নয়, খাটেরও নয়, যখন যেমন, তখন তেমন। তাই চাঁদ একাধারে ও যুগপৎ উপগ্রহ ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আধার।

ষোল শতকের শেষপাদ থেকেই বিশেষ করে গত দু'শ বছর ধরে শিক্ষিত মুসলিমরা স্বধর্মীয় আচারে-সংস্কারে বাঙালীত্ব ঘুচিয়ে দেশজ মুসলিমদের দেশ-কালহীন শরীয়তপন্থী-বৈশ্বিক মুসলিম করার চেষ্টায় রয়েছেন নিরত।

তথ্যসঙ্কেত

১. পাণ্ডুলিপি : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্য সমিতি প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা, ১৯৭৪ সন, পৃ. ১৫৩-৩০৫
২. পৃ. ৬২৮-৩৫, এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' ; দ্রষ্টব্য।
৩. আমার 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।
৪. ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা থেকে 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' [২য় খণ্ড] গ্রন্থে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ-উদ্ধৃত, পৃ. ৭৮
[ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ'ভুক্ত আমার লিখিত প্রবন্ধ, ১৯৮৫ সন।]

নির্ঘণ্ট

অকিঞ্চন দাস ৮২
অক্ষয়কুমার কয়াল ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯
অক্ষয়কুমার দত্ত ৪৭৬
অগ্নি ৬, ৫৮৬
'অগ্নিপরীক্ষা' ২৭০
অগ্নিপুরাণ ৩৬, ১২৮, ৫৫০
অঙ্গদের রায়বার ১৩৫
অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ৮, ১৯, ২১
অচ্যুত দাস ১২৫
অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ৮০
অচ্যুতানন্দ ৩৯, ৮০, ৮১, ১১৫, ৫৪৮, ৫৫২
অজন্তা ১৫৩
'অতুলা সুন্দরী' ৫০৫
অথর্ববেদ ৬, ৭
অদ্ভুত রামায়ণ ১২৮, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪
অদ্ভুতাচার্য (নিত্যানন্দ আচার্য) ১৩২, ১৩৩, ৫৮৭
অদ্বৈত আচার্য ১৮, ১৯, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৭-৪৯, ৫৯, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩-৮৫, ৮৭, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২০, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২, ৫৫৩, ৬১৬
অদ্বৈতপন্থ ৩৭
'অদ্বৈত প্রকাশ' ৩৮, ৭৯-৮১, ১১৮
অদ্বৈতবাদ (অদ্বৈততত্ত্ব) ২, ৩, ৮, ১৪, ১৭, ১৯, ২১, ৮৪, ৩০৩, ৩১৬, ৪৫৬
অদ্বৈতমঙ্গল ৩৮, ৭৯-৮১
অদ্বৈতাষ্টক ৮১
অধ্যাত্মবাদ ১৯
অধ্যাত্ম রামায়ণ ১২৮-১৩১, ১৩৪, ১৬০
অনন্ত ৯৮
অনন্ত দাস (অনন্ত আচার্য) ৩০, ৩১, ৮৭, ৯৩, ৫৪৯, ৫৫২
অনন্তপুরী ৫৪৮, ৫৫০
অনন্তবিপ্র নন্দিনী ৫৫৩
অনন্ত মিশ্র ১৫৫, ১৬০
অনার্য ৭, ৮, ৪১০, ৪৫৩, ৫৮৪
অনার্য ভাষা ৪১০
অনিরুদ্ধ ৩৪, ১৬০
অনিরুদ্ধ গুপ্ত ৫৩৯
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯৮
অনুপ ভট্ট ৪০৮
অনুপচন্দ্র দত্ত ৫৪০
অনুপম গোস্বামী ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ১১৮
অনুভবানন্দ ৫৪৮, ৫৫০
'অনুরাগবল্লী' ৩৬, ৪৫, ৪৬, ৮২, ৮৪
অনুরাধা ৬
'অনুশীলন' ৩৪০
অনুষ্টুপ ছন্দ ১২৮
অন্নদা ৩৮৬, ৪১০, ৪১৫, ৪১৭, ৪২৬
'অন্নদামঙ্গল' ৩৮৮, ৩৯৪, ৪১৩, ৪১৫-৪১৭, ৪২১, ৪২৭, ৪২৯, ৪৪১, ৫৩১, ৫৪০, ৫৮৯, ৬০২
অন্নপূর্ণা ৩৮৬, ৩৮৮, ৪১৫, ৪২৬
অবলোকিতেশ্বর ৮, ৯, ৪৩৪, ৪৩৮
অবহট্‌ঠ ২৫, ৮৬, ৮৮, ৯০, ২১৫
অভয়া দাসী ৬৪
অভিনন্দ ১২৯, ১৩১
অভিরাম গোস্বামী ৫৯
অভিরাম ঠাকুর ৫৪৯
অভিরাম দাস ১২৫
অভিরাম নিত্যানন্দ ৫৫১
অভিরাম মুখোপাধ্যায় ১৫৬
অভিরামলীলামৃত ৮২
অভেদতত্ত্ব ১
অমর মাণিক্য ২৯০
অমরু শতক ২৫
'অমৃতরত্নাবলী' ৮২
'অমৃতরসাবলী' ৮২

অম্ববরু উপাখ্যান ৪০৮
অম্বষ্ঠ বল্লভ ১৬০
অম্বিকানাথ ব্রহ্মচারী ৪৯
অযোধ্যা ২১৫, ২১৬, ৩১০, ৪৪২, ৫৬৯, ৫৭১
অযোধ্যাকাণ্ড ১২৭
অযোধ্যারাম রায় ৪৪১, ৪৪৩
অর্জুন ১২৭, ৩৬৭
অশোক ১৫৩
অশ্ব ঘোষ ১৩১
অষ্টকালিকা ৩৫
অষ্টবাসরীয় পালা ৩৯১
অষ্টমঙ্গলা ৩৯৮
অষ্টলোকপাল কথা ৪২৪
'অষ্টাধ্যায়ী' ১২৭
অষ্ট্রিক ৪৫৪, ৫৮৪, ৫৯৯
অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভেড্ডিড ৪২৬
অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোল ৪৭৪
অষ্ট্রিক-ভেড্ডিড ৪৩৪, ৪৫৩
অষ্ট্রিক-মঙ্গোল ৩৮৬, ৪৫৪, ৬১২
অষ্ট্রিক-মঙ্গোল-নেগ্রিটো ৪২৬
'অসমৎ নামা' ২০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডক্টর) ৭৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৯, ১৫২, ১৬১, ৫২৬, ৫৩২, ৫৪১
অসুরদলনী ৩৮৭
অস্ট্রেলিয়া ৫৮৪
আইন-ই-আকবরী ১৯৪, ৫৭১, ৫৭২
আইনুদ্দীন ৯৮, ১০০, ১৯৬, ২০৬, ৩০৫, ৩৩২
'আইয়ুব নবীর কিসসা' ২৬২
আইয়াজ-ই-খুস-রুবী ৫৭১
আইয়োনিযান যবন ৮৩
আউল ১৭
আওধী ২১৫, ২৩৪
আওরঙ্গজেব ১৬১, ১৭৩, ১৯০, ২৬১, ২৭৯, ৪১২, ৪৩৭, ৪৬৫, ৪৬৭, ৫৬৯, ৫৭১
'আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি' ১০০, ১৯৮, ৫৩৫, ৫৩৬
আওলিয়া কাহিনী ৪৯৯
আকবর (সম্রাট) ১০, ১৮, ৯৯, ১২৩, ২৩৫, ৩৯১, ৩৯২, ৪৩৬, ৪৩৯, ৫৬৯-৫৭১, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৯, ৫৯১
আকবর আলি ৯৯, ৩৩৫
আকবর চৌধুরী ৬১৮
'আকবর নামা' ৮৪, ৫৮৬
আকবর শাহ ৯৮, ৯৯, ৫৭৫
আকিয়াব ১৯৫, ২১৪
আখড়াই ৫২৩, ৫২৫
আখণ্ডল আচার্য ৭৮
'আখবারুল জুমা' ৪৯৯
আখরিয়া বিজয় দাস ৫৫১
'আখেরি কালাম' ২১৫
'আগম' ৩০৪
'আগম-জ্ঞানসাগর' ১৩, ৩০৪, ৩৪৭, ৩৪৮
'আগম সার' ৮২
আগ্রা ৫৭০
আচার্য চক্রপাণি ৫৪৮
আচার্য বল্লভ ৫৪৮
আচার্য রতন ৫৫১
আছলাম ২৩২
আজগর আলি পণ্ডিত ২৬২
আজমত আলি ৩৩০, ৩৩৫
আজমতুল্লাহ ৩৮৪, ৩৮৫
'আজরশাহ-সমনরোখ' ১৬৬, ১৭৩, ২৩৬, ২৫৪-২৫৮, ৩৫৫
আজহার আলী ২৯৬
'আজাদ' (পত্রিকা) ৪৮৩
আজাবুল কবর ৩৩৫, ৫০১
আজিমুদ্দীন আহমদ ২৯৬
আজিমউল্লাহ খান ২৬২
আজিমুশ্‌শান ৪৩৭
আড়ার (আড়বার) ৩১
আড়াঢ় ৭
আতাউল্লাহ ২৪৮, ৩৩৫
আদম ২৯১
আদমউদ্দীন ৩৫৮

আদম ফকির ৩৪১. ৫১৯
আদিনাথ ৩৯১. ৪২৭. ৪৩৪, ৪৩৮
আদিনাথ-আদ্যা ৪২৬
আদি পুরাণ ৬৮. ৫৫০
আদিবাসী ৩০৪
আদিল শাহ ১৭৩
আদি শূর ১২০
আদি সংহিতা ৫৫০
আদিত্য দাস ৪০৮
আদিল খান সুর ৫৬৯
'আদ্য পরিচয়' ৩০৪
'আদ্যব্যক্ত' ৩০৪
আদ্যাশক্তি ৪১০. ৪২৬. ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৮
আধু খান ২৪৮, ৩২৪. ৫৩৩, ৫৩৪
আনন্দ (সম্প্রদায়) ১২০
আনন্দ দেবী ৫৯১
আনন্দবর্ধন ৭
'আনন্দবর্মা-রতনকলিকা' ২০২, ২০৭. ২১৪, ২১৯, ২২০ ২৬৬, ২৬৭. ২৭৮
'আনন্দ বৈভব' ৮২
আনন্দমঞ্জরী ৮২
আনারউদ্দীন খোন্দকার ৫২১
আনোয়ারা ২৮১, ৩২০, ৩৪৭, ৩৯৮
আফজল আলি ৯৯, ১০৫, ৩২৪, ৩২৫, ৫৫৯
আফসোস ১৫
আফ্রিকা ৫৮৪
'আবজাদ' রীতি ২৪৫, ৩০৫
আবদুন নবী ১৬৬, ২৬১, ২৮০, ৩১৪, ৩২৭, ৩৩৫
আবদুর রউফ ৫২২
আব্দুর রশিদ ২৩৬
আবদুর রহমান ২১৫, ৫১৮
আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ৩৬০
আবদুর রহিম ৩০৪, ৪৫৭
আবদুর রহিম (শায়ের) ৪৬৭, ৪৭৩, ৪৮০, ৪৮৫
আবদুর রহিম খান খানান ১১১
আবদুল আজিজ ৬৩০
আবদুল আলি ৩২৯
আব্দুল আলিম (হালিম) ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
আবদুল ওহাব ১০৩. ১০৭. ২৯৫. ৩৩৫. ৪৮৫. ৫১১, ৫১৭. ৫৭৫. ৫৭৬,
আবদুল ওহাব সদর-ই-জাঁহা ২৮৯. ২৯০. ৫৩৫
আবদুল করিম (ডক্টর) ৩২১. ৩২৪
আবদুল করিম খোন্দকার ১৯৬, ১৯৭. ২০৬. ৩০৫, ৩১৬. ৩৩২, ৩৪০. ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫১. ৩৫৬. ৩৮২-৩৮৪
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৩. ১০৯. ১৪১, ১৪৩, ১৬৯, ১৭৮, ১৮০. ১৯৭. ২০১. ২০২, ২০৩, ২১৮, ২৩২. ২৩৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮. ২৫৪. ২৬৪, ২৬৫, ২৬৮, ২৭২. ২৭৭. ২৭৯, ২৮১, ২৮৩, ২৯৪, ৩১৭, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৪৬. ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৯, ৩৯১. ৩৯৮, ৪১১, ৪১২, ৪২৪. ৪৩৩, ৪৪৪, ৪৫৩, ৪৭৯, ৪৯১. ৪৯২, ৫২২, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৫৭, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৪, ৫৭৫, ৬১৪, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯
আবদুল কাদির জিলানী (বড়পীর) ৪৭৩
আবদুল গনি ২০৬, ৩৩২, ৪৯৯, ৫৭৭
আবদুল গফুর ৪৫৭, ৫৮৭
আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ ১৮৯, ৩৩৪, ৪৯১,
আবদুল গাফফার ৫১৬
আবদুল জলিল পেশোয়ারী ৩১০
আবদুল বহর (গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ) ১৩১
আবদুল বারী ২৯৫
আবদুল মজিদ ২৫৪, ২৫৬-২৫৮
আবদুল মজিদ খান ৪৬৭, ৪৮০, ৪৯৫
আবদুল মজিদ খোন্দকার ৪৯৭
আবদুল মজিদ ভূঁইয়া ৪৯৪, ৪৯৫
আবদুল মালেক (খলিফা) ১৮৮, ২৭৭, ৪৯৩

আবদুল মুত্তালিব ২৮০
আবদুল হক চৌধুরী ২০৩, ৬১৮
আবদুল হাকিম ১৫৪, ২৯৫, ৩০১, ৩০৪, ৪৮৩
আবদুস শুকুর (ওর্ফে মানিক মিয়া) ২৫০
আবদুস সাত্তার চৌধুরী ২৮১
আবদুস সামাদ ৩৩৫
আবদুস সোবহান ২৯৫, ৫২২
আবদুল্লাহ ৩০৫, ৩৩০
আবদুল্লাহ ইবনে গোলাম ১৯০
আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ ২৭৫
আবদুল্লাহ হাতিভী ১৮৯
আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল ১৩, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫০, ৫১৯
আবাল ফকির ৯৯
আবিসিনিয়া ৫৬৬, ৫৬৭, ৬০৭
আবু জদ জহিরুল হক ১৮৯, ৫০৩
আবু তালিব ৪৪৪
আবু নসর সারাজ ৫৬৭
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (ডক্টর) ১৬৫, ২৪৯
আবু সামা ৪৮৯
'আবু সামার পুথি' ৫১৯
আবু সৈয়দ ৩৮৪
আবু হাশিম ৩০৩, ৪৫৬
আবুল ফজল ৫৭১, ৫৯৫, ৬০৪
আবুল ফারাজ ইসফাহানী ৫৬৭
আবুল মনসুর আহমদ ৪৮৭, ৪৮৮
আবেদ আলী খাঁ ৩৩৫
আব্বাস ৯৯,
আব্বাস আলী মিয়া ৫২২
আব্বাসীয় বংশ ২৭৫
আব্বাসীয় যুগ ৩০২
আভীর (আহীর) জাতি ৭, ২০০, ২০১
আমজাদ কাজী ৫৭৫
আমর হামজা ৫৬৭
আমানউল্লাহ ২৯৪, ২৯৫
আমানত ২৪৯
আমীর উদ্দীন ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৭৩
আমীর খসরু ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ২১৪, ২৩৪, ৪৮৮, ৪৯৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭১
আমীর সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী ৫০৭
'আমীর হামজা' (হামজার বিজয়) ২৮০, ৩৩৫, ৩৫৩, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯৩, ৫২২,
আমীর হামজার দাদ ৫০৯
'আমীর হামজার বিজয়' ২৮০, ২৮১
'আম্বিয়ানামা' ৫২২
'আম্বিয়াবাণী' ২৯৩, ৩৩৪, ৪৬৪
আম্বুরামুলুক ৩০
আম্মান (আমান) ৯৯
আমেরিকা ৫৮৪
আয়ুর নবীর কথা ৩৩৩
আয়না-মহুয়া-মলুয়া-ভেলুয়া-সখিনা-সোনাই লীলা-কাজল-চন্দ্রাবতী ৫৭৭, ৬০৫, ৬০৭
আয়ুর্বেদ ৫৯৩
আয়েজুদ্দীন ৪৮৫
আরড়া ৩৯২-৩৯৫
আরণ্যক ৭
আরব ২, ১৪৭, ১৫১, ১৮৮, ১৯৬, ২০৩, ২৭৪, ২৭৬, ৩০৪, ৩৫৯, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৯৩, ৫৬৬, ৫৬৭
আরবি ২১৫, ২৩৪, ২৪০, ২৬৫, ২৭৩, ২৭৮, ৩০০, ৩০৩, ৩১৩, ৩২৭, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮৪, ৪৮৫, ৫৯০, ৬১৯
'আরবি তিন হরফে মুনাজাত' ৩২৬
'আরবী ত্রিশ হরফের বয়ান' ৩২৬
আরবী-ফারসী ১৬৫, ২০৭, ২০৮, ২৪৯, ৩২৭, ৩৪৩, ৪৫২, ৪৭৪-৪৭৮, ৪৮১, ৪৮৪, ৪৮৫, ৫৩৪
আরব্য উপন্যাস ৫০৯
আরাকান ১০৯, ১১১, ১৪৬, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৪-১৯৯, ২০৩-২০৪, ২০৮, ২১৪, ২২১, ২৩৩,

২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৯০, ৩০১, ৩২২, ৩২৪, ৩৩১, ৩৫৫, ৩৮৩, ৪৬৭, ৬০৪, ৬০৭, ৬২৫
'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' ১৯৭, ২০৫, ২৩২, ২৩৩
আরিফ ৪৪১, ৪৪৮, ৪৫১, ৪৮৫
আরিফ লাহোরী ১৯০
আর্মেনীয় (ভাষা) ২০৮, ২৭৮
আর্য ৭, ৮, ১৯৭, ৪১০, ৪৫৩, ৫৮৪
আর্য বিজয় ১
আর্যভাষা ৪১০, ৪৩৪, ৪৭৪
'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' ৪৭৪
আর্য সমাজী ২৮
আর্যাবর্ত ১৫৩, ১৯৭
'আঁযা সপ্তশতী' ২৫, ৫৩০, ৬০৯
আল আশআরী ৩০২, ৪৫৬
আল ইসলাহ (পত্রিকা) ৩৫৮
আল এসলাম (পত্রিকা) ৪৭৯
আলম (কবি) ৫৭০
'আলমাস ও গোল রায়হান' ৫১৩
আল মাসুদী ৫৬৭
আলাউদ্দীন খিলজী ২০৮, ২১৬, ৫৬৯
আলাউল ৯৯, ১১১, ১৮৪, ১৯৫-১৯৮, ২০১-২০৫, ২০৭-২২৯, ২৩৩, ২৩৬-২৩৮, ২৪৮, ২৫৬, ২৬১, ২৬৭, ২৭২, ২৭৭-২৮০, ৩০৫, ৩১০-৩১৩, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৫৫, ৩৯১, ৩৯৪, ৪১৯, ৪৮৩, ৪৯৮, ৫১৭, ৫৩১, ৫৪৪, ৫৬১, ৫৬২, ৫৭৫, ৫৮৮, ৫৯১, ৫৯৩, ৬০০, ৬০১, ৬০৩, ৬১৫, ৬১৮
আলাউল খান ৯৯, ২০৭, ৩৫৫
আলাউল হক ২০৭
'আলালের ঘরের দুলাল' ৪৫২, ৪৭৭
আলি-ফাতেমা ৪২৭
আলী আহমদ ২৩৯, ২৪০, ২৮৩, ২৯৫, ৩১৪, ৩৪৩, ৩৫৮
'আলী ও দেলবাহার কেচ্ছা' ৫০৯
আলিবর্দী (নবাব) ৪৩৭, ৪৭৮, ৫৩২, ৫৪১, ৫৮৭
আলি আদিল শাহ ১৬৮
আলি মিয়া ১০০, ১০৬, ২৬১, ৬১৮
আলিমুদ্দিন ৯৯, ১০০
আলি রজা ১১, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১১১, ২৬১, ৩০৪, ৩৩১-৩৩৩, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৬১৮
আলীগড় ১৯০
আলী হোসেন চৌধুরী (কালাচাঁদ চৌধুরী) ২৬৩, ২৬৪
আলেফ লায়লা ১০৭, ২১৪, ২১৯, ২৩৬, ২৩৭, ২৬৬, ৪৭৩, ৪৮৮, ৫০৫, ৫১২, ৫৬২
আলোয়ার সম্প্রদায় ৫, ৬, ৭, ৩১, ৩৮
আশরাফ ৩০৫, ৩০৮-৩১০, ৪৭৩,
আশরাফ আলী খাঁ ৩৩৫
আশবাফ আলী চৌধুরী ২৭১
আশরাফ খান (লস্কর উজীর) ১৯৯, ২০০
আশআরীয় মতবাদ ৩০২, ৪৫৬
আশুতোষ ভট্টাচার্য (ডক্টর) ১৭৭, ১৭৮, ৩২৭, ৩৮৭, ৩৯১, ৩৯৯, ৪০২, ৪০৮, ৪০৯, ৪১২, ৪১৩, ৪৩১
'আশেকী কামাল' ৩০৪
আশেক মতলবের কিস্‌সা ৫২২
আশেক মুহম্মদ ৪৭৩
'আসমানী পর্দা' ৪৮৭, ৪৮৮
আসক ১০০
'আসক নামা' ৫০১
আসাউদ্দীন (পীর) ১০০, ১০৪, ১৮৪, ১৮৮
আসাদ আলী চৌধুরী ২৬৫
আসাম ৮৮, ৯০, ১২০, ১৫৩, ১৮০, ৪০১, ৪০২, ৪৩৭, ৪৪৩, ৪৫৪, ৫৯৪, ৬০৫, ৬১১
আসামী (ভাষা) ৪০১, ৪৭৫
আসুরার সালাত ৩৩৫
আহমদ ১১১
আহমদনগর ১৬৬, ২৩৫, ২৭৪
আহমদ শরীফ (ডক্টর) ১৯৮, ২১১, ২৫৫, ৫২২, ৬১৩, ৬১৪

'আহকামুল জুমা' ৩৩৫. ৪৮৯. ৪৯৬
আহসান হাবীব ৪৮৮
আহাদীসুল খাওয়াননী ১৮৬
অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ৫২৫-৫২৭
ইউচি ১
ইউনানী চিকিৎসা ৫৯৩
ইউনানী-দর্শন ১২
'ইউনান দেশের কথা' ৩৩৫
'ইউনান দেশের পুঁথি' ১৩
ইউসুফ গদা ২১৪, ৩০৫, ৩১০-৩১২
ইউসুফ-জোলেখা ১১০, ১৫৪, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২০২, ২৪০, ২৪১, ৩১৬, ৪৮৮-৪৯১, ৫০৩, ৫১৭, ৫১৮, ৫২২
ইউসুফ হাফিজ ২৫৩
ইংরেজ ২৬৭, ৪২৭, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫২৪, ৫৪০, ৫৪১
ইংরেজ আমল ২, ২৬৭, ৪৭৭, ৪৮৬, ৫৭০, ৫৮৯
ইংরেজী ভাষা ১৯৭, ২১৫, ৪৫২, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৮, ৫২৮
ইংল্যাণ্ড ৮৩, ৩৯৪
ইকদুল ফরিদ ৫৬৭
ইকবাল ২৮
ইকবাল নামা ২৭৭
ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ৫৮৯
ইছাই ঘোষ ৩৮৮
ইতিহাস পত্রিকা ১৭১, ৫৩৯, ৬১৭
'ইতিহাসমালা' ৪৭৭
ইদিলপুর ২৫৩
ইন্দার সভা ২৪৯
ইন্দ্র ৬, ৩৬৩
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৪২১
ইন্দ্রপ্রস্থ ১৩৭
ইন্দ্র-শচী ১১০
ইন্দ্রাবৎ ২১৫
ইন্দোনেশিয়া ২৭৭
ইবনে আবদুর বিবহী ৫৬৭
'ইবন আমীন ও চন্দ্রপ্রভা' ২৪১
ইবনে বতুতা ২৮৯, ৬০১, ৬০৬. ৬০৭, ৬০৯-৬১১
ইব্রাহীম আদহম ৩০৩. ৩৭৬, ৪৫৬
ইব্রাহিম আদিল সুর ৫৭০
ইব্রাহিম খান ১৪৬, ১৫০, ১৮৬. ২৮৯, ২৯০, ৩২২, ৩২৩, ৩৫৫
ইব্রাহিম শর্কী ৪৬৭, ৫৭০
'ইব্লিসনামা' ৩৩৫, ৪৮৯, ৪৯৬
ইমাম আবু হানিফা ৩৭৬
ইমাম আহমদ হাম্বল ৩৭৬
ইমাম গাজ্জালী ৩১৭, ৫৬৭,
ইমাম চুরির পুথি ৫৯১, ৫১৮
ইমাম জাফর সাদেক ২৭৫, ৩৭৬
'ইমাম বিজয়' ১৯০, ২৮৩, ২৮৪
ইমাম শাফী ৩৭৬
'ইমাম সাগর' ২৯৫, ৫২১
ইমামিয়া ১৬৬
ইরাক ২৭৬, ৪৫৫, ৬০৫
ইরাকি ৩০৩, ৪৫৬
ইরান ১৬৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯৭, ২৩৫, ২৩৬, ২৪১, ২৭৪, ৩০৩, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৮২, ৫৬৭, ৬০৫, ৬০৭
ইরানি ২৩৫, ২৪২, ২৭৪, ২৭৬, ৩০২, ৪৮৬
ইরানী ভাষা ১৮৯
ইরানী-শিয়া ২৭৪
ইলাহি ধর্ম ৪৩৯, ৫৮৬
ঈশান ৪২৭
ঈশান আচার্য ৫৪৮
ঈশান গোস্বামী ৪৪১
ঈশানচন্দ্র ঘোষ ১৭৬
ঈশান দাস ৫৪৯
ঈশান নাগর ৩৮, ৮০, ৮১, ১১৮
ঈশান বসু ১২৩
ঈশ্বর কৃষ্ণ ১২৩
ঈশ্বর গুপ্ত ৫২৫-৫২৭
'ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবি জীবনী' ৫২৬

ঈশ্বর গোলাম ২৫৯, ২৬২
ঈশ্বরপুরী ১৯, ৩৭, ৩৮, ১১৫, ১২০, ৫৫০, ৫৫১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৪৭৫-৪৭৭
'ইসপের গল্পাবলী' ৪৪৭
ইসমাইল গাজী ৩৭৭, ৪৪৩, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬৫, ৪৭৯, ৪৮৮
ইসমাইল গাজী চরিত ৪৪১
ইসমাইল সেরেস্তাদার ৩৩৫
ইসমাইলী শাখা (ইসমাইলিয়া) ৩০৩, ৪৫৬
ইসলাম ২-৫, ৮, ৯, ১০-১৩, ১৬, ১৮, ১৯, ২৭, ১১১, ১১৪, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১৬৬, ২৭৩-২৭৬, ২৮০, ২৮১, ২৮৯, ২৯৫, ৩০১-৩০৫, ৩১৫, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৬৩, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭৪, ৪৮২, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫১৯, ৫৬৬-৫৬৮, ৫৮৬, ৫৯০, ৬০১, ৬০২, ৬১৮, ৬২৯
'ইসলাম নবী কেচ্ছা' ৪৯৮
ইসলাম প্রচারক (পত্রিকা) ৬৩০
ইসলামভেদ ৫২২
ইসলাম সুর ৪৩৯, ৫৬৯
ইসলাম শাহ ১১৮
ইসলামাবাদ ২৫৩, ৩৮০, ৩৮১
'ইসলামের চারুশিল্প' ৫২২
'ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য' ১৭০, ৪৫১
ইসহাক আল নিশাপুরী ৩৭৭
ইসহাক খান ৩২২
ঈসা খাঁ ২০৭, ২৮৯, ২৯০, ৪৩৬, ৫৩২,৫৩৫, ৬০০
ঈসাপুর ৫৩৫, ৫৩৬
'ঈসাপুরের ইতিহাস' ৫৩৫
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ৪১৫, ৪৩৭, ৪৮৬, ৫২৮, ৫৫৪
উইন্টারনিজ ১২৬
উইলকিন্স ৪৭৭
উগ্রশ্রবাঃ ১৩৭
'উচিত শ্রবণ' ২৬৫
উজির আলি মুন্সী ২৬২
'উজ্জ্বলনীলমণি' ৩৫, ৩৬, ৮৩
উড়িডয়ানা ৫৯০
উড়িয়া (ভাষা) ৪৭৫, ৫৯০
উড়িয়া ভগবানাচার্য ৫৫১
উড়িষ্যা ৩১, ৩৪, ৫৯, ৮৯-৯০, ১০৭, ১১৪, ১১৮, ১৫২, ৩৯২, ৪২১, ৪৩৭, ৪৬৫, ৪৮০, ৫২৮, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৪৮, ৫৫১, ৫৯০, ৬০৬
উৎকল ৮৪, ৩৯২
উৎকলিকারল্লী ৩৫
উৎসবানন্দ ১৩২
উত্তরকাণ্ড ১২৬
উত্তরপুরাণ ১৩৯
উত্তরপ্রদেশ ২০০, ৫৪২
উত্তর বঙ্গ ১১৪, ৩০০, ৩৮৭, ৪০৬, ৪০৭, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬৭, ৫২১, ৫৪০, ৫৪২
উত্তর ভারত ২, ৬, ৯, ১৯, ২০, ২৭, ৯০, ১১১, ১২৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৬, ২১৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৬৭, ৩০৪, ৪০৮, ৪২৪, ৪৫২, ৫৭২, ৫৭৫, ৫৮৬, ৬০৫, ৬১১
উত্তরাপথ ২, ৯, ১৩৭, ১৩৮, ৪০৮
উদয়মানিক্য ২৯০
উদয়াদিত্য ১০৯
উদয়নাচার্য ভাদুড়ী ১১৪
উদ্ধব দাস ৪৬, ৬৮, ৮৭, ৯৮, ১২৪, ৫৪৯
'উদ্ধব সন্দেশ' ৩৫
উদ্ধরণ দত্ত ৫৪৮
উদ্ধার দেবী-উদ্ধার বিবি ৩০৪, ৪৪০, ৪৮৯, ৫৮৭
উনিশ শতক ২, ৬১৮, ৬২৯
'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' ৬৩০
'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ' ৮, ১০
উপনিষদ ৩, ১০, ১২৮, ১২৯, ৪৮২

উপাসনাসার ৮৪
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৭, ৬১৩, ৬১৫
উপেন্দ্র মিশ্র ৫৮
উমর (কবি) ৫৭৭
উমা ৩৮৬, ৩৮৭, ৪১০, ৪২৬, ৪২৭
উমাইয়া ২৭৫, ২৮৪
উমাচরণ মিত্র ২৫০
উমাপতি ধর ১১৪
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ১৪০
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫, ১৭
উম্মিয়া শাসনকাল ৩০২, ৪৫৫
উর্দু ২৩৪, ২৩৫, ২৪৯, ২৭৬, ২৭৭, ৩২৭, ৪৫২, ৪৭৩, ৪৭৯-৪৮৫, ৫০৩, ৫০৯, ৫২২, ৬১৯
উর্দু-বাঙলা ৪৭৮
উর্দু-ফারসী ২৯৫, ৪৫২
উর্দু-হিন্দি ২৩৪, ২৫৮, ৪৭৯, ৪৮১
উসমান (কবি) ২১৫
উসমান খান ৪৩৬
ঋগ্বেদ ৭, ১৩১, ১৯১
একচাকা বড় গাছী ৭৮
একদীল শাহ ৪৭৩
একলব্য ১০, ৪০৮
'এক শত বত্রিশ ফরজ' ৩৩৫, ৪৮৯, ৪৯৯
'একাদশীর পাঁচালী' ১৬১
একেশ্বরবাদ ৩, ১১৪
'এছলামী বাংলা' ৪৮৬
এজিদ ১৯৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৪, ৫১১
এতিম আলম ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৯
এতিম কাসেম ১০০, ১৯৮, ৫৩৫, ৫৩৬
এতিম নাসির ৯৯, ১০৩
এনায়েতুল্লাহ ৫১৭
এবাদত (এবাদুল্লাহ) ১০০
এয়াকুব আলী ৪৯০-৪৯২
এয়ারী ১১১
এরাদত আলী ২৫০, ৫০৭, ৫০৮
এর্শাদুল্লাহ ১০০, ৩৪৭
এশিয়া ৫৮৪
এশিয়াটিক সোসাইটি ৫৭, ৬৩০
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (কলিকাতা) ৫৪৫
এস্কে সাদেক ৫০৪
এলান ১৩
'এহিয়া উল্ উলুম' ৫৬৭
এহিয়া কাবুলি ৫৭০
এ্যলুইন ২০০
ঐনবার বংশ ২৮
ওথেলো-ডেসডিমোনা ৩৬৬
ওফাতনামা ৫২২
'ওফাত-ই-রসুল' ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৭৬
ওয়াজুদ্দিন চৌধুরী ৫৩৯
ওয়াকিল আহমদ (ডক্টর) ১৯১, ১৯২, ৬৩০
ওয়াজেদ আলী ১৮৯, ৪৪১, ৪৪৫, ৪৯০,
ওয়াজেদ আলী শাহ (অযোধ্যার নবাব) ৫৬৯, ৫৭১
ওয়ারেন হেস্টিংস ১০০, ৫৩৬, ৫৪১
ওয়াসিল ইবনে আতা ৩০২, ৪৫৬
ওয়াহিদ আলী ২৯৫
ওয়াহিদ মুহম্মদ চৌধুরী ১০২
ওয়াহাবী আন্দোলন ২৮২, ৫৪০
ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন ১১৭, ৩০১, ৫৪২, ৬৩০
ওঁরাও ৩৮৬, ৪২৬, ৫৮৪
ওয়াং অ য়ুয়ান ৬০১, ৬১১
ওলাদেবী-ওলা বিবি ২৮২, ৩৮৬, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৮৯, ৫৮৭, ৫৯৪, ৬০২, ৬১৩
ওলী মুহম্মদ মনজীর ১৯০
ওসমান ১৬
ওহাবী ২৮
ওহুদের যুদ্ধ ২৭৩, ৩৭৬, ৫৬৭
কংসারি সেন ৫৪৯, ৫৫২
কক্সবাজার ২৬৩, ৩৫৭, ৪৬৭, ৬০৪
কঙ্ক ১১৭, ২৮৩, ৪১০, ৪১১, ৪৪০, ৪৪১
'কঙ্ক ও লীলা' ৪১১, ৫৮১
'কঞ্জু দায়ায়েক' ৩১৮
কটক ১৫৬

কঠ (উপনিষদ) ৬
কদর খান গাজী ২৮৯
কড়চা ৪৩, ৪৪
কল্ক ৪২৭, ৪৩৪
কপিল সাংখ্যসূত্র ৭
কপিলামঙ্গল ৪২৪, ৪২৫
কবিওয়ালা ২৫৬, ৪১০, ৪১৫, ৪১৬, ৪৯৮, ৫২২-৫২৯, ৫৩১
কবিকঙ্কণ ৫৯৫, ৬০৬
কবি-কর্ণপুর ৪০৮
কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৮০, ৮১, ১২১, ১২২, ৫৫০
কবিগান ২৫৬, ৪১৫, ৪৫৫, ৪৭৮, ৫২২-৫২৯
কবিচন্দ্র ৮৬, ৯৩, ১৩২, ৩৯৭, ৪১০, ৪২৩
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ৫৪৯
কবিচন্দ্র ঠাকুর ৫৪৮
কবিচন্দ্র বৈদ্যনাথ ৫৫৩
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ৩৯৩, ৪২৫
কবিচন্দ্র মিশ্র ১৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ৩৯৭
কবি বলরাম ৩৯০
কবিবল্লভ ১২৪, ৪২২
কবিরঞ্জন ৯৭, ৯৮
কবিশেখর ৯৭, ১২৩, ১২৪
কবিশেখর গোবিন্দ ১৬০
কবীন্দ্র ১৭৭, ৪১০, ৪১৩
কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী ৩৯৯, ৪০০, ৪২৩, ৪২৪
কবীন্দ্র আচার্য ৫৪৮
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ১৯, ১১১, ১৩৯, ১৪০-১৪৭, ১৪৯-১৫৫, ১৫৭, ২৫২, ২৯০, ৩৯০, ৩৯১, ৪২৪, ৫৩১
'কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত' ১৪৪
কবীন্দ্র মহাভারত ১৫৩-১৫৫
কবীর ২, ৪-৬, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ৩৭, ৪০৮, ৫৮৫, ৫৮৬
কবীরপন্থী ৩০৩
কমর আলী ১০০
কমর আলী পণ্ডিত ৫৭৫
কমল দাসকর ৬৪
কমল নয়ন ৪০৮. ৫৫১
কমললোচন ৪০৮
কমলা ৩৮৬, ৫৪৮
কমলাকর পিপিলাই ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
কমলামঙ্গল ৩৯৮, ৪১১, ৪২২, ৪৫৪
কমলাকান্ত দাস ৮৬. ১৫৬. ১৫৯
কমলাকান্ত ৫৪৮, ৫৫১
'কমলাকান্তের দপ্তর' ৪৭৭
কমলাক্ষ (কমলকর) ৩৮
কমলে কামিনী ৩৮৯. ৩৯৮, ৪৪৪, ৪৫৮
কমোভট্ট ৫৫১
'কয়ম্রুচ রাজার কেচ্ছা' ২৬৫
করতোয়া ১৩৩, ৪০৭, ৪৬৭
করমণ্ডল ৬০৭
করাচী ১৯৭
কর্ণ ৬, ১২৭, ১৩৯, ৪৯৮
কর্ণপুর কবিরাজ ৮৪
কর্ণফুলী (নদী) ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৯, ২৫২, ৩৯৯
কর্ণসেন ৩৮৮
কর্ণাট ৪৩৪
কর্ণানন্দ ৮১
কর্মকার গোবিন্দদাস ৭৭
কর্মবাদ (কর্মমার্গ) ৭, ৮, ৩৭
কলন্দর, কলন্দরিয়া ৮৩, ৮৫, ৬১০
কলন্দরিয়া সম্প্রদায় ১১, ৩০৩, ৬০৩
কলবে আলী (নবাব) ৫৬৯
'কলমী পুথি' ৪৮৩, ৫১৯
'কলা অব্দ' ২৪৪
কলানিধি ৫৫১
কলি ৪৪২
কলিকাতা, কোলকাতা ১, ২, ২৭, ৪৪, ২৫০, ২৫৪-২৫৭, ২৬৩, ৩৯৫, ৪০৪, ৪১১, ৪১৩, ৪১৫, ৪৩৫,

৪৫২, ৪৫৫, ৪৭৮-৪৮১, ৪৮৫-৪৮৭, ৪৯২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৬-৫২৮
কামরূপ ১৯৭, ৪৬৫, ৬০১, ৬০৫
'কলিকাতা কমলালয়' ৪৭৭
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫২, ১৬১, ৩৯৮, ৫৩২, ৬১৬
'কলিকালের আওরতের বয়ান' ৩৩০
কলিম শাহ-দিলারাম ২৫৬, ২৫৮
কল্কি পুরাণ ১২৮
কল্যাণ দেব ১৩২
কস্তূরী মঞ্জরী ৮২
ক্বাসিদা ৩৮৪, ৫৩৩, ৫৩৪
'ক্বাসিদাতুল বুর্দা' ৩১৭
কাইম ১৬
কাঙান হরি ৫৪৮
কাছাড়া ৫৩৯
কাজলরেখা ৬১৫
কাজী আবুল হোসেন ৪৮৭
কাজী আমিনুল হক ২৯৫, ৫১৬, ৫১৭
কাজী দৌলত ১৬৮, ১৬৯, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৭-২০৩, ২১৯, ২৬১, ৪৮৩, ৬১৮
কাজী নজমুল হক ৫৬৪
কাজী নজরুল ইসলাম ১০, ১৬, ১৭৫, ২১৪, ৪১৯, ৪৮৪, ৪৮৮
কাজী নামা ৫২২
কাজী ফজলুর রহমান ৫২১
কাজী বদিউদ্দীন ১০১, ১০৪, ৩০৫, ৩২৮, ৩২৯
কাজী মনসুর ২৪৩, ৩০৭, ৩৫৫
কাজী রায়হান উদ্দীন ৫১৫
কাজী সফীউদ্দীন ৩৭৫, ৩৭৬
কাজী হাসমত আলী চৌধুরী ২৫৯, ২৬৫, ২৬৬
কাঁচড়াপাড়া ৩৭, ৪৪
কাঞ্চনমালার কেচ্ছা ৫১০, ৫১১
কাঞ্জনা তহুফ ৫৭০
কাটোয়া ৩০, ৪০, ৬৮, ৮১, ১৫৬, ৫২৯
কাঠগড় ১৮৬, ১৮৭
কাদেরিয়া ১১, ২০৮, ৩০৩, ৬০৩
কানপুর ৪৬৭, ৫৪২
কানাই খুঁটিয়া ৮৭
কানাই ঠাকুর ৫৪৮
কানু দাস ১০৯
কানু পণ্ডিত ৫৫৩
কানু ফকির ১০০
কানুরাম দাস ৩০, ৮৭, ৯৩
'কান্তনামা' ৫৪০,
কাফেলা (পত্রিকা) ৫৬৪
কাব্য সন্দীপনী ১৭৬
কামদেব ৫৪৮, ৫৫৩
কামরূপ ১৯৭, ৪৬৫, ৬০১, ৬০৫
কামরূপ-কামাখ্যা ১৬৮, ৪৪০, ৪৫৪
কামরূপ-কালাকাম ২৫৪, ২৫৭-২৫৯, ২৬২
কামাখ্যা ৩৮৬
'কামাখ্যা মঙ্গল' ৪২৫
কামালনসিয়ত ২৯৩, ৩৩৪
'কামিনী কুমার' ৪৭৭
কামেশ্বর ৪৬৫
কাম্বে ৬০৭
কায়কোবাদ ২৯৫
'কায়দানী কেতাব' ১০৪, ১০৬, ৩০৫-৩০৯, ৩২৮, ৩৫৪
কায়াবাদ, কায়াতত্ত্ব ৩০০, ৩০১
কায়াসাধনশাস্ত্র ৫৭, ৩০৩, ৩৮৬, ৪৫৬, ৬০১
কায়েম উদ্দীন পণ্ডিত ২৬২, ৩২৭
কারবালা ১৬৬, ১৯৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৯০, ২৯৩, ২৯৪, ৫২২
'কারবালা কাব্য' ২৯৫
'কারবালা তরঙ্গ' ২৯৫
কারবালা যুদ্ধ ২৭৪, ২৮৩, ২৮৪, ২৯৩, ৪৮৮
'কারুণ্যের নির্ঝর' ১৯০
কার্তিক ১১২, ৪২৭, ৪৩৩
কার্তিক মাহাত্ম্য ৫৫০
কালকেতু ৩৮৮, ৩৯৫, ৩৯৭, ৫৯৫

উপাখ্যান ৩৮৮, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০০
যানী বৌদ্ধ ৪৩৮
কালনেমি ৩৬৩
কালাচাঁদ ৪৪১
কালাকাম ৩৩২, ৩৩৩
কালা কৃষ্ণদাস ৫৫২
কালিদাস ১৩১, ২৩৭, ৪৩২
কালিদাস গাজদানী ৬০০
কালিদাস (বর্ধমান-বীরভূমের কবি) ৪০৪
কালিকা ৩৮৬, ৪১০
'কালিকা পুরাণ' ৪৩০
'কালিকা বিলাস' ৪৩২
'কালিকা মঙ্গল' ১১১, ১৬১, ১৭৬-১৭৯, ২৬৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯৮, ৪১০-৪১৩, ৪১৫, ৪২২, ৪২৩, ৪৪৪
কালিকারঞ্জন কানুনগো (ডক্টর) ২১৮
কালী ১২, ৪১০-৪১২, ৪১৫, ৪১৭, ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৮
কালীকান্ত বিশ্বাস ৫২০
কালীচরণ ৪৪১
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৪৭৬, ৪৭৭
কালী মীর্জা ৫২৮
কালু ডোম ৩৮৮
কালু রায় ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৯, ৪৭৮
কালু গাজী-কালু রায় ২৮২, ৪৪০, ৪৮৯, ৫৮৭, ৬০২
কালু গাজী চম্পাবতী ৪৫৭, ৫১৭,
কাশিম শাহ ২১৫
কাশী ৩১, ৩৫, ৫২৮
কাশীনাথ ১৭৮, ৪২৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১
কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৪৪১, ৪৪৩
'কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ' ৪১৩
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৫২৮
কাশী মিশ্র ৩১, ৫৪৯, ৫৫১
কাশীরাম ৬৯, ১৩৩, ১৫৫
কাশীরাম দাস ১২৩, ১৩৯, ১৫৫-১৬০
কাশীদাসী মহাভারত ১৬০, ১৬১
কাশীশ্বর ৫৪৮, ৫৪৯
কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী ৫৫১
কাশ্মীর ২৬৫, ৫৬৯, ৫৭০
কাসাসুল আম্বিয়া ৩৫৩, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৭৫-৩৭৭, ৪৭৩, ৪৮৮, ৪৯৯, ৫৪৪
কাসিম খান ১৮৭
'কাসেমবধ কাব্য' ২৯৫
কাসেমের লড়াই ১০৭
'কিং লিয়ার' ২২০, ২৬৭
কিঙ্কর ৪৪১
'কিতাব্যুৎ আতরিহ ওয়াল ইশরাফ' ৫৬৭
কিতাবুল আগানি ৫৬৭
কিতাবুল লুম্বা ৫৬৭
কিপলিঙ ১৯৭
কিফায়তুল মুসল্লিন ৩০৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩৫৪
কিফায়তুল মুসলেমিন ৩০৫, ৩০৮-৩১০
'কিমিয়া-ই সাদত' ৫৬৭
'কিয়ামতনামা' ৪৮৯
কিরিটেশ্বরী ৫৮৭
কীর্তন ২৫, ২৬, ৩০, ৩৮-৪০, ৯০, ৯১, ৫৭০, ৫৭৩
কীর্তনানন্দ ৮৬
কীর্তিচন্দ্র ১৬০
কীর্তিচন্দ্র রায় ৪২০, ৪২৪, ৫৪০
কীর্তিচন্দ্র সিদ্ধান্ত ৫৪০
কিশোরগঞ্জ ১২৫, ৩৯১, ৪০১, ৪০৩, ৫৩২
কিষ্কিন্দাকাণ্ড ১২৭
'কিসসা-ই-মধুমালৎ' ১৭১, ১৭২
'কিসসা-ই-মৈনা' ২০০
কিস্‌সা-ই-যৈতুন ২৭৭
কিসু দাস ৩৯২
কুকী ৪৭৪, ৫৩১, ৫৩৬-৫৩৯,
'কুকী জাতির বিবরণ' ৫৩৭
কুঞ্জবিহারী বসু ২৫০
কুণাল জাতক ১৩৮
কুণ্ডলিনী ৩০৩
কুতবন ২১৫
'কুতব মশ্‌তরী' ২০৫

কুম্ভক ৭
কুন্তী ১২৭, ১৩৯
কুফা ২৭৫
কুমার দেব ৩৪
'কুমার সম্ভব' ৪৩২
কুমারিল ভট্ট ১৩৮
কুমিল্লা ১৫৩, ১৬৪, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৬, ২৫৪, ২৬২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৪২৫, ৫১৩, ৫৩৮
কুমুদ দত্ত ১৩২
কুমুদানন্দ ৪৪১
'কুম্পানী সরকারের পরিচয়' ৫৩৬
কুম্ভকর্ণের রায়বার ১৩৫
কুষাণ ১
কুরু ১৩৬
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৩৮, ২৭৪, ২৮৯, ৬০৭
কূর্ম ৩৬৩
কূর্মপুরাণ ৬৮, ১২৮
কুলুব মাধবপুরী ৫৪৮
কুলুব রাঘবপুরী ৫৪৮
কৃত্তিকা ৬
কৃত্তিবাস ২, ১৯, ১১৯, ১২৯-১৩২, ১৩৪, ১৪০, ১৫২, ২৮২, ৩৮৯, ৪২০, ৫৩১, ৬১৫
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১৩০, ১৩১, ১৩৯, ১৪৫, ১৬০, ৪৮২
কৃষ্ণ ৬, ৭, ৯, ১৭, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ৩৭, ৪৩, ৬৫, ৬৬, ৭৯, ১১২, ১২০, ১২১, ১২৬, ১২৯, ১৩৬, ১৩৯, ১৭৭, ৩৫৩, ৩৬৭, ৫১৮, ৫৪৮
কৃষ্ণকথা ১২৬
'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ৯৭
কৃষ্ণকান্ত ৪৪১, ৪৪৩
কৃষ্ণচন্দ্র রায় ৪১৩, ৪১৭, ৪২১
'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' (রাজা) ৪৭৭
কৃষ্ণতত্ত্ব ৬৭
কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ ৫৫০
কৃষ্ণতীর্থ ৫৪৮
কৃষ্ণদাস ৩০, ৮১, ৮৭, ১২৪, ১৩২, ১৫৬, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫২
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৬৪, ৬৫, ৬৭-৭০, ৮০, ৮২, ৮৫, ৮৭, ১২১, ৫৪৭
কৃষ্ণদেব দাস ১০৯
কৃষ্ণধন দে ৫২৯
কৃষ্ণ ধামালী ১১, ৫২২
কৃষ্ণনগর ৪১২, ৪১৩, ৪২১,
কৃষ্ণ-নাপ্পিন্নাই ৮, ১১০
কৃষ্ণনাথ ৪২৩
কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ১৬০
'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ১২২
কৃষ্ণ বসু ১৬০
কৃষ্ণবিহারী ৪৪১
কৃষ্ণমঙ্গল ১২০-১২৫
'কৃষ্ণমঙ্গল' ১২১
কৃষ্ণমাণিক্য ২৫৪
কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য ৫২৫, ৫২৬
কৃষ্ণরাম ১৬০, ১৭৮, ৪১০, ৪৩০
কৃষ্ণরাম দাস ১২৩, ২৮৩, ৩৯৮, ৪১১, ৪১২, ৪২২, ৪২৩, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৯, ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৫
'কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' ৩৯৮
কৃষ্ণা চাঁদীপিকা ৩৬
কৃষ্ণলীলা ৬, ১২১, ১২২
'কৃষ্ণস্তবাবলী' ১২১, ১২২
কৃষ্ণহরিদাস ৪৪১, ৪৪৪, ৫৪০
কৃষ্ণানন্দ ৪০৮, ৫৪৯
কৃষ্ণানন্দ পুরী ৫৪৮, ৫৫০
কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী ৪৪
কৃষ্ণোপনিষদ ৫৫০
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ৪০৪-৪০৬
'কেচ্ছা মধুমালতী' ১৭০
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৫০
কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় ৫২৬, ৫৩২
কেনারাম দস্যু ৪০৩, ৫৪০

কেবলাদ্বৈতবাদ ৩
কেয়ামত নামা ৩৩৫, ৫০০
ক্বেয়াজ এজমা ৩১২
কেরামত আলি ৫২১, ৫৪৩, ৬৩০
কেরী (উইলিয়াম) ৪৭৫, ৪৭৭
কেষ্টামুচি ৫২৫, ৫২৬
কেশব ৫৪৮
কেশব ছত্রী ৩০, ৩৪, ১১৮
কেশবপুরী ৫৪৮
কেশব ভারতী ৩০, ১২০, ৫৪৮, ৫৫০
কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯
কৈলাস বসু ১৩২, ১৩৪
কোগ্রাম ৬৪
কোচবিহার ১৯৭, ৫৪০,
কোছনায়ে সোরে কেয়ামত ৫২১
কোম্পানী আমল ৪৩৭
কোরআন ১৮৮, ২৭৫, ২৭৬, ৩০১-৩০৩, ৩১২, ৩২৭, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৬১, ৩৭৬, ৪৩৯, ৪৫৫, ৪৮৮, ৫৬৭
কোরআন-হাদীস ৩০০-৩০২, ৩১৩, ৩২৫, ৪৪০, ৫৬৭
'কোরান পাঠের ফল' ৩২৭
'কোরানের কায়দা' ৩২৭
কোল ৩৮৬, ৪৭৪
কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৪৪১
কৌরব ১৩৭
কৌশারী ১৬০
ক্রমদীপিকা ৫৫০
ক্রমসর্ন্দভ ৩৬
'ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি' ৪৪৩
ক্লাইভ ৫৪১
'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ৮৬
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ৫৬৯, ৫৭১
ক্ষুদিরাম দাস (ডক্টর) ৩৯২
ক্ষেত্রপাল ৭৯, ১১৬, ৪৩৪, ৪৩৮, ৫৮৪, ৬১৩
ক্ষেমঙ্করী ৪১০
ক্ষেমানন্দ ৪০৫-৪০৭, ৪১০, ৪১৩, ৬১৬
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৬৬
'খজীনাতুল আফসিয়া' ১০৫
খড়দহ ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৯, ৭৮, ৮৫, ৫৪৯
খগুল ৫৩৭-৫৩৯
খগুলে কুকির হামলার ইতিহাস ৫৩৬-৫৩৯
খন্দকার মোজাম্মিল হক (ডক্টর) ৩১৮, ৩১৯
খন্দকের যুদ্ধ ২৭৩
"খবর নিশান' ১০৪
'খয়বরে জঙ্গনামা' ২৯৬
খয়বরের যুদ্ধ ২৭৩
'খয়রুল হাসর' ৫১২
খয়রাতুল্লাহ ২৯৫
খয়রাবাদ ৫৭১
খলিল ১০১
খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি ১১, ৫৬৮, ৫৬৯
খাড়িবোলি ২০৭
খান জাহান আলী খান ১১৮, ৩৭৭, ৪৫৪, ৪৬৫, ৪৮৮
(খাঞ্জা খাঁ গাজী)
খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান ২৯৫
'খাবনামা' ৩৪৭, ৫২০
খায়েরউদ্দীন ৫২২
খিজিরপুর ৪৩৬
খিলাফত (খেলাফত) ২৭৪, ২৭৫
খ্রীস্টধর্ম ১০, ১৯, ২৭
খ্রীষ্টিয় দর্শন ৩০২
খুদা বখ্শ ১৪৭
খুলনা ১১৮, ৪২৩, ৪৪০
খুল্লনা ৩৮৮-৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৫৯১
খেউড় ৫২৩, ৫২৫-৫২৭
খেতরী ৮৪
খেমদাস ২০০
খেয়াল ৫২৮
খৈয়াম (ওমর) ১০
'খোট্টা ভাষা' ৪৭৯
খোকনরাম দাস ৪৪১
খোদা বকশ খান ২৯০
খোন্দকার আজমতউল্লাহ ৫২০

খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী ২৬৫
খোরাসান ১৯০
খোলাফায়ে রাশেদীন ৩৩, ৫১৯
খোলাবেচা শ্রীধর ৫৪৯, ৫৫১
খোশাল শর্মা ১৩৩
গওসিয়া ৩০৩
গওয়াসি ৩০৩
গঙ্গা ২৪২, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৮৫, ৫২৭, ৫৮৭
গঙ্গাদাস ১১৯, ১৫৫, ৫৩৫, ৫৫২
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৫৪৯, ৫৫১
গঙ্গাদাস সেন ১৩৪, ১৬০, ১৬১, ৪০২
গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি ৫৪৮
গঙ্গাদাস আচার্য সাধুবর্ষ ৫৪৮
গঙ্গাদাস ভদ্র ৫৪৮
গঙ্গাধর ৪২৭
গঙ্গারাম ৪৪১, ৫৩১-৫৩৩
গঙ্গারাম দত্ত ১৩২, ৪২৩
'গঙ্গামঙ্গল' ১৯, ১২২-১২৪, ৩৯১, ৪২৪
গজপতি (উড়িষ্যার রাজা) ৪৬৫
গজপতি বা গজবাদী ১৯৫
(ইলিয়াস শাহ)
গজল ১০, ১৫, ১৭, ২৩, ১০৫
গড় মান্দারণ ৪৬৫
গড়েনহাটী কীর্তন ৮৪, ৫৭০, ৬০৩
গণেশ ৪২৭, ৪৩৮
'গদা-মালিকা সম্বাদ' ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৯, ৫৬০
গদাধর ৩১, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৭, ৬৫
গদাধর গোস্বামী ৬৯
গদাধর দাস ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫২, ৬০৩
গদাধর পণ্ডিত ৪১, ৫৪৯, ৫৫১'
গদাধরপন্থ ৩৭
গদাধর মুখোপাধ্যায় ৫২৫
গম্ভীরা ৫২৫, ৫৩১, ৫৭৩, ৬১২
গয়া ৪৩, ৪৬, ৫৭
'গরকীর বচন' ৫৩৯
গরীব খান ১০১
গরীবউল্লাহ বেপারী ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০৮, ৫১৯
গরুড় পুরাণ ৬৮
গরুড় অবধূত ৫৫০
গরুড়ধ্বজ আচার্য ৫৪৮, ৫৪৯
গরুড় পণ্ডিত ৫৫১
গাজন ৫২৮, ৫৩১, ৬১২
গর্গ ৪১১
গহুর বাদশা ও বানেছা পরীর পুথি ৫১২
গাইবান্ধা ৫২১
গাউস গোয়ালিয়র ১৭
গাওয়াসী ২০০, ২৩৬
গাজী কালু ৪৫৪, ৫৮৭
'গাজী বিজয়' ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ৩৩৩, ৪৪১, ৪৫৪
গাজীনামা ৩৮০, ৫৮৭
গাজীর গান ৬১২
'গাজী সাহেবের গান' ৪৭২
গাজীর পুথি ৫০৪
গাণপত্য ১০৯
গান্ধী ১০
গাভুর খান ১৪৬, ১৪৭, ২৮৯, ২৯০
গাথা-গীতিকা ১১২
গাহা সত্তসঈ (গাথা সপ্তশতী) ৭, ২৫, ১৪৫
গিনা ৫৬৬
গিয়াস ২৬১
গিয়াস খান ১০১, ২৪৩, ২৪৪
গিয়াসুদ্দীন ২৯০, ৫৯১
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ১৯৫
গিয়াসউদ্দিন আবু মুহম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ ১৮৯
গিয়াসুদ্দীন জালাল শাহ ৪৩৬
গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর ২৯০
গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩১, ২৯০, ৪৩৬
গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১১৮, ১৮৭, ১৮৮, ২৯০, ৫৪৫
গিরি (সম্প্রদায়) ১২০
গিরিয়ার যুদ্ধ ৪৩৭, ৫৪০, ৫৪১
গিরিশ ৪২৭

গিরিশ চন্দ্র দাস ৪০৮
'গীতগোবিন্দ' ৭, ১১, ৩০, ১২১, ৪৫৫, ৪৭৯ ৫২৫, ৫৩০
'গীতচন্দ্রোদয়' ৮৬
'গীতরত্ন' ৫২৮
গীতা (গীতা-স্মৃতি-সংহিতা) ৮, ৩৭, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১২৭, ১৩২, ১৩৬, ১৩৯, ৪৩৯, ৪৪০
গীতাবলী ৩৫, ৫৩৩
'গীতি লহরী' ৫২৮
গুজরাট ১৭৬, ২৭৭, ৫৬৯-৫৭১
গুজরাটি ৪৮৪
গুণমঞ্জরী ৮২
গুণরাজ ৪২৩
গুণার্ণব মিশ্র ৬৮
গুপ্ত ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৭৪
গুপ্ত আমল ৪৩৫, ৬১০
'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' ৫২৬
গুরুবাদ ১৩, ৩০০, ৪৪০, ৪৫৬
গুলজার-ই-ইশক ২৩২
গুল বখশ ৫৩৭, ৫৭৫
গুল বদন ১৪৪, ২৫১
গুলবানুর বারমাসী ৫৩৫
গুল মুহম্মদ খলিফা ৫৭৫
গুলরওশন বিবির পুথি ৫১৪
'গুলসনে এশক' ১৬৮, ১৭১, ১৭৩
'গুলসনে বাহার' ২৬২
'গুলসনোবর' ১০১, ৪৮৮, ৪৯৮
'গুল ও হরমুজ' ১০৬, ৪৮৮, ৪৯৯
গুলিস্তাবোঁস্তা ৫৬২
গুলে-বকাউলি ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১৯৯, ২১৪, ২১৫, ২৩৪, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৭, ৩০৭, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৫৪, ৪৮৮, ৪৯৮, ৫৩৩, ৫৬১, ৬১৫, ৬১৮
গেয়াস খান (গয়াস) ২৮১
গোকুলচন্দ্র ৯৮
'গোকুল মঙ্গল' ১১১
গোকুলানন্দ ৫৪৮, ৫৪৯
গোঁজলা গুঁই ৫২৫, ৫২৬, ৫২৮,
গোপাল (গায়ক) ৫৭০
গোপ জাতি ২৯, ৪৪৫
গোপাল আচার্য ৫৫১
গোপাল চম্পু ৩৬, ৬৯
'গোপাল চরিত' ৯৭
'গোপাল চরিত মহাকাব্য' ১২৪
গোপাল তাপনী ৩৬
গোপাল বসু ৫৭, ৫৪৮, ৫৪৯
'গোপাল বিজয়' ৯৭, ১২৩
গোপাল বিরুদাবলী ৩৬
গোপাল ভট্ট ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৮২, ৮৪
'গোপাল মন্ত্র' ৩৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৬
গোপাল সিংহ ১৩৪
'গোপালের কীর্তনামৃত' ১২৪
গোপী ২১, ২৪
গোপী দাস ৫৪৪, ৫৪৫
গোপীকান্ত দাস ৩৫
গোপীকান্ত মিশ্র ৫৫১
গোপীচন্দ্র ৪০৮
গোপীচন্দ্র (গোপীচাঁদ) ৫২২
গোপীজন বল্লভ দাস ৮২
গোপীনাথ দত্ত ১৬০
গোপীনাথ দাস ১১১, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ২৬৬, ২৭১
গোপীনাথ পণ্ডিত ৫৪৯
গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী ৩৯২
গোপীনাথ নায়ক ৫৫১
গোপীনাথ বসু ১১৮
'গোপীনাথ বিজয়' ৯৭, ১২৪
গোপীনাথ বিশারদ ১৬০
গোপীনাথ মিশ্র ৫৫১
গোপীনাথ সিংহ ৫৫১
গোপীমোহন ঠাকুর ৫২৮
গোবর্ধন মজুমদার ৩৬
গোবিন্দ ৬৯, ৭৭, ৫৫১

গোবিন্দ অধিকারী ৫২৮
গোবিন্দ আচার্য ৮৬, ১২১
গোবিন্দ কর্মকার ৭৭
গোবিন্দ গতি ৮৭, ৯৭
গোবিন্দ গোঁসাই ৫৪৮
গোবিন্দ ঘোষ ৩০, ৮৬, ৯০, ৯১, ৫৪৮, ৫৪৯
গোবিন্দ চক্রবর্তী ৮৭, ৯৬, ৯৭, ৯৮
গোবিন্দ চন্দ্র ৫৯১
গোবিন্দচন্দ্রের গান ৬১৩
গোবিন্দ দত্ত ৫৫১
গোবিন্দ দত্ত (কীর্তনীয়া) ৭৭
গোবিন্দ দাস ৮৭, ৯০, ৯২, ৯৪-৯৬, ৯৮, ১০৯, ১১১, ১৬১, ১৮৩, ১৮৪, ৪৮১
গোবিন্দ দাস (কালিকামঙ্গল রচয়িতা) ১১১, ১৭৮, ৪১০
গোবিন্দ দাস (চৈতন্য অনুচর) ৭৭
গোবিন্দ দাস (বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা) ১৭৭, ৪১০, ৪১১
'গোবিন্দ দাসের কড়চা' ৭৭, ৭৯
'গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' ৬১৪, ৬১৬
'গোবিন্দ দাস বিজয় গীত' ৫৭
গোবিন্দপুরী ৫৪৮, ৫৫০
গোবিন্দ বল্লভ ১০৯, ১১৩
গোবিন্দনন্দ ৭৭, ৫৪৯, ৫৫১
গোবিন্দ বিজয় ১২০
'গোবিন্দ বিরুদাবলী' ৩৫
গোবিন্দ ভাগবত ৪৪১
গোবিন্দ মঙ্গল ৮৪, ১২০, ১২৩
'গোবিন্দলীলামৃত' ৬৮-৭০, ৮২, ৯৭
গোয়ালিয়র ৫৬৯, ৫৭০
গোরক্ষনাথ ৫২৫
'গোরক্ষ বিজয়' (গোর্খবিজয়) ১৩, ২৮১-২৮৪, ২৯৭, ৩০৪, ৩৩৩, ৪৪১, ৬০৮, ৬১৪
গোরাচাঁদ ৩৭৭, ৪৬৮, ৪৮৮
গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ ২৯
'গোরাচাঁদ পুথি' ৪৬৮
'গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা' ৪৬৮
গোলকনাথ শর্মা ৪৭৭
গোলকুণ্ডা ১৬৬, ২৩৫, ২৭৪
গোলাম নবী ৫৭০
গোলাম নবী ইবনে ইনায়েত উল্লাহ ৩৭৭
গোলাম মাওলা ৩৩৪
গোলাম রসুল ৩৭৯, ৫২২
গোলাম সাফাতুল্লাহ ২৪১
গোলাম হোসেন ১০১
'গোলামিজান আপতাব দস্তান' ৫২১
'গোলে আরজান' ৫১৫
গোলে দেওগান্দা ৫১৭
'গোষ্ঠী কথা' ১১৪, ৫৮৬
'গোসানী মঙ্গল' ৪২৪, ৪২৫
গোহারী ২০০
গৌড় ১৯, ২৮, ৩০, ৮৯, ১২২, ১৬৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৫, ২০৩, ২৪৭, ২৬২, ২৮২, ২৮৯, ২৯০, ৩২২, ৪৩৬, ৪৬৫, ৪৭৪, ৪৮৬, ৪৮৭
গৌড়সম্প্রদায় ৩৭
গৌতম বুদ্ধ ২, ৩৬, ১১১
গৌতমীয়তন্ত্র ৫৫০
গৌর কবিরাজ ৫২৫, ৫২৬
'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৬৫, ৮০, ১২১, ১২২
গৌরগোবিন্দ ৪৫৮
গৌরচন্দ্রিকা ২৫, ৮৭
গৌরদাস ৫৪৮, ৫৪৯
গৌরনাগর ৩৭, ৬৫
গৌরনাগরবাদ ৩৭, ৪০, ৬৪, ৮২, ৯০, ১১৫
গৌরনাগরবাদী ৫৫০
গৌরনাগরভাবপন্থী ৫৪৭
'গৌরপদতরঙ্গিনী' ৮৬, ৯৮
গৌরপারম্যবাদতত্ত্ব ৩৭, ৬৫, ৮২
গৌরপারম্যবাদী ৩৭, ৪৫, ৬৪, ১১৫, ৫৪৭
'গৌরমন্ত্র' ৩৭, ৪৩
গৌর মল্লিক ১১৮
গৌরসুন্দর দাস ৩৫, ৮৬, ৯৮
গৌরাঙ্গ-চৈতন্যদেব ২৫, ৬৫, ৮৭
'গৌরাঙ্গ বিজয়' ৭৮, ৭৯, ১২১, ১২২, ৫৩১

গৌরী ৩৮৬, ৩৮৭, ৪১০, ৪১৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৮
গৌরীকান্ত ৪৭৭
গৌরী দাস ৩০, ৮৬
গৌরীদাস পণ্ডিত ৫৪৮, ৫৫২
গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৪০, ১৪৪, ১৫৩
'গৌরীমঙ্গল' ১৪১-১৪৪, ১৬০, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯৭
গ্রিয়ার্সন ২০০
গ্রীক ১, ৪৫৫
গ্রীক দর্শন ৩০২
গ্রীস ১৩০, ৫৬৭
ঘটজাতক ১৩৮
ঘনরাম ৪২৩
ঘনরাম চক্রবর্তী ১৮৪, ২০৭, ৪১৯, ৪৪১, ৪৪৩
ঘনশ্যাম চক্রবর্তী ৮২, ৯৮
ঘনশ্যাম দাস ১৩২, ১৩৪, ১৬১
ঘেঁটুগান ৫২৮
ঘোড়াঘাট ৩৩৪
চকরিয়া ৩১৮
চক্রপাণি আচার্য ৫৫৩
চক্রধর শর্মা ৩৯৩, ৩৯৪
চক্রশালা ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ২০৩, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫৮, ৪৩৩
চট্টগ্রাম ৪০, ৪১, ৮৬, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৬, ১০৯, ১১১, ১১২, ১২৩, ১৪০, ১৪১, ১৪৩-১৫১, ১৬৪-১৬৬, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯-১৮৮, ১৯৪-১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২১৪, ২৩২, ২৩৩, ২৪৬-২৪৮, ২৫০, ২৫২-২৫৪, ২৫৭, ২৬০-২৬৩, ২৬৫-২৬৮, ২৭১, ২৭৪, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ২৮৩-২৮৫, ২৮৯, ২৯০, ২৯৫, ৩০০, ৩০৪, ৩০৮, ৩১৫, ৩১৮, ৩২০, ৩২৩-৩২৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৯-৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৩, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৯, ৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪২৪, ৪২৯, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৬৭, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৮, ৫০৭, ৫১১, ৫১৭, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৯, ৫৪৯, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৯, ৫৬১, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৯৩-৫৯৫, ৬০৩, ৬০৫-৬০৭, ৬১১, ৬১৮-৬২০, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৯
'চট্টগ্রামের ইতিহাস' ১৮১, ১৮২, ১৯৫
'চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ' ২০৩
'চট্টগ্রামে ভূমিকম্প গ্রহস্তি' ৫৩৯
চড়ক ৬১৩
চণ্ড ৩৬৩, ৩৮৬
চণ্ড-চণ্ডী ৩৮৬, ৪১০, ৪২৬,
চণ্ডমুণ্ড ৩৮৭
চণ্ডী ১১৫, ১১৬, ২৮২, ৩৮৬-৩৯০, ৩৯৩, ৩৯৬, ৪০৩, ৪১০, ৪১৫, ৪২৭, ৪৩০, ৪৩৮, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৯, ৪৭৯, ৫৮৪, ৬০২, ৬১৩
চণ্ডীচরণ মুন্সী ৪৭৭
চণ্ডীদাস ২, ৯, ১৪, ২৫, ৩০, ৮৫-৮৭, ৯১, ৯৪, ১০৯, ১১৩, ১১৫, ৪৮১, ৫৬৫, ৫৬৬, ৬১৫
চণ্ডীমঙ্গল ১৯, ১১২, ১২২, ১৫৪, ৩৮৬-৪০০, ৪০৯, ৪১০, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৭, ৪৪২, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯৪, ৫৯৮, ৬০৫, ৬০৬, ৬১৩-৬১৫, ৬১৭
চণ্ডীর পাঁচালী ৩৯৯
চতুরঙ্গ (মাসিক পত্রিকা) ৪৪
চতুর্ভুজ দাস ১৭১, ২০০
চন্দন নগর ৫২৩, ৫২৬
চন্দ্রচূড় ৪২২
চন্দ্রদ্বীপ ৩৪
চন্দ্রনাথ ৪২৭, ৪৩৪
চন্দ্রনাথ (পর্বত) ১৮৭
চন্দ্রনাথ দে ১৩৩, ৫৮১
চন্দ্রভান ৪৮৮
'চন্দ্রমুখী' ১০১

চন্দ্রশেখর ২৮, ৩০, ৩১, ৩৮, ৯৮, ৪২৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
চন্দ্রাবতী (কবি) ১৩২-১৩৪, ৪০৩, ৫৪০, ৫৯১
'চন্দ্রাবতী' ২০৩-২০৬, ২৬৬, ৪৮৮, ৫৮০, ৫৮১
চন্দ্রাবলী ৬
'চন্দ্রাবলী' ১১১, ২৬৬, ২৭০, ২৭১
চব্বিশ পরগণা ৪১২, ৪২৪, ৪৪৩, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৯১
'চমন বাহার' ২৬২
'চম্পক বিজয়' ৩৪৩, ৫৪০
চম্পক রায় ৩৪৩
চম্পতি পতি ৮৭
চম্পতি রায় ৯৫
চম্পা গাজী ১০১, ৩২৯, ৩৫৬, ৫৭৫
চরক ৭
চর্যাগীতি ৮, ১০, ১৪৫, ৪৩৮, ৬০৯
চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ৪৭৫
চর্যাপদ ৯, ১০
'চলতি ভাষা' ৪৭৫
'চলিত বাংলা' ৪৮৬
চাঁদ কাজী ১০১, ১১১
চাঁদপুর ২৩৯, ২৮৯
চাঁদ-বেহুলা ৪০১, ৪০২, ৪০৫, ৪০৮
চাঁদ রায় ১০৯
চাঁদ রায়-কেদার রায় ৪৩৬
চাঁদ সওদাগর ৩৮৮, ৪০২, ৪০৩, ৪০৫, ৪০৮, ৪০৯, ৪২৭, ৫২২
'চান্দায়ন' ১৬৪, ২০০, ২০১, ২১৫
চামারু ১০১, ১০২, ৫৭৫
চামু ২৬১
চামুণ্ডা ৩৮৭
'চারি মোকাম ভেদ' ২৪০, ৩১৬-৩১৮
চাহার দরবেশ ৪৯৮, ৫৪৪
'চিত্তউত্থান' ২৯৩, ৩৩৪
'চিত্রাবলী' ২১৫
চিত্রা ৬
চিদানন্দ ৫৪৮
চিন্তামণি ময়রা ৫২৫
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৭৬
'চিনলেস্পতি' ২৬২
চিরজীব ৫৫১
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৪৩৭
চিল্কা (হ্রদ) ৫২৮
চিশতিয়া ১১, ২১৫, ৩০৩, ৫৬৯, ৬০৩
চীন ৬০৭
চুঁচুড়া ৫২৩, ৫২৬
চূড়ামণি দাস ৭৮, ৭৯
চৈতন্য, চৈতন্য দেব ১, ৪, ৬, ৮-১০, ১৪, ১৮-২০, ২৫-৩৮, ৬৪-৬৮, ৭০-৭৪, ৭৭-৮৭, ৯০-৯৩, ১০১, ১১০, ১১১, ১১৪-১১৬, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৪, ১৩১, ১৫১, ৩৫৩, ৪০৮, ৪১১, ৫৪৫-৫৫৩, ৫৬৯, ৫৮৫-৫৮৭, ৫৯৯, ৬০২
চৈতন্য কীর্তনিয়া ৫৫১
চৈতন্য চন্দ্রোদয় ৪৪, ৪৫
'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' ৪৫
'চৈতন্য চরিতের উপাদান' ৪১, ৪৯, ৬৫, ৮০, ৮১
'চৈতন্যচরিতামৃত' ১৬, ৩০, ৩১, ৩৪-৩৭, ৩৯-৪১, ৪৩, ৫৯, ৬৭-৭৭, ৯১, ৯৩, ১২১, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৮৭, ৫৯৫, ৬১৫
'চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যম' ৪৪, ৮০, ৫৪৭
চৈতন্যতত্ত্ব ৬৭, ৬৮
'চৈতন্য তত্ত্বপ্রদীপ' ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৮-৪০, ৪৬, ৭৭, ৫৪৫-৫৪৭, ৫৫৩
চৈতন্যতত্ত্বামৃত ৫৫০
চৈতন্য-দর্শন ২১
চৈতন্য দাস ৩০, ৮৪, ৫৫১, ৫৫২
চৈতন্যধর্ম ৩৯
চৈতন্য পণ্ডিত ৬৯
চৈতন্যপন্থ ৩৭
চৈতন্যপারম্যবাদ ৪৩
চৈতন্যবাদ ৩৮

'চৈতন্য বিলাস' ৬৪
'চৈতন্য ভাগবত' ৩৮, ৩৯, ৪৫-৫০, ৫৭, ৬৪, ৮১, ৯১, ৯৩, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৫১, ১৭৭, ৪২৯, ৫১৮, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৮৯, ৫৯২, ৫৯৯, ৬০৫, ৬১০
'চৈতন্যমঙ্গল' ৪৪-৪৬, ৫০, ৫৬-৬৪, ৬৫, ৭৭, ৮১, ১২১, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৫০, ৬১৫
চৈতন্য মতবাদ ১, ৪৩৫
চৈতন্য যুগ ২৬৭
চৈতন্যসিংহ ৫৪১
চোপাই ২০০, ২১৮
চোরার হেকায়েত ৯৯
চৌতিশা ১৯১, ১৯৪, ২৮৪, ৩২৭, ৩২৮
চৌথ ৪৩৭, ৫৩৩
'চৌধুরীর লড়াই' ৫৪০
'চৌর পঞ্চাশিকা' ১৭৬, ১৭৭, ৪১৬
('চৌর পঞ্চাশৎ')
চ্যাবন মুনি ১৩০, ১৩১
'ছত্রিশ মেল' ১১৪
ছন্দহষ্টাদশকম ৩৫
'ছহি বড় জঙ্গে সোহরাব' ৫১৯
'ছহি বড় মউতনামা' ৫০১
ছহি সের আলী ৫০৭
ছাতু বাবু ৫২৮
ছান্দোগ্য (উপনিষদ) ৬, ৮৩, ১০৯,
ছিন্নমস্তা ৩৮৬, ৪১০
ছুটি খান (নসরত খান) ১৪০, ১৪৫-১৫১, ১৮৭, ২৮৯, ২৯০
ছুটি খানী মহাভারত ১৪৭, ১৫০
ছেকেন্দার ছানি ৫২১
ছেদমত আলী ২৩২
ছোটনাগপুর ৩১
ছোট পাণ্ডুয়া ৪৬৫, ৪৬৬
জখিমার জঙ্গনামা ৫২২
জগৎ মাণিক্য ১৩৪
জগৎ রাম ১৩২
জগৎ শেঠ ৪৭৮
জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৪৭, ১৫০, ১৮২
জগজ্জীবন ঘোষাল ৪০৭, ৬১৫
জগৎ রায় (বর্ধমানের রাজা) ৪০০
'জগতী মঙ্গল' ৪০৬
জগদানন্দ ৮৭, ৫৪৯
জগদীশ দাশ ৫৪৯
জগদীশ পণ্ডিত ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫২
জগদীশ সিংহ ৫৩৯
জগন্নাথ ১১৪, ৪০২, ৪০৮, ৫২৮, ৫৪৮, ৫৪৯
জগন্নাথ আচার্য ৫৪৮, ৫৫১
জগন্নাথ ঠাকুর ৩৪৩
জগন্নাথ তীর্থ ৫৫০, ৫৫১
জগন্নাথ দাস ১৩৩, ৫৪৯, ৫৫১
'জগন্নাথ বল্লভম্' ৯০
'জগন্নাথ মঙ্গল' ১৫৬, ১৫৭
জগন্নাথ মিশ্র ২৮, ২৯, ৫৮, ১১৯
জগন্নাথ সেন ৫৪৯
জগমোহন মিত্র ৪০৮
জগদ্বন্ধু ভদ্র ৭৭
জগাই-মাধাই ৩০, ৫২, ৬৭, ৫৫৩
জঙ্গনামা ১৬৬, ১৮৪, ২২২, ২৪৪, ২৭৩, ২৮১, ২৮৪, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩১৮, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৫১, ৩৫৩, ৪৫৩, ৪৬৬, ৪৮০ ৪৮৬, ৪৮৯-৪৯১, ৪৯৮, ৫১০, ৬২০
'জঙ্গনামা বা ইমামের কিসসা' ২৭২
জঙ্গীপুর ১০৫
জঙ্গলবাড়ি ৫৩২
জঙ্গে ওহুদ ৪৮৮
জঙ্গে খয়বর ২৯৬, ৪৮৮, ৪৯৮
জঙ্গে বদর ৪৮৮
জঙ্গে যৈতুন ২৭৭
জঙ্গে রসুল ও আলী ২৯৬
জঙ্গে সোহরাব ২৯৬, ৪৯৯
জনমেজয় ১৩৭
জনাব আলী ২৯৫, ২৯৬, ৩৩৫, ৩৭৬, ৪৭৩, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৯৮, ৫৪৩, ৫৪৪

জনার্দন ৫৮
জনার্দন চক্রবর্তী ৫৬৬
'জমিদার পরিবার' ৩৫৭
'জয়কুম রাজার লড়াই' ১৬৬, ২৭৩, ২৭৬, ২৮১, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১
জয়কৃষ্ণ দাস ৫৫০
জয়গুন ২৭৬, ২৭৭
জয়গুনের কিসসা ১৬৬, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৮১
জয়গোপাল গোস্বামী ৭৭, ৭৮,
জয়গোপাল দাস ৫৫০
জয়দেব ৭, ৯, ১১১, ১১৫, ১৬০, ১৭৭
জয়দেব দাস ৪০৮
জয়দেব বচন ৫৫০
জয়নবের চৌতিশা ৪৪১
জয়নাথ বিশী ৪৪১
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৫
জয়নারায়ণ সেন ৩৯৯
জয়নাল আবেদিন ৫১৯
জয়নুদ্দীন ৪৬৪, ৪৬৫
জয়নুল আবেদীন (কাশ্মীর রাজ) ৫৭০
জয়ন্ত দেব ১৬০
জয়পুর ২৮
জয়রাম ৪০৮, ৪২৪
জয়রাম দাস ১০৯
জয়া-বিজয়া ৪২৭
জয়ানন্দ ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৯-৪১, ৪৭, ৪৮, ৫৬-৬০, ৬৫, ৭০, ৭৭, ৮১, ১১৮, ১২১, ৫৯৭
জয়েনউদ্দীন ১৬৫, ২৭৬
জসীমউদ্‌দীন ১৬, ১৭৫, ৫০২
জহরমহরা ২৯৫
জাকাত রহমান ৫২১
জাগগান ৫৪২
জাঙ্গুলী ৪৩৪, ৬১৩
জাজপুর ২৮
জাতক ১৩৯, ৩৬০
জাতিমালাকাচারী ১১৪, ৫৮৬
'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' ১৩
জানকীনাথ ৪০২, ৪০৮
জাপানি ৪৮৪
জাফর ২৯৩
জাফর আলী ২৫৪-২৫৭
জাফর খাঁ গাজী (দরাফ খাঁ গাজী) ৩৭৭, ৪৪৩, ৪৫৪, ৪৬৫, ৪৬৬
জাফর সাদেক (ইমাম) ২৭৬
জাফরাবাদ ১৮৬-১৮৮, ২৮৪
জামী, আবদুর রহমান ১০, ১৮৮-১৯২, ২৪১, ৩৩১
জারী গান ২৭৪
জায়ী জঙ্গনামা ২৭৪
'জাল প্রতাপচন্দ্র' ৫৪০
জালাল খান ১৪৬, ১৮৬, ২৮৯, ২৯০, ৩৫৫
জালাল উদ্‌দীন তাবরেজী ৪৫৪, ৫৯৬
জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ ১৯৫
জালালউদ্দীন রুমী ১১৮
জাহাঙ্গীর (সম্রাট) ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৭৩, ৪৮৪, ৫৫৮, ৫৬৯, ৫৮৬
জাহান্দর শাহ ৫৬৯
জাহ্নবা দেবী ৩৭, ৩৯, ৪২, ৮২-৮৫, ৯৪, ১১৬, ৫৪৮, ৫৫৩
জাহ্নবী ১২৭
'জাহ্নবী মঙ্গল' ৪২৪
জিনদিকী ৪৫৫
জিনাত ৩৩৬
জিন্দাপীর ৪৬৫
'জিন্নানামা' ৪৮৭
জিব্রাইল (জিবরিল) ২৭৫, ২৮৪
'জিয়ারতে কবর' ৪৯৮
জীত ঘটক ১৩২, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১
জীবকৃষ্ণ মৈত্র ৪০৭
জীব গোস্বামী ৩১, ৩৩-৩৬, ৪৫, ৬৯, ৮৪, ৯৫, ৫৪৮-৫৫০
জীবন ১০২
জীবন আলি পণ্ডিত ১০২, ৫৭৫
া-পরমাত্মা ২১, ২৫-২৭, ৩৩, ১১৫

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৭৬
জুননুন মিশরী ৩০৩, ৪৫৬
জুনাইদ বাগদাদী ৩৭৬
জুলুয়া ৫৬৪, ৫৬৫
জেকোবী ১২৬, ১২৮
'জেবলমুলুক-শামারোখ' ২৩৬, ২৪৪-২৪৬, ২৫৪,
জৈগুনের কিস্‌সা ২৭৭, ৪৮৮, ৪৯৩, ৪৯৪
'জৈগুনের বারমাসী' ১০৪
জৈগুন-সোনাভানের কিসসা' ৪৬২
জৈন ধর্ম ১৯৭, ৪৫৩, ৪৭৪
জৈন-বৌদ্ধ ৪৫৪
জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম ৪৩৪, ৪৫৩, ৪৫৪
জৈমিনি ১৩৭, ১৩৯, ৪৪১
জৈমিনি ভারত ১২৮-১৩০, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৭, ১৫১, ১৬০
জোড়াসাঁকো ২৯০
জোন্স ৪৭৭
জোবরা ১৪৫
জোবায়ের ২৭৫
জোবেদ আলী ১৬৬, ১৭৪
জোবেদা খাতুন ৫২২
জোরওয়ারগঞ্জ ১৬৮, ১৬৯
জোরওয়ার সিংহ ২৪৮
'জোরওয়ার সিংহ প্রশস্তি' ২৪৮, ৫৩৩, ৫৩৪
জোরাস্ট্রীয় ৩০২, ৪৫৫
'জোহরার সওয়াল' ৩৪১, ৫১৯
জৈন ১৩৯
জৌনপুর ৪৬৭, ৫৬৯, ৫৭১
'জ্ঞান চৌতিশা' ৩৪৭, ৩৫৮
জ্ঞান দাস ৮৭, ৯৪-৯৫, ১০৯, ১১১, ১১৩, ৪৮১
'জ্ঞানপ্রদীপ' ১৩, ৩০৪, ৩৫৮
'জ্ঞানবসন্তবাণী' ৪৯৮, ৫১৭, ৫৬১, ৫৬২
জ্ঞানবাদ (জ্ঞানমার্গ) ২, ৭, ৮, ৩৭, ৬০২
'জ্ঞানসাগর' ১০৪, ৩৪৭
'জ্ঞানাদি সাধনা' ৪৭৭
ঝামটপুর ৬৮
ঝুমুর ৫২৫, ৫৭৩, ৬১২
টপ্পা ৫২২, ৫২৫, ৫২৭, ৫২৮, ৫৭০
টমাস বাউরী ৬০৯, ৬১১
টাঙ্গাইল ৪০৩
টেকনাফ ১৯৪-১৯৬
টোটেম-টেবু ১৬৩, ৫৮৪
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ৫২৫
ঠাকুরদাস সিংহ ৫২৭
ঠাকুরমার ঝুলি ৬১৫
ঠেট ২০০, ২০৭, ২১৫, ২৩৪, ২৭৬
ডন কুইকসোট ২৮১
ডাকিনী যোগিনী ১৬৮, ১৭৫, ২০৬, ৩৯১, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৪৪, ৪৫৪, ৫৯৪, ৬০২, ৬০৮
ঢপ ৫২৮
ঢাকা ১০৯, ১৩৪, ১৯৪, ৩৩০, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৭, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৫, ৫০৮, ৫৫৯, ৬০৫, ৬১০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৯, ১২৪, ১৬৫, ১৭১, ২০১, ২৩৬, ২৪৪, ২৭৯, ৩৩৬, ৩৫৯, ৪৮৩, ৫২২, ৫৪৬, ৫৫৩, ৫৫৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ৫৬৬
'তজদীরুল বুখারী' ৩৬০
তত্ত্বসাগর ৫৫০
'তনতেলাওত' ৩০৪
তন্ত্র ৮, ১০৯, ২০৭, ২০৮, ৩৮৬, ৩৯১, ৪২৭, ৪৩৮, ৪৫৫, ৪৭৯, ৫৯৩, ৬০৮
তন্ত্রবিভূতি ৩৯০, ৪০৬, ৪০৭, ৪৫৪
তপন আচার্য ৫৪৯
তপন মিশ্র ৩১, ৩৪, ৩৬, ৫৫১, ৫৫২
'তফসীর' ৩০৫, ৩৩২
'তফসীর হোসেনী ও ফুতুহুল আজীজ' ৩৩২
তমলুক ৬০৫, ৬১১
তমিজী ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪
'তমিম আনসারী' ৩৫০, ৩৮২, ৩৮৩
'তমিম গোলাল চতুর্ন সিলাল' ১০৬, ২৫০, ২৫১, ২৫৮

'তন্বীয়তুন্নিসা' ৩৩০, ৩৩৫, ৪৮৯, ৪৯৬
তরণীসেন ১৩১
তরল পয়ার ৩৩৬, ৩৩৭
তরিকতে হক্কানি ৪৮৯
'তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া' ৬৩০
তাঁত ৯
তাজ ১৫
তাজউদ্দীন ৩০৭, ৪৭৩, ৪৮৫
'তাজকিরাতুল আউলিয়া' ৩৭৬, ৪৭৩, ৪৮৯, ৪৯৮, ৫৪৪
'তাজকিরায়ে উলেমায়ে হিন্দ' ৩১০
তাজ খান কররানী ১৩২, ২৯০, ৪৩৬
তাজ খান মসনদ-ই-আলা ৪৬৫
তাজ বেগম ১১১
তাজমহল ১৫৩, ৪১৬
তানসেন ৫৭০, ৫৭১
তান্ত্রিক ৯, ৪২৬, ৪৫৩
তান্ত্রিক বৈষ্ণব ৯
'তামাকু চরিত্র' ৫৫৭, ৫৬১
'তামাকু পুরাণ' ৫৫৭, ৫৫৯, ৬০২, ৬১৬
'তামাকু মাহাত্ম্য' ৫৫৭, ৫৬১
তামিল ২৫
তামিল সাহিত্য ২৫
তারকেশ্বর ৪২৭
তারানাথ ১৯৪
তারা ৬, ১১৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৪১০, ৪১৫, ৪৩৪
তারাচাঁদ ৩, ১৭
তারাপদ মুখোপাধ্যায় ৪৪
তারিণীচরণ মিত্র ৪৭৭
তারিণীশঙ্কর ঘোষ ৪৪১
'তালনামা' ১০৯, ৫৭৫
তালহা ২৭৫
'তালিবনামা' ৩০৪, ৩৪০
তাসাউফ ২০৭, ২০৮
তাহির ২৬১, ৬১৮
তাহির মাহমুদ ১০২, ৪৪০, ৪৪৪, ৪৫২, ৪৫৪, ৫৭৫
তাহের ঠাকুর ১১৮
'তিব্বত' ৬০৫, ৬১১
তিব্বিয়াশাস্ত্র ৫৯৩
তীতুমীর ৫৪৩
তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা ৬০৪
তীর্থ (সম্প্রদায়) ১২০
'তীর্থমঙ্গল' ৪২৪
'তুতি নামা' ৪৯৯
তুফানুদ্দিন ১০২
'তুরান শাহাজাদার কিসসা' ৫২২
তুর্কী ১, ১১৪, ১১৮, ১৯৬, ৪২৭, ৪৩৪-৪৩৬, ৪৩৮, ৪৭৭
তুর্কী আমল ৪৩৫, ৪৫৫, ৬০৯, ৬১১
তুর্কী বিজয় ২, ১১৪, ৪৮৫
তুর্কী ভাষা ২৩৪, ২৩৬, ৪৭৪, ৪৮৪
তুর্কী-ফারসি ২৩৬
তুর্কী মুঘল আমল ২৬৭, ৪৭৫
তুলসী দাস ১১১
তুলসী মিশ্র ৫৪৯
তেজশ্চন্দ্র ৪২২, ৪৪৩
তেলেঙ্গা সাহা ফকির ৫২১
তুহফতুল হিন্দ ৫৭১
তুহফা-ই-মজলিশে সালাতিন ২৪৯
তৈত্তিরীয় ৬
তোড়লমল ৩৯২
'তোতা ইতিহাস' ৪৭৭
তোমে পিরেস ৬০১, ৬০৬
'তোহফা' ১৯৮, ২০৮, ২১১, ২১৪, ২৭৮, ২৮০, ৩০৫, ৩১০-৩১৩, ৫৮৮, ৫৯১, ৫৯৪, ৫৯৫, ৬০০, ৬০১, ৬১৩, ৬১৫, ৬১৬
'তোহফাতুননেসায়েহ' ৩১০, ৩১১
ত্রিদিবনাথ রায় ১৭৬
ত্রিপুরা ৮৯, ১৪৬, ১৬৫, ১৬৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৫, ১৯৭, ২৭৬, ২৯০, ৩০১, ৩২৬, ৩৭৯, ৪২৫, ৫১৩, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০
ত্রিপুরাব্দ ৩২৬
ত্র্যম্বক ৪২৭
ত্রিবিক্রম ৭
ত্রিমল্লভট্ট ৩৭

ত্রিলোচন ৪২৭
থিবিথুধম্মা ২০৯
দক্ষিণ বঙ্গ ৪২৩
দক্ষযজ্ঞ ৪২৭, ৪৩০
দক্ষিণ ভারত ৩, ৬, ৯, ১১, ১৯, ৩১, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৬, ২৬৭, ৪৫২, ৪৭৯, ৪৮৬, ৫৭৫
দক্ষিণ রায় ১২৩, ২৮২, ৩৯৫, ৪৪০, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৭-৪৬২, ৪৭৮, ৪৮৪, ৪৮৯, ৪৯৯, ৬০২
দক্ষিণাপথ ২, ৪৪৮
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৬১৫
'দণ্ডাত্মিক পদাবলী' ৯৭
দবীর খাস ১১৮
দয়াময় ৫৯০
দয়ারাম দাস ৪২৩
দয়াল ৪২৪, ৪৪১
দয়ালচন্দ্র মিত্র ৫২৮
দরবেশ ৪৫৩-৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬৭, ৪৭৩, ৫৮৯, ৫৯৬
দরবেশ ওয়ায়েজ ৫২২
দরবেশ পীর পাঁচালী ৪৫৩
'দরাফ খান গাজী' ৪৬৬
দরিয়া ১১১
দরিয়া পীর ৪৬৭
দরিয়া সাহেব ১৫
দশমহাবিদ্যা ৩৮৬, ৪১০
'দশরথ জাতক' ১২৯
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র ৪৩
'দস্তান-ই-আমীর হামজা' ২৮০, ৫০৯
দাউদ খান কররানী ১৩২, ১৮৮, ২৯০, ৪৩৬
দাকায়েক আখবার ৩১৮-৩২০
'দাকায়েকুল হেকায়েক' ৩০৫, ৩৫১
দাক্ষিণাত্য ২, ৩, ২০, ২৫, ২৭, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৭৭, ৭৮, ১২৭, ১২৮, ১৩৭, ১৩৯, ১৬৬, ১৭৭, ২৩০, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ৪০৮, ৫৮৬
দাখিনী উর্দু ১৬৬, ১৭১, ২০০, ২৩৪, ২৩৬, ২৪৯, ২৯৫, ৪৭৯, ৪৮৬, ৪৮৯
'দাখিনী হিন্দি' ১৬৮, ১৭৩
দাদু ২, ৬, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ৩৭, ১১১, ৪০৮, ৫৮৬
'দানকেলী কৌমুদী' ৩৫
দানিশ (কাজী) ১০২, ১০৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৯৮, ৫১৭, ৫৭৫, ৬১৮
দামুন্যা ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫
দামিরী ১৯০
দামেস্ক ২৭৫, ২৮৪
দামোদর দাস ৫৮১
দামোদর পণ্ডিত ৫৪৯, ৫৫১
দামোদর পুরী ৫৪৮, ৫৫০
দায়ুদ ত্বয়রী ৩০৩, ৪৫৬
দায়েম উল্লাহ ৫১৭
দারা শিকোহ ৫৮৬
'দারা-সিকান্দার নামা' ২৭৭
দারুব্রহ্ম ১১৪
দাশরথী রায় (দাসু রায়) ৫২৫, ৫২৮, ৫২৯
দাশু রায়ের পাঁচালী ৫২৯
দাস জনার্দন ৫৫৩
দাস ভোলানাথ ৫৫৩
দিওয়ান ১০
দিওয়ানা মদিনা ১৩০
দিকপাল ৪২৭
দিখা ১৮৭
দিনাজপুর ৪৬৭, ৫২১
দিব্যসিংহ (কবিরাজ) ৮৭, ৯৬, ৯৮
'দিলরুবা-চারচমন' ৪৯৫
দিলারাম উপাখ্যান ৪৯৫, ৫০৮
দিল্লী ১৯, ১৯৭, ২১৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৭৪, ৩১০, ৪১৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৫২৮, ৫৩১, ৫৭০
দীন চণ্ডীদাস ১১১
দীনবন্ধু ১০৯
দীনবন্ধু দাস ৮৬, ৯৮
দীন ভবানন্দ ১১৩, ১২৪, ১২৫
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৭৮, ৪১২
দীনেশচন্দ্র সেন (ডক্টর) ২৮, ৬৫, ৭৭, ৭৮, ১০১, ১৩৩, ১৪০, ১৪৯, ১৫২-১৫৪,

১৫৭, ৪৩১, ৪৮৩, ৫৮০, ৫৮১, ৬১৩, ৬১৪
'দীল দেওয়ানা' ৫০৪
দুদু মিয়া ৫৪৩
দুর্গম সঙ্গমণি ৩৬
দুর্গাপ্রসাদ ঘটক ৪৪১
দুর্গা ১১৬, ৩৮৬-৩৮৮, ৪১০, ৪১৫, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৩৮, ৫৮৭, ৬০২
দুর্গাপঞ্চরাত্রি ১৩৪
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪২৪
'দুর্গামঙ্গল' ৩৮৮, ৪২৪
দুর্গামণি ঠাকুর ৫৪০
দুর্বলা ৩৮৮
দুর্লভ আচার্য ৫৪৮
দুর্লভ বিশ্বাস ৫৫৩
দুর্লভ মল্লিক ৪৫৪
দুর্লভ রায় ৯৮
দুলা মিয়া ১০২
দুল্লা মজলিশ ১৯৬, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৮২-৩৮৪
দুষ্মন্ত ১৩৭
দুষ্টা সরস্বতী ৪২১
দুঃখী শ্যামদাস ৮৪
দেওয়ানা-মদিনা ৫৪০
দেওয়ান ফিরোজ খান ৫৪০, ৫৮০
দেওয়ান মানুল্লা মণ্ডল ৫৪০
দেওয়ান রামবল্লভ রায় ৫৪০
দেবকী নন্দন ৩১, ৪৫, ১২১, ৪৪১
দেবনাগরী অক্ষর ৪০৫, ৪৫২
দেবমাণিক্য ১৮২, ২৯০
দেবান আলী ৫৭৫
দেবানন্দ ৫৪৯
দেবানন্দপুর ৪২০
দেবীনন্দন ১৩২
দেবীবর ঘটক ১১৪, ৫৮৭
দেবী ভাগবত ১২৮, ৩৮৭, ৪৩২
দেবী সিংহ ৫৪২, ৬১০
দেয়াঙ ১৮৬, ৫৩৪, ৫৩৫
'দেলবাহার গোলে গোলজার' ৫১৪
'দেল মনছর' ৫২২
দেহতত্ত্ব (দেহবাদ) ৩০৪, ৬০১
দৈবকীনন্দন ৮৭, ৯৭, ১২৩, ১৫৫, ১৬০, ১৬১
দোনাগাজী ২১৯, ২৩৬-২৩৯, ৫৪৪, ৫৯১
দোভাষী পুথি ১৭৩, ৩৩৫, ৪১৫, ৪৫২, ৪৭৪, ৪৭৮-৪৮৪, ৪৮৯, ৫১৮, ৬০৭, ৬২৯
দোভাষী রীতি ১১২, ১৭৪, ২৬৩, ২৭২, ৩৭৬, ৪৬৬, ৪৭৭, ৪৮৩-৪৯০, ৪৯২, ৫০৪, ৫০৭, ৫২১, ৫৪৪
দোভাষী শায়ের ২৪৯, ২৫১, ২৫৬, ২৫৮, ২৭৭, ২৮০, ২৯৫, ৩৬৫, ৩৭৬, ৩৮৪, ৪৮৪, ৪৮৮, ৫২৪
দোভাষী সাহিত্য ১১২, ২৫৬, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৮৮, ৪৮৯
দোরদানা বিলাপ ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৫৭
দোররে মজলিশ ২৪০, ৩১৬, ৩১৮, ৩৮৪
দোস্ত মুহম্মদ ২৯৬, ৫২০
দোহা, দোহাকোষ ৮, ১০, ১৫, ১৪৫, ২১৬, ২১৮
দোহাজারী ২৪৮, ২৫৬, ২৫৭, ৩২৪, ৫৩৩,
দৌলত উজির বাহরাম খান ১০৪, ১১৩, ১৬৬, ১৮২, ১৮৪-১৯৩, ২০৭, ২৮৩, ২৯৩, ৪৬৭, ৫৩১, ৫৯০, ৬১৬
দ্য বারোজ ৬০৭
দ্বারকানাথ রায় ১৮৯
দ্বিজ অভিরাম ১৫৫, ১৬০, ১৬১
দ্বিজ অমর সিংহ ৪৪১
দ্বিজ কবিচন্দ্র ৪০৬
দ্বিজ কমলাকান্ত ৪২৪
দ্বিজ কানাই ৫৮১
দ্বিজ কালিদাস ৪২৪, ৪৩২, ৪৪১
দ্বিজ কালীপ্রসন্ন ৪০৮
দ্বিজ কুমুদ ১০৯
দ্বিজ কৃপারাম ৪৪১, ৪৪৩
দ্বিজ কৃষ্ণদাস ৭৭
দ্বিজ কৃষ্ণরাম ১৬০
দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ১৩২, ১৩৪

দ্বিজ গদাধর ১০৮
দ্বিজ গিরিধর ৪৪১: ৪৪৩, ৪৫৫
দ্বিজ গুণনিধি ৪৪১
দ্বিজ গোপাল ৪২৩
দ্বিজ গোবর্ধন ১৫৫, ১৬০
দ্বিজ গোবিন্দ ১২১
দ্বিজ গৌরাঙ্গ ৪২৪
দ্বিজ ঘনশ্যাম ১৬০
দ্বিজ চণ্ডীদাস ১১১
দ্বিজ জগৎরাম ১৩৪
দ্বিজ জনার্দন ৪০০, ৪৪১
দ্বিজ জানকীনাথ ১০৯
দ্বিজ তুলসী ১৩৩
দ্বিজ দয়ারাম ১৩৩
দ্বিজ দর্পনারায়ণ ১৩২
দ্বিজ দামোদর ৫৩৯
দ্বিজ দীনরাম ৪৪১
দ্বিজ দুর্গারাম ১৩২
দ্বিজ দুলাল ১৩৩
দ্বিজ দীনরাম ৪৪১
দ্বিজ দ্বারকানাথ ৫৩৯
দ্বিজ ধনঞ্জয় ১৩২
দ্বিজ নন্দরাম ৪৪১, ৪৪৩
'দ্বিজ নন্দিনী' ২৬৫, ৪৪৩
দ্বিজ নফর ৫৩৯
দ্বিজ পঞ্চানন ১০৯
দ্বিজ পঞ্চানন্দ ১৩২
দ্বিজ পশুপতি ১১১, ২৬৬, ২৭০, ২৭১, ৬১৫
দ্বিজ পার্বতী ১০৯
দ্বিজ প্রেমানন্দ ১৬০
দ্বিজ বংশীদাস ১৩৩, ৪০১, ৪০২, ৫৯৪, ৫৯৫, ৬১৫
দ্বিজ বনমালী ৪০৮
দ্বিজ বলরাম ১৬০
দ্বিজ বাণেশ্বর রায় ৪০৬
দ্বিজ বিশ্বনাথ ৪৪১
দ্বিজ বিশ্বেশ্বর ৪৪১
দ্বিজ ব্রজসুন্দর ১৩২
দ্বিজ ভগীরথ ৪৩২
দ্বিজ ভবানন্দ ১০৯, ১২৩, ৫১৭
দ্বিজ ভবানন্দ তনু ১০৯
দ্বিজ ভবানী দাস ১৩২, ১৩৪
দ্বিজ ভবানীনাথ ১১১, ১৩৪
দ্বিজ মণিবাম ৪৩২
দ্বিজ মাধব (মাধবাচার্য) ১৯, ১২৩
দ্বিজ মাধব ১০৯, ১১৩, ১২২-১২৩, ৩৮৭, ৩৮৯-৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪২৪
'দ্বিজ মাধবরচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত' ১২২, ৩৮৭
দ্বিজ মাধবেন্দ্র ১২৫
দ্বিজ মানিকচন্দ্র ১৩২
দ্বিজ রঘুনন্দন ৪৩৩
দ্বিজ রঘুনাথ ১০৯, ১১৩, ১৫২, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ৪৪১, ৫১৭, ৫৭৫
দ্বিজ রঘুনাথ চক্রবর্তী ৪৪১
দ্বিজ রঘুরাম ১৩২, ১৬০, ৪৪১
দ্বিজ রতিদেব ১১১
দ্বিজ রসিক মিশ্র ৪০৬, ৪০৭
দ্বিজ রাজীব ১৩২
দ্বিজ রাধাকান্ত ৪১০
দ্বিজ রামকিশোর ৪৪১
দ্বিজ রামকৃষ্ণ ৪৪১
দ্বিজ রামগোপাল ১০৯
দ্বিজ রামচন্দ্র ১৩২, ৪৩২, ৪৪১, ৫৩৫, ৫৪৯
দ্বিজ রামতনু ১০৯, ৫৭৫
দ্বিজ রামদাস ৫৪৮
দ্বিজ রামদেব ৩৯৭, ৩৯৯
দ্বিজ রামধন ৪৪১, ৪৪৩
দ্বিজ রামনাথ ১২৫
দ্বিজ রামপ্রসাদ ৪৪১
দ্বিজ রামভদ্র ৪৪১
দ্বিজ রামলোচন ১৬০
দ্বিজ রামানন্দ ৪৪১, ৫৬০
দ্বিজ রামেশ্বর ১২৫
দ্বিজ লক্ষ্মণ ১৩২-১৩৪, ৪২৪
দ্বিজ শম্ভুসুত ১৩২
দ্বিজ শিবরাম ১৩২
দ্বিজ শুকদেব ৪৪১

দ্বিজ শ্রীধর ১৯, ১৭৬-১৮০, ৪১০
দ্বিজ শ্রীনাথ দাস ১৫৫
দ্বিজ ষষ্ঠীবর ৬১৬
দ্বিজ সর্বানীনন্দন ১৩৩
দ্বিজ সাফল্যরাম ১৩২
দ্বিজ সীতাসুত ১৩২, ১৩৩
দ্বিজ সৃষ্টিধর ৪৩২
দ্বিজ হরিদাস ১৬০, ১৬১, ৪৪১, ৫৫১
দ্বিজ হরিবাম ৩৯৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৮
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪১৯, ৪৮৮
দ্বৈতবাদ ৮, ১৪, ১৫, ২১
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব) ৩, ৮, ১৫, ২১, ১১১
দ্বৈপায়ন দাস ১৬০
দ্রাবিড় ২, ৮, ১১, ১২৮, ৫৮৪
দ্রৌপদী ১২৭, ১৩৯
ধনঞ্জয় পণ্ডিত ৭৮, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
ধনপতি ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৫, ৪০৮, ৪২৭, ৫২২, ৬০৪
ধনপতি সওদাগরের কাহিনী বা উপাখ্যান ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০০, ৪৪২, ৪৫৮
ধন্বন্তরী ৪২৭
ধন্যমাণিক্য ৮৯, ১৮১
ধরমদেবতা ৪২৬
ধর্ম, ধর্মঠাকুর ৭৯, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৪০৬, ৪০৭, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩২, ৪৪০, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৭৮, ৫৮৪, ৬১৩
ধর্মঠাকুরপন্থ ৪০৬
ধর্মনিরঞ্জন ৩৯০, ৩৯১, ৪৩৪
ধর্মমঙ্গল ১১২, ১৫৪, ১৭৭, ৪০৬, ৪১০, ৪২২, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৫৪, ৪৬৫, ৫৩১, ৫৯০, ৪৯৬, ৬০৪, ৬০৫
ধর্মোপাসক ৪৫৩
ধর্মেশসূর্য ৪২৬
ধাতুসংগ্রহ ৩৬
ধানুকী ৪২৭
ধামালী ৫২২, ৫২৫
ধূমাবতী ৩৮৬, ৪১০
ধূম্রলোচন ৩৮৭
ধূম্রলোচন আখ্যান ৩৮৯
ধূর্জটি ৪২৭
ধৃতরাষ্ট্র ১২৭, ১৩৭
'ধোকাভঞ্জন' ৫২১
ধ্যাননামা ১০২
'ধ্যানমালা' ১৯৯, ৩৪৭, ৫৭৫
ধ্বন্যালোক ৭
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১১৪
নওয়াজিস খান ১০২, ২৪৬-২৫০, ২৬৭, ২৮০, ২৯৩, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৩৪, ৬১৫
নওয়াব ফয়জুননিসা ২৬২, ৫৫৪
নওয়াবী আমল ৪৭৯, ৪৯০
নওশেরঁওয়া ৪৯০
নকশবন্দিয়া ৩০৩
নকুল ১৩৭
নকুল আচার্য ৫৪৯
নগেন্দ্রনাথ বসু ৫৭, ৭৮, ৭৯, ১৪০, ১৫২, ১৫৮, ৪৭২, ৬১৩
নঘমাতুল আসরার ৫৭১
নছিয়তে রঙ্গরস ৫২২
নছিহত বা সদুপন্যাস ৫২১
নজর আলী ২৯৪, ২৯৫
নজর মুহম্মদ ১০২
নট ঘনশ্যাম ১০৯
নটহি দাস ১০৯
নট ভূঁইয়া ১০৯
নদীয়া, নবদ্বীপ ২৮-৩১, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৭, ৫৯, ৬৫, ৯২, ৯৩, ১০১, ১১৬-১১৯, ৩৯০, ৩৯১, ৪৬৬, ৫৪৯, ৫৮৯, ৫৯১
নদের চাঁদ ৫৭৭
ননা গাজী ৩৩৫
নন্দ ৪৩৪
নন্দকিশোর ৪২৫
নন্দন আচার্য ৫৫১

নন্দন ব্রহ্মচারী ৫৫১
নন্দরাম ১৬০
নন্দরাম দাস ১৫৫-১৫৮
নন্দরাম মিত্র ৪৪১
নন্দলাল ৪০৮, ৫২৯
নন্দী-ভৃঙ্গী ৪২৭
নবকৃষ্ণদেব (রাজা) ৫২৮
নবচন্দ্র দাস ১০৯
নবপদ্য ৮৪
নববাবুবিলাস ৪৭৭
নব বালক ১০২
নববিবিবিলাস ৪৭৭
নববৈষ্ণব ২৫, ৩৩
নব বৈষ্ণবমত বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত ৩৩, ৮৫, ৫৮৯
'নবরস' ৫৭০
নবরাজ মজলিস ২১৩, ২১৪, ২৭৮, ২৭৯
নবাই ঠাকুর ৫২৫, ৫২৬
নবান্ন ৬১৩
নবীবংশ ১০১, ১৪৪, ২৪৩, ২৮০, ২৯০, ২৯১, ৩০৬, ৩০৭, ৩৫০, ৩৫৩-৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১-৩৭১, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৪, ৫১২, ৫৯১, ৫৯৪
নব্যন্যায় ১১৪, ৫৮৯, ৫৯৩
নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ২৩৪
নম: শূদ্র ৫৯৪
'নযমাতুল আসরার' ৫৭১
নয়নানন্দ ৩০, ৪৪১
নয়নানন্দ মিশ্র ৮৭
নয়ানচাঁদ ঘোষ ৫৮১
নর-নারায়ণ-শুক্লধ্বজ ৮৯
নরপতিগী ২০৩, ২০৯-২১১, ২২৮
নরসিংহ ৩৬৩
নরসিংহ কবিরাজ ৮৪
নরসিংহ তীর্থ ৫৪৮
নরসিংহ দাস ১২৫, ৫৪৯
নরসিংহ বসু ৫৯০
নরহরি ৪৪১, ৫৪৮, ৫৫৯
নরহরি কবিরাজ ৫২৬
নরহরি চক্রবর্তী ৩৬, ৪০, ৪৩, ৮২, ৮৬, ৯১, ৯২, ৯৮,
নরহরি দাস ১২৫, ৫৪৯, ৫৫০
নরহরি বিশারদ ৪০
নরহরি সরকার ৩০, ৩৭, ৪০, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৮
নরেন্দ্র রায় ৪১৩, ৪১৪, ৪২০
নরোত্তম ঠাকুর ৮১, ৮৭, ৯৬
নরোত্তম দাস ৮২-৮৫, ৮৭
নরোত্তমবিলাস ৪৬, ৮২
নলচম্পু ৭
নল-দময়ন্তী ১৩৯, ২৯৭
নলিনীকান্ত ঘোষ ৭৭
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ৫৫৭, ৫৬১
নসর শহীদ ৪৬৪
নসরত খান ২৮৯, ২৯০
নসরুল্লাহ খোন্দকার ২৮১, ২৯৩, ৩০০, ৩০৫, ৩২০-৩২৪, ৩৪০, ৩৫১, ৫৩১, ৬০১, ৬০৯, ৬১৯, ৬২০, ৬২৯
'নসলে উসমান ইসলামাবাদ বা শাহনামা ৩৮০
নসিব নামা ২৩০
নসিয়তনামা (নসিহতনামা) ৯৯, ১০৫, ১০৬, ২৩৯, ২৪০, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩২৪, ৩২৫; ৩৩০, ৩৩৫, ৪৮৯, ৫২২, ৫৬০
নসিয়তুল খুবী ৫৯৪
নাগপুর ৫৩২, ৫৩৩
নাগমাতুল আসিফী ৫৭১
নাগর যুবাই ৫৪৮
নাগরী ২৬৫, ৫৯০
নাগরী বর্ণবালা ২৩৪
নাগরীভাব ৬৫
নাগা ৪৭৪
নাগাষ্টক ৪১৬, ৪২১
নাছিহাতুল ইসলাম ৫২১
নাজিমুদ্দৌলা ৪৯০
নাজির মাসুদ সরকার ৫২১

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ২০৫
'নাটক-চন্দ্রিকা' ৩৫
নাটোর ৪০৭
নাথ ৯
নাথগীতিকা ১১৫, ৬০৮
নাথপন্থ,নাথযোগীপন্থ ৯, ১২
নাথপন্থী ৪৫৩
নাথ যোগী ৪০৬, ৪২৭, ৪৩০
নাথ-সহজিয়া ৮
নাথ সাহিত্য ৪৩৮, ৪৬৫
নাদির বিন হারিস ৫৬৭
নানক ২, ৪, ৫, ১০, ১৯, ৩৭, ৪০৮, ৫৮৫, ৫৮৬
নানুপুর ১৮২, ১৮৩
নাপ্পিন্নাই ৬, ৭, ৮, ২৫
নামকীর্তন ৫৬৯
নামাজনামা ৪৮৯
'নামাজ মাহাত্ম্য' ৪৮৯
নামাজের কেতাব ৩৩০, ৩৩৫
নায়ক কারণ ৫৭০
নায়ক গোপাল ৫৭০
নায়ক ধুন্দে ৫৭০
নায়ক বৈজু ৫৭০
নায়ক বখশু ৫৭০
নায়ক মাহমুদ ৫৭০
নায়েক ময়াজ গাজী ৪৪১
নারদ ২, ৬, ১২৭, ৪১৬, ৪৩০
নারদ পঞ্চরাত্র ৬৪, ৬৮, ৫৫০
নারদ সঙ্গীতসার সংহিতা ৫৫০
নারায়ণ ৪২, ৬৫, ২৮২, ৫৪৮, ৫৫০
নারায়ণ আচার্য ৫৪৮
নারায়ণ গুপ্ত ৫৪৯
নারায়ণ দাস ৫৫৩
নারায়ণ দেব ৪০১, ৪০২, ৬১৪
নারায়ণ পণ্ডিত ৫৫১
নারায়ণ মিশ্র ৫৪৯
নারায়ণী ৩২, ৩৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫৩
নার্সিসাস ২৪৯, ৩৬৩
নালন্দা ৫৯০
নাসির আলী ১৭১, ১৭৩
নাসির মুহম্মদ ১০২, ১০৩, ২৮১
নাসিরউদ্দিন ১০৩
নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৯৫
নিকাহমঙ্গল ৯৮, ৩৩২, ৫৬৩
নিখিলনাথ রায় ১০৫
নিজাম ২৮৩, ২৮৪
নিজামউদ্দিন আউলিয়া ১১, ৩১০
নিজামপুর ১৮৭, ২৮৪
নিজ্জামিয়া ২১৫
নিতাই দাস (বৈরাগী) ৫২৫, ৫২৬
নিত্যানন্দ ১৮, ১৯, ২৯-৩১, ৩৪, ৩৬-৪০, ৪২, ৪৩, ৪৭-৪৯, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭৮-৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯৩, ৯৪, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ৫৪৭-৫৪৯, ৫৫২, ৫৫৩, ৬১৬
নিত্যানন্দপন্থ ৩৭
নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৫
নিত্যানন্দ ঘোষ ১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬১
নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ৪২২, ৪২৩
নিত্যানন্দ দাস ৮২, ৮৩
'নিত্যানন্দ বৈদ্য' ৫৩৫
নিধিরাম ১৭৭
নিধিরাম আচার্য ১১১, ১৭৮, ৪১০, ৪১২, ৪১৩
নিধু বাবু (রামনিধি গুপ্ত) ৫২৫, ৫২৭, ৫২৮
নিমাই ২৯, ৩০, ৪৬, ৫৯, ৬৫, ১১৬, ১৬০
নিমানন্দ দাস ৮৬, ৯৮
নিম্বাদিত্য ৩
নিম্বার্ক ২, ৩, ৮, ৩৭, ৪০৮, ৫৮৬
নিয়ামত আলী খাঁ ৫২১
নিযামপুর ১৮৭, ১৮৮
নিযাম শাহ ১৮৫-১৮৮
নিযামী ১৮৯-১৯২, ২১৪, ২২১, ২৫২, ২৭৭, ২৭৯, ৪৮৮
নিরঞ্জনের রুম্মা (কলিমা জালাল) ১১৪, ২৪৫, ৪৬৭
নির্বাণতত্ত্ব ৪৫৬

নির্বাণবাদ ৩০৩. ৩৯০, ৪৫৪
নির্লোম গঙ্গাদাস ৫৫২
নিশাত আরা ৫৭১
নিশুম্ভ ৩৬৩
'নীতিশাস্ত্রবার্তা' ৩০০, ৩১৩-৩১৫, ৬১৫, ৬১৭, ৬২৯
নীলকণ্ঠ ৪২৭
নীলকমল ৫২৫
নীলমণি ১১৯
নীলমণি পাটনী ৫২৫, ৫২৭
নীলাচল ৩১, ৩৬. ৩৯-৪১, ৪৭, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৮৪, ১২২, ১৫১, ৫৫১, ৫৫২
নীলাম্বর চক্রবর্তী ২৮, ৪০, ৫৪৮, ৫৪৯
নীলাম্বর পণ্ডিত ৫৪৮
নীলাম্বর সিহাভট্ট ৫৫১
নীলু ঠাকুর ৫২৫-৫২৭
নীলতারা ৪৮৬
নীহাররঞ্জন রায় ৩০৪
নুরউদ্দীন ২৭৭
নুর উল ইমান ৪৯৮
নুর কুতুবে আলম ১৫, ১৭, ২০৭
নুর বক্ত নওবাহার ৫১৬
নুর মুহম্মদ ১৭৫, ২১৫
নুরুল্লাহ ৩৮৪, ৩৮৫
নুসরত খান ১৮৬
নুসরৎ শাহ (নসরত শাহ) ৯৯, ১১৮, ১২১, ১৩১, ১৪৮, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮৬, ২৯০
নুসসাহ-ই-খায়ের অল মুলুক মশহুর বাহ তুফফাহ্ অল মুলুক ২৩৬
নূরজামাল ১৩, ৩০৪
নূরনামা ১০৬, ২৪০, ২৪৩, ৩০৪, ৩০৬-৩০৮, ৩১৬, ৩১৭, ৩২৯, ৩৫৪, ৩৮৪,
নুর ফরামিস নামা ৩১৬, ৩৫০, ৩৮৪
নুলু পঞ্চানন ১১৪, ৫৮৬
নৃসিংহ ৫৪৮
নৃসিংহ দেব ৮৭, ৯৭
নৃসিংহানন্দ ৫৪৮, ৫৫০
নেওল কিশোর ২৩৬
নেকবিবির বয়ান ৩৩০, ৪৯৫, ৫০৮, ৫১৯
নেপাল ৮৮, ৯০, ১৭৮, ১৯৭, ৫৯৪, ৬০৫
নেড়া নেড়ী ৮৩, ৮৫, ১১৫, ৫৯৬
নেয়াজ ৩০৫, ৩০৮, ৩০৯
নৈমিষারণ্য ১৩৭
নৈহাটি ৩৪, ১১৯
নোগাজিল ২৮৩, ২৯০
নোয়াখালি ১৬৪, ২৩৯, ৩৩০, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৯০, ৫৩৮-৫৪০
পঞ্চকোট ১৩৪
পঞ্চতত্ত্ব ৩৭, ৬৫
পঞ্চতন্ত্র ৫৬২
পঞ্চভাষা ২০৮
পঞ্চরাত্র ৬, ৭
পঞ্চানন ১২৫, ৪৩৩
পঞ্চানন দাস ৫৪২
পঞ্চানন মঙ্গল ৪৩৩
পঞ্চানন মণ্ডল (ডক্টর) ১৪১, ৫৬০, ৬১৪
পঞ্চানন্দ ৫৭৫
পটিয়া ১০২, ১৪৭, ১৮১, ২৬২, ২৭১, ২৯০, ৩২৮, ৩৫৮, ৪৩৩, ৪৪৫
পণপ্রথা ৫৯৮
পণ্ডিত জগানন্দ ৫৫১
পণ্ডিত দামোদর ৫৪৮
পতঞ্জলি ৭, ১৩৭
পত্রলেখা ৫৯১
পদকল্পতরু ৭৯, ৮৬, ৯২, ৯৩, ৯৮, ১০২, ১০৫, ১২১
পদকল্পলতিকা ৮৬
পদরত্নাকর ৮৬
পদরত্নাবলী ৮৬, ৯৩
পদরসসার ৮৬
পদসংকলন ৮৬
পদাবলী ২৫, ৮৫-১১৩, ১২৫, ২০৭, ২১৪, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯, ৪৯৮
পদামৃতসমুদ্র ৮৬

পদ্মাবৎ ১৬৪. ১৬৮. ১৭৩. ২১৫. ২১৬. ২৩৪
পদ্মনাভ ৩৪
পদ্মনাভ চক্রবর্তী ৮০
পদ্মপুরাণ ৭, ২৫, ৩৬. ৬৮, ১২৮. ৫৫০
পদ্মা (নদী) ৪৩৬
পদ্মা (দেবী) ৫৮৭
'পদ্মাপুরাণ' ৪০২, ৪০৪, ৪০৮, ৪৩২, ৬১৪
পদ্মাবতী ৯৯. ২০৩. ২০৪. ২০৭, ২১০, ২১৩-২১৮, ২২২. ২২৮, ২২৯, ২৩৩, ৩৩৮, ৪৮২. ৫৫৪. ৫৫৫, ৬১৪
'পদ্মাবতী ও মধুমালতীর রূপক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য' ১৭১
পদ্মাবতী (নিত্যানন্দেব মা) ৫৪৮, ৫৪৯
'পদ্মিনী উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা' ২১৮
পদ্যাবলী ৩৫, ৪৫
পরগনাতি সন ২৯৩
পরমানন্দ অবধূত ৫৪৮, ৫৫০, ৫৫২
পরমানন্দ উপাধ্যায় ৫৫২
পরমানন্দ খান ১১৮
পরমানন্দ গুপ্ত ৩০, ৫৭, ৮৬. ১২১, ১২২, ৫৪৯, ৫৫২
পরমানন্দ পুরী ৩১, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০
পরমানন্দ ভট্টাচার্য ৬৫
পরমানন্দ সেন ৪৪, ৪৫
পরমেশ্বর দাস ৩০. ১৩২, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
পরশুরাম ৩৬৪
পরশুরাম বিজয় ৮৮
পরাগল ১৪০, ১৪৪, ১৪৫, ২৫১-২৫৩, ২৬১, ২৮৪
গরাগল খান ১৪০. ১৪৪-১৫১, ১৮৭, ২৫২. ২৮৯, ২৯০, ৩৫৮
পরাগলপুর ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৬৯, ১৮৬, ২৮৪, ২৯০, ৩৫৮
পরাগলী মহাভারত ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭. ১৫০, ১৫২, ১৮২, ১৮৬, ২৫২, ৩৬১
পরানচন্দ্র সিং ৫২৫
পরাশর ১২২. ১২৩
পরিচয় (সুনীতিকুমার স্মারক সংখ্যা) ১৭, ১৩০
পরীক্ষিৎ ১৩৭, ১৯৩
পরীবানু শাহজাদী ৫০৫
পর্তুগীজ ১৬৫, ১৯৮, ২০৬, ২৪৩. ২৯০. ৩০৪. ৩৮১, ৪৩৬. ৫২৭. ৫৩৫ ৫৩৬, ৫৫৮, ৫৯৯, ৬০৪, ৬০৭
পর্তুগীজ (ভাষা) ৪৮৬
পর্তুগীজ হার্মাদ ৪৩৬
পলাশী ৪৭৭, ৪৮৬. ৫৪১
পলাশীর যুদ্ধ ৪৭৯, ৫২৩, ৫৪০
পশুপতি ৪২৭
পশ্চিম গাঁও ২৬২
পশ্চিম পাঞ্জাব ১০
পশ্চিম বঙ্গ (পশ্চিম বাংলা) ১৪. ১১১, ১১২, ১৫৩, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯৯. ৪০৪, ৪২৩, ৪২৪, ৪৫২. ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৬৫, ৪৯৮, ৫১৯, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৯. ৫৪০
পাই ইন সিঙ সউ ওরফে মেনখামঙ ১৯৫
পাক পাঞ্জতন বা পাঁচ পীরতত্ত্ব ৬৫, ৪৫৬, ৪৮৬
পাকিস্তান ২৩৪, ২৩৫
পাকিস্তান আমল ১৯৭
'পাকিস্তান নামা' ৪৮৭, ৫০৬
পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ৪৮৩
পাকিস্তানের পুথি ৫০৬
পাঁচালী ৫২২, ৫২৩, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩২
পাঞ্জাব ৫৭১
পাঞ্চাল ১৩৬
পাঠান আমাল ৪৩৬
পাঠান প্রশংসা ২৪৮, ৫৩৩
পাণ্ডববিজয়কথা ১৪৫
পাণ্ডু ১২৭, ১৩৬
পাণ্ডুপুরাণ ১৩৯
পাণ্ডুলিপি (পত্রিকা) ৩২১
পাণ্ডুয়া ৪৮৬, ৪৮৭
পাণ্ডুয়ার কিসসা বা শা সফি সুলতান ৪৬৬
পাথুরিয়া ঘাটা ২৯০

পাদ্রী জমিরুদ্দীন ৫৪৩
পাদ্রী লঙ ৪৮৩, ৪৮৫
পাণিনি ১২৭, ১৩৮, ১৫৩
পাবনা ১৩৩
পারস্য ২৭৭
পারস্য সাহিত্য ১০
পার্বতী ১২৮, ৩৬৩, ৩৮৬-৩৮৮, ৪১০, ৪৩০, ৪৩২
পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৪, ৫৯৪
পার্সী ১
পাল ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৫৫, ৪৭৪, ৪৭৯
পাল আমল ২৮২, ৬১০
পালি ৪৭৪
পাহলবী ২০৮, ২৭৮
পিরিজউদ্দিন ৪৬৪
পীতাম্বর ৫৪৮
পীতাম্বর আচার্য ৫৪৮
পীতাম্বর দাস ১২১, ১৫৫, ১৬০
পীর ৩০৪, ৪৫২, ৪৫৪-৪৫৭, ৪৫৯, ৪৮৮
পীর গোরাচাঁদ (সৈয়দ আব্বাস আলী) ৪৬৭
পীর নারায়ণ সত্য ২৬৭, ৩০১, ৩৮৬, ৪৩৫, ৪৩৯-৪৪১, ৪৪৪, ৪৫১, ৪৫২, ৪৯৯, ৬১৩
পীর পাঁচালী ৩০২, ৪১৪, ৪৩৪, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৬২, ৪৭৮, ৪৮৮, ৫১৮, ৫৩১
পীর বদর আলম ৪৬৭
পীরবাদ ১৩, ৪৪০
পীর মুহম্মদ ১০৩
পীর মুহম্মদ সৈয়দ ১৮৪
পীর মুহম্মদ শাহাবুদ্দীন ২৩৯, ৩১৬
পীর শাহ জুনদ ১৮৪
পীর সদর জাঁহা ১৮৪, ১৮৮
পীর সফিউদ্দিন ৩৭৭
'পীরের পাঁচালী' ৪১১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ৪০, ৫২, ১১১, ১১৬, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৯৬
পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধন ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৫৪, ৪৭৪
পুথি পরিচয় ১৪১, ৫৬০, ৬১৪, ৬১৭
পুথি সাহিত্য ৪৭৪, ৪৮১-৪৮৩
পুথি পরিচিতি ৯৮-১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১৯৬, ২০২, ২০৪, ২৩৯-২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৮, ২৫০, ২৬১, ২৮০, ২৮৩, ২৯৩, ৩০৬, ৩১৫, ৩১৯, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩০-৩৩২, ৩৪৬, ৩৫৯, ৩৭৯, ৫২২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৯, ৬১৫, ৬১৭, ৬১৯
পুনা ৭৭
পুরন্দর ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
পুরাণ ৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ২৪২, ৩০১, ৩৯১, ৪২৬, ৪২৭, ৫৩২, ৫৪৭
পুরী ৩১, ৯০
পুরী (সম্প্রদায়) ১২০
পুরুবরা ১৯১
'পুরুষ-পরীক্ষা' ৪৭৭, ৫৬২
পুরুষ-প্রকৃতি ৬, ৭, ২১
পুরুষোত্তম আচার্য ৪০
পুরুষোত্তম গুপ্ত ৬৪
পুরুষোত্তম দত্ত ৮৪
পুরুষোত্তম দাস ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
পুরুষোত্তম পণ্ডিত ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩
পুরুষোত্তমপুরী ৫৫০
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ৫৪৯, ৫৫৩
'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' ৬১৩
পূর্ববঙ্গ (পূর্ব বাঙলা) ১৫৩, ১৮০, ১৯৪, ৩০০, ৩৯০, ৩৯৯, ৪০২, ৪০৪, ৪২৪, ৪৪৪, ৪৫৯, ৫৪০
পূর্ববঙ্গ গীতিকা ১৩৩, ৪৭৯, ৫৩১, ৫৪০
পূর্ব ভারতিক দ্বীপপুঞ্জ ৬০৭
পেগু ৬০৭
পেতা গাজী (হাসান আলী) ৩৫৭
পেয়ার শাহ ৪৬৮
পেয়ার শাহর চরিতকথা ৪৬৮
পৃথ্বীচন্দ্র (রাজা)– ১৬১
পেরিপ্লাস ৬০৭
পৈল ১৩৭

পোতন ১০৩
পৌষপার্বণ ৬১৩
প্যারীচাঁদ মিত্র ৪৫২, ৪৭৬, ৪৭৭
প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় ৪৩২
প্যালেস্টাইন ২৯৬
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ৮৫, ১১৪, ৩৯১, ৪২৭
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য ৮৫
প্রজ্ঞা-উপায় ৪২৬, ৪২৭, ৪৩৪
প্রণয়োপাখ্যান ১১১, ১৬২-২৭২, ৪১০, ৪৮৮, ৪৯৬, ৬০৭
প্রণয়োখ্যানের কবি মুহম্মদ জীবন ২৫৫
প্রতাপচন্দ্র (রাজা) ৫২৮
প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত ৫৪
প্রতাপরুদ্র ৩১, ৪০, ৪৫, ৫৯. ৭০, ৮৯, ১১৮, ১৪৭, ১৫০. ৫৪৮. ৫৫১
প্রতাপাদিত্য ৯৫, ১০৯, ৪১৬, ৪১৭, ৪৩৬
'প্রতাপাদিত্য চরিত' ৪৭৭
প্রদুম্ন ব্রহ্মচারী ৫৫১
প্রদ্যুন্ন মিশ্র ৮০
প্রফুল্লচন্দ্র পাল ৫২৬
প্রবাসী ২১৮
প্রবোধচন্দ্রিকা ৪৭৬, ৪৭৭
প্রবোধানন্দ ৫৪৮
প্রবোধানন্দ সরস্বতী ৩৭, ৪৫, ৫৫০
প্রবোধানন্দ সরস্বতীবচন ৫৫০
প্রভু রাম ৫৯০
প্রমথেশ ৪২৭
'প্রসন্ন রাঘব' ১৭৭
প্রসাদবসু মিত্র ৫২৮
প্রহলাদ ২
প্রাকৃত ২৫, ৮৬, ১৭৮, ৪৭৪
প্রাকৃতপৈঙ্গল ২৫, ৬০৯
প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান ৫২৬
প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ ৮৬, ৫২৬
প্রাচীন কবিওয়ালার গান ৫২৬
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ৮৬
'প্রাচীন পুথির বিবরণ' ১৫৫, ৫৩৪, ৫৩৯, ৫৬১, ৬১৪
'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' ৯, ৬০৫
'প্রাচীন বাংলা সাহি[illegible] কালক্রম' ২১১, ২৮২
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ২৫০
প্রাণচন্দ্র ৪৩২
প্রাণবল্লভ ৪২৪
প্রাণরাম ১৭৭, ৪১০
প্রাণরাম চক্রবর্তী ৪১১, ৪১২
প্রিয়ম্বদা দেবী ৫৯১
প্রেমদাস ৯৮
প্রেমতত্ত্ব, প্রেমবাদ ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩,
প্রেমধর্ম ৩৪, ৩৭, ১৩১, ৫৮৬
প্রেম পরাবিধ স্তোত্র ৩৬
প্রেমবিলাস ৩৬, ৪৬, ৬৯, ৮২-৮৪, ১১৪
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৮৩
প্রেমী কৃষ্ণদাস ৬৯
প্রেমেন্দুসাগর ৩৫
প্রেসিডেন্সী বিভাগ ৮৬, ১১১, ১১২
প্রোটেস্ট্যান্ট ১১
ফকির আসকর আলী ২৬৩
ফকির ওহাব ১০৩, ১০৪
ফকির গরীবুল্লাহ ১৫৪ ১৭৩, ২৪১, ২৪৯, ২৮০, ২৯৫, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৯, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৯-৪৯৩, ৫০৯, ৫১৮
ফকিরচাঁদ ১১১, ৩৩৪, ৪৪৫, ৫২২
'ফকির বিলাস' ২৯৩, ৩৩৪, ৪৮৯, ৪৯৯
ফকির ভোলা শাহ ১০৪
ফকির মুহম্মদ ২৪১, ৪৬৩, ৪৬৮, ৪৭২, ৪৯০, ৪৯১, ৫১৮
ফকির মোহাম্মদ ৫২২
ফকির রাম ৪৪১
ফকির রামদাস কবিভূষণ ১৩৩, ৪৪১
ফকির শাহ ১০৪
ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ৫৪০
ফকির হাবিব ১০৪
ফক্করনামা ১০৭
ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ২৮৯
ফজল বিন মুহম্মদ ২৭৭
ফজলিয়াতে দরুদ ৪৯৮

ফজলুর রহমান চৌধুরী ২৬২
ফজিল আয়াজ ৩৭৬
ফটিকছড়ি ১০০, ১০৬, ১০৭, ১৮২, ২৫০, ২৫৩, ২৬০, ২৬২, ৫৩৫
ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ৪০৮
'ফতহ-উল মেসের' ২৯৬
ফতন ১০৩, ১০৪
ফতে খান ১০৩, ১০৪, ৩৫৫
ফতে মণ্ডল ৫২১
ফতেপুর সিক্রি ৫৮৬, ৫৯১
ফতেয়াবাদ ১৮৬, ২১২, ২১৪, ২৬০, ২৮৪, ২৯০, ৪৩৬
ফন নিন চটোয়েন ১৯৪
ফয়জুল্লাহ (মীর ও শেখ) ১০৪, ১১১, ১৬৫, ২৮১-২৮৪, ৩০৪, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪০, ৪৪১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬৫, ৫৭৫
ফয়েজ ২৩২
ফররুখ আহমদ ৪৮৪, ৪৮৮
ফররুখশিয়র ৪৩৭
ফরায়েজনামা ৩৩৫
ফরায়েজী আন্দোলন ২৮
ফরাসভাঙা ৪২১, ৫২৭
ফরাসি ১৯৭, ৪৮৪
ফরিদপুর ৫১৮
ফরিদুদ্দীন আত্তার ১০
ফাজিল নাসির মুহম্মদ ১০২, ১০৩, ১৯৯, ২৬১, ৫৭৫, ৫৭৬
ফাতিয়া-ই-ইবরিয়া ১৯৪
ফাতেমা ৬৫, ৫২০
ফাতেমার জহুরানামা বিবি কুলসুমের মেজামান ৫২০
ফাতেমার সুরতনামা ১০৪
ফানা, ফানাতত্ত্ব ১৪, ১৫, ৩০৩, ৪৫৬
ফায়দুল মুকতদী ৯৯, ২৬১, ২৬২, ৩০৫, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৪৭, ৬১৮
ফারসী, ফার্সী ১১৮, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১-১৭৩, ১৮৯, ১৯৮, ২০৭, ২০৮, ২১৫, ২৩৪-২৩৬, ২৪০, ২৪১, ২৪৯, ২৫৮, ২৬১, ২৬২, ২৬৫, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ৩২৭, ৩৩০, ৩৫১, ৪১৬, ৪২০, ৪৫২, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৪-৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯৮, ৫১৪, ৫২৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৮৩, ৫৯০, ৫৯৩, ৬১৯
ফারসী-তুর্কী ২৩৪, ৪৮৫
ফারসী সাহিত্য ১৬৬, ১৬৮, ২১৫, ২২১, ২৩৫, ২৩৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৯, ২৫০, ২৫৮, ২৬৬, ২৭৯
ফারসী-হিন্দি ৪৭৯
ফারসী-হিন্দুস্তানী ১৮৯, ৪৮৮
ফারহাঙ্গে আফসিয়া ২৪৯
ফালনামা ৩৩২, ৪৮৯, ৫৭৬, ৫৭৭, ৬০৮
ফাসানা-ই-আজায়েব ৫১৪
ফিটজেরাল্ড ১৬০
ফিরদৌসী ২৪১
ফিরিঙ্গি ৬৫, ৩৯০, ৪০৩
ফিরোজ শাহ ৯৯, ১৭৬, ১৭৭
ফিরোজ শাহ তুঘলক ২০০, ৪৬৬
ফুগপুর শাহ ১০৭, ২৬৬
ফুলমতিবিবির কিস্‌সা ৫২২
ফুলিয়া ১১৯, ৪২০
ফুল্লরা ২০২, ৩৮৮, ৩৯৪, ৩৯৬, ৬১০
ফুল্লরার বারমাসী ৬০৫
ফেই শিন ৬১১
ফেছানায়ে আজায়েব ৪৮১, ৫১৪
ফেনী ১০৪, ১৯৮, ২৫৪, ২৬০, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৭৯, ৫৩৬
ফেনী নদী ১৪৬, ১৫১, ১৮৭, ২৮৪, ২৯০
ফৈজুদ্দিন ৩৩৫
ফৈজুল্লাহ (দোভাষী শায়ের) ৩৩৪, ৪৪১, ৪৫১, ৪৬৫
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ২৫৬, ৪৭৭
ফ্রায়ার ম্যানরিক ১৯৪
বংশী ঘোষ ৪২৪
বংশীদাস্ ৪০২
বংশীবদন ৩০, ৮৬, ৮৭, ৯২, ১০৯, ৫৪৭, ৫৪৮
বংশীমোহন ১৩২

বকশা আলি ১০২, ১০৪,
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ৫৪৯, ৫৫১
বক্রেশ্বর মিশ্র ৫৪৮
'বক্রোক্তিজীবিত' ৭
বখতপুর ২৫০
বখশ আলী পণ্ডিত ৫৭৫
বখশ আলী ফৌজদারের কীর্তিগাথা ৫৩৪
বখসী হামিদ ২৯৩
বগলা ৩৮৬, ৪১০,
বগুড়া ৪০৭, ৪৬৭, ৫২১
বঙ্কিমচন্দ্র ২, ৩৪০, ৪৩৬, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫২৫, ৫৭৬
বঙ্গ ৪৩৪-৪৩৬
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ২৯, ১৫৩, ৪৩১
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ৪৩১
'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' ৬১৩-৬১৬
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮০, ৮৬, ৩৯১, ৩৯৮, ৪৪৪
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৫৮, ৪৭২
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথি ৫৪১
'বঙ্গে সুফী প্রভাব' ৪৬৭, ৬১৩
বঙ্গোপসাগর ৩৯৯, ৪৩৬, ৪৬৭
বজ্র-তারা ৩৮৬, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩৮
বজ্রযান ৮, ২৮২, ৪৫৫, ৪৭৯
বজ্রযানী বৌদ্ধ ৪৩৮
বজ্র সহজযানী ৪২৭
বটতলার পুথি ২৩৯, ৪৮৩
বড় খাঁ গাজী ২৮২, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮-৪৬০, ৪৬২, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯৯, ৫৮৭, ৬০২
বড় চন্দ্রাবলীর পুথি ২৭০
বড়ু চণ্ডীদাস ১৯, ১১১, ৩৯১
বড়ে গাজীর কেরামতি ৪৫৭
বৎসলা (বাসুলী) ৪৩৪, ৪৩৮
'বত্রিশ সিংহাসন' ৫৬২
বদর পীর ২৬১, ২৮৯, ৪৫৯, ৪৬৭, ৪৯০
বদরের যুদ্ধ ২৭৩
বদরউদ্দীন বদর-ই-আলম ২৮৯, ৩১৫, ৪৬৭
বদনানন্দ ৫৪৯
বদিউজ্জামান ১০৪
বদিউজ্জামার লড়াই ৫০৯
বদিউদ্দিন ১০৭
বনদুর্গা ৪৫৯
বনদেবী-বনবিবি ২৮২, ৩০৪, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯-৪৬২, ৫৮৭, ৬০২
বনবিবি-জহুরা নামা ৪৬২, ৪৬৪, ৪৭৯, ৪৯৯
বনবিবি তল ৪৫৯
বনমালী ৫৪৮, ৫৫৩
বনমালী কবিরাজ ৫৪৮
বনমালী দাস ৫৫৩
বনমালী পণ্ডিত ৫৫১
বনিজ মুহম্মদ ৫২১
বয়নুদ্দীন ৪৬২
বরদামঙ্গল ৪২৪, ৪২৫
বররুচি ১৭৬, ১৭৭
বরাহ ৩৩৩
বরাহনগর ১২২
বরাহপুরাণ ৬
বরিশাল ৩৪
বরুণ ৬
বরেন্দ্র ৩৮৭, ৪৪০
বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী ১৪১, ৬১৭
বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২৫৫
বর্গী ৫৩২, ৫৩৩, ৫৪০
বর্ধমান ৫৭, ৬৪, ৯৪, ৯৫, ২৬৫, ৪০৪, ৪০৬, ৪১২-৪১৪, ৪২০-৪২২, ৪২৪, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৮৫, ৪৯৮, ৫২৬, ৫২৮, ৫৪০, ৫৪৪
বর্ধমান দাস ৪০৮
বর্ধমান বিভাগ ৮৬, ১১১
বর্ধমান সাহিত্য সভা ৬৯
বলখ ৪৬৭
বলভদ্রাচার্য ৫৫১
বলরাম ৩৯, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৭৯, ৪০৮, ৫৪৮, ৫৫২

বলরাম কবিশেখর ১৭৬, ১৭৭
বলরাম চক্রবর্তী ৪১০ ৪১২, ৪১৩
বলরাম দাস ৮৫-৮৭, ৯২, ১২৫, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
বলরাম দাস (উড়িয়া) ৫৪৯
বলরাম দেব ১১১
বলরাম মাণিক্য ২৫৪
বলরাম সেন ৫৪৯
বলরাম হাতী ৫৪৯
বলশর হাফী ৩৭৬
বলাই সরকার ৫২৭
বলি ৩৬৩
বল্লভ ২, ৮, ৩৭, ৯৮, ৫৮৬
বল্লভাচার্য ৩, ১০, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৮৫
বল্লভ গোস্বামী ৩১
বল্লভ ঘোষ ৪০৮
বল্লভ দাস ৮৬, ৮৭, ৯৭, ৯৮
বল্লভ দেব ৭
বল্লভ সেন ৫৪৯, ৫৫১
বল্লাল চরিত ৫৩০
বল্লাল সেন ১২০, ৪৬৮
বল্লুকা ৩৮৭, ৩৯১
বশিরহাট ১১৮, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৯১
বশিষ্ঠ ৬, ১২৮
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪০, ১৫২,
বসন্তকুমার ভট্টাচার্য ৬১৪, ৬১৬, ৬১৭
বসন্ত রায় ৮৭, ৯৭
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ৪০৫
বসু রামানন্দ ৩০
বসুধা ৩৯, ৫৮, ৮৪
বসোরা ২৯৬
বহরাম ১০৪
বাইবেল ১৮৮, ৩০১
বাইশকবির মনসামঙ্গল ১৪৫, ৪০২, ৪০৮
বাউল ৮, ৯, ১৬, ৫৭, ৮২, ৮৫, ১০৯, ১১৫, ৩০৪, ৪২৭, ৪৫৪, ৫৭৩, ৫৮৭
বাউল মত ৮, ৯, ১১, ১৭, ২৬
বাউল সম্প্রদায় ১১২
বাউল সহজিয়া ৯
বাগীশ্বরী ৩৮৬
বাঙলা ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৯, ২০, ৫৯, ৯০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১৬৫, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮, ১৮৯, ১৯৭, ২০৭, ২২১, ২৬৩, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৮২, ২৯৫, ২৯৬, ৩০০, ৩০১, ৩২৭, ৩২৯, ৩৮৭, ৪০১, ৪০৫, ৪০৬, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৯, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫৩, ৪৬৭, ৪৭৩-৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৮, ৫০৩, ৫০৭, ৫২৪, ৫২৭, ৫৩৩, ৫৪০, ৫৪৭, ৫৭০, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৮৬, ৫৯০, ৬০১, ৬১১
বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ২৮৪
বাংলা একাডেমী ১৩, ২১৯, ২৩৯, ২৭৮, ৩১৫, ৩৪৩, ৩৬০
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১০০, ১১৩, ১৯৮, ২৫৮, ২৬০, ২৬৪, ২৮৪, ৩৩৫, ৪৪৪, ৫৩৬
বাঙলাদেশ ২, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২৬-২৮, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ১১১, ১২০, ১২৯, ১৭৭, ২৩৫, ২৮২, ৩০০-৩০২, ৩০৪, ৩১৫, ৩২২, ৩৫৩, ৩৫৯, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৭৪, ৪৮১, ৪৮৬, ৪৯৩, ৫৬৯, ৫৭২, ৫৮৪, ৫৮৬, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯৩, ৫৯৪, ৬০২, ৬০৫, ৬০৬, ৬১১, ৬২৯
বাঙলাভাষা ৮৬, ২০৭, ২১৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৯, ২৫১, ২৫২, ৩১৪, ৩১৭, ৩৪০, ৩৮৬, ৪০১, ৪০৮, ৪১৪, ৪১৫, ৪২৭, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৬৭, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৬-৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৮, ৪৯২, ৫১৭, ৫১৮, ৫৭২
'বাংলা পুঁথির তালিকা' ৬১৭
বাঙলাবন্দর ৬০৫
'বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' ১৭৭, ৩২৭, ৩৮৭, ৩৯৯, ৪০২, ৪০৮, ৪১২, ৪৩১

'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দি পটভূমি' ১৭১, ২০০
'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' ১৯১
বাঙলা সাহিত্য ১, ১১২, ১১৫, ১৭০, ১৯৬-১৯৮, ২০৭, ২৪২, ২৭৬, ২৭৭, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮৩, ৫৮৩, ৫৯০
বাঙলা সাহিত্য সমিতি (চট্টগ্রাম) ৬৩০
'বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী' ১৬৫, ২৪৯
'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ৭৮, ১৬১, ৫২৬, ৫৪১
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১৭, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯০, ১২১, ১২২, ১৩৩, ১৩৮, ১৫২, ১৫৩, ১৬০, ২০৫, ২৮২, ৩৫৮, ৫৪০, ৬১৩
'বাংলা সাহিত্যের কথা' ৩৫৮, ৪১১, ৪৬৭
'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' ২০৫
'বাংলা সাহিত্যের প্রতিপোষক' ২৬৪
'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর' ১১৭, ১১৯, ৬০৬
'বাঙলার নবজাগৃতি' ৩, ১৭, ৬১৩
'বাংলার বাউল ও বাউল গান' ১৭, ৬১৫
'বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস' ৬১৩
'বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' ৩৫৮
বাঙালী ১১, ১৩, ১৮, ৩৩, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১৩৯, ১৬৫, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৭, ২৮২, ২৯৯, ৩০৩, ৩৫৯, ৩৮৬, ৩৮৭, ৪১৪, ৪১৫, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৮-৪৪০, ৪৫২-৪৫৪, ৪৫৫, ৪৭৮-৪৮১, ৪৮৮, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৭, ৫৩২, ৫৩৪, ৫৬৫, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৭, ৫৯০, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৯-৬০২, ৬০৪-৬০৮, ৬১০, ৬১১, ৬১৩
'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' ৩১৫, ৬২০
বাঙ্গালীর ইতিহাস ৩০৪, ৬১৬, ৬১৭
বাঙ্গালা শহর ৬০৬, ৬০৭, ৬১১
বাঁকুড়া ১৩৪
বাঁকুড়া রায় ২৯৩, ৩৯৩
বাঁশখালি ৭৩, ২৪৭, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ৩২০, ৪০৮, ৬২০
বাকলা ৩৪, ১১৬, ১১৮, ১১৯
বাকাবিল্লাহ ১৫, ১৭, ৩০৩, ৪৫৬
বাকের আলী চৌধুরী ২৫৮-২৬০
বাজসনেয়ি সংহিতা ১০৯
বাজ বাহাদুর ও রূপমতী ৫৬৯
বাড়বকুণ্ড ১৮৭
বাণভট্ট ১৩৮
বাণীনাথ ৫৪৯, ৫৫১
বাণীনাথ পট্টনায়ক ৫৫১
বাণীনাথ বসু ৫৫১
বাণীবিলাস ৬৫
বাণীরাম ১১১
বাণীরাম ধর (দাস) ২৬৬, ২৭১
বানু হোসেন-বাহরাম গোর ১০২, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮
বাবা আদম কাহিনী ৪৫৮, ৪৬৮
বাবা রামদাস ৫৭০
বাবুর (সম্রাট) ২১৫, ৫৬৯, ৬০১
বায়ু ৬
বায়ুপুরাণ ৬, ১২৮
বায়েজীদ বিস্তামী ১৭, ৩৭৬, ৪৭৩
বার্নিয়ার ৫৮৬
'বাবু মিঞার আলাপ' ৫২১
বারবোসা ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০১, ৬০৬, ৬০৭, ৬১১
বারভুঁইয়া ৪৩৬
বারমাসী সাহিত্য ১৯১, ১৯৪, ২০২, ২৯৫
বারা খান ৪০৫
বারাসত ৪৬৮, ৪৭৩
বারৈয়াঢালা ১৮৭
বার্থেমা ৬০৭
বার্মা ১৯৪-১৯৮, ৩৮৩
বালক ফকির ৯৯, ৩০৫, ৩৩২, ৩৪৭
বালাণ্ডা ১৪৩, ১৪৪, ৩৯১, ৪৬৮

বালি ৩৬৪
বাল্মীকি ১২৮-১৩০
বাল্মীকি রামায়ণ ১২৬-১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৬০
বাল্যলীলাসূত্র ৩৯, ৮০, ৮১
বাসনামঞ্জরী ৬০৯
বাসপিউ (কলিমা শাহ) ১৯৫
বাসবদত্তা ১৬৫
বাসুকী ২৪২
বাসুদেব ১০৯, ১২৭
বাসুদেব ঘোষ ৩০, ৮৬, ৮৭, ৯১, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫২
বাসুদেব তীর্থ ৫৫০
বাসুদেব দত্ত ৩১, ৪৭, ১১১, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১
বাসুদেব সার্বভৌম ৩৪, ৪০, ৮৪
বাসুলী ৭৯, ১১৫, ১১৬, ৩৮৬-৩৮৮, ৩৯৫, ৫৮৪, ৬১৩
বাসুলী মঙ্গল ৩৮৮, ৪২৫
বাস্তদেবী-বাস্তবিবি ৩০৪, ৪৪০, ৪৮৯, ৬০২
বাহমনী রাজ্য ১৬৬, ২৭৪
বাহরাম খান ২৮৯
বাহাদুর শাহ (প্রথম) ৫৬৯
বাহার দানেশ ৫১৭
বাহারিস্তানগয়বী ৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৪
বাহারে আফছোছ ৫২১
বিকল চট্টোপাধ্যায় ৪৪১, ৪৪৩
বিক্রমশীলা ৫৯০
বিক্রমাদিত্য ১৬৮, ৫০৯
বিচার সুধার্নব ৫৫০
বিজনানন্দ পুরী ৫৫০
বিজয় গুপ্ত ২, ৯, ৭০, ৫৯৫, ৬০৭, ৬১০, ৬১৪-৬১৭
বিজয় ঠাকুর ৪৪১
বিজয় দাস ৫৫৩
বিজয়নন্দন আচার্য ৫৪৮
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ২৫০
বিজয় পণ্ডিত ১৪০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭
বিজয়রাম সেন ৪২৬
বিজাপুর ১৬৬, ১৬৮, ১৭৩, ২৩৫, ২৭৪
বিদর ১৬৬, ২৩৫, ২৭৪
বিদগ্ধমাধব ৩৫, ৯৭
বিদুর ১২৭, ১৩৯
বিদ্যাধর ৪০২
বিদ্যানন্দ সরস্বতী ৫৪৯, ৫৫১
বিদ্যাপতি ১১, ৩০, ৮৬-৮৮, ৯০, ৯৪, ৯৬-৯৮, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৫, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৮০, ৪৮৫
বিদ্যাবাচস্পতি ৬৫
বিদ্যাবিদ আচার্য ৫৪৯
বিদ্যাভূষণ ৬৪
বিদ্যাসুন্দর ১৭৬-১৮০, ২৯৭, ৪১০-৪১৩, ৪১৬, ৪১৭, ৪৪১, ৪৫৫, ৪৭৯, ৪৮৪, ৫৮৯, ৫৯৮
'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান' ১৭৬, ১৭৭
বিধুর পণ্ডিত জাতক ১৩৮
বিনয় ঘোষ ৩, ৬১৩
বিপ্র চন্দ্রশেখর ৫৪৯
বিপ্র জগন্নাথ ৫৫১
বিপ্রদাস ২, ৪০৮
বিপ্রদাস ঘোষ ৯৮
বিপ্রদাস পিপিলাই ১৯, ৭০, ৩৯০, ৩৯১, ৪০৭, ৪৫৪, ৫৯০, ৬০৭, ৬১৪, ৬১৬
বিপ্রদাস সেন ৪৪১
বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত ৭৭
বিবর্তবিলাস ৭৯, ৮২
বিমানবিহারী মজুমদার ৪৯, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৮০, ৮১, ৮৬, ৮৭, ৯২-৯৫, ১১৯, ৫৩৬, ৬১৬
বিরাহিম ১৪৫, ১৪৬
বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৩৬
বিলালনামা ৩১
বিলাল হাবসী ৫৬৭
বিলাসমঞ্জরী ৮২
বিল্বমঙ্গল ৩১
বিশাখা ৬

বিশালাক্ষী ৩৮৬
বিশাখাপত্তম ২৭৮
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৩, ৮. ২১
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৮২. ৯৮
বিশ্বভারতী ১৪১, ২৮২, ৫৬০. ৬১৪
বিশ্বভারতী পত্রিকা ৮
বিশ্বম্ভর ২৯, ৪৬, ৫৮৬
বিশ্বরূপ ২৯, ৫৪৮
বিশ্বেশ্বর ৪১০, ৪১৩, ৪৪৩
বিশ্বেশ্বরপুরী ৫৪৮
বিষহরী ৪৩৮
বিষাদসিন্ধু ২৯৫
বিষালাক্ষী ৪৩৪
বিষ্ণাই হাজরা ৫৫২
বিষ্ণু ৬, ৮, ১০. ৩৭, ৬৫, ১২৮, ১২৯, ১৩৬, ৩৬৩, ৪৩৪, ৪৪২, ৪৯৮, ৫৫৭
বিষ্ণু দাস ৩৯, ৭৭, ৮১, ৪০৫, ৫৫২
বিষ্ণুদাস আচার্য ৫৪৮, ৫৫৩
বিষ্ণু দাস কবিরাজ ৪৪
বিষ্ণু ধর্মোত্তর ৫৫০
বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে ৫৭২
বিষ্ণু পাল ৪০৬, ৪০৭
বিষ্ণুপুর ৮৪, ১১৬, ৪৩১, ৫৪১
বিষ্ণুপুরী ৫৪৮
বিষ্ণুপুরাণ ৬. ৭. ১২৮, ১৩১, ৫৫০
বিষ্ণুপ্রিয়া ২৯, ৩১. ৫৯, ৯২, ১১৬, ৫৪৮
বিষ্ণুপ্রিয়া (পত্রিকা) ৭৭
বিষ্ণু-লক্ষী (বিষ্ণু-শ্রী) ৬, ২১, ১১০. ১২৭. ১২৯, ৫২২
বিষ্ণুস্বামী ৩
বিসমিল্লার বয়ান ১০৩
বিহার ৫৯, ৯০, ২০০, ২৩৪, ২৮৯, ৪০৫, ৪০৬, ৪৭৮, ৫২৮, ৫৫৪, ৫৮৬. ৫৯০
বিলহন ১৭৬, ১৭৭
বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) ১৮, ৩৭. ৩৯, ৪০, ৪২, ৫৮, ৫৯, ৬৮, ৭৮. ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৫, ১১৬, ৫৪৮, ৫৫২, ৫৫৩
বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা ৬৯. ৮২
বীরভুম ৩৯. ৪০৪, ৪০৬, ৪৪৩. ৫৪২
বীর হাম্বীর ৮৪. ৮৭. ৯৭. ১১৬. ১৩৪,
বীর সিংহ ১৩৪
বীরেশ্বর ৪২৪
বুজুর্গ উমেদ খান ১৪৬. ২৪৮, ৪৩৭, ৫৩৩
বুদ্ধ ৩
বুদ্ধচরিত ১৩১
বুদ্ধিমন্ত খান ৫৪৯, ৫৫১
বুরহানুদ্দিন ৩২৩
বুরহান উল্লাহ ৩৭৯, ৫০০
বুরহানুল আরেফীন ৯৯, ৩১৮-৩২০
বুলেহ শাহ ১৭
বৃটিশ মিউজিয়াম ৪৭৭
বৃত্তরত্নাকর ৬০৯
বৃন্দাবন ৩১, ৩৩-৩৬, ৪৭, ৬৮, ৮২. ৮৪. ৪২১, ৫৫২
বৃন্দাবন দাস ২০, ২৮, ২৯, ৩৩. ৩৯-৫০, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৯৪, ১১৫, ১৫৬, ৪২৯, ৫৪৭-৫৫০, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৮৯, ৬১০, ৬১৪
বৃষভানু ৬
বৃন্দাবন পরিক্রমা ৮৪
বৃন্দাবনলীলা ৬
বৃন্দাবন সম্প্রদায় ৩৭
বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র ৬৮
বৃহদ্ধর্মপুরাণ ১২৮, ৩২৭. ৩৮৭, ৪৪০
বৃহৎ নারদীয় পুরাণ ৬৮, ৪২২, ৪৩০, ৪৩২
বৃহৎ বামন ৫৫০
বৃহৎ বৈষ্ণব হিতৈষিণী ৬৫
বৃহৎ ভাগবতামৃত ৩৫, ১১৯
বৃহদারণ্যক ৬, ১০৯
বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ ৫৫০
বৃহস্পতি ৫৮৬
বেচারাম ৪৪১
বেণীসংহার ৭
বেতাল পঞ্চবিংশতি ২৯৮, ৪৭৭, ৫৬২

বেদ ৩. ১৩৬. ১৩৭. ৩৬১. ৩৬২. ৩৮৭. ৪২৬. ৪৮২. ৫০৪
বেদব্যাস ৬৮
বেদরাবাদ ২৫৪
বেদান্ত দর্শন. বেদান্ত তত্ত্ব ৮, ১৪. ৩৭. ৩০২. ৩০৩. ৫৮৭
'বেদার-আল-গাফিলিন' ৬৩০
বেনজীর বদর-ই-মুনীর ১০৩, ২৬২, ৩৩০
বেবর ১২৮. ২৭৪
বেরার ১৬৬. ২৩৫
বেরিলী ১০৫
বেলায়েত (কবি) ৪৮১, ৪৮৬
বেলায়েত হোসেন ৫১৪
বেহারোদন্ত ৫৪০
বেহুলা ৩৮৮, ৪০২, ৪০৫-৪০৭, ৪০৯, ৫২২
বেহুলা-লখীন্দর ৫১৮, ৫৯৯, ৬১৬
বৈজয়ন্তী দেবী ৫৯১
বৈদ্যনাথ ৪০৮, ৪২৭
বৈদ্যনাথ পরমানন্দ ১৬০
বৈদ্যনাথ মণ্ডল ৪৩২
বৈদ্যনাথ রায় ২৪৭, ২৪৮, ২৬৭
বৈদ্য পঞ্চানন ১৬০
বৈদ্য হরিদাস ৪০৮
বৈদ্য বনমালী দাস ৫৪৯
বৈরাগ্য, বৈরাগ্যবাদ ৮
বৈশম্পায়ন ১৩৭
বৈশ্য গঙ্গাদাস ৫৪৯
বৈষ্ণব ৬,-৯, ১৪, ১৫, ১৮-২১, ২৩-২৭, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৫৭, ৬৭, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ১০৯, ১১৫-১১৭, ১৩৬, ৫৪৭, ৫৮৬, ৫৯৬. ৬১০
বৈষ্ণব আন্দোলন ১০, ২৬, ৫৭২, ৫৭৩
বৈষ্ণবতত্ত্ব ৭, ৩৬
বৈষ্ণবতন্ত্র ৫৫০, ৫৪৭
বৈষ্ণবতোষিনী ৩৫. ৫৫০
বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন) ৮৬, ৯২, ৯৮, ১০২
বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণব মত ৩, ৯, ১০, ১৩, ১৪. ১৭. ১৮. ২০, ২৬. ৩৩. ৪৯. ৮২. ৮৪. ৮৬. ৯০. ১১১. ৪৫৫. ৪৭৯
বৈষ্ণব পদ. বৈষ্ণব পদাবলী ৫. ১৪. ২৩. ২৫. ২৬. ১৪৫. ৪১৬. ৫২৯. ৫৯৬. ৬০৩
'বৈষ্ণব বন্দনা' ১৬১, ৫৪৮
'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' ৯৯, ১০৫
বৈষ্ণব সমাজ ১৯. ৩৩. ৩৫-৩৭. ৩৯. ৪৮, ৫০, ৫৮, ৫৪৬, ৬০২
বৈষ্ণব সহজিয়া ৮, ১৮, ২৬, ৫৭. ৬৫. ৮২. ৮৫, ৪২৭, ৫৪৫
বৈষ্ণব সাহিত্য ১. ২৬. ৯৪. ১১২. ১১৪
বৈষ্ণবাচার দর্পণ ৫৯
বোখারা (বুখারা) ১৯৭
বোধিসত্ত্ব ৩৬০
বোম্বাই ১, ১৯০
বোয়ালখালি ১৭৪. ২৭১
বোলন ১০৪
বৌদ্ধ ১৩৯, ১৯৬-১৯৮, ২৫১, ৩০৩. ৩০৪, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৫৫, ৪৫৬, ৫৮৬, ৫৯০, ৫৯৩-৫৯৬, ৫৯৯, ৬০৮
বৌদ্ধ জাতক ১৩৭
বৌদ্ধ ধর্ম ১৯৭, ৪৫৩, ৪৭৪. ৬০১
বৌদ্ধ দর্শন ৩০২, ৩০৩
বৌদ্ধ যুগ ১৬৮, ৪২১, ৪৩৪, ৫৯০
বৌদ্ধ সহজিয়া ৮, ৯, ৮৫, ১১৫
বৌদ্ধ-হিন্দু ৪৫৪
ব্যাস (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন) ২, ১২৭, ১২৮, ১৩৬-১৩৯, ১৬০, ৪১৬, ৪১৭
ব্রজবুলি ২৬, ৭৯, ৮৮, ৮৯, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১৯৩, ২০২, ৪৮১, ৪৮৫
ব্রজভাষা (ব্রজভাখা) ৮৮, ২০৭, ২৩৪
ব্রজমোহন দাস ২৮, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৭৭, ৫৪৫-৫৪৮, ৫৫০, ৫৫৩
ব্রজমোহন রায় ৫২৯
ব্রজমোহন সান্যাল ৮০
ব্রজলাল সেন ১১১
ব্রজসুন্দর ১৬০
ব্রজসুন্দর সান্যাল ১০০, ১০৫
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৬, ১৭৭

ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ৬, ৮, ১০, ২৩, ১২৮, ৩৩৮, ৩৬৩, ৪২৬, ৫৩২
ব্রহ্মপুত্র ৪৪৩
ব্রহ্মপুরাণ ৬৮, ৪৩২
ব্রহ্মবাদ ১৪, ৩০৩
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৭, ৬৪, ৩৮৭, ৪২২, ৫৫০
ব্রহ্ম সংহিতা ৩৬, ৬৪, ৫৫০
ব্রহ্মসম্বাদ ৫৫০
ব্রহ্মসংহিতাতন্ত্র ৫৫০
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩৮
ব্রহ্মানন্দপুরী ৫৪৮, ৫৫০
ব্রহ্মানন্দ ভারতী ৫৫০, ৫৫১
ব্রাহ্মমত (ব্রাহ্মধর্ম) ১৯, ১৯
ব্রাহ্মণ (উপনিষদ) ৭, ১০৯
ব্রাহ্মণ্যধর্ম ৯, ১০, ১৯, ৩৭, ১১৫, ১৯৭, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮৬, ৪৫৩-৪৫৫, ৪৭৪, ৬০১
ব্রাহ্মণ্যবাদী ৮, ১০, ১৯, ৫৯৬
ব্রাহ্মণ্য সমাজ ২, ১৯, ২৭, ৪৩৪
ব্রিটিশ সরকার ৫৩৯
ব্রুমহার্ট ৪৮৩
ভক্ত-ভগবান ২৬
ভক্তরাম দাস ১১১
ভক্তি কল্প বৃক্ষ মূল রূপ
ভক্তিবাদ (ভক্তিতত্ত্ব) ভক্তিমার্গ, ভক্তিধর্ম ২, ৩, ৫-৯, ১১, ১৬-২০, ২৬, ৩২, ৩৭, ৬৭, ১২০, ১২৮, ১২৯, ২৬৭
ভক্তিভাব প্রদীপ ৫৫৩
ভক্তি রত্নাকর ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৮২, ৮৪, ৯২, ৯৫
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৩৫, ৩৬
'ভক্তিসূত্র' ৬
ভগবদগীতা ৫৫০
ভগবদ্ভক্তিবিলাস ৩৬
ভগবদামৃত ৫৫০
ভগবান ৫৫১
ভগবান পণ্ডিত ৫৫১
ভগবানাচার্য ৫৫১
ভজন ৫২৩, ৫৭০
ভট্টনায়ক ৫৪৯
ভট্টনারায়ণ ৭
ভট্টি কাব্য ১৩১
ভদ্রা ৬
ভবতোষ দত্ত ৫২৬
ভব-ভবানী ৪২৬
ভবানন্দ ৫৫১
ভবানন্দ তনু ৫৭৫, ৫৭৬
ভবানন্দ মজুমদার ৪১৭
ভবানী ৪১০
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রমথনাথ শর্মা) ৪৭৭
ভবানী দাস ১৫৫, ৩৮৭
ভবানী বণিক (বেনে) ৫২৫-৫২৭
ভবানী পাঠক ৫৪২
ভবানীশঙ্কর দাস ৩৯৯
ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২
ভবিষ্যপুরাণ ২৫, ৬৪, ৫৫০
ভরত ১৩৭
ভরষ্টার ৪৭৭
ভাগবত ৬, ৭, ১১, ২৬, ৩৫, ৩৬, ৪৭, ৫০, ৬৪, ৮২, ১১৫, ১২০, ১২২, ১২৮, ১৩২, ১৪০, ১৬০, ৩০১, ৩৫৩, ৩৬৩, ৪০২, ৪৩১, ৫৪৭, ৫৫০
ভাগবত মত ৯
ভাগবত পুরাণ ৩৮৭
ভাগবতাচার্য ৫৫১, ৫৫৩
ভাগবতাচার্য পরমানন্দ ৫৪৯
ভাগীরথী ২৪২, ৪৩৬, ৪৮৫,
ভাটিয়ালি ৫৭৩
ভাঁড়ু দত্ত ৩৮৮, ৩৯৪, ৩৯৬
ভাগলপুর ৬০৪
ভাতৃবিলাপ ৫৫৪, ৫৫৫
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৪৮১
ভানু দত্ত ৪১৬
ভাববাদ ৮,
ভাবমালা ৮৪
ভাব-লাভ ২৬৫
ভাবার্থসূচক চম্পু ৩৬

ভারত ২, ৭-৯, ১২, ১৬, ২৬, ৩৭, ১৯০, ২৩৫, ২৩৬, ২৬৭, ২৭৪, ৩০৪, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩৭, ৫৮৪-৫৮৬, ৬০৭
'ভারতকথা' ১৪৫
ভারতচন্দ্র (রায়গুণাকর) ৭০, ১১৮, ১৩৪, ১৭৭, ১৮৩, ১৮৪, ২০৭, ২৮৩, ৩২৭, ৩৯১, ৩৯৭, ৪১০, ৪১২-৪২১, ৪২৭-৪২৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৮, ৫২৯, ৫৩১, ৫৪০, ৫৮৮, ৬১৬
'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' ১৭৬, ১৭৭
ভারতচন্দ্রের মানসিংহ খণ্ড ৪১৬, ৪১৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৮৪
ভারত দর্শনসার ৫, ১৭
ভারত পাঁচালী ৫২২
ভারতবর্ষ ৯, ১৫, ১২৯, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ২৩৭, ৩০৩, ৩০৪, ৩৫৩, ৪৫৬, ৫৬৭-৫৭০, ৫৭২, ৫৮৭
ভারতবর্ষ (পত্রিকা) ৬
'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ১৩৮
'ভারতী মঙ্গল' ৪২৪
'ভারতীয় দর্শন' ৬১৩
ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ৮
'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' ৫৬৯
ভার্গব ১৩১
ভারামল ৪০৫
ভাস্কর ২, ৮, ৩৭, ৪০৮, ৫৮৬
ভাস্কর পণ্ডিত ৪১৪, ৫৩২
ভিক্টোরিয়া (রানী) ১০৭, ২৬৬, ৪৩৮
ভিকন ২০৩
ভীম ১৩৭, ১৩৯
ভীমদাস মালাকার ৫২৫
ভীষ্ম ১২৭
ভুঁইয়া ৪৩৬
ভুজঙ্গধর ৪২৭
ভুবনেশ্বরী ৩৮৬
ভুরশুট পরগনা (ভূরিশিট) ১৭৩, ৪১৩, ৪১৪, ৪২০, ৪৯২
ভুলুয়া ১৩৪, ৩৩০
ভূতনাথ ৪২৭
ভূষণা ৪৩৬
.ভূপেন চক্রবর্তী ৩৪৩
ভৃগু ১৩১
ভেডডিড ৪৫৪, ৫৮৪
ভেদাভেদবাদ ৮
ভৈরব ৪২৭
ভৈরব ঘটক ৪৪১
ভৈরবী ২৬৫, ৩৮৬
ভোজপুরী ২৩৪
ভোজ রাজা ১৬৮, ৫০৯
ভোলানাথ ৪২৭
ভোলা ময়রা ৫২৫-৫২৭
মইজদ্দিন ১৫
মউজ-ই-মুসকি ৫৭১, ৫৭২
মওতনামা ৩৩৫
মওলানা মুহম্মদ ফরাগলী ১৪৪
মক্কা ১৯৭, ২৭৪, ৪৪২, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৪, ৫৬৭
মকবুল হোসেন ১৪৫, ১৯০, ২৭৪, ২৮৫, ২৯০-২৯২, ২৯৮, ২৯৯, ৩৩৬, ৩৫৩, ৩৫৭, ৫৩৫
মগধ ১৯৭, ১৯৮, ৪৩৪, ৪৩৫
মগধ সাম্রাজ্য ৪৩৫
মঘ ১৯৬-১৯৮, ২২৯, ৪০৩, ৬০৯, ৬২৫
মঘবাজার (ঢাকা) ১৯৮
মঘ-হার্মাদ ৪৩৭, ৪৩৯
মঘা শাস্ত্র ৫৯৩
মঘী সন ১৯৮, ২৮৩
মঙ্খ্রী (আলি খান) ১৯৫
মঙ্গলকাব্য ১৩১, ১৪৫, ২৩২, ২৪৬, ৪১৭, ৪২৭, ৪২৯, ৪৮৮, ৫৩২, ৫৮৭, ৬০৬
মঙ্গলচণ্ডী ১১৫, ৩৮৭, ৩৯৫
'মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী' ৪১৩
মঙ্গল চাঁদ ৬১৭
মঙ্গল পাঁচালী ৩৮৮, ৩৯০, ৪১০, ৪২৭, ৪৩০
মঙ্গোল ১৯৮, ৪৩৪, ৪৫৪, ৫৮৪

মছন জাত ১০৪. ১০৬
মছন্দর-মছলন্দী ৪৮৯
মছলন্দী পীর ৪৫৪, ৪৬৫
মছলন্দীর গীতি ৪৬৫
মজদকী (দর্শন) ৪৫৫
মজনু শাহ ৫৪২
'মজনুর কবিতা' ৫৪২
মজমু-অল-বাহরাইন ৫৮৫, ৫৮৬
মজমুয়ে ফহতুশাম ২৯৬, ৪৯৮, ৫০২
মজলিস কুতুব ৪৩৬
মজলিস সিরাজ ২৫৪
মঞ্জরীতত্ত্ব ৮২
'মণক বা গণক' ৫৭০
মণিপুর ৫৩৯
মণি হোড় ৫৪৯
মণীন্দ্রমোহন বসু ১৪০, ১৫২
মণ্ডু খাঁ ৫৭৫
মৎস্য (পুরাণ) ৬, ২৫, ১২৮
মতিউল্লাহ ২৫৬, ২৫৭
মতিরাম ১৩৩
মতিলাল ঘোষ ৭৭
মথুরা ৩১, ৫৪৯
মথুরা মহিমা ৩৫
মথুরেশ ৪৪১
মদন-কামদেব পালা ৪৪৩, ৪৪৫-৪৪৮, ৪৫২, ৪৮৯, ৪৯০
'মদন কুমার-মধুমালা' ১৭৫
মদন দত্ত ১৭৭, ৪১০, ৪১৩
'মদন পালা' ৪৭২, ৫৪১
মদনমোহন ৫৪১
মদনমোহন গোস্বামী (ডক্টর) ৩২৭
মদনসুন্দর পালা ৪৪৪, ৪৪৫
মদীনা ২, ১০, ১৯৭. ২৭৪, ২৭৫
মধু কান ৫২৮
মধু কৈটব ৩৮৭
মধু পণ্ডিত ৫৪৯
মধুমালৎ ১৬৪, ২১৫, ২৩৪
মধুমালতী ১৬৬-১৭৫, ২০০, ৪৪৫, ৪৮৮, ৪৯২, ৪৯৩, ৬১৫
'মধুমালতী উপাখ্যান' ১৭১
'মধুমালা কেচ্ছা' ১৭৪
মধুসূদন (মাইকেল) ২, ১৮৩, ১৮৪, ২৬৩, ৪৭৫,
মধুসূদন ৪০৮, ৪৪১
মধুসূদন চক্রবর্তী (কবীন্দ্র) ১৭৭, ৪১০, ৪১৩
মধুসূদন বাচস্পতি ৩৫
মধ্য এশিয়া ২৩৬, ৬০৫
মধ্য প্রদেশ ২০০
মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ১৬৫
'মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ' ৫৫৫, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৭
'মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী' ৬০৫, ৬১৫
মধ্যযুগের রাগতাল গ্রন্থ ১৪৫
'মধ্যযুগের রাসতালনামা' ৫৭৫
'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' ২৯৯, ৩০০, ৬৩০
'মধ্যযুগের সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' ৬৯, ৭৮, ৯৫, ৯৭, ১৫৬
মধ্ব২, ৮, ৩৭, ১২৯, ৪০৮, ৫৮৬
মধ্ব সম্প্রদায় ১২০
মনওয়ার আলী ৫১৩
মনঝন ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ২১৫
মনবুদ্ধিসম্বাদ ৫৫০
মনসা ১১২, ১১৫, ১১৬, ২৮২, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯১, ৪০২-৪০৪, ৪০৬, ৪০৯, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৭৯, ৬০২, ৬১৩
মনসা পুরাণ ৪০৬
মনসা বিজয় ৬১৫
মনসার ভাসান ১১১, ১৩৪, ২৮২, ৪০২, ৪০৩
মনসামঙ্গল ১৫৪, ৩৯১, ৪০১-৪১০, ৪২৪, ৪২৭, ৪৬৫, ৬১৪, ৬১৫
মনসুর ১৭
মনসুর বয়াতি ৫৮১
মনসুর হাল্লাজ ৪৭৩, ৪৮১, ৫১৫
মনিরুদ্দিন ৪৮০, ৪৮৫, ৫০৮, ৫২০
মনীর-মাহারুসুন্দরী ৫০৮

'মনীষা মঞ্জুষা' ৫৫৭
মনুচেহের-মাসুমা পরী ২৫৯
'মনুচেহেরে কেচ্ছা' ২৫৯
মনুলাল মিশ্র ৫২৬
মনোমোহন বসু ৫২৬, ৫২৯
মনোহর ৪০২, ৫৯১
মনোহর দাস ৩৬, ৪৬, ৮২, ৮৪, ৫৫২
মনোহর-মধুমালতী ১১১, ১৬৬-১৬৮, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৬, ২৭১, ৪৫৭, ৬১৬
মনোহর শাহ ১০০, ১০৪
মনোহরশাহী কীর্তন ৮৪, ৫৭০, ৬০৩
মনোহর সেন ১৩২
মন্ত্র ৪৩৮
মন্ত্রযানী বৌদ্ধ ৪৩৮
মফিজুদ্দিন ৪৭৩
'মফিদুল ইসলাম' ৫২১
মফীদুল মুমেনীন ৩৩৫
মমতাজুর রহমান তরফদার (ডক্টর) ১৭১, ১৭২, ২০০, ২০১, ৬১৭
ময়নামতী ৫২২, ৫৯১, ৬১৬
ময়নামতীর গান ২৮২
ময়মনসিংহ ১১২, ৪০৩, ৪২৩, ৫৪২
ময়মনসিংহ গীতিকা ১৩৩, ৪১১, ৪৭৯, ৫৩১, ৫৪০
ময়মনসিংহের ইতিহাস ৫৩২
ময়েন জো দারো ৪২৬
মরদন ১৯৬-১৯৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ৬১৪
মরমীয়াবাদ ১৩, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৪৫৬
মর্কট বল্লভ ১০৯, ১১৩
মর্সিয়া ৪৮৬, ৫৪৪
মর্সিয়া সাহিত্য ১৬৬, ২৭৪
মলঙ্গা সরকার ৫২২, ২৯৫
মলয়া-মাহমুদ ১০৭, ২৫৯, ২৬৫, ২৬৬, ৩৩২
মলুয়া
মল্লভূম ৪০৬, ৪৩১
মল্লিকার সওয়াল ১৩, ১০৭
মল্লিকাআকারবিবির পুথি ৫০৪
মসনবী ১১৮, ১৭১, ১৭২, ৫১৫
মসলিন ৬১১,
মসলিপত্তম ২৭৯
মসনবী খইয়াবান ২৪৯
মহতোইঙ্গ সন্দঅয় ১৯৬
মহফিল
মহররম ৪৮৬, ৫৪৪
মহম্মদ রাজা খান ৫৭১
মহরম শরীফ কাব্য ২৯৫
'মহাকাব্যের লক্ষণ' ১৩৮
মহাজন পদাবলী ৮৬
মহাদেব ১২৮, ৪২৭
মহাবংশাবলী ১১৪
মহাবীর ২
মহাভাগবত ৬৪
মহাভারত ৬, ২১, ৬৮, ১০৯, ১১১, ১১৫, ১২১, ১৩৬-১৬১, ১৬৪, ১৯২, ১৯৩, ২৫২, ২৮২, ৩০৯, ৩৫৩, ৩৬৩, ৩৯১, ৪৩১, ৪৮২, ৫৮৭, ৫৯০, ৬০৭
মহাভাষ্য ১৩৭
মহামদ ৩৮৮
মহামায়া ৩৮৯
মহাযান ৮
মহাযানী বৌদ্ধ ৪৩৮
মহারাজ নন্দকুমার ৫৪১
মহারাষ্ট্র পুরাণ (ভাস্কর পরাভব) ৫৩১, ৫৩২
মহাস্থানগড় ৪৬৭
মহিউদ্দিন ওস্তাগর ৪৬৬
মহিষমর্দিনী ৩৮৭
মহিষাসুর ৩৮৭
মহীনাথ শর্মা ১৬০
মহেন্দ্র ১৬০
মহেশচন্দ্র দাস চৌধুরী ১১১, ২৬৬, ২৬৭, ২৭১, ২৭২
মহেশচন্দ্র মিত্র ১৮৯
মহেশ পণ্ডিত ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫২
মহুয়া ৫৭৯
মলুয়া ও কেনারাম দস্যু ১৩৪
মা মঘিনী ৫৯৪, ৬০৯

মাওলানা এস, এম আবদুল আলীম ৩৪৭
মাগন ঠাকুর (কোরেশী মাগন) ১৯৭, ১৯৮, ২০৩-২০৫, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৩, ২২৪, ৫৯৩
মাগাজী ১৬৬, ২৭৩, ৩৬১, ৩৭৮
মাঘের শিশুপাল বধের টিকা ৭
মাতঙ্গী ৩৮৬
মাদারী, মাদারিয়া ৮৩, ৮৫, ৩০৩
মাদ্র ২৬৭
মাদ্রাজ ১, ২৭
মাধব ৬৪, ৭০, ৫৫১, ৫৫২
মাধব আচার্য ৪৫৯, ৫৫১
মাধন ঘোষ ৩০, ৮৬, ৯১, ৫৫২
মাধব চরিত ১২৪
মাধবচন্দ্র ১৬০
মাধব নায়ক ভট্ট ৫৪৯
মাধব পণ্ডিত ৫৫৩
মাধব ভাট ৪৮৪
মাধব ময়রা ৫২৫
মাধব মিশ্র ৪১
মাধবাচার্য ৩, ৮৭, ১২৪, ৪২৪, ৫৫২
মাধবানন্দ ১০৯, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১, ৪২৪
মাধবানন্দ ঘোষ ৫৪৮, ৫৪৯
'মাধবানল কাম কন্দলা' ৫৭০
মাধবী ১৩৩, ৫৫১
মাধবেন্দ্রপুরী ৯, ২৯, ৩৭, ৬৫, ৭৮, ৭৯, ১১৫, ১১৬, ১২০, ৫৬৯
মাধো দাস ১৭১
মানসিংহ তনবার ৫৬৯, ৫৭০
মানভূম ৪০৫
মানসিংহ ৩৬, ৩৯২, ৩৯৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪৮৪
'মানকৌতুহল' ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২
'মানিকচন্দ্র রাজার গান' ৬১৫
মানিক দত্ত ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১
মানিক দাস ১০৫
মানিক পীর ৪৫৪, ৪৫৭, ৪৬৩, ৪৬৪
'মানিক পীরের গান' ৪৬৪, ৫১৮
মানিকরাম গাঙ্গুলী ৪২২, ৬০৪
মান্দারনী ৬০৩
মানী (দর্শন) ৩০২, ৪৫৫
মায়বন ২৫,
মায়বন-নাপ্পিনাই ৮৫
মায়াবাদ ২, ৮, ১০, ১১, ৬০২
মায়া-ব্রহ্ম ২১
মারওয়ান ইবনে হাকাম ১৮৮
মারফততত্ত্ব ৩০২, ৪৮৯
মারাঠা ৪১৪, ৪৩৭
মারুফ করখী ৩০৩, ৪৫৬
মার্কণ্ডেয় ১৩১
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মাহাত্ম্য ১১১
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৮৭
মার্কোপলো ৬০৭
মার্টিন লুথার ২৮
মার্সম্যান ৪৭৭
মালঝাঁপ ৩৩৬, ৩৩৭
মালঞ্চকন্যা ৫০৫
মালতী-মনোহর ১৭৪
মালদহ ৪০৬
মালাক্কা ৬০১, ৬০৭
মালাধর বসু (গুণরাজ খান) ২, ১৯, ৯১, ১২০, ১৩২, ১৪০, ২৮২, ৪২৪, ৫৪৪
মালিক ইজ্জুদীন এহিয়া ২৮৯
মালিক বিন ধোবায়ের ৫৬৭
মালিক মুহম্মদ জায়সী ১৬৮, ২১৫-২১৮
মালিকার হাজার সওয়াল বা ফক্করনামা ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৯, ৩৫৬, ৫১৯
মালিনী ৫৪৮
মালে মুহম্মদ ২১৯, ২৩৬-২৩৮, ৩৩৫, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৯৬, ৫৪৪
মালেকাবানু-মনু মিয়া গাথা ৫৩৩, ৬১৮
মালোয়ার ৫৬৯, ৫৯১
মাসিক গৃহস্থ ১৮২
মাসিক মোহাম্মদী (পত্রিকা) ৩৫৮
মাসুদী খোর্দাদবেহ ৬০৭
মাহমুদ শরীফ ৩৯২
মাহমুদাবাদ ১৮৬

মাহবুব উল আলম ১৫০, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৯৫
মাহি আসোয়ার ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ২৮৯, ২৯০, ৪৬৭
মাহুয়ান ৫৯০, ৫৯৩, ৬০১, ৬০৭, ৬১১
মাহেশ্বরী ৩৮৭
মিত্র ১০৯
মিথিলা ২৮, ১০৭, ৫৮৯
মিনা খান ১৪৫-১৪৭, ১৮৬, ২৮৯, ২৯০, ৩৫৫
'মিফতাউস সরুর' ৫৭০
মিয়া সাধন ২০০, ২০১, ২১৫
মির্জা ফকীরুল্লাহ ৫৭১
মির্জা রওশন জামী ৫৭১
মিশর ২৯৬, ৪৫৫, ৫৮৪
মিশ্র কবিরাজ ৫৪৯
মিশ্রভাষা ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৮
মিশ্ররীতি ৪৫২, ৪৫৩, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৪
'মিসর রাজকুমার আবদুল আজীম' ২৫৯, ২৬২
'মিসরী জামাল' ১৬, ২৫০, ২৫১, ২৫৮
মীত সেন ৫৫০
মীনকেতন ৫৫২
মীননাথ ৪৬৪
মীনা ৫৬৭
'মীর ও মা' ১৭২, ১৭৩
মীর আসকারী ১৭১-১৭৩
মীর আহমদ ৫৭১
মীর কাসেম আলী খান ৪৩৭, ৫৩১, ৫৪১, ৫৫৪
মীর জাফর আলী খান ৪৩৭, ৪৯০, ৫৪১, ৫৮৭
মীরজুমলা ১৯০, ২৭৯
মীর মশাররফ হোসেন ২৯৫, ৪৮৩
মীর মুহম্মদ সফী ২৪৩, ৩০৪-৩০৮, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫৫
মীর শাহ মনোহর ৫২২
মীর হাসান দেহলবী ২৬২
'মীরাতুল খিয়ান' ৫৭১
মীরাবাঈ ২, ১১১, ৫৭০
মীরেরসরাই ১০৭, ১৬৯, ১৮৭, ২৮৪, ৫১১, ৫১৭, ৫৩৯
মীর্জা কাঙালী ১০৫
মীর্জা ফকীরুল্লাহ ৫৭০
মীর্জা মুহম্মদ কাসেম কাসেমী গুণাবাদী ১৯০
মীর্জা সোলতান আহমদ ১৮৯
মীর্যা নাথান ১৯৪, ৬০৪
মুকুল ওরফে মঙ্গল ২৪৬, ৩৫৬
মুক্তারাম দাস ৪৪১, ৪৪৩
মুক্তারাম সেন ১০৯, ১১১, ৩৯৮, ৩৯৯
মুকুন্দ ২৯, ৩৪, ৩৮, ৬৮, ৮২, ১১১, ১১৮, ৪৩৬, ৫৪৮, ৫৫২
মুকুন্দ কবিরাজ ৫৪৯
মুকুন্দ কর্মকার ৭৭
মুকুন্দ চক্রবর্তী ৬৯
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ) ১৫৬, ২০২, ৩৮৯-৩৯৭, ৩৯৯, ৪০৪, ৪০৫, ৪২৩, ৪২৫, ৪৫৪, ৫৩১, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯৮, ৬০৬, ৬০৭, ৬১০, ৬১৩-৬১৫
মুকুন্দ শীল ৫৫২
মুকুন্দ দত্ত ২৯, ৮৬, ৫৪৮, ৫৫১
মুকুন্দ দাস ৩৭, ৪০, ৮৫
মুকুন্দ দেব ১৫২
মুকুন্দ পণ্ডিত ৩৯
মুকুন্দ ভদ্র ৫৪৮
মুঘল ১, ১১৮, ১৯৬, ৪২৭, ৪৩৫-৪৩৭, ৪৩৯
মুঘল আমল (মুঘল যুগ) ৪৩৭, ৪৫৫, ৪৮০, ৫৮৯, ৬০২
মুজাফফর ২৪৩, ৩০৭, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৫৪, ৩৫৫, ৫৭৫
মুঙ্গের ৫৫৪
মুজাম্মিল ২৬১, ৩০০, ৩১৩-৩১৬, ৬০৮, ৬১৫, ৬১৭, ৬১৮, ৬২৯
মুজাম্মেল হক ৪৬৬
মুণ্ড ৩৬৩
মুণ্ডা ৩৮৬, ৪৭৪, ৫৮৪
মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ (ডক্টর) ১৫২-১৫৪
মুতাযিলা ৩০২, ৪৫৬

মুনশী আজিমউদ্দীন ৫০১
মুনশী আবেদ আলী খাঁ ৫০১
মুন্সী আয়েজ উদ্দীন আহমদ ৫০৪, ৫০৫
মুনশী আলি রিযা ১৭৩
মুনশী আশরাফ খাঁ ৫০১
মুনশী গরীবুল্লাহ ৩৩০, ৪৯৬
মুনশী মুহম্মদ এবাদুল্লাহ ৪৬৮
মুনশী মুহম্মদ খোদা নেওয়াজ ৪৬৮
মুনশী মুহম্মদ মুকিম (পণ্ডিত) ২৫৮, ২৬১, ২৬২, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৪৭, ৩৫২, ৬১৮
মুন্সী মেহেরুল্লাহ ৫৪৩
মুন্সী মোহাম্মদ আবেদ ২৭০
মুনসী মোহাম্মদ বক্তার খাঁ ৫০৮
মুনশী রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ৪৮৩
মুনশী সাদুল্লা সরকার ৫১৫
'মুনাযাৎ' ৩২৬
'মুনীর-মাহারু সুন্দরী' ৫০৯
মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরী ১০৫
মুবারক খান ১৮৪, ১৮৬
মুবারিজ খান ২৮৯, ২৯০, ৫৭০
মুয়াজ্জম ৩৩৫
মুয়াবিয়া ২৭৪, ২৭৫
মুরাদ আলী আওরঙবাদী ৫৭১
মুয়ারিফুল নাঘমাত ৫৭১, ৫৭২
মুরারি গুপ্ত ২৮, ৩০, ৩৭, ৪৩-৪৬ ৬৪, ৬৭, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ৯১, ৫৪৭-৫৪৯, ৫৫১
মুরারি গুপ্তের কড়চা ৪৪, ৪৫, ৬৪, ৮১
মুরারি পণ্ডিত ৫৫৩,. ৫৪৭
মুরারি মহাতি ৫৫১
মুরারি শীল ৩৮৮, ৩৯৪, ৩৯৬
মুর্শিদ কুলি খান ৪৩১, ৪৩৭, ৪৭২, ৪৮৬, ৫৪১
মুর্শিদনামা ৪৮৯, ৫০৫
মুর্শিদাবাদ ১০৫, ৪১৪, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৬, ৪৮৭, ৫২৭, ৫৩২, ৫৪০
মুলতান ২
মুসলমান ৯, ১০-১৪, ১৬, ১৭, ৮৩, ১১১, ১১৬, ১১৮, ১৬৪, ১৬৫, ২৮২, ৩০২-৩০৫, ৩১৪, ৩১৫, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৬৩, ৪২৩, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫-৪৫৭, ৪৭৮-৪৮৯, ৪৯৩, ৫২২, ৫৬৪ ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯৩-৬০০, ৬০৮-৬১০, ৬২০, ৬২২, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৮, ৬৩০
'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ১০০, ১০২, ১০৫
'মুসলমানি বাঙলা' ৪৮৩-৪৮৫
'মুসলমানি বাঙলা সাহিত্য' ৪৮৫
'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' ১২, ৮৬, ১০৮, ৬১৩, ৬১৭
'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' ১০৫, ১৬৯, ১৯১, ২৬২, ২৮২, ৩২১, ৩২৬, ৩৫৮, ৬৩০
'মুসানামা' ৩১৮, ৩৪০, ৩৪১
মুসা-ফেরাউনের কিসসা ৩৬৮, ৩৬৯
'মুসার সওয়াল' ১৩, ২৮১, ৩১৮-৩২০, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪১, ৩৫১, ৫১৯, ৫২২, ৬২০
মুসিকী ৫৬৬
মুহম্মদ (পদকার) ১০৬
মুহম্মদ আকবর ১০১, ২৪৪-২৪৬
মুহম্মদ আকবর আলী ৫০৫
মুহম্মদ আকিল ২৭৬, ২৭৭, ৩১৮, ৩৪০-৩৪২
মুহম্মদ আজিম ৫৭৫
মুহম্মদ আবদুর রশীদ ২৩৬
মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক ২৫৪
মুহম্মদ আলী ১০৬, ২৫০, ২৫৩, ২৫৮, ২৬১, ৩০৫, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৬, ৬১৮
মুহম্মদ আলী রাজা ১০৬, ২৫০, ২৫১, ২৫৮, ৫৭৩-৫৭৫
মুহম্মদ ইসমাইল ৫০০
মুহম্মদ ইসহাকুদ্দীন ২৯৫
মুহম্মদ উজির আলি ৩৮০, ৩৮১
মুহম্মদ এনামুল হক (ডক্টর) ১০৫, ১৬৮-১৭০, ১৯১, ১৯৭, ২০৩, ২০৫, ২৩২, ২৪৫, ২৫০, ২৬২, ২৮২, ২৯৮,

৩১৫, ৩২১, ৩২৬, ৩৪৩, ৩৫৮, ৪৪১, ৪৬৭, ৫৩৫, ৫৭৫, ৬১৩, ৬১৮, ৬১৯, ৬৩০
'মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ ৬৩০
মুহম্মদ কবীর ১৬৬, ১৬৮-১৭১, ১৭২-১৭৩, ২০৭, ২৭১, ৪৯২, ৫৯৭, ৬০৩
মুহম্মদ কাসিম ৩৩৪
মুহম্মদ খাতের ১৮৯, ২৯৬, ৩১৭, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪১, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৫৯, ৪৬২, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৯৯
মুহম্মদ খান ১৪৫-১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৬৬, ১৮৮, ২৪৬, ২৫৬, ২৬১, ২৮৫-২৯৩, ২৯৭-৩০০, ৩১৮, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৫৪-৩৫৮, ৩৮৪, ৩৯৫, ৪৬৭, ৫৩১, ৫৩৫, ৫৬২, ৫৮৮, ৬০১, ৬০৮, ৬১৬, ৬১৮, ৬২৯
মুহম্মদ খান সুর ২৯০
মুহম্মদ চুহর ১৬৬, ১৭৩, ১৭৫, ২৫৪-২৫৮, ৩৫৫
মুহম্মদ ছমি ৩৭৯
মুহম্মদ জান ৩২৯, ৬১৯
মুহম্মদ জীবন (জীবন মুনশী) ১০২, ২৫৪-২৫৯, ২৬৬
মুহম্মদ তকী ৬১৮
মুহম্মদ তকী খান ১৯০
মুহম্মদ তুঘলক ২৮৯, ৬১৯
মুহম্মদ দানিশ ২৬৬, ৪৯৮, ৫১৭, ৫৪৪, ৫৬১, ৫৬২
মুহম্মদ নকী ৫৭৫
মুহম্মদ পরাণ ৫৭৫
মুহম্মদ বাকের আগা ২৩২
মুহম্মদ ফসীহ ৩২৬-৩২৮
মুহম্মদ বিন ইসহাক ৩৬১
মুহম্মদ বিন ওমর ওয়াকেফী ৩৬১
মুহম্মদ মতীন ৪৯৮
মুহম্মদ মীরন ৫১৭
মুহম্মদ মুকিম ১০০-১০৭, ১৯৯, ২১৪, ২৫০, ২৫৩, ২৫৮, ২৬০-২৬২, ৩০৫, ৩০৭, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫৬, ৪৯৮, ৫৬২, ৬১৮
মুহম্মদ মুনশী ২৯৫, ৪৮০, ৪৮৫, ৫০৯, ৫১০
মুহম্মদ মুসা ২৯৬
মুহম্মদ রফি ৫৭৭
মুহম্মদ রফিক ৫২২
মুহম্মদ রফিউদ্দীন ২৪৬, ২৫৪
মুহম্মদ লাল খান বরণী ৫৭১, ৫৭২
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডক্টর) ৯৯, ১৪০, ১৭৩, ৩৫৮, ৪১১, ৪১৩, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৯২
মুহম্মদ শাহ (রঙিলা) ৫৬৯
মুহম্মদ শাহ ফকির ৫৭৫
মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (ডক্টর) ৪০৩
মুহম্মদ সুলতান ২৯৫
মুহম্মদ সাত্তারী ৪৬৫
মুহম্মদ সেকেন্দার আলী বেপারী ৫১২
মুহম্মদ হবিবুর রহমান খান শেরওয়ানী ১৯০
মুহম্মদ হানিফা ২৭৬, ২৭৭, ২৮৪, ২৯৪, ৩৬১, ৪৭৮, ৪৮৮, ৪৯৩, ৪৯৪, ৫১১
মুহম্মদ হারি ১০৪
মুহম্মদ হাসেম ১০০, ১০৬
'মুহম্মদী (মোহাম্মদী) বেদতত্ত্ব' ৩০৪, ৪৮৯, ৫০৩, ৫০৪
মুহররম ২৭৪
'মৃগলুব্ধ' ১১১, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৩
'মৃগলুব্ধ সম্বাদ' ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৩
মৃগাবৎ ২১৫, ২৩৪
'মৃগাবতী' ২৫৮, ২৬২, ৩৩২, ৩৩৩
'মৃগাবতী-যামিনীভান' ৪৮৮, ৪৯৯
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৪৭৫-৪৭৭
মেক্সিকো ৫৮৪
মেঘদূত ১৯১, ২৩৭
মেঘনা ৪৩৬
মেঙ মেঙ (সুলতান যৌবক শাহ) ১৯৫, ২০৯
মেঙ ইয়াজাদী (সলিম শাহ) ১৯৫, ২০৯
মেঙ খামঙ (হোসেন শাহ) ১৯৫, ২০৯
মেঙ ফালঙ (সিকন্দর শাহ) ১৯৫, ২০৯, ২৮৯
মেঙসামোন ওরফে নরমিখলা ১৯৫
মেদিনীপুর ৮৪, ১২৩, ৩৯০, ৩৯৯, ৪০০, ৪২২, ৪২৩, ৪৩১, ৪৪৩, ৪৬৫, ৫৪১
'মেরাজ নামা' ৩৭৭, ৪৯৯
'মেহের চরিত' ৫৪৪
মৈথিল ৮৮, ২০৭, ৪১৩, ৪৮১
মৈথুন তত্ত্ব ৬, ২১

'মৈনাকো সতু' ২০০
মৈনাসৎ ১৬৪, ২০০, ২০১, ২১৫, ২৩৪
'মোকাম-মঞ্জিল কথা' ১০৫, ১০৬, ৩২৫
মোকাম্মেল খাঁ ৫০২
মোনাইযাত্রা ৫২১
মোবারক গাজী ৪৬৮, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮৮
মোবারক গাজীর পুথি ৫১৮
মোমতাজ ১০৬
মোয়াজ্জেম আলী ৫০৭
মোল্লা হোসেন আলি ৩৭৬, ৪৭৩
মৌলি সেন ৫৪৮
মোস্তফা চরিত ৩৬১
মোহন চাঁদ ৫২৫, ৫২৭, ৫২৮
মোহন দাস ১০৯
মোহন সরকার ৫২৫, ৫২৭
মোহসেন আলী (মোছন আলী) ১০৫, ১০৬, ৩২৫
মোহাম্মদ আকবর ২৫৪
মোহাম্মদ আশ্‌রাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন ৩৫৮
মোহাম্মদ ইব্রাহীম ৫২১
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী ৪৯২
মোহাম্মদ তকী ২৬১
মোহাম্মদ দানিশ ২৬১
মোহাম্মদ পরাণ ১০৬
মোহাম্মদ বক্তার খাঁ ৫০৮
মোহাম্মদ রওশন আলী ৫১৪
মোহাম্মদ হাকিম আলী ২৩২
'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' ২৯৪, ৩৩৬
মোহাম্মদ হোসেন ৩২৭
মোহিতলাল মজুমদার ৪৮৪, ৪৮৮
মৌজিরাম ঘোষাল ৪৪১, ৪৪৩
মৌর্য ৪২৭, ৪৩৪, ৪৭৪
মৌলবী আতাউল্লাহ ২৪৭
মৌলবী রহমতুল্লাহ ৩০৫, ৩০৯
মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান ৩৬১, ৪৮৭, ৫০৬
মৌলানা দাউদ ২০০, ২০১, ২১৫
মৌলানা ফরাগল ২৫১
ম্যানরিক ৫৯৫, ৫৯৮, ৬০১, ৬০৫
ম্যাকলে ১৯৭
ম্রোহঙ ১৯৫, ১৯৬
যক্ষ ৭৯, ১১৫, ১১৬, ২৪২, ৩৮৬, ৪৩৪, ৪৩৮, ৫৮৪, ৬১৩
যজুর্বেদ ৬
যজ্ঞেশ্বরী ৫২৫, ৫২৭
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৯৯, ১০৫, ৩৫৮
যদুনন্দ ৫৫১
যদুনন্দন ৮৭, ৯৭
যদুনন্দন দাস ৬১৫
যদুনন্দাচার্য ৫৫২
যদুনাথ ৮৬, ৮৭, ৪০২, ৪০৮, ৫৫১
যদুনাথ কবিচন্দ্র ৫৫২
যদুনাথ ঘোষ ৫২৮
যদুনাথ চক্রবর্তী ৮৭
যদুনাথ দাস ৫৯, ৬৯, ৯৩, ১২২
যদুনাথ সরকার ৫৯৩
যুগলতত্ত্ব ৬
যুধিষ্ঠির ১২৭
যবন ১৩৮
'যয়নবের চৌতিশা' ২৮৪
যশস্তিলক ৭
যশোদারঞ্জন তালুকদার ৮৩
যশোধর ৮৯
যশোবন্ত সিংহ ৪৩১, ৪৩২, ৪৪৩
যশোর, যশোহর ৩৪, ৩৯, ১১৮, ১১৯, ৩৯৯, ৪০৮, ৪৩৬, ৪৪০, ৬০৪
যশোরাজ খান ৮৬, ৮৮, ৯০, ১১৮, ১২১
যাজিগ্রাম ৮৪
যাত্রা ৫২৮
যাদব দাস ৫৫৩
যাদবাচার্য ৬৯
যাদু বিশ্বাস ৩০৪
'যুগসম্বাদ' ২৯৭
যুগীকাচ, যোগীকাচ ৩০৪, ৪৮৯.
যুদ্ধকাব্য ৪০৮
যুধিষ্ঠির ১৩৭

যোগ ৭, ৮, ১২, ১৩, ১০৯, ১২৮, ২০৭, ২০৮, ২৪৩, ৩০২-৩০৪, ৩৮৬, ৪২৭, ৪৩৮, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৭৯, ৫৯৩, ৬০২, ৬০৮
'যোগ কলন্দর' ১৩, ৯৯, ১০০, ১০৫, ৩০৪
যোগতন্ত্র ৫৭, ৩০১, ৫৮৭, ৬০৯
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১২৮-১৩১, ১৩৪, ১৬০
যোগসূত্র ৭
যোগী ১, ৩০৩, ৩৬৩, ৪২৬, ৪৫৩
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৬, ১৫৮
যৌটক ৫২৪, ৫২৭
য়ুরোপ ২৩৬
য়ুরোপীয় মিশনারী ৪৭৫
য়ুরোপীয় বেনে ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯
রইসউদ্দিন আহমদ ৫২১
'রওজাতুস সুহাদা' ২৯৫
রওশন আলী ৪৭৩
রওশনাবাদ ২৫৪, ৩৭৯, ৩৮০
রংপুর ১৭৪, ২৯৩, ৩৩৪, ৪৩০, ৪৪৪, ৪৬৫, ৫০০, ৫২০-৫২২
রংপুর সাহিত্য পরিষদ ৫২০, ৫২১, ৫৪২
পত্রিকা ৫৪২
রক্তবীজ ৩৮৭
রঘুজী ভোঁসলা ৫৩২, ৫৩৩
রঘুনন্দন ২, ১৪, ২৭, ২৮, ৪০, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ৫৮৬
রঘুনন্দন দাস ৮১, ৫৪৮, ৫৪৯
রঘুনাথ ৫৯, ৯৭, ১১৬, ১৬১, ৪০৮, ৫৪৯, ৫৫১-৫৫৩
রঘুনাথ দত্ত ৪২৩
রঘুনাথ দাস ৩১, ৩৩, ৩৬, ৬৭, ৬৯, ৮২, ৮৪, ৮৭, ৫২৫, ৫২৬, ৫৪৯
রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য ৮৭, ১২২,
রঘুনাথ পুরী ৫৫০
রঘুনাথ ভট্ট ৩১, ৩৩, ৩৬, ৬৯, ৮২, ৮৪
রঘুনাথ রায় ৩৯২-৩৯৪
রঘুনাথ শিরোমণি ১৪, ২৭, ৪০, ১১৪, ৫৮৬
রঘুনাথ সিংহ ১৩৪
'রঘুবংশ' ১৩১, ৩৫৯
রঘু সুত ৫৮১
'রঙ্গবাহার' ৪৯৪
রজনীকান্ত সেন ৪৮৮
রজব ১১, ১৫, ১৭, ১১১, ৪০৮
রজব আলি ১০৬
রঞ্জাবতী ৩৮৮
রতি দেব ৪২৯, ৪৩৩
রতিমঞ্জরী ৮২
রতিরাম দাস ৫৪২
রত্নমাণিক্য ৩৪৩
রত্নেশ্বর আচার্য ৫৪৯
রথীদেব সেন ৪০৮
রবীন্দ্রনাথ ২, ১৪, ২১-২৩, ২৬, ১৩৮, ১৫৩, ১৯৩, ২১৪, ৪০৯, ৪১৫, ৪১৯, ৪২৯, ৫২৪, ৫৮০, ৫৮২
রমজান আলি ৩০৪
রমণীমোহন মল্লিক ১০২
রমাকান্ড ১৬০, ৪০৮
রমানন্দ দাস ৪৪
রমেশচন্দ্র দত্ত ৩৯১, ৩৯৫
রসকদম্ব ১২৪
'রসকল্পবল্লী' ৮৪, ৯০, ৯৭
রস খান ১১১
'রসভাবপ্রাপ্ত' ৮২, ৮৩
রসমঞ্জরী ৮২, ৪১৬
রসালকোন্ডা ৭৭
রসামৃত শেষ ৩৬
রসামৃতসিন্ধু ৫৫০
রসিকচন্দ্র বসু ৮০
'রসিকমঙ্গল' ৮২
রসিকানন্দ ৮২, ৯৮
রসুল ৬৫, ২৭৪-২৭৬, ৩৫৩, ৩৬১, ৪৫৬
'রসুল চরিত' ৩০২, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৯, ৬১৯
'রসুল বিজয়' ১৭৮, ১৮৪, ২৭৬, ২৮০, ৩৫৩, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৭৯, ৫২২, ৬১৫-৬১৭
রসুলে বেদাতল ৫২১
রহমত খান ৫৩৪
রহমান আলি ৩১০, ৩১২
রহিম বক্স ৫২১
রহিমুন্নিসা ৫৫৩-৫৫৭, ৫৯১

রহিমুল্লা ৩০৪
রাইকৃষ্ণ দাস ৫৪২
রাউজান ১৯৯, ২০৩, ২১৪, ২৫২, ২৫৯, ২৬০, ৫৭৬
রাগতালনামা ১০২, ১০৯, ২০৭, ২১৪, ২৮০, ৩২৯, ৩৩৩, ৫৭৫, ৬১৭
'রাগদর্পণ' ৫১৭
রাগনামা ১০২, ১০৯, ৫১৭, ৫৭৫
'রাগমালা' ৮৩, ৯৯, ১০৪, ২৮৩, ৩৫৬, ৪৯৮, ৫১৭, ৫৭৫
'রাগমালা সতীময়না' ১০৭, ৫১১,
রাগা-ই-হিন্দ' ৫৭০
রাগাত্মিকা ভক্তি ২১, ৮৬, ৫৫০
রাগানুগা ৮৬
রাঘব গোসাঞিঃ ৫৪৯
রাঘব পণ্ডিত ৫৪৯, ৫৫১
রাঘবপুরী ৫৫০,
রাঘব ভট্ট ৫৪৯
রাঘব রায় ১১২,
রাঘবেন্দ্র দাস ৯৮
রাঙ্গুনিয়া ২৫৯, ২৬৫
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৫
রাজকুমার বাবুর পরিণাম ৫৩৫
রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৯
রাজনারায়ণ বসু ৪৮৫
রাজপুতানা ২১৫
'রাজমালা' ৮৯, ৫৩৮, ৫৪০
রাজশাহী ৮৪, ৪৪৩
রাজসিংহ ৪০৮
রাজা আদম ২৮৯, ২৯০
রাজা দত্তখাস ১৪৪
রাজা নওয়াব আলী ৫৭১, ৫৭২
'রাজা' পৃথ্বিচন্দ্র ৪৩২
রাজা রাজসিংহ ৪২৪
রাজারাম (রাজা) ৫৬৯
রাজারাম দত্ত ১৫৫, ১৬০
রাজা সদানন্দ ৫৪৮
রাজীব ঘোষ ৫৪৯
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৪৭৭
রাজীব সেন ১৬০
রাজেন্দ্র দাস ১৫৫, ১৬০
রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিম ২৩৯-২৪৪, ৩০৮, ৩১৪, ৩১৬-৩১, ৩৮৪
রাঢ় ৮৬, ১১২, ১১৪, ১২০, ৩০০, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১, ৪০১, ৪০৪, ৪০৫, ৪১১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৫, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৮০, ৪৯৬, ৬০৭
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ১১৪
রাণী ভবানী ৫৯১
রাধা ৬-৮, ১৭, ২১, ২৩-২৫, ২৭, ৩১, ৮৭, ১১৩, ১২১, ৪১০
রাধাকান্ত ১৭৭
রাধাকান্ত মিশ্র ৪১৩
রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-কানু ৬-১০, ১২, ১৪-১৮, ২১, ২৩-২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪২, ৮৫-৮৭, ১১০, ১১১, ১১৫, ১২০, ১৩১, ১৮৯, ২০১, ৪০৮, ৪১৬, ৪২৭, ৫২২, ৫২৫, ৫৫০, ৫৬৬, ৫৮৬, ৫৯৬
রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা ৩৫
রাধাকৃষ্ণলীলা ৩৭, ৬৫, ৪৫৫
রাধাকৃষ্ণলীলাগীতি ৯০
'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব' ৮২
রাধাচরণ গোপ ২৭২, ২৯৫, ৪৫৩, ৪৮০, ৪৮৫
রাধানন্দ ৯৮
রাধানাথ রায় ৪০৮
রাধাবল্লভ ১০৯
রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ৯৮
রাধাবল্লভ দাস ৯৮
রাধাবাদ ৬-৮
'রাধাভাব' ২১
রাধামোহন ৮৭, ৫৩৭, ৫৩৮
রাধামোহন ঠাকুর ৮৬, ৯৮
'রাধামোহন সেরেস্তাদারের কীর্তি' ৫৩৪
রাধার সম্বাদ (ঋতুর বারমাস) ১০০
রাণীগঞ্জ ৪০৬

রানী ভবানী ৪০৭
রাবণ ১২৮-১৩৩
রাবিয়া বসরী ৩০৩, ৩৭৫, ৪৫৬
রাম ৪৩, ১২৬-১৩৭, ৩৫৩, ৩৬৪
রাম (বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা) ১৭৭
রামকথা ১২৬-১৩৫, ১৩৮
'রামকথার প্রাক-ইতিহাস' ১২৯-১৩১
রামকান্ত ৪০৮
রামকিশোর তর্কালঙ্কার ৪৭৭
রামকৃষ্ণ দাস ১৫৩
রামকৃষ্ণ পরমহংস ৩৮৭, ৪১০, ৬০২, ৬০৭
রামকৃষ্ণ রায় ৪০৭, ৪৩০
রামকেলী ৩৪
রামগতি ন্যায়রত্ন ৪৯, ৪৩১
রামগোপাল দাস ৬৫, ৮৪, ৯০, ৯৭
রামগোবিন্দ দাস ১৩২
রাম চক্রবর্তী ৫৪৯
রামচন্দ্র ৩০, ৬৫, ১৩২, ৫৫১
রামচন্দ্র কবিরাজ ৯৫, ৫৫২
রামচন্দ্র খান ১১৬, ১১৮, ১৫৫, ১৬০, ১৬১,
রামচন্দ্র পুরী ৫৪৮, ৫৫০
রামচন্দ্র মুখুটি ৪৭২
রামচন্দ্র মুন্সী ৪২০
'রামচরিত' ১৩১
রামজয় দাস (রামজীবন দাস, রামজী) ২২০, ২৬৬, ২৬৭
রামজী দাস ৫২৫, ৫২৬
রামজীবন ৪২৪
রামজীবন দাস ১১১
রামজীবন বিদ্যাভূষণ ১১১, ৪০৮
রামতনু আচার্য ১১১
'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ৬১৬
রামতর্কবাগীশ ১৭৬, ১৭৭
রামতীর্থ ৫৪৮
রামদাস ২, ১০, ৩১, ৩৭, ৮২, ৪০২, ৪০৮, ৫৫১, ৫৫২, ৫৮৫, ৫৮৬
রামদাস আদক
রামদেব ৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯৯
রামধন ৪২৩
রামধুন ১০
রামনন্দন ১৬০
রামনাথ ২৭, ১১৬
রামনারায়ণ ১৩২, ১৩৩
রামনারায়ণ ঘোষ ১৬০
রামনারায়ণ দত্ত ১৬০
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ৮৩
রামপাঁচালী ৫২২
রামপুর ৫৭০
রামপ্রসাদ ৫৫৭, ৫৬১
রামপ্রসাদ ঠাকুর ৫২৬, ৫২৭
রামপ্রসাদ মৈত্র ৫৪১
রামপ্রসাদ সেন ১৭৭, ৪১০, ৪১২, ৪১৩, ৪২৩, ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৫
রামবল্লভ দাস ১৬০
রাম বসু ৫২৫-৫২৮
রামবিনোদ ৪০৮
রাম ভদ্র ৪৪৩, ৫৫২
রামভদ্রাচার্য ৫৫১
রামমাণিক্য ৩৪৩
রামমুকুন্দ ৫৪৯
রামমোহন রায় ২, ১০, ২৭, ৪০৮, ৪৭৫-৪৭৭
রামমোহন সেন ৫৫২
রাম রাজা ১১১, ৪২৯, ৪৩২
রামরাম বসু ৪৭৭
রামশঙ্কর দত্ত ১৩২, ১৩৪
রামশঙ্কর সেন ৪৪১, ৪৪৩
রামসিংহ ৪৩১, ৪৪৩
রাম-সীতা ৬, ১২, ৮৫, ১১০, ১১১, ১২৭, ১২৯
রামসুন্দর রায় ৫২৬
রামানন্দ ২, ৪, ৬, ১০, ৩৪, ৩৭, ১২৯, ৩৯৮, ৪০৮, ৪৪১, ৫৫১, ৫৮৫, ৫৮৬
রামানন্দ ঘোষ (বুদ্ধাবতার) ১১৪, ১৩২, ১৩৫,
রামানন্দ বসু ৮৬, ৮৭, ৯১, ৯৪, ৫৪৯
'রামানন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' ৩৯৮
রামানন্দ মিশ্র ৫৪৮
রামানন্দ যতি ১৩৫, ৩৯৭
রামানন্দ রায় ৩০, ৩১, ৪১, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১

রামানুজ ২-৩, ৪, ৮, ৩৭, ১২৯, ৪০৮, ৫৮৬
রামায়ণ ৬৮, ১১৫, ১২০, ১২১, ১২৬-১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৫৭, ১৬০, ১৬৪, ১৯২, ১৯৩, ২৮২, ৩০১, ৩৫৩, ৩৬৩, ৩৯৮, ৪০৩, ৪২০, ৪৩১, ৪৮২, ৫৮৭, ৫৯০, ৬০৭
রামায়েৎ ১২০, ১২৭, ১২৯
রামু ১৮১, ১৯৫, ২৬৩
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩৮
রামেশ্বর চক্রবর্তী ৪৪১
রামেশ্বর দাস ১৬০
রামেশ্বর নন্দী ১৬০
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৪২৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৪৩, ৪৫১, ৬১৬
'রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র' ৩২৭
রায় চক্রবর্তী ৫৪৮
রায়পট্টক ৫৪৮
রায়বেরেলী ২১৫
'রায়মঙ্গল' ২৮৩, ২৯৮, ৪১১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৫, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৮০, ৪৮৪
রায়শেখর ৮৭, ৯৭, ১২৪
রায়হান ২৪৯
রাসলীলা ৬, ৭
রাসু-নৃসিংহ ৫২৫, ৫২৬
রাস্তি খান ১৪৫-১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৮৬, ২৮৮, ২৯০, ৩৫৫
'রাহাতুল কুলব' (কেয়ামত নামা') ৩১৮, ৩২০, ৩৫১
রিয়াঙ ৫৩৭, ৫৩৮
'রিসালা-ই-মুসিকি' ৫৭১
'রিসালা-দর ইল্লত-ই-মুসিকি' ৫৭১
রিসালৎ-উস্-শুহুদা ৪৬৫
রুকনউদ্দীন কাইকাউস ৪৬৫
রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ২৯০, ৪৬৫
রুক্মিনী ১৩৯
রুদকী ১৮৯
রুদ্র ৪২৭
রুদ্রদেব ১৬০, ৪৫৯
রুদ্রদেবের পাঁচালী ৪৫৯
রুদ্ররাম চক্রবর্তী ৪২৩
'রুবাইয়াতে উমর খৈয়াম' ১০, ১৬০
রুমী (মৌলানা জালালউদ্দীন) ১০, ১১, ১৪, ১১৮, ৫১৫, ৫৬৯
'রুহনামা' ৩৫১
'রূপকথা' ৪৭৭
রূপ গোস্বামী ৬, ৩০, ৩১, ৩৩-৩৫, ৪৫, ৫৬, ৬৯, ৮২-৮৪, ৮৭, ১১৬, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫৩
রূপ গোস্বামীর বচন ৫৫০
রূপচাঁদ পক্ষী ৫২৫, ৫২৮
'রূপ জালাল' ২৬২, ৫৫৪
'রূপবান-রূপবতী উপাখ্যান' ১১১, ২৬৬, ২৬৮-২৭০
রূপমঞ্জরী ৮২
রূপমতী ৫৬৯
'রূপরাজ-চন্দ্রাবতী' ৫০৪
রূপরাম চক্রবর্তী ৪৪১, ৪৫৪
রূপরামের ধর্মমঙ্গল ৫৯৬, ৬০৫
রূপেশ্বর ৩৪
'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' ৫৩৬
'রেজওয়ান শাহ' ১০৬, ১৯৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩
রেজাউল্লাহ ৩৭৫-৩৭৭, ৪৭৩, ৪৮৫, ৪৮৬, ৫৪৪
রেড ইন্ডিয়ান ৫৮৪
রেনেটী ৫৭০, ৬০৩
রেনেসাঁস ২, ১৮, ৩৩
রেবতী ৬
রেয়াছক (রেয়াস খাঁ) ১০৬
রোকাম শহর ১৯৪
রোমাঁ রোলাঁ ৫৮০
'রোমিও-জুলিয়েট' ১৯৩
রোসাঙ্গ ৯৯, ১১২, ১৬৬, ১৯৪-১৯৮, ১৯৯, ২০৩, ২০৫, ২০৭, ২১১-২১৬, ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৬৩, ২৭৮, ২৭৯, ৩২৩, ৩৩২, ৩৫৫, ৩৮২, ৩৮৩, ৫৭৭, ৬২৫

রোস্তম ৫১০
রোহিণী ৬
র‍্যালফ ফিচ্ ৫৯৮, ৬০৬, ৬০৭
লক্ষ্মণ ১২৯
লক্ষ্মণ (বিনয় লক্ষণ) ৪৩২
লক্ষ্মণ আচার্য ৫৪৯
'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' ১১১, ১৩৪
লক্ষ্মণ সিংহ ৫৩৩
লক্ষ্মণ সেন ৪৫৪, ৫৩০
লক্ষ্মণ হাজরা ৪০৩
লক্ষ্মী ১১৫, ৩৮৭, ৪২৭, ৪৩৮
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ৫২৫
লক্ষ্মী নারায়ণ ৫২৫
লক্ষ্মীপ্রিয়া ২৯, ৫৮
'লক্ষ্মী মঙ্গল' ৪১১, ৪২৩-৪২৫
লক্ষ্মীরাম ১৩২, ১৬০
লক্ষ্ণৌ ৫২৮, ৫৭০
লখনৌতি (লক্ষণাবতী) ২৮৯, ৫৮৯
লখাই ৩৮৮
লখীন্দর ৫২২
লঘু বৈষ্ণবতোষিণী ৩৫
লঙ্কা ১২৭
লঙ্কাকাণ্ড ১২৭
'লঙ্কাবতার সূত্র' ১২৮
লছমনসিংহ ২৪৮, ৩২৪, ৫৩৩
লন্ডন ২৫৬
লতিফা ৩০৩
'লবকুশ চরিত্র' ৫৩২
লবঙ্গমঞ্জরী ৮২
লর্ড নর্থ ৫৩৬
'ললিত মাধব' ৬, ৩৫
'লহজত-ই-সিকান্দরী' ৫৭০
লহনা ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯৬, ৫৯১
লহর ৫২৬, ৫২৭
লাউড় ৩৮, ১৫৩
লাউড়িয়া কৃষ্ণ দাস ৩৮, ৮০, ৮১
(রাজা দিব্য সিংহ)
লাউর ২৯
লাউসেন ৫২২
লাতিন ১৯৪, ৩০১
'লায়লী-মজনু' ১০৪, ১১০, ১১৩, ১৮২, ১৮৪, ১৮৮-১৯৪, ২০২, ২৮৩, ২৮৪, ৪৬৭, ৪৮৮, ৪৯৯, ৫০৩, ৫১৪, ৫২২, ৫৫৩, ৫৫৭, ৫৯০, ৫৯১, ৬১৬
লায়েট (জোয়াস দ্য) ৬১৬
লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ৫২৮
লালন ১৭, ৫৮২
লালবাগ কেল্লা ৪৯৫
লাল বেগ ১০৬
লালমাই ১০৬
লালমোহন ৪৪১
'লালমোনের কিস্‌সা' ২৮৩, ৪৩৩, ৪৪৮-৪৫১
'লালমোতি-তাজুলমুলুক' ২৩৬, ২৫৯, ২৬৪
'লালমোতি-সয়ফুলমুলুক' ২৪০-২৪৪, ৩১৬, ৩৫৪
লালা জয়নারায়ণ সেন ৪৪১
লালু নন্দলাল ৫২৫, ৫২৬
লাহোর ১৯০, ২৩৪, ২৩৬
লিঙ্গায়েত ১০৯, ২৬৭
লিঙ্গায়েতবাদ ৪
লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ২১৫, ২৩৪, ৪৭৯, ৪৮৪, ৫৭২
লীলা ৪১০, ৫৭৭
লীলাবতী ৫৯১
লীলাবাদ ১৮
'লীলাস্তব' ৩৫
লুদী ভট্ট ৫৭০
লেংটা ফকির ৪৪১, ৪৪৫
'লেখক সমাবেশ পত্রিকা' ৫৪৬
লোকনাথ ৮, ৯
লোকনাথ দত্ত ১৬০
লোকনাথ দাস ৩৯, ৮১
লোকনাথ পণ্ডিত ৫৫৩
লোকনাথ শর্মা ১৩২
লোকমান আলী ২৬৩
'লোকরহস্য' ৪৭৭

লোক সাহিত্য ৫৩১. ৫৭৮-৫৮৩
লোচন রচনী ৩৬
লোচন দাস ২৯. ৩৯. ৪০, ৪৩, ৪৪. ৫০.
৬৪-৬৬, ৮৭, ৯৪
লোরিকমল্লের গাথা ২০০
লৌকিক দেবতা ৪৮৪. ৪৮৮
ল্যাটিন ৪৮৪
শক্তি ১৮
শকুন্তলা ১৩৭
শঙ্কর, শঙ্করাচার্য ২, ৩, ৮, ১০, ৩৭, ৭০.
৪০৮, ৫৮৬
শঙ্কর (কবি) ৪২২, ৪২৩
শঙ্কর (পাগল) ১০৯
শঙ্কর (শিব) ৪২৭
শঙ্কর আচার্য ৪৪০, ৪৪১, ৫৪৮
শঙ্কর ঘোষ ৩০, ৮৬
শঙ্কর চক্রবর্তী (কবিচন্দ্র) ১২৫, ১৩২,
১৩৪, ১৩৫, ১৫৫, ৪৩১
শঙ্কর দাস ১১১
শঙ্কর দেব ৮৯
শঙ্কর পণ্ডিত ৫৪৯, ৫৫১
শঙ্কর ভট্ট ১১১
শঙ্করাবন্যাচার্য ৫৫১
শঙ্করী ৪১০
শঙ্খ নদ ১৮১, ১৮৩, ১৮৬, ১৯৪-১৯৬,
২৪৮, ৩২৪, ৫৩৩
শচী দেবী ২৮, ২৯, ৩১, ৫৯, ৯২, ১১৬,
৫৪৮, ৬১৬
শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬
শনি ৩৮৬, ৪২১, ৪৩৮, ৬০২
'শব-ই-মেরাজ' ৩৩৫
শমস তবরেজী ৫১৫
'শমস তবরেজীর কেচ্ছা' ৫১৫
শমসের ১০৬, ১০৭
শমসের আলী ১০৬, ১০৭, ১৯৯, ২৩০.
২৩২, ২৩৩
শমসের গাজী ১৯৮, ৩৫৬, ৩৭৯, ৫৯০
শমসের গাজীনামা ১০৪, ৩৫৬, ৩৭৯.
৫৩১, ৫৯০, ৫৯১
শম্ভু ৪২৭
শরফতুল্লাহ ৩৪৭
শরীফ শাহ ২৪৩. ২৪৪. ৩০৭. ৩৩৫.
৩৫৪, ৩৫৫
শরীয়ত ১৩, ২০৮, ৩০২. ৩০৩, ৪৮৯
'শরীয়তনামা' ২৮১, ৩০০. ৩০৫, ৩২০-
৩২৪. ৩৫১, ৬০১. ৬০৯
শরীয়তুল আইয়াম ৫২২
শশিচন্দ্রের পুথি ১১১, ২২০, ২৬৬, ২৬৭
শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ডক্টর) ৬-৮, ১৭
শশিশেখর ৯৮
'শহীদ-এ-কারবালা' ২৯৫, ৫১১, ৫১৭, ৫৪৩
শাকম্ভরী দেবী ৪৬৭
শাকের মল্লিক ১১৮
শাক্ত ১০৯, ২৬৭
শাক্ততন্ত্র ১২
শাক্ত পদাবলী ২৬
শাক্ত সম্প্রদায় ২৬
শাখানির্ণয় ৬৫, ৯৭
শাখা নির্ণয়ামৃত ৫৯, ১২২
শাণ্ডিল্য ৬
'শাণ্ডিল্যসূত্র' ৬
শাত্তারিয়া ১৭০
শান্তনু ১২৭
শান্তি দাস ৫৫৭, ৫৫৯-৫৬১
শান্তিপুর ৩১, ৩৬,. ৩৭, ৩৯, ৪৯, ৪৬৬, ৫৪৯
শাম নুরিমানের জঙ্গ কাহিনী ৫১০
শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪০
শামসুদ্দীন মুহম্মদ গাজী ১৩১
শামসুদ্দীন শাহ গাজী ১৮৮, ৪৩৬
শার্ঙ্গদেব ৫৭১, ৫৭৬
শায়দা ২৮৯
শায়ের ২৫৬, ৪১৫, ৪৭৩. ৪৮২, ৪৮৭,
৪৮৮, ৪৮৯, ৫২২, ৫২৪
শায়েস্তা খান ১৪৬, ৪১২, ৪৩৭, ৪৭২,
৪৭৩, ৫৩৩, ৫৪১
শাহ আইনুদ্দীন ৯৮, ১০৪
শাহ আকবর ৯৮
শাহ আবদুর রাজ্জাক ১০৫, ২৩৯, ৩১৬
শাহ আবদুর রহিম ৫০৩, ৫০৪

শাহ আবদুর লতিফ ১৭
শাহ আবদুল্লাহ ১০৩
শাহ আশেক মাহমুদ ৫২২
শাহ আসহাবুদ্দীন ১৮৪, ২৬১
শাহ কলন্দর ১৭, ৪৭৩
শাহ কাতাল ৯৯
শাহজালাল ৪৫৮
শাহজালাল–মধুমালা ২৪৬, ৩৫৬, ৬১৭
শাজাহান (সম্রাট) ১৯০, ২১০, ২২১, ২৬১, ২৭৮, ২৭৯, ৩৩১, ৪৩৬, ৫৬৯, ৫৬৯, ৫৭১
শাহ জাহিদ ২৬১
শাহ তাজুদ্দীন ৩৫৫
শাহ দৌলাপীর ১০৭, ৩৪১
শাহনওয়াজ খান ৫৭১
শাহনামা ২৭৩, ২৯৬, ৪৮৮, ৪৯৯, ৫১০, ৫১২
শাহ পন্থী ২৬১
শাহ নিয়ামতুল্লাহ ১০৫
শাহপরীর কিসসা ২৫২, ২৫৩
শাহপরী মালিকজাদা ১০৬, ২৫৩, ২৫৮, ৩৫২, ৩৫৬
শাহপীর ২৬১
শাহ বদীউদ্দীন মাদার ৪৬৬
শা বারিদ খান ১৬৬, ১৭৬-১৮৪, ২৫৬, ২৭৬, ২৭৭, ৪১০, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৫৫, ৬১৫-৬১৭
'শা বারিদ খানের গ্রন্থাবলী' ১৭৮
শাহ বিবি ৬১৮
শাহ বীরবল-চন্দ্রভান ৫১৭
শাহ মইনুদ্দীন ১০৪
শাহমতজঙ্গ ৫৮৭
'শাহ মাদারের নিকট শাহ মালেকের সওয়াল' ৪৬৭
শাহ মুহম্মদ খোন্দকার ৪৭৩
শাহ মুহম্মদ সগীর ১৫৪, ১৮৯, ২০২, ২০৭, ২৪১, ৩০১, ৩১৪, ৬১৫
শাহ রুস্তম ৯৯, ৩২৪, ৩২৫
শাহ শরফউদ্দীন ৪৭৩
শাহ সফীউদ্দীন সুলতান ৪৬৫, ৪৬৬
শাহ সফীউদ্দীন সুলতান চরিত ৪৬৬
শাহ সুন্দর ফকির ২৬১
শাহ সুলতান ২৬১
শাহ সুলতান বলখী ৪৫৮, ৪৬৭
শাহাদাৎনামা ২৯৫
শাহাদাৎ হোসেন ১৮৯
শাহাবুদ্দীননামা ২৩৯, ২৪০, ৩০৪, ৩১৬
শাহেজুল্লাহ খান ৩০৪
'শিক্ষাষ্টক' ৩২, ৩৩, ৫৮৭
শিখ ১০, ১৯, ২০
শিখ ধর্ম ১০
শিখি মহাতি ৫৫১
শিব ১০, ১৮, ৪২, ৩৬৩, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯১, ৪০৩, ৪০৭, ৪১০, ৪১৭, ৪২৫-৪৩০, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৫৪, ৫৩২, ৫৭৪, ৫৮৭
শিব-উমা ২৫, ৪২৬
শিব চতুর্দশী ৪৩২, ৪৩৩
শিবচন্দ্র সরকার ৫২৮
শিবচন্দ্র সেন ৪৪১
শিবচরণ ৪৪১, ৪৪৩
শিবজীব পণ্ডিত ৫৪৯
শিবনাথ চক্রবর্তী (ওর্ফে বল্লব দাস) ৮৬
শিবচরণ দাস ১০৯
শিবনাথ শাস্ত্রী ৬১৬
শিবনারায়ণ ৪৪১
শিবপুরাণ ৪৩২
শিব ভট্ট ৪২১
শিবমঙ্গল ৪২৬, ৪২৯, ৪৩০
শিবরাম ১২৫, ৪০৪
শিবরাম ঘোষ ১৬০, ১৬১
শিবরাম দাস ৯৮, ১০৯
শিবরাম রাজা ৪৪১
শিব-রামের যুদ্ধ ১৩৪, ১৩৫
শিবলিঙ্গ ৪২৬
শিব-শক্তি ৪২৭
শিব-শিবানী ১১৫, ৪২৬
শিব শিবানীর ছড়া ১১
শিব সংকীর্তন ৪৩১, ৪৩২
শিবানন্দ কর ৪২৫

শিবানন্দ চক্রবর্তী ৬৯, ৫৪৯
শিবানন্দ দস্তুর ৫৫১
শিবানন্দ পণ্ডিত ৫৪৯
শিবানন্দ সেন ৩০, ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৮৬, ৯০, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১
শিবানী ৩৮৬, ৪১০, ৪২৭
'শিবায়ন' ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৪৩, ৬১৬
শিবের গাজন ৪২৯
শিবের গীত ৪২৯, ৪৩২
শিবের ছড়া ৪২৯, ৪৩০
শিয়া ৬৫, ১৬৬, ২৭৪-২৭৭, ৩০২, ৩০৩, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৮৬
শিয়ালদহ ৪৭২
শিয়া সাহিত্য ২৩৫
শিয়া-সুফী ৫২২
শিরি-খসরু ৫২২
শিরি-ফরহাদ ১১০, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২৩৪, ৫০৩, ৫১৪
শির্নামা ৩০৪, ৩৫৫
শিশিরকুমার ঘোষ ৭৭
শিশু কৃষ্ণদাস ৫৪৯
শীত বসন্ত ১১১, ২৬৬, ২৭১
শীতলক্ষা ৪৩৬
শীতলা দেবী, শীতল বিবি ১১৬, ২৮২, ৩৮৬, ৩৯৫, ৪০৮, ৪২১-৪২৩, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৫৪, ৫৯৪, ৬০২
শীতলামঙ্গল ৩৯৮, ৪০৮, ৪০৯, ৪১১, ৪২২, ৪২৩, ৪৩১, ৪৫৪
শীতলার পাঁচালী ৪৪৪
শুক ১, ২, ১২৭, ১৩৭
শুক-সম্বাদ ৫৩২
শুক্লাধামালী ৫২২
শুক্লাম্বর আচার্য ৫৪৮
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ৫৪৯, ৫৫১
শুজা ৫৪০
শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ৮
শুম্ভ ৩৬৩
শুম্ভ-নিশুম্ভ ৩৮৭
শূন্য ৪৫৪, ৪৫৬
শূন্যপুরাণ ৩৯০, ৪০৭, ৪৩০, ৬১৪
শূন্যবাদ ৩৯০
শূলপাণি ৫৮৬
শেক্সপীয়ার ২৬৭, ৩৯৪, ৪২১
শেখ আমীরুদ্দীন ৪৭৩, ৪৮১, ৫১৫
শেখ আয়েজউদ্দীন ২৮০, ৪৭৩, ৪৮০
শেখ আসমত উল্লাহ ৫২২
শেখ ইজ্জতউল্লাহ বাঙ্গালী ২৪৯
শেখ ইউসুফ দেহলভী (গেদা) ৩১০
শেখ এ টি এম রহুল আমীন ১৮৭, ৩৭৮
শেখ ওমর উদ্দীন ৫১২, ৫১৩
শেখ কবীর ১০০
শেখ কমরউদ্দীন ২৬২, ৫১২, ৫১৩
শেখ কিনু ৩০৪
শেখ চান্দ ১৩, ১০৭, ২৮০, ৩০৪, ৩৪০, ৩৭৭-৩৭৯, ৩৮৪, ৬১৫
শেখ জয়েনদ্দি ৪৬৮
শেখ জাহিদ ৩০৪
শেখ জুম্মান ১৭৩
শেখ জেবু ৩০৪
শেখ তনু ৪৪১
শেখ নবী ২১৫
শেখ নূর মুহম্মদ ১৭১, ১৭২
শেখ নুরুদ্দীন হানাফি ৩৭৬, ৪৭৩
শেখ নুসরতী ১৬৮, ১৭১, ১৭৩
শেখ পরাণ ২৬১, ৩০৫-৩০৯, ৩২৭, ৩৫৪, ৬১৮
শেখ ফজলুল করিম ১৮৯
শেখ ফরিদ ২৬১, ৪৭৩
শেখ ফরিদের পুথি ৪৭৩, ৫০৪
শেখ ফরিদুদ্দীন আক্তার ৩৭৬
শেখ ভিকন ১০৭
শেখ মনসুর ৩০৪, ৩৫৫
শেখ মনোহব ১০৪, ১৯৮, ৩৫৬, ৩৭৯, ৩৮০
শেখ মুত্তালিব ১০৬, ৩০৫-৩০৯, ৩১৪, ৩৫৪
শেখ মুহম্মদ গাউস গোয়ালিয়রী ১৭০
শেখ লাল ১০৭, ৪৬৮
শেখ শরফুদ্দীন বু আলী কলন্দর শাহ ১৭
শেখ শরীফউদ্দীন ২৮৯
শেখ শুভোদয়া ১১৪, ৩০০, ৪৪১, ৪৫৫ ৪৭৯, ৫৩০, ৫৯৬, ৬০৯

শেখ সাদী ৩৩১, ৩৪১-৩৪৪, ৩৪৯, ৫৬০, ৫৬২, ৬০৩
শেখ সেরবাজ চৌধুরী ১০৭, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৬
শেখ সোলায়মান ৩৩০
শেখর ১২৪
শেখর রায় ৮৭, ৯৭, ৯৮
শের জামাল খান ২৪৮, ৫৩৩, ৫৩৪
শের মুহম্মদ খান ৫৭১
শের শাহ ১১৮, ১৩১, ১৭০, ১৮৭, ২১৫, ২৮৩, ২৯০, ৪৩৬, ৪৩৮
শেহাবুদ্দীন তালিশ ১৯৪
শৈব ১০৯, ৬১০
শৈব ধর্ম ৩
শৈব নাথমত, শৈব নাথপন্থ ৯
শৈব মুচুকুন্দ ৪৩২
শৈব সংহিতা ৬
শৈব সম্প্রদায় ১৮
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ১৭৬
শোভাবাজার ৫২৮
শোভা সিংহ ৩৯৯, ৪৩১, ৬১০
শৌনক ১৩৭
শৌরসেনী ২৬৭
শৌরসেনী প্রাকৃত ৯০, ২১৫
শ্যামতারা ৩৮৬, ৪৩৮
শ্যামদাস ১০৯, ১১২
শ্যামদাস আচার্য ৫৪৮
শ্যামা ৩৮৬, ৩৮৭, ৪১০, ৪১২
শ্যামানন্দ দাস (শ্যাম দাস) ৮০-৮৪, ৮৭, ১২৩
শ্যামামঙ্গল ৪১৩
শ্যামা সঙ্গীত ৩৮৭, ৪১৩
শ্রীআচার্য পুরন্দর ৫৫১
শ্রীকবিবল্লভ ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৮০
শ্রীকর ৫৪৯, ৫৫১
শ্রীকর নন্দী ১৯, ১১১, ১৩২, ১৪০, ১৪৫, ১৪৭-১৫১, ১৫৩, ১৫৭, ৫৩১
শ্রীকান্ত সেন ৫৫১
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩১
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ৪২২
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১১, ২৫, ৮৬, ১২০, ১২১, ১২৫, ১৭৯, ৩১৪, ৪৮৫, ৫২৫, ৬০৪, ৬১৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৫৪৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ৭৯, ৮০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত ৪৩, ৪৪
শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১১, ২৫, ৮৬, ৯১, ১২০, ১২১, ১৪০
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ৩৯১
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত ৬৯
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৩১৪, ৩৯১, ৫৫০
শ্রীখণ্ড ৩৫, ৩৭, ৪৯, ৬৪, ৯০, ৯৫
শ্রীগোপাল দাস ৫৫১
শ্রীগর্ভ আচার্য ৫৪৮, ৫৪৯
শ্রীচন্দ্র আচার্য ৫৪৯
শ্রীচন্দ্রশেখর ৫৫৯
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বচন ৫৫০
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা ২০৯, ২১০, ২২১, ২২৯, ২৭৮, ২৭৯
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪৪
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩৭
শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ৪৪
শ্রীচৈতন্য-সহস্র নাম ৫৫০
শ্রীদশম ৫৫০
শ্রীধর ৩৯৩, ৩৯৪
শ্রীধর কথক ৫২৫, ৫২৮
শ্রীধর কবিরাজ ৫৯৮
শ্রীধর পণ্ডিত ৫৪৮
শ্রীধরস্বামী ৬৫
শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য ৫৫০
শ্রীনাথ ৪৪, ১৬০, ৫৪৮, ৫৪৯
শ্রীনিধি আচার্য ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১
শ্রীনাথ পণ্ডিত ৫৫১
শ্রীনাথ বানিয়া ৫৮১
শ্রীনিবাস আচার্য ৩৫, ৩৬, ৪৬, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১১৬, ৫৪৯, ৫৫৩

শ্রীনিবাস আচার্যগুণলেশসূচক ৮৪
শ্রীপতি ৫৫১
শ্রীপুর ৪৩৬
শ্রীপুরুষোত্তম ৫৫১
শ্রীবরের ঝি ১০৯
শ্রীবৎস পণ্ডিত ৫৫৩
শ্রীবল্লভ চৌধুরী ৯৮
শ্রীবাস পণ্ডিত ৩১, ৩২, ৩৮, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৪৮, ৫৫১
শ্রীবাসপন্থ ৩৭
শ্রীবাৎস্যচরিতম ১৪৭, ১৫০, ১৮২
শ্রীমৎ গোসাঞি ৫৪৮
শ্রীমধুসূদন ৫৫১
শ্রীমন্ত সোলায়মান ২১৪, ২১৯, ২২১
শ্রীমন্ত সওদাগর ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৫, ৪৫৮, ৫২২
শ্রীমান পণ্ডিত ৫৪৯, ৫৫১
শ্রীমুকুন্দ ৫৫১
শ্রীরঘুনন্দন ৫৫১
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ৬, ৭, ১৮
শ্রীরামতীর্থ ৫৫০
শ্রীরামপুর মিশন ১৬০, ২৫৬
শ্রীরামমঙ্গল ১৩৫
শ্রীরাম পণ্ডিত ২৯, ৪৬, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫১
শ্রীরাম দাস ৫৪৮
শ্রীরাম সেন ৫৫১
শ্রীল নারায়ণ চক্রবর্তী ৫৪৮
শ্লোকাবলী ৩৫
শ্রীসুধর্মা (থিরিথুধম্মা) ১৯৯
শ্রীসুন্দরানন্দ ৫৪৮
শ্রীহট্ট ২৮, ২৯, ৩৮, ১০১, ১১৯
শ্রীহট্ট সাহিত্য সংসদ ১০১
শ্রীহরিচরণ ৫৫৩
'ষটচক্রভেদ' ৩৪৭
ষটসন্দর্ভ ৩৬
ষষ্ঠী ১১৬, ৩০৪, ৪২১, ৪২৩, ৪৩৮, ৫৯৪, ৬০২, ৬০৯, ৬১২, ৬১৩
ষষ্ঠীদেবী-ষষ্ঠীবিবি ৪২৩, ৪৪০
ষষ্ঠীমঙ্গল ৩৯৮, ৪১১, ৪২২, ৪২৩, ৪৫৪
ষষ্ঠীবর ১৬০, ৪০২
ষষ্ঠীবর দত্ত (গুণরাজ খান) ১৩২, ১৩৪, ৪০৭, ৪০৮
ষষ্ঠীবর সেন ১৩৪, ১৫৫, ৪০২
ষড় গোস্বামী ৩১, ৩৩, ৩৪, ৬৮, ৮৪, ৫৫৩
ষড় দর্শন ১২৮
'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' ৮৬, ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৪, ১১৯
ষোড়শী ৩৮৬
ষোশী কন্যা ৫৯১
সওগাত (পত্রিকা) ৩৫৮
'সওয়াল ও জওয়াব' ৩৪১, ৪৯৯
সওয়াল সাহিত্য ১৩, ৩১৮, ৩২০, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৪৯, ৫৬৫
সংকীর্তনামৃত ৯৮
সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত ৩৫
সংস্কৃত ২৫, ৮৬, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৯, ১৯৭, ১৯৮, ২০৭, ২১৫, ২৩৫, ২৭৩, ৪২৯, ৪৭৪-৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৫, ৫৪৭, ৫৭৩, ৫৮৩, ৫৯০, ৫৯৩
সকিনার চৌতিশা ৫২২
সক্রেটিস ১০
সখাওয়াত নামা ৫০৪
সখিনার বারমাস ৯৯
সখীর বারমাস ৯৯
সখী সম্বাদ ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭
'সঙ্গীত পারিজাত' ৫৭১, ৫৭৫
'সঙ্গীত রত্নাকর' ৫৭১, ৫৭৫, ৫৭৬
'সঙ্গীত রসকল্লোল' ৫২৮
'সঙ্গীত শিরোমণি' ৫৭০, ৫৭২
'সঙ্গীত সাধক' ৯৫
'সংগীত সার ও রাগকলা' ৫৭০, ৫৭১
সজনীকান্ত দাস ১৭৬, ১৭৭
সঞ্জয় ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৫২-১৫৫, ১৫৭, ১৬০
সঞ্জয় (বৈষ্ণব মহাজন) ৫৪৯, ৫৫১
সঞ্জয় মহাভারত ১৫২, ১৫৩
সতী ৪১০, ৪৩০
সতীদাহ ১১৬, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৯৮

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ৫২৫
সদাশিব কবিরাজ ৫৪৮, ৫৪৯
সদাশির পণ্ডিত ৫৫১
সত্যবতী ১২৭
সতী বিবির কিসসা ৫০৫
'সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী' ১৬৮, ১৯৮, ২০০-২০৩, ২১৪, ২১৯-২২১, ২২৫, ২২৩, ৪৮২
সতীশচন্দ্র রায় ৮৬, ১০৫, ১২৪
'সত্যকলিবিবাদসম্বাদ' (যুগসম্বাদ) ১৪৫, ১৯৮, ২৮৫, ২৯৭-৩০০, ৩১৮, ৩৪১, ৩৯৫, ৫৮৮, ৫৯৪, ৬০১, ৬০৮, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৭, ৬২৯
সত্যদেব সংহিতা ৪৪৩
সত্যনারায়ণ পাঁচালী ১১১, ১৩৩, ২৮২, ৪১০, ৪৩৯-৪৪১, ৪৪৩, ৪৫২, ৪৭৮, ৪৮৪, ৪৮৬
সত্যনারায়ণ প্রশস্তি ২৮৩, ৪৪১
সত্যনারায়ণ ব্রতকথা ৪২০
সত্যনারায়ণ পুথি ৪৪৪, ৪৫২, ৪৮০
সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ৩৯৮
'সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্যকথা' ৪২০, ৪৪৪
'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু' ৪৪৩
সত্যপীর (সত্য নারায়ণ) ২৮২, ২৮৩, ৩০১, ৩৯৫, ৪১১, ৪৪০-৪৪৩, ৪৪৫-৪৫৫, ৪৬৫, ৪৭৮-৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৯, ৫৮৭, ৬০২
সত্যপীর পাঁচালী ২৮২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৮৯, ৬১৭
সত্যপীর বিজয় ২৮১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪৪১, ৪৫৪,
সত্যপীর ব্রত কথা ৪৬, ৪৪১, ৪৪৪
সত্যবতী ১৩৯
সত্যরাজ রামচন্দ্র ৫৫১
সত্যানন্দ ভারতী ৫৫০
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১৯৮, ২০১
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২২, ২৮, ৪১৯, ৪৮৪, ৪৮৮
সদাগরের কিসসা ৫২২
সদানন্দ নাথ ১৬০
সদানন্দ ভট্ট ১১১
সদানন্দ ভারতী ৫৪৮
সদানন্দী ৬৪
সদাশিব আচার্য ৫৪৮, ৫৪৯
সদাশিব কবিরাজ ৫৪৮, ৫৪৯. ৫৫২
সদাশিব পণ্ডিত ৫৫১
'সদুক্তিকর্ণামৃত' ২৫, ১৪৫, ৬০৫, ৬০৯
সনাতন গোস্বামী ৩০, ৩১, ৩৩-৩৬, ৪০, ৫৬, ৬৫, ৬৮, ৮২, ৮৪, ১১৬, ১১৯, ৫৪৮-৫৫০, ৫৫৩
সনাতন পণ্ডিত ৫৪৮
সনাতন দত্ত ৫৪৯
সনেট ৩২৮
সন্ত আন্দোলন ২
সন্তধর্ম ১৯, ২০, ২৬৭, ৫৮৬
সন্তোষ দত্ত ৮৪
সন্দীপ ৩৯০, ৬০৪, ৬০৬, ৬১১
সন্ধ্যাকর নন্দী ১২৯, ৫৩০
সপ্তগ্রাম ৩৬, ১১৬, ১২২, ১৪৩, ৩৯১, ৬০৫, ৬১১
সপ্তপয়কর ১৯৮, ২১৪, ২২১, ২২৬, ২৫২, ২৭৮, ৩১২, ৫১৭
সপ্ত সোরাহ ২৫৯
সফীউদ্দীন ২৯৬, ৪৫৪
সফীউদ্দীন খাঁ (সফী খাঁ গাজী) ৪৪৩, ৪৮৮
সভারমুখতা ২৪০, ৩১৬
সমরকন্দ ১৯৭
সয়ফুনতমিজ-জরুখভান ২৬৬, ২৬৭
সয়ফুন মলুর্ক-জরুখভান ১১১
সমীরউদ্দীন ৬৩০
সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩৬-২৩৯, ২৭৮, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৮, ৪৯৬, ৫৪৪, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৯১, ৫৯৬
সয়ফুলমূলক লালবানু ২৫৪
সরফতুল্লাহ ১০০, ১০৭
সরফরাজ খান ৪৩৭, ৪৭৮, ৫৪১
সরসালের নীতি ১০০
সরস্বতী ১১৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৪২৭, ৪৩৮, ৬০২

সরস্বতীমঙ্গল ৪২৪
সরাফতউল্লা ৫৭৭
সর্বপ্রাণবাদ ৫৮৪
সর্বসংবাদিনী ৩৬
সর্বেশ্বরবাদ ৩০৩
সলীম শাহ ১৮৬
সহজ পন্থ ৯
সহজযান ২৮২, ৪৫৫, ৪৭৯
সহজিয়া ৮, ৯, ৮২, ৮৫, ১০৯, ৪৫৩, ৪৭৭, ৫৭৩
সহজিয়া তত্ত্ব ৩৭
সহজিয়া তান্ত্রিক ১৪
সহজিয়া-বাউল ৬০৯
সহজিয়া বৈষ্ণব মত ৩৯
সহদেব ১৩৭
'সহসরস' ৫০, ৫৭০
সাইদ আল জাফর বাহারী ৩৮৩
সাংখ্য (দর্শন) ৭, ৮, ১০৯, ১২৮, ৩৮৬, ৫৯৩, ৬০৮
সাংখ্যকারিকা ৭
সাঁওতাল ৫৮৪
সাঁওতাল বিদ্রোহ ৫৪২
সাকের মাহমুদ ১৭৪, ১৭৫
সাগর আলী ৫৭৫
সাতকানিয়া ১৮১, ২৪৭, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩১, ৫৩৩
সাতগাঁও ২৮৯, ৬০৫
সাতবাহন ৭
সাতু রায় ৫২৫, ৫২৭
সাদ আলী ২৯৫, ৪৮৫, ৫১১
সাদউমেঙদার (খদোমেঙদার) ২০৩, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৮, ২২৮, ২২৯, ২৭৯
সাদী ৩৩১
সাদেক আলী ২৪১
সাধুবর্ষ ভাগবতাচার্য ৫৪৮
'সাধু ভাষা' ৪৭৫
সাধুরীতি ৫৪৪
সাধ্যসাধনতত্ত্ব ৬৭, ৬৮
সাফাভি বংশ (ইরান) ২৩৫, ২৭৪, ৪৮৬
সাবিত্রী-সত্যবান ১৩৯
সামবেদ ৭
'সামা' ৫৬৬, ৫৬৯
'সায়াৎনামা' ৬০৮
সায়েদ কুমারের পুথি ২৬২
সারকথা বা তত্ত্বকথা ৫২৯
সারঙ্গ দাস আর্য ৫৫১
সারণ ১৬০
সারদা ৩৮৬-৩৮৮
সারদা চরিত ১২২
সারদানন্দ ১০৯, ১৩২
'সারদামঙ্গল' ১০৯, ১১১, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯৮, ৩৯৯
সারা-ইব্রাহিম ৩৬৬
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ৩১, ৪০, ৫৭, ৬৫, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫২
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন ৫৫০
সালেহ বেগ (সালবেগ) ১০৭
সাহ সের আলী ৫০৭
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২১১, ৬১৫
সাহিত্য পত্রিকা ১৬৫, ১৭১, ২১১, ২৪৯, ৩৩৬, ৩৭৮, ৫৫৩
'সাহিত্য প্রবেশিকা' ২৮২
সাহিত্য পরিষৎ পুথি ১৫৭, ৩৮৯
সিংহল ২৭, ৩৮৯, ৬০৭
সিংহেশ্বর উড়িয়া ৫৫১
সিকান্দরনামা ২০৮, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৬, ২৭৭-২৮০, ৪৮৮, ৫৬২
সিকান্দর লোধী ৫৬৯, ৫৭০
সিকান্দ্রা ৫৮৬
সিত কর্মকার ৫৫৭, ৫৬০, ৫৬১
সিদ্দিক ২৮৯, ২৯০
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় ৬৮, ৮২
সিন্ধু দেশ ৮
সিন্ধু বিজয় ২
সিপাহী বিপ্লব ৪৩৭
সিফৎ-ই-ইমান ১০৪, ৩০৫, ৩২৮, ৩২৯

সিফৎনামা ৩৮৪
সিফতুল আম্বিয়া ৩৫৩
সিরতাজ (সেরতাজ) ১০৭
সিরাজ কুলুব ১০৩, ৩৩১, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৪৮,
সিরাজ সবিল ১৩, ১০৩, ২৬২, ৩০৫, ৩৩১, ৩৫৬, ৫৬২,
সিরাজুদ্দৌলা ৪৩৭, ৪৭৮, ৫৩১, ৫৪১, ৫৮৭
সিরাত ৩৬১, ৩৭৮
সিরিয় ৩০৩, ৪৫৬
সিবিয়া ২৭৫, ২৭৬, ২৯৬ ৪৫৫, ৪৬৭
সিলেট ১১২, ১২৫, ১৫৩, ২৯২, ৩৫৮, ৪০৭, ৪০৮, ৪২১, ৪৫৮, ৫৩৯
সিরাজ খান ইবনে ফখরুদ্দীন আহমদ ৫৭১
সীতা ৪২, ১২৮, ১২৯, ৩৬৪
সীতাকুণ্ড ১৮৭, ২৮৪, ৩০৫, ৩০৮, ৩৫৪, ৫৩৯, ৬০৪
সীতাগুণকদম্ব ৩৯, ৮১
সীতা চরিত ৩৯, ৭৯, ৮১
সীতা দেবী ২৯, ৩৭, ৩৯, ৫৪৮
সীতাপতি ৪০৮
'সীতার বনবাস' ১৩৪
'সীতারাম' ৪৭৭
সীতারাম ৫৫৭, ৫৬১
সীতারাম দাস ৪০৬, ৪০৭, ৪৬৫, ৬০৫, ৬১৩, ৬১৫
সীতারাম রায় ৫৪০
সুকুমার সেন (ডক্টর) ৮, ৯, ১৭, ৩৯, ৪৩, ৬৭, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯২, ১২৩, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৪০, ১৪৪, ১৫১-১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৭০, ১৭৪, ২০৫, ২২৯, ২৮২, ৩৫৭, ৩৯২, ৪৪০, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৮৩, ৪৯১, ৪৯৮, ৫১৭, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৯৫
সুখ দাস ৪০৮
সুখময় মুখোপাধ্যায় ৩৫, ৫৭, ৫৮, ৬৯, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৯, ৯৫, ৯৭, ১১৭, ১১৯, ১২৩, ১৩০, ১৪০, ১৪১, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬-১৫৯, ১৬১, ২১১, ২৮২, ২৮৩, ৩৯২, ৬০৬
সুখানন্দ পুরী ৫৪৮, ৫৫০
সুগ্রীব ৩৬৪
সুগ্রীব মিশ্র ৫৪৯
সুঙ্গ ৪২৭, ৪৩৪
সুচক্রদণ্ডী ৪৩৩
সুজন-চিত্রাবতী ২৫৬-২৫৮
সুজা ২১০, ২২১, ২৭৮, ২৭৯, ৩৩১
সুজাউদ্দীন ৪৩৭
সুজাউদ্দিন খান ৩২২, ৩২৩
সুত্তপিটক ১৩০
সুদাম ৪০৮
সুদর্শন মিশ্র ৫৪৯
সুধা ১০৫
সুধানিধি ৫৫১
সুধারাম ২৩৯
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ৩৮৭, ৩৯১
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডক্টর) ৪, ৫, ১২, ১৭, ১২৯-১৩১, ৪৭৭, ৪৮৩
সুনীতিভূষণ কানুনগো (ডক্টর) ২৮৩
সুন্দর ফকির ১০৭
সুন্দর বন ৪৫৭, ৪৫৮
সুন্দর হরিদাস ৫৪৯
সুন্দরানন্দ ৫৫২
সুন্না ২৭৫
সুন্নীমত ৩০২, ৪৫৫
সুবচনী মঙ্গল (শুভদামঙ্গল) ৪২৪
সুবন্ধু ১৬৫
সুবুদ্ধি খান ৫৪৯
সুবুদ্ধি মিশ্র ৫৭, ৫৯, ৫৫১
সুবুদ্ধি রায় ১৬০
সুবে বাঙ্গালা ৪৩৭, ৫৯০
সুভাষিতরত্নকোষ ৭, ২৫, ১৪৫, ৬০৯
সুভাষিতাবলী ৬০৯
সুমন্ত ১৩৭
সুমাত্রা ৬০১, ৬০৭
সুহ্ম ৮৬, ৩৮৭, ৪২৩
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫, ১৭
সুরাট ৩১
সুরুজ্জামাল ৫১৮
'সুরতনামা' ৩০৬, ৩০৮
সুরদাস ৫৭০
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৮

সুল তইঙ সন্দ ১৯৪
সুলতান আহমদ ভূঁইয়া ৩৩৫
সুলতান জমজমা ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪০
সুলতান জয়নুল আবেদীন ৫৬৯
সুলতান নাসির শাহ ১০০
সুলতান ফিরোজ শাহ ১৭৮, ১৭৯
সুলতান বলখী ৪৯৭
সুলতান বলখীর কাহিনী ৪৯৭
সুলতান বাহাদুর শাহ ৫৬৯, ৫৭১
সুলতান মাহমুদ ৩১৭
সুলতান সুফিয়ান সাহে এমরান চন্দ্রবান ৫০৮
সুলতান হোসেন শাহ ৫৬৯
সুলোচন ৫৫১
সুশীল মিশ্র ১১১, ২৬৬, ২৬৮-২৭০
সুশীলকুমার গুপ্ত ৮, ১০
সূফী ২, ৫, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪, ১৮৯, ২০৮, ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৮, ৫১৪, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭৩, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৯, ৫৯০, ৬০৩
সূফীতত্ত্ব ৮, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ২৪৩, ৩৭৭, ৪৯৯, ৫৮৭, ৬১১
সূফী ধর্ম, সূফীবাদ, সূফীমত ৫, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ৩২, ১৮৯, ২৫১, ২৬৭, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩১৬, ৪৫৬, ৫৮৬
সূফী সানাউল্লাহ ৩৮৫
সূফী সানাউল্লাহর সিফৎনামা ৩৮৪, ৩৮৪
সূফী সাহিত্য ২০, ১০০, ৩১৮
সূর্য ৬, ৪২৪, ৪২৬, ৪৩২, ৫৮৬
সূর্য উজাল বিবি ২৭৩, ৪৯৩, ৫০৭
সূর্যদাস ৫৪৮, ৫৪৯
সূর্য মঙ্গল (আদিত্য চরিত) ৪০৮, ৪২৪,
সূর্যদাস সরখেল ৩৯, ৫৮, ৮৫, ৫৫২
সেকান্দর নামা ৫০৫
সেন্ট অগাস্টিন ২৮
সেন (বংশ) ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৫৫, ৪৭৪
সেন আমল ২৮২, ৪৩৪, ৬০২, ৬১০
সেনভূম ৪০৬
সেরাতুল মুমেনীন ৩৩৫, ৪৮৯, ৪৯৬
সেলিম শাহ ১৭০
সেলিমাবাদ ৩৯২, ৪০৫
সৈয়দ আইনুদ্দীন ১৭, ৯৮, ৩৩২, ৫৬৪, ৫৬৫
সৈয়দ আকবর ২৫৪
সৈয়দ আকবর আলি শাহ্ ৯৯
সৈয়দ আফজল ৯৯, ১০৩
সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী ৫৪৬
সৈয়দ আবদুল মান্নান ২৫০
সৈয়দ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ৪১০
সৈয়দ আলী আহসান ১৭১
সৈয়দ আহমদ ২৪৯
সৈয়দ আহমেদ (ওয়াহাবী নেতা) ৫৪৩
সৈয়দ কলবে মুস্তফা ২১৮
সৈয়দ কাসিম শাহ ১০৫
সৈয়দ নাসির ৩৩০, ৩৫৬
সৈয়দ নাসিরউদ্দীন ৩০৫
সৈয়দ নাসির আলী ৪৭৩
সৈয়দ নুরুদ্দীন ৩০৫, ৩১৮, ৩১৯, ৩৪১, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৭৮, ৩৮৪
সৈয়দ ফিরোজ শাহ ৯৯
সৈয়দ বায়েজীদ ১০৭
সৈয়দ মুর্তজা ১৫০-১৭, ১০৫, ১১১
সৈয়দ মুসা ২০৫, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২৭৯
সৈয়দ মুহম্মদ ২২১, ৩০৭
সৈয়দ মুহম্মদ আকবর ৪৮৩
সৈয়দ মুহম্মদ খান ২১৪
সৈয়দ মুহম্মদ নাসির (সৈয়দ নাসিরুদ্দীন) ১০৩, ২৬২
সৈয়দ শাহনুর ১৬
সৈয়দ সুলতান ১৩, ১০১, ১০৪, ১০৭, ১১১, ১৪৪, ১৫৩, ১৬৬, ২৪৩, ২৪৬, ২৫৬, ২৬০, ২৬১, ২৭৬, ২৭৭, ২৯০, ২৯১, ৩০৬-৩০৯, ৩১৪, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫-৩৬৩, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৫-৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮৪, ৫১২, ৫২২, ৫৬২, ৫৭৭, ৫৮৮, ৫৯০, ৫৯১-৬১৯
সৈয়দ সুলতান–তার গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ ১৯৫, ২৪৩, ৩৭৫

সৈয়দ হামজা ১৬৬, ১৭০, ১৭৩-১৭৫, ২৭৭, ২৮০, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৮৯-৪৯০, ৪৯১, ৪৯৪, ৫০৯, ৬১৬
সৈয়দ হালু মিয়া ৪৫৭
সৈয়দ হাসান ২৪৩, ৩০৫-৩০৭, ৩১৮, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭
সৈয়দ হাসান আসকারী ২০০
সোনাভান ২৭৩, ২৭৭, ২৮১, ৪৮৮-৪৯১, ৪৯৩, ৫১৮
সোনারগাঁও ২৮৯, ৬০৬, ৬০৭, ৬১০
সোমদেব সূরি ৭
সোলায়মান ৩০৫
সোলায়মান কররানী ১৩২, ১৫২, ১৮৮, ২৯০, ৪৩৬
সোলেমান (নবী) ৫৭৭
সোলেমান (ভূগোলবিদ) ৬০৭
সোহরাওয়ার্দীয়া ৩০৩
সোহরাব ৫১০
সৌলতজঙ্গ ৫৮৭
সোহরাব ৫১০
সোহরাব-রুস্তম ৫১৯
স্কন্দ পুরাণ ২৫, ৬৮, ৪৩০, ৪৪০
স্বতন্ত্র্যাভিমান ৫৫০
স্তবমালা ৩৫
স্বয়ম্ভূ ৪২৭
স্বরূপ ৫৫১
স্বরূপ দামোদর ২৯, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৬৫, ৬৭, ৭৮
স্বরূপ বর্ণনা প্রকাশ ৬৯, ৮২
স্বরূপ রামানন্দ ২৯
স্বাধীন সুলতানী আমল ৪৩৫, ৪৩৬
স্বামী হরিদাস ৫৭০
স্মৃতি ১৯
স্রষ্টা-সৃষ্টি তত্ত্ব ১৩
হংসদূত ৩৫
হকিকতে সিতারা ৪৮৯
হজরত ১০৭
হজরত আদম ৩৬০, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৮৪
হজরত আবুবকর ২০৪, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৮০, ২৯৬, ৩৫৭
হজরত আয়েশা ২৭৫, ৩৩৪, ৫৬৮
হজরত আলী ১৬৬, ২৭৩-২৭৭, ২৮১, ২৮৪, ৩৫৭, ৩৬১, ৪৫৬, ৪৮৮, ৫৭৪
হজরত ইব্রাহিম ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৮৪, ৪৬০, ৫২২
হজরত ঈসা ৩৩৪, ৩৬৩
হজরত উমর ২৭৫, ২৭৬, ২৯৬, ৩৫৭, ৫১৯
হজরত ওসমান ২৭৫, ২৭৬, ৩৫৭, ৩৮০
হজরত মুসা ৩৪২, ৩৫১, ৩৬৯, ৩৮৪
হজরত সোলায়মান ৩৬৯, ৩৮৪
হজরত ফাতেমা ২৭৪, ২৭৫, ২৯১, ৪৫৬, ৫১৮
হজরত মুহম্মদ ৩, ১৬৬, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩৩৪, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৬০, ৩৬১, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮৪, ৪৯৩, ৫১১, ৫১৮, ৫২০, ৫৭৪
হজরত হামজা ১৬৬, ২৭৩, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ৩৬১, ৪৭৮, ৪৮৮, ৪৯৩
হটু (রূপমঞ্জরী) বিদ্যালঙ্কার ৫৯১
হুনুফা ২৭৭
হনুমান ১২৯
হপকিনস ১২৬
হবিগঞ্জ ৩৫৮
হবিবর রহমান খান শেরওয়ানী ১৯০
হর-গৌরী, হর-পার্বতী ৮৫, ১১০, ১১১, ১১৫, ৩৬৪, ৩৯৫, ৪১০, ৪১৫-৪১৭, ৪২৯, ৪৩৪, ৫২২, ৫২৫
হরগৌরী সম্বাদ ১৩, ৩০৪, ৩৪০, ৩৪১
হরপার্বতী মঙ্গল ৪৭২
হরপ্রসাদ রায় ৪৭৭
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়) ৭৭-৭৯, ১৭৬, ১৭৭
হরায়রা খুলাইদা ৫৬৭
হরিচরণ আচার্য ৪৩২
হরিচরণ দাস ৩৮, ৮০, ৮১
হরিণামৃত ব্যাকরণ ৩৬
হরিদাস ১০৯, ১১৮, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৩
হরিদাস (যবন) ২৯, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৫৯, ১১৯, ৫৪৮
হরিদাস ঠাকুর ৫৪৯, ৫৫১

হরিদাস পণ্ডিত ৬৯
হরিদাস ব্রহ্মচারী ৫৫৩
হরিদেব বসু ১৬০
হরিধরের ঝি ১৩৩, ৫৯১
হরিনারায়ণ দেব ১৫২-১৫৭
হরিবংশ ৬, ১২৩-১২৫, ১৩১, ১৩৯, ৩৫৯, ৩৮৭, ৫২৫, ৫৫০
হরিভক্তিবিলাস ৩৫, ৩৬
হরিমোহন রায় ৫২৮
হরিলীলা ৩৯৯
হরিহর পণ্ডিত ৫৪৮
হরিহরানন্দ পুরী ৫৫০
হরু ঠাকুর ৫২৫-৫২৭
হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৪৪১
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫৬৬
হরেন্দ্রনারায়ণ ১৬০
হলায়ুধ ৫৪৮
হলায়ুধ আচার্য ৫৪৯
হলায়ুধ মিশ্র ৪৫৪
হাওড়া ৪৪৪, ৪৬৮, ৪৭৯, ৪৮৫-৪৮৭, ৪৮৯, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫১৪
হাওয়া ৩৬৪
হাকিম সালাওয়াত আলী খাঁ ৫৭১
'হাজার মসায়েল' ৩০৫, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫০, ৩৮২, ৩৮৩, ৪৮৯
হাজী আলী ২৬৩
হাজী আহমদ ৪৩৭
হাজী খলিল ২৮৯
হাজীগঞ্জ ৩৪৮
হাজী মুহম্মদ ২০, ৩০৪, ৩০৬-৩০৮, ৩১৪, ৩৫৪
হাটহাজারী ১৯৯, ৩৮১, ৫৫৩
হাড়ই পণ্ডিত ৫৪৮, ৫৪৯
হাতিম ২৮৯, ২৯০
হাতেম তাই ১৭৩, ৩৫৩, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৮, ৫২২
হাদিস ২৭৫, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩১৬, ৩৬০
হাদিস বয়ান ৫২২
হাদিসের কথা ৯৯, ৩৩৫
হাদী বাদশাহ ২৬১
হাদী মুহম্মদ ৫২২
হানিফা ২৭৩, ২৭৬
হানিফা ও কয়রাপরী ২৭৩, ২৭৭
'হানিফার দিগ্বিজয়' ১৭৮, ১৮৪, ২৭৭
হানিফার বারমাস ৯৮
হানিফার লড়াই ২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ৩৫৩, ৩৫৪
হানিফউদ্দীন মুহম্মদ ৫২১
হানিফুদ্দিন মিয়া ৫২১
হান্টার ২০০
হাপু গান ৫৪১
হাফ আখড়াই ৫২৩, ৫২৫, ৫২৭
হাফিজ ১০, ১৪
হাফিজ জলন্ধরী ১৬
হাফিজউদ্দীন আবুল বরকাত ৩১৮
হাবিবুল হোসেন ২৯৬, ৪৭৩, ৫১৯
হামিদ ২৯২, ২৯৩
হামিদ আলী ২৯৫
হামিদ খান ১৮৫, ১৮৬
হামিদউদ্দীন খান ৩২২, ৩২৩
হামিদী ২০০
হামিদুল্লাহ খান ১৮৬
হাম্মাদ (ওর্ফে এজিয়া) ৫৭০
হায়দর বখশ ১৯০
হায়দারউল্লাহ ৫২২
হায়দরাবাদ ২৭৯
'হায়রাতুল ফিকাহ' ১০৬, ২৫৩, ৩০৫, ৩৩৩, ৩৪০, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৬
হায়াত মাহমুদ ২৯৩, ৩৩৪, ৪৬৪, ৪৮৩, ৫২২
'হারামণি' ৪৭৯
হারি ২৬১, ৫৭৫, ৬১৮
হারুত রোয়াজা ২৬১, ৬১৮
হামজা খান ১৪৬, ১৪৭, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২৮৯, ২৯০
হামজার জঙ্গনামা ১৬৬
হামজার বিজয় ২৪৪
হারুন ৭৯
হারুন-অর রসিদ ৫০৯
হার্মাদ ১৯৮, ২১২, ৪৩৬, ৪৩৭
হাল ৭
হালী ২৮
হাশেমী বংশ ২৭৫, ২৮৪

হাসমত আলী ১০৭
হাসমত চৌধুরী ৩৩২
হাসন বানু ১০৬, ২৫৩, ২৫৮, ৩৫২, ৩৫৬
হাসান ৬৫, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪, ৪৫৬
হাসান কোরাইশী ৩৮৪
হাসান বসরী ৩০২, ৩০৩, ৩৮৪, ৪৫৬
হাসান শরীফ ১০৭
হাসান-হোসেন পালা ৪০৯
হাতেম তাই ১৭৩, ৩৫৩, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৮, ৫২২
হাসেম কাজির পুথি ৫১৮
হিজলী ৪৫৯, ৪৬৫
'হিতজ্ঞানবাণী' ২৯৩, ৩৩৪, ৩৩৫
'হিতোপদেশ' ৪৭৭
হিন্দি ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ২০৭, ২০৮, ২৩৪, ২৩৫, ৪১৬, ৪৫২, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৮৪, ৫২৮, ৫৯৩
হিন্দি-আওধী ৮৮, ১৬৬, ২৪৯, ২৭৬, ৪৮৮
হিন্দু ৯, ১০, ২৭, ২৮, ৩৩, ১১১, ১১৪, ১১৬, ১১৮, ১৩৬, ১৪০, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৭, ২৩৪, ২৬৭, ২৮২, ৩০১, ৩০৪, ৩৫৩, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৭৮, ৩৯০, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪২, ৪৫২, ৪৫৪-৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮২-৪৮৪, ৪৮৬, ৫৪৩, ৫৭০, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৯-৬০০, ৬০২, ৬০৮, ৬০৯, ৬২০, ৬২২, ৬২৬, ৬২৮
হিন্দু কবির পদসাহিত্য ৮৫, ৮৬, ১০৯, ১১৩
হিন্দু ধর্ম ৯, ১০, ৩৮৬
হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-মুসলিম ১২-১৪, ২৩৪, ২৩৫, ২৮২, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৫, ৪৮৮, ৫২৩, ৫৮৫, ৫৯৪
হিন্দুস্তানী ২১৫, ২৩৪, ৩৫১, ৪৫২, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৫৭০, ৫৯০
হিন্দুস্তানী-বাঙলা ৩৫১, ৪৫২, ৪৭৪
হিন্দুস্তানী সংগীত ৫৭২
হিব্রু ২৭৮, ৩০১
হিমালয় ৪২৮, ৪৩০
হিরণ্য ৫৫১
হিরণ্যকশিপু ৩৬৩
হিলালী আস্তাবাদী ১৯০
হীরা ৩৮৮
হীরামণি ১০৯, ১১৩, ৫৯১
হুক্কাপুরাণ ৫৫৭, ৫৬০, ৬০৩
হুগলী ১৭৩, ৪২০, ৪২৪, ৪৩৬, ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৫-৪৮৭, ৪৯৮, ৫১৪, ৫২৮, ৬০৫, ৬১১
হুগলী নদী ৪৮৫
হুন ১
হুতোম প্যাঁচার নকশা ৪৭৭
হুমায়ুন ২১৫, ২৩৫, ২৭৪, ৪৩৬, ৪৭৩
হুমায়ুননামা ১৪৪, ২৫১
হৃদয় ৪০৮
হৃদয়ানন্দ ৫৫১
'হেদায়েতুল ইসলাম' ৩০৫
হেমচন্দ্র ১২৮
হেমলতা ঠাকুরানী ৮১, ৮২, ৯৭
হো ৫৮৪
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ৫৯৩
হোলি ৬১২
হোসেন ৬৫, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪, ২৯২, ২৯৪, ৪৫৬, ৪৭৮, ৪৮৮
হোসেন ওয়ায়েজ কাশিফী ২৯৫
হোসেন কুলী বেগ ৫৩৫
হোসেন খাঁ ৫২৭
হোসেন খান ৫৩৪
হোসেন-প্রশস্তি ৫৪৫
হোসেন ফকির ৫৭৭
হোসেন মঙ্গল ৪৮৯, ৪৯০
হোসেন শাহ (সৈয়দ আলাউদ্দীন) ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৫৫, ৫৯, ৮৯, ৯০, ৯৯, ১০১, ১১৬-১১৮, ১৩২, ১৪১-১৪৪, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৭৮, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬, ২৫২, ২৮৩, ২৯০, ৩৯৭, ৪১০, ৪৪০, ৪৬৮, ৫৪৫
হোসেন শাহ শর্কী ৮৯, ৫৬৯-৫৭১
হোসেন সংগ্রাম ২৯২
হ্যালহেড ৪৮৫, ৪৮৬

APPENDIX

Ain-i-Akbari ৬১৩, ৬১৪, ৬১৭
'Aspects of Bengali society from old Bengali Literature' ৬১৪-৬১৭
Bagchi, P.C. ৬১৪
Battutah, Ibne ৬১৭
Bengal in the 16th century ৬১৬
'Bengali Literature' ৬১৩
Bernier ৬১৬
'Bengal under Akbar & Jahangir ৬১৪-৬১৬
Borah, M.I ১৮৭
Brilish Policy and Muslim Education in Bengal ৬১৩
Bowrey ৬১৬
Baharistan Ghyabi ৬১৭
Bhattashali, N. K ৬১৩, ৬১৭
'Bhattasali Commemoration Volume' (Dhaka Museum) ১৯৪
Compos, A. J ৬১৭
'Chittagong During Afgan rule' ২৮৪
Coins and cronology of the independent Sultans of Bengal ৬১৩-৬১৫, ৬১৭
Dasgupta, Tamonash Chandra ৬১৪, ৬১৭
Dasgupta, J.N ৬১৬
Datta, K.K. ৬১৩
De, S.K (Dr) ৫২৬
Descriptive Catalogue of Bengali Books ৪৮৫
Elliot and Dawson ৬১৩
'England's Pioneers in India' ৬১৬
Fitch, Ralph ৬১৪, ৬১৭
Gibb, H.A.R.
Ghose ৬১৩
Halim, Abdul ৫৭২
Harvey, G.E. ১৯৫
Harvey, H.G. ১৯৯
The Hindu View of Life ৪
History of Bengal ৬১৩, ৬১৬
'History of Bengal Subah ৬১৩
History of Bengali literature in the Nineteenth Century ৫২৬
History of Burma ১৯৪, ৬১৭
History of Chittagong ১৯৫
'History of India' ৬১৩
'History of Indo-Pak Music' ৫৭২
Horton, J ৬১৬
Hussain Shahi Bengal ৪৬৭
Indian Contribution of the study of Hadith literature ৩১০
Influence of Islam on Indian Culture ৪, ১৭, ৬১৩
Ishaque, Md. ৩১০
Journal of the Asiatic Society of Bengal ১০৫, ২৮৪
Karim, A (Dr.) ৪৬৭, ৬১৩, ৬১৪
Land of the Great Image ১৯৪
Law, N.N. ৫৮৮
Laet, De ৬০০, ৬০১, ৬১৬
Mahuan's Account of Bengal ৬১৭

Mallik, A.R ৬১৩
Manrique ৬১৪-৬১৭
Maurice Collis ১৯৪
Minhaj ৬১৩
New Values ৬১৭
Nicholson, R.A. ৫৬৭
'Outline of Burmese History' ১৯৪, ১৯৫
'Pagsam Jon Zam' (Antiquity of Chittagong) ১৯৪
Pelo Vino ১৯৪
Phayre ১৯৪, ১৯৫
Purchas-His pilgrims ৬১৪
Portuguese in Bengal ৬১৭
'Promotion of learning during Mohamedan Rule' ৫৮৯, ৬১৩
Rahim, A (Dr) ৬১৪, ৬১৭
Roy Chowdhury, Tapan Kumar ৬১৪
Radhakrisnan, Sarbapalli ৪
Sarat Chandra Das ১৯৪
Sarkar, J.N ৬১৩, ৬১৪, ৬১৭
Schuten ৬০০, ৬০১, ৬১৬
Shihabuddin Talish ৬১৬
Social & Cultural History of Bengal ৬১৪, ৬১৭
'Social History of the Muslims of Bengal' ৪৬৭, ৬১৪
Tarachand ৬১৩
Tarafdar, M.R (Dr) ৪৬৭
Tavernier ৬০৫
Tassy, De 588
Viswabharati Annals ৬১৪, ৬১৫, ৬১৭
Waqiat-i-Jahangiri ৬১৩
Wise, James ৬১৩